...ক্ষের ৫

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপা...
শিবঠাকুরের ঠিকুজি
বিয়ের ফুল (উপন্যাস) ... ৪৪৭
কাঁকড়া (সচিত্র) ... ৫৫০
দেশের কথা
চিত্র-পরিচয়, পঞ্চশস্য ইত্যাদি ... ১৬৮

...ড, ডি-লিট,—
...দ্র-প্রশস্তি ... ২৭
...সনগুপ্ত—
...র সংশোধন ... ২৭৪
...—
...তার বাসা ... ৭৯
...ক, বি-এ—
...ইতিহাস (কবিতা) ... ৩৫
... ফুল (কবিতা) ... ১২৮
...য় (কবিতা) ... ২৬৪
...ভ (কবিতা) ... ৩৯২
...শে (কবিতা) ... ৫৩৯
...প্ত, এম-এ, অধ্যাপক—
...দয় ভাবধারা ... ৩২১
...াম্—
... ... ২৭২
...বুল হাকিম্—
আল্লাহর স্বরূপ (কষ্টিপাথর) ... ১১৫
...গ—
(... ... ৪৯৪

জ্ঞানকীনাথ দত্ত—
অগ্নিসংস্কার (কবিতা)
সহযোগিতার পরিণাম (কবিতা)
ন্যায়ের আসন (কবিতা)
দারিদ্র্য-মাহাত্ম্য (কবিতা)
অভিশাপ (কবিতা)
জিতেন্দ্রিয় মণ্ডল—
কুষ্ঠরোগ ও দেশী খৃষ্টান
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
মহাত্মা গান্ধীর মনোগত অভিপ্রায়
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—
বাঙ্গালা ভাষায় প্রাণিবিজ্ঞানের
দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—
বার্থা (গল্প)
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, অধ
সর্ব্বব্রহ্মবাদ (Pantheisr
(Mysticism)—স্পি
নলিনীকান্ত গুপ্ত—

... ৩৪
... ৩'৮ রাজা কা
৩২৮ রাণী হইবার গুণ
শ্রীসত্যেন্দ্রনা ৩৭৯ রামদাস—অধ্যাপ
লনী (সচিত্র) ... ৫২৯ রেডিয়ামের গুণ—শ্রীশর
) ৬১,১৬৯,২২৭,৩৫১,৪৪ ,৫৩৫ রেডিয়ামের শক্তি—শ্রীশরৎচন্দ্র ব্র
দোহন (সচিত্র) ... ১৬৩ শরৎ প্রভাত (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চ
ষ্টিপাথর)—শ্রীবসন্তকুমার শানানো দাঁত (সচিত্র)
... ১১৭ শিক্ষার বীজ—রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র
... ৩৮১ শিবঠাকুরের ঠিকুজী—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্
মূর্ত্তি (সচিত্র)—শ্রীসুরেশচন্দ্র শিরাজ্-ই-হিন্দ্ (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ
... ৪৪১ শিশু-প্রতিভা—শ্রীসোমনাথ সাহা
তা)—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ... ৫৫০ শিশু-রাজ্য (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি
া)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ... ১৫৪ শ্যামদেশের ভিক্ষি (সচিত্র)
তা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্যামার শিশ্ (কবিতা)—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র
... ৫৫৯ সন্ধ্যায় (কবিতা)—অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজু
শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত ... ১৫০ সন্ন্যাসীর শিল্পকার্য্য (সচিত্র)
ত্র)—পিয়েমভি ... ২৪৩ সমাজের কথা (কষ্টিপাথর)—শ্রীনলিনীকান্ত
সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৭৯ সর্ব্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) ও মায়াবাদ (M
(সচিত্র) ... ৫৩৯ cism)—স্পিনোজা ও শঙ্কর—শ্রীধীরে
সচিত্র) ... ২৪৩ চৌধুরী, এম-এ
... ৩৭৯ সহজ ব্যায়াম (সচিত্র)
... ৪৪৫ সহযোগিতার পরিণাম (কবিতা)—শ্রীজানকীন
-রায়বাহাদুর অধ্যাপক সহানুভূতি (গল্প)—শ্রীলীলা দেবী
-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞান- সংশোধনের সংশোধন—শ্রীকিরণকুমার সেনগু
২০০ সাইন্‌বোর্ডে মের প
সাগর

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

...ম-এ, ঢাকা মিউজিয়ামের
... ৩১৫
...) ... ৪১১
...থর) ... ১১৩
... মূল ... ১৬৮
...ষ্টিপাথর) ... ১০৯
... ৭০
... ৭৪,১৫৫,৩৫৭,৪৫৮,৫৬০
...বিতা) ... ৮০
...বিতা) ... ১৭৪
...তা) ... ৪৪৮
...এ—
...জীবনের শৈশবকাল ... ৪২৭
...সি—
...ভিতরের ও বাহিরের ৪৮৯
...স্থান ও শিক্ষা (কষ্টিপাথর) ১০৯
... ১৫০
...) ... ৪৮
... ৫৬০
...) ... ১৬০
... ২৯৫
...কবিতা) ... ৩৩৬
...া) ... ৩৯১
... ৫৫৪
...াথর) ... ১১৭
...) ... ২৫৪
...অধ্যাপক—
... ৩৭৮
... ১১৪

ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—
বদরীনাথের পথে
মণীন্দ্রলাল বসু—
মা (গল্প)
সুকান্ত (গল্প)
জন্মজন্মান্তর (গল্প)
মনোমোহন রায়—
ঢাকা জেলার একটি প্রাচীন কীর্ত্তি (সচি
মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, বি-এ—
জীবিত পুরুষপরম্পরা
মন্মথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ—
হাতল কাঁকড়া
মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—
ওম্
পুস্তক-পরিচয়
মাখনলাল চক্রবর্ত্তী—
অজৈব অভিব্যক্তি
মোহাম্মদ লুৎফর্ রহমান—
বিদ্রোহ (কষ্টিপাথর)
মোহিনীমোহন বসু—
পূর্ব্ববঙ্গে দাসত্ব প্রথা (কষ্টিপাথর)
যতীন্দ্রকুমার সিংহ, বি-এ, এটনি-এট-ল
পঞ্চশস্য
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ—
খলিফা ও তুর্কীর সুল্‌তান্
যতীন্দ্রনাথ শিকদার, এম-এ, অধ্যাপক—
প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়
যদুনাথ সরকার, এম-এ, অধ্যাপক—
প্রতাপাদিত্যের পতন
মুসলমান যুগ হইতে কি পাইয়াছি (কষ্টিপা
যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এস্‌সি—
নরবলি
যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, এম-এ, অধ্যাপ
বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ—
শিক্ষার বীজ
আদ্যশিক্ষা
মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
বিলাতযাত্রীর পত্র (কষ্টিপাথর) ...
রমেশচন্দ্র মজুমদার—
বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (কষ্টিপাথর)
রাখালরাজ রায়, এম-এ—
বাঙ্গালায় একারের উচ্চারণ
রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—
মুকের ভাষা (কবিতা)

ভাত (কবিতা) ... ১৬
ভোরে (কবিতা) ... ১৩৯
ও নাতি (কবিতা) ... ২৫৯
(কবিতা) ... ২২১
(কবিতা) ... ৫৫৪
—
যপরম্পরা ... ৭৯
ঠক
বিবরণ ... ৫৪৬
তি (গল্প) ... ৪১৬
র—
এম-এ, বি-এল—
(গল্প) ... ৬২
বি-এ—
(উপন্যাস) ৩১,১০২,২০৮,৩০৬,৪১৮,৫১০
ার দেশে (গল্প) ... ১১৮
চট্টোপাধ্যায়—
থুতু ... ৩৭৯
রায়—
নীচের ফুল (কবিতা) ৪৩৯
নগুপ্ত—
াজের কথা ... ৭৯
বী—
স্তা (কষ্টিপাথর) ... ১১১
দত্ত—
(কবিতা) ... ২৫
রিপুর (কবিতা) ... ৩০
কবিতা) ... ৩৭
বিজ্ঞ (কবিতা) ... ৩৩৭
(কবিতা) ... ৩৪৬
ামেলির প্রতি (কবিতা) ... ৩৪৯
ক (কবিতা) ... ৩৫১
(কবিতা) ... ৩৭৯
(কবিতা) ... ৩৮১
র্ধ্বজের প্রতি (কবিতা) ... ৪৫৭
-হিন্দ্ (কবিতা) ... ৪৬৪
(কবিতা) ... ৪৬৮
গান (কবিতা) ... ৫২০
খোপাধ্যায়—
পুরুষ-পরম্পরা ৭৯
—
:* ... ৩৪৯

সুখরঞ্জন রায়, এম-এ, অধ্যাপক—
অলোকপন্থায় পোপে ও রবীন্দ্র
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—
"আমার সম্পত্তি"
ঈশ্বরভক্তদের কাছে ক্রটি স্বী
সুধাংশুশেখর মজুমদার—
দুর্গেশ-নন্দিনী
সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ—
ম্যালেরিয়া এবং তাহার প্রতিকার
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ—
রাজদ্বার (কবিতা)
সুবোধচন্দ্র রায়—
চিত্তের জয় (কবিতা)
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম-এ, অধ্যাপক—
সিংহলের কথা (সচিত্র)
সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস,
সুশীলবাবুর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহা
রামদাস
পুস্তক-পরিচয়
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—
কাপড়ের কল
সুরেশচন্দ্র চৌধুরী—
ভাঙার গান (কবিতা)
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
পথের কথা
সুরেশচন্দ্র বসু—
ব্রহ্মদেশের আশ্চর্য্য বুদ্ধমূর্ত্তি (সচি
সুরেশচন্দ্র মিত্র, এস-এম-এস—
ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে
(কষ্টিপাথর)
সুরেশচন্দ্র রায়—
পাবনা জেলার পৌষ-পার্ব্বণ-উৎস
সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী—
বিদেশ-প্রত্যাগত হিন্দুর প্রা
(কষ্টিপাথর)
শ্রীসোমনাথ সাহা—
পঞ্চশস্য
হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—
জল-সমস্যা (কবিতা)
প্রলাপ (কবিতা)
বন্ধু (কবিতা)
হেমন্তকুমার সরকা
ইন্দো-ইউরোপ
"বিশ্বভাষা"

চিত্র-সূচী

কায় কাঁকড়া ... ২৩৭
কায় মানুষ ... ১৬৪
পেঁয়াজ ... ৫৪৪
লার উপর বোল্‌বোলা ... ৩৪৫
ড় আল্‌গা ... ৫২২
নারি, ডাক্তার— ... ৩৮৫
প-বিদায় (রঙীন)—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ১৯৩
ফকার কাফ্রিদের তামাক খাওয়া ... ৪৪৪
তোষ চৌধুরী, সার ... ৫২০
জাঁওয়েণ্টা ফাঁয়া বা বুদ্ধমূর্ত্তি ... ৪১৪
র পিঠে তাঁবু ... ২৪১
রপাড়া পটারি ওয়ার্কস্ ইত্যাদি ... ৫৩২
০ সালের আয়র্ল্যাণ্ড ... ৩৪৩
বাইসাইকেল ... ৩৩৭
মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝর্‌বে" (রঙিন)—
শ্রীআবদুর রহমান চাঘ্‌তাই .. ৪৮৯
চাকার সাইকেল ... ৫০
বোঁটায় তিন বেগুন ... ৫৪৩
বোঁটায় দুইটি বেগুন ... ৩৪৩
বোঁটায় দুই লঙ্কা ... ৩৪৩
সঙ্গে চরিটি কলা ২৪২,৩৪২
সনের ডাকে ভূতের সাড়া ... ৫৩৯
সনের ভূতের সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা ... ৫৩৯
র্সন, জে. ডি. ... ৮২
গুরু সাহেব—পূর্ব্ব আফ্রিকায় ... ২৮০
লস্, এইচ জী ... ৫৭২
মান সাগরের অর্দ্ধনির্ম্মিত বাঁধ ... ৪৪
সার্ট পার্টি ... ৫২৪
রী-কলম ... ১৬৫
র্ণল ওয়েজউড ইত্যাদি ... ৫২৬
ন্ধোর পথ ... ১২৯
রীরঙ্গ আয়াঙ্গার ... ৫২৬
কড়াব ক্রম-অভিব্যক্তি ... ২৩৩
কড়ার চোদ্দ দশা ... ২৩৪
রূপা ... ৫৩
গরিয়ার তামাক খাওয়া ... ৪৪৪
াল্‌কাটা পটারি ওয়ার্কস্ ... ৫৩১
জুরের খেজালত ... ৫২১
া (রঙীন)—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় .. ১
তিচ্ছন্দের ছবি ... ৫২
ম আলু হাত পোড়ালে বাবা! ... ৩৪৪
ছে কাঁটাল গোঁপে তেল ... ৩৪৩
ছচড়া ডাকাতে কাঁকড়া ... ২৩৯
গৃহস্থ কাঁকড়া
গেলাসের থির থাকা
গোদোহনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র
গোলকুণ্ডা দুর্গ ও গোলকুণ্ডা শহর
গোলকুণ্ডা দুর্গপ্রাকারের একটি বৃহৎ কামান
গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বাদশাহের কবর
চার-মিনার ফটক— হায়দরাবাদ
চিত্র-কাঁকড়া
চিংড়ি-আকার কাঁকড়া
চীনদেশে দোষীর সাজা
চীনা তীর্থযাত্রী
চেহারায় চিন্তার ছাপ
চৌগুলে
ছাত্রদের ধরা
জন্ বুলের পায়ে বোমা! ফাটে বুঝি!!
জল-পথের বাইসাইকেল
জল-পথের মোটর গাড়ী
জলের সমান থাকা
জিন্না
জুলুমবাজির শাস্তি বটে!
টাকের উপর বিজ্ঞাপন
ডিমের থির থাকা
তরুণ বরকনে
তিন-মণজওয়ালা অতিকায় পশু
তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিদ্রুম (রঙীন্)—শ্রীঅ
নাথ ঠাকুর
তুরস্কের আত্মপ্রতিষ্ঠা
তুলার বীচি ছাড়াইবার কল
ত্রিশ হাজার টাকার মুরগী
দড়ির টিকি
দন্ত মেশিন এণ্ড টুল ওয়ার্কস্
দশ হাজার বছরের আধুনিক পোষাক
দাসগুপ্ত এণ্ড সন্‌স্
দাঁতে শান
দ্ভ ভ্যালেরা
দুই বোন্ (রঙীন)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর
নাগবালা
নারিকেল-ছোব্‌ড়ার সাঁজোয়া
নুট্ হাম্‌সন্
ন্যাশন্যাল ট্যানারি কোম্পানী ইত্যাদি
পড়ুয়ার সঙ্গী পড়ার আলো
পরস্পরের মুখাপেক্ষা
পর্ব্বতের মূষিক প্রসব

চিত্র-সূচী

ুলে ভর দিয়া ওঠানামা ও হাঁটার ব্যায়াম ৪৪৮
প্রপুরী ... ৫০
মনাথম্, সি-এম্-জি ... ১৩৬
... ৪৪৬
ঘরকন্না ... ৩৪০
পেঁপে ... ৪৪৮
য়েদের তামাক খাওয়া ... ৪৪৫
শ দৃশ্য ... ৫৩১
র জন্য কৃচ্ছ্র-সাধন ... ২৪৩
দেশী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ... ৪১৬
... ৩১৭
... ৩১৮
র উপরকার অঙ্ক-সংখ্যার আকৃতি ... ৩১৯
... ৩৪৪
গোল-আলু ... ৫২
লিচাকা কাঁকড়া ... ২৩৮
া প্রতিনিধি ... ৫২৮
দোলা ... ৪৪৬
... ৫৭০
র অস্ত্র ... ৫৪৫
ানুষের পূর্ব্বপুরুষ ... ৫৪০
র্য্য ... ৩৮৫
র্য্য—নাগপুর কংগ্রেসে ৫২৫,৫২৬
লোঝুলি ... ৫২৩
য় তাঁত ... ৩৩৮
স্থ-পেটিকা ... ২৭৯
পেটিকা প্রদান ... ২৭৭
ক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,
হ ... ৫৩০
ার্কস্ ইত্যাদি ... ৫৩৪
ানী ইত্যাদি ... ৫৩৩
ময়ের তামাক খাওয়া ... ৪৪৪
আর, প্রভৃতি ... ৫২৫
কলিকাতা ... ২৭৮
গোড়া বা মন্দির ... ৪১৫
া ... ৪১৪
-সার্কাস ... ৯২
... ৫২২
ড়া ... ২৩৫
পাকা ... ২৪৪
শাই মহিষী ... ১৬১
ড়া ... ২৪০
প্রভৃতি ... ৫২৮

মাকড়সা কাঁকড়া ...
মাথায়-মুহুরি দুষ্ট ঘোড়া ...
মানুষ-বিবর্ত্তনের আগের ধাপের বনমানুষ ...
মানুষমুখো বাঁদর ...
মানুষের ও গণ্ডারের দৃষ্টি ...
মানুষের পূর্ব্বপুরুষ ...
মান্দ্রাজী স্বেচ্ছাসেবিকা ...
মেঘনাদ সাহা, ডক্টর ...
ম্যাক্সুইনী, টেরেন্স্ ...
ম্যাক্সুইনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা—
আমেরিকার পথে ...
ম্যাক্সুইনীর মুক্তির জন্য আয়র্ল্যাণ্ড-বাসীর ভগ-
বানের কাছে প্রার্থনা ...
যোগিনী মূর্ত্তি ...
যৌবন আর জুজুর লড়াই ...
রসিকলাল দত্ত ...
রংচঙা কাঁকড়া ... ২৩
রাসবিহারী ঘোষ ...
লর্ড রোনাল্ড্‌শে ...
লালা লাজপত রায়, প্রভৃতি—কলিকাতা কংগ্রেসে
লিষ্টার এ্যান্টিসেপ্‌টিক্ এণ্ড ড্রেসিং কোম্পানী ...
লোমশ কাঁকড়া ...
শঙ্কর আবাজী বীজে ...
শানানো দাঁত ...
শান্তি-দূত ...
শ্যামদেশের ভিত্তি ...
সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি ...
সদ্য বিধবা (রঙীন্)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর ...
সন্ন্যাসীর শিল্পকার্য্য ... ৪৩
সরলা দেবীচৌধুরাণী ... ৫২
সাইন্‌বোর্ডে গ্রামের পরিচয় ... ৫৪
সাপের শুওর গেলা ... ২৪
সাবধানের মার নেই ... ৫
সাঁতারে আরাম ... ২৪
সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি ... ১৪১
সিংহলী ঘানীগাছ ... ১১
সিংহলী মেয়েদের লেস্ বুনন ... ১৩৩
সিংহলের গানওয়ালী ... ১৩৫
সূর্য্যপুত্র রেবন্ত ... ৪১২
স্বয়ংপ্রভ পেন্সিল ... ১৬
হংসাকৃতি রাঙা-আলু ... ২৪
হাতল কাঁকড়া ... ২
হায়দরাবাদের মুসী নদীর পুল ... ৪

গঙ্গা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত পারাজু মহাশয়ের সৌজন্যে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২৭

১ম সংখ্যা

প্রতাপাদিত্যের পতন

[১]

নূতন ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কার।

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রবাদ যে মুঘল রাজ-প্রতিনিধি রাজা মানসিংহ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া দিল্লী লইয়া যান, পথে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। (Westland's *Jessore*, 2nd. ed., p. 24.)

মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদে থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পর তাঁহাকে (১৪ অক্টোবর ১৬০৫) ঐ কর্ম্মে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই (১৬০৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই আগষ্ট মাসে) তাঁহাকে সরাইয়া কুতবুদ্দীন খাঁকে নুরজাহান হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন। (ইক্‌বলনামা, ২ ও ১৯ পৃঃ)। সুতরাং মানসিংহ প্রতাপকে বিনাশ করিলে তাহা ১৬০৬এর মধ্যেই ঘটিত। (একখানা "অদ্বিতীয়" পুরাতন ফার্সী হস্তলিপি হইতে)।

গত ১৩২৬ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি যে এই প্রচলিত কথা সত্য নহে, এবং প্রতাপাদিত্য সশরীরে ২৬এ এপ্রিল ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুবাদার ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েক দিন পরে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইলেন।

তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের শেষ পরাভব কোন্ বৎসরে এবং কোন্ সুবাদারের হাতে ঘটে? তিনি মানসিংহ হইতে পারেন না। তবে কে?

সুখের বিষয়, এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যায়। বিলাতে একখান ফার্সী হস্তলিপি আছে, যাহার দ্বিতীয় পুঁথী পৃথিবীর অন্য কোথায়ও নাই। ইহার নাম খুলাসত-উস্-সিয়ার; রচয়িতার নাম আলাউদ্দীন ইস্‌ফাহানী শিতাব খাঁ (ছদ্মনাম ঘাইবী)। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫৬; প্রতিপৃষ্ঠায় ২০ লাইন। ইহার একমাত্র বিষয় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অতি বিস্তৃত ইতিহাস। ইতিহাস বলিতে অবশ্য বুঝায় শুধু সুবাদারের দরবারের ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, ওমরাগণের কার্য্যকলাপ, এবং বাদ্‌শাহের সভার সংবাদ। দেশের কথা, প্রজার অবস্থা, ইচ্ছা করিয়া বর্ণিত হয় নাই; তবে স্থানে স্থানে কিছু আভাস পাওয়া যায়।

এই পুঁথীখানি গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত, ফারণ দুই পাশে সমালোচনা ও টিপ্পনী আছে, এবং যোহরগুলি হইতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অধিকারীর নাম পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথম যাঁহাকে গ্রন্থকার পুঁথীখানি উপহার

দেন তাঁহার নামও আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের পক্ষে ইহা অমূল্য। আমি ইহার ফটো আনিয়াছি।

এই ফার্সীগ্রন্থে তৎকালীন বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারের সহিত মুঘলরাজের সংঘর্ষের এবং আমাদের "বঙ্গাধিপ পরাজয়ের" বিস্তৃত সঠিক ও প্রাচীনতম সমসাময়িক বিবরণ আছে—অবশ্য বিজেতার পক্ষ হইতে লেখা। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে নূতন সংবাদ পাওয়া যায় তাহা নীচে দিতেছি।

[২]

প্রতাপাদিত্যের সহিত বিবাদ।

"এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর নাই। তাঁহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশহাজার পাইক এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে।" (আব্‌দুল লতীফের ভ্রমণ)।

প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী ঐ রাজার কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া [রাজমহলে] নবাব ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল (১৬০৮ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে)। কিছুদিন পরে বালককে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া গেল।

যখন ইস্‌লাম খাঁ নৌযানে চড়িয়া রাজমহল হইতে গোয়াশ্‌ এবং গোয়াশ্‌ হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত শাহপুর থানার সাম্‌নে আত্রেয়ী নদীর পারে পৌঁছিলেন, তখন শেখ বদীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। [এই সাক্ষাতের স্থান বজ্রপুর, নাটোর শহর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে। প্রতাপ ৬টা হাতী, নানা মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৬০৯। (আব্‌দুল লতীফের ভ্রমণ)।

ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবার্ত্তা করিতে থাকিলেন। তাহার পর এই শর্ত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে দেশে ফিরিয়া তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদ্‌শাহী নওয়ারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন, এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটী প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদ্‌শাহী সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষা শেষে স্বয়ং আরও এক শত নৌকা (একুনে পাঁচশত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দলখাঁ নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অতএব ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপের পূর্ব্ব সম্পত্তি বহাল রাখিয়া তাঁহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর ইনাম দান করিলেন। (তখনও জয় করা হয় নাই! প্রতাপ এবং বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার মহা সুযোগ; divide and rule.) সুবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে খেলাৎ, রত্ন-খচিত ছোরা, তিনটা হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদ্‌শাহের পক্ষ হইতে নক্কাড়া উপহার দিলেন।

তাহার পর ভাটীর মুসা খাঁ ও বারো ভুঁইয়ারা বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল; উস্‌মান পরাস্ত হইয়া বকাই-নগর দুর্গ ছাড়িয়া শ্রীহট্টের জঙ্গলে পলাইয়া গেল। ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ ত আগেই মুঘল পক্ষে আসিয়া জুটিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই, এইসব যুদ্ধে সুবেদারকে সাহায্য করেন নাই। [তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে বারো ভুঁইয়া ও উস্‌মানকে জয় করিবার পর মুঘল সৈন্য তাঁহার উপর পড়িবে, সুতরাং উহাদের ধ্বংসে সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা হইবে।] ইস্‌লাম খাঁর এই-সব বিজয়ের পর প্রতাপের চৈতন্য হইল। তিনি পূর্ব্ব অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে ৮০ খানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন। ইস্‌লাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর ইমারৎ (গৃহনির্ম্মাণের অধ্যক্ষ) ঐ ৮০ খানা নৌকায় কাঠ, খড়, ইঁট, পাথর বহিয়া বহিয়া ঐগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলুক। তাহার পর ইনাএৎ* খাঁর অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল, অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক্‌-আন্দাজ, ৩০০ রণপোত এবং অনেকগুলি তোপ দিয়া তাঁহাকে যশোহর প্রদেশ জয়

* বর্ত্তমান যশোহর শহরের ৩ মাইল উত্তরের ইনাএৎ-নগর কি ইঁহার নামে হইয়াছে? (রেনেলের ১ নং ম্যাপ।)

করিতে পাঠাইলেন। মুসা খাঁ ও অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্য সহ বাদ্‌শাহী অভিযানে যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে অপর একদল বাদ্‌শাহী সৈন্য বগুলার জমিদার (কন্দর্পের পুত্র) রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০০ বরকন্দাজ ও ৪০০ নৌকা অনেকগুলি ওম্‌রা সহ উস্‌মান খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য "বার সন্দুর" নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান। ইস্‌লাম খাঁ স্বয়ং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা গেলেন।

[৩]

যশোহর অভিযান।

প্রথমে ইনাএৎ খাঁ কুচ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহার কিছুদিন পরে মির্জা সহন্ তোপ লইয়া পিছু পিছু রওনা হইলেন। মির্জা ভাতুড়িয়া-বাজু পরগনার চীলা-জোরাব নামক স্থানে পৌঁছিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিতে চাহিলেন। উক্ত চোয়ারের জমিদার পীতাম্বর ও অনন্ত বদোহী হইয়া মুঘল শিক্‌দারগণকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। এখন বাদ্‌শাহী সৈন্য নিকটে আসায় তাহারা ভয়ে পলাইয়া আলাইপুরের জমিদার বয়খুর্দারের পুত্র আলাবখ্‌শের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। মির্জা সহন্ তখন সৈন্য লইয়া গিয়া আলাবখ্‌শের দুর্গগুলি দখল করিলেন।

এদিকে ইনাএৎ খাঁ মহদপুর বাঘোয়ান্ * পৌঁছিয়া দেরি করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ তখনও তাঁহার অধীনস্থ কয়েকজন ওম্‌রা আসিয়া যোগদান করেন নাই। তাঁহার প্রেরিত একদল সৈন্য—১৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক—গিয়া বাঘা † গ্রাম লুট করিয়া পুড়াইয়া দিল এবং তথায় দুর্গ নির্মাণ করিয়া থানা স্থাপন করিল। এখানে ৪০০ অশ্বারোহী রহিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি এই স্থান হইতে অনেকগুলি সুন্দরী স্ত্রীলোককে ধরিয়া [illegible] বাঁদীতে পরিণত করিল।

মহদপুর বাঘোয়ানে মির্জা সহন্ তোপ [illegible] আসিয়া ইনাএৎ খাঁর সহিত যোগ দিলেন [illegible] প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দিকে সকলে অগ্রসর হইলেন আর পথে শিকার চলিতে লাগিল। [মুঘলের ভৈরব [illegible] ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া ক্রমাগত দক্ষিণে [illegible] দিকে যাইতে লাগিল।]

মুঘল সৈন্য যশোহর-রাজের সীমানায় পৌঁছিয়া [illegible] যে প্রতাপাদিত্য সালকা * নামক স্থানে তাহার [illegible] উদয়-আদিত্যকে খোজা কমলের অধীনে [illegible] এবং কৎলু খাঁর পুত্র কমাল খাঁর অধীনে [illegible] অশ্বারোহী ও ৪০ টা হাতী দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়া [illegible] এখানে উদয় একটি উঁচু দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার [illegible] দিকে জল দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল;—এক [illegible] অপর পাশে একটি নালা, আর দুই পাশে [illegible] কাটিয়া তাহা ঐ নদী ও খালের সঙ্গে যোগ [illegible] পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রতাপের সৈন্য দুর্গে ও [illegible] নদীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

[৪]

প্রথম যুদ্ধ।

এইরূপ স্থির হইল যে মুঘল সৈন্য নদীর [illegible] কুচ করিয়া শত্রুদুর্গের দিকে অগ্রসর হইবে [illegible] রহিয়া নওয়ারা চলিবে, এবং তীরের বন্দুক ও [illegible] সাহায্য পাইবে। প্রথম দিন এই [illegible] ইনাএৎ খাঁর অধীনে রহিল। দ্বিতীয় [illegible] অধীনে রাতারাতি অপর পাড়ে [illegible] পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের [illegible] নিকটবর্ত্তী পাড় ঘেঁষিয়া—নওয়াবার এক [illegible] চলিতে থাকিবে।

পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। [illegible] করিতে অগ্রসর হইলেন না। মুঘল সেনাপতিরা

---

* বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর শহরের ২ মাইল উত্তরে, ভৈরব নদীর তীরে বাঘোয়ান বলিয়া একটি স্থান আছে। মহদপুর কৃষ্ণনগরের ৬ মাইল উত্তরে Mohatpur, (রেনেল ১ নং ম্যাপ)

† বাঘা একটি হিন্দু সমৃদ্ধ মুসলমান [illegible] ছিল। (১৬২৬ খৃষ্টাব্দের বাদ্‌শাহ নামা)

বাঘোয়ানের ১৭ মাইল পূর্ব্বে সোলোপ নামক [illegible] আছে। যাসী পুঁথী এক স্থানে নামটী "সালকপ" [illegible] পারে কি, বিখ্যাত "শোলা পী[illegible] [illegible] যশোহর জেলার মধ্যভাগে "সালকর" আছে [illegible]

দশখানা নৌকা পাহারার জন্য অগ্রে রাখিয়া, অপর নৌকাগুলির মাল্লাদিগকে হুকুম দিলেন যে তাহারা নামিয়া শত্রুদুর্গের পাশে দুটি দুর্গ নির্ম্মাণ করুক।

এই কাজ অর্দ্ধেক হইয়াছে এমন সময় উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোজা কমল তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বিভাগের সেনাপতি, এবং ঐ খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোসা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব্ (floating battery, gun-boat), মাচোয়া, পশ্‌তা ও জলিয়া (galliot) জাতীয় নৌকা ছিল। অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমাল খাঁ পদাতিক ও হাতী লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে থাকিল। মহাশব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপর মুঘল নৌকা সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত শত্রু-আক্রমণের চাপ ঐ বিশখানি বাদ্‌শাহী নৌকার উপর পড়িল, কিন্তু তাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না।

খোজা কমলের ঘুরাবগুলি এবং ২ খানা "পিয়ারা" [illegible]লিয়া দশখানা বাদ্‌শাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনাএৎ [illegible]র দিকে যে দুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল তাহার পাড়ের নীচে লইয়া গেল। তীরস্থ মুঘল সৈন্য ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া একখানা ঘুরাব্ ও একখানা "পিয়ারা" কাড়িয়া লইল।

যুবরাজের সৈন্য ও মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবগুলি নঙ্গর করিয়াছিল; তাহাদের লইয়া পলাইতে পারিল না। এখন মুঘল তীরান্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল। (অর্থাৎ এই জলযুদ্ধ স্থলসৈন্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হইল।)

নদীর অপর পাশে মির্জা সহনের দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শত্রুরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু তীর হইতে মির্জা, লক্ষ্মী রাজপুত, শাহ বেগ এবং অপর নেতারা নিজ নিজ অনুচর সহ তীর চালাইয়া শত্রু মাল্লাদিগকে বাধা দিতে এবং পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অগ্রসর হইয়া মির্জা সহন এরূপ স্থলে আসিয়া পৌছিলেন যে খোজা কমলের নৌ-বল তাঁহার পিছনে এবং উদয়াদিত্যের নৌ-বল তাঁহার অগ্রে এবং পাশে রহিল; সুতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ারা বিশৃঙ্খল এবং মাল্লাগণ হতভম্ব হইয়া পড়িল।

[অর্থাৎ সালামিসের যুদ্ধে পারসীক নৌ-বলের মত যশোহরের নৌবাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা এবং পরাজয়ের কারণ হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই ছোট নদীর মধ্যে নৌ-কাণ্ডলির লোক তীরবর্ত্তী সবল দ্রুতগামী ও স্থলযুদ্ধে-পরিপক্ক মুঘল সৈন্যের তীর ও বন্দুকের আক্রমণ নানাদিক হইতে পাইয়া একেবারে অসহায় ভাবে হত আহত হইতে লাগিল। তীরভূমি উঁচু, সেখান হইতে দুপাশ দিয়া যে তীর ও গুলি আসিতে লাগিল, তাহা হইতে যশোহরের মাল্লা ও সৈন্যগণের না ছিল রক্ষার স্থান, না ছিল পলাইবার পথ। অর্থাৎ স্থলসৈন্য জলসৈন্যকে পরাজয় করিল। মির্জা সহন তীর বহিয়া দ্রুত অগ্রসর হওয়ায় নদীস্থ যশোহরের নৌকার লম্বা শ্রেণী মাঝে কাটা পড়িল; পশ্চাৎও বন্ধ; শুধু সর্ব্ব সম্মুখের কয়েকখানি নৌকায় পলাইবার পথ খোলা রহিল। অপর সব নৌকা এত ভিড় করিল যে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল, এবং তীর হইতে মুঘল সৈন্যগণ অব্যর্থ সন্ধান করিতে লাগিল।]

যখন উদয়াদিত্যের নৌবাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শত্রুকে আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের গুলিতে খোজা মারা গেল। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস কাহারও রহিল না। জমাল খাঁ তীর হইতে নিকটবর্ত্তী মুঘলদের উপর তীর ও কামান চালাইতে লাগিল বটে, কিন্তু উদয় পলাইল।

[৫]

উদয়াদিত্যের পলায়ন।

শত্রু-নৌবলের পরাজয়ে সমস্ত বাদ্‌শাহী এবং বাধ্য জমিদারদের নওয়ারা যশোহর-নওয়ারা লুট করিতে লাগিয়া গেল, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই; সেনাপতির কথা কেহ শুনে না।

শুধু চারিখানি কোসা ও দুখানি অপর নৌকা উদয়ের পিছনে তাড়া করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন একখানা "পিয়ারা" নৌকা, চারিখানা ঘুরাব এবং ফিরিঙ্গী-পূর্ণ একখানা মাচোয়া,—এই

ছয়খানি নৌকা প্রভুভক্তি দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদ্‌শাহী নৌকার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে কিছু সময় পাওয়া গেল। পরে যখন পাড় দিয়া মির্জা সহন ও অন্যান্য সৈন্য নিকটে আসিয়া পৌঁছিল এবং এই শত্রু-নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, তখন বাদ্‌শাহী পশ্চাদ্ধাবনকারী নৌকার মধ্যে চারিখানি উহাদের সুট করিতে ব্যস্ত হইল। দুইখানি মাত্র কোসা—(মির্জা সহনের নিজস্ব নৌকা, তাহার একখানিতে মহমুদ খাঁ পানী, অপরখানিতে মির মুহম্মদ লোদী মির-বহর নেতা)—মির্জাকে দেখিয়া লজ্জার খাতিরে উদয়ের নৌকার পিছু-পিছু চলিতে লাগিল। নদীকূল দিয়া মির্জা ও তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য উদয়কে ধরিবার আশায় দৌড়াইতে লাগিলেন। শত্রু-নৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে চালাইতে পলাইতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা নদীর এক অতি সংকীর্ণ অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাম্‌নে নৌকার ভিড়ে পথ বন্ধ। মুঘল কোসা দুখানি উদয়াদিত্য যে "মহলগিরি" * শ্রেণীর নৌকায় চড়িয়া ছিলেন তাহার দুপাশে আসিয়া পৌঁছিল। তীরে মির্জা আসিলেই উদয় বন্দী হন আর কি।

এ মহাবিপদে উদয়ের অগ্রবর্ত্তী দ্রুত পলায়মান কোসার মাল্লারা পলায়ন বন্ধ করিয়া দাঁড় ছাড়িয়া বৈঠা হাতে লইয়া কোসাকে দ্রুত বাহাইয়া আনিয়া উহার পশ্চাৎভাগ উদয়ের মহলগিরির সাম্‌নের গলুইএর সঙ্গে ভিড়াইয়া দিল। এ সময় মির্জার কোসা দুটির মাথা উদয়ের মহলগিরির হাল ছুঁইয়াছিল এবং মুঘলেরা ঐ মহলগিরিতে চড়িতে চেষ্টা করিতেছিল এবং উহার মাল্লা ও সৈন্যগণ কেহ তীরে কেহ জলে লাফাইয়া পড়িল। মহা সঙ্কট! এইবার উদয়াদিত্যের রক্ষা নাই।

কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উদয় দুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিরি হইতে নিজ কোসার উপর লাফাইয়া পড়িলেন, আর তৎক্ষণাৎ প্রভুভক্ত কোসার মাল্লাগণ প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া এই নৌকাকে অপর সমস্ত পলাতক নৌকার আগে পৌঁছাইয়া দিয়া বায়ুবেগে চলিতে লাগিল। যুবরাজের সম্পত্তিভরা "মহলগিরি" লুট করিবার লোভ কেহই সম্বরণ করিতে পারিল না; মুঘল কোসা সেখানেই থামিয়া গেল। উদয় বাঁচিলেন।

মির্জা সহন দুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে-চাপড়াইতে ও পাড় বহিয়া আরও কিছু দূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাঁহার কোসা নাই, কোনই ফল হইল না।

যশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪০ খানি নৌকা পলাইয়া গেল, অপর সবগুলি (তোপ সহ) ধরা পড়িল।

উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমাল খাঁ রাজলক্ষ্মী কে লইয়া দুর্গ হইতে পলাইয়া গেল। মির্জা সহন বিজয়ী হইয়া দুর্গে ঢুকিয়া বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন। সেখানেই রাত কাটাইল।

[৬]

মুঘলদের কার্য্যকলাপ।

যুদ্ধের পরদিন ইনায়ৎ খাঁ কুচ করিয়া পৌঁছিয়া থামিলেন। মির্জা সহন রণশ্রমে ক্লান্ত নৌকায় শুইয়া রহিলেন। এই অবসরে তাঁহার সৈন্যগণ নামিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান চারিহাজার কৃষক-স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া করিল।"

মির্জা সেখানে পৌঁছিয়া জানিতে পারিয়া ভাগিনীদিগকে সেনানিবাস হইতে খুঁজিয়া বাহির মুক্তি দিলেন, এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রের সাহায্য নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে সৈয়দ হকিম কন্দর্পপুত্র রামচন্দ্র দেশ বগলা আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার সীমান্ত মুঘলেরা জয় করিয়া যখন দেশমধ্যে প্রবেশ করে

* সে নৌকায় 'মহল অর্থাৎ রাজেরা চড়েন। আরও বড় নৌকা।

* ইহা 'যুচান' হইবে। "এখনও মাতলার মহ পশ্চিমাংশে যমুনা ইছামতী হইতে কপোতাক্ষী পর্য্যন্ত বিস্ত বুচান পরগণা।" (সতীশ মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস ১৩৬ পৃঃ।) এই দুর্গ সাতক্ষীরা মহকুমার দক্ষিণ কদ নদীর তীরে ছিল। রেখেল ১ নং ম্যাপে Bhusna কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের ৩৮ মাইল দূরে স্থিত, হয় দিয়া ইহা মতী প্রবাহিত; নিকটে মোত্তারপুর, ইত্যা এই বুচনা হাসর একই হইবে ইচ্ছামতী তখন চলি হইয়াছে, সুতরাং এরা মুলের পথে কালের কথা (

* ইনি প্রতাপাদিত্যের ভাগিনেয়, সংধাতি (সতীশ মিত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৫২১ পৃঃ।)

রাজমাতা পুত্রকে বলিলেন, "যদি তুই সন্ধি না করিস, আমি বিষ খাইয়া মরিব।" তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর সহিত দেখা করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ এই জয়সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়া গিয়া নজরবন্দ করিয়া রাখিলেন এবং সৈয়দ হকিমকে হুকুম দিলেন যে দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনাএৎ খাঁর সাহায্য করুক। শক্রজিৎ * রামচন্দ্রকে ঢাকা পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া যশোহর অভিযানে যোগ দিলেন।

[৭]

দ্বিতীয় যুদ্ধ।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরাজয়ে এবং দুই দিক হইতে দুই মুঘল সৈন্য কর্ত্তৃক নিজদেশ আক্রমণের সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্য মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার নৌ-বল অর্দ্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। তিনি ঠিক করিলেন যে মুঘল সেনানীকে মিথ্যা সন্ধির কথাবার্ত্তায় ভুলাইয়া কিছু সময় লাভ করিয়া যশোহর হইতে দূরে একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে আশ্রয় লইবেন। যশোহরের নদী হইতে একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া তিনি বুধনে পৌঁছিলেন এবং মির্জা সহনের কাছে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন, "আপনার পিতা (ইহ্‌তমাম্ খাঁ) আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন; আপনি আমার ভাই। অতএব আমার মধ্যস্থ হইয়া আমাকে ইনাএৎ খাঁর নিকট লইয়া যান।" এই সংবাদ পাইয়া ইনাএৎ খাঁ নিজ দূত পাঠাইয়া উত্তর দিলেন যে "যদি তোমার সত্য সত্যই এইরূপ মনের ইচ্ছা, তবে কল্যই আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা কর। নচেৎ পরশু দিন আমি কুচ আরম্ভ করিয়া যশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি হইব। সেখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

পরদিন খাঁর দূত ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে প্রতাপের কথা মিথ্যা ও তাঁহার অভিসন্ধি কপটতা মাত্র। অতএব তৃতীয় দিবসে মুঘল সৈন্য অগ্রসর হইল এবং তাহার তিন দিন পরে খরাওনঘাট পৌঁছিল।

প্রতাপের দুর্গের এক পাশ দিয়া কাগরঘাটা * খাল এবং অপর পাশ দিয়া ভাগীরথী নদী বহিতেছিল। নদীতে তাঁহার অসংখ্য নৌকা; দুর্গমধ্যে হাতী, পদাতিক সৈন্য ও বড় বড় তোপ। এই সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইয়া তিনি শক্রর অপেক্ষা করিতেছিলেন।

ইনাএৎ খাঁ নদীর বাম পাড়ে রহিলেন, আর মির্জা সহন রাত্রে ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপতন অগ্রাহ্য করিয়া নদী পার হইয়া দক্ষিণ কূলে পৌঁছিলেন। পরদিন প্রাতে দুই-দল শক্র দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল, মধ্যে বাদ্‌শাহী নওয়ারা চলিতে লাগিল। ভাগীরথীর যে শাখা যশোহরের পাশ দিয়া যায়, তাহার মোহানায় প্রতাপের নৌ-বল খাড়া ছিল, তাহারা বাদ্‌শাহী নওয়ারা এবং ডাঙ্গার সৈন্যদলের গোলাগুলি সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। বাদ্‌শাহী নওয়ারা মোহানা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আর আগাইতে পারিল না, কারণ দুর্গ হইতে অজস্র অগ্নিবর্ষণ হইতেছিল। বামদিকে, নদী সম্মুখে পড়ায় ইনাএৎ খাঁ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; কিন্তু মির্জা সহন, লক্ষ্মী রাজপুত এবং অন্যান্য সেনানী দক্ষিণ পাড় বহিয়া কাগরঘাটার খালের ধার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে শুধু ৪০ জন অশ্বারোহী এবং দশটি হাতী। দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মির্জা সহন হাতীর উপর লোহার বর্ম্ম আচ্ছাদন-রূপে ফেলিয়া জনকত অতি সাহসী ও ভক্ত অনুচর সহ হাতীকে খালের মধ্যে নামাইয়া দিলেন। দুর্গরক্ষকগণ তাঁহার দিকে কামান ফিরাইল, আর সেই অবসরে, মির্জা সহনের পূর্ব্ব আদেশ মত, বাদ্‌শাহী নওয়ারাও অবাধে বা অল্প বাধায় জোর করিয়া মোহানা পার হইয়া নদীতে ঢুকিল এবং দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শক্রপক্ষ দুদিকে মন দিতে পারিল না। প্রতাপের নওয়ারাও বাদ্‌শাহী নৌকা-

* এই শক্রজিৎ কি যশোহরের শক্রজিৎ নগরের প্রতিষ্ঠাতা? (Westland, map.)

* রেনেলের ১ নং ম্যাপে Cogregot এবং ২০ নং ম্যাপে Cogreeghat; যশোহর জেলার মির্জ্জানগর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে। ইহার নিকটে নদী তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; একটি দিয়া উত্তর-পূর্ব্বে প্রতাপনগর ও গড়কমলপুর যাওয়া যায়, অপরটি দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপের রাজধানী "প্রাচীন দুর্গ" ও ধুমঘাট অতি নিকট। যার, মধ্যে কদমতলীর প্রবাহ।

গুটির কাছে পরাস্ত হইয়া, এবং মির্জা সহনও খাল পার হইয়া শক্ত জমিতে পৌঁছিয়া হাতা ছুটাইয়া দুর্গদ্বারের দিকে গেলেন। বাদ্‌শাহী নৌ-বলের মধ্যভাগও সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। মহাযুদ্ধ চলিল; "তাহাতে স্তূপ গঠিত হইতে লাগিল।"

অবশেষে প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। মির্জা সহন দুর্গ জয় করিয়া নাকাড়া ও ভেরী বাজাইলেন।

[৮]

প্রতাপাদিত্যের শেষ দশা।

যশোহরে পৌঁছিয়া পরাজিত পিতাপুত্র মিলিত হইলেন। ভাগ্যবল বুঝিয়া ওসমান খাঁ প্রতাপকে ছাড়িয়া কাগরঘাটায় মুঘলদলে যোগ দিলেন, এদিকে খুলনা হইতে অপর মুঘল সৈন্যদলও কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রতাপ আত্ম-সমর্পণ করাই স্থির করিলেন, নচেৎ বৃথা সৈন্যবধ হইবে এবং সমস্ত রাজ্য লুট হত্যা এবং অত্যাচারে ছারখার হইবে।

যেদিন বাদ্‌শাহী সৈন্য কাগরঘাটায় প্রথম শিবির করিল, প্রতাপ একা একখানি কোষা চড়িয়া তথায় পৌঁছিলেন, সঙ্গে ৬৮ জন মন্ত্রী। তিনি বিনীতভাবে ইনাএৎ খাঁর তাম্বুর বাহিরে দাড়াইয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। খাঁ তাঁহাকে মান্য করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন।

স্থির হইল যে বাদ্‌শাহী সৈন্য কাগরঘাটায় থাকিবে, এবং ইনাএৎ খাঁ প্রতাপকে ঢাকায় সুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন, তাঁহার যেরূপ আজ্ঞা পরে তাহাই করা যাইবে। চতুর্থ দিবসে ৪০ খানা নৌকা লইয়া ইনাএৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওনা হইলেন। মুঘল সেনাপতিগণ কাগরঘাটায় সুন্দর সুন্দর কাঁচা ঘর ("বাঙ্গলা") নির্ম্মাণ করিয়া কয়েক মাস বাস করিতে লাগিল। এক-একখানার খরচ দেড় হাজার টাকা। বাকুড়া* গ্রামে প্রতাপের ব্রাহ্মণ "ফটকী" (দূত?) এবং মহাগুরুর অতি মনোরম বাঙ্গলা ছিল।

ইসলাম খাঁ প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যশোহর প্রদেশ বাদ্‌শাহী রাজ্যভুক্ত করিয়া ইনাএৎ খাঁ ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা হইলেন, এবং খাজা হাসান দেওয়ান পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা হইল যে কিরূপে কষ্ট না দিয়া যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় হইতে পারে।

[প্রতাপকে কি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল? অসম্ভব নয়, কারণ ঠিক এই সময়ে ঢাকায় দুইজন বন্দী পাঠান জমিদার রক্ষীকে ধুতুরা মিশ্রিত মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া, কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া, নদীতে প্রস্তুত নৌকায় চড়িয়া পলাইয়াছিল। তাহার পর ইসলাম খাঁ নিশ্চয়ই কারাগারের বন্ধন কঠিন করেন।

এইসব ঘটনার বৎসর পরে ইসলাম খাঁর নিকট পরাজিত আফ্‌ঘান (ওসমান্ খাঁ), বঙ্গোপসাগরের মগরাজা হইতে গৃহীত মূল্যবান লুটের সামগ্রী হাতী ও কয়েকজন মগ সঙ্গে লইয়া আগ্রা গিয়া (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) পিতার এইসব বিজয় উপঢৌকন বাদ্‌শাহের সম্মুখে স্থাপন করেন। প্রতাপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না। (ইক্‌বলনামা, ৯৯ পৃঃ)। সুতরাং তিনি রাস্তায় মারা যান, এ প্রবাদ সত্য হইতে পারে। বাঙ্গলায় স্থান ছিল না।]*

[৯]

প্রতাপাদিত্য কি হত্যাকারী?

জেসুইট্ পাদ্‌রীগণের বিবরণ অবলম্বনে ফ্রান্সের ইতিহাসে লেখা আছে যে ফিরিঙ্গী নৌ-সেনাপতি ডোমিঙ্গো কার্ভালোকে চণ্ডিকানের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। বেভারিজ সাহেব তাঁহার "বাখরগঞ্জ" গ্রন্থে বলেন যে এই রাজা প্রতাপাদিত্য। কিন্তু বহারিস্তানের পুঁথীর ১৬৮ খ পৃষ্ঠা স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছে যে এই অপবাদ মিথ্যা। ইহাতে লেখা আছে যে ইস্‌লাম্ খাঁ প্রতাপকে ঢাকার বন্দী করার অনেক পরে কাসিম খাঁর সুবাদারীর প্রায় শেষাংশে মুঘলের বশীভূত গাঙ্গের মগরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভালুয়া হইতে অগ্রসর

* "কালীগঞ্জের নিকট, কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে, বাকড়া নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে শিবলিঙ্গ ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বাঁকড়ার পূর্ব্বপারে ডামরেলীর বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির বর্ত্তমান আছে।" (সতীশ মিত্র, ইতিহাস, ৭০ ও ৭১ পৃঃ।)

মির্জানগরের ৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে, কপোতাক্ষীর পশ্চিমপারে স্থিত বাঁকড়া গ্রাম (Bakarli in Lat.) এখান হইতে

Bahristan, ... 6

হয়, তখন ঐ মগরাজা সমস্ত ফিরিঙ্গীদিগকে বন্দী ও হত করিতে চেষ্টা করেন, এবং কাপ্তান ডোর-ম-শ কার্ভালোর অধীনে ফিরিঙ্গীগণ মগপক্ষ ত্যাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শব্দকে ডো-আমো পড়া যাইতে পারে, ইহা ডোমিঙ্গো (Portuguese, Domingos) শব্দের ফার্সী অপভ্রংশ।

[১০]

উদয়াদিত্যের কথা।

যখন ইনাএৎ খাঁ পরাজিত প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা চলিলেন এবং মুঘল সৈন্য কাগরঘাটায় ছাউনী করিয়া রহিল, সেই সময় উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্য মির্জা সহনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মির্জা সহন তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা মির্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং রত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঁঠালের ডালী দিয়াও পুছ না! আমি কি কেহ নই? তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে।" সেই দিনই দুপুর রাতে মির্জা সহন নিজসৈন্য লইয়া বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রামগুলিতে এরূপ লুট ও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই। (বহারিস্তান, ৫৭ ক।)

সম্ভবতঃ, এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে উদয়াদিত্য নিজের ও প্রজাদিগের প্রাণ ও মান বাঁচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিতেছেন, "তৃতীয় দিবসে ইনাএৎ কুচ আরম্ভ করেন। পথে তাঁহাকে কুশলীক্ষেত্রের মধ্যে দিয়া যাইতে হয়। [প্রতাপের রাজধানী-দুর্গ হইতে ৮।১০ মাইল উত্তরে এবং যমুনা নদীর পূর্ব্ব দিকে কুশলীক্ষেত্র।] এ দেশে প্রবাদ আছে যে এই কুশলীক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যের সহিত প্রতাপ-পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের কয়েকদিবসব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে উদয়াদিত্য কুশলীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রাজবংশীয় কেহ কেহ উক্ত কুশলীক্ষেত্রে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক আছেন।"

এই প্রবন্ধে "যশোহর খুলনার ইতিহাস"-রচয়িতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত টীকা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন :—

(১) রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১ খৃঃ প্রকাশিত) অনেক স্থলে বহারিস্তানের বৃত্তান্তের অনুগামী ; যথা,

কতক কাল পরে [মান] সিংহ রাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে...আপনে ওজির এছলাম খাঁ চিশ্‌তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গলায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্থানের তিন হিস্‌সা ফৌজ সাতে লইয়া থানা বথানা মারিপিট করিয়া সর-বসর আসিয়া সালিখার থানায় পৌছিলে রাজার (অর্থাৎ প্রতাপের) প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা ব্যাস্ত ছিলেন।"* * *

"এককালিন সসৈন্য যাইয়া ওজির (অর্থাৎ ইস্‌লাম খাঁর) সহিত দেখা করিলে ওজির তাহাকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি তোমার কর্ত্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?' রাজা কহিলেন, 'না আমারা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব।' এই মত তাহাকে পিঞ্জিরায় কয়েদ করিয়া" ইত্যাদি।

(২) ইনাএৎপুর—বর্ত্তমান যশোহর শহর হইতে ৫।৬ মাইল দূরে এই নামের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। উহা নদীর নিকট নহে এবং তথায় মুঘল সৈন্যের যাইবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। সুতরাং উহা সেনাপতি ইনাএৎ খাঁর নামানুসারে হইতে পারে না। কাকশিয়ালী খালের দক্ষিণে এবং প্রতাপের দুর্গের ৯ মাইল উত্তরে অপর এক ইনাএৎপুর আছে।

(৩) পীতাম্বর—পুঁটিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ভাতুড়িয়ার অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত ছিল।

(৪) বাঘাগ্রাম—এই বাঘাগ্রাম বাঘোয়ানের সন্নিকটে নহে। হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর অপর পারে যমুনার মোহানায় একটি দ্বীপ ছিল, উহা এক্ষণে একটি গ্রাম হইয়াছে, এই গ্রামকে বাঘার গ্রাম বা বাঘের গ্রাম বলে। "নদীয়া-কাহিনী" ৩৫১ পৃঃ দেখুন। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানই যশোহরের সীমান্ত, এবং প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গঙ্গা হইতে তাহার পথও এই বাঘার পার্শ্ব দিয়া। সুতরাং ইনাএৎ খাঁর সৈন্যদল যে এইরূপ স্থলে পথের মুখে থানা স্থাপন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

[কিন্তু আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনীতে যে বাঘার বর্ণনা আছে তাহা এই হুগলী জেলার কাঁচড়াপাড়ায় নিকটবর্ত্তী বাঘের গ্রাম হইতে পারে না।—যদুনাথ সরকার।]

(৫) সালকা—সালকার স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন। প্রতাপাদিত্যের অধস্তন রাজবংশীয়দিগের বংশগত প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালখিয়া নামক স্থানে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে সালখিয়া আছে, সেখানেই প্রতাপের দুর্গ ছিল। অর্থাৎ শত্রু যমুনার মোহানা হইতে দক্ষিণ দিকে আসিলে, প্রথমে জগদ্দল দুর্গে, পরে সালখিয়া দুর্গে তাহাদিগকে বাধা দিত। প্রাচীন ম্যাপে সালখিয়া (Salica বা Salkhia) খুব বড় করিয়া লেখা আছে। কিন্তু মোগল সৈন্য উক্ত সালখিয়ার দিকে গিয়াছিল কি না সন্দেহ হয়।

ইচ্ছামতী-কালিন্দীর মোহানায় দমদমার নিকট শালিখা দুর্গ ছিল, ইহাই আমার নিকট বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধের বর্ণনা হইতেও তাহাই অনুমিত হয়।

(৬) ধরাওন ঘাট—যশোহর দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইচ্ছামতীর

কূলে কোন তাৎকালিক ঘাটের নাম "খয়াওন ঘাট" হইতে পারে; এখন তাহার কোন চিহ্ন বা সে নামে কোন গ্রাম নাই।

(৭) কাগর ঘাটা—পুরাতন যশোহর নগরীর পূর্ব্বদিকে ইছামতী নদীর পরপারে খাগড়াঘাট বলিয়া একটি স্থান আছে। সম্ভবতঃ ঐখানে আসিয়া মোগল সৈন্য নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। এই খাগড়াঘাটকেই রেনেল সাহেব Cogregot করিয়াছেন। পুরাতন যশোহর দুর্গের পশ্চিমদিকে যমুনাকূলে কুকড়া-ঘাটা আছে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এটি যুদ্ধের স্থান নহে।

(৮) ভাগীরথী—এখানে যশোহর দুর্গের পশ্চিমবাহিনী যমুনা নদীকেই ভাগীরথী বলা হইয়াছে, কারণ উহা ভাগীরথীরই একাংশ। যশোহরের সন্নিকটে যমুনাও তীর্থনদীর মত ব্যবহৃত হয়।

(৯) বাহুড়া বা বাঁকড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। উহা অনেক দূরে অর্থাৎ কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার উত্তরে বাঙ্গাল-পাড়া নামক একটি স্থান আছে, সেখানে অনেক বাঙ্গলা গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হয়তঃ মোগল সৈন্য সেইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বহুদিন বাস করিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য কটক হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনিয়া যমুনাকূলে গোপালপুরের মন্দিরে স্থাপিত করেন। ঐ বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি কটকী ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। তাঁহারা দুধলীর উত্তরাংশে রায়পুরে বাস করিতেছেন। উঁহাদের নিকট চাঁদরায়ের প্রদত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দের একটি সনন্দ আছে।

যদুনাথ সরকার।

মূকের ভাষা

কণ্ঠ তারে পায় না নাগাল,
　　বাজ্‌ল না সে বীণার তারে,
শব্দ-সাগর স্তম্ভিত তার
　　স্তব্ধতারি তোরণ-দ্বারে।
তর্জ্জনী তার ওষ্ঠ-পুটে,
তার কাননে পুষ্প ফুটে—
গায় না পাখী; ভাব-পরিমল
　　ছড়ায় শুধু বারে বারে!

কণ্ঠ তারে পায় না নাগাল,
　　বাজ্‌ল না সে বীণার তারে,
মৌনময়ী মূকের ভাষা—
　　অর্ঘ্য আমি কী দিই তারে?
নিমেষ-হারা আকাশ হ'তে
নাম্‌চে নীহার নীরব স্রোতে,
নয়ন-দানী দিলাম ভ'রে
　　অশ্রু-গাঁথা দৃষ্টি-হারে।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

শিব-ঠাকুরের ঠিকুজি

(পূর্ব্ব বারের অনুবৃত্তি)

শিবের চতুর্বক্ত্র হওয়ার কারণ তিলোত্তমার রূপদর্শন লালসা ও পঞ্চবক্ত্র হওয়ার কারণ ব্রহ্মার মুণ্ড ছেদন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীর রূপদর্শনলালসাতে চতুর্ম্মুখ হন ও পাপবাসনায় তাঁর সমস্ত তপঃপুণ্য নষ্ট হইয়া পঞ্চম মুখ সৃষ্টি করে; ব্রহ্মা সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য পঞ্চম মুখকে জটাজালে আবৃত করেন; শিব ব্রহ্মার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ড ছিন্ন করিয়া নিজে লন। (মৎস্যপুরাণ ৩য় অধ্যায়)। ব্রহ্মা ও অগ্নি একই দেবতা; অগ্নি শিখাধূমজটিল, সেইজন্য জটাধারী। রুদ্রও অগ্নি; সুতরাং ব্রহ্মার জটা ও পাওয়া স্বাভাবিক। যদিও এই মুণ্ডছেদনের গল্পের দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

শিব ত্রিনেত্র হইয়াছিলেন উমা তাঁর দুই চক্ষু আবৃত করিলে। ইহা দেবতাকে ত্রিকালদর্শী বুঝাইবার রূপক।

শিবের ললাটে তৃতীয় নয়নের উপর শশিকলা স্থাপিত যে মুঞ্জবান পর্ব্বতে রুদ্রের বাস ছিল, সেই পর্ব্বতেই সোমলতার জন্মভূমি। সোম মানে পরে যখন চন্দ্র হইল, তখন চন্দ্র হইয়াছিল মহাদেবের চিহ্ন। এর পৌরাণিক ইতিহাস এই যে, শিব সতীবিরহে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁর তপের তেজে বিশ্ব দগ্ধ হইবার উপক্রম হয়; তখন দেবতারা শীতাংশু চন্দ্রকে শিবের ললাটে স্থাপন করিয়া তাঁর তপের তেজ শীতল করেন। এই শশিভূষণের মতো প্রাচীন ঈজিপ্ট ব্যাবিলন সীরিয়া প্রভৃতি দেশের সূর্য্য উপাসনা ও চন্দ্র উপাসনা সম্মিলনের চেষ্টা দেখা যায়। ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা, চন্দ্রদেবা-পূজকদের দেশ ব্যাবিলন হইতে এদেশে আসিয়া রুদ্র হইয়াছেন; তাই শিব সূর্য্যপ্রভ রজতশুভ্র কর্পূরবর্ণ, এবং তাঁর ললাটে চন্দ্র। বেদের মরুৎগণ সূর্য্যত্বচঃ এবং তাদের রথধ্বজ ছিল চন্দ্র আচন্দ্রেণ রথেন। শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে এক মূর্ত্তি সূর্য্য ও অপর মূর্ত্তি চন্দ্র। শাকদ্বীপী বা সিথীয় মগব্রাহ্মণরা যখন এ দেশে আসে তখন তারা সূর্য্যপূজা লইয়া আসে। তারা সূর্য্যকেই শিব বলিত; সারদাতিলকতন্ত্রে শিবের

একটি ধ্যানে তাঁকে 'বন্ধুকাভং' বলা হইয়াছে; সে বর্ণ সূর্য্যের এবং শিবই সূর্য্য। মেগাস্থিনিস (৩০২ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) লিখিয়া গিয়াছেন যে, বৈদিক রুদ্র শাকদ্বীপী মগদের সূর্য্য-দেবতা শিবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন। এরিয়ান বলেন —গ্রীক দেবতা ব্যাকাস ভারতে আসিয়া শিবস্বরূপে নিমজ্জিত হন; ব্যাকাসের এক নাম ত্রিয়ম্বস, তাহা সংস্কৃত ছাঁচে পড়িয়া হইয়াছে ত্র্যম্বক।

বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্করদের সঙ্গে শিবও ক্রমশঃ একই ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানী বুদ্ধ, অশোক-তরুমূলে জৈন তীর্থঙ্কর, বিল্বমূলে যোগী শিবে পরিণত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপুরুষলক্ষণ বলিয়া কতকগুলি দৈহিক বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—যেমন আজানুলম্বিত বাহু, উষ্ণীষাকার মস্তক, যুগ্ম ভ্রূ ইত্যাদি। বুদ্ধদেব মহাপুরুষ নিঃসন্দেহ; সুতরাং তাঁর মস্তক উষ্ণীষাকার ও ভ্রূ যুগ্ম হওয়া উচিত মনে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি সেইরূপ করিয়াই রচিত হইতে থাকে। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইলেও তাঁর মূর্ত্তি মুণ্ডিতকেশ করিয়া গঠিত হইত না; তাঁর সকল মূর্ত্তির মস্তকের মধ্যস্থল উষ্ণীষাকৃতি উচ্চ, মাথায় দক্ষিণাবর্ত্তে কুঞ্চিত অলিকেশ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিরোধের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যখন চেষ্টা করিতেছিল, তখন বুদ্ধদেবের সমস্ত গুণ মহাদেবে আরোপ করা ত হইলই, শিবমূর্ত্তিও বুদ্ধমূর্ত্তির নকল হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের কুঞ্চিত অলিকেশে আবৃত উচ্চ ব্রহ্মতালু ক্রমে শিবের মাথার জটার চূড়া হইল অতি সহজেই। যুগ্ম ভ্রূর মধ্যস্থলে যে রোমাবর্ত্ত হয়, তার পারিভাষিক নাম ঊর্ণা। এই ঊর্ণা বৃত্তমূর্ত্তিতে ক্রমে ভ্রূ ছাড়াইয়া কপালের মধ্যস্থলে ঈষৎ উন্নত টিপের আকার ধারণ করে; বুদ্ধদেব যখন মহাদেব হইলেন, তখন সেই ঊর্ণা হইল তৃতীয় নেত্র বা শশিনেত্র। বুদ্ধমূর্ত্তি যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি জগন্নাথ হইয়া গেল, তখন ত আর তাকে ত্রিলোচন বা চন্দ্রশেখর করা চলিল না; তখন উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে পুরীর জগন্নাথমূর্ত্তির কপালের ঊর্ণা ঢাকা দেওয়া হইল। হুয়েন স্যাং এদেশে আসিয়া (৬ষ্ঠ শতাব্দী) লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অবলোকিতেশ্বর ও শিব অভিন্ন দেবতা। অবলোকিতেশ্বরের মাথায় অমিতাভ বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তারই অনুকরণে শিবের মাথায় গঙ্গা প্রতিষ্ঠিত হন। বজ্রপাণি বুদ্ধকে পিনাকপাণি শিব করা হয়। লোকেশ্বর বুদ্ধের ধ্যান শিবের ধ্যানের মতনই—

চতুর্ভুজস্ ত্রিনেত্রশ্ চ চন্দ্রাঙ্কিত-জটাধরঃ।
সর্পাভরণসংযুক্তঃ শ্বেতবর্ণঃ লোকেশ্বরঃ॥

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ ও মহাদেবের প্রলয়সমাধির মধ্যে ভাবগত সমতা আছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের অনুকরণে বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ রচিত হয়। বৌদ্ধ পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে, শকদিকের আক্রমণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধদেব মহাদেবকে নিযুক্ত করেন; শিব বৌদ্ধধর্ম্মকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে চামুণ্ডাকে ভার দেওয়া হয়। এই আখ্যায়িকায় এই বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং শকেরা শৈব ছিল। চীন পরিব্রাজকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে কপিলবাস্তুর শাক্যেরা শৈব ছিল। শাকদ্বীপী মগী ব্রাহ্মণেরাও শৈব ছিল। এইরূপে ক্রমে বুদ্ধদেব শিব-স্বরূপে এমন বেমালুম নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন যে ভক্তদের চিনিতে ধোকা লাগিত—সে দেবতাকে বুদ্ধদেবই বলা যাইবে, না মহাদেবই বলা যাইবে। ভক্তিশতকে আছে—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং, যস্যানবদ্যং বচো,
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব, ন পুনর্ দ্বেষো, ন মোহস্ তথা।
যস্যাহেতুর্ অমন্তনিত্যসুখদানজ্ঞা কৃপামাধুরী,
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্ তস্মৈ নমস্ কুর্ম্মহে॥

মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। এর উপাখ্যানের মূল সূত্র এই যে শিব যজ্ঞভাগ পান নাই। তা ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন আখ্যায়িকা আছে। রামায়ণে হরধনুর পরিচয়-প্রসঙ্গে জানা যায় যে শিব যজ্ঞভাগ না পাওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের অঙ্গশাতন করেন; পরে স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ছিন্ন অঙ্গ জোড়া লাগাইয়া দেন। মহাভারতে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের জন্য শিব মুখ হইতে এক ভীষণ প্রহর্ষণ সৃষ্টি করিয়া তাকে দক্ষযজ্ঞ বধ করিতে আজ্ঞা দেন; সেই অস্ত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ বধ করিল—ছিত্বা শিরো বৈ যজ্ঞস্য। তখন ব্রহ্মা ও দক্ষ করজোড়ে সেই অস্ত্র ও মহেশ্বরের স্তব ও প্রণাম করিলে প্রীত মহেশ্বর দক্ষকে যজ্ঞসাফল্যের বর দিয়া প্রস্থান করেন। বরাহ ও কূর্ম্মপুরাণের দক্ষ পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের পিতা (কূর্ম্মপুরাণ, ১৫ অধ্যায়); দক্ষ শিবকে ত্যাগ করিয়া

যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পার্ব্বতী শিবকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন; শিব তাঁর গণপতি বীরভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস করিতে পাঠাইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধে; দক্ষের পক্ষে বিষ্ণুও যুদ্ধ করেন; শেষে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দেন এবং শিবপার্ব্বতী দক্ষকে ক্ষমা করেন। এইসব গ্রন্থে দক্ষের ছাগমুণ্ড বা সতীর দেহত্যাগের কাহিনী নাই। বরাহ পুরাণে (২১ অধ্যায়) দেখা যায় দক্ষ শিবের ক্ষমা পাইয়া তাঁকে গৌরী নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করেন।

সতীর দেহত্যাগের কাহিনী আসিয়াছে ঈজিপ্টের ইসিস ও অসিরিসের কাহিনী হইতে। ঈজিপ্টের লোকেরা ছিল মাতৃতন্ত্র; সেইজন্য সেখানে দেব অপেক্ষা দেবীর প্রাধান্য ছিল। অসিরিস মরিয়া গেলে ইসিস শোকবিহ্বলা হন ও পরে মন্ত্রতন্ত্র ও তপস্যার দ্বারা নিজের প্রিয় সহচরকে পুনর্জীবিত করেন। ঈজিপ্টের লোকেরা ছিল শিশ্নদেবাঃ। অসিরিস মরিয়া গেলে ইসিস মীনধ্বজ হইয়াছিলেন। এই কাহিনী পিতৃতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষে আসিয়া উল্টিয়া গেল; এখানে মরিলেন স্ত্রী, শোকার্ত্ত হইলেন স্বামী, এবং স্ত্রীকে পাইবার জন্য শিব তপস্যা করিয়া মীনধ্বজকে ধ্বংস করিলেন। কিন্তু লিঙ্গ হইয়া রহিল শিবেরই স্বরূপ। ইসিস-অসিরিসের পূজা অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ; শিবশক্তি পূজাও তদ্রূপ। ইসিস অসিরিসের লিঙ্গ ছেদন করিয়া লইয়াছিলেন; অসিরিস পুনর্জীবিত হইলে নপুংসক হইয়া ছিলেন; এইজন্য পরবর্ত্তীকালে দেবীপূজক পুরোহিতদিগকেও নপুংসক করা হইত। এর দ্বারা এই বোঝানো হইত যে দেব-দেবী স্বামী-স্ত্রী হইলেও তাঁদের সম্পর্ক কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক। আমাদের দেশেও সেইজন্য শিব কামারি ও ঊর্দ্ধলিঙ্গ। যিশুমাতা মেরীও গর্ভবতী হন God the Holy Ghostএর আধ্যাত্মিক মিলনে—Immaculate conception। ইসিস ও ইশ্‌তর নীলবর্ণা; আমাদের কালীও নীলবর্ণা। ঈজিপ্টে অসিরিস বৃষমূর্ত্তি, বেদে রুদ্র বৃষমূর্ত্তি, পরে শিব বৃষবাহন। ব্যাকাস-পূজার অঙ্গ ছিল লিঙ্গ; শিবপূজা ক্রমে লিঙ্গ-পূজাতেই পর্য্যবসিত হয়। ঈজিপ্টে মৃতদেহ মমি করার প্রথা হইতে তাদের দেশে ভূতের ভয় প্রবল হয়; শিব ভূতনাথ ও শ্মশানচারী বলিয়া আমাদের দেশেও পরিচিত।

মহাভারতে শিব পার্ব্বতীকে নিজের শ্মশানপ্রিয়তার কারণ বলিয়াছেন—

তত্র চৈব রমন্তীমে ভূতসঙ্ঘা শুচিস্মিতে।
ন চ ভূতগণৈর্ দেবী বিনাহং বস্তুম্ উৎসহে॥
—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪১ অধ্যায়

শ্মশানে ভূতেরা বিচরণ করে, আমি ভূতদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তাই শ্মশান আমার প্রিয়।

শিব কালান্তক সংহারকর্ত্তা, সেইজন্য তিনি শ্মশানবাসী এজন্য চিতাভস্ম তাঁর ভূষণ (শিবপুরাণ, ৩৫ অধ্যায়) মহাদেব মদনভস্ম করিয়া সেই ভস্ম অঙ্গে লেপন করেন—

কামদেবস্য ভস্মানি লিলেপাঙ্গে মহেশ্বরঃ।—
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২৩।৪৫।
মহাদেবোঽপি তদ্‌ভস্ম মনোভব-শরীরজম্।
আদায় সর্ব্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ।
—কালিকাপুরাণ, ৪২।১০৮।

সতী যোগের অগ্নিতে দেহ ভস্মসাৎ করিলে শিব সেই ভস্ম ও তাঁর ভস্ম ও অস্থি ধারণ করিয়াছিলেন।—

বিভূতিগাত্রঃ স বিভুঃ সতীসৎকারভস্মনা।
ধত্তে তস্যা অস্থিমালাং প্রেমভারেণ ভস্ম চ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৩ অধ্যায়

এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করিয়া শরীর হইতে শাকরস নির্গত করিবার শক্তি লাভ করেন ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। শিব তাঁর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য স্বীয় অঙ্গুলি ক্ষত করিয়া দেখান রক্তের পরিবর্ত্তে তাঁর দেহ হইতে ভস্ম নির্গত হইতেছে। তদবধি বিভূতি শিবের ভূষণ। শিবপুরাণ।

লিঙ্গপুরাণ (১৭ অধ্যায়) শিবকে বলিতেছেন—তুমি রুদ্ররূপী অগ্নি; এবং সেইজন্য তোমার দেহ ভস্মলিপ্ত। বেদের রুদ্ররূপী অগ্নি যে শিব হইয়াছেন তার চিহ্ন আছে তাঁর ভস্মলেপনে ও নীললোহিত নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নামে।

নীলকণ্ঠ রজতগিরিনিভ শিব আবার খানিকটা ভূত-ধবল হিমালয়ের দেবত্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন; হিমালয় পর্ব্বতের শুভ্র বিরাট দেহের কণ্ঠসানুতে নীলমেঘ সঞ্চার করে, তাহা হইতে ত্রিশূলের ন্যায় বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়—দেখিয়া কবিকল্পনায় নীলকণ্ঠ শূলপাণি শিব আবির্ভূত হইয়াছিলেন; শিবের বাসভূমি হিমালয়, শ্বশুরালয় [illegible]

স্বয়ং শ্বশুর হিমালয়, গৃহিণী পার্ব্বতী, পুত্র গুহ, তাঁর জটাজালে গঙ্গা—এ একেবারে হিমালয়ের রূপক বলিয়াই অনুমান হয়।

গঙ্গা ও উমা দুজনেই হিমালয়-দুহিতা। দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে গঙ্গা ও উমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব উভয়কেই বিবাহ করিয়া গঙ্গাকে মস্তকে ও পার্ব্বতীকে বামাঙ্গে ধারণ করেন (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। এই আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কেউ বলেন ভগীরথের স্তবে এবং কেউ বলেন স্বয়ং শিবেরই হরিগুণগানে দ্রব বিষ্ণুর পদসম্ভূতা গঙ্গা বিগলিত হইয়া পড়িলে বিষ্ণুভক্ত শিব সেই বিষ্ণুচরণামৃত বিষ্ণুপাদোদক মস্তকে ধারণ করেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)। ইহার মধ্যেও একটু প্রাকৃতিক রূপক আছে; বেদে দেখা যায় বিষ্ণু মানে সূর্য্য—বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, তিনি ত্রিপাদক্ষেপে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ত্রিলোককে অতিক্রম করেন; সেই বিষ্ণু বা সূর্য্য দ্বারা হিমালয়ের তুষার বিগলিত হওয়াতে গঙ্গার উৎপত্তি ও হিমালয় হইতে গঙ্গার অবতরণ।

গঙ্গাকে মস্তকে ও পার্ব্বতীকে বামাঙ্গে ধারণের মধ্যেও প্রাকৃতিক রূপকের আভাস পাওয়া যায়। পার্ব্বতী আগে কালী ছিলেন, পরে গৌরী হন; হিমালয়ের অঙ্গে কালো মেঘ সংলগ্ন হইয়া শুভ্র তুষারে পরিণত হওয়ার ছবি হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

লিঙ্গপুরাণ ও কালিকাপুরাণে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধারণের যে আখ্যায়িকা আছে তাহা স্ত্রীপুরুষের আসক্তির রূপক মাত্র। কালিকাপুরাণে অপর একটি উপাখ্যান আছে।—একদিন সুন্দরী অপ্সরারা শিবপার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কৈলাসে আসে; সেইসব সুরসুন্দরীদের সম্মুখে শিব ভিন্নাঞ্জনশ্যামলা পত্নীকে বারম্বার কালী কালী বলিয়া সম্বোধন করাতে কালী অপমান বোধ করিয়া কুপিতা হন। কালী মনের খেদে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ও ব্রহ্মার বরে গৌরী হইলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পার্ব্বতী স্ফটিক-গৌর শিবের বিশাল মুকুরবৎ বক্ষে নিজের গৌরীমূর্ত্তির ছায়া দেখিয়া নিজেকে চিনিতে পারেন নাই, মনে করেন; পর নারী শিবের হৃদয়ে রহিয়াছে; এতে গৌরী ক্রুদ্ধা হইয়া খণ্ডিতা হন। খণ্ডিতা গৌরীকে সতত স্বামী-পাশে রাখিবার সুযোগ দিবার জন্য শিব দেহার্দ্ধভাগ ছাড়িয়া দিয়া শান্ত করেন।

পার্ব্বতীর এই কালী রূপ হইতে গৌরী হওয়ার উপাখ্যানের মধ্যে অন্-আর্য্য কৃষ্ণকায় লোকের কৃষ্ণকায় দেবতার গৌর আর্য্যজাতির গৌরবর্ণ দেবতায় পরিবর্ত্তিত হওয়ার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। কালী যখন প্রথম আবির্ভূত হন তখন তিনি ছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী—অনার্য্য দেশের দেবতা; পরে তাঁকে হিমালয়-দুহিতা দক্ষ-দুহিতা করা হয়।

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—সৃষ্টিকর্ম্মের জন্য তপস্যারত ব্রহ্মার মুখ হইতে রুদ্র একেবারে অর্দ্ধনারীশ্বর (Hermaphrodite) মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন এবং পরে বিভক্ত হইয়া শিব ও শক্তি রূপ ধারণ করেন। এই আখ্যায়িকার মধ্যে ভারতবহির্ভাগের আদি দেব-কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। ঈজিপ্ট ব্যাবিলন সীরিয়া তিব্বত প্রভৃতি মাতৃতন্ত্রের দেশের পুরাণ বলে—আদিতে এক দেবী ছিলেন; তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাতে আপনি পুত্র উৎপাদন করেন এবং সেই পুত্র তাঁর সহচর পতি হয়। মাতৃতন্ত্রের আখ্যায়িকা পুরুষতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া শিবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

এইরূপ যুক্ত-রূপ কল্পনার কারণ পরবর্ত্তী কালে দার্শনিক তত্ত্বে ব্যাখ্যা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির অভেদত্ব-প্রতিপাদক বলা হইয়াছে। এর মধ্যে বিভিন্ন বিবদমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আপোষ রফার চেষ্টারও ইতিহাস পাওয়া যায়। (শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের আপোষের ফল হরগৌরী মূর্ত্তি; শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মিলনের ফল হরিহর মূর্ত্তি (বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ); এবং বৈষ্ণব ও শাক্তের মত-সমন্বয়ের ফল কৃষ্ণকালী রূপের পরিকল্পনা (রাধাতন্ত্র)। প্রাচীন ঈজিপ্ট ব্যাবিলন সীরিয়া প্রভৃতি দেশে মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র সমাজ-ব্যবস্থা পাশাপাশি দেখা যাইত; মাতৃতন্ত্রের লোকেরা ছিল চন্দ্র উপাসক; এবং পিতৃতন্ত্রের লোকেরা ছিল সূর্য্য উপাসক। এই দুই সমাজের মিলনে যখন উভয়ের উপাসনা-পদ্ধতিও সম্মিলিত হয়, তখন মাতাপিতার একত্র মিলন কল্পনার ফল এইরূপ যুক্ত বা যুগনদ্ধ মূর্ত্তি; সূর্য্যস্বরূপ শিবের ললাটে চন্দ্র স্থাপন, শকদের ভারতে আসিয়া সূর্য্যবংশীয়

ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হওয়া প্রভৃতির মধ্যেও এই সূর্য্যচন্দ্র উপাসনার আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিরোধিতার সময় মহাদেবকেই যখন বুদ্ধদেবের সকল গুণে ভূষিত করা হইতে লাগিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের উপর শৈবধর্ম্মের বিজয়ধ্বজা তুলিয়া মহাদেবকে বৃষধ্বজ করা হয়। এই বৃষ আসলে হইতেছে ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বৌদ্ধদের আদিদেব, ত্রিরত্নের মধ্যমণি। আমরা দেখিয়াছি ঋগ্বেদে স্বয়ং রুদ্রকেই বৃষভ বলা হইয়াছে; গৃহ্যসূত্রে রুদ্রতোষণের জন্য শূলগব যজ্ঞ করা হইত; তখনো বৃষ মহাদেবের বাহন হয় নাই। বৃষবাহন মহাদেবের সাক্ষাৎ পাই প্রথম মহাভারতে। ব্রহ্মা দেবধেনু সুরভী সৃজন করেন; সুরভীর বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফুৎকার দেওয়াতে তার মুখোৎসৃষ্ট ফেন গিয়া শিবের গায়ে লাগে; শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গাভীদের দগ্ধ করিতে উদ্যত হন; কিন্তু আশুতোষ শিব ব্রহ্মার বিনয়ে নিবৃত্ত হন। শিবরোষের একটু যে আঁচ গাভীর গায়ে লাগে, তাতেই তার শুভ্র বর্ণ কর্ব্বুর হইয়া যায় এবং সেই অবধি গাভীগণ নানা বর্ণের হয়। তখন ব্রহ্মা শিবকে তুষ্ট করিবার জন্য সুরভীর বৎস বৃষকে শিবের বাহন করিয়া দেন—

বৃষকৈনং প্রযচ্ছার্থং মে দদৌ বাহনমেব চ।
—মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪১ অধ্যায়।

এখন পর্য্যন্ত এ বৃষ সামান্য বৃষ মাত্র। তার পর পুরাণে দেখি ধর্ম্ম বৃষরূপী, শিবের বাহন।—

ধর্ম্মস্ ত্বং বৃষরূপেণ জগদ্ধানন্দকারকঃ।
অষ্টমূর্ত্তেব্ অধিষ্ঠানম্, অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপেণ নন্দী নাম গণাধিপঃ।
—মৎস্যপুরাণ, ৯৫ অধ্যায়।

নন্দীর বৃষরূপ ধারণ সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে। দক্ষ শিববিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁর কন্যা দুর্গা শিবের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁর অনুরাগিণী হন। শিব ইহা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধের ছদ্মবেশে দুর্গার অন্তঃপুরে অভিসারে আসেন। নন্দী ছিলেন দক্ষালয়ের প্রহরী; তিনি মহাদেবকে চিনিতে পারেন, এবং নিজে বৃষ রূপ ধারণ করিয়া শিব-দুর্গার পলায়নের বাহন হন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেই আবার আর-একটি উপাখ্যান আছে—মহাদেব বৃদ্ধবেশে দুর্গার অন্তঃপুরে অভিসারে আসিলে দুর্গার এক সখী নীলকুন্তলা ছদ্মবেশী শিবকে চিনিতে পারেন। তাঁর কথায় অপ্রত্যয় করিয়া অপর সখী রত্নমুখী ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—

বৃষবুদ্ধে মহামূর্খে বদ মা নীলকুন্তলে।
বৃষত্বং যাহি, যেনায়ং বৃষারূঢ়ো ব্রজেৎ পথি॥

'ওগো বৃষবুদ্ধি নীলকুন্তলা, তুমি বৃষ হও, বুড়োটা তাহা হইলে ষাঁড়ে চড়িয়া পথে পথে বেড়াইতে পারিবে।' এই কথার উত্তরে নীলকুন্তলা বলেন—

এষ অমন্ত পরং ভাগ্যং শিব-বাহনতাম্ অগাম্
শিবং শিবাঞ্চ সততং দ্রক্ষ্যামোব যথেচ্ছয়া॥
ইত্যুক্ত্বা সা বৃষো ভূত্বা, তাং সমারুরুহে শিবঃ।—
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪,২৫—২৭।

'আমার তেমনি সৌভাগ্য হোক যে আমি শিবের বাহন হইয়া সতত শিব ও শিবাকে দেখিতে পাই।—এই বলিতেই নীলকুন্তলা বৃষ হইলেন ও শিব তার উপর চড়িয়া বসিলেন।'

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেই আবার এই শিববাহন বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে শৈবসময় নামে এক পুরাণ আছে। তাহাতে আছে যে ধর্ম্ম আসিয়া বৃষরূপে শিবের বাহন হন।—এই সময় লিঙ্গরূপী শিব সপ্তর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে অরুন্ধতী ছাড়া আর ছয় ঋষিপত্নীদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে (তুলনীয় মহাভারতে অগ্নির উপাখ্যান ও লিঙ্গপুরাণে শিবোপাখ্যান)। তাহা দেখিয়া ঋষিরা শিবকে বিনাশ করিবার জন্য এক বাঘ লেলাইয়া দেন; শিব বাঘকে মারিয়া তার চর্ম্ম ছাড়াইয়া পরিধান করেন। ঋষিরা এক মন্ত্রপূত শূল চালনা করিলে শিব তাহা নিজে আয়ুধ করিয়া শূলপাণি হইলেন। ঋষিদিগের দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহা দেখিয়া ভীত ধর্ম্ম বৃষরূপ ধরিয়া শিবের কাছে তাঁর বাহন হইতে প্রার্থনা করিলেন; শিব এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হইলেন বৃষভবাহন।

শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্র ধারণের উপাখ্যান আবার অন্যবিধও পাওয়া যায়।—

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পিনাকং মে করে স্থিতম্।
মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৩১ অধ্যায়।

সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ ছিল; সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা সেই তেজ সহ্য করিতে পারিতেন না; সূর্য্যের শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মা তাঁর

তার তেজ খানিকটা তক্ষণযন্ত্রে শাতন করিয়া দেন; সূর্য্যের সেই শাতিত তেজ হইতে শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হয় (মৎস্য পুরাণ, ১১ অধ্যায়)।

শৈবসময় পুরাণের উপাখ্যান হইতে আমরা এই জানিতে পাবি যে ঋষিরা প্রথমে শিববিরোধী ছিলেন, যেমন দক্ষও ছিলেন। পরে শিব আর্য্যসমাজে দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন। শিব যে খাঁটি বৈদিক আর্য্যসমাজের দেবতা নন তার প্রমাণ এইরূপ পদে পদে পাওয়া যায়। মহাভারতে অর্জ্জুন শিবকে কিরাত-বেশে দেখিয়াছিলেন; শিবপুরাণে শিব ভিন্নরূপে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; লিঙ্গপুরাণে শিব লিঙ্গ-রূপী ও পশুপতি; শিবপুরাণে ব্যাধবেশী শিব ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত কারণ শিবকে দেখিয়া ঋষিপত্নীদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; শিবরাত্রি ব্রত প্রচলন হয় ব্যাধের দ্বারা; বৈদিক দেবতাদের পূজায় শূদ্রের অধিকার নাই, কিন্তু শিব পূজায় আচণ্ডাল সকলেরই অধিকার—শিব ব্রাত্যদেরই দেবতা। স্কন্দপুরাণ বলেন—কিরাতের শিবপূজাপদ্ধতিই অচ্ছিদ্র। বরাহপুরাণে মহাদেব দ্যূতক্রীড়ায় কৌপীন পর্য্যন্ত হারিয়া পার্ব্বতীর বিদ্রূপে বনে যান ও সেখানে পার্ব্বতী শবরীর বেশে শিবকে প্রলুব্ধ করেন; বাংলা শিবায়ন প্রভৃতিতেও শিবের কুঁচুনীর প্রতি টান দেখা যায়। ঈশানসংহিতা বলেন—শিব "আচণ্ডালমনুষ্যানাং ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়কঃ" (নাগরখণ্ড)। স্কন্দপুরাণে স্বয়ং শিব বলিতেছেন—

শূদ্রঃ কর্ম্মাণি যো নিত্যং স্বীয়ানি কুরুতে প্রিয়ে,
তস্যাহম্ অর্চ্চাং গৃহ্নামি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতে॥

শিব অন্-আর্য্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের পরিকল্পিত দেবতা ও ভারতের বাহির হইতে আগন্তুক দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া আর্য্যরা শিবের পূজা নিষেধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে—

অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
—তিথিতত্ত্বে বহ্বৃচগৃহ্যপরিশিষ্ট-বচন।
সকৃদ্ এব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালো ভবেৎ ধ্রুবম্॥
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা॥
পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৮ অধ্যায়।

শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য লইয়া বিরোধের বহু উপাখ্যান রামায়ণ (১।৭৫), বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ (১৮৩-১৮৪), ভাগবত (১০।৬৪), ইত্যাদিতে আছে। ওয়েবার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মহাভারতের যুগেই শৈব ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিব মগ ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন; তাঁরা আবার নাগপূজক ছিল; দুই দেবতাকে একত্র করিয়া তারা ফণীভূষণ শিব পরিকল্পনা করে। জৈন তীর্থঙ্করদিগকে ফণীভূষণ দিগম্বর করিয়া মূর্ত্তি গঠিত হইত; তার মানে তাঁরা হিংসা ও হিংস্রতাকে বশ করিয়াছেন, এবং তাঁরা লৌকিক প্রথা লজ্জার বশবর্ত্তী ও বিষয়াসক্ত নহেন। জৈন ধর্ম্মের প্রতিকূলে শৈব ধর্ম্ম যখন উত্থিত হইল, তখন দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর ফণীভূষণ দিগম্বর শিব হইয়া পূজা পাইতে লাগিলেন।

লিঙ্গপূজা শিবপূজার বহু পূর্ব্ব হইতে বহু দেশে অনুষ্ঠিত হইত—ঈজিপ্টে, ব্যাবিলনে, সীরিয়াতে, গ্রীসে, রোমে লিঙ্গ-পূজা প্রচলিত ছিল। এই-সমস্ত লোক শিশ্নদেবাঃ বলিয়া আর্য্য সমাজে ঘৃণিত ছিল; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রাবল্য হওয়াতে এই পূজা-পদ্ধতিকে শৈব ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয়। এইজন্য শিবশক্তি পূজার মধ্যে বহুবিধ অশ্লীল জঘন্য দুর্নীতিপূর্ণ অনুষ্ঠান স্থান পাইয়াছে। গোঁড় জাতির এক বীরপুরুষের নাম ছিল লিঙ্গো; তারা লিঙ্গোক দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত; পরে এই লিঙ্গো শিবলিঙ্গের সঙ্গে এক হইয়া যায়। এইরূপে অনার্য্য অন্ত্যজ ভারত-বাহ্য যত সমাজের যত দেবতা যখন যখন প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তখন তাঁদের সকলকেই এই শিবস্বরূপে নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

শিবের মহিমা এইরূপে যখন বহু দেশ-বিদেশের দেবতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল, তখন শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল কাশী। এই কাশীতে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন; সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে শৈবধর্ম্মে নিমজ্জিত করিয়া বুদ্ধকে শিবস্বরূপ করিয়া তুলিতে শৈবদের বেগ পাইতে হয় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অনার্য্য ও বৌদ্ধ দেবতার সংমিশ্রণে প্রস্তুত শিবকে যেমন স্বীকার করিতে চাহেন নাই, শিবের পুরী কাশীকেও তেমনি তীর্থ বলিয়া প্রথমে স্বীকার করেন নাই। এইজন্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতি-

নিধি বেদ-ব্যাস ব্যাসকাশী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন ; কিন্তু বেদব্যাসের চেষ্টা বিফল হয়। ক্রমে কাশীমাহাত্ম্য প্রবল হইয়া এমন বিশ্বাস প্রচারিত হইল যে সেখানে মরিলেই লোক শিব হয় ও কাশী পৃথিবীবহির্ভূত স্থান। কাশী যে ভূলোকে সংলগ্ন নয় তাহা প্রায় সকল পুরাণেই আছে—

"ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নম্, অন্তরীক্ষে মমালয়ম্।"
—মৎস্যপুরাণ, ১৮২ অধ্যায়।
"সপাদযোজনং তত্ত্ব দেশং পৃথ্বীবহিষ্কৃতম্।"
—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য ২২।২৬।

কূর্ম্মপুরাণ (৩০ অধ্যায়), কালিকাপুরাণ (৫০ অধ্যায়) প্রভৃতিতেও আছে। কাশী যদি ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত নয় তবে আছে কোথায় ?

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ॥
এতাস্ তু পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন ॥
পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্যোপরিস্থিতা।
শ্রীরাম-ধনুব্-অগ্রস্থা অযোধ্যা সা মহাপুরী ॥
মথুরা কেশবোৎসৃষ্ট-সুদর্শন-বিধারিতা।
মায়া চ শিবলিঙ্গস্থ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবিতা ॥
কাশী শিব-ত্রিশূলস্থা কাঞ্চী হরিহরাত্মকঃ ॥
—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য ২৪। এবং ভূতশুদ্ধিতন্ত্র।

এই কাশী অনাদি ও অনন্তকাল স্থায়ী ; বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও কাশী শিবের শ্রীচরণে ছিল—

ন যদা ভূমিবলয়ং ন যদাপাং সমুদ্ভবঃ।
তদা বিহর্ত্তুম্ ঈশেন ক্ষেত্রম্ এতৎ বিনির্ম্মিতম্ ॥
পরমানন্দরূপাভ্যাং পরমানন্দরূপিণি।
পঞ্চক্রোশ পরীমাণে স্বপাদতলনির্ম্মিতে ॥
—কাশীখণ্ড।

এবং বিশ্ব যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে তখন শিব তাঁর পুরীকে ত্রিশূলের ডগায় ক্রমশঃ উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিবেন—

যথা যথা হি বর্দ্ধেত জলম্ একার্ণবস্য চ।
তথা তথোন্নয়েদ্ ঈশস্ তৎ ক্ষেত্রং প্রলয়াদপি ॥
ক্ষেত্রম্ এতৎ ত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্ তিষ্ঠতি দ্বিজ ॥
—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ২২ অধ্যায়।

দৈনন্দিনেঽথ প্রলয়ে ত্রিশূলকোটৌ সমুৎক্ষিপ্য পুরীং হরঃ স্বাম্।
বিভর্ত্তি সংবর্ত্ত মহাম্বিভূষণস্। ততো হি কাশী কলিকাল-বর্জ্জিতা ॥
—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৩০।১১০।

ব্রহ্মণোঽপি দিনে বিশ্বং বিনশ্যতি সুনিশ্চিতম্।
তদা শিব ত্রিশূলেন ধর্ত্তাতি চ মুনীশ্বরাঃ ॥
—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৪২।৪৪-৪৫।

শিবের সঙ্গে পাঁচ সংখ্যার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায় —তাঁর পাঁচ মুখ, কাশী পঞ্চক্রোশী ; কারণ, তিনি ভূতনাথ এবং ভূত পঞ্চ—এই পঞ্চভূত তাঁর অষ্টমূর্ত্তির পঞ্চমূর্ত্তি। তাঁর পঞ্চমুখ পঞ্চবিদ্যারও চিহ্ন—ধনুর্বিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীত), যোগ, আয়ুর্ব্বেদ, পশুবিদ্যা। শিব যে ধনুর্দ্ধর তাহা অতি বৈদিক রুদ্রের আমল হইতে হিমালয়ের উপর বিদ্যুৎস্ফুরণ বা রামধনু বিকাশের রূপকের মধ্যে দেখিতে পাই। তবে বৃহস্পতি ছিলেন সঙ্গীতকারী গণের গণপতি ; সেই গণপতিত্ব পরে গণেশ ও শিব আত্মসাৎ করেন ; শিবের আদি যাঁহ রুদ্র ও মরুৎ দুজনেই রোদন করিতেন ; সেই রোদন হই গান হইয়া উঠিল। তাই প্রবাদ হইল—"প্রভুণা শঙ্করেণে গীতবাদ্যং প্রকাশিতম্"—সঙ্গীতদামোদরঃ। শিব যে বুদ্ধদেবকে আত্মসাৎ করিয়া যোগশাস্ত্রেরও প্রবর্ত্তক। শিব আগে জ্বর ও অন্যান্য পীড়া জন্মাইবার ভূতনাথ ছিলেন যে পীড়ক তারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁকে চিকিৎসকও হইয়াছিল ; শিব আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক সেইজন্য। শিব পশুপতি ; সুতরাং পশুবিদ্যা তাঁরই জানিবার কথা বিশেষত তিনি অশ্বচিকিৎসক, কারণ পারস্য ও ব্যাক্ট্রিয়া হইতে ভারতে অশ্ব প্রথম আনীত হয় এবং শিবও ব্যাক্ট্রিয়ানের ও পারস্যের মগ ব্রাহ্মণদের দেবতা হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন, সুতরাং অশ্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে—তাঁরা স্বদেশী।

ডাক্তার ইউজেন বুর্নুফ বলেন যে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বে ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিস (৩০২ খ্রীষ্টাব্দে) দেখিয়া গিয়াছিলেন যে বৈদিক রুদ্র ও শাকদ্বীপী মগদের দেবতা শিব মিলিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। চীন পরিব্রাজকেরাও শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া গিয়াছিলেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময় (১৫০ খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব) হইতে শিবের বিগ্রহ মানবাকৃতি করিয়া গঠিত হইত প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী দশকুমারচরিত প্রভৃতি পুস্তকেও শিবমূর্ত্তি মানবাকৃতি। হুয়েনস্যাং কাশীতে এক বিরাট মানবাকৃতি শিবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ শতাব্দী)। বরাহমিহিরের

সময় (৬ষ্ঠ শতাব্দী) পর্য্যন্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে অনার্য্য লিঙ্গ-দেবতা শিবের বিগ্রহরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়।

শিব-ঠাকুরকে যেমন বহু দেবতার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তাঁর ভক্তদেরও সেইরূপ বহু বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়াছে। অশোক প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। সেই সুদূর কাল হইতে বহু শৈব রাজা—হয় বৌদ্ধ, নয় জৈন, নয় জোরোস্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। কুষণ-রাজ কাড্‌ফাইসেস দ্বিতীয় (৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ভক্ত শৈব ছিলেন; হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৮) মূলতানে জোরোস্ত্রীয়দের হত্যা করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন; দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ-রাজ্যের (আধুনিক নিজাম রাজ্য) বিজ্জল রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসব বেদবিরোধী ও ব্রাহ্মণবিরোধী বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন (১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। এইরূপে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র, গান্ধার, বেলুচিস্থানের হিঙ্গলাজ, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে শৈব তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। শৈবধর্ম্মের প্রভাব সাহিত্যে সুপরিস্ফুট—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের কাব্য নাটক, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে শিবের মহিমা পরিকীর্ত্তিত।

ভারতে প্রাচীনতম দেবমন্দির যা বর্ত্তমান আছে তা শিবমন্দির; এই মন্দির প্রাচীন অহিচ্ছত্র বা বর্ত্তমান বেরেলি জেলার রামনগরে আছে; নির্ম্মাণকাল ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের অনুমানে প্রথম শতাব্দী খ্রীষ্টপূর্ব্ব বা খ্রীষ্টপর। এই মন্দিরের গায়ের ইট ও টালিতে শিবের উপাখ্যানাবলীর পুতুল তোলা আছে (A History of Fine Art in India and Ceylon.—Vincent Smith)। অনেকে অনুমান করেন শিবমন্দিরগুলি বৌদ্ধ বিহার চৈত্য ও স্তূপের রূপান্তর বা প্রতিরূপ (The Folk-Element in Hindu Culture—Benoykumar Sarkar)।

বুদ্ধদেবের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই গৌড়ে বঙ্গে শৈব কৌমার ও জৈন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল। অশোকের প্রভাবে দেশ বৌদ্ধ হয়। পরে গুপ্ত রাজাদের প্রভাবে বঙ্গদেশ পুনরায় শৈব হয়। সেই সময় বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করদের আত্মসাৎ করিয়া শিব আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় উদাসীন যোগী দেবতা হইয়া পড়িলেন। তখন বঙ্গদেশের এমন এক দেবতার আবশ্যক হইল যিনি উদ্যমপূর্ণ, যিনি শরণাগতবৎসল ও আর্ত্তত্রাণে সক্ষম শক্তিসম্পন্ন। সেই দেবতা আবির্ভূত হইলেন চণ্ডী—তিনিও বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়াই অবতীর্ণ হইলেন; তিনি একদিকে হইলেন শিবের পত্নী, অপর দিকে বৌদ্ধশক্তি বাশুলী ও বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যমণি ধর্ম্ম, অথচ তিনি পৌরাণিক শক্তির ন্যায় উদ্যমশীলা; তিনি নিতান্ত নিরীহ দেবতা হইলেন না—তিনি হইলেন চণ্ডী!

[এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তি পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার—"শিবপূজা" (বঙ্গদর্শন ১৩০৯), ঠাকুরপূজার ইতিহাস (প্রবাসী ১৩১৯); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়; Encyclopaedia of Religion and Ethics; Religious Sects of the Hindus —H. J. Wilson; Elements of Hindu Iconography —T. Gopinatha Rao: L' Iconographie Bouddhique— A. Foucher; Archæological Survey of Mayurbhanj— N. N. Basu; The Folk-Element in Hindu Culture— B. K. Sarkar; Vaisnavism, Saivism and Saktism— R. G. Bhandarkar; A History of Fine Art in India and Ceylon—Vincent A. Smith; History of India— Vincent A. Smith; The Syrian Goddess—Herbert A. Strong; Indo-Aryan Races—Ramaprasad Chanda; Muir's Sanskrit Texts, Vol. IV; The Quarterly Journal of the Mythic Society, April 1920; Vedic Mythology—A. A. Macdonnel; Vedic Magazine, 1920; যজ্ঞকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; পুরাণ; etc, etc.]

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎ-প্রভাত

শরৎ-প্রভাত—সোনার স্বপন
আকাশেরি নীল পাথারে
ভেসে বেড়ায় হাল্‌কা মেঘের ভেলায়;
কল্পপুরীর প্রজাপতি
অপ্‌রাজিতার নীল কাতারে
পল্‌কা পাখা পুলক-ভরে খেলায়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষার বীজ

দেশের অভ্যুদয়ের কারণত্রয়।

দেশের অভ্যুদয়ের কারণ তিনটি,—(১) লোকের সত্ত্ব, (২) দেশ, (৩) শিক্ষা। সকল মানুষ সমান শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে দুইটি মানুষ সমান হয় না। ইহা যেমন সত্য, তেমনই সত্য—শিক্ষা দ্বারা নিঃসত্ত্বকে সত্ত্ববান্ করিতে পারা যায় না। যে স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহাকে ব্যায়াম করাও, সুপথ্য ভোজন করাও, আর স্বাস্থ্যকর দেশে বাস করাও, কিছুতেই তাহাকে সবলের সমান করিতে পারা যায় না। এইরূপ, দুর্বলচিত্তকে শিক্ষা দ্বারা সবল করিতে পারা যায় না।

(১) মানুষ।

খর-লোম তৈল-সিক্ত করিয়া অশ্ব-লোমের তুল্য চিক্কণ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে খরতা বাহিরে প্রকাশিত না হইলেও ভিতর হইতে লুপ্ত হয় না; সুযোগ পাইলেই তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন আমরা আশ্চর্য হই; বলি, বক-ধার্মিক, ভণ্ডতপস্বী, ধর্মধ্বজী, ইত্যাদি। এইরূপ, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদও জন্মগ্রহণ করেন; আমরা তখনও আশ্চর্য হই। জাপানের অভ্যুদয়ের মূলে কেবল বিলাতী শিক্ষা নহে। সে জাতির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা শিক্ষিত হইয়া জাতিটাকে নূতন মার্গে চালিত করিয়াছে। ইহাকেই সত্ত্ব (inherent character) বলিতেছি। ইহার উৎপত্তি কি, কিসে বা ইহার পরিবর্তন হয়, সে-সব গুরুতর প্রশ্নের বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(২) দেশ।

দেশের গুণে মানুষের দেহের ও মনের ও আত্মার, এক কথায়, মনুষ্যত্বের ইতর-বিশেষ হয়, এক-একটা জাতির চরিত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জাপানীকে যদি তিব্বতে বাস করিতে হইত, আমেরিকার রাজ্য-যুতি যদি সাইবেরিয়ায় বসানা যাইত, তাহাদের বর্তমান গৌরব হইত কি? দেশের কোন্ গুণে অধিবাসীর কোন্ গুণ, কিংবা কোন্ কর্ম তাহার সহজ হয়, তাহার বিচারও গুরুতর, এবং এখানে নিষ্প্রয়োজন। 'দেশ' (environment), একটা ব্যাপক সংজ্ঞা; মানুষের সত্ত্ব যেমন অদৃষ্ট দেশেরও অধিকাংশ বিষয় অ-দৃষ্ট। শিক্ষার (culture training) ফল কিন্তু দৃষ্ট; এই কারণে আমরা শিক্ষার আশ্রয় লইতে এত ব্যগ্র।

(৩) কালোপযোগী শিক্ষা।

এই শিক্ষা কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র,—এই তিন উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া তদুপযোগী করিতে হইবে। কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির, কি কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত শিক্ষা চাও, তা শিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ায় বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পাত্র দেশ ভগবদ্-দত্ত; পরিবর্তনের উপায় নাই। কাল কিন্তু নিত্যপরিবর্তনশীল। ইংরেজ যদি এদেশে না আসিত, যদি বণিক্-জাতি না হইত, যদি ঐহিক সুখ-ভোগ একান্ত কাম্য না করিত, তাহা হইলে আমাদেরও কাল ভিন্নরূপ হইত। জাপানে বিদেশী, পশ্চিমদিগ্‌বাসী না আসিলে তাহার কাল যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিত। বিদেশের একটা প্রবল ধাক্কা আসে, দেশের কালের কপাট হঠাৎ খুলিয়া যায়। কখনও কখনও আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কারণে দেশের চিত্ত নড়িয়া উঠে। কালের স্রোত একটা বহিতেছিল, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যমহাপ্রভুর স্কন্ধে দেবতা ভর করিলেন, কালের স্রোত উজান বহিতে লাগিল। গৌড়বঙ্গ ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, লোকে বলে কি এক যোগে ভূত আসিয়া তাহাকে শ্মশানভূমি করিয়া দিয়াছে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি দেবতার মার; মালেরিয়া ও কলেরা বোধ হয়, ভূতের মার। পড়িয়া পড়িয়া কত মার খাইতেছি, আর বুক ফুলাইয়া কোঁচা দোলাইয়া বলিতেছি, 'ভয় নাই,' 'বেশ আছি।' প্রকৃতির শেষ প্রবোধন (warning) যে বেদনা, তাহাও হারাইতে বসিয়াছি।

প্রাণ ও ধনের নিমিত্ত শিক্ষা।

এমন দুরন্ত কালে শিক্ষাকেও দুরন্ত হইতে হইবে। আজি না হয়, ইয়ুরোপের প্রলয়কাণ্ডে আমাদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট ঘটিয়াছে। কিন্তু দুই পুরুষ কাল,—দুই পুরুষ কাল!—মেলেরিয়া রাক্ষসী থানা পাতিয়া বসিয়াছে; সে যাইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কত লোককে যে খাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহারা গ্রাস হইতে

খসিয়া পড়িয়াছে; তাহারা বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এত বড় ঘটনা, যাহাতে দেশকে-দেশ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, সে দেশ আর দাঁড়াইতে পারিবে কি? দেশের নূতন আইনে যে বাঙ্গালী অমাত্য নিযুক্ত হইবেন, দেখিতেছি তাঁহাকে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। মহামারী হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইবে, অন্ন-বস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, আর শিক্ষা দিয়া এই দুইএর প্রতিষেধ কল্পনা করিতে হইবে।

শিক্ষা এক সংস্কার।

শিক্ষা একটা উপায়, একটা বড় সং-স্কা-র; এদেশেই এই সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্বি-জ বলা হইত। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম হইলেই দ্বি-জ হইত না; যাহার উপনয়ন না হইত, সে দ্বিজ হইত না। আর, সেকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পুত্রের উপনয়ন না হইলে সে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত। ইদানী আমরা মনে করিতেছি, শিক্ষা দেশময় আবশ্যক (compulsory) করিতে বলিয়া একটা নূতন কিছু করিতে বলিতেছি। মোটেই না। যে শিক্ষা অবশ্যক ছিল, তাহাকে কালোপযোগী করিয়া পুনঃ প্রবর্তিত করিতে বলিতেছি, নর-নারী-নির্বিশেষে দেশোপযোগী করিতে বলিতেছি।

এখনও ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন হইতেছে; তাহার স্কন্ধে উপবীত লম্বিত হইতেছে, কর্ণে সাবিত্রী উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু যে উপনয়নের কথা বলিতেছি, ইহা সে উপনয়ন নহে। সে উপনয়ন তিন দিনে সমাপ্ত হইত না, চতুর্থ দিনে গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনও হইত না।

একালে সে উপনয়ন আর চলিবে না। কিন্তু তাহার ভাব যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে বলি। বঙ্গে ব্রাহ্মণ মাত্র সাড়ে বার লক্ষ; দুই কোটি হিন্দুর বাকি সব শূদ্র। যদি বা অন্য বর্ণ আছেন, তাহা নগণ্য। বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন, বোধ হয় অধিকাংশ শূদ্র ছিলেন। বহুকাল দ্বি-জের সেবা করিয়া হউক, বঙ্গভূমি বৌদ্ধধর্মের ও শক্তি-তন্ত্রের লীলা-নিকেতন বলিয়া হউক, সেদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব-বশেই হউক, বঙ্গের শূদ্র প্রাচীনকালের শূদ্র আর নাই। বঙ্গে কেন, বহু প্রদেশে নাই। এই শূদ্র শিব-শক্তির বা রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব অক্লেশে বুঝিতে পারে। জ্ঞান বিস্তারে ইহা অল্পসৌভাগ্যের কথা নহে। পাত্র আছে; আস্তিক্যের বীজ গ্রহণের শক্তি আছে। ইহাদিগকে একালের দ্বিজ করিয়া লওয়া কঠিন নহে। কারণ শিক্ষা দ্বারা মানুষের কতকগুলা দোষ শোধ্‌রাইতে পারা যায়; বিশেষতঃ যে-সব গুণের বীজ থাকে, সে-সব বীজকে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, ও ফলপ্রসূ করিতে পারা যায়। এই কারণেই উপনয়ন একটা প্রধান সংস্কার গণ্য হইত।

কন্যা-শিক্ষা।

বিবাহ আরও বড় সংস্কার। শুধু সেকালের হিন্দু স্মার্তাচার্যের নিকট বড় ছিল না; একালের সমাজতত্ত্ব-দর্শীর নিকটও বড়। কিন্তু লোকে জানে না, বিবাহ একটা সংস্কার। না জানিলেও সংস্কার সংস্কারই থাকে। কিন্তু জানিলে নিজের ও সমাজের হিত সাধন হইত। বিবাহ একপুরুষের সংস্কার নহে; যে বিবাহ করে কেবল তাহাকেই দোষ গুণ ভুগিতে হয় এমন নহে, পরিবারবর্গও ছাড়িয়া দি-ই; পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে অন্ততঃ তিনচারি পুরুষ সে বিবাহের ফল ভোগ করে। লোকে বোঝে না, বিবাহ পুত্রার্থে, কামার্থে নহে। এই জ্ঞান জন্মিলে দেশে কন্যা-শিক্ষা প্রসারিত হইবে; পুত্রের তুল্য যত্নে কন্যা, পালিত ও শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তখন বর-পণ গিয়া হয়ত কন্যাপণ আসিবে। কারণ যাহাকে সহধর্মিণী করা যাইবে, যাহাকে পুত্রার্থে লাভ করিতে হইবে, তাহাকে ঘটকের দোকানে হঠাৎ পাওয়া যাইবে না; তাহাকে নিশ্চয়ই সমাদরে গ্রহণ করিতে ও সমাদরে রক্ষা করিতে হইবে। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষিতেরা সামাজিক অনুষ্ঠান-বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। এসব বিষয়ের উপদেশ তাহারা পায় না; বর্তমান সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষার দোষই এই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন।

আমাদের দেশের পক্ষে এই শিক্ষা দরকার ছিল। সমাজের বাহিরে থাকাতে তাহার দোষ গুণ সহজে চোখে পড়িতেছে। অপর সমাজের তুলনায় নিজের সমাজের কোন্ অঙ্গে বিকার জন্মিয়াছে, তাহা সহজে ধরিতে পারা যায়, প্রতিকার তত সোজা না হইলেও লক্ষ্য থাকে। কালে কতক লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা নিজেদের

জীবনে ফলাফল ভোগ করিয়া গণের পথপ্রদর্শক হয়। এইরূপে বিদ্রোহী মাত্রেই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেশের ক্ষত দেখাইতে থাকে, এবং কালে তাহার আরোগ্যেরও সূচনা করে। এই যে 'অস্পৃশ্য জাতি', 'অনুন্নত জাতি' নামে হিন্দু সমাজে একটা বিষম ব্যাধি বহুকাল হইতে নালী-ক্ষতে পরিণত হইয়া আছে, সমাজের ভিতর হইতে তাহার শোধন হইত কি না, সন্দেহ। যে কারণে সে জাতি অস্পৃশ্য ছিল, যে কারণে অন্য এক জাতির স্পৃষ্ট জল অমেধ্য বিবেচিত হইত, এখন সে কারণ আর নাই! আমরা বুঝিয়াছি দেহের ও চিত্তের শুচিতা রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইতে হইবে; এবং কদাচার ও অসৎ কর্ম দ্বারা সে শুচিতা রক্ষা পাইতে পারে না। হোটেলে ভোজনের আশঙ্কাও ত এই। অপরদিকে উনানের চারিদিকে জলের রেখা টানিয়া যে আত্মতুষ্টি, তাহা হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রের ভাবার্থ বিস্মরণের ফল। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হইলে ভ্রষ্টাচার ও অসৎমার্গাবলম্বের দোষ যায় না। এরূপ ব্রাহ্মণের প্রদত্ত জলও অপেয়। কুলধর্ম অগ্রাহ্য নহে; কিন্তু সদাচার ও সদ্-ব্যবহার দ্বারা নিষ্কুলীনকে কুলীন করা এদেশে অজ্ঞাত নহে। মধ্যশিক্ষা ও অন্ত্যশিক্ষা সময়ে ছাত্রদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইবে। তখন তাহাদিগের যে শৌচ অভ্যাস হইয়া যাইবে, তাহার ফল সহজে নষ্ট হইবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্মৃতির হ্রাস।

একালের পাশ্চাত্য শিক্ষা নূতন মার্গে ধাবিত হইয়াছে, বুদ্ধির বিকাশকেই এক কাম্য করিয়া ধরিয়াছে। ফলে স্মৃতিশক্তি, যে শক্তি নইলে সংসারে একদিন টিকিতে পারা যায় না, সে শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এখন রব উঠিয়াছে, মুখস্থ করিও না, বুঝিয়া রাখ। কিন্তু রাখার নামই ত স্মৃতি। বুদ্ধির বিকাশ চাই; কিন্তু তা বলিয়া স্মৃতির ধ্বংস চাই না। টোলে-পড়া পণ্ডিত মহাশয়দিগের স্মৃতি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহারা না পড়ে পণ্ডিত নহেন, না বুঝে পণ্ডিতও নহেন। আমরা আবৃত্তির নামে ডরাই, ছেলেরা আরও ডরায়। একই পদ বা বাক্য যাহা পড়িতে ভাল লাগিতেছে না, মনে রাখিতে পারা যাইতেছে না, তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে,—ইহা শুনিলেই সন্তাপ ও ক্রোধ জন্মে। আমি বলি, এই কারণেই স্মৃতির অভ্যাস, শারীরিক ব্যায়ামের তুল্য, হিতকর। কষ্টকর ত্যাগ করিতে করিতে কেবল সুখ, কেবল আনন্দ, কেবল ইচ্ছা, কর্মের প্রবর্তক হইয়া দাঁড়ায়। তখন শিক্ষার আর কি থাকে?

ইচ্ছা-শক্তির হ্রাস।

যাহা প্রথমে অসাধ্য মনে হয়, তাহাকে সাধ্য করা, তোলা, ষোল আনা না হউক অন্ততঃ বার আনায় সিদ্ধি লাভ করা, শিক্ষার প্রধান ফল। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর—লোকে এই উপদেশ দেন। কিন্তু চেষ্টার গোড়ায় যে ইচ্ছা-শক্তি, তাহার চালনা না হইলে উপদেশ পালনই অসাধ্য। আমরা ব্রত গ্রহণের, ব্রত আচরণের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি, মনে করিয়াছি, সে-সব কুসংস্কার। কিন্তু ইহার ফলের নিমিত্ত পরকালের দিকে তাকাইতে হইবে না, ইহার ফল ইহকালেই প্রত্যক্ষ হয়। আমরা ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বলি, বিদ্যার পথ রাজপথ নহে; অথচ সে পথে বহু ভোগের ব্যবস্থা হইতেছে। এত ভোগে (যদিও ভারতবাসীর পক্ষে দুঃখভোগ) থাকিয়া চিত্ত নির্মল ও দৃঢ় হইতে পারে না। আমরা জ্ঞানের শক্তি মানি, বিদ্যার শক্তি আরও মানি; মানি না ইচ্ছার শক্তি! যে বাঙ্গালীর ভীরুতা অপবাদ ছিল, সেই বাঙ্গালীর সুকুমার বয়সের কিসের বলে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে বীরের পরিচয় দিতেছে তাহারা কখনও কোনও কষ্টকর ব্রত গ্রহণ করে নাই। গুরুকুলে দৃষ্টান্ত পাইলে আমাদের পুত্রেরা কি না করিতে পারে? ছোট ছোট, কিন্তু অনভ্যস্ত ও কষ্টকর ব্রত করিতে করিতে যে চিত্তবল জন্মে, সংসারে সে বলের নিকট অপর বল পরাস্ত হয়। "আমি ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিব," "আমি বিনা পাদুকায় এক বৎসর যাপন করিব," "আমি গল্প করিতে ভালবাসি, কিন্তু এক বৎসর মৌনী থাকিব,"—ইত্যাদি সহস্র কর্ম দ্বারা ইচ্ছা-শক্তি প্রবল করিতে পারা যায়। আমার প্রয়োজন নাই, তাই ছয়মাস প্রত্যহ, কি মাসে মাসে এক কি দুই নির্দিষ্ট দিন এই কর্ম করিব, শুভকামনায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করা মনে বল আসে। আমি পারি, অন্যের কষ্টকর কর্ম আমি পারি, এই আত্মশক্তি জাগাইবার নিমিত্ত ব্রত পালন একান্ত কর্তব্য। ইষ্টদেবের নামে ব্রত পালন করা

তিনিই ব্রতীকে পালনের কষ্ট হইতে রক্ষা করেন। বালকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য এইরূপ ব্রত। কঠিন বলিয়াই ইহা যথাসাধ্য পালন করিতে হইবে। আচার অভ্যাসের গৌণ ফলও তাই। বিদ্যার জাহাজ, ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা সুচরিত অভ্যাস লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। সদাচার ও সদ্‌ব্যবহার যাবতীয় ধর্মের মূল। হিন্দুর নিকট ধর্ম ই এই।

সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষায় অকল্যাণ।

কিন্তু শিক্ষার যে প্রস্তাব করিতে যাইতেছি, তাহা কেবল হিন্দুর নিমিত্ত নহে। আমি মুসলমান ধর্মের কিছু জানি না। কিন্তু সে ধর্মেও উপবাস আছে, হয়ত ব্রতগ্রহণও আছে। কারণ ইন্দ্রিয়-সুখে রত থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধন হইতে পারে না। তথাপি হিন্দুর পর্ব পূজা, ব্রত উপবাস, প্রভৃতি হিন্দুর পুত্রের শিক্ষার পক্ষে যেমন মূল্যবান, অন্যের পক্ষে তেমন হইতে পারে না। অথচ এসব বাদ দিয়া পুত্রকে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করিতে পারা যায় না। এখন ধরিয়া রাখা হইয়াছে, পুত্রের আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাহার বাড়ীতে হইতেছে। যদি বাড়ীর সহিত ইস্কুলের যোগ থাকিত, যদি দুই-ই এক শরীরের দুই অঙ্গ হইত, তাহা হইলে কর্ম বিভাগের ক্ষতি হইত না; ইস্কুলে বুদ্ধির, বাড়ীতে দেহ ও আত্মার বিকাশের চেষ্টা হইতে থাকিত। কিন্তু ইস্কুলের শিক্ষা সমাজ-ব্যতিরিক্ত শিক্ষা। কেবল তাহা নহে, সে শিক্ষা পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ধর্মব্যতিকীর্ণ শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় হিন্দুর ছেলে ও মুসলমানের ছেলে সে সভ্যতার প্রতি লোলুপ হইতেছে। বড় হইয়া জ্ঞানবান্ হইয়া সে ধর্মান্তর গ্রহণ করুক, কিন্তু তাহার কাঁচা বয়সে তাহাকে পিতা-মাতার ধর্মে পালিত হইতেই হইবে। কেহ সে ধর্মকে কুসংস্কার বলুক, অন্ধবিশ্বাস বলুক, সে বিচার তাহার পিতামাতার, পুত্রকন্যার নহে, রাজারও নহে।

ধর্মশিক্ষা।

বর্তমান শিক্ষা যে সর্ব্বাঙ্গীন হইতেছে না, তাহা সবাই বুঝিতেছি। কেন হইতেছে না, তাহাও বুঝি। রাজা বিধর্মী; দেশের প্রজাও একধর্মী নহে, ব্যাপক অর্থে (কেবল religion অর্থে নহে) ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করিতেছি। আচার-ব্যবহার সমাজের লিঙ্গ (distinguishing mark)। নিজের সম্বন্ধে যাহা করি, তাহা আচার। ইষ্টদেবের পূজা, পিতৃপুরুষের তর্পণ, বিবাহও ইহার অন্তর্গত। পরের সম্বন্ধে যাহা করি, তাহা ব্যবহার। ব্যবহার আইনের অন্তর্গত। রাজা প্রজার ব্যবহার নিয়মিত করেন; ব্যবহার ভঙ্গে দণ্ড বিধান করেন, এবং ব্যবহারাভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের সাহায্যে ব্যবহারের বিচার করেন। রাজা বিধর্মী হওয়াতে প্রজার ব্যবহার ধর্মের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বিচারালয় আর ধর্মাধিকরণ বলিতে পারা যায় না। অথচ শাস্ত্র চাই; কারণ, শাস্ত্রহীন সমাজ ও নিয়মহীন রাজ্য, কর্ণহীন নৌকার তুল্য প্রমাদের অতল জলে নিমগ্ন হয়। আর, এ কথাও কি সত্য নয়, গর্ভচ্যুত শিশু নিজে নিজে পণ্ডিত হয় না?

শাস্ত্র শিক্ষা।

আমি বুঝিতেছি, পাঠক যদি বা এ পর্য্যন্ত সহিয়া আসিতেছিলেন, উপনয়ন, ব্রত ও উপবাস, ইষ্টপূজা, পার্ব্বণ ও পিতৃতর্পণ, আচার ও শাস্ত্র শুনিয়া এবার খড়্গহস্ত হইবেন। কারণ, যে শাস্ত্র শাস্ত্র, ধর্ম ধর্ম করিয়া দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে, এই মরণ-বাঁচনের দিনে পুত্র-কন্যাকে সেই শাস্ত্রের সেই ধর্মের দাসত্ব শিখাইতে হইবে? আমি বলি, ধর্ম চাই, শাস্ত্র চাই; হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে লাফাইয়া বেড়াইলে পা-হাত ভাঙ্গিতে থাকিবে, পতনই চলিতে থাকিবে, উত্থান হইবে না। কার বলে সমাজকে বলবান্ করিবে, ভারতের চব্বিশ কোটি হিন্দুর দ্বিজত্ব ঘটিতে পারিবে? অর্থ চাই, অর্থকরী শিক্ষা চাই বলিয়া মানুষগুলাকে কলে পরিণত করিতে চাও কি? রজতমুদ্রা যদি পরমার্থ হয়, তাহা হইলেও আত্মহীন কলের মুখ দিয়া সে রজত বমিত হইতে থাকিবে না। মরাকে বাঁচাইতে চাও; অথচ মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিতে দিবে না? ধর্মের, ও শাস্ত্রের, বিশেষতঃ স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে কি না, ভাবিয়া দেখ। নানা মুনির নানা মত দেখিয়া স্থির চিন্তা হইতে পলায়ন করিলে চলিবে কি? জাপানও ফাঁপরে পড়িয়াছিল, এবং হযবরল করিয়া কথাটা চাপা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঁধন ভরসা করিয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নূতন ধর্ম (morals) শিক্ষা দিতেছে,

তাহা ত পর্যাপ্ত হয় নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় জর্মানী হইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে আত্মতুষ্টি খুঁজিতেছে। জাপান ফাঁপরে পড়িয়া বিলাতী সভ্যতার অনুবর্তী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের স্মৃতি তন্ত্রে ও শক্তি-তন্ত্রে সনাতন বলিয়া কিছু আছে। দ্বেষরাগাদিহীন (unbiassed) সৎ ও বিদ্বান্ যে শাস্ত্র নিত্য পালন করেন, এবং যাহা তাঁহার হৃদয় শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমোদন করে, এমন শাস্ত্র নিশ্চয় সনাতন। এখন দেখি, ইস্কুলে good conduct জন্য prize দেওয়া হয়। যে ছেলেরা পাঁচ ছয় ঘণ্টা বোবার মতন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যাহারা হাঁ-তে থাকে না, না-তেও থাকে না, কিন্তু ছেলেয় ছেলেয় দুষ্টামি করিলে শিক্ষকের নিকট গোয়েন্দাগিরি করে, তাহারা good conductএর prize পায়। কিন্তু আমি যে শিক্ষাশালার কথা বলিতেছি তাহাতে "প্রাইজ" থাকিবে না, ছেলেরা বোবা হইবে না, বালক-বিশেষকে চর করা হইবে না, কেহ অনুচিত দুষ্টুও হইবে না। আচার ও ব্যবহার অভ্যাস করাইয়া, মুখে বলিয়া নহে, কাজে করাইয়া, শিক্ষার অঙ্গ করিতে চাই।

আচার ও ব্যবহার শিক্ষা।

এখানে আর-একটা কথা বোঝাপড়া হইয়া যাউক। পুত্রকন্যা-শিক্ষা অবশ্যক করিতে চান; কোন্ অধিকারে? সে অধিকারে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, সে শিক্ষা পিতা বা অন্য অভিরক্ষিতার (guardian) স্বেচ্ছাধীন থাকিবে না। অতএব এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে পুত্রকন্যা 'মানুষ' হয়। মানুষ করিতে গেলেই ধর্মশিক্ষাও অবশ্যক করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আচার ও ব্যবহার শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার আদি।

এই শিক্ষা বাড়ীর উপরে ছাড়িয়া দিলে বর্তমান অবস্থায় চলিয়া আসিব। ইহার দুই কারণ। (১) যাহাঁরা ইংরেজী-শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাঁরা সনাতনধর্মশিক্ষার প্রায় কিছুই জানেন না। (২) যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা ধর্মশিক্ষা দিতে গিয়া আচারকেই বড় করিয়া তুলিবে, কিংবা কুলাচার ও দেশাচারকেই আচার মনে করিবে। অবশ্য একথা সত্য, প্রচলিত যুক্তিহীন আচার অধিককাল টিকিবে না। ট্রামে ও রেলে ও ষ্টীমারে জন্মগত জাতির লঘু-গুরু-ভেদ ঘুচাইয়া দিতেছে, কুলীন ব্রাহ্মণের পার্শ্বে একাসনে অবনত অকুলীন বসিয়া যাইতেছে। রাজদণ্ডের ভয়ে ম্লেচ্ছ বিচারকের বিচার মানিতে হইতেছে, তাহাকে (সেলাম নামে) নমস্কারও করিতে হইতেছে। প্রায় আশীশত বৎসর, চৌদ্দপুরুষ নয়, বত্রিশ পুরুষ, এই দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে। কাজেই ঘরে বাহিরে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে গেলে যাহা নিত্যাচার, যাহা নিত্য ব্যবহার, তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। সকলের বাড়ীতে এই শিক্ষা হইবে কি না সন্দেহ।

গুরুকুলে শিক্ষা।

নিত্যাচার ও নিত্য-ব্যবহার শিক্ষা সকলের বাড়ীতে সেকালেও হইত না। তাই শিষ্যকে গুরুকুলে (কুল = গৃহ) থাকিতে হইত। বিহারও বৃহৎ গুরুকুল। মঠ শব্দের অর্থ ছাত্রনিবাস। এখানেই আচার, বিনয় (discipline), বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (fame), বৃত্তি (occupation), নিষ্ঠা (devotion to work), তপঃ (moral virtue), প্রভৃতি কুলীনের কাম্যগুণ জন্মিতে পারে। বাড়ীর শিক্ষা, ব্যক্তির শিক্ষা; গুরুগৃহে শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা। বিবিধ শিক্ষার মধ্যে, গুরুকুলে শিক্ষাই ভাল। এখন একা একা তিষ্ঠিবার জো নাই। এই বুঝিয়াই বিধি হইতেছে, আদর্শ শিক্ষা সকলকেই পাইতে হইবে। পিতা-মাতার মতামত ছিল না নাই; ছেলে তাঁহাদের হইলেও রাজ্যের। যে ছেলে রাজ্যের, সে ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা রাজার হাতে। অতএব তাহার শিক্ষা, সমূহের শিক্ষা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল। গুরুকুলে এই শিক্ষার যেমন সুবিধা, বাড়ীতে তেমন হইতে পারে না; গুরুকুলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ঘণ্টায় যে আচার সে ঘণ্টায় সে আচরণ ঘড়ীর কাঁটার মতন চলিতে থাকে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা-ত্যাগ; সে সময়ের নিদ্রালস্য সভয়ে উত্থানে পলায়ন করে। আরও সুবিধা, গুরুগৃহের যাবতীয় কর্ম ছাত্র কিংবা ছাত্রীকেই করিতে হইবে। কারণ, চাকর নাই। ঘর-দুয়ার ঝাঁটানা, নিকানা, বাসন-কোশন মাজা ধোওয়া, নদী হইতে জল আনা, হাট করা, রান্নাবান্না প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম বাল্যকাল হইতে করিতে করিতে একদিকে ছাত্র ও ছাত্রীর দেহ শ্রম-ক্ষম হইতে থাকিবে, অন্যদিকে এসব নিত্যকর্মে হেয়ত্বজ্ঞান বা লজ্জা-বোধ জন্মিবে।

25 304

পারিবে না। এক এক গৃহে আটদশ জনের অধিক থাকিবে না। ইহাদের পরস্পর সখ্য দ্বারা, পরস্পর সাহচর্য দ্বারা সমূহের ইষ্টানিষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে। কুল-পতির আজ্ঞাধীনে থাকিয়া এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কর্মে অভ্যাস জন্মিলে পরে বড় হইয়া নেতার অধীনে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি সহজে আসিতে পারিবে। বিশেষতঃ যে ব্যায়াম ও আহার না করাইলে বাঙ্গালী জাতির পুত্র-কন্যার কল্যাণ নাই, তাহা এইরূপ গুরুকুল ব্যতীত বাড়ীতে হইতে পারিবে না। ইংরেজ জাতির কৃপায় রবিবারে ছুটি, গ্রীষ্মকালে ছুটি, বিদ্যালয়ের বালক-বালিকারা এখন ভোগ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিত্য কর্মের পরিবর্ত্তন চাই; কিন্তু সেটা পর্বে পর্বে হইলে, গ্রীষ্মে না হইয়া বর্ষাকালে হইলে, একদিকে পর্বের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে, অন্যদিকে বর্ষাকালের দুর্যোগ-হেতু শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আদ্যশিক্ষাকালে বালক বালিকা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে। মধ্যশিক্ষাকাল হইতে গুরুকুলে বাস যত হয়, ততই ভাল। সর্বত্র এই নিয়ম চলিতে পারিবে না; কিন্তু এখানে মানস বর্ণনা করা যাইতেছে।

বাঙ্গালীর দোষ গুণ।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, এমন শিক্ষা চাই, যদ্দ্বারা বাঙ্গালীজাতির দোষ যথাসাধ্য শোধিত হইতে পারিবে, এবং গুণ বিকসিত হইয়া সর্বাঙ্গপূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর দোষ গুণ ঠিক ধরিতে পারিব কি না, সন্দেহ। না ধরিলে শিক্ষার বিষয় ও ক্রমও ঠিক হইতে পারিবে না। অতএব ভুলের শঙ্কা থাকিলেও চেষ্টা করিতেছি।

দেহ।

১। বাঙ্গালী শীর্ণ ও খর্বদেহ; বাঙ্গালী দুর্বল। ইহার কারণ জানা চাই, কিন্তু জানা কঠিন। হয়ত মেলেরিয়া, হয়ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, হয়ত ব্যায়ামা-ভাব, হয়ত বা দেশের উষ্ণ আর্দ্র বায়ু, বোধ হয় সব মিলিয়া বাঙ্গালীজাতির দৈহিক অবনতি ঘটাইয়াছে। অবশ্য আদি বংশের দোষও থাকিতে পারে। তথাপি মনে পড়ে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী এত হীনবীর্য ছিল না। জাপানীও আকারে বাঙ্গালীর তুল্য, তাহার অন্নও বাঙ্গালীর তুল্য। কিন্তু প্রভেদ—তাহার দেশে মেলেরিয়া নাই, পুষ্টিকর অন্নও অপ্রচুর হয় নাই; আর প্রভেদ, তাহারা পুত্র-কন্যাকে রীতিমত ব্যায়াম না করাইয়া ছাড়ে না। দুর্বল বলিয়া বাঙ্গালী কার্যবিমুখ হইয়া পড়ে। আহার ও ব্যায়াম এই রোগের ঔষধ।

চিত্ত।

২। বাঙ্গালী সহসা প্রবৃত্ত, সহসা নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ তালপাতার তুল্য ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু পরে নিবিয়া যায়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধরে না, ভাবিয়া-চিন্তিয়া ছাড়ে না। অর্থাৎ বাঙ্গালী হুজুগে মাতে। এই দোষ হেতু বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না। জাপানী জাতিটাও নাকি বাঙ্গালীর তুল্য চলচিত্ত ছিল, কিন্তু আপনাকে বাগাইয়া আনিয়াছে। এই দোষের প্রতিকার বড় সহজ নহে। বোধ হয় নিত্য ক্লেশকর কর্ম (drudgery) করিতে করিতে ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশে চলচিত্ততার প্রতিষেধ হইতে পারে। দেখা যায়, গ্রামের লোক সহজে হুজুগে মাতে না। তাহারা স্বভাবতঃ রক্ষাশীল। কাজেই ফলাফল স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে নূতন কাজে হাত দেয় না। কেহ কেহ বলেন, আমাদের যুবকেরা ভাব-প্রবণ। ইহা অসাধারণ নহে। যৌবনের চাঞ্চল্য সর্ব্বজনবিদিত। ভাব-প্রবণ না হইলে বরং দোষের হইত। যৌবনে ভোগ-লালসা যেমন প্রবল হয়, ত্যাগ, এমন কি আত্মত্যাগও তেমন সহজ। এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশেই যৌবন মহনীয় হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যুবার ভাবপ্রবণতা অধিক হইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। কাঁচা বয়সে দর্শন পাঠ ঠিক মনে হয় না। বিশেষতঃ ইদানীর ইয়ুরোপী বিশৃঙ্খল-বৃত্তি নায়ক-নায়িকার উপন্যাস বিষবৎ পরিবর্জন কর্তব্য।

আত্ম-সম্মান।

৩। বাঙ্গালী অভিমানী। ইহা একটা বড় গুণ বটে, কিন্তু অতিবোধে দর্প ও ঔদ্ধত্য আসে। অশিষ্টের দর্প হেতু বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হইয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী যাহা 'ছোট কাজ', হেয় কাজ মনে করে, সে কাজ সহজে করে না। বাঙ্গালী কুলী হয় না। ঘরে অন্ন আছে বলিয়া নহে; কোন্ বাঙ্গালীকে খাটিতে না হয়? গ্রাম-

সম্বন্ধ চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বাঙ্গালী বাড়ীর চাকর হইতেছে না। পঞ্জাবের শিখ কলিকাতায় 'মোটর' রথের সারথি হইতেছে; বেতন অল্প নয়; কিন্তু বাঙ্গালী কয়জন? ইদানী কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই কর্মে তাহারা লজ্জা বোধ করে। বাঙ্গালীর কেরাণী হইবার কারণও তাই। কেরাণী প্রাচীনকালের 'করণিক' (officer); দাস (menial servant) নহে। তা ছাড়া, যিনি যাহাই বলুন, পরের কাজে বেতন লইয়া দেহ খাটাইয়া কে কোথায় সুখ অনুভব করে? দেহের কর্ম চিরদিনই হেয়, বুদ্ধির কর্ম চিরদিনই প্রেয় বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকা নূতন রাজ্য; সেখানে পরে কি দাঁড়ায় কে জানে। আমি দৈহিক শ্রমের নিন্দা করিতেছি না; বাঙ্গালীর কেরাণী হইবার প্রবৃত্তির মূল খুঁজিতেছি। আমরা একটা কথা ভুলিয়া যাই। যাহার দেহ ও মন মাত্র পুঁজি, তাহাকে এই দুই লইয়াই ব্যাপার করিতে হইবে। কেরাণী ও মাষ্টারি, ওকালতি ও ডাক্তারি, ইত্যাদি কর্মে মানুষটি থাকিলেই চলে। লোকে বলে ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, বৈজ্ঞানিক চাষ কর। কিন্তু এসব কর্ম, চাকরির তুল্য একপাদ নহে, প্রায়ই ত্রিপাদ কি চতুষ্পাদ।

অভিমান প্রকৃত বস্তুতে আরোপিত হইলে চিত্তবলের সঙ্গে সঙ্গে কর্মশক্তি প্রকাশ করে। সংবাদপত্রে দেখি, প্রায় দেড় হাজার যুবা রাজদ্বেষী সন্দেহে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা ধন চায় নাই, মান চায় নাই। কি অভিমানে মরিতে গিয়াছিল? যে বাঙ্গালী কখনও অস্ত্রের মুখ দেখে নাই, কোন্ সাহসে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে গোলার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল? নির্বোধের সাহস ত নয়। অভিমানের ভালর দিকে এই। মন্দের দিকে, সাহেব সাজিবার চেষ্টা। সাহেবে মান পায়; অন্য উপায় না দেখিয়া মানী বাঙ্গালী সাহেবের অনুপযুক্ত পরিচ্ছদ ও রীতি নীতি অনুকরিতেছে। বড়র অনুকরণ মানুষ মাত্রেই স্বাভাবিক; কারণ তাহাই শিক্ষার উপায়। কিন্তু বাহ্য আবরণ অপেক্ষা বড় কিছু আছে, বাল্যাবধি তাহার আভাস পাইলে বাঙ্গালী মানুষ হইয়া উঠিবে। এক অন্তরীয় ও এক উত্তরীয় পরিলেও হিন্দুর গর্ব করিবার অনেক আছে, বাঙ্গালীরও আছে। দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস, প্রাচীন অবদানের ইতিহাস, এখনও রচিত হয় নাই, কর্ম-প্রবৃত্তির নির্মল ও প্রাণকর উৎস এখনও অদৃশ্য হইয়া আছে।

উদারতা।

৪। বাঙ্গালী নির্ভীক ও উদার। দেহের বলে বলবান না বলিয়া তাহার ভীরু অপবাদ রটিয়াছে। যেদিন দেহে বল আসিবে, সে দিন তাহার মনের বল আরও প্রকাশিত হইবে। স্থৈর্য, বলবানের লক্ষণ, কাপুরুষের নহে। বাঙ্গালী নূতন পথে চলিতে ডরায় না। শক্তি-তন্ত্রের উপাসক হইয়া মহাশক্তিকে জগতের অম্বা জ্ঞান করে, অসুর-মর্দিনী দিব্য-বাহিনীকে কন্যা-রূপে অর্চনা করে। তাই তাহারই কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ সহজ হইয়াছে। বাঙ্গালী গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি করে; কিন্তু যে জাতিভেদের প্রচণ্ড উত্তাপে ভারতের অপর প্রদেশ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বঙ্গে সে উত্তাপ কত মৃদু তাহা দেশভ্রমণ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। উদার বলিয়া বাঙ্গালী গুণের আদর করে, এবং বিদেশী বিধর্মী হইলেও তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়ে।

বুদ্ধি।

৬। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্। কিন্তু ইহাতে কেহ হইয়াছে, বুদ্ধির জোরে কেল্লা ফতে করিবার প্রবৃত্তি কম করিতে পারে না। অল্পদর্শী মনে করে, ইংরেজের সঙ্গে বহুকাল আছে বলিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুলিয়াছে। কিন্তু খোলা বুদ্ধির লক্ষণ আর-এক প্রকার। আরও আগে হইতে মাদ্রাজী ইংরেজের সংসর্গে আসিয়াছে। বাঙ্গালী ইংরেজের বুদ্ধি পাইলে বড় হইয়া উঠিত। ইংরেজ বণিকের মত অন্ততঃ অর্থে বড় হইতে পারিত। অনুকরণে দক্ষ হইতে রাজধানী কলিকাতায়, যেখানে বিদেশী বণিকের অট্টালিকা তাহার বাণিজ্য ঘোষণা করিতেছে, কারখানায় চিমনীর ধূম সর্বদা নির্গত হইতেছে, এবং যেখানে শত শত বাঙ্গালী কাজ করিতেছে, সেখানে কি দেখিয়াও অনুকরণ কই? বাঙ্গালী সুখাভিলাষী, কি পৃথিবীর কোন্ জাতি নয়?

আর-একটা কথা ভাবিবার আছে। বাঙ্গালী যদি বুদ্ধিমান্, তাহা হইলে তাহার সর্জনা (originality) তাহার উদ্ভাবনা (inventiveness) শক্তির পরিচয় কই? আমার বিশ্বাস, ইংরেজী পড়ার চাপে এই

শক্তি চাপা পড়িয়াছে। এ বিষয় পরে দেখাইতেছি। আরও কারণ আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি বিশ্লেষণে উন্মুখ, সংশ্লেষণে বিমুখ। পরের যুক্তি খণ্ডন করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না। নানা ব্যাপারে বাঙ্গালীর বিশ্লেষণী বুদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালী 'নেই-আঁকড়ে', ন্যায়শাস্ত্রের তর্ক আঁকড়াইয়া থাকে, কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করে না। এই কারণে চলিত কথায় বলে,—হিক্‌মতে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গালী। এই দোষেই বাঙ্গালী মজিয়াছে ও মজিতেছে। তাহার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না। সেই দোষেই বাঙ্গালী কাহারও আজ্ঞাধীন হইয়া কাজ করিতে পারে না, একত্র মিলিত হইতে পারে না; প্রত্যেকে মনে করে সে যেমন বুঝিয়াছে আর কেহ তেমন বোঝে না। বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে সমগ্র দেখিতে দেয় না। এই হেতু বাঙ্গালী বৃহৎ কলা বা বাণিজ্য চালাইতে পারে না, কর্ম্মের ব্যবস্থাপক (organiser) হইতে পারে না। ব্যাপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় উত্তম বুঝিতে, করিতে, চালাইতে পারে; কিন্তু সেসব একত্র করিতে হইলে সে দিশাহারা হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর কুশাগ্রবুদ্ধির নিকট অভেদ্য কিছু নাই; কিন্তু স্থূলের নিকট কুশ পরাজিত হয়; আর সংসারে ভেদন অপেক্ষা যোজন অধিক লাগে। কারণ বিশ্লেষণী শক্তি ভঞ্জন-শক্তি; সংশ্লেষণী, নির্ম্মাণ-শক্তি। আশ্চর্য্যের কথা, বঙ্গদেশে অদ্যাপি অর্থনীতিবিৎ জন্মগ্রহণ করেন নাই! কারণ পরিসংখ্যানের (statistics) পরে যে ব্যাপক দৃষ্টি চাই, তাহার অভাব ঘটে। অবশ্য খণ্ডদৃষ্টিই সহজ, কিন্তু অখণ্ডদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত একাগ্রতা ও অভ্যাস চাই। ইহা এক প্রকার যোগ (concentration of mind), এ চলচিত্ততায় অসাধ্য।

ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার দোষ।

ইংরেজী ভাষা দ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রত্যহ দেখিতেছি বলিয়া ইহার পরিমাণ পাইতেছি না।

(১) শক্তিহানি।

দেখি, বালক ও যুবক কাতারে কাতারে ইংরেজী ইস্কুল ও কলেজের পথে ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়াছে, বার-চৌদ্দ-ষোল-বর্ষব্যাপী তপস্যায় বসিয়া গিয়াছে। অর্থ ও কামের নিমিত্ত ব্যগ্রতা বুঝিতে পারি; কিন্তু যাহার অর্থফল অনিশ্চিত তাহার প্রতি এমন আসক্তি অন্য দেশে দুর্লভ। শুনিয়াছি, জর্মানী ও ইদানী জাপান ছাড়া ইহার তুলনা নাই। কিন্তু তাহাদের পথ সোজা; আমাদের পথ কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা। পূর্ব্বকালে সমস্থানীয় দুর্গ বেউড়-বাঁশের বেষ্টনে দুর্ভেদ্য করা হইত। ধন্য আমাদের ধীরত্ব ও বীরত্ব; আমরা সুকুমার বালক ও বালিকাকেও নির্বিকার চিত্তে সেই কাঁটার বনে নিক্ষেপ করিতেছি। ধন্য তাহারা, যে, মরি-বাঁচি পণ করিয়া, সিদ্ধ তপস্বীর ন্যায়, শরীর দিয়া কাঁটার অগ্র ভগ্ন করিতেছে! দেশের মধ্যশ্রেণীর কি প্রভূত শক্তি এইরূপে অপব্যয়িত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না! চাই বিদ্যা, চাই জ্ঞান। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা, অন্যের ভাষা দিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে? হয়ত ভবিষ্যৎ প্রত্নবেত্তা পুরাতন জীর্ণ নিবন্ধ ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করিবেন, চাপ্‌কান কাটিয়া কোট করিতে গিয়া তাহাদের পিতামহগণের মতি-ভ্রম ঘটিয়াছিল। কারণ, শুনিতে পাই, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচার কামনায় ইংরেজী-শেখার বিধি হয় নাই।

ফলও প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগের পর স্বর্গারোহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। দ্রৌপদীও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু হিমালয়ের বহুর শৈলে, হিমানীর অসহ্য শীতে, কিছুদূর চড়িতে না চড়িতে পথে পতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। আমাদের বালিকাবিদ্যালয়ে যে বালিকা চড়িতে যাইতেছে, তাহারও দশা দ্রৌপদীর তুল্য হইতেছে, শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। হিমালয়ে চড়িতে গিয়া কোমলদেহ কনিষ্ঠ পাণ্ডবদ্বয়ও যে গতায়ু হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি। পরাক্রমশালী ভীমার্জ্জুনেরও নিষ্কৃতি হয় নাই। মহাভারতে আছে, একা যুধিষ্ঠির, বোধ হয় সংযমগুণে, স্বশরীরে স্বর্গে পহুঁছিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দ্বারা এইটি প্রথম ফল। বোধ হয় ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন অকালবৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

(২) জ্ঞানহানি।

দ্বিতীয় ফল আরও ভয়ানক। বিদ্যার পরিপাক দূরে থাক, ভক্ষিত বিদ্যা কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া অন্ননালীতেও

পড়িতেছে না। বিদ্যার ফল জ্ঞান। এমন জ্ঞান, যে জ্ঞানে দিবাকে দিন বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং সেই অনুসারে কাজ করি। কানে শোনা কথা নহে, কেতাবী বয়দ্ নহে; এমন জ্ঞান যাহাতে সুপক্ক সুদৃশ্য অন্নে বিষ আছে জানিলে ক্ষুধার্তও সে অন্ন বর্জন করে। যে জ্ঞান কর্মের প্রবর্তক না হয়, সে জ্ঞান মিথ্যা। ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যার্থীকে দেশে না রাখিয়া বিদেশে বিচরণ করিতে পাঠাইতেছি, এক কাল্পনিক প্রাণীতে পরিণত করিতেছি। ফলে, সংসারের এক আঁচড়ে তাহার লব্ধজ্ঞান অদৃশ্য হইতেছে। জন কয়েক ছাড়া আর কেহ ইংরেজী লেখা-পড়ার ধার দিয়া যায় না, পনর-ষোল বৎসরের কঠোর তপস্যা সব ভুলিয়া যায়। কেহ বা বুভুক্ষিত তৃষিত জনের ন্যায় মাতৃস্তন্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, হয় ত পায় না; পাইলেও দেশী-বিলাতীর মিল করিতে পারে না।

(৩) আত্মহানি।

তৃতীয় ফল আরও ভয়ানক। দিবারাত্র বৎসরের পর বৎসর ইংরেজী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার দেহে ফিরিঙ্গীর ভূত প্রবেশ করে। তাহার সত্ত্বা লুপ্ত হয়; সে মনে করে, সে ফিরিঙ্গী। তাহার আচারে ও ব্যবহারে, তাহার চিন্তায়, নিজে আর থাকে না। যিনি ভূতে-পাওয়া রোগী দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন ইচ্ছাশক্তি কি অদম্য বলে ভূতের ইচ্ছাতে পরিণত হয়। ভাষাশিক্ষা মাত্রেই অন্যের অনুকরণ। ইহার আদ্যে মুখস্থ, মধ্যে মুখস্থ, অন্তে মুখস্থ। ভাষার শব্দ মুখস্থ, অর্থ মুখস্থ, রচনা মুখস্থ, রীতি মুখস্থ, এমন কি ভাবও মুখস্থ না করিলে সে ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারা যায় না। অর্থাৎ নিজের করিয়া লইতে হইলে পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। অনুকরণে এই যে অভ্যাস হয়, তাহার ফল ভয়ানক। কোথায় বা সর্জনা, কোথায় বা উদ্‌ভাবনা, কোথায় বা স্বাধীনচিন্তা। চিত্তের দাসত্বের তুল্য শোচনীয় কি আছে? শৈশব হইতে "হর্লিক্স মিল্ক" খাইলে বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায়, কিন্তু এই পর্যন্ত।

এই যে দশা হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তির উপায় কি?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ইন্‌সাফ্

ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া
লস্কর অফুরান্
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন
সুল্‌তান্ বুল্‌বান্।
স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র
প্রতাপ-ছত্র মাথে
চলেছেন রাজা, দিল্লী নগরী
চলে যেন তাঁর সাথে।
সাথে সাথে চলে উর্দ্দু-বাজার,
হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠ্‌ঠা পাঠান
হাতে নিয়ে ঢাল কাতী।
বল্লম-ধারী চলে সারি সারি
ফলায় আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন
মালিক সদল-বলে।
কত সাজা কত শিরোপা বিতরি'
নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল, ছাউনি পড়িল
বদাউন্-পুরে এসে।

* * * *

দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে
বদাউন-সর্দ্দার,
নগরী সাজিল নাগরীর মতো
ইশারায় যেন তার।
কোথাও দুঃখ নাই যেন, কোনো
নাইক নালিশ কারু,
দুনিয়া কেবল ঢালা মখ্‌মল্
চুম্‌কির কাজে চারু।
আতর গোলাব আর কিম্খাব
যেন বদাউন-পুরে
রাজপুরুষের প্রসাদে প্রজার
হয়েছে আটপহুরে।

ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওয়াজে
কাটে দিন মৃগয়ায়,
লোক খাসা অতি বদাউন-পতি
সন্দেহ নাই তায়।
বিশ্রামে বিশ্রম্ভ-আলাপে
কাটে দিন কোথা দিয়ে,
রাজ-অতিথির বিদায়ের দিন
ক্রমে আসে ঘনাইয়ে।
বদাউন্-বনে সেবারের মতো
শীকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফেরে সুল্‌তান্ সহ
উল্লাসে মাতোয়ারা।
সঙ্গে চলেন বদাউন্-পতি
করিয়া তূর্য্যনাদ,
সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি
"সুল্‌তান্! ফরিয়াদ্!"
চমকি চাহিয়া বদাউন-প তি
বক্‌বক্ মিঞা কন্—
"দেওয়ানা! দেওয়ানা! হটাও উহারে,
কি দ্যাখো সিপাহীগণ।"
সুল্‌তান্ কন্—"না, না, আনো কাছে,
কি আছে নালিশ, শুনি।"
প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত
ওম্‌রাহ বদাউনী।
শাহান্‌শাহের হুকুমে সিপাহী
কাছে গেল জেনানার,
আঁখি বিস্ফারি কাছে এল নারী
বাদ্‌শাহী হাওদার।
"কিবা ফরিয়াদ? কহ ফরিয়াদী,
নালিশ কাহার পরে?"
"ভয়ে কব? কিবা নির্ভয়ে, প্রভু!"
পুছে সে যুক্ত করে।
"নির্ভয়ে কও!" বলেন হাকিম;
নারী কয় ঋজুকায়া—
"হত্যাকারীর সাজা দাও, প্রভু!
জগৎ-প্রভুর ছায়া!
স্বামীরে আমার হত্যা করেছে
বদাউন-সর্দ্দার,
এই মাতালের কোড়ার প্রহারে
জীবন গিয়েছে তার।"
"কে তোর সাক্ষী, মিথ্যাবাদিনী,
কে তোর সাক্ষী, শুনি?"
"ধর্ম্মের প্রতিনিধি এসেছেন,
বুঝে কথা কও, খুনী!
সাক্ষী খুঁজিছ? সাক্ষী আমার
সারা বদাউন-ভূমি,
সাক্ষী আমার ওই কালামুখ,
আমার সাক্ষী তুমি।
সাক্ষী, তোমারি ভৃত্য, যাহারে
গিলেছে পাষাণ-কারা,
আমার সাক্ষী রাজপুরুষেরা
নালিশ নিলে না যারা।"
বজ্রদীপ্তি যুগল চক্ষে
সুল্‌তান্ বুল্‌বান্
চর-পরিষদ্‌পতিরে করেন
সঙ্কেতে আহ্বান।
নিভৃতে তাহারে কি কহিল নৃপ,
নিমেষে ছুটিল চর,
নিমেষে আসিল কয়েদখানার
সাক্ষীরা তৎপর।
আসিল কোরান সাক্ষী-জবান্-
বন্দী হইল পাকা,
সাক্ষ্য-প্রমাণ বাক্য নারীর,
নয় মিছে, নয় ফাঁকা।
বচন-দক্ষ মিথ্যা পক্ষ
হেরে গিয়ে হ'ল রূঢ়,
বর্ব্বরতায় গর্ব্বের বেশে
জাহির করিল মূঢ়।
ঘৃণায় বক্র ভুরু ভূপতির,
নয়নে আগুন জ্বলে,
হুকুমে লুটাল বক্‌বক্ যাঁর
উষ্ণীষ ধূলিতলে।

ঘোড়া ছেড়ে রাজপথে দাঁড়াইল
বদাউন্ সর্দ্দার,
হাতে পায় বেঁধে শিকল, সিপাহী
কেড়ে নিল তলোয়ার।
কোড়া নিয়ে এল কোড়া-বর্দ্দার
বাদ্‌শাহী ইঙ্গিতে,
বজ্র-কঠোর স্বরে বাদ্‌শার
অপরাধী কাঁপে চিতে।
"দোষী সর্দ্দার, ভুল নাই আর,
দোষীর শাস্তি হবে,
রাজার প্রতিভূ রাজার সুনাম
ঢেকেছে অগৌরবে,
রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে
চোর-ডাকাতের হাতে,
কে বলো প্রজারে রক্ষিবে রাজ-
পুরুষের উৎপাতে?
রক্ষক যদি হয় ভক্ষক
কে দিবে তাহারে সাজা?
রাজপুরুষের রাহুক্ষুধা হ'তে
প্রজারে বাঁচাবে?—রাজা।
এই তো রাজার প্রধান কর্ম্ম,
এ বিধি সুপ্রাচীন,
এই ধর্ম্মের করিব পালন
মানিব না ধনী দীন।
গরীবের প্রাণ, আমীরের প্রাণ,—
সমান যে জন জানে,
সর্দ্দারী তারি সুল্‌তানী তারি
দুনিয়ার মাঝখানে;
গরীবের প্রাণ তুচ্ছ যে মানে
অরি তার ভগবান;
কোড়ার প্রহারে প্রাণ যে নিল, সে
কোড়াতেই দিবে প্রাণ।
আর যারা আজ মুলুকের তাজ
রাজার নিয়োগ পেয়ে
ছোটোর নালিশ তোলে নাই কানে
বড়দের মুখ চেয়ে
খুনের খবর গুম্ ক'রে যারা
রেখেছে রাজার কাছে,
খুনীর দোসর শয়তান তারা,—
দাও ঝুলাইয়া গাছে।
বে-ইমানী সনে রফা ক'রে চলা
জানে না মুসলমান,
কাজে আজ করে সে কথা প্রমাণ
দুনিয়ায় বুল্‌বান্।
বলবান ব'লে খুনীর খাতির?
হবে না; হবে না মাফ্,
কসুর করিলে পুরা পাবে সাজা—
এই মোর ইন্‌সাফ্।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফরাসী রবীন্দ্র-প্রশস্তি

সকলেই জানেন যে মহাযুদ্ধের শেষে দুইটি মহাপ্রদেশ জার্মানী দেশের দখল হইতে মুক্তিলাভ পাইয়া, আবার ফরাসী দেশের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। এখন আল্‌সাস্ ও লরেন্ প্রদেশদ্বয়ে ফরাসী ভাষা আবার প্রচলিত হইয়াছে, ফরাসী সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইতেছে। এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে জুর্ণা দ'আল্‌সাস্, এ দ্য লোরেন্ ("Journal d' Alsace et de Lorraine") নামক একটি খবর-কাগজ প্রসিদ্ধ। ইহার ১৬ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যাতে একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, যাহার শিরোনামা এই:—ল্য পোয়েৎ বাঙ্গালী ("Le poete bengali") অর্থাৎ "একজন বাঙ্গালী কবির কথা"। আমাদের পাঠকবর্গ সহজে অনুমান করিতে পারিবেন যে এই কবি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন আর কেহ নহেন। আমরা যথাসাধ্য এই প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছি। এই অনুবাদে যদি "ভুল-চুক" হইয়া থাকে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। প্রবন্ধটির লেখকের নাম জর্জ ব্যার্‌ঞের্ (Georges Bergner)। তিনি নিম্নলিখিত ভাবে রবি-বাবুর বিষয় সমালোচনা করিয়াছেন।

জে ডি এণ্ডার্সন।

"যদিও তাঁহার নাম একরকম ফরাসী নামের মতন শোনা যায়, তথাপি তিনি ফরাসী নন। Strauski, Pappadiamantopoulos, T'serstevens, এই বিচিত্র শব্দগুলি ফরাসী গ্রন্থকারদের নাম। ঠাকুর-মহাশয় একজন ফরাসী লেখক নহেন। যৌবনকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অনেক বিদেশী ভাষা না শিখিলে আমি কখনও জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিব না। সেইজন্য আমি সময় সময় পারী (Paris) সহরের বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষার বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া করিতাম। সেই বিদ্যালয়ে একটি অল্পবয়স্কা ফরাসী মহিলার সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনি সযত্নে বাঙ্গালা ভাষা শিখিতেন। কেন শিখিতেন, জানেন? ঠাকুর-মহাশয়ের গীতাঞ্জলি নামক পুস্তক কবিবরের নিজ ভাষাতে পড়িবার নিমিত্ত, আর কি! আমার এত সাহস ছিল না যে আমি এই বালিকার নিদর্শন অবলম্বন করি। এত প্রয়োজনও ছিল না, কারণ কবি মহাশয় অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত স্বয়ং তাঁহার কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি ভালই করিয়াছেন, কারণ এই উপায়ে তাঁহার গীতগুলি নানা দেশবিদেশে প্রচলিত ও খ্যাত হইয়াছে। এই অনুবাদ না করিলে, তিনি কখনও, বোধ হয়, প্রসিদ্ধ নোবেল প্রাইজ (Nobel Prize) প্রাপ্ত হইতেন না।

ঠাকুর-মহাশয় মা সরস্বতীর একজন বরপুত্র। তিনি এমন সুন্দররূপে নিজ ভাষাতে তাঁহার গানগুলি রচনা করিয়াছেন যে মা সরস্বতীর কৃপায় ও সহায়তায় তাঁহার অনুবাদকগণও সুচারুরূপে ভাষান্তর করিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাতে ও ইংরেজী ভাষাতে কবিবরের রচনা কেমন শোনা যায়, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের আঁদ্রে জিদ্ (Andre Gice) ঠাকুর-মহাশয়ের "গীতাঞ্জলির" যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা একটি উত্তম ফরাসী গ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যদিও কথিত আছে যে অত্যধিক প্রশংসা করা অবিহিত, তবে অপর দিকে আমি ইহা বলিতে পারি যে আমাদের অনুবাদক মহাশয়গণ প্রায়ই কেবল অশুদ্ধ ও কদর্য্য ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ঠাকুর-মহাশয়ের ভাগ্য এই যে তাঁহার পুস্তকগুলির যত অনুবাদক হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই খুব উৎকৃষ্ট ফরাসী ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছেন। বিশেষ মাদাম্ আঁরিয়েৎ মিরাবো তোরাঁ (Madame Henriette Mirabaud Thorens) একটি খাসা পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি ল্য জার্দিনিয়ে দ' আমুর ("Le Jardinier d'Amour") (অর্থাৎ "প্রেমের মালাকার") নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি এমন নৈপুণ্যের সহিত এই দূরদেশের গীত আমাদের ভাষায় তরজমা করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাকে একটি যথার্থ সৃষ্টিকর্ত্রী বলিতে হইবে। তিনি একটি পুরাতন পদার্থকে নূতন করিয়া রাখিয়াছেন, একটি বিদেশী দ্রব্য আমাদের ঘর-বাড়ীতে আনিয়া আমাদের চোখের সাম্নে সুন্দররূপে তাহাকে বিদ্যমান করিয়া দিয়াছেন। স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে এই মহিলার মানসিক শক্তি অসাধারণ। সকলেই স্বীকার করিবেন যে একজন প্রসিদ্ধ কবির গীতের অনুবাদ করা, বিশেষ এমন পরদেশী কবির গীতের অনুবাদ করা, বড়ই কষ্টকর ও কঠিন ব্যাপার।

আমি শুনিয়াছি যে ঠাকুর-মহাশয় আপন দেশে ঋষি স্বরূপ পূজনীয়। সমস্ত বাঙ্গালী জাতি তাঁহার কবিতা মুখস্ত করিয়া থাকেন। তিনি অপূর্ব্ব পরিশ্রমের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান পথ-প্রদর্শক ও নেতা হইয়া উঠিয়াছেন। ছেলেপিলে পর্য্যন্ত তাঁহার গীত গাহিয়া আনন্দ লাভ করে। মেয়ে-মানুষ সকল ঘরকন্না করিতে করিতে তাঁহার গীত দ্বারা শ্রম দূর করিয়া থাকেন। পুরুষ লোকেরা গঙ্গার প্রসারিত বক্ষে নৌকা চালাইয়া তাঁহারই গান জপ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে করিবেন না যে তিনি একজন একলসেঁড়ে মুনি। তিনি লোকসমাজের মধ্যে সর্ব্বদা চলা-ফিরা করেন। তিনি পশ্চিমদেশের সাহিত্য ও তত্ত্ব একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন। বরং তিনি আপন ভাষায় শেলী (Shelley), টেনিসন (Tennyson) ও মুসে (Musset) কবিদের কবিতা অতিশয় সুন্দররূপে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি অনেকবার আমাদের দেশে পর্য্যটন করিয়াছেন।

যদিও আমার খুব জানা আছে যে ঠাকুর-মহাশয় আমাদের সঙ্গে বারংবার মিশামিশি করিয়াছেন, আমাদের

সভ্যতা বেশ বুঝিয়া উঠিয়াছেন, আমাদের চালচলন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও আমার চোখে দেখিতে এই হিন্দু কবি ঠিক আমাদের মতন একজন লোক নহেন। তিনি আমার কল্পনাতে একটি খুব বুদ্ধিমান ও ভক্তিযুক্ত বৃদ্ধ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার লম্বা দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ কেশ শুভ্রবর্ণ। তিনি যেন সময় ও মায়া-বন্ধন ভুলিয়াছেন। আমরা প্রায়ই মনে করিয়া থাকি যে ভারতবর্ষের মুনিগণ চিরকালের নিবিড়তা আপনাদের অন্তঃকরণের মধ্যে টানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে কেমন একটি কি মহিমা ও মাহাত্ম্য আছে, যাহাকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

এই পুস্তকখানির ইতিহাস কোন্ যুগে বা কোন্ স্থানে স্থিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাহার ঘটনা-বৃত্তান্ত সর্ব্ব-দেশের ও সকল সময়ের। ইহা কেবল মানব-হৃদয়ের ইতিহাস নয়, ইহার মধ্যে প্রকৃতির লীলা খেলা উপস্থিত। ইহাতে দেখা যায় কেমন করিয়া মানব-জীবন আপন মিষ্ট-রসে মুগ্ধ হইয়া যায়। কবিতাগুলি এতই সরল, এত সুমধুর যে তাহার শেষ কথা পড়িয়া কেহই আশ্চর্য্য হইবে না। শেষ কথাটা এই :—"আমার প্রার্থনা এই যে, যে জয়ধ্বনি চিরকাল পার হইয়া তোমার নিকট যুগে যুগে পলে পলে আসিয়া রহিয়াছে, সে কথাটা তোমার হৃদয়ের উল্লাসের সহিত সর্ব্বদা তোমার মনে বাজে।"

এ-প্রকারের গানের সংহিতার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিব? যদিও এই-সকল গানের মধ্যে নানা ভাবের মধ্য দিয়া এক প্রধান ভাব স্পষ্টরূপে দেখা যায়, যদিও ইহার আভাস আমার মনে জীবন্ত রহিয়াছে, তথাপি আমি ইহার সমালোচনা করিতে অক্ষম। এই কবিতাতে অনেক অসাধারণ গুণ আছে। ইহাতে সরলতা, মধুরতা, মৃদুতা, আমোদ, কৌতুক, অনেক ভাব ও অনেক চিন্তা, ভাবনা, প্রেম, শোভা, সৌন্দর্য্য পাইবেন। কিন্তু যেন এ কথা মনে থাকে যে এ-সকল কবিতা অনেক দূর থেকে আসিয়াছে। যে সভ্যতা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের ফরাসী সভ্যতা নয়। এমন গান কি আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিব? ইহার ভিতরে অতি প্রাচীন, অতি গুপ্ত কথা রহিয়াছে। ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যের নিদর্শন। কিন্তু মনে রাখিবেন যে আমরা এখন পর্য্যন্ত এই সাহিত্য জানি না।

যাক! ফরাসী দেশেই হউক বা অন্য কোন দেশেই হউক, যথার্থ মহাকবি অতি বিরল। ঠাকুর-মহাশয় একজন মহাকবি। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখানি কবিত্ব-রসে পরিপূর্ণ। কিন্তু সংসারী লোক এই-প্রকারের পুস্তককে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ইহারা কি মানব-হৃদয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড নীল আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিতে পারে? কিন্তু ইহাদের আত্মাতেও সময় সময় একটু বিশ্রামের উপলক্ষ্য উদয় হয়। ইহারাও সময় সময় কবিতার অমৃতের তৃষা অনুভব করে। ইহারাও সময় সময় সংসারের কোলাহল হইতে খালাস পায়। এমন অবকাশ পাইলে ইহারাও ঠাকুর-মহাশয়ের গান পড়িয়া তৃপ্তি-লাভ করিতে পারিবে। তিনি কি লিখিয়াছেন, শুনুন;—

"ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।"

আপনাদেরও যদি এমন অবকাশ, এমন তৃষ্ণা [illegible] থাকে, তবে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া চরিতার্থ হউন। ঠাকুর-মহাশয়ের গান পড়িতে পড়িতে নানা গোপন স্থানে, নানা পুষ্পপূর্ণ বনে ভ্রমণ করিবেন। কবিবরের [illegible], ঝরণার জলের মত নির্ম্মল ও সুশীতল, আপনাদের অন্তঃকরণ জুড়াইবে। ইহার চেয়ে সুন্দর কবিতা আর কোনখানে পাইবেন না।"

জর্জ্জ্ ব্যার্‌এ-র্।

রাজা-কারিগর

(গান)

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়ার আদি-মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে হাতুড়ি হাঁকাই,
করাতের দাঁতে শাল চিরি।
ঘাঁটা-পড়া কড়া লাখো হাতে তুমি
গড়িছ কত-কি কৌশলে !
কামার-শালের গন্‌গনে রাঙা
আগুনে তোমার চোখ জ্বলে !
হাপরে তোমার নিশ্বাস পড়ে
খুব জানি মোরা খুব চিনি,
মাকু-ইঁদুরের গণেশ তুমি হে
ছুটোছুটি চৌপর-দিনই !
সিদ্ধি তোমার হাতে-হাতিয়ারে,
সোনা করো তুমি থাক্ নিয়ে,
দুনিয়ার সমৃদ্ধি, তোমার
গলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
দুনিয়ার সেরা মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে লোহা হ'ল নিম্নু,
পদানত যত গজ্‌গিরি।

ইন্দ্রের তুমি বজ্র গড়েছ
দধীচির দৃঢ় হাড় কুঁদে,
গ্রহ তারা তুমি গড়েছ ফুঁ দিয়ে
ফুলিয়ে আগুন-বুদ্‌বুদে !
অগ্নির তুমি জন্ম দিয়েছ
কাঠে কাঠে ঠুকে চক্‌মকি,
সূর্য্যেরে শান-যন্ত্রে চড়ায়ে
গড়িলে বিষ্ণু-চক্র কি !
ছিন্ন-ভান্নুর জ্বালার মালায়
গড়িলে শিবের শূল তুমি,
যমের জাঙাল গড়িতে গড়িতে
রেখে দিলে কেন মুল্‌তুবি !
তারার খিলান রয়েছে যে তার
আধখানা আস্‌মান জুড়ে,
কীর্ত্তি তোমার উজ্জ্বল জাগে
অনাদি অন্ধকার ফুঁড়ে !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গলোকের মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে যত কারিগরে
ঘরে ঘরে নব দ্যায় ছিরি !

পথ গড় তুমি, রথ গড় তুমি,
নখ-দর্পণে শিল্প-বেদ,
সকল কর্ম্মে সিদ্ধহস্ত
যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বমেধ।
অষ্ট বসুর কুলের দুলাল
হুনর তোমার সাত বুড়ি,
হাজার হাতের হাতুড়ি তোমার
তুড়্-তুড়া-তুড়্ দ্যায় তুড়ি !
তুয়্‌পুন্ হ'ল তান্‌পুরা তব,—
নেহাইএ নেহাইএ দাও তেহাই,
উল্লাস ভরে হুল্লোড় কভু,
গুন্‌গুন্ গান শুন্‌তে পাই।
তোমার ভক্ত সেবক যে তার
বুকে পিঠে যেন ঢাল বাঁধা,
দর্‌কচা-মারা জোয়ান্ চেহারা
কোঁচ্‌কানো ভুরু, মন শাদা !

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিস্তিরি !
তোমার প্রসাদে শ্রমেও আমোদ,
ধমনীতে ছোটে পিচ্‌কিরি !

তোমার হুকুমে হাতিয়ার ধরি
আমরা বিশ্ব-বাংলাতে ;
থল্‌থলে মাটি, ঠন্‌ঠনে লোহা
অনায়াসে পারি সাম্‌লাতে।
মণি-কাঞ্চনে আমরা মিলাই
মণি মালঞ্চে হার গাঁথি,
বন-কাপাসীর হাসি কুড়াইয়া
টানা দিই তাঁতে দিনরাতি।
রুখো শুখো কাঠে ফুল যে ফোটাই
বাটালির ঘায়ে বশ করি,
কর্নিক, ছেনি, হাতুড়ি চালাই,
তুর্‌পুন্ মাকু বা'শ ধরি।
তোমার প্রসাদে শ্রমে অকাতর
মোরা দড় বিশ কর্ম্মেতে,
দীক্ষা নিয়েছি তোমারি হুকুমে
পরিশ্রমের ধর্ম্মেতে।

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
সকল কাজের মিস্তিরি !
তোমার হুকুমে হীরা কাটি মোরা,
অনায়াসে ইস্পাত চিরি।

তোমার প্রসাদে স্রোত বাঁধি মোরা,
পুল বেঁধে করি জয় জলে,
হাওয়া করি জয় গরুড়-যন্ত্রে
কীলিকা-প্রয়োগ-কৌশলে।
বিদ্যুতে বাঁধি তামার বেড়ীতে
দস্তার দিয়ে হাতকড়ি,
বে-ঢপ্ বে-গোছ বে-গোড় মাটিতে
প্রাসাদ দেউল দেব গড়ি।
অষ্টবসুর যজমান মোরা
ত্বষ্টা ঋষির সন্ততি ;
লস্কর মোরা সূর্য্য-দেবের
স্বাস্থ্য মোদের সঙ্গতি।

রাজা-কারিগর বিশ্বকর্ম্মা !
বুনিয়াদি আদি-মিস্তিরি !
তোমার আশিসে হাতিয়ার-হাতে
হাসি-মুখে ত্রিভুবন ফিরি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চিরন্তনী

(১৩)

বৃদ্ধ বয়সেও তারিণীকান্ত সে ধাক্কা সাম্‌লাইয়া উঠিলেন। শৈলজা বন্ধুমহলে গালে হাত দিয়া বলিল, "বুড়ো হাড় যমেরও অরুচি। নইলে এত হতশ্রদ্ধায় মানুষ বাঁচে ? সে যাত্রা বাঁচিয়া উঠিলেও ডাক্তারেরা তাঁহাকে বেশী দিনের আশা দিলেন না।

সেই ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে করুণা যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া তারিণীকান্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা করেন নাই। করুণা বৃদ্ধের দৃষ্টির ঘায়ে সচেতন হইয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া আঁচল ও শালের চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিল নোট নাই। নোটগুলা ফেলিয়া আসিয়াছে বুঝিয়াও সে স্বচ্ছন্দে বলিল, "দাদা-মশায়, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি।"

তারিণীকান্ত বলিলেন, "এরি মধ্যে টাকা জোগাড় করে ফেলেছ ? দেখি।"

করুণা বলিল, "টাকা কাল-পরশুর মধ্যেই পাব।"

তারিণীকান্ত মুখ ফিরাইয়া অবিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততার হাসি হাসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন, তার পরদিন এবং তারও পরের দিন অবিনাশ আসিল। যতবার আসিল ততবারই দেখিল করুণা তারিণীকান্তের মাথার কাছে বসিয়া আছে। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া জুতা ঘস্‌ঘস্ করিয়া, গলা খাঁকরানি দিয়া, এক গ্লাস জল চাহিয়া, নূতন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেখিতে চাহিয়া অনেক চেষ্টাতেও সে করুণাকে একবারও নড়াইতে পারিল না। সে যা চাহিল তাই

পাইল, কিন্তু যাহার জন্য চাহিল তাহার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও পাইল না। অগত্যা প্রতিদিনই অন্য চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন রোগীর অকারণ নাড়ী টিপিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইল। চতুর্থ দিন শতদলের হাতে করুণার কাছে একখানা চিঠি আসিল, খুব পুরু খামে শীলমোহর করা। শতদল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে করুণার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "বড় মামা বল্‌লেন, তিনি আজ তারিণীবাবুকে দেখ্‌তে আস্‌তে পারলেন না, তাই আমায় একবার খবর নিয়ে যেতে বলেছেন, আর তোমায় কাছে কি একটা জরুরি কাজের চিঠিখানা দিতে বলেছেন।"

শতদল বিদায় লইবার পর করুণা দেখিল খামে চারখানা পাঁচ শ' টাকার নোট। আর কাগজে লেখা—আমি আবার মফস্বলে যাচ্ছি। দিন পনের-কুড়ির আগে ফির্‌তে পার্‌ব না। আশা করি এটা যথেষ্ট সময়।

সেইদিন থেকে রাজ্যের লোকের খবরের কাগজ বার করিয়া বিজ্ঞাপন উল্টানো ও যেখানে-সেখানে কাজের জন্য চিঠি লেখা করুণার এক কাজ হইল। তারিণীকান্তের যে বাহিরের খোলা হাওয়া দর্‌কার এ-কথা ত ডাক্তার বলিয়াছেন। তাহার উপর করুণার যে এখন বেশী টাকার দর্‌কার এ-কথা তারিণীকান্তকে বুঝাইতে তাহাকে কিছু মাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।

যে-দিন মফস্বলে সত্তর টাকা মাহিনায় করুণার একটা কাজ জুটিয়া গেল, সেইদিন হইতেই তাহাদের ছোট ঘরখানিতে জিনিষপত্র টানাটানির একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রেল-গাড়ীর কল্যাণে আজকাল কলিকাতার প্রায় সব মানুষই জীবনে অন্ততঃ দু-চারবার বাহিরের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কুড়ি বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও করুণার ভাগ্যে হাওড়া ষ্টেশনের সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া একবারও ঘটে নাই। ছোট ভাই বোন দুটির যে হয় নাই সে ত বলাই বাহুল্য। প্রথম বিদেশ-যাত্রার অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের কথা রণু সকাল-সন্ধ্যার মধ্যে এক নিমিষের জন্যও কাহাকেও জানাইতে ভুলে নাই। রণুর প্রথম ট্রেনে চড়ার মত জরুরি খবরটা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক মানুষের একটা অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় এ সম্বন্ধে রণুর নিজের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাহার সহযাত্রিণী দিদি দুইটি ভাইটিকে এমন একটা গুরুতর কার্য্যে উৎসাহের পরিবর্ত্তে বাধা দিতেই বেশী উৎসুক। সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াই রণু ছুটিতেছিল ভোলা টুবা প্রভৃতি বন্ধুদের রয়টারের কাজে লাগাইতে, তা না বড়দিদি বলিল, "ছিঃ রণু, একটা কথা শুন্‌তে-না-শুন্‌তে বাইরে রটিয়ে আস্‌তে ব্যস্ত কেন? এর মধ্যে কত কি হতে পারে, হয়ত যাওয়া নাও হতে পারে।" রণু ভাবিতেছিল, যাওয়া এত দিন হয় নাই, এবারও যদি না হয় তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু সম্ভাবনাটা থাকিতে কোন্ বুদ্ধিমান নিজের গৌরব বৃদ্ধির এমন সুযোগ ছাড়িয়া দেয়? যাওয়া হয় ত ভালই, না হয় ত এই ক্ষণিক গৌরব যথালাভ। রণুর গভীর আত্মচিন্তায় বাধা দিয়া অরুণা আসিয়া বলিল, "সত্যি ত! ষ্টেটস্‌ম্যানে খবর পাঠাতে ভুল হয়ে গেছে! শেষে রণু চলে গেলে কল্‌কাতা সুদ্ধু লোক কাজকর্ম্ম ফেলে ডিটেক্‌টিভ নিয়ে ওর খোঁজ করে বেড়াক আর কি! যা যা চট্ করে এই বেলা বলে আয়।"

রণু অত্যন্ত চটিয়া গাল ফুলাইয়া বলিল, "যতটা ঠাট্টা মনে কর্‌ছ ততটা নয়! তোমাদের মত সবাইকে মনে কোরো না।"

অরুণা বলিল, "তা আর বল্‌তে! লাটসাহেবকে রাতারাতি বর্‌খাস্ত করে রণুকে কাজে বহাল করার প্রস্তাবটা কে না শুনেছে?"

এবারে রণু নিতান্তই অবজ্ঞাভরে হাসিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না তাহাদের নিজের মূল্য বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আজ তাহার মোটেই ছিল না। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দেওয়া, সব কাজকর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া যাওয়া, এগুলাও ত অন্ততঃ এই কয়দিনের মধ্যে করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার উপর অকর্ম্মা দিদিদের অসংখ্য ফর্‌মাস্ খাটা ত আছেই। এখন আবার আরও বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন

একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি, তাই ম্যানসপলিটির বাজারটা বাক্সে পুরিয়া লইয়া যাইবার কল্পনায় রণুর দিদিমা ত রণুকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

তারিণীকান্ত বৃদ্ধ বয়সে নূতন করিয়া উঠিতে বসিতে শিখিবার দশ বার দিনের মধ্যেই যাত্রা সুরু হইল। তাঁহাকে এখনও রোগী বলাই চলে। কাজেই রণু এই অল্প বয়সে তিনজন মানুষের অভিভাবকত্বের গুরুভারে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। বিদেশে ঔষধ-পত্র সঙ্গে রাখা, ট্রেনে খাবারের চুবড়ি ছাড়া সব-কিছু বেচে দেওয়া এবং প্রত্যেকের টিকিট নিজের নিজের কাছে রাখা সম্বন্ধে নবলব্ধ তথ্যগুলি যে উপদেষ্টার মত যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে দিদিদের বুঝাইয়া দেওয়া এখন তাহারই অবশ্য কর্ত্তব্য- এ কথা রণু ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। ষ্টেশনে যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠার পর সে করুণাকে টাকার ব্যাগটা ভাড়াটে গাড়ীতে ফেলিয়া না যাইতে ভাল করিয়া বলিয়া দিল। কারণ তাহা হইলে টিকিট করা শক্ত হইবে। অরুণা যেন রাজগঞ্জ ষ্টেসনে ঘুমাইয়া না পড়ে সে কথাও তাহাকে মনে করিয়া দিতে রণুর ভুল হইল না। রণু গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল, "দেখ, এ তোমাদের ছ্যাকড়া গাড়ী নয় যে যত খুসি বোঁচকা বে, ঘটা রে, করে একটা একটা নামাবে আর গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে। এক ষ্টেশন আগের থেকে সব জিনিষপত্র নামিয়ে দরজার কাছে জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, গাড়ী থামতে-না থামতে হেঁচকা টানে জিনিষপত্র মানুষ সব নামিয়ে ফেলবে।"

অরুণা বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোর feeding bottleটা তুই শক্ত করে ধরে রাখিস ত! আর-কিছুর ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।"

ভাবিতে বারণ করিলেও সারাপথ উচ্চকণ্ঠে ভাবিতে ভাবিতেই রণু ষ্টেশনে পৌঁছিল। ভাবনাটা সবই ঠিকমত হইয়াছিল, কেবল কাজের বেলা টিকিট কিনিয়া নোটের টাকা একটা কম আনিয়া বেচারা বড় লজ্জা পাইয়াছিল। অরুণা ঠাট্টা করাতে রণু সত্য কথাই বলিয়া ফেলিল, "বাবা, মেমসাহেবরা যা দশঘণ্টা ধরে হিসাব করে আর উড়েরা পিছন থেকে ধাক্কা মারে, ওতে কি কারুর মাথা ঠিক থাকে?"

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝকঝকে গাড়ীগুলি বাদ দিয়া গাড়িয়া থাকিতেও যে কেন তাহাদের তৃতীয় শ্রেণীর অসংখ্য যাত্রীর আজন্মের আবর্জ্জনা-মাখা যে দুর্গন্ধ হাঁ করিয়া থাইয়া শরীর মন পুলকিত করিয়া তবে ছাড়ে সেই সৃষ্টির জন্য বিধাতাকে সারা পথ দোষ দিতে দিতে যাইতে হইবে রণু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভাবনার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ইঞ্জিন সামনের দুটা গাড়ী ও যাত্রী-ঠাসা বড় বড় লোহার খাঁচাগুলা একসঙ্গেই টানিয়া লইয়া চলিল। রাজগঞ্জ আসিতে আর সাত গুলি বিরাট বপুর ধাক্কায় ও উচ্চকণ্ঠের কোলাহলে তার ক্ষীণ দেহের উৎসাহ প্রায় নিভিয়া আসিয়াছিল। সে বৃদ্ধ দাদামহাশয় ও অকর্ম্মা দিদিদের সাহায্যে কুলি মজুর ডাকিয়া সে কোনো-প্রকারে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইল।

ছোট্ট ষ্টেশনটিতে কুলি-মজুরের ঘটা ত ছিলই না, তাহার উপরে দুই-একজন যদিও বা ছিল তাহারা তাহাদের বেশভূষা দেখিয়া কে কুলি কে যাত্রী বোঝা কঠিন। সকলেরই গায়ে তেলচিটে মার্কিনের জামা, মাথায় [redacted] আর হাতে পোঁটলাপুঁটলি হুঁকো ধামা কলসী। [redacted] একটা লোক যে নিতান্তই কুলি তা তাহার [redacted] মজুরি প্রত্যাখ্যানের বিষম আস্ফালনেই বোঝা যাইতে ছিল। যাত্রী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কমলালেবুর ঝুড়ি, জিলাপীর সের চেঙারি, পাথুরে চুনের হাঁড়ি, পানের ডোঙা, নারিকেলের খুরি, নারকেল দড়ির বোঝা, তরকারির ধামা, ময়লা কাপড়ের আলাদা আলাদা গাঁঠরি, ভাঙা ও আস্ত ছাতা প্রভৃতি এক মণ হইতে একতোলা ওজনের [redacted] রকমের একুশটি জিনিষ ওনিয়া লইয়া একজন হাসি গাঁঠ হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া [redacted] ছিলেন। কুলি সেলাম করিয়া দুই হাত পাতিয়া চার পয়সা পাইয়াও খুসী না হইয়া বাবুর চতুর্দ্দশপুরুষ [redacted] দিয়া জিনিষগুলির ক্ষণভঙ্গুরতা আকৃতি প্রকৃতি [redacted] সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা করিল। বাবু মুখ ফিরাইয়া সমস্ত [redacted] একটা কথারও উত্তর না দিয়া আবার একবার টাকাটা [redacted] দিয়া কুলির হাতে নগদ একটি আধলা দিয়া [redacted] "হয়েছে বাবু, আর জ্বালাস্ নে, যা।"

কুলিটা অত্যন্ত হাসিয়া "ঢের ঢের বাবু দেখেছি, [redacted]

কিস্সিন কথ্খুনো দেখিনি," বলিয়া বাবুকে শুনাইয়া নামিয়া গেল। কুলির রসিকতায় অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া রণু যখন হাসিতে ব্যস্ত, তখন অরুণা হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি, দেখ, দেখ, আর-একজন নতুন-রকমের কুলি দেখ। একেবারে modern কুলি।"

করুণা দেখিল শ্যাওলারঙের ফ্লানেলের পাঞ্জাবীর উপর পদ্মলতা পাড়ের শাদা শাল গায়ে দিয়া একটি যুবক ছুটিয়াছে, তাহার মাথার চুলগুলা কতক চোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কতক শূন্যে উড়িতেছে। একহাতে তাহার টাট্‌কা গাওয়া ঘিয়ের কালো কুচ্‌কুচে একটা ভাঁড় আর এককাঁদি কাঁচকলা। কলার আঠা দামী শালের উপর টপ টপ করিয়া পড়িতেছে। আর একহাতে কানের ভিতর দিয়া দড়ি চালানো মস্ত একটা মাছ, একটা দড়িতে গাঁথা লাল আর শাদা বাঁশে বোনা পাঁচটা নূতন ডালা আর লাল গামছায় বাঁধা একটা পুঁটলি। যুবকের পিছনে চওড়া লাল পাড়ের মোটা খাটো শাড়ী পরিয়া উবু-খোঁপা বাঁধিয়া একটি গ্রাম্য মেয়ে ছুটিয়াছে। দৌড়ানোর বেগে তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে, কানের সার মাকড়ি ও হাতের [redacted]ভরা চুড়ি বাজিয়া বাজিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। মেয়েটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেবলি বলিতেছে, "হেঁই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় গাড়ীতে তুলে দাও।" গাড়ীতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাটা চাক্ষুষ দেখিয়াও তাহার অনুরোধের বিরাম নাই। গাড়ীতে ওঠা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যখন আর কোনোই কারণ রহিল না, তখন মেয়েটি বলিল, "বেঁচে থাক বাবা, আজ্জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে।" এমন কন্যাগর্ব্বে কিছুমাত্র গর্ব্বিত কি পুলকিত না হইয়া যুবক গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া আবার উল্টামুখে ফিরিয়া চলিল।

এতক্ষণ তাহার মুখটা করুণার চোখে পড়ে নাই, সেও যাত্রীদের মধ্যে এ সহরে দলটিকে দেখে নাই। তার মুখ দেখিয়াই অরুণা বলিল, "বাঃ, সভ্য কুলিটি ত মন্দ দেখ্‌তে নয়!"

করুণা মুখে বলিল, "আঃ, চুপ কর্, শুন্‌তে পাবে।" এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "একে আমি নিশ্চয় কোথায় দেখেছি।"

যুবক করুণাদের ঠিক সাম্‌নে দিয়াই চলিয়া গেল। করুণাদের সে খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছিল বলিয়া অত-গুলা মানুষকে না দেখার ভানটা বেশী আড়ম্বর করিয়া দেখাইতে বাধ্য হইল। শূন্যের দিকে পরম গম্ভীর মুখে তাকাইতে তাকাইতে সে টিনের ছাউনিটার তলায় গিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে করুণা অনেক কষ্টে মাথা ঘামাইয়া ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে যে সম্ভবত এই ভদ্রলোকটির চেহারাই সে শতদলের ছোটমামার ছবিতে দেখিয়াছে।

ইতিমধ্যে ষ্টেশনের কালো রেলিঙের দরজা ঠেলিয়া একজন ঘোর কৃষ্ণ সদাহাস্যময় প্রৌঢ়মূর্ত্তি ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। করুণার দিকে তাকাইবা মাত্র তাঁহার হাসিমাখা মুখখানা একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। চেষ্টা করিয়া গোল-গাল মুখখানাকে কিঞ্চিৎ লম্বা ও আরো গম্ভীর করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া তারিণীকান্তের দিকে তাকাইলেন। বেশীক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকা বোধ হয় তাঁহার পক্ষে একটা শক্ত পরীক্ষা ছিল। তারিণীকান্তকে দেখিয়াই খুব হাসিয়া মাথাটা হাতদুই নীচু করিয়া নমস্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "এই যে আপনারা এসেছেন। বড় দেরী হয়ে গেল আমার, আরো অনেক আগেই আসা উচিত ছিল। বিদেশ-বিভূঁই। হ্যাঁ, ওর নাম কি, আপনিই ত হলেন গিয়ে তারিণী-বাবু?"

তারিণীবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি গোপেশ-বাবু? এইটি আমার নাত্‌নী করুণা।"

গোপেশবাবু করুণার দিকে পাশ ফিরিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আমি বুঝেছি।" তারপর সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বলিলেন, "আপাততঃ, মা-লক্ষ্মীরা এই দরিদ্রের বাড়ী উঠে একটু জিরিয়ে নিলে হয় না?"

তারিণীকান্ত বলিলেন, "এখানে আর আমাদের মতা-মতের অপেক্ষার কি দর্‌কার। আপনি যে পথ দেখাবেন সেই পথেই চলা ভিন্ন গতি কি?"

গোপেশবাবু হাসির ছটায় মণ্ডিত মুখখানিতে তিন চার থাক গভীর বলিরেখা ফুটাইয়া জোড়করা হাত-দুখানি বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আ হা, হা, বলেন কি? আপনার মত মহাজন ব্যক্তি অনুগ্রহ করে আমার

বাড়ীতে পদধূলি দান করবেন বই ত নয়! সাধুসঙ্গ বড়ই মধুর, বড়ই মধুর।"

মনে মনে সাধুসঙ্গের মাধুরী ধ্যান করিতে করিতে গোপেশবাবুর চোখ বুজিয়া আসিল, মুখের হাসি আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গোপেশবাবু মিনিটদুই তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। রণু দিদিকে ঠেলা দিয়া বলিল, "দিদি, আমি গাড়ী ডাকতে যাচ্ছি; আর কতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে ছেঁচ্‌কিপোড়া হব।"

গোপেশ-বাবু চমকিয়া বলিলেন, "আরে সে কি কথা! এই যে যাই গাড়ীখানা ডেকে আনি, আগে ঠিক করে রাখি নি, বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। বেশ বলেছ বাবা, ছেঁচ্‌কি পোড়াই বটে। অমৃতং বাল-ভাষিতম্। বড়ই মধুর!" রণুর মুখের দিকে তাকাইয়া মিনিট খানেক প্রশংসাদীপ্ত হাসিতে আপনি বিভোর হইয়া গোপেশবাবু গাড়ী ডাকিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন। দুই পা অগ্রসর হইতে-না-হইতে হঠাৎ থামিয়া আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে কাহাকে যেন আপ্যায়িত করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ, বেশ! এই ত মানুষ। বড়ই পরিতৃপ্ত হলাম।"

করুণারা সদলবলে ফিরিয়া দেখিল অরুণার modern কুলি আখ্যাধারী যুবকটি নিতান্তই সাধারণ মানুষের মত মালগুদাম হইতে কতকগুলা ভারী ভারী জিনিষ খালাস করিতেছে। মনুষ্যত্বের এরকম নিদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহারা আরো কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় সেইদিকেই মন দিয়া দেখিতে লাগিল। যুবকটি গোপেশবাবুর উচ্ছ্বাসে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, আমার নিজেরও কাজ ছিল, নিছক পরোপকার নয়।"

গোপেশবাবু হঠাৎ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "দেখ হে! গাড়ী ত আগে থেকে বলে না রাখলে পাওয়া দুষ্কর। ইস্কুলের এঁরা সব এসে পড়েছেন! এখন কি ব্যবস্থা করা যায়? বড়ই চিন্তার কারণ।"

যুবকটি বলিল, "তা আর কি হবে? জিনিষ খালাস করার জন্যে আমি একটা গরুর গাড়ী এনেছিলাম। সেইটাই আপাতত কাজে লাগান। ব্ল্যাকবোর্ড আর গ্লোব ম্যাপ না হয় আর-একদিন গুদামে থাকতে পারে, শিক্ষয়িত্রীকে ত বাড়ী পৌঁছে দেওয়া চাই।"

গোপেশ-বাবু যুবকের পিঠে সজোরে দুই তিন ঘা দিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। ঠিক বলেছ, শিক্ষয়িত্রীকে ত আর গুদামজাত করা যায় না! বড়ই নিশ্চিন্ত হলাম। এস, এস, তারিণীবাবুর সঙ্গে আলাপ করে দি।"

গোপেশবাবু যুবকের গলা জড়াইয়া টানিতে টানিতে সকলের মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তারিণীবাবু, ইনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের সুপ্রকাশ রায়। বড়ই উৎসাহী যুবক। মধুর প্রকৃতি। সম্প্রতি এদিকে বেড়াতে এসেছেন।" সুপ্রকাশ নমস্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে গোপেশবাবু ও হাতজোড় করিয়া আবার নমস্কার করিলেন।

তারিণীকান্ত বলিলেন, "ওহো, একে ত আমি অনেকবার দেখেছি। তুমি না অবিনাশের ছোট ভাই?"

সুপ্রকাশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তারিণীবাবু তাঁহার প্রথামত তৎক্ষণাৎ সকলের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। গোপেশবাবু যথাসম্ভব গম্ভীর ও ক্লিষ্ট মুখ করিয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারিণীকান্ত বলিলেন, "কি উপলক্ষে আসা হয়েছে?"

সুপ্রকাশ বলিল, "উপলক্ষ করিনি, অমনিই এসে পড়েছি।"　　(ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

তৈজসের ইতিহাস

এই থালাখান দাদুর বিয়ের দানের সময় পাওয়া,
ওর ওপরই কর্ত্তা-মায়ের বিশেষ ছিল দাওয়া।
হাত হতে ও পড়্‌লে কারো সইত না'ক তাঁর,
তোরঙ্গেতে তুল্‌তে যেতেন দিনেই শতেক বার।

(২)

গয়াধামের এই 'গয়েশ্বরী', বৃন্দাবনের বাটি,
পয়মন্ত জিনিষ বড় যায়নি আজও ফাটি'।
লক্ষ্মীছাড়া 'গামলাখানা' দাল ঢালা হয় যাতে,
আস্‌লো আহা ভাগ্যহীনা খুড়িমায়ের সাথে।

(৩)

'বাঁট্‌নো'টি হায় দাদুর মায়ের সাধের পায়েস রাঁধা
দুষ্ট রাখাল লুকিয়ে নিয়ে পরকে দিলে বাঁধা।
হয় যে বাবার অন্নপ্রাশন ধুমধামেরি সাথ—
এই 'বাগ থাল' এতেই বাবা প্রথম খেলেন ভাত।

(৪)

'বোগ্‌নো'টি ওই বেশ যে মনে পড়্‌ছে আজি মোর
চৌধুরীদের মধ্যমেরি বিয়ের বিলানর।
তৈলভরা ঐ বোগ্‌নো, মিষ্টিভরা ঠোলা—
অনেক দিনের কথাই বটে, যায় না তবু ভোলা।

(৫)

ডুব্‌ড়ে-যাওয়া দাগধরা ঐ 'গঙ্গাজলী ঘড়া'
মায়ের হাতে পড়্‌লো কুয়োয় টান্‌তে গিয়ে দড়া।
তখন তিনি দশ বছরের নবসতের কনে
কেঁদেছিলেন কুয়োর ধারে বিপদ মহা গণে'।

(৬)

[redacted]-কাটা ওই 'পানের বাটা' ফুলশয্যার দান,
বার বাবার ঠাকুর-মা যে সাজ্‌তো ওতেই পান।
খাগ্‌ড়ায়ে ঐ 'পানের ডিপা' ময়লাধূলামাখা
দেখ্‌লে চোখে জল যে আসে, কাকার স্মৃতিমাখা।

(৭)

প্রকাণ্ড ঐ 'পুষ্পপাত্র' বা'র করিতে মানা,
এই পিটারই 'বাস্তু-যাগের জন্য প্রথম আনা'।
মুখ-আঁটা ঐ 'কমণ্ডলু' যত্নে দিছি রেখে,
আন্‌লেন ওটি জেঠাই-মা যে বদ্‌রীনারাণ থেকে।

(৮)

ঘরের প্রতি-তৈজসেতে রাং-ঝালেতে ওর
লেগেই আছে কতই গত উৎসবেরই জোড়।
কাঁসারী হায় বদ্‌লে নিতে আস্‌ছে প্রতি মাস,
গৃহস্থালির তাম্রলিপি, নিত্য ইতিহাস।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বাঙ্গলায় একারের উচ্চারণ

সংস্কৃতে একারের এক দীর্ঘ উচ্চারণ ছিল। তেলেগু ভাষায় একার ও ওকার দুই প্রকারের আছে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। শুধু উচ্চারণ বলিয়া নয়, দুই প্রকারের পৃথক অক্ষর আছে। পালি ও প্রাকৃতে সংস্কৃত পদ-পরিবর্ত্তনের একটা সাধারণ নিয়ম আছে—কোন বর্ণ যুক্তবর্ণ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর হ্রস্ব হইত। যথা সং কার্য্য, প্রাং কজ্জ ; সং কীর্ত্তন, প্রাং কিত্তন। এ নিয়মটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পরে যুক্তাক্ষর থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী একার এবং ওকারের হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। যথা সং পিণ্ড, প্রাং পেণ্ড ; সং পুষ্কর, প্রাং পোক্‌খর। এই দুইটি উদাহরণে একার ও ওকারের হ্রস্ব উচ্চারণ হইয়া থাকে ; পরে যুক্তবর্ণ আছে বলিয়া একটু জোর পড়িবে, কিন্তু দুইমাত্রাকাল স্থায়ী হইবে না। বাঙ্গলায় যে প্রাকৃতের অনুরূপ একার ও ওকারের হ্রস্বদীর্ঘ দুই প্রকারের উচ্চারণ আছে, তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না ; কিন্তু দুই-একটি উদাহরণ দিলে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। "খাও" বলিলে ওকার হ্রস্ব ও একমাত্রা, যেন হসন্ত ও্। পুরাতন বাঙ্গলায় অনেক পদের শেষে একার থাকিত ; সেগুলি হ্রস্ব একার। যথা—

ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।

আমরা বর্ত্তমানে সেরূপ পদান্ত একার স্থানে য় লিখি এবং সেইরূপ উচ্চারণ করি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমরা বাঙ্গলায় যে একারের য়্যা উচ্চারণ বা বাঁকা উচ্চারণ করি তাহাই একারের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং সংস্কৃত শব্দের যে-সকল একার উচ্চারণ করি তাহা একারের দীর্ঘ উচ্চারণ।

(১) খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের যেখানে দ্বিতীয় বর্ণে দীর্ঘস্বর আ কিংবা ও থাকে সেখানে পূর্ব্বের একারের হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। যথা—একা, দেখা, দেখো, খেলা।

(২) পরে হ্রস্বস্বর থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী একারের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যথা—দেখিস্, ফেলি, একটি, একটু।

(৩) ই+আ মিলিত এ দীর্ঘ। যথা—বেগুনে, হল্‌দে, মেটে।

(৪) একস্বরবিশিষ্ট পদের একার দীর্ঘ। যথা—যে,

সে, নে। কিন্তু পরে হসন্তবর্ণ থাকিলে একারের হ্রস্ব উচ্চারণ হয়,—দেখ্, ফেল্। আবার কোন কোন শব্দের একার সংস্কৃতের প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘ, কিন্তু মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে হ্রস্ব। যথা—সং তৈল, দঃ-বাং তেল্, উঃ-বাং ত্যাল্। হর্ণলে সাহেব বলেন বেহারে একারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় উচ্চারণই এ,—একটি এক মাত্রা, অপরটি দুই মাত্রা। নিয়মটি অবশ্য খাঁটি দেশীয় শব্দেই প্রযোজ্য। তিনি বলেন, "উপান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী একারের হ্রস্ব উচ্চারণ হইয়া থাকে।" যথা, বেটিয়া। কিন্তু একস্বরবিশিষ্ট শব্দের একার দীর্ঘ। যথা—জে।

বাঙ্গলা দেশে কাটোয়া মহকুমা, বীরভূমের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ, বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ ও বাঁকুড়া জেলার উত্তরাংশে বাঙ্গলার বাঁকা বা হ্রস্ব উচ্চারণ এখন প্রায় নাই। "হইয়াছিল" এই কথাটির প্রাচীন রূপ "হএছিল", দক্ষিণাঞ্চলের কথিত রূপ "হোএছিল", মুর্শিদাবাদের উত্তরাঞ্চলে "হোয়্যাছিল"। উত্তর-বঙ্গের কথিত রূপের সহিত আমি পরিচিত নই, কিন্তু পাবনার জনৈক অল্পশিক্ষিত ভদ্রলোকের কথায় "হইয়া"র কথিতরূপ "হয়্যা" শুনিয়াছি। আমার মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গেও ক্রিয়ার অন্ত্য একারের হ্রস্ব বা বাঁকা উচ্চারণ প্রচলিত আছে। যথা "করিয়া"র কথিত রূপ "কোর্য্যা", কিন্তু ইহা অনেকটা "কোর্‌য্যা"র মত শোনায়।

আমার অনুমান হয় "করিয়া"র উচ্চারণ পূর্ব্বে ঠিক "কোরিআ" ছিল না, শেষের "য়া" অনেকটা বাঁকা বা হ্রস্ব একারের মত উচ্চারিত হইত। "করিলাম"এর কথিত রূপ দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোথাও "কোল্লেম"; কিন্তু মুর্শিদাবাদের উত্তরে "কোল্ল্যাম"; এখানেও একারের হ্রস্ব দীর্ঘ দুই উচ্চারণই বর্ত্তমান।

বেহারের অন্তর্গত গয়ার "পেড়া"র একার উচ্চারণে হ্রস্ব কি দীর্ঘ এখন ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু বাঙ্গলায় আসিয়া তাহা "প্যাড়া" হইয়াছে।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

সাঁঝাই

সাঁঝে আজ কিসের আলো!
ভুলালো মন ভুলালো!
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়!
আলোতে ডুবিয়ে আঁখি
পুলকে ডুব্‌তে থাকি!
হুবহু সোনার ফাঁকি
ঝুরুঝুর্ হাওয়ায় খেলায়!
মরি, কার পরশ-মণি
গগনে ফলায় সোনা!
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি।—
অজানার আনাগোনা!
সোনালি জর্দ্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি
নিথরের পর্দ্দা ঠেলি'
উদাসে আঁচল হেলায়!

ধ'রে রূপ জর্দ্দা আলোর
ঝরে কার রূপের আতর!
নয়নের কার্ব্বা যে মোর
ছাপিয়ে ঢেউ খেলে যায়!
নলিনীর ক্লান্ত ঠোঁটে
অবেলায় হাসি ফোটে!
গহনে স্বপন-কোটে
সেফালি চোখ মেলে চায়!
অলকার রত্নাগারে
ঢুকেছি হঠাৎ যেন!
ডুবে যাই চমৎকারে!
সায়রে শিশির হেন;
আঙুলে হিঙুল নিয়ে
ফেরে কে মেঘ রাঙিয়ে!
গোপনের কিনার দিয়ে
পারিজাত-ফুল ফেলে যায়

বলি, ও স্বর্গনদী!
বিলালে স্বর্ণ যদি,
তবে কি এই অবধি?
এসো আর-একটু নেমে;
থেক না আধেক পথে,
এসো গো এই মরতে,
অতসীর এই জগতে
প্রতিমার কপোল ঘেমে!
মরতের কুঞ্জগেহে
ঝ'রে যে যায় গো চাঁপা,
তারা রয় তোমার দেহে,
সে বরণ রয় কি ছাপা?
ধরণী সাজ্‌ল ক'নে
যে আলোর সুচন্দনে
সে আলোর আলোক-লতা!
থেক না শূন্যে থেমে।

ফুলেরা তোমায় সাধে,
সুবাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে,—
থেক না বধির হ'য়ে,
এসো গো অরূপ হ'তে
মূরতির এই মরতে,
আঁখা দাও আলোর রথে,—
ডাকে প্রাণ অধীর হ'য়ে।
থেক না আবছায়াতে
কিরণের হিরণ-মায়া?
প্রদোষের পক্ষপাতে
থেক না লুকিয়ে কায়া,
তোমারি মূক আরতির
কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
দ্যুলোকের মৌন দু'তীর
উঠেছে মদির হ'য়ে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কষ্টিপাথর

মুসলমান যুগ হইতে কি পাইয়াছি।

(১) প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, আকবর হইতে মুহম্মদ শাহ পর্য্যন্ত প্রায় দুই শত বৎসর ভারতের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ ভিন্ন এই মধ্য-ভূখণ্ড একচ্ছত্র রাজার অধীন ছিল; খণ্ডরাজ্যের অহরহঃ সংঘর্ষ, আভ্যন্তরিক অশান্তি, ধনজনক্ষয় এই কালের জন্য প্রায় তিরোধান করিয়াছিল। প্রায় সমগ্র ভারত নিজ রাজনৈতিক একতা অনুভব করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর এরূপ হয় নাই; কারণ আওরংজীবের ভারতীয় সাম্রাজ্য অশোক বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীন ভারত অপেক্ষা আয়তনে অনেক বৃহৎ এবং অধিক মাত্রায় কেন্দ্রীভূত। অশোকের সাম্রাজ্যে প্রত্যেক প্রদেশ নিজের পুরাতন পরিচিত শাসনপদ্ধতি অনুসারে চলিত, নিজ স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিত, নিজের জীবন পৃথক পথেই যাপন করিত; শুধু রাজধানী হইতে রাজপ্রতিনিধি ও রাজসেনাপতি আসিয়া সকলের উপরে বসিতেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যে—কাশ্মীর হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া ২০টি প্রদেশ ঠিক এক শাসন-পদ্ধতি, এক সরকারী ভাষা, এক শ্রেণীর মুদ্রা, একই প্রকার পথের ও পত্রের ডাকের বন্দোবস্ত চলিত এবং হিন্দু পুরোহিত ও কৃষক ভিন্ন অপর সমস্ত সামাজিক শ্রেণীর অল্প বিস্তর উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারিত।

এই রাজনৈতিক একতা যে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দু সামন্ত রাজগণ এমন কি স্বাধীন মারাঠা রাজাও মুঘল শাসনপদ্ধতি, কর্ম্মচারীদিগের নাম ও কার্য্যবিভাগ, রাজসভার আদব কায়দা এবং মুদ্রা অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা ফার্সী বা উর্দ্দু ভাষা ব্যবহার করিতেন না।

(২) মুসলমানদিগের নিকট হইতে আমাদের দ্বিতীয় লাভ ঐতিহাসিক সাহিত্য। হিন্দুরা দিন রাত পরমার্থ চিন্তায় ব্যস্ত, এই জগৎ-রূপ পান্থশালার সংবাদ রক্ষা করিতে তাহারা ঘৃণা করে। তাই সংস্কৃতে অসংখ্য উচ্চশ্রেণীর দর্শন গ্রন্থ আছে, ইতিহাস একখানিও নাই। আছে শুধু চার খান ঐতিহাসিক জীবনী, আর তাহাও ইতিহাস নামে প্রচ্ছন্ন কাব্য; তাহাতে ভাষার আবরণে ভাব লুকাইয়াছে, তারিখ ও ঘটনা কথার তুলনায় অতি কম।

আরবের বুদ্ধি খুব হিসাবী, সংযত, শুষ্ক বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যাহার বিষয়েই লিখুন না কেন, প্রথমে ঘটনাগুলির একটি কালানুযায়ী কাঠামো প্রস্তুত করিয়া, তারিখ দিয়া ঠিক পূর্ব্বপরক্রমে সাজাইয়া তবে বর্ণনা করিতে বসেন।

এজন্য মুসলমান ইতিহাসের আর যাহাই অভাব হউক না কেন, তারিখের কোন অভাব নাই।

(৩) তৃতীয় ফল এই যে, মুঘল বাদশাহগণ এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন মুসলমান সুলতান ভারতবর্ষের সহিত ভারত-বহির্ভূত জগতের সংশ্রব আবার স্থাপিত করেন। বৌদ্ধ যুগে ভারতবাসীরা "এক-ঘরে কোণঠেসা" ছিল না; কত বিদেশীয় জাতি—চীন, তিব্বতী, সিংহলী, শক, হূন, পার্থিব, বাল্‌হীক, যবন (অর্থাৎ গ্রীক বা আইওনীয়ান), পারসিক,—ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, কত ভারতীয় পণ্ডিত, প্রচারক ও বণিক ঐসব বিদেশে গমন করে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানের পর হইতে ভারতবর্ষ বাহিরের এসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইল; আর ভাবের, পণ্যদ্রব্যের, রক্তের আদান প্রদান চলিল না; আমরা কূপমণ্ডূক হইয়া পড়িলাম।

বিজেতা মুসলমানগণ, রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘরের" ঈশ্বরের দূতের মতন জোর করিয়া ভারতবর্ষের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার গিরি-সঙ্কট দিয়া বৎসর বৎসর সহস্র লোকের স্রোত, বুখারা, সমরকন্দ, বাল্‌খ্‌, খুরাসান্‌, খারিজম্‌ (বর্ত্তমান খীভা) ও উত্তর পারস্য হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে লাগিল। বোলান গিরিবর্ত্ম অবলম্বন করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে দক্ষিণ আফগানিস্থান (অর্থাৎ কান্দাহার) দিয়া দক্ষিণ পারস্যে অসংখ্য লোক যাতায়াত করিত; ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পথে ১৪ হাজার উট বোঝাই মাল বৎসর বৎসর ভারত হইতে পারস্যে বিক্রয়ের জন্য যাইত।

শুধু উত্তর-পশ্চিমের নহে, আমাদের পশ্চিম ও পূর্ব্বের দ্বারগুলিও মুসলমানেরা আবার খুলিয়া দিল; ভারতের শেষোক্ত দুইটি সমুদ্র-কূল হইতে বৎসর বৎসর জাহাজ যাইত কত দেশ বিদেশে—টাটা, বরোচ্‌, সুরট, চউল, গোয়া, কাব্‌ওয়ার [বর্সলুর ও মাঙ্গালোর মুসলমান হস্তে ছিল না] প্রভৃতি পশ্চিম উপকূলের বন্দর দিয়া যাত্রী ও পথিক, বণিক ও কর্ম্মপ্রার্থী সৈনিক, পারস্য, আরব, তুর্কী, মিশর, টুনিস্‌, আবিসিনিয়া, এমন কি জাঞ্জিবার হইতে ভারতবর্ষে আসিত, ভারতের দ্রব্য তথায় যাইত। সেইমত পূর্ব্ব উপকূলের মসুলিপটন ও রাজমহেন্দ্রী হইতে মুসলমান জাহাজ শ্যামদেশ, সুমাত্রা, জাবা, চীন পর্য্যন্ত যাইত; সিংহল ও ব্রহ্মদেশের ত কথাই নাই। এইরূপে ভারতের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ আবার স্থাপিত হইল, যদিও জাতিভেদে পীড়িত হিন্দুগণ এই সুবিধা অতি কম মাত্রায় গ্রহণ করিল।

(৪) চতুর্থ দান—কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং তাঁহাদের দেশীয় চেলারা বলিয়া থাকেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবেই মধ্য যুগে অনেকগুলি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণ- ও জাতিভেদ-বিদ্বেষী উপাসক-সম্প্রদায় হিন্দুদিগের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়ায়,—যেমন রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, দাদু, নানক ও চৈতন্যের দল। আমি কিন্তু এই মতের ভিত্তি দেখিতে পাই না। অতি প্রাচীন কাল হইতে উপনিষদের যুগ, এমন কি তাহারও পূর্ব্ব হইতে সকল হিন্দু সংস্কারক, ভক্ত ও চিন্তাশীল লেখক, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর উপর একমাত্র পরম ঈশ্বরকে চরম উপাস্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে ১২০০—১৬০০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরা একেশ্বরবাদ শিখিয়াছে, এ কথা সত্য হইতে পারে না। আসল কথা এই যে, ঐ সময়ে আমাদের বাড়ীর পাশে একেশ্বরবাদী, জাতিভেদ-হীন, আড়ম্বরশূন্য উপাসনাকারী ও ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ বিশাল মুসলমান সমাজকে দুবেলা চক্ষে দেখিয়া মধ্যযুগের হিন্দুরাও ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, একাকার সমাজে মিলিত, সকল-ভক্তিমার্গাবলম্বী এইসব ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিতে,—মনের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসাহ পাইল।

মুসলমানযুগে কতকগুলি 'পন্থ" অর্থাৎ ধর্ম্মমত হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ঈশ্বরের আসনের সম্মুখে এক করিবার জন্য প্রকাশ্য চেষ্টা করে। যিনি রাম, তিনিই রহিম; আল্লা ও ব্রহ্ম একার্থবাচক দুই শব্দ মাত্র; মুসলমান জোলা কবীরের হিন্দু শিষ্য ছিল, হিন্দু চৈতন্যের "যবন হরিদাস" পদধূলা গ্রহণ করিত,—এগুলি মধ্য যুগের ভারতের ধর্ম্মসামঞ্জস্যের জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহা ত হইল জনসাধারণের কথা, নিরক্ষর সরলচেতা ভক্তমণ্ডলীর কথা। শিক্ষিত ও পদস্থ হিন্দু-মুসলমান একত্র মিলিতেন সুফী-ধর্ম্মের কল্যাণে।

(৫) মুসলমানদিগের নিকট হইতে হিন্দুরা সামাজিক প্রথা ও ব্যবহার, আদব-কায়দা, পরিচ্ছদ ও পাকপ্রণালী শিখিয়াছে।

(৬) ষষ্ঠ দান—শিকার, বাজ্‌পক্ষী দিয়া অন্য পক্ষী মারা, এই রকম খেলা ও ব্যসন একেবারে মুসলমানী প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এইসব বিভাগের শব্দগুলি আরবী ফারসী, না হয় তুর্কী, ইহাই আমার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(৭) সপ্তম দান—ভারতীয় রণনীতি ভারতের বাহিরের মুসলমান জগতের অনুকরণে অনেক পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইল। পূর্ব্বে ত মুসলমান সুলতান ও বাদশাহগণ অতি বিপুল সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, হিন্দু খণ্ড-রাজাদের মত দু'চার হাজার লোক লইয়া নহে, তাহার ফলে বহুসংখ্যক সৈন্য চালনা করার (strategy) জ্ঞান উদ্ভূত হইল; হিন্দু যুগের ছোট দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রণালী (mine tactics) পড়িয়া রহিল।

এই রণনীতির উন্নতি কতকটা যুদ্ধধর্ম্মের ফলেও। ভারতী মুসলমানেরা তুর্কী দেশের দ্বার দিয়া ইউরোপের নব নব আবি- অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশল শিখিতে লাগিল এবং হিন্দু রাজগণও তা যথাসম্ভব অনুকরণ করিলেন। দুর্গ-নির্ম্মাণ-প্রণালীর উন্নতি ইহা জলন্ত দৃষ্টান্ত।

(৮) অষ্টম দান—শিল্পকলা, বিশেষতঃ স্থপতিবিদ্যা ও চিত্রাঙ্কণ

গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা চিত্রাঙ্কণে বাদশাহগণ ভারতকে অধিক ঋণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শত শত বৎসর অযত্নে ও অনাহা অজন্তার চিত্রকরদের বংশধরগণও মৃতপ্রায় মূর্খে পরিণত হইয়াছিল মহামতি আকবর তাহাদের নিজ সভায় ডাকিয়া আনিলেন, তাহাদে বুঝাইলেন যে, আবার প্রকৃত গুণের আদর হইবে। ইহার ফলে তাঁহার সভায় চীন দেশ হইতে বুখারা ও খুরাসান দিয়া আগত চিত্রপ্রণালী ও খাঁটি পুরাতন হিন্দু চিত্রপ্রণালীর আশ্চর্য্য সমাবেশ হইয়া মুঘল কলা Indo-Saracen School of Painting জন্ম হইল। তাহাতে ভারতীয় প্রতিভা আবার আকাশ ছুঁইতে পারিল। এই আমাদের নিজস্ব জিনিষ, বিদেশীর নকল নহে।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

(প্রভাতী হইতে ভাদ্র মাসের সাধনায় উদ্ধৃত)

—

পূর্ব্ববঙ্গে দাসত্ব-প্রথা।

প্রাচীন সময় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে এক-প্রকার দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দাস বা দাস-পরিবার ছিল। কিন্তু ইহারা আফ্রিকা বা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের ন্যায় উৎপীড়িত বা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইত না। ইহারা আপন আপন প্রভুর নিকট হইতে জমি প্রাপ্ত হইত এবং তাহা চাষ আবাদ করিয়া পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই-সকল দাসদিগকে গোলাম বা নফর বলিত। ইহারা আবশ্যক-মত প্রভুর বাটীর ভৃত্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সহায়হীন হইলে যথাসম্ভব আদরের সহিত প্রতিপালিত হইত। প্রভুর বিশ্বাসভাজন হইলে অনেকে উচ্চ পদেও নিযুক্ত হইত। অদ্যাপি অনেক জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে এইরূপ দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এই প্রথা লোপ পাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে এই-সকল দাস শূদ্র নামে খ্যাত। শূদ্রগণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে উপযুক্ত শিক্ষা ও উচ্চপদ লাভ করিয়া অগত্যা জন্মভূমি ত্যাগ করতঃ স্থানান্তরে বসবাস করিতেছে এবং সমাজে আপনাদিগের ন্যায্য দাবী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেহ কেহ উচ্চকায়স্থদিগের সহিত পুত্রকন্যা আদান প্রদান করিয়া কায়স্থ নামে পরিচিত

হইতেছে। যাহারা রীতিমত শিক্ষা লাভ করে নাই, তাহারা কন্‌ষ্টেবল আদালতের পিয়ন বরকন্দাজ সর্দ্দার প্রভৃতির কার্য্য করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কিম্বা প্রচলিত থাকিলেও অনেক দিন হইতে ইহার লোপ হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে একটি কাজ এই ছিল যে, বিবাহের সময়ে মুখচন্দ্রিকা অর্থাৎ বরকন্যার পরস্পর মুখ দর্শন কালে উভয়কে আসনসহ ঊর্দ্ধে উঠাইতে হইত। ইহাকে পূর্ব্বাঞ্চলে পাট ধরা বলে। এই পাট ধরার কার্য্য শূদ্রগণ এক্ষণে অতি হীন ও অপমানজনক বলিয়া মনে করে এবং কেহই ইহা করিতে চায় না। এজন্য এবং জমির মালিকের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় অনেক শূদ্র নান্‌কার জমি হইতে উৎখাত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সেটেল্‌মেণ্টে অনেক প্রজা আপন আপন জমি নান্‌কার লিখিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রজা ও মালিকে বিবাদ হইতেছে এবং অনেকে স্বেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ নান্‌কার জমি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের সময় অথবা ঋণগ্রস্ত হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপনাদিগকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিত এবং যাবজ্জীবন পুরুষানুক্রমে গোলামী অর্থাৎ দাসত্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়া আত্মবিক্রয়পত্র লিখিয়া দিত। দেশের কিরূপ দুরবস্থা ছিল এবং সমাজ কিরূপ হৃদয়হীন ছিল, তাহা এইরূপ দুইখানি দলিল হইতে দৃষ্ট হইবে। ইহার একখানিতে মাত্র ১১ এগারটি টাকার জন্য মুচিরাম নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা, মোট ৫ জন, অপর খানিতে বাসিরাম নামক এক ব্যক্তি ২১৲ টাকা পাইয়া ৩ পুত্র কন্যা সহ ৫জন যাবজ্জীবন ও পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করিতে অঙ্গীকার করিয়া আত্মবিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। প্রথম পত্রখানি ১৯৩ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। উভয় পত্রই ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্বের সময় লিখিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা সেই সময়ের ভাষারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম পত্র।

প্রতিলিপি

৭ই আদি কির্দ্দি সকলমঙ্গলালয়

শ্রীজয়কৃষ্ণ গুহ সুচরিতেষু লিখিতং

শ্রীমুচিরাম চঙ্গ তস্য স্ত্রী শ্রীমতি তপী তস্য পুত্র শ্রীপঞ্চা চঙ্গ ও শ্রীবারু চঙ্গ ও শ্রীরঙ্গিত চঙ্গ কন্যা শ্রীমতি কালিন্দিবালা আপ্ত (আত্ম) বিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা সপরিবারে অন্নরিণ (ঋণ) উপহতি (?) ক্রেমে নগদ মূল্য তোমর স্থানে ১১ এগার রূপাইয়া পাইয়া স্বইচ্ছা পূর্ব্বক আপ্তবিক্রি হইলাম। তোমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব। এহি কারারে আত্ম বিক্রয় পত্র দিলাম। ইতি সন ১১৩৪ চৌত্রিষ তেরিখ ১৬ ফাল্গুণ। এই পত্রের অপর পৃষ্ঠায় সাক্ষীদিগের নাম।

(অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীদিগের নাম)

নিসানসহি

শ্রীমুচিরাম চঙ্গ

শ্রীমতি তপী

শ্রীপঞ্চা চঙ্গ

শ্রীবারু চঙ্গ ও শ্রীরঙ্গিত চঙ্গ

শ্রীমতি কালি চঙ্গ।

ইআদিকার্দ্দ শ্রীশোভারাম গুহ সুচরিতেষু লিখিতং শ্রীবাসিবার শূদ্র ওলদে সাছুরাম শূদ্র ইরফে দেবাই শূদ্র তস্য স্ত্রী শ্রীমতি মাধবী তস্য পুত্র শ্রীরামধন শূদ্র ও শ্রীসদারাম শূদ্র তস্য ভগ্নি শ্রীমতি রতনি কওলা আপ্ত বিক্রি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা [illegible] মহাদুর্ব্বিক্ষে অন্নরিণ উপহতি ক্রেমে আপন আপন সহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার স্থানে নগদ মূল্য পুরণ্ডজন দহমাসি ২১৲ একৈস রূপাইয়া দস্তবদস্ত পাইআ আপ্ত বিক্রয় হইলাম তোমা পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে দান বিক্রির অধিকারি হইআ নফরি দাস্ততা করিব এহি কারারে আপ্ত বিক্রিয় পত্র দিলাম ইতি সন ১১৬১ এগারসও একসাইট তেরিখ ২৫ ফাল্গুণ রোজ শুক্রবার

জায় জিনিস

আরকট ১১৲

দহমাসি ১০৲

২১৲ এহি একৈশ রূপাইয়া পাইলাম ইতি

নিসানসই

শ্রীসদারাম শূদ্র

শ্রীরামধন শূদ্র

শ্রীমতি মাধবি

শ্রীবাসিরাম শূদ্র

শ্রীমতি রতনি

(নব্যভারত, শ্রাবণ) শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

গোলকুণ্ডা ও ওস্‌মান সাগর

যেদিন প্রথমে নিজাম রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদে আসিলাম, সেদিন ভাবিয়াছিলাম গোলকুণ্ডাতে না জানি কত হীরকের আকর আছে, তাই গোলকুণ্ডা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিতে পারি নাই। আধুনিক গোলকুণ্ডা অর্থে এক প্রাচীন গিরিদুর্গের ধ্বংসাবশেষ, কুতুবশাহী বাদ্‌শাদের সমাধিশ্রেণী, ও তাহার পাশের সামান্য গ্রামমাত্র বুঝিতে হইবে। কিন্তু এককালে এই দুর্গের চারিদিকে এক অতি জনাকীর্ণ ও ধনবান নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন দ্রবিড় বংশীয় হিন্দু নরপতিরা কখন বা স্বাধীনভাবে, কখন বা আশী মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ওয়ারঙ্গলের রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। এই ওয়ারঙ্গলের রাজারা এককালে বিজয়ী সৈন্য লইয়া উত্তর-ভারতে গঙ্গাতীরে জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। একজন রাজা কনোজপতি শ্রীহর্ষের সহিত সীমানা লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন; আর-একবার ইহাদের বিজয়ী সৈন্য নাকি পুষ্পপুর (পেশোয়ার) পর্য্যন্ত জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আসিয়াছিল। তখন গোলকুণ্ডার মত অজেয় দুর্গ এ অঞ্চলে ছিল না, ইহাকে দাক্ষিণাত্যের চিতোর বলিত। এখনও বিদেশী

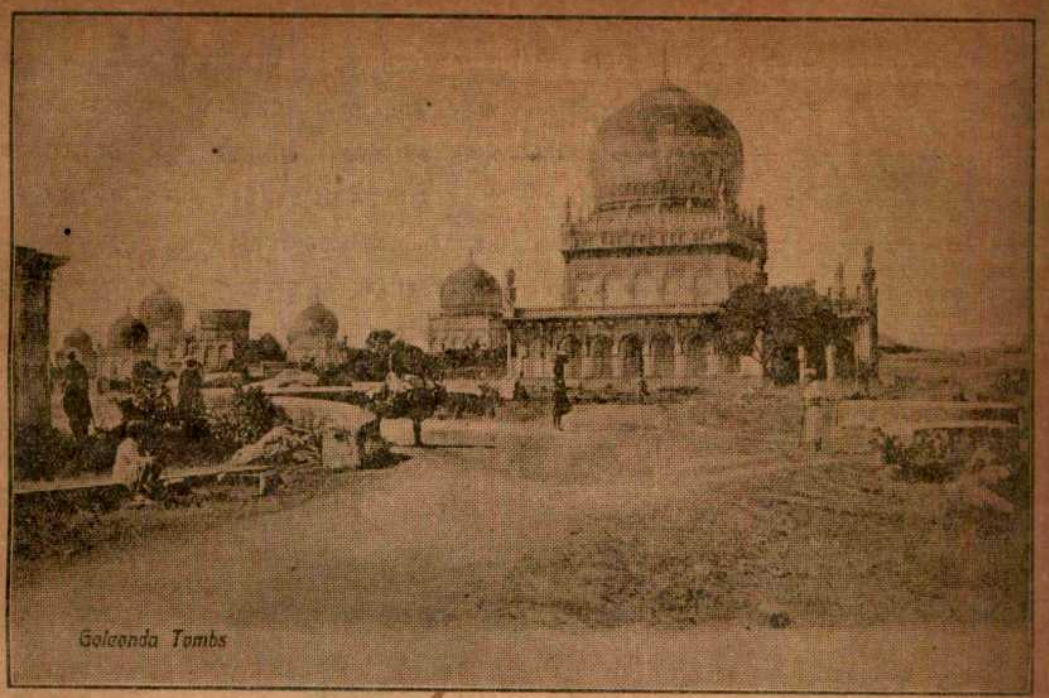

গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বাদ্‌শাদের কবর।
ছবির বাম দিকের মাঝামাঝি জায়গায় একটি অসমাপ্ত অর্দ্ধগুম্বজ শেষ বাদ্‌শা তানা শাহের গোরস্থান।

ভ্রমণকারীরা দুর্গের হস্তশ্রী "মোতিমহল" ও "বালাহিসার" ছাদে উঠিয়া দুর্গের চারিদিকের কৃত্রিম পাথরের প্রাচীর ও অল্পদূরবর্ত্তী প্রকৃতি-নির্ম্মিত গ্রানাইট (এক রকমের লাল বেলে পাথরের) গিরিশ্রেণীর প্রাচীর দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। গোলকুণ্ডা দুর্গের শেষ যুদ্ধ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হইয়া গিয়াছে; তখন, কূটবুদ্ধি রণ-পণ্ডিত বৃদ্ধ মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেব স্বয়ং নয় মাসের অক্লান্ত চেষ্টাতেও সম্মুখ-সমরে দুর্গজয় করিতে অক্ষম হইয়া গোপনে অর্থবলে গোলকুণ্ডা দুর্গের এক খিড়্‌কি-রক্ষককে বশীভূত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মত প্রবীণ রণ-দক্ষ বীরও স্বীকার করিয়াছেন যে এই ক্ষুদ্র সেনাপতি—আবদুল্লা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শেষ রাত্রে কুমার মুঅজ্‌জমকে সৈন্য সহ অবাধে দুর্গে প্রবেশ করিতে না দিলে স্বয়ং-সম্রাট-পরিচালিত অগণিত মোগলবাহিনীকেও পরাজয় স্বীকার করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রাতে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—কুতুবশাহী বংশের শেষ নরপতি—তানাশাহ—আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহাকে দৌলতাবাদের দুর্গে বন্দী করিয়া পাঠান হয়; এই ঘটনার পর ২৩২ বৎসর গত হইয়াছে, আর কোন যুদ্ধ হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবারও সম্ভাবনা এখন দেখা যায় না।

গোলকুণ্ডার আদি দুর্গ কোন্ কালে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ১৫।১৬ শতাব্দী পূর্ব্বে নগর ও দুর্গের অস্তিত্বের কতক কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন হিন্দু রাজারা গোলকুণ্ডার অধিপতি, তখন আগ্নেয়াস্ত্র, শেল, শ্রাপ্‌নেল লইয়া যুদ্ধ হইত না। তখনকার অস্ত্র, শেল, শূল, জাঠা, ইত্যাদি অন্যপ্রকার ছিল। প্রবাদ আছে যে কৃষ্ণ নামক কোন রাজা পুরাকালে এই অজেয় দুর্গটি মাটি ইঁট ও বড় বড় পাথর দিয়াই গাঁথিয়াছিলেন। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারঙ্গলের হিন্দু রাজা এই মাটিগাঁথা দুর্গ, গুলবর্গার মুসলমান রাজা মহম্মদশাহ বহমনীকে উপহার স্বরূপ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে ইব্রাহিম কুতুবশাহ (১৫৫০ হইতে ১৫৮০) দেখিলেন মাটির গাঁথুনি তোপের প্রহার সহ্য করিতে অক্ষম, অতএব তিনি চুন ও পাথর দিয়া দুর্গ গাঁথিলেন ও প্রায় আট হাজার গজ লম্বা প্রাচীর

দিয়া বেষ্টন করিয়া লইলেন। এই প্রাচীরে চারশত বুরুজ ও চারটি লোহার বড় দ্বার ও চারটি খিড়্‌কী বা ছোট দ্বার ছিল। এখন ছোট বড় চারটিমাত্র দ্বার আছে। প্রাচীরের চারিদিকে পঞ্চাশ হইতে ষাট ফুট গভীর পরিখা কাটা ছিল, এখন মাটি পড়িয়া প্রায় বুজিয়া গিয়াছে। দুর্গমধ্যে ইব্রাহিমের হিন্দু পত্নীদ্বয় তারামতী ও প্রেমমতীর রাণীবাসের ধ্বংসাবশেষ এখনও যাত্রীদের দেখান হইয়া থাকে। দুর্গমধ্যে নানাস্থানে মস্‌জিদ, হম্মাম, ও অন্যান্য অট্টালিকার ভগ্নাংশ এখনও আছে। ইব্রাহিম এই দুর্গ ও নগরের নাম "মহম্মদ-নগর" রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পুরাতন নাম গোলকুণ্ডাই অদ্যাবধি প্রচলিত। স্থানীয় অধিবাসীরাও নূতন নাম ভুলিয়া গিয়াছে।

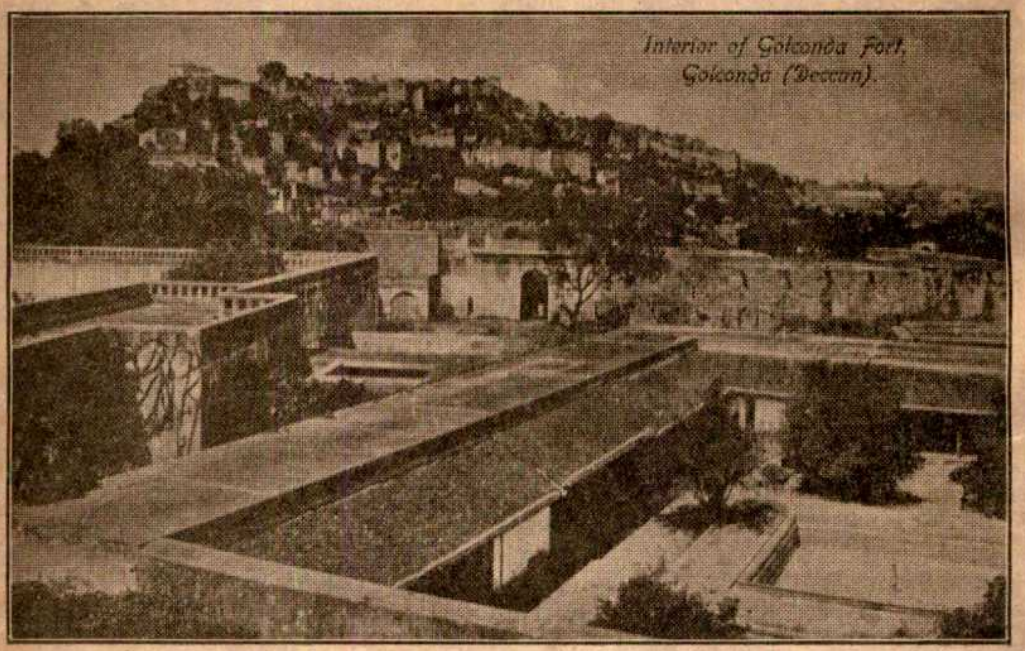

গোলকুণ্ডা দুর্গ ও গোলকুণ্ডা শহর।

দুর্গপ্রাচীরের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে কুতুব-শাহী রাজাদের সমাধিশ্রেণী, বিশেষতঃ শেষ রাজা তানাশাহের অসম্পূর্ণ সমাধি-সৌধ দেখিবার বস্তু। এই সমাধি-গৃহটি যখন গাঁথা হইতেছিল তখন আওরঙ্গজেব দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ একদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্রাট-পুত্র কুমার মুআজ্‌জম্ মোগল সেনা সহিত নগর অধিকার করিলেন। সেদিন আর সমাধি-সৌধের মিস্ত্রীরা কাজ করিতে আসিল না। কাজ বন্ধ হইল। সমাধি-গৃহের ভারা এখনও বর্ত্তমান। এক স্থানে একটি খিলান গাঁথা হইতেছিল, রাজমিস্ত্রী পূর্ব্ব বৈকালে কর্ণিকে করিয়া মাখা চুন ছড়াইয়াছিল, এখনও কর্ণিকের দাগ নষ্ট হয় নাই। মাখা চুন একটা পাত্রে উপুড় করিয়া নিকটে রাখা হইয়াছিল, সেই চুনের গায়ে এখনও পাত্রের গায়ের একটা কীলের দাগ দেখা যায়, অর্থাৎ সে চুন এমন মসলা দিয়া প্রস্তুত ও শুকাইয়া এমন কঠিন হইয়াছে যে দুই শতাব্দীর জল ও রৌদ্রে একটা কীলের দাগ নষ্ট হয় নাই। ইঞ্জিনিয়রেরা বলেন যে চুন পুরাতন হইলে ক্রমে পাথরের মত দৃঢ় হয়, সেইজন্য এমন দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু এই চুন যেদিন মাখিয়া রাখা হইয়াছে তাহার পরদিবস হইতেই রৌদ্র ও বাতাসের অখণ্ড প্রতাপ ২৩২ বৎসর সহ্য করিতেছে। এদেশের চুন অতি উৎকৃষ্ট, বাঙ্গলাদেশে এমন নাই। তাহা ছাড়া প্রাচীন নিয়মমত এখনও কেহ কেহ মসলা দিয়া চুন মাখেন। এইরূপে ঘর গাঁথিবার মত চুন প্রস্তুত করিতে এক বৎসর সময় লাগে; ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলে এরূপ চুন

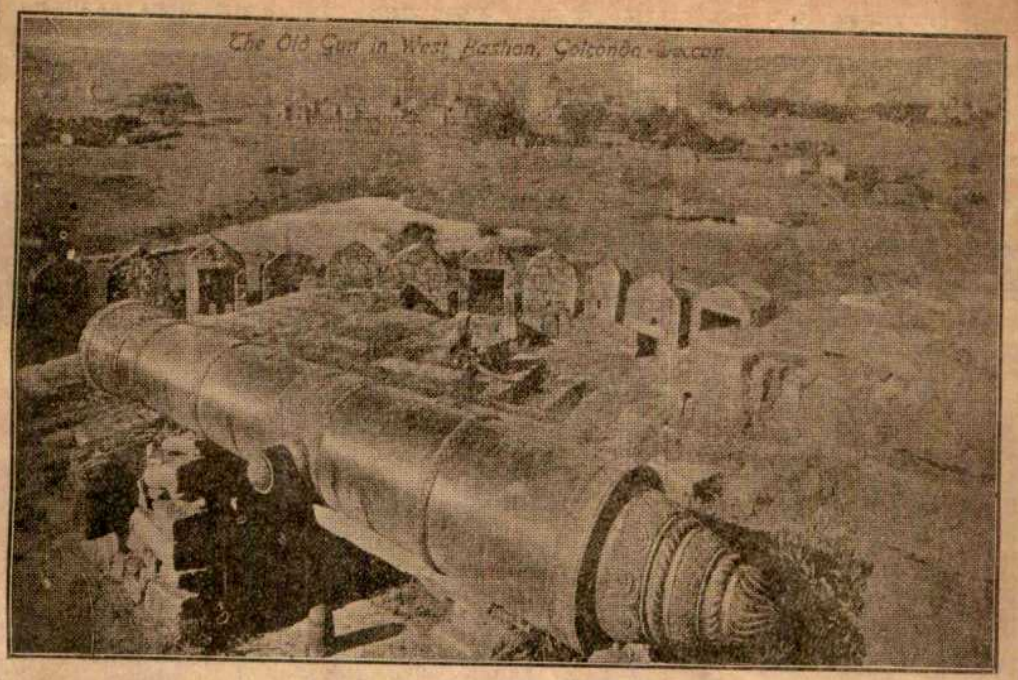

গোলকুণ্ডা দুর্গপ্রাকারের একটি বৃহৎ কামান।

ব্যবহার করিতে পারে না, কিন্তু এই চুন একবার শুকাইলে ঠিক চুনে পাথরের (Lime Stone) মত দৃঢ় হয়। সমাধি-সৌধগুলি প্রায় এক ছাঁচে প্রস্তুত। চারিদিকে খিলানের সারি। এই খিলানগুলির এক খিলপাথর (keystone) হইতে অন্য খিল-পাথর পর্য্যন্ত একখানি গ্রানাইট (granite) পাথর কাটা। এই পাথরগুলি নিশ্চয়ই কোনপ্রকার উত্তোলন-যন্ত্র (Crane) দ্বারা তোলা হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়রেরা কিন্তু সেকালে ক্রেনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

গোলকুণ্ডা বা তাহার নিকট কোন স্থানে এখন ত হীরকের আকর নাইই, কোন-কালে যে ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণা নদীর তীরে পল্লুতিয়াল নামক স্থানে সম্ভবতঃ পূর্ব্বে হীরকের আকর ছিল। আধুনিক কালে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ডেকান মাইনিং কোম্পানি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে এক গ্রেনের বড় হীরক পাওয়া যায় না। খরচে পোষাইল না বলিয়া চেষ্টা ত্যাগ করা হইয়াছে। কেবল একটা প্রবাদ আছে যে এই প্রদেশেই কোহিনূর ও নিজামের হীরক (Nizam's Diamond) নামক অর্দ্ধডিম্বাকার প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হীরা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি স্থানীয় কোন আকরে, কিম্বা স্থানান্তর হইতে আনা হইয়াছিল নিঃসন্দেহ বলা যায় না। আজকাল যেমন ইউরোপে বড় বড় নগর থাকিতে হীরক কাটা ও পালিশ করা ডেনমার্কের আম্‌ষ্টার্ডামেই ভাল হয়, সেইরূপ এক কালে, ভারতের যে-কোনো প্রদেশে ভাল হীরা উৎপন্ন হইক না কেন, গোলকুণ্ডার শিল্পীরাই তাহার কাটিবার ও পালিশ করিবার ভার পাইত। সেইজন্যই গোলকুণ্ডার বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরক বিক্রয় হইত। দেশ-দেশান্তরের রাজারা ভাল হীরকের জন্য গোলকুণ্ডাতে বণিক পাঠাইতেন। গোলকুণ্ডার সে গৌরবের দিন এখন গত হইয়াছে। তবে এখনও হায়দরাবাদে হীরক কাটা ও পালিশ করা, পদ্মরাগ মণি (ruby) ও নীলমণি (sapphire) পালিশ ও খোদাই কার্য্য কিছু কিছু হয়।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে যখন ফিরোজ খিলজী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন মুসলমান সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দেশ আক্রমণ

করে। এইটিই মুসলমানদের দক্ষিণে প্রথম অভিযান। তিনি দেবগিরির (অওরঙ্গাবাদের আট মাইল পশ্চিমে আধুনিক দৌলতাবাদ) যাদব বংশীয় রাজার কাছে প্রচুর দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া যান বটে, কিন্তু যখন তিনি পিতৃ-স্থানীয় খুল্লতাত বৃদ্ধ ফিরোজকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় অনুচর মলিক কাফুর দক্ষিণ দেশ লণ্ডভণ্ড করিয়াছিল। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের কালাপাহাড় বলিলে অন্যায় হয় (বাঙ্গলা মল্লিক) উপাধির দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। এই কাফুরই সর্ব্ব প্রথমে মুসলমান সৈন্য লইয়া গোলকুণ্ডা পীড়ন করে ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়া সেখানে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে। পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৪৭ খৃঃ) গুলবর্গাতে বহমনী রাজ্য স্থাপিত হইবার ১৭ বৎসর পরে গোলকুণ্ডার হিন্দু আধিপত্য চিরকালের মত লোপ পায়। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দের পর বহুকাল গোলকুণ্ডা বহমনী রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায়

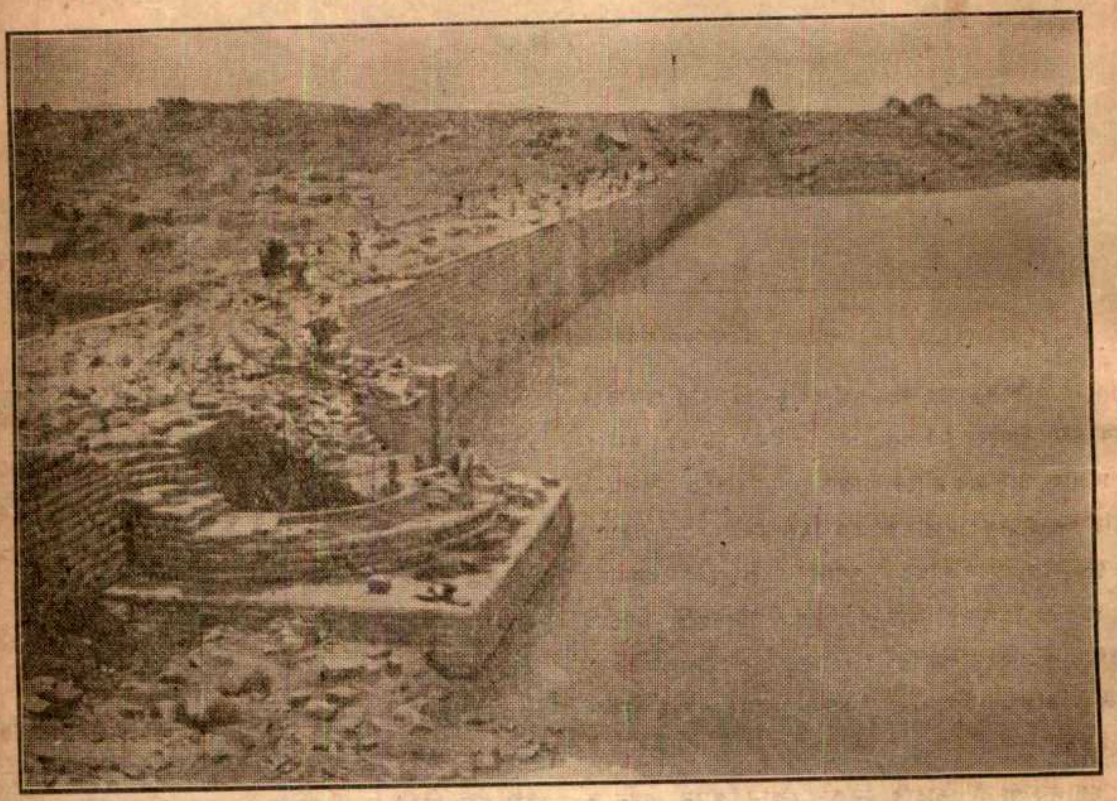

ওস্‌মান্‌সাগরের অর্দ্ধনির্ম্মিত বাঁধ।

না। এই মলিক কাফুর গুজরাতের একটি দরিদ্র ব্রহ্মণকুমার, কোনও যুদ্ধে বন্দী হইয়া অদৃষ্টচক্রে দিল্লীতে দাস রূপে বিক্রীত হয়। তাহার রূপে মুগ্ধ আলাউদ্দীন এই প্রিয়দর্শন দাসটিকে এক হাজার দীনার দিয়া কিনিয়াছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর ইহার নাম হয় কাফুর। সেইজন্য ইতিহাসে ইহার নাম হয় "কাফুর হজার-দীনারী।" কালে "মলিক" একটি সুবা মাত্র ছিল। এখানে একজন মুসলমান সুবাদার বা কিলাদার থাকিতেন। যখন বহমনী রাজারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখন গোলকুণ্ডার সুবাদার ইরাণ-বাসী সম্ভ্রান্ত বণিকবংশীয় কুতুব-উল্‌-মুল্‌ক ১৫১২ খৃষ্টাব্দে মস্‌নদ্‌ তাকিয়া ছাড়িয়া একখানি সিংহাসন পাতিয়া বসিলেন, ও মাথার পাগ্‌ড়ির পরিবর্ত্তে রাজমুকুট ধারণ করিলেন। তিনি এইরূপে কুতুব শাহ নাম গ্রহণ

হায়দরাবাদের মুসী নদীর পুলের উপর দিয়া নিজাম বাহাদুরের শোভাযাত্রা।

করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বংশে আট জন রাজা ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে এই বংশের এক যুবরাজ—মহম্মদ কুলী কুতুব শাহের একটি নীচ জাতীয়া হিন্দু রক্ষিতা স্ত্রী ছিল। তাহার নাম ভাগমতী বা ভাগ্যমতী। যুবরাজ, তাহার জন্য গোলকুণ্ডা হইতে পাঁচমাইল পূর্ব্বে, নদীর তীরে এক বাগানবাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি এই ভাগ্যবতীর বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। কাজে-কাজেই রাজ্যের আমীরেরা ভাগমতীর বাটীর চতুর্দ্দিকে আপন আপন প্রাসাদ ফাঁদিলেন। ক্রমে প্রাচীর দিয়া এই প্রাসাদগুলি ঘিরিয়া লওয়া হইল ও নগর বা প্রাসাদমণ্ডলীর নাম ভাগনগর রাখা হইল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সুলতান মহম্মদ কুতুব শাহ রাজ্যাধিকারী হইলেন, তখন তিনি এই গণিকার নামের পরিবর্ত্তে নগরের নাম "হায়দরাবাদ" রাখিলেন। হজরৎ মহম্মদের জামাতা হজরৎ আলীর এক নাম বা উপাধি "হয়দর"। যদিও এই প্রবাদটি কয়েকটি পুস্তকে, এমন কি গেজেটিয়রেও স্থান পাইয়াছে ও স্থানীয় অধিবাসীরা অনেকে নগরের নাম এখনও ভাগনগর বলে, তথাপি অনেকের বিশ্বাস এটি গল্প মাত্র, ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই তবে হায়দরাবাদ নগর যে মহম্মদ কুলী কুতুব শাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহা সকলেই স্বীকার করেন। নগরের অধিকাংশ সৌধমালাই ইঁহার দ্বারা নির্ম্মিত। এ নগর প্রতিষ্ঠার পরও গোলকুণ্ডাই রাজধানী ছিল, হায়দরাবাদ উপনগরে কেবল রাজা ও আমীরেরা অবসর সময়ে বাস করিতেন। মোগল বিজয়ের পর বহুকাল গোলকুণ্ডাতে বেতনভুক সুবাদার বাস করিতেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে আসফ্‌জাহ্‌, নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক হায়দরাবাদের সুবেদার ছিলেন। তিনি মোগল সম্রাটদের দুর্ব্বল দেখিয়া আর তাঁহাদের সহিত কোনও সংশ্রব রাখিলেন না। কিন্তু স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনের প্রধান চিহ্ন "সিংহাসন ও রাজ-মুকুট" গ্রহণ বা নিজনামে মুদ্রা মুদ্রিত করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরের

আপনাদিগকে সেকালের দিল্লীর বাদ্‌শাহ-প্রদত্ত উপাধি "নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক আসফ্‌জাহ্‌" বলিয়াই সমধিক সম্মানিত মনে করিয়া থাকেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হায়দরাবাদে দিল্লীর মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর বাদ্‌শাহের অস্তিত্ব লোপ পাইবার পর এখানে মুদ্রা মুদ্রিত হইতেছে। বর্ত্তমান নিজাম এ-বংশের সপ্তম "আসফ্‌জাহ্‌"। একবার গোলকুণ্ডাতে মড়কে বহু

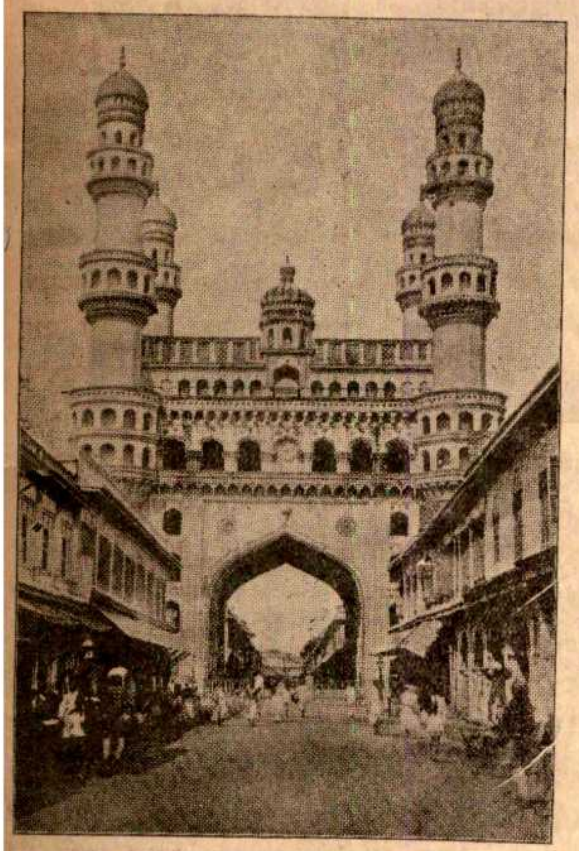

চার-মিনার্‌, ঘটক, হায়দরাবাদ।

নাগরিক মারা যায়, তখন নিজাম কালে-ভদ্রে সেখানে যাইতেন; মড়কের পর হায়দরাবাদই রাজধানী হইয়া গেল ও গোলকুণ্ডা নাগরিক অভাবে একটি নগণ্য গ্রাম হইয়া গেল। এখন গোলকুণ্ডাতে একটি মিড্‌ল্‌ স্কুল আছে, কিন্তু প্রায় সকলেই কেল্লার সিপাহীদের সন্তানাদি, নাগরিক ছাত্র বোধ হয় দশ-বারোটির বেশী নহে।

হায়দরাবাদ নগর প্রাচীরে ঘেরা। অতএব যখন নাগরিকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তখন স্থানের অভাব হইতে লাগিল। নদীর উত্তর দিকে অপর পারে নগরের উপকণ্ঠ ছড়াইতে লাগিল। গোলকুণ্ডার নিকট দুইটি গিরিনদী মিলিয়া হায়দরাবাদে আসিয়াছে। এই নদী-দুটির হিন্দু আমলে কি নাম ছিল বলা যায় না। মুসলমানেরা ইহাদের নাম মূসা (বা মূসী) ও ঈসা (বা ঈসী) রাখিয়াছে। এখানে একটি প্রবাদ আছে যে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে মুচুকুন্দ নামক এক ঋষির আশ্রম ছিল। তাঁহার নামেই এখনকার মূসী, পূর্ব্বে মুচুকুন্দ নদী নামে পরিচিত ছিল। অন্য নদীটির কি নাম ছিল তাহার কোন প্রবাদও নাই। এই দুটি নদীর মধ্যে ঈসীই বড়, কিন্তু সঙ্গমের পরে মূসী নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই মূসী সর্ব্বসুদ্ধ ১৫০ মাইল দীর্ঘ, কৃষ্ণাতে মিলিয়াছে। হায়দরাবাদ এই মূসী নদীর সঙ্গমের নীচেই উভয় তটে অবস্থিত, অর্থাৎ নগরের মধ্য দিয়া উভয় নদীর একত্রিত জল বাহিত হয়। ইহার দক্ষিণ তটে প্রাচীন ভাগনগর বা প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদমালা ও উত্তরে বা বামতটে পরবর্ত্তী কালের উপনগর। নগর ও উপনগরের মধ্যে চারটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর সেতু আছে।

গত ১৯০৮ সালের ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর এ দেশে দুই দিনে প্রায় ১৮ ইঞ্চি বর্ষা হয়; তাহার ফলে ২৭শে হইতে নদী স্ফীত হইতে আরম্ভ হয়, ও ২৭ ও ২৮র মধ্য রাত্রে ও ২৮র প্রাতে ৫।৬ ঘণ্টা কাল জল এত বাড়িয়াছিল যে নগরের মধ্যে নদীতল (river bed) হইতে ৭০ ফুট জল উঠিয়াছিল। উভয়তটের বহু নাগরিক ও বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছিল। কয়েকটি বড় রাস্তায় ২০ ফুট জল ছিল। দোতালা ও স্থান-বিশেষে তেতালার গায়ে এখন H. F. L. (Highest Flood Level) 28 Sep. 1908 এইরূপ চিহ্ন বসান হইয়াছে। নগরে বেড়াইতে গেলে প্রায় প্রত্যেক মোড়ে এইরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যে মৃতদেহগুলি পুলিসে সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার সংখ্যাই সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা স্বচক্ষে অনেক লোক ডুবিতে দেখিয়াছে তাহাদের মতে অন্ততঃ পাঁচহাজার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। দুই চার ক্রোশ ভাসিয়া অনেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। একটি যুক্তদেশবাসী যুবক

প্রায় একশত মাইল ভাসিয়া কৃষ্ণা নদীতে গিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে জেলেরা নৌকা করিয়া মাছ ধরিতেছিল, তাহারা মৃতপ্রায় যুবকটিকে রক্ষা করে। যুবকের অন্য আত্মীয়েরা ভাসিয়া গিয়াছে, সে এখন আবার নূতন সংসার পাতিয়াছে। সরকারী রিপোর্ট মতে তিন কোটী টাকার ক্ষতি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার পর যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ প্লাবন আর না হয়, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের মত এ দেশের ভূমি সমতল নহে, সেইজন্য জলের স্রোত বেশী প্রখর, ও কোন স্থানে জল দাঁড়ায় না। কৃষির জন্য মধ্যে মধ্যে নদীতে স্রোতের আড়াআড়ি বাঁধ দিয়া কতক জল বাঁধিয়া রাখা হয়, জল বাঁধ ছাপাইয়া আবার প্রবাহিত হয়। এরূপ জলাশয়কে, বড় হইলে তাল ও ছোট হইলে কুণ্টা বলে। মূসী ও ঈসী এইরূপে সঙ্গমের পূর্ব্বে প্রত্যেকে ৭০। ৮০ স্থানে বাঁধা আছে। এইসকল জলাশয় হইতে কৃষক বারমাস প্রয়োজন-মত জল সংগ্রহ করে। সেইজন্য তেলেঙ্গানা দেশে ২।৩ বৎসর বর্ষা না হইলেও ধান আবাদ হইয়া থাকে। সমস্ত তেলেঙ্গানাকে এইরূপ চৌবাচ্চার দেশ বলা যাইতে পারে। হিন্দু রাজাদের সময়ে যতগুলি জলাশয় ছিল তাহার সিকি ভাগও এখনও উদ্ধার করা হয় নাই। প্রতি বৎসর কতকগুলি জলাশয় উদ্ধার করা হয়। এরূপ ট্যাঙ্কের এক দোষ যে অতিবর্ষার সময়ে যদি উপরের একটি বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় তবে তাহার নীচের ট্যাঙ্কে এত জোরে জল প্রবেশ করে যে তাহারও বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, পরে তাহার নীচের বাঁধ ভাঙ্গে; ক্রমে নীচের দিকে বন্যা অনিবার্য্য হয়। ১৯০৮ সালে এইরূপে উভয় নদীর প্রায় দেড়শত বাধ ভাঙ্গিয়াছিল; সেই-সব জল একত্রিত হইয়া হায়দরাবাদে প্রতি সেকেণ্ডে ৪,৫০,০০০ ঘনফুট জল আসিয়াছিল। কিন্তু নগরের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১,২০,০০০ ঘনফুট জল আসিলেই দুই কূল ছাপাইয়া পড়ে, ইহার অতিরিক্ত স্থান নাই। নদীর দুই কূলেই জনাকীর্ণ বসতি। অতিরিক্ত প্রতি সেকেণ্ডের ৩,৩০,০০০ ঘনফুট জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া নগর ধ্বংস করিল।

নিজাম গবর্ণমেণ্ট এই কাজের জন্য মহীশূর হইতে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র সার্ বিশ্বেশ্বর আইয়র (আর্য্য), এম-সি-আই-ই, কে-সি-আই-ই, নাইটকে আনিয়াছিলেন। তিনি দুই নদীতে দুইটি বড় বাঁধ দিয়া দুইটি জলাশয় প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিলেন। অর্থাৎ বন্যার সময়ে এই জলাশয়ে জল আট্‌কাইয়া ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার পরামর্শ-মতে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র চুনিলাল তারাচন্দ দালাল, এম-সি-আই-ই কার্য্যভার পাইলেন। এই চুনিলাল দালাল মহোদয় গুজরাতবাসী। তিনি পুণা কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মহীশূরে কার্য্য করিতেন। মহীশূরে বেদবতী নদীর ১৬২ ফুট উচ্চ বাঁধ ইঁহারই কীর্ত্তি। পরে বরোদা রাজ্যে পাঁচ বৎসর চীফ্ ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। এখন মূসী নদীর বাঁধ শেষ হইয়াছে। বাঁধটি প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ, নদীতল (river bed) হইতে ১০৩ ফুট উচ্চ, ও ভিত্তিমূল (foundation) ২৫ হইতে ৪০ ফুট গভীর। জলাশয়ের নীচের ৫০ ফুট জল (তলানি ও ময়লা থাকিতে পারে বলিয়া) ছাড়িয়া, তাহার উপরের ২৭ ফুট জল দ্বারা হায়দরাবাদ নগর ও উপকণ্ঠ, সেকেন্দরাবাদ, বোলারম, ত্রিমল্লগিরি ইত্যাদি স্থানের পানীয় জল সরবরাহ হইবে। ইহাতে নদীতল হইতে ৭৭ ফুট উচ্চে পনেরটি বন্যা-দ্বার (flood sluice) ও পনেরটি খোলাদ্বার (open sluice) রাখা হইয়াছে, এগুলি প্রত্যেকে ছয় ফুট প্রশস্ত, ও দশ ফুট উচ্চ। দ্বারের উপর আরও ১৬ ফুট জল রাখিতে পারা যায়। জলাশয়টি পূর্ণ হইলে তাহাতে ১,১৪৩ কোটী ৭০ লক্ষ ঘনফুট জল থাকিবে ও জলের বিস্তার ১৩ বর্গ মাইল হইবে। নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫৮।৫৯ লক্ষ টাকা মাত্র। ইহাতে জমীর মূল্য ধরা হয় নাই। এইবার ঈসী নদীর বাঁধ আরম্ভ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় হইবে। বোধ হয় চল্লিশ লক্ষ টাকাতে শেষ হইবে ও জল কেবল কৃষিকর্ম্মে ব্যয়িত হইবে। তের বর্গমাইল বিস্তৃত জলাশয়কে তড়াগ বলিলেও অপমান করা হয়; সেইজন্য আমাদের নিজাম বাহাদুর নবাব মীর ওস্‌মান অলী খাঁর নামে উহার নাম "ওস্‌মান-সাগর" রাখা হইয়াছে। এই জলাশয়টি নগর হইতে প্রায় এগার মাইল দূরে, কিন্তু নগরের পাশে বা মধ্যেও অপেক্ষাকৃত ছোট সাগরের অভাব নাই। নগরের

উত্তরে হসনসাগর ট্যাঙ্ক, ইহার পরিধি প্রায় চার মাইল। দক্ষিণে মীর আলম ট্যাঙ্ক ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু পাহাড়ের নীচে বলিয়া সুন্দর। ইহার বাঁধের প্রাচীর সোজা নহে, আগাগোড়া খিলানের সারি। মীরজুম্‌লা ট্যাঙ্ক এ দুইটি অপেক্ষা ছোট, কিন্তু পূর্ব্বে এই ট্যাঙ্কের জল খাইয়াই নগরের লোক বাঁচিত।

হায়দরাবাদে যাঁহারা বেড়াইতে আসেন বা আসিবেন তাঁহাদের অনুরোধ করি যে যদিও নিজাম রাজ্যের মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীন কালের কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দেখিবার উপযুক্ত দৃশ্য অনেকগুলি আছে, তথাপি রাজধানী হায়দারবাদে আসিলে একবার নগর হইতে পাঁচ মাইল দূরে গোলকুণ্ডা ও ১১ মাইল দূরে ওস্‌মান-সাগর নিশ্চয় দেখিয়া যাইবেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

ক্ষণ-মিলন

১

আলোক-প্লাবনে ভাঁটা পড়ে আসে
দিবস পিছায়ে পড়ে,
নয়ন-ভুলান শ্যামল ধরণী
ধূসর বরণ ধরে!

২

দিবস-নিশার সন্ধি-নিমেষে
স্তিমিত আলোক-পথে,
ক্ষণিকের দেখা; চলে গেলে হায়
আঁধারে আলোক হতে!

৩

প্রভাত উদয়ে আলোক-জোয়ার
ভুবন ভরিবে যবে,
তোমার বিদায়-নয়ন-তিমির
মরমে জাগিয়া রবে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

মানুষমুখো বাঁদর—

ছবিতে যে বাঁদরের মুখ দেখা যাইতেছে তাহা অনেকটা মানুষের মত,—যেন দাড়িওলা, শাদা-চুলো এক বুড়ো। এর দোষের মধ্যে নাকটা কিছু থ্যাব্‌ড়া। এই বানরদের শাকী বানর বলে। এদের

মানুষমুখো বাঁদর।

মানুষমুখো বাঁদর।

মেজাজ খুব ঠাণ্ডা এবং এরা বকে কম। আমাদের মেয়েরা ত বকর-বকর করিতে খুব মজবুত; এরা কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের মেয়েদের চেয়েও বুদ্ধিমান। মেয়েদের মত মাথার মাঝখানে এদের সীঁথি আছে, কিন্তু আবার বুড়োদের মত দাড়ি ও গম্ভীর!

সন্ন্যাসীর শিল্পকার্য্য—

ফরাসী দেশের রদারনিউ দ্বীপে এক সন্ন্যাসী বাস করেন, তাঁর ভাস্কর্য্যের দিকে খুব ঝোঁক দেখা যায়। তিনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া বসিয়া জলের ধারে পাথরের গায়ে নানা-রকম মানুষের মুখ খোদাই করিয়াছেন। এই মুখগুলি যেন কতকগুলি মৃত মানুষের মুখের মত

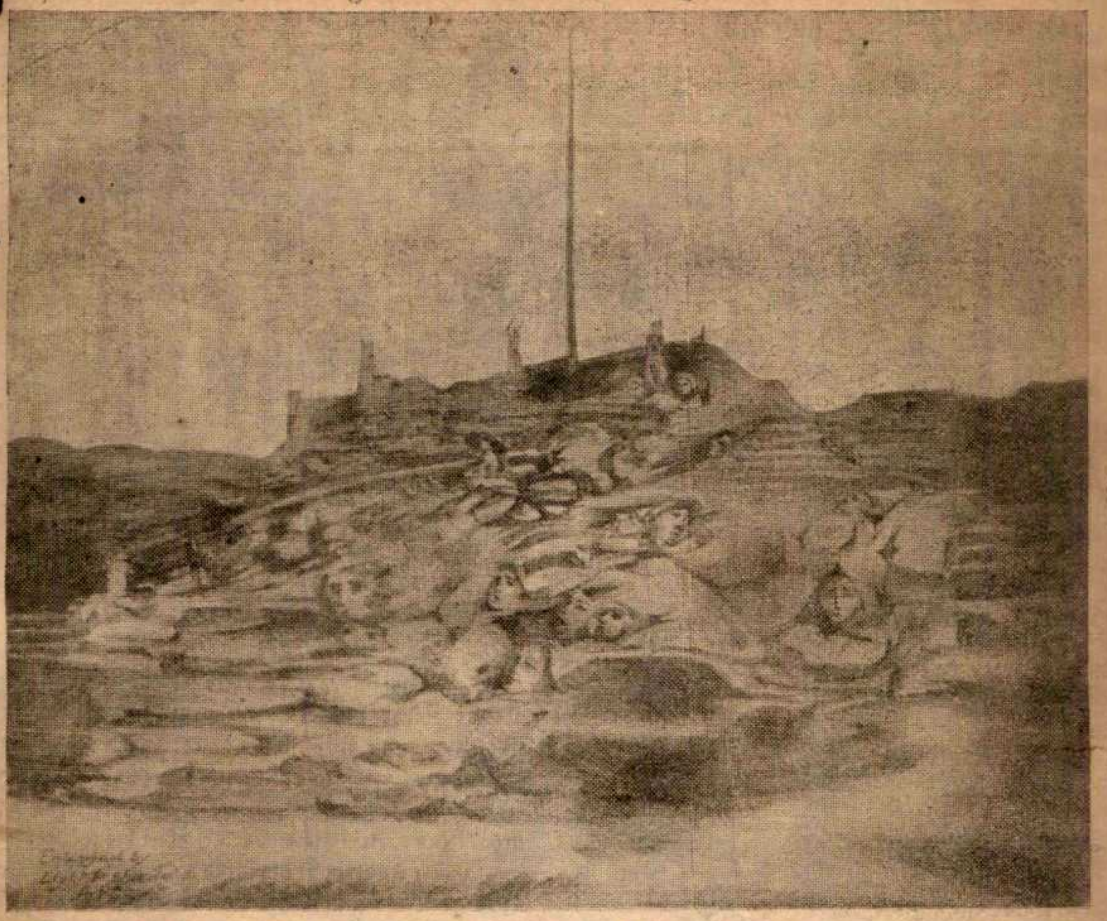

সন্ন্যাসীর শিল্পকার্য্য।

দেখায়; সকলেই মাটিতে চিত হইয়া আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসী বলেন সেগুলি বাইবেলের নানা চরিত্রের পরিকল্পনা। এই মোটামুটি মূর্ত্তিগুলি দেখিলে অনৈতিহাসিক যুগের মিশরের শিল্প-ভাস্কর্য্যের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সম্প্রতি ফরাসী দেশে ও মেক্সিকোতে প্রাপ্ত আজ্‌টেক্‌স্ জাতির প্রস্তরমূর্ত্তির কথা। অনেক বৎসর ধরিয়া সন্ন্যাসীটি এই দ্বীপে বাস করিতেছেন। সমুদ্রের তীরে উঁচু পাথুরে জায়গায় তাঁর খোদিত এইসব মূর্ত্তি এবং তার উপরেই তাঁর আশ্রম।

কিন্তু সন্ন্যাসী মরিয়া গেলে তাঁর এই অদ্ভুত ভাস্কর্য্য বা শিল্পকলা সমুদ্রের বালীর নীচে নিশ্চয়ই চাপা পড়িয়া যাইবে। দুই এক শতাব্দী পরে অনুসন্ধিৎসু শিল্পীরা মাটি খুঁড়িয়া এই অদ্ভুত শিল্পকলা লাভ করিয়া ইহাকে বিংশ শতাব্দীর শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া ধরিবে না ত!

—

পিয়নের স্বপ্নপুরী—

কবিরা কল্পনা করেন কমনীয় শোভন মূর্ত্তি, চিত্রকর কল্পনা করেন নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য; আর সম্প্রতি ফরাসী দেশের এক ডাকপিয়ন একটি অনুপম প্রাসাদ কল্পনা করিয়াছে এবং তাহা বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। ডাকের চিঠির স্তূপের মধ্যে ও টাকাকড়ির ঝন্‌ঝনার মধ্যে বসিয়া এই পিয়নের চিত্ত অবহিত হইয়া কেমন করিয়া এমন সুন্দরের কল্পনা করিল তাহা সৌন্দর্য্য-পিপাসুদের ভাবিবার কথা।

এই পিয়নের নাম ফার্ডিনাণ্ড শেভ্যাল। ১৮৭৯ সালে ডাকের চিঠি ও কাগজপত্র বিলি করিতে করিতে তার হাতে পড়ে বিনা ঠিকানার একখানি ছবির বই—তাতে ছবি ছিল—প্রাসাদ, গির্জ্জা, মস্‌জিদ এবং দুর্গের। বইখানি উল্টাইতে উল্টাইতে অনেক বাড়ীর ছবি দেখিয়া তার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হয় নিজের একটি প্রাসাদ তৈরী করিতে। তখন হইতেই সে প্রতিজ্ঞা করিল তার ইচ্ছা যে-কোন রকমে সে কার্য্যে পরিণত করিবে। সমস্ত দিনের কাজের পর সে নানা-রকম পাথর, শামুক, বালি প্রভৃতি জোগাড় করিয়া নিজের বিঘা-খানেক একটি জায়গায় জোগাড় করিতে লাগিল। পিয়নের মাহিনা অল্পই; কিন্তু তাহা হইতেও কিছু কিছু বাঁচাইয়া শেভ্যাল প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু করিয়া সিমেণ্ট ও চুন কিনিতে লাগিল।

সম্প্রতি তার অধ্যাবসায়ের সিদ্ধি ঘটিয়াছে, তার স্বপ্ন ও কল্পনা বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শেভ্যাল তার প্রাসাদ তৈরী করিয়াছে। ইহা দেখিতে যে কেমন সুন্দর ও মনোরম তাহা আপনারা ছবি দেখিলেই

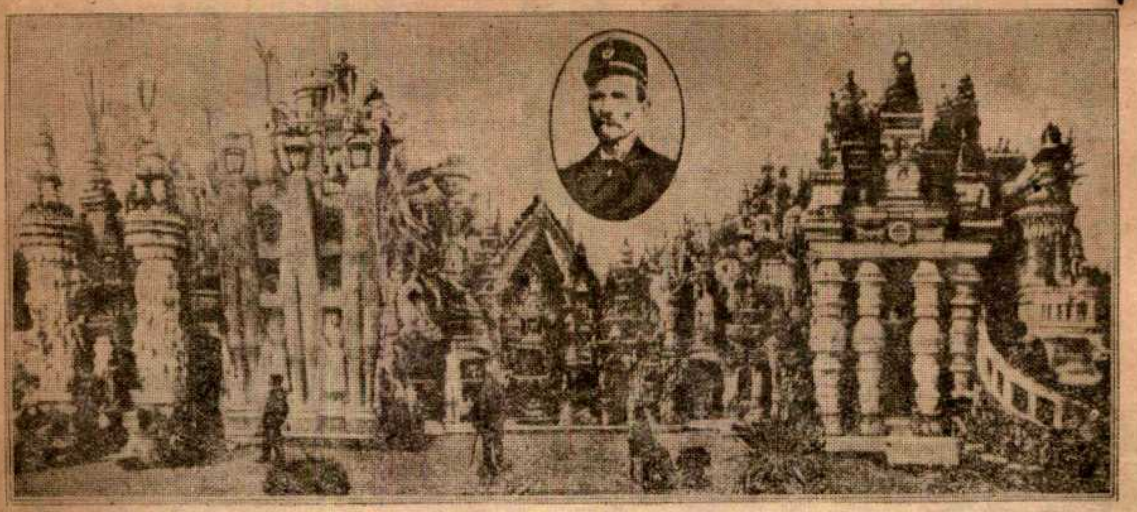

পিয়নের স্বপ্নপুরী।

বুঝিতে পারিবেন। এটি নিপুণ ভাস্কর্য্যের পরিচয়। চল্লিশ বৎসরের উদ্যম ও পরিশ্রমের ফল যে-প্রাসাদ, শেভ্যাল তাতে এখনো বাস করিতে আরম্ভ করে নাই, প্রাসাদটির পিছনে একটি শাদা বাড়ীতে সে বাস করে।

—

একচাকার সাইকেল—

জার্ম্মানীর বার্লিন শহরে একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা গেল একজন ব্যবসায়ী লোক একটা একচাকার সাইকেল চড়িয়া বেশ সহজ ভাবে হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে। একচাকার সাইকেল দেখিয়া অনেকে ত অবাক! কিন্তু অবাক হইলে হইবে কি,—এ লোকটি আশ্চর্য্য কাজ সাধন করিয়াছে। এই সাইকেলে চড়িয়া মোড় ফিরিবার সময়ই মুস্কিল। তাছাড়া হঠাৎ থামানো এবং দেহের ভারের সমতা রক্ষা করিয়া চলাও শক্ত কাজ। এ-লোকটি এ বিষয়ে খুব ওস্তাদ বুঝিতে হইবে, কেননা, এ বেশ সহজ ভাবেই চলিতে শিখিয়াছে। প.

একচাকার সাইকেল।

—

তিন-মগজওয়ালা অতিকায় পশু—

এই পৃথিবীটা প্রকৃতির পরীক্ষাগার, বহুলক্ষ বৎসর ধরিয়া এখানে জীবসৃষ্টির পরীক্ষা চলিয়াছিল ও এখনো সকলের অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। অনেক ব্যর্থতা ভুলচুকের পরে এমন এক-একটি প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে, যারা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বুঝিয়া থাপ্ খাইয়া টিঁকিয়া যাইতে পারে। তারাই আজও অবধি টিঁকিয়া আছে, অন্যেরা তাদের জায়গা ছাড়িয়া দিয়া দিয়া সরিয়া গিয়াছে। মানুষের মাথা জিনিষটা হালনাগাদ জীব-বিবর্ত্তনের শেষ কথা, এটাকে লইয়া প্রকৃতি দেবীকে কম মাথা ঘামাইতে হয় নাই। কেমনটি হইলে মাথার কাজ সবচেয়ে ভালো হয় সে বোধ চট করিয়া তাঁর মাথায় আসে নাই। ভূস্তরের পাতায় পাতায় তাঁর ভুল-চুকের কীর্ত্তি চাপা-চুপি দিয়া লুকানো আছে। মাটির চাপ খুঁড়িয়া মানুষ এমনি একটি ভুলের প্রমাণ ধরিয়া ফেলিয়াছে, প্রকৃতির এদিককার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে এটি বোধ হয় সবচেয়ে মারাত্মক।

ক্যামারাসরাস বলিয়া একটি প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তিন-তিনটি মগজ লইয়াও সে ধরাপৃষ্ঠে বেশী দিন টিকিয়া যাইতে পারে নাই। এই তিনটি মগজের একটি ছিল মাথায়, একটি ঘাড়ে, অপরটি কোমরে। কিন্তু যেটাকে মাথা বলিতেছি, সেইটাতেই ছিল সকলের চেয়ে ছোট মগজ, কোমরেরটা ছিল তার ষোলগুণ বড়, ঘাড়েরটা নয়গুণ; কাজেই কোন্‌টিকে ছাড়িয়া কোন্‌টিকে মাথা বলিব তাহা ভাবিয়া মাথা ঘোলাইয়া যাইবার জোগাড়।

এই অতিকায় পশুর ল্যাজটি এমন বেপরিমাণ বড় ছিল যে সেটার নড়াচড়া এবং পশ্চাতের পাদুটাকে নিয়মিত করিবার জন্য সবচেয়ে বড় মগজটার দরকার হইত; গলা পর্য্যন্ত শরীরের সম্মুখটার ভার ছিল মাঝের মগজটার উপর, আর মাথার মগজটি দেখা শোনা শোঁকা প্রভৃতির কাজ করিত। সবচেয়ে সহজ পথটিতে চলা জড়-প্রকৃতির স্বভাব। সম্ভবত সেইজন্যই মাথার খুলির শক্ত কঠিন হাড়গুলোকে বাড়াইয়া একটি মগজেরই বুদ্ধির সুবিধা করিয়া না দিয়া, কোমল মেরুমজ্জাকে তিনটি জায়গায় জমা করিয়া তিনটি মগজ করিবার কথা

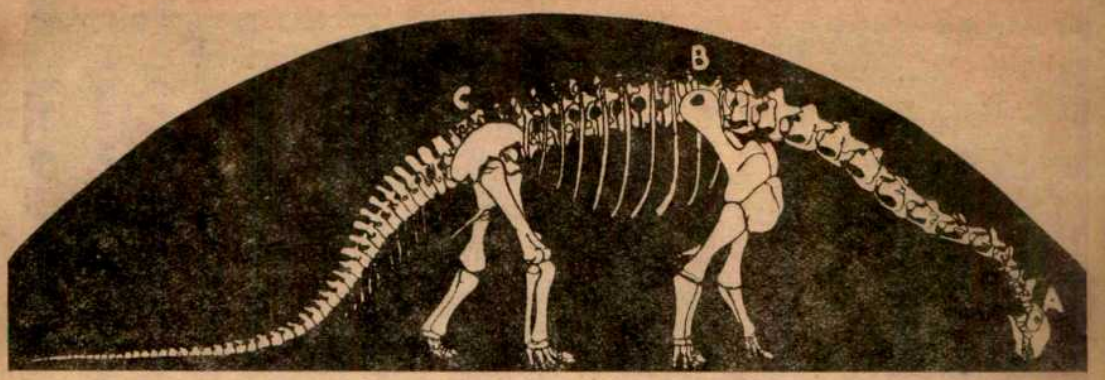

তিন মগজ-ওয়ালা অতিকায় পশু।

তাঁর মনে হইয়াছিল; কিন্তু তিনটি মগজের অধিকারী হইয়াও দেহযন্ত্রগুলির পরস্পরের আকৃতি এবং অবস্থানের অনুপাতে ভুল থাকাতে ক্যামারাসরাস পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নতুবা মানুষ তার সবে মাত্র একটি মাথা লইয়া কোনোপ্রকারেই তার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

—

নারিকেল-ছোব্‌ড়ার সাঁজোয়া—

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে কতগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে, তাদের পলিনেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে পাপুয়ান্ অধিবাসীদের প্রায় সর্ব্বদাই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত।—বহু শতাব্দীর শত্রুতার পরেও এখনও তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ একেবারে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু এদের বুদ্ধিবৃত্তি আততায়ী-স্বভাবের দিক্ দিয়া যতটা বিকাশ লাভ করিয়াছে, আত্মরক্ষার দিক্ দিয়া ততটা করে নাই। আঘাত করিবার, মারিবার, নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু কোনরকমের বর্ম্মচর্ম্মে দেহটাকে ঢাকিয়া আঘাত হইতে বাঁচাইবার কল্পনা কাহারও মাথায় আসে নাই। একমাত্র গিলবার্ট নামক ছোট একটি পাপুয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে বিজেতা পলিনেশীয়দের কাছে এক-প্রকার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ম্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই বর্ম্ম নারিকেল-ছোব্‌ড়ার তৈরি। এই বর্ম্ম তৈরি করিতে অত্যন্ত খাটুনির দর্‌কার হইত বলিয়া সকলে যথেচ্ছা ইহা ব্যবহার করিতে পাইত না, একএকটি গ্রামে একটির বেশী এই মূল্যবান বর্ম্ম থাকিত না। একটি বর্ম্মে অবশ্য গ্রামসুদ্ধ লোকের আত্মরক্ষা চলিত না, গ্রামের সবসেরা যোদ্ধাকে এই বর্ম্মটি উপহার দেওয়া হইত। শিকারের অধিকার লইয়া তর্কবিতর্ক, স্ত্রীহরণ, বা অন্য কোনো কারণে প্রতিবেশী কোনো গ্রামের সঙ্গে গোলযোগ উপস্থিত হইলে সকলে মিলিয়া মারপিট করিবার কোনও প্রয়োজনই হইত না! দুই দলের সেরা বীর-দুজন এই বর্ম্মে গা ঢাকিয়া যুদ্ধের জায়গায় সমবেত হইতেন, সেই দ্বৈরথ সমরের ফলাফলে দুই বিরুদ্ধ দলের জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইয়া যাইত।

এই অপূর্ব্ব লোভনীয় বর্ম্মটি নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়া ঘন বুননে তৈরি হইত। পিছন দিক হইতে শত্রুর আক্রমণের ভয় বেশী বলিয়া কাঁধ এবং পিঠের দিক্‌টা তুলনায় অনেকখানি মোটা করিয়া বোনা হইত। একখানি শক্ত হাল্‌কা চামড়ায় বক্ষাবরণ

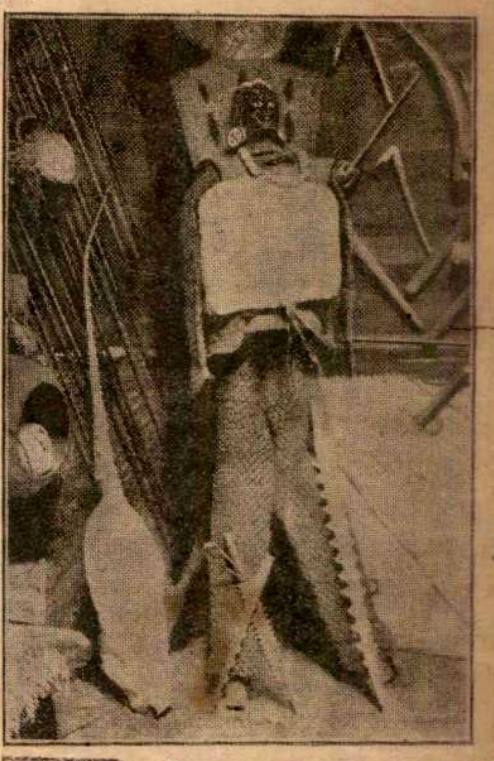

নারিকেল ছোবড়ায় সাঁজোয়া।

নির্ম্মিত হইত, চামড়া এবং দড়ির স্তর ভেদ করিয়া বর্শার ধারালে ফলকও সহজে অনিষ্ট করিতে পারিত না।

এই গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ এখন ইংরেজদের সাম্রাজ্যভুক্ত। কিন্তু এখানকার অসভ্য জাতিরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছে!

—

গতিচ্ছন্দের ছবি—

গতিবেগের ছন্দকে ফটোগ্রাফের ছবিতে ধরিবার চেষ্টা প্রায় ২৫ বৎসর আগে পারী সহরে প্রথম হয়। মুইব্রিজ্ নামক এক ব্যক্তি

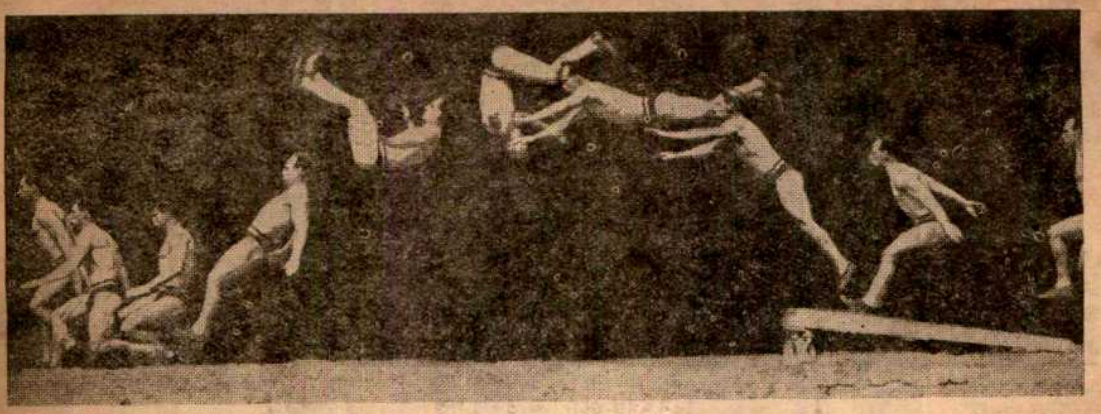

গতিচ্ছন্দের ছবি।
ছবিতে দেখা যাইতেছে দশটি লোক লাফ খাইতেছে। কিন্তু তা নয়; একটি লোক লাফাইবার সময় কত রকম শরীরের গতি করিয়াছে তাহাই একটি প্লেটে তোলা হইয়াছে।

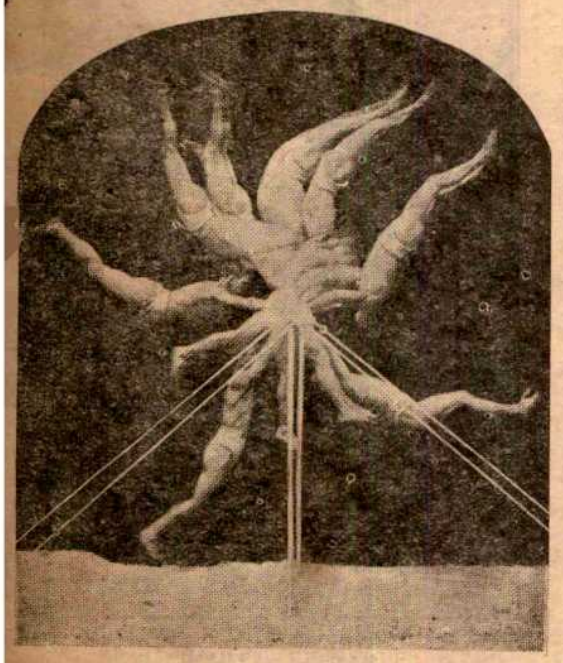

গতিচ্ছন্দের ছবি।
হরাইজেণ্টাল বারে একটি মানুষের ঘুরপাক খাওয়ার সময়ে দেহের বিভিন্ন অবস্থানের ছবি। বারে দশটি লোক দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটি লোক ঘুরপাক খাইতেছে। ফটোগ্রাফ তোলার নূতন পদ্ধতি অনুসারে দশটি অবস্থার ছবি একটি প্লেটে তোলা হইয়াছে, দশটি আলাদা আলাদা প্লেটে নয়।

নেকগুলি ক্যামেরার মুখ গতিশীল কোনো প্রাণী বা দ্রব্যের উপর ন্যস্ত করিয়া রাখিয়া খুব দ্রুতপর্য্যায়ে তার একটির পর একটিতে গতিরূপের নানা অবস্থার ছবি তুলিয়া এদিকে সব-আগে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

তারপর বায়স্কোপের ছবি লইবার ক্যামেরা উদ্ভাবিত হয়। মুই-ব্রিজের নিয়মে এতে একসঙ্গে একেবারে কুড়ি-পঁচিশটি ক্যামেরার প্রয়োজন হইত না বটে, কিন্তু এ-রকম ছবি লওয়াতে খরচ পড়িত বেজায় বেশী, তা ছাড়া প্রত্যেকটি অবস্থানের ছবি স্বতন্ত্র বলিয়া তুলনায় গতিছন্দের সমন্বয় রূপটিকে একসঙ্গে চোখের সম্মুখে ধরিয়া বুঝিবার সুবিধাও এতে ছিল না।

মারে নামক একজন ফরাসী কারিগর এতদিন পরে এই সুবিধা পাইবার উপায় করিয়াছেন। একটি মাত্র স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার মুখ চোখের পাতার মতো তাড়াতাড়ি বোজে খোলে, তারই নিমেষে নিমেষে একটিমাত্র প্লেটেরই উপর গতিবেগের নানা অবস্থার ছবি আঁকা পড়িয়া যায়। খুব তীব্র আলো ফেলিয়া কালো কুচ্‌কুচে পর্দ্দার সমুখে ছবি লওয়া হয়। কলের কারিগর এবং খেলোয়াড়েরা ইহার পর ছবি দেখিয়া নিজেদের খেলা এবং কাজের গতিচ্ছন্দে কোথায় কোথায় তাল কাটিতেছে ঠিক করিয়া সহজেই সেই ভুল শুধ্‌রাইয়া লইতে পারিবেন।

—

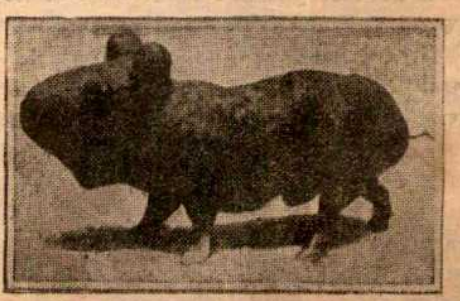

বরাহ-অবতার গোল-আলু।

বরাহ-অবতার গোল-আলু—

একটি আলু প্রকৃতির খামখেয়ালিতে অবিকল একটি শূকরের মতো হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মানুষের খামখেয়ালিতে আলুটি সাড়ে চার শো টাকায় বিক্রি হইয়াছে।

—

কুরূপের আদর—

সুন্দর মুখের আদর সর্ব্বত্র, কুৎসিত মুখেরও যে আদর হইতে পারে সেটা সকলের জানা না থাকিবারই কথা। শ্রীমতী মেরী বেভান্ নাম্নী এই ইংরেজ মহিলাটি তাঁর মুখাকৃতির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা-ভরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন কি না তাহা জানা যায় নাই, তবে

কুরূপা।

এই মুখটির দৌলতে তিনি একবার কুরূপের প্রতিযোগিতায় ষোল হাজার টাকা বাজি জিতিয়াছিলেন এবং এই তাঁর আশ্চর্য্যরকমের কদর্য্য চেহারার জোরেই বায়স্কোপের অভিনয়ে তাঁর মোটা বেতনের একটি কাজ জুটিয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে জগতে কিছুই ফেলা যায় না।

—

চমৎকারিণী—

এই মুরগীটির নাম "চমৎকারিণী"। মিঃ ই, ব, টম্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি ৩০ হাজার টাকাতে ইঁহাকে কিনিয়াছেন। চমৎকারিণীর গুণের চমৎকারিত্বের বিষয় আমাদের কিছুই জানা নাই; খবরটা চমৎকার বটে, এবং রূপটাও পেটুক ছাড়াও কারো কারো চোখে চমৎকার ঠেকিতেও পারে।

স. চ.

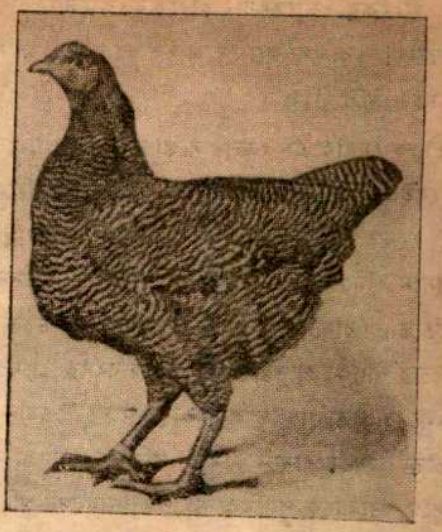

তিরিশ হাজার টাকা দামের মুরগী।

বিয়ের ফুল

(১৩)

হীরকের বিছানায় হীরকের পাশে নিজের অলক্ষিতে কেবল ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমাইয়া পড়াতে সেবা যেমন লজ্জিত হইয়াছিল তেমনি তার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক সে অনুভব করিতেছিল। সেবা এই নূতন অভিজ্ঞতার লজ্জায় হীরকের কাছে একটা নূতন সঙ্কোচ ও ব্রীড়া অনুভব করিতেছিল। সেবা এই লজ্জা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সে আরো বেশী সঙ্কুচিত হইতেছিল; নববধূর যে লজ্জার কথা সে সাহিত্যের মধ্যে পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিত, আজ সেই লজ্জা নিজে অনুভব করিয়া তার মাধুর্য্যে সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; পুরুষের জন্য নারীর ও নারীর জন্য পুরুষের যে ব্যাকুলতা ও তাদের মিলনের যে আনন্দ এতদিন কেবল সাহিত্যের রাজ্যে কল্পনার সামগ্রী হইয়া ছিল, তাহা আজ অকস্মাৎ নিজের অন্তরে অনুভবের আয়ত্ত দেখিয়া সেবা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তার এই আনন্দ ও লজ্জার মিশ্র আভা তার মুখে পড়িয়া তাকে অধিকতর সুন্দর মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। সে এই আনন্দ বহন করিয়া যতবার হীরকের কাছে যাইতেছিল ততবারই তার মনে হইতেছিল হয়ত বা তার মন ছাপাইয়া

তার পুলকের আতিশয্য হীরকের কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেছে; এবং সেইজন্য সে অধিকতর লজ্জায় ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছিল।

হীরক সেবার এই লজ্জার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিতেছিল; এবং সেইজন্য সে বেশী করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তার সন্দেহ হইতেছিল সেবা ইচ্ছা করিয়াই রমার সিংহাসনে নিজের স্থান করিয়া লইবার সচেতন চেষ্টা করিতেছে। রামচন্দ্রের পরিত্যক্ত সিংহাসনে ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা প্রতিষ্ঠা করিয়া চৌদ্দ বৎসর রামের সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, হীরকও ত তেমনি রমার পরিত্যক্ত হৃদয়-সিংহাসনে রমার স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তার সঙ্গে পরলোকে পুনর্মিলনের প্রত্যাশায় দিন গণিতেছে। এর মধ্যে কোথা হইতে সেবা আসিয়া পড়িয়া তার মনে সিঁধ কাটিবার চেষ্টা করিতেছে; ইহাতে হীরক সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় সেবার সকল আচরণ চোরের শঠতা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল। হীরক সঙ্কল্প করিল—সেবার ধূর্ত্ততায় সে কিছুতেই নিজেকে ঠকিয়া যাইতে দিবে না, সেবাকে আর কিছুতেই সে নিজের মনে আমল পাইতে দিবে না, সে সতর্ক হইয়া সেবাকে ও নিজের মনকে পাহারা দিবে।

হীরক যখন মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিতেছিল, ঠিক সেই সময় ঘরে আসিয়া ঢুকিল লোকনাথ। হীরকের কেমন মনে হইল লোকনাথের মুখে একটা যেন কি গোপনতার প্রয়াস ফুটিয়া উঠিয়াছে। হীরক উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি রে লোকাদা?

লোকনাথ কেমন একটু থতমত খাইয়া বলিল—"কিছু না ভাই।" কিন্তু সে যে কিছু গোপন করিতে চাহিতেছে তাহা তার ভাবে বোঝা গেল, অথচ তার চোখ-দুটা আবার কৌতুকের আনন্দে জলজল করিয়াও উঠিল।

হীরকের অত্যন্ত রাগ হইল সেবার উপর। সে বাড়ীর চাকর-দাসীদের হাত করিয়া লইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা যে কিছু ষড়যন্ত্র করিতেছে তাতে হীরকের আর সন্দেহ মাত্র রহিল না; কিন্তু তার পুরাতন ভৃত্য লোকনাথও যে নবাগত স্বার্থ-বশ সুখান্বেষী সেবার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাকে প্রতারণা করিতেছে ইহা হীরকের সবচেয়ে অসহ্য বোধ হইল, রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। লোকনাথ যে তাকে লুকাইয়া কি করিতে যাইতেছে তাহা ধরিবার জন্য হীরক অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া আড়চোখে লোকনাথকে একএকবার একটু-একটু দেখিতে লাগিল। হীরক দেখিতে লাগিল লোকনাথ দেয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া দেয়ালের কাছে দাঁড়-করানো যে শেল্‌ফ্ ছিল তার উপরকার জিনিসগুলি এটা ওটা নাড়িয়া সরাইয়া রাখিতেছে; কিন্তু সেই জিনিস নাড়াচাড়া যে তার আবশ্যক নয় ও উদ্দেশ্যও নয় তা তার হাতের উৎসাহহীন রকম দেখিয়াই হীরক বুঝিতে পারিতেছিল, তার উপর আবার সে মাঝে মাঝে আড়চোখে হীরককে দেখিতেছিল বলিয়াই হীরক বুঝিতে পারিতেছিল লোকনাথ তাকে লুকাইয়া কিছু করিতে আসিয়াছে, এবং শেল্‌ফের জিনিস গোছানোটা কেবল ছল মাত্র। হীরক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানাইবার জন্য আস্তে আস্তে চোখ বুজিল এবং চোখের পাতা-দুটির মাঝে রেখা মাত্র ফাঁক রাখিয়া লোকনাথের আচরণ দেখিতে লাগিল। লোকনাথ দুবার আড়চোখে হীরককে দেখিল; হীরক চোখ বুজিয়া আ[illegible] মনে হওয়াতে একবার সে চট করিয়া ঘাড় অন্য এক[illegible] ফিরাইয়া ভালো করিয়া আর-একবার হীরককে দেখিয়া নিশ্চিত হইয়া লইল; তারপর ক্ষিপ্র হাতে সন্তর্পণে দেয়াল হইতে রমার ফটোগ্রাফটা খুলিয়া নামাইয়া লইয়া নিজের শরীর দিয়া আড়াল করিয়া ধরিয়া চোরের মত চুপিচুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল। ইহা দেখিয়াই হীরকের মনে হইল রমার ছায়াটুকুকেও সেবা তার চোখের সামনে হইতে সরাইয়া লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, আর সেই দুরভি-সন্ধির উত্তরসাধক হইয়াছে কিনা লোকনাথ! রাগে আত্মহারা হইয়া আবেগের আতিশয্যে হীরক একেবারে উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"শূয়ার কাঁহাকা!" এবং চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে হীরক খাটের পাশের টুলের উপর হইতে একটা রূপার গেলাস তুলিয়া লইয়া লোকনাথের দিকে ছুড়িয়া মারিল। লোকনাথ হীরকের বিকৃত কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; রূপার গেলাসটা গিয়া তার কপালে লাগিয়া মার্বেল-পাথরের মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বিষম ঝঞ্ঝনায় সমস্ত বাড়ী

একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। লোকনাথের কপাল রূপার গেলাসের কানায় কাটিয়া গিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছিল; সে কিন্তু ওদিকে লক্ষ্যই না করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসিভরা প্রফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিল—তুমি উঠে বোসে গেলাস ছুড়ে আমায় মারতে পেরেছ ভাই!

হীরকের চীৎকার ও গেলাস আছড়ানোর বিকট শব্দ শুনিয়া সেবা কামিনী ও বাড়ীর অন্যান্য চাকরদাসীরা ছুটিয়া আসিয়াছিল। তারা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া উঠিল যে হীরক বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আছে এবং লোকনাথ নিজের রক্তধারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধ আনন্দিত দৃষ্টিতে হীরকের দিকে স্নেহাকুল হইয়া দেখিতে দেখিতে বলিতেছে—তুমি উঠে বোসে গেলাস ছুড়ে আমায় মারতে পেরেছ ভাই।

হীরক যে উঠিয়া বসিয়া লোকনাথকে মারিতে পারিয়াছে এতেই লোকনাথের অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও লোকনাথের কপাল হইতে রক্ত পড়িতে দেখিয়া হীরক লজ্জিত হইয়া পড়িল; সে যে উঠিয়া বসিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে বিলম্বিত করিয়া তুলিল ইহাতেও হীরকের অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল; সে যে সুস্থ হইয়া উঠিয়া রমার কাছে অবিশ্বাসী ও অপরাধী হইয়া উঠিল এই ধারণাতেও সে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া পড়িল; তার মনে হইল সে-ই যখন রমার কাছে এমন অবিশ্বাসী হইয়া পড়িল তখন লোকনাথ ও সেবা হইলে এতে আর আশ্চর্য্য কি? তাদের একজন ত অশিক্ষিত ছোটলোক চাকর মাত্র, আর অপর-জন ত একেবারে রমার অপরিচিত। হীরক রাগ ভুলিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে লোকনাথকে বলিল—তুই রমার ছবি চুরি কোরে নিয়ে যাচ্ছিলি কেন? [illegible]তেই ত আমার রাগ হল, আমি তোকে মারলাম।

লোকনাথ হীরকের এই কথার উত্তরে কেবল সমস্ত [illegible]বাহির করিয়া এমন খুসীর হাসি হাসিল যেন তার কোনো মহৎ সাধুকর্ম্মের সে প্রশংসা ও পুরস্কার পাইতেছে; তার চুরি যেন গৌরবের, এবং হীরকের হাতের মারে রক্তপাত যেন তার জীবনের চরম পুরস্কার!

সেবা আগাইয়া হীরকের কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল—ও ছবি আমিই চুরি করতে পাঠিয়েছিলাম; কল্‌কাতা থেকে একজন খুব ভালো চিত্রকর আনিয়ে তাকে দিয়ে মার আর দিদির অয়েল-পেণ্টিং করিয়ে আপনাকে হঠাৎ দেখিয়ে খুসী কোরে তুলব মনে [illegible] এখন আপনাকে বল্‌বার ইচ্ছে ছিল না।

হীরক সেবাকে ও লোকনাথকে মিথ্যা সন্দেহ করার লজ্জায় ও সেবার অন্তরের নূতন পরিচয় পাওয়ার [illegible] একেবারে অভিভূত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া যাইতেছিল; সেবা চট করিয়া নিজের বাহুবেষ্টনে হীরককে ধরিয়া শুইতে না দিয়া প্রফুল্ল মুখে স্নেহ-ব্যগ্র [illegible] স্বরে বলিল—উঠে যদি বসেছেন ত আর শোবেন না লক্ষ্মীটি। আমি ইন্‌ভ্যালিড্‌-চেয়ার আনিয়ে রেখেছি তাইতে আপনি বসুন, আমরা আপনাকে নিয়ে একবার বাগানে বেড়িয়ে আসি।

সেবার মধ্যে এমন সেবার শক্তি আছে! [illegible] হইয়া উঠিবে নিশ্চয় জানিয়া সে হীরকের সুবিধার জন্য ইন্‌ভ্যালিড্‌ চেয়ারও আনাইয়া রাখিয়াছে! এই [illegible] ও এত বুদ্ধি সেবার! হীরক শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে আপত্তি করিবে কি না ভাবিয়া স্থির করিবার [illegible] লোকনাথ চাকা-দেওয়া হেলানো চেয়ার ঠেলিয়া [illegible] ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাকে আরও [illegible] সুস্থ করিয়া তুলিবার এই আয়োজন ও আগ্রহ দেখিয়া হীরক এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে সে আর আপত্তি করিতে পারিল না। সেবা চাকরদের [illegible] ধরাধরি করিয়া হীরককে খাট হইতে নামাইয়া [illegible] বসাইয়া দিল এবং তার পিঠে নরম কুশন বালিশ [illegible] দিয়া ও তার পায়ের উপর একখানি নরম [illegible] ঢাকা দিয়া নিজেই সে চেয়ার ঠেলিয়া লইয়া চলিল। হীরক ব্যস্ত হইয়া বলিল—তুমি কেন কষ্ট করছ, চাকরদের কাউকে দাও না।

সেবা ছলছল চোখে ধরা গলায় বলিল—মার [illegible] প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আপনাকে আমি ভালো কোরে তুলব; মা যদি আজ থাকতেন তা হলে আপনাকে [illegible] বসতে দেখে তিনিও ভালো হয়ে উঠতেন।

হীরকের তখনি মনে হইল—আর আজ রমা যদি থাকত।

সেবা হীরকের চেয়ার ঠেলিয়া সিঁড়ির মাথা পর্য্যন্ত লইয়া আসিল; তারপর চাকরের ধরাধরি করিয়া হীরককে নীচে নামাইয়া লইয়া গেল।

হীরক বাগানের মধ্যে গিয়াই দেখিতে পাইল—যে বাগান দেখিয়া গিয়া সে শয্যাগত হইয়াছিল, এ সে বাগান মোটেই নয়। বাগানের শ্রী একেবারে বদল হইয়া গিয়াছে; কত নূতন নক্সার কেয়ারীতে কেয়ারীতে মর্ম্মী ফুল; এক-এক পথের দুধারি এক-এক রকম ফুলগাছের সারের বীথিকা; বাগানের মাঝে দুটি চৌবাচ্চার মতন ছোট্ট ছোট্ট পুষ্করিণী খোঁড়া হইয়াছে, এবং তার একটিতে শাদা লাল নীল রঙের কুমুদ নাল হেলা ফুল ও অপরটিতে শাদা ও লাল পদ্ম ফুটিয়া শারদলক্ষ্মীর হাসিমুখের মত সমস্ত বাগানটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে; বড় পুকুরটিতে শরতের শুভ্রহাস্যের মতন কতকগুলি রাজহাঁস লম্বা লম্বা গলা বাকাইয়া পালতোলা নৌকার মতন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি পথের দুধারি কেবল শিউলিগাছ বসানো হইয়াছে; গাছগুলি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, গাছের তলাতেও ফুলশয্যা পাতা। একটি পথের দুধারি কেবল কদম-গাছ; একটি পথের দুধারি কেবল কৃষ্ণচূড়া। এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুল ফুটিলে পথের তরুবীথিগুলি মনোরম হইয়া উঠিবে। ইহা অনুভব করিয়া ও দেখিয়া হীরকের মনে পড়িল—সে বইএ পড়িয়াছে জাপানে এমনি পথের দুধারে চেরি ও প্লাম গাছের বীথি থাকে; যখন যে ঋতুতে যে ফুল ফোটে তখন সেই পথ পুষ্পপ্রিয় তীর্থযাত্রীতে ভরিয়া উঠে। সেই সুদূর দেশের যে শোভা সে কল্পনায় অনুভব করিত তাহা তার বাগানের মধ্যে ধরিয়া দেখাইবার আয়োজন করিয়াছে সেবা! হীরক পুলকিত হইয়া দেখিতে লাগিল —

"চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে!"

সেবা নিজেই হীরকের চাকা-দেওয়া চেয়ার ঠেলিয়া বাগানের চারিদিকে লইয়া বেড়াইতেছিল; হীরক নীরবে সেবার নিপুণতা ও কৃতিত্ব উপভোগ করিতে করিতে সেবার দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া মুগ্ধ মনের উচ্ছ্বসিত আনন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিল—তুমিই নিশ্চয় এসব করিয়েছ সেবা! সমস্ত দিন ত তুমি আমার কাছেই থাকতে, এসব কর্‌বার সময় পেতে কোথায়?

সেবা মৃদু হাসিয়া বলিল—বাগানের চেয়ে প্রিয় ত আমার কিছু নেই; তাই একে আমি মনের মতন কোরে সাজাতে চেষ্টা করেছি—যখনই কাজের মাঝে ফাঁক পেয়েছি তখনই এখানে ছুটে এসে একবার বেড়িয়ে গেছি!

হীরক হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল; বাগানের চেয়ে সেবার আর কিছু যে প্রিয় নয় এই কথা শুনিয়া হীরকের মন যেন দুঃখ অনুভব করিল; যে বাগান দেখিয়া হীরক এই একটু আগে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বাগানটা তার চক্ষুশূল মনে হইতে লাগিল, জড় বাগানটার উপর কেমন একটা সপত্নীহিংসা তার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল; বাগানটাকে যত তার সুন্দর লাগিতেছিল, বাগানের মধ্যে যত নূতন পরিবর্ত্তনে সেবার হাতের প্রসাধনের বা মনের আগ্রহের যত্নের পরিচয় পাইতেছিল, হীরক ততই ঈর্ষাকুল হইয়া পড়িতেছিল!

হীরককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবা বলিল—এখন বাড়ী ফিরে যাই; প্রথম দিনই বেশী বেড়ালে কষ্ট হবে।

হীরক কোনো কথাই বলিল না। সেবা হীরককে ফিরাইয়া লইয়া বাড়ীতে চলিল। হীরক বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারার আনন্দের উৎসাহের মুখে উপর হইতে নীচে নামিবার অসুবিধা ও কষ্ট গ্রাহ্য করে নাই; কিন্তু এখন মনের অবসাদের অবস্থায় তার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল—চাকরদের কাঁধে চড়িয়া টানা-হেঁচড়া সহিয়া তাকে উপরে উঠিতে হইবে। হীরক বিরক্ত স্বরে বলিল—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি সেবা! আমায় টেনে নামিয়ে আন্‌লে, আবার টেনে ওপরে তুল্‌বে, টানাহেঁচড়া আমার ভালো লাগ্‌ছে না একটুও!

সেবা হাসিমুখে বলিল—আর টানাহেঁচড়া দরকার হবে না। যতদিন আপনি নিজে হেঁটে উঠ্‌বেন ততদিন আপনাকে ওপরে তুল্‌ব না।

হীরক বিরক্ত স্বরেই বলিল—তবে থাক্‌ব কোন্ চুলোয়?

সেবা কৌতুকভরা স্বরে বলিল—চলুন না দেখ্‌বেন।

সেবার কথায় হীরকও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া রহিল। হীরক বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল বাড়ীর নীচের তলার দালান হইতে যে সিঁড়ি বাগানে নামিয়া আসিয়াছে, তারই এক পাশে একটা খুব ঢালু পথ বাঁধানো হইয়াছে; সেবা সেই পথ দিয়া অনায়াসে ও হীরকের অক্লেশে গাড়ী ঠেলিয়া দালানে তুলিল। এই বিস্ময় না জানি আরো কি বিস্ময়ের অগ্রদূত তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া হীরক নীরবে কৌতূহলী দৃষ্টি চারিদিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সেবা তার গাড়ী ঠেলিয়া নীচের তলার মাঝখানের বড় ঘরটিতে লইয়া আসিল। হীরক বিস্মিতনেত্রে দেখিল সেই ঘরটি শয়নকক্ষ করিয়া পরিপাটী-রূপে সাজানো হইয়াছে এবং সেই নীচের ঘরে বাস করিবার উপযুক্ত সমস্ত আয়োজনই আশে-পাশে চারিদিকে করা হইয়াছে। হীরক আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত সব জোগাড় কবেই বা কর্‌লে আর কেনই বা করেছ সেবা?

সেবা বলিল—আপনি ভালো হয়ে উঠ্‌লে আপনি যাতে বাগানেরই মধ্যে থাক্‌তে পারেন আর সকাল-বিকাল বাগানে বেড়াতে পারেন তার জন্যেই এই ব্যবস্থা করিয়েছি।

সেবার কথায় মনে মনে খুসী হইয়াও হীরক চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তার মনের খুসী তার চোখ-মুখের উজ্জ্বলতা দেখিয়া সেবার অগোচর রহিল না। সেবাও প্রফুল্ল মুখে হীরককে চেয়ার হইতে চাকরদের সঙ্গে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া ঢাকা দিতে লাগিল। হীরক বিছানায় শুইয়াই দেখিল তার বিছানার কাছেই একটি সুন্দর খাঁচায় দুটি ক্যানারীপাখী মৃদুমধুর শিশ দিয়া চঞ্চল হইয়া খেলা করিতেছে, আর সেবার দেওয়া দুটি বাঁশের ফুলদানীতে দুটি ফুলের তোড়া হইতে শোভার আনন্দ ও পুষ্পপ্রাণের সুগন্ধ ঘরখানিকে ভরিয়া তুলিয়াছে।

(১৪)

সেবা দেখিল হীরকের বাগানে নামিয়া বেড়াইতে পারার আনন্দ ও উৎসাহ পরদিন হইতেই হ্রাস পাইতে লাগিল; সে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে চায় না, অনুরোধ করিলে বিরক্ত হয়। তখন সেবা আবার নূতন কোন্ উপায়ে হীরকের মনে আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতে পারিবে তাই ভাবিয়া স্থির করিতে মনকে ব্যাপৃত করিয়া দিল। হঠাৎ তার মনে পড়িল—আনন্দ-বাবু যেদিন সেবাকে বিবাহ করিতে হীরককে অনুরোধ করিতে যান, সেদিন হীরক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, আমি আমার সমস্ত জমিদারী রমার নামে মেয়েস্কুল করিবার জন্য দান করিয়া ফেলিব। এখন সেবা যদি এই সৎকর্ম্মের আয়োজন করিতে পারে তবে হয়ত হীরককে উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারিবে। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সেবা একদিন হীরককে বলিল—দেখুন, আপনি ত একলা মানুষ, এতবড় জমিদারীটা নিয়ে কর্‌বেন কি?

একলা মানুষ! কথাটা ঝাঁত করিয়া হীরকের বুকে গিয়া বাজিল। সে অবাক বিস্ময়ে দৃষ্টি ভরিয়া সেবার দিকে চাহিল। সেবা বলিতে লাগিল—আপনার জমিদারী দান কোরে ফেলুন মা আর দিদির নামে; তা থেকে মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কর্‌লে দেশের মস্ত উপকার করা হবে।

হীরক রাগ করিয়া একদিন নিজে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, সেবা আজ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া তাকে তার ভোলা ইচ্ছা স্মরণ করাইয়া দিল মাত্র; কিন্তু হীরকের আজ এ প্রস্তাব মোটেই ভালো লাগিল না; সেবা যে দেশের উপকার করিতে উপদেশ দিতে আসিয়াছে ইহা হীরকের কাছে কেমন জ্যাঠামি বলিয়া মনে হইল; তার উপর আবার সেবা তাকে বলিল—একলা মানুষ বই ত না! তবে কি সেবা তার সঙ্গে বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতেছে না? সেবা কি তবে তাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না? সেবার এই যে সব যত্ন শুশ্রূষা, সে কি পেশাদার ধাত্রীর কেবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও প্রথাপালন মাত্র? হীরকের মন ক্ষোভে দুঃখে বিরক্তিতে সন্দেহে ছাপোছাপো হইয়া উঠিল; সে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না, গম্ভীর স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। হীরককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবা আবার বলিল—আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক; আপনার মাসে পাঁচ-শ টাকা হলেই স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পারে। আপনার জমিদারীর আয় বছরে প্রায় বত্রিশ হাজার টাকা; আপনার জন্যে বছরে সাত-আট

হাজার টাকা রাখ্‌লেও বছরে চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয় হতে পার্‌বে; নগদে আর কোম্পানীর কাগজেও প্রায় দুলাখ টাকা জোমে আছে, তাই দিয়ে কাজের গোড়া পত্তন, স্কুলবাড়ী ইত্যাদি হতে পার্‌বে।

হীরকের গলা পর্য্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে কষ্টে কথা উচ্চারণ করিয়া বলিল—তুমি ত এই অল্পদিনের মধ্যেই আমার পুঁজি-পাটা যেখানে যা আছে তার সব খবর নিয়ে চুকেছ দেখ্‌ছি। স্ত্রীশিক্ষা আর আমার personal খরচের জন্যে ত সব ভাগ-বাঁটোয়ারা কোরে ফেল্‌লে। কিন্তু তোমার নিজের ত কোনো ব্যবস্থা কর্‌লে না?

হীরকের কথার ধরণে সেবার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল; তার মনে হইল সে বলে—'আমি ত আপনার স্ত্রী, আমার ব্যবস্থা কর্‌বেন আপনি।' কিন্তু হীরকের মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী তাকে এ কথা বলিতে দিল না, সে ঢোক গিলিয়া নিজের ভাববিলাসিতার ক্ষণিক ইচ্ছা দমন করিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—আমার ব্যবস্থা কি আর আমি করিনি ভাব্‌ছেন? মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর, নিজের ভাবনা সে সবার আগে ভাবে। মেয়েস্কুলে ত শিক্ষয়িত্রীর দর্‌কার হবেই, তারই একটা চাকরী আমায় দেবেন।

চট করিয়া এই কথা বলিতে জোগাইল বলিয়া সেবা নিজের উপর খুসী হইয়া উঠিল, এবং সেই সন্তোষে তার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হীরক কিন্তু বিষণ্ণ গম্ভীর হইয়া পড়িল; সেবা যে তার কাছে চাকরী করিতেছে এবং চাকরীই করিবে মনে করিতেছে, ইহা হীরকের মনে আঘাত করিল। হীরক অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—আচ্ছা, ম্যানেজার-বাবুকে বল্‌ব একটা দানপত্র উকিলকে দিয়ে তৈরি কর্‌তে।

সেবা আনন্দিত হইয়া বলিল—আমি একটা তৈরি করিয়ে রেখেছি, দেখ্‌বেন?

হীরক সেবার এই অতি আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; তার মনে হইল সেবা যেন তাড়াতাড়ি জেদ করিয়া তার সমস্ত সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করিতে যাইতেছে। হীরক বিরক্তি চাপিয়া বলিল—দেখি।

সেবা তাড়াতাড়ি একটা দলিল বাহির করিয়া আনিয়া হীরকের হাতে দিল; হীরক সেবার কর্ম্মের সম্পূর্ণতা ও তৎপরতা দেখিয়া যত আশ্চর্য্য হইতেছিল, তত তার মন বিরক্তও হইয়া উঠিতেছিল; হীরক আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া দেখিল একেবারে ষ্ট্যাম্প-কাগজে পাকা দলিল লেখা প্রস্তুত হইয়া আছে, কেবল দাতা ও সাক্ষীদের সই করিতে মাত্র বাকী। হীরক নিজের অজ্ঞাতে এই দানপত্রে কিসের জন্য কি করিবার উদ্দেশ্যে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় তার সর্ব্বস্ব দান করিয়া দিতেছে তাহা অতি আগ্রহে পড়িয়া দেখিতে লাগিল—সে স্বর্গীয়া মাতার স্মৃতিরক্ষার জন্য সুমতি মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ও ঐ বিদ্যালয় হইতে যে-সব মেয়ে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাদের উচ্চ-শিক্ষালাভের সুবিধা হইবে বলিয়া পরলোকগত পত্নী রমার নামে বৃত্তি প্রদানের জন্য নিজের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করিতেছে; কেবল সে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে এই বাগানবাড়ীতে তার সম্পূর্ণ দখল ও অধিকার থাকিবে এবং তার নিজের খরচের জন্য মাসে মাসে পাঁচশত টাকা সে মাসহারা পাইবে; তার মৃত্যুর পর এই বাড়ী ও টাকাও উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পত্তি হইবে, এবং রমা-বৃত্তি-প্রাপ্ত কোনো মেয়ে এখানকার উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদেশে বিদ্যা সম্পূর্ণ করিতে যাইতে প্রস্তুত হইলে সেই টাকা হইতে তাকে হীরক-বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই দানের ট্রাষ্টী হইবে তিনজন—দাতা হীরক নিজে, আনন্দ-বাবু, এবং সেবা; এই তিনজনের মধ্যে কারো মৃত্যু হইলে অপর দুজন একমত হইয়া অপর কাহাকেও তৃতীয় ট্রাষ্টী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। হীরক তার অজ্ঞাতসারে এমন আটঘাট-বাঁধা দানপত্র প্রস্তুত হইয়া আছে দেখিয়া এমন চটিয়া গিয়াছিল যে সে লক্ষ্যই করিল না সেবা নিজের জন্য হীরকের সম্পত্তি হইতে এক পয়সা পাইবারও ব্যবস্থা রাখে নাই; হীরকের মনে হইল সেবাই সমস্ত সম্পত্তিটা ঠকাইয়া নিজে দখল করিবার জন্যই এই ফন্দি আঁটিয়াছে। সেবার ফাঁকি যে হীরকের পরলোকগত মা ও স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার মুখোস পরিয়া হীরককে ঠকাইতে আসিয়াছে এতেই হীরকের আরো বেশী রাগ ও ঘৃণা হইতেছিল। সে ঘৃণার তলায় রাগ চাপা দিয়া বলিল—কাকে কাকে সাক্ষী কর্‌বে ডেকে আনো, আমি যদি লিখ্‌তে পারি ত এখনি সই কোরে দিচ্ছি, পরে রেজেষ্টারী কোরেও দেবো।

এত সহজে হীরককে সম্মত হইতে দেখিয়া সেবা উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আমি দাদামশায়কে গিয়ে বল্‌ছি।

সেবা আনন্দ-চঞ্চল পদে ঘর হইতে প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল; সেবার প্রফুল্লতা ও উৎসাহ দেখিয়া হীরকের সন্দেহ আরো ঘন হইয়া উঠিল, সে সমস্ত সংসারটার উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়া-রহিল।

আনন্দ-বাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেবা ফিরিয়া আসিল। আনন্দ-বাবুকে দেখিয়াই হীরক বলিয়া উঠিল—আমি সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞ কর্‌ছি জ্যাঠামশায়। সেবা আমার পুরোহিত।

আনন্দ-বাবু হাসিমুখে বলিলেন—এ তোমার মতন মহৎ-প্রাণ যুবার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে বাবা; তোমার এই আদর্শে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ তোমা হতে মুক্ত হবে। সেবা তোমারই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী!

আনন্দ-বাবুর কথায় হীরক ও সেবার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—দুজনার মুখে, দুই কারণে। আনন্দ-বাবুর মুখে হীরকের প্রশংসায় ও হীরকের সহধর্ম্মিণী বলিয়া নিজের পরিচয়ে সেবার মুখে হাসি ফুটিয়াছিল; আর হীরক হাসিয়াছিল এই ভাবিয়া যে এই ছদ্মরূপিণী সয়তানীর কুহকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যুবক হইলেও এই কুহকের মধুর মোহে সে ভোলে নাই। হীরক যে প্রতারিত না হইয়া যেন সে প্রতারিত হইতেছে এই ভাব দেখাইয়া সেবাকেই প্রতারিত করিতে পারিতেছে এই কৌতুকের আনন্দে সে সহজেই কলম ধরিয়া দানপত্র সই করিয়া দিল, এবং তার সাক্ষী হইল গ্রামের চার-পাঁচজন মাতব্বর ভদ্রলোক।

গ্রাম জুড়িয়া হীরকের এই বয়সে এই মহৎ দানের প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল; খবরের কাগজের মারফতে এই সংবাদ দেশেবিদেশে ছড়াইয়া গেল। হীরক খবরের কাগজে নিজের প্রশংসা দেখিয়া আনন্দের চেয়ে কৌতুক অনুভব করিল বেশী। কিন্তু তার মন সেবার উপর বিষ হইয়া উঠিল, সেবাকে দেখিলেই তার মন এমন বিরক্ত হইয়া উঠিত যে সে তখনি স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া পড়িত।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-পরিচয়

বাঘের বাচ্চা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল্-এম্-এস প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবিজয়কুমার মৈত্র, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৭০ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা।

প্রাঞ্জল ঝরঝরে ভাষায় লেখা নূতন ধরণের 'ডাক্তারী' উপন্যাস। রচনায় লেখকের হাত আছে। চিন্তাশীলতারও পরিচয় আছে, তবে সে ছাড়া-ছাড়া ভাবে; নায়ক-নায়িকারা সুবিধা পাইলেই বক্তৃতা সেগুলি প্রচার করিতেছে। গল্পটিকে ঘোরালো করিবার জন্য কতগুলি এপিসোড জুড়িয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে হযবরল করিয়া লেখক ক্ষান্ত হইয়াছেন, গল্প বলিবার স্বাভাবিক শক্তির অভাবে সমস্তটা ঘোলাটে হইয়া চাপ বাঁধে নাই। চরিত্রগুলির বেলাতেও এইরকমই দোষ ঘটিয়াছে, লেখক সবগুলিকেই স্বতন্ত্র এবং সুন্দর করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু গল্পের মধ্য দিয়া তারা আপনা হইতে ফুটিয়া ওঠে নাই। আমাদের মনে হয়, চারিশত পৃষ্ঠা জুড়িয়া অনাবশ্যক স্ফীত না করিলে এটি একটি ভালো বই হইতে পারিত। ছোট রচনায় কিছুদিন হাত পাকাইয়া লইলে লেখক হয়ত ভবিষ্যতে সাহিত্যে উপাদেয় জিনিষ দিতে পারিবেন।

কেরাণী বাবু—সামাজিক প্রহসন। শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত। প্রাপ্তিস্থান—"সারস্বত ভবন", ১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

৫৬ পৃষ্ঠা। বাঁধাই ভালো। ছাপা কাগজ চলনসই।

সন্ধানী আলো।

জহান্-আরা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—দি নবদান বুক ডিপো, ১৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৮। মূল্য ১।০।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাহজহান' অভিনীত হইবায় পর বাঙালী আপামর সাধারণের সম্রাট-নন্দিনী জহান্-আরার সহিত পরিচয় হইয়াছে। সেখানে তিনি দারার একান্ত হিতৈষিণী ভগ্নী, পিতৃসেবা নিরত দুহিতা, মূর্ত্তিমতী কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং পিতৃদ্রোহী ঔরংজীবের শত্রু। শেষ অঙ্কে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে তিনি ঔরংজীবকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার ও ফরাসী সওদাগর টেভার্নিয়ার জহান-আরা সম্বন্ধে অস্বাভাবিক কলঙ্ককাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন, ভিনীসের পরিব্রাজক মেনুসী তাঁহার বিরাট গ্রন্থে বার্ণিয়ার ও টেভার্নিয়ারের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু কুৎসিত কাহিনীর প্রচারের প্রতি মেনুসীর বিশেষ আসক্তি ছিল বলিয়াই হউক অথবা মুঘল অন্তঃপুরের ও অন্তঃপুরিকাদিগের সকল গুপ্ত কাহিনীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিবার জন্যই হউক মেনুসীও আবার জহান-আরার কতকগুলি কুৎসা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

নাটকের জহান-আরা, বর্ণিয়ার টেভার্নিয়ার ও মেনুসীর জহান-আরা, ইতিহাসের জহান-আরা দারার পক্ষপাতিনী কিন্তু ঔরংজীবের প্রতি তাঁহার বিরাগ নাই। তাঁহার পিতৃভক্তি অনন্যসাধারণ, তাঁহার দয়া সরলতা কোমলতা অনুকরণীয়। তাঁহারই অনুরোধে বৃদ্ধ শাহ জহান অন্তিমশয্যায় পিতৃদ্রোহী পুত্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন।

ফারসী ও ইংরেজী প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে বিশেষ নিপুণতা

ও নিরপেক্ষতার সহিত ব্রজেন্দ্র-বাবু জহান-আরার পবিত্র জীবন-কাহিনী সঙ্কলন করিয়াছেন। রচনার গুণে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে।

জহান-আরার জীবনের ঘটনা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়দ্রাবক। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রবলপ্রতাপান্বিত জনপ্রিয় বাদ্‌শাহ শাহজহানের কারাগারে মৃত্যু, যুবরাজ দারার অপ্রত্যাশিত পরাজয় ও করুণ মৃত্যুকাহিনী, সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করে। এতদিন অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ইংরেজী ইতিহাস ব্যতীত এই-সকল ব্যাপারের সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার উপায় ছিল না। ব্রজেন্দ্র-বাবুর জহান-আরা পুস্তকেও এইসকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে প্রমাণপঞ্জী গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। জহান-আরা সর্ব্বপ্রকারেই ব্রজেন্দ্র-বাবুর যশোবৃদ্ধি করিবে। ছাপা কাগজ চিত্র ও বাঁধাই সকলই উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান চড়াদামের বাজারে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুখপাঠ্য নির্ভুল ঐতিহাসিক গ্রন্থখানির ১।০ দাম মোটেই অধিক হয় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বিচিত্র জগৎ—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৫৪; মূল্য ২৲।

গ্রন্থে এই নয়টি প্রবন্ধ আছে—(১) বিজ্ঞানবিদ্যায় বাহ্যজগৎ, (২) ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, (৩) বাঙ্ময় জগৎ, (৪) জড়জগৎ, (৫) বৈজ্ঞানিকের আকাশ, (৬) প্রাণময় জগৎ, (৭) প্রাণের কাহিনী, (৮) প্রজ্ঞার জয়, (৯) চঞ্চল জগৎ।

প্রবন্ধসমূহ "ভারতবর্ষ" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—উভয় তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে, তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই ইহার বিশেষ আলোচনার বিষয় এবং তাহাতেই গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য। গ্রন্থকারের দার্শনিক মতামত এবং বিচারপ্রণালী বর্ত্তমান যুগে আদরণীয় হইবে না; তিনি Bain (বেন) সাহেবের যুগ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিতে পারেন নাই।

যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান জানেন, তাঁহাদের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া প্রীতি হইবেন। কিন্তু অপরের পক্ষে এ গ্রন্থ দুর্ব্বোধ্য। বহুস্থলে ইংরেজী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার বাঙ্গলা দেওয়া হয় নাই বা দেওয়া সহজও নহে।

পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা—শ্রীসুকুমার হালদার প্রণীত (Published by Sanatkumar Haldar at Samlong Farm, Ranchi) পৃঃ ৯৬; মূল্য জানা যায় নাই।

ড্রেপার, লেকী (Draper, Lecky) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে খৃষ্টানধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্যতাকে বাধা দিয়া আসিতেছে। যখনই কোন মহাপুরুষ কোন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, তখনই খৃষ্টান-সমাজ তাঁহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিয়াছে। নূতন মত প্রচার এবং গ্রহণের জন্য যে কত লোককে হত্যা করা হইয়াছে তাহার সীমা নাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রথম হইতেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার বিরোধী।

ইংলণ্ডে Rationalistic Association নামক একটি সমিতি আছে। ইহার প্রায় সমুদয় সভ্যই খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরোধী; ইঁহারা যে কেবল খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরোধী তাহা নহে, ইঁহারা প্রায় সকলেই ধর্ম্মের বিরোধী। ইঁহারা নানা উপায়ে ধর্ম্মের ও বিশেষ ভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদিগের গ্রন্থকারও খৃষ্টান ধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী এবং এই বিদ্বেষ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। Rationalistic Associationএর গ্রন্থসমূহ এবং অপরাপর স্থল হইতে অনেক ঘটনা এই পুস্তিকাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই-সমুদয় ঘটনা হইতে Rationalistic সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন খৃষ্টান ধর্ম্ম অসার এবং সমুদয় ধর্ম্মই অসার, সুতরাং ধর্ম্মই পরিত্যাজ্য; কিন্তু আমাদিগের গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত খৃষ্টান ধর্ম্ম অসার, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মই সার। গীতার ভাষায় তিনি বলিতেছেন—

স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় শুন ধনঞ্জয়,
পরধর্ম্মে সর্ব্বদাই আছে মহাভয়।

গ্রন্থকারের ধারণা 'স্বকর্ম্ম' অর্থাৎ পিতা-পিতামহের ধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম; অর্থাৎ স্ব=পিতা পিতামহ কিংবা স্ব=হিন্দু। এ ধারণা অতি অদ্ভুত ধারণা। খৃষ্টান ধর্ম্ম অসার, সুতরাং "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়"—এ সিদ্ধান্তটাও অতি অদ্ভুত। গ্রন্থকার যদি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে তাঁহার 'স্বধর্ম্ম' এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম যে-সমুদয় অপরাধে অপরাধী, তাঁহার 'স্বধর্ম্ম' সে-সমুদয় অপরাধে অপরাধী নহে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থকার সে চেষ্টা করেন নাই এবং করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। প্রকৃত কথা এই—গ্রন্থকারের 'স্বধর্ম্ম' এবং খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম একই শ্রেণীর ধর্ম্ম। আমরা এখানে কেবল দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—"দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন খৃষ্টান মহাপুরুষ Irenaes বলিতেছেন—'পেগানগণ আমাদের দেনদার। পেগানরা পরিশ্রম ক'রে যা সঞ্চয় করেচে তা আমাদের বিনা পরিশ্রমে ভোগ করা কর্ত্তব্য।' তারপর সুবিখ্যাত St. Augustine প্রচার করেন, যে, খৃষ্টানরা সমস্ত হিদেন দেশের ধনের অধিকারী।" পৃঃ ১৫।

কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্রেও আছে—"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্কচিত্তে শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিবেন। মনু ৮।৪১৭।

বাইবেলে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদানের অধিকার এবং অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। আমাদের গ্রন্থকার মনে করেন যে স্ত্রীলোকদিগের বেদে অধিকার, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কোন নিষেধ-আজ্ঞা "খুঁজে পাওয়া যায় না" (পৃঃ ৯৬)। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা অন্যকথা বলেন। ভাগবতে আছে:—স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্ ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরা (১।৪।২৫) অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদিগের বেদে অধিকার নাই।

অত্রি সংহিতাতে বলা হইয়াছে:—জপস্তপস্তীর্থযাত্রা-প্রব্রজ্যা-মন্ত্রসাধনম্। দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি চ। (১৩৫) জীবদ্‌ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী। আয়ুষ্যম্ হরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ (১৩৬)॥ অর্থাৎ "জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতার আরাধনা—এই ছয়টি কার্য্য স্ত্রী ও শূদ্রের পাতিত্যজনক। যে নারী স্বামীর জীবিতাবস্থায় উপবাস করিয়া ব্রত করে, সে স্বামীর আয়ুহরণ করে এবং নরকে গমন করে।"

স্বয়ং মনু বলিয়াছেন:—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো
ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং। ৫।১৫৫

স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত বা উপবাস নাই। মনুর মতে স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্রদ্বারা কোন অনুষ্ঠান হইতে পারে না—তাহারা মন্ত্রবিহীন অর্থাৎ বেদে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহারা 'অনৃত'—মিথ্যা অর্থাৎ হীন এবং অপরার্থ:—

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ॥ মনু ৯।১৮।

মনু স্ত্রীলোক বিষয়ে এমন ভীষণ কথা বলিয়াছেন, যাহা নির্জ্জনে পড়িতেও লজ্জা বোধ হয় (মনু ৯।১৪-২০ দ্রষ্টব্য)।

খৃষ্টান ধর্ম্মে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যাহা করা হইয়াছে তাহা আরও গুরুতর।

হিন্দুধর্ম্ম খৃষ্টানধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে উচ্চতর খৃষ্টানধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, খৃষ্টান আদর্শ অপেক্ষা হিন্দু আদর্শ শ্রেষ্ঠ এবং আমাদিগের অধিকতর উপযোগী।

অনেক শিক্ষিত লোকেরও বিশ্বাস খৃষ্টান ধর্ম্মই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি। লোকের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করা আবশ্যক। বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে কোন পুস্তক লিখিত হয় নাই। এই পুস্তিকা দ্বারা আংশিক ভাবে এই অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার যদি বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে এই পুস্তিকা রচনা করিতেন তাহা হইলে আরও উপকার হইত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

গুপ্ত উপন্যাস—শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত। কলিকাতা ৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দুই টাকা। ২৩১ পৃষ্ঠা।

প্রাচীনদের মুখে শোনা আবহমানকাল চলিত কতকগুলি বৈঠকী গল্পকে গ্রন্থকার সুন্দর রচনাশক্তি এবং সাহিত্যরসবোধের দ্বারা এই গ্রন্থটিতে গ্রথিত করিয়াছেন। উচ্চ অঙ্গের রসিকতায়, মানবজীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয়ে এবং পরিকল্পনার ওস্তাদীতে গল্পগুলি বাস্তবিকই উপভোগ্য। অ-খ্যাতি অপরিচয়ের অন্ধকার কুক্ষি হইতে এগুলিকে উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠক-সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ছাপা-কাগজ ভালো। বাঁধাই প্রাইজের উপযোগী।

সন্ধানী-আলো।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলকের তিরোভাব—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ, প্রণীত ও প্রকাশিত। ভাষা-পরিষৎ-লিমিটেড, ২৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫। দাম দশ পয়সা।

পদ্যে লোকমান্য টিলকের দেশ-সেবা ও দেশ-প্রীতির বিবৃতি।

নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ—

৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅবনীনাথ ভট্টাচার্য্য, ১০৬।৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯০+৪। দাম আট আনা।

প্রবন্ধের বই। গ্রন্থকার মৃত। তিনি এক সময়ে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তাহা হইতেই অধিকাংশ প্রবন্ধ সঙ্কলিত। আধুনিক বাংলার প্রচলনের আগেকার লেখা। অতএব লেখাগুলির ভাষা স্থানে স্থানে সংস্কৃত-বহুল; তাহা হইলেও এগুলিতে যথেষ্ট চিন্তা ও শক্তির পরিচয় আছে। লেখকের যুক্তিপরম্পরা ও সমালোচনার কৌশল প্রশংসনীয়। বইখানি সাহিত্যসেবীদের পড়া উচিত।

মর্ম্মস্মৃতি—শ্রীসুরুচিবালা রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এল, ১৫ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮০। দাম এক টাকা।

গল্পের বই। বইখানিতে আটটি ছোট গল্প আছে। দুই একটি গল্প চলনসই; বাকিগুলি ভাল লাগে না। প্লট নিতান্ত মামুলি। বইটির ছাপা সুন্দর, বাঁধন মজবুত।

—সত্যানন্দ।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা।

(১৯)

(ক) ইংরেজি কোন্ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় ১৩২৭ সাল চলিতেছে। উহার প্রবর্ত্তক কে এবং কোন্ উপলক্ষে কেন উহার প্রবর্ত্তন হয়?

(খ) ভবভূতি ও বরাহমিহির কোন্ দেশের লোক?

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

(২০)

ফারসীতে লেখা পারস্যের উপকথা, আরবীতে লেখা আরবের উপকথা,—ইহাদের ইংরেজি অনুবাদ, প্রত্যেকখানি বইর পূরা নাম, গ্রন্থকার, রচনার স্থান ও সময় এবং প্রাপ্তিস্থান কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

এব্রাহিম খাঁ।

(২১)

"গজভুক্তকপিত্থবৎ"—এই কথার সত্যতা কেহ প্রমাণ করিয়াছেন কি?

শ্রীবিভূতিভূষণ বসু।

(২২)

(ক) বিজয়ার পর লোকে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া যথাযোগ্য নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ করে কেন? সিদ্ধি খায় কেন? ইহার প্রবর্ত্তক কে এবং ইহাতে কোন পৌরাণিকত্ব আছে কি না?

(খ) ঝটিকা ও ভূমিকম্পের সময় মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি করেন কেন?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা।

(২৩)

ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে বাঙ্গালী ব্যবসাদার আছেন? বোম্বাই ও মান্দ্রাজে আছেন কি না।

শ্রীরামাক্ষুক কর।

(২৪)

ভারতবর্ষে মোট কত টাকার কাপড় বিক্রী হয়? এইজন্য বিদেশে কত টাকা যায়? ব্রিটিশ ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে দেশী কাপড়ের কল আছে?

শ্রীসীতানাথ বণিক। ও শ্রীকালীপদ মিত্র।

(২৫)

ভারতবর্ষ হইতে ঐতিহাসিক যুগে সর্ব্বপ্রথমে যে বিখ্যাত মানী রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে কোন বাঙালী বিলাত গিয়াছিলেন কি না? এবং কে কি উদ্দেশ্যে বা উপলক্ষে গিয়াছিলেন?

শ্রীকলিন্দনাথ ঘোষ।

(২৬)

আমাদের দেশে ভেল্কী বা ভোজবাজী খেলায় যে আমীরাম সরকারের নাম শুনা যায় তাহার কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আছে কি না?

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

(২৭)

গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে কি না?

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ।

(২৮)

নবাব সর্‌ফরাজ খাঁর আমলে যে মহারাজ যশবন্ত সিংহ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন, তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল ?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মহাপাত্র।

(২৯)

সতরঞ্চ বয়ন শিখিতে পারা যায় এমন কোন স্থান দেশে কোথায় আছে ? তথাকার নিয়মাদি ও সুযোগ-সুবিধা কি রকম ?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

(৩০)

আমন ধান্যের অনেক জমিতে স্থানে স্থানে প্রায় এককাঠা ও ততোধিক স্থান ব্যাপিয়া সতেজ অবস্থায় ধান্যের থোড় (গর্ভ) হওয়া সত্ত্বেও শিষ বাহির হয় না। ইহাকে কৃষকরা "ঘেঁসে" পড়া বলে। ইহার কারণ ও প্রতিকারের উপায় কি ?

শ্রীজয়গোপাল ঘোষ।

(৩১)

হিন্দুদের হিন্দু সংজ্ঞা কতদিন হইতে হইয়াছে ? হিন্দু শব্দের অর্থ কি ?

শ্রীরামানুজাচার্য্য গোস্বামী ও শ্রীললিত সরকার।

(৩২)

মহাভারত ও রামায়ণ কত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল ? কোন্‌টি পূর্ব্বে এবং কোন্‌টি পরে ?

শ্রীনীরেন্দ্রপ্রতিম মাইতি।

(৩৩)

পৌরাণিক উপাখ্যানে বিষ্ণু কখন্ কি কারণে শনিকোপে গণ্ডকীতে শিলারূপ ধারণ করিয়াছিলেন ?

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৩৪)

কোন্ দেশ হইতে ও কোন্ সময়ে প্রথমে তাসের উৎপত্তি হইয়াছে ?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস।

(৩৫)

"মশারি" জিনিষটা কতকাল হইতে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইতেছে ? প্রাচীন কোন বাঙ্গলা সংস্কৃত, ফার্‌সি, আরবি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে কি না ?

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

(৩৬)

দুগ্ধে লবণ ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন ?

শ্রীসিদ্ধেশ্বর নন্দী।

(৩৭)

উইর উপদ্রবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত। উহার প্রতিকারের কোন সহজ উপায় কাহারও জানা থাকিলে তাহা জানাইলে বা কোন বৈজ্ঞানিক ইহার হাত হইতে উদ্ধারের কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিলে উপকৃত হইব।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

মীমাংসা।

১৪ প্রশ্নের উত্তর।

রাজসিংহের এই ফার্সী চিঠি-খানির বিশুদ্ধ অনুবাদ আমার History of Aurangzib, Vol. III এবং Shivaji and His Times, 2nd ed.এ সম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছে।

"শান" = শাম, Syria.

'সপ্ত-ঋতু জনপদ", ফার্সী হফ্‌ৎ ইক্‌লিম্ শব্দের খারাপ অনুবাদ, অর্থ "সাত প্রকার climateএ বিভক্ত এই বিশ্বজগৎ।"

যদুনাথ সরকার।

শান—ছাপার ভুল। শব্দটি শাম। আধুনিক সিরিয়ার প্রাচীন নাম। ফার্সী ভাষায় "ইরাণ"-এর সহিত "তুরাণ" ও "শাম"-এর সহিত "রূম" প্রায়ই ব্যবহার হয়। অর্থ "পৃথিবীর সকল দেশ।"

সপ্ত-ঋতু জনপদ :—ফার্সী সাহিত্যে "ভূমণ্ডল"-এর জন্য প্রায়ই "হফ্‌ত্ অক্‌লীম" অর্থাৎ "সপ্তমহাদ্বীপ" ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ভূগোললেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সপ্ত মহাদ্বীপের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা :—

১। ভূমধ্যরেখার ১০° অংশ উত্তর হইতে ১০° দক্ষিণ অতি উষ্ণ দেশ।
২—৩। উত্তরে ১০° হইতে ৩০° ও দক্ষিণে ঐরূপ উষ্ণ দেশ।
৪-৫। উত্তরে ও দক্ষিণে ৩০° হইতে ৫০° পর্য্যন্ত নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশ।
৬-৭। উত্তরে ও দক্ষিণে ৫০° হইতে ৭০° পর্য্যন্ত শীতপ্রধান দেশ।
৭০° অংশের পর মনুষ্যবাসোপযোগী স্থান নহে।

ভূগোললেখকেরা যদিও এরূপ লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রথম যখন হফ্‌ৎ অক্‌লীম বলা হইয়াছিল তখন ঋতুবিভাগ কল্পনা করা হয় নাই। আকাশ-স্বর্গ বা ফলক সাতটি, সমুদ্র সাতটি, দিন সাতটি ; সেইরূপ মহাদেশও সাতটি বলা হইয়াছিল।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

১ নং প্রশ্নের উত্তর।

সংস্কৃতে উপন্যাস শব্দের অর্থ বাক্যোপক্রম। কিন্তু আজকাল উপন্যাস সংস্কৃত আখ্যায়িকা ও ইংরেজি Novel, Romance,

নাটক—দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্। অভিনেয় যাহা তাহাই দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটক। সংস্কৃতে নাটক দৃশ্যকাব্যের ভেদমাত্র। বাংলায় কিন্তু নাটক শব্দ দৃশ্যকাব্য মাত্র পরে হইয়াছে।

উপন্যাস—শ্রব্য অথবা পাঠ্য। ইহাই নাটকের সহিত বিভিন্নতা। তাহা ব্যতীত উভয়ই রস ও ভাবের অনুকূল হওয়া চাই। এবং প্রত্যেকেই অবান্তর বর্ণনা মূলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সেই রসের পরিপূর্ণতা সাধন করিবে। মোট কথা—নাটক দৃশ্য অভিনেয়, আর উপন্যাস শ্রব্য ও পাঠ্য।

৬নং প্রশ্নের উত্তর।

খ। 'পৌষাদি চতুরো মাসান্ জ্ঞেয়া বৃষ্টির্ অকালজা' এই শ্রীপতি-বচনে বোঝা যাইতেছে—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে তাহাকে অকালবর্ষণ বলে। সেই অকালবৃষ্টি অথবা অকালে মেঘ ডাকিলে উপনয়ন নিষিদ্ধ হয়। প্রমাণ—

"আকালিকীং বৃষ্টিম্ অবেক্ষ্য গন্তা
পদং ন গচ্ছেচ্ ছুভম্ আত্মনীচ্ছন্।
ক্ষৌরং ব্রতঞ্চাপি শুভাভিলাষী
কদাপি নৈবং মনসাপি কুর্য্যাৎ।"

অথবা

"ব্রতে হ্যস্মি পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং বারিদো যদি গর্জ্জতি।
তদ্দিনং স্যাদ্ অনধ্যায়ং ব্রতং তত্র ন কারয়েৎ।"

উভয় স্থলে ব্রত শব্দের অর্থ উপনয়ন।

কালবৈশাখী স্বাভাবিক বলিয়া উহাতে ক্রিয়া পণ্ড হয় না। যাহা ঔৎপাতিক—তাহাই দোষের।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রী-গৃহস্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন চাউল ও ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে এমন কোন শস্য আছে কি না। ইহার উত্তরে জনৈক মহিলা "মাড়ুয়ার" নাম করিয়াছেন। ছোটনাগপুরে চাষারা চাউলের পরিবর্ত্তে মকাই কোদো এবং গুঁন্দলি ব্যবহার করে। ঐগুলির মধ্যে শুধু ভুট্টা ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। মকাই যে কেবল ছোটনাগপুরের লোকেরাই ব্যবহার করে তাহা নহে, পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরাও বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রায়ই বৎসরের অর্দ্ধাংশ সময় উহারা ঐসব শস্য খাইয়া কাটাইয়া থাকে।

মকাই ঢেঁকিতে কুটিয়া আটা করে। আর যে-সব অংশ কোটা যায় না সেগুলিকে জলে সিদ্ধ করে, সিদ্ধ হইলে পর ঐ মকায়ের গুঁড়া (আটা) ফুটন্ত জলে আস্তে আস্তে ঢালিয়া জলের সহিত মিশায়। তারপর মিনিট কুড়ি সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া লয়। ইহা অনেকটা বার্লি তৈয়ার করার মত, কিন্তু অনেক বেশী ঘন করিতে হয়। ইহাকে বলে লাপ্‌সী। মকায়ের আটা হইতে উহারা সুন্দর রুটি তৈয়ার করে, কখন কখন দানা ভাজিয়া খই খায়। আর যে-সব দানা ভাজিবার সময় ভাল খই হয় না, সেগুলিকে ঢেঁকিতে কুটিয়া ছাতু করিয়া খায়। কাঁচা অবস্থায় আগুনে পোড়াইয়া খাইতে বেশ লাগে।

ভুট্টা পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা অত্যন্ত গুরুপাক। ভুট্টা জলা-ভূমিতে জন্মায় না, কিন্তু মিশ্রিত (এঁটেল+সরবালি) দোআঁশ মাটীতে বেশ জন্মে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ কিংবা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রথম বৃষ্টির পর মাটী একটু সরস হইলে ভুট্টা বুনিতে হয়। পচা গোবরই ইহার প্রধান সার। প্রতি একর জমিতে ১০ গাড়ি (গরুর) সার দিলেই যথেষ্ট হয়। সার উত্তমরূপে ছড়াইয়া প্রথম বৃষ্টির পর উপর্য্যুপরি তিন-চার বার চাষ দিতে হয়। বুনিবার সময় মাটীর অবস্থা পরীক্ষা করিতে হয়—হাতে এক মুঠো মাটী লইয়া বার বার চাপ দিয়া যদি হাত ভিজা ভিজা বলিয়া মনে না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ভুট্টা বুনিবার জন্য মাটী তৈয়ার হইয়াছে।

গাছ প্রায়ই ৭।৮ ইঞ্চির হইলে কোদাল দিয়া চারিদিককার মাটী গোড়ায় দিতে হইবে। প্রায় ১০।১২ দিন পরে আর-একবার ঐ রকম মাটী দিতে হইবে। মাটী দেবার সময় গাছের চারিপাশের আগাছাগুলিও তুলিয়া ফেলা হয়। ভুট্টা পাকিতে প্রায় আড়াই মাস লাগে।

কোদো ও গুঁন্দলির বিষয় পরে লিখিব।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়।

(১০)

(ক) ইংরেজ সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৫১ কোটি টাকা দিয়া ভারতবর্ষ খরিদ করেন। ঐ টাকা ভারত-তহবিল হইতে দেওয়া হয় নাই। ঋণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঋণ এক্ষণে সুদে বাড়িয়া প্রায় ৭৬৷৷ কোটী টাকা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের মোট ঋণ হইয়াছিল [redacted] কোটী টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে ভারতীয় ধনবানের নিকট [redacted] কোটী ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ঋণ করা হইয়াছে, অবশিষ্ট ইংলণ্ডের মহাজনদের নিকট ধার করা হইয়াছে। জার্ম্মান সময় ইহা ছাড়া আরও অনেক টাকা ঋণ হইয়াছে। তাহার পরিমাণ সঠিক এক্ষণে জানিতে পারা যায় নাই।—শ্রীঃ।

(১৮)

উন্নত প্রণালীর হ্যাণ্ডলুম খুব সম্ভবতঃ কলিকাতায় পাওয়া যায় না। The Bengal Home Industries Association (মজুমদার বিল্ডিংস্) সম্প্রতি খোঁজ করিয়াছিলাম, সেখানে পাই নাই। কিন্তু এ-সকল বিষয়ে সুদক্ষ একটি কর্ম্মচারীর নিকট জানিলাম যে এই হ্যাণ্ডলুম নিম্নলিখিত ব্যক্তি সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট পত্রাদি লেখা প্রয়োজন—ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ নন্দী, পোঃ ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কুমিল্লা। মূল্য বোধ হয় ১০৲ টাকা আন্দাজ হইবে।

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেন।

মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে বাসকালে একদিন অধ্যাপকগণের সহিত আলোচনাক্রমে বলিয়াছিলেন যে আজকাল আহমাদাবাদ সহরে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক চরকায় সূতা কাটে এবং কাপড় বুনে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে এক লক্ষ টাকা বিতরণ করিয়াছেন। আহমাদাবাদে সাবরমতীতে তাঁহার আশ্রমে দেশী কাপাস হইতে চরকায় কাটা সূতায় হাতের তাঁতে কাপড় বোনা হয়। তাঁহারা সকলেই ঐ কাপড় ব্যবহার করেন—তাঁহার গায়ে ঐ কাপড় দেখিলাম। সন্তোষবাবু যখন ঐ দিকে গিয়াছিলেন তখন তিনিও ঐ কাপড় আনিয়াছিলেন এবং এখন ব্যবহার করিতেছেন।

যদি মহাত্মাজীর আশ্রমে চিঠি লেখা যায় তবে ঐ সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যাইবে। সেখানে improved handloomও পাওয়া যায় শুনিয়াছি। মহাত্মাজীর আশ্রমের ঠিকানা—Mahatma M. K. Gandhi, The Asram, Sabarmati, Ahmadabad.

ঃ।

ত্রিপুরার সুসন্তান কর্ম্মবীর খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় সূতা কাটিবার চরকা, উন্নতপ্রণালীর হ্যাণ্ডলুম প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি অর্ডার পাইলেই এইসব তৈয়ার করাইয়া দেন। দিয়াশলাইর কল ও বোতামের কল প্রচলনের জন্যই খুব চেষ্টিত বলিয়া অর্ডার ব্যতীত বিক্রির জন্য হেণ্ডলুম তৈয়ার করেন না। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী কালীকচ্ছ, সরাইল, ত্রিপুরা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে হ্যাণ্ডলুমের দাম ৩৪৲ টাকার বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে কাঠ ও লোহার দাম বেশী বলিয়া তৈয়ার করিতে যাহা ব্যয় পড়ে তাহাই দিতে হয়। স্বদেশীর সময় এই হ্যাণ্ডলুম ১১।১২ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন।

শ্রীশিবেন্দ্রলাল দত্ত।

ঢাকা, ইষ্ট বেঙ্গল শিল্পসমিতি রায়সাহেবের বাজার ঠিকানায় অনেক হ্যাণ্ডলুম বিক্রয় হয়। দাম ২ টাকা হইতে ৩ টাকার মধ্যে। ইষ্ট বেঙ্গল শিল্পসমিতির ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমোহিতমোহন রায় চৌধুরী।

(২৪)

ভারতবর্ষে বস্ত্র ও কার্পাসসূত্রের প্রস্তুত অন্যান্য জিনিস ১৯১৮ ১৯১৯ সালে বিদেশ হইতে আমদানী হয়—৬৮ কোটি ২০ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ টাকার; কেবল ধুতি ও শাড়ী আমদানী হয়—১ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬ শত ৫৫ টাকার।

—কায়স্থপত্রিকা, ভাদ্র।

(১৬)

(১) Protoplasm—জীবমূল, জৈবণিক, প্রাণপঙ্ক, জীবাণি।
(২) Nucleus—ডিম্বাষ্ঠ, ডিম্বকেন্দ্র, কোষনাভি।
(৩) Cell—কোষ, বুদ্বুদ, গর্ভ।
(৪) Plastids—কোষকণিকা।

প্রতিশব্দগুলির মধ্যে অধিকাংশই উদ্ভিদশাস্ত্রবেত্তাগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। বাকীগুলি আমার দ্বারা গঠিত বা প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত। ২।১টি ইতিপূর্ব্বে স্থলবিশেষে ব্যবহারও করিয়াছি।

'পিয়েমড'।

1. Protoplasm = (১) জৈবনিক (বঙ্কিমচন্দ্র)
   (২) জীবসামগ্রী (জগদানন্দ রায়)
2. Nucleus = সজীবাণু।
3. Cell = জীবকোষ কিম্বা কোষ।
4. Plastids = চক্রাণু।

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের যে তালিকা বাহির হইয়াছে তাহা এখনও অসম্পূর্ণ। "কৃষ্ণকান্তের উইল" অনুবাদক দক্ষিণাচরণ রায় "যুগলাঙ্গুরীয়" (The Two Rings) এবং "রাধারাণী" ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীরাইমোহন দে মজুমদার।

Protoplasm = প্রাণসামগ্রী, প্রাণাধান। Cell = কোষ; Nucleus = কোষবিন্দু, বিন্দুচিহ্ন; Plastids = প্ল্যাস্টিড্‌স্ (Plastidsএর বাঙ্গলা প্রতিশব্দ ইংরেজির অনুরূপ)।

মোহিতমোহন রায়।

(১৯)

(ক) বাংলা সাল প্রবর্ত্তন করেন সম্রাট আকবর। শকাব্দার ৫১৫ বৎসরে ও খ্রীষ্টাব্দের ৫৯৩ বৎসরে এর প্রথম গণনা। কিন্তু সম্রাট আকবর তাঁর নিজের সময়ের অত পূর্ব্ব হইতে কেন সাল প্রবর্ত্তন করিলেন, তার আরম্ভ কোন্ বিশেষ স্মরণীয় ঘটনায়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানাইলে অনেকে উপকৃত হইবেন।

(খ) ভবভূতি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদর্ভ (বর্ত্তমান বেরার) প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। এবং বরাহ-মিহির ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে মালব (রাজপুতানার একাংশ) দেশে বিদ্যমান ছিলেন।

(২২)

(ক) রামচন্দ্র বিজয়া দশমীতে রাবণ বধ করিয়া বিজয়ী হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া আনন্দে বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

রাঘবঃ পরমপ্রীতঃ সুগ্রীবং পরিষস্বজে।
পরিষজ্য চ সুগ্রীবং লক্ষ্মণেনাভিবাদিতঃ।
পূজ্যমানো হরিগণৈর্ আজগাম বলালয়ম্।
বাল্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪ সর্গ, ৭-৮ শ্লোক।

হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বিলাসেও বিজয়োৎসবের এই বিধি ও এই আচারের মূলের ইঙ্গিত আছে।

এখন নামসাম্যে সিদ্ধি লাভ ভাং খাওয়াতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বীরের বিজয় লাভের ও সিদ্ধি লাভের আনন্দ এখন নেশাখোরের উল্লাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

(খ) ঝড় ও ভূমিকম্পের সময় শঙ্খধ্বনি করা হয় লোককে সচেতন করিবার জন্য এবং শঙ্খধ্বনি অমঙ্গল ও উৎপাত নিবারক বলিয়া বিশ্বাস থাকাতেও।—

তত্রৈব সততং লক্ষ্মীর্ দূরীভূতম্ অমঙ্গলম্।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১৮ অধ্যায়।

(২৫)

ইংরেজদের সঙ্গে মহারাষ্ট্র পেশওয়াদের যুদ্ধের সময় মহারাষ্ট্র নেতা নানা ফড়নবিশ দুজন মহারাষ্ট্রীকে পার্লামেণ্টে মহারাষ্ট্র-ব্যাপার উপস্থিত করিবার জন্য পাঠান; ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক্ সেই দুজন মহারাষ্ট্রীকে সাহায্য করেন। ইহা ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরের ঘটনা। তার আগের সংবাদ অনুসন্ধান-যোগ্য।

(২৭)

গোচিকিৎসার বই—(১) গোজীবন—প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) গোধন—বিধুভূষণ বসু, (৩) গোধন-রক্ষক ও গোচিকিৎসা—সচ্চিদানন্দ গীতারত্ন।

(৩১)

আমাদের হিন্দু নাম মুসলমানদের দেওয়া। আগে পঞ্জাব প্রদেশের নাম ছিল সপ্তসিন্ধু, সংক্ষেপে সিন্ধু। স অনেক দেশের উচ্চারণে হ হয়, যেমন—সংস্কৃত অসুর, পার্সীদের অহুর। সিন্ধু নাম মুসলমানদের মুখে হিন্দু উচ্চারিত হইত। হিন্দুদেশের অধিবাসীরাও হিন্দু নামে পরিচিত হয়। এ নাম খ্রীষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীন নয় বোধ হয়। পারস্যের মহাকবি হাফিজের লেখায় হিন্দু শব্দ কৃষ্ণবর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কারণ হিন্দুরা পারসীকদের তুলনায় কৃষ্ণবর্ণ।

(৩২)

রামায়ণ খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ও মহাভারত ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল ২৪৪৮ খ্রীষ্টপূর্ব্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

(৩৩)

শ্রীকৃষ্ণ পাপাচরণ করিয়া শঙ্খচূড়কে বধ করিলে শঙ্খচূড়ের সাধ্বী পত্নী তুলসী ক্ষুব্ধ হইয়া কৃষ্ণকে শাপ দিয়াছিলেন—

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্ত চ।
ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেণ মম স্বামী ত্বয়া হতঃ॥
পাষাণহৃদয়স্ ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতো প্রভো।
তস্মাৎ পাষাণ-সদৃশস্ ত্বং ভবেহ হরে হধুনা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১৯ অধ্যায়।

গণ্ডকী তপস্যা করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকে পুত্র রূপে কা[illegible] করেন; দেবতারা এই বর দিতে অস্বীকার করিলে গণ্ডকী শাপ দেন। সেই শাপপ্রভাবে বিষ্ণু শালগ্রাম রূপ পরিগ্রহ করেন।—মেরুতন্ত্র, ৫ পটল।

কিন্তু শনির শাপের গল্প কোনো পুরাণে আছে কি না খুঁজিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

(৩৫)

মশারি আমাদের দেশে অন্তত ষোড়শ শতাব্দীতে বেশ ব্যবহার হইত।—

পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়,
মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা।
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

তার আগেও হইত কি না অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

(৩৬)

শাকান্ন-পলপিণ্যাক-কুলত্থ-লবণামিষৈঃ।
কারীরদধি-মাষৈশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীরং বিরুধ্যতে॥
—রাজবল্লভ।

ক্ষীরং ন ভুঞ্জীত কদাপ্যতপ্তং
তপ্তঞ্চ নৈতল্ লবণেন সার্দ্ধম্।—রাজনির্ঘণ্ট।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে লবণাক্ত দুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠ পিত্তশোষ হয় এবং "মারয়ত্যবুধম্ আশু সর্পবৎ।" বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারেরা কি বলেন?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ে।

(৩৪)

কাহারো কাহারো মতে একজন জর্ম্মান পাগল, পাগ্‌লাগারদের কক্ষে বসিয়া তাসের খেলা আবিষ্কার করে। তবে খুব সম্ভব যাযাবর জিপ্‌সী লোকেরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাস-জিনিসটাকে সবপ্রথমে ইউরোপে লইয়া গিয়া সেখানকার সভ্য লোকদের গোচর করে। জিপ্‌সীদের কোনো একটা বিশেষ দেশের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। তবে কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপে বাস করিয়াও তাহাদের আচার ব্যবহার ভাষা সভ্যতাতে প্রাচ্য প্রভাব স্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে দেখা যায়; তাই কেউ কেউ বলেন তাদের আদিনিবাস ছিল ভারতবর্ষে। উহারা তাসের নানা রকম ভেল্‌কি দেখাইয়া লোকের ভবিষ্যৎ বলিয়া ফিরিত। পরে সম্ভবতঃ কোনো বুদ্ধিমান লোক সেই অর্থহীন কেঁটাকাটা কাগজগুলি হইতেই খেলার উপকরণ তৈরী করিয়া লন্। তাসের খেলা নানা রকমের আছে, তার সবগুলি একই সময়ে উদ্ভাবিত হয় নাই, এখনো নূতন নূতন ক্রীড়াপদ্ধতির সৃষ্টি হইতেছে।　　স. চ.

টেরেসা

(রুস লেখক ম্যাক্‌সিম্ গোর্কী'র লেখা গল্প হইতে)

আমি তখন মস্কৌ কলেজে পড়ি। অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; থাকৃতাম একটা সাধারণ হোটেলে। সেখানে অনেক রকমের পুরুষ নারী বাস করৃত।

উঁচু তালার ছোট যে ঘরটিতে আমার বাসা ছিল, তার সমুখে হলের অপর পাশের ঘরে একটি স্ত্রীলোক থাকৃত। সে জাতিতে পোল। সে ছিল সেই ধরণের স্ত্রীলোক যার সম্বন্ধে প্রেমের কথা কারো মনে আস্‌তে পারে না। দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ গঠন। চোখের ভুরু লোমশ। মস্ত একখানা মুখ, যেন কুড়ুল দিয়ে কেটে গড়া। তার চোখে একটা পশুসুলভ আলো, গলার স্বর কর্কশ, আর পুরুষমানুষের মত ছিল তার চলন বলন। দেখে আমার একটু একটু ভয় করৃত। সে যখন নিজের ঘরে থাকৃত, আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ কোরে দিতাম। আর ঘরে থাকৃতও সে খুব কম সময়। কখনও কখনও সিঁড়িতে বা উঠানে তার সঙ্গে দেখা হত। প্রায়ই তাকে মাতাল অবস্থায় দেখা যেত। তখন তার চোখদুটো অর্দ্ধেক বুজে আস্‌ত, চুল-গুলো উস্কখুস্ক হয়ে যেত, আর কেমন একটা বিশ্রীরকম হেসে আমার সঙ্গে কথা কইত। "কি হে ছোকরা, আছ কেমন?" এই বলেই আহাম্মুকের মতন এমন হেসে উঠ্‌ত যে আমার ঘৃণা বেড়ে যেত। তার সঙ্গে দেখাশুনা আর কথাবার্ত্তা হবার ভয়ে, মধ্যে মধ্যে মনে হত বাসাটা বদ্‌লাই। কিন্তু আমার ঘরটি বেশ ছোটখাট পরিষ্কার ছিল; আর জানালা থেকে বাহিরের দৃশ্যটি সুন্দর ছিল। তা ছাড়া নীচের রাস্তাটা বেশ নীরব থাকৃত। এইসব কারণে সহ্য কোরে থাকৃতাম।

একদিন সকালে কোচের উপর অলসভাবে শুয়ে পড়ে আছি, আর মৎলব ঠাওরাচ্ছি যে কি ছুতায় আজ আর কলেজে না যেতে হয়। এমন সময় আমার ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। চৌকাঠের কাছ থেকে মোটা গলায় শোনা গেল, "ওহে ছোকরা, কি হচ্চে?"

আমি বল্‌লাম, "তুমি আবার এখানে কি চাও?"

আজ তার মুখের ভাবটা অন্য দিনের চেয়ে মোলায়েম। একটু থতমত ভাব; কি যেন প্রার্থনা আছে। সে বল্‌লে, "তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে, রাখ্‌বে?"

শুনে ভাব্‌লাম, একি আবার? কোনও কুমৎলব নয় তো? কিছু উত্তর না দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে শুয়েই রইলাম।

"বল্‌ছিলাম কি, আমাকে একখানা চিঠি লিখে দিতে পারো?" কথাগুলো খুব নরম ভাবে যেন ভয়ে ভয়ে বল্‌লে।

শুনে মনে মনে ভাব্‌লাম, তুমি গোল্লায় যাও। একটু আরাম কোরে শুয়ে থাকৃতে দিলে না দেখ্‌ছি।

যা হোক, উঠ্‌লাম। টেবিলের কাছে বোসে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে বল্‌লাম, "ওখানে বোসো; কি লিখে দিতে হবে বোলে যাও, আমি লিখে দিচ্চি।"

সে একটা চেয়ারের ধার ঘেঁসে বস্‌ল। এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল, যেন একটা কি দোষ করৃতে এসেছে।

"বলোনা, কাকে চিঠি লিখ্‌তে হবে।"

"বোল্‌স্লাভ ক্যাস্‌পুট্‌কে। স্‌ভিট্‌সিয়ানা নগর, ওয়ার্‌স রোড।"

"আচ্ছা কি লিখ্‌ব বলো।"

"লেখ—'প্রিয় বোল্‌স্, আমার প্রিয়তম, আমার প্রেমিক, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। অনেক দিন অবধি তোমার আদরের ছোট টেরেসাকে চিঠি লেখোনি কেন? তোমার ছোট পাখীটিকে কি একেবারে ভুলে গেলে'..."

লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমি হেসে ফেল্‌লাম। ছোট পাখীটিই বটে! চার হাত লম্বা, ছ মোন ভারি, কালো পাখীটি। বুঝি চিম্‌নির ভিতর বাসা?

সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "এই বোলেষ্ট্‌টি কে?"

"বোলেষ্ট্ নয়, বোল্‌স্। আমার প্রেমিক।"

"তোমার প্রেমিক?"

"হাঁ তাই। আশ্চর্য্য হচ্চ কেন? আমার মত মেয়েদের কি প্রেমিক থাক্‌তে পারে না?"

বলে কি না "মেয়েটি"। কি সর্ব্বনাশ! আধা বয়স পেরোয় যে।

"তা থাক্‌বে না কেন? জগতে সবই সম্ভব। তা, কতদিন সে তোমার প্রেমিক হয়েছে শুনি?"

"এই আজ ছ বছর।"

"ছ বছর? আচ্ছা, এইবার তোমার চিঠিখানা শেষ করা যাক্।"

বল্‌ব কি, এমন ভাবে চিঠিখানা লেখালে, যে, সে যদি ঠিক টেরেসা না হত, তা হলে আমার বোল্‌স্ হওয়াতে আপত্তি ছিল না।

চিঠিখানা লিখে তাকে দিলাম। নিয়ে বল্‌লে, "আমার অজস্র ধন্যবাদ। যে দয়া কর্‌লে! তোমার কি কোনও কাজ আমি কোরে দিতে পারি? জামা-টামা কিছু সেলাই কোরে দেওয়া?"

ঘনিষ্ঠতা দেখে একটু বিরক্ত হলাম। বল্‌লাম, "আমার কিছু দর্‌কার নেই। তুমি যাও।"

সে চোলে গেল। দু এক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাইরে বৃষ্টি হচ্চে। আমি কোথাও বেরুতে না পেরে জানালার ধারে বোসে বোসে নানারকম ভাব্‌ছি, আর মনটাকে কেমন কোরে চাঙ্গা করা যায় তার উপায় চিন্তা কর্‌ছি। কাজ কর্‌বার ইচ্ছা নাই, অথচ কি কোরে সময় কাটান যায় তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এমন সময়ে দুয়ারটা খুলে গেল। ভাব্‌লাম, বাঁচা গেল। বন্ধু-বান্ধব কেউ আস্‌চে বোধ হয়। চেয়ে দেখি টেরেসা।

সে বল্‌লে, "এখন তোমার বোধ হয় বিশেষ কোনও কাজ নেই?"

"না। কেন বলো দেখি?"

"বল্‌ছিলাম কি, আর একখানা চিঠি লিখে দিতে পারো?"

"বেশ তো। আবার সেই বোল্‌স্‌কে নাকি?"

"না। এবার বোল্‌সের কাছ থেকে।"

"কি বল্‌ছ?"

"ঠিক তা নয়, তা নয়। এই ধরো আমার একজন পুরুষ বন্ধু তার প্রণয়িনীকে যেন চিঠি লিখ্‌ছে। তারও নাম যেন টেরেসা। এই-রকম একটা চিঠি লিখে দেবে?"

আমি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে তার দিকে চেয়ে রইলাম। বল্‌লাম, "কি বাজে বক্‌ছ? সব মিথ্যা কথা তোমার। তুমি ছাড়া এখানে আবার টেরেসা কে?"

কথাটা শুনে তার মুখটা কালি হয়ে গেল। হাত দুটো কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। কি যেন বল্‌তে চাইছিল বল্‌তে পার্‌লে না।

আমি অপেক্ষা কোরে রইলাম যে তারপর সে কি বলে। তবে এইটুকু বুঝ্‌লাম যে আমি যা বুঝেছিলাম তা ভুল। এর ভেতর আর-কিছু বোধ হয় আছে। কিন্তু সে আর কিছু না বোলে হঠাৎ উঠে ঝনাৎ কোরে দুয়ারটা খুলে বেরিয়ে গেল।

আমি মনে মনে একটা বড় অসন্তোষ বোধ কর্‌লাম। কান পেতে শুন্‌লাম তার ঘরের দরজাটা খুব জোরে বন্ধ হয়ে গেল। বুঝ্‌লাম বড় রাগ করেছে।

ভেবে চিন্তে ঠিক কর্‌লাম যে তার ঘরে যাই, আর তাকে ডেকে এনে, যা লিখ্‌তে বলে, না হয় লিখে দি। আমার কিছু ভাব্‌বার দর্‌কার কি?

তার ঘরে ঢুক্‌লাম। দেখ্‌লাম সে টেবিলের উপর দুটা কুনুই রেখে মাথা ধোরে বোসে আছে।

বল্‌লাম, "শুন্‌ছ?"

উত্তর নাই।

"বলি, শুন্‌তে পাচ্চ?"

সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল। তার চোখ দুটো যেন জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। ছুটে আমার দিকে এসে তার হাত দুটো আমার কাঁধের উপর রেখে বল্‌লে, "আচ্ছা শোনো, এইবার সত্য কথা বল্‌ব। বোল্‌স্ নামে কোনও লোক নেই; আর টেরেসাও আর কেউ নেই। তাতে তোমার কি? কাগজের উপর দুটো কালির আঁচড় টেনে দেবে,

তাও পারো না? না হয় বোল্‌স্ কেউ নেই; আমি তো আছি?"

এই আশ্চর্য্য ব্যবহারে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। বল্‌লাম, "তা হলে এসব কি হচ্চে? বোল্‌স্ কেউ নেই তো?"

"না, নেই।"

"টেরেসাও আর কেউ নেই?"

"না, তাও নেই। আমিই ধর টেরেসা।"

তখনও আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে হল, এর কি পাগল হবার জোগাড় না কি?

সে তখন টেবিলের কাছে গিয়ে খানিক খুঁজে একখানা কাগজ এনে আমার হাতে দিলে। ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে, "যদি চিঠি লিখে দিতে তোমার এত বিরক্তি হয়, চাই না আমি কিছু। এই নাও তোমার লেখা চিঠি। আমি না-হয় আর কাউকে দিয়ে লেখাব।"

দেখ্‌লাম আমি বোল্‌স্‌কে যে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলাম, এ সেই চিঠিখানা। আমার আশ্চর্য্যের মাত্রা বাড়্‌তে লাগ্‌ল।

"আচ্ছা, এসবের মানে কি, টেরেসা? চিঠি যদি লেখালে তো পাঠাওনি কেন?"

"কাকে পাঠাব?"

"কেন, এই বোল্‌স্‌কে?"

"বল্‌লাম তো, বোল্‌স্ কেউ নেই।"

ভাব্‌লুম, নাঃ এসব আমার বুদ্ধির অতীত। আর কি কর্‌ব, ফিরে যাই। এই মনে কোরে ফিরেছি, এমন সময় সে হঠাৎ রাগ কোরে বল্‌লে, "এটা আর বুঝ্‌তে পারছ না? বোল্‌স্ কেউ নেই বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে ঐরকম একজন থাকে, আর সে যেন আমায় ভালবাসে। এই ধরো, সে যেন বোল্‌স্। আমি তাকে চিঠি লিখ্‌ব। তোমার তাতে কি?"

"কাকে চিঠি লিখ্‌বে?"

"এই বোল্‌স্‌কে, আর কাকে?"

"কিন্তু বোল্‌স্ তো কেউ নেই?"

"নেই বটে, কিন্তু থাক্‌তে পার্‌ত তো। আমি তাকে চিঠি লিখ্‌ব, সে উত্তর দেবে, এমন হতে পার্‌ত তো। আমি কুৎসিত বোলেই হল না তো।"

ওঃ! এতক্ষণে সব কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, আর আমার যেন কান্না পেলে।

এই কুৎসিতা রমণীকে কেউ কখনও ভাল বাসেনি, তাই তার ক্ষুধিত হৃদয় এক কাল্পনিক নায়ক স্থির কোরে তার সঙ্গে চিঠি পত্র লেখালিখি কর্‌তে চায়। বোল্‌স্ যেন টেরেসাকে চিঠি লিখেছে, আর টেরেসা তার উত্তর লিখে দিতে আমাকে অনুরোধ কর্‌ছে।

সে বল্‌লে, "দেখ, তুমি যে সেই চিঠিখানা দিয়ে দিয়েছিলে, আমি তা একজনকে দিয়ে পড়ালুম। আমার মনে হতে লাগ্‌ল যেন স্বয়ং বোল্‌স্—অর্থাৎ যে যেন একজন পুরুষ—আমাকে ভালবেসে তার মনের কথা জানাচ্ছে। বুঝ্‌লে? আর তার একটা উত্তর দিতে হবে তো? এই-রকম হলে তবে তো জীবনটা একটু হাল্কা হয়!"

নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়ে ভাব্‌লাম—আঃ নির্ব্বোধ। এই সোজা কথাটা এতদিন বুঝ্‌তে পারোনি? প্রেম যে সবারই চাই,—তা সত্য হোক, মিথ্যা কল্পনা হোক। না হলে মানুষ যে টিক্‌তে পারে না।

তার পর থেকে সপ্তাহে রীতিমত দুবার কোরে বোল্‌স্‌কে চিঠি লিখে দিতাম। আবার তার উত্তরও লিখে দিতে হত। যথাসম্ভব মোলায়েম কোরেই লিখ্‌তাম। তাকে সেইগুলি মধ্যে মধ্যে পড়িয়ে শোনাতে হত। সে চুপ কোরে চোখ বুজে শুন্‌ত, আর তার চোখের কোণে জল দেখা দিত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে আমার খুব অনুগত হয়ে পড়্‌ল। আমার জামা কাপড় মেরামত কর্‌বার জন্য আর লোকের অভাব হত না।

মাস তিনেক পরে সে একটা কি অপরাধ করায় জেলে গেল। তাকে তারপর আর দেখ্‌তে পাইনে। এতদিনে বোধ হয় সে মরে গেছে।

হায়, কি নির্ব্বোধ আমরা, আর, কি স্বার্থপর! মুখে বলি যে সকল-রকম লোকের মধ্যেই মানুষের হৃদয় আছে। কিন্তু সেটা তো সব সময় মনে থাকে না। নিজের সুখ-দুঃখ নিয়েই আমরা মত্ত। যাদের আমরা নীচশ্রেণী বোলে জানি তাদের হৃদয়ের খবর তো আমরা রাখি না।

যাক্ ওসব। পুরানো কথা আর বোলে কাজ নেই।

শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র।

তিনটি প্রশ্ন

(টল্‌ষ্টয়ের লেখা হইতে)

এক সময়ে এক রাজার এই ধারণা হল যে যদি তিনি জান্‌তে পার্‌তেন কখন কোন্ কাজ করা উচিত, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে, আর কোন্‌টাই বা সবচেয়ে দর্‌কারী কাজ, তবে কোনো বিষয়েই তিনি অকৃতকার্য্য হতেন না।

এই ভেবে তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা কর্‌লেন, যে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বে সে প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত সকলেই এলেন, কিন্তু সকলেই প্রশ্নতিনটির বিভিন্ন উত্তর দিলেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বল্‌লেন, উপযুক্ত সময়ে কাজ কর্‌তে হলে ভাল পাঁজি একখানা কাছে রেখে পাঁজির নির্দ্দেশ-মত কাজ করা আবশ্যক। কেউ কেউ বল্‌লেন, আগে থেকে কখন্ কি কর্‌তে হবে ঠিক্ করা অসম্ভব। তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট না করে যখন যা দর্‌কার হয় তাই করা উচিত। তবেই জানা যাবে কোন্ কাজ সবচেয়ে দর্‌কারী। আর কেউ কেউ বল্‌লেন, কখন্ কোন্ কাজ করা উচিত একা তা স্থির করা অসম্ভব, সুতরাং রাজার একটি মন্ত্রণা-সভা থাকা চাই। মন্ত্রণা-সভাই সকল কাজের উপযুক্ত সময় স্থির কর্‌বেন।

আরও অনেকে ছিলেন; তাঁরা বল্‌লেন, এমন অনেক বিষয় আছে যা তৎক্ষণাৎই স্থির কর্‌তে হলে ভবিষ্যতে কি হবে তা' আগে জানা চাই। জ্যোতিষীরাই তা জানে—সুতরাং জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে জান্‌তে হয় কখন কোন্ কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হল বিভিন্ন রকমের। কেউ বল্‌লেন, রাজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি মন্ত্রী; কেউ বল্‌লেন, পুরোহিত; কেউ কেউ বল্‌লেন চিকিৎসক; কেউ কেউ বা বল্‌লেন, সৈনিকই রাজার সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বল্‌লেন, বিজ্ঞানই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়; কেউ বল্‌লেন, রণকৌশল; কেউ বা বল্‌লেন, দেবপূজাই সবচেয়ে দর্‌কারী কাজ।

প্রশ্ন তিনটির সমস্ত উত্তরই বিভিন্ন হওয়ায় রাজা কারও সঙ্গে একমত হতে পার্‌লেন না; পুরস্কারও কাউকেই দিলেন না; কিন্তু তবুও প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাওয়ার ইচ্ছা থাকায় জ্ঞানের-জন্যে-সর্ব্বত্র-বিখ্যাত একজন সাধুর সঙ্গে পরামর্শ করা স্থির কর্‌লেন।

এই সাধু যে বনে বাস কর্‌তেন সে বন ছেড়ে কখনো কোথাও যেতেন না। তিনি সাধারণ লোকদেরই অভ্যর্থনা কর্‌তেন; সুতরাং রাজা সাধারণ লোকের বেশেই গেলেন। সাধুর কুটীরের কিছু দূরে ঘোড়া ও রক্ষী সৈন্যদের রেখে একাই সাধুর কাছে গেলেন।

গিয়েই দেখ্‌লেন সাধু কুটীরের সাম্‌নের জমীতে কেয়ারী কর্‌ছেন। রাজাকে অভ্যর্থনা করেই আবার কাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কাছে গিয়ে রাজা বল্‌লেন, "বিজ্ঞ, আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জান্‌তে আমি এসেছি। কখন্ কোন্ কাজ করা উচিত, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি কে, আর সবচেয়ে দর্‌কারী কাজ কোন্‌টা।"

সাধু শুন্‌লেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, কাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা বল্‌লেন, "আপনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; কোদালটা আমাকে দিন, আপনার জন্যে কিছু কাজ করে দি'।"

"ধন্যবাদ," বলে সাধু কোদালখানা রাজার হাতে দিলেন।

দু'টি কেয়ারি করেই রাজা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

এবারেও সাধু কোনো উত্তর দিলেন না—কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোদালের জন্যে হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন, "এখন একটু বিশ্রাম কর; আমি কিছুক্ষণ কাজ করি।"

রাজা কোদাল না দিয়ে আরও দু' ঘণ্টা কাজ কর্‌লেন।

সূর্য্য অস্তগামী হলেন। রাজা কোদাল রেখে বল্‌লেন, "বিজ্ঞবর, আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেতেই আপনার এখানে এসেছি। যদি আপনি উত্তর না দিতে পারেন তাও বলুন; আমি বাড়ী ফিরে যাই।"

"ঐ দেখ, কে একজন এদিকে দৌড়িয়ে আস্‌ছে—দেখা যাক সে কে।"—সাধু বল্লেন।

রাজা দেখ্‌লেন দাড়িওয়ালা কে একটি মানুষ বনের ভিতর দিয়ে দৌড়িয়ে আস্‌ছে। মানুষটি দু' হাত দিয়ে তার তলপেটটা চেপে ধরেছে। হাতের নীচে রক্ত-প্রবাহ। রাজার কাছে এসেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। রাজা ও সাধু দু'জনে মিলে লোকটির পরিচ্ছদ খুলে ফেল্লেন। পেটের নীচেই একটা প্রকাণ্ড ক্ষত। রাজা নিজের রুমালখানি ও সাধুর তোয়ালেখানা নিয়ে ক্ষতটি ভাল করে বেঁধে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় লোকটির চেতনা হল—সে একটু জল চাইলে। রাজা জল এনে দিলেন।

এর মধ্যে সূর্য্যাস্ত হয়েছে। রাজা ও সাধু দু'জনে মিলে লোকটিকে কুটীরের মধ্যে নিয়ে গেলেন ও একখানি বিছানায় শুইয়ে দিলেন। লোকটি চোখ বুজে আরাম বোধ কর্‌লে। কিন্তু রাজা এত পথ এসে ও এত কাজ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন; শোওয়া মাত্রেই তিনি ঘুমিয়ে পড়্‌লেন।

পরদিন সকালে জেগে উঠেই রাজা দেখ্‌লেন সেই লোকটি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তিনি কোথায় সেই লোকটিকে দেখেছেন তা স্মরণ কর্‌তে তাঁর বিলম্ব হল। রাজাকে ঘুম থেকে উঠ্‌তে দেখে লোকটি ক্ষীণস্বরে বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

"আমি ত তোমাকে চিনি না—কিসের জন্য তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে?"—রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

"আপনি আমাকে চেনেন না—কিন্তু আমি ত আপনাকে জানি। আপনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন, আমার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন। এর প্রতিশোধ নেব বলে আমি শপথ করেছিলাম। আপনি সাধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন শুনে আমি আপনার ফির্‌বার পথের ধারে লুকিয়ে ছিলাম আপনাকে হত্যা কর্‌বার ইচ্ছায়। দিন গেল, তবুও আপনি ফির্‌লেন না। কাজেই, আমার লুকাবার জায়গা থেকে বার হলাম। কিন্তু হঠাৎ আপনার রক্ষীদের হাতে পড়ে যাওয়ায় তারা আমাকে চিন্‌তে পারে ও আহত করে। আমি ওদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে এলাম। কিন্তু যদি আপনি আমার শুশ্রূষা না কর্‌তেন তবে আমি নিশ্চয়ই মারা যেতাম। আমি আপনাকে মার্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে রক্ষা কর্‌লেন। এখন, যদি আমি বাঁচি আর আপনি সম্মত হন, তবে আমি আপনার সবচেয়ে বিশ্বাসী ক্রীতদাসের মত আপনার সেবা কর্‌ব ও আমার ছেলেদেরও তাই কর্‌তে বল্‌ব। আমাকে রক্ষা করুন।"

রাজা তাঁর শত্রুর সঙ্গে এত সহজে সন্ধি কর্‌তে পারায় ও তাকে বন্ধু রূপে লাভ করায় বড় খুসী হলেন। শুধু যে তাকে রক্ষা কর্‌লেন তা নয়; নিজের চাকর ও চিকিৎসকদের তার সেবাশুশ্রূষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতেও স্বীকৃত কর্‌লেন।

আহত ব্যক্তিটির কাছে বিদায় নিয়ে রাজা সাধুর খোঁজে গেলেন। ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর প্রশ্ন-তিনটির উত্তর জান্‌তে আর-একবার ইচ্ছে কর্‌লেন। সাধু তাঁর নতুন তৈরি কেয়ারিগুলিতে বীজ বপন কর্‌ছিলেন। রাজা তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌লেন, "সাধুশ্রেষ্ঠ, আমার প্রশ্নতিনটির উত্তর দিতে শেষবার প্রার্থনা কর্‌ছি।"

রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করে সাধু বল্‌লেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর ত তুমি পেয়েইছ।"

"পেয়েছি? বলেন কি আপনি?"—রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

"বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?" সাধু বল্‌লেন, "কাল যদি আমার দৌর্ব্বল্য দেখে তোমার দয়া না হত, এসব কেয়ারি যদি তুমি না কর্‌তে, যে পথে তুমি এসেছিলে সেই পথেই যদি চলে যেতে, তবে সেই লোকটা নিশ্চয়ই তোমাকে আক্রমণ কর্‌ত—আর তুমিও আমার কাছে কেন থাক্‌লে না এই ভেবে আক্ষেপ কর্‌তে। সুতরাং, যখন তুমি কেয়ারি কর্‌ছিলে সেই সময়ই ছিল তোমার কাজ করায় উপযুক্ত সময়; আমিই ছিলেম সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি, আর আমার উপকার করাই ছিল তোমার সবচেয়ে দরকারী কাজ। পরে যখন সেই লোকটি দৌড়িয়ে এল আর তুমি তার শুশ্রূষা কর্‌লে, সেই সময়ই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। যদি তুমি তার শুশ্রূষা না কর্‌তে সে নিশ্চয়ই মারা যেত; তুমি তার সঙ্গে মিত্রতা কর্‌তে পার্‌তে না। সুতরাং সেই হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। আর তুমি তার জন্যে

যা করলে তাই হল তোমার সবচেয়ে দরকারী কাজ। তবেই মনে রেখো, সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মোটে একটি—'এখন' এইটিই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়; কারণ, এই সময়েই আমাদের যা-কিছু ক্ষমতা থাকে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি সেই, যার সঙ্গে তুমি এখন আছ; কেননা, কেউ জানে না কখনো আর কারও সঙ্গে তার কোনো কাজ থাকবে কি না। সবচেয়ে দরকারী কাজ তার উপকার করা; কারণ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই এই।"

অন্নদাশঙ্কর রায়।

বাক্যবাণ

(১)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন। বেলা সাতটা না বাজিতেই চারিদিক খররোদে ভরিয়া যায়। দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মিত্তিরদের বড়বৌ ঘাড় হেঁট করিয়া হাঁকিয়া কহিলেন, "ওমা! ও বিধু-ঠাকুরঝি উনুন ধরলো তোমার? মা গো মা! লোক রেখেও তো নিশ্চিন্দি হবার জোটি নেই, তাঁর নিত্যি রোগ, নিত্যি রোগ! জ্বালাতন বাপু!" নীচেকার ছোট আঙ্গিনার উপর তখন কেহই ছিল না, সুতরাং কেহ উত্তরও দিল না। ত্যক্তকণ্ঠে বড়বৌ গজগজ করিয়া কহিলেন, "হাঁ দ্যাখো, জবাবটি পর্য্যন্ত নেই। যাই, বাড়ীর যত-কিছু আপদ বালাই ত হয়েছি আমি, আর যত-সব আছেন কেবল খাবার কুমীর!" বলিয়া তিনি দালানের ওপাশের একটা ঘরের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে একটি বছর চৌদ্দ-পনেরোর সুন্দরী মেয়ে দুই হাত উঁচু করিয়া মাথার কাপড় টানিতে টানিতে বাহির হইয়া আসিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "কি হ'ল তোমার বড়দি, বকে মরচো কেন?"

বড়-বৌ মুখখানা গম্ভীর করিয়া ভারী গলায় কহিলেন, "বকে মরচি সাধে, সকাল বেলা বিধু এসে সুখবর জানিয়ে গেলেন, হাঁড়ী ঠেলতে হবে।"

"কেন? বামুন-ঠাকুরুণ?"

"পোড়া কপাল বামুন-ঠাকুরুণের, তাঁর বুঝি কি ব্যামো না বিকার কি হয়েছে, ছুতো-নাতার তো অভাব নেই।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি গিয়ে দেখে আস্‌চি।" বলিতে বলিতে তর্‌তর্ করিয়া সে নামিয়া গেল।

বড়বৌ ঠোঁটটা নীচে পানে উল্টাইয়া কহিলেন, "হ্যাঃ! উনি গিয়ে তো সবই করবেন!"

নীচেকার রান্নাঘরের পাশে একটা তিন হাত চওড়া আর চার হাত লম্বা অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে ছোট একটা তক্তপোষের উপর বামুন-ঠাকুরুণ মালতী সারারাত্রি জ্বরের দাহে ছট্‌ফট করিতে করিতে ভোরের এদিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ছোটবৌ শোভা পা টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরের চৌকাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সে ঘরের মধ্যে সেই বৈশাখের চন্‌চনে রৌদ্রেও এমন অন্ধকার যে চৌকীর উপর সাদা কি একটা পড়িয়া আছে ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শোভা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও ঘুমন্ত মানুষকে কোন কথা কহিতে পারিল না। একটু পরে উঠানে জুতার শব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল—স্বামী সুবোধ বাহির হইতেছে, শোভাকে দেখিয়া চক্ষের ইসারায় প্রশ্ন করিল, "এখানে কেন?" শোভা সরিয়া আসিয়া চাপাকণ্ঠে কহিল, "বামুন-ঠাকুরুণের জ্বর হয়েচে।"

"তা কি তিনি বাড়ী যাননি?"

"না, বাড়ী গেলে দিদি তাঁর জ্বর বিশ্বাস করেন না, তাই যান্‌নি।"

"তা বেশ।" বলিয়া সুবোধ বাহির হইয়া গেল। শোভা দাঁড়াইয়া রহিল, উপরে গিয়া বড় জায়ের সাম্‌নে পড়িতে সাহসে কুলাইল না।

বিধু ঝি রান্নাঘরের উনুনে আগুন দিয়া পাথুরে কয়লার ধোঁয়ায় দুই চক্ষু মুদিয়া উঃ আঃ করিতে করিতে পাখা হাতে করিয়া দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরে ধোঁয়ার প্রকোপ কমিলে সে কহিল, "কি গো ছোট-বৌ ঠাকুরুণ, ওঁকে বুঝি দেখ্‌তে এসেচো, তা দেখ বাছা দেখ, তোমার দয়ার শরীর, বাড়ীতে তো ঐ গিন্নি রয়েচেন, বাছা!" বলিয়া সে উপর পানে চক্ষু ঠারিল।

শোভা সে কথায় কান না দিয়া কহিল, "তোমার উনুন কি ধরেচে ঠাকুরঝি?"

"এই ধরলো ব'লে।"

"তবে আমিই যাই, কাপড়টা কেচে নিইগে, বড়দিকে আর ডাক্‌বো না।"

রান্না-ঘরের ধোঁয়ার কুণ্ডলী অন্য কোনও খোলা পথ না পাইয়া পাশের ছোট দুয়ার দিয়া মালতীর সেই অন্ধকার ঘরখানাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। শোভা একবার সেই ঘরের দিকে চাহিয়া কাপড় কাচিতে গেল।

(২)

বামুন-ঠাকরুণ মালতীর বয়স সম্ভবতঃ বছর পঁচিশ হইবে। তার স্বাভাবিক ধীরতা শীলতা দেখিলে ভদ্রঘরের বলিয়াই বোধ হয়। মুনিবের মন রাখিয়া চলিবার নিয়ত চেষ্টা দেখিলেই বোঝা যায় অনেক দুঃখে পড়িয়াই সে পরের দ্বারস্থ হইয়াছে। তবু তার সমস্ত অবয়বে এমন একটু দৃঢ়তা, এমন একটু তেজ ছিল, যাহাতে যে বয়সে চৌকাটের বাহিরে পদার্পণ করিতে গেলে মেয়েমানুষের পঁচিশকে পঞ্চাশ করিয়া লইবার শক্তির দরকার সেই শক্তি সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। এই বাড়ীখানির সম্মুখে যে রাস্তা, সেই রাস্তার ওপারে খানকয়েক বাড়ীর পরই একটি অতি বৃদ্ধা মুদিনীর দোকান ছিল। মালতী প্রত্যহ মুনিব-বাড়ীর কাজ সারিয়া সেই মুদিনীর বাড়ী গিয়া ঢুকিত; ঘণ্টা দেড়েক সেখানে থাকিয়া তারপর আবার আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়া সে ফিরিয়া আসিত। কেহ কিছু বলিলে কহিত, একটু বেড়িয়ে এলাম।" রাত্রেও এক-একদিন সে বাড়ী থাকিত না। এই লইয়া কেহ কেহ তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া দুএকটা কটু রসিকতা করিতে ছাড়িত না, সে তখন কান ঢাকিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত মাত্র, কোন রকম উগ্রতা প্রকাশ করিয়া নিজের গাম্ভীর্য্যটুকু শিথিল করিত না। দিন কতক হইতে তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত। এই সময় সে বাড়ী ছাড়িয়া গেলে বড়বৌ তাহার জ্বরের কথা অবিশ্বাস করিয়া এমন সব কথা বলিতেন যে যাহার বিন্দুমাত্রও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আছে সে সেই কথা শুনিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় মনে করিবে।

শোভা একটা উনুনে ডাল ও একটা উনুনে তরকারী চড়াইয়া ভাজিতেছিল। এমন সময়ে বড়বৌ নামিয়া আসিলেন, তাঁহার কোলে বছর দেড়েকের একটি ছেলে। তিনি চুলের বিনুনী খুলিতে খুলিতে রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিলেন, "তবু ভাল, রান্না চড়েচে দেখ্‌চি।"

শোভা কহিল, "হ্যাঁ, যাও তুমি, চান করে নাও গে।" বড়বৌ চৌকাটের উপর বসিলেন দেখিয়া শোভা শঙ্কিত হইয়া কহিল, "ওকি, ওখানে বস্‌লে কেন দিদি? যাও নেয়ে নাও গে। খুকুকে বরং আমার কাছে দাও, আমি দুটো খৈ ছড়িয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌চি।"

বড়বৌ একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁলা ছোটবৌ আজ বুঝি আর আসেনইনি, না?"

ছোটবৌ নতমুখে তরকারী নাড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া পাশের ঘরটায় ইসারা করিল। বড়বৌ কহিল, "ওঃ হরি তো। রোগ বালাই হ'লে কেউ কাউকে পোছে না, ঘরের সোয়ামীই ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে .." বলিয়া একটা ইঙ্গিত করিলেন।

শোভা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আচ্ছা দিদি, এখন তো কোনও কাজ নেই তোমার, এই বেলা ওঠো না কেন, চান করে এসোনা।" বলিয়াই শোভা তরকারীর জল ঢালিতে গিয়া—"ওমা! বিধু-ঠাকুরঝি ঘড়াটা ঢেকে রাখেনি? কি একটা পড়েছে জলে! দাঁড়াও, আমি একটু জল নিয়ে আসি—" বলিয়াই সে জলের ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বড়বৌ সে আলোচনাটি ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না, তিনি বসিয়া রহিলেন। ওদিকে তরকারী পুড়িয়া যায়, সুতরাং শোভাকে ফিরিতেই হইল। ফিরিবামাত্র বড়বৌ আবার আরম্ভ করিলেন শোভা এইবার ছোট ঘরটার দিকে চাহিয়া কহিল "কি বক্‌চো তুমি বড়দি, শুন্‌তে পাবে যে!"

বড়বৌ বাহাদুরী দেখাইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "পেলেনইবা পেলেনইবা, ভারী আমার সম্মানের মান লজ্জাবতী লতাটি গো।"

অগত্যা অন্য কথা পাড়িয়া শোভা কহিল, "আজ আমার হাতের রান্না দিদি, যা না চমৎকার হয়েচে, হয় তো কেউ মুখে কর্‌তেও পারবে না।"

"না তা কেন পারবে না। বলি—"

"কিন্তু বামুন-ঠাকরুণ কি চমৎকার রাঁধে দিদি মাইনে যে নেয় তা পুষিয়ে দেয়, কি বল?"

"হ্যাঁ পোড়াকপাল! রাঁধুনির মাইনে আবার সাতটাকা —শাশুড়ীর আমাদের খেয়াল বই তো নয়।"

শোভা কহিল, "মা কবে ফিরবেন দিদি ?"

"কি জানি, তীর্থে গেলে কি আর তিনি শিগ্‌গির ফিরতে চান—" সহসা উঠানে কি দেখিয়া অসহ্য বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বড়বৌ কহিলেন, "ওলো ও ছোটবৌ!"

শোভা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিল, মালতী কলতলায় স্নান করিয়া দালানে পেরেকে আটকানো শুক্‌নো কাপড় ছাড়িতে আসিতেছে, ভয়ানক জ্বরে তাহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ। হাত পা-গুলা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শোভাকে দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, "তুমি সরো ছোট-বৌদি, আমিই রাঁধ্‌বো।"

বড়বৌ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে কহিল, "ভাঙ্‌লো তোমার নেশা! এমন লোকের আবার চাকরীর সখ্ হয় কেন ?"

কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মালতীর সংজ্ঞাহীন দেহটা সশব্দে আছাড়িয়া পড়িল। বড়বৌ গালে হাত দিয়া কহিলেন, "হ্যাকামী আর-কি ?" শোভা কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। বাড়ীর চাকরটা শব্দ পাইয়া ছুটিয়া আসিল, আসিয়া সেও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গঙ্গাস্নান করিয়া এক কলসী গঙ্গাজল লইয়া বিধু-ঝি বাড়ী ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এ কি কাণ্ড! দুপ্ করিয়া জলের ঘড়া নামাইয়া সে তাড়াতাড়ি মালতীর ঝুলিয়া-পড়া মাথাটি সোজা করিয়া দিল। তারপর ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া অন্য কাপড় পরাইয়া চাকরটার সাহায্যে তাহাকে ঘরের ভিতরকার সেই চৌকীর উপর লইয়া গিয়া ফেলিল। মালতী তখনও অজ্ঞান।

(৩)

সমস্ত রাত্রি বিকারের ঘোরে ভুল বকিয়া মালতী বিধুকে একটুও ঘুমাইতে দেয় নাই। তাই ভোরে উঠিয়াই সে বাসন-কোসন লইয়া বসিয়াছে, বাড়ীর সকলে তখন সুপ্ত। কলিকাতার কলকোলাহল একটু একটু আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিধু বারবার চারিদিকে চাহিতেছিল, যদি কারো একটু সাড়া পায়। শোভা উঠিয়া আসিলে তাহাকে হাতের ইসারায় ডাকিয়া বিধু ফিস্‌ফিস্ করিয়া দু-একটা কথায় মিনতি জানাইয়া উপরে পাঠাইয়া দিল। শোভা উপরে গিয়া সুবোধের ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে শোভা কহিল, "ওগো, বামুন-দিদি তো মরমর।"

সুবোধ কহিল, "কেন ?"

"তার বিকার হয়েচে, বিধু বল্‌চে।"

সুবোধ সে কথা উড়াইয়া দিয়া কহিল, "হ্যাঃ! বিকার হয়েচে!"

"ওগো সত্যি সত্যি হয়েছে। শোন না, বিধু বল্‌ছিল যে যদি তোমরা বল তো সে একটা ডাক্তার ডেকে আনে।"

"ডাক্তার ? ভিজিটের টাকা ?"

"তা না হয় তোমরা দিও না, শুদ্ধু হুকুম দাও তো ?" অনেক কষ্টে স্বামীর অনুমতি লইয়া শোভা বিধুকে গিয়া জানাইবামাত্র সে ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। বাড়ীর বড় কর্ত্তা প্রবোধ-বাবু খুব কড়া মেজাজের লোক, তিনি প্রায়ই অনেক রাত্রে বাড়ী আসেন ও অনেক বেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া ওঠেন, তিনি উঠিবার আগে ডাক্তারকে বিদায় করা চাই। রান্নাঘরের দালানে পা দিয়াই ডাক্তার সবিস্ময়ে কহিলেন, "এইখানে!"

বিধু ক্ষুব্ধ হাস্যে কহিল, "আজ্ঞে, আমরা চাকরবাকর, আমাদের এইখানেই বৈকি!" মালতীকে দেখিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিলে বিধু কহিল, "কেমন দেখ্‌লেন ?"

ডাক্তার কহিলেন, "ওঁর আপনার লোক কেউ থাকে ত খবর দিও, অবস্থা ভাল নয়।"

বিধু পয়সাহীন দরিদ্রের ঘরের মেয়ে। পয়সাই যে মানুষের মনুষ্যত্ব এ মহাতত্ত্বটি সে শিখিতে পারে নাই। তাই নিঃসম্পর্ক একটা পরের জন্যও সে ডাক্তারের হাতে ভিজিট গুনিয়া দিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান লিখাইয়া লইল। তার পর ভাবিল—আপনার লোক আর ওর কে আছে! যাবার মধ্যে তো ওই বুড়ী দোকানীর কাছে যায়। দেখি ওইখানে একটা খবর দিয়ে। বুড়ীর দোকানে গিয়া দেখিল যে সে বাড়ী নাই, দুয়ারের ঝাঁপ বন্ধ। ঝাঁপ ঠেলিতেই ভিতর হইতে কোন বৃদ্ধ জড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "কে মালতী, আয় মা।"

বিধু কহিল, "না, আমি মালতী নই, মালতীর বড় ব্যামো, এই দোকানী এলে তাকে বলো এই কথা, তার আত্মীয় স্বজন কাউকে জানা থাক্‌লে যেন খবর

দ্যায়।" ভিতর হইতে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা গেল। বিধু বাড়ী আসিয়া দেখিল মালতী অনর্গল প্রলাপ বকিতে সুরু করিয়াছে। সে মালতীর মুখের কাছে হেঁট হইয়া ডাকিল, "বামুন ঠাক্‌রণ।"

উত্তরে মালতী গভীর আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিল, "কি বাবা?"

বিধু চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আহা বাছারে! বাবাই যদি তোমার থাক্‌বে, তা হলে আর এমন দশা হয়!"

মালতী কিন্তু ক্রমাগত "বাবা বাবা" করিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

(৪)

বুড়ী দোকানী একগাছি লাঠি হাতে করিয়া মিত্তিরদের বাড়ীর ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, লাঠির অন্য দিক ধরিয়া একটি ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বৃদ্ধ অন্ধ, দশবৎসর পূর্ব্বে তার দুই চক্ষের উপর চির-অমাবস্যা নামিয়া জগৎ-সংসার ঢাকিয়া দিয়াছে; তাহার দুই পা ময়লা ফ্লানেলের টুক্‌রা কাপড়ের পটি দিয়া জড়াইয়া বাঁধা; দেখিলে বোঝা যায় বাতের প্রকোপ তার উপর কম নয়। বৃদ্ধ কোন্ কালে একটা জমিদারি সেরেস্তায় নায়েব ছিল; তখন যাহা পাইয়াছে তাহা খরচ করিয়াছে। তারপরে দুই চক্ষু, স্ত্রী, পুত্র, সহায়, সম্পদ, সমস্ত হারাইয়া বিধবা কন্যা মালতীর হাত ধরিয়া পুরাতন দাসীর দোকানখানা আশ্রয় করিয়াছিল। বাড়ীর কাছেই সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও মালতী এই স্থবির পিতার জন্যই এই চাকরী স্বীকার করিয়াছিল, পরের কাজ করিয়াও বাপের সেবা করিতে পারিত, পাছে বাপ কষ্ট পায় সেজন্য সে কখনো নিজের বাপের কথা কাহাকেও বলিত না।

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধ ইষ্টমন্ত্র জপের মত জপ করিতেছিল, "মা আমার, আমার মা!"

বিধু আসিয়া কহিল, "হ্যাঁগা, পেলে তার কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান?"

উৎকণ্ঠিত বিবর্ণ মুখে সে কহিল, "কেমন আছে সে?"

"একটু ভালই।"

বৃদ্ধ এইবার বলিতে লাগিল, "ভাল ভাল।"

বিধু এতক্ষণে বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল, কহিল, "ইনি কে? ওর বাপ বুঝি?"

মুদিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

"আহা! তাই কেবল বাবা বাবা কর্‌চে, এস এস তোমরা ভিতরে এস।"

রান্নাঘরের দালানে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর মালতী পড়িয়া ছিল। বিধু দুজনকে সেইখানেই বসাইয়া কহিল, "চেঁচিয়ে কথা-টথা বলো না যেন, এ হল'গে পরের বাড়ী, বুঝ্‌লে তো!"

অন্ধ বৃদ্ধের দৃষ্টি তো ছিল না, সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না; কিন্তু উপর হইতে বড়বৌয়ের কথাগুলা সুতীব্র বাণের মত আসিয়া তাহাকে বিঁধিল। বড়বৌ কহিতেছিলেন, "কি গেরো! মাগী মর্‌বার কি আর জায়গা পেলে না গো, গেরস্তর বাড়ীতে মর্‌তে বস্‌লো!'

শোভা কহিল, "আহা! পড়ে গিয়েই ত এমন হয়েছে দিদি। তুমি শুধু-শুধু ওকে স্বভাব-চরিত্তির তুলে কথা বল্‌তে গেলে, ও তো তা ছিল না।"

বড়বৌ মুখ নাড়িয়া কহিলেন "না ছিল না! তুই ত সবই বুঝিস্!"—

নিশীথ রাত্রে থিয়েটার-ফেরত বড়বাবুর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া তুচ্ছ একটা রাঁধুনির জন্য সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া নির্ব্বোধ বৃদ্ধ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ও হো হো ভগবান, এ বাণ আমায় কেন মার্‌লে, আমার যে অন্ধের নড়ি—"

অকস্মাৎ উপর হইতে বড়বাবুর বজ্রগর্জ্জনে চেতনা লাভ করিয়া বিধু বলিয়া উঠিল, "আস্তে আস্তে হরিধ্বনি কর বাবারা, বেরিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ক'রো।"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

জল-সমস্যা

সোডা লিমনেড চলে সকলের হাতে,
শুঁড়ীর চোয়ানো জল, দোষ নাহি তাতে!
বরফে বিচার নাহি করি একটুক,
খাঁটি জলে আঁটাআঁটি এ বড় কৌতুক!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

দেশের কথা

অন্নকষ্ট।

দুর্ভিক্ষে কন্যা বিক্রয়—সেদিন চাঁদপুরে এক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট হইয়া নিজ কন্যাকে বিক্রয় করিবার জন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে ৩৲ টাকা মূল্য সাব্যস্ত করে। এ কথা জানিতে পারিয়া স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট দরিদ্র ভাণ্ডার হইতে তাহাকে ২৲ টাকা দিয়া কন্যা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দেন। হায় স্বর্ণপ্রসূ ভারত! তোমার ঐশ্বর্য্য নাকি এখনও চারিদিকে উপ্‌চিয়া পড়ে।—সারথি ও রায়ত।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে আজকাল প্রায় শতকরা পঁচাত্তর জন একরূপ না খাইয়া না দাইয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। কার সাধ্য পল্লীবাসীর পরিধানে শতগ্রন্থি বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ দেখিয়া চক্ষু না বুজিয়া দেখিয়া থাকিবে? অন্ন অভাবের সংখ্যা নাই। তাহাতে আশানুরূপ মূল্যে পাট বিক্রীত না হওয়ায় হাওলাত বরাত দেনা পাওনা একরূপ বন্ধ।

যাহারা থাকিলে তোমরা থাকিবে, যাহারা থাকিলে আমরা থাকিব, পল্লী থাকিবে, দেশ থাকিবে, সত্বর তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা কর, অল্প মূল্যে রেঙ্গুনী চাউল দেও, মোটা কাপড় সরবরাহ কর, নতুবা ৩মাসের দেশ গেল, দেশের মেরুদণ্ড কৃষক গেল। পল্লীবাসীর অনশন-ক্লিষ্ট রিক্ত দেহে কখন জানি সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিয়া হারখার করিয়া দেয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। ঔষধের ব্যবস্থা কর, পথ্যের ব্যবস্থা রাখ। দারুণ শীত আসিতেছে, বস্ত্র কই? ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তুত হও, নতুবা দেশ গেল।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

অনাহারে আত্মহত্যার চেষ্টা—রঘুনাথ উড়িয়া দেশে অন্নসংস্থানের কোন উপায় করিতে না পারিয়া তাহার অন্নক্লিষ্টা স্ত্রীকে দেশে রাখিয়া কর্ম্মের সন্ধানে কলিকাতায় আসে। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ছয় দিন অনাহারের পর তাহার হতভাগ্য জীবন পরিহার করিবার মানসে হাওড়ার পুল হইতে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়ে। একটি ডিঙ্গির মাঝিরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ জল হইতে তুলিয়া ফেলে। আত্মহত্যা করিবার অভিযোগে এই হতভাগ্য কলিকাতা দক্ষিণবিভাগের পুলিশ আদালতে বিচারার্থ নীত হয়। সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, খাঁ দণ্ডস্বরূপ আদালত না উঠা পর্য্যন্ত তাহাকে তথায় অবরুদ্ধ রাখিয়া সাহায্যস্বরূপ আদালতের দরিদ্রভাণ্ডার হইতে তাহাকে ২০৲ টাকা দিবার আদেশ দিয়াছেন।

—বীরভূমবাণী।

অনশনের চিত্র।—বেঙ্গলীর জনৈক সংবাদদাতা ত্রিপুরা চাঁদপুর হইতে খবর পাঠাইয়াছেন যে, কালীবাড়ী সেসনে একটি মজুর শ্রেণীর লোক না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে। লোকটি নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। পেটের দায়ে অস্থির হইয়া দুইটি ছোট মেয়েকে সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কয়েক দিন উপবাস করিয়া মারা গিয়াছে। এক দয়াবতী মহিলা জমিদার হতভাগ্যের নিরাশ্রয়া কন্যা দুইটির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।—জ্যোতিঃ।

ভারতবর্ষ ছাড়া এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা আর কোনো দেশে কোথাও নাই। কেন? তার কারণ আমরা সবাই জানি। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করিতে জানি না বলিয়াই এই দুর্ভোগ।

অন্নকষ্ট নিবারণ।

অন্নছত্র—বরিশালের হৃদয়বান লোকসকলের যত্নে টাউনস্কুলের পার্শ্বে অন্নছত্র খোলা হইয়াছে। অন্নক্লিষ্ট বহু নরনারী, বালক বালিকা সহ সহর ছাইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহারা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হয়রান হয়না। ভিক্ষা সম্বল লইয়া এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। শ্রীভগবান উৎসাহী অনুষ্ঠাতা-বর্গের মঙ্গল করুন।—কাশীপুর-নিবাসী।

অন্নসত্র—বরিশালে যে অন্নসত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে—বিগত ৫ই হইতে ১৯ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত—মোট ১৫ দিন যাবত গড়ে ১০০ জন শিশু স্ত্রীলোক ও অপরাগ পুরুষ আহার করিয়াছে ও বর্ত্তমানে দৈনিক ১৪৫ জন আহার করিতেছে।—বরিশাল-হিতৈষী।

দুর্ভিক্ষে দান।—পুরীর দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। বহুলোক অনশনে ক্লেশ পাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট সময় থাকিতেই সাবধান হইয়াছেন, কিন্তু তবু ক্লেশমোচন করিতে পারিয়া উঠিতেছেন না। দয়ার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তিদিগের সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। শোনপুরের মহারাজ বাহাদুরের এই দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে প্রতিষ্ঠিত তহবিলে ২ হাজার ২ শত ৯২ টাকা দান করিয়াছেন। সম্ভ্রান্তবংশে একলক্ষ টাকার চাউলও দিতেছেন। মহারাণী এক সহস্র টাকার বস্ত্রদান করিয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

দান।—আমরা মুর্শিদাবাদের শ্রীল শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের অতুলনীয় দানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অকাতরে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মুর্শিদাবাদের অনশনক্লিষ্ট ও বস্ত্রাভাবগ্রস্ত দরিদ্রগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, যে-সকল ব্যক্তি কোনরূপ কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে অক্ষম, এরূপ অসহায় দরিদ্র মাত্রেই তাঁহার ভাণ্ডার হইতে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পাইতে পারিবে।—মালদহ-সমাচার।—বীরভূমবার্ত্তা।

—জ্যোতিঃ।

সদনুষ্ঠান—জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল শর্ম্মা মহোদয় ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে ছয় সহস্রেরও অধিক দীনদরিদ্রকে খিচুরী ও তরকারী দ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইছেন।—ঢাকা-প্রকাশ।

দুর্ভিক্ষ ও জেলাবোর্ড।—কাপড় ও চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় গরীব লোকের আজকাল বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই কষ্টের কথঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিবার মানসে যশোহর জেলা বোর্ড খরিদ মূল্যে চাউল ও কাপড় বিক্রয়ার্থ তত্রত্য টাউন "কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্" লিমিটেডের নিকট ত্রিশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে যশোহর জেলা বোর্ডের এরূপ অর্থের সদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়া অনেকেই সুখী হইয়াছেন। আমরা বলি বঙ্গের সকল জেলা বোর্ডেরই সাধ্যানুসারে দুঃসময়ে গরীব লোকদিগের উপকারার্থ এই ভাবে কোন একটা সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

—বীরভূমবার্ত্তা।

অন্নকষ্ট নিবারণের নূতন উপায়।

উপবাস করিয়া সাহায্য।—কটকের প্রায় সকল হিন্দু মুসলমানগণই গতপূর্ব্ব রবিবার দিন উপবাস করিয়া তাহাদের সেই দিনের খাদ্য তত্রত্য বন্যা-পীড়িত লোকদিগকে সাহায্যার্থ দান করিয়াছিলেন। এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।—বীরভূম-বার্ত্তা।

কিন্তু উপবাস করিয়া উপবাসীর ক্ষুধা মোচন মুষ্টি

ভিক্ষায় কতদিন চলে? স্থায়ী প্রতিকারের উপায় চাই।
স্বদেশের ব্যবস্থা স্বায়ত্ত না হইলে পরিত্রাণের অন্য পথ নাই।

বন্যার উপদ্রব।

বর্ত্তমান অবস্থা।—প্রায় একের তিন অংশ জল কমিয়া গিয়াছে। আবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীসমূহের মোহানা উন্মুক্ত করিয়া বিভিন্ন খাল দ্বারা জল বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে, আশা করা যায় অবিলম্বে অতিরিক্ত জল কমিয়া যাইবে। শঙ্কর-আড়া খাল দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সহরের মধ্যবর্ত্তী খালের দুইপার্শ্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় দুইটি সেতু ও কয়েকখানি ইষ্টকালয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় সহরের প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

—মেদিনীবান্ধব।

আল্‌ফাডাঙ্গার বন্যা।—যশোহর জেলার অন্তর্গত আল্‌ফাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত প্রায় চুরাশীখানি গ্রামে মধুমতীর বন্যার জল উঠিয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। আউশ ও আমন প্রভৃতি ধান্য ও পাট সমস্তই জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর হইতে শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় ইতিপূর্ব্বেই তথায় ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেখানকার অধিকাংশ লোকেই দুইবেলা খাইতে পায় না। বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। কর্জ্জ করিতে হইলেও তথায় টাকা মিলিতেছে না। কারণ মহাজনগণ অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি অনেকে উদরের জ্বালা নিবারণ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।—প্রতিকার।

মুরারইএর বন্যা।—গত ৩।৪ দিন অতিবৃষ্টি হওয়ায় মুরারই ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহ বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে অনেক লোক গৃহহীন হইয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই বন্যায় আবাদী জমিরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।—বীরভূমবাসী।

বন্যা-পীড়িতের সাহায্য।

তমলুকের বন্যা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পঞ্চাশ মণ চাউল ও এক বস্তা কাপড় প্রেরণ করিয়াছেন।

হোরমিলার কোম্পানি ঐ-সমস্ত দ্রব্য ও কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবককে বিনা ভাড়ায় কলিকাতা হইতে তমলুকে প্রেরণ করিয়াছেন।

—প্রতিকার।

মেদিনীপুর জেলার বন্যাবিপন্ন ব্যক্তিগণকে কৃষিঋণ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গোপীবল্লভপুর এবং নয়াগ্রাম থানার অধীনে ৩২ খানি গ্রাম বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে। ৩০৪৪ বিঘা জমিতে বালি জমিয়াছে; প্রায় ১৫৩৮ বিঘা জলমগ্ন আছে, ২৪৫ বিঘা নদীগ্রাসে গিয়াছে। প্রায় ১১৭ খানা বাড়ী পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। ৫৬৭ খানা বাড়ীর শুকতর ক্ষতি হইয়াছে। ৩৬৮০ জন লোক বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে। নদীর উভয় দিকে এক মাইল করিয়া প্রস্থে এবং ৪০ মাইল দীর্ঘ ভূভাগে বন্যা হইয়াছে। জমির উপর দুই হইতে সাতফুট পর্য্যন্ত বালি জমিয়াছে। ধানগাছ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে।—ঢাকাগেজেট।

বন্যা-পীড়িতদের সাহায্য।—কাঁথির বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের রোগার্ত্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য কয়েকজন সরকারী ডাক্তার আসিবার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি এই-সকল ডাক্তারের কার্য্যপ্রণালী তত্ত্বাবধান জন্য স্থানীয় সরকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি জল কাদা হাঁটিয়া অনেক কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তথায় তিনি হামিরপুর বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণকে ওলাউঠার প্রতিকার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে বন্যাপীড়িত স্থানে ঔষধাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য-কল্পে তাঁহার এবম্বিধ যত্ন চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।—নীহার।

কটক এবং উড়িষ্যাতে বন্যা-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যে। গুপ্ত বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট তকাবী ঋণ প্রদানের জন্য এবলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।—যশোহর।

বন্যা-পীড়িতের সাহায্য। তমলুকের বন্যাপীড়িত অধিবাসীদিগের সাহায্যার্থ হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ কলেজের ছাত্রদিগকে লইয়া স্থানীয় লোকের দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিলাম, এযাবৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ শত টাকা এবং কয়েক মণ চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন। এ উদ্যম প্রশংসনীয়।

চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

অভাব নিবারণের সদুপায়।

বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর্‌স্ লিমিটেড্ গত দুইবৎসর যাবৎ অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গের প্রযত্নে মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। আমরা এযাবৎকাল তৈল, ডাউল, মসলা, উৎকৃষ্ট ঘৃত ও তৈলের কারবার করিতেছি। এতদ্ব্যতীত এইসঙ্গে ছাত্রদের ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবসার দ্বারা কার্য্যের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য পরিচালকবর্গ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

—শ্রীঅমুতোষ দাসগুপ্ত, এম্ এ, বিদ্যার্থী।

সেবক-সমিতি—ঢাকা-সহর-বাসী নমঃশূদ্র যুবকবৃন্দের উৎসাহে ও চেষ্টায় ঢাকা সহরে একটি সেবক-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণের সাহায্য ও সেবা শুশ্রূষা করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। এইরূপ সমিতি দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। বঙ্গের অন্যান্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থলেও এইরূপ সমিতি গঠন হওয়া উচিত। আমরা আশা করি সমবেত চেষ্টার ফলে নমঃশূদ্র যুবকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এই সমিতি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

—নমঃশূদ্র বান্ধব।

স্বাস্থ্য।

মফস্বলের স্বাস্থ্য।—মেদিনীপুর জেলার বন্যাপীড়িত স্থানসমূহের স্বাস্থ্যের কথা আর কি বলিব? জ্বর, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে শত শত লোক দেহত্যাগ করিতেছে। সে কথা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? না দেখিলে সে ভীষণ দৃশ্য বুঝান যায় না। একদিনের জ্বরেই ডাক্তার কবিরাজ না ডাকিতে ডাকিতেই প্রাণান্ত হইতেছে। একে উদরে অন্ন নাই, কাজ কর্ম্ম নাই, দুশ্চিন্তায় শরীর জর্জ্জর, তাহার উপর রোগের আক্রমণ যে সহজ ও সুলভ, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ!

দাসপুর থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে কি ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহা দেখিলে মহামারী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। মেদুতা প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যার লতা পাতা ও গুল্মাদি পচিয়া চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। এবং জ্বরে বোধ হয় কোন বাড়ীর একজনও পথ্য সেবন না করিয়া সুস্থ শরীরে নাই। জ্বরের এমন ভীষণতা কখনও দেখা যায় নাই। কত লোক মরিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

জেলাবোর্ড যদি কিছু প্রতিকার করিতে পারেন ত অবিলম্বে চেষ্টা করুন।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সদনুষ্ঠান।

মিঃ আর দুধোড়িয়ার দান।—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জের ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত আর দুধোড়িয়া মহোদয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হস্‌পিট্যাল-গৃহ নির্ম্মাণ উপলক্ষে ১০০১৲ টাকা দান করিয়াছেন ও তত্রত্য একটি রোগীর পরিচর্য্যার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ৪০০০৲ টাকা জমা দিয়াছেন। ইঁহার দেশহিতার্থ এই দান বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।—প্রতিকার।

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা।—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সন্তোষের ছয় আনি কোর্ট অব ওয়ার্ড ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরীর উদ্যোগে কোকডহরা গ্রামে গত ৪ঠা আগষ্ট এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ১৫০ রোগী চিকিৎসার্থ আসিতেছে। আমরা অবগত হইলাম, সতীশ-বাবুর চেষ্টায় পলানিয়া গ্রামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।—ঢাকা-গেজেট।—ঢাকা-প্রকাশ।

সরকারী ডাক্তার।—রামনগর ও জুকী প্রভৃতি অঞ্চলের বন্যা-বিপন্ন ব্যক্তিদের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার্থ সম্প্রতি ঔষধাদি সহ পাঁচজন ডাক্তার প্রেরণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই-সকল ডাক্তার উপরোক্ত স্থানসমূহে চিকিৎসার্থ গমন করিয়াছেন।—নীহার।

বস্ত্রাভাব ও তার প্রতিকার।

চরকার চলন।—গান্ধী মহাশয় দেশী চরকায় কাটা সুতার কাপড় পরেন। শুনিতে পাই শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরুর পরিবারের সকলেই নাকি দেশী চরকায় কাটা সুতার কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলার সুকন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী যে সকল কাপড়-চোপড় পরিয়া এবার কলিকাতা আসিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। প্রায় সমস্ত কাপড়ই দেশী চরকায় হাতে কাটা সুতার তৈরী। কাপড়গুলি মোটা ও মজবুত। বৃন্দাবনী ছাঁচে তিনি কাপড়গুলির সুন্দর পাড় করিয়াছেন। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাদের নিকট বলিয়াছেন—তিনি এবার বাংলার ঘরে ঘরে চরকা বসাইয়া এবং বাংলার মেয়েদিগকে চরকায় সুতা কাটা শিখাইয়া তবে পাঞ্জাবে ফিরিবেন। তাঁহার এই সাধু সংকল্প সিদ্ধ হউক ইহাই আমাদের আকিঞ্চন। বাংলার মেয়েরা ত ঠেকিয়া শিখ নাই, এইবার দেখিয়া শিখ।—রায়ত।

স্বদেশী তাঁতের বস্ত্র।—রামপুরহাট স্বদেশী তাঁতের দ্বারা স্থানীয় ডাক্তার জগদীশ্বর সাহা মহাশয় আগামী শারদীয়া পূজার জন্য বরাতমত নানারকম ধুতি সাড়ি ও কোট কামিজের কাপড় প্রস্তুত করাইতেছেন।—রাঢ়দীপিকা।

গরুর অভাব।

গো-রপ্তানি।—বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বৈঠকে মাননীয় মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রশ্নোত্তরে মিঃ শর্ম্মা বলেন যে ১৯০৭ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট গো-রপ্তানি বিষয় আলোচনা করিতেছেন। ১৯০৭-০৮ সালে গবর্ণমেণ্টের ধারণা ছিল গো-রপ্তানির ফলে দেশে উৎকৃষ্ট গরুর অভাব ঘটিবে। ১৯১৪ সনে এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে ১৯১৬ সালে কৃষিবোর্ড স্থির করেন গো-রপ্তানি বন্ধ করা শ্রেয় হইবে না; কিন্তু যে স্থানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু জন্মে তথায় অপেক্ষাকৃত হীনজাতির গরুর সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না হয় তাহার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। গত বৎসর কৃষিবোর্ড এই বিষয় আলোচনা করেন। বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে গো-রপ্তানির ফলে দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরুর সংখ্যা হ্রাস হইবার কোন আশঙ্কা নাই। রপ্তানির পরিমাণ এত কম যে তাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরুর সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে না। বিদেশীয় বণিকগণের নিকট হইতে উচ্চহারে মূল্য পাইলে দেশীয় গোয়ালাগণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু জন্মাইবার চেষ্টা করিবে। ভারতগবর্ণমেণ্ট কৃষিবোর্ডের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ শ্রেণীর গরু রপ্তানি হইতেছে এবং দেশে কোন্ শ্রেণীর গরু কি পরিমাণ আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছেন। ১৯১৭ সালে দেশে গাভীর সংখ্যা সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালে কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। সংক্ষেপে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, এই অবস্থায় গো-রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন নাই।—দেশে দুধ, ঘৃত, দধি প্রভৃতি একেবারে দুষ্প্রাপ্য। এইসমুদয় জিনিষ সামান্য পরিমাণ পাওয়া গেলেও তাহা অগ্নিমূল্য। এই অবস্থায় দেশের গরু দেশে রাখিবার বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কৃষিবোর্ড গো-রপ্তানি বন্ধ করিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু এই দিকে যেরূপ রপ্তানি হইতেছে তেমন বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ষাঁড় ও গাভী আমদানির ব্যবস্থা করাও সঙ্গত নহে কি?—জ্যোতিঃ।

অভাব-নিবারণের শিক্ষা।

বাণিজ্য শিক্ষার কলেজ।—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে সম্প্রতি একটা বাণিজ্য-বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত নীলরতন ভট্টাচার্য্য জানাইয়াছেন—কলিকাতা সহরে একটি বাণিজ্যশিক্ষার কলেজ খুলিবার জন্য তিনি ১০,০০০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন যদি আরও দশজনে দশহাজার করিয়া দেন। দেখিব এবার কর্ত্তাদের কথায় কাজে ঠিক কত!—কল্যাণী ও প্রতিকার।

টেক্‌নিক্যাল স্কুল।—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার করপোরেশন ষ্ট্রীটে প্রায় ছয় বিঘা জমি লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই স্থানে এক টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে।—এডুকেশন গেজেট।

খনি-বিদ্যালয়।—গবর্ণমেণ্ট ধানবাদে একটি খনি-বিদ্যালয় সংস্থাপনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয় ভারতের সকল প্রদেশের ছাত্রগণকেই শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হইবে।—বীরভূমবার্ত্তা।

শিক্ষা-বিস্তারের অনুষ্ঠান।

দান।—ঢাকা-বালিয়াটীর ভূম্যধিকারী বাবু হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী বালিয়াটী ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—বরিশাল-হিতৈষী।

সরকারী সাহায্য।—ফরিদপুর সহরস্থিত 'অষ্ট্রেলিয়ান মিশন' কর্ত্তৃক উক্ত মিশনের বাড়ীতে যে টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেদিন ফরিদপুর পরিদর্শন কালে মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সেই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ঐ স্কুলের জন্য ৫ হাজার টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিয়া গিয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

আমাদের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় চীফ্ কমিশনার বাহাদুরের আদেশ-মত ঘোষণা করিয়াছেন যে, আসামের অন্ধ ও মূক-বধির ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার জন্য কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয়ে মাসিক ১৩৲ টাকা করিয়া ৩টি ও কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে মাসিক ১৮৲ টাকা করিয়া ৩টি বৃত্তি এই বৎসর দেওয়া হইবে। এই বৃত্তির

জন্য আসাম শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। এ, কে, সাহা,
প্রধান শিক্ষক, কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়; ও নীহার

পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা।—পত্রান্তরে প্রকাশ, ময়মনসিংহ জিলার কটিয়াদি পোষ্টাফিসের এলাকাধীন দশপাথী গ্রামের শিক্ষিত ভদ্র-মণ্ডলীর উৎসাহে ও যত্নে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে বঙ্গীয় লেখকগণের পুস্তকাদি সংগৃহীত হইতেছে। পণ্ডিত মহম্মদ দিনায়ত উল্লা সাহেব এই লাইব্রেরীর সম্পাদক এবং মুন্সী আবদুল গফুর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

শিক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

স্কুলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।—জেলা ঢাকা, মাণিকগঞ্জ সবডিবিশনের অন্তর্গত ঢাকাইজোড়া একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের আশেপাশে অনেক গরীব মুসলমানের বাস। এই গ্রামের ৭।৮ মাইলের মধ্যে কোনরূপ বিদ্যালয় নাই, তজ্জন্য শিক্ষিত সমাজ হইতে এইসমস্ত দুর্ভাগ্য অধিবাসী অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। যদিও ২।৪ জন হিন্দু-মুসলমানদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁহারা বিদেশে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি রাখিয়া স্বচ্ছন্দে পড়াইতেছেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের চেষ্টা না থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষণে উপস্থিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের অনেক চেষ্টায় উক্ত গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। উপযুক্ত সাহায্য দ্বারা এই স্কুলটির উন্নতি সাধিত হইলে এবং ইহা উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করিতে পারিলে ইহার দ্বারা স্থানীয় অধিবাসিগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশের উন্নত সমাজহিতৈষী মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, এই স্কুলের উন্নতিকল্পে যথাশক্তি সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

ঠিকানা—আবদুল হক। গ্রাম ঢাকাইজোড়া, পোঃ বুতলি, জেলা ঢাকা। বিনীত—ঢাকাইজোড়া-গ্রামবাসীগণ।—মোস্‌লেম-হিতৈষী।

শিক্ষা-বিষয়ে উৎসাহ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—
পদক ও পুরস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।—

পদক	প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক কাব্য ও নাট্যসাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—(ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের উপকরণ।

৪। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৫। হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদক—মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও বৃত্র-সংহার কাব্যের বৃত্রাসুরের তুলনায় সমালোচনা।

৬। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশের সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৭। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

১০। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে 'শৈলজা' চরিত্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যান-ভাগ।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৫ম বিষয় স্কুলকলেজের ছাত্রদের জন্য এবং ৯ম ও ১০ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সকল-সাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ১১শ বিষয়ে প্রবন্ধ আগামী পূজার দুটীর মধ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধ ৩১এ চৈত্র মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির,
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
১৭ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

স্বাধীন জীবিকায় স্বাধীন অনুষ্ঠান।

তালের গুড় ও মিশ্রি।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বোলপুরে শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় একটি তালের গুড় ও মিশ্রির কারখানা স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বোলপুরে প্রচুর তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। মালিকগণ তাহা 'শিউলী'দের তাড়ী করিবার জন্য জমা দেন, কারণ গুড় প্রস্তুতের কারিকর নাই। হরিপ্রসাদের এ প্রচেষ্টা সফল হইলে গরীবদের যথেষ্ট উপকার হইবে। যাঁহারা এরূপ গুড় ও মিশ্রি প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়কে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।—বীরভূমবাণী।

অল্পব্যয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ।

তোষক—নন্দপাড়া হইতে সারদাবাবু লিখিয়াছেন—নারিকেলের ছোবা কি সুপারির ছোবা ঢেঁকিতে ভানিয়া তোষক তৈয়ার করিলে অতি উত্তমই হয়। অর্থশালী লোকদিগের কথা আমি বলিতেছি না কিন্তু গরীব গৃহস্থের পক্ষে সাধারণ ব্যয় দ্বারাই অতি উৎকৃষ্ট তোষক ব্যবহারের কাজ চলে। অনেকে ইহা দ্বারা বালিশ, লেপ, প্রভৃতিও তৈয়ারী করিয়া থাকে। আমি মাত্র সামান্য চেষ্টায় বালিশের জন্য কতক ছোবা তুলার ন্যায়ই তৈয়ারী করিয়াছি। গরীব গৃহস্থ ভাই একবার এই চেষ্টা করিয়া দেখিলে বোধ হয় সফলকামই হইবেন।—
—কাশীপুর নিবাসী

কৃষি-কৌশল।

হাজারি কাঁঠাল প্রস্তুতের উপায়।—একটা পাকা কাঁঠাল লম্বা দিকে করিয়া মাটীতে কোনও স্থানে রোপণ করিতে হইবে। এমন

ভাবে রোপণ করিতে হইবে যে, উপরের মুখের উপর যেন মাটী না থাকে। কাঁঠালটি যাহাতে শিয়াল-কুকুরে খাইতে না পারে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কয়েক দিন পরে আস্তে আস্তে কাঁঠালের ডাঁটাটি নাড়িয়া দেখিতে হয়। যদি ডাঁটাটি নরম বোধ হয় এবং সহজে উঠিয়া আসে, তাহা হইলে আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় আট দশ দিন পরে এই ডাঁটার চিহ্ন দিয়া এক ঝোপ কাঁঠালের চারা উঠিবে। এই চারাগুলি একটু বড় হইলেই গোময় দিয়া সকলগুলি একত্রে বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সকল চারার গুঁড়ি মিলিয়া একটি গাছ হইয়া যাইবে। এই উপায় ব্যতীত অনেকগুলি কাঁঠাল-বীজ একত্র রোপণ করিয়া পরে গাছগুলি বাঁধিয়া দিয়া গোময় বা চিক্কণ মাটীর প্রলেপ দিলেও ঐরূপ ফল হয়। এবং এই প্রথায় দৃশ্যতঃ একটা কাঁঠাল গাছে খাজা, নেয়ো, রস-খাজা প্রভৃতি তিন প্রকার কাঁঠাল ফলাইতে পারা যায়। উক্ত প্রকারে গাছ তৈয়ারি করিলে গাছ বলবান হয় এবং বহু ফল প্রসব করে।—সম্মিলনী।

শিক্ষার সুফল।

বিধবা বিবাহ—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর লালা গঙ্গারাম সি, আই, ই; এস, ভি, ও, মহাশয়ের নেতৃত্বে লাহোরে "পঞ্জাব বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা" স্থাপিত হইয়াছে।

এই সভার সাহায্যে গত জুন মাস পর্য্যন্ত ২৮০ টি বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। অধিকাংশ বিবাহ ক্ষত্রি, বৈশ্য, অরোরা, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের নিকট আত্মীয়দের দ্বারা সমাধা হইয়াছে।

টাঙ্গানিকা টেরিটরি। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বে।
(ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ ঈষ্ট আফ্রিকা।)

রাজসাহীবাসীর কৃতিত্ব—রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি আমেরিকাতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্, এস, সী পাস করিয়া যুক্ত রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাড়িত-ঘটিত ইন্‌জিনিয়ারিং ও কলকারখানা প্রভৃতি বিদ্যায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ২০টি নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইসমুদয় যন্ত্র তাঁহার নিজ মৌলিক গবেষণার ফল। মিঃ চক্রবর্ত্তীর নবোদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল ও কার্য্যকারিতা আমেরিকার বিশেষবিদ্‌গণের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে তিনি এই উদ্যমশীল যুবকের উদীয়মান প্রতিভাকে সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত করুন।
—হিন্দুরঞ্জিকা।

বাংলার কৃতী ছাত্র।—বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে শ্রীমান সুবাসচন্দ্র বসু সম্মানের সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, প্রতিযোগী পরীক্ষায় তিনি ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমান সুবাস কটকের রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু মহাশয়ের ৬ষ্ঠ পুত্র। শ্রীমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। গত বৎসর স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে সম্মানের সহিত দর্শন শাস্ত্রে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই সেপ্টেম্বর মাসে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া শ্রীমান বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন।—রায়ত।

শিক্ষা-জনিত প্রীতি ও ঔদার্য্য।

এ বৎসর বিহার প্রদেশে বক্‌রী-ঈদ্ পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বিহারে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে—এই কথার উল্লেখ করিয়া বিহার-উৎকলের ছোটলাট মাননীয় এডোয়ার্ড গেট ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বকরী ঈদ্ হাঙ্গামার কারাবদ্ধ তাবৎ অপরাধীকেই ছাড়িয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ছোটলাট বাহাদুরের এরূপ ব্যবস্থায় দেশের লোক বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

সৎ-সাহস।

বাঙ্গালী বালকের সাহস।—ভবানীপুর গড়িয়া রোড হইতে বাবু রঙ্গিতনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃত-বাজার পত্রিকায় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে,—"গতকল্য আমার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ভগ্নী শ্রীমতী সরলাবালা দেবী রাত্রি ৮টার সময় লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে আমাদের নিজেদের মোটর-গাড়ীতে বাসায় প্রত্যাগমন করিতেছিল। সহসা বালিগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবের কাছে আসিয়া মোটরের একটা চাকা ফাটিয়া যায়; গাড়ীতে আর অতিরিক্ত চাকা না থাকায় মোটর-ড্রাইভার অন্য একটি ট্যাক্সি আনিবার জন্য একটু দূরে যায়। ইতিমধ্যে জনৈক মাতাল সাহেব আমার ভগ্নীকে একাকিনী দেখিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ধরিতে যায়। ইতিমধ্যে শীতলচন্দ্র চাটার্জ্জি নামক ষোড়শবর্ষীয় একটি বালক ঐ স্থান দিয়া যাইবার সময় সাহেবের এই কাণ্ড দেখিয়া সিংহের গর্জ্জনে তাহার উপর আপতিত হয় এবং প্রায় ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমার ভগ্নীও কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়ায়। ইত্যবসরে ড্রাইভার ফিরিয়া আসে এবং দুইজনে মিলিয়া সাহেবকে এমন প্রহার দেয় যে সাহেব তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। আমার ভগ্নী শীতলের সাহসিকতায় এত সন্তুষ্ট হয় যে, সে তাহার আংটী খুলিয়া বালককে দিতে চাহে, কিন্তু বালক তাহা গ্রহণ না করিয়া এই বলিয়া বিদায় লয় যে,—"বোন, ঈশ্বরের নিকট শুধু এই প্রার্থনা করিও যে আমি যেন প্রত্যেক লোকের প্রতি আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালন করিতে পারি।"
—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

শোক-সংবাদ।

শোক সংবাদ। দিঘাপতিয়ার স্বনামধন্য জমিদার কুমার বসন্তকুমার রায় মহোদয় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা একান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। কুমার বাহাদুর একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন; এই ত সেদিন তিনি রাজসাহী কলেজে ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়ন প্রভৃতির শিক্ষায় অন্য তিন লক্ষ চার হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশের যে একজন প্রকৃত স্বদেশ-সেবক ও দানবীরের অভাব হইল একথা অবিসম্বাদিত সত্য। ভগবান পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।—ঢাকা-প্রকাশ।

স্মৃতিরক্ষা।

বাঙ্গালী পল্টনের যে-সকল সৈনিক মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে নিহত হইয়াছে তাহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ মিউনিসিপালিটী কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে একখণ্ড জমি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। চাঁদা আদায়ে উক্ত স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে।—(বীঃ বাঃ)
বীরভূমবাসী।
—সেবক।

আলোচনা

পিঁপ্‌ড়ের পাতার বাসা।

আশ্বিনের প্রবাসীতে (৫৩৭ পৃঃ) যে পিঁপড়ের কথা লিখেছেন তা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে খুব দেখা যায়। সেখানে এর নাম "কুরকুট"। বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের হাটে এই পিঁপ্‌ড়ে বিক্রয় হয়। মেয়ে নিয়ে আসে। ভূমিজ জাতীয় লোকেরা এর ঝোল রেঁধে খায়। তারা বলে বেশ উপাদেয়। কোনও কোনও অঞ্চলে ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়।

এদেশেও ইহা যথেষ্ট আছে। সব গাছেই এরা বাসা করে—আম, কাঁটাল, সেগুন, নেবু, ডালিম, পেয়ারা কোনও গাছই বাদ যায় না। এরা খুব ক্ষিপ্রগতি।

টিনেভেলী, শ্রীকিরণচন্দ্র বসু।
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

—

কাপড়ের কল।

"প্রবাসী"-পাঠকগণ কয়েকমাস যাবৎই মোটা কাপড়ের অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সুতা, চরকা ও তাঁতের খবরাখবর করিতেছেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত আলগী গ্রামে এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ৬।৭ বৎসরের মধ্যে চল্লিশটি কাপড়ের তাঁত নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই লোহা ও ইস্পাতের নির্ম্মিত বিলাতী তাঁত। অপরগুলি কাঠের তৈয়ারী দেশী তাঁত। লোহার তাঁতে প্রত্যহ ৮০ আশি হাত কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। মেশিনে চালাইলে এই তাঁতেই বোধ হয় দৈনিক ২৪০ হাত বা পুরা মাপে ১২ জোড়া দশগজা বুতি প্রস্তুত হইতে পারে। আজ ২।৩ বৎসর যাবৎ এই-সমস্ত লোহার তাঁত বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে না। "হেটার্সলি লুম" বা অপর কোনও বিলাতী লুম কাহারও অনুসন্ধানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিলে আমরা উহা উচিত মূল্যে ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।

উল্লিখিত তাঁতগুলিতে শুধু যে তন্তুবায় জাতিই কাজ করিতেছে তাহা নহে। উচ্চবংশের ভদ্র কায়স্থগণ, তিলি, রজক ও মুসলমান সকল জাতির গৃহেই ঐ কল দেখা যাইতেছে। এই তাঁত অবলম্বন করিয়া—যাহাদের গৃহে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুইবেলা উনুন জ্বলিত না—তাদৃশ দীনদুঃখীরাও ৫।৭ বৎসরের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে সুতা সরবরাহ হইলে কেবলমাত্র উহাদের চেষ্টাতেই ঐ অঞ্চলের বস্ত্রাভাব নিবারিত হইতে পারে।

আলগী, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
পোষ্ট নওপাড়া, জেলা ঢাকা।

—

জীবিত পুরুষপরম্পরা।

ভাদ্র মাসের "প্রবাসীতে" পঞ্চশস্য বিভাগে আমেরিকার দীর্ঘায়ুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং "এরূপ কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন না শুনিয়াছেন?" ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

আমাদের গ্রামে একটি বালকের পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী, বালকের পিতার পিতামহ-পিতামহী ও মাতামহ বর্ত্তমান।

কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, বাঁকুড়া। শ্রীরামানুজ কর।

আমার কল্যাণী দুহিতা শ্রীমতী অরুণা এ বিষয়ে শ্রীমতী জোসেফাইন অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবতী। নিম্নলিখিত দুটি টেবিলে তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমতী জোসেফাইন	শ্রীমতী অরুণা	
	পিতা	মাতা
মাতা	পিতামহ	মাতামহ
মাতামহী	পিতামহী	মাতামহী
পিতামহী	পিতার পিতামহী	মাতার পিতামহ
পিতার পিতামহী	পিতার মাতামহী	মাতার পিতামহী
পিতার মাতামহী		মাতার মাতামহী

সুতরাং "দীর্ঘায়ু" সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে সেরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও বিরল নহে।

বাহেরক, দিঘির পাড়, ঢাকা। শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, বি-এ।

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে পঞ্চশস্য বিভাগে "দীর্ঘায়ু" শীর্ষক সংবাদের (Journal of Heredity March 1919) আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই মুদ্রের সহরে শরদিন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জয়মঙ্গল ফিজিক্স ওয়র্কে দিব্যেন্দুভূষণ নামে একটি শিশু বালক আছে যাহার মাতা পিতামহী, মাতামহী, পিতার পিতামহী, পিতার মাতামহী, জীবিতা তো বটেনই, অধিকন্তু মাতার পিতামহ পিতামহী ও মাতার পিতামহীর মাতা পর্য্যন্ত জীবিতা আছেন।

সর্ব্বাণীচরণ মুখোপাধ্যায়।

একসঙ্গে বহু পুরুষপরম্পরা জীবিত থাকা সকল দেশেই দুর্লভ, তবে অন্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশে একপ দৃষ্টান্ত যে অধিক তার কারণ বোধ হয় আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ, দীর্ঘ আয়ু নহে।—

প্রবাসীর সম্পাদক।

—

একটি কাজের কথা।

আমাদের দেশের বহু গৃহস্থ এনামেল (কলাই-করা বাসন বলিয়া পরিচিত) বাসন কিনিয়া থাকেন।

এখন কথা হইতেছে, এই কলাই-করা বাসন কি চিরদিন বিদেশ হইতে আসিবে? জাপান এই কলাই-করা বাসনগুলি সরবরাহ জোগাইতেছে। জাপানী মাল খেলো হইতে পারে, কিন্তু দামে খুব সস্তা। সুতরাং আমাদের দেশে জাপানের মালের কাটতি খুব বেশী হইতেছে, এবং হইবারই কথা।

আমাদের দেশে এখন কলাই-করা বাসন তৈয়ারি করিবার চেষ্টা করা যায় না কি? রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যাঁহাদের শিল্প শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কি এ বিদ্যা শিখেন নাই? যদি কেহ শিখিয়া থাকেন তবে এই ত তাঁহার সাহস্র সুযোগ।

লাখটাকা, বিশলাখ টাকা, এমন কি ক্রোড় টাকা মূলধন লইয়া কতগুলি ব্যবসা দেখিতে দেখিতে যৌথ ভাবে আরম্ভ করা হইল। এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কি আমাদের কোনও যোগ্য কর্ম্মী বা কর্ম্মীমণ্ডল যৌথ কারবার আরম্ভ করিতে পারেন না?

ইহার এখন খুব চাহিদা। এই চাহিদা ক্রমেই বাড়িবে। সুতরাং ক্রেতার অভাব ঘটিবে না। লোকে এখন স্বদেশী জিনিষ চায়। ইহাও আর-এক মস্ত সুবিধা।

জাপান যদি বাজার গ্রাস করিয়া বসিতে পারে, তখন বিঘ্ন তারও বাড়িবে। সস্তার ওস্তাদ কুশলী জাপানকে বাজার হইতে হটান অসম্ভবের কাছাকাছি হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

দুর্গেশ-নন্দিনী।

আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম,—"বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-বৃত্তান্ত কি ঐতিহাসিক সত্য? যদি সত্য হয়, তবে ইহার ঘটনাস্থল গড়মান্দারণ, কি বিমলীগড়-বিরণকিতাদি?" তাহার উত্তরে ভাদ্রমাসের "প্রবাসী"তে শ্রীএককড়ি কুণ্ডু মহাশয় গত ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় লিখিত "দুর্গেশনন্দিনী-নিকেতন" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে প্রবন্ধে জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা বা প্রমাণোল্লেখ নাই এবং দুর্গেশনন্দিনীর ব্যাপার যে গড়মান্দারণেই ঘটিয়াছিল, এরূপ কোন কথা তাহাতে নাই, বরং উল্টা আছে।

সুতরাং (এই বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে) ইহার ঘটনাস্থল গড়মান্দারণ নহে; কারণ, প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে, মানগড় বিরণকিতাদি ইহার ঘটনাস্থল বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা,—

(১) বিহারের এই-সকল অবজ্ঞাত, অনুন্নত পল্লীতে হিন্দীভাষা-ভাষী ও বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত। তাহারা বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" পড়ে নাই, অথচ তাহাদের মধ্যে এই প্রবাদ বর্ত্তমান।

(২) এখানে বীরেন্দ্র সিংহ ও তৎপত্নী বিমলার সন্ধান মিলিতেছে। তাঁহাদের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট "বিরণকিতা" ও বিমলীগড় এখনও বর্ত্তমান। ইহাদের আধ মাইল দূরে মৌজা মার্পায় শিবমন্দির রহিয়াছে।

(৩) এই সকল স্থানের অনতিদূরে রাজমহলে মানসিংহ ও তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ জগৎসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইহাদের পাঁচ মাইল দূরে যে বানগড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাহা মানসিংহের নির্ম্মিত বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস।

শ্রীসুধাংশুশেখর মজুমদার।

জাতি-সমস্যা।

সাহা-বণিক জাতের এক ভদ্রলোক আমাদের পত্র লিখিয়াছেন—সাহা-বণিক জাত ও শুঁড়ি জাত যে এক নয় তাহা সেন্সসের জাত-নির্ণয়ে ও শাস্ত্রজ্ঞদিগের ব্যবস্থায় স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও স্থির হয় নাই যে সাহাবণিক জাত ব্রহ্মার কোন্ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাই তিনি এই সমস্যার মীমাংসাপ্রার্থী হইয়াছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এই, যে, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতই আদিপিতামহ শিম্পাঞ্জীর মত কোন জীব হইতে বিবর্ত্তন প্রক্রিয়া অনুসারে উৎপন্ন; সুতরাং সকল জাতের লোকই সমজন্মা বলিয়া সমান পদবীয়। জাতে জাতে উচ্চ-নীচ তারতম্য মানুষের কৃত্রিম চেষ্টায় ও অবিচারে অত্যাচারে হইয়াছে। সেই বিশ্বাসে আমরা সকল জাতের মানুষকে সমান বলিয়া গুণ মর্য্যাদা অনুসারে সম্মান ও বিচার করিতে চেষ্টা করি।

প্রবাসীতে ও স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিতে কর্ম্মকার জাতকে 'কামার' বলিয়া উল্লেখ করাতে কনেক কর্ম্মকার ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়া অনুযোগ জানাইয়াছেন।

কোনও জাতের সংস্কৃত নাম করিলেই তার সম্মান হয়, এবং তার চলিত নাম করিলে অসম্মান হয়, এ ধারণা আমাদের ছিল না। জাত সামাজিক বিভাগের কৃত্রিম নাম; সে নাম সংস্কৃত বা প্রাকৃত যাই হোক, তার মানে ও মর্য্যাদা একই। জাত বিভাগ স্বীকার করাতেই তারতম্য ও হীনতা বোধ মনে জন্মে; সেইজন্যই আমরা জাত বিভাগ অন্যায় মনে করিয়া উহা সমূলে উচ্ছেদ করিবার পক্ষপাতী।

কোন পত্রিকায় বা পুস্তকে কোন জাতের কোন প্রকার উল্লেখ করিলেই যে সেই জাতের অমর্য্যাদা করা হইয়াছে এমন মনে করিবার পূর্ব্বে সেই পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকের মত ও গ্রন্থকারের মত অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা কর্ম্মকার হাড়ি মুচি কোনো জাতের লোককেই কেবল তাঁর জাতের জন্য অপর কোন জাতের লোকের চেয়ে হীন মনে করি না; বিদ্বান বুদ্ধিমান চরিত্রবান ধার্ম্মিক কর্ম্মকার, মূর্খ নির্ব্বোধ দুশ্চরিত্র কুকর্ম্মরত ব্রাহ্মণবংশীয় অপেক্ষা আমাদের নিকট ঢের বেশী সমাদর ও সম্মানের পাত্র।

যিনি কোন জাতকেই জাত হিসাবে ছোট মনে করেন না, তিনি যদি কতকগুলি বিভিন্ন জাতের উল্লেখ এক সঙ্গে করেন, তাতে কোন জাতের অসম্মান করা তাঁর উদ্দেশ্য, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিতে কামার কুমার হাড়ি মুচি জাতের নাম এক-সঙ্গে উল্লেখ থাকাতে পত্রলেখক কর্ম্মকার ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; কায়েত বামুনের পংক্তিতে কর্ম্মকার নাম থাকিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন না। তাঁর জাত্যভিমান এমনই প্রবল যে হাড়ি মুচি নামের পাশে তাঁর জাতের নাম থাকায় তিনি স্পর্শ ও ছুতের ভয়ে সঙ্কুচিত। তিনি যেখানে নিজের জাতের অমর্য্যাদা আশঙ্কা করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, সেখানেই তিনি অপর জাতকে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁদের অমর্য্যাদা করিতেছেন। নীতিপুস্তকের উপদেশ—"নিজে যা ভালবাস না, অন্যে তা কভু কোরো না।"—পত্রলেখক মহাশয়ের স্মরণ রাখা উচিত। সকল জাতকে যিনি সমান বিবেচনা না করিতে পারিবেন, যিনি জাতের গণ্ডী অতিক্রম না করিতে পারিবেন, তাঁরই এই বিপদ—তিনি পদে পদে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত জাতের কাছে হীন হইয়া থাকিবেন, এবং তাঁর চেয়ে হীন বলিয়া ভ্রম করিয়া অপর বহু জাতের লোকের অমর্য্যাদা করিয়া অপরাধী হইবেন। অপরকে অসম্মান করিয়া কেহ চিরকাল সম্মান-ভাজন থাকিতে পারে না।

প্রবাসীর সম্পাদক।

দুঃখ ও কাব্য

দুঃখে যখন বাজিয়ে তোলে প্রাণ
তীব্র সুখে গাই যে বসে' গান!
আঘাত ব্যথা অপমানের ভার
কাঁদিয়ে মোরে হাসায় অনিবার।
সেই বেদনার গুপ্ত মধু দিয়ে
কাব্য লিখি, ভরিয়ে তুলি হিয়ে।
সুখের সাথে নেই ত কভু দেখা,
দুখের সুখে প্রাণের বেগে লেখা।
কাব্য-লেখা—দুঃখে সুধু আঁকা,
তীব্র হিমে আগুন কাছে রাখা।
আঘাত খালি জিইয়ে তোলে প্রাণ,
দুখের বেগে আনন্দে গাই গান।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৃদ্ধ ও তরুণ।

কি যে সম্ভব, আর কি যে অসম্ভব, তাহা বলা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বটে। ভারী জিনিষটা নীচে পড়িয়া থাকিবে, হাল্কা জিনিষটা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু তথাপি মানুষ পুরাকাল থেকে আকাশে বিচরণ করিবার কল্পনা করিয়া আসিতেছে,—কেহ কেহ মনে করেন সেকালের লোকেরা পুষ্পক রথে চড়িয়া সত্যসত্যই আকাশে ভ্রমণ করিতেন। এখন ত চোখের সাম্‌নে দেখিতেছি, ভারী লোহালক্কড়ের তৈরী আকাশ-যান হাল্কা বাতাসের উপরে ও মধ্যে উঠিয়া হাজার হাজার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেছে। আগে যাহা অসম্ভব বা কল্পনার খেলা বলিয়া মনে হইত, এখন তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বিজ্ঞান এইরূপ "অসাধ্য-সাধন" অনেক করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানাবিধ ব্যাপারেও নানা দেশে এইরূপ অনেক "অসম্ভব" সম্ভবে ও বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং আমরা বৃদ্ধেরা যখন ইতিহাসের ও অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া তরুণদিগকে বলি, "এটা আগে কখনও হয় নাই, কিম্বা এটা করিবার চেষ্টা আগে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা এ চেষ্টা করিও না," তখন তাহারা যদি আমাদের কথা না শুনে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

বৃদ্ধের দৃষ্টি অতীতে আবদ্ধ, তরুণ আশানেত্রে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকে। বাস্তবিক, বয়সে মানুষকে বৃদ্ধ বা তরুণ করে না। ৬০।৭০।৮০ বৎসরের মানুষও তরুণ হইতে ও থাকিতে পারে, যদি তাহার চক্ষু কেবল অতীতে আবদ্ধ না থাকিয়া আশান্বিত হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভবিষ্যতের দিকেও তাকাইয়া থাকে, যদি সে মনে করে যে এমন কিছু শ্রেয়ঃ ভবিষ্যতে হইতে পারে, যাহা অতীতে হয় নাই। আবার ২০।২৫ বৎসরের মানুষও বৃদ্ধ হইতে পারে, যদি সে মনে করে যে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভাল আর কিছু হইতে পারে না।

ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, বৃদ্ধের শাস্ত্র। তরুণের শাস্ত্র তাহার আশা, তাহার আদর্শ, তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার উৎসাহ।

History repeats itself, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি—ইহা বৃদ্ধের বচন। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য মাত্র। মানুষের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও যুগে একই রকমের ঘটনা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এমন ব্যাপারও ত নিত্য সংসাধিত হইতেছে যাহা পূর্ব্বে কোন দেশে কোন কালে হয় নাই। তাই যখন বৃদ্ধ বলেন, "ওহে বাপু, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনি নাই, এ যে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি, এ চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হও;" তখন তরুণের মন বলে, "সৃষ্টি যে এখনও চলিতেছে, উহা ত শেষ হয় নাই; আমাকেও যে ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার সহকারী করিয়াছেন; আমি তাঁহার প্রদত্ত সৃজনশক্তির ব্যবহার না করিলে আমার অপরাধ হইবে; আপনি যাহাকে সৃষ্টিছাড়া বলিতেছেন, তাহার সৃষ্টি আমার আত্মায় ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল তাহাকে বাহ্যরূপ দিলেই হয়। আর "ন ভূতো" যে বলিতেছেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতেই "ন ভবিষ্যতি" সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি এমন হইত, যে, মানুষের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা অতীতে লেখা হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যাহা ঘটিতেছে ও ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা অতীতের খোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িখোড় মাত্র, তাহা হইলে আপনার কথা মানিয়া লইতাম, যদিও তথাপি আমার বিধিদত্ত হৃদয়মন ইতিহাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী থাকিয়া যাইত। কিন্তু ইতিহাস যে "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" গল্পের মত, ইহার শেষপৃষ্ঠা অতীতে লিখিত হইয়া যাওয়া দূরে থাক্, উহা যে কবে শেষ হইবে, শেষ হইবে কিনা, তাহার নিশ্চয় নাই। আপনি আমি সবাই ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছি, লিখিতেছি। ঘটনাচক্র আমাদিগকে ঘুরাইতেছে বটে, কিন্তু আমরাও ঘটনাচক্রকে ঘুরাইতেছি।"

বৃদ্ধ যখন বলেন, "অতীতের অভিজ্ঞতার আলো যে পথে পড়ে নাই, সে পথে চলিতে তোমাদিগকে কেমন করিয়া বলি? তাহাতে না-জানি কত বাধা কত বিপদই আছে; হয়ত তোমরা যে শুভ চাহিতেছ, তাহা ত পাইবেই না, তাহার জায়গায় অকল্যাণ তোমাদিগকে গ্রাস করিবে;"

তরুণের হৃদয় তখন উত্তর দেয়, "বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই ত মনুষ্যত্ব, বিপদ্‌কে পরাজিত করাতেই ত জীবনের সফলতা। সেই জন্য আমরা অজ্ঞাতকে, বাধাকে, বিপদ্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। আর আপনি যে কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা বলিতেছেন, ও কথা দুটি আমিও মানি; কিন্তু উহার মানে আমি একটু অন্য রকম বুঝি। সিদ্ধিই একমাত্র কল্যাণ এবং পরাজয়ই একমাত্র অকল্যাণ নহে। বরং ইহাই মনে হয়, যে, অনেক সিদ্ধিও অকল্যাণ এবং অনেক পরাজয় প্রকৃত কল্যাণ। বস্তুতঃ চেষ্টা ও সংগ্রামই একমাত্র কল্যাণ—ফল বিধাতার হাতে। লক্ষ্য যদি ক্ষুদ্র হয়, নীচ হয়, তাহাতে সিদ্ধিলাভ অকল্যাণ। লক্ষ্য যদি মহান্ হয়, উচ্চ হয়, চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাতে অসিদ্ধি কল্যাণ। অব্যবহৃত লোহার ন্যায় পড়িয়া পড়িয়া মরিচা ধরার মত অকল্যাণ আর কি হইতে পারে? তার চেয়ে চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হওয়াও ভাল; কেন না, বহুচেষ্টার স্তূপাকার মৃতদেহের উপর দাঁড়াইয়া আমাদের পেছনের সৈনিকেরা বাধারূপ দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে পারিবে।"

তথাপি বৃদ্ধের পক্ষে সাবধান করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন, তরুণের পক্ষে অজ্ঞাতের, বাধার, বিপদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিয়া চিরবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ শ্রেয়ের অভিমুখে ধাবিত হওয়াও স্বাভাবিক। তরুণ বৃদ্ধের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবেন না, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে বাধা বিপদের সহিত সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্র ও বল সঞ্চয় তিনি করিবেন; কিন্তু ভবিষ্যতের অজানা পথে দৃঢ় অকম্পিত পদে চলিবার যে প্রেরণা বিধাতা তাঁহার আত্মায় দিয়াছেন, তাহাকেও অগ্রাহ্য করিবেন না।

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে নানা মত শুনা যায়, ও নানা দলের আবির্ভাব হয়, তাহার মূলে যে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ ঈর্ষ্যা ইত্যাদি কখনও থাকে না, তাহা নহে; সাহসের অভাবেও যে অনেক সময়ে অনেকে তাঁহাদের হৃদয় ও বুদ্ধি যাহা বলে তাহার অনুসরণ করিতে পারেন না, ইহাও সত্য; বুদ্ধির বিচার-শক্তির ও জ্ঞানের তারতম্য, এবং অতীত জীবন ও সংসর্গজাত সংস্কারের ও বিশ্বাসের পার্থক্য বশতঃও নানা মত ও নানা দলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা বলিলেই মতভেদের ও দলভেদের উদ্ভবের সব কারণ বলা হইয়া যায় না। কতকগুলি মানুষের বার্দ্ধক্য ও অন্য কতকগুলি মানুষের তরুণতাও একটি প্রধান কারণ। পক্ককেশের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনেক তরুণ আত্মা সংসারে বিচরণ করেন; আবার অনেকের কালোচুল কলপ মাত্র, উহা যৌবনের লক্ষণ নহে, বার্দ্ধক্য ঢাকিবার কৌশল মাত্র। এমনও হয়, যে, কেহ কেহ এক একটা দিকে বুড়ো অন্য দিকে তরুণ। সেই জন্য রাজনীতিক্ষেত্রে আমূলসংস্কারপ্রার্থী এমন কি বিপ্লবপ্রার্থী লোকদের মধ্যে সামাজিকবিষয়ে অতীতবর্ত্তমানের গোলাম অনেক দেখা যায়, এবং সামাজিক বিষয়ে আমূলসংস্কার ও প্রগতিপ্রার্থী অনেকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এমন কিছু করিতে নারাজ যাহাতে দায়ঝুঁকি আছে।

যাহা আমাদের নিকট অসাধ্য বা দুঃসাধ্য মনে হয়, তাহা কৃষ্ণকেশ ও পক্ককেশ তরুণদের দুঃসাধ্য মনে না হইতে পারে। এই জন্য সুসাধ্যতা দুঃসাধ্যতা লইয়া বেশী তর্ক করিতে চাই না। কিন্তু কোন্ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বা ঈপ্সিত বস্তু আত্মার পক্ষে কল্যাণকর, কোন্‌টিই বা অকল্যাণকর, তাহা স্থির করিবার ভার অপরের উপর কোনমতেই দিয়া রাখিতে পারি না। যাহা অকল্যাণকর নহে, দুঃসাধ্য বলিয়া কাহাকেও তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চাই না; কিন্তু যাহা অকল্যাণকর, তাহা লোভনীয় ও সুসাধ্য হইলেও তাহাতে মত দিতে পারি না। সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বনেও মত দিতে পারি না। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপায় সমস্তই সাধু হওয়া চাই।

—

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ বিদ্বানের মত।

শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডার্সন্ বাংলা দেশে সিবিল সার্বিসে কাজ করিতেন। অনেক বৎসর হইল, তিনি পেন্সান লইয়া কেম্ব্রিজে বাস করিতেছেন। তিনি সেখানে ও লণ্ডনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শৈশবের ৮।৯ বৎসর এদেশেই যাপন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডার্সন্।
J. D. ANDERSON, D. LITT.

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে। তিনি হিন্দী, অসমীয়া, প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা জানেন, এবং নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাও জানেন। তাঁহাকে সাহিত্যাচার্য্য (Doctor of Literature) উপাধি দিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পাণ্ডিত্য স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক উন্নতির উল্লেখ করিয়া কয়েকবার ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে লণ্ডন টাইম্‌সের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"It happens that the first volume of a new series of Cambridge Guides to Modern Languages is a little manual of the Bengali language. It is much to be hoped that this is a tacit academical recognition of the fact that our forty-five millions of Bengali fellow-subjects possess a great modern literature already comparable with those of the nations of Europe, and full of a promise which in some Western nations has for the time been ruined by the political and social results of war.....novels,.....a modern form of literary art in which Bengal stands apart from other Indian nations and provinces, a new modern literature which deserves the same attentive and respectful study that we give to the fiction of France and Germany."

তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

"Surely we should be proud that in the British Empire we have now at least two great literatures."

"নিশ্চয়ই আমাদের গৌরব অনুভব করা উচিত যে এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটি (অর্থাৎ ইংরেজী ও বাংলা) মহৎ সাহিত্য বিদ্যমান আছে।"

সাহিত্যাচার্য্য এণ্ডার্সন্ মহাশয় বাংলা দেশ তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপননীতি।

যাহার লুকাইবার কিছু নাই, সে লোকের মুখ বন্ধ করিতে ব্যস্ত হয় না। ঠিক্ খবর যাহাতে বাহির না হয়, তাহার আয়োজন করিতে দেখিলেই লোকের সন্দেহ হয় যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাহা প্রকাশযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে যদি সত্যগোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া সত্য-প্রকাশের ও সমালোচনার সম্যক্ সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে লোকের বিশ্বাস হয়, যে, গোপন করিবার মত অপকর্ম্ম বা অপকৃষ্ট রীতি কিছু ত নাইই, অধিকন্তু মানব-সুলভ ভ্রম কিছু হইলে সমালোচনার সাহায্য লইয়া তাহা সংশোধন করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে।

দুঃখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গোপননীতি অবলম্বন করায় লোকের ধারণা দৃঢ়তর হইতেছে যে উহার ঘরের খবর ভাল নয়, এবং উহা সমালোচনার সাহায্যে ভ্রম সারিয়া লইতে ইচ্ছুক ও চেষ্টিত নহে। গোপননীতি আগেও ছিল ; কিন্তু সম্ভবতঃ সম্প্রতি মাসিকপত্রে ও খবরের কাগজে সমালোচনা হওয়ায়, অতঃপর সত্য যাহাতে প্রকাশ না পায় তাহার খুব কড়া বন্দোবস্ত হইতে যাইতেছে। "দি সার্ভেণ্ট" (অর্থাৎ সেবক) নামক ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছে যে "পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্-এ অধ্যাপনা কৌন্সিলের আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন" [অধিবেশনের তারিখ ছাপা নাই, আমরা জানি না উহা হইয়া গিয়াছে কিম্বা হয় নাই ; কিন্তু ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবে বা হইয়া গিয়াছে। আমরা তাহার তাৎপর্য্য দিতেছি।]

"১। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক এইজন্য সাধারণ বা বিশেষ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এম্-এ শ্রেণীর শিক্ষক তাঁহার সহযোগী উক্তপ্রকার শিক্ষক ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও বা কোন সংবাদপত্রকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্য করিবার সময় বা অন্য প্রকারে প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কোন কাগজপত্র বা সংবাদ দিতে বা জানাইতে পারিবেন না।

"২। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমতি লইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (এম্-এ শ্রেণীর) কোন শিক্ষক কোন খবরের কাগজ বা সাময়িক-পত্রের পুরা বা আংশিক স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবেন না, কিম্বা উহা সম্পাদন করিতে বা সম্পাদনকার্য্যে যোগ কিম্বা উহার পরিচালন বা উহার ব্যবসাঘটিত কার্য্যে যোগ দিতে পারিবেন না।

"যে সাময়িক বা সংবাদপত্র প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় নিয়োজিত নহে, কেবল তাহার সম্পর্কেই ঐরূপ অনুমতি দেওয়া হইবে, এবং এই অনুমতি

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মর্জ্জি অনুসারে যে-কোন সময়ে প্রত্যাহৃত হইতে পারিবে।

"৩। ১ নং নিয়মভঙ্গ না করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক নাম গোপন রাখিয়া সাময়িক ও সংবাদপত্রে লিখিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাকে সংযত ও যুক্তিযুক্ত আলোচনার সীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। যদি তাঁহার খবরের কাগজের সহিত যোগ সাধারণহিতের বিরোধী হয়, তাহা হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার কাগজে লিখিবার স্বাধীনতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়শিক্ষকের খবরের কাগজের সহিত সম্পর্ক সাধারণ-হিতের বিরুদ্ধ কি না, তাহা সন্দেহস্থল হইলে, বিষয়টি বিবেচনা করিবার এবং তদ্বিষয়ে আদেশ দিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হইবে।"

যে-সব ছাত্র এম্-এ পড়ে, অর্থাৎ মোটামুটি কোন রকম বিজ্ঞান পড়ে না, "আর্ট্‌স্" পড়ে, তাহাদের অধ্যা-পনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি কৌন্সিল্ আছে; যাহারা বিজ্ঞান পড়ে, তাহাদের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অন্য একটি কৌন্সিল আছে; এবং যাহারা আইন পড়ে তাহাদের জন্য পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত একটি তত্ত্বাবধারক-সমিতি আছে। উপরে যে প্রস্তাবগুলির কথা লিখিত হইল, তাহা পেশ্ করিবেন একজন সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে বা হইয়া থাকিলে তাহা বিজ্ঞানশিক্ষক বা আইনশিক্ষকদের উপর জারী করা যাইবে না। কেবল আর্ট্‌স্-শিক্ষকদেরই মুখ বন্ধ করিবার এবং হাত পা বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে কেন? তাঁহাদিগকেই বেশী "অপরাধী" বা "অপরাধ-প্রবণ" বলিয়া সন্দেহ করিয়া কেন অপমানিত করা হইতেছে? কিম্বা ইহাও হইতে পারে, যে, বিজ্ঞানশিক্ষক ও আইনশিক্ষকদের জন্যও পরে এইরূপ নিয়ম হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইবে, এবং ইহা প্রমাণ হইবে, যে, "আর্ট্‌স্"-শিক্ষকদের মধ্যেই সন্দেহভাজন বা গোলামীতে সন্তুষ্ট লোকের অনুপাত বেশী বলিয়া তাঁহাদেরই মুখবন্ধ করিবার ও হাত পা বাঁধিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। "দি সার্ভেণ্ট" কাগজটির প্রবন্ধে যেন এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে মনে হয়, যে, প্রস্তাবগুলি আর্ট্‌স্ শিক্ষক ও বিজ্ঞানশিক্ষক উভয় দলেই প্রতি প্রয়োজ্য হইবে। তাহা মনে করিবার কারণ দেখা যাইতেছে না।

[প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রবাসী-সম্পাদককে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলিতে হইতেছে; কেন না, অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, সম্প্রতি প্রবাসীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা প্রস্তাব তিনটি উপস্থিত করিবার একমাত্র কারণ না হইলেও অন্যতম প্রধান কারণ।

আমি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ কাগজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ব্যাপারের আলোচনা অনেক বৎসর হইতে করিয়া আসিতেছি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আমার সহকারী ছিলেন না, তখনও করিতাম, এখনও করি। চারুবাবু সবে দুবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট্‌স্-শিক্ষক হইয়াছেন। তাহার আগেও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমা-লোচনা করিতাম, পরেও করিয়াছি, এখনও করি, ভবিষ্যতেও আবশ্যক হইলে করিব। গত দুই মাসে প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছি, তাহার একটি বর্ণও চারুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিম্বা তাঁহার স্বতঃপ্রদত্ত কোন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয় নাই। বস্তুতঃ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। ঐ দুই মাসের আগেও, আমার যতদূর মনে পড়ে, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমি কোন সমালোচনা করি নাই; এবং ইহা নিশ্চিত যে বিশ্ববিদ্যালয়সংপৃক্ত কোন মুদ্রিত বা লিখিত কাগজপত্র আমি তাঁহার নিকট হইতে সমালোচ-নার জন্য পাই নাই ও লই নাই। তাঁহাকে সন্দেহমুক্ত করিবার জন্য আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কথাগুলি লিখিলাম। প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে এখন আর কিছু লিখিব না। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।]

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা কোন কাগজের স্বত্বাধিকারী বা আংশিক স্বত্বাধিকারী, (বেতনভোগী বা অবৈতনিক) সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ বা সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ, দ্বিতীয় প্রস্তাবের নিয়মটি তাঁহাদের

উপর খাটিবে, ইহা বুঝা সোজা। শিক্ষকদের মধ্যে এরূপ লোক কয়জন আছেন, ঠিক্ বলিতে পারি না। আমরা যতদূর জানি, কেবলমাত্র মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীর একজন সহকারী সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক। কিন্তু মডার্ন-রিভিউ-ও-প্রবাসী-রূপ মশা মারিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মত গোলন্দাজকে কামান পাতিতে বলিয়াছেন, এরূপ সন্দেহ করা আমাদের পক্ষে অত্যধিক অহঙ্কারিতা বলিয়া অনুমিত হইবে; এবং আমাদের অজ্ঞাত, অন্য কাগজ পরিচালনে সংসৃষ্ট, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকও থাকিতে পারেন; অতএব এরূপ সন্দেহ না করাই ভাল। তবে একথা বলিয়া রাখা ভাল, যে, কোনও সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকই কোনও কাগজের অস্তিত্বের বা কার্য্যকারিতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহেন, তাঁহাদের জায়গায় অন্য লোকের আবির্ভাব অসম্ভব নহে, এবং দেশহিতসাধন জন্য, একখানা দুখানা কাগজ লুপ্ত হইলে, তাহার স্থান পূরণার্থ অন্য কাগজের আবির্ভাবও অসম্ভব নহে। যদি বলেন, কাগজগুলার উদ্দেশ্য ও কার্য্য দেশহিতসাধন নহে, গবর্ণমেণ্টকে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গালাগালি দিয়া ও জ্বালাতন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা, তাহারও প্রতিবাদ আমরা এখন করিব না; কেবল বলিব, দুচারজন মানুষ কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেই জ্বালাতন করিবার লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু ইহাও কেহ যেন মনে না করেন, যে কাগজ চালানর কাজ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী করাই উভয় কার্য্যে ব্যাপৃত প্রত্যেক শিক্ষক বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন।

যাঁহারা কখন কখন বা নিয়মিতরূপে খবরের কাগজে বা সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, দ্বিতীয় প্রস্তাবটি তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু উহার ভাষা যেরূপ ব্যাপক, তাহাতে মনে হয় যে উহার জালে সকল রকম কাগজলেখক-মৎস্যকে ধরিবার অভিপ্রায় আছে। এইরূপ লেখকদের মধ্যে খুব পণ্ডিত ও মনস্বী লোক আছেন। এবং এই লেখকেরা প্রত্যেকেই অতীতকালে লেখায় ও বক্তৃতায় রাজনীতিকে বাদ দিয়া আসিয়াছেন, বা এখনও দেন, এমন নয়। আমরা কাহারও নাম করিতেছি না। কিন্তু মনে মনে [illegible] জানিবার কৌতূহল রহিল, যে, অতঃপর তাঁহারা খবরের কাগজে বা সাময়িক পত্রে লেখেন কি না; এবং লেখেন, তাহা অনুমতি লইয়া বা না লইয়া।

কোন কাগজের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ রাজনীতি কি না, তাহা স্থির করা সহজ নয়। বলা বাহুল্য, কোন বিদ্যালয়ের দোষপ্রদর্শন রাজনৈতিক আলোচনা নহে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় রাজনীতি বটে। মাসিক কাগজগুলির সম্বন্ধে ও সিদ্ধান্ত কঠিনতর। অধিকাংশ বাংলা মাসিক পত্রে রাজনীতি আলোচিত হয় না। যাহাতে হয়, যেমন প্রবাসীতে, সেগুলিতেও কয়েকটি পৃষ্ঠায় মাত্র রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু লেখা হয়, রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রায় থাকে না। কিন্তু এস্থলে বিবেচ্য, যে, রাজনীতি সম্বন্ধীয় লেখার পরিমাণ দ্বারা সাময়িক পত্রের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইবে? না, উহার রাজনৈতিক লেখার প্রকারভেদে কাগজটির প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইবে? দুইরূপ কোন কাগজের সহিত কোন শিক্ষককে সংশ্রব রাখিবার অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া উহার রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করিবে, ইহা বলাও ঠিক কিছু বলা হইল না। বস্তুতঃ ও কার্য্যতঃ এরূপ অনুমতি দান এবং অনুমতি প্রত্যাহার কৌন্সিলের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভু শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ নিগ্রহ মাত্র জানিতে হইবে।

যাহাই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকগণ এতদিন যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন, তাহা হৃত বা সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তন যে রকমেরই হউক, তাহা করিতে হইলে, কারণ দেখান দরকার, যে বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থার দ্বারা কি অনিষ্ট হইতেছে বা কি ইষ্ট হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখাইতে হইবে, যে উহার শিক্ষকগণ তাঁহাদের স্বাধীনতার কি অপব্যবহার করিয়া সর্ব্বসাধারণের কি অনিষ্ট করিয়াছেন। তাহা দেখাইতে না পারিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে না, যে, ব্যক্তিবিশেষের বা কতকগুলি লোকের স্বার্থে ঘা লাগায়, স্বেচ্ছাচারিতায় ও আত্মাভিমানে আঘাত লাগায় শিক্ষকদের স্বাধীনতা অপহৃত হইতেছে। [illegible] শিক্ষক

যদিই বা স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া থাকেন (যাহার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই), তাহা হইলেও সকলের স্বাধীনতা অপহরণ ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, চোর সকল দেশেই আছে, কিন্তু তা বলিয়া এমন আইন ত কোথাও নাই যে চুরি নিবারণ করিবার জন্য সকল মানুষের হাত দুটাতে হাতকড়া লাগাইয়া অকেজো করিয়া ফেলিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত লোকদের হাত খোলা থাকিবে। মিথ্যাসাক্ষ্যও সবদেশে দেয়, কিন্তু তজ্জন্য সকল মানুষের মুখে ঠুলি (gag বা muzzle) লাগাইয়া কেবলমাত্র অনুগৃহীত লোকদিগকে কথা বলিবার অধিকার দিতে হইবে, এরূপ আইনও কোথাও নাই।

পণ্ডিত ও মনস্বী লোকদের স্বাধীনতা থাকিলে সমাজের যে উপকার হয়, তাহা আমাদের দেশেও কিঞ্চিৎ হইয়াছে। যাঁহারা নানা বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান চিন্তা ভাব সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারায় তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা ও প্রতিভা সার্থক হয়, লোকেরাও উপকৃত হয়; কেহ কেহ কিছু রোজগার করিতেও সমর্থ হন। যে-সকল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোক এখনও খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই, উল্লিখিত সুবিধার উপর তাঁহারা খ্যাতিলাভ করিতেও সমর্থ হন। কাগজের পরিচালক বা মালিকদের কি সুবিধা হয়, তাহা না হয় নাই ধরিলাম; কেননা, সরকারী বেসরকারী জবরদস্ত লোকেরা তাহাদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখাটা কর্ত্তব্য মনে করেন না। তাহাদের সুবিধা অসুবিধার কথা না তুলিবার আর একটা কারণ আছে। সে কথা তুলিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ভাবিতে পারেন, সম্পাদকেরা বুঝি গলবস্ত্রে তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতেছেন। সে ভ্রমটা তাঁহাদের না হওয়া ভাল। বিশ্ব-বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা স্নেহসৌজন্য অনুগ্রহ করিয়া এপর্য্যন্ত নানা কাগজে লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সম্পাদকেরা উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাগজ মূল্যবান্ হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি সম্পাদকেরা চিরকৃতজ্ঞ আছেন। কিন্তু ইহাও আমরা জানি, যে, লেখকদের মধ্যে কেহই এরূপ মনে করেন না, যে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে না লিখিলে কোন কাগজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

এরূপ যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যে, নাই বা খবরের কাগজ বা সাময়িক পত্রে লিখিবার স্বাধীনতা রহিল? বিদ্বান্ ও প্রতিভাশালী লোকেরা বহি লিখিবেন, ও তদ্দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হইবে। ইহার নানা উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। বহি লিখিবার সময় ও সামর্থ্য যাঁহার নাই, একটি প্রবন্ধ লিখিবার সময় তাঁহার থাকিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা লোকে উপকৃত হইতে পারে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র যত লোকে পড়ে, বহি তত লোকে পড়ে না। বহি প্রকাশ করিতে হইলে, আমাদের দেশে, অধিকাংশ স্থলে, লেখককেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। অনেক সময় পুস্তক বিক্রয় হইতে খরচটাও আদায় হয় না। এই জন্য অনেকেই পুস্তক লিখিতে, এবং লেখা হইলেও ছাপাইতে, ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ছাপাইবার জন্য লেখককে খরচ করিতে হয় না, অধিকন্তু কেহ কেহ দু চার টাকা দক্ষিণাও পাইয়া থাকেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকার আখ্যা-পত্রে উহার উদ্দেশ্য Advancement of Learning বলিয়া মুদ্রিত আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে শিক্ষকদের স্বাধীনতা অপহৃত বা সীমাবদ্ধ হইলে, আর যে-কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক বা না হউক, উহা যে জ্ঞান-বিস্তারের সাহায্য করিবে না, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় প্রস্তাবটিতে কিঞ্চিৎ অনভিপ্রেত হাস্যরস আছে। উহাতে বলা হইয়াছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক নিজের নাম গোপন রাখিয়া কাগজে লিখিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে কিরূপ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবেন, এবং কি অবস্থায় তাঁহার কাগজে লিখিবার স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইবে, তাহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে মনে করেন, যে, উহাঁর শিক্ষকেরা এরূপ নাবালক, "দুষ্ট বালক" (bad boys) বা বিশ্বাসের অযোগ্য যে তাঁহাদিগকে লিখিবার পুরা স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু আবার অন্যদিকে ইহাও মনে করেন, যে, তাঁহারা এমন "ভাল ছেলে" যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়া কোন কাগজে বেনামী প্রবন্ধও তাঁহারা লিখিবেন

না! নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য, কখনও বা লোকহিতের জন্য, ইংরেজ ও ভারতীয় অনেক সরকারী কর্ম্মচারী নিজ নিজ নাম গোপন করিয়া সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রয়োজনমত লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা লিখিবার পূর্ব্বে উপরওয়ালার অনুমতি গ্রহণ করেন না, উপরওয়ালাকে জানান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ?

যাহা হউক, প্রস্তাবগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা স্বনামী, অনামা, বা বেনামী কোন লেখা অনুমতি না লইয়া কোন কাগজে দিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কেহ অনুমতি না লইয়া কাগজে অনামা, লেখা দেন (যেমন অনেক ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারী করিয়া থাকেন), তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কি করিবেন? "দি সার্ভেণ্ট" ঠিক্‌ই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয় কি গোয়েন্দার সাহায্যে অনামা লেখার লেখক আবিষ্কার করিবেন? যে নিয়ম লঙ্ঘন অনায়াসেই করা যায়, সেরূপ নিয়ম প্রণয়ন করা কি বিজ্ঞ লোকের পক্ষে সঙ্গত? ইহাতে কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিবেন, যে, কোন অনামা লেখা সংযত ও যুক্তিসঙ্গত কি না এবং উহা সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের অবিরোধী কি না। কিন্তু এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদিগকে লইয়াই গঠিত, কোনও উচ্চতর শ্রেণীর জীব লইয়া গঠিত নহে। অবশ্য সমিতির সভাপতি আছেন শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি শিক্ষক নহেন, এবং ইহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, তাঁহার মতই অধিকাংশ স্থলে সমিতি শিরোধার্য্য করিবেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের অনামা লেখার সংযততা, যৌক্তিকতা এবং লোকহিত-কারিতা সম্বন্ধে তাঁহার মত যেরূপ হইবে, তদনুসারে তাঁহা-দের ওরূপ লেখা কোন কাগজে পাঠাইবার স্বাধীনতা বজায় থাকিবে বা লুপ্ত হইবে।

অনামা লেখাও কাগজে পাঠাইবার জন্য অনুমতি লইতে যাঁহাদের রুচি হইবে, আশা করি এরূপ শিক্ষক কমই আছেন। কার্য্যতঃ, তাহা হইলে, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকেরা যাহাতে না লেখেন, ইহাই কর্ত্তার ইচ্ছা বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ কাগজে ছাপাইতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু লেখা নাই। কেবল অনামা লেখা সম্বন্ধে নিষেধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে হয়ত কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, যাহা আমরা জানি না। এখানে কেবল দুটা তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফী-বৃদ্ধির কথা যখন আলোচিত হইতেছিল, তখন আমরা উহার বিরুদ্ধে মডার্ন রিভিউ কাগজে লিখি। তাহার একটি অনামা প্রতিবাদ একজন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক পাঠান। উত্তরসহ উহা আমরা ছাপিয়াছিলাম। আবার গত ভাদ্রমাসে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকাদি নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলাম, অন্য এক শিক্ষক তাহার এক অনামা প্রতিবাদ পাঠান। উত্তরসহ তাহা আশ্বিনের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। ইহা হইতে কি এইরূপ অনুমান করা যায়, যে, তৃতীয় প্রস্তাবের অন্যতম উদ্দেশ্য এই, যে, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বা উহার কর্ত্তার কোন প্রতিকূল সমালোচনা কোন কাগজে বাহির হইলে কর্ত্তার অনুগৃহীত শিক্ষকেরা গা ঢাকা দিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে? সর্ব্ব-সাধারণের নিকট সমর্থকদের নাম অজ্ঞাত থাকার সুবিধা এই, যে, তাঁহারা অন্যায়ের সমর্থন করিয়াও সর্ব্বসাধারণের বিরাগভাজন হইবেন না, অথচ তাঁহারাই যে অনামা সমর্থনের লেখক, কর্ত্তা তাহা জ্ঞাত থাকায় তাঁহাদের অনুগ্রহ ও বখ্‌শিশ্‌ তাঁহারা পাইতে পারিবেন।

পরিশেষে একটা কথা বলি। আমাদের দেশটা গরীব ও পরাধীন, পাশ্চাত্যদেশসকলের মত ধনী ও স্বাধীন নহে। জাপান আমাদের চেয়ে ধনী হইলেও ইউরোপ আমেরিকার মত ধনী নহে। এই জন্য, কোন বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ-ভাবে যদি অর্থব্যয়ের সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে পাশ্চাত্যদেশসকলের চেয়ে জাপানের নজীর লওয়াই আমাদের উচিত। আমরা যতদূর জানি, পাশ্চাত্য স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়সকলে এরূপ কোন নিয়ম নাই যেরূপ নিয়ম কলিকাতায় হইয়াছে বা হইবে। কিন্তু যদিই বা কোন পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ নিয়ম থাকে, তাহা হইলেও

আমাদের সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা উচিত নয়। কারণ পাশ্চাত্য দেশসকল স্বশাসক, আমরা পরাধীন। তাহারা স্বাধীনতার যে স্তরে পৌঁছিয়াছে, আমাদিগকে এখনও সেখানে পৌঁছিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা সব দিকেই করিতে হইবে, এবং এই চেষ্টা সমবেতভাবে করিতে হইলে জ্ঞানবান্ যত লোকের পূর্ণ অবাধ কার্য্যশক্তির সাহায্য দেশ পান, ততই ভাল। এই হেতু আমরা আশা করি, যে, যে-যে প্রতিষ্ঠানে দেশীলোকের প্রভুত্ব আছে, তথায়, যতদিন পর্য্যন্ত না প্রমাণিত হয় যে স্বাধীনতার অপব্যবহারে দেশের ও জাতির অনিষ্ট হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান লোকদের স্বাধীনতায় হাত দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয় কারণ এই, যে, পাশ্চাত্য দেশসকল ধনী, আমরা দরিদ্র; সেই সকল দেশে যেরূপ স্থলে এক-একজন মানুষ একএকটা কাজ করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারে, আমাদের এখানে তাহা সম্ভব না হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়েই তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; আর্ট্‌স-শিক্ষক, আইনশিক্ষক এবং আইনব্যবসায়ী, একজনেই ত্রিবিধ পেশা অবলম্বী, এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। একজন মানুষে এই তিনরকম কাজ করিতে পারে, তাহাতে কোরান পুরাণ বাইবেল কিছুই অশুদ্ধ হয় না; কিন্তু একজন মানুষ আর্ট্‌স-শিক্ষক এবং সংবাদ-বা সাময়িকপত্রের পরিচালক বা প্রবন্ধলেখক হইলেই সমুদয় শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত হয়, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ কর্ত্তারা দেখাইতে পারেন কি?—যাহা হউক, আমরা জাপান সম্বন্ধে যে-কথা বলিতে চাই, তাহা বলিয়া মন্তব্য শেষ করি।

কিছুদিন আগে মৈসূর রাজ্যের সরকারী মাসিক দি মাইসোর ইকনমিক্ জার্ন্যালে (The Mysore Economic Journal এ) জাপানের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হয়। উহা মৈসূরের একজন দেশী কর্ম্মচারী জাপান দেখিয়া আসিয়া লেখেন। উহা হইতে জানা যায় যে তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপকেরা মাসিক ১৫০৲ হইতে ২৫০৲ বেতন পান (যুদ্ধের পর ইহা কিছু বাড়িয়া থাকিবে)। এত কম টাকায় যোগ্যলোকেরা কি প্রকারে কাজ করিতে পারেন, এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে লেখক বলেন:—

"The professors lead simple lives and work from patriotic motives, although men of their qualifications can earn much more in private employment than they can hope for under Government. With them it is a case of high thinking and plain living. They keep no furniture—they cannot afford the expenditure—in the European fashion,....."

তাৎপর্য্য।—"অধ্যাপকেরা সাদাসিধা জীবন যাপন করেন এবং দেশ-ভক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করেন। তাঁহারা বাড়ীতে ইউরোপীয় ধরণের আস্‌বাব রাখেন না, রাখিবার সামর্থ্য নাই।"

তাঁহারা যে অল্প বেতনে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করেন, তাহার কারণ তাঁহাদের দেশ-ভক্তিতে আঘাত করা হয় না, তাঁহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। লেখক অন্য যে কারণ বলিয়াছেন, তাহা হইতেও উহা বুঝা যায়।

"I met several men in Tokio who held a multiplicity of employments. These work in offices as secretaries or heads of departments and they teach also several hours in the university. I met one talented professor who held an important Government office, a professorial chair and who was also the principal editor of an important journal. Asked why he wore away his life working like that, he remarked he could not make money enough. Professors in Government schools are allowed to teach in or preside over private schools. The private school or college is a great feature in the educational progress of the country and the private schoolmaster works with singular devotion for moulding young Japan."

তাৎপর্য্য। তোকিয়োতে অনেকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল যাঁহারা এক এক জনে অনেকগুলা কাজ করেন। ইহাঁরা আফিসে সেক্রেটারীর বা বিভাগাধ্যক্ষের কাজ করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েক ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেন। এক জন শক্তিমান্ অধ্যাপকের সহিত দেখা হয় যিনি গবর্ণমেণ্টের বড় চাকরী করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করেন, এবং একখানি প্রভাবশালী সংবাদ-পত্রের প্রধান সম্পাদকের কাজও করেন। তিনি এমন করিয়া জীবনক্ষয় কেন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর দিলেন, তা নইলে যথেষ্ট টাকা রোজগার হয় না। সরকারী বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়াইতে বা তাহার অধ্যক্ষতা করিতে দেওয়া হয়। জাপানের শিক্ষোন্নতির একটি প্রধান উপায় বেসরকারী বিদ্যালয় ও কলেজগুলি, এবং বেসরকারী শিক্ষকেরা

তরুণ জাপানকে গড়িয়া পিটিয়া মনোমত করিবার জন্য সাতিশয় আত্মোৎসর্গের সহিত কাজ করেন।

ইহা হইতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের কি শিখিবার আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক।

—

তিনটি বালিকার আত্মহত্যা।

বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব। ঐ জেলায় কুষ্ঠরোগীরা সাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণীতে স্নান করে, সকলের সঙ্গে অবাধে মিশে, নানা রকমের দোকান করে, এমন কি সন্দেশ মিঠাইয়ের দোকানও করিতে কয়েক বৎসর হইল দেখিয়াছিলাম; এখনও কুষ্ঠরোগীর সেরূপ দোকান আছে কিনা জানি না। লোকমত এবং আইন দ্বারা এসকল নিবারিত হওয়া উচিত। যাঁহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদেরও এমন ভাবেই চলা উচিত, যাহাতে অপরে এই রোগ সংক্রামিত না হয়। যদি অন্যের এই রোগ হইলে তাঁহাদের রোগ সারিয়া যাইত, তাহা হইলেও না-হয় বুঝিতাম যে তাঁহারা স্বার্থপরতাবশতঃ অন্যের হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি দিতেছেন না। কিন্তু যখন অন্য কেহ মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাঁহারা মহাব্যাধিমুক্ত হইবেন না, তখন তাঁহাদের সাবধান হইয়া না চলিবার কোন কারণ নাই। তবে, যদি বলেন, যে, অন্যের দুর্দশা নিজের সমান দেখিলে সুখ হয়, তাহা অতি পৈশাচিক সুখ।

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দপুর থানার এলাকা-ভুক্ত একটি গ্রামের তিনটি বালিকার আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালিকা তিনটির কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিরাগমনের সময় হওয়ায় তাহারা কোনক্রমেই শ্বশুরবাড়ী যাইতে চায় নাই। কিন্তু তাহাদের কথায় কেহ কর্ণপাত না করায় তাহারা আত্মহত্যা করিয়া মুক্তি পাইয়াছে। ইহা যে কিরূপ শোচনীয় ও লজ্জাকর ঘটনা, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে আছে?

—

বিহারে গীতাঞ্জলি।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"কে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক করিয়াছেন। আদর দূরের লোকেরা করে দেখিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম্-এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, কিন্তু রবিবাবুকে বাদ দিয়া পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষিতব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা কর্ত্তাদের কাব্যরসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

বাংলায় এম্-এ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বৎসর প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষা হইয়াছিল। ১৬টি ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৭টি প্রথম বিভাগে, ৯টি দ্বিতীয় বিভাগে। ছয়জনের দ্বিতীয় ভাষা অসমীয়া, দুইজনের ওড়িয়া এবং আটজনের হিন্দী ছিল।

—

আর্‌বীতে এম্-এ হিন্দু ছাত্র।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক একজন হিন্দু ছাত্র এবৎসর আরবীভাষা ও সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত পালি আরবী ফারসীর জ্ঞান যত বিস্তৃত হয় ততই মঙ্গল।

—

বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের মূল্য-বৃদ্ধি।

বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, যে, কাগজ ও ছাপাখানার জিনিষপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকসকলের লেখক ও প্রকাশকদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, যে, তাঁহারা পুনর্ব্বার আদেশপ্রচার পর্য্যন্ত তাঁহাদের ইচ্ছামত তাঁহাদের প্রণীত ও প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকসকলের মূল্য শতকরা ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারিবেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত আদেশ।

আমরা ৩৷৵০ হইতে বাড়াইয়া প্রবাসীর মূল্য ৪৲ টাকা করায় অল্পসংখ্যক গ্রাহক মূল্য অত্যন্ত বাড়ান হইয়াছে বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কেহ কেহ বা আমাদিগকে বিদ্রূপও করেন। অথচ আমরা শতকরা ১৯ টাকা অপেক্ষাও কম মূল্য বাড়াইয়াছি।

—

চরখায় কাটা সুতার হাতের তাঁতে বোনা কাপড়।

আহ্‌মেদাবাদে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ-আশ্রমে চরখায় কাটা সুতার হাতের তাঁতে বোনা কাপড় পাওয়া যায়। উহা কলিকাতায় ৮ সী নং লালবাজারে স্বদেশী কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে ওরূপ কাপড় কোথাও প্রস্তুত হয় কি না, তাহার উত্তরে আমরা নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানি পাইয়াছি।

সম্পাদক মহাশয়,

আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীর ৬০৯ পৃষ্ঠায় আপনি লিখিয়াছেন, দেশী কাপাস হইতে চরখাকাটা সুতায় হাতের তাঁতে

বোনা কাপড় কেহ দিতে পারেন কি না, প্রবাসীতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং বিনামূল্যে তাহার বিজ্ঞাপন দিব বলিয়াছিলাম; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোন জবাব পাই নাই।

আপনার এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। যাহা হউক প্রবাসীর পাঠক-মহোদয়গণের জ্ঞাতার্থ আমি জানাইতেছি যে, চট্টগ্রামে দেশী কাপাস হইতে চরখায় কাটা সূতায় হাতের তাঁতে দেশী তাঁতী কর্ত্তৃক বোনা বিভিন্ন রকমের কাপড় এখনও পাওয়া যায়। আমি অবগত হইলাম কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশী খেলাফত ষ্টোর লিমিটেড্" নামক কোম্পানী শীঘ্রই এই এই সকল কাপড়ের আমদানী করিবেন। এ বিষয় যিনি আরও অধিক জানিতে চাহেন, তিনি ১০৪ নং লোয়ার চিৎপুর রোড্ (সিন্দুরিয়া পটী) উক্ত ষ্টোরের আফিসে জানিতে পারেন। ইতি

বশংবদ
নজির আহমদ,
মোহাম্মদীর সহ-সম্পাদক।

এ বিষয়ে আমাদিগকে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী সংবাদ দিয়াছেন, যে, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রায় মহাশয় ১৫।২০ জন স্ত্রীলোককে চরখাতে সূতা কাটা শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ীতে ঐ সূতা দ্বারা ধুতি ও বিছানার চাদর প্রস্তুত করা হইতেছে। যদি কেহ এই কাপড় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার নিকট চিঠি লিখিলে পাইতে পারিবেন। তাঁহার ঠিকানা—গ্রাম কালীকচ্ছ, পোষ্ট আফীস সরাইল, জিলা ত্রিপুরা।

—

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ভুবনমোহন কর।

দিনাজপুরের প্রাতঃস্মরণীয় দরিদ্রসেবক পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় নব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রত্যহ শতশত লোক তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ আসিত। তিনি বিনামূল্যে সকলকে ব্যবস্থা ও ঔষধ দিতেন। দিনাজপুরে তিনি সকলের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী লিখিয়াছেন—

তাঁহার ত্রুটিবিকল্প জীবন ও অশ্রান্ত লোকসেবা তাঁহাকে এরূপ সর্ব্বজনপূজ্য করিয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র যাবতীয় আফিস, কাছারী, বিদ্যালয় তাঁহার সম্মানার্থ বন্ধ করা হয়, দিনাজপুরের মহারাজা ১৭টি ফুলের তোড়া এবং একদল কীর্ত্তনকারী পাঠান, সকল শ্রেণীর দুইসহস্রাধিক লোক শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ সহরের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করান, গবর্ণমেণ্ট হইতে মিলিটারী গার্ড অব্ অনার প্রদর্শিত হয়, ইউরোপীয় জজ ও পুলিস সাহেব পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করিয়া শ্মশানঘাটে গমন করেন। অথচ সংসারের ধন, মান, বিদ্যা বা পদের গৌরব তাঁহার কিছুই ছিল না। একমাত্র আদর্শ ব্রাহ্মজীবনই তাঁহার সকল প্রতিপত্তির মূল। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার স্থান শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

—

কর্ম্মী দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

নব্যভারত সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষাটের উপর হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় নিঃসম্বল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নিজের পরিশ্রম ও বৈষয়িক কার্য্যদক্ষতাগুণে সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা, পুরী, দেওঘর, এবং জন্মগ্রাম ওলপুরে অনেকগুলি বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার বিশেষত্ব নহে। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ এই লক্ষ্য করিয়াছি, যে, তিনি কোন প্রকার শ্রমকে অবজ্ঞা করিতেন না; যে-সব কাজ গৃহস্থরা অন্য লোক দিয়া করান, তিনি তাহা অনেক সময় স্বয়ং করিতেন। গত বৎসরও পুরীতে দেখিয়াছি, তিনি স্বহস্তে বাড়ীর কপাটে রং দিতেছেন, এবং মই দিয়া একটি বাড়ীর ছাতে উঠিয়া রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতেছেন। শিক্ষিত লোকে কথায় শ্রমের গৌরব প্রচার করেন, তিনি কথায় ও কাজে সেই গৌরব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নব্যভারতের সম্পাদকীয় ও ব্যবসাসম্বন্ধীয় সমুদয় কাজ তিনি ৩৮ বৎসর কাল ধরিয়া একা করিয়া গিয়াছেন, কখন কোন সহকারী সম্পাদক বা কেরানী রাখেন নাই। তিনি তাঁহার বন্ধু ও আশ্রিত লোকদিগের বহু উপকার করিতেন। অন্য অনেক লোককেও অন্ন দিতেন। শুনিয়াছি, তাঁহার জন্মগ্রামে তাঁহার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দুর্ভিক্ষ হইলে, বিশেষতঃ তাঁহার নিজের জেলা ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ হইলে, তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের সময় ও শক্তি দিয়া সাহায্য বিতরণ জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতেন। ফরিদপুর জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে তিনি বরাবর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বদেশীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি সাহস ও উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা ছিল।

—

মিশরের "স্বাধীনতা"।

কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাত হইতে খবর আসে, যে, ইংলণ্ড মিশরকে স্বাধীনতা দিতে রাজি হইয়াছেন। ইহা পড়িয়াই মনে হইয়াছিল, এত বড় খবরটা সম্পূর্ণ সত্য হইতে

পারে না। তা ছাড়া স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, উহা অর্জ্জন করিতে হয়। পরে এই "স্বাধীনতার" বিশেষ বৃত্তান্ত যাহা কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, যে, ইহা প্রধানতঃ মিশরের আভ্যন্তরীন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব, যদিও তাহাও সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব নহে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে, মিশরের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যাহা হইতে যাইতেছে, তাহা ভারতবর্ষের অবস্থা অপেক্ষা ঢের ভাল। গোড়াতেই ত প্রধান একটা কথা এই, যে, ইলণ্ড স্বীকার করিতেছেন, যে, মিশর ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত নহে, উহা "বিদেশ"। উহার সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে অন্য বিদেশের সঙ্গে যেমন সমানে সমানে সন্ধি আদি করিতে হয়, মিশরের সঙ্গেও তাহাই করিতে হইবে; ভারতবর্ষের নামে যেমন ইংলণ্ড নিজের সুবিধা ও ইচ্ছা অনুসারে সব ব্যবস্থা করেন, তাহা করা চলিবে না। তা ছাড়া, মিশরের নিজের প্রতিনিধিসভা, নিজের রাজা, বিদেশে নিজেদের রাজদূত প্রভৃতি থাকিবে। বর্ত্তমানে যে-সব ইংরেজ কর্ম্মচারী মিশরে কাজ করে, মিশরীয়রা তাহাদের যাহাকে ইচ্ছা রাখিবে, যাহাকে ইচ্ছা কিছু টাকা দিয়া বিদায় দিবে, এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগের উপরওয়ালা এক এক জন মিশরীয় হইবে। এইরূপ আরো কিছু কিছু সুবিধা হইবে।

কিন্তু মিশর যে পুরা স্বাধীনতা পাইবে না, তাহা সুস্পষ্ট। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে মিশরকে ইংলণ্ড রক্ষা করিবে, এবং মিশর ইংলণ্ডকে বিশেষ সুবিধা দিবে। যুদ্ধ ঘটিলে মিশরের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনাদির সুযোগ ইংলণ্ড পাইবে। সুয়েজ খালের নিকটবর্ত্তী মিশরের অঙ্গীভূত প্রদেশে ইংলণ্ড নিজের সৈন্যদল রাখিয়া দখল করিয়া বসিয়া থাকিবে। মিশর ব্রিটিশ স্বার্থ বা রাষ্ট্রনীতির প্রতিকূল কোন সন্ধিআদি কোন বিদেশের সহিত করিতে পারিবে না। মিশরপ্রবাসী বিদেশীদের স্বার্থ, স্বাধীনতা বা অধিকারের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে, এরূপ কোন আইন মিশরীয়রা করিলে ইংলণ্ডের মিশরবাসী প্রতিনিধি তাহা রদ্ করিতে পারিবে। নীল নদের জলের বন্যায় মিশরের চাষের সমস্ত জমী প্রতিবৎসর ডুবিয়া যায়, এবং তাহাতেই মিশরে অপর্য্যাপ্ত ফসল হয়। এই নীল নদ সুদান দেশ হইতে আসে। তাহা আগে মিশররাজ্যভুক্ত ছিল; এখন ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত, ও তাহাই থাকিবে। মিশরীয়দিগকে জব্দ করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা হইলে ইংরেজ নীলের জল যথেষ্ট পরিমাণে তাহাদের দেশে আসিতে দিবে না। সুতরাং এ হিসাবে মিশরকে ইংলণ্ডের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বাস্তবিক, মিশরকে যে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে না, প্রধানতঃ উহার বাহ্য আকারটাই দেওয়া হইতেছে, তাহা ইংরেজরা নিজেরাই বলিতেছে। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ এংলোইণ্ডিয়ান কাগজ পাইয়োনীয়রের কায়রোস্থিত সংবাদদাতার পত্রে ব্রিটেনের সহিত মিশরের সমুদয় প্রস্তাবিত সর্ত্তের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, "And after all are we really losing position?" "যাই বল কও, আমরা কি সত্যসত্যই মিশরে প্রভুর পদবী ও ক্ষমতা হারাইতেছি?" উত্তরে সংবাদদাতা স্বয়ং বলিতেছেন:—

Outwardly we surrender Egypt to the Egyp and are allowing them to run their own show. Bu the other hand we receive from the Powers n veto which our representative will enjoy over legi affecting foreigners recognition of our predo position in the Valley of the Nile which we di enjoy before the war, a recognition to which Egyptians now declare themselves ready to sub the interests of the bondholders which we wer Egypt to protect are safeguarded by the agre we are still supreme in the Sudan which hol key to Egypt; and we maintain an army in th Canal zone. In reality the sole importance t our occupation of Egypt has been the hold it has us over the Suez Canal and thus the protection of route to India and the Far East. The provis we are to retain an army in the Canal zone covers fully and in view of the general admission of predominant position throughout the Valley of Nile which is forthcoming not only in the Ver Treaty but also from the Egyptians themsel difficult to see from the imperial point of vie more could well be expected in the circumstance

ইহার অনেক কথা আমরা উপরে বলিয়াছি। আর একটির তাৎপর্য্য দিতেছি। যে-সব বিদেশী (প্রধানতঃ ইংরেজ) মিশরকে টাকা ধার দিয়াছে, তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী থাকিবে। সুয়েজ খালের উপর দখল থাকাই মিশরে ইংলণ্ডের প্রভুত্বের প্রধান প্রয়োজন; কারণ তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে প্রভুত্ব থাকে না। সেই সুয়েজখালের চারিদিকের জায়গায় ইংরেজের দখল ও সৈন্যদল থাকিবে।

কিছুদিন হইল আমেরিকার একখানা কাগজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক ছবি বাহির হইয়াছিল, তাহার নকল দিলাম। উহাতে ইংলণ্ডকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যরূপ সার্কাসের ওস্তাদ্ থেলোয়াড়রূপে আঁকা হইয়াছে। তাহার ঘাড় ভারতবর্ষ, আয়র্লণ্ড ও মিশরের ঘাড়ে চড়িয়া কসরৎ দেখাইতেছে। মিশরকে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, পড়িয়া, এই ভাবনা আসিতে পারিত যে সার্কাসের দল ভাঙ্গিয়া বা ভাঙ্গে; কারণ, একজন সরিয়া পড়িলেই হয় ত সমস্ত দলটাকে

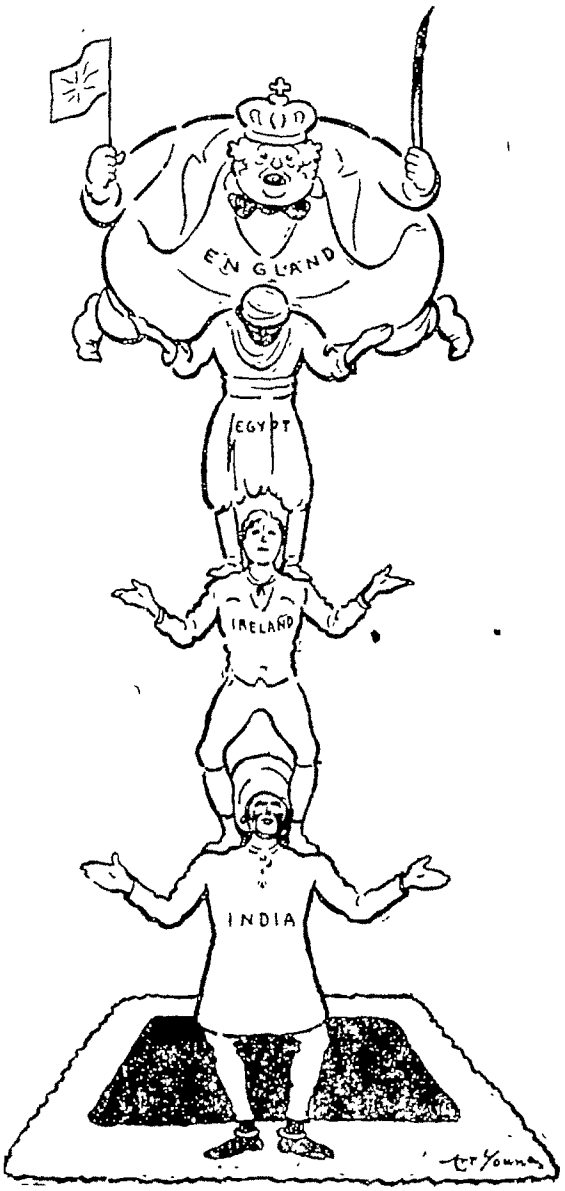

ব্রিটিশসাম্রাজ্য সার্কাস্।

হুড়মুড় করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু সে দুর্ভাবনার প্রয়োজন নাই; পাইয়োনীয়ারের ইংরেজ সংবাদদাতা স্বয়ং বলিতেছেন, ইংলণ্ডের মিশরের স্কন্ধারোহী অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিল ("Our strategic position just as secure")।

—

শিবনাথ-স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস।

প্রধানতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের চেষ্টায় ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। অন্যেরাও যোগ দিতেছেন। এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট হইতে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এই চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য। যাঁহারা স্মৃতিরক্ষা কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী তাঁহাদিগের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে; জানাইতেছি। ইহা অবশ্য সকলেই জানেন ও স্বীকার করিবেন, যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবন ও চরিত্রই প্রধানতঃ তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিবে। তাঁহার লিখিত আত্মচরিত পড়িলে এই জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান জন্মে; এবং তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বহিখানি সম্বন্ধে স্মৃতিরক্ষাসমিতিকে কিছু করিতে হইবে না। উহার একটি ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার দৌহিত্রবধূ প্রস্তুত করিতেছেন। উহার প্রতি সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতেছি। উহা এখনও প্রেসে দেওয়া হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার একটি বিস্তৃত জীবনচরিত বাংলায় লিখিয়াছেন। উহা তাঁহার দৈনন্দিনলিপি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে; এখনও প্রেসে দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্রী সুলেখিকা। তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতিও আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন ও চরিত্রের পরেই তাঁহার লিখিত ধর্ম্মোপদেশ, কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার একখানি কবিতাপুস্তকও আর ছাপা নাই, তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "যুগান্তর"ও তাই, বহুপ্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই, ধর্ম্মোপদেশের সমষ্টি তিনখণ্ড অমূল্য "ধর্ম্মজীবন" অর্দ্ধমূল্যে বহুকাল ধরিয়া বিক্রী হইয়াও শেষ হয় নাই, ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজী ইতিহাস দুইখণ্ডেরও সেই অবস্থা, "Men I Have Seen" নামক মহৎজীবনের আলেখ্যও অনাদৃত। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির প্রকাশ ও প্রচার কার্য্যের প্রতি সমিতি মন দিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে কি ব্রাহ্মসমাজ, কি হিন্দুসমাজ, কি মুসলমানসমাজ, মহৎলোকদের জীবিতকালে, এবং তদপেক্ষাও অধিক তাঁহাদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের প্রতি কাগজে পত্রে ও সভায় শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা কপটভক্তিও নহে। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহা বলিতেই হইবে, যে, এই ভক্তি আমাদের জীবনগত আচরণগত নহে। নতুবা এমন কেন হয়, যে, যে-সব গ্রন্থে কোনও পূজনীয় মনস্বী ব্যক্তি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনার ধন সঞ্চিত রাখিয়া

যান, তাহার একহাজার খণ্ড দশ বার বৎসরেও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রী হইয়া শেষ হয় না, পোকায় কাটিয়া নিঃশেষ করে ?

—

বৃহৎ স্বাধীন জাতির লোক হইবার সুবিধা।

পরাধীনতার কষ্ট ও অসুবিধা যে কি, তাহা আমরা ভুগিয়া জানি, বর্ণনা অনাবশ্যক। উহা যে জাতীয় মহাপাপের ফল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই মহাপাপের ফলে পরাধীন জাতির লোকেরা জগতের অনেক মহৎ কার্য্যের খবরই রাখিতে পারে না, মহৎ কার্য্য করা ত দূরে থাক্। এই জন্য দেখা যায়, বিদেশী স্বাধীন দেশের লোকেরা অন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপার যেরূপ বুঝেন ও উহার চর্চ্চা করেন, আমরা তাহা পারি না।

আমরা নিজেদের হাজার দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা অপমান অসুবিধার আলোচনায় এমন অভিভূত যে জগতের অন্য অত্যাচরিত লোকদের কথা জানিবার ভাবিবার ও যথাসাধ্য, প্রতিকার করিবার কোন চেষ্টাই করিতে পারি না। ফলে আমাদের কাছে মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব কথার কথা মাত্র। আমাদের নিজের দুঃখ অপমান নিবারণের সব চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফীজী ও আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুরবস্থা দূর করিবার চেষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, বৃহৎ স্বাধীন জাতির লোক শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ্ ও পিয়ার্সন্ যাহা করায় লোকে এই দুরবস্থার কথা জানিয়াছে ও জানিতেছে, আমরা সেরূপ কাজ কতটুকু করিতে পারিতেছি ?

বৃহৎ স্বাধীন শক্তিশালী জাতিসকল এপর্য্যন্ত অন্যদেশকে পদানত করিয়া আরও শক্তিমান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবারই চেষ্টা প্রধানতঃ করিয়াছে, তাহাদের অন্তর্ভূত ২।৪ জন লোক জগতের হিতার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন (যাহা আধুনিক যুগে পরাধীন জাতির কেহ করিতে পারেন নাই)। কিন্তু এই সব বৃহৎ জাতি যদি কখনও বুঝে, যে, জগতের পরাধীন অনুন্নত অবমানিত অত্যাচরিত লোকদিগকে মানবপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবার ক্ষমতা ও উচ্চ অধিকার ভগবান তাহাদিগকে দিয়াছেন, তখন তাহারা মানবকুলের যে-সেবা করিতে পারিবে, তাহা জগতের ইতিহাসে তাহাদের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে, তখন তাহাদের স্বাধীনতা ও শক্তি সার্থক ও ধন্য হইবে। আমরা যে মহাপাপের ফলে পরাধীন হইয়াছি, পরাধীনতা ছাড়া তাহার আরও ফল-ভোগস্বরূপ আমাদিগকে নিখিল জগতের সেবাকার্য্যে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। যখন আমরা স্বাধীন ও শক্তিশালী হইতে পারিব, যখন কেবলমাত্র আমাদের নিজের দুঃখ দারিদ্র্য, লজ্জা, অপমান ও অত্যাচার আমাদের হৃদয়মনকে গ্রাস ও অভিভূত করিয়া রাখিতে পারিবে না, তখন আমরা সমস্ত জগৎকে, পৃথিবীর দূরতম স্থানেরও দুঃখী লোকদিগকে, হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়া ধন্য হইব।

রাজনৈতিক এবং তদ্বিধ অন্যান্য বিষয়ে যদিও পরাধীন জাতির লোকেরা পৃথিবীর সকলদেশের মঙ্গলের কথা ভাবিবার অবসর এবং কল্যাণ করিবার সুযোগ পান না, তথাপি ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরাধীন দেশের লোকেরাও এই অবসর ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত নহেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ স্বামী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসু বিদেশীর নিকটও পরিচিত হইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

—

আইনজীবী ও শিক্ষক।

সম্পূর্ণ স্বাধীন সুপরিচালিত বেসরকারী শিক্ষালয় যথেষ্ট সংখ্যক স্থাপিত না হইলে, সরকারী ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত শিক্ষালয় সকল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে ছাড়াইয়া আনার আমরা বিরোধী, তাহা আগেই লিখিয়াছি কংগ্রেসের সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্য, পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্রু, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত বিঠলভাই ঝাভেরভাই পটেল, এই তিনজনের সব্-কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়। তাঁহারা লিখিয়াছেন, সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত স্কুলকলেজ বর্জ্জন খুব সোজা হওয়া উচিত ; কারণ ঐসব স্কুলের বালকদের অভিভাবকগণের এবং বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের রাজনৈতিক চৈতন্য (political consciousness) জন্মিয়াছে। এ বিষয়ে পরে লিখিতেছি সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাবে আইনজীবীদিগকে আইনের ব্যবসা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সব্-কমিটি বলিতেছেন, "lawyers suspending practice and requiring to be supported can be supported by the nation by utilising their services either for national schools or private arbitration or propaganda work." অর্থাৎ যে-সব আইনজীবী আইন ব্যবসা ছাড়িবেন তাঁহাদের ভরণপোষণ জাতীয় বিদ্যালয়ের চাকরী, সালিসী আদালতের কাজ, কিম্বা রাজনৈতিক (সহযোগিতা-বর্জ্জন) প্রচারের কাজের দ্বারা চলিতে পারে। এস্থলে আমরা জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজের আলোচনা করিব। কংগ্রেসের এবং সব্-কমিটির মত এই যে, সরকারী বা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলকলেজগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং তাহার জায়গায় জাতীয়

শিক্ষালয় স্থাপন করিতে হইবে। যদি সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত স্কুলকলেজগুলি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে উহার শিক্ষক ও অধ্যাপকদের কাজ যাইবে। তাঁহাদের ভরণপোষণ কেমন করিয়া হইবে, সে চিন্তাটা সব্‌কমিটির মনে আসিল না কেন? তাঁহারা শিক্ষণকার্য্যে অভিজ্ঞ লোক; আইনজীবীদের চেয়ে শিক্ষকতায় তাঁহাদের দাবীই আগে নয় কি? তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাবিবার আছে।

১৯১১ সালের আদমসুমারী (Census) অনুসারে, ব্রিটিশ ভারতে সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষক অধ্যাপক, শিক্ষালয়ের কেরানী ও ভৃত্য, এবং ইহাঁদের সকলের পোষ্য লোকদের মোটসংখ্যা ছিল ৫,৩০,৫৭৯। সব স্কুল কলেজ উঠিয়া গেলে এতগুলি লোক বেকার ও নিরাশ্রয় হইবে। অবশ্য আমাদের ধারণা স্কুলকলেজগুলি উঠিবে না, কিন্তু যাঁহারা উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে তাঁহারা ওগুলিকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহারা সরকারী বিচারালয়গুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে জাতীয় সালিসী আদালত চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের ধারণা এ চেষ্টাও সম্যক্ সফল হইবে না। কিন্তু যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সফলকাম হইবেন এই বিশ্বাস লইয়াই কাজ করিবেন। এখন দেখা যাক্, সরকারী আদালতগুলি উঠিয়া গেলে কত লোক বেকার ও নিরাশ্রয় হইবে। ১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ব্রিটিশভারতে উকীল ব্যারিষ্টার মুক্তিয়ার কাজী রেবিনিউ-এজেণ্ট দরখাস্তলেখক উকীলের মুহুরী, এবং ইহাঁদের সকলের পোষ্য ও আশ্রিত লোকদের সংখ্যা ছিল, মোট ২,৫৫,৬৬৩। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই, যে, সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলি উঠিয়া গেলে আমাদের জাতিকে ৫,৩০,৫৭৯ জন লোকের ভরণপোষণের কথা ভাবিতে হইবে, এবং সরকারী আদালতগুলি উঠিয়া গেলে ২,৫৫,৬৬৩ জন লোকের ভরণপোষণের উপায় চিন্তা করিতে হইবে। অবশ্য ১৯১১ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত নয় বৎসরে উভয় শ্রেণীর লোকের সংখ্যা আরও বেশী হইয়াছে। কিন্তু আগে যাহা ছিল, তাহার কথাই ভাবা যাক্। যদি জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র সমস্ত বেকার আইনব্যবসায়ীদের নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষালয়সমূহের দ্বারা পালিত ৫,৩০,৫৭৯ লোকের ভরণপোষণ হয় না। পক্ষান্তরে শিক্ষক অধ্যাপকেরা সালিসী আদালতের কাজের অনুপযুক্ত, কারণ তাঁহাদের আইনজ্ঞান নাই।

অতএব, এখন আমাদের নেতারা কাহাকে কি কাজ দিয়া পালন করিবেন, ভাবুন; যদিও সমস্ত ব্যাপারটি কতকটা কালনেমির লঙ্কাভাগের মত। কারণ, জাতীয় শিক্ষালয়সমূহ ও সালিসী আদালতসকলের দ্বারা দেশ ছাইয়া ফেলিতে বিলম্ব আছে।

—

জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা।

যাঁহারা সরকারী ও সরকার-অনুমোদিত স্কুলকলেজগুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে জাতীয় বিদ্যালয়সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহারা যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার বিশালতা সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা আবশ্যক বলিয়া আমরা কিছু লিখিতেছি।

১৮১৮-১৯ সালের সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ বৎসর ব্রিটিশ ভারতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৯,৩৬,৫৭৭ ছিল। এতগুলি ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের জন্য মোট শিক্ষালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৪৭টি। এতগুলি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইগুলি চালাইবার জন্য এক বৎসরে রাজকোষ হইতে এবং সর্ব্বসাধারণের পকেট হইতে, ব্যয় হইয়াছিল মোট ১২,৯৮,৬৩,০৭৩ টাকা। রাজকোষ হইতে ব্যয় হইয়াছিল ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার ২৯২ টাকা, এবং সর্ব্বসাধারণে ব্যয় করিয়াছিল ৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৮১ টাকা। জাতীয় শিক্ষালয়গুলির জন্যও বৎসরে ব্যয় করিতে হইবে ঐ ১২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৩ টাকা। (সমুদয় শিক্ষালয়গুলির বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে এ পর্য্যন্ত যত খরচ হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহা ধরা হয় নাই।) সমস্ত জাতি প্রাণপণ করিয়া লাগিলে, এত বেশী টাকা ব্যয় করাও অসম্ভব নহে।

আমরা আগে বলিয়াছি, এই কাজ হইতে কাহাকেও নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য আমাদের নাই। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়হিতসাধনের জন্য এত বড় কাজে হাত দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে চাই। ১৯১৮-১৯ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, যে, ঐ সালে ব্রিটিশভারতের সমগ্রলোকসংখ্যার শতকরা ৩·২৫ (সওয়া তিন) জন মাত্র সমুদয় স্কুলকলেজে শিক্ষা পাইতেছিল। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের শিক্ষা-কমিশনারের ১৯১৩ সালের রিপোর্টে দেখিতেছি (উহার পরবর্ত্তী কোন সালের রিপোর্ট আমাদের হাতের নিকট নাই), তখন ঐ দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ২০·২২ জন তথাকার স্কুলকলেজে শিক্ষা পাইতেছিল। এখন নিশ্চয়ই এই সংখ্যা বাড়িয়াছে। যাহাহউক, ১৯১৩ সালে আমেরিকায় শতকরা যত লোক শিক্ষা পাইত, আমাদের দেশে এখন শতকরা তাহার প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ শিক্ষা

পায়। অর্থাৎ যদি আমাদের দেশে শিক্ষালয় ও ছাত্রছাত্রীর বর্ত্তমান সংখ্যা সাতগুণ হয়, তাহা হইলে এদেশে শিক্ষার বিস্তৃতি আমেরিকার ১৯১৩ সালের সমান হইবে। ইহা হইতে আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই :—

আমরা ত এক দফা গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দি, এবং তাহার সামান্য অংশ সরকার আমাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। উহা ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত মোট টাকার অল্প অংশ হইলেও সাত কোটি টাকার উপর। ধরুন আমরা যদি এখনকার ৭৯,৩৬,৫৭৭ জন ছাত্রছাত্রীকে সরকার-অনুমোদিত শিক্ষালয় হইতে ছাড়াইয়া আনাইয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে চাই, তাহা হইলে ঐ সাতকোটি টাকা দু-দুবার খরচ করিতে হইবে; অর্থাৎ একবার ত ট্যাক্স দিতেই হইবে—গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স মাফ করিবেন না—এবং দ্বিতীয় বার জাতীয় বিদ্যালয় চালাইবার জন্য খরচ করিতে হইবে। অথচ এই যে দ্বিতীয় বার খরচ করিতে হইবে, তাহা সেই-সব অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকদের সন্তানদের জন্য যাঁহারা এখন অর্থব্যয় করিয়া পুত্রকন্যা-দিগকে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছেন। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই যে-সব ছাত্রছাত্রী কোন একপ্রকার শিক্ষা পাইতেছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই দরিদ্রদেশে দ্বিতীয়বার সাতকোটি টাকা খরচ করা ভাল, না, ঐ সাতকোটি টাকা খরচ করিয়া সেই-সব দরিদ্রলোক-দের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ভাল যাহারা এখন কোন শিক্ষাই পাইতেছে না?

ইহা আমরা জানি ও বুঝি যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বা আমাদের আয়ত্তাধীন গবর্ণমেণ্ট না হওয়ায়, আমাদিগকে এমন অনেক কাজ করিতে, এবং ট্যাক্স দিবার পরও তজ্জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইতেছে ও হইবে, যাহা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশে গবর্ণ-মেণ্টই করিয়া থাকেন। আপাততঃ এ বিষয়ে আমরা নিরুপায়, এবং হয়ত এইজন্য ভবিষ্যতে ট্যাক্স না দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও দেশের লোককে করিতে হইবে। কিন্তু এখন যদি দোকড় খরচ করিতেই হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই দোকড় খরচ তেল্যে মাথায় তেল দিবার জন্য করা উচিত, না দরিদ্র রুক্ষকেশদের জন্য করা উচিত? মনে রাখিতে হইবে, যে, আমেরিকার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুসারে আমাদের দেশে সাতভাগের একভাগ মাত্র ছাত্র শিক্ষা পায়, বাকী ছয়-সপ্তমাংশ (৬/৭) শিক্ষা পায় না।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যে, এখন যাহারা শিক্ষা পায়, তাহা এতই কুশিক্ষা যে তাহার আলয়গুলিকে সদ্যসদ্য বিনষ্ট করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ধারণা তাহা নহে। তথাপি, এ বিষয়টির একটু আলোচনা করা ভাল। কুশিক্ষা, এবং শিক্ষার অল্পতা বা অপকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে শিক্ষা, সমার্থক নহে। বর্ত্তমান শিক্ষাবিধিতে শিক্ষার অল্পতা ও অপকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয়েই খুবই লক্ষিত হয়। কিন্তু কুশিক্ষা সকল বিষয়ে লক্ষিত হয় না, প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে লক্ষিত হয়। ১ম, ভারতবর্ষের ইতিহাস শিক্ষায়, ২য়, সাহিত্যবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে। যে-সব ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক গ্রন্থ ইস্কুল-কলেজে পড়ান হয়, তাহাতে ইংরেজের অনেক গুরুতর দোষ গোপন রাখা হয়, ইংরেজ-শাসনের হিতৈষিতা ও উপকারিতা একদেশদর্শী অত্যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হয়, অপকারিতা বর্ণিত হয় না, এবং মুসলমান ও হিন্দু রাজত্বকাল সম্বন্ধে হীন ধারণা জন্মান হয়। ছাত্র-পাঠ্য ইতিহাসসকলের দ্বারা এই যে কুশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার প্রকৃত প্রতিকার হইতে পারে, যদি আমাদের জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব জন্মে এবং আমরা অবাধে ও অসঙ্কোচে শান্ত মনে ধীর ভাবে নিরপেক্ষ জাতীয় ইতিহাস লিখিতে পারি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরপেক্ষ জাতীয় ইতিহাস লেখার দুটি বাধা আছে। ইংরেজের মুদ্রাযন্ত্রসম্পর্কীয় আইনগুলি এবং দণ্ডবিধি আইন এরূপ, যে, ইংরেজ রাজত্বের উদ্ভব, ইতিহাস, স্থিতি, ও ফল সম্বন্ধে কোন সত্য কথা লেখা নিরাপদ নহে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা পরাধীন আছি বলিয়াই, আমাদের দেশভক্তি ও দেশ-হিতৈষণা জাগ্রত হইলে উহা আমাদিগকে আমাদের পরাধীনতার জন্য ইংরেজকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়া আমাদের জাতীয় অতীত ইতিহাস ও চরিত্রকে তৎসম্পর্কে দোষহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত করে। ইংরেজের লেখা বা ইংরেজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লেখা ইতিহাস যেমন ইংরেজের দোষ ঢাকিয়া ইংরেজের গুণ বেশী করিয়া গায়, উগ্রদেশভক্তিপ্রণোদিত ভারতীয় ঐতিহাসিক দ্বারা লিখিত ইতিহাস তেমনি আবার আমাদের জাতীয় দোষ ঢাকিয়া প্রায় সমস্ত দোষ ইংরেজের ঘাড়ে চাপাইতে চায়। এবং আমাদের লেখা ইতিহাসে এই দোষটা রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়েই বেশী থাকিবার কথা। এরূপ দোষদুষ্ট ইতিহাস আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এইজন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়সকলের নিমিত্ত ইতিহাস এখন উত্তেজনার বশে লিখিত হইলে তাহা নিরপেক্ষ ও কল্যাণকর হইবে না। ইংরেজকর্তৃক কিংবা ইংরেজপ্রভাবা-ধীনতায় লিখিত যে-সব ভারতেতিহাস ছাত্রেরা পড়ে, তাহার দোষের প্রতিকার অন্ততঃ বাংলা দেশে অন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিদ্বারা অনেকটা হইয়াছে। অন্য প্রদেশেও ক্রমশঃ হইতেছে। ছাত্রপাঠ্য সাহিত্যপুস্তক-গুলিতে প্রভুভক্তি রাজভক্তি ইংরেজগুণগানের বাড়াবাড়ি

আছে। মানবহিতৈষণা, দেশভক্তি ও দেশহিতৈষণা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, বিপদ্‌বাধাসঙ্কুল অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পড়িয়া পৌরুষ চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণের প্রবৃত্তি, অন্যায় অত্যাচার অধর্ম্ম ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা, আমাদের ছাত্রপাঠ্য সাহিত্যপুস্তকসকল এই-সব গুণ বিকাশের সাহায্য করে না। কিন্তু, অন্ততঃ বাংলা দেশে, অন্যান্য পুস্তক, সাময়িকপত্র ও প্রবন্ধ গল্পাদির দ্বারা এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতেছে। জাতীয় শিক্ষালয়-স্থাপনে উদ্যোগী লোকেরা উল্লিখিত সদ্‌গুণসমূহ বিকাশের অনুকূল বহি লিখাইলে ভাল হয়।

কুশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। সরকার-অনুমোদিত স্কুলকলেজে যতটা বা যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, জাতীয় শিক্ষালয় সকলে তাহা অপেক্ষা বেশী বা ভাল প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হঠাৎ হইয়া উঠিবে না। ইহা সময়সাপেক্ষ এবং শিক্ষাদাতাদের শিক্ষাসাপেক্ষ।

সরকার-অনুমোদিত স্কুলকলেজগুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন কেন সহজ হইবে, তাহার একটা কারণ সব্‌-কমিটি এই বলিয়াছেন, যে, বর্ত্তমান ছাত্রদের অভিভাবকগণের ও বয়স্ক ছাত্রগণের রাজনৈতিক চৈতন্য (political consciousness) জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান স্কুল-কলেজ বর্জ্জন করিতে রাজী হইবেন। এই রাজনৈতিক চৈতন্য যদি সত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে আমরা কিন্তু উহাকে ভিত্তি করিয়া অন্য যুক্তি খাড়া করিতে চাই। আমরা বলি, যাহাদের রাজনৈতিক চৈতন্য জন্মিয়াছে, তাহাদের জন্য দোকড় কোটি কোটি টাকা খরচ না করিয়া, যাহারা এখন কোন শিক্ষা পাইতেছে না সেই সংখ্যাষ্ঠভূয়িষ্ঠ শিশু, কিশোর ও তরুণবয়স্কদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চৈতন্য সম্পাদন করা হউক। এখন যাহারা শিক্ষা পাইতেছে, তাহাদের শিক্ষার দোষ পূর্ব্বোক্ত প্রকার পুস্তক, সাময়িক পত্র, প্রবন্ধ ও গল্পদ্বারা সারিয়া লইবার চেষ্টা হউক। ইহা শ্রেষ্ঠ উপায় নহে, কিন্তু মন্দের ভাল। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ও ভারতে-প্রভুত্বকামী অন্য ইংরেজদের আমাদিগকে কোন অধিকার না দিবার একটা ওজুহাত এই, যে, ভারতের অতি অল্পসংখ্যক লোকের রাজনৈতিক চৈতন্য ও রাজনৈতিক চিন্তার অভ্যাস জন্মিয়াছে। এই ওজুহাতটা বাজে কথা, জানি; আসল কারণ ইংরেজের প্রভুত্বপ্রিয়তা ও ধনলিপ্সা। তথাপি ওজুহাতটা নষ্ট করিয়া ফেলা দরকার।

সব্‌-কমিটি বলিতেছেন, সরকার-অনুমোদিত শিক্ষালয়-গুলিতে পড়িয়া উপাধি লইয়া সরকারী চাকরী পাইবার আশা লোকে করে। স্বরাজ স্থাপিত হইলে সরকারী চাকরী ব্যতিরেকেও লোকে চালাইতে পারিবে। কি প্রকারে, তাহা ত বুঝিলাম না। স্বরাজ স্থাপিত হইলেও, বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদের জায়গায় দেশী রাজকর্ম্মচারী থাকিবে। এই চাকরীগুলা কি দেশী শিক্ষিত লোকে চাহিবে না? না, চাওয়ায় দোষ আছে? যাহাই হউক, সব্‌-কমিটির যুক্তি সত্য হইলে, আগে স্বরাজের চেষ্টা করাই ত ভাল। স্বরাজ স্থাপিত হইলে লোকে সরকারী চাকরী চাহিবে না, সুতরাং তজ্জন্য সরকার-অনুমোদিত স্কুলকলেজেও পড়িবে না, এবং সেগুলি উঠিয়া যাইবে, ও জাতীয় স্কুলকলেজ ছাত্রে পূর্ণ হইবে।

সব্‌-কমিটি বলিতেছেন, যতদিন যথেষ্টসংখ্যক জাতীয় স্কুলকলেজ স্থাপিত না হয়, ততদিন বালকদিগকে বাড়ীতে বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া হউক বা তদভাবে দেশী বণিক্‌দের দোকানে ও কারিগরদের কর্ম্মস্থানে শিক্ষানবীস্‌ করিয়া দেওয়া হউক! অদ্ভুত ব্যবস্থা! ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে বাড়ীতে পড়াইবার মত সঙ্গতি বা বিদ্যা সব অভিভাবকদের আছে কি? তদভাবে ৮০ লক্ষ শিক্ষানবীস্‌ লইবার মত বণিক্‌ ও কারিগর মিস্ত্রী আদি কোথায়? তা ছাড়া, ব্যবসা ও মিস্ত্রীগিরি শিখিয়া দুপয়সা রোজগার করিতে পারিলেই কি তাহা শিক্ষার স্থান পূরণ করিতে পারে? বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, প্রভৃতি শিখিবার কোন দরকার নাই? না, ওসব বিদ্যা মাড়োয়ারী ভাটিয়া দিল্লী-ওয়ালা দোকানদার এবং রাজমিস্ত্রী ছুতারমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগরেরা শিখাইতে পারিবে? এমন নির্বুদ্ধিতার কথা নেতৃস্থানীয় লোকদের বলা উচিত নয়।

—

বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন।

বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে সব্‌কমিটি বলেন, যে, উহা বুঝিবার ভুল ("misapprehension") বশতঃ কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ("interpolation") হইয়াছে। সব্‌-কমিটির সভ্যদের মত লোকদের নিকট আমরা এরূপ চাতুরী ও অসত্য কথা আশা করি নাই। শ্রীযুক্ত মোহনদাস গান্ধী বেশ সজাগ-অবস্থায় জানিয়া শুনিয়া ইহা তাঁহার প্রস্তাবের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারাও সজাগ-অবস্থায় বুঝিয়া সুঝিয়া ভোট দিয়াছিলেন। কেহ ত অভ্রান্ত নহে। ভ্রম স্বীকার করিয়া সত্য কথা বলিলে কোন দোষ হয় না।

—

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দুই বোন

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের সৌজন্যে।

M. RAY & SONS, CALCUTTA

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ | ২য় সংখ্যা

বাঙ্গলার প্রাণ

বাঙ্গলা হইতেছে নদীমাতৃক দেশ। শুধু তাই নয়, বাঙ্গলার ভূখণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—গড়িয়া উঠিয়াছে—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের শাখানদীসমূহের পলিমাটি দিয়া। কবি বঙ্গমাতাকে বলিয়া গিয়াছেন সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা।—কথা কয়টি কল্পনার অতিরঞ্জন, অন্ধভক্তির উচ্ছ্বাস নয়; উহা যে কতখানি সত্য তাহা বাঙ্গলার বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দেশের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারা শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে নয় স্পর্শে স্পর্শে অনুভব করিবেন। এমন কোমল সবুজ স্নিগ্ধ রসভরা মাটি আর কোথাও এতখানি চোখে পড়ে না। বাঙ্গলার মাটিতে আঁচড়টুকু দিলেই যেন টস্‌টস্ করিয়া রস ঝরিতে থাকে, বাঙ্গলার কৃষক তার ক্ষুদ্র লাঙ্গল-ফলকের স্পর্শমাত্রে সোনা ফলাইয়া দিতে পারে। এ হেন মাটি হইতেছে বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠা।

তারপর এই মাটিতে জন্মিয়াছে, আসিয়াছে, বাড়িয়াছে কোন্ জাতি? বাঙ্গালী হইতেছে মিশ্র সঙ্করজাতি। বাঙ্গালীর মধ্যে আর্য্য, আর্য্যেতর ও অনার্য্য জাতির রক্ত মিশামিশি হইয়া আছে। কোন্ রক্তের পরিমাণ বা প্রভাব কতখানি, সে অনুপাত নির্দ্ধারণ করিবার ভার প্রত্নতাত্ত্বিকদের উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব; কিন্তু জাতিটা যে মোটেই বিশুদ্ধ নয়, কিন্তু অনেক বিভিন্ন রকমের ধাতুর সংমিশ্রণে যে বিশেষ রকম সঙ্করজাতি, তাহার নিদর্শন ও ফলের দিকে শুধু আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথমত, বাঙ্গালীর চেহারার কথা। বাঙ্গালীর চেহারা অর্থাৎ বাহিরের কাঠামটি সুচারু সুসীম সুসম নয়, সেখানে আছে কেমন একটি নিয়মের বাঁধনের অভাব (irregular features)। যে জাতি আপনাকে যতখানি বিশুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে, সে জাতির চেহারায় সেই পরিমাণে দেখিতে পাই রেখার স্ফুটতা, গাঁথনীর দৃঢ়তা, অঙ্গের অংশে অংশে একটা সমানুপাত। বাঙ্গালীর চেহারায় কিন্তু আছে একটা অসমভাব, পরিবর্ত্তনশীলতার ছায়া, অনিয়মিত গতির ভঙ্গী; তারপর বিভিন্ন জাতি-সঙ্ঘের আছে যে এক-একটা সাধারণ ধরণ বা মূর্ত্তি—আর্য্য হউক, মঙ্গোলীয় হউক, সেমেটিক হউক অথবা নিগ্রোশ্রেণীভুক্ত হউক—প্রত্যেক জাতির পাই ঐ শ্রেণী অনুযায়ী একটা স্পষ্ট সাধারণ চেহারা; কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকে ইহার কোন একটি শ্রেণীতে নিঃসন্দেহে ফেলিতে পারি না, বাঙ্গালী যেন একটা খিচুড়ী। শুধু তাই নয়,—বাঙ্গলার নানা অংশে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে চেহারায় যতটা বৈষম্য পার্থক্য দেখা যায়, অন্য কোন সঙ্কর-জাতির মধ্যে ততটা দেখা যায় কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর চেহারার বিশেষত্ব বিষমতা (irregularity) আর লোলতা লীলা-শীলতা (mobility)।

বাঙ্গালীর চেহারার কাঠামে যেমন, স্নায়ুমণ্ডলীর খেলায় প্রাণশক্তির ধারায় তেমনই দেখিতে পাই সেই একই বিষমতা ও লোলচাঞ্চল্য। এখানেও পাই ধৈর্য্যের সংযমের সমতার অভাব (unstable nervous system); অল্পেতেই সে উত্তেজিত হইয়া উঠে, অল্পেতেই আবার এলাইয়া পড়ে। স্পর্শের সহিত সাড়ার, ক্রিয়ার সহিত প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য ও সমানুপাত নাই; স্নায়ুর ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিতেছে একটা যেন থামখেয়ালী বিসদৃশ ভাব। বিদেশীরা বাঙ্গালীর সম্পর্কে হঠাৎ আসিয়া যদি বলিয়া ফেলে যে, বাঙ্গালীর আছে হিষ্টেরিয়ার ধাত, বাঙ্গালী জাতটা neurotic—তবে তাহা যে একেবারে ভুল হইবে এমন বলিতে পারি না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী যেমন মাতিয়া গিয়াছিল আবার দমিয়া গিয়াছিল, ভারতের অন্যান্য জাতি তেমন করিয়া মাতেও নাই দমেও নাই। কেরোসিনে পুড়িয়া মরা কিছুদিন আগে আমাদের মেয়েদের মধ্যে প্রায় একটা সংক্রামক রোগ হইয়া উঠিতে চলিয়াছিল। আর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বাঙ্গালীর প্রাণে যে এত গিয়া লাগিয়াছে তার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও কি একটা কারণ নয় যে, বাঙ্গালী সেখানে আপনার প্রাণের একটা নিগূঢ় প্রতিধ্বনি পাইয়াছে—সেখানে সব চরিত্রগুলির মধ্যে পাই না কি প্রাণে একটা অসমতা, কথায় যাহাকে বলে 'ছিটে'? বাঙ্গালীর স্নায়ুমণ্ডলী দৃঢ় নয়, কিন্তু তাহা অতি তীক্ষ্ণ; প্রাণশক্তি তাহার নিরেট নয়, কিন্তু নমনীয়; কর্ম্মে অধ্যবসায় নাই, কিন্তু আছে ক্ষিপ্রতা। বাঙ্গালীর আছে একটা সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি, একটা সজাগ বোধশক্তি (sensitiveness ও sensibility)।

বাঙ্গালী আবার ভাবপ্রবণ, আবেগপরায়ণ; কিন্তু সেইজন্যই আছে তাহার ভাবুকতা, কল্পনাশীলতা। বাঙ্গালী চপল চঞ্চল, কিন্তু তাই সে নিত্য নূতনের দিকে উন্মুখ। ধীর সাদা চোখে সে বাস্তবকে দেখিতে চায় না, হৃদয়ের অঞ্জন লাগাইয়া জগৎকে রঙ্গিল করিয়া দেখিতেই তাহার তৃপ্তি। বাঙ্গালী চলিয়াছে চিত্তবৃত্তির দোলায় হেলিয়া দুলিয়া; চিত্তের আবেগকে একমুখীন করিয়া এমন তীব্র করিয়া তুলিতে আর কেহ পারে না। চণ্ডীদাস একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী কবি। এই হিসাবে বিদ্যাপতিও বোধ হয় বাঙ্গালী নহেন, তাঁহার মধ্যে আছে তর্কবুদ্ধির একটা খেলা, একটা এদিক ওদিক চাওয়া, একটা সজাগ ভাব;—চণ্ডীদাস কিন্তু একেবারে আত্মহারা, আপনভোলা কবি।

বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি আছে, কিন্তু তাহাতে পাই প্রতিভার যে থাকিয়া থাকিয়া তড়িৎবিলাস, তীব্র দৃষ্টি বা অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকপাত; সেখানে অভাব তর্কবুদ্ধির ধীর প্রশান্ত আত্মস্থ গতি। চিত্তকে হৃদয়বৃত্তিকে দূরে রাখিয়া শুধু মস্তিষ্ক খাটাইয়া আনন্দ পাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে কিছু কঠিন। চিন্তাকে চিন্তা হিসাবে চিন্তা করিয়া যাওয়াতে প্রয়োজন যে সহিষ্ণুতা যে কৃচ্ছ্রতা, বাঙ্গালীর স্নায়ু সে টানা সহ্য করিতে যেন পারে না। তবে যে চিন্তা তাহার চিত্তকে একবার ধাক্কা দিতে পারিয়াছে, যে চিন্তার উৎস তাহার প্রাণের আবেগ, সেই চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে—এমন কি সেখানে ধীর সহিষ্ণুভাবে যেন জোঁকেরই মত লাগিয়া থাকিয়াছে, তত্ত্বের পর তত্ত্ব তর্কের পর তর্ক নিষ্কাষণ করিয়াছে। বাঙ্গলার মাটিতে শঙ্করের উদ্ভব কিছু কঠিন—সেখানে নিমাই পণ্ডিত জন্মিতে পারে, কারণ, নিমাইএর পাণ্ডিত্যের পিছনে ছিল একটা বিরাট বিপুল প্রাণের ভাবের ভাবুকতার সাগর। বাঙ্গলার নৈয়ায়িক তর্ক করিতে জানে বিশেষরূপে তখন, যখন তুমি তাহাকে চেতাইয়া মাতাইয়া তুলিতে পার; কিন্তু ধীর বিচারে দাক্ষিণাত্যবাসীর সমকক্ষ বোধ হয় বাঙ্গালী নয়। ইহার প্রমাণ আরও এই যে, তর্কক্ষেত্রে বাঙ্গালী যেমন বস্তুতন্ত্রহীন হইয়া পড়ে আর কেহ তেমনটি হয় না। প্রাচীন ফরাসীদের সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে, একবার পাগলামী (furia franca) যদি তাহাদিগকে পাইয়া বসে তবে আর রক্ষা নাই, দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান তাহাদের লোপ পায়, যা-তা করিয়া বসে; সেই-রকম বাঙ্গালীরও আছে একটা পাগলামীর ধাত (furia)।

বাঙ্গলার মাটির মতই বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর মনপ্রাণ—নরম ও নমনীয়; নূতন ভাব নূতন রূপ সহজেই তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে। অন্যান্য কোন কোন শুষ্ক বালু-কঙ্করপূর্ণ কঠিন পাহাড়িয়া দেশের অনুরূপে তাহার মস্তিষ্ক নিরেট শক্ত হইয়া উঠে নাই, সে সব ছাঁচ ধরিতেই যেন প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু আবার বাঙ্গলার আঠালে

মাটির মনেই বাঙ্গালীর মনপ্রাণ যাহাকে একবার ধরে তাহাতে লাগিয়াই থাকে। যাহা শুধু মস্তিষ্কের শুধু ঔৎসুক্যের জিনিষ তাহাকে প্রাণের চিত্তের জিনিষ করিয়া ধরিতে বেশী দেরি তার লাগ না, আর ধরিলে ছাড়িতেও সহজে সে চায় না। অবশ্য সব সময়ে সমান জোরে জিনিষকে সে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না, প্রাণের তন্ত্রী তার অল্প আয়াসেই অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু সময় ও সুযোগ পাইলেই অবসাদ কাটাইয়া সে জাগিয়া উঠিতে, শিথিল মুষ্টিকে আবার দৃঢ়বদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করে না।

বাঙ্গালীর স্নায়ুতে, প্রাণে, মনে, মস্তিষ্কে আছে একটা—ভাল কথায়, নমনীয়তা (flexibility)—মন্দ কথায়, অসঙ্গতি (instability)। এই জন্যই বাঙ্গালীর মধ্যে পাই নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। বাঙ্গালী একটা বিশেষ কাটা-ছাঁটা ধরণের গড়নের মধ্যে আপন অন্তরাত্মাকে বাঁটিয়া এখনও দিতে পারে নাই, গতানুগতিক সংস্কার (tradition) তাহার মধ্যে নিবিড় হইয়া দেখা দেয় নাই। এ জাতিটিতে বিশুদ্ধ রক্তের এত অভাব, এ দেশের ভূপৃষ্ঠ নদনদীর খাত পরিবর্ত্তনে এত বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, তাই ইহার উপর প্রাচীনের অচলায়তন কীর্ত্তিসৌধ দাঁড়াইয়া গ্রাস করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। তাই বাঙ্গালীর মধ্যে একটা অবকাশ একটা ফাঁক আছে, যেখান দিয়া নূতন সৃষ্টির প্রেরণা নিত্যই আসিতে পারে। ফলে হইয়াছেও তাই। আধুনিক যুগে বাঙ্গলা যত নূতন সম্পদ আনিয়া দিতেছে, ভারতের অন্যান্য দেশ তাহা পারে নাই। বাঙ্গলার ধাতুতে আছে একটা স্বচ্ছতা, সেইজন্য উপরের কল্পলোকের অধ্যাত্ম জগতের প্রভাব তাহার মধ্যে যত ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কোথাও তেমনটি হইতেছে না। স্বীকার করিতে পারি, ধারণ-সামর্থ্যের অভাবে (instability) অনেক ক্ষেত্রে ফল সুষ্ঠু সুঠাম সুপরিণত হইয়া উঠে নাই, কিন্তু উপরের [illegible]লোকের শক্তির প্রভাব আদৌ যে পড়িতে পারিয়াছে তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়।

বাঙ্গালীর সম্পদ এই উপরের অন্তরাত্মার সম্পদ। কর্ম্মে বাঙ্গালী কুশলী নহে, মস্তিষ্কের ধীর স্পষ্ট দৃঢ় চিন্তাশীলতাও বাঙ্গালীর বিশেষত্ব নয়। বাঙ্গালীর কর্ম্মে আছে আবেগ, চিন্তায় আছে ভাবুকতা। অর্থাৎ কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম, চিন্তার জন্য চিন্তা বাঙ্গালী করে না—সে কর্ম্ম করে চিন্তা করে যেন আপন অজ্ঞাতসারে; একটা নিবিড় উপলব্ধি, কোথা হইতে একটা অজানা প্রেরণা যখন তাহার সত্তাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বাঙ্গালী হইতেছে শিল্পীর জাতি—অন্তরাত্মার একটা গভীর রসবোধ তাহার সকল বৃত্তিকে সৃষ্টিকে জীবনকে নিয়মিত করিতেছে, রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যকে ধরিয়া চলিবার, উহাকে সফল করিয়া তুলিবার যত্ন বাঙ্গালীর নাই, যাহা-তা কাজ অনেকটা যেন অহৈতুক অর্থাৎ আনন্দের, সৌন্দর্য্য বোধের। দেশ স্বাধীন হইলে আমরা সকলে ভাল খাইব পরিব, এটা বাঙ্গালীর কথা নয়; দেশের স্বাধীনতা চাই কারণ, সুন্দর দেশ আরও সুন্দর হইবে—সুস্মিতাং ভূষিতাং—ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। সুবিধার প্রয়োজনের কথা বাঙ্গালী ভাল বুঝে না, বাঙ্গালী বুঝে ভাবের সুন্দরের কথা। বাঙ্গলার পলিটিসিয়ান অপেক্ষা বাঙ্গলার কবি অনেক বড়।

বাঙ্গালী সুন্দরের পূজারী—কিন্তু তাহা ভাবের সৌন্দর্য্য যতখানি, দেহের সৌন্দর্য্য ততখানি নয়। অলঙ্কার প্রসাধন ভূরি-ঐশ্বর্য্য এ-সকল অপেক্ষা যাহা সহজ সরল অথচ সুষ্ঠু শোভন তাহার দিকেই বাঙ্গালীর ঝোঁক বেশী। দাক্ষিণাত্যের বিরাট স্থাপত্যকীর্ত্তি সব দেখিয়াছি—কি বিপুল কারুকার্য্যের ভরপুর পাষাণের স্তূপ! তাহাদের দেবতার বিগ্রহ সব অলঙ্কার আর পরিভূষণের মধ্যে যেন ডুবিয়া আছে। বাঙ্গালী সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চায় 'ভারে' নয়, বরং বলিতে পারি 'ধারে'—রেখার সরল ভঙ্গিমায়। দাক্ষিণাত্যবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদে রঙের দিকে বাহারের দিকে টান, বাঙ্গালী চায় শুধু পরিচ্ছন্নতা, সাদা রঙ্। বাঙ্গালী যত ভাল বাসে আর কেউ বোধ হয় তেমন বাসে না। বাঙ্গালীর আদি কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে এই দিকটাই প্রতিফলিত হইয়াছে দেখি।

সুন্দরের আর-এক কষ্টিপাথর হইতেছে নারী। সুরূপা রমণী বাঙ্গলা অপেক্ষা বাঙ্গলার বাহিরেই বেশী, কিন্তু বাঙ্গলায় আছে সুশ্রী রমণী। কোন উদ্ভটকার আলঙ্কারিক নানা প্রদেশের সুন্দরীদের বিশেষত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং, জয়দেবও বোধ হয়

'দন্তরুচিকৌমুদি' দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে কথা জানি না, কিন্তু বাঙ্গলার রমণীর মুখে আছে একটা শ্রী, একটা মনোহারিত্ব। চেহারা গঠনের অনবদ্য সৌষ্ঠব সেখানে না পাইতে পারি, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে পড়ে সলোমনের (Solomon) কথা—I am black but comely। বাঙ্গালীর স্বভাবের প্রাণের কমনীয়তা নমনীয়তা সলীল সলোল ভঙ্গিটিই তাহার চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর গঠনে গ্রীকের সুসীম রেখাপাত (statuesqueness) নাই, কিন্তু সেখানে আছে মাধুরী, লাবণ্য। আর এই লাবণ্য জিনিষটি কি? বের্গসন ইহার বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

The soul imparts a portion of its winged lightness to the body it animates: the immateriality which thus passes into matter is what is called gracefulness.

শরীরের উপর অন্তরাত্মার ছায়া জড়ের মধ্যে অধ্যাত্মের অনুরঞ্জনই হইতেছে লাবণ্য।

কোন জাতির বিশেষত্ব শারীরিক সৌন্দর্য্য, কোন জাতির প্রাণের সামর্থ্য, কাহারও বা মন-বুদ্ধির চমৎকারিত্ব; —কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষত্ব অন্তরাত্মার ভাববৈদগ্ধ। এই অন্তরাত্মার ভাবেরই অনুলেপনায় লাঞ্ছনায় তাহার চিন্তা-জগতে ফুটিয়া উঠিয়াছে উদার সূক্ষ্মদৃষ্টি, কর্ম্মে খেলিয়া চলিয়াছে সৃষ্টিশক্তি, আর দেহে দেখা দিয়াছে একটা শ্রী। বাঙ্গালীর সমস্ত আধারটিতে প্রতিফলিত লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে যেন আত্মার জ্যোতির্ম্ময় লোকের আভা।

বাঙ্গালীর ভাণ্ডার এই উত্তর-লোক—এই উত্তর-লোকের সত্যই সে দিয়াছে, দিতেছে ও দিবে। সত্যকে তর্কে প্রতিষ্ঠিত করা অথবা কর্ম্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিতে হয় ত বাঙ্গালী অপটু নয়, অন্ততঃ ভবিষ্যতে না হইতে পারে; কিন্তু তাহার আসল কাজ সত্যকে উপলব্ধি করা, অনুভব করা। তাই বাঙ্গালী নবযুগের অগ্রণী পথপ্রদর্শক। প্রমাণের মধ্যে সত্যকে যখন আগে বুঝিতে চাই, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সত্যকে যখন বাঁধিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠি, তখন পাই কাঁচা সত্য, অর্দ্ধেক সত্য, একরোখা সত্য। বাঙ্গালী সত্যের সকল খোলস ছাড়াইয়া সোজাসুজি প্রবেশ করিতে পারিয়াছে সত্যের মূল সত্তায়। তাই বাঙ্গালীর মধ্যে পাই একটা গভীর অখণ্ড সহজ সত্যের প্রকাশ।

শুধু বাহিরের দিকে বাহিরকে ঘিরিয়া যাহা, বাঙ্গালী তাহার উপর জোর করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই; তাই বিশেষ কোন রূপের মধ্যে কাঠামের মধ্যে আপনাকে ধরিয়া বাঁধিয়া খণ্ডিত করিয়া দেয় নাই। পঞ্চনদবাসীর শারীরিক বল আছে, মারাঠীর আছে কর্ম্মকৌশল, দাক্ষিণাত্যে পাই ধীর তর্কবুদ্ধি। বাঙ্গালীর আছে কি? আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিব, বাঙ্গালীর আছে 'ইনটুইশন' (Intuition), আর প্রাচীনতর ভাষায় বলিব বাঙ্গালীর আছে 'মর্ম্ম'—বাঙ্গলার প্রথম কবির প্রথম কথা—'মরমে পশিল গো'। বিদ্যাপতিও বাংলারই হাওয়া পাইয়া যেন বলিয়া গিয়াছেন—'কি পুছসি অনুভব মোয়'। এই মর্ম্মের অনুভব বাঙ্গালীর আর সকল বৃত্তিকে সচল উজ্জ্বল উদার করিয়া ধরিয়াছে।

তাই রসের ভূমি বাঙ্গলাদেশ রসকে যেমন বুঝিয়াছে আর কেহ তেমনটি করিয়া বুঝে নাই। বাঙ্গালীর সৃষ্টি সব আনন্দের সৃষ্টি। বাঙ্গালী 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' কি না জানি না, কিন্তু বাঙ্গালী যে আনন্দের পুত্র তাহাতে কিছু সন্দেহ করিবার নাই। নীরস কর্ত্তব্যজ্ঞান, কঠোর নিগ্রহপ্রয়াস বাঙ্গালীর কর্ম্মের উৎস নহে। বাঙ্গালীর ধাতুতে কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার তেমন স্থান নাই। বাঙ্গালী মহাত্মা গান্ধীর ষ্টোইক (Stoic) আদর্শ প্রাণ ধরিয়া লইতে পারে না—বাঙ্গালীর মানুষ হইতেছে রবীন্দ্রনাথ। দাক্ষিণাত্য শঙ্করকে জন্ম দিয়াছে, উত্তরাপথে নানকের সুরদাসের উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু বাংলার মাটিতে জন্মিয়াছেন চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ। ভক্তির ধর্ম্ম ভারতের অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু ভক্তিরও যে কান্তভাব তাহা বাংলাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও দেখি সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিকেয়) দেবের পূজা, কোথাও—শ্রীরাম বা রামসীতার পূজা—রাধাকৃষ্ণকেও কোথা[illegible] দেখি; কিন্তু রাধাভাবের পূর্ণরস এক বাঙ্গালীই বুঝিয়াছে। মহাদেব অনেক জায়গায় আপন আসন পাতিয়াছেন, বাঙ্গালী কিন্তু গৌরীকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। বেদান্তের আদর্শ সর্ব্বত্র সকল আদর্শকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে,

কিন্তু বাঙ্গালী খুঁজিয়াছে এমন একটি সাধনা যাহা—'বেদ-বিধি পার'। আত্মার পূজা শুধু নয়, কিন্তু মানুষের পূজা —সহজ-সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভার দান।

বাঙ্গালী হইতেছে প্রকৃতির সাধক। বাঙ্গালীর ধর্ম্মে সাহিত্যে দেখি জমিয়াছে এই প্রকৃতিপূজার উৎসব। বাঙ্গালীর ইষ্ট পুরুষ নহে। নিরালম্ব, সমাধিগত, আত্মরত স্থৈর্য্যকেই সে একান্ত করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙ্গালী চাহিয়াছে প্রকাশ, লীলা। বাঙ্গলা তাই মায়ের—শক্তির পীঠ। বাঙ্গলা আনন্দের ক্ষেত্র—অক্ষরব্রহ্ম বাঙ্গলার লক্ষ্য নয়—বাঙ্গালীর প্রাণে অধিষ্ঠিত হ্লাদিনী শক্তি। আধুনিক বাঙ্গলার গোড়ায় দেখি শক্তিসাধক রামমোহন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তিসাধক। বেদান্ত তাঁহাদের উপর যতই প্রভাব ছড়াইয়া থাকুক না কেন, শক্তির সাধনা ছিল তাঁহাদের মর্ম্মের বস্তু। আর অন্যক্ষেত্রে আজকাল জগদীশচন্দ্র প্রকৃতিসাধনার যে একটা নূতন দিক্ দেখাইতেছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গলার প্রতিভারই ছায়া কি দেখিতেছি না ?

বাঙ্গালীর একটা অখ্যাতি আছে যে, সে 'ঘরমুখো'। ঘরকন্নার আনন্দ (Domestic instinct) তাহার মধ্যে অতি প্রবল। গৃহস্থালির চিত্র সে তাহার কাব্যে গানে ছড়ায় এমন ফলাইয়া রসাইয়া আঁকিয়াছে আর কোথাও তেমনটি দেখি না।

বৈষ্ণব কবির

আমার বঁধুয়া　　আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।

অথবা　রন্ধনশালাতে যাই　　তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।—

শুনিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ কি একটা নিবিড় টানে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। কবিকঙ্কণে ত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের একটা পূর্ণ আলেখ্যই পাই। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের উদার উদাত্ত কাহিনী ছাড়িয়া যখন ঘরের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখনই যেন পাইয়াছেন নিজের কোট। বঙ্কিমচন্দ্রে ও আধুনিক শরৎচন্দ্রে বাঙ্গালীর পারিবারিক চিত্রই বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে যাহা হউক, কিন্তু এই 'ঘরমুখো' ভাবের অর্থ কি ? ইহার অর্থ জীবনের নিবিড় রসের উপর বাঙ্গালীর টান—ইহাও বাঙ্গালীর প্রকৃতিপূজার একটা দিক্। অবস্থা পড়িয়া এই ভাবটি সঙ্কীর্ণতার, দুর্ব্বলতার আশ্রয় হইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু অন্য অবস্থায় পড়িলে ইহা হইত জীবনের মধ্যে থাকিয়া, মানুষের সাথে মিলিয়া মিশিয়া, আদানে প্রদানে যে আনন্দ—যাহাকে পারিবারিক টান বা domestic instincts বলি তাহাই হইত social virtues, সামাজিক গুণ বা ধর্ম্ম। আর মানুষের ঘরে, সমাজের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যেই যে একটা ভাগবত স্বর্গ-জীবন স্থাপনের একটা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আজকাল যে সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি, তাহাতে 'ঘরমুখো' বাঙ্গালীর মনপ্রাণ যতখানি মাতিয়া উঠিতে পারিবে অন্য কেহ তত সহজে পারিবে কি না জানি না।

আনন্দের সন্তান, রসের পূজারী, প্রকৃতির সাধক বাঙ্গালীর মধ্যে তাই দেখা দিয়াছে একটা পূর্ণ-জীবনের আদর্শ, একটা বৃহৎ সামঞ্জস্যের প্রয়াস। বাঙ্গলায় নানা সব নানা জায়গা হইতে মাটি আনিয়া—ঢালিয়া মিশাইয়া—বাঙ্গলার দেশকে তৈয়ার করিয়াছে। নানাদিক্ হইতে নানাজাতি—দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, অনার্য্য, আর্য্য প্রভৃতি কত রকম তাহার হিসাব প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দিতে পারিবেন—সকলে আসিয়া মিশিয়া বাঙ্গালী জাতিকে জন্ম দিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে তাই দেখি বহুলবিচিত্র প্রেরণা, তাহার মনে নানা-মুখীন কৌতূহল, তাহার অন্তরাত্মায় সকলের একটা মিলন সামঞ্জস্য। বাঙ্গলায় আছে প্রেমের ধারা, আবার আছে শক্তির ধারা। বাঙ্গলায় তন্ত্র আছে, কিন্তু সে তন্ত্রের মধ্যে বেদান্তও আছে। তাই বাঙ্গালীর মুখে শুনি "তারা ব্রহ্মময়ী।" বাঙ্গলার ভাবুকতা আছে, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রও আছে—নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী কোলাকুলি করিয়া আছে। আমরা বাঙ্গলার সরল শ্রী, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী যে আবার ঐশ্বর্য্যের ভক্ত নয়, তাহাও বলা যায় না। বাঙ্গালী চাহিয়াছে উজ্জ্বলে মধুরে মিলন, সরলতা ও শোভার সামঞ্জস্য—আড়ম্বর সে না চাহিতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করে নাই। বাঙ্গালা জীবন চাহিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অধ্যাত্মকে ভুলিবার আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। বৈরাগ্য হইতে সে

দূরে থাকিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মুক্তিকে দূর করিয়া দেয় নাই। বাঙলা তাহার ঘরখানি চাহিয়াছে, কিন্তু বাহিরকেও তাহার সাথে যোগ করিয়া দিতে চাহিয়াছে।

তবে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা হইতেছে রস, জীবন, পৃথিবী—মাটি। তাহার পা হইতে মাথা অবধি সমস্ত আধারের মধ্যে প্রবাহিত তরঙ্গিত হইয়া যাইতেছে প্রকৃতিরই উদার লীলাময় গতি। বাঙ্গালী জাতিকে অনেক সময় নারীজাতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। কথাটি যে অনেকখানি সত্য তাহাতে সংশয় নাই। নারীর স্পর্শালুতা (sensitiveness) অনুভব-প্রাথর্য্য, নারীর কমনীয়তা নমনীয়তা, নারীর একটা দোলাচলবৃত্তি আর সেইসঙ্গেই এক তীব্রনিষ্ঠা, নারীর শ্রী ও হ্রী, সকলের উপরে নারীর একটা সহজাত দিব্য দৃষ্টি—সবই বাঙ্গালীর ধর্ম্মে কর্ম্মে, শিল্পে সাহিত্যে স্পষ্টই দেখিতে পাই। নারীর প্রতিষ্ঠা যেমন প্রাণময় জগতে, এই প্রাণের সুরে ও রঙ্গে যেমন তাহার আর-সকল জগৎ অনুরণিত অনুরঞ্জিত, সেই-রকম বাঙ্গালীও দাঁড়াইয়াছে এই প্রাণময় এই জীবনাধারার উপরে। বাঙ্গালী সাদা অধ্যাত্মকে ধরিতে জানে না, তাই বাঙ্গালী মায়াবাদের অর্থ বুঝিতে সাধু সন্ন্যাসী হইতে চাহে না। বাঙ্গালী আবার সাদা জড় লইয়াও থাকিতে পারে না—তাই ব্যবসা বাণিজ্যে বা শুধু পলিটিকাল কাজে সে এত পিছনে, বাঙ্গালীর বদ-নাম, বাঙ্গালী practical নয়। কিন্তু এই দুই অতি-বাদের মাঝখানের জগৎটি বাঙ্গালী অধিকার করিয়াছে। ইহাতে অনেক সময়ে তাহাকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এই ভাবেই সে যে একটা বৃহত্তর সামঞ্জস্য নিবিড়তর সত্যকে পাইতে চলিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

চিরন্তনী

(১৪)

মেয়ে-ইস্কুলের বাড়ী ছিল একটা পোড়ো ভিটায়। বাড়ীটা যাহাদের তাহারা এখন কে কোথায় ভাবিয়া ঠিক করা শক্ত। তবে বেশীর ভাগই যে অনেক দিন ইহ-লোকের মায়া কাটাইয়া গিয়াছে তাহা বাড়ীর অবস্থাই সাক্ষ্য দেয়। কোনো কালে মস্ত উঠানের তিন দিকে তিন মহল বাড়ী ছিল, আর এক দিকে ছিল খিড়্কীর পুকুরের রাস্তা। পশ্চিম মহলের সান-বাঁধানো প্রকাণ্ড মেঝে আর প্রকাণ্ড একটা ফাটা খিলান একরাশ ভাঙা ইট-পাট্‌কেল আর কাঁটাবনের মাঝখানে ভগ্নদূতের মত ম্লান মুখে এখনও পড়িয়া আছে। সানের মেঝের বুক চিরিয়া শেয়ালকাঁটা আর বুনো ফুলের চারা সেখানে সদর্পে বিরাজ করিতেছে। উত্তরের মহল বোধ হয় রান্না-মহল ছিল। সেখানে কতকগুলা পোড়া ইট এখনও পড়িয়া আছে, আর আছে একটা জীর্ণ ঢেঁকি। বাড়ী ঘর পড়িয়া গেলেও বাড়ীর শেষ বাসিন্দাকেও রান্না করিয়া খাইতে হইয়াছিল, সুতরাং ঘর-সংসারের চিহ্ন দুই-একটা সে মহল খুঁজিলে এখনও পাওয়া যায়। ঢেঁকি-কাঠ-খানার পাশে তিনটা ইটের পুরাণো দেওয়ালের উপর একটা নূতন খড়ের ছাউনি। বাড়ীর ছাদ পড়িয়া যাওয়াতে খড়ের ছাউনি দিয়া মেয়ে-ইস্কুলের পণ্ডিত সেখানে তাঁহার গৃহপালিত গরু ও বাছুরের আশ্রয়স্থান করিয়া-ছেন। পাকা মেঝের উপরেই গোবর দিয়া সেটাকে কোনো রকমে গোয়াল-ঘর নামের যোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। রান্না-ঘরের পাশে দুচার পুরুষের উনুনের ছাই আর হেঁসেলের আবর্জ্জনা পড়িয়া জায়গাটা একটু উর্ব্বরও হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত-মহাশয় ছাত্রীদের সাহায্যে সেখানে গোটা দশেক বেগুন-গাছ, দু-একটা লঙ্কার ঝাড় আর গোটা-দুই লাউ-কুমড়ার লতা লাগাইতেও ত্রুটি করেন নাই। নূতন শিক্ষয়িত্রীর আবির্ভাবে এগুলির ভোগ-দখলও পাছে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হয় এই ভয়ে সেক্রেটারী মহাশয়কে তিনি বার তিন চার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ গাছ গাছালিগুলা তিনিই সংসা

রের একটু সুবিধার জন্য অবকাশ-কালে খাটিয়া-খুটিয়া করিয়া তুলিয়াছেন।

দক্ষিণের বাড়ীটা ছিল বাবুদের বাহির-বাড়ী। সুতরাং তাহার উপর বাবুরা একটু অর্থ ও যত্ন ব্যয় করিয়া সেটাকে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। বাবুদের ভাগ্যদেবতা তাঁহাদের এই যত্নে-গড়া বৈঠকখানাটিকে কেন জানি না পরিশেষে সেই স্ত্রীজাতিরই কাজে লাগাইয়া দিলেন, যাহারা তাঁহাদের চক্ষে চিরকালই সংসার-গোলাপের কণ্টক ছিল। মেয়ে-ইস্কুল বলিতে রাজগঞ্জের লোকেরা আজকাল এই বাড়ীটাকেই বুঝিত। তিন-চার দিন হইল এই বাড়ীর উপর-তলার ঘরে নূতন শিক্ষয়িত্রীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। নূতন ইস্কুলের সব কাজ-কর্ম্ম বোঝাপড়া করিয়া লইবার পর আজ প্রথম করুণার অবসর হইয়াছে নূতন দেশটাকে বুঝিয়া লইবার। যে বাংলাদেশের সে কন্যা, আজ প্রথম সে সেই বাংলা-দেশের স্পর্শ এত নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতে-ছিল।

পশ্চিম মহলের খিলানটার ফাটলের ভিতর দিয়া বর্শার ফলকের মত খানিকটা সূর্য্যকিরণ দক্ষিণ মহলের বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। রান্না-বাড়ীর পাশের আমগাছটা শীত শেষে বসন্তের আগমন-সম্ভাবনায় মুকুলের ভারে নুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সিঁদুরে রূপের উপর অবিশ্রাম রৌদ্র-ছায়ার খেলা চলিতেছিল। করুণার ঘরের পিছনের জামগাছ আর সেগুনগাছ দুটা যেন তাহাদের নূতন অতিথির দর্শনে পুলকিত হইয়া কেবলি তাহার ঘর-দুয়ারের চারিধারে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতেছিল। পণ্ডিত-মহাশয়ের গরুটা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মাছির উৎপাতে লেজ নাড়িতেছিল। বাছুরটা গলার দড়ি ছিঁড়িয়া উঠান-ময় নাচিয়া বেড়াইতেছিল আর শুক্‌না পাতার খড়খড় শব্দ শুনিলেই ভয়ে চম্‌কিয়া উঠিতেছিল। পাঠশালা-ফেরত ছেলেরা বগলে মাদুর আর হাতে দোয়াত লইয়া মহা কোলাহল করিতে করিতে পথে বিপথে ছুটিতেছিল। পূর্ব্বদিকে খিড়্‌কির পুকুরটার ঘাটের কাছে কঞ্চীঝাড়ের মধ্যে একপাল পাতিহাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া কেবলি ঘুরিতেছিল।

করুণা জানালার ধারে বসিয়া চারিদিকে চোখ বুলাই-তেছিল আর ভাবিতেছিল এই পল্লীপথ, এই পোড়োবাড়ী, এই আম-কাঁঠালের বাগানে পাঠশালার পোড়ো-দের অকারণ দাপাদাপি, এই পুকুরঘাটের অলস রূপ সে যেন কবে কোথায় দেখিয়াছে। এ চোখে যে দেখে নাই সে ত বলাই বাহুল্য। কলকারখানা আর পুলিস আদালতের মুখোসে যে কলিকাতায় বাংলা দেশকে দেখা যায় না, সে কলিকাতায় সে জন্মিয়াছে, আছে, সেই খানেই কাটাইয়াছে, তবে এ বাংলাকে সে এমন করিয়া চিনিল কি করিয়া? কি করিয়া চিনিল তাহা সে নিজে বুঝিতে পরিতেছিল না, কিন্তু মনে হইতেছিল আজ যেন সে দীর্ঘ নির্ব্বাসনের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। কুড়ি বৎসরের দেখা কলিকাতা সহর তিনদিনের দেখা এই পল্লীপথের ধূলায় কখন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, তাহার ভয় ভাবনা দ্বন্দ্ব সংগ্রাম সমস্ত ভুলিয়া সে যেন উপভোগ করিতেছিল তাহার এই ফিরিয়া পাওয়ার উপলব্ধিকে। না পাইয়াই যাহাকে সে হারাইয়াছিল, তাহাকে সে সমস্ত মন দিয়া আজ আঁকড়িয়া ধরিতেছে। স্বদেশ বলিতে শতদলের কথা আর নিজের মনের মধ্যে এত দিন যে জিনিষটিকে সে গড়িয়াছিল, এই দেশটা তাহার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া মোটেই যায় নাই, তার ত্রুটি অনেক ছিল। কিন্তু এই অল্প দিনের পরিচয়ে সেগুলাকে অনায়াসে বাদ দিয়া সবটা নিজের মনে নূতন করিয়া কল্পনায় বাস্তবে গড়িয়া লইতে তাহার কিছু বাধে নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাঙা ধূলা উড়াইয়া গরু-বাছুর রাখাল-ছেলের বাঁহাতের লাঠির সঙ্কেতে অলস মন্থর গতিতে লোকালয়ের দিকে ফিরিতে লাগিল। পানা-পুকুরের ঘাটে চুড়ি-বালা-মলের শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের শব্দ মিশিয়া করুণার কানে আসিতে লাগিল। সেসব কথা গানের পদের মত মিষ্ট মোটেই নয়, কিন্তু তবু আজ তাহা গানের সুরের মতনই করুণার কানে মধুর লাগিতে ছিল। ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দ একটানে কতকগুলা কাহাকে যেন ডাকিতে লাগিল। করুণা কল্পনায় সুন্দরী বধূর হাতের মাটির প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতে দেখিল।

একবার তাহার ঈর্ষ্যাও হইল এইসব পল্লীবালাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর। তখনকার মত সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, গোধূলির আলোয় আম্রমুকুলের গন্ধে মাতিয়া সে যে পল্লীর স্বপ্ন দেখিতেছে বাস্তব জগতে সেই ধূপধুনা শঙ্খ প্রদীপ রাঙাপথ বাঁকানদী মেঠো বাঁশি আর হাসি-গানের ভাণ্ডার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জিনিষগুলা আছে বটে, কিন্তু তাহার যে প্রাণটা কল্পনায় সে জাগাইয়া তুলিয়াছিল জগতের সকল রূপের সকল রসের প্রাণের মত তাহাও শত আবর্জ্জনা আর অকল্যাণের চাপে কোথায় অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে।

করুণা বসিয়া বসিয়া কত কি গল্পের জাল বুনিতেছিল। আজ রাত্রে তাহাদের সেক্রেটারী গোপেশ-বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। হাতে কাজ নাই, কাজেই মনটা খুব দ্রুত চলিয়াছিল। এই পোড়ো বাড়ীর কোণটাতেই আজ তাহার গল্পের আসর ভাল জমিল। কলিকাতার সেই ভাড়াটে বাড়ীর দুইখানা ঘরের দিকে মন ত তাকাইতেই চায় না। লাল ইটের প্রাসাদখানাও এই পানা-পুকুরের পাশে সে কিছুতেই সাজাইয়া রাখিতে পারিল না। নিপুণ চিত্রকর যেন ঠিক বুঝিয়া-সুঝিয়াই এই পোড়ো বাড়ীটাকে যথাস্থানে বসাইয়া গিয়াছে। করুণার সাধ্য কি যে সেটাকে সরায়। কিন্তু সেই কাল-রাত্রিতে দুই হাজার টাকায় যাহার কাছে সে আপনাকে বাঁধা দিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ত এখানে বসানো উচিত! করুণার মনটা সেদিন যে ধাক্কা খাইয়াছিল এতদিন ধরিয়া সেটার দিকে সে পারত পক্ষে তাকায় নাই। আজ চাহিয়া দেখিল মনের একটা কোণে অনেক দিন ধরিয়া যে সোনার সংসারটা গড়িয়া উঠিতেছিল, যেখানে সে কতবার তাহার দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত চিত্তের শান্তি খুঁজিতে যাইত কিন্তু ভয়ে-ভয়ে ফিরিয়া আসিত, যেখানে সে ঐশ্বর্য্যের রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া তাহার ক্ষুধিত অন্তরের সকল ক্ষুধা দূর করিতে যাইত, সে সংসার সেই ঝড়ের রাত্রে সোনার ঘায়েই গুঁড়া হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সে সংসারের কেন্দ্ররূপে যাহাকে কল্পনা করিতে সে এতদিন চেষ্টা করিয়াও পারে নাই, আজ যেন তাহাকে খুঁজিয়াও পাইতেছে না।

করুণা নিজের মনের ব্যবহারে নিজের কাছেই লজ্জা পাইতেছিল। তাহার যে এমন করিয়া বিমুখ হওয়া উচিত নয়, ইহা যে অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যাচরণ, এমনই কত কি কড়া কড়া সে নিজেকে শুনাইল, কিন্তু আমতলার পোড়োবাড়ীটার কোণের তাহার এই মনগড়া রোমান্সে তাহার মহাজনকে স্থান দিতে পারিল না। বৃষ্টির জলে কচিগাছ ক্রমে বাড়িয়া উঠে, গ্রীষ্মকালে চাতকের মত ঊর্দ্ধমুখে সে ডালপালা মেলিয়া মেঘকে ডাকে, কিন্তু প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিকে কি সে ডাকিতে পারে? সে যে তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে?

তাহার গল্পের জাল বেড়িয়া-ধরিতে চাহিতেছিল এমন একটি মানুষকে যে এই দৃশ্যপটের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া যায়, যাহার কাছে পৃথিবীর সব-কিছু এখনও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের মত প্রখর আর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, এই মনগড়া পল্লীর মত যাহার মধ্যে অনেকখানিই রহস্য, অনেকখানিই অজানা।

পল্লীর ছবি প্রথম তাহার মনে যে আঁকিয়া দিয়াছিল, সেই শতদল আরও যে একটি ছবি কথায়-কথায় আঁকিতে চেষ্টা করিত, সেই ছবিখানি ত এখানে বেশ মানায়। করুণা নিজেকে ধমকাইল, এ-রকম চপলতা এ-রকম মূঢ়তা তাহার মত মেয়ের শোভা পায় না। কিন্তু তবু সেই মানুষটিরই ছবি বারবার এই পোড়ো বাড়ীর কোণে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, যে সেদিন প্রখর রোদে গরুর গাড়ীর ভাঙা চালে গায়ের শালটা ঢাকা দিয়া গরুর গাড়ীর আগে-আগে অতক্ষণ তাহাদের পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। হাওয়ায় যাহার রুক্ষ চুলগুলা কেবলি উড়িতেছিল, গোপেশ-বাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় যে লজ্জা ঢাকিবার চেষ্টায় ক্রমাগতই অন্য কথা পাড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিবার উৎসাহে জিনিষপত্র একলাই গাড়ীতে টানিয়া তুলিতে গিয়া যাহার সখের জামাটা ছিঁড়িয়া দু-টুক্‌রা হওয়াতে হাসিয়া সে টুক্‌রা-দুটা একটা গিঁঠ বাঁধিয়া তখনকার মত কাজ চালাইয়াছিল।

আজ করুণার মনে হইতেছিল, শুধু আজ নয় কিন্তু লক্ষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া বারে-বারে যেন সে এই চূর্ণ ফুল-রেণুর মধ্যে এই সিঁদুরে আমগাছের কোলের কাছে তাহার

আসন পাতিয়া আসিয়াছে। এইখানে কত সংসার সে আপন হাতে গড়িয়াছে, কত মহাপ্রলয় তাহা ছারখার করিয়া দিয়াছে, কিন্তু পারে নাই এই সুরটিকে আর এই নারীর প্রাণটিকে ধ্বংস করিতে। জন্মান্তরের কথা করুণাকে কেহ কোনো দিন শেখায় নাই, এ জন্মেও এ দেশের সঙ্গে তাহার আর কখন পরিচয় ছিল না, তবু এই তিনদিনের পরিচয় তাহার আর-সকল ভুলাইয়া কেন যে তাহাকে তিন শতাব্দীর বন্ধনে এই ধূলামাটি আর এই আকাশের সঙ্গে বাঁধিতে চাহিতেছিল তাহা সে নিজে কোনোমতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

সেক্রেটারী গোপেশ-বাবুর বাড়ীর জীর্ণ গাড়ীখানা খড়্‌খড়্‌ করিতে করিতে কখনও মাঠে কখনও পথে পড়িতে পড়িতে সেগুনগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। করুণা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অরুণা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, তোমার ধ্যানভঙ্গ হল? ভাগ্যিস্ আমি আছি, তা নইলে তোমার যে কি দশা হত তার ঠিক নেই। বড়ই মধুরের গাড়ী এসে পড়্‌ল আর তুমি বসে বসে এখন কোন্ ময়ূরবাহন কার্ত্তিকের ধ্যান কর্‌ছ?"

করুণা বলিল, "আচ্ছা, যথেষ্ট জ্যাঠামি হয়েছে! এখন আমার মঙ্গলচিন্তা রেখে নিজের চুলের তোয়াজটা সেরে ফেল্ দেখি।"

অরুণা বলিল, "চোখ দুটো একবার না তুলেই উপদেশ দাও কেন? আমার চুলটুল কখন বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তুমিই—"

কোথা হইতে গায়ে ধূলাবালি মাখিয়া রণু ছুটিয়া আসিয়া অরুণার ঘাড়ের উপর পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই ছোড়দি, গোপেশ-বাবু কি সমস্ত ক্ষণ কাঁচা তেঁতুল খান নাকি? কথা বলতে গেলেই অমন মুখ হয়ে যায় কেন?"

অরুণা তাহাকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া বকিয়া উঠিল, "কাঁচা তেঁতুল কে খায় জানি না, কিন্তু তুমি যে সম্প্রতি একটি পাকা হনুমান হয়ে উঠেছ তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। দিলে আমার ধোপকাপড়টা মাটি করে! হাত না ধুয়ে খবদ্দার আর আমায় যদি ছোঁবে!"

"আহা, কিনা একটা পচাকাপড়! টাকা দিলেও কেউ ছুঁতে চায় না।" বলিয়া রণু নিমন্ত্রণের উপযুক্ত বেশভূষা করিতে চলিয়া গেল।

গাড়ী করিয়া সকলে গোপেশ-বাবুর বাড়ী পৌঁছিতেই গৃহকর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হাত জোড় করিয়া হাসিয়া তারিণীবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন! আসুন! দরিদ্রের বাড়ী আজ পবিত্র হল। ঈশ্বরের অসীম দয়া।"

একটি ছোট মেয়ে গোপেশ-বাবুর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, গোপেশ বাবু তাহাকে কনুই দিয়া একটা ধাক্কা মারিয়া মুখখানা বাঁকাইতেই সে থতমত খাইয়া করুণার কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল। করুণা মেয়েটির বিপদ বুঝিল। তাহাদের মত সহুরে জীব বেচারার কখনও দেখা অভ্যাস নাই, কাজেই ভয়ে কিম্বা বিস্ময়ে বেচারার বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে, সে আতিথ্যটা কি করিয়া সারিবে বুঝিতে পারিতেছে না। করুণা মেয়েটিকে বিপন্ন দেখিয়া বলিল, "চল না, কোন্ দিকে যেতে হবে, আমরা যাই।"

গোপেশ-বাবু হাসিমুখখানা দাঁত খিঁচাইয়া নিমেষে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া বলিলেন, "হাঁ-করা ভ্যাবাগঙ্গারাম! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কি? অতি মূর্খ মশায়, অতি মূর্খ।"

অরুণা হাসি চাপিতে গিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট দুখানা প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া করুণাকে সজোরে একটা চিম্‌টি কাটিয়া লাট্টুর মত বোঁ করিয়া ঘুরিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি তাড়া খাইয়া পাশ হাঁটিয়া অন্দরের দিকে চলিল। অন্দরের দরজায় একগলা ঘোম্‌টা দিয়া একজন প্রৌঢ়া গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার মুখও দেখা যাইতেছিল না, কথাও কাহারও কানে পৌঁছিল না। তবে তাঁহার ধরণধারণ ও ঘাড় নাড়ায় অতিথিদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, গৃহিণী তাহাদের অভ্যর্থনাই করিতেছেন। ভিতরে ঢুকিয়া আরও এমনই ভীত ও তটস্থ গুটিকয়েক বৌ-ঝির দর্শন পাওয়া গেল। তাহাদের মধ্যে নবীনারা কালো-লেস্-বসানো গোলাপী সেমিজ শাড়ী ও বালিকারা পোষাকের উপর একটা করিয়া বেল্ট্ পরিয়া যথাসাধ্য আধুনিক বেশভূষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিসের ভয়ে জানি না অতিথিদিগের সঙ্গে কথা বলিতে কেহই সাহস করিল

না। কিছু একটা দেখিবার কি শুনিবার আশায় সকলেই সেইখানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহই কথা বলে না দেখিয়া একটি প্রবীণা বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া করুণাদের বসিতে বলিয়া কথা সুরু করিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, "দেখ বাছা, তোমায় মেয়েমাষ্টার না গুরুমা কি বল্‌তে হয় জানি না, বুড়ো মানুষের দোষ নিও না। ছুঁড়ি-গুনোকে গুপী আজ সারাদিন ধরে তালিম দিলে, তা রঙ্গিণীরা ত কাজের সময় সব ভ্যা হয়ে রইলেন। যেই হও না বাছা, যখন গেরস্তর বাড়ী এসেছ কাউকে ত কথা কইতে হবে, আমাদের বাঙালী মানুষের দেশে এমনি নিয়ম। কলকেত্তাই কথা জানি না বলে কি 'এস বোসো' বল্‌ব না?"

তরুণীদের মধ্যে লজ্জা ও আসন্ন বিপদ-বোধের একটা শিহরণ দেখা গেল। করুণা হাসিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে আবার তালিম কিসের? আমরাও বাঙালী—আমরাও মেয়েমানুষ, আর কিছু ত নই!"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বই কি! তবে আমরা গেরস্তর মেয়ে, তোমাদের মত ত নয়।"

করুণা বলিল, "আমরাও গেরস্ত, ভবঘুরে নয়।"

বৃদ্ধা মনের ভাবটা বুঝাইতে না পারিয়া বলিলেন, "তা তবে বাছা! আমরা অতশত জানি না।"

কোনো ক্রমে নিমন্ত্রণের ব্যাপার চুকিয়া গেল। মনে হইল অতিথি ও গৃহস্থ দুই পক্ষেরই যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

রাত্রি দশটার সময় যখন সকলে বাড়ী ফিরিতেছিল তখন গ্রামের খড়ের ঘরগুলির উপর জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, নদীর ধারের বালির পথ জ্যোৎস্নায় মিশিয়া তুষারশুভ্র হইয়া উঠিয়াছে। পথে লোকজন বড় নাই। গাড়ীতে বসিয়া নিস্তব্ধ গ্রামের উপর চাঁদের এই শুভ্র শীতল কিরণের স্পর্শ অনুভব করিয়া করুণার দুঃখ হইতেছিল যে, এমন সম্পদ্ মানুষ কি করিয়া হেলায় ফেলিয়া রাখে। সে বলিল, "প্রচুর আছে বলে এমন জিনিষও মাঠে মারা যায়।"

অরুণা বলিল, "সবাই ত তোমার মত কবি নয়।" নদীর ধারের আমতলার পিছন হইতে একটা নিতান্ত আধুনিক গানের সুর কাহার বাঁশীর কণ্ঠে হঠাৎ ধ্বনিয়া উঠিল। অরুণা বলিল, "নাঃ, তুমি ছাড়া আরও একজন কবি এ গ্রামে আছে দেখ্‌ছি। এ নেহাৎ রাখাল-বালকের বাঁশী নয়।"

রণু বলিল, "আরে ও সুপ্রকাশ-বাবু নিশ্চয়। কালই আমার ওঁর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। আমি দেখেছি ওঁর একজোড়া সুন্দর বাঁশী আছে। গাড়ীটা একটু থামাতে বল না, দেখ আমি এখ্‌খুনি ধরে আন্‌ছি তাঁকে।"

অরুণা বলিল, "তাঁর বয়ে গেছে দুপুর রাত্রে ওখানে বসে বাঁশী বাজাতে। তোমার মত ত সবাই ক্ষেপেনি।"

গাড়ী থামান হইল না। রণু অগত্যা বলিল, "আচ্ছা দেখাই যাবে ক্ষেপেছেন কি না।"

(ক্রমশ)

শ্রীশান্তা দেবী।

মহাত্মা গান্ধীর মনোগত অভিপ্রায়

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত অসহযোগিতার (non-co-operation এর) সম্বন্ধে সংবাদপত্র-সমূহে যেরূপ তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা দৃষ্টে আমার মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত মহাত্মার প্রকৃত মনোগত অভিপ্রায়টি অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশেষত সংবাদপত্রের অধিনায়কদিগের, হৃদয়াভ্যন্তরে এখনোপর্য্যন্ত কেন-যে তাহা প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে কারণ আর কিছু না—ত্রেতাযুগে মায়ামৃগের প্রলোভনে মুগ্ধ হওনের ফল হইয়াছিল কীরূপ যে ভয়ঙ্কর শোচনীয়, তাহা আমাদের কাহারো জানিতে বাকি নাই:—তেম্নি আমাদের এই বর্ত্তমান কলিযুগে, নদীর কিনারায় বাঘে-গোরুতে একসঙ্গে মিলিয়া মনের সুখে জলপান করিবে, এইরূপ একটা দুরাশা-রূপিণী মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হওনের ফল—বিধাতা আমাদের ললাটে কী যে লিখিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা যদি ব্যালা থাকিতে ভালোয়-ভালোয় সাবধান না হই, তবে আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে যাহা—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কী? না, আমাদের দেশের অস্থি মজ্জা শোণিত প্রভৃতি

যত কিছু সার উপাদান—সমস্তেরই হরণ, এক কথায়—সর্ব্বস্ব হরণ। এটা সীতা হরণেরই দ্বিতীয় সংস্করণ তাহাতে আর ভুল নাই।

মহাত্মা গান্ধীর অভিপ্রেত অসহযোগিতার ভিতরকার নিগূঢ় কথাটা আমার সাদাসীধা সহজ বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা বলি তবে শুনু'ন্ঃ—

আমাদের আপনাদের যাহা কিছু ভাল আদর্শ আছে, তাহা আপনাদের দেশের মঙ্গলের জন্য আপনাদের শুভবুদ্ধি খাটাইয়া, আপনাদের প্রাণপণ চেষ্টায় লোকসমক্ষে দাঁড় করাইয়া তুলিতে না-পারিতেছি যতক্ষণ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের সম-পদবীতে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে আমরা কোনো অংশেই ভদ্রভাবে পারিয়া উঠিব না—ইহা সুনিশ্চিত। কেননা—দুই পক্ষ যদি সমান পদবীতে দাঁড়াইতে না পারে তবে দুয়ের মধ্যে সহযোগিতা কেবল-একটা কথার কথা মাত্র! উচ্চনীচ পদবীস্থ দুই ব্যক্তি যদি পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে যায় তবে ঘটে এই যে, হয় দুর্ব্বল পক্ষ প্রবল পক্ষের সহিত একান্ত বশম্বদ ভাবে গোড়দিয়া চলে, নয়, দুর্ব্বল পক্ষ আপনার মনোগত অভিপ্রায় পষ্টাপষ্টি অনাবৃত করিয়া প্রবল পক্ষের নিদারুণ বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক্ষণকার স্কুল-কালেজে আমরা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাহাতে, প্রবলপক্ষের সহিত দুর্ব্বলপক্ষের গোড়দিয়া চলা ছাড়া সহযোগিতা শব্দের আর কোনো অর্থ সম্ভবপর নহে। এক্ষণকার শিক্ষার ফলে আমাদের নিজের দেশের নিজের ভাব—নিজের ভদ্রজনোচিত আচার-ব্যবহার—নিজের উচ্চ আদর্শ—সমস্তই আমরা বিস্মৃত হইয়া পরের উচ্ছিষ্ট সামগ্রী দিয়া আমাদের জ্ঞানধর্ম্মের ক্ষুৎপিপাসা কথঞ্চিৎ-প্রকারে নিবৃত্ত করিতেছি। এরূপ অবস্থায়, প্রবলপক্ষ এবং দুর্ব্বলপক্ষের মধ্যে সমানভাবে মেলামেশা কিরূপে সম্ভব হইবে—আমি তো তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তাই আমি বলি যে, দুর্ব্বলপক্ষ আপাততকার মতো প্রবলপক্ষের অধিকার হইতে পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার নিজের অধিকারভুক্ত সারপদার্থ সকল যে পর্য্যন্ত না প্রকাশ্যে উদ্ভাসন করিয়া তুলিতে পারিতেছে, সে পর্য্যন্ত কোন্ লজ্জায় দীনহীন-ভিখারী-বেশে প্রবলপক্ষের সহিত মেলামেশা করিতে গিয়া সমস্ত জগতের সমক্ষে আপনার অপদার্থতা অকর্ম্মণ্যতা এবং পরমুখাপেক্ষিতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিবে? আমাদের দেশের এই দেশের সঙ্কটাবস্থায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত—কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়দিগের রুধির-শোষক প্রতাপ-মাহাত্ম্য হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের নিজের চেষ্টায়, নিজের ভাবে, নিজের মঙ্গলের আদর্শ ভিতর হইতে বাহিরে বিধিমত প্রকারে ফুটাইয়া তোলা। তাহা যখন তাঁহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন—তখনই সহযোগিতা শব্দ তাঁহাদের মুখে শোভা পাইবে—তাহার পূর্ব্বে না।

এ যাহা আমি বলিলাম তাহার প্রমাণ যদি কেহ চান, তবে, এতদিন ধরিয়া আমাদের সহিত কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়-দিগের সহযোগিতা (Co-operation) যেরূপ চলিতেছে, এবং তাহার বিষময় ফল যাহা আমাদের চতুর্দ্দিকে অল্পস্বল্প পরিমাণে ফলিত হইতেছে, তাহাই তাহার অল্পঘ্যান্ত প্রমাণ, অপর প্রমাণ নিতান্তই বাড়া'র ভাগ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

সমাজের কথা।

এটা সাদা কথা, মানুষ একা থাকিতে পারে না, এটা কোনো পক্ষে সম্ভব নয়। এখন একের সহিত অপর সকলের, প্রত্যেকের সমস্তের, ব্যষ্টির সহিত গোষ্ঠী ও সমষ্টির ঠিক সম্বন্ধটি কি?

নিজের স্বেচ্ছাচারকেই যদি জীবনের কেন্দ্র করিয়া তুলি তবে আমাদের পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে। এই জন্যই গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজের নিয়ম সব, তাহার বিধি নিষেধ,—তাহার শাস্ত্র। আমি ও আমি-ছাড়া অপর সকল, এই দুই সত্তার আদান-প্রদানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে উভয়ের সংমিশ্রণ বা সমায়ন যে তৃতীয় সত্তা তাহারই নাম সমাজ।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরস্পরের মধ্যে এই যে আদান-প্রদান, তাহারও আবার বিভিন্ন ধরণ আছে। গোড়ায় এই আদান প্রদান হইয়া থাকে অজ্ঞানতঃ, প্রয়োজনের বশে—এইরূপেই রীতি, আচার বা unwritten law গড়িয়া উঠে। অজ্ঞানে প্রয়োজনে যেমন সমাজ বাঁধিয়া উঠিতেছে তখন প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্বসংঘর্ষ থাকিলেও এই রকম যুদ্ধেরই ফলে যেন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতেছে। বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই আছে, শৃঙ্খলা চলন-নই রকম স্থাপিত হইয়া গেলে, স্বেচ্ছাচারী যখন-তখন উদ্ভূত হইতে পারে, তাই তাহাকে পাকা করিয়া রাখিবার জন্য বা অতি পরাক্রমশালী হইলে তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য দরকার হয় সমাজের একটা কেন্দ্রীভূত শক্তি। [illegible]

গবর্ণমেণ্ট, সরকার, পঞ্চায়ৎ—সমাজের প্রতিনিধি। এই সমাজের প্রতিনিধিরাই পরে আবার নূতন নূতন নিয়ম-কানুনের প্রবর্ত্তন করেন, সজ্ঞানে সমাজকে সংহত শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিতে চাহেন। এই দ্বন্দ্ব চলিয়াছে প্রত্যেক তিন দিক্ হইতে (triangular)। প্রত্যেক ব্যক্তিকে দ্বন্দ্ব করিতে হয় প্রত্যেক অপর ব্যক্তির সহিত আর সকলের সমবেত সমাজের একটা প্রতিনিধি-শক্তির সহিত। ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির প্রতিযোগিতা আর্থিক বিষয়ে (economic), আর সমষ্টির সহিত তাহার প্রতিযোগিতা নৈতিক বিষয়ে। ব্যক্তি যে-মুহূর্ত্তে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা নৈতিক স্বাতন্ত্র্যকে কিছু খর্ব্ব করিয়াই তাহাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু বাধ্য হইয়া এই যে সে নিজের উপর সংযম বা নিগ্রহ করিতেছে, ইহাতে তাহার প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমতি নাই। পৃথিবীর খাদ্যের অনুপাতে লোকসংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়া যাইতেছে,—সেজন্য লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা (economic struggle) তত-খানি চলিতেছে না যতখানি চলিতেছে প্রত্যেক মানুষের প্রাণে অধিকার-বোধের ভিতর দিয়া যে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লিপ্সা আছে সেইজন্য। মানুষ চাহিতেছে সমাজের সমষ্টির মধ্যে ফিরিয়া আবার সেই আদিম প্রাকৃতিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের মত কিছু স্থাপন করিতে। এই স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছা-আচার-স্পৃহার জন্যই সে বলিতেছে—Good government is no substitute for self-government.

কিন্তু মানুষ যখন একলা থাকিবে না, একলা থাকিবার ফলে তাহার যে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারের অধিকার তাহাও সে পাইবে না। তবে কি সমাজে থাকিলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ তাহার জীবনের সাথী, জীবন-অভিব্যক্তির উপায় ?

তাহা ঠিক বোধ হয় না। কারণ, বলা যাইতে পারে, মানুষের সমাজ দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দ্বন্দ্ব প্রতি-যোগিতাই সব কথা নয়। মানুষের মধ্যে সহযোগিতা বলিয়াও একটা জিনিষ দেখি। মানুষ শুধু নিজের জন্য ভাবে না, পরের জন্যও ভাবে। গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে, কারণ, গোষ্ঠীর মধ্যে সে আপনার বৃহত্তর সত্তা পায়। একক থাকিলে স্বতন্ত্র আমি পারি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলা দুষ্কর। একলা থাকিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা মাত্র, সংঘর্ষের যুদ্ধের মাত্রা আমার যত বাড়িয়া আমার জয়ের সম্ভাবনা ততই কমিয়া যায়। তাই ত গোষ্ঠীবদ্ধ হই। একই লক্ষ্যের একই স্বার্থের লোক লইয়া সংঘ গঠন করি—সুবিধার জন্য। ইহা যুদ্ধের কৌশল মাত্র।

সহযোগিতাও (co-operation) প্রতিযোগিতারই (competition) আর এক মূর্ত্তি। সহযোগিতার মূলে আছে স্বার্থই। প্রথমে ধরা যাউক গোষ্ঠীগত স্বার্থের কথা। ইউরোপের সমাজে বিভিন্ন যুগে চারিটি বৃহৎ সংঘশক্তির খেলা চলিয়াছে—রাজশক্তি, পৌরোহিত্যশক্তি, সামন্ত-রাষ্ট্র-শক্তি আর সাধারণ প্রজা-শক্তি। কিন্তু এই বিভিন্নশক্তিসমুদয় আপন আপন স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াছে, কোন বিশেষ শত্রুশক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-শক্তির মধ্যে এই রকমই দেখিতেছি সহযোগিতার তলে তলে প্রতিযোগিতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর আধুনিক যুগে সমাজের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি (class war), সেখানেও সঙ্ঘবদ্ধ সকলে হইতেছে, সহযোগিতা বেশী দৃঢ় করা হইতেছে প্রতিযোগিতার জন্য। গোষ্ঠী বা সংঘের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা ব্যষ্টির দিকে তাকাই, সেখানেও দেখি সহযোগিতার বন্ধনকে কাটিয়া প্রতি-যোগিতার স্বাতন্ত্র্যের উপরই জীবনকে বাড়া করিবার একটা গতিধারা। ভারতে সমাজের কেন্দ্র (unit) ছিল একান্নবর্ত্তী পরিবার, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের মত দম্পতীই হইয়া উঠিতেছে এক-একটা কেন্দ্র। কিন্তু এখানেও তাহার শেষ হইতেছে না। আমেরিকা যেন দেখাইতেছে দম্পতীর সম্বন্ধও ভাঙ্গিতে হইবে। দম্পতীর যে সহযোগ তাহাও ক্ষণিক, সুখ-সুবিধার জন্য। স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পুরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সমাজকে ক্রমে দাঁড়াইতে হইতেছে। প্রত্যেককে নিজেরই দিকে দেখিতে হইতেছে, নিজেরই উপর ভর করিতে হইতেছে, নিজের দায়িত্ব নিজেকেই লইতে হইতেছে, নিজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি নিজেকেই করিয়া লইতে হইতেছে।

ইহা হইতেছে, আর ইহাই হওয়া উচিত। কারণ, নিজের শক্তিকে চিনিবার, বাড়াইবার ইহা একমাত্র পন্থা। ঘর্ষণে যেমন চন্দনের সৌরভ ফুটিয়া উঠে, সেই-রকম সংঘর্ষেই ব্যষ্টির প্রতিভা প্রজ্বলিত হয়। মানুষের গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ মানুষের ব্যক্তিগত সার্থকতার অবলম্বন, উপায় মাত্র।

কিন্তু এই উপায় যখন আদর্শ হইয়া পড়ে, যে জন্য ইহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা ভুলিয়া গিয়া ইহাকে স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লই, তখনই ধ্বংসের বীজ বপন করি—ব্যষ্টিধর্ম্মের উপরে যখন গোষ্ঠী- বা সমষ্টিধর্ম্মকে চাপাইতে আরম্ভ করি তখনই ব্যষ্টির, গোষ্ঠীর, সমষ্টির অবনতি সুরু হইল।

কিন্তু এখানে আবার প্রশ্ন করিতে পারি, স্বাতন্ত্র্য অর্থই কি দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ? মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হইবার যে প্রেরণা (Herd instinct), তাহা কি প্রকৃতির প্রয়োজনেরই তাড়নার উদ্ভব হইয়াছে, না তাহার সঙ্গে অন্য রকম কারণও কিছু মিশ্রিত আছে ?

মানুষে মানুষে মিলিয়া যে সমাজবদ্ধ হইয়াছে তাহা জীবন-সংগ্রামের চাপের ফল, উহা ব্যক্তিতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছল-বল-প্রণোদিত চুক্তি, শুধু এইটুকু বলিলে সব কথা বলা হইল না। পরের সাথে মানুষ মিশিতে চায়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু মেশার আনন্দের জন্য। অপরের সাথে মানুষ লেনা দেনা করিতে চায়, কেবল নিজের ভাণ্ডারকে বাড়াইবার জন্যই নয়, ইহাতে সে তৃপ্তি পায় বলিয়া। মানুষের এক অংশে এক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যেমন ধর্ম্ম, আর-এক অংশে আর-এক ক্ষেত্রে সহযোগিতা তেমনই ধর্ম্ম, তেমনই আবার আর-এক অংশে আর-এক ক্ষেত্রে তাহার ধর্ম্ম একাত্মতা। এই একাত্মতা সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, অনুভব করে বলিয়াই, তাহার এই মেলামেশা, লেনাদেনা ; সকলের মধ্যে থাকিয়া, সকলের সাথে চলিয়া ফিরিয়া, সে যেন বাস্তবিকই পায় নিজের এক বৃহত্তর সত্তা, গভীরতর জীবন, মহত্তর সার্থকতা। তারপর যেখানে চোখে দেখিতেছি শুধু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, সে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের অর্থ হইতেছে মিলনের সামঞ্জস্যের চেষ্টা। ভিতরে একটা নিবিড় ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মনের প্রাণের বাধা ঠেলিয়া বাহিরে প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে, মনের প্রাণের বন্ধনকে মিলনের ভাব করিয়া তুলিতে যত্ন করিতেছে, তাই এত দ্বন্দ্ব, এত সংঘর্ষ। মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় (will to live), আপনাকে বাড়াইয়া তুলিতে চায় (will to power), সেই জন্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই সমাজ থাকিবে ও চলিবে—ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে চায় (will to love), পরের মধ্যে নিজের চারিদিকে নিজেকে পাইতে চায়, সেই জন্যই সমাজে গোষ্ঠী ও সঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য সে চলিয়াছে।

মানুষ চায় মানুষের স্পর্শ—পরের মধ্যে নিজের আত্মার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পরের মধ্যে নিজেকে পাওয়ার অব্যর্থ অনুসঙ্গ হইয়াছে নিজের

মধ্যে পরকে পাওয়া, নিজের মধ্যে অপরের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ঠিক এই কথাটিকেই কিন্তু তাহার মন ও প্রাণ ঠিক বুঝিতে ধরিতে দেয় না, তাই সমাজের যত গোলমাল; এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া সমাজবন্ধনের, গোষ্ঠী বা সংঘ গঠনের চেষ্টা সে করিয়াছে বলিয়া সমাজ গোষ্ঠী সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, ব্যষ্টিই ব্যক্তিগত অহংকারই হইয়া পড়িতেছে চরম সাধনা ও সিদ্ধি।

নিজেরই মধ্যে নিজে মানুষ সম্পূর্ণ নয়, অন্ততঃ এই সম্পূর্ণতার প্রকাশের, বাহিরে খেলার জন্য চাই অপরের সংসর্গ। একায় ভোগ হয় না, শক্তিরও ভোগ হয় না, ভালবাসারও ভোগ হয় না। কিন্তু দুইএর সংসর্গে প্রথমে চাগিয়া উঠে সংঘর্ষ। কারণ, বাধা পাইয়াই মানুষ প্রথমে আপনার সম্বন্ধে সচেতন হয়, এবং আপনাকে বেশী করিয়া পাইতে চায় বলিয়া সম্মুখে একটা বাধাকেই সজীব করিয়া রাখার মধ্যে মানুষের এত আনন্দ। এই রকমেই সে নিজের নিজত্ব ও সামর্থ্য অনুভব করে, ফুটাইয়া তোলে। তাই মানুষ দেখি সংঘ সমাজ গড়ে যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য। কিন্তু এটা একটা বিশেষ স্তর মাত্র, একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা মাত্র। কিছু অগ্রসর হইলে, কিছু জ্ঞান হইলে আমরা দেখি, আমরা বুঝিতে পারি, নিজের নিজত্ব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাধার দরকার নাই; পর হইতে পৃথক্ বোধ করিবার, পরের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাইবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আরও অগ্রসর হইলে, আরও জ্ঞান হইলে, দেখি স্বাতন্ত্র্য অর্থে সংঘর্ষ ত নয়ই নয়, স্বাতন্ত্র্যেই শ্রেষ্ঠ মিলন; সমাজের, সংঘের মধ্য দিয়াই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। পরের মধ্যে আমাকে দেখি ও আমার মধ্যে পরকে দেখি বলিয়া পরস্পরের লেনাদেনা যখন সরল সহজ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত হয় তখনই প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ শক্তি খেলিয়া উঠে।

এই একাত্মতায় যখন পৌঁছি তখন প্রত্যেক এককের মধ্যে দেখি নিজেরই শক্তির, নিজেরই সামর্থ্যের প্রতিরূপ; আমার কর্ম্মের দ্বারা আমার নিজের কর্ম্ম ত উপচিত হইতেছেই, পরের কর্ম্মও উপচিত হইয়া চলিয়াছে, আবার অপরের কর্ম্ম কাহার কর্ম্মকে উপচিত করিয়া আমারই কর্ম্মকে উপচিত করিতেছে। মানুষের ভোগ-সামর্থ্যের অনুযায়ী রসদের অভাব যে পৃথিবীতে আছে তাহা নয়, অভাব শুধু রসদের যথাযথ ভাগবাটরা বা বিলি বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত ঠিক-মত যে হয় না, তাহার কারণ মানুষের একটা অমূলক আশঙ্কা, একটা অধীর ত্বরা, প্রাণের ও মনের ভাসাভাসা আবেগ। সামর্থ্য যতখানি বা প্রয়োজন যতখানি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আমাদের আকাঙ্ক্ষা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে; হজম যতখানি করিতে পারি না, গ্রাস করিতে চাই ততখানি।

অনেকে হয় ত আশঙ্কা করিবেন এই একাত্মতার ফল হইতেছে একাকার; অতিবৃদ্ধি ও অতিশয়ের হাত এড়াইতে গিয়া মানুষ হইয়া পড়িবে অতি সাধারণ (mediocrity)। কিন্তু তাহা হয় শুধু যখন বাহিরের আইন কানুন বিধি নিষেধের জোরে এই একাত্মতা স্থাপন করিতে আমরা চেষ্টা করি। গোড়া হইতে, প্রত্যেক মানুষ হইতে সংঘশক্তি গড়িবার চেষ্টা না করিয়া আমরা উপর হইতে একটা কেন্দ্রগত সংঘশক্তি হইতে সমাজকে মানুষকে গড়িতে বা চালাইতে চেষ্টা করি। Socialismএর ভুল এইখানে যে সে বাহির হইতে একটা কেন্দ্রগত শক্তির চাপে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সাম্য ও মিলনের চেষ্টা করিতেছে। আমরা বলিয়াছি কেন্দ্রগত সমাজশক্তি ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে লেনাদেনার ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ঐ সমাজশক্তি দিয়া ব্যষ্টির লেনাদেনা নিয়মিত বা পরিচালিত করিতে না গিয়া, করা উচিত ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে লেনাদেনার ধরণের পরিবর্ত্তন, যাহাতে সমাজশক্তি পায় একটা নূতনতর উচ্চতর মূর্ত্তি। এই ভাবে ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি হইতে যখন আরম্ভ করি, ব্যক্তির ব্যষ্টির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের সাহায্যেই সমাজকে গড়িয়া উঠিতে দেই, তখন দেখি সমাজ একাকারও নয়, অতি-সাধারণও নয়, তাহা বহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাই স্বাভাবিক। আর সে সমাজ যে প্রতিযোগিতা বা নামমাত্র সহযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে এমনও কোন কথা নাই। মানুষ সমাজ গড়িয়াছে পরের সহিত মিলিবার জন্য, পরের মধ্যে থাকিয়া আপনার ও পরের শ্রীকে বিভূতিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য; পরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নয়, পরের উপর আপনার প্রভুত্ব খাটাইবার জন্য নয়। এই শেষোক্ত পন্থায় যতদিন চলিয়াছে ততদিন তাই তাহার প্রকৃত ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে নাই, ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা, তাই প্রকৃত সমাজ, প্রকৃত সঙ্ঘ, প্রকৃত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইবার জন্য তাহার সাময়িক সমাজ সঙ্ঘ গোষ্ঠী সব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির টানে তাই সে দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ছাড়াইয়া আর-একটা বৃত্তি আর-একটা প্রেরণার আশ্রয় লইতে চলিয়াছে।

(নারায়ণ) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

—

দেশের কথা।

আমাদের প্রথম কাজ কৃষককে বাঁচান। বাঙ্গালী কোন দিন না খাইয়ে শুধু খেয়ে তৃপ্ত হয়নি। আবার আমরা সায়েস্তা খাঁর সে স্বচ্ছলতার দিন ফিরিয়ে আনতে চাই। পল্লীতে ফিরতে হবে—নূতন পল্লী গড়তে হ'বে। যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, অথচ অর্থ নিয়ে কি করতে হবে ভেবে পান না, এ কাজ তাঁদের, দেশের শিক্ষিত কৃতী সন্তানদের দিয়ে কাজ করাবার ভার তাঁদের উপর। পূর্ব্ববাংলার ঘাড়ে যার সূচনা হয়েছে, মঙ্গলময়ের সেই ইঙ্গিতকে বাংলার সর্ব্বত্র বুঝে কাজ আরম্ভ করবার সুযোগ এসেছে। দেশভক্ত ধনকুবের যাঁরা, তাঁরাই দেশের শত হেমসেদ্‌নগর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাঁরাই এক দিন সেই তাম্রলিপ্তির বিলুপ্ত নাম আবার জগতে ঘোষণা করতে পারেন। কর্ম্মীর ডাক পেলেই দেশভক্ত যুবকের দল দলভুক্ত হবে। জ্ঞান-ভক্তির উভয় তীর প্লাবিত করে কর্ম্মনদীতে বন্যা আনবার এই যুগ। ধনকুবেরের স্থান রাজধানীর বাইরেও অসংখ্য মাতৃপূজার অসংখ্য উপকরণ জোগাবে, রাজধানীর ভিতর বদ্ধ থাকলে চলবে না—ধনঞ্জয়ের পাশুপত অস্ত্রে এক ধনকুবের-সঞ্চিত পাশ্চাত্যরাশির মত মাতৃপূজার মন্দিরে ধনরত্ন স্তরে স্তরে স্তরে উঠবে। প্রতিকারের এই নূতন পথ।

(নারায়ণ) শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার।

—

হিন্দু সমাজে নারীর স্থান ও শিক্ষা।

পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকেই দুই দিক্ হইতে দেখা যায়—এক স্বানুভবের (subjective) দিক হইতে, আর এক পরানুভব বা বাস্তবের (objective) দিক হইতে। এই দুই দিক দিয়া যখন কোন জিনিসকে দেখা যায়, তখনই জিনিসটিকে পুরাপুরি ভাবে দেখা হয়; নতুবা দেখা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

আমাদের দেশের নারীজাতির বিষয় আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কেবল এক দিক দিয়াই চিন্তা করিয়া থাকি। কাজেই আমাদের চিন্তার কোথায় অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায় তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যখনই আমরা তাহাদের বিষয় আলোচনা

করি, তখনি কেবল স্বানুভব (subjective) ও উপযোগিতার (utility'র) দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া থাকি ; অর্থাৎ ইহাই ভাবি যে, সে উন্নতিতে আমাদের স্বার্থের যোগ কতটুকু, প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধ কতখানি। আমাদের প্রেয়সাধনে অয়ানবদনে আত্মবলিদানেই নারীজীবনের চরিতার্থতা, কাজেই কিরূপ শিক্ষা দিলে তাহারা আরও সুন্দররূপে, গভীরতর ভাবে আমাদের সুখোৎপাদন করিতে প্রয়াসী হইবে, অলক্ষ্য ভাবে অন্তরে এই ধারণা লইয়াই ত আমরা চিরকাল নারীর শিক্ষা ও উন্নতি কামনা করিয়া আসিয়াছি। নারীর শুচিতা, সতীত্ব ও পবিত্রতার কথাও যখন ভাবিয়াছি, তখনও তাহা স্বামিত্ব-প্রতীতি ও নিজস্ব-জ্ঞানের দিক হইতেই ভাবিয়াছি। কিন্তু নারীর শিক্ষা, নারীর উন্নতি নারী-জীবনের দিক দিয়াও যে কতখানি আবশ্যক, আমাদের মন সে চিন্তাকে চিরদিনই এড়াইয়া আসিয়াছে।

এই যে স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য ও স্ত্রী-জাতির উচ্চশিক্ষার কথা উঠিলেই আমরা ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় আঁৎকাইয়া উঠি এবং "It is not wise to implant in girls, by means of education, tastes which they would not have an opportunity to gratify in their after-life, and thus sow the seeds of future discontent and discord"...(১) প্রভৃতি বড় বড় যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়া হিন্দুনারীসমাজের প্রতি দরদ দেখাই তাহা কি সত্য-সত্যই নারীজীবনের শুভাশুভের দিকে তাকাইয়া দেখাই, না সেই স্বামিত্ববোধের দিক দিয়া ও সমাজ-জীবনে স্বার্থের যোগসূত্রের দিকে তাকাইয়া ? এ প্রশ্ন আমাদের কোন দিন মনে হয় নাই যে, যে শিক্ষা আমরা নিজে অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে পারি এবং নিঃসঙ্কোচে বালকগণকে দিতে পারি, নারীজাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার আমাদের আছে কি না ; এবং সে শিক্ষা দিলে যে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে, নৈতিক বন্ধন শিথিল হইবে এবং পারিবারিক জীবনের শুচিতা নষ্ট হইবে ইত্যাদি ভাবিবার অধিকার কেবল পুরুষের উপরই আছে কি না।

যদি আমাদের এ বিশ্বাস থাকে যে, সমাজের শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার একা পুরুষেরই আছে, তাহা হইলে সে বিশ্বাসের মূলে সত্য ও নিরপেক্ষ বিচার আছে কি না তাহাও দেখা আবশ্যক। আর যদি সে অধিকার আমাদের নাই স্বীকার করি, তাহা হইলেও ভাবিতে হইবে, যে জন্মজাত অধিকার ও প্রকৃতি-গত প্রাপ্য হইতে কোন মানবকেই বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই, নারীজাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া আমরা সমাজের কি অকল্যাণ সাধন করিয়াছি এবং মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের নিকট কি অপরাধ করিয়া আসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার নানা দোষ সত্ত্বেও যখন তাহার প্রভাবে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয়ত্বের বহু বিকাশ হইয়াছে আমরা স্বীকার করি, তখন সেই শিক্ষায় যদি নারীত্বের বিকাশ হইবারও সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সাময়িক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় সে শিক্ষালাভ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না তাহাও চিন্তার বিষয়।

স্বীকার করি যে, যাহারা বহু যুগ হইতে আপনাদের সত্তা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য পুরুষের সত্তায় ও ইচ্ছায় বিশাইয়া দিয়া আসিয়াছে এবং আত্মশক্তি স্ফুরণের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া পুরুষের প্রেয়সাধনকেই স্বীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়সাধন ও চরম পরিণতি জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে অকস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিতে ও নবতর যাগরণে উদ্বুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরের বদ্ধ বাতাস হইতে বাহিরের মুক্ত বাতাসে আনয়ন করিলে তাহারা একটু বেশী অসংযত ও অস্বাভাবিক ভাবেই ক্রিয়াশীলা হইয়া উঠিবে এ সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও "অধিকতম জনের প্রভূততম কল্যাণ"-এর দিকে তাকাইলে সে অপকার তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়।

তাহার পর নারীর মর্য্যাদা, নারীর শুচিতা ও পবিত্রতা যে শুদ্ধ পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণের উপর এবং সামাজিক কঠোরতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহা বিশ্বাস করাও ত গৌরবের বিষয় নহে। যাহাকে আমরা নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পাতিব্রত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, তাহা যথার্থই পাতিব্রত্য, না একটা নিরবচ্ছিন্ন দাসীত্ব ? যে সেবায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মদান নাই, যে বিসর্জ্জনে আত্মমর্য্যাদায় মহনীয়তা নাই, যে নিষ্ঠায় প্রাণস্পর্শ নাই, তাহাকে দাসীত্ব বই আর কি বলিতে পারি ? আমরা নাটকে নভেলে, পুরাণে আখ্যানে, সাহিত্যে ইতিহাসে সতীধর্ম্ম ও পাতিব্রত্যের যে চিত্র আঁকিয়া আসিয়াছি, তাহা-দ্বারা কি আমরা নারীজাতিকে বিবর্ত্তন-ধারার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শের দিকে এবং নারী-ধর্ম্মের নবতর বিকাশের দিকে লইয়া যাইতেছি, না দিন দিন নারীর অধিকার, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নারীর মর্ম্মগত ধর্ম্ম ভুলাইয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বামীর প্রেয়সাধনের দ্বারা এবং এই দাসীত্ব-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া জীবনের চরিতার্থতা উপলব্ধি করিবার একটা অন্ধ প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতেছি ? আমাদের সমাজের বালবিধবা ও কুলবধূদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি কিরূপে আমরা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক গতি প্রবৃত্তি ও শীলতাকে নিদারুণ ভাবে অস্বীকার করিয়া, নারীর স্বতন্ত্র সত্তাকে নির্ম্মম ভাবে দলিত করিয়া, শুদ্ধ পুরুষের সুখসাধনে এবং নির্ব্বিচারে তাহাদের অনুগমন-চেষ্টায় তাহার সকল শক্তি পর্য্যবসিত করিতে শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি না যে, এইরূপে আমাদের লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমরা যতই নারীজীবনের গূঢ়তর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইতেছি, আমাদের সমাজ-জীবনও ততই পদে পদে ব্যর্থ হইয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। এই অন্ধ নির্ভরশীলতা এই প্রাণহীন আত্মোৎসর্গ (self-abnegation) কি নারীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে ? ত্যাগের দিক দিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে ইহা বরণীয় ও মহনীয় ; কারণ, সে ক্ষেত্রে ইহা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আনন্দদানের স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত ; কিন্তু একটা জাতি হিসাবে একটা সমাজ হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে, এই ত্যাগ ও আত্মদান যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত (out of free-will) হইবে তাহা আশা করা কি সমীচীন ? না সেই অনিশ্চিত আশার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে বিধিনিষেধের বন্ধনে বাঁধিয়া প্রথা হিসাবে গ্রহণ করা দূর-দর্শিতার পরিচায়ক ? যাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব, তাহা সমগ্র জাতির পক্ষেও সম্ভব, এরূপ বিশ্বাস করিয়া কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে তাহার যে বিষময় ফল হয়, তাহা ত সতীদাহ প্রথার পরিণাম হইতেই আমরা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিয়াছি। নারীদের ভিতরও যে একটা আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং একটা প্রবল নৈতিক শক্তি রহিয়াছে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই ; কাজেই আমরা ধারণাও করিতে পারি না যে, উচ্চশিক্ষা-প্রভাবে সেই মর্য্যাদাজ্ঞান ও আত্মশক্তিকে স্ফুট-তর করিলে, আপনা-আপনি তাহাদের ভিতর হইতে যাহা অসুন্দর যাহা কুৎসিত ও নিন্দার্হ তাহার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারা নির্ভীক চিত্তে সমাজের সহস্র কদর্য্যতা সহস্র প্রলোভনের মধ্য দিয়াও আপনাদের শুচিতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিবে। প্রবাসী দেশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক

(১) Calcutta University Commission Report, 1917-19, Part I, Vol. II, Chap XIV, p. 54.

তোকভিল (A. D. Tocqueville) তাঁহার "Democracy in America" নামক পুস্তকে আমেরিকার রমণীগণের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া এই কথাটি বড় সুন্দর রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"And instead of inculcating mistrust of herself, the Americans constantly seek to enhance their confidence in her own strength of character. As it is neither possible nor desirable to keep a young woman in perpetual complete ignorance, they hasten to give her a precocious knowledge on all subjects. Far from hiding the corruptions of the world from her, they prefer that she should see them at once and train herself to shun them."

ইহাতে হয় ত অনেকে বলিবেন, হিন্দু রমণীকে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিতা করিলে বা তাহাকে স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ করিলে আমাদের সমাজের সনাতন আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহারা ক্রমশঃ স্বৈরিণী হইয়া পড়িবে,—ফলে স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি নারী-জাতির যে-সমস্ত সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি পারিবারিক জীবনকে মধুর করিয়া রাখে, সে সকলগুলিই প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইবে, সমাজ-জীবনে একটা বিরোধ ও বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু একটু ধীরভাবে উদার ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বস্তুতঃ তাহাতে সে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। কারণ, সামাজিক বিপ্লব-সৃজন ও দ্বন্দ্ব-বিরোধই মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; যুগ-ধর্ম্মের উপযোগী করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে যাইয়া যদি একটু চঞ্চল ও অসংযত হইয়া পড়ে, তথাপি অচিরকাল মধ্যে তাহাকে শান্তি ও শৃঙ্খলার দিকে আসিতেই হইবে। পুরুষ বা স্ত্রী, সমাজ-জীবনে কেহই স্বপর্য্যাপ্ত নহে। প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়াই প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই প্রত্যেকের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি এবং প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মদানের ভিতর দিয়াই প্রত্যেক জীবনের সার্থকতা। তাহার উপর, যাঁহারা ধাত্রীর মত মানবসমাজকে অনাদিকাল হইতে বিনিদ্র ভাবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে সমাজে অকল্যাণ ও অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই—ধারণা পোষণ করা কি যুক্তিসঙ্গত? বরং যাঁহারা রক্ষণী ও পালনী শক্তিরূপে মানব-সমাজকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এবং নবতর জাগরণে জাগরিত হইলে, সমাজকে সুন্দরতর, প্রিয়তর এবং মধুরতর করিয়াই তুলিবেন।

একটি কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, স্ত্রী ও পুরুষ সমাজ-শরীরের দুইটি অঙ্গ। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও সমোন্নতি (harmonious growth) সাধন করিতে হইলে এই উভয় অঙ্গের ভিতর সর্ব্ববিষয়েই একটা ঐক্য ও একটা সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক, নতুবা অঙ্গবিশেষের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন দ্বারা সমাজকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা কীলকবদ্ধ তরণী চালন-প্রয়াসের ন্যায় বাতীয় মনের প্রতিভা ও শক্তির অপচয় মাত্রই হইবে, তাহাতে সমাজের উন্নতি বা লাভ কিছুই হইবে না। যাঁহারা গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মনীষিণীদিগের শিক্ষালাভ প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা দিবার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন—

We do not want.....that women in India should be steadily Anglicised, importing into our peaceful homes,,,the spirit of revolutionary and rationalistic iconoclasm, condemning all our ancient institutions that are the outcome of a long past, and a part of our flesh and blood, as it were.[1]

তাঁহাদিগকে আমি তাৎকালিক শিক্ষা-প্রণালী ও পারিবারিক জীবন-ধারার দিকেও লক্ষ্য করিতে বলি। বর্ত্তমান যুগেও যদি আমাদের যুবক ও বালকদিগকে ভারতের চিরন্তন প্রণালীতে শিক্ষিত করিয়া ভারতীয় আদর্শে তাহাদিগের পারিবারিক জীবন-ধারা গঠিত করিবার সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য প্রণালীতে উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা দিবার কোন কথাই উঠিত না। কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, তখন নারীজাতিকে এক স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে বা সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শে তাহাদিগকে গঠিত করিবার চেষ্টা করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে পারিবারিক জীবনে বিরোধ ও পার্থক্য দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে স্ত্রীজাতিকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাহা তাহাদের ভিতরে স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও আত্মপ্রত্যয়-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে কালোপযোগী করিয়া তুলে, এবং তাহারা নিজেদের অধিকার প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া, আমাদের অনুগ্রহ-দত্ত শিক্ষালাভে ও এই দাসীত্বধর্ম্ম পালনে তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া নারীজীবনের চরম পরিণামের মহত্তী সম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া স্বেচ্ছায় অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে পুরুষের প্রেম-সাধনে আত্মদান করে ও মঙ্গলমূর্ত্তিরূপে আমাদের পারিবারিক জীবনে দেখা দেয়।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন) শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

—

নারী-সমস্যা।

নারীর অন্তঃসলিলা কর্ম্মচেষ্টাই পুরুষের বহিঃ-প্রকাশিত কর্ম্ম-প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ,—সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষেত্রেই।

সাহিত্যের দিক্ দিয়া,—বুদ্ধি এবং হৃদয়ানুভূতি-প্রয়োগে নারী-প্রকৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পুরুষ জাতি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী অস্পষ্টতার কুজ্ঝটিকাজাল অপসারিত করিয়া, পরস্পর মানস-অনুভূতি বোধগম্য করিয়া, প্রকৃতির সত্য পরিচয় লাভার্থই উপন্যাসরাজ্যে আজকাল মহাধুম বাধিয়া গিয়াছে।

নারী-প্রকৃতি ততটা জানিব বা জানিতে চেষ্টা করিব, যতটায় তাহাদের পাওয়া সহজ হয়,—এ ত' অংশ-জ্ঞানের চেষ্টা। পূর্ণজ্ঞান তাহাই, যাহার দ্বারা নারী-প্রকৃতির মধ্য দিয়া সাহিত্য একটা নারীর জাতিত্ব গঠন করিতে পারিবে, চরিত্রলাভ-সাধনার পথ-নির্দ্দেশে সমর্থ হইবে। সেই creative সাহিত্য যাঁহারা গড়িবেন, তাঁহাদেরই সাহিত্য সাধনা সিদ্ধকাম,—ফলপ্রসূ।

তাঁহারা যাইতে চাহিবেন অভিজ্ঞতা ও আদর্শ এতদুভয়কে লইয়া গঠিত একটি নূতন পথে। লক্ষ্য হইবে,—নারীর পরিবর্ত্তন;—অবস্থার নহে, স্বভাবের। স্বভাবটিকে গড়িয়া না তুলিয়া, বাহিরের দিক হইতে কেবল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা কাহারই কখনও অবস্থার চিরস্থায়ী পরিবর্ত্তন হয় নাই। নারীরও অসম্ভব। নারী না উন্নত হইলে নারীর অবস্থারও উন্নতি হইবে না।

---

[1] C. U. Commission Report, 1917-19. Chap. XIV, Para 13.

প্রধান বাধা, নারী আপনার দিক্ হইতে এখনও এ কথা বুঝিতে পারে নাই ;—তাহারা চোখে এখনও বেশই ঝাপ্‌সা দেখে। উন্নত হইবার ইচ্ছা জাগিবার মত উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এখনও তাহারা লাভ করে নাই। সে নিজের দিক হইতেই তাহাকে তুলিবার, তাহাকে সবল স্বচ্ছন্দ করিয়া দিবার সকল চেষ্টাকেই প্রতিরোধ করিতেছে। সে রক্ষণশীল। একদিকে জীবন-সমস্যা তীব্র হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া, আমাদের সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কালোপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে প্রচণ্ডবেগে তাগিদ করিতেছে ; অপর দিকে নারীর জড়ত্ব সমাজের রক্ষণশীলতার অবস্থান-দুর্গ হইয়া, আমাদের মুখ থুবড়িয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। সমাজ অচল—নারী তাহার চরণের শৃঙ্খল বলিয়া। সমাজ নিস্পন্দ—নারী তাহার বক্ষে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে বলিয়া!—এত অস্বাভাবিকতা প্রকৃতির অসহ্য। স্বাধীন, উন্নতচিত্ত পুরুষের কাছে বিবাহিত জীবনটাই অশ্রদ্ধার বস্তু—ইহাই আজ সমাজ-বিপ্লবের সুস্পষ্ট পূর্ব্ব-লক্ষণ।

সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, নারীর অধীনতায় পুরুষ যে কেবল কতকগুলি অপ্রতিহত অধিকার ভোগ করিতেছে,—ষোল-আনাই যে তাহার সুবিধা,—সে ঠিক্ নহে। অধীন থাকিয়া, সর্ব্ব-প্রকারেরই দায়িত্ব ও ভারমুক্তা নারী পুরুষের ঘাড়ে বিলক্ষণই ভার চাপাইয়া দিয়া বসিয়া আছে।

এ কি হাসির কথা নয়? হেঁসেলটা, ভাঁড়ারটা, একাদশীটা, এগুলাকেই চিনি,—আপনাকে চিনি না। এগুলা কি আপনার জন্যই নয়? আপনারই জন্য এগুলা, আর আপনি বলিতে এইটি,—এই ভাব, এই আশা, এই রুচি, এ যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখনই ঘর করা সার্থক হইবে। আপনারই জন্য প্রাণেশ্বরের-পাতিয়া-দেওয়া আমার এই চির-আপন ঘরে, যেথায় তিনি আমায় গৃহিণী রূপে দেখিতে চান, সেথায় ভূতগ্রস্তার মত দাসীপনা করিয়া মরিতেছি।—এ কেমন সংসার? কাহার মনোরঞ্জন?

নারী-সমস্যার সমাধান সেই দিনই হইবে,—নারীর জীবনে একটা স্বাধীন ব্রতের স্বাধীন অনুষ্ঠান সেই দিনই হইবে, যে দিন নারী বুঝিবে আপনাকে সমগ্ররূপে ;—পাইবে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে। ইহারই নাম প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা। নারী-সমস্যার সমাধান-চেষ্টা যতদিন গোঁজামিল ব্যাপার, সমাধান-ফলও ততদিনই অধিনীর ডিম্ব-প্রসব। সব মিথ্যা, সব হুজুগ। স্থায়ী ফল আকাশকুসুম।

(ভারতবর্ষ, আশ্বিন) শ্রীসত্যবালা দেবী।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা।

সমগ্র ভারতে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ১৩১৭১২, তন্মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে ২৭৪৭০টি স্কুল এবং উহাতে ১০২৮৪৮৪ ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে। ভারতের সমগ্র প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৫৪২৭৮৫০ ; ইহার মধ্যে ৫,৫৯৮৩১টি বালিকা ছাত্রী আছে। ইংরেজী মিডিল ও হাই স্কুলের সংখ্যা সমগ্র ভারতে মোট ৭৪৩৩ এবং ছাত্রসংখ্যা ১০৯৭৯২২ ছিল। টেক্‌নিক্যাল ও ইণ্ডষ্ট্রিয়ল স্কুল ১৯৮টি এবং শিক্ষার্থী ১১৭১৩ জন ছিল। আর্ট স্কুল ৯টি, ছাত্রসংখ্যা ১৪১১; মেডিকেল স্কুল ২৪টি, মেডিকেল কলেজ ৫টি এবং পশু চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ৪টি স্কুল ছিল। ল-কলেজ ২২টি ও ছাত্রসংখ্যা ৪৪৭৬ ; কমার্শিয়াল স্কুল ৬১টি, ইহার মধ্যে তিনটি গবর্ণমেণ্টের, অন্যগুলি প্রাইভেট। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি হইয়াছে) এবং ১৯৫টি কলেজ। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে বালিকা ছাত্রীসংখ্যা ৪৪০৪৭০ ছিল আর ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১০৭৮৭৩১ হইয়াছিল। আমাদের শিক্ষা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে।

সমস্ত সভ্যদেশের শিক্ষার সহিত ভারতের শিক্ষার তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহাদের সম্মুখে এ শিক্ষা অতি অল্প, তুচ্ছ। প্রত্যেক দেশের শিক্ষার একটা মোটামুটি হিসাব এইরূপ :—

দেশ	ছাত্রসংখ্যা,	প্রতিছাত্রের মাসিকব্যয়	ছাত্রের বয়স	দেশের জনসংখ্যা
আমেরিকা	১,৬৮,০০,০০০	৪·০	৮ হইতে ১৬	৮,২০০০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৭৮,০০,০০০	৩·৬	৭ ,, ১৪	১,৫০,০০,০০০
সুইজারল্যাণ্ড,	৫,০২,০০০	৩·২	৬ ,, ১৪	৩৫,০০,০০০
যুক্তরাজ্য,	৭৫,০০,০০০	৩·০	৫ ,, ১৪	৪,৪২,০০,০০০
নাটাল,	২৬,০০০	৩·০	৬ ,, ১৪	৫,৪৪,০০০
জর্ম্মনী,	৯০,০০,০০০	২·৭	৬ ,, ১৪	৬,৫০,০০,০০০
ছয়টি দেশের ছাত্রসংখ্যা	৪,১৬,২৮,০০০		জনসংখ্যা	২০,০২,৪৪,০০০
সমগ্র ভারতের ছাত্রসংখ্যা	৫৪,৪৭,৮৫০০·২৫		জনসংখ্যা	৩১,৫০,০০,০০০

১৯১৪—১৫ খ্রীষ্ট-অব্দে যে-সকল বালক বালিকা স্কুল যাইবার উপযুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে শতকরা ৩৩·৯ জন বালক এবং ৬·৩ জন বালিকা বিদ্যালয়ে যাইত। ভারতের প্রধান প্রদেশের শিক্ষার হিসাব এইরূপ :—

	ছাত্রসংখ্যা		ছাত্রীসংখ্যা	
বোম্বাই	,,	৩৬·২	,,	৭·৪
বঙ্গদেশ	,,	৪০·৯	,,	৬·৮
মান্দ্রাজ	,,	৩৩·১	,,	৭·৪
বিহার ও উড়িষ্যা	,,	২৬·০	,,	৩·৪
যুক্তপ্রদেশে	,,	১৭·৪	,,	১·৫

ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি ; এবং কলেজ প্রায় ১৫০টি। আমেরিকার জনসংখ্যা প্রায় নয় কোটী। এই অল্প জনসংখ্যার শিক্ষার জন্য সেখানে ৫২৫ কলেজ আছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য ১৯১৫ অব্দে ১১টি এবং বর্ত্তমানে ১৭টি কলেজ আছে, আমেরিকায় কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের জন্য ১৫০ কলেজ আছে। ভারতে ১৪০৩ জন স্ত্রীলোক কলেজে শিক্ষা পাইয়া থাকেন, আর আমেরিকায় ১৭৩৩৭ জন স্ত্রীলোক কলেজের ছাত্রী। আমেরিকায় ৪,৩৪,৪৮০ জন স্ত্রীলোক স্কুলের ছাত্রী, আর ভারতে ৯,৯৬,৩৪১ জন স্ত্রীলোক আঁকা বাঁকা অক্ষরে কোনরূপে পত্রাদি লিখিতে ও ধোপার হিসাব রাখিতে সক্ষম।

"ভারতের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮০০০ ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে ; আর আমেরিকায় কেবলমাত্র ২৪০০০ প্রফেসার আছে।" ভারতে এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকেন ; আর দশলক্ষের মধ্যে একজন প্রকৃত বিজ্ঞানবেত্তা পাওয়া যায়। আমেরিকা ও জর্ম্মনীর অল্পবয়স্ক বালকগণ ভারতের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-বেত্তাগণের অপেক্ষা বিজ্ঞানবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। রুষ ব্যতীত ভারতের জনসংখ্যা সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকার জনসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক ; এই জনপূর্ণ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় মোট আটটি ; অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এইরূপ :—

ইংলণ্ড (U. K.)	জনসংখ্যা	৪১০ লক্ষ	বিশ্ববিদ্যালয়	১৯ টি
জর্ম্মনী	,,	৬৪৫ লক্ষ	,,	২১ টি
ইটালী	,,	৩২০ লক্ষ	,,	২১ টি
ফ্রান্স	,,	৩৯০ লক্ষ	,,	১৫ টি
আমেরিকা	,,	৮৫৮ লক্ষ	,,	১৪০ টি

পাঁচটি সভ্যদেশের জনসংখ্যা ২৬২৩ লক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ২১৭টি কেবল মাত্র ভারতের জনসংখ্যা ৩১৫০ লক্ষ আর বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ৮টি, তাহার মধ্যে দুইটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য, শক্তি, দেশসেবা, পরোপকার প্রভৃতির উপরও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। "ভারতবর্ষে শতকরা ৫০ জন ছাত্রের পরিপাক-শক্তি না থাকায় তাহাদের আহারে রুচি থাকে না এবং ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া শতকরা ২৫ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়; ভারতবর্ষের ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের দশা এমনি শোচনীয়।" আমাদের দেশের পূজ্য নেতাগণের স্বাস্থ্যবিবরণ এইরূপ :—ধর্ম্মাচার্য্য স্বামীবিবেকানন্দ ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন; জষ্টিস দ্বারকানাথের মৃত্যু ৩৯ বৎসর বয়সে হইয়াছিল; ৪২ বৎসর বয়সে সাহিত্যরত্ন দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু হয়; ৪৯ বৎসর বয়সে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়; ৪৬ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস পাল, ৪৯ বৎসর বয়সে কৃষ্ণস্বামী ঐয়ার, ৪৮ বৎসর বয়সে বিচারপতি তৈলঙ্গ এবং ৪৯ বৎসর বয়সে মহাত্মা গোখলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কি শোচনীয় হৃদয়-দ্রাবক দশা! ভাল করিয়া দেশের সেবা করিবার পূর্ব্বেই, এই মহৎহৃদয়গুলি অকালে কালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল! অপরিণত বয়সে অপরিমিত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য এবং আয়ু উভয়ই নষ্ট হইতে থাকে, একথা কে অস্বীকার করিবেন?

এইবার পাশ্চাত্য জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। ডারুইন তাঁহার প্রসিদ্ধ Origin of Species নামক পুস্তক ৫২ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন, লর্ড কল্‌ভিন ৭৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌এর বয়স ৮০ বৎসর, তিনি যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক এডিসনের বয়স এখন ৬৯ বৎসর, তিনি বলেন আমি আরও দুইশত বৎসর বাঁচিব। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি যে-পরিমাণে কার্য্য করিতেন, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ করিয়া থাকেন।

(পরিচারিকা, আশ্বিন) শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

—

অন্নসমস্যা।

পাট আমাদের প্রধান পণ্য। নিম্নস্থ তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে গত পাঁচ বৎসরে আমরা পাট বিক্রয়ে কত ক্রোর টাকা লোকসান দিয়াছি, অধিকন্তু কত ক্রোর টাকা অধিক ব্যয়ে ভিন্ন দেশ হইতে বস্ত্র খরিদ করিতেছি।

	রপ্তানি—পাট		আমদানী—
বৎসর	মূল্য		বস্ত্র ও কার্পাসসূত্রের প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষের মূল্য।
১৯১৩-১৪	৩০,৮২,৬৫,০০০	টাকা	
১৯১৪-১৫	১৩,৯১,০২,০০০	,,	৫৪,২৮,৭৮,৫০০ টাকা
১৯১৫-১৬	১৫,৬৪,২০,০০০	,,	৪৮,৬৯,০৪,৫০০ ,,
১৯১৬-১৭	১৬,২৮,৮০,৫০০	,,	৬০,৩৭,৭৪,০০০ ,,
১৯১৭-১৮	৬,৪৫,৩৭,৪০০	,,	৬৩,৩৪,৩৫,০০০ ,,
১৯১৮-১৯	১২,৬২,০০,০০০	,,	৬৮,২৪,২০,৫০০ ,,

এই স্থলে প্রকাশ করা উচিত যে যদিও বস্ত্র ও কার্পাসসূত্রে অন্যান্য জিনিষের মূল্যের জন্য উত্তরোত্তর অধিক টাকা বিদেশে পাঠাইতেছি, অন্যদিকে ঐ বস্ত্রের পরিমাণ অনেক হ্রাস হইতেছে। অর্থাৎ জিনিষ দিন দিন কম আসিতেছে, কিন্তু মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের অতিপ্রয়োজনীয় মাত্র ধুতি ও শাড়ীর আমদানী ও মূল্যের তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি—

ধুতি ও শাড়ীর আমদানী

বৎসর	মাপ	মূল্য
১৯১৪—১৫	১০,৩০,৭৯,৪৪৬	১,৮৭,৯৮,৮১০ টাকা
১৯১৫—১৬	৫,১৯,৬৯,৫৪৯	১,৫৩,৪১,৩৪৫ ,,
১৯১৬—১৭	৬,৩৪,৯৬,১৮২	১,৪৫,৭৭,৭২০ ,,
১৯১৭—১৮	৪,১৬,২৯,৮৫৪	১,৩১,৫৫,৮৫২ ,,
১৯১৮—১৯	৩,৫৭,৯৬,৯৮৬	১,৭১,৮৯, ৫০ ,,

কোন্ সনে প্রতি টাকায় কত গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে তাহা বলিলে উপরোক্ত হিসাব অধিক পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যাইবে।

১৯১৪—১৫	প্রতিটাকায়	৫½ গজ
১৯১৫—১৬	,,	৫ ,,
১৯১৬—১৭	,,	৪ ,,
১৯১৭—১৮	,,	৩ ,,
১৯১৮—১৯	,,	২ ,,

(কায়স্থপত্রিকা, ভাদ্র) শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

—

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী।

প্রাচীন কালেও যে বাঙ্গালী স্বীয় দেশ হইতে বহুদূরে কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন শিলালিপি সম্যক্ আলোচনা করিলে সম্ভবতঃ তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি তিনখানি শিলালিপিতে আমি এইরূপ বিবরণ পাঠ করিয়াছি।

১। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাকতীয় বংশের রাজগণ মাদ্রাজের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই বংশের গণপতি-রাজ ৬২ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রুদ্রদেবী অথবা রুদ্রাম্বা নাম্নী তাঁহার কন্যা রুদ্রদেব-মহারাজ এই পুরুষ-নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ১২৬১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গন্তুর জিলার অন্তর্গত গন্তুর তালুকের অধীনস্থ মাল্‌কাপুরম্ নামক স্থানে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

লিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য গৌড় দেশের অন্তর্গত রাঢ়া প্রদেশের পূর্ব্বগ্রাম নামক স্থানের অধিবাসী, সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইনি ধর্ম্মশম্ভু নামক শৈব গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, কলচুরি-রাজ, ও চোল-রাজ এবং অন্যান্য রাজগণ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাকতীয়-রাজ গণপতি নিজেকে ইঁহার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল এবং বাঙ্গালা দেশের বহু শৈবাচার্য্য ও ঋষি কাকতীয়-রাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। লিপিখানিতে উক্ত হইয়াছে যে আজানু কর্ণভূষণ, কণ্ঠহার ও হেমকান্তি জটাধারী, প্রতিভা-দীপ্ত যুবমণ্ডল বিশ্বেশ্বর-শম্ভু যখন গণপতি রাজার প্রাসাদে বিদ্যামণ্ডপে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু বলিয়া গণ্য হইতেন। ১১৮৩ শকাব্দে (১২৬১ খৃষ্টাব্দে), রাণী রুদ্রদেবী আচার্য্য বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মন্দর ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম ও কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। মন্দর গ্রামে আচার্য্য কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপিত হয়। [illegible]

ঐ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ইহাকে "বিশ্বেশ্বর গৌলকী" নাম প্রদান করেন। কাকতীয় রাণীর নিকট হইতে তিনি যে ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ষাটটি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশিষ্ট সমান তিন ভাগ করিয়া, প্রথম-ভাগ শিব-মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, দ্বিতীয় ভাগ শুদ্ধ শৈবগণের মঠ ও ছাত্রগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এবং তৃতীয় ভাগ একটি মাতৃ-মন্দির, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি অন্নসত্রের ব্যয় বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। ঋক্ যজু ও সাম বেদ পড়াইবার নিমিত্ত তিন জন এবং ন্যায় সাহিত্য ও আগমের নিমিত্ত পাঁচজন অধ্যাপক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও একজন হিসাব-নবীশও নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাঁদের প্রত্যেকের নিমিত্ত দুই পুট্টি ভূমি বরাদ্দ ছিল। মন্দিরে দশজন নর্ত্তকী ও আটজন বাদ্যকর ছিল। মঠ ও অন্নসত্রে একজন কাশ্মীর-দেশীয় গায়ক, চৌদ্দজন গায়িকা, দুইজন নর্ত্তকী, দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন ভৃত্য, ছয়জন ব্রাহ্মণ ভৃত্য ও দশজন বীরভদ্র ছিল। এই বীরভদ্রগণ গ্রামের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত এবং গ্রামের রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে উদর জিহ্বা ও মস্তক কর্ত্তন করিত। এতদ্ব্যতীত বিশজন বীরমুষ্টি ভৃত্য ছিল। ইহারা শিবপন্থী, এবং স্বর্ণকার, তাম্রকার, কর্ম্মকার, রাজমিস্ত্রী, কুম্ভকার, স্থপতি, সূত্রধর, মাপিত ও শিল্পীর কার্য্য করিত। উল্লিখিত একাশী জন প্রত্যেকে এক পুট্টি করিয়া জমি পাইত। এতদ্ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য স্বীয় জন্মভূমি পূর্ব্বগ্রাম-নিবাসী ৩০ জন শ্রীবৎস-গোত্র ও সামবেদী ব্রাহ্মণকে তৎপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের আয়ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক পুট্টি জমি দান করিয়াছিলেন। অন্নসত্রে যাহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলেই সকল সময়ে আহারাদি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা ছিল। মন্দির, অন্নসত্র, মঠ ও গ্রাম—এই সমুদয়ের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এতদ্ভিন্ন নিজ বেতনে সর্ব্বোপরি একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই অধ্যক্ষ তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিলে, অথবা অন্য কোনরূপ কুব্যবহার করিলে, স্থানীয় শৈব সম্প্রদায় একযোগে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

উল্লিখিত মহদনুষ্ঠান ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য আরও নানা স্থানে মঠ, শিবলিঙ্গ ও অন্নসত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমি দান করিয়াছিলেন। নিজের নামানুসারে তিনি "বিশ্বেশ্বরনগর" নামক একটি নগর ও "বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ" নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার এই কর্ম্মবীর, সুদূর দাক্ষিণাত্যে গৌরবময় রাজগুরু পদে অভিষিক্ত থাকিয়া, এইসকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন করতঃ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

২। ঈশান শিব।

প্রাচীন পঞ্চাল দেশের অন্তর্গত, মুক্তপ্রদেশস্থ বদাউন নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে আর-একজন বাঙ্গালী শৈব সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাল দেশে কান্যকুব্জ বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ঈশান শিব নামক গৌড়দেশীয় একজন শৈব সাধক এই বংশের দশম রাজা অমৃতপালের গুরু এবং একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বৎসভার্গব গোত্রীয় এবং ভার্গব চ্যবন আপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এই পঞ্চ প্রবরযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সরসকদলীদণ্ডবৎ অসার সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত হন। কালক্রমে তিনি রাজগুরু ও মঠাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইয়া একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের বর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে যে, মহাদেব কৈলাসগমনে বিমুখ হইয়া ঐ মন্দিরেই বসতি করিতে এবং সূর্য্যদেব অবিরত আকাশমার্গে পরিভ্রমণে ক্লান্ত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য ইহার উচ্চচূড়ায় বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য ও ঈশান শিবের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় শৈব ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন।

৩। গদাধর।

আগ্রা জিলার অন্তর্গত বটেশ্বর নামক স্থানে প্রাপ্ত এবং চান্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের রাজত্বকালে ১২৫২ সংবতে (১১৯৫ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপির নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে আগ্রা-প্রদেশস্থিত একটি বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়।

"গৌড়াদ্বয়ৈক তিলকস্য গদাধরাখ্যো
লক্ষ্মীধরস্য তনয়ঃ কবিচক্রবর্ত্তী।
বিদ্যাবতাং স পরমঃ পরমর্দ্দিদেব
সংধানবিগ্রহ-মহাসচিবো বভুব॥
তস্মাত্মজো দেবধরঃ কবীন্দ্রঃ
প্রশস্তিমেতামতুলাঞ্চকার।
অস্যানুজো ধর্ম্মধরস্য ধীরঃ
কুতূহলাদ্বালকবির্লিলেখ॥

এই শ্লোকদ্বয় হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়দেশীয় লক্ষ্মীধরের গদাধর নামক এক পুত্র ছিল। ইনি কবি ও বিদ্বান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং চান্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবের সান্ধি-বিগ্রাহিক এই নামধেয় সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র দেবধরও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত লিপিখানি তাঁহারই রচনা।

যে সময় বাঙ্গালা দেশ উপযুক্ত রাজমৌতিজ্ঞের অভাবে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া যবনগণের পদানত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই একজন বাঙ্গালী সুদূর আগ্রা প্রদেশে সান্ধিবিগ্রাহিক নামক উচ্চ অমাত্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

—

প্রাকৃত ভাষা।

প্রাকৃত ভাষাকে প্রা কৃ ত বলা হয় কেন, ইহার উত্তরে আমাদের দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণিকেরা সাধারণত এই কথা বলেন যে, প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে হইয়াছে, সংস্কৃতই প্রাকৃতের প্র কৃ তি; তাই অর্থাৎ সংস্কৃতরূপ প্র কৃ তি হইতে হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম প্রা কৃ ত। "অথ প্রাকৃতম্॥ ...প্রকৃতিঃ, সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।" —হেমচন্দ্র, ৮, ১,১। "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং মতম্।"—প্রাকৃতচান্দ্রিকা। "প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ।"—প্রাকৃত-সঞ্জীবনী।

ইহার বিরুদ্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, এবং অনেকেই ইহা বলিয়াছেন, তাই সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার নাই। ভাষাতত্ত্ব-বিদেরা বলেন, সাধারণ লোকের যে প্রা কৃ তি ক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষা তাহাই প্রা কৃ ত। সংস্কৃতের মধ্যে অন্তত একখানি পুস্তকে এই মত দেখিতে পাইয়াছি; সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। রুদ্রট-প্রণীত কাব্যালঙ্কারের (নির্ণয়-

সাগর, ২,১২) টীকাকার নমিসাধু (১১২৫ বিক্রমাব্দ=১০৬৯ খ্রীঃ) বলিতেছেন :—

"সকলজগজ্জন্তূনাং ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজো বাগ্‌-ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ, তত্র ভবং, সৈব বা প্রাকৃতম্।"

জগতের সমস্ত জীবের যে স্বাভাবিক কথা বলা—ব্যাকরণাদির দ্বারা যাহার কোনোরূপ সংস্কার করা হয় নাই, তাহার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতিতে যাহা হইয়াছে তাহা প্রাকৃত; অথবা সেই প্রকৃতিই প্রাকৃত (অর্থাৎ প্রকৃতি শব্দের কেবল আকারগত ভেদ, অর্থত দুইই এক, তাদৃশ স্বাভাবিক কথা বলাই প্রাকৃত)।

(শান্তিনিকেতন, আশ্বিন)　　শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

—

বিলাতযাত্রীর পত্র।

৬

দক্ষিণ-ফ্রান্স,
Cap Martin,
Alpes Maritimes.

এখানকার যে-সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েচে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেইখানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে না, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকালবিহারী, তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান। এইখানেই পদে পদে ক্ষয়, এইখানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য—এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়। মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়—সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে, সেই হচ্চে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই। আধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চে না, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল স্বল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়—আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতচি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবী কাল বাধাগ্রস্ত, এই জন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাব্‌তে পার্‌চে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ কর্‌তে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে বোঝা যায়, যে-সকল পরিবার থেকে এই-সব ছাত্র আসে তারা ভাবের দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাব্‌চে, ছোট কর্ম্ম কর্‌তে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘরে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বদ্ধ হয় তাহলে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "কালোহ্যনবধিঃ" আমাদের পক্ষে সত্য নয়, "বিপুলা চ পৃথ্বী" সেও আমাদের কাছে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্ত্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ কর্‌তেই পারে না, সে আপনাকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এই অক্ষমতা এবং দুঃখদুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে, সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়—পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষ্যাপরতায় সেই শ্রদ্ধাহীনতা দেশের আত্মাবমাননাকে উদ্‌ঘাটিত কর্‌তে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বার বার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—আমরা দিব্যধামবাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমানকালকে ত্যাগ কর্‌তে পারে—এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহুলোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে, ভাবীর জন্যে বর্ত্তমানকে ত্যাগ কর্‌চে যে তার সংখ্যা নেই। সেইরকম অনেক লোককে দেখ্‌চি। যতই দেখ্‌চি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। এখানে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা—ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নৈব নৈবচ। কোনো রিফর্ম বিল্ আমাদের দুঃখমোচন করতে পার্‌বে না—আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচ্‌বে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগুসাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে?

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

২৮ আগষ্ট,—১৯২০।

(শান্তিনিকেতন, আশ্বিন)　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

ইস্‌লামে আল্লাহর স্বরূপ।

আল্লাহতা'লার স্বরূপ।

আল্লাহতালার স্বরূপ—ইস্‌লামী "আকিদা" বা ধর্ম্মবিশ্বাসের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। "আল্লাহ"র অর্থ—"পূর্ণ পবিত্র অনাদি অনন্ত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন—এবং সকল-অসম্পূর্ণতা-ও-সর্ব্বদোষমুক্ত!" তিনি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন ও থাকিবেন। তিনি স্থান কাল চিন্তা ও ধারণার অতীত—অনাদি অনন্ত ও চির-বিরাজমান, ইহাই ইস্‌লামের মূলমন্ত্র ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস।

আল্লাহতা'লার অবস্থান।

আল্লাহতালার অবস্থান সম্বন্ধে ইস্‌লামের বিশ্বাস এই যে, অবস্থান করিবার স্থান সম্বন্ধে আমরা যাহা চিন্তা ধারণা বা কল্পনা করিতে পারি, তাহা সমস্তই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কোনো ধারণা অনুযায়ী কোথাও অবস্থান করেন না।

সাধারণতঃ একটি চলিত কথা খুব শুনিতে পাওয়া যায়, যথা:—"আল্লাহতালা সর্ব্বদা বিরাজমান এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।" এই বাক্যের প্রথমাংশ সত্য, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ [illegible]

আল্লাহতালা "সর্ব্বদা বিরাজমান" আছেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু "সর্ব্বত্র বিদ্যমান" থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমার মনে হয়, হিন্দু ধর্ম্মের "অদ্বৈতবাদ" হইতে এ দেশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ঐ কথাটি প্রবেশ করিয়াছে।

ইস্‌লামী ধর্ম্মশাস্ত্রেও এইরূপ একটি বাক্য আছে; যথা:—"আল্লাহতা'লা সমস্ত জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।" জগৎ পরিবেষ্টন করিতে হইলে জগতে অবস্থান করা আবশ্যক। জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, ইহা বলা কিছুতেই সঙ্গত বা সমীচীন হইবে না। কিন্তু উপরোক্ত কথা স্বীকার করিতে হইলে পবিত্র কোরানের—"তাঁহার মত কোন বস্তুই নাই"—এই বাণীর অবমাননা করিতে হয়। কারণ পরিবেষ্টন করা বা ধারণা করা সৃষ্ট বস্তুর গুণ-বিশেষ; সুতরাং ঐ গুণটি আমাদের ধারণা-মত খোদাতালার প্রতি অর্পণ করিলে, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও মহাগৌরবের প্রতি দোষারোপ করা হয়। এই জন্য শাস্ত্রবিদ মুসলমান পণ্ডিতগণ ঐ বাক্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা—"তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্বব্যাপী এবং তাঁহার প্রভাব জগতের সমস্ত বস্তু পরিবেষ্টন করিয়া আছে।"

পবিত্র কোরান শরিফে উক্ত হইয়াছে, "রহমান 'আর্শে'র উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।" "আর্শ" সৃষ্ট বস্তু; যদি তাহাতে আল্লাহতা'লার প্রতিষ্ঠিত থাকা বা অবস্থান করা সম্ভবপর হয়, তবে অন্য সৃষ্ট বস্তুতে অবস্থান করায় আপত্তি হইবে কেন? উহার উত্তর এই যে, আল্লাহতালা "বেচুঁ" অর্থাৎ অনুপম; তিনি কোন বস্তুর সদৃশ নন, এবং অন্য কোন বস্তুই তাঁহার সদৃশ নহে। সুতরাং অনুপমের অন্য কোন উপমাযোগ্য স্থানে বা 'মাকানে' অবস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্যই বিশেষ ভাবে তাঁহার অবস্থানের জন্য অনুপম "আর্শে"র কথা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই যে, "আর্শে"র স্বরূপ কি? পবিত্র কোরান শরীফে উক্ত হইয়াছে,—"তাঁহার আসন (আর্শ) ভূলোক ও দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।" প্রকৃত পক্ষে "আর্শে"র তাৎপর্য "লা-মাকাঁ" বা স্থানশূন্যতা। উহার পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বা ঊর্দ্ধ-অধঃ দিক-সীমা নাই। উহা অনুপম ও ব্যাপক; মানবের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র।

আল্লাহতালার সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বদর্শিতা ও নিকটবর্ত্তিতা।

ইস্‌লামের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহতালা হাজের, নাজের ও নিকটবর্ত্তী। "হাজের" অর্থ সর্ব্বজ্ঞ এবং "নাজের" অর্থ সর্ব্বদর্শী। হাজের ও নাজেরের সহিত নৈকট্যের সম্বন্ধ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্ব্ববিষয় জানিতে বা দেখিতে হইলে তাঁহাকে যে প্রত্যেক বস্তুর উপর উপস্থিত বা অবস্থিত থাকিয়া পাহারা দিতে হইবে এমন নহে। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি "লা-মাকানে" থাকিয়াই সমস্ত জানিতেছেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত না থাকিয়াও জগতের প্রত্যেক বিষয় অবলোকন করিতেছেন। ইহাই হাজের ও নাজের শব্দের বিশেষত্ব।

এক্ষণে নিকটবর্ত্তিতা। আল্লাহতালা আমাদের নিকটেই আছেন, ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা একজন যেমন অন্য একজনের নিকট দাঁড়াইয়া থাকি, কিংবা কোন একটা বস্তু আমাদের নিকটে থাকে, আল্লাহতা'লাও সেইরূপ আমাদের নিকটে আছেন। অবশ্য কোরান শরীফেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"আমি তাহাদের স্কন্ধ-শিরা হইতেও নিকটবর্ত্তী।" কিংবা "যেখানে হোক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন।" উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলে হয় আল্লাহতা'লাকে স্কন্ধ-শিরার ন্যায় আমাদের শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে; অথবা পথের সাথীর মত সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; উহার মর্ম্মার্থ এই যে, আল্লাহতালা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বদর্শিতা শক্তির প্রভাবে আমাদের সঙ্গী অথবা নিকটতমেরই মত আমাদিগকে সর্ব্বদা অবলোকন করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে,—হিন্দুশাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে যে,—"জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ।" ইস্‌লামী শাস্ত্রেও প্রায় সেই ভাবেই উক্ত হইয়াছে যে,—"আর তোমাদের জীবনের মধ্যে কেন দেখিতেছ না?" ইহাতে যেন মনে হয় যে, জীবাত্মার অবস্থান-স্থান শরীরের মধ্যে পরমাত্মারও অবস্থান করা সম্ভবপর। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। উহার মর্ম্ম এই যে, জীবাত্মা শরীরের যতদূর নিকটবর্ত্তী, পরমাত্মা জীবাত্মার তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই 'লামাকান'-বাসী ও অনুপম। জীবাত্মা যেমন শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা স্থাপিত হইতে পারে না, সেইরূপ পরমাত্মার পক্ষেও শরীরে অবস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ; সেই জন্য আমরা তাহাদিগকে কাফের, মোশ্‌রেক ও অংশীবাদী বলি। ইস্‌লামী বিশ্বাস অনুসারে জীবাত্মা খোদাতালার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ও গুণের প্রতিবিম্ব মাত্র। কার্য্য যেমন কর্ত্তার গুণের প্রতিবিম্ব, লেখা যেমন লেখকের গুণের নিদর্শন, বাক্য যেমন বক্তার গুণের প্রতিধ্বনি, সেইরূপ সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার গুণের প্রতিবিম্ব বা প্রতিকৃতি স্বরূপ উহা স্রষ্টার বা তাঁহার গুণের অংশ কদাচ হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তবে একটি নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট জীবের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার কোন পার্থক্য থাকা সম্ভব হইত কি? সুতরাং কোরানোক্ত—"তোমাদের জীবনের মধ্যে কেন দেখিতেছ না" বাক্যের মর্ম্ম এই যে, নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তোমরা খোদাতালার গুণ-গরিমা বুঝিতে পারিবে।

"আল্লাহতা'লা সমস্ত জগৎ হইতে পবিত্র"—তিনি অনুপম, অতুলন ও অভাবশূন্য; ইহাই ইস্‌লামী ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি।

(ইস্‌লাম-দর্শন, আশ্বিন) খোন্দ্‌কার আব্‌দুল হাকিম।

—

বিদেশ-প্রত্যাগত হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত-বিচার।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতি-সমূহের সমুদ্র-পথে আর্য্যম্লেচ্ছ ও যবন দেশে গমন, আর্য্যম্লেচ্ছ ও যবনের অন্ন ভোজন প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত?

উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,—সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতে আরোহণ এবং গোমেধ, মহর্ষিগণ এইসব ধর্ম্মকার্য্য কলিতে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন।

উদ্বাহতত্ত্বে উদ্ধৃত হেমাদ্রি-পরাশরধৃত আদিত্যপুরাণও বলেন—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কমণ্ডলুধারণ মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বৃদ্ধত্বনিবন্ধন ভৃগুবহ্নি দ্বারা মৃত্যু; কলিতে এগুলি বর্জ্জনীয়।

মহাত্মা কাশীরাম উদ্বাহ ও প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে উদ্ধৃত নারদীয় ও আদিত্য পুরাণোক্ত বচনগুলির একত্রে একই টীকা করিয়াছেন। কাশীরাম বলেন,—মরণোদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা, গৃহস্থের সর্ব্বদা সঙ্গল কমণ্ডলু ধারণ, মরণোদ্দেশে হিমালয়াদি উচ্চ দেশে আরোহণ; যেমন বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে আনন্দ, অগ্নি প্রবেশে প্রমোদ এবং তুঙ্গ অর্থাৎ উচ্চস্থান হিমালয়াদি অরোহণে প্রাণত্যাগ দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ হইত,—এই কার্য্যগুলি কলিতে পরিহার্য্য।

মহাত্মা রঘুনন্দন হেমাদ্রি পরাশর ধৃত আদিত্যপুরাণ হইতে যে-

সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বর্ত্তমানে সেই হেমাদ্রি পরাশর গ্রন্থে তদতিরিক্ত বচনাংশও সংযুক্ত আছে দেখা যায়। ইহার অর্থ এই—নৌকায় সমুদ্রযায়ী দ্বিজকে সংশোধন ক্রমে যে সমাজে গ্রহণ করা হইত কলিতে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

সমুদ্রযায়ী সম্পর্কে মহাত্মা মনু বলেন :—

স্বয়ং বহিত্রাদি দ্বারা নৌকা চালন ক্রমে, সমুদ্রযায়ী, বন্দী, তৈলিক এবং মিথ্যা-সাক্ষ্য-প্রদানকারী দ্বিজগণ অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ সদ্‌ ব্রাহ্মণের এক পংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য; অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে বর্জ্জিত হইবেন।

উশনা বলেন—সমুদ্রযায়ী প্রভৃতি নিষিদ্ধকর্ম্মকারী দ্বিজদিগকে শ্রাদ্ধাদি নিমন্ত্রণ কার্য্যে বর্জ্জন করিবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিযুগে পরিহার্য্য কর্ম্মগুলির মধ্যে সমুদ্র-যাত্রাও নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে; কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্মগুলিকে আবার 'ইমান্ ধর্ম্মান্' এই বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত করায়, ধর্ম্মোদ্দেশে যে মরণান্তক সমুদ্রযাত্রা তাহাই নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণ প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে গমনাগমন ধর্ম্মোদ্দেশক নহে; সুতরাং এস্থলে তাহা নিষিদ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। নারদীয় পুরাণে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি অতি প্রাচীন-ধর্ম্মোদ্দেশক বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত ছিল, যেমন মরণোদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে আনন্দ, অগ্নি প্রবেশে প্রমোদ এবং হিমালয় আরোহণে প্রাণত্যাগ করিলে সুখ নামক স্বর্গলাভ হইত। অর্থাৎ তাহাতে আত্মহত্যাদির পাপ হইত না। কিন্তু বৃহন্নারদীয় পুরাণের উদ্দেশ্য এই যে, কলিযুগে মরণান্তিক সেই অনুষ্ঠান-জনিত ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাপজনক, কাযেই কলিযুগে মরণ-উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ করিলে আত্মহত্যা এবং গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলে গো-হত্যা ইত্যাদি পাপের ভাগী হইতে হইবে। প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে গমন শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মকার্য্য নহে। কাজেই "ইমান্ ধর্ম্মান্" কলিযুগে "বর্জ্জানাহুর্মনীষিণঃ" এই প্রমাণ-মূলে তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে না, বিশেষতঃ ম্লেচ্ছ দেশে গমন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া নদী পর্ব্বত ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাওয়া সমুদ্রযাত্রা নহে। সমুদ্র উদ্দেশ্যে যাইবার নামই সমুদ্রযাত্রা। সেই সমুদ্রযাত্রা একমাত্র কাশীরামোক্ত শাস্ত্রে বিহিত মরণান্তিক সমুদ্রযাত্রা। সুতরাং দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, প্রয়োজনানুরোধে সমুদ্রপথে গমনাগমন বৃহন্নারদীয় বচনানুযায়ী শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে! হেমাদ্রি ও পরাশর ভাষ্যের উক্তির বিষয় বক্তব্য এই যে, মহাত্মা রঘুনন্দন হেমাদ্রি ও পরাশর ভাষ্য হইতে কলিতে বর্জ্জনীয় কার্য্যের সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু "দ্বিজস্তাবেদৌ তু নৌ যাতুঃ শোধিতস্তাপি সংগ্রহঃ" এই প্রমাণাংশ তখন হেমাদ্রিতে থাকিলে তিনি অবশ্যই তাহা সংগ্রহ করিতেন; সুতরাং রঘুনন্দনের সময়ে এই বচনাংশ হেমাদ্রিতে ছিল না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

(নবযুগ, কার্ত্তিক) শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী।

বৈষ্ণব সাহিত্য।

বৈষ্ণব-যুগের নব সাহিত্য প্রচুর ভাববৈশ্বর্য্যে চিরন্তন নরনারীর সুখ-দুঃখ-কাহিনীর অনাবিষ্কৃত মহাসিন্ধুতে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। আদিম বৈষ্ণব-যুগের কাব্য-গীতিকায় যে সার্ব্বজনীন মঙ্গল ও সুন্দর সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহা ব্যক্তিগত বিশ্বাস-কাহিনীর কুক্ষিতে একেবারে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজিও অনেক ধর্ম্মজ্ঞ সমালোচকবর্গ সেইগুলিতে আধ্যাত্মিক অর্থ বসাইয়া সেইগুলিকে উচ্চ শ্রেণীর কাব্য বলিয়া বুঝাইতে বৃথা প্রয়াস করেন।

আমাদের মনের মধ্যে যে জগৎ আছে, তাহা ভাবের জগৎ। এই ভাবের দেশে যে বিচিত্র সৃষ্টি চলিতেছে—তাহাই সাহিত্য। মানুষ মন বাহিরের সমস্ত অবস্থা কাল ও পাত্র হইতে মধু আহরণ করিয়া অন্তরে বসিয়া তাহার সাহিত্যমধুচক্র নির্ম্মাণ করে। এইজন্য মানুষের জগৎ বাহিরের জগতের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। ময়রা যেমন সন্দেশ রসগোল্লা ঘৃত ছানা প্রভৃতি মাল মশলা লইয়া রসগোল্লা তৈরি করে,—কিন্তু রসগোল্লার মধ্যে সর্ব্বসমন্বয়ে উপমি-উক্ত উপাদান হইতে পৃথক একটি আস্বাদ জন্মে, কোনো একটিরও প্রাধান্য বা পৃথক্ সত্তার অনুভূতি হয় না, সেইরূপ মনও বাহিরের সমস্ত উপাদান লইয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করে, অথচ তাহাতে বাহিরের নয়র জড় কোনো পদার্থেরই প্রাধান্য থাকে না—সকল উপাদানের সংমিশ্রণে মনের কলা-নৈপুণ্যের গুণে—তাহা অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করে। এই যে সৃষ্টি, ইহাতে সাহিত্যকার সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের মনের মাধুরী মিশাইয়া তাহাকে সার্ব্বজনীন এবং অমর করিয়া তুলে—তবে তাহা প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য হয়। ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্ব থাকিলেই, তাহা আর, সাহিত্য হয় না। অন্য যাহা ইচ্ছা বলিতে পার।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ হইতেই বহু ব্যক্তির সার্ব্বজনীন সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মধ্যে অনেক বিসঙ্গতি, অবিচার, অসমানত্ব, বিক্ষোভ ও বিরোধ থাকে, যাহা তত্ত্ব মানুষের অজ্ঞাত বা অপরীক্ষিত—সেইজন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কাহিনী সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যিকের কার্য্য সেই নিজের কাহিনীকে বৃহত্তর উপযোগী করা; যাহা সকল কালে সকল মানবই আপনার বলিয়া অভিনন্দন করিয়া লইতে পারে।

যাহা নীচ হইতে আমাদিগকে উচ্চে লইয়া যায়, যাহা ক্ষণিক হইতে অনন্তে লইয়া যায়, যাহা অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যায়—তাহাই মঙ্গল। মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতি মানুষকে ছোট হইতে বড়র লইয়া গিয়া, এমন জায়গায় পৌঁছাইয়া দেয় যেখানে সে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অল্পতা, এবং নীচতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া—এক অপূর্ব্ব চমৎকার রহস্যের সন্ধান পায়। এ রহস্য দুই দণ্ডের জন্য নয়, ইহা অনন্তকাল ধরিয়া উপভোগ করিলেও কিছুমাত্র ব্যয়িত হইবে না। এই যে রহস্যময় অনুভূতি, ইহার সীমা নাই শেষ নাই বলিয়া ইহা অমৃত এবং নিত্য।

সুন্দরই মঙ্গল এবং নিত্য—তাই আজ পর্য্যন্ত রাম সুন্দর সীতা সুন্দর, ভীষ্ম সুন্দর, দধীচি সুন্দর, উমা সুন্দর; ত্যাগ ক্ষমা ধর্ম্ম সুন্দর, প্রেম প্রীতি নিষ্ঠা সুন্দর। কারণ এইসবই মঙ্গল এবং নিত্য। সেই জন্য সুন্দর। এই জন্য সাহিত্যে কেবল সৌন্দর্য্যের ঐ স্থান,—আর এই-জন্য সাহিত্য নিত্য কালের মঙ্গলময়। যাহা অমঙ্গলময়, তাহা সাহিত্যের অঙ্গে আভরণ না হইয়া আবরণ হয়, দুইদিনেই তাহা খসিয়া পড়ে।

বৈষ্ণব যুগের নব চেতনায় এইরূপ একটা সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু হইয়াও হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সাহিত্য নামে নির্ব্বিচারে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহার অধিকাংশই অসুন্দর উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী; তাহা কেবল বিলাসিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিতের মতই ক্ষণেকের জন্য মনকে হরণ করে মাত্র, মনকে বরণ করে না। কারণ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে যে সুরটি ধ্বনিত হইতেছে, তাহা হরার মত মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে, হৃদয়ের মধ্যে সুপূর্ণ রহস্যময়ী মোহিনী অনুভূতিটিকে জাগাইতে পারে না। এ সুরা হরার মত চঞ্চল করিয়া তুলে মাত্র, ফুলের মত ভরিয়া দিতে পারে না। যেহেতু এ মোটা হারের সুর। মিলনের আনন্দের মধ্যে বিরহ

বিরহের ব্যথার মধ্যেও যে সুখ—নরনারীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এবং পরস্পরের মধ্যে যে জন্মজন্মান্তরের অটুট নিগূঢ় সম্বন্ধ—তাহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিগণ কেবল দেহের মিলনটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া এবং তাহাকেই সকলের চেয়ে উপরে আসন দেওয়ায়, পূজনীয় আদর্শ চরিত্র, অবতার কিম্বা সাক্ষাৎ ভগবান্ যাহাই বল, শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেম মিলন বিরহ ও আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই সাধারণ ধারণার অনুগামী তুচ্ছ দৈহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল সুরটি সুন্দর অভাবনীয় এবং জগতের সাহিত্যে নূতন। বিষয়টি সুন্দর কিন্তু ব্যঞ্জনা সকলের সর্ব্বত্র সুন্দর হয় নাই। ভিক্ত রস শারীর স্বাস্থ্যে উপকারী বলিয়া মানুষ নিমের পাতার ঝোল খায়। নিপুণ পাচক তাহাকেই মুখরোচক করে। কিন্তু আনাড়ি তেতোর ঝোলে যদি তেতোকেই অতি প্রাধান্য দিয়া বসে, তাহা হইলে উক্ত ব্যঞ্জন মুখরোচক হওয়া দূরে থাকুক্, রন্ধনকারীর বুদ্ধির প্রশংসাও যেমন আমরা করি না, তেমনি নরনারীর মিলনে যৌন সম্বন্ধটিকেই যে কবি প্রাধান্য দেন তাঁহারও আমরা তেমনি বড় পক্ষপাতী হইতে পারি না। কারণ—মনও তাহাকে লইতে সঙ্কুচিত হয়।

(নারায়ণ) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চাঁদ-তারার দেশে

ছোট্ট খোকা। লম্বায় সে মায়ের হাঁটুর একটুখানি উপরে। হাঁটে যখন তখন তার চলার তালে তালে মাথার রেশমের মত চুলগুলি দুলে দুলে ফুলে ওঠে, টলে টলে ছোটে যখন তখন আশেপাশের সব জিনিষ তার হাতের পায়ের দোলায় গড়িয়ে পড়ে, নাচে যখন তখন রাঙা টুকটুকে গালদুটি থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়ে। তার হাসি ঝর্ণার জলের মত কল্‌কল্ করে সারাদিন ঝর্‌তে থাকে; দুটি মুক্তোর মত দুটি ফোঁটা জল যদি কখনও তার চোখে দেখা যায় তাহলে মায়ের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে।

খোকার সবই ভাল। কেবল তার একটা বড় দুঃখ যে সে বড় হয় না। সবাই বলে "তুমি ছেলেমানুষ," "তুমি ছোট এতটুকু"—একি কম অপমান? খোকা রোজ সকালে উঠেই আয়নায় মুখ দেখে সে বড় হল না কি! ঘুম থেকে উঠ্‌তে বেলা হলে সে ধড়মড়িয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে। উঃ আজ কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে! না জানি এতক্ষণে সে কতই বড় হয়ে গেছে। বিছানা থেকে আজ যে অত বড় লাফ দিতে পেরেছে সে কি আর বড় না হয়ে যায়। খোকা ছুটে গিয়ে মাকে জিগ্‌গেষ করে, "মা, ওমা, আমি বড় হয়েছি নাকি?" মা খোকার ফোলা গালদুটি টিপে দিয়ে বলেন, "হবে গো হবে খোকাবাবু, আর কিছু দিন পরে।"

"আরো পরে?" খোকা ঠোঁট ফুলিয়ে চলে যায়।

খোকার বাবা অনেক দূরে সাত সমুদ্র পারে ব্যবসা কর্‌তে গিয়েছিলেন। খোকার ভারি সখ সেও বাবার মত অনেক অনেক দূরে চলে যায়, যেখানে কেউ তাকে ছুটে গিয়ে ধরে আন্‌তে পার্‌বে না, যেখানে কেউ তাকে ছেলেমানুষ বল্‌বে না। খোকার বাবার চিঠি এসেছিল। খোকা গিয়ে মাকে বল্‌লে, "মা, বাবা কেন অনেক দূরে গিয়েছে, আমিও যাব।"

মা বল্‌লেন, "তুমি আগে বাবার মত বড় হও, তার পর যাবে।"

খোকা মোটা দুটি বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে বল্‌লে, "এই যে, বড় হয়েছি, পাঠিয়ে দাও।"

মা হেসে বল্‌লেন, "বাবা বুঝি ওইটুকু বড়? আরো বড় হতে হবে।"

খোকা ছোট্ট দুখানা হাত মাথার উপর তুলে দিয়ে বল্‌লে, "এই যে এইবার আরো বড় হয়েছি।"

মা তবু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "ওতেও হবে না, আরও বড় হতে হবে।"

খোকা একমাথা চুল ঝাড়া দিয়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে বল্‌লে, "এইবার?"

মা খোকার গালে একটা টুস্‌কি দিয়ে বল্‌লেন, "এখনও হয়নি রে পাগ্‌লা।"

খোকা খাটের উপরে উঠে মায়ের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা, যখন তোমার মত এই এত্ত বড় হব, তখন হবে বুঝি?"

মা খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লেন, "তোমার বাবা কি আমার মতন নাকি বোকা ছেলে? তিনি আমার চেয়েও অনেক বড়।"

খোকা কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বল্‌লে, "সে কত বড় মা? কুম্ভকর্ণের মত? আমি রাক্ষস হব না।"

মা বল্‌লেন, "রাক্ষস কেন হবে! তুমি কার্ত্তিক ঠাকুরটি হবে।"

সন্ধ্যে বেলা চাঁদের আলো খোকার জান্‌লা দিয়ে বিছানার উপর এসে পড়েছিল। খোকার মা খোকাকে কোলে নিয়ে দোল্ দিতে দিতে সুর করে গাইছিলেন, "ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেও, বাটা ভরে পান দেব গাল পুরে খেও।"

খোকা চোখ চেয়ে বল্‌লে, "মা ঘুমপাড়ানী মাসি কোথায় থাকে?"

মা বল্‌লেন, "ওই চাঁদের দেশে।"

খোকা বল্‌লে, "ঘুমপাড়ানী বুঝি বাবার মত বড়? তার রাত্তির বেলা ভয় করে না?"

মা বল্‌লেন, "ভয় কর্‌বে কেন? চাঁদা-মামা যে আলো জেলেছে।"

খোকা বল্‌লে, "মা, আমি বড় হয়ে চাঁদা-মামার আলো কেড়ে নেব। তাহলে আর আমার ভয় কর্‌বে না।"

মা বল্‌লেন, "আচ্ছা, তাই নিও। এখন ঘুমোও!"

খোকা ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

মাঝ রাত্রে খোকার কানের কাছে কে যেন এসে ডাক্‌তে লাগ্‌ল, "ও ভাই খোকনজা গো রে!" খোকা চম্‌কে উঠে বল্‌ল, "কেন বোন পারুল ডাকো রে?" তার পর চোখ চেয়ে বল্‌ল, "কে ভাই তুমি? তুমি কি সাত ভাই চম্পার পারুল দিদি?" মেয়েটি বল্‌লে, "চেয়ে দেখনা কে?"

খোকা দেখ্‌ল পাশাবতী রাজকন্যার মত এক কুঁচবরণ কন্যা, তার মেঘবরণ চুল, কানে তার মোতির ফুল, গলায় তার অজগরের মাথার মণি, সওদাগর-কন্যা বসুমতীর মত পরণে তার অমূল্য-রতন শাড়ী, সে শাড়ীর পাড়ে আঁচলে আগুনের মত টক্‌টকে কত যে সাগরছেঁচা মাণিক দুলে দুলে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ছে তার আর ঠিক্‌ঠিকানা নেই। সে কন্যা খোকাকে দেখে হাস্‌তেই হীরামণি ঝল্‌কে পড়্‌ল। নীল সাগরের উপর দিয়ে সাদা-পাল তোলা এক ডিঙিতে চড়ে সে জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে সঙ্গে খোকার বিছানার উপর এসে নেমেছে। দাঁড় বাইছে সে এক হাতে সোনার কাঠি আর এক হাতে রূপোর কাঠি দিয়ে। খোকা অবাক হয়ে ভাব্‌লে, তবে বুঝি এ মণিমালা, "হাঁকো কাঠের লায়" চড়ে এসেছে। একে 'চ' বললেই হয় চলে, আবার 'র' বল্‌লেই রয়। খোকা ভাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল, মুখখানা চেনে কি একবার মনে হল, ও মা, এ যে রাঙা দিদির মত। তার পর ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌ল, ও মা, না, এ যে আরো সুন্দর ঠিক্ যেন মায়ের মত।

ছোট্ট দুখানি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগ্‌ড়ে খোকা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে কুঁচবরণ কন্যার রতন শাড়ীর আঁচল চেপে ধরে বল্‌লে, "কে তুমি শীগ্‌গির। নইলে ছাড়্‌ছি না। তুমি কি ঘুমপাড়ানী মাসি, না পারুল দিদি, না পুষ্পময়ী রাণী?"

মেয়েটি হেসে বল্‌লে, "আমায় যা বলে ডাক্‌বে তাই সেই।"

খোকা বল্‌লে, "তবে কি আমার রাণী? কিন্তু আমি বড় না হলে রাজা হব না। মা বলেছে বড় হলে আমি দুধ-সাগরের পারের দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে আন্‌ব। কবে আমি বড় হব বল না, রাণী?"

রাণী বল্‌লে, "আমার রাজা কি ছোট্ট হয়। তুমি বড় হয়েছ। উঠে এস না একবার, দেখ কত হয়েছ!"

খোকা রাণীর হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। ওমা, তাই ত খোকা ত আর খোকা নেই। এ যে মস্ত মস্ত বড় মার চেয়ে বড়, বাবার চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে বড়। খোকার মাথার চুলে চোখের পাতায় আকাশের মেঘগুলো এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। খোকার গায়ের চাদরটা উড়ে গিয়ে চাঁদা-মামার মুখখানা আড়াল করে ফেল্‌ছে। খোকার যে দোলাটায় শুয়ে সে একটু আগে ঘুমিয়েছে, সেটা যে কতটুকু হয়ে খোকার পায়ের আঙুলের কাছে পড়ে রয়েছে দেখে খোকার হাসি পাচ্ছিল। তার দিকে নীচু হয়ে তাকাতে খোকার ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যে সে বিছানা ছেড়ে আগেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, নইলে খোকার হাঁটুর কাছে যে-ঘরের ছাদ ঠেক্‌ত তার ভিতর সে বস্‌ত কি করে! খোকার ভারি হাসি পাচ্ছিল তার মার কথা মনে করে, কাল সকালে তাকে কোলে কর্‌তে এসে মা হয়ত ভয়ই কেঁদে ফেল্‌বে এখন ত খোকা বড় হয়েছে, মা হবে তার খুকু।

কেঁদে ফেল্‌লে খোকা মাকে কোলে করে হাত বাড়িয়ে চাঁদটা পেড়ে এনে মায়ের সব কান্না ভুলিয়ে দেবে।

রাণী খোকার ভাবনায় বাধা দিয়ে বল্‌লে, "এস মহারাজ! আর দাঁড়িয়ে কেন?"

খোকা বল্‌লে, "কোথায় যাব?"

রাণী বল্‌লে, "চল ডিঙিতে চড়ে ভ্রমণে যাই।"

খোকা হেসে বল্‌লে, "রাণীর ও ছোট্ট ডিঙিতে রাজাকে ধর্‌বে কোথায়?"

রাণী বল্‌লে, "মহারাজ, নির্ভয়ে আসুন। তার ব্যবস্থা আমি করেছি।"

খোকা গিয়ে দেখে ডিঙি আর ডিঙি নেই। নীল আকাশের বুক জোড়া এক ময়ূরপঙ্খী! তার গায়ে হাজার হাজার তারার আলো। আজ সে রাজা হয়েছে তাই, নইলে এত আলো দেখ্‌লে তার চোখ দুটো এতক্ষণ ঝল্‌সে যেত। রাণী রাজার চেয়ে অনেক ছোট। রাজা তাই রাণীকে হাতে ধরে ময়ূরপঙ্খীতে তুলে নিল। হাল ধর্‌তে হল না, দাঁড় বাইতে হল না। 'চ' বল্‌তেই মন-পবনের জোরে হাওয়ার মতন ময়ূরপঙ্খী আকাশের বুক চিরে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। পৃথিবীটা কত নীচে ছোট্ট খেলাঘরের মত পড়ে রইল। খোকার হঠাৎ যেন একবার মনে হল মা ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে কেঁদে তাকে ডাক্‌ছেন, "ও খোকা, আমায় একলা ফেলে যেও না বাবা।"

খোকা উপর থেকেই ডেকে বল্‌লে, "কেঁদ না মা, লক্ষ্মী মেয়ে, একটু ঘুমোও আমি এই আস্‌ছি।"

ময়ূরপঙ্খী প্রকাণ্ড এক হীরের প্রাসাদের দরজায় গিয়ে থাম্‌ল। প্রাসাদের ভিত নেই, আকাশের স্বচ্ছ বুকের উপর ময়ূরপঙ্খীরই মত বাতাসের দোলায় তালে তালে সে দুল্‌ছে। খোকা বল্‌লে, "এ বাড়ীতে কে থাকে? মায়াপুরীর নাগকন্যা নাকি?"

রাণী হেসে বল্‌লে, "সে কি মহারাজ? আকাশে কি নাগকন্যা থাকে! এ সাঁঝের তারার বাড়ী।"

খোকা বল্‌লে, "তাই নাকি? তবে আমি নাম্‌ব।"

রাণীর হাত ধরে রাজা নেমে পড়্‌লেন। হীরের প্রাসাদের পদ্মরাগের চূড়ার গায়ে খোকাদের বাড়ীর পাশের সেই বুড়ো নিমগাছের বাঁকা ডালগুলি কোথা থেকে এসে হেসে হেলে রয়েছে। তারি আড়াল থেকে নীল ওড়্‌না এক হাতে একটু ফাঁক করে মিষ্টি হাসি হেসে মুখ নীচু করে সাঁঝের তারা এসে দাঁড়াল। খোকা ছুটে এসে ঘোম্‌টা খুলে ফেলে বল্‌লে, "তুমি বুঝি রোজ বুড়ো নিমগাছের আড়ালে উঁকি মেরেই ডুবে যাও! তুমি সাঁঝের তারা! কি সুন্দর তুমি! তুমি আমার রাণী হবে?"

খোকার রাণী চোখ ঘুরিয়ে খোকার সাম্‌নে এসে ঝাঁঝাল গলায় শুধু বল্‌লে, "মহারাজ!"

রাজা বল্‌লেন, "রাগ কর কেন? তুমি আমার দুয়ো রাণী, সাঁঝের তারা আমার সুয়ো রাণী।"

রাণীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। "আমি তোমার দুয়ো রাণী?" বলে রাণী গাল ফুলিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন!

রাজা বড় মুস্কিলে পড়্‌লেন। কি করেন, ছুটে গিয়ে রাণীর হাত ধরে আদর করে বল্‌লেন, "ছিঃ! কাঁদে না, তুমিই আমার সুয়ো রাণী আর সাঁঝের তারা আমার কনে।"

সাঁঝের তারা আর রাণী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল। ঠিক যেমন রাঙাদিদি খোকার কথায় কথায় ঠাট্টা করে হেসে ওঠে!

খোকার বড় রাগ হল। "কি! আমার কথায় হাসি?" বলে খোকা রাগ করে ময়ূরপঙ্খীতে গিয়ে উঠে পড়্‌ল। রাণীর হাত ধরে সাঁঝের তারাও এসে খোকার পিছনে বসে পড়্‌ল। খোকা তাদের দিকে ফিরে না তাকিয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে রইল।

ময়ূরপঙ্খী ভেসে চল্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চাঁদের দেশ এসে পড়্‌ল। আলোয় যেন আকাশে বান ডেকে যাচ্ছিল। দেশের পথ ঘাট ঘর বাড়ী সব আলোর ঢেউয়ের মত আলোর বুকেই দোল খাচ্ছিল। চাঁদের মায়ের আলোয় চর্‌কার পাশে বসে চাঁদ হাসির আলো ছড়াচ্ছিল। ময়ূরপঙ্খীর ভিতর থেকে তার প্রকাণ্ড হাতখানা বাড়িয়ে খোকা চাঁদের মাথার ঝুঁটি ধরে এক টান দিল। চাঁদের মা বুড়ী হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে

উঠ্‌ল। চাঁদ বল্‌লে, "ওকি, ওকি, করেন কি মহারাজ! আমায় ধরে টানাটানি কেন?"

খোকা ঝট্‌ করে বলে ফেল্‌ল, "ভয়ে কব, না নির্ভয়ে কব?"

সাঁঝের তারা আর রাণী আবার খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল। খোকা লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

চাঁদ হেসে বল্‌লে, "নির্ভয়ে কও।"

খোকা এবার খুব গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, "তোমায় আজ কত দিন ধরে রোজ সন্ধ্যেয় ডেকেছি তুমি কথা শোন না, তোমায় এবার বেঁধে নিয়ে যাব, আমার দেশে জ্বাল্‌তে। পৃথিবী মোটেই আলো জ্বালে না।"

খোকার পায়ের উপর মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে চাঁদ বল্‌লে, "মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

সাঁঝের তারা পেছন থেকে বল্‌লে, "মহারাজের জয় হোক।"

দেশ সুদ্ধ সব আলো এনে ময়ূরপঙ্খীতে জড়ো করা হল। আকাশ অমাবস্যার মত অন্ধকার হয়ে গেল; কেবল ময়ূরপঙ্খীর জান্‌লা দিয়ে মাঝে মাঝে আলো উছ্‌লে পড়ে কালো আকাশকে একটু হাসিয়ে তুল্‌ছিল। চাঁদের মা বুড়ী খোকার মায়ের মত কেঁদে উঠ্‌ল, "ওরে আমার খোকা, আমায় একলা ফেলে যাস্‌নে বাবা।" খোকা রাজা মানুষ। বুড়ীর কথায় কি কান দিলে তার চলে? তবুও খোকার কান্না আস্‌ছিল, তার নিজের মাকে মনে করে। কিন্তু যদি সাঁঝের তারা এই ছেলেমানুষী দেখে হাসে? কিছুতেই তা হবে না। খোকা ময়ূরপঙ্খীকে বল্‌লে "চ।"

কালো আকাশের একটি তারার মত খোকার আলোর নৌকা ছুটে চল্‌ল। চলেছে, চলেছে, কত পথ যে পার হয়ে গেল তার আর ঠিক নেই। যেখানে অন্ধকার বটতলার ভাঙা মন্দিরের মত কুচ্‌কুচে কালো, দেখ্‌লে ভয় করে, সেইখানে অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে আকাশজোড়া চাঁপা-গাছ উঠেছে। তাতে সাতটি সোনার চাঁপা ফুটে আছে। সেই চাঁপাগুলির ঝল্‌মলে পাপ্‌ড়ির আড়ালে চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে মাখনের মত সাতটি রাজ-পুত্র। খোকা ডাক্‌লে, "সাত ভাই চম্পা জাগে রে।"

চোখ মেলে হেসে সাত ভাই বল্‌লে, "[illegible] পারুল ডাকো রে?"

খোকা বল্‌লে, "আমি খোকা, তোদের [illegible] ফুল নিয়ে খেলা কর্‌ব তাই ডাক্‌ছি।"

সাঁঝের তারা হেসে খোকার গায়ে চ'লে প[illegible] রাণী বল্‌লে, "তুমি খোকা!"

খোকা জিভ কেটে বল্‌লে, "আমি মহারাজ, [illegible] আমার মন্ত্রী সেনাপতি হবে?"

"যো হুকুম মহারাজ!" বলে সাত ভাই নেমে [illegible] ময়ূরপঙ্খীতে আর যেন ঠাঁই মেলে না। একে [illegible] একলাই আধখানা জুড়ে বসেছে, তার উপর [illegible] জিনিষে চাঁদে তারায় ঠাসাঠাসি।

ময়ূরপঙ্খী আবার চল্‌ল। আকাশ থেকে [illegible] বারে সমুদ্রে গিয়ে পড়্‌ল। এই সমুদ্র পার হলে [illegible] বাবার কাছে যাওয়া যায়। খোকা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘাটে এসে পৌঁছল। শ্বেতপাথরে বাঁধানো [illegible] উপর খোকার বাবা বসেছিলেন। উঃ সে কি [illegible] হাত বাড়িয়ে তিনি ময়ূরপঙ্খী আট্‌কে ধর্‌লেন [illegible] পর দু হাত বাড়িয়ে খোকাকে কোলে নিতে ছুটে এলেন খোকা তখন মুখ বাড়িয়ে একটুখানি দেখা দিল বাবা দু হাত সরে গিয়ে বল্‌লেন, "আমার খোকা, [illegible] হয়েছিস্‌?"

খোকা বল্‌লে, "হ্যাঁ বাবা, মেঘে আমার মাথা ঠেকে যায়। হাত বাড়িয়ে আমি চাঁদকে ধরে এনেছি।"

কি অদ্ভুত! তাতেও সাঁঝের তারা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠ্‌ল। খোকা বিরক্ত হয়ে [illegible] রাঙা দিদি তার মাথার কাছে [illegible] আর সে সেই ছোট খোকার দোলাটে [illegible] রাঙা দিদি বল্‌লে, "কত বড় হয়েছিস্‌ খোকা?"

খোকা বল্‌লে, "যাও তুমি।"

শ্রীশান্তা [illegible]

আদ্য শিক্ষা

অর্থকরী শিক্ষা আবশ্যক।

যে দুঃসময় পড়িয়াছে, দেশের ধনের রক্ষা ও বৃদ্ধি ব্যতীত বাঁচিবার উপায় নাই। যদি লোকে উৎপন্ন বৃদ্ধি করিতে পারে, চাষে দশ মণের জায়গায় পনর মণ ফলাইতে পারে, এইরূপ অন্যান্য জীবিকায় পারে, তবেই রক্ষা। কিন্তু পারিবে কি?

দেশে ধনাগমের তিন উপায়—কর্ষণ, কলা, ক্রয়। আমরা বলিতেছি, চাষ কর, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তিত কর। ভূমি হইতে ধাতু কর্ষণ কর, আকর-কর্ম শেখ। বিশ্ব-কর্ম্মশালা কর, কলা-বিদ্যালয় খোল, বাণিজ্য শেখাও।

চেষ্টাও কিছু কিছু হইতেছে। কয়েকটা জেলায় 'বৈজ্ঞানিক' কৃষির আদর্শ রাখা হইয়াছে। বঙ্গের সন্নিকটে কৃষি-বিদ্যালয় আছে; ঢাকাতে আর-একটা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে; সেখানে আকরবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা দেওয়া হইতেছে। ঢাকাতেও আর-একটা বিদ্যালয় খুলিবার উদ্‌যোগ হইতেছে; কলিকাতায় কলাশিল্পশালা স্থাপনের কথা উঠিয়াছে। কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে বাণিজ্যবিদ্যা শিখাইবারও প্রস্তাব হইয়াছে। কাশিমবাজারের চিরবদান্য মহারাজা ইতিমধ্যে কলিকাতায় বিশ্বকর্মশালা (polytechnic) খুলিয়াছেন, বহরমপুরে তাঁহার কলেজে বাণিজ্যবিদ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় মূর্ত্তবিজ্ঞান (applied science) শিখাইবার নিমিত্ত প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্‌টিটিউট অনেক দিন কলা শিক্ষা দিতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়াসে কিছু-না-কিছু ফল হইতেছে। কিন্তু কত জনের শিক্ষা হইতেছে, কত জনের বা হইবে? কত কালেই বা হইবে? এ দিকে এক এক বৎসর যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন এক এক যুগ চলিয়া যাইতেছে। উনানে হাঁড়ী চড়াইয়া ঘরে চাল নাই দেখিয়া বাজারে দৌড়াইলে যে হাস্যকর দশা ঘটে, সে দশায় আমরা পড়িয়াছি।

সমাজের নিম্নাঙ্গের শিক্ষা।

বিশেষ চিন্তা, উপরি-উক্ত প্রয়াস সমাজের উচ্চাঙ্গে, যে অঙ্গ সহজে চোখে পড়ে। যে নিম্নাঙ্গ অসাড় নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, যাহাকে ভর করিয়া কোটি কোটি প্রজা দাঁড়াইয়া আছে, সে দিকে তেমন দৃষ্টি কই? যদি দশটা কৃষিবিদ্যালয়, পাঁচটা কলাবিদ্যালয় ও তিনটা বাণিজ্য-বিদ্যালয় খুলিলে বঙ্গের সাড়ে চারি কোটি লোকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এতদিন টাকা কর্জ করিয়াও সে-সব খুলিতে পারা যাইত না কি? আমার বিশ্বাস এ-সব গোষ্পদের পানিতে দেশের শুষ্ক ভূমি সিক্ত হইবে না; ভূরি বর্ষণ চাই, জলের ছিটার কর্ম নয়। শিক্ষা-নীতির আমূল সংস্কার চাই, গ্রামের কুটীর হইতে নগরের সৌধ সুরচিত শিক্ষা-জালে ঘেরা চাই। জালের সূত্র কেমন হইবে, "শিক্ষার বীজ" প্রবন্ধে আভাস দিয়াছি।

কর্ষণ, বর্ষণ ও রক্ষণ।

শিক্ষার তারতম্যে জাতি উন্নত কিংবা অবনত হয়। এই কথা আমরা এত বুঝিয়াছি যে, দেশের রাষ্ট্রনীতির উল্লেখ করিতে গেলেই শিক্ষা বিস্তার করিতে বলি, আদ্য শিক্ষা অবশ্যক (compulsory) করিতে বলি, এবং বর্তমান দৈন্যের কারণ, শিক্ষার অল্পতা বিবেচনা করি। উত্তম কর্ষণ না পাইলে ভূমি উর্বরা হয় না; আমাদের চিত্তও হয় না। কিন্তু কেবল কর্ষণ হইলেই শস্য জন্মে না; একদিকে যথাকালে যথাপরিমাণে বর্ষণ চাই, অন্যদিকে মূষিক ও খগ ও পতঙ্গ প্রভৃতি অভ্যাপাত হইতে রক্ষণ চাই। জমিন্‌ত মানবের; কর্ষণও যেন হইল; কিন্তু বর্ষণ ও রক্ষণ যে ইন্দ্রের হাতে। তা ছাড়া, রোগের নিদান আবিষ্কার এক কথা, চিকিৎসা আর-এক কথা।

কর্ষণের পূর্ব্বে বর্ষণ।

প্রচুর বর্ষণ চাই; কতক বৃষ্টি যে খালে ও নদীতে পড়িবে না, এমন নহে। সে আশঙ্কায় অর্থব্যয়ে কৃপণ হইলে যে-ভূমি কর্ষণের ও ফলনের যোগ্য তাহাও রসসিক্ত হইতে পারিবে না। দেশকে মানুষ করিবার নিমিত্ত যে ব্যয়, সেটা ত ব্যয় নহে, সেটা পুনরাবর্তক ধন। সেটাই ব্যয়, যেটার বৃদ্ধি হয় না। যে ব্যয়ে ধন বাড়ে, সে ব্যয় খাতার ডান পাশে দেখা গেলেও, বাঁয়ে ধরা কর্ত্তব্য। মহাজন ধান কিনিয়া রাখিবার সময় মনে করে না, টাকা

নষ্ট হইয়া গেল। সে ধন তাহার মূলধন, যাহা বাড়িয়া বাড়িয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষায় যে ব্যয়, যাহাতে দেশের আয়ু ও আরোগ্য, শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িয়া চলে, তাহাই ত দেশের মূলধন। অতএব আপাতব্যয়ের কাল্পনিক তর্কে ভুলিলে চলিবে না। গোড়া পত্তন ভাল করিতে হইবে; তার পর আট্টালিকা উঠাও। জানি, আমরা বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে পড়িয়াছি; বীজ নইলে অঙ্কুর জন্মে না, অঙ্কুর নইলে বীজ হয় না। কিন্তু বীজ বিনা অন্য উপায় কই? বীজ যোগাড় করিতেই হইবে; নতুবা মানব-জমির আবাদ দূরে থাক, জমিটাই শন্যে মিলাইয়া যাইবে।

শিক্ষা শব্দের অর্থ।

কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা রব করিলেই, মানব-কৃষ্টি (culture) শতবার উচ্চারণ করিলেই, তাহার ক্রিয়াপরিপাটি বুঝিতে পারা যায় না। 'শিক্ষা' বলিতে ইংরেজী শিক্ষা বুঝাইতেছে; টোলের বৃদ্ধ অধ্যাপক ও গ্রামের প্রবীণ মুখ্য 'শিক্ষিত' নহেন, কারণ, তাঁহারা ইংরেজী ভাষা শেখেন নাই। 'শিক্ষিত' শব্দের এই অপপ্রয়োগে বুঝি, আমরা বস্তুটা চিনিতে পারি নাই, একটা ছায়ার অনুসরণ করিতেছি। অথচ জানি, যার নাম শে-খা, তারই নাম শি-ক্ষা। ইহাও জানি, অভ্যাস দ্বারা, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ করিয়া, কর্ম শিখি। মানুষের এই যে শক্তি, যে শক্তি দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, দেহের বৃত্তিবিশেষে পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্বক যত্নপূর্বক করিতে করিতে অনিচ্ছাকৃত অযত্নকৃত হইয়া পড়ে, সে শক্তি হেতু মানুষ পশুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

কোনও কর্ম করিতে শিখিলেই যে, সে কর্ম জা-না হয়, এমন নহে। পাচক ব্যঞ্জন রাঁধিতে শিখিয়াছে, কি মাত্রায় কি উপকরণ যোগে কোন ব্যঞ্জন স্বাদু হয়, তাহা জানিয়াছে, ভূয়োদর্শন দ্বারা জানিয়াছে। তাহার পাক-কর্ম শিক্ষা হইয়াছে। কিন্তু সে জানে না, সে সে উপকরণ একত্র পাক করিলে, সে সে মাত্রায় যোগ করিলে, ব্যঞ্জন কেন সুস্বাদু হয়। এই জ্ঞানের অভাবে, তাহাকে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের যুক্তি (recipe) পৃথক্ মনে রাখিতে হয়। তাহার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত। সে পাককর্ম জানে, জানে না। সে পাককর্মের সূত্র পায় নাই। পূর্বে [illegible] সূত্রকে বিদ্যা (science) বলা হইত। [illegible] বিজ্ঞান বলিতেছি। কারণ, বিজ্ঞানে [illegible] শিখিতে হয়।

অতএব দেখিতেছি, প্রথমে শিক্ষার—[illegible] প্রয়োজন। ইহার নিমিত্ত মস্তিষ্কের যত না [illegible] কানের হাত-পায়ের নিয়ন্ত্রিত কর্ম আবশ্যক [illegible] যাহারা কারু (artisan), যাহারা কৃষক, যাহা [illegible] তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি এই ভাবে পিতা বা [illegible] প্রভৃতির নিকট শেখে। পাঠশালায় পাঠ [illegible] পঠ শেখা গৌণ, কর্ম শেখাই মুখ্য; কারণ, [illegible] চিন্তনীয় আর কিছুই নাই। আগে অন্ন, [illegible] তার পর সুখভোগ ও আনন্দ। যে কারু [illegible] য়াছে, এবং যাহার মনন-শক্তি বিকশিত হইয়াছে [illegible] কর্ম জানিয়াছে, সে কলাবান্ হইয়াছে। [illegible] দেখিয়া, করিয়া দেখিয়া, ভূয়োদর্শন হয়। ইহ [illegible] তাহার প্রবৃত্তি থাকা চাই, এবং তাহার [illegible] থাকা চাই। দর্শনের ও মননের শক্তি কত [illegible] বা জন্ম হইতে প্রাপ্ত, কিছু শিক্ষার দ্বারা অর্জি [illegible] খানি জন্মগত, কতখানি শিক্ষা-সাপেক্ষ, তাহা [illegible] উপায় নাই। যেমন করিয়া হউক, যাহারা [illegible] বা জন্মিয়াছে, তাহারা পরে শিল্পী হইয়া [illegible] সর্বত্র দুর্লভ। কিন্তু ইহারই প্রসাদে কলাবানের [illegible] বস্তা। কলাবানের নিকৃষ্ট শিষ্য, কারু। কৃষি [illegible] সম্বন্ধেও এইরূপ অধিকারিভেদ আছে; কে [illegible] বাচক নাম নাই।

শুক্রাচার্য বিদ্যা শব্দের অর্থভেদ বুঝাইয়া [illegible] বিদ্যা সম্যক্ বাচিক কর্ম। অর্থাৎ বাঙ্ময়ী। [illegible] মূক ব্যক্তি বিদ্বান্ হইতে পারে, কিন্তু [illegible] বান্ হইতে পারে। বিদ্যা, সমস্তই মুখস্থ বি [illegible] হইবে, এমন কথা নাই। বিজ্ঞানে ভূয়োদর্শ [illegible] থাকে। যদি ছাত্র স্বয়ং ভূয়োদর্শন না করি [illegible] ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানে তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে [illegible] জ্ঞান জন্মে না। সে বিদ্যা অর্জন করি [illegible] নিক; কিন্তু বিজ্ঞান পায় নাই। এইরূপ [illegible]

ন্যূনাধিক্যে পঞ্চভূতবিষয়ক জ্ঞান, ভৌতিক বিদ্যা কিংবা ভৌতিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে বিদ্যা হউক, বিজ্ঞান হউক, দুই দিক্ হইতে শেখা যাইতে পারে। প্রয়োগ প্রধান লক্ষ্য হইলে তাহা মূর্তবিজ্ঞান (applied science), আর জ্ঞান প্রধান হইলে অমূর্তবিজ্ঞান বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের যেমন অন্ত নাই, কলারও তেমন নাই, বিদ্যারও নাই। আরও দেখা যাইতেছে, এক দিকে কলা, অন্য দিকে বিদ্যা; মাঝে মূর্ত বিদ্যা বা মূর্ত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশালার মূর্ত বিজ্ঞান কলা শালায় মূর্তিমান্ হইলে অর্থ আকর্ষণ করে। মূর্ত বিজ্ঞান শিখিলেই অর্থ উপার্জন করিতে পারা যায় না; কারণ, কর্মে অভ্যাস ব্যতীত কোনও কর্ম সফল হয় না। তথাপি দেখা যাইতেছে, বিদ্যা দ্বারা বাচিক কর্মের যোগ্যতা হইতে পারে, যেমন মাষ্টারি ও ওকালতি; অমূর্ত বিজ্ঞান দ্বারা মাষ্টারি ব্যতীত অন্য কোনও কর্মের যোগ্যতা হয় না। আমরা এই বিজ্ঞান শিখিতেছি।

দেশে জ্ঞান প্রচার।

এখন একবার দেশের শিক্ষার দিকে তাকাই। দেখিতেছি, দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষা চলিতেছে। এবং লোকে শিক্ষিত হইতেছে বলিয়াই বিপুল মানবপরিবারের জীবনপ্রবাহ রুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু আমরা ইদানী এই শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠশালায় কি বিদ্যালয়ে, কি ইস্কুলে ও কলেজের শিক্ষাই শিক্ষা মনে করিতেছি। আমার বিবেচনায়, এই মস্ত ভুলের দরুণ আমরা এতদিন কিছু করিতে পারি নাই। পাঠশালায় বসিবার, কিংবা বিদ্যালয়ে ঢুকিবার বয়স যাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-সব অসংখ্য নর-নারী একেবারে বাদ দিয়া তাহাদের শিশুর দিকে তাকাইয়া আছি। ইহারা 'মানুষ' হইবে, শিক্ষিত হইবে, তার পর দেশ জাগিবে! কিন্তু এ যে বিশ বছরের কথা! এই বিশ বছর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে পরে কত বিশ বছর মৃতবৎ কাটাইতে হইবে, তাহা দেখিতেছি না। মনে করিতেছি, যে কয়েক জন ইংরেজী শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারাই মাথা দিয়া দেশটি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন। দেশ দেশ করিয়া বেড়াই, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় সে দেশ এক-একবার দেখা দিয়া অদৃশ্য হয়। দেশের বুভুক্ষিত দেহের মনের ও আত্মার ভোজ্য কই? লেখা-পড়া-গণা না শিখাইয়াও জ্ঞানের প্রবাহ চালাইতে পারা যায়, যে প্রবাহ গ্রামের পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হইয়া বাল-বৃদ্ধ, নর-নারী, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সকলের দ্বারে দ্বারে অমৃতের কণিকা বিতরণ করিতে পারিত। কৃষি ও শিল্পের 'প্রদর্শনী' নয়, 'নৈশ বিদ্যালয়'ও নয়; চাই জ্ঞানের আলো। একটু আলো দেখাও, একটু কথা কও, একটু হাত ধর; লোকের ধৈর্য আসুক; তাহারা ভাল মন্দ বুঝুক; তাহারা যে মানুষ, এই বোধ জন্মুক। বাঁকুড়ায় যে অবস্থা শুনিয়াছি, কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যে সে জেলারই বিশেষ, আর তাহা মনে হয় না।

নিজজ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান।

কিন্তু কিসের জ্ঞান? জ্ঞানের বিষয় দুইটি। আমি ভোক্তা; এবং আমি ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, তাহা আমার ভোগ্য। ভোক্তা ও ভোগ্য, জ্ঞানের দুই বিষয়। দুই বটে, কিন্তু ভোগ্য ছাড়িয়া ভোক্তা নাই, ভোক্তা ছাড়িয়া ভোগ্যও নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই, আমি কোনও দেশে কোনও কালে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আমি-র জ্ঞান নিজ-জ্ঞান। দেশ-বৃত্তে দেশ-জ্ঞান, এবং ইতিবৃত্তে কাল-জ্ঞান বর্ণিত হয়। এই দুই পরস্পর জড়িত। এই হেতু সংক্ষেপে এক নাম, 'দেশ-জ্ঞান' বলিতে পারা যায়। দেহ, মন, ও আত্মা, এই তিন লইয়া আমি ভোক্তা। এই তিনেরই জ্ঞান চাই, নতুবা আমার বাঁচা অসম্ভব। এই তিনের জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন মানুষ নাই। সকলেরই কিছু কিছু আছে বলিয়া প্রাণধারণ করিতে পারিতেছে। তেমনই, দেশ-জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, এমন মানুষ নাই। কিছু কিছু আছে বলিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেছে। এই জ্ঞানের সহিত শিক্ষাও কিছু কিছু পাইয়াছে। নিজ-জ্ঞানে জানি, অন্ন বিনা প্রাণরক্ষা হয় না; দেশ-জ্ঞানে জানি, এই দেশে এই কালে অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যাহাকে আমরা অকর্মণ্য বলি, সে যে জানে না, এমন নহে; সে করিতে পারে না বলিয়াই অকর্মণ্য।

শিক্ষার ধারা কি হইবে?

আমরা মনে করি, লিখিতে পড়িতে-গণিতে শেখার

নাম জ্ঞানলাভ করা ; আর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই ত্রিকর্ম শেখা চাই। যিনি বলেন, আমাদের দেশের লোকের শিক্ষা নাই, তিনি এই ত্রিকর্মের শিক্ষা মনে করেন। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। দেশ বিদ্যাহীন, দেশ আধুনিক কলাজ্ঞানহীন, দেশ পশ্চিমদেশের অর্থকরী শিক্ষাহীন। আমি বলি, যাহা আছে, তাহা ধরিয়া নাই-র দিকে হাত বাড়াইতে হইবে। নাই-র দিকে একাএক হাত বাড়াইলে ফলপ্রাপ্তি না হইতে পারে। গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা বসাইয়া মনে করুন, দেশের ছেলে-মেয়েকে ত্রিকর্ম শেখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেল। সে বিদ্যা টিকিবে কি ? টেকে, যদি রসের যোগান্ বরাবর পাইতে থাকে। এই রস এক-রকমের নয়, তাই ত দেশের শিক্ষা-ব্যাপার, একা একা তোমার আমার কর্ম নয়। যদি 'রাজা' অর্থে প্রজার বিক্ষিপ্ত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আধার হয়, সে রাজাই আবশ্যক রসের যোগান্ দিতে পারেন। ভবের হাট এত বড় যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার চলিতেছে। মানুষই ব্যাপারী। যাহার যে ব্যাপার, তাহার খোঁজ লইয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া যেমন-তেমন কর্ম নয়। ব্যাপার অগণ্য ; শিক্ষার ধারাও অগণ্য।

আদ্যশিক্ষায় অগণ্য ধারা ধরিতে হয় না ; ইহা অল্প সুবিধা নহে। এই শিক্ষা বিনা-বেতনে শিক্ষা, পিতামাতার ইচ্ছাধীন নয়, অবশ্যক। অতএব রাজাকে পিতামাতা হইতে হইবে। ইহার রূপ কি হইবে, সীমা কোথায় টানা যাইবে ? সাধারণ মত এই বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে, এবং সোজা সোজা অঙ্ক কষিতে পারিলেই আদ্যশিক্ষা সমাপ্ত। বোধ হয়, শিশুর নয় দশ বছর বয়সেই এই শিক্ষার ইতি হইবে। আরও কল্পনা করিতেছি, গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা বসিবে, হয় ত গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ী তৈয়ার হইবে, এবং পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে সেই কারায় চারি পাঁচ ঘণ্টা বসাইয়া লেখা পড়া গণা অভ্যাস করাইয়া করাইয়া তাহার শৈশব দুঃখময় করিয়া তোলা হইবে। আমি জানি, বহুর বিবেচনায়, এই ক্রমে লেখা-পড়া শিখিয়া দেশে বড় বড় লোকের উদয় হইয়াছে। এই যুক্তি নানা সময়ে নানা স্থানে শুনিয়া থাকি। যখনই কোনও ক্রমের কোনও ব্যবস্থার দোষ দেখাইবে, তখনই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই-সব তার্কিকের চিত্ত কখনও অপ্রসন্ন হয় না ; কারণ, ইহাঁরা 'আশঙ্কা' বলিয়া কিছু জানেন না, 'সম্ভাবনা' বলিয়া কিছু জানেন না। ইহাঁরা দেখেন না, যদি এক দুই তিন চারি জনের হিত হইয়াছে, পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ জনের হিত হয় নাই। যদি গুরুমশায়ের ঠেঙ্গা খাইয়া পাটোয়ারী দুই জন হইয়াছে, দশ জন পাটা-চুরি শিখিয়াছে, আর দশ জন যেমন গাধা তেমনই গাধা রহিয়া গিয়াছে। পাঠশালায় ইস্কুলে কলেজেও এমন শিক্ষক দেখিয়াছি, যিনি ছেলেদের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহিতে পারেন না, হাসিতে পারেন না, এই কঠোর শাসনে তাঁহারাই অবশ্য অধিক কৃতিত্ব পান, এবং বৃত্তির ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিরুৎসাহে অবসাদ জরায় দিনপাত করেন।

শিক্ষাকাল-বিভাগ।

আমি যে শিক্ষার প্রস্তাব করিতেছি, সে শিক্ষা ইহাঁদের দ্বারা চলিবে না। কি রকম শিক্ষক চাই, বিশেষতঃ আদ্য শিক্ষায়, তাহা পরে বলিতেছি। প্রথমে শিক্ষাকাল বিচার করি। বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই কাল ধরা যাইতে পারে। তার পর সংসারধর্ম পালন আছে। [illegible] ছয় উত্তীর্ণ হইলে। কদাচিৎ পাঁচ উত্তীর্ণ হইলে। অতএব সমগ্র শিক্ষাকাল ষোল বৎসর। ইহাকে চারি ধাপে (stages) ভাগ করিলে, প্রথম চারি বৎসরে আদ্যশিক্ষা, দ্বিতীয় চারি বৎসরে মধ্যশিক্ষা, তৃতীয় চারি বৎসরে অন্ত্যশিক্ষা, এবং শেষ চারি বৎসরে অধিশিক্ষা,—এই এই নাম দেওয়া যাইতে পারে। অধিশিক্ষা, যেমন বিদ্যা-মহাপীঠে শিক্ষা, সকলের ভাগ্যে ঘটিবে না, অন্ত্যশিক্ষা অনেকের ভাগ্যে ঘটিবে না। তথাপি ইহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। আঠার বছর বয়সে এই শিক্ষার শেষ। মধ্যশিক্ষা, চৌদ্দ বছর বয়সে শেষ হইবে, এবং আদ্য ও মধ্য লইয়া যে আট বৎসরের শিক্ষা, সেই শিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিতে চাই। চারি বৎসর ছেলে-মেয়েকে দুই-চারিখানা বই পড়াইয়া তাড়াইয়া দিলে আদ্যশিক্ষা ব্যর্থ হইবে। আদ্যশিক্ষা অবশ্য শিক্ষা-প্রধান হইবে, [illegible] শিক্ষায় তদুপরি কিঞ্চিৎ বিদ্যার যোগ ঘটিবে। অন্ত্যশিক্ষায় কিছু পূর্ণতা পাইবে। মধ্যশিক্ষিত বালক ইংরেজী ইস্কুলে যাইতে পারিবে, এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যা-

মহাপীঠে প্রবেশ করিতে পারিবে। বিদ্যা না চাহিলে সে অন্ত্যশিক্ষাশালায় যাইবে, এবং লক্ষ্মীর উপাসক হইয়াও সরস্বতীকে সমাদর করিতে শিখিবে। শিক্ষা বহুমুখী চাই, বিদ্যাও বহুমুখী চাই। নতুবা সমাজ-কলের চাকায় চাকায় ঘষা-ঘষিতে শক্তির অপচয় হয়, শিক্ষারও উপযোগিতাও হ্রাস পায়।

কেহ মনে করিবেন না, আমি লেখা-পড়া-গণা শেখার নিন্দা করিতেছি। এত বড় একটা কৌশল, যাহার আবিষ্কারে মানুষ এত বড় হইয়াছে, পশুকে দূরে ফেলিয়া আকাশে উড্ডীন হইতেছে, জ্ঞানের বর্তিকায় যুগযুগান্তরের অন্ধকার ভেদ করিতেছে, তাহার নিন্দা কে কোথায় করিতে পারে? তবে, স্বভাব নাকি মলেও যায় না; তাই লেখা-পড়া হাজার শিখিয়াও, কৃতবিদ্য ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এক এক মানুষ দানব হইয়া থাকিতেছে।

শিশু শিক্ষা।

বক্তব্য একটু বিস্তার করিতেছি। শিশু অল্পে অল্পে দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, ভাঙ্গিয়া জুড়িয়া, বিজ্ঞান-শালায় বিজ্ঞানার্থী যেমন পরীক্ষা করে তেমন পরীক্ষা করিয়া, দ্রব্যের গুণ আবিষ্কার করে, পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ভূয়োদর্শন লাভ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করে। পদে পদে ভুল করে, পদে পদে ঠকে। ভুল করুক; কে না ভুল করে? কিন্তু এই ভুলেই যে শিক্ষা হয়, সেই পাকা শিক্ষা। কথা শুনিয়া, বই পড়িয়া সে শিক্ষা অসম্ভব। চারি পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে এই শিক্ষা দিতে চাই। তাহাকে লইয়া এখানে-সেখানে বেড়াইতে চাই; সে দেখুক, শুনুক, ভূয়োদর্শন লাভ করুক। তাহাকে বিজ্ঞানার্থী পরীক্ষক করিতে চাই। তাহার নিকটে নানাবিধ খেলার সামগ্রী রাখিব; সে খেলিবে, সে সবের ক্রিয়া ও গুণ দেখিতে থাকিবে। শিক্ষা-শালার গুরুমশায় প্রায় সাক্ষীগোপাল হইয়া থাকিবেন। "প্রায়" বলিতেছি; কারণ, তিনি দৃশ্যতঃ সাক্ষী হইলেও মূলে যন্ত্রী। শিশু তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইবে।

পাঠশালা ও শিক্ষাশালা।

কেহ কেহ বলিবেন, ইহা আর নূতন কথা কি। আমি নূতন কিছু করিতে বা বলিতে বসি নাই। যিনি শিশু-চরিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই শিশু-শিক্ষাও জানিয়াছেন। দুঃখের কথা এই, যাহা জানা, তাহা করা হইতেছে না। বিদ্যাকরী শিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালা আছে; জ্ঞানকরী শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষা-শালা চাই। ইস্কুল ও কলেজের শিক্ষক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, গ্রামের ছেলেরা যাহারা গ্রামে পালিত হইয়াছে, এবং গ্রামে ছুটির সময় কাটায়, তাহাদের ভূয়োদর্শন যত, নগরের ছেলেদের তত নয়। গ্রামের ছেলের উপস্থিতবুদ্ধি যত, নগরের ছেলের তত নয়। এই প্রভেদের কারণ স্পষ্ট। বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায়, যাহা অজ্ঞাত ভাবে ঘটিতেছে, তাহা জ্ঞাতসারে করাইতে হইবে। গ্রামে কৃষি, কলা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, পূজা, পার্বণ, যাত্রা, উৎসব, যাহা কিছু হইয়া থাকে, শিশুকে সব দেখাইতে হইবে, এবং সুবিধা হইলে তাহাকে দিয়া করাইতে হইবে। গ্রামের পুকুর, নদী, খাল, বিল, মাঠ, বাগান, পথ, ঘাট, গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতি তাহার কিছুই অচেনা থাকিবে না। ডাক শুনিয়া পাখীর নাম, গন্ধ শুঁকিয়া ফুলের নাম, চিত্র দেখিয়া গাছের নাম বলিতে পারিবে। হাটে যাইবে, সুবিধা হইলে সে নিজে কিছু কিছু কিনিবে, কখনও বা কিছু বেচিবে। শোনা গেল, পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, গুরুমশায় ছেলেদিকে লইয়া পুকুর-পাড়ে শিক্ষা-শালা করিলেন। অমুকের বাড়ীতে বিবাহ, ছেলে সঙ্গে গুরুমশায় সে বাড়ীতে নিশ্চয় উপস্থিত। এইরূপ, শিক্ষার অগণ্য ক্ষেত্র আছে। বর্ত্তমান কালের শিক্ষা বাড়ীর কুঠরীতে শিক্ষা, সংসার-বৈরাগীর শিক্ষা। সেখানে বই-কাগজ-কলম লইয়া শিক্ষা। কদাচিৎ বাগান থাকে; কিন্তু একে ছোট, তাহাও ছেলেদের নয়, যেখানে তাহারা যা ইচ্ছা তা রুইতে বসাইতে পারে। এত কৃত্রিম আয়োজনের মাঝে থাকিয়া শিক্ষা-লোলুপ শিশুর মন কৃত্রিম পরিখায় ঘুরিয়া বেড়ায়। হায়, সে কিছুই দেখিল না, কিছুই শুনিল না, কিছুই করিল না; কেবল লেখা-পড়া-গণা শিখিল। এই ক্রমে সে বিদ্বান্ হইতে পারে, কিন্তু কাজের লোক হইতে পারে না।

দেশ-ভ্রমণ ব্যতীত দেশজ্ঞান জন্মে না। শিশুর দেশ, তাহার গ্রাম। নয় দশ বছর বয়সে আদ্যশিক্ষা শেষ হইবার কথা। চারি পাঁচ বছরে যদি শিশু তাহার

গামখানির জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে, আমি মনে করি, যথেষ্ট শিখিয়াছে। তাহার বিকাশোন্মুখ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, বাগিন্দ্রিয় ও হস্তপদ স্ব স্ব কর্মে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার ইচ্ছার আয়ত্ত হইয়াছে, এবং যন্ত্রবৎ চালিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। চিত্র লিখিতে শিখিয়াছে, ইচ্ছা করিলে গ্রামের রাস্তাগুলি লিখিয়া দিতে পারে। এমন চেঁচাইতে পারে যে, এক মাইল দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। চলিয়া চলিয়া, প্রায়ই শুধু পায়ে, শুধু গায়ে, শুধু মাথায়, তাহার দেহ কষ্টসহ হইয়াছে। গাছে চড়িয়া মনে সাহস জন্মিয়াছে, জলে ঝাঁপাইয়া আনন্দ বুঝিয়াছে। এমন 'দুষ্টু' হইয়াছে যে, মা ছেলের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। একদিন ছেলের মা আসিয়া বলিল,

'বাবা, ঝন্টিকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেও।"

'কেন, কি হয়েছে?'

'ভারি দুষ্টু হয়েছে, একটি কথা শোনে না।'

'এই কারণে জেলখানায় পাঠাবে?'

'এই দুপর বেলা, কি রোদ! একটু শোবে না, কামরাঙ্গা গাছের তলায় ছুটাছুটি করে, গাছে ঢিল ছোঁড়ে, গাছে চড়তে যায়।'

'বোধ হয় কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা। ওকে কামরাঙ্গা দিলেই হয়।'

'কামরাঙ্গা খেলে পেট কামড়ায়। এখন তাও পাকে নাই।'

'শুধু কামরাঙ্গা খাবার ইচ্ছা নয়, গাছে চড়বারও ইচ্ছা। কামরাঙ্গা গাছে চড়তে পারবে না। পাঁচীরের ধারে যে পেয়ারা-গাছ আছে, তাতে চড়তে বলো।'

'তা হলে আর রক্ষা থাকবে? গাছে দিনরাত বসে থাকবে, আর কাঁচা পেয়ারা খাবে।'

'কিছুই কর্তে দিবে না? কেমন ক'রে বাঁচবে, বাড়বে?'

আর একদিন কন্যা আসিয়া বলিল,

'বাবা, ঝন্টিকে ইস্কুলে না দিলে আর রাখতে পারা যাবে না।'

'কেন, কি করেছে?'

'দুপর বেলা চৌকীর উপর টুল রেখে তাকের ওষুধের বোতল খুলে ওষুধ ঢেলে সব একাকার করেছে! কত ওষুধ খেয়েছে কি না, জানি না।'

'বোতলে কি আছে, দেখাও নাই বুঝি?'

'ওষুধ আর দেখাব কি?'

ইত্যাদি। এই রূপ, দুষ্টু দৌহিত্রের বিরুদ্ধে মাতামহকে বহু অভিযোগ শুনিতে হইত। শিশুকে নিত্য শান্ত করিতে করিতে দেশটাই শান্ত হইয়া গিয়াছে। শান্ত ছেলে পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু "কাজের লোক" হইতে পারে না।

কিন্তু ছেলেরা লেখাপড়া শিখিবে না? নিশ্চয়ই শিখিবে। চারিবৎসর, হারাহারি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা শিখিলে যথেষ্ট। সোজা সোজা বই পড়িতে ও বুঝিতে; সোজা সোজা কথা জুড়িয়া বলিতে, স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে ও সোজা সোজা অঙ্ক কষিতে শিখিতে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা পর্যাপ্ত। চাণক্য-শ্লোক বোঝে না, কিন্তু শুদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া আওড়াইতে পারিবে; নামতা রচিতে পারে না, কিন্তু অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিবে। শিশুকে বিদ্বান্ করিবার প্রয়াসে তাহাকে ভাষা শেখানা হয় না; 'শেখানা' হয়, সাহিত্য (কেহ কেহ নাম রাখিয়াছেন শিশু-সাহিত্য, যদিও বুড়া রচনা)। তেমনই যে সংখ্যাজ্ঞানে বড় বড় গৃহস্থেরও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহা না শিখাইয়া মনঃকল্পিত ঘড়ীর কাঁটার দৌড়, লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ গুণনীয়ক প্রভৃতি গরিষ্ঠ কুপথ্য দ্বারা শিশুর মস্তক পূর্ণ করা হয়। উহা পূর্ণ হইলে তাহা প্রবাহিত হইয়া যাইত, কিন্তু মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহের পথ নাই।

আচার ব্যবহার শিক্ষা।

লেখা-পড়া-গণা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় শিক্ষা আছে। সেটা আচার ও ব্যবহার শিক্ষা। যে আচার নিষ্ঠাচার নামে খ্যাত, তাহা শিখিতে হয়। তাহা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি (instinct) বশে বুভুক্ষা ও পিপাসার ন্যায় আপনি আসে না। ইহার অপর নাম দিন-চর্য্যা। ইহা কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বা শরীরপালন নহে; মনের পালন ও দমনও ইহার লক্ষ্য। দেশাচারও উপেক্ষার বিষয় নহে। বড় হইয়া, জ্ঞানবান্ হইয়া, কেহ দেশাচার কিংবা কুলাচার

মানিবে কি ভাঙ্গিবে, তাহার আশঙ্কা লইয়া শিশুশিক্ষা চলিতে পারে না। শৈশবকাল শিক্ষার কাল, ক্রিয়া অভ্যাসের কাল। কেমন করিয়া চলিতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, কাপড় পরিতে হয়, দাঁত মাজিতে, খাইতে, বসিতে শুইতে হয়,—এ সবের শিক্ষা বাড়ীর উপর বরাত দিলে চলিবে না। তেমনই, কেমন করিয়া কখন ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়, তাহারও অভ্যাস করাইতে হইবে। বাড়ীর ভরসা নাই বলিয়াই শিশুশিক্ষা এত কঠিন হইয়াছে। আচার সমাজগত; আচারে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান; কেহ বঙ্গের হিন্দু, কেহ পঞ্জাবের, ইত্যাদি। আচারতত্ত্বে না গিয়া বলা যাইতে পারে, যাহার যে সমাজ (বা ধর্ম), তাহার পক্ষে সে সমাজের (বা ধর্মের) আচার শ্রেষ্ঠ। ব্যবহারও দ্বিবিধ। নিত্য ব্যবহার, অর্থাৎ শিষ্ট ও সাধু ব্যবহার, সকল সমাজের প্রায় এক। কিন্তু দেশ-ব্যবহারও আছে। গুরুজনের নিকটে কি ভাবে দাঁড়াইতে হয়, তাঁহাদের সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, কি ভাবে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়, ইত্যাদি না শিখাইলে শিশু অবিনীত হইয়া বড় হইবে। শিক্ষার দ্বারা বি-ন-য় অভ্যাস হয়; বেতের ভয় কি জরিমানার ভয়, এমন কি পুরস্কারের উৎকোচ দ্বারা শিক্ষা অর্থাৎ অভ্যাস জন্মিতে পারে না। নিষেধ নহে, বিধি চাই। নিষেধের সঙ্গে বিধি প্রচ্ছন্ন থাকে বটে; কিন্তু এত ঘুরাইয়া উল্টা বুঝাইয়া, বিনয় শিক্ষা শিশুর পক্ষে সহজ হয় না।

আত্মশিক্ষক।

শিশু রূপ উপাদান লইয়া তাহাকে যন্ত্রবৎ করিয়া তোলার নাম শিশু-শিক্ষা। দেশে সে যন্ত্রী কই, তেমন গুরু কই? একজন দুইজন নহে, যত গ্রাম তত গুরু চাই। এ দিকে, আজ্ঞামাত্র গুরু জন্মে না। কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান্ বলে কি, যেহেতু দেশে ইট নাই, অতএব শূন্য মাঠে পড়িয়া থাকা কর্তব্য? মাটির কাঁথে খড়ের চালাও হইতে পারে। প্রথম প্রথম কাঁচি ঘরই তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিক্ষার আয়োজন চলিতে থাকিবে। আদ্য শিক্ষায় যে অফুরন্ত ধৈর্য, অফুরন্ত উৎসাহ, ও শিশু-বাৎসল্য চাই, সে তিন গুণ সুলভ নহে। কিন্তু রক্ষা এই, বিদ্বান্ চাই না, 'পণ্ডিত', প্রৌঢ় কিম্বা বৃদ্ধ আদৌ চাই না। যুবা গুরুর অভিজ্ঞতা থাকে না; ছেলেমি থাকিতে পারে, অন্য তিন গুণও থাকিতে পারে। বিশেষতঃ এই গুরুকে শিখাইয়া লইতে পারা যায়; পাকা গুরুকে কাঁচাইতে পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, পাঠশালা নয়, শিক্ষা-শালা চাহিতেছি। পাঠশালার পণ্ডিত, আর শিক্ষাশালার শিক্ষক এক নহেন। এই রূপ, যে-সব পাঠশালা-নীক্ষক (inspector) আছেন, তাঁহাদেরও কর্তব্য সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হইবে। বিদ্যা অল্প হউক, যাঁহারা উত্তম শিক্ষক, তাঁহারাই নীক্ষক পদের যোগ্য।

সর্বাপেক্ষা ভাবনার কথা, আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সংস্কার আছে, সে সংস্কার একদিনে পরিবর্তিত হইবে না। দেখা গিয়াছে, 'শিক্ষিত' পিতামাতাও ছেলের পড়া বহির পাতা গণিয়া তাহার শিক্ষার পরিমাণ করেন। পাঠশালা কিম্বা বিদ্যালয়ে বিদ্যার পরিমাণ করা হইয়া থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও না হয়, তাহা নহে; কিন্তু প্রথম হইতেই শিক্ষা-শালার লক্ষ্য স্থির রাখিলে গোলে হরিবোল হইবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ফাটালের ফুল

পাষাণ চেয়ে পাষাণ প্রাচীর,
তাহার কঠিন গাত্রে
কেমন করে ফুল ফোটালে
একটি বাদল রাত্রে!
একটি নিশার শব-সাধনায়
এমন মহাসিদ্ধি!
রূপ-সাগরের প্রবাল-দ্বীপের
এম্‌নি কি হয় বৃদ্ধি?
রুদ্র নভে করলে কে এই
রামধনুকের সৃষ্টি?
তীব্র শোকের উগ্র বুকে
এ কার সুধা-দৃষ্টি!
আন্‌লে কে এই সুরের সাড়া
এমন নীরস গদ্যে,
নূরজাহানের জন্ম এ যে
উষর মরুর মধ্যে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আবার সিংহল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়েতে চড়িলাম। এই গাড়ীতে সমস্ত রাত চলিয়া অনেক নারিকেলের বাগান, চায়ের ক্ষেত ডাহিনে বাঁয়ে ফেলিয়া লঙ্কার প্রাচীন রাজধানী অনুরাজপুরের মধ্য দিয়া সকাল বেলা কলম্বো সহরে পৌঁছিলাম।

কলম্বো সহরে নামিয়াই মনে হইল যেন সব ছবির মতন। ভারতবর্ষে কতস্থানে গিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর সহর একটিও দেখি নাই। বেশ বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা। দুপাশের ঘরগুলি কতক বা ছাত-করা, কতক বা টালি-দেওয়া, কতক বা খোলায় ছাওয়া। কিন্তু ঘরগুলির গঠনের প্রণালী সমস্তই সাহেবী ঢঙের। হোটেলের ত অন্ত নাই। সমস্তগুলিই বিলাতী ধরণের। দৈনিক শুল্ক সাধারণতঃ ৫।৬ টাকা। কিন্তু বিশেষ সম্ভ্রান্তগুলিতে ১০।১৫ টাকা পর্য্যন্ত আছে। একটু আসিতেই পথে কলম্বোর উচ্চ লাইট হাউস্ বা ক্লক্ টাওয়ার। কলম্বো সহরের উত্তর দিকে কলিকাতার গঙ্গার এক-তৃতীয়াংশ আন্দাজ চওড়া কেলনি-গঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীর উপর সুদৃশ্য ভিক্টোরিয়া ব্রিজ ও তারই পাশে খেয়া ঘাট। দুখানা করিয়া লম্বা ধরণের নৌকা একত্র বাঁধা ও মধ্যে পাটাতন দেওয়া। তার উপর হেলানি দেওয়া বেঞ্চি ও উপরে চৌকোনা ছাপর দেওয়া আছে। চীন দেশেও শুনিয়াছি এই রকমের খেয়ার বন্দোবস্ত। অনেকে বলে যে এখানকার আদিম অধিবাসীরা চীন হইতে এই স্থানে আসিয়াছিল এবং তখন হইতেই এই দেশে পারাপারের এই চীন পদ্ধতি চলিতেছে। সহরের পশ্চিমে, পশ্চিম দক্ষিণ কোণে, ও উত্তর-পশ্চিম কোণে সমুদ্র। বন্দরটি অতি সুন্দর। সমুদ্রের মুখ জুড়িয়া তিনটি ব্রেক্‌ওয়াটারের ঢেউ-আড়িবার বাঁধ। মধ্যে দুই স্থানে দুইটি সাঁকো আছে। তার মধ্যে প্রায় ৩০।৩৫ খানা জাহাজ সর্ব্বদাই বন্দরের মধ্যে বাঁধা থাকে। ব্রেক্‌ওয়াটারের বাহিরে মাঝ দরিয়াতেও কতকগুলি জাহাজ থাকে। বেশ সুন্দর জেটি। নির্দ্দিষ্ট ভাড়ায় জাহাজে চড়িবার বা বন্দরের মধ্যে বেড়াইবার জন্য অনেক নৌকা ঘোরাফেরা করিতেছে। এত বিদেশী লোকের এখানে যাতায়াত, কিন্তু এমন সুবন্দোবস্ত যে নিরীহ যাত্রীদের উপর অত্যাচার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পুলিশ আছে। কেহ কোনও রূপ উৎপাত করিলে তার কাছে প্রতিবিধান পাওয়া যায়। শুল্কবিভাগের এখানে খুব কড়াকড়ি। কোনও জিনিষ লঙ্কায় আসিলে বা কোনও জিনিষ লঙ্কা থেকে বাহিরে গেলেই শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক হইতেই এখানকার রাজস্বের প্রধান আয়। এখানে ইন্‌কাম্ টেক্স্ নাই। দেশময় ছোট ছোট তালুকদারেরা বিনা খাজনায় আপন আপন জমি ভোগ করে। অতি অল্পমাত্র জমি সরকারের খাস দখলে আছে, তাহাই সরকার বন্দোবস্ত করিতে পারেন বা বিক্রী করিতে পারেন। বড় বড় জমিদারেরা অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রজা বিলি করেন। সমুদ্রের মুক্তা সংগ্রহ, লবণ, বাগানের উপর টেক্স্, ষ্ট্যাম্প, পোষ্টেজ, গাড়ীর টেক্স, পুলিশ টেক্স, এইগুলি হইতেই এখানকার রাজস্ব প্রায়শঃ সংগৃহীত হয়। সাধারণ লোকের অবস্থা এখানে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল বলিয়াই মনে হইল, আমাদের দেশের মত অনাহারক্লিষ্ট নয়। সেদিন কুলিদের ও শ্রমজীবীদের আড্ডা ঘুরিয়া আসিলাম। তাদের বাসস্থান বাঙ্‌লা দেশের কুলিমজুরদের বাসস্থানের চেয়ে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেখিলেই মনে হয় যে তারা খাইয়া পরিয়া এক রকম ভালই আছে।

সিংহলের য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় অধিবাসী প্রায় ৩০,০০০ কি ৪০,০০০; নিম্ন সিংহলী প্রায় ১৫ লক্ষ; কাণ্ডীয় সিংহলী প্রায় ৯০০০০; তামিল প্রায় ১০০০০; মুর প্রায় ২২৫০০০; মালয় প্রায় ১১০০০; স্থানীয় আদিম অধিবাসী ব্যাধসম্প্রদায় প্রায় ১২০০০; বাণিজ্যের জন্য সমাগত বিভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাও প্রায় সাত কি আট হাজার হইবে।

টার্নার সাহেবের দ্বারা সংস্কৃত মহাবংশ গ্রন্থ বাহির হইবার পূর্ব্বে, সিংহলের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে কি না এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। মহাবংশের প্রাচীন খণ্ড, রাজা ধাতুসেনের পিতৃব্য মহানামের দ্বারা ৪৫ হইতে ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে লিখিত হয়। এই খণ্ডে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ হইতে ৩০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সিংহল-বিজেতা বাঙালী বিজয় সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাসেন পর্য্যন্ত রাজগণের ইতিহাস ইহাতে

সিংহলের কথা

মাদ্রাজ হইতে সাউথ্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীর দুধারে তাল খেজুর নারিকেল কলা নিম আমের গাছ সারি দিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বালি-জমির মধ্যে দু-মাইল চারি-মাইল ধরিয়া হয়ত কেবল ফণিমনসার ঝোপ। পাশে পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি অনেক দূর পর্য্যন্ত বরাবর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া গেছে। ধারা শ্রাবণের আমলে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম কতই জলঝড় পথে পাইব। কিন্তু এ দক্ষিণাপথের দুপাশের ক্ষেত দেখি কতদিনের অনাবৃষ্টিতে শুকাইয়া কাঠ হইয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে অনেকগুলি জমিতে যোড়ম্ শস্যের বেশ জোর দেখিলাম। যোড়ম্ ঠিক্ চালের মতনই সিদ্ধ করিয়া দক্ষিণদেশের গরিব লোকেরা খায়। এ শস্যের বিশেষত্ব এই যে এর ফসলের জন্য তেমন জলের বা চাষের প্রয়োজন হয় না, ছড়াইয়া দিলেই বেশ ফসল হয়।

এদিকে ভারতবর্ষের শেষপ্রান্ত মণ্ডপম্। মণ্ডপম্ ষ্টেশনে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য লঙ্কাশাসনের নিযুক্ত ডাক্তার আছে। মণ্ডপমের পরেই রামেশ্বর দ্বীপ। এই ষ্টেশনে নানাদেশীয় বিস্তর তীর্থযাত্রী দেখিলাম। রেলের উপর হইতেই রামেশ্বরের দক্ষিণ দেশের ঢঙে গড়া সুন্দর মন্দিরগুলি দেখা যায়। রামেশ্বর হইতে ৪৫ মাইল দূরে সেতুবন্ধ। এই স্থানেই সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন ধনুষ্কোটি। ভারতবর্ষের টাকা লঙ্কায় চলে না। মণ্ডপম্ হইতেই একজন পোদ্দার বরাবর গাড়ীতে চলিয়াছে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া যার যার টাকা বদ্‌লানর প্রয়োজন তাকে টাকা বদ্‌লাইয়া দিয়া যাইতেছে। লঙ্কার এক টাকা ভারতবর্ষের এক টাকার সমান। কিন্তু সেখানে এক টাকায় ১০০ পয়সা হয়, সে পয়সাগুলির নাম সেণ্ট্। ১০ সেণ্টে এক দুয়ানি, ২৫ সেণ্টে সিকি, ৫০ সেণ্টে আধুলি। ধনুষ্কোটিতে পৌছিয়া মালপত্র কুলির মাথায় দিয়া ফেরি ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার যে পথে চলে তারই একপাশে বরাবর লঙ্কা পর্য্যন্ত বালিয়াড়ি (sand reefs) আছে। তাকেই লোকে Adam's Bridge রামের সেতুবন্ধ বলে। ষ্টীমার হইতে তালাইমানার দ্বীপে নামিয়া

কলম্বোর পথ।

লিখিত হইয়াছে। মহাসেনের পর হইতেই গুলুবংশ বা নীচবংশ আরম্ভ হয়। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রক্রমবাহুর সময়ে মহাসেনের পর হইতে সিংহল-রাজগণের ইতিহাস লিখিত হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ডীর রাজা কীর্ত্তিশ্রীর আদেশে ১২৬৬ হইতে ১৭৫৮ পর্য্যন্ত সমস্ত সিংহল রাজগণের ইতিহাসই ইহাতে যোজিত হইয়াছে। মহাবংশ ছাড়া আরও অন্য অন্য সাময়িক ঘটনার বিবৃতি ও ইতিহাসও পাওয়া যায়। এই মহাবংশকে অবলম্বন করিয়া টার্নার্ সাহেব ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার Epitome of the History of Ceylon লেখেন।

সহিত ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ করিয়া যক্ষিণী কুবেণীর সহিত মিলিত হন। সিংহল-ইতিহাস হইতে জানা যায় যে বিজয় প্রথম বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতীয় উপকূলে কোনও আশ্রয় না পাইয়া পরিশেষে লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ করেন। লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিয়া তিনি তাঁর সিংহ উপাধি অনুসারে এই দ্বীপের সিংহল নাম দেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গকে সিংহলের নানাস্থানে কৃষিকার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি সন্তান সহিত তাঁহার প্রথম যক্ষিণী পত্নী কুবেণীকে বিতাড়িত করেন ও এক রাজকন্যা বিবাহ করেন। রাজমহষীর গর্ভে বিজয়ের

সিংহলী ঘানীগাছ।

এ দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা যে কোন্ জাতিভুক্ত ছিল তাহা বলা কঠিন। কেহ বলেন যে ইহারা চীন জাতীয় ছিল, কেহ কেহ বলেন যে ইহারা দ্রাবিড় জাতীয়ই ছিল। ইহারাই প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে রক্ষ বা রাক্ষস নামে পরিচিত। কোনও কোনও স্থানে ইহাদিগকে "নাগ" বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবংশে বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয় সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে বিজয় বঙ্গদেশ হইতে কতকগুলি অনুচর

কোনও সন্তান না হওয়ায় বিজয়ের কোনও নিকট আত্মীয় পাণ্ডবাস রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে সিংহলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। উপরের ভাগকে পিহিতি বলিত, মধ্য ভাগকে রোহনো ও নিম্নভাগকে ময়রত্ত বলিত। কৃষিকার্য্যের জন্য পাণ্ডবাস তাঁহার রাজধানী অনুরাজপুরে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। পরবর্ত্তী রাজগণও এইরূপ আরও অনেক দীঘি খনন করেন ও ফল-পুষ্পাদির উদ্যান রোপণের

ব্যবস্থা করেন। বিজয় সিংহ ও তাঁহার পরবর্ত্তীরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। যদিও তাঁহারা নিজেরা ব্রহ্মোপাসক ছিলেন, তথাপি তাঁহারা যক্ষ-মন্দিরাদির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০৭ বৎসরে তিস্‌সের রাজত্বকালে মগধ-রাজকুমার মহিন্দো সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সহিত বৌদ্ধ মন্দিরের উদ্দেশে ভূমিদান-পদ্ধতিও খুব প্রসার লাভ করে; এই-সমস্ত ভূমিতে কৃষিকার্য্যের জন্য বড় বড় দীঘিও খনন করা আরম্ভ হয়। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রকাণ্ড দীঘি খনন করিবার পদ্ধতি এ দেশে চলিতেছিল এবং ইহাতেই এ দেশের কৃষিকার্য্য এত পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ৩০২ খ্রীষ্টাব্দে মহাসেনের পর হইতেই নিম্নজাতীয় গুলুবংশীয় রাজগণ সিংহলে রাজত্ব আরম্ভ করেন। বিজয় সিংহের বংশে প্রায় ৫১ জন রাজা রাজত্ব করেন। গুলুবংশেও ৬২ জন রাজা ৩০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহল শাসন করেন। এই বংশের রাজত্বকাল সিংহলের পক্ষে বড় সুখের হয় নাই। পরস্পর গৃহবিবাদ, বাহিরের দিক হইতে দক্ষিণ ভারতের মালাবারীগণের আক্রমণ হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সিংহল দেশ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতেছিল। ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে কোনও নির্ব্বাসিত রাজবংশীয় কুমার বিজয়বাহু মালাবারীগণকে বিতাড়িত করিয়া সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র প্রক্রমবাহু সমস্ত সিংহলবাসীর একমাত্র রাজা স্বরূপে সিংহাসন অধিকার করেন (১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। সিংহলের রাজগণের মধ্যে তিস্‌সের পর প্রক্রমবাহুর খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইনি জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্ম শৌর্য্য সকল বিষয়েই অদ্বিতীয় বলিয়া বারংবার মহাবংশ গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। প্রক্রমবাহু ১৩৯৫টি কৃষিদীর্ঘিকার সংস্কার করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমধিক উন্নতি বিধান করেন ও কাম্বোডিয়া ও অররমন প্রদেশ আক্রমণ করেন। প্রক্রমবাহুর মৃত্যুর ৩০ বৎসরের মধ্যেই সিংহলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল ও মালাবারীগণ পুনরায় ১২১২ খ্রীষ্টাব্দে মঘের অধিনায়কতায় সিংহল অধিকার করে। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়বাহু (তৃতীয়) মালাবারীগণের নিকট হইতে কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করেন। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত প্রক্রমবাহু (তৃতীয়) আবার মালাবারীগণের নিকট হইতে কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজদের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিংহলীরা কখনই মালাবারীগণের হাত হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারে নাই। একবার (১৪০৫) খৃষ্টাব্দে চীন সেনানী চিংহো লঙ্কার বৌদ্ধ মন্দিরে উপহার দিতে আগমন করেন, কিন্তু সিংহলরাজ বিজয়বাহু (ষষ্ঠ) তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইহার ফলে কিছুদিন পরে চিংহো বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া বিজয়-বাহুকে পরাজিত করিয়া সপরিবারে তাঁহাকে বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া যান। চীন সম্রাট অনুকম্পা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশে ফিরাইয়া পাঠান।

যে-সমস্ত ভারতীয় মালাবারীগণ লঙ্কা আক্রমণ করেন ও রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন। কাজেই, বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে অনেক হিন্দু মন্দিরও দেখা যায়। এই-সমস্ত হিন্দু মন্দিরে গণেশ, শিবলিঙ্গ, নটরাজ শিব, সুব্রহ্মণ্যদেব (কার্ত্তিকেয়) প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চিত হয়। বিষ্ণু-মূর্ত্তিও অনেক স্থানে দেখা যায়।

১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ধর্ম্মপ্রক্রমবাহু (নবম) দক্ষিণ লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিলেন, মালাবারীরা জাফ্‌নাপটমে রাজধানী করিয়া উত্তর লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিল, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরগুলি মুরগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তখন লরেন্‌জো নামক এক পর্ত্তুগীজের জাহাজ বায়ুবলে দক্ষিণ লঙ্কার গল্ বন্দরে উপনীত হয়। মুরেরা তখন জাহাজে মাল ভরিতেছিল, পর্ত্তুগীজদের আগমনে তাহারা ভীত হয়, এবং একজন সিংহলীকে রাজা সাজাইয়া তাহার নিকট তাহাদের লইয়া যায়। এই মিথ্যা রাজা তাহাদিগকে কলম্বোতে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেয়। বার বৎসর পরে লোকো সেরেজ কলম্বোতে আগমন করেন ও প্রক্রমবাহুকে প্রলুব্ধ করিয়া তথায় বাণিজ্যের অবসর পান। বাণিজ্যের অবসর পাইয়াই তাঁহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু মধ্যপ্রদেশের সিংহলীরা পর্ত্তুগীজদের এই ব্যাপারে ও তাহাদের সহিত প্রক্রম-বাহুর সন্ধিতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। তাহাদের উপর্য্যুপরি

আক্রমণে প্রক্রমবাহু সিংহাসনচ্যুত হয়। এইরূপে পর্ত্তুগীজদের সহিত সিংহলীদের বিবাদ চলিতে থাকে এবং ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা মালাবারীদের হাত হইতে উত্তরের জাফ্না রাজধানী অধিকার করে। এদিকে ওলন্দাজেরা ক্রমশঃ লঙ্কার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল এবং কাণ্ডীর রাজা বিমলধর্ম্মের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইতেছিল। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিমলধর্ম্মের ভ্রাতা রাজা সেনরাট কৌশলক্রমে পর্ত্তুগীজদের এক বিরাট বাহিনী ধ্বংস করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রাজসিংহ ধ্বংসাবশিষ্ট পর্ত্তুগীজদিগকে পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। ওলন্দাজেরা ও-সমস্ত ব্যাপারের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া শুধু বাণিজ্য দ্বারা ধনবৃদ্ধির চেষ্টায়ই ব্যাপৃত রহিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ডীর রাজা ওলন্দাজদিগকে তাড়াইবার জন্য ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন এবং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত লঙ্কাদ্বীপ ইংরেজাধিকৃত হইল।

লঙ্কার শাসনভার এখন লণ্ডনের কলোনিয়াল অফিসের সেক্রেটারির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে। স্থানীয় কাজ চালাইবার ভার একজন গবর্ণর ও পাঁচজন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর

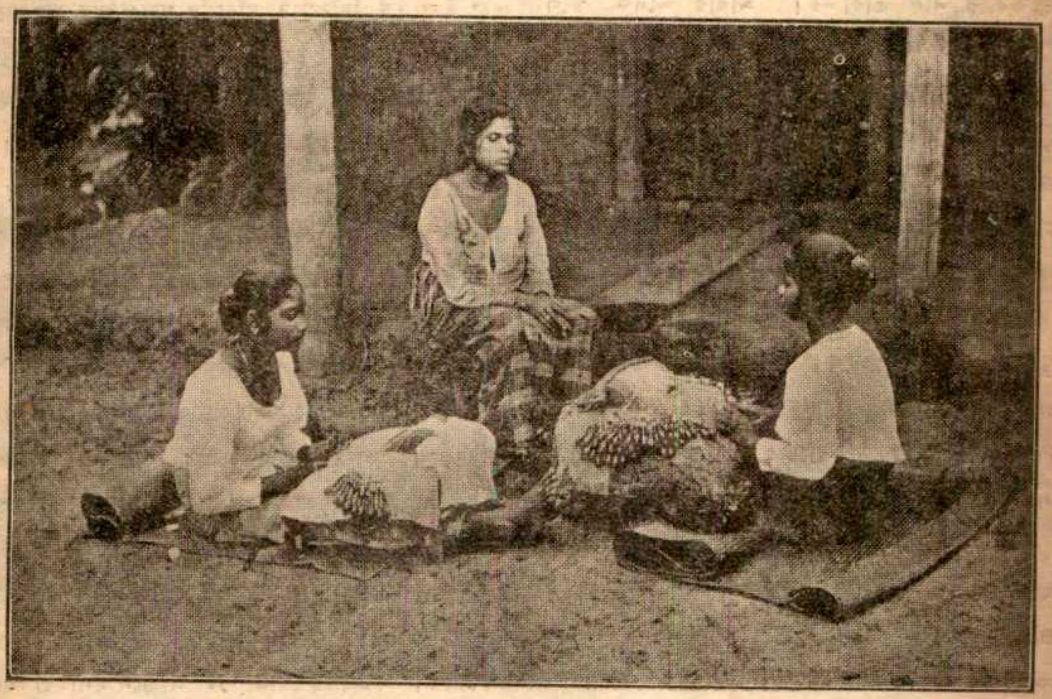

সিংহলী মেয়েদের লেস্ বুনন।

কোনওক্রমে বিতাড়িত করিতে না পারিয়া বাটাভিয়ার ওলন্দাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজদের সাহায্যে যখন ক্রমশঃ পর্ত্তুগীজরা বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, তখন আবার ওলন্দাজদের ভয়ে রাজসিংহ কম্পমান হইয়া উঠিলেন। ওলন্দাজেরা ক্রমশঃ রাজসিংহের তরফে যে-সমস্ত দুর্গ জয় করিয়াছিল সেগুলি নিজেরা দখল করিয়া বসিল। পর্ত্তুগীজেরা দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য উঠিয়া হাতে ন্যস্ত আছে। আইন-কানুনের ভার গবর্ণর ও ঐ পাঁচজন প্রধান সচিব, চার জন সিভিল্ সার্ভেণ্ট ও আটজন বে-সরকারী সভ্য লইয়া গঠিত সভার হাতে ন্যস্ত আছে। সরকারী সভ্যের বাহুল্য বশতঃ দেশীয়দের মত বজায় থাকিবার কোনও সুযোগ নাই। তবে এখানকার এক সুবিধা এই যে এখানে Press Act ও Arms Act নাই। লঙ্কাদ্বীপ নয়টি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে

একটি করিয়া প্রধান ও সহকারী কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহাদিগকে Government Agent ও Assistant Government Agent বলা হয়।

দীর্ঘকাল পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সংসর্গে আসিয়া এখানকার সিংহলীরা একেবারে বিলাতি-ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহাদের অনেকেই বৌদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশেরই ওলন্দাজ বা পর্ত্তুগীজ নাম, যথা—ফার্নাণ্ডো, ডি সিল্‌ভা, ইত্যাদি। নাম শুনিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না যে ইহারা বৌদ্ধ। গুণবর্দ্ধন, গুণরত্ন প্রভৃতি বৌদ্ধ নামও যে একেবারে নাই তাহা নয়। আবার অনেক স্থলে দুইটি নাম একত্র হইয়া গিয়াছে। যথা,—এড্‌উইন গুণ-বর্দ্ধন। যারা সামান্য একটু শিক্ষা পাইয়াছে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, তাদের দেখিতে ঠিক হুবহু আমাদের দেশের নেটিভ খ্রীষ্টানদের মতন। তামিল জাতিরা কিন্তু এ বিষয়ে অনেকটা স্বাতন্ত্র্য রাখিয়াছে। সিংহলীদের অনেকের এমন অবস্থা যে সিংহলী ভাষায় কথা কহিতে লজ্জা বোধ করে এবং কথা বলিতে পারে না। বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীতে "ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে।" তামিলদের মধ্যেও এই রকম ভাব খুবই ছিল। কিছুদিন হইতে তাঁদের মধ্যে একটু জাতীয়তার ভাব ঢুকিয়াছে।

সিংহল সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ-গুলি সমস্তই সিংহলাক্ষরে তালপত্রে পালিভাষায় লৌহ-সূচি দ্বারা লিখিত। গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি ঐ ভাবেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মহাবংশ প্রভৃতি ছাড়া সিংহলের আর আর যে-সমস্ত রাজাবলি প্রভৃতি ইতিহাস ও গ্রন্থ আছে সেগুলি খাঁটি সিংহলী ভাষায় লিখিত। কিন্তু এই সিংহলী ভাষাতেও বিস্তর পালি ও সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনেক পালি গ্রন্থও সিংহলী ভাষায় অনূদিত দেখা যায়। পরবর্ত্তী যুগে সিংহলী ভাষায় উপন্যাস ও কবিতা প্রভৃতিও অনেক লিখিত হইয়াছে। সিংহলী ভাষার গঠনপ্রণালী এমন নমনীয় যে তাহাকে সহজেই নানাবিধ ছন্দে ভাঁজ দেওয়া যায়। সিংহলী ভাষায় কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর অনেক স্তোত্র পাওয়া যায়।

বিজয় সিংহের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালীরা আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা কৃষিকার্য্য জানিত না বলিয়াই ঐতিহাসিকেরা বলেন। বিজয় সিংহের সিংহল আগমনের সময় যক্ষ-কন্যা কুবেণী বিজয় সিংহের অনুচরবর্গকে যে ভাত পরিবেশন করেন তাহা সিংহল হইতে উৎপন্ন হয় নাই, জলমগ্ন বণিক-পোত হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বিজয় সিংহের অধিকারের ২০০ বৎসর পরেও সিংহলে ধানের চাষ এত অল্প হইত যে অশোক তিস্‌সকে বঙ্গদেশ হইতে ১৬০ ভার ধান পাঠান। পরবর্ত্তীকালে সিংহলের সিংহলী ও তামিল রাজগণ অসংখ্য জলাশয় খনন করেন এবং ইহাতেই সিংহলের ধান্যাদি সর্ব্বপ্রকার কৃষিকার্য্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়। এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ ভাত, ডাল এবং তরকারী খায় ও খুব পান খায়। তরকারীগুলি প্রায়ই নারিকেল-তেলে রান্না হয়। এ দেশের লোকেরা নানা তরকারী একত্র মিশাইয়া রাঁধে না। শুধু বেগুনের, কি শুধু চিচিঙ্গার, কি আলুর তরকারী নারিকেল-তৈলে ভাজিয়া বা নারিকেলের দুধে সিদ্ধ করিয়া খায়। এ দেশের লোকে প্রচুর নারিকেল ও কাঁঠাল খায়। নারিকেল খোলা হইতে ছাড়াইয়া ধোঁয়ায় শুকাইয়া তেল প্রস্তুতের জন্য অন্য অন্য স্থানে রপ্তানি করে। নারিকেলের কাঠে ইহারা চেয়ার, বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত করে এবং নারিকেলের খোলে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করে। এখানকার সমুদ্রে ওপাল্ ও হীরক ছাড়া প্রায় সর্ব্ববিধ রত্নই পাওয়া যায়। এখানকার হাতীর দাঁতের কাজ, ও আবলুশ কাঠের কাজ অতি চমৎকার। কচ্ছপের খোলা ঢিমা আগুনে গলাইয়া ইহারা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করে। সোনারূপার কাজও ইহারা খুব ভাল করে। কাণ্ডীতে অতি সুন্দর পিতলের কাজ হয়, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সেদিন এখানকার যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম। বহু প্রাচীনকালের (৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যবহৃত অনেক ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্র সেখানে দেখিতে পাইলাম। এখানকার নানাস্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলির মধ্যে বিশেষত্ব নাই, সবই এক ঢঙের। নটরাজ শিব ও পার্ব্বতীর অনেকগুলি দক্ষিণভারতের মূর্ত্তির মতন মূর্ত্তি সেখানে রক্ষিত হইয়াছে দেখিলাম।

যাদুঘরের সঙ্গে সিলোন্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির বেশ

সুন্দর একটি লাইব্রেরী আছে। যাদুঘরের বন্দোবস্ত সুন্দর ও শোভন বলিয়াই মনে হইল।

এখানে সহরের নানাস্থানেই অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার আছে। বিহারগুলিতে কাষায়বাসধারী বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণের ও মহাস্থবিরগণের বাসের ব্যবস্থা আছে, একটি করিয়া বুদ্ধের মন্দির আছে, এবং একটি বোধিদ্রুম (অশ্বত্থ গাছ) আছে। ছাত্রদিগের পড়িবার জন্যও এখানে স্বতন্ত্র গৃহের

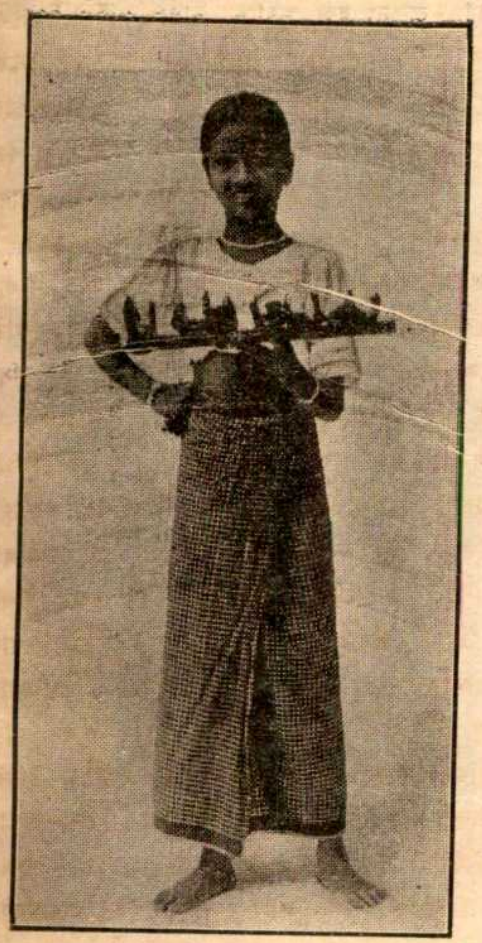

সিংহলের পানওয়ালী।

ব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসের ঘরগুলি বেশ সুসজ্জিত, আমাদের বাঙলাদেশের কলেজের ছাত্রগণের মেসের ও হোষ্টেলের ঘরের ন্যায় মোটেই নোংরা নয়। প্রত্যেক ছাত্রাবাসেই একজন মহাস্থবির আছেন ; তিনি ছাত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ও প্রয়োজনমত তাহাদিগকে পড়াশুনায়ও সাহায্য করেন। তাঁহার বাসগৃহ আমাদের বাঙ্গালী হিসাবে বড়মানুষী ধরণের। বেশ স্প্রিংএর খাট, গদি, সোফা, আল্‌মারি, সুন্দর টেবিল, কার্পেট প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। প্রত্যেক বিহারেই এক একটি ধর্ম্মদেশনার জন্য গৃহ আছে। এইখানে সপ্তাহের কোনও কোনও দিনে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হয়। ভিক্ষুরা অতিশয় সজ্জন।

আমি ইহার মধ্যে এখানের তিলকরত্নারাম ও জয়শেখরারাম নামে দুটি বিহারে গিয়াছিলাম। জয়শেখরারাম বিহারে ভগবান্ বুদ্ধদেবের শয়ান (নির্বাণদশা), উপবিষ্ট (ধ্যানদশা) ও দণ্ডায়মান (প্রচার দশা), এই তিন অবস্থার তিন মূর্ত্তি দেখিলাম। তা ছাড়া আগামী ভবিষ্যৎ মৈত্রেয় বুদ্ধেরও এক মূর্ত্তি দেখিলাম। এই বৌদ্ধমন্দিরের অভ্যন্তরের দেয়াল ও ছাদ সমস্তই বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার ছবিতে পূর্ণ। অনেকগুলি জাতকের গল্পও সুন্দরভাবে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিলাম। অঙ্কনপদ্ধতির কোনও বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া মনে হইল না। চাকচিক্যটাই প্রধান। ভাবাভিব্যঞ্জনের তেমন কোনই সৌষ্ঠব নাই। তবে চোখে দেখিতে বেশ চমক্ লাগে। ছবিগুলি দেখিলেই মনে হয় যে সেগুলি প্রাচীন ছবির হুবহু অনুকরণ মাত্র। ছবিগুলিতে কল্পনাশক্তির প্রকাশ নাই ; বাঁধা নিয়ম অনুসারে প্রাচীনের অনুকরণে যথারীতি অঙ্কিত হইয়াছে মাত্র।

প্রত্যেক বিহারেই একটি করিয়া দাগোবা (চৈত্য-স্তূপ) আছে। দতু শব্দের অর্থ স্মৃতিচিহ্ন, গর্ভম্ শব্দের অর্থ মন্দির। দাগোবাগুলি ইট চুন সুরকিতে গঠিত হয় এবং বাহিরের আকৃতি দেখিতে ঠিক্ ঘণ্টার মতন। এগুলির অভ্যন্তরে পূর্ব্বে ছোট একটি পাত্রে নানা মণিমুক্তার সহিত বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম রক্ষিত হইত। কিন্তু অনেকগুলিই এখন বুদ্ধদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠিত হইতেছে। মহাবংশে (১৬ অধ্যায় ১০৪ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে যে লোকের পূজোপহারের উদ্দেশ্যেই এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এইখানে আসিয়া অনেক বৌদ্ধ ভক্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন ও ইহার উদ্দেশে পূজা করেন। জয়শেখরারামে স্বতন্ত্র একটি মন্দিরে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিলাম। সেখানেও দেখিলাম পূজার ফুল, সন্ধ্যাদীপ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

[redacted]র পরে আর আহার করেন না। আহার

সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও বিশেষ বিচার নাই, মাছ মাংস শুট্‌কি সমস্তই খান।

এখানে বিদ্যোদয় কলেজ নামে একটি প্রকাণ্ড ভিক্ষুবিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫০ ভিক্ষু ও ৫০ জন গৃহস্থ বৌদ্ধ অধ্যয়ন করেন। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে এই বিদ্যালয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এই কলেজে আসিয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া যান। এই কলেজে কিছু ইংরেজী শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

সিংহলে বিদ্যোপকৃত্তি সভা নামে একটি প্রাচীন সভা আছে। সেই সভার নিয়ম অনুসারে এই কলেজের ছাত্রদিগকে আদ্য, মধ্য ও উপাধি, তিনটি পরীক্ষা দিতে হয়। এখানে বিনয়, সুত্ত ও অভিধান পড়ান হয়। তা ছাড়া কিছু সংস্কৃত কাব্য, ও আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবারও ব্যবস্থা আছে। মাঘ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কাদম্বরী, কাব্যাদর্শ, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি পড়ান হইতেছে দেখিলাম। চরক, সুশ্রুতও নাকি পড়ান হয়। ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য একটু ইংরেজী জানেন। এই বিদ্যোদয় কলেজে সিলোন্ গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা বৃত্তি আছে। প্রত্যেক ভিক্ষু ছাত্রকে আপন আপন ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। কাহারও বা পিতামাতারা তাহাদের ব্যয়ভার বহন করেন, কাহারও বা গ্রামস্থ গৃহস্থ বৌদ্ধেরা ব্যয়ভার বহন করেন। ইহাদের আহারের ব্যয় মাসে প্রায় পনেরো টাকা লাগে। বিহারেই থাকিবার স্থান পায়। বিদ্যাধার সমিতি নামে এখানে আর-একটি বৌদ্ধ সমিতি আছে, সেই সমিতি হইতে অত্রত্য বৌদ্ধ স্থবিরগণের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ স্থবিরগণের সাহায্যের জন্য এখানে আরও দুই চারিটি বৌদ্ধ সমিতি আছে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দ্বারা বিহারের সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। যেরূপ ছাত্রাদির পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে তদনুসারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অতীব স্বল্প।

একদিন সন্ধ্যায় বিদ্যোদয় কলেজ দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম আচার্য্য মহাস্থবির নানেশ্বর (জ্ঞানেশ্বর) ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মদেশনা করিতেছেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম যে তাঁহারা লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে সূত্র বেশ সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ধর্ম্মদেশনা শেষ হইলে ভিক্ষুসংহতিপরিবৃত মহাস্থবির নানেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। তাঁহার সহিত প্রায় দেড় ঘণ্টা সংস্কৃত ভাষায় নানা বিষয়ে আলাপ হইল। চারিদিকে অনেক ভিক্ষু দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের সোৎসুক বিস্ময়দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল যে অনেকেই বোধ হয় আমাদের আলাপ বুঝিল না। কলেজে আচার্য্য জ্ঞানেশ্বরের অধীনে আরও পাঁচটি মহাস্থবির

শ্রী পুণ্যস্থলম্ রামনাথম্, কে-সি, সি-এম-জি।
(তরুণ বয়সের ছবি)

অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের সহিতও তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। পরলোকগত আচার্য্য মহাস্থবির সুমঙ্গল এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপন করেন। বর্ত্তমান অধ্যাপক-মণ্ডলী তাঁহারই ছাত্রসন্ততি। বিদ্যোদয় কলেজে ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে একদিন বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংস্কৃতে একটি

বক্তৃতা দিই। মহাস্থবিরগণ অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সমস্ত মহাস্থবিরগণ একত্র হইয়া পালিভাষায় বৌদ্ধ বিজয়প্রশস্তি গান করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহাদের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিলাম। এখানকার পঠন পাঠনের বেশ সুব্যবস্থা দেখিলাম, তবে অভিধর্ম্মের ছাত্র যে বেশী আছে এরূপ মনে হইল না, সেদিকে দৃষ্টিও কম। সুত্ত ও বিনয়ের দিকেই বেশী দৃষ্টি। অনেকগুলি ক্লাশে দেখিলাম, মজ্‌ঝিম নিকায় ও সংযুত্ত নিকায় পড়া চলিতেছে। একটা বড় হলের মধ্যে খানকয়েক বেঞ্চিতে কতকগুলি ছাত্র বসিয়া রহিয়াছে ও সাম্‌নে একখানি চেয়ারে অধ্যাপক বসিয়া আছেন। এই রকমেই অনেকগুলি ক্লাস চলিতেছে দেখিলাম। স্বয়ং মহাস্থবির তাঁর আপন ঘরে কাদম্বরী পড়াইতেছেন দেখিলাম। এই রকম বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শন অভিধর্ম্ম খুব উৎসাহের সহিত পড়ান হইতেছে, ইহা দেখিলে আরও সুখী হইতাম। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ছাপান গ্রন্থের সংখ্যা ত খুবই কম, হাতের লেখা পুঁথীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম মনে হইল। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সিংহল গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিদ্যালয়কে যথেষ্টরূপ সাহায্য করেন না।

সেদিন এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পুণ্যম্বলম্ রামনাথমের সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিলাম। ইঁহারই ভাই পুণ্যম্বলম্ অরুণাচলম্ ও ইনি সিংহলের জননায়ক। ইঁহারা সিংহলের বহুপুরুষের তামিল অধিবাসী। পুণ্যম্বলম রামনাথম পূর্ব্বে সলিসিটার-জেনেরাল ছিলেন। ইঁহাদের যথেষ্ট নারিকেলের বাগান আছে এবং ইঁহারা দুই ভাইই খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি। পুণ্যম্বলম্ অরুণাচলম পূর্ব্বে সিভিল সার্ভাণ্ট ছিলেন। দুই ভাই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকেন। পুণ্যম্বলম্ রামনাথমের বয়স প্রায় ৭০ কি ৭৫ হইবে। বেশ সজ্জন ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সহিত কথায় বেশ প্রীতিলাভ করিলাম। দেখিলাম তিনি সিংহলের প্রতি, স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং দেশের মঙ্গলের জন্য বেশ ভাবেন। ইঁহারা দুই ভাইই এখন এস্থানের লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সিংহলে হিন্দুমুসল্‌মানে একটা দাঙ্গা হয় তখন হিন্দুদের জন্য ইনি অনেক করিয়াছেন। ইঁহার ভাই সার্ অরুণাচলম সিংহলের জন্য রিফর্ম্ স্কিমের ব্যবস্থার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন। যে-রকম শুনিলাম তাহাতে এখানে কোনও প্রকার রিফর্ম্মের ব্যবস্থা হওয়ার আশা অতি কম।

পুণ্যম্বলম্ রামনাথম্ বাইবেলের আমাদের হিন্দুভাবাপন্ন ব্যাখ্যা দিয়া দু-খানা বই লিখিয়াছেন। তা ছাড়া তিনি আমেরিকায় গিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁর সেই বক্তৃতাগুলি তাঁর স্ত্রী লীলাবতী (ইনি অষ্ট্রেলিয়া কন্যা, শ্রীরামনাথমের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী) প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কতকগুলি বই আমাকে উপহার দিলেন। শ্রীরামনাথমের সহিত এস্থানের শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। সিংহলে অনেকগুলি কলেজ আছে। কিন্তু এ কলেজগুলি আমাদের স্কুলস্থানীয়। এগুলিতে ম্যাট্রিকুলেশনের অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নাই। কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ডের জুনিয়ার সিনিয়ার ইত্যাদি পড়াইবারও এখানে ব্যবস্থা আছে। আর লণ্ডন্ ইউনিভার্সিটির ইণ্টার সায়েন্স, ইণ্টার আর্ট্‌স্ ও বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার এখানে কেন্দ্র আছে। যদি কোনও ছাত্র ঘরে পড়িয়া এই-সমস্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে তবে এইখানে তাহার পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু পড়াইবার কোনও ব্যবস্থা নাই। এ বৎসর এখানে একটি নূতন এডুকেশন্ বোর্ড বা Advisory Committee for Education নিযুক্ত হইয়াছেন। মেম্বরেরা সকলেই সরকারপক্ষ থেকে মনোনীত। এবং অধিকাংশ মেম্বরই সরকার পক্ষের লোক। ইঁহাদের পরামর্শানুসারে এ বৎসরই একটি ইউনিভার্সিটি কলেজ খোলা হইবে। তাহাতে ব্যবস্থা এই হইবে যে যাহারা সেখানে পড়িবে তাহারা একটি ডিপ্লোমা পাইবে; তাহার ফলে তাহারা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে পড়িতে গেলে এক বৎসর রেহাই পাইবে। ষোল বৎসর বয়সে কলেজগুলি হইতে যে-সব ছেলেরা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবে, তাহারা দুই বৎসর পরে এই য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। এ দুইবৎসর তাহাদিগকে নযো নমো ভাবে প্রারম্ভিক বক্তৃতাগুলি শুনিতে হইবে। এ-সমস্ত যেন অতি-আড়ম্বরে মূষিকপ্রসবের ব্যবস্থা। এখানকার কলেজগুলিতে সিংহলী বা সিংহলী

ইতিহাস ইত্যাদি পড়াইবার ব্যবস্থা নাই। সংস্কৃত বা পালিও পড়ান হয় না। কেবল গ্রীক্ লাটিনের ধুম। কতকগুলি সিংহলী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিলাম, তাহারাও তাহাদের জাতীয় অভাবগুলি বোধ করিতে পারে না। রামনাথম্, অরুণাচলম্, প্রভৃতি কতকগুলি জননায়ক সিংহলী ভাষাধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সামপায়ার প্রভৃতি কতকগুলি সিংহলী তাহার বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন সিংহলী পড়িলে বা সিংহলীর চর্চ্চা করিলে তাঁহাদের জাতির অবনতি ছাড়া উন্নতি নাই।

সিংহলের বর্ত্তমান বিরুদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার হাওয়ায় বসিয়া আমার বেশ মনে হইতেছে যে শিক্ষা জিনিষটা যখনই কোনও সুবিধা-সুযোগের দিক্ দিয়া পর্য্যালোচনা করা যায় তখনই তাহাকে খাটো করা হয়। জাতিকেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বা ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে শিক্ষা ভিতরের মানুষটিকে গড়িয়া তুলিতে থাকে সেই শিক্ষাই শিক্ষা। কতকগুলি ভাষায় বলিতে বা লিখিতে পারা, কি কতকগুলা অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষা করাকে শিক্ষাই বলা চলে না। সিংহলের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ইহাদের অন্তরস্থ মানুষটি চাপা পড়িয়া যাইতেছে।

এ প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ীর সেই সুন্দর কথাটি মনে পড়ে "তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্ যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্।" ইহারা বেশ কাজ করে, বেশ ইংরেজী বলে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বেশ ভাল, কিন্তু তথাপি যেন মনে হয় ইহারা এ দেশের লোক নয়; এদেশ ইহাদের মাতৃভূমি নয়, ইহাদের পিতামাতা নাই, ইহারা যেন অনাথাশ্রমের সাজান-গোজান ছেলে। এর চেয়ে মায়ের কোলে ধূলামাখা থাকিলে সে যে অনেক ভাল হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলিকাতার জন্য কি করিয়াছে তাহা এদেশে আসিলে বেশ বুঝা যায়। সমস্ত সিংহল দেশটা নিজেদের সমস্ত ছাড়িয়া বিলাতের অন্ধ অনুকরণে কোমর বাঁধিয়া ছুটিয়াছে। সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা কেমন করিয়া বিলাতী ঢঙে করিবে ইহাই ইহাদের ধ্যান জ্ঞান। নিজেদের দেশে একটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র নাই, নিজেদের দেশের ভাষার, নিজেদের দেশের ইতিহাসের সম্মান নাই; নিজেদের জাতির প্রতি নিজেদের একেবারে বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। বাঙ্গালা দেশের মনীষীদের মধ্যে মধ্যে এই দেশে আসিয়া চিন্তার আদান প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বাঙ্গালীদের দ্বারাই এই দেশের সভ্যতার প্রথম আরম্ভ হয়, কাজেই বাঙ্গালীদের এখনও এই দেশের প্রতি টান থাকা উচিত। এদেশে বাঙ্গালী ছাড়া সমস্ত জাতির লোকেরাই বেশ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অর্জ্জন করিতেছে। সমস্ত কলম্বো সহরে একটি মাত্র বাঙ্গালীর খোঁজ পাইয়াছি, তাঁহার নাম সুধাংশুকুমার বসু, বি-এ। তিনি বরিশালের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়। তিনি পি, রামনাথমের প্রাইভেট সেক্রেটরি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানকার কলেজগুলি সমস্তই আমাদের দেশের স্কুলস্থানীয়। মেয়েদেরও এখানে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে এবং সিংহলী রমণীরা প্রায়ই পায়ে হাঁটিয়া, রিক্‌শয় ও মোটরে বাহির হইয়া থাকেন। তামিল রমণীরা প্রায়ই গাড়ী ছাড়া বাহির হন না। এখানে একপ্রকার গরুর-টম্‌টম্ গাড়ী আছে, দেখিতে খুব সুন্দর এবং সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই তাহাতে চড়িয়া থাকেন।

এদেশে শীত বা গ্রীষ্ম কোনও ঋতুই প্রবল নয়। সকল সময়ই বেশ বসন্ত ঋতুর মতন না-গরম না-ঠাণ্ডা। দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। চোখে না দেখিলে বুঝান যায় না। প্রাচীন রাজধানী অনুরাজপুরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পুরাকালের রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ এখনও সেইযুগের রাজগণের স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু কি সিংহলী গ্রন্থে, কি পালি গ্রন্থে কোথাও লঙ্কার সহিত রামসীতার কোনও স্মৃতি জড়িত নাই।

কায়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য হিসাবে এ দেশের লোক বেশ সুখে আছে। সে দিন সার্ অরুণাচলম্ আমাকে বলিতেছিলেন যে এ দেশ যদি সুখে স্বচ্ছন্দে না থাকিত, এ দেশে যদি লর্ড কার্জ্জনের মত ২।১ জন শাসনকর্ত্তা আসিতেন, তবে হয়ত দেশটা জাগ্রত হইতে পারিত। অনেক ব্যথা, অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহিলে তবে দেশবোধিকে পাওয়া যায়। আমি প্রত্যেক জিজ্ঞাসু বাঙ্গালীকে এই দেশ দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

আজ্‌কে ভোরে

আজ্‌কে ভোরে দুয়ার খুলেই
　　জাগ্‌ল মনে একটি কথা ;
ওগো আকাশ,—ভোরের আকাশ,
　　সে যে আমার প্রাণের কথা !
ও শরতের সুনীল আকাশ,
এই যে তোমার আলোর বিকাশ,
জলে-স্থলে বাইরে-ঘরে
　　সকল ঠাঁয়ে ছড়িয়ে-যাওয়া—
একটা উদার প্রীতি যেন !
　　একটা মহান্ স্নেহের চাওয়া !

কাঙালেরি ভাঙা কুঁড়েয়,
　　রাজার রাঙা প্রাসাদ-শিরে,
সুবাস-ভরা কমল-বনে,
　　পচা-ডোবার কু-বাস নীরে,
সাগর-কোলে, শিখর-'পরে,
এই যে আলো সমান-করে
উচ্চে-নীচে ছড়িয়ে দেছ
　　ভগবানের দয়ার মত—
বৃহৎ হৃদয়খানি করি
　　ক্ষুদ্র-পানে অবনত—

এই আলোরি একটি কণা,
　　ওই হিয়ারি একটু-ছোঁওয়া,
একটু হাওয়া—অবারিত
　　ওই দানেরি অঙ্গ-বওয়া,
একটুখানি আরো নুয়ে
যাওগো আমার হিয়ায় থুয়ে ;
আমিও যেন, ওগো, আমার
　　ক্ষুদ্র হিয়ার ক্ষুদ্র প্রীতি—
হউক ক্ষুদ্র—এম্‌নিধারা
　　বিলিয়ে দিতে পারি নিতি !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা জেলার একটি প্রাচীন কীর্ত্তি

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন দাশোড়া গ্রামে "শিববাড়ী" বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে। ইহাতে প্রকাণ্ড কুণ্ডের মধ্যে পাষাণময় অচল শিবলিঙ্গ শায়িত আছেন। কুণ্ডের পূর্ব্বপার্শ্বে উচ্চ বেদীর উপর নানাকারুকার্য্যখচিত মনোহারিণী পাষাণময়ী বালা ভৈরবী মূর্ত্তি স্থাপিত ; সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। শিবরাত্রির সময় এই স্থানে মেলা হইয়া থাকে ও বহুদূর দেশ হইতে যাত্রীগণ এ স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে কোন বিষয়ের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই শিব বাড়ীর সম্বন্ধেও কোন প্রকৃত ইতিহাস বহু অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়ার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে যে-সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার একটি এই :—

এই গ্রামে ভানুদত্ত নামে এক প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন। তিনি একদা রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বয়ং ভৈরবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"দেখ, এই গ্রামের উত্তরাংশে যে অরণ্য আছে উহার মধ্যে নির্ম্মলসলিলবিশিষ্ট এক সরোবর আছে। আমি ঐ সরোবরে অবস্থান করিতেছি এবং সেই সরোবরের পূর্ব্বদিকে এক প্রকাণ্ড কুণ্ডের মধ্যে ভূতভাবন ভবানীপতি মহাদেব শায়িত আছেন। তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থাপন কর ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেও।" এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখার পর ভানুদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সেই দিন একজন তেজঃসম্পন্ন সাধু মহাপুরুষ ভানুদত্ত যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তদনুরূপ এক বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

তখন তাঁহারা উভয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সরোবর হইতে ভৈরবী মূর্ত্তি উদ্ধার করিলেন। কিন্তু পাষাণময় মহাদেবের মূর্ত্তি উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই স্থানের উপর এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কুণ্ডের পূর্ব্বপার্শ্বে ভৈরবী-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই স্থানের নাম মহেশপুর রাখিয়া, সেই মহেশপুর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন হিজুলি গ্রাম

সিদ্ধেশ্বরী-মূর্ত্তি।
ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমায় দাশোড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তির ডাহিন দিকে গণেশ ও বাঁদিকে বোধ হয় লক্ষ্মীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

আর দুই-একখানি গ্রাম দান করিয়া শিব-সিদ্ধেশ্বরীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সেই সাধুকে উহার পূজক নিযুক্ত করিলেন।

অন্য প্রবাদ এইরূপ—

মহেশপুর গ্রামে একজন ধনবান্ গোয়ালা বাস করিত। তাহার প্রায় ৩।৪ শত গাভী ছিল। প্রতিদিন এক রাখাল গাভীদিগকে লইয়া সন্নিহিত জঙ্গলে চরাইতে যাইত। গোয়ালা অন্যান্য গাভী হইতে যে পরিমাণ দুগ্ধ প্রাপ্ত হইত একটি গাভী তদনুরূপ দুগ্ধ প্রদান না করায়, গোয়ালা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাখাল-বালকের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু সে এ বিষয় কিছু অবগত নহে শুনিয়া, গোয়ালা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ইহার প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করিয়া একদিন মধ্যরাত্রি হইতে দেখিতে পাইল উক্ত গাভীটি জঙ্গলের ভিতর একটি নির্জ্জন স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার বাঁট হইতে দুগ্ধ-ধারা পতিত হইতেছে। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে গোয়ালা গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার কারণ বুঝিতে পারিল এবং উক্ত স্থানে কোন অলৌকিক পদার্থ লুক্কায়িত আছে মনে করিয়া মৃত্তিকা খনন করিল এবং দেখিতে পাইল তথায় এক অচল শিবলিঙ্গ শায়িত রহিয়াছেন। ঐ রাত্রিতে গোয়ালা স্বপ্ন দেখিল যে, স্বয়ং মহাদেব তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—"দেখ, তুমি আমার সেবার ব্যাঘাত করিয়াছ। এখন তুমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেও। আমি এখন জঙ্গলের যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছি তাহার নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীতে ত্রিপুরা বালা ভৈরবী সিদ্ধেশ্বরী আছেন। তাঁহাকে ও আমাকে উদ্ধার করিয়া ঐ স্থানে স্থাপিত কর। বর্দ্ধমান রাজবাটীর নিকট আমার একজন সেবাইত বাস করে। তুমি তাহার নিকট গমন করিয়া একজন চেলা প্রার্থনা কর। তিনি যে চেলা প্রদান করিবেন তাহাকে আমার সেবাইত নিযুক্ত কর। ভানুদত্তের বংশধর দাশোড়ার জমিদার ও মিতবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের সাহায্যে আমাদের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেও।" গোয়ালা স্বপ্নাদেশ-মত শিব ও সিদ্ধেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বর্দ্ধমান হইতে যে সেবাইত আসিয়াছিলেন তিনি গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। যখন পুষ্করিণী হইতে শিব ও সিদ্ধেশ্বরী-মূর্ত্তির উদ্ধার করা হয় তখন তাহার সহিত তাঁহার পূজার যথারীতি তৈজস-পত্র, পূজার পটল, ধ্যান, যন্ত্রাদি, চন্দনপাটা, খড়্গ প্রভৃতি সমস্তেরই উদ্ধার হয়।

এই-সকল জনপ্রবাদ ব্যতীত এ সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না। শেষোক্ত প্রবাদ তারকেশ্বর সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে; সুতরাং ইহার মূল্য কিছু আছে মনে হয় না।

পূর্ব্বে যে ভানুদত্তের কথা লিখিত হইয়াছে, সে ভানুদত্ত কে? বর্ত্তমানে দাশোড়া গ্রামে দাশোড়ার রায়বংশ বলিয়া যে বৈদ্যকুলোদ্ভব দত্তবংশ বর্ত্তমানে আছেন তাঁহাদের আদিপুরুষের নাম ভানুদত্ত। বিখ্যাত চক্রদত্ত গ্রন্থ প্রণেতা

চক্রপাণি দত্ত, চক্রদত্ত গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আপনার পরিচয় দান স্থলে বলিতেছেন যে,—

গৌড়াধিনাথ রসবত্যাধিকারি পাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽস্ত রঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী।

অর্থাৎ—গৌড়াধিনাথের পাকশালাধ্যক্ষ ও মন্ত্রিবর নারায়ণের পুত্র এবং বিদ্যাকুলসম্পন্ন ভানুর কনিষ্ঠ প্রসিদ্ধ দত্তকুলোৎপন্ন নীতিজ্ঞ শ্রীচক্রপাণি কর্ত্তৃক এই গ্রন্থে সিদ্ধফল যোগ-সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

শিবদাস সেন টীকাতে গৌড়েশ্বরকে নয়পাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পাল ১০৩৬ খৃঃ হইতে ১০৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। অতএব এই ভানুদত্তকে আমরা একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া জানিতে পারিতেছি।

ভাওয়ালের রাজজামাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল মহাশয় বলেন,—ভাওয়াল অঞ্চলে শিশুপাল যশোপাল ও হরিশ্চন্দ্র পাল এই তিনটি ভূঁইয়া পালরাজা রাজত্ব করিতেন। ইহাঁরা দশম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের রাজ্যে আরাকান দেশীয় মগদের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়াতে ও রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে ভানুদত্ত গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া ভাওয়ালে আগমন করেন। আরাকানবাসী মগদের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য তাঁহার অধীনে অনেক ছিপ্ নৌকা (Flotilla, Nawara, রণতরী) ছিল। এই ছিপ্ নৌকার ব্যবহার ভানুদত্তের সময় হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিতেছে।

গোবিন্দ-বাবু ভাওয়ালের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে—

It is also interesting to note here that a man named Bhanu Datta, brother of the famous Chakra Datta, court physician to Raja Naya Pal of Gaur 11th in descent from Gopal, the founder of the Pal dynasty of Bengal and Behar, was said to have been located here as Generalessimo, i.e., Commander-in-Chief of the Eastern Bengal army and his alleged descendants are still extant though in very reduced circumstances and still adhere to certain rites distinctly Buddhistic in nature.

অর্থাৎ—ইহাও এ স্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় প্রীতিপদ হইবে যে, যে গোপাল বাঙ্গালা ও বেহার দেশে পালসাম্রাজ্য স্থাপন করেন তাঁহার অধস্তন ১১শ পুরুষে নয়পালের রাজচিকিৎসক বিখ্যাত চক্রদত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানুদত্ত নামে এক ব্যক্তি গৌড়ের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন। ইহাঁদের বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাঁরা এখনও বৌদ্ধরীতি অনুযায়ী অনেক কাজ করেন।

দাশোড়ার রায় মহাশয়গণের বংশাবলী হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ভানুদত্তের ৬।৭ পুরুষ অধস্তন বংশীধর দত্ত ওরফে কর্ণ খাঁ পর্য্যন্ত ভাওয়াল পরগণায় প্রভাবশালী ছিলেন।

কর্ণ খাঁ মগদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ কিম্বা অন্য কোন উপদ্রব নিবারণ জন্য সাভারে এক দুর্গ ও দুর্গস্থানে সহজে যাতায়াত জন্য বংশাই নদী হইতে এক খাল খনন করিয়াছিলেন। সাভার অঞ্চলে এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও এই খাল এখনও বর্ত্তমান আছে। সাভার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এখনও কর্ণপাড়া বলিয়া এক গ্রাম বিদ্যমান আছে। ঐ খালকে লোকে এখন 'কর্ণখাল' বলিয়া থাকে।

ঢাকার ইতিহাসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন যে—

"রাঢ় হইতে দাশোড়া সমাগত দ্বিতীয় ভানুদত্তের বংশধর বংশীধর দত্ত কর্ণ খাঁ সমগ্র শিলিমপ্রতাপ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। এই দুর্গটি (সাভারের কোঠবাড়ী দুর্গ) উক্ত বংশীধর দত্তের নিজস্ব দুর্গ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।"

—৫১৫ পৃঃ ফুটনোট

কোন এক সময় এই দত্ত বংশ ঢাকা জেলার পশ্চিমাংশে প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন এবং এ-অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সুয়াপুরের পয়দাশগণ, তৎপর ভাওয়ালের গাজীগণ, তৎপর রোয়াইলের কাশ্যপগণ ঢাকার উত্তর পশ্চিম ও ভাওয়ালে প্রবল হইয়া উঠিলে ও দত্তগণের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইলে দত্তগণ

ভাওয়াল অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া দাশোড়া আগমন করেন।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত দাশোড়ার শিববাড়ীর সহিত এই দত্ত মহাশয়গণের একটি সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। একজন মহন্তের মৃত্যু হইলে যখন অন্য এক মহন্ত নিযুক্ত হন, তখন এই দত্তবংশের কেহ নূতন মহন্তের ললাটে চন্দন-ফোঁটা ও গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন মহন্ত চরিত্রহীন হইলেও এই দত্ত মহাশয়গণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নূতন মহন্ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যদিও বহুকাল অতীত হইয়াছে তথাপি এখনও দাশোড়ার দত্তবংশের কর্ত্তৃত্ব এই শিববাড়ীর উপর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই যেন অনুমান হয় দাশোড়ার দত্ত মহাশয়গণের কর্ত্তৃত্বে এই শিববাড়ী স্থাপিত হইয়াছিল।

অনেকে অনুমান করেন যে, দাশোড়ার এই শিববাড়ী পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বিহার ছিল। কুণ্ড মধ্যে যে অচল শিবলিঙ্গ শায়িত আছেন উহা বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতানুযায়ী একটি বৌদ্ধ দেব-মূর্ত্তি। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশ হইতে দূরীভূত হইলে, হিন্দুগণ তাঁহাদের সঙ্ঘ বা বিহারগুলি হিন্দুতীর্থে পরিণত করেন। তাঁহাদের পুরোহিতগণও হিন্দুদের অত্যাচারে জাতিচ্যুত হইয়া হীনাবস্থা প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে দাশোড়ার শিববাড়ীর শিব ও সিদ্ধেশ্বরীর পূজক জাতিতে তন্তুবায়। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন এই তন্তুবায় বংশ পূর্ব্বে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বিহারের পুরোহিত ছিলেন, পরে হিন্দুদের দ্বারা জাতিচ্যুত হইয়া 'যোগী' জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ডাক্তার টেইলারের 'টপোগ্রাফি অব্ ঢাকা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

Dr. B. Hamilton considers the latter (Jogees) to have been originally the priesthood of the Pal Rajas who were Buddhists. P. 236.

পূর্ব্বে এই শিববাড়ীর সংলগ্ন একটি "জিয়স" পুকুর বর্ত্তমান ছিল। বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে "জিয়স" পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, এই পুকুরগুলি প্রাচীন কালে বৌদ্ধদের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

এই-সমস্ত কারণে সহজেই অনুমান হয় এই শিববাড়ী পূর্ব্বে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বিহার ছিল।

এই বৌদ্ধ-বিহার এ অঞ্চলে কে স্থাপন করিল?

ভানুদত্তের বংশীয় দত্ত মহাশয়গণই এ অঞ্চলে প্রথম আগমন করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বে কোন পরাক্রান্ত জমিদার এ অঞ্চলে আগমন করেন নাই এবং ইহাঁদের কর্ত্তৃত্ব এই শিববাড়ীর উপর এখনও বজায় রহিয়াছে। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দাশোড়ার দত্ত মহাশয়গণ দ্বারাই এই শিববাড়ী প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভানুদত্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা নয়পালের প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া এ অঞ্চলে আগমন করেন। আজকাল যেমন অনেক ভারতবাসী ইংরেজ-রাজের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া খৃষ্টান্ কিম্বা খৃষ্টভাবাপন্ন হইয়াছেন, সে সময়ও পাল-রাজগণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। পাল-রাজার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভানুদত্ত ও তাঁহার বংশধরেরা সেই কারণে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে ও ভানুদত্ত কিম্বা তাঁহার বংশধরেরা এই বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। কালে যেমন বৌদ্ধবিহারগুলি হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছে, ভানুদত্তের বংশীয়েরাও তেমনই ক্রমে হিন্দু হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে এই শিববাড়ী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"দাশোড়ার নিকটবর্ত্তী শিববাড়ী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে। এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্যবংশোদ্ভব দত্ত মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত। যোগী জাতীয়গণ এই শিবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে এই যোগীদিগের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইহাঁর সন্ধান পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রত্যেক যুগী পূজারীকেই দত্ত মহাশয়দিগের আস্তর-পুরুষগণের নিকট হইতে কপালে টীকা গ্রহণ করিতে হয়। উহাই তাহার নিয়োগপত্র বিশেষ।

এই শিববাড়ী একটি প্রসিদ্ধ দেবস্থান। প্রকাণ্ড কুণ্ড মধ্যে শায়িত সুবৃহৎ পাষাণময় অচল শিবলিঙ্গ ও মনোহারিণী বালা ভৈরবী মূর্ত্তি। শিবরাত্রির সময় এখানে একটি মেলার অধিবেশন হয়।"—৩৯৫ পৃঃ।

প্রথমে শিব ও সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল হিজুলি মহেশপুর। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রাম ধলেশ্বরী নদীগর্ভে বিলীন হওয়াতে বর্ত্তমান নূতন শিববাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে শিব ও সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি আনিয়া স্থাপন করা হয়। এই নদীভঙ্গে দত্ত মহাশয়দিগের এক প্রধান কীর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীকালী শ্রীমহাত্মা এই শিববাড়ীর মহন্ত।

শ্রীমনোমোহন রায়।

প্রলাপ

বিপ্লবে, লুণ্ঠনে, পাৎসাহ তক্তে।
জমিদার বড় নাকি প্রজাদের রক্তে॥
ঝগড়া ও বিবাদেতে উকিলেরা পুষ্ট।
ডাক্তার কবিরাজ রোগী নিয়ে তুষ্ট॥
হাকিমেরা দণ্ড ও মুণ্ডেরই কর্ত্তা।
কুলীদের জান মেরে কুঠেলের পড়্তা॥
কৃষকের নেংটিতে ঢাকেনাকো লজ্জা।
ফোড়েদের বাবুগিরি ফিটফাট সজ্জা॥
মহাজন পিষে খায় খাতকের অস্থি।
যাগ্‌গিতে মরে দেশ, বণিকের স্বস্তি॥

শিক্ষায় সম্মানে সমাজের শ্রেষ্ঠ।
পুত্রের পরিণয়ে বণিকের জ্যেষ্ঠ॥
বালিকার বিয়ে নাই, ম'রে গেলে ভর্ত্তা।
পঞ্চাশ অতীতেও বিবাহিত কর্ত্তা॥
বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বামুনের উচ্চে;
মিছে কেন খাটো থাকা পৈতের গুচ্ছে?
শূকরের কাট্‌লেট্, মুরগীর অণ্ড,
গোপনেতে দোষ নাই, প্রকাশ্যে দণ্ড।
পশ্চাতে চৈতন্, সাম্‌নেটা চোস্ত;
এ-কুলের ও-কুলের দু-কুলের দোস্ত।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।

বিয়ের ফুল

(১৫)

হীরকের গম্ভীর বিরাগ সেবা দুতিন দিন ধরিতে পারিল না। হীরককে দিয়া এমন একটা মহৎ অনুষ্ঠান করাইবার নিমিত্ত হইতে পারার আনন্দে সেবার মন থইথই করিতেছিল; যেদিন যে কাগজ সে খোলে তাতেই হীরকের প্রশংসা পড়িয়া সেবার মন আত্মপ্রসাদে এমন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল যে তার কাছে বিশ্বনিখিল আনন্দিত মধুময় অভাবশূন্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু তিন চার দিনেই অল্পে অল্পে সেবা অনুভব করিতে লাগিল হীরকের গম্ভীর ভাব ও তার প্রতি হীরকের বিরাগ। আগে হীরক তার আগমনের প্রতীক্ষায় যেমন উৎসুক আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং সে কাছে আসিলেই হীরক যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, এখন আর সে হীরককে তেমন দেখিতে পায় না। সেবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল—তবে হীরকের যত্ন সম্বন্ধে তার কি কোনো ত্রুটি ঘটিতেছে। সে ত্রুটি সংশোধনের জন্য যত বেশী আগ্রহে যত্ন করিতে লাগিল হীরক ততই মনে করিতে লাগিল—এ যেন জালেপড়া মাছির উপর মাকড়সার যত্ন, সুতার পর সুতা জড়াইয়া তাকে ভালো করিয়া বন্দী করিবার ফন্দি। হীরককে প্রফুল্ল ও সহজ করিয়া তুলিবার সকল রকম চেষ্টা করিয়া বিফল ও পরাস্ত হইয়া সেবা ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল; সে অনুভব করিতে লাগিল তার মনের চিরপ্রফুল্লতা যেন হীরকের অটুট বিরসতার ছোঁয়াচে ম্লান হইয়া আসিতেছে, তার ভরা মনে কিসের অভাব যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। সেবার মনে যেন কান্না চোঁয়াইয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। এ কী তার দুর্দ্দৈব! সে এই কোথাকার কে অপরিচিত লোকটিকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া নিজের অদৃষ্টকে তার সঙ্গে জড়াইয়া জট পাকাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তার বদলে সে কি কিছুই পাইবার যোগ্য নয়? প্রীতি যদি না পায়, একটু কৃতজ্ঞতার পরিচয়ও ত তার পাওয়া উচিত। কিন্তু হীরক আজকাল তার সেবা লইতেই নিষ্ঠুর রকমে আপত্তি করে; সে কিছু করিতে গেলেই হীরক বাধা দিয়া বলিয়া ওঠে—থাক, ও তোমার করতে হবে না। সে নিজের

সমস্ত ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া পাইল এই উপেক্ষা ও অবহেলা! এখানে আর তার যদি দরকার না থাকে তবে সে নিজের অদৃষ্টের জট খুলিতে না পারিলেও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু সেই জট ছিঁড়িতে গিয়া হীরকের যদি ক্লেশ হয় একটুও, এই ভয়েই সেবা মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না, অসহ্য সন্তাপে সকলের অগোচরে পুড়িয়া যাইতেছিল। এখন গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারী এবং নবপ্রবর্ত্তিত মহিলা-বিদ্যালয়ের সকল কর্ম্মেরই তদারক তাকেই করিতে হয়, কিন্তু কোনো কাজের মধ্যেই সে আর উৎসাহের উৎস খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

এমনি দুতরফা গোপন দুঃখের বোঝা বহিয়া চার মাস কাটিয়া গেল, ফাল্গুন মাস আসিল। পাতা ঝরার সময়। সেবা বাগানের ধারের বারান্দায় বসিয়া বসিয়া দ্যাখে চোখের জলের মতন ঝরঝর করিয়া গাছের পাতা খসিয়া বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তার মনে হয় তার চারিদিক হইতে সুখের সম্ভাবনা যেন এমনি করিয়াই ঝরিয়া পড়িতেছে। সে নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া দিয়াও যে কেন হীরকের মন পাইতেছিল না, হীরককে খুসী করিতে পারিতেছিল না, তাহা সে খুঁজিয়াও বুঝিতে পারিতেছিল না বলিয়াই তার নিজের উপর ও হীরকের উপর রাগ হইতেছিল—এক-একবার তার মনে হইতেছিল তারই কোনো অজানা ত্রুটিতেই হয় ত হীরক তার উপরে অপ্রসন্ন হইয়া থাকিতেছে, আবার অনেক চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াও সে যখন নিজের কোনো ত্রুটিই আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না তখন সে হীরকের অকারণ গাম্ভীর্য্য ও বিরাগকে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেমানুষের অন্যায় আব্দার ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিতেছিল না। হীরক এখনো শয্যাগত হইয়াই আছে; সে ইচ্ছা করিলে শয্যা ছাড়িয়া এতদিন উঠিতে পারিত, সে সম্বন্ধে সেবার সন্দেহ নাই; বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া হীরক সেবার সেবা লইতেছে, অথচ তার উপর বিরক্ত অপ্রসন্ন হইয়াও আছে, ইহা সেবার কাছে অত্যন্ত অন্যায় অশোভন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। এই রকম মনের ভাব লইয়া সদানন্দময়ী উল্লাসচঞ্চল সেবার উৎসাহ যেন পথ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল! সে আর প্রাণের টানের আগ্রহে হীরকের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিতেছিল না, শিক্ষিত সেবিকার কর্ত্তব্য পালন মাত্র যন্ত্রের মতন সে করিয়া চলিতেছিল।

একদিন বিকালে সেবা বাগানের প্রথম বসন্তের দান কতকগুলি সদ্যমুঞ্জরিত আমের মুকুল নবকিশলয়দল সুদ্ধ তুলিয়া আনিয়া হীরকের বিছানার কাছে ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিতেছিল। সেবার দিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই হীরকের মুখ খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তার মনে হইল—সেবা কবি!—নানান রকম ফুল ত সবাই ফুলদানীতে সাজায় দেখিয়াছি, কিন্তু আমের বোল তুলিয়া ফুলদানী সাজাইতে ত কাউকে দেখি নাই; কবি বিনা এমন সখ কারো হয় না। হীরক হাসিয়া সেবাকে কবি বলিয়া সম্বোধন ও তার রুচির প্রশংসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন চাকর ঘরে আসিয়া সেবার হাতে একটা ভিজিটিং-কার্ড দিয়া বলিল—একজন সাহেব বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

হীরকের ঠোঁটের কথা সেবাকে আর বলা হইল না, তার মুখের হাসির ছটাও বিস্ময়ে বিলীন হইয়া গেল, সে আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সাহেব আবার কে? কে আবার জ্বালাতে এল?

সেবা হীরকের দিকে পিছন ফিরিয়া ফুলদানীতে আমের মুকুল সাজাইতেছিল, হীরক গম্ভীর বিরক্ত হইয়া থাকে বলিয়া সে আর আগের মতন সহজে হীরকের দিকে তাকাইতে পারে না, হীরকের সঙ্গে হাসিমুখে অনর্গল গল্প করিতে পারে না। সে হীরকের প্রশ্ন শুনিয়া যখন তার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল তখন সে আর দেখিতে পাইল না হীরকের মুখের উপর কি আনন্দনিবেদন তার কাছে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল; সেবা দেখিল শুধু হীরকের চোখে মুখে বিস্ময় ও বিরক্তি। সে আনত চোখের দৃষ্টির নীচে হাতের কার্ডখানি পাতিয়া ধরিয়া পড়িতে গেল—ডক্টার.....

হীরক ঐটুকু শুনিয়াই বিরক্তিকর্কশ কঠোর স্বরে উগ্র ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল—ডাক্তার! কে তোমাকে গিন্নমো কোরে ডাক্তার ডাকতে বলে? তুমি কি জানো না আমার

ডাক্তার দেখিয়ে রঙ্গ কর্‌বার সখ নেই? শয্যাগতকে শুশ্রূষা কর্‌তে আর না পারো কোরো না, আমায় জ্বালিয়োও না।

সেবা তিরস্কারে ব্যথিত বড় বড় দুটি চোখ তুলিয়া হীরকের দিকে কোমল ভাবে তাকাইয়া নরম সুরে বলিল—আমি ত ডাক্তার ডাকাইনি; কে ডাকিয়াছেন তাও জানি না। ইনি আই-এম-এস দেখ্‌ছি, জেলার সিভিল সার্জ্জন হতে পারেন।

অকারণে সেবাকে তিরস্কার করিয়া হীরক অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; সে অপ্রতিভ মুখে সেবাকে বলিল—কি নাম পড়ো ত?

সেবা আবার চোখ নামাইয়া পড়িল—ডক্‌টার কুমুদ-শঙ্কর.....

আর বাকীটুকু না শুনিয়াই হীরক উল্লাসে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া আনন্দ-ব্যগ্র স্বরে বলিয়া উঠিল—আরে তাই আগে বল্‌তে হয়—আমাদের কুমুদ! যা যা সাহেবকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।

হীরকের হুকুম পাইয়া চাকর চলিয়া গেল। সেবাও সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে বলিয়া দরজার দিকে যাইতেছিল। হীরক উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিল—সেবা, তুমি যেয়ো না। এ আমাদের কুমুদ!

হীরকের এত আনন্দ হইয়াছিল যে সে ভুলিয়াই গিয়াছিল যে সেবার কাছে 'আমাদের কুমুদ' বলিলেই পর্য্যাপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল না; তাই সে বারবার শুধু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছিল—এ আমাদের কুমুদ! এর কাছে তোমার লজ্জা কর্‌তে হবে না—ও একেবারে আমাদের ঘরের লোক। বাড়ীর লোকের কাছে লজ্জা কর্‌লে চলে কখনো.....

এমন সময় সেই সাহেবী-পোষাক-পরা কুমুদ হাসিতে হাসিতে সেই ঘরে আসিতেছে দেখা গেল; সে চৌকাঠের এপারে পা দিয়াই দুই হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া সেবাকে নমস্কার করিল এবং কাছে আসিতে আসিতেই বলিতে লাগিল—প্রণাম হই বৌদিদি। দোহাই আপনার, ঘরের লোককে দেখে লজ্জা কর্‌বেন না, আপনি পালাবেন না। শাস্ত্রের বিধি—কেবল দুর্জ্জন দেখ্‌লেই স্থানত্যাগ কর্‌বে।—আমাকে না দেখেই আপনি ঠাওরালেন কি কোরে যে আমি দুর্জ্জন?

সেবা প্রতিনমস্কার করিয়া কৌতুকপূর্ণ আনন্দিত দৃষ্টিতে কুমুদকে দেখিয়া লইল—লম্বা ফর্সা তরুণ যুবা, ফিটফাট বাবু, চোখে রিম্‌লেস্ প্যাঁস্-নে চশ্‌মা, মাথার চুল কোঁকড়া, ঘি রঙের ফ্লানেলের সুট সদ্যপাটভাঙা চোস্ত—কোথাও এতটুকু কোঁচ্‌কায় নাই, গায়ের রঙে ও পোষাকের রঙে যেন মিলিয়া গিয়াছে, তার চোখ উজ্জ্বল চঞ্চল, মুখ আনন্দিত ও সপ্রতিভ। সেবা হাসিমুখে একখানা চেয়ার হীরকের খাটের কাছে সরাইয়া দিয়া শুধু বলিল—বসুন।

কুমুদ প্রবল আপত্তিতে জোরে জোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সে হতে পারে না, আপনি দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন আর আমি বস্‌ব, এ হতেই পারে না।

সেবা কৌতুক-আনন্দে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি ত বস্‌ছি, বসুন আপনি।

কুমুদ আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনি না বস্‌লে আমার বসা হতেই পারে না।

কুমুদকে সেবা যে চেয়ারখানা দিয়াছিল, কুমুদ সেইখানা সেবার কাছে পাতিয়া দিয়া নিজের জন্য আর-একখানা চেয়ার একটু দূর হইতে তুলিয়া আনিল। সেবা লজ্জিত মুখে বসিল। কুমুদও হীরকের হাত নিজের হাতে তুলিয়া চাপিয়া ধরিয়া চেয়ারে বসিল। হীরক হাসিয়া বলিল—তোর কি সব অকস্মাৎ কুমুদ? বিলেত গেলি হঠাৎ—কাউকে বলা না, কওয়া না; বিলেত থেকে ফির্‌লি হঠাৎ; বাড়ীতে ঢুকেই বৌদিদির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলি দিব্যি;—আমি যে এতকালের বন্ধু, আমার সঙ্গে কথাই নেই, যত কথা বৌদিদির সঙ্গে! আমি যার মনে মনে ভেবে রাখ্‌ছিলাম তোদের ইন্‌ট্রোডাক্‌শান্ করাবার সময় কালিদাসের শ্লোক আওড়ে বল্‌ব—ইনি আমার—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ!

আর টেনিসনের লাইন আওড়ে সেবাকে বল্‌ব—এই যে আমার বন্ধু, এ—

More than my brothers are to me!—

তা তুই সব ভেস্তে দিয়ে নিজেই বৌদিদি পাতিয়ে আলাপ জুড়ে দিলি দিব্যি।

কুমুদ হাসিতে হাসিতে হীরকের হাত ধরিয়া অল্প অল্প নাড়া দিতে দিতে বলিল—আরে পরের পরিচয় দিয়ে দরকার কি? বৌদিদি যে তোর গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা তা তোর কাছ থেকে না শুনেও আমি বুঝ্‌তে পার্‌তাম—এমন বুদ্ধি আমার বটে আছে; আর আমি যে তোর কেমন বন্ধু তাও তুই পরিচয় না দিয়ে বৌদিদিকে বুঝ্‌তে দিলেই তাঁর বুদ্ধির প্রতি সম্মান দেখানো হত। তা তোর নিজের বুদ্ধির ওপর এমন মমতা যে আমাদের দুজনের ওপর তোর নিজের এষ্টিমেট না চাপিয়ে কিছুতেই ছাড়্‌লি না।

কুমুদের কথা শুনিয়া হীরক পুলকিত হইয়া অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সেবার মুখও আনন্দের আভায় জলজ্বল করিতেছিল নানা কারণে।—প্রথম, বহুদিনের গুমোট গ্রীষ্মের পর আজ যেন বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বহিতেছে মনে হইতেছিল; হীরক এই চার মাস যে-রকম আড়ষ্ট গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাতে সেবার সকল উৎসাহ আনন্দও যেন জমাট বাঁধিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছিল; আজ কুমুদের আগমনে হীরকের সেই আড়ষ্ট ভাব ত কাটিয়া গেছেই, তার এমন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রাণখোলা হাসি সেবা আসিয়া অবধি শুনে নাই। দ্বিতীয়, হীরক আজ নিজের মুখে প্রচার করিয়াছে খুসীতে খোলা মনে যে সেবা তার গৃহিণী সচিব সখী ও শিষ্যা এবং সে তার প্রিয়ও! তৃতীয়, দুই বন্ধুর মিলনের আনন্দ ও কুমুদের সহজ অমায়িক আত্মীয়তা সেবাকে মুগ্ধ করিতেছিল। চতুর্থ, তার আশা হইতেছিল কুমুদের নূতন বন্ধুর প্রাণচাঞ্চল্যের সংসর্গে কিছু-দিন থাকিতে পারিলেই হীরক সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে।

হীরক হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, এখন শুনি—তুই কবে এলি, কোথায় পোষ্টেড্ হলি, কবে জয়েন্ করতে হবে, কতদিন তুই আমার কাছে থাক্‌বি?.....

কুমুদ হাসিয়া বলিল—তোর অত জেরার জবাব দিতে হলে কিছু খেয়ে আগে গায়ে জোর কোরে নিতে হবে। বৌদিদি, বড় খিদে পেয়েছে—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার থেকে কিছু প্রসাদ পেতে চাই।

এই সদ্যপরিচিত বন্ধুকে এমন করিয়া যাচিয়া খাইতে চাহিতে দেখিয়া সেবার যেমন কৌতুক বোধ হইল, তেমনি তার আনন্দও হইল, আবার একটু লজ্জাও হইল;—সে মেয়ে—অন্নপূর্ণার স্বজাতি, তাতে আবার বাড়ীর গৃহিণী, তারই আগে খাইতে অনুরোধ করিবার কথা; কিন্তু সপ্রতিভ কুমুদ তাকে হারাইয়া দিয়া যে জিতিয়া লইল এতে তার লজ্জা আনন্দ কৌতুক তিনই বোধ হইল। সেবা হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া খাবার আনিতে গেল।

সেবা বাহির হইয়া যাইতেই হীরক দুঃখিত হইবার উপক্রম করিয়া আনন্দের উপর যথাসম্ভব শোকের ছায়া টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সব শুনেছিস কি? মা আর রমা আমাকে ছেড়ে গেছে, আর আমি.....

কুমুদ চট্ করিয়া একটা ঢোক গিলিয়া নিজের উদ্যত দুঃখবেদনাকে চাপিয়া ফেলিয়া হাসিমুখেই বলিতে লাগিল—আরে আমরাই বা আছি কটা দিন? মেরে কেটে আর পঞ্চাশ-ষাট বছর? এমন সুন্দর ধরণীতে ঐ কটা দিনে কতটুকু আনন্দই বা সঞ্চয় কর্‌ব। আনন্দ লুটতেই সময় পাওয়া যায় না, তা দুঃখ শোক কর্‌ব কখন? যা আছে তার কথা ভাব্‌তেই সময় পাই না, যা নেই তার জন্যে আর ভাবি কখন? যা আছে তাই এত প্রচুর যে যা হারিয়েছে তার জন্যে মন খারাপ কর্‌বার কিছু দরকার নেই।—

"থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চোলে
কালের পিছু পিছু!
অধিক দিন ত বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।
মালা বটে শুকিয়ে মরে।—
যেজন মালা পরে
সেও ত নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে?

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ,
থাক্‌বে না ভাই কিছু!
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে
কালের পিছু পিছু!"

বৌদিদির ছোট বোন-টোন কেউ আছে বল্‌তে পারিস?

কুমুদের আনন্দবাদী মনের সংস্পর্শে আসিয়া ও তার মুখের আনন্দ-লঘু কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া হীরকের মনও হাল্কা ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর তার মুখে হঠাৎ এই খাপছাড়া উদ্দেশ্যশূন্য প্রশ্ন শুনিয়া হীরক কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—তোর বৌদিদির ছোট বোনের খবরে দর্‌কার কি?

কুমুদ বলিল—বিয়ে কর্‌ব। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল সে মোরে গেছে, এখন একটা বিয়ে ত কর্‌তে হবে। বৌদিদির বোন হলে একেবারে যাচাইকরা ভালো মেয়ে পাওয়া যাবে।

হীরক অধিকতর কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তোর বৌদিদির কে আছে না-আছে, কিছুই ত আমি জানি না; আচ্ছা আসুক সেবা, খোঁজ নেওয়া যাবে। কিন্তু তোর আবার কার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, আর কবেই বা সে মর্‌ল?

কুমুদ হাসিমুখে বলিল—আরে আমার কাছাকাছি বয়সী মেয়ে দুনিয়ায় রোজই ত মর্‌ছে; তাদের কেউ না কেউ ত আমার প্রেয়সী প্রাণেশ্বরী হলেও হতে পার্‌ত! সে আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় না কোরেই যে মোরে গেল, তাতে আর কি কর্‌ছি বল্? তার শোকের ঝাপ্‌টায় আনন্দের আলো নিবিয়ে দিয়ে মুখ অন্ধকার কোরে জীবনটাকে ত নষ্ট কর্‌তে পারি না?—

"এস আমার শ্রাবণ-নিশি,
এস আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এস আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এস, তুমিও এস,
তুমি এস—এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জানো
ধরণীর নাম মর্ত্যধাম।
যে যায় চোলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ কোরে কাটাই এমন
সময় যে নেই—সময় যে নেই!"

কুমুদের সান্ত্বনার ইঙ্গিতভরা কৌতুকময় কথায় ও বলিবার ভঙ্গীতে উৎফুল্ল হইয়া হীরক আবার উচ্চস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেবা কুমুদের খাবার লইয়া আসিতে আসিতে হীরকের সেই প্রাণখোলা হাসি শুনিয়া খুশী হইয়া প্রফুল্ল মুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সেবা ঘরে ঢুকিতেই হীরক হাসির ভিতর হইতে কথা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সেবা, তোমার ছোট বোন আছে?

সেবা আশ্চর্য্য ও কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল—না। কেন?

হীরক বলিল—কুমুদ বিয়ে কর্‌ত—ওর তোমায় বড় ভালো লেগেছে, তোমায় যখন পাবে না, তখন তোমার অনুকল্প চাই ওর।

সেবার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; সেবার লজ্জা দেখিয়া কুমুদও অপ্রতিভ হইল। সেবা আগাইয়া আসিয়া কুমুদের সাম্‌নে টেবিলের উপর খাবার রাখিবার সময়-টুকুর মধ্যে নিজের লজ্জা সাম্‌লাইয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল—আপনি জল খান।

কুমুদ সেবার আহ্বানে চট্ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—আমাকে আপনি সম্বোধন নয় বৌদিদি—আমি আপনার ছোট দেওর, আপনার ছোট ভাই—শুন্‌লেন ত আপনি হীরকের কাছে, যে, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে—আপনাকে আমার নিজের দিদির মতন বোধ হচ্ছে।

হীরকের কথার মধ্যে যে একটু বিদ্রূপের খোঁচা সেবাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, কুমুদ সেই বিদ্রূপকে সত্য বলিয়া সহজে স্বীকার করিয়া সমস্ত লজ্জা দূর করিয়া দিল সেবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অথচ পবিত্র পদবীতে স্থাপন করিয়া এবং তাতেই সেবাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল। সেবা সহজ হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা, তুমি জল খাও।

কুমুদ খাবারের রেকাবি বাঁহাতে তুলিয়া লইয়া ডান-হাতে খাবার মুখে তুলিতে তুলিতে বলিল—মাপ কর্‌বেন বৌদিদি আপনাকে তুমি সম্বোধন করে ফেল্‌লাম বলে।

এমন দুর্নাম কোথাও কখনো নেই যে কুমুদকে উপরোধ কোরে ঢেঁকিও গেলাতে হয়। গেল্‌বার জিনিস সে আপনিই গেলে। তবে ভরসা এই যে আজও আমার দুর্নাম রটবে না, কারণ, খাবারটা আমার নিজের যেচে পাওয়া!

কুমুদ সেবার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে হীরকও হাসিতে লাগিল। কুমুদের সদানন্দ মন, হাস্যদীপ্ত মুখ ও অনর্গল কৌতুককথা সেবার জীবনের ক্ষণিকের দুঃখচ্ছায়া একেবারে দূর করিয়া আবার তাকে আগের মতন প্রদীপ্ত শ্রীতে বিমণ্ডিত করিয়া তুলিল।

কুমুদের খাওয়া হইলে হীরক বলিল—সেবা লোকা-দাকে বলো ওপরের ঘরে কুমুদের থাক্‌বার ব্যবস্থা কোরে দেবে। যা, সাহেবী খোলস ছেড়ে আয়, তার পর বাগানে বেড়ানো যাবে।

কুমুদের মুখ বন্ধ ছিল শেষ সন্দেশটি চর্ব্বণে; সে সেটিকে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—আজ ভাই থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি যাচ্ছিলাম দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌তে; সেখান থেকে ফিরে এখানে আস্‌ব ঠিক ছিল; কিন্তু তোর ষ্টেশনে গাড়ী এসে থাম্‌লে আর না নেমে থাক্‌তে পার্‌লাম না। আজ না গেলে দিদি ভাব্‌বে। পর্‌শু তর্‌শু সেখান থেকে ফিরে এসে কিছুদিন থাক্‌ব।

কুমুদ চলিয়া যাইবে শুনিয়া সেবার মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; সে আশা করিয়াছিল কুমুদ থাকিলে হীরক প্রসন্ন প্রফুল্ল হইয়া শীঘ্রই সুস্থ সহজ-মানুষ হইয়া উঠিবে; তাতে বিলম্ব ঘটিবে আশঙ্কা করিয়া সেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অনেক কাল বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফির্‌ছেন, আত্মীয়স্বজন সকলেই দেখ্‌তে উৎসুক হয়ে আছেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি; কিন্তু তবু ছেড়ে দিতে ইচ্ছে কর্‌ছে না। দুদিন থেকে কি যাওয়া যায় না?

কুমুদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—না বৌদিদি, দিদিকে আমি চিঠি লিখেছি আজ যাব, না গেলে বড় ভাব্‌বে। আমি শীগ্‌গির ফিরে ত আস্‌ছি।

হীরক এতক্ষণ বসিয়া ছিল; সে সেবার বিষণ্ণমুখ দেখিয়া ও দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়াশুইয়া পড়িয়া বলিল—এরকম অন্যায় অনুরোধ করা উচিত নয় সেবা—কুমুদ এতকাল পরে বাড়ী ফির্‌ল, আপনার লোকের সঙ্গে দেখা কর্‌বে না?

কুমুদ মনে করিল সে এখনি আসিয়া এখনি চলিয়া যাইতেছে বলিয়া হীরক নিশ্চয় অভিমান করিয়াছে; সে একহাত হীরকের কাঁধে রাখিয়া ও একহাতে হীরকের এক হাত তুলিয়া ধরিয়া বলিল—লক্ষ্মী ভাই, রাগ করিস্‌নে। আচ্ছা, আমি কাল হয়ত ছাড়া পাব না, পর্‌শু নিশ্চয় আস্‌ব। তবে এখন যাই ভাই, নইলে ছটার গাড়ী পাব না।

সেবা জিজ্ঞাসা করিল—ছটার গাড়ীতে গেলে কটার সময় পৌঁছবে সেখানে?

কুমুদ বলিল—রাত্তির এগারোটা হবে।

সেবা বলিল—তবে দাঁড়াও, সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দি, পৌঁছতে অত রাত্তির হবে।

কুমুদ খুসী হইয়া হাসিয়া বলিল—আমার টিফিন-ক্যারিয়ারে কিছু খাবার আছে; তবু দিন কিছু, খাবার প্রত্যাখ্যান করা আমার স্বভাব নয়। আপনার ভাই যে কতবড় পেটুক তা আমার চেয়ে-নিয়ে চেটেপুটে খাওয়া দেখেই ত বুঝ্‌তে পেরেছেন।

সেবা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। হীরক চুপ করিয়া পড়িয়াই রহিল। ছেলেমানুষ রাগ করিলে লোকে যেমন করিয়া ভোলায়, কুমুদ তেমনি করিয়া হীরককে বলিতে লাগিল—রাগ করিস্‌নে ভাই; আমি ফিরে এসে অনেক দিন থাক্‌ব। যেতে কি আমারই ভালো লাগ্‌ছে, কিন্তু কি করি.....

সেবা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে ত শুধু একটা ব্যাগ আর টিফিন-ক্যারিয়ার ছিল?

কুমুদ হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ছিল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—হ্যাঁ।

সেবা বলিল—আমি গাড়ীতে তুলে দিতে বলেছি, গাড়ী আন্‌তে গেছে।

কুমুদ বলিল—আবার গাড়ী কেন বৌদিদি, এই ত ষ্টেশন, বিকেলবেলা হেঁটেই চোলে যেতাম।

সেবা বলিল—হেঁটে যেতে হলে আগেই বেরুতে হবে; হাঁটার চেয়ে গাড়ীতে শিগ্‌গির যাওয়া যাবে; যতক্ষণ ধোরে কাছে রাখা যায় ততক্ষণই লাভ।

কুমুদ হাসিতে লাগিল। সেবাও হাসিল। হীরক মুখ আরো গম্ভীর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

লোকনাথ আসিয়া খবর দিল—মোটর-গাড়ী বাগানের গেটে এসেছে।

কুমুদ আবার হীরকের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল—তবে আসি ভাই। আমি কাল পরশুই এসে পড়্‌ব।

হীরক কোনো কথা বলিল না। কুমুদ হীরকের হাত নাড়িয়া মাথার চুলের উপর দিয়া হাত বুলাইয়া ক্রুদ্ধ ব্যথিত বন্ধুকে নীরব সান্ত্বনা জানাইল; তারপর সেবাকে নমস্কার করিয়া বলিল—তবে আসি বৌদিদি—পুনর্দর্শনায় চ।

সেবা বিষণ্ণ হাসিমুখে বলিল—চলো, তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

হীরকের ঘরের সাম্‌নেই বাগান; সিঁড়ির নীচেই দীর্ঘ সোজা পথ, তরুবীথিকায় সমাচ্ছন্ন; কুমুদ ও সেবা সিঁড়ি নামিয়া পাশাপাশি সেই পথ দিয়া কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল; হীরক উৎসুক হইয়া বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া সেই দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। সেবা বাগানে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বন্ধুর জীবনের সব ঘটনা শুনেছ কি তুমি?

কুমুদ বিষণ্ণ মুখে দুঃখিত স্বরে বলিল—শুনেছি বৌদিদি।

—উনি ডাক্তার দেখাতে দ্যান না, মর্‌বেন বোলে। তুমি ডাক্তার, তুমি কাছে থাক্‌লে উনি সেরে উঠ্‌তে পারেন; তুমি আস্‌তে আহ্লাদে উঠে বসেছিলেন।

—ও ত সেরে গেছে। পক্ষাঘাত বেশীর ভাগ মনের রোগ; উঠ্‌তে পার্‌ব না মনে কর্‌লেই রোগীর অঙ্গ অবশ বোধ হয়; তা ছাড়া পোড়ে থেকে থেকেও অঙ্গ শিথিল দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আমি ফিরে এসে ওকে চাঙ্গা কোরে দিয়ে তবে যাব।

—তুমি চোলে যাচ্ছ বোলে রেগেছেন। তুমি দিদির সঙ্গে দেখা সেরে এখানে এলেই ভালো হত।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—তাই দেখ্‌ছি। ও এখনো ভারী ছেলেমানুষ আছে—চিরকালের সেন্টিমেন্টাল।

সেবাও কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিল।

এমনি হীরকেরই কথা আলোচনা করিতে করিতে তারা গেটের কাছে পৌঁছিল। কুমুদ আবার সেবাকে নমস্কার করিয়া মোটরে চড়িল। মোটর অদৃশ্য হইয়া গেলে সেবা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সেবা ফিরিতেছে দেখিয়া হীরক টপ করিয়া মাথা নামাইয়া শুইয়া পড়িল। সেবা হীরকের কাছে আসিয়া বলিল—ঠাকুরপো বড় খাসা সরল লোক। এক দিন এক ঘণ্টার আলাপ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত-কালের আত্মীয়, চোলে গেলেম ত কষ্ট হচ্ছে।

হীরক অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল, সেবার সঙ্গে কথা কহিল না। সেবা আবার বলিল—এখন একবার উঠে বাগানের দিকে বেড়াতে গেলে হত।

হীরক এ কথাতেও কোনো সায় দিল না। সেবা হীরকের কোনো উত্তর না পাইয়া ব্যথিত চিত্তে একলাই বাগানে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

হীরকের মনে একটা অকারণ ঈর্ষ্যা জাগিয়া তাকে পীড়া দিতেছিল। সেবা আশৈশব মেম-সাহেবদের মধ্যে থাকিয়া পুরুষের সঙ্গে সহজে বন্ধুভাবে মিশিতে অভ্যস্ত হইয়া ছিল; কুমুদও সদ্য বিলাতফেরত, সে মেয়েদের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশিতে শিখিয়াছে; কিন্তু হীরক এ-রকম ব্যবহারে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, এরকম অসঙ্কোচ আচরণের সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না; এতদিন সে সেবাকে পত্নীত্বের অধিকার দিতে চায় নাই, তাকে বরাবর দূরে সরাইয়া ফেলিতেই চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আজ আর-একজন পুরুষ তার ও সেবার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেই সেবার উপর তার অধিকারের মমত্ব সজাগ হইয়া উঠিল। হীরকের মনে হইল—সে পীড়িত শয্যাগত পঙ্গু, কুমুদ সুস্থ সবল সুখী; সে শোকার্ত্ত বিষণ্ণ গম্ভীর, কুমুদ প্রফুল্ল আনন্দময় বাক্‌চতুর; সে মরণাহত, কুমুদ প্রাণবান! এমন অবস্থায় সেবার মন তাকে ফেলিয়া কুমুদকেই যে বেশী ভালোবাসিবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? কুমুদ স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিতে একটুও লজ্জা করে নাই যে সেবাকে তার ভালো লাগিয়াছে, সেবার বোন—অর্থাৎ সেবাকে পাইলে সে বিবাহ করিত; সেবাও অসঙ্কোচে একদিনের পরিচিতকে বারবার বলিয়াছে—তাকে ছাড়িয়া দিতে তার কষ্ট হইতেছে। সেবা ও কুমুদ কতবার কোন্ কোন্ ভঙ্গীতে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করিয়াছে হীরক তা

ভাবিয়া তাহাই মনে করিতে লাগিল; এবং ক্রমে তাদের সব কথার মধ্যেই এক-একটা গূঢ় অর্থ সে আবিষ্কার করিতে লাগিল। তার মনে হইল সেবা আর আগের মতন তার সঙ্গে হাসিয়া আগ্রহ করিয়া কথা বলে না, কিন্তু সদ্যপরিচিত কুমুদের সঙ্গে হাসি ও কথায় তার আগ্রহের অন্ত ছিল না; একদিনের আলাপেই সেবা কুমুদকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু হীরক তার স্বামী হইলেও তাকে এখনো আপনিই বলে; সেবা আর তার কাছে বেশীক্ষণ থাকে না, কিন্তু বেশীক্ষণ সঙ্গ পাইবে বলিয়া সেবা কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিল! হীরক অকারণ হিংসায় ভুলিয়াই গেল যে সে নিজেই সেবার সঙ্গে কথা বলে না বলিয়া সেবা তার কাছে আগের মতন আর হাসিখুসী লইয়া থাকিতে পারে না; হীরক নিজে সেবাকে তুমি বলে, কিন্তু সেবাকে বলিতে অনুরোধ একবারও করে নাই। হীরকের নিজের আচরণের সমস্ত ত্রুটি এখন হিংসায় সে সেবার উপর আরোপ করিয়া আরো অশান্তি ও পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। সেবা যে একান্ত তার নিজস্ব, সেবার ভালোবাসা যে কেবল তারই প্রাপ্য, এই বোধ এতকাল পরে হীরকের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়া সেবাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যস্ত ও উৎসুক হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোলা

ওরে আমার চিত্তহারা,
ওরে আপন-ভোলা,
এম্‌নি করে দিবস নিশি
দুল্‌বে কি তোর দোলা!
থাক্‌বে না ত এমন হাসি, প্রাণের হরষণ,
কুঞ্জবনে যাবেই থেমে আলোর গুঞ্জরণ,
রাজ্‌পুরীতে সারা রাতি জ্বল্‌বে না আর আলোর বাতি,
অন্ধ সম শক্ত হবে
আঁধার পথে যাওয়া
বন্ধ যে তোর কর্‌তে হবে
ঝুলনে দোল খাওয়া।

২

ওরে আমার চিত্তহারা,
ওরে আমার সব,
সিন্ধুতীরে দাঁড়িয়ে কি রে
শুন্‌বি কলরব?
সিন্ধু-মাঝে ডাক্‌বে রে বান, দুল্‌বে যে তোর তরী,
এর্ মাঝেতে ছুট্‌তে হবে মহাসাগর 'পরি;
কাঁপে যদি, কাঁপুক পরাণ, গাইতে তোমার হবেই যে গান,
নইলে আঁখি সিক্ত করে'
আস্‌বে ভরে জল,
পাগ্‌লা হাওয়ায় ক্ষুদ্র তরী
কর্‌বে যে টল্‌মল্।

৩

ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া,
ওরে দুলাল মোর,
এম্‌নি করে দিনটারে তুই
কর্‌বি কি রে ভোর?
আঁধার-ঘন নিবিড় মেঘে নিশা আস্‌বে-নেমে,
পথের যত যাওয়া-আসা, সব যাবে যে থেমে;
আকাশ-ভাঙ্গা মেঘের ছলে ভাস্‌বে যে পথ আঁখির জলে,
বন্ধু যদি শক্ত করে'
রয় বা তোরে ঘিরে,
পারের খেয়া বন্ধ হলে
যেতেই হবে ফিরে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

পুস্তক-পরিচয়

১ যজ্ঞকথা—৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ, ১৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তি-স্থান সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৪ পৃষ্ঠা। আঠারো আনা।

আমাদের যে সমাজের চলিত নাম হিন্দুসমাজ তাকে বেদপন্থী বলা চলে। যজ্ঞানুষ্ঠানেই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিলেই বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসের বিশিষ্টতা বুঝা সহজ হয়। এই উদ্দেশ্যে মহামনীষী আচার্য্য ত্রিবেদী বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞের অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র হিন্দুসমাজের ইতিহাসের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট; ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যাগের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি; খ্রীষ্টযাগের সঙ্গে বৈদিক যাগের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক কোথায়; এবং পুরুষযজ্ঞের তাৎপর্য্য এই পুস্তকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিচক্ষণতা ও তুলনামূলক বিতর্কের সহিত অতি সহজ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচীন বৈদিক সমাজে দ্বিজ মাত্রকেই বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য করা হইত; গুরুকুলে ভর্ত্তি হওয়ার নাম ছিল উপনয়ন; উপবীত ছিল ইউনিভার্সিটির ইউনিফর্ম; বিদ্যাশিক্ষার অন্তে সমাবর্ত্তন ছিল ডিপ্লোমা লাভ; ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বিদ্বান না হইলে মূর্খের বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার অধিকার থাকিত না; গৃহস্থ হইয়া গৃহে অগ্ন্যাধান করিতে হইত; সেই অগ্নিতে গৃহ্য ও শ্রৌত অর্থাৎ গৃহসম্পর্কীয় ও শাস্ত্রসম্পর্কীয় যজ্ঞ করিয়া দেবঋণ পিতৃঋণ ঋষিঋণ ও মানবঋণ শোধ করিতে হইত। দেবতার উদ্দেশে কোনো দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ; এই ত্যাগকর্ম্মের নাম আহুতি। দেবতা মানে ইন্দ্র বরুণ ইত্যাদিই কেবল নন—তাঁরা ছাড়াও পিতৃগণ ঋষিগণ ও বিদ্যমানবগণ সবাই দেবতা। দেবতার আরাধনায় দেবঋণ, পিতৃগণের গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ দ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ্চা ও অনুশীলন করিয়া ঋষিঋণ এবং গৃহাগত অতিথি ও বিদ্যমানবের সেবার দ্বারা মানবঋণ প্রত্যেক গৃহস্থ প্রত্যহ শোধ করিতে বাধ্য ছিল; না করিলে তার দ্বিজত্ব নষ্ট হইত, পাতিত্য ঘটিত। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান। জীবনের কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ; ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারই ভোগ কর্ত্তব্য—ইহাই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভোজন, খ্রীষ্টানদের eucharistic sacrifice। এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্ম-কর্ম্ম; এই ব্রহ্মকর্ম্ম-সম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাস এইরূপ বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী; ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশ-বিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। ভারতী রূপে তিনি ভারতবর্ষের কুল-দেবতা। প্রত্যেক ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে পরমান্নের অমৃতরসে সেই ভুবনমনোমোহিনী চিরকল্যাণময়ী। যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর হবিঃ-শেষমাত্র ভোজনে আমরা অধিকারী। এই সর্ব্বদেবময়ী মহতী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া আসুন সকলে বলি—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,

নমামি ত্বাম্—

বন্দে মাতরম্।

নিজেদের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের ধারা যাঁরা বুঝিতে চান যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দ্যান, যাঁরা হিন্দুর ইতিহাস জানিতে উৎসুক; তাঁদের সকলেরই এই অমূল্য পুস্তক পাঠ করা উচিত। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি Calcutta University extension lectures—বিশ্ববিদ্যার উপযুক্ত উপহার।

বিজ্ঞান—চিত্রে ও গল্পে—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র, বি-এসসি (গ্লাসগো)। প্রকাশক—শিশির পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৪১ পৃষ্ঠা। পরিষ্কার ছাপা, সুন্দর তলতলে বাঁধা, অনেক ছবি। দাম একটাকা।

এখানি শিশির পাব্‌লিশিং হাউসের শিশুতোষ সিরিজের প্রথম বই। চিত্তাকর্ষক গল্পের ভিতর দিয়া বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্ব আবিষ্কারের কথা ছেলেদের পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টায় এই বই লেখা। উদ্দেশ্য মহৎ, এবং চেষ্টা সফল হইবে আশা করি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুব সহজে চিত্তাকর্ষক গল্পের মারফতে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং তাতে চিন্তা-শক্তি প্রখর ও জ্ঞান-স্পৃহা প্রবল হইবে। এ বই শিশুতোষ হইয়াছে—শিশুদের পড়িতে দেওয়া অভিভাবকদের কর্ত্তব্য।

য়ুরোপে তিনমাস—(সার্) শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। প্রকাশক—ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ২৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সচিত্র। ৪৪৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। ছাপা কাগজ ভালো। চার টাকা।

সার্ দেবপ্রসাদ য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়া নিজে দেখিয়া জানিয়া বিভিন্ন দেশের দর্শনীয় বর্ণনীয় ও জ্ঞাতব্য তথ্য ও ইতিহাস সরল ভাষায় লিখিয়াছেন। এই বই পড়িলে য়ুরোপের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানের দৃশ্য ইতিহাস ও বিবর্ত্তনের বিষয় জানা যায়। সুতরাং বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিতে উৎসুক সকলের ইহা পড়া উচিত। ভ্রমণকাহিনী একদিকে যেমন উপন্যাসের মতন চিত্তাকর্ষক হয়, তেমনি আবার অপর দিকে চিত্তকে বিশ্বে প্রসারিত করিয়া দেয়। এইজন্য ভ্রমণকাহিনী সকলকার কাছেই সমাদৃত হয়। এ পুস্তকেরও সমাদর হইবে।

সাত নদী—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকমলচরণ মুখোপাধ্যায়, ৭০ নং অখিলমিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা। ৭১ পৃষ্ঠা, সচিত্র, দশ আনা।

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের ধারায় সাত নদী বিশেষ সাহায্য করিয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তাই তাদের কথা আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেও মিলিত হইয়া গেছে, এবং পূজায় বসিয়া যে-কোন পাত্রের জলের মধ্যে সেই সাত নদীর আবির্ভাব আহ্বান করিতে হয়—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি,
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

এই সাত নদীর সঙ্গে যুগ-যুগান্তের ইতিহাস জড়িত হইয়া নানা আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছে। সেইসব আখ্যায়িকা নানা পুরাণে

বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। নানা পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়া সাত নদীর কাহিনী ইতিহাস ভূগোল-সংস্থান সহজ সরল করিয়া বুঝাইয়া ছেলেদের জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। বইখানি আগাগোড়া চলিত মুখের কথায় গল্প বলার ধরণে লেখা; এজন্য ইহা ছেলেদের খুব সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এই সাত নদীর কাহিনী জানা উচিত। সাত নদীর সাতখানি রঙিন ভাল ছবি আছে। সুতরাং দাম এই মাগ্‌গির বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে।

ছেলেদের বঙ্কিম—দুর্গেশনন্দিনী এবং দেবীচৌধুরাণী—শ্রীভক্তিলতা ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, ১৫ নং নারিকেল-বাগান লেন, কলিকাতা। দুখানি বইএই ছবি আছে; পাতা ৪৮ করিয়া। দাম প্রত্যেকের চার আনা।

বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের প্রবর্ত্তক শুধু নন, তিনি আদি সম্রাট। এমন রং-ঘোরালো ছবি, এমন মিষ্টি বর্ণনা, এমন জমকালো সাজ-সজ্জা উপন্যাসের মধ্যে তাঁর পরেও বড় কেউ একটা দিতে পারেন নাই—তাঁর পরে উপন্যাস লিখিয়া যাঁরা নাম করিয়াছেন, তাঁদের যশ অন্য কারণে। এই আদি ঔপন্যাসিকের উপন্যাসগুলির গল্পাংশ-টুকু ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখিকা প্রকাশ করিতেছেন। এতে ছেলেদের গল্প পড়িবার সাধ ও কৌতূহল মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হইবে। ছেলে-বয়সে ছেলে-মেয়েদের নির্ব্বিচারে সব কিছু পড়া অনেকের মতে ঠিক নয়; সকল রসের সঙ্গে পরিচয় বাল্যে ঘটিলে ছেলে মেয়ে অকালপক্ক হইয়া উঠে ও তাতে চরিত্র চটুল চঞ্চল হইয়া খারাপ হইবার সম্ভাবনা ও প্রবণতা ঘটে। সেজন্য তাদের হাতে বই দিতে হয় বাছবিচার করিয়া। বঙ্কিমের নাম ও খ্যাতি ঘরে-ঘরে; ছেলেমেয়েরা শৈশব হইতেই তাহা শোনে; এবং যে বয়সে জানিবার পড়িবার আগ্রহ অত্যুগ্র থাকে সে বয়সে তারা বঙ্কিমের উপন্যাস যদি পড়িতে না পায় তবে ক্ষুণ্ণ হয়। এই দুইদিক বাঁচাইবার উপায় হইয়াছে ছেলেদের বঙ্কিম; এখন অভিভাবকেরা অবাধে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় ঘটাইয়া তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন এবং ছেলেমেয়েরাও শৈশবে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যরসাস্বাদের অধিকারী হইয়া থাকিবে। লেখিকার এই উদ্যম প্রশংসার্হ। বইগুলি দেখিতেও বেশ, দামও সস্তা। গল্পগুলি মাঝে মাঝে বঙ্কিমের কথাতেই বলা হইয়াছে; বঙ্কিমের ভাষা আরো বেশী বজায় রাখিবার চেষ্টা লেখিকার করা উচিত ছিল; তবে সংক্ষেপ করিবার জন্যই লেখিকা তাহা পারেন নাই বোধ হয়।

হাসির তোড়া—শ্রীমোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, বি-এ প্রণীত। ঘোড়ামারা, রাজসাহী। ১৪৯ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

এই বইএর দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। নামজাদা লোকের প্রশংসাও পাইয়াছে দেখিতেছি। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা লিখিয়াছেন। তবু আমরা এই বইএর সুখ্যাতি করিতে পারিতেছি না। গোপালভাঁড়ের মোটা ভাঁড়ামো রসিকতার দিন অতীত হইয়াছে; ভোঁতা কথায় কদর্য্য অশ্লীল কথা বলিলেই হাসি পাওয়ার অবস্থা কাটাইয়া বাঙালী পাঠকেরা এখন বুদ্ধিমত্তার একটু উঁচুধাপে উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বইটিতে বাংলা ও ইংরেজী পদ্যে রসিকতা করিবার দুশ্চেষ্টা আছে; পদ্যের ভাষা কর্কশ, ছন্দ পঙ্গু, রুচি স্থানে-স্থানে নিন্দনীয়, রস এক-এক জায়গায় হাস্যের কোটা উৎরাইয়া বীভৎসই হইয়াছে বেশী। হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের ব্যর্থ অনুকরণ সব কয়টি পদ্য। বাংলা সাহিত্যে হাস্য জিনিসটার এমনই অভাব যে এই মোটা ভোঁতা রসিকতাও পড়িতে পাইতেছে না। এর মধ্যে হাস্যের উপাদান আছে, কিন্তু লেখক সেই হাস্যকে সাহিত্য করিতে না পারিয়া লোক হাসাইয়াছেন।

স্বাস্থ্য-চিত্র—প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, টেনারী, তাজগঞ্জ, আগ্রা। প্রাপ্তিস্থান—এম ধর, ৪৯।২এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দু আনা।

এক তা কাগজে জল বায়ু গৃহ পরিচ্ছদ নিদ্রা ব্যায়াম খাদ্য ব্যাধি দুর্ঘটনা ও আদর্শ গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্য পালনীয় নিয়ম ও প্রতিকার-ব্যবস্থা মোটা-মোটা হরপে ছাপা। গ্রামের বারোয়ারি-তলা প্রভৃতি প্রকাশ্য জায়গায় এক-এক খণ্ড টাঙাইয়া রাখিলে লোকের উপকার হইতে পারে; ঘরে ঘরে টাঙাইয়া রাখিলে ত আরো ভালো।

ব্রহ্মচর্য্য—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এম ধর, ৪৯।২এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চার আনা।

বইখানির নবম সংস্করণ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য সাধন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় আদেশ ও নিয়ম, আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মত, আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার ক্রম-ব্যবস্থা এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। এই পুস্তকে আটটি পরিচ্ছেদ আছে—শারীর তপ, মানস তপ, আত্মিক তপ, ব্রহ্মচর্য্যব্রতের স্বরূপ, ব্রহ্মচর্য্যারম্ভ, ব্রহ্মচর্য্যের ক্রম, ব্রহ্মচর্য্যব্রতের লক্ষ্য, পরিশিষ্ট। ছাত্রদের হিতকারী বই।

গ্রামের উন্নতি—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেই গ্রামের উন্নতি হয়। এজন্য গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উপায় আয়োজন ও স্বাস্থ্যহানিকর বিষয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কথা এই বইএ আছে।—(১) অজ্ঞতার প্রতিকার—শরীরের কথা, জল বায়ু, গৃহনির্ম্মাণ, আহার ও খাদ্য, ব্যায়াম, স্নান, পরিচ্ছদ, নিদ্রা, দৈবদুর্ঘটনা, কীটপতঙ্গাদি, সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে; (২) অলসতাদির প্রতিকার; এই দুই প্রতিকার হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে (৩) আদর্শ গ্রাম। ছাত্র-ছাত্রী ও গৃহস্থদের পাঠ করিবার উপযুক্ত। বহু জ্ঞাতব্য কথা সহজ করিয়া বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

বস্ত্র-যন্ত্র—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এক আনা। বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটের প্রতিকার যে ক্ষেতে ক্ষেতে কাপাস চাষ, ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁতের প্রবর্ত্তন, তাই এই বইয়ে দেখানো হইয়াছে। কাপাস চাষের ব্যবস্থা প্রণালী ও খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় বোনার লাভ খতাইয়া দেখানো হইয়াছে। উদ্যোগী কর্ম্মীদের একবার পড়িয়া ভাবিয়া ও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

অবস্থা ও স্বাস্থ্য—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এক আনা। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন, গৃহে বিদ্যালয়ে যাতায়াতে নিয়ম পালন প্রভৃতির ব্যবস্থা এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

সেবক-কর্ত্তব্য—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এক আনা। এই পুস্তিকায় যুবক-যুবতীদের আত্মশোধন করিয়া সেবার দ্বারা জগৎশোধনের ক্রম ও উপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাধর্ম্ম-বার্ত্তিক—শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ সম্পাদিত। এম ধর, ৪৯।২এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দু আনা।

মানুষের মহাধর্ম্ম কর্ম্মসাধন। কর্ম্মসাধনার জন্য সুস্থ সবল

দেহ ও মন ধ্বংকার। দেহ রক্ষায় ও মন উন্নত বিশুদ্ধ করিবার স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বাঙালীর ব্যবসাদারী—অধ্যাপক শ্রীপার্থসারথি মিশ্র, এম-এ প্রণীত। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, ৪।১ রাজাবাগান সংসন রোড, কলিকাতা। ২৩ পৃষ্ঠা। দাম লেখা নাই।

বাঙালী ব্যবসা করিতে জানে না বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে। কিন্তু লেখক চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন বাঙালীর সকল জাতেই ব্যবসাদারীর জন্যই বাঙালী আসল ব্যবসাদার হইতে পারে নাই। বাঙালীর ধর্ম্মসাধন পুরোহিতের সঙ্গে ব্যবসাদারী; তার তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডার সঙ্গে ব্যবসাদারী; দাম্পত্য প্রেমেও বাঙালীর ব্যবসাদারী; স্বদেশ-প্রেমেও ব্যবসাদারী। কিন্তু সারা জাতটা যে ব্যবসাদার হইয়া যায় নাই তার প্রমাণ সকল ক্ষেত্রেই কোনো-না-কোনো ত্যাগী বাঙালী দিতেছেন। "তাই তো আশা রাখি, তাই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, কবে আমাদের ব্যবসাদারী ঘুচিয়া ত্যাগ-মহিমার জ্বলন্ত আগুনে সব জঞ্জাল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, আদর্শ নিষ্ঠার তেজোময় প্রভাবে শতাব্দীর সঞ্চিত আঁধার দূর হইয়া যাইবে, বাঙালী আবার মানুষ হইয়া উঠিবে।" সমাজের এইসব ব্যথার দরদী সুচিকিৎসকের রোগ-নির্ণয় পড়িয়া বুঝিয়া চলিতে পারিলে বাঙালী আবার মানুষ হইয়া উঠিবে। কবির কাতর আহ্বান "আবার তোরা মানুষ হ" এই লেখকের বাণীতেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

জাতের বিড়ম্বনা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, আর্য্য পাবলিশিং হাউস। ৩৭ পৃষ্ঠা।

লেখক স্বাধীন সংস্কারমুক্ত সুযুক্তি ও সুচিন্তিত বিতর্ক দ্বারা "আমাদের সমাজে জাতের বিড়ম্বনা আলোচনা করিয়াছেন। জাতের ব্যবস্থা যে অত্যাচারমূলক, সমাজের ক্ষতি ও অবনতির কারণ, তাহা এই অল্প-পরিসর বইএর মধ্যে খুব স্পষ্ট করিয়া দক্ষতার সহিত দেখানো হইয়াছে। "মোটামুটি হিসাব ধরিলে বাঙ্গলার প্রায় ২ কোটি হিন্দুর মধ্যে শতকরা ২২ জন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু; ৩০ জন জল-আচরণীয়; বাকি ৫৮ জন জল-চল নয়, এবং এই ৫৮ জনের মধ্যে প্রায় ৫০ জন অস্পৃশ্য।" "বাঙ্গলার অর্দ্ধেক অপরার্দ্ধকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। এই ত সমাজের অবস্থা!" এই-জন্য সমগ্র হিন্দুস্থান বিশ্বসমাজে অস্পৃশ্য হইয়া লাঞ্ছিত হইতেছে; নিজে অপরকে অপমান করিয়া নিজেও অন্যের কাছে অহরহ অপমান ভোগ করিতেছে। স্বদেশীকে নিজের সমকক্ষ ভাবিয়া মানুষের অধিকার না দিলে বিদেশীর সমকক্ষ হইবার আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র। গুণ কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা জাতি নির্ণয় করিতে হইলে অনেক তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির লোক যে পৈতাটিকিধারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাতে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং জন্মগত জাতের বিড়ম্বনা ভোগ করা কারো উচিত নয়। বইখানি ছোট, দাম অল্পই হইবে, সবাইকে পড়িয়া একবার দেশের দশাটা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

দ্বীপান্তরের কথা—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, ৪।১ রাজাবাগান সংসন রোড, কলিকাতা। ১০৮ পৃষ্ঠা। ছবি আছে। দেড় টাকা।

অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার ভূমিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন—"দ্বীপান্তরের কথা একজনের দুইজনের কথা নয়। ইহা নবজীবনের ডায়েরীর এক পাতা।" বারীন্দ্রের নাম ভারতের উদ্বোধিত নবজীবনের সঙ্গে সমার্থক হইয়া উঠিয়াছে যিনি দেশ মাতৃকার দুঃখ দুর্দ্দশা উৎপীড়ন অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া প্রাণের ব্যগ্রতায় দুঃখ যজ্ঞের আহুতি দিবার প্রধান হোতা হইয়াছিলেন, তিনি নিজে দুঃখ বরণ করিয়া সমদুঃখভাজন বহু ভাষাহীন মূক দণ্ডিতের দুঃখকাহিনী এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। দ্বীপান্তরে প্রেরিত দণ্ডিতদের কিরূপ অবস্থায় থাকিতে হয়, কি করিতে হয়, তার বিশদ বর্ণনা এই বইএ আছে। দণ্ডিতদের "দুঃখের সার সঙ্কলন" করিয়া বারীন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছেন—"এ যন্ত্রণার সার্থকতা কি? ইহা অপরাধের দণ্ড, না বিদ্বেষপ্রসূত নির্য্যাতন?" দণ্ড যতক্ষণ ন্যায়সঙ্গত থাকে, ততক্ষণ দণ্ডদাতা দণ্ডিতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যেই দণ্ড নির্য্যাতনে পরিণত হয় তখন দণ্ডিত শ্রেষ্ঠ হইয়া নির্য্যাতনকারীকে পরাজিত প্রমাণ করে। তাই বীর নির্য্যাতিত এই দ্বীপান্তরের কথা শেষ করিয়াছেন হাসিমুখে সকল নির্য্যাতিতকে আশার বাণীতে আশ্বাস দিয়া—"তবু এই দুঃখেও আনন্দ কম ছিল না। কারণ, আনন্দ ত একান্তই নিজস্ব ধন; অন্তরের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে লইয়া যথেচ্ছ পান করিলেও হইল। তবে দুঃখের কষাঘাতও মিথ্যা নহে...গাছের বৃদ্ধির কারণ বসন্তস্পর্শও বটে, আবার কড় কাঠা রৌদ্র-তেজও বটে। শুধু একটানা বসন্তে জীবনে মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড নিতান্ত অপুষ্ট থাকিয়া যায়, শক্তির স্ফুরণে মানবকে দেবতা করে যে বজ্রাগ্নি তাহা যে পরম সত্য।"

কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ। কল্পতরু পাব্‌লিশিং হাউস, চাঁদপুর, ত্রিপুরা। ৫০ পয়সা।

দেশসেবার জন্য মানুষকে কর্ম্মের পথে চলিতে হইবে। কর্ম্মে মানুষ গড়ে। এবং "দেশ চায় মানুষ—যে মানুষ অশনি-আঘাতে নম্রশির হইয়া পড়িবেন না, যাঁহার তেজস্বিতা বিভীষিকা দেখিয়া ম্লান হইবে না..... দেহ যাঁহার বজ্রের ন্যায়, বীর্য্য যাঁহার অপরিমেয়, মনুষ্যত্ব যাঁহার অভ্রভেদী, দেশ চায় তেমন মানুষ।.....দেশ চায় তোমাকে,—ব্রাহ্মণ তোমাকে,—কর্ম্মী তোমাকে,—আত্মশক্তিতে স্থির বিশ্বাসপরায়ণ তোমাকে। স্বদেশ তোমার সাধনা চায়, তোমার তপস্যা চায়, পতিতের উত্থানলাভে তোমার আত্মোৎসর্গ চায়।" কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মনে রাখিতে হইবে "মানুষ মানুষের 'দাস' নয়, সে তাহার স্নেহানুলিপ্ত কনিষ্ঠ। মানুষ মানুষের 'প্রভু' নয়, সে তাহার শ্রদ্ধাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ।" নীরব কর্ম্মে মানুষের গৌরব রক্ষা করিয়া অকপট হইয়া দেশের সেবা করিতে হইবে বিগতভী অদম্য অজেয় হইয়া, দুঃখ বাধা বিঘ্ন বরণ করিয়া অতিক্রম করিয়া। কর্ম্মের অধিকার কেবল পুরুষের নয়, নারীদেরও—"আমরা যেন তেমনই তেজস্বিনী জননীর সন্তানরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে পারি, যাঁহাদের মর্ম্মভেদী অগ্নিদীপ্তি সকল নীচতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দ্যায়, যাঁহাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে বন্যার স্রোত থমকিয়া দাঁড়ায়, যাঁহাদের চরণরেণু স্পর্শ করিয়া মহাপাতকী তরিয়া যায়।" দেশসেবার ও দুঃখবরণে অধিকারী সেই, যে ব্রহ্মচারী, কারণ—"সংযমশক্তির কাছে সম্রাটশক্তিও অবনত হয়।' "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। আলস্য না করিলে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের জন্য কোষ্ঠীর লিখিত গ্রহনক্ষত্রের আশায় বসিয়া থাকিতে হয় না। অনলস কর্ম্ম করিয়া ইংরেজ-মাড়োয়ারী বড় হয়, লক্ষ্মী কিনিয়া আনে; আর আমাদেরই কেবল ফুল-বেলপাতার প্রয়োজন হয়। যেদিন অবধি চেষ্টা কর্ম্ম ও আলস্যশূন্যতা দূর হইয়া লক্ষ্মীর পূজায় ফুল-বেলপাতা ঢুকিয়াছে, সেই দিন হইতেই লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন, বা ফুল-বেল পাতা ধানদূর্ব্বা কচুঘেঁচুর চাপায় পড়িয়া মরিয়া আছেন।" আমাদের সমস্ত কর্ম্ম কেবল কপট অভিনয় মাত্র—"শুধু অভিনয় করলেই যদি দেশের উদ্ধার হত, তবে বাঙ্গলাদেশের বক্তারাই দেশটাকে উদ্ধার

ক'রে ফেল্‌ত। কপটতা দিয়েই যদি কল্যাণ হত, তবে আজ ভারতের চৌদ্দলক্ষ গেরুয়াওয়ালা থাক্‌তে দেশের লোক দুঃখে আধমরা হয়ে থাক্‌ত না।" "যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী নিঃস্বার্থ পুরুষ, তাঁহাদেরই অস্থিখণ্ডে বজ্র নির্ম্মাণ হয়, যথা—দধীচি।" এর জন্য চাই যথার্থ শিক্ষা—"যে শিক্ষা আত্ম-সম্ভ্রমকে জাগাইল না, সে শিক্ষা কুশিক্ষা, যে শিক্ষা স্বতন্ত্র বুদ্ধির বিকাশ দিল না, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষা পরমুখপ্রেক্ষিতা ঘুচাইল না, সে শিক্ষা ব্যর্থ।" "যে দেশের লোক নিজের দেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্নিগ্ধ-ধারায় সে দেশে নামিয়া আসে।" "অমৃতের আস্বাদনে অমর হইব—এ ভরসা যাহার আছে শতবারও কি সে নির্ভয়ে মৃত্যুর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে না? মায়ের কোলে বসিতে পারিব—এ কথা ভাবিয়া দুর্ব্বল শিশুও কি আছাড় পড়িতে পড়িতে জননীর কাছে ছুটিয়া যায় না?" কবে দেখিব এমনি প্রাণের আবেগে সকল নরনারী দেশজননীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ছুটিয়াছে। এই বইখানি ছোট, কিন্তু তার অন্তরের বাণী মহৎ অনন্ত। অনেক উদ্ধার করিয়া পরিচয় দিলাম; বাকিটুকু পাঠকপাঠিকারা বইখানি সংগ্রহ করিয়া প্রাণের পরতে পরতে গাঁথিয়া লইবেন—নিজে উপকৃত হইবেন, দেশ সমাজ উপকৃত হইবে।

ঘর ও পর—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাপ্রচার ভাণ্ডার, বসন্তকুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। ৯৯ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

বইখানিতে ২২ পরিচ্ছেদে ঘরের কথা ও পরের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আলোচনা করিয়া লেখক মোটামুটি বলিতেছেন—পরের সাহায্য ও সহকারিতা ভিন্ন ঘর চলে না; পরের সহিত ঘরের ভেদ ঘুচিয়া যায় প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মের নিষ্ঠার দ্বারা; সমাজে ছোট বড় কেউ নয়, সবাই নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে বড়—ব্রাহ্মণও বড়, মেথরও বড়; প্রকৃত বড় যে সে ব্রাহ্মণই হোক আর মেথরই হোক তার কাছে মাথা নীচু করিতে সঙ্কুচিত হওয়া, আর যে যথার্থ ছোট তাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিতে ছোটা নীচতারই পরিচায়ক। এই জাত বড় আর ঐ জাত ছোট—এই অপবোধের সংস্কারের সময় আসিয়াছে; সমাজের হিতকর্ম্ম মাত্রই বড় কাজ, সমাজের অহিতকর্ম্মই নীচ কাজ। কৃত্রিম ভেদ পুরাতন বলিয়াই তাকে বাঁচাইয়া রাখা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। মনুষ্যত্বই অর্জ্জনীয় ও সম্মাননীয়; তার জন্য চাই নিষ্ঠা ও সংযম। সকল দোষের আকর—আলস্য ও উপেক্ষা। আমরা বিশেষভাবে উপেক্ষা করি মেয়েদের; মেয়েরা যে ছেলেদেরই মত সমাজদেহের অচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহা আমরা ভুলিয়া ফল পাইতেছি হাতে-হাতে; অশিক্ষিতা মাতার সন্তান, অশিক্ষিতা ভগিনীর ভাই, অশিক্ষিতা পত্নীর সহচর যেমন হইবার, আমরা তেমনি পঙ্গু হইতেছি। মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের প্রকৃতি ও কর্ত্তব্যের অনুকূল করিয়া দিতে হইবে; তাদের শিক্ষা পাইবার সুযোগের জন্য তাদের বিবাহের বয়স পিছাইয়া দিতে হইবে। সমাজের সকল লোকের বুদ্ধির চালনা থাকিলে, জ্ঞানচর্চ্চা থাকিলে অপবুদ্ধি দেশবাসীর মধ্যে বাসা বাঁধিতে পারে না। জ্ঞান-চর্চ্চা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, ধর্মচর্চ্চাও সঙ্গে-সঙ্গে করিতে হইবে। মেয়েদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কেবল বর্ত্তমানের সম্পর্ক নয়, ভবিষ্যতের সম্পর্কও রহিয়াছে—তারাই যে ভবিষ্যৎ-বংশের জননী। স্বাস্থ্যরক্ষার সকল নিয়ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও দেশ সুস্থ উন্নত হইবে। সমাজে ধনসাম্য কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে। ফলকথা, আমাদিগকে মানুষ হইয়া স্বাধীন হইতে হইবে—মানুষ মানেই সম্পূর্ণ মানুষ, মুক্তি মানেই সম্পূর্ণ মুক্তি।

এই বইখানি সুচিন্তিত কথায় ভরা, সুলিখিত; বড় ভালো লাগিল; সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। —মুন্সী-রাক্ষস।

ভাঙার গান

দে ভেঙে দে লোপাট ক'রে, গড়া এখন থাকুক প'ড়ে,
কি হবে তায় ঠেক্‌না দিয়ে ভিত্তিটা যার উঠ্‌ছে ন'ড়ে?
নোনা-ধরা দ্যালের গায়ে কি হবে আর রঙ্ ফলিয়ে?
বাজ-খাওয়া ঐ শালের গুঁড়ি, চালিয়ে তারে দে জ্বলিয়ে।

ভাঙন-বহা নদীর মত চল্ ছুটে চল্ দেশ-বিদেশে;
ভাসিয়ে দে যা, ডুবিয়ে দে যা,—পলিমাটি পড়্‌বে শেষে;
নদী ছোটে ধ্বংস নিয়ে, পলি থাকে মিশিয়ে স্রোতে,—
ভাঙার মাঝেই গঠন যে তার সৃষ্টি লভে আপন হতে।

ভাঙার আগে গঠন সুরু,—তালি দিয়ে কাজটা সারা।
নূতন ক'রে বীজ না পুঁতে কোথায় পাবে সতেজ চারা?
পুরানো গাছ উপ্‌ড়ে ফেলে ওলটপালট কর্‌লে মাটি
সজীব গাছে নূতনতর তবেই ত ফল ফল্‌বে খাঁটি?

অতীত যুগের গর্ব্ব দিয়ে ভুলিয়ে তুমি রাখ্‌বে কাকে?
আট-কুটি সে জরীর কাপড়—তাতে কি আর লজ্জা ঢাকে?
ইমারতের ইট খসাতে আপনি যে সে উঠ্‌ছে কেঁপে,
সময়ে না কর্‌লে বিহিত পৃষ্ঠে কবে পড়্‌বে চেপে!

অনেক দামী পোষাকখানা, ইমারৎ সে প্রাসাদ-তুল;
প্রাচীন মানের সাক্ষী ভাবিস্? তা' যদি হয়, মস্ত ভুল!
নয় কি রে তোর শত্রু তারা? নয় কি রে তোর দৈন্যমাপ?
তোর হীনজীবনে নয় কি তারা আঙার-লেখা চরম শাপ?

তবে দে ভেঙে দে উজাড় ক'রে নদীর মত চল্ ডুবিয়ে,
গড়ার কাজে দিস্‌না রে হাত, ভাঙার লেঠা সব চুকিয়ে।
ভাঙ্‌তে গিয়ে ভাব্‌না কিসের?—নূতন ক'রে গড়্‌বে কারা?
জ্বালিয়ে দেওয়ার মাঝেই যে তাপ সৃজন করে বাদলধারা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

দেশের কথা

অন্নকষ্ট।

অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ। জিলা ত্রিপুরা থানা দাউদকান্দির এলাকাধীন ৭ নং মজিতপুর ইউনিয়নের মৌজে সালাপুর, সাহাপুর, মটপী, ভাদেরা, দুদঘাটা, দরিগাও, হামলাবাদ, বাহেরচর প্রভৃতি মৌজার প্রজাবৃন্দ অন্নবস্ত্রাভাবে নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছে। অধিকাংশ পরিবারে ২।৩ দিনের এক বেলা আহার জুটিতেছে না। অন্নাভাব ও অনাহারে বহু লোকের চলৎশক্তি প্রায় রহিত হইয়াছে।—প্রতিকার।

শুধু ত্রিপুরা জেলা কেন,—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলারও ঐ দশা! সমস্ত জেলারই বারো আনা লোক আজ অভাবে প্রপীড়িত। অথচ এইসমস্ত লোক লইয়াই বাংলা দেশ। বাংলা দেশকে সুস্থ সবল করিতে হইলে এইসমস্ত লোককে খাওয়াইতে পরাইতে হইবে। যাঁরা দেশকে ভালবাসেন তাঁরা আগে দেশের অন্নকষ্ট নিবারণ করুন।

অভাব নিবারণে সাহায্য।

মেদিনীপুর রিলিফফণ্ডে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৫২ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আরও টাকা চাই, দাতাগণ মুক্তহস্ত হউন।—যশোহর।

উড়িষ্যা শোণপুরের মহারাজা কটক জেলায় বন্যাপীড়িতগণের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহারাণীসাহেবাও সম্বলপুর জেলায় দুঃস্থগণের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—আনন্দ-পত্রিকা, কাশীপুর-নিবাসী।

দান।—পুরীর দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিবারণ জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী গিয়াছেন। এবং তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে পুরী জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সাহায্যের জন্য চিল্কা হ্রদের নিকটবর্ত্তী বালুগাঁও রেল ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রামের ভার দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ ইতিমধ্যেই তাঁহার নিকট ১৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।—প্রতিকার।

অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা।—উড়িষ্যা কটকের সংবাদ, অনাথ উড়িয়া বালক-বালিকাগণের জন্য লাহোর আর্য্য-সমাজ পুরী-সাক্ষীগোপালে এক অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দয়ানন্দ কলেজের শ্রীযুক্ত মোহনলাল ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।—প্রতিকার।

এই মহাশারদীয় পূজায় বস্ত্রহীনেরা বস্ত্র পরিধান করিয়া যাহাতে মহামায়া দর্শন করিতে সক্ষম হয় সেইজন্য সহৃদয় রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র মিত্র, ৭৬ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২০০৲ টাকার ও নিধি রায় বাহাদুর সুন্দরমল ৪০০৲ টাকার কাপড় খরিদ করিয়া জেলা হুগলি থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত বহুয়া গ্রামে ও তন্নিকটস্থ গ্রামে দরিদ্রদিগকে কাপড় বিতরণ করায় উক্ত মহোদয়দ্বয় গ্রামবাসীদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিশ্বস্তসূত্রে আরো অবগত হইলাম রায় বাহাদুর সুন্দরমল নদীয়া জেলার গরীব লোককে এই সময়ে ২০০৲ টাকার বস্ত্র দান করিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র বসু,
ধনিয়াখালি ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান।

অভাব নিবারণের সদুপায়।

কেবল অর্থ দিয়াই যে দেশের অভাব মোচন করিতে পারা যায় এমন নহে। অনেক সৎপথ ও সৎউপায় আছে যাহা দেশ-সেবার জন্য আমরা অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারি।

গত ৭ই কার্ত্তিক রবিবার উত্তরভূমী মধ্যম ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চট্টগ্রামের নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে "চট্টপল্লীহিত-সম্মিলনী" ও কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্মিলনীতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চট্টলের প্রতি গ্রামে অথবা কয়েকটি সম্মিলিত গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হইবে এবং ঐ সমিতির অধীনে সমবায় ঋণদান সমিতি বা Co-operative Bank, কৃষি ও পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, সেবা ভাণ্ডার, সাধারণ বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত সালিসী সমিতি এবং গ্রামের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও রাস্তাঘাটাদির উন্নতিকল্পে গ্রামোন্নতি বিভাগ থাকিবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি গ্রামে এই প্রকার গ্রাম্য সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। এইসমস্ত সমিতি বর্ত্তমানে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে বৎসরের প্রথমে গ্রামের অধিবাসীগণের ধান্য শস্য সংরক্ষণের এবং গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয়গুলির সাহায্যে বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে বালিকাগণ চরকায় সূতা কাটিতে শিক্ষা পায় এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন। চিনির মূল্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গ্রাম্য রাস্তার দুধারে, পুকুরের পাড়ে এবং অন্যান্য পতিত জমীতে খেজুর-গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীসরোজমোহন সেন, বি-এ,
সম্পাদক "চট্টলপল্লীহিত-সম্মিলনী"।

কুষ্টিয়ায় একটি দরিদ্রভাণ্ডার ও অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা, শবদাহ বা কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্র ও বুদ্ধিমান ছাত্রদিগকে সাহায্য করা এই-সমস্ত মহদুদ্দেশ্য লইয়া সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেশবাসীর মানসিক অবনতি এতদূর গড়াইয়াছে যে আজকাল শবদাহ করিবার লোকের অভাব হয়। দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় সুপ্তসিংহ যেন ক্রমেই জাগ্রত হইতেছে।—যশোহর।

অভাব নিবারণে দরিদ্রের মহত্ত্ব।

সৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব দান।—গত ১৩২৩ সালের ১৪ই মাঘ পাইক গাছার থানার গদাইপুর গ্রামের মেহের বেহারা তাঁহার আজীবনের উপার্জ্জন চারি হাজার টাকা একখানি দানপত্র রেজেষ্টারী দ্বারা রাণলী নিবাসী রায়সাহেব নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী, তত্রত্য সবরেজেষ্টার হেডমাষ্টার, বাবু জ্যোতিষচন্দ্র বসু, বি-এ, মহোদয়গণকে ট্রষ্টি ও জেলা মাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়দ্বয়কে পরিদর্শক করিয়া দরিদ্র হিন্দু মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থে ও মুসলমান ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে দান করিয়াছেন। স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্রগণ আয়ের ছয় আনা, তালা হাইস্কুলের ছাত্রগণ দুই আনা, কপিলমুনি মঃ ইং স্কুল দুই আনা, হরিচালি মঃ ইং স্কুল দুই আনা, শ্রীকণ্ঠপুর জুম্মা দুই আনা এবং বুয়ানপুর জুম্মা দুই আনা পাইবেন। এ দেশে বহুতর লোক দান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দানের পরিমাণ তাঁহাদের বিত্তের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু এই দানবীর মেহের পাল্কি বহিয়া ও অন্যরূপ কায়িক পরিশ্রমে এ যাবৎ যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দুইটি পুত্রকে পর্য্যন্ত না দিয়া সমস্তই দরিদ্রের শিক্ষোন্নতিকল্পে প্রদান করিয়াছেন। (মেহেরের ঐ চারি

হাজার টাকা বাড়ুলি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে)। উক্ত মহাত্মা মেহেরকে গভর্ণমেণ্ট "খাঁ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিলে আমরা আন্তরিক সুখী হইব।—খুলনাবাসী।

বস্ত্রকষ্ট।

অন্নকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রকষ্টও আমাদের একটি ঘোরতর সমস্যা। কাপড়ের দাম কিছু কমিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।—

কাপড়ের মূল্য হ্রাস।—বিলাতে কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। কোন কোন মিল ইতিমধ্যেই শতকরা ৩৩৷৩ টাকা মূল্য কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এদেশে জোড়ায় তিন আনা কি চারি আনা মাত্র কমিয়াছে। সকলেই ধৈর্য্য ধারণ করুন; অচিরেই বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পাইবে।

—২৩ পরগণা বার্ত্তাবহ।

কিন্তু এ কমা-বাড়ার লাভ লোকসান ত আমাদের নয়, বিদেশের। আমাদের অভাব আমরাই দূর করিয়া যাতে লাভবান হই তার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়।

তৎবিষয়ে কর্ত্তব্য—বস্ত্র অভাবে দেশে যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। শুধু যে আমাদের মাতা ও ভগ্নীগণের লজ্জা নিবারণে আমরা অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি তাহা নহে, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই বস্ত্রাভাবের জন্যই নানা প্রকার রোগে ক্লিষ্ট হইয়া অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। আমরা দেশের এই ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজদিগকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছি। যদি আমরা এই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হই তাহা হইলে উহাতে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে উপায়ে বস্ত্রের সংস্থান হইত এখন পর্য্যন্তও সে উপায় আমাদের হাতেই রহিয়াছে। দেশে প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে কার্পাসের গাছ উৎপন্ন করা অতি সহজ। সেই গাছের তুলা হইতে চরকা দ্বারা বাড়ীর মেয়েদের সাহায্যে সুতা প্রস্তুত করা কঠিন নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রথা অনেক স্থানে পরিচালিত ছিল। সুতা প্রস্তুত হইলে এখনও দেশে যে তন্তুবায় শ্রেণী রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে অতি অল্প ব্যয়ে কাপড় প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ভালরূপে চেষ্টা উদ্যোগ করিলে এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে আমাদের স্বাবলম্বন-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, বর্জ্জন-নীতির কার্য্যে লোকের প্রচুর শিক্ষা উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা হইবে এবং দেশের দুর্দ্দশাও বহু পরিমাণে প্রশমিত হইবে। আমরা আশা করি, দেশের নেতাগণ অনতিবিলম্বে এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।—চারুমিহির।

বস্ত্রকষ্ট নিবারণের উপায়।

উপায় দুরধিগম্য নয়। এখন এ-বিষয়ে চাই আমাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়। কাজের সময় আসিয়াছে। দেশেই উদ্‌যোগী কর্ম্মীর দৃষ্টান্ত আছে —

ভগবানের ইচ্ছায় আমার মনে সঙ্কল্প উদয় হইল দেশে সুতাকাটা শিল্প পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা। কিন্তু এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইবে। কারণ দেশীয় লোকদিগকে এই দিকে আকৃষ্ট করা অতি সহজ নহে। দুই হাতে দুই খাই সুতা কাটা যায় এইরূপ চরকা আবিষ্কার করিয়া দেখিলাম। একখাই সুতা কাটিতে হস্ত শিক্ষিত না হইলে দুই খাই সুতা কাটা সম্ভবপর নহে। এইজন্য মাসিক বেতন দ্বারা অনেকজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোককে অপর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। ভাবিলাম, ঢাকাইয়া মসলিন কাপড়ের সুতাও এদেশে স্বচ্ছন্দে কাটা হইত, কিন্তু অদ্য মোটা সুতাও কেহ কাটিতে জানে না। বিশেষ চেষ্টা উদ্‌যোগ ব্যতিরেকে এই শিল্প দেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব। অথচ ইহার উপরেই দেশের ভাবী মঙ্গল অধিক পরিমাণে নিহিত। দেশের প্রচলিত পুরাতন প্রণালীতে সুতাকাটা অভ্যাস না হইলে নূতন কোন প্রণালীতে সুতা কাটা সম্ভবপর হইবে না। এইজন্য গ্রামের বিভিন্ন পাড়াতে প্রায় ৩০টি চরকা বিলি করিয়া দিয়া বেতনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক-সকল দ্বারা অপর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। এই উপায়ে যে-সকল সুতা কাটা হইতেছে তাহা সাধারণ তন্তুবায়গণ বিনাট করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে পারে না। কারণ তাহা অতীব মোটা ও সহজে ছিঁড়িয়া যায়। এই কাঠিন্য দূর করিবার জন্য একজন তন্তুবায়কে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া কি উপায়ে ঐ-সকল সুতা দ্বারা কাপড় বুনা হইতে পারে তাহা শিক্ষা দিতেছি, এবং কিছু কিছু কাপড় বিছানার চাদর ও গায়ের চাদর প্রস্তুত হইতেছে। এইখানে যাহা হইতেছে তাহা না দেখিলে কিম্বা এখানে আসিয়া তাহা শিক্ষা না করিলে অপর জায়গায় চরকা লইয়া গিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। জগতে সাধন ছাড়া সিদ্ধি হয় না। দেশহিতৈষী মহোদয়গণ এই সাধনায় আমার সঙ্গে যোগ দিয়া যদি দেশে সুতা কাটা এবং বস্ত্রবয়ন শিল্প প্রচলন করিতে কায়মনপ্রাণে সঙ্কল্প করেন তাহা হইলেই বিদেশী বস্ত্রের জন্য আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না।

আমার এখানে প্রস্তুতী হ্যাণ্ডলুম অতি সহজ। প্রস্তুত করিতে দশ টাকা ব্যয় পড়ে এবং তাহার উপর চাকিযুক্ত লোহার মাকু একটির দাম ৵৹ চারি টাকা পড়ে। একজন লোক আসিয়া শিক্ষা করিয়া গেলে সহজে চালাইতে পারিবে।

কালীকচ্ছ, সারাইল, ত্রিপুরা। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

স্বাস্থ্য।

মানুষের যে দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজন—খাদ্য এবং পরিচ্ছদ, সেই দুইটির অভাব আমাদের স্বাস্থ্য বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই জেলায় জেলায় রোগের প্রকোপ। রোগ প্রশমের আশু উপায় চিকিৎসা। কিন্তু দেশে চিকিৎসক ও চিকিৎসালয়েরও একান্ত অভাব।—

দাতব্য চিকিৎসালয়ের অভাব—ত্রিপুরা জেলার নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের অভাবে লোকের বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দেশে রোগের অভাব নাই। কিন্তু রোগ প্রতিষেধ বা প্রতিকারের ভার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত। জিলার লক্ষ লক্ষ লোকের সংখ্যানুপাতে ডজন বা দুই ডজন ডাক্তার বা চিকিৎসালয় অতি অকিঞ্চিৎকর তাহা বলাই বাহুল্য। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি বোর্ডেরা এ বিষয়ে সত্বর মনোযোগ প্রদান করিয়া দেশের রোগযন্ত্রণা ও অকাল-মৃত্যু নিবারণে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

রোগ নিবারণে সাহায্য।

শিশুর অপমৃত্যু নিবারণের জন্য।—গোয়াড়ী শিশুর অকালমৃত্যু-নিবারণী সভা দরিদ্র অধিবাসীদের বিনাব্যয়ে ধাত্রী পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দরিদ্র অধিবাসীরা কৃষ্ণনগর সরকারী হাঁসপাতালে এই বিষয়ে তত্ত্ব লইলে জানিতে পারিবেন।

—বঙ্গরত্ন।

খলসিনি দাতব্য চিকিৎসালয়।—গতকল্য শনিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় বিভাগীয় কমিশনার মিঃ হোবার্লীর সভাপতিত্বে চন্দননগর খলসিনির নবপ্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। হুগলী জেলা বোর্ডের অর্থানুকূল্যে এই চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হইল।—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

সৎকার্য্য।—জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুড়াগাছা কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জমিদারী। কুমার বাহাদুর এই জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়া এখানে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের স্মৃতি রক্ষার্থ একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন। কুমার বাহাদুরের এই সৎকার্য্যে স্থানীয় দরিদ্র লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে।—বীরভূমবাসী।

অভাবের প্রতিকার—স্বাধীন ব্যবসা।

দেশব্যাপী অভাবের প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান ও অবলম্বন করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। ধানের পরিবর্ত্তে অপর কি কি শস্য উৎপন্ন করা যায় সে সম্বন্ধে আমরা কয়েক মাস ধরিয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছি। কোন কোন সংবাদপত্র সোহোগোর উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সোহোগোর চাষের প্রণালী জানা আবশ্যক। এ-সম্বন্ধে আমরা সংবাদ পাইয়াছি—

শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে Deputy Chief Accountant's Office, Tanga, Tanganika Territory এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে, আগামী মার্চ্চমাসে বাড়ী (খুলনা জেলায়) যাইবার সময় তিনি সোহোগোর ডাঁটা (যেটা বীজরূপে ব্যবহৃত হয়) লইয়া গিয়া পাঠাইতে ও চাষের প্রণালী লিখিয়া জানাইতে পারেন। ডাঁটা বিনামূল্যে অথবা সামান্য মূল্যে পাওয়া যাইবে, পাঠাইবার যা খরচ। সোহোগোর উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া কাঁচা খাইতেও বেশ লাগে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে, ইষ্ট আফ্রিকা।

তারপর দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগের দরকার। ভারতের যাহা ব্যবসা-বাণিজ্য তাহা ভারতের পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়, তাহা বিদেশীদের পুষ্ট করিতেছে। তার হিসাব এই—

ভারতীয় বাণিজ্য।—ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিদেশীয় জিনিস বেশী আমদানী হইতেছে এবং রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস হইতেছে। গত আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে একত্রিশ কোটী টাকার, ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে ১৯ কোটী টাকার জিনিস এবং ১৯১৩ সালে ও ১৯১৩ সালে সমান জিনিস আমদানী হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে গত আগষ্ট মাসে ৫০০ লক্ষ টাকার তুলার জিনিষ, ১১৩ লক্ষ টাকার সুতা ও সুতার তায় জিনিস, ১৮৩ লক্ষ টাকার ধাতুর দ্রব্য, ৭৪ লক্ষ টাকার মটরকার ও মটর-সাইকেল অধিক আমদানী হইয়াছে। আর ৩১১লক্ষ টাকার চামড়া, ২৪৮ লক্ষ টাকার বীজ, ১১৫ লক্ষ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১২০ কোটী টাকা মূল্যের জিনিস এদেশে আমদানী হইয়াছে। ১৯১৯ সালে ঐ সময়ে, মাত্র ৭৪ কোটী টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এদেশ হইতে ১১৯ কোটী টাকার জিনিস বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ঐ সময়ে ১২০ কোটী টাকার জিনিস রপ্তানী হইয়াছে।—জ্যোতি।

ভারতের সব প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশের ব্যবসা-বিমুখ বলিয়া অখ্যাতি আছে। কিন্তু বাংলা আজ তার অখ্যাতি নিবারণে সচেষ্ট।—

গত জুলাই মাসে সমস্ত ভারতে ১৫ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা মূলধনে ৯৪টি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক বঙ্গদেশেই ৪ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা মূলধনে ৪৩টী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা হউক নিরাশার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিলে যে ব্যবসা-বাণিজ্যেও অন্যান্য প্রদেশকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—যশোহর।

কিন্তু বাংলা দেশে কারবার হইলেই বাঙালীর কারবার মনে করা ভ্রম; এইসব কারবারের কতখানি মূলধন ও কর্ত্তৃত্ব বাঙালীর সে বিষয়ে অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। বাংলা দেশ ত এখন ইংরেজ ও মাড়োয়ারী ব্যাপারীর করতলগত, তাই এই সন্দেহ ও প্রশ্ন।

বড় বড় কারবার ছাড়াও অর্থাগমের অনেক সহজ স্বাধীন ও অল্প-ব্যয়সাপেক্ষ পথ আছে। আমরা এদিকে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।—

মৎস্যপালনে লাভ।—মৎস্য পালন ও মৎস্যের চাষ একটি খুব লাভজনক ব্যবসায়।

কলিকাতা হইতে ৫।৩ মাইল দূরে ১০০৲ টাকা মূল্যে এক বিঘা জমি পাওয়া যায়। ১০ বিঘা জমি লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলে নিম্নলিখিত হিসাবে আয় ব্যয় হইতে পারে।

১ম বর্ষ আয়		ব্যয়	
এক বৎসরে লাভ অন্যূন	৫০০৲	কলা, ইক্ষু, হরিদ্রা প্রভৃতির	
একদফা পোনা মৎস্য বিক্রয়		চাষ আবাদে ১০ বিঘা জমির	
লাভ অন্ততঃ	৫০০৲	মূল্য	১০০৲
		দুইটি পুষ্করিণী খননের খরচ	৮৲
	১০০০৲	মৎস্যের ডিম বা পোনা খরিদ	৭৲
			১১০০৲
দ্বিতীয় বর্ষে আয়		পুকুরের পাড়ে মাটী সমতল করিয়া	
কলা, পেঁপে, ইক্ষু,		কলম, চারা ও বীজ বপন প্রভৃতির	
হরিদ্রা, আনারস প্রভৃতিতে ও		ব্যয়	৫০০৲
নানাবিধ তরিতরকারীতে	৮০০৲	হাতে মূলধন	১৫০৲
মৎস্য বিক্রয় আয় অন্ততঃ	৭০০৲		
	১৫০০৲		

আয়		ব্যয়	
জের—	২৫০০৲	২য় বর্ষে মৎস্যের ডিম বা পোনা	২০০৲
৩য় বর্ষে আয়		৩য় বৎসরে	২০০৲
পূর্ব্বোক্ত ফল ও তরিতরকারীর আয় ব্যতীত আতা (শরিফা), জামরুল, পেয়ারা প্রভৃতিতে			
অন্ততঃ	১০০৲		
সুতরাং মোট	৩০০০৲		

স্থূলকথা, ৩য় বৎসরে ১০ বিঘা জমিতে প্রায় ২০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। হাতে যে মূলধন ১৫০০৲ টাকা ১ম বৎসরে ধরা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং মালী প্রভৃতির বেতন বাবদ, এবং জামরুল ও সার খরিদে ৭০০৲ শত টাকা খরচ হইতে পারে। বাকী ৮০০৲ টাকা মূলধন হাতে থাকিবার কথা। দ্বিতীয় এবং ৩য় বৎসরেও ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করা যাইবে। মোটের উপর খরচ বাদ ১ম বৎসরে ১০০০৲ ২য় বৎসরে ১৫০০৲ টাকা ও ৩য় বৎসরে ২০০০৲ টাকা আয় হইবার খুব সম্ভাবনা। ১ম বৎসরের মৎস্যগুলি ৩য় বৎসরে /৸০, /১ সের ওজনের হইতে পারে।—মোহাম্মদী।

শটী ও শটীর পালো।—শটী একপ্রকার বন্য জাতীয় উদ্ভিদ। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এমন কি বহু জমি শটীর বনে আচ্ছন্ন হইয়া চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। এই শটীর গাছ হলুদের গাছের ন্যায়। এই শটী হইতে যে পালো হয়, তাহা এরারুটের ন্যায় উপাদেয় খাদ্য এবং পথ্য। জঙ্গল বলিয়া উপেক্ষিত শটী হইতে মূল্যবান পালো তৈয়ার হইয়া থাকে। এমন অযত্নসম্ভূত উদ্ভিদ হইতেও আমরা অর্থলাভ করিতে কুণ্ঠিত। ইহা আমাদের অকর্ম্মণ্যতা ও অপদার্থতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শটী কোদালী দ্বারা তুলিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া ধুইতে হইবে। তৎপর উপর-উপরের ছাল ফেলিয়া, রৌদ্রে শুকাইবে। ধুলা, বালু, হইতে সাবধানে উহা রক্ষা করিতে হইবে। শটী শুষ্ক হইলে ঢেঁকিতে কুটিয়া গামলার পানীর সহিত গুলিতে হইবে। তৎপর উপর্য্যুপরি কয়েকবার ধৌত করিয়া অন্য পরিষ্কার পাত্রে পানী দিয়া রাখিবে। যখন পানী স্থির হইয়া উহার সারাংশ পাত্র বা গামলার জমিবে তখন উপর হইতে সাবধানে পানী ফেলিয়া দিয়া, ঐ সারাংশ রৌদ্রে শুকাইলেই শটীর পালো হইল। চট্টগ্রামের মধ্য অঞ্চলে দেয়াং, বাঁশখালী প্রভৃতি স্থানে এরূপে প্রস্তুত হয়। সেখানকার ভাষায় শটীকে ফল্‌থা বলে।

কলিকাতার বাজারে শটীর পালো বলিয়া টীনের ডিবায় ময়দাবৎ সাদা পদার্থ বিক্রয় হয়, উহা প্রকৃত শটীর পালো বলিয়া বোধ হয় না। শুনিয়াছি, অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাগুদানা মেশিনে চূর্ণ করিয়া এই কৃত্রিম শটীর পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। শটীর পালো যেরূপ উপকারী, ইহা তদ্রূপ উপকারী নহে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, যে জেলায় এই শটী প্রচুর পরিমাণে আগাছার ন্যায় জন্মে সেই সেই জেলার কর্ম্মবীর ও দেশসেবকগণ ঐসকল শটী হইতে পালো প্রস্তুত করিয়া লাভবান হউন, এবং আরও অনেককে এই অর্থকরী লাভজনক কার্য্যে ব্রতী করুন। ইহা সকলেরই স্মরণ করা উচিত যে, কেবল কথার দিন চলিয়া গিয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত কাজের যুগ আসিয়াছে। যে পথে, যে ভাবে, যে উপায়ে সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায়, সেই সেই উপায় অবলম্বন করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল ছাত্রদিগকে এইসকল বিষয় তাহাদের গ্রামস্থ সকল লোককে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আর তাহারা নিজেও যথাসম্ভব এই শ্রেণীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে বিশেষ সুখের কারণ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দৈন্যদশা অনেকটা দূর হইবার কথা।—মোহাম্মদী।

মূল্যবান বৃক্ষের বাগান।—এই অন্ন-সমস্যার বিষম দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার অধিবাসীগণ যদি পূর্ব্ববৎ অলস ও জড়ভাবাপন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে থাকে, তবে তাহাদের দুর্দ্দশা-দুর্গতির অবসান হইবে না। অন্নসমস্যা বস্ত্রসঙ্কট দারুণ অর্থাভাব, এ-সকল যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে। এখন চাই দেশে অর্থাগমের উপায় বিধান করা। সকলকেই আলস্য এবং জড়তা পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মঠ বা কর্ম্মবীর হইতে হইবে। এখনও বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বেকার পড়িয়া আছে।

আজ আমরা মূল্যবান বৃক্ষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। মেহাগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান বৃক্ষ। তৎপর শিশু, সেগুণ, আবলুস্, শাল প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। দেবদারু বৃক্ষও কম লাভজনক নহে। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা কাষ্ঠের মূল্য প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ওদিকে ব্রহ্মদেশের বহু ক্রটীন ও উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। জারুল বৃক্ষের তক্তাও নিতান্ত কম মূল্যে বিক্রয় হয় না। আমাদের বঙ্গদেশে কাঁঠালের উৎকৃষ্ট তক্তা হয়। ইহার তক্তাও মূল্যবান।

অনেকে নদীয়া জেলার রাণাঘাট ষ্টেশনের নিকটে বৃহৎ সেগুণের বাগান দেখিয়া থাকিবেন। বীজ পড়িয়া তথায় ক্রমে বহু সেগুণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। গোয়াড়ী অর্থাৎ কৃষ্ণনগর শহরেও বিস্তর বৃহৎ বৃহৎ সেগুণ গাছ আছে। আবার বগুলা হইতে যে বৃহৎ রাজপথ হাসখালি হইয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহার দুই ধারে অসংখ্য শিশু গাছ। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, কুষ্টিয়ার একজন মুসলমান ওভারশিয়ারের বাচনিক শুনিয়াছিলাম, নদীয়ার তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব, জেলার সমস্ত সরকারী রাজপথের পার্শ্বে মেহাগ্নি বৃক্ষের চারা রোপণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এজন্য আমেরিকা হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় মেহাগ্নির চারা আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খরচখরচা সহ প্রত্যেক চারার মূল্য ।৵০ হইতে ৷৷০ আনা পর্য্যন্ত পড়িত। একটি নীলকুঠিতে ২০।২৫টা পুরাতন মেহাগ্নি গাছ ছিল, উহার প্রত্যেক বৃক্ষ ১০০০৲ টাকা হইতে ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। কৃষ্ণনগরে বৃহৎ বৃহৎ সেগুণ বৃক্ষ ৮০৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে।

নদীয়া জেলায় সহস্র সহস্র বিঘা পতিত জমি দৃষ্ট হয়। ঐসকল জমিতে প্রায়ই কোন ফসল হয় না। অথচ মেহাগ্নি, শিশু, সেগুণ, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ উহাতে উত্তম রূপে জন্মিতে পারে। এখানকার মৃত্তিকা ঐসকল বৃক্ষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। জেলার সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১০।২০ বা ৫০।১০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া উপরিউক্ত মূল্যবান বৃক্ষের বাগান করিলে, তৃতীয় পুরুষে শতকরা কয়েক সহস্র টাকা লাভ হইতে পারে। এইসকল বৃক্ষ পরিপক্ক হইতে বহু বৎসর লাগে। তাহা হইলেও ভাবী-বংশধরদিগের জন্য এক মূল্যবান জমিদারীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে কম-বেশ ১০০ মেহাগ্নি গাছ জন্মিলে ১০০ বা ৮০ বৎসর পরে উহা ১০০ টাকা হিসাবে লক্ষ টাকার মাল হইবে। ৫০ টাকা করিয়া মূল্য হইলেও ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি, ১০০ শিশু বা সেগুন গাছ হইলে ৮।১০ হাজার টাকার সম্পত্তি হইবে। জমির মূল্য সহ ১০০ মেহাগ্নির চারা রোপণে ২০০ টাকার বেশী খরচ পড়িবে না।

শিশু বা সেগুণ কাষ্ঠের চারা ১২৫ টাকা বা ১৫০ টাকা খরচ হইতে পারে। অবশ্য বাগান বেড়া দিয়া ঘিরিতে হইবে। গাছ বড় হইলে আর বেড়া দেওয়ার আবশ্যক হইবে না। এইসকল কাষ্ঠের মূল্য এখন যাহা আছে, ৮০।৯০ বা ১০০ বৎসর পরে উহার মূল্য কমপক্ষে চতুর্গুণ হইবে।

যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদের এই কাজে অর্থ প্রয়োগ করা উচিত। প্রতি বিঘায় ১০০ গাছ না হইয়া গড়ে ৫০টা গাছ হইলেও কাঠের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ উহা পূর্ব্বোক্ত হিসাবে লাভজনক হইবে। এদেশে কাঁঠাল গাছের বাগান করিলে দ্বিবিধ লাভ। ১ম লাভ কাঁঠাল বিক্রয়, ২য় লাভ ২৫।৩০ বৎসর পরে উহার গাছ বা তক্তা বিক্রয়। অবশ্য উৎকৃষ্ট জাতীয় কাঁঠালের বাগান করা উচিত। সুমিষ্ট ও বৃহৎ কাঁঠালের ২০টা গাছ বিঘা প্রতি রোপণ করিলে গড়ে প্রতি গাছে ৪—৫ টাকা আয় হওয়া খুব কমের পক্ষে। ৮—১০ টাকা আয় হওয়াও অসম্ভব নহে। দেবদারু গাছের বাগানেও বেশ লাভ আছে। কাঁঠালের বাগান করিয়া তাহার ফল উপভোগ করা যায়। গাছ প্রাচীন হইলে ২০ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাছ বিক্রয় হইতে পারে। আশা করি, দেশবাসীগণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।—মোহাম্মদী।

শিক্ষা।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসুক হওয়ার মূলে রহিয়াছে শিক্ষা। এই শিক্ষার বিস্তারে যাঁরা সাহায্যতা করিতেছেন তাঁরা সাধু।—

দুই লক্ষ টাকা দান।—উড়িষ্যায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উড়িষ্যা আটগড়ের রাজা দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট এই স্কুলে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্বন্ধে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি কমিটীও গঠিত হইয়াছে।—প্রতিকার।

অবৈতনিক স্কুল।—শুনা যাইতেছে যে, পাবনা সহরে নিম্নশ্রেণীর লোকের শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ শীঘ্রই তিনটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হইবে। এই স্কুল তিনটির অর্দ্ধেক খরচ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর দিবেন এবং বাকী অর্দ্ধেক তত্রত্য মিউনিসিপালিটী হইতে সরবরাহ হইবে। এ ব্যবস্থা অতি সুন্দর হইয়াছে।—প্রতিকার।

বিদ্যালয় স্থাপন।—চুয়াডাঙ্গার একটি ভাল রকমের বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন জন্য চুয়াডাঙ্গার বড় রাস্তার উপর একটি নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইয়াছে, এই নূতন অট্টালিকা-গৃহটি স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় রূপে সংস্থাপিত হইল।—বঙ্গরত্ন।

নূতন নৈশবিদ্যালয়।—কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালী পাদরীদের উদ্‌যোগে গোয়াড়ীতে একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, যে নৈশ-বিদ্যালয় আছে ইহা তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র পাঠের উপযুক্ত হইবে [illegible] প্রকাশ।—বঙ্গরত্ন।

সাহিত্য-পরিষৎ।—চন্দননগরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কটকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য চব্বিশ বিঘা জমি ও উহার গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে দশ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

—কাশীপুর-নিবাসী।

শিক্ষা-বিষয়ে উৎসাহ।

পদক-পুরস্কার। মাকড়দা সারস্বত লাইব্রেরী নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন।

পদক	প্রবন্ধের বিষয়
১। ক্ষেত্রমোহন সুবর্ণ পদক—	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ" ইহার যুক্তি এবং প্রমাণ।
২। বীণাপাণি রৌপ্য পদক—	গ্রাম্য স্বাস্থ্য।
৩। চণ্ডীমাতা রৌপ্য পদক—	Ideals of Present-day Indian Nationalism.

দ্রষ্টব্য—আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। শেষোক্ত প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লিখিতে হইবে, প্রথমোক্ত দুইটি বাংলায়। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া খাতার একপাতে লিখিবেন এবং নাম ঠিকানা পুরাপুরি দিবেন।

মাকড়দা পোঃ অঃ
জেলা হাওড়া।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক সারস্বত লাইব্রেরী।

শিক্ষিতের কর্ত্তব্য।

কিন্তু শিক্ষা পাইয়া হুজুগে মাতিয়া কেবল বক্তৃতা দেওয়াকেই বাঙালী দেশ-সেবার আদর্শ বুঝিয়াছে সহরের বাহিরের লক্ষ লক্ষ অভুক্ত রোগজীর্ণ অজ্ঞতাপূর্ণ পল্লী পড়িয়া রহিয়াছে। শিক্ষিতের কর্ত্তব্য সেইখানে সেবাব্রত গ্রহণ করা।—

সহরে দেশসেবক।—সহরের মধ্যে দেশসেবার প্রবল প্রবৃত্তি অনেক যুবকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সভা-সমিতি করিয়া নেতৃবৃন্দের উপদেশ মত চাঁদা সংগ্রহে, সেবায়, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সহরের দেশসেবক আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। কিন্তু যেখানে মরণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া দেশকে বাঁচাইতে হইবে, দারিদ্র্যের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, সে কাজে বড় কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। সহরে থাকিয়া জীবন-যাপন করা অধিকতর আরামপ্রদ, পল্লী-জীবন গ্রহণ করিয়া দেশের শ্রমজীবী কৃষকদিগের সহিত একত্র অবস্থান করা কঠোর সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু দেশকে মানুষ করিতে হইলে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই।—প্রবর্ত্তক।

দেশকে ভাল রকমে সেবা করিতে গেলে ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আমরা দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের চেয়ে মোটেই উচ্চ নহি এবং তাদের সেবা করিয়া আমরা তাদের কৃপা করিতেছি না। আমরা সকলেই সমান ক্ষেত্রে আছি। এবং দেশকে সেবা মানে—প্রীতির আগ্রহে চারিদিককার ভাইদের সাহায্য করা। উচ্চ নীচ জ্ঞান লইয়া সেবা করা চলে না। এই উচ্চ-নীচের ভ্রমে পড়িয়া আমরা নিজেরাই আমাদের ভাইদের প্রতি কত অবিচার করিয়াছি। তাই ঋষি কবির কথা মনে পড়ে—"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" পুরাতন ত্রুটি সংশোধন করিতে না পারিলে

আমাদের লাঞ্ছনার শেষ নাই। তথাকথিত অবজ্ঞাত লোকদের দাবী আজ আমাদের পূরণ করিতেই হইবে।—

অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, "অজ্ঞাত" ও "নীচ" এই কথাগুলির প্রয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের কতকগুলি জাতির পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এইগুলি নিতান্তই আপত্তিকর ও মনুষ্যত্বের অবজ্ঞাসূচক। এক জাতির অন্য জাতিকে "নীচ" বলিবার ও "অস্পৃশ্য" আদি বলিবার কোনও অধিকার নাই, থাকাও উচিত নহে। সাধারণতঃ কেহ কাহাকেও "নীচ" বলিয়া গালি দিলে আইনতঃ তাহার নামে মানহানির নালিশ চলে। আর কতকাল ভারতের কোটী কোটী তথাকথিত অবজ্ঞাত শ্রেণীগণ মর্ম্মাহত হইতে থাকিবেন। ইংরেজগণ ভারতের লোকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া নেটিভ্ (Native) বলিত। ইহা সম্মানহানিকর বলিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই কথার প্রয়োগ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা এদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীগণের প্রতি "অনাচরণীয়, অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত," ও "নীচ" প্রভৃতি অসম্মানকর কথার প্রয়োগ আইন করিয়া বন্ধ করিতে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করি।—প্রতিজ্ঞা।

মানুষকে অবমাননার প্রথা মান্দ্রাজে আরও প্রবল। ইহার নিবারণের যতটুকু উদ্যোগের সংবাদ পাওয়া যায় ততটুকুই দেশের পক্ষে শুভ।—

সহৃদয়তা।—মান্দ্রাজের থিয়া সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীনারায়ণ গুরুস্বামী এই সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলিতে তথাকার অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত জাতিদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজের নিম্ন শ্রেণীরা অত্যধিক পরিমাণে নির্য্যাতিত ও বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। অনেক প্রকাশ্য রাজপথে তাহারা যাতায়াতের অধিকার হইতে বঞ্চিত, এমন কি তাহাদের শরীরের ছায়াপাতে উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয় অস্পৃশ্য হইয়া যায়। জাতি বিচারের এমন কঠিন ভূমিতে স্বামীজীর এই প্রকার সাহসিকতা ও উদারতা অতীব প্রশংসনীয়।—সম্মিলনী।

নিজেদের প্রতি নিজেরাই অবিচার করিয়া আসিতেছি বলিয়া পরের কাছ হইতে নিজেদের প্রতি আমরা সুবিচার কিছুতেই আদায় করিতে পারিতেছি না। নিজেদের কৃত পাপের ফল নিজেদের উপরে আজ ফিরিয়া আসিতেছে।—

আবার গ্রীহা ফাটা—আগ্রাতে চ্যাপমেন নামক এক ইংরেজ-দৈন্য একটি ভারতবাসী পাথাটানা কুলিকে লাথি দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। মামুলি প্রথায় ইংরেজ হাকিম ও ইংরেজ জুরীর দ্বারা চ্যাপমানের বিচার হইয়াছিল। কুলির গ্রীহা অত্যন্ত বড় ছিল, সামান্য আঘাতেই গ্রীহা ফাটিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া মামুলি প্রথায় আসামী খালাস পাইয়াছে। এই মামুলিপ্রথা ব্যতীত এই মোকদ্দমায় আর কোনও বিশেষ ঘটনা নাই।—চারুমিহির।

খেরির হত্যাকাণ্ড—খেরির ডেপুটী কমিশনারের হত্যার জন্য যে তিনব্যক্তি বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, দায়রার জজের বিচারে তাহাদিগের তিন জনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দুইজন অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে নাই। এই এক খুনের পরিবর্ত্তে তিন খুনের ব্যবস্থায় এই ব্যাপারের যবনিকা পতন হইবে অথবা সুরেন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশমত গবর্ণমেণ্ট আরও কিছু কঠোরতা অবলম্বন করিবেন তাহা ক্রমে জানিতে পারা যাইবে। একে স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবু প্রস্তাবকর্ত্তা, তাহাতে পাইয়োনিয়র, ইংলিশম্যান, শ্বেতাঙ্গ-সভা প্রভৃতি তাহার সমর্থক; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কিছু-না-কিছু করিবেন বলিয়াই মনে হয়।—হিতবাদী।

দুইই হত্যা—সমান পাপ; মানুষ মাত্রেরই প্রাণ মূল্যবান। তাকে অবমাননা করিবার অধিকার কাহারও নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

মুচ্‌কি হাসি

চপলার মত চল-চঞ্চলা
উজল হাস্যকণিকা,
সুখের কানের শোভন দুলটি
মোহন মধুর মণিকা!
রুদ্ধ অধর-দুয়ারের কোণে
উঁকি দিয়া তুমি যাও ক্ষণে ক্ষণে,
চলে যাও পুন চকিত চরণে
জোনাকীর মত ক্ষণিকা!
চপলার মত চল-চঞ্চলা
উজল হাস্যকণিকা!

ফুটে ওঠ তুমি যূথিকার বনে,
ঝরে পড় তুমি নীহারে,
তোমার চপল চতুর মাধুরী
স্বপনের মাঝে বিহারে!
নূপুরের আধ মধু গুঞ্জনে
গান গেয়ে যাও আপনার মনে,
কুঞ্জবনের ক্ষণ শিহরণে
মরমীর প্রাণ দিয়া রে!
ফুটে ওঠ তুমি যূথিকার বনে
ঝরে পড় তুমি নীহারে।

"বনফুল"

পঞ্চশস্য

রাণী হইবার গুণ—

সভ্য দেশে যাঁরা রাণী হন, তাঁদের দরকার হয় মানসিক বল ও ধৈর্য্য। অহল্যাবাই এলিজাবেথ প্রভৃতি রাণী হইয়াছিলেন তাঁদের বুদ্ধিমত্তার জন্য, রিজিয়া ভিক্টোরিয়া রাণী হইয়াছিলেন মানসিক গুণের জোরে। কায়িক সহনশীলতা বা বল তাঁদের রাণী হওয়ার পথে বিশেষ সহায়তা করে নাই। কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকার মাশাই জাতিদের মধ্যে যিনি রাণী নির্ব্বাচিত হন তাঁর চাই কায়িক ধৈর্য্য। মাশাই জাতির রাজা যাকে-তাকে রাণী করেন না। যাকে তিনি রাণী করেন তাঁর গলা হইতে তিনি কয়েক হাত লম্বা পিতলের নল জড়াইয়া জড়াইয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় বৃত্তাকারে সর্ব্বাঙ্গে ঝুলাইয়া দেন, এবং তাঁর প্রতি কানের ছেঁদায় প্রত্যেকটি ওজনে প্রায় আধ সের এমন

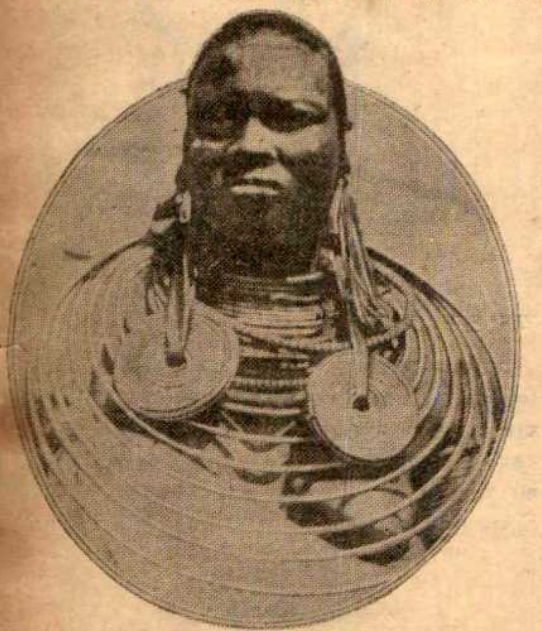

ভূষণ-ভূয়িষ্ঠা মাশাই মহিষা।

কয়েকখানি বড় বড় করতালের মতন ইস্পাতের চাকতি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেন। রাণীকে দিনরাত এইসব বহন করিতে হইবে। যদি তিনি বহন করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি রাণী হইবার অযোগ্য। যিনি এইসমস্ত সহিয়া খাড়া থাকিতে পারিবেন তিনিই হইবেন রাণী। জাতির অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনিই থাকিবেন একমাত্র স্বাধীন। অপর মেয়েদের কেবলমাত্র কয়েকটা গরু বা কয়েকখানা বর্শা দিয়া বেচা কেনা করা যায়। ইঁহার বেলা আর তাহা খাটে না। মোটের উপর কায়িক বল ও ধৈর্য্যের গুণেই তিনি রাণীও হইলেন, স্বাধীনও হইলেন।

—

শ্যামদেশের ভিস্তি—

আমাদের দেশে আগে রাস্তায় জল দিত ভিস্তিরা মোশকে করিয়া জল লইয়া। তারপর চলন্ত সিন্দুকের মত এক রকম গাড়ীর সৃষ্টি

শ্যামদেশের ভিস্তি।

হয়, তার পিছনে একটি নল লাগানো থাকিত, তার গায়ে অনেক ছেঁদা। এইসব ছেঁদা দিয়া জল সরু হইয়া ছুটিয়া রাস্তায় পড়িত। সহরের চারি পাশে অনেক জায়গায় এখনো এই রকম গাড়ী করিয়া রাস্তায় জল দিবার প্রচলন আছে। আজকাল সহরে পথের ধারে ধারে জলের কল থাকে, তাতে বড় বড় লম্বা লম্বা নল লাগাইয়া জল ছড়ান হয়।

শ্যাম দেশে এখনো ভিস্তিরা রাস্তায় জল দেয়। তবে তারা মোশক ব্যবহার করে না। আমাদের দেশে বাগানে জল দিবার জন্য মালীরা যে ঝাঁঝরা গাড়ু ব্যবহার করে, শ্যাম দেশের ভিস্তিরা সেই রকম দুইটা বড় বড় ঝাঁঝরা গাড়ুতে জল ভরিয়া বাঁকে বাঁধিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া রাস্তায় বেড়াইয়া বেড়ায় ও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় জল ছিটান হইয়া যায়। ছবিতেই দেখিতে পাইবেন সেখানকার ভিস্তিরা কেমন করিয়া রাস্তায় জল দিতেছে।

—

বিপজ্জনক তীর্থযাত্রা—

চীন দেশে তাও নামে একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। হুয়া-শান নামে একটি পাহাড়ের উপর তাঁদের একটি কাম্য প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, সেখানে অনেক দেব-মন্দির। যাঁরা গুণ বা শক্তি লাভ করিতে কিম্বা মনের বাসনা পূর্ণ করিতে চান তাঁরা এইখানে তীর্থ করিতে আসেন। কিন্তু এই তীর্থ দর্শন করিতে আসিলে প্রাণটি হাতে করিয়া আসিতে হয়। হুয়াশান পাহাড়টি খুব উঁচু ও খাড়াই। তার গায়ে কতকগুলি মোটা কাঠ পুঁতিয়া তাদের উপর লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি পাতিয়া তীর্থে যাইবার পথ করা হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে একটি শিকল ঝোলানো আছে। তাহা ধরিয়া ধরিয়া কোন রকমে দেহের সমতা রাখিয়া এই

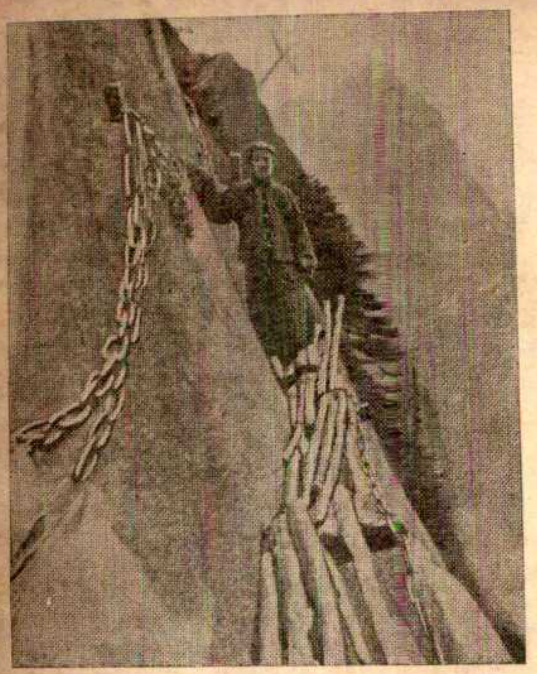

চীনা তীর্থযাত্রী—দুর্গম পথে।

খাড়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। এত কষ্ট ও বিপদ মানিয়া যে উপরে উঠিল, বুঝিতে হইবে তার ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং তার মনস্কাম সিদ্ধ হইবেই! এই পথ হইতে পা ফস্‌কাইয়া পড়িলে একেবারে দেড় হাজার দুহাজার ফুট নীচে মাটিতে পড়িয়া একেবারে গুঁড়া হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের টানে এই পথে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক উঠিয়া থাকে এবং পা পিছ্‌লাইয়া মরেও অনেক লোক। আমাদের দেশেও কিছুদিন আগে লছমনঝোলা দড়ির পুল পার হইয়া বদরীনারায়ণ যাওয়াও এইরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল। তবু যাত্রীর অভাব হইত না। ধর্ম্মপিপাসা মানুষের এমনই প্রবল ও স্বভাবগত।

দড়ির টিকি—

মাথায় টিকি রাখার প্রথা অনেক জাতির মধ্যেই আছে। চীনের টিকিই ছিল বহরে সবার বড়। কিন্তু তারা যে টিকি রাখিত তাহা বাস্তবিকই মাথার চুলের। আর ইষ্ট আফ্রিকায় ওয়াকাম্বা বলিয়া এক জাতি আছে, তাদের টিকি রাখার সখ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু তাদের মাথার চুল ছোট ছোট, কোঁকড়া কোঁকড়া, তাহা হইতে ভাল টিকি তৈরী করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া তারা ছাড়িবার পাত্র নয়। তারা ছোট চুলের সঙ্গে এক হাত আন্দাজ এক দড়ি বাঁধিয়া তাহাই টিকি করে। কিন্তু দড়ি বাঁধা টিকি লোকের চোখে খারাপ ঠেকিতে পারে; তাই কেরাসিন তেল ঢালিতে আমরা যেমন ফানেল ব্যবহার করি সেই রকম একটি ফানেল তারা মাথার উপর বসাইয়া দেয়, তার নল দিয়া টিকির দড়ি পিঠের উপর ঝুলিতে থাকে। এত করিয়া তারা তাদের টিকির সখ বজায় রাখিয়াছে!

এই ওয়াকাম্বা জাতির মেয়েরা ইস্পাতের মোজা ও বালা পরে। কয়েকটা গরু দিয়া এইসব মেয়ে কিনিতে পাওয়া যায়।

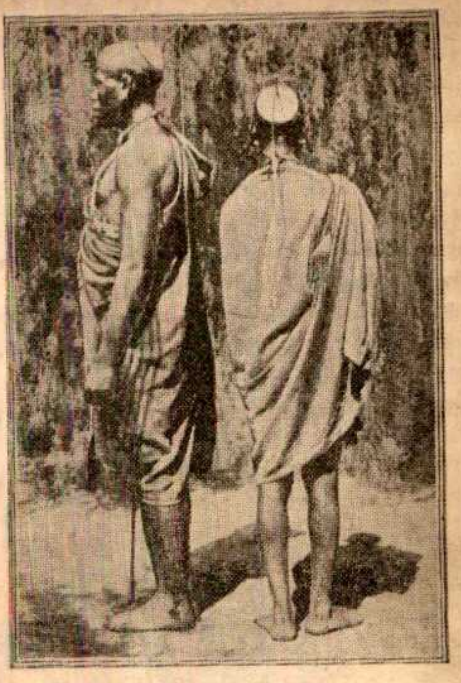

দড়ির টিকি।

স্বয়ংপ্রভ পেন্সিল—

অনেক সময়ে রাত্রিতে পথে অন্ধকার ঘরে আমাদের কিছু না কিছু লিখিবার দরকার পড়ে। সে সময়ে হঠাৎ আলো পাওয়া বা আলো জ্বালা হয়ত সুবিধা না হইতে পারে কিম্বা দেরী হইতে পারে। এই রকম দরকারের সময় যদি কাছে এমন কোন কলম বা পেন্সিল থাকে যাহা আপনা-আপনি আলো দেয় এবং অন্ধকারেও কাগজের উপর লিখিতে কোন কষ্ট বোধ না হয়, তাহা হইলে কি আশ্চর্য্যের কথা।

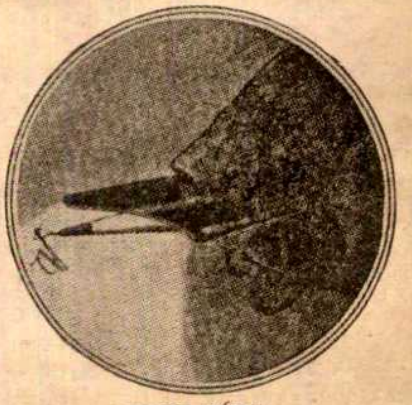

স্বয়ংপ্রভ পেন্সিল।

দুই রকম স্বয়ংপ্রভ পেন্সিল সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। একটি উদ্ভাবিত হইয়াছে ইংলণ্ড হইতে, অপরটি আমেরিকা হইতে। ইংলণ্ড হইতে যেটি উদ্ভাবিত হইয়াছে তাতে একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি আছে, আলোর একটি কাচের চোঙা আছে এবং সেটিকে রক্ষা

করিবার জন্য একটি কাচের আচ্ছাদনী আছে। কিন্তু আমেরিকার পেন্সিলটি আরো সাদাসিধা উপায়ে প্রস্তুত। ইহাতে পেন্সিলের মুখে চালের মত একটি গোল চাকতি স্বয়ংপ্রভ ধাতুদ্রব্য লাগানো আছে। এই চাকতিটিকে যে-কোন পেন্সিলের মুখে লাগাইয়া তাকে স্বয়ংপ্রভ পেন্সিল করা যায়।

—

কপালে পড়িবার আলো—

স্বয়ংপ্রভ পেন্সিলে অন্ধকারে কেমন লিখিবার সুবিধা হয় তাহা বলিলাম। রাস্তায় হঠাৎ কোন কিছু পড়িতে বা লিখিতে দরকার হইলে কাছে রাখা যায় এমন এক প্রকার আলোও সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা পকেটে রাখা চলে। এবং হঠাৎ দরকার হইলে বাহির করিয়া কপালে ভ্রূর উপর লাগাইয়া দিলে ইহার আলোতে অনায়াসে কিছু পড়িতে বা লিখিতে পারা যাইবে।

পড়ুয়ার সঙ্গী পড়ার আলো।

এই আলোর উপাদান—একটি চোঙা, একটি ঢাক্‌নি আর তার সঙ্গে একটি ব্যাটারি। ঢাক্‌নিতে বাধা পাইয়া আলোর রশ্মিগুলি নীচের দিকে তাড়িত হয়, এবং তাতে পড়িবার ও লিখিবার খুব সুবিধা। ইহার নির্ম্মাতার নাম চার্লস্ এস বার্টন, ওক পার্ক, ইলিনয়, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্।

—

দুষ্ট ঘোড়া জব্দ করা—

ঘোড়া একবার গরম হইলে তার অত্যাচার বড় ভীষণ; আর প্রায়শঃ দুষ্ট ঘোড়ারা যে কি কষ্ট দেয় তা বলা যায় না। যে-সব দেশে আবার ঘোড়ার প্রাচুর্য্য সেসব জায়গায় দুষ্ট ঘোড়ারা ফসলেরও অত্যন্ত ক্ষতি করে।

আমেরিকার এক জায়গায় একটি চাষার একটা দুষ্ট ঘোড়া ছিল। তার কাজ ছিল যখন-তখন মনিবের ক্ষেতে বা প্রতিবাসীদের ক্ষেতে পড়িয়া ফসল ধ্বংস করা। চাষা কিছুতেই ঘোড়াটাকে আঁটিয়া উঠিতে

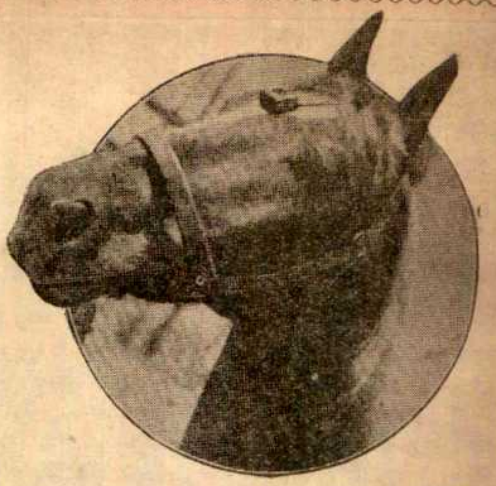

মাথায়-মুহরি দুষ্ট ঘোড়া।

পারিতেছিল না। অবশেষে একদিন সে একটি ক্ষুর চিপ্‌লে বা মুহরি কুড়াইয়া পাইয়া তাতে দড়ি গলাইয়া ঘোড়াটার মাথার চুলের সঙ্গে বাঁধিয়া তার কপালের উপর ঝুলাইয়া দিল। তারপর ঘোড়া ছাড়া পাইয়া যেই মাথা নাড়িতে লাগিল, অমনি মুহরিটা দুলিয়া দুলিয়া চিপ চিপ করিয়া তার কপালে লাগিতে লাগিল। যখন সে মাথা থামাইল, মুহরিটাও থামিল। দুষ্টামি করিয়া মাথা নাড়ার যে কি বিপদ তাহা সে তখন বুঝিল ও বাধ্য হইয়া শান্ত হইল।

আমাদের দেশে যাঁরা দুষ্ট ঘোড়ার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁরা এই চাষার পন্থা অবলম্বন করিলে সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

—

বৈদ্যুতিক উপায়ে গো-দোহন—

আমাদের দেশে হাতে করিয়াই গো-দোহন প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এ প্রথার কোন পরিবর্ত্তনে বা পরিবর্দ্ধনে আমাদের মনোযোগ নাই। দুধ দুহিবার আগে গরুর বাঁট ও দোহকের হাত ভালো করিয়া ধুইয়া ও বীজাণুমুক্ত করিয়া দুধ দুহিলে দুধে কোন রোগের বীজ সংক্রামিত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের গোয়ালাদের জ্ঞান অল্প। তা ছাড়া দোহনের সময় গরুর পা ছোড়া ও ল্যাজ দিয়া মারা—দোহনে বড় বাধা দেয়।

এইরূপ ব্যাধি-বীজ হইতে দুধ মুক্ত ও দোহনের সময় গরুকে শান্ত রাখিবার জন্য সম্প্রতি ইউরোপে একরূপ বৈদ্যুতিক কল উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই দোহন-যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র একটি লোকে এক সময়ে তিনটি লোকে হাত দিয়া যতগুলি গরুর দুধ দোহন করিতে পারে, ততগুলি গরু দুহিতে পারে। ইহার দ্বারা প্রথমে গরুর বাঁট-গুলি পরিষ্কৃত ও শোধিত করিয়া লওয়া হয়, তারপর বাঁটে কয়েকটি রবারের নল লাগাইয়া দেওয়া হয়। এই নলগুলি দুধ টানিয়া আনিয়া একটি পাত্রে ঢালে। ছবিটিতে এই প্রথায় গো-দোহন দেখান হইয়াছে।

এই দোহন-যন্ত্রকে সকল সময়েই কাজে লাগান যাইতে পারে। ইহাতে অল্পই বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয়িত হয়। ইহা লাগাইয়া দুধ দুহিতে থাকিলে গরু পা ছুড়িতে পারে না। ইহার সাহায্যে পঁয়-তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে পনেরোটি গরু দোহন করিতে পারা যায়।

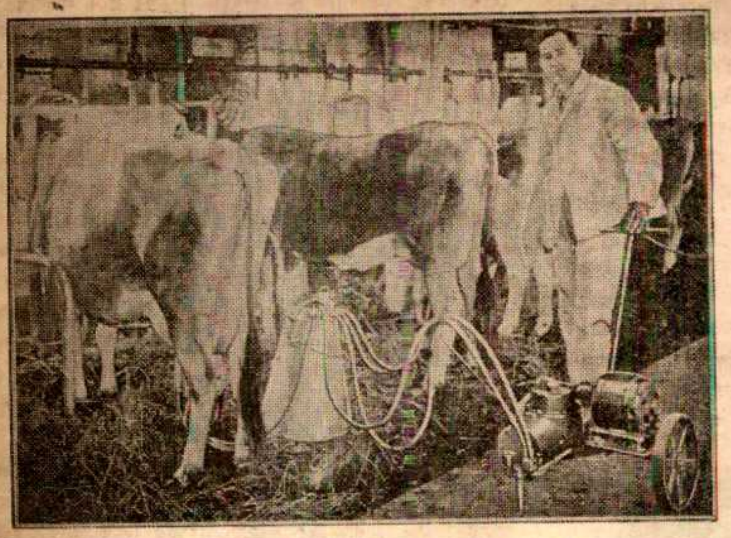

গো-দোহনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

আর হাতে দুহিয়া যত দুধ পাওয়া যায়, এই কলের সাহায্যে তার বেশী দুধ পাওয়া যায়।

সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি গো-প্রধান জায়গা। এখানে এই যন্ত্রের প্রচলন খুব বেশী। ইউরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গায় আজকাল ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

—

অতিকায় মানুষ—

আমেরিকায় একটি প্রকাণ্ড লোক আছে, সে অপর লোকদের চেয়ে ঢের বেশী লম্বা। তার বাড়ী হলাণ্ডে এবং সেখানে তার দেহের

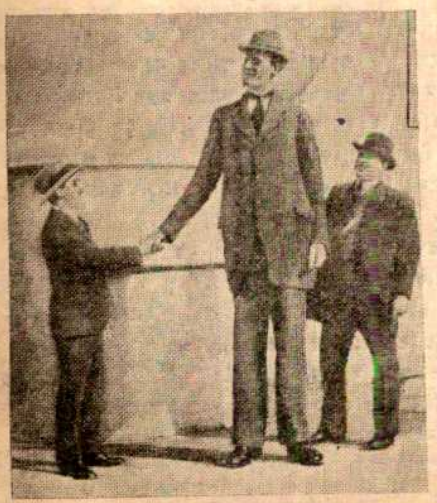

অতিকায় মানুষ।

দৈর্ঘ্য লাভ ঘটে। লোকটি উচ্চতায় আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। সে পরে সাড়ে নয় নম্বরের টুপি, তেরো নম্বরের জুতা এবং চোদ্দ নম্বরের দস্তানা! এই লোকটির পোষাক তৈরী করিতে বারো হাত কাপড় লাগে!

মানুষ বেশী ঢ্যাঙ্গা হয় কেন, আর বামনই বা হয় কেন? এ-সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্ত এই, যে, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (Thyroid gland) মানুষকে ঢ্যাঙা ও বেঁটে করিবার কর্ত্তা। এই গ্রন্থির উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ইহার একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া ডাক্তারেরা একবার একটি ব্যাঙাচিকে প্রকাণ্ড আকারের করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে প্রবাসীতে আমরা আগে কিছু লিখিয়াছি।

—

গণ্ডারের শিং—

প্রাচীন কালে অনেক দেশে রাজারাজড়ারা জল কিম্বা অপর কোন পানীয় জিনিষ খাইবার জন্য গণ্ডারের শিং পাত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল—পানীয়ের সঙ্গে বিষ দিলে তাহা ইহাতে ফুটিয়া উঠিবে, কিন্তু অন্য পাত্রে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দুশাস্ত্রে গণ্ডারের খড়্গ পিতৃপুরুষের তর্পণের শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে; গণ্ডারখড়্গে করিয়া জলগণ্ডুষ দান করিলে পিতৃপুরুষের নাকি অনন্ত তৃপ্তি হয়।

গুপ্ত।

—

নিখুঁত রমণী—

ভিনাস্ দ্য মিলো নামক দেবীমূর্ত্তিটি রূপরসিক লোকদের মতে নিখুঁত রমণীর আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। এখন একজন জীবন্ত মেয়ে পাওয়া গিয়াছে যাঁকে সৌন্দর্য্যবিচারকেরা নিখুঁত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ইনি আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেস দেশের মেয়ে, নাম মিস রোজালিণ্ড স্মীথ। এঁর দেহসৌষ্ঠব নাকি perfect নিখুঁত বলিয়া ইনি বিজয়িনী প্রতিপন্ন হইয়াছেন। এঁর ওজন প্রায় ১ মণ ২১ সের; খাড়াই ৬৩·৫ ইঞ্চি (৫ ফুট ৩।০ ইঞ্চি); প্রসারিত দুই হাতের মাঝের আঙুল হইতে মাঝের আঙুলের ডগা (এক বাম) ৬৪·৮ ইঞ্চি; কাঁধের বিস্তার (পুট) ১৪·৭ ইঞ্চি; বক্ষের গভীরতা ৭।০ ইঞ্চি; গলার বেড় ১২·৩ ইঞ্চি; কোমরের বেড় ২০ ইঞ্চি; উরুর বেড় ২১·৭ ইঞ্চি; পায়ের ডিমের বেড় ১৩·১ ইঞ্চি। মিস স্মীথ বলেন—তাঁর দেহসৌষ্ঠব নিখুঁত হইবার কারণ এইগুলি—(১) ৯ ঘণ্টা ঘুম; (২) খোলা জায়গায় রাত্রে শোওয়া; (৩) দীর্ঘ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (প্রাণায়াম); (৪) সামান্য দৈহিক ব্যায়াম; (৫) মিষ্টান্ন পিষ্টক প্রভৃতি আহার বর্জ্জন।

—

কালির পেন্সিল ও কব্জী কলম—

ফাউণ্টেন পেন বা ঝর্না-কলমে তরল কালি ভরিয়া লইতে হয়; তরল কালির বদলে কালির বড়ি, কাদা কালি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমেরিকার ব্রুক্‌লীন পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউটের কেমিষ্ট ডাক্তার অল্‌সেন এক রকম কালির পেন্সিল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই

পেন্সিলের মধ্যে লেড্ পেন্সিলের শিষের বদলে একটা কালির বাতি ভরা থাকে; এবং পেন্সিলের মুখে নিব পরানো থাকে। নিবটা জলে ডুবাইয়া লইলেই কালির বাতি গলিয়া একটা খাঁজে খানিকটা তরল কালি জমে; সেই কালিতে একখানা চিঠি অক্লেশে লেখা চলে। আবার জলে নিব ডুবাইলেই আবার কালি পাওয়া যায়। এই কালির পেন্সিলে কালি কলম দুই এক সঙ্গেই থাকে; ফাউন্টেন পেনের মতন সঙ্গে সঙ্গে কালির দোয়াতও বহিয়া বেড়াইতে হয় না।

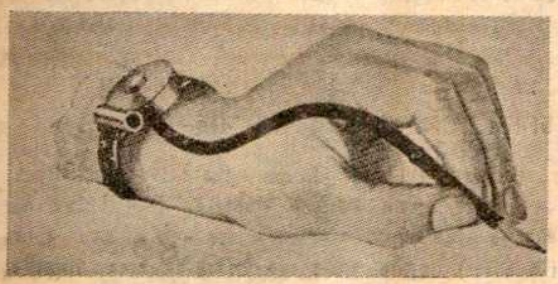

কব্জী-কলম।

আমেরিকায় সম্প্রতি এক রকম হাতকলম তৈরি হইয়াছে। হাতঘড়ী যেমন কব্জীতে বাঁধা থাকে, এই কলমের একটা ছোট্ট দোয়াত তেমনি কব্জীতে বাঁধা থাকে, এবং সেই দোয়াত হইতে একটা লম্বা নমনীয় নল ঝোলে, সেইটাই কলম; লিখিতে আরম্ভ করিলে কব্জীর দোয়াত হইতে কলমের মুখে কালির জোগান্ চলিতে থাকে।

—

পারাবত-দূত—

পায়রা বহুকাল হইতে অনেক দেশেই দূতের কাজ করিয়া আসিতেছে প্রণয়ে ও বিবাদে। এখন পায়রাকে উড়ন নৌকায় ও এরোপ্লেনে যাত্রাকালে সঙ্গে রাখা হয় বিপদে দৌত্যে পাঠাইবার জন্য। উড়ো নৌকা উড়িতে উড়িতে বিকল হইয়া যদি সমুদ্রে পড়ে ও মাঝিমাল্লারা জাহাজের সন্ধান না পায় তবে বিপদবার্ত্তা কাগজে লিখিয়া সঙ্গের পায়রার গায়ে বাঁধিয়া দ্যায় এবং তাকে ছাড়িয়া দ্যায়। পায়রা অকূল সমুদ্রে যেখানে আশ্রয় পায় সেখানে গিয়া বসে; অথবা সমুদ্র পাড়ি দিয়া ডাঙায় যায় এবং সেখানকার লোকেরা তার কাছে খবর পাইয়া বিপন্নদের উদ্ধার করে। ইংরেজদের একটা বিপন্ন উড়ন নৌকা হইতে এইরূপ এক পারাবত দূত পাঠানো হয়; তখন কোয়াসায় দিক আচ্ছন্ন ছিল; তবু সেই পায়রা পথ চিনিয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছিল। বেচারা শ্রান্ত হইয়া তখনি মরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিপদের উদ্ধারের উপায় করিয়া।

কয়ালী।

—

ক্যামেরায় ঢুকিয়া ছবি লওয়া—

ছবি লইবার সময় ফটোগ্রাফের ক্যামেরা ঠিক-মত বসানো হইল কি না, ফোকাস্ ঠিক হইল কি না নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যেক ক্যামেরার গায় একটি বা দুইটি করিয়া আর্সি-ফলক বসান থাকে, যে জিনিষের ছবি লওয়া হইবে তার ছোট একটি প্রতিচ্ছায়া সেই আর্সি-ফলকের উপর প্রতিফলিত হয়। ঠিক যতটুকু জায়গার ছবি লইতে চাই, ততটুকু জায়গার ছায়া আর্সি-ফলকে খুব স্পষ্ট এবং সোজা হইয়া পড়িল কি না দেখিয়া তারপর ছবি লওয়ার রীতি। কিন্তু এই আর্সি-ফলকের সাহায্য ছাড়া একেবারে ক্যামেরার মধ্যেকার প্রতিফলন দেখিয়া ফোকাস্ ঠিক করিবার পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহা করিতে হইলে ফটোগ্রাফারকে একেবারে ক্যামেরার মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে হয়।

বলিতে গেলে এ পদ্ধতিতে ফটোগ্রাফ লইতে ক্যামেরার দরকারই হয় না। যে-কোন ফাঁক-বোজানো ঘরকে ফটোগ্রাফার তাঁর ক্যামেরায় রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারেন। এমনি একটি ঘরে ঢুকিয়া তার সমস্ত দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া তারপর কেবল একটিমাত্র জানালার গায় পুরু কালো পর্দ্দা আঁটিয়া দিয়া সেই পর্দ্দার গায় ছোট একটি ছিদ্র করিতে হয়। ছিদ্রপথে অপর দিক্‌কার দেয়ালের গায় রৌদ্রালোকিত বাহিরের একটি অস্পষ্ট রঙিন প্রতিচ্ছায়া উল্টা হইয়া পড়িয়াছে, দেখিতে পাইবেন। ছেঁদার মুখে কাচের লেন্স্ জুড়িয়া দিলেই ছবিটি সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। এইটিই হইল নূতন পদ্ধতির ফটোগ্রাফের ক্যামেরা।

লেন্সের উল্টা দিকে ঘরের মধ্যে, ফটোগ্রাফার ছবি লইবার আলোক-কুণ্ঠিত কাচের প্লেট বা কাগজটিকে প্রয়োজন-মত দূরে খাটাইয়া দেন। লেন্সের সম্মুখে বাইরের দিকে আর-একটি ঘরে যে জিনিষ বা ব্যক্তির ছবি লওয়া হইবে তার বসিবার জায়গা। দুদিক হইতে দুইটি বিদ্যুতের বাতির চোখ-ঝল্‌সানো আলোর ধারা সেই জায়গাটির উপর ঝরিতে থাকে, দরকার-মত এ আলোক কম বেশী করা যায়। এই আলোয় চাহিয়াই ক্যামেরা তার চিত্ত-পয়তে নয়নপথবর্ত্তীর ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া লয়।

—

প্রজাপতি এয়ারপ্লেন্—

ত্রিশবৎসর আগে এই কলিকাতা সহরে একটিও মোটরগাড়ী ছিল না, আর আজ যেখানে-সেখানে এরা মশার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। এই উপমাটি কিছুদিনের মধ্যেই আরও সুসঙ্গত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। "বাটারফ্লাই" বা "প্রজাপতি" বলিয়া একরকমের এরোপ্লেন্ তৈরি হইতেছে, এরা যেমন ছোট তেমনি সস্তা। মাঝারি রকমের একটি মোটরকার কিনিবার সামর্থ্য যার আছে সে ইচ্ছা করিলেই এই রকমের একটি এয়ারপ্লেন্ কিনিয়া রাখিতে পারিবে। প্রজাপতির ওজন সাড়ে সাত মণের বেশী নয়, লম্বাই ১৯ ফুট, পাখার বিস্তার ২৯ ফুট।

টাকাওয়ালা লোকদের হাওয়া খাওয়া ও আর আর গুরুতর দরকারে মোটরকারের আদর কমিয়া গিয়া যদি প্রজাপতির রেওয়াজ সুরু হয় তবে পথব্রাজকদের জীবন নিরাপদ হইয়া প্রজাবৃদ্ধি ঠিক না হোক, প্রজা বলি কিছু কমিতে পারে বটে।

—

বরুণের ঘরে খানাতল্লাসী—

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে "স্পানিশ আর্মাডা" বা স্পেনদেশীয় রণতরী-বাহিনী ইংরেজরাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আসিয়া ঝড়ে বিধ্বস্ত হইয়া মারা পড়িয়াছিল। তার অন্তর্গত একটি নিমজ্জিত জাহাজের খোল হইতে ৩০০ বৎসর পরে অনেক মূল্যবান এবং কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হইয়াছে। রূপার বাসন-কোষণ, নানারকমের দামী মুদ্রা, এমন কি কতগুলি মদের বোতল পর্য্যন্ত প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

—

সিংহের মাংস—

কিছুদিন হইতে ফ্রান্সের রাজধানী পারীর বাজারে কসাইখানায় সিংহের মাংস বিক্রয় করা হইতেছে। সাধারণ মাংসাশী মানুষ ছাগ মেষ প্রভৃতি সাধারণ পশুর মাংসে তৃপ্তিলাভ করে। পশুরাজের মাংস কি তবে রাজা-রাজড়াদের রসনাতৃপ্তির জন্য? কিন্তু ফ্রান্স গণ-তন্ত্রের দেশ, সেদেশে রাজারাজড়াও নাই আর রাজারাজড়া বলিয়া কোনো ব্যক্তিকে সে দেশের লোকেরা সম্মান করিতেও জানে না। পশুরাজের প্রতিও খুব অসম্মান দেখানো হইতেছে. গোমেষাদির মাংস অপেক্ষা তিনগুণ সস্তায় তাঁর মাংস ক্রেতাদের দেওয়া হইতেছে। এমন দেশে যে এমনটি ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

—

পৃথিবীর সব চেয়ে ছোট শিশু—

জ্যাঁন্ উসের বয়স দুই মাসের কাছাকাছি, কিন্তু ওজনে সে আধ-সেরের বেশী নয়। সে যখন জন্মায় তখন তার ওজন ছিল এক পোয়া। অনেক ইঁদুরের ওজন একপোয়ার চেয়ে বেশী। জ্যাঁনের পুতুলটা তার চেয়ে বড়। কিন্তু এই একরত্তি একফোঁটা মানুষটি যে-কোনো পাঁচসেরা খোকাখুকীরই মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে, তারও চীৎকারের শব্দে পাড়াপ্রতিবাসীদের কানে তালা লাগিয়া যায়।

—

সাগরের মাপ—

সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার একটি খুব সহজ উপায় ফরাসীদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে। জলের নীচে জাহাজের খোলের গায় মাপযন্ত্রটিকে লাগাইয়া যেখানকার গভীরতা মাপা প্রয়োজন সেইখানে জাহাজটিকে লইয়া যাওয়া হয়। যন্ত্রের মধ্যে খানিকটা বিস্ফোরক ফুটাইবার ব্যবস্থা থাকে। বিস্ফোরক ফুটিবার শব্দ সমুদ্রের গভীরতলদেশ হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসে। মাইক্রোফোন বা অণু-শ্রবণ যন্ত্রে সে শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানটুকু মাপিলেই জলের গভীরতাও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে, কারণ, শব্দের গতিবেগ কত তা জানা আছে। জাহাজের নড়াচড়া ও জলের তাপ শব্দের চলা ব্যাহত করিবার সম্ভাবনা থাকে। সেটাকে ধরিয়া বাদসাদ দিয়া হিসাব করা ব্যবস্থা।

—

চিন্তাশীল লোকের মাথা—

পঁচিশ বৎসরের পর মানুষের দেহের বড় আর-একটা পরিণতি হয় না; কিন্তু তার মাথা, বিশেষ করিয়া সে যদি ভাবুক চিন্তাশীল হয়, পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত আকারে সমান বাড়িতে থাকে।

—

তিনতলা বাড়ীর জায়গা বদল—

তাঁবু যেমন করিয়া এক জায়গা হইতে উঠাইয়া অন্য জায়গায় লইয়া গিয়া খাটাইতে পারা যায়, তেমনি করিয়া আমেরিকায় বড় বড় বাড়ী তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সম্প্রতি ছেটোয়া শহরে বড় বড় মোটর কোম্পানীর আফিস-বাড়ীর জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া জমানো কংক্রিটের তিনতলা একটি বাড়ীকে ৪৫০ ফুট রাস্তা বহন করিয়া সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁবু সরানোর সঙ্গে তার তফাৎ হইয়াছে এইখানে যে, যে ছয়দিন ধরিয়া তিনটি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে এই সরানোর কাজ চলিয়াছিল তার মধ্যে একটি মুহূর্ত্তও বাড়ীর মধ্যকার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম নিয়মে চলিবার বাধা ঘটে নাই, টেলিফোঁর যোগ ব্যাহত হয় নাই, বাইরের সঙ্গে কারবার যথারীতি চলিয়াছে। বাড়ীটির ক্ষেত্রপরিমাণ ৬০×৯৫ ফুট, ওজন লোকজন জিনিষপত্র বাদে ৭১০০০ মণ।

সুধীর।

—

চামড়া রং করিবার উপযোগী গাছ—

মিঃ হেইন্‌স (H. H. Haines) বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের বন বিভাগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মচারী। তিনি উপস্থিত উক্ত প্রদেশের উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় নানা তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। বাব্‌লা (Acacia) জাতীয় গাছের ছাল যে বহুদিন যাবৎ চামড়া রং (tan) করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। কিন্তু, এখন চামড়া রং করিবার উপযোগী অন্য গাছেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গত জুলাই মাসের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার (Indian Forester) নামক পত্রিকায় তিনি করঞ্জা (Carissa) জাতীয় যে-সমস্ত পাতা ও ছাল হইতে চামড়া রং করিবার উপযোগী টেনিন্ (Tannin) নামক কষায় পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ অনুসন্ধিৎসুদের পঠনীয়।

—

পিপীলিকার আক্রমণ হইতে খাদ্য-দ্রব্য রক্ষার সহজ উপায়—

পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী বলিয়া পিপীলিকার নিকট মানুষের যতই শিক্ষা করিবার থাকুক না কেন, পিপীলিকা যে মিষ্ট জিনিষ ঘরে থাকিলে বড় উৎপাত করে সে সম্বন্ধে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। চিনি, মিছরী, সন্দেশ ও বিস্কুট ইত্যাদি যেখানেই লুকাইয়া রাখুন না কেন, ক্ষণেক পরে দেখা যায় যে পিঁপ্‌ড়ে সেখানে গিয়া ঠিক হাজির হইয়াছে। যদি চেপ্টা পাত্রে জল ঢালিয়া তার উপর অন্য পাত্রের মধ্যে ঐসব মিষ্টদ্রব্য রাখা যায় তবেই উহাদের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সচরাচর তাও সাঁতার দিয়া পার হওয়ার চেষ্টা করিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ ব্যবধান যদি অল্প হয়। যদি অল্প কিছু কর্পূরের একটা পুঁটুলি ঐসব জিনিষের মধ্যে রাখা যায়, তবে পিঁপ্‌ড়ে সে দিকে ঘেঁসে না। কর্পূর উহাদের পক্ষে বড় মারাত্মক জিনিষ। জিনিষ বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্পূরের উগ্রগন্ধ দূর করিতে হইলে ব্যবহারের পূর্ব্বে জিনিষগুলি খোলা জায়গায় কতক্ষণ রাখা দরকার। ইহা আমার পরীক্ষিত।

"পিয়েমডি।"

আলোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গীতাঞ্জলি

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি প্রবাসীর একটি আগ্রহী পাঠিকা। অন্যান্য পত্রিকা অপেক্ষা এই পত্রিকাটিকে বরাবরই একটু প্রীতির চক্ষে দেখি; কারণ—বোধহয় এই পত্রিকাটির স্পষ্টবাদিতা। কিন্তু আপনার কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ভালরূপ খোঁজ না লইয়াই একটা অন্যায় কথা ছাপাইয়া ফেলিয়াছেন; তাহাতে একটু দুঃখিত হইলাম। আপনি বাংলার একটা প্রধান কাগজের সম্পাদক, আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, আপনার 'ভুলচুক'গুলি আমাদের পীড়া দেয়। আশা করি আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ ত্রুটী অনেক। আর আপনি সেগুলি বেশ সুন্দর যুক্তি-তর্কের সহিত দেখাইয়াও দেন। কিন্তু আপনি ভালরূপে খোঁজ না লইয়াই যদি তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখেন, তাহা হইলে লোকের চক্ষেও আপনার কাগজখানি যেমন ভাল ঠেকিবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণও তেমনি আপনাকে আর প্রীতির চক্ষে দেখিবে না। সত্য কথা লইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিলে যেমন করিয়াই হউক সহিয়া লওয়া যায়, কারণ নিজের দোষ তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; কিন্তু মিথ্যা বলিলে যে ক্রোধ—অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।

বিহার আমাদের পূজনীয় গুরুদেবের গীতাঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার পুস্তক যাহাতে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ্যরূপে গৃহীত হয় তাহার পথপ্রদর্শক হইয়াছে সত্য; কিন্তু কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তো এই পথ অনুসরণে বিলম্ব করে নাই। আই-এ পরীক্ষাতে বালিকাদের সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাংলা লইবার প্রথা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় বালিকাদের সেই বাংলা পুস্তকের তালিকার ভিতর "গীতাঞ্জলি'কে স্থান দিয়াছেন। অবিশ্যি গীতাঞ্জলির স্থান ইহা অপেক্ষা ঢের উচ্চে। কিন্তু গুরুদেবের পরম-শত্রু—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে যে এইটুকু সম্মান দেখাইয়াছেন তাহাই এখন আমাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পুস্তকগুলির বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান প্রাপ্তির আশা আছে, এইটুকু সম্মান প্রদর্শন হইতে কি আমরা সে আশা করিতে পারি না? থাক আমার বক্তব্য;—আপনি যদি ভালরূপে খোঁজ লইয়া তবে কিছু ছাপান তবে সব দিক বজায় থাকে। আপনার সময়ের অভাব বুঝি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো আর সে কৈফিয়ৎ শুনিতে আসিবে না। আশা করি আপনার বিরক্তিজনক কিছু লিখিলাম না? দোষ বোধ করিলে ক্ষমা প্রার্থনীয়।

ইতি—

প্রবাসীর জনৈক পাঠিকা।

অজ্ঞতাবশতঃ আমাদের কিছু ত্রুটী হইয়াছে স্বীকার করিতেছি।

ইতি—

প্রবাসীর সম্পাদক।

কুষ্ঠরোগ ও দেশী খৃষ্টান।

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রবন্ধ-লেখক শ্রীরামানুজ কর কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অন্য সব জাতির চেয়ে বেশী।" কথা এক পক্ষে মিথ্যা না হইলেও, কারণ অনুক্ত রাখিয়া, যে ভাবে এবং যে অবস্থায় কথাটি তিনি প্রবন্ধে লিখিত করিয়াছেন, বিশেষ, তাঁহার প্রবন্ধে উক্ত রোগোৎপত্তির যে-সমস্ত কারণ দেখানো হইয়াছে,—তার পরে একটি জাতির মধ্যে সেই রোগের আধিক্য দেখাইলে, যে, সেই জাতির নৈতিক অবস্থাকেই খাটো করিয়া দেখানো হয়—কর মহাশয়ের সেটা বুঝা উচিত ছিল। তাঁর কথার অর্থ যদি এই হয়—প্রবন্ধ পাঠে স্বতঃই যে অর্থবোধ জন্মে—যে, দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যেই রোগটা বেশী এবং তাহারা ইহাতে আক্রান্তও হয় বেশী, তবে আমরা বলিব, ইহা তাঁহার অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা যে বেশী, সেটা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন ভাল, কিন্তু কেন বেশী—তাহা জানিতে বোধ করি একটু চেষ্টাও করেন নাই। কারণ, যদি করিতেন, তাহা হইলে দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে শুধুমাত্র কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাধিক্য দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না এবং যতটা আয়ত্ত তিনি হইয়াছেন—দেশীয় খৃষ্টানদের উপরে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাধিক্য নির্দ্দেশ করিয়া—অন্ততঃ ততটা আয়ত্ত হওয়া তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না, এ নিশ্চিত।

অন্যান্য জাতির তুলনায় খৃষ্টান কুষ্ঠীর সংখ্যা যে বেশী,—বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়—সে কথা ঠিক। এখন দেখা যাক্, অন্যান্য জাতির তুলনায় খৃষ্টানদের মধ্যেই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা এত বেশী কেন।

বাঁকুড়ার উপকণ্ঠে লেখক-বর্ণিত যেমন একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে, ঠিক তেম্‌নি একটি রাণীগঞ্জের উপকণ্ঠেও আছে। এই দুইটি আশ্রমই মিশনারি সাহেবদিগের দ্বারা স্থাপিত এবং পরিচালিত। উপস্থিত, বাঁকুড়ার আশ্রমে প্রায় ১৫০ জন এবং রাণীগঞ্জের আশ্রমে প্রায় ২৫০ জন রোগগ্রস্ত আছে। বলা বাহুল্য, খৃষ্টানদের বলিয়া, এ দুইটি আশ্রমেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া হয়। আপাততঃ এই দুইটি আশ্রমে যত কুষ্ঠী আছে, তাহার মধ্যে বাঁকুড়ায় মাত্র একজন আছে, যে খৃষ্টান হওয়ার পর ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তাও, খৃষ্টান হইবার পূর্ব্বে যে, ঐ রোগ তাহাতে সংক্রামিত হয় নাই, সে কথাও বলা চলে না। এ ছাড়া, দুইটি আশ্রমের আর সকলেই বিভিন্ন জাতীয় রোগগ্রস্ত। হিন্দু জাতির প্রায় সকল শ্রেণীর।

যেসব ভিন্ন জাতীয় রোগগ্রস্ত আশ্রমে আসে, তাহারা প্রত্যেকেই যাহাতে স্ব স্ব জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহার জন্য যথোচিত সুযোগ দেওয়া হয়। পরন্তু, ইহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারেরও রীতিমত ব্যবস্থা আছে। ফলে, এইসমস্ত হতভাগ্যেরা, যাহারা আপনাদের ঘৃণ্য অবস্থার জন্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবস্বজাতি সকলেরই স্নেহমমতা হারাইয়াছে, সংসারের সকল আশাভরসা যাহাদের একেবারে নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহারা, যাহাদের নিকটে আশ্রয় পায়, সেবিত ও চিকিৎসিত হয়, অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহাদের প্রায় সকলেই স্বেচ্ছায় তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। উপস্থিত বাঁকুড়া ও রাণীগঞ্জের আশ্রমের প্রায় ৪০০ জন কুষ্ঠীর মধ্যে প্রায় সকলেই খৃষ্টান এবং এই প্রকারের খৃষ্টান—যাহারা রোগ লইয়া আশ্রমে আসার পর খৃষ্টান হইয়াছে। তার পরে, লোক গণনা অথবা কুষ্ঠ রোগী গণনার সময় ইহারা সকলেই দেশীয় খৃষ্টান রোগগ্রস্ত বলিয়াই গণিত হয়। অতএব, দেশীয় খৃষ্টান কুষ্ঠীর সংখ্যা যে কেন বেশী, এইবার বোধ হয় কর-মহাশয় বুঝিতে পারিবেন।

বিশেষ দুঃখ এবং সঙ্কোচের সহিত আর-একটি কথা এই স্থানে বলিতেছি। বাঁকুড়ার মফঃসল অঞ্চলের অশিক্ষিত গরীবদের চেয়ে, অল্প বা অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থাপন্নদের অবস্থা বড় ভয়ানক। মিশনারিদিগের দ্বারা স্থাপিত সারেঙ্গার হাঁসপাতালে ডাক্তার সি ডেভিসের চিকিৎসাধীনে, ডাক্তার লিওনার্ড রজার্সের আবিষ্কৃত প্রণালীতে কুষ্ঠরোগী

চিকিৎসিত হয়। এই চিকিৎসাদিগের সংখ্যা যখন প্রায় ৩০।৪০ জন দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যেকার ব্রাহ্মণ কায়স্থ শিক্ষিত অবস্থাপন্নের সংখ্যা প্রণিধানযোগ্য।

বাঁকুড়া জেলায় উপদংশরোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া প্রবন্ধলেখক একস্থানে অনুযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধে, এসব রোগ যখন চরিত্রের অধঃপতনজনিত এবং নিম্ন স্বভাবের সংশোধন করিলেই যখন উহাতে আক্রান্ত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বলিয়া অনুযোগ করার চেয়ে, রোগ অর্জ্জনকারী স্বভাবের জন্য অনুযোগ করিলে শোভন হইত বেশী। স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচারজাত রোগের শুধু মাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেই ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুশিক্ষার আলোয় নৈতিক উন্নতি সাধন দরকার।

জিতেন্দ্রিয় মণ্ডল।

—

মায়াবাদের বৈদিক মূল।

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মায়াবাদ শীর্ষক সারবান প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "এজগৎকে যে-প্রকার দেখিতেছি ইহা এই-প্রকারই কি না, এ বিষয়ে ঋগ্বেদের ঋষিদের প্রাণে কোন জিজ্ঞাসাই উত্থিত হয় নাই। এ জগতের বাস্তব সত্তা আছে, ইহাই ঋগ্বেদের মৌলিক ভাব। উপনিষৎ রচনার পূর্ব্বেই মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং জ্ঞাতসারেই কেহ কেহ এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ঐ সময়ের সাহিত্যে জগতের মায়াময়ত্ব বিষয়ে যে দুই-একটি উক্তি পাওয়া যায় তাহাকে মায়াবাদ বলা যায় না। উপনিষদেই ইহার ভিত্তি।" আমার বেদ পড়া নাই। এ বিষয়ে আমি পরমগ্রাহী পাঠক মাত্র। তবে পাঠক সাধারণের জন্য জানাইতেছি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদক, বৈদিক সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁর "কর্ম্মকথা" পুস্তকে "যজ্ঞ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে ঋগ্বেদেই অদ্বৈতবাদের ও তাহার স্বাভাবিক পরিণাম মায়াবাদের মূল পাওয়া যায়। তিনি বলেন "নাসদাসীয় সূক্ত ও দেবীসূক্ত যিনি অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন ইহাই জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা—অন্যান্য বেদান্তবাক্য ইহারই পল্লবিত ভাষ্যমাত্র।" উক্ত প্রবন্ধে তিনি ঐ দুই (ঋগ্বেদসংহিতার) সূক্ত থেকে মন্ত্র উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা দ্বারা এই কথা দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন। যাঁরা এই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের সুযুক্তিপূর্ণ সুন্দর ও সরস ব্যাখ্যা দেখিতে চান, এবং দার্শনিকের চক্ষে বিজ্ঞান, ও বৈজ্ঞানিকের চোখে দর্শন দেখার আনন্দলাভ করিতে চান, তাঁরা ত্রিবেদী মহাশয়ের উক্ত "যজ্ঞ" প্রবন্ধ এবং তাঁর "জিজ্ঞাসা" পুস্তকের অন্তর্গত 'জগতের অস্তিত্ব' 'সৃষ্টি' 'আত্মার অবিনাশিতা', 'এক না দুই', 'মুক্তি', 'মায়াপুরী', 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা', 'কে বড়', প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

টাঙ্গানিকা টেরিটারী
(ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান ইষ্ট আফ্রিকা)
টাঙ্গা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে।

—

গড়মান্দারণ।

গত ভাদ্রের "প্রবাসী"তে আমি শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মজুমদার মহাশয়ের একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমি অনেকখানি লিখিয়া পাঠাইলেও প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সেটিকে সংক্ষেপ করিয়া ছাপাইয়াছেন। তাহাতে আমি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয় তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা না বলিয়া প্রকৃত উল্টা রকমই বলা হইয়াছে। ইহাতে সুধাংশুশেখর-বাবু ইহার আলোচনা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত। আমি তাহাতে বলিয়াছিলাম যে বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত "দুর্গেশনন্দিনী" ব্যাপার প্রকৃত সত্য নহে। তবে উপন্যাস-বর্ণিত কতকগুলি নাম প্রকৃতই সত্য এবং গড়মান্দারণ দর্শন করিয়া এইসকল লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বঙ্কিমবাবু এই উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"ঘোষাট হইতে কামার পুকুরে যাইতে পথের বামদিকে কাঁটালি গ্রামে শৈলেশ্বর শিবের জীর্ণ-মন্দির। কামারপুকুর বা কাঁটালি গ্রাম হইতে দক্ষিণে গড়মান্দারণ দেড় মাইলের বেশী হইবে না। কাঁটালিতে যেমন শৈলেশ্বর শিব, কামারপুকুরে তেমন "কর্ম্মকারদের পুষ্করিণী"র পূর্ব্বতীরে গোপেশ্বর শিব সংস্থাপিত। গদাই ঠাকুর (পরমহংসদেব) স্বয়ং এই শিবের পূজা করিয়াছিলেন। মান্দারণ পূর্ব্বে অতি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। শ্রীপুর, মুকুন্দপুর, মধুরাটা (৺ পরমহংসদেবের পত্নী শ্রীযুক্তা সারদা দেবীর পিত্রালয় ও বর্ত্তমান বাসের স্থান) গড়মান্দারণের অন্তর্গত। এই পুণ্যক্ষেত্রে অসংখ্য অরণ্যাবৃত মৃৎস্তূপ ও বহু বিলুপ্তপ্রায় দুর্গপ্রাকার সুদূর অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ইহার নিকট দিয়া আমোদর নদ প্রবাহিত।"

উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমবাবু ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

অগ্রজ "সঞ্জীববাবুর কার্য্যোপলক্ষে জাহানাবাদে অবস্থান কালে, বঙ্কিমবাবু যুবক বয়সে গড়মান্দারণে বেড়াইতে আসিয়া ইস্মাইল গাজীর আস্তানা, কাঁটালির শিবমন্দির ও নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগ্রামের ব্রাহ্মণ-বসতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। সেই হইতে দুর্গেশনন্দিনী গল্পের কল্পনা।"

সুধাংশুশেখর-বাবু মৌজা মার্পায় এক প্রাচীন শিবমন্দির আছে জানিয়া সেইটিকেই শৈলেশ্বর শিব-মন্দির ধারণা করিয়াছেন; আর পরমেশপ্রসন্ন-বাবু বলিতেছেন যে কাঁটালিতে এখনও শৈলেশ্বর শিবমন্দির জীর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান এবং ইহা গড়মান্দারণের নিকটবর্ত্তী। বঙ্কিমবাবুও নিজের উপন্যাসে গড়মান্দারণ ও এই কাঁটালি গ্রামের শৈলেশ্বর শিবের উল্লেখ করিয়াছেন।"

"তৎপর কালক্রমে এই দুর্গ জয়ধর সিংহ ও তাঁহার উত্তরপুরুষ বীরেন্দ্র সিংহের হস্তগত হওয়ার উল্লেখ যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অবশ্য ঔপন্যাসিক কল্পন।"

সুধাংশুশেখর-বাবু বলিতেছেন যে বীরেন্দ্র সিংহ ও বিমলার সন্ধান মিলিতেছে। কিন্তু পরমেশপ্রসন্ন বাবু গড়মন্দারণের দুর্গ বীরেন্দ্র সিংহের হস্তগত হওয়া বঙ্কিম-বাবুর কল্পনা বলিতেছেন। বিমলীগড়-বিরণকিতাদি প্রকৃতই জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-ব্যাপারের ঘটনাস্থল যদি হইত তাহা হইলে বঙ্কিম-বাবুর তাহা উল্লেখ করিতে এমনই বা কি বাধা ছিল? আরও অনেকের অনেক ঐতিহাসিক কল্পনা-পূর্ণ উপন্যাস আছে। কিন্তু ইতিহাস উলটপালট করিয়া কেহই স্থানের অথবা নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই।

পরমেশপ্রসন্ন-বাবু আরও লিখিয়াছেন,—

"গড়মান্দারণের ভূগর্ভ অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পৎ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় বহু নিহিত সত্য আবিষ্কৃত ও রুদ্ধ-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইতে পারে। ঔপন্যাসিকগুরু বঙ্কিম-চন্দ্র উপযুক্ত স্থানেই দুর্গেশনন্দিনীর নিকেতন স্থাপন করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-বৃত্তান্ত সমস্ত সত্য না হইলেও এই গড়মান্দারণ উপলক্ষ্য করিয়াই যে বঙ্কিম-বাবু "দুর্গেশ-নন্দিনী" উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন এরূপ মনে করা একেবারে যুক্তিশূন্য নহে। আমি ভাদ্রমাসের "প্রবাসী"তে এই প্রকার কথাই বলিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা ছাপা না হইয়া গড়মান্দারণই যে প্রকৃত ঘটনাস্থল তাহা বলা হইয়াছে।

শ্রীএককড়ি কুণ্ডু।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা।

(৩৮)

ভদ্রঘরের মেয়েরা চরখায় সুতা কাটা শিখিতে পারেন এমন কোন শিল্পবিদ্যালয় কি কলিকাতায় আছে? সুতা বিড়াতে আসিয়া ক্রয় করিবে কিম্বা সুতা লইয়া গিয়া কাপড় বুনিয়া দিবে এমন তাঁতি কি কলিকাতায় আছে?

শ্রী"বঙ্গবালা"।

(৩৯)

বাঙ্গালীর কয়টি পাটকল আছে? বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে কত টাকার পাট ও পাট-জাত দ্রব্য রপ্তানি হয়? ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর চু দিয়া কত টাকার দ্রব্য যায়?

শ্রীরামানুজ কর।

(৪০)

বাংলায় নাস্তিকবাদ বিষয়ক কোনো গ্রন্থ আছে কি?

শ্রীমুকুলচন্দ্র জোশী।

(৪১)

(ক) মেদিনীপুর জেলার সন্নিকটবর্ত্তী যে কর্ণগড় নামক স্থান আছে এবং যেখানে অদ্যাপি রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে উহা কাহার রাজধানী ছিল? ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি?

(খ) একজন কবি তাঁহার গ্রন্থ রচনার শেষে কোন্ সময়ে গ্রন্থ-খানি রচিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে আভাষ দিয়াছেন—

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধি কান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা। ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মহাপাত্র।

(৪২)

আমেরিকা, জাপান ও ইংলণ্ড এই তিন স্থানে যাইতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জন্য কত ভাড়া লাগিতে পারে এবং ঐ ঐ স্থানে থাকিতে হইলে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক আনুমানিক কত খরচ পড়িতে পারে?

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

মীমাংসা।

(১৯)

হিজরী ৯৯৩ (১৫৮৫ খৃঃ) অক্‌বর ফসলী সন প্রচলিত করেন। তাহার পূর্ব্বে মুসলমানদের রাজ্য স্থাপন হওয়া অবধি প্রচলিত হিজরী সনে ফসলের কর সংগ্রহ করা হইত। অক্‌বর দেখিলেন যে ৩০ সৌর বৎসরে ৩১ চান্দ্র বৎসর বা হিজরী বৎসর হয়। ফসল সৌর বৎসরে উৎপন্ন হয়, চান্দ্রে নহে। অর্থাৎ যে সময়ে ৩০ বার ফসল উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ৩১ বার কর লওয়া হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির হিজরী সনকে (৯৬৩) ইলাহী ফসলী সন বলিতে আরম্ভ করিলেন ও ফসলী সনের গণনা সৌর বৎসর দ্বারা করিতে লাগিলেন। অক্‌বর ২রা রবি-উল-সানী ৯৬৩ হিজরী (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খৃঃ) রাজ্যলাভ করেন। রাজ্যলাভ করিবার ২৫ দিন পরে (১১ মার্চ্চ ১৫৫৬) নও-রোজ (নব বর্ষ) উৎসবকে ৯৬৩ ইলাহী ফসলী সনের প্রথম দিন ধার্য্য করিলেন। বাঙ্গলা দেশে বৈশাখ হইতে সৌর বৎসর আরম্ভ হয়। অতএব ১লা বৈশাখ ৯৬৩ ফসলী (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল) বৎসরারম্ভ ধরা হইল। অন্যদেশে ১১ মার্চ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ফসলী বৎসর আরম্ভ ও ইরানী মাসের ১লা ফর্‌বর্দী ধার্য্য হইল। এই ইরানী মাস এখন আর ভারতে প্রচলিত নাই, কেবল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রচলিত আছে। স্থানীয় প্রয়োজন বলিয়া অল্প পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এখন হায়দ্রাবাদে অক্টোবর মাসে বৎসরারম্ভ হয় ও প্রথম মাস ফর্‌বর্দী Farwardi না রাখিয়া আজর রাখা হইয়াছে। ইরানী মাসগুলির নাম এইরূপ—

১ আজর Azur, ২ দ্যি Dye, ৩ বহ্‌মন্ Bahman, ৪ ইস্‌ফন্দার্ Isfandar, ৫ ফর্‌বর্দী Farwardi, ৬ অর্দীবহিশ্‌ত Ardibahisht, ৭ খুর্দাদ্ Khurdad, ৮ তীর Tir, ৯ অমর্দাদ্ Amardad, ১০ শহর্‌-ওয়ার Sharwar, ১১ মেহর Mehir, ১২ আবান Aban.

অক্‌বর এই পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি সভা করিয়াছিলেন, তাহার সভাপতি সেকালের অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা শাহ ফতে উল্লা শীরাজী ছিলেন ও এক সভ্য ছিলেন মওতমিন-উদ্দৌলা উমদ্‌দৎ-উল্-মুল্‌ক রাজা টোডর মল।

হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ। শ্রীঅমৃতলাল শীল।

(২০)

শব্দবিদ্যার মতে "শাল" এই শব্দটি শালিবাহনের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অর্থাৎ সম্রাট শালিবাহন যে অব্দ প্রচারিত করেন তাহার নাম শাল। তাহার পর ক্রমে "শাল" শব্দটি অকার্থক হইয়া গেল। তাহার পর ভারতের অনেক রাজাই এক-একটি শাল প্রচলিত করিলেন। তাহার পর বাঙ্গালাদেশে "শঙ্কু" নামক কোনও জ্যোতিষী বা রাজা যে শাল প্রচলিত করেন—তাহার বর্ত্তমান বিকৃতাবস্থার নাম শন ১৩২৭ শাল। "শন্" এই কথাটি শঙ্কু জ্যোতিষীর নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। "শঙ্কু" নবরত্নের এক রত্ন—"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কুঃ"। "শঙ্কু" বা শঙ্কর পণ্ডিত তাঁহার নাম "শন্" শব্দে এবং গণিত জ্যোতিষের "শঙ্কুচ্ছায়া" শব্দে রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের শব্দবিদ্‌গণ চিরদিন তাহা পড়িয়া দেখিবে। "শঙ্কু" শব্দের প্রাচীন নাম "কীলক"। আমার অনুমান, এই শঙ্কর পণ্ডিতই "মোহ-মুদ্গর" রচনা করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে বাঙ্গালা শাল একজন বৈদ্য রাজার প্রচারিত। ইহা তিনি বৈদ্যকুলপঞ্জিকা হইতে প্রমাণ করিয়াছেন।—

বঙ্গে শ্রীশালবান্ নাম ভূপো বিখ্যাতবিক্রমঃ।
শালাব্দ নির্ণয়ো যস্য সর্ব্বলোকাবগোচরঃ॥
বৈদ্যবংশসমুদ্ভূতঃ স চ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

—মন্দারমালা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠা, শাল বৈদ্যাব্দ কেন? প্রবন্ধ।

সম্রাট আকবর হিজরী সন বা মহাম্মদের পলায়নাব্দকে বাঙ্গালা শালে পরিবর্ত্তিত করেন। হিজরী চান্দ্র মাসে গণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মল মাস না থাকায় প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে এক মাস করিয়া সৌর বর্ষ হইতে কম হয়। তাহাতে খাজনা আদায়ের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। তিনি সেইজন্য বাঙ্গালী জমিদারদের অনুরোধে, বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত সৌরমানে হিজরী প্রচলিত করেন। তাহারই বর্ত্তমান নাম সন ১৩২৭ শাল। বর্ত্তমান বর্ষ ১৩৩৮ হিজরী। চান্দ্র ১৩৩৮ হিজরী সৌরমানে ১৩২৭ বর্ষ হয়। প্রত্যেক চতুর্থ বর্ষে একমাস করিয়া মলমাস বা মাস বৃদ্ধি ধরিলে ৩৬ বর্ষে এক বর্ষ বৃদ্ধি। ৩৬০ বর্ষে ১০ বর্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা হইলে প্রায় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরীকে বাঙ্গালা অব্দে রূপান্তরিত করেন। হিন্দুস্থানে চান্দ্রমাসই চলিত। তাহাদের মলমাস থাকায় আর রূপান্তরের আবশ্যক হয় নাই। আমার পূর্ব্বোক্ত শব্দবিদ্যানুমোদিত অনুসন্ধান অনুযায়ী বাঙ্গালা দেশে সম্রাট আকবরের পূর্ব্বে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে (ল সং) লাক্ষ্মণের সম্বতের মত শঙ্কুর শন চলিত ছিল। মুসলমানদের হিজিরার চাপে শঙ্কুর শন লোপ পাইয়া বর্ত্তমান আকারের আকবরীয় সন ১৩২৭ সাল স্থান পাইয়াছে। ল, সং বা লাক্ষ্মণের সম্বৎ এক্ষণে মিথিলা হইতেও লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(২১)

"গজভুক্তকপিত্থবৎ"—এই কথার লোকে যে অর্থ করিয়া থাকে, ইহার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমি কৃষ্ণনগরের মহারাজার হাতির কত্‌বেল খাওয়ার ও ত্যাগের অনুসন্ধান করিয়া এবং অপরাপর মাহুতদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি। হাতিরা কৎবেল মড়্‌মড়্‌ করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলে এবং তাহাদের নাদে কৎবেল বা কপিত্থের সত্তার কোনও উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই একথা আমি "কবিসময়প্রসিদ্ধি" বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে একস্থানে কৎবেল কুড়াইতে গিয়া শুনিলাম তদ্দেশের লোকেরা কৎবেলের অভ্যন্তরস্থ পোকাকে "শুঁড়ো" পোকা বলে। শুঁড়ো—যাহার শুঁড় আছে বা যে পোকা শুঁড়ের মত। "শুণ্ড" এই শুঁড়ো পোকারই সংস্কৃত নাম। কবির ভাষায় ইহাকে "গজ" করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এই ক্রিয়ার নাম "প্রতিশব্দ"। সংস্কৃত ভাষার এই রীতি বহুত্র প্রচলিত আছে। তাহার পর আর-এক দিন "হিতবাদীর" বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়—ত্রিপুরা কমিল্লানিবাসী—এই শ্লোকের আমার অনুমিত ব্যাখ্যাই করিলেন। তদবধি আমি আমার অনুমিত ব্যাখ্যাতেই দৃঢ় হইয়াছি।

হুকার ছিদ্রে কাট জমিলে যে লৌহশলাকার দ্বারা তাহা পরিষ্কার করা হয় তাহার বাঙ্গালা নাম "গজ"—গজো মানে মত্তমক্ষে (মেদিনী)। এই গজ করার অনুকরণে বোধ হয় "গজভুক্তকপিত্থবৎ" কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়—গজ নামক কীট-বিশেষ দ্বারা ভুক্ত কপিত্থ ফলের মত। এখানে গজ একটি সাদৃশ্যার্থক কৃত্রিম শব্দ। ছিঁচ্‌কের সম্মুখে প্যাঁচান থাকে। তাহার সহিত শুঁড়ো পোকার সাদৃশ্য আছে।

(৩২)

চারু-বাবু রামায়ণ রচনার যে তারিখ দিয়াছেন আমি তাহার কিছু কমাইতে চাই। বাল্মীকি বা দস্যু রত্নাকর শাক্যসিংহের জন্মের পরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধের সংসারত্যাগী চরিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মীদের পক্ষ হইতে রামচরিত্র খাড়া করিয়া তুলেন। বাল্মীকির জন্মসময় আমার অনুমান খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দ। ছন্দে গ্রথিত মহাভারত তাহার অনেক পরে, মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের সময়, পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দ। যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কালও অনেক নামান।

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবৎ নন্দাভিষেচনং
এতৎ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং"॥

—বিষ্ণুপুরাণ।

নন্দের রাজ্যাভিষেকের ১০১৫ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দ হয়। আরও কলির জন্মাব্দ ১৫২১ সম্বৎপূর্ব্ব। কলি বা কলির চ্যালারা বড় হইয়া ও পরাক্রান্ত হইয়া, মহাভারত নামক জনপদ হইতে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবদের বিতাড়িত করিতে কোন্ ১০০।১৫০ বর্ষ সময় না লাগিয়াছিল। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানাব্দ বা মহাপলায়নাব্দ খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দেই পড়ে।

(৩৪)

তাসের নামের উপর শব্দবিদ্যার মতে একটু ভারতীয় প্রভাব রহিয়াছে—রুইতন—রোহিতন—লোহিত বর্ণ জাতি। "লোহিতো রোহিতো রক্তঃ" অমর। চিড়িতন—চিরন্তন,—পুরাতন জাতি। চীর বসন শব্দে কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্রে লক্ষণা বা কৃষ্ণবর্ণ লোক। হরতন—হরিতন—হরিদ্রা বর্ণ জাতি। স্কাবন—পরিচ্ছদ্ন জাতি—বা শুভ্র জাতি। চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। যাহার যখন খেলা বা পড়্‌তা পড়ে, যখন যেটা রং হয়—তখন তাহার গোলামের অসাধারণ আধিপত্য। পুরাণের সমুদয় দেবতার গোলামদেরই অসাধারণ আধিপত্য।

এই তাস খেলা ভারতের সনাতন অক্ষ ক্রীড়া বা পাশা খেলারই রূপান্তর। তাহাও চারিজনেই খেলিতে হয় এবং তাহাতেও হরিদ্রা শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ এই চারিবর্ণ বা চারি জাতি আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভারতের অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত। তাহাতেও যাহার যেরূপ পড়্‌তা তাহার তদনুযায়ী উন্নতি।

ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের "সমর-ব্যসন" অবনতির পূর্ব্বাভাসে "অক্ষ-ব্যসন" বা অক্ষৌহিণী-ব্যসনে পরিণত হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে চতুরঙ্গ খেলা বা সতরঞ্চ ক্রীড়া। "হস্ত্যশ্বরথপাদাতি" এক্ষণে হাতি ঘোড়া রোক (নৌকা) বিট—বড়ে রূপে পরিণত হইয়াছে। "হস্ত্যশ্বরথ-পাদাতং সেনাঙ্গং স্যাৎ চতুষ্টয়ং" অমর। এই চতুরঙ্গিণী সেনার সমরব্যসনই বর্ত্তমানে—মোগল যুগে—সতরঞ্চ ক্রীড়া হইয়াছে। অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি যেরূপ ভারত হইতে, সেইরূপ অনেক অন্ধ কুসংস্কার এবং ব্যসনেরও উৎপত্তির স্থান ভারতবর্ষ। গোলকুণ্ডার আকারে হীরক ও কয়লা উভয়ই জন্মে।

শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।

(১৯)

বাঙ্গালা সনের প্রবর্ত্তক সম্রাট আকবর। তিনি হিন্দু প্রজাদের অনুরোধে হিজরীর পরিবর্ত্তে হিন্দু প্রজাদিগের ব্যবহার জন্য "ইলাহী" সৃষ্টিকর্ত্তার সনের প্রবর্ত্তন করেন। এই সন হিজরী হইতে দশবৎসরের ব্যবধান ও হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর তারিখ হইতে গণনা করা হইয়াছে।—"মোহাম্মদী পত্রিকা"।

(২৫)

শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী ইহাই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে, যে, বিলাতের ব্রিটীশ মিউজীয়াম লাইব্রেরীর "শিগারিফ-নামাই-বিলায়েত" নামক পারস্য গ্রন্থের লেখক ইতিসাম-উদ্দিন ছাহেবই প্রথম শিক্ষিত বিলাতযাত্রী বাঙ্গালী। তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের প্রেরিত ক্যাপ্টেইন হুইন্টনের সহিত তাঁহার সহকারীরূপে বিলাতযাত্রা করেন।—"প্রতিভা" চৈত্র ১৩২৪ ও "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" ১৩২৫ সাল শ্রাবণ।

শেখ আবদুল হামিদ।

(২১)

পুরাণো "উপাসনা" পত্রিকায় জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন যে তিনি নিজে হাতীকে কয়েতবেল খাওয়াইয়া দেখিয়াছেন যে হাতী ইহার সুধু শাঁসটুকু খাওয়া ত চুলোয় থাক, খোলাটা সুদ্ধ উদরসাৎ করে; হয় ত পুরীষে থাকিতে পারে ভাবিয়া পুরীষ ঘাঁটিয়াও দেখিয়াছেন, তাহাতে কয়েতবেলের শাঁসবিহীন আস্ত খোলা ত দূরের কথা, খোলার কোন চিহ্নমাত্রও পাম নাই। সুতরাং "গজ" মানে ওখানে হাতী নইই নয়।

ঐ ভদ্রলোকই আরও লিখিয়াছিলেন যে এই পরীক্ষার বহুদিন পরে তাঁহার হাতে একখানা জীর্ণ পুঁথি পড়ে, তাহাতে দেখিতে পান লেখা আছে, কয়েতবেলের অন্তর্গত কীটকেও "গজ" বলে,—"কপিত্থান্তর্গতঃ কীটঃ গজ ইতি উচ্যতে"। এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; "গজ" শব্দের এই অর্থ অপ্রচলিত হইয়া পড়ার দরুণই প্রবচনের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ সমুত্থিত হইয়াছে, নতুবা প্রবচনটি কিছু আর অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রীঅনিলপ্রকাশ সোম।

(২১)

মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ বেণীমাধব লাহা বহুদিন ঢাকা গবর্ণমেণ্ট খেদা আফিসের হেড্ আসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রুত হইয়াছি যে তিনি কয়েকবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, হাতীকে কৎবেল (কপিত্থ) খাইতে দিলে হাতী তাহা চর্ব্বণ করিয়া খাইয়াছিল, তাহার বিষ্ঠায় কৎবেলের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

শ্রীরমাপ্রসাদ লাহা।

(২১)

"গজভুক্তকপিত্থ" কথাটি খাঁটি সত্য। আমার নিজের প্রত্যক্ষ। "কার্ত্তিক" সংখ্যার "প্রবাসী"তে ঐ প্রশ্নটি দেখে উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে আমার বলবতী ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি একটা হাতীকে অনেক কৌশলে একটা বেল খাওয়াই। দ্বিতীয় দিন বিষ্ঠার সঙ্গে বেলটা বার হয়। চাকরদের কাছে শুনে নিজেই গিয়ে দেখি—সত্য সত্যই বেলটা গোটাই আছে। কোন স্থানে সামান্য ছিদ্রও হয় নাই। আনন্দে নিজেই সেটাকে ভেঙ্গে দেখি যে, ভিতরটা একেবারেই ফাঁপা; শাঁস কিছুমাত্র নেই।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

(৩৭)

কেরোসিন তৈল অথবা তুঁতের জল উইয়ের স্থানে দিলে উইপোকা পলায়ন করে।

শ্রীগদাধর দে।

(৩৭)

উইয়ের গর্ত্তে কেরোসিন তৈল বা ফেনাইল ঢালিলে অথবা গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাদের রাজাকে (খুব বড় একটি গুটিপোকার মত) মারিয়া ফেলিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

যে ঘরে উই, সেই ঘরের মেঝেয় একটি গর্ত্ত খনন করিয়া সেই গর্ত্তে এক কাঁদি কাঁচা (Green) কলা রাখিয়া মাটি দিয়া ভালমতে ঢাকিয়া দেড়মাস দুইমাস রাখিয়া দিলেই ঘরের সমস্ত উই আসিয়া সেই জায়গায় জমা হয়। তখন মাটি সরাইয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেই সব গোলমাল চুকিল।

উই যে জায়গায় থাকে সেই জায়গায় মরা হাতির হাড় পুতিয়া রাখিলেও তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায় বলিয়া শুনা যায়।

(২৭)

গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীকালী-প্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত "গাভী-পরিচর্য্যা" নামক আর এক-খানা বই আছে।

মহি-উদ্-দীন আহম্মদ।

(৩৭)

উইরাজ (সচরাচর ইহাকে উলিরাজ বলে) নামক এক প্রকার লাল পিপীলিকাবৎ প্রাণী আছে। উহাদের বিশ-পঁচিশটা সংগ্রহ করিয়া যে ঘরে উই আছে সে ঘরে ছাড়িয়া দিলে অচিরেই উইয়ের বংশ সমূলে নষ্ট হয়। উইরাজদের এত তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি হয় যে শুনিয়া অবাক হইবেন যে উক্ত ২০।২৫টা শেষে অসংখ্যে পরিণত হয়। উহারা যেখানে উই দেখিবে বা ঘ্রাণে অনুসন্ধান পাইবে অতি দ্রুত গতিতে সেখানে যাইয়া উইগুলিকে মুখে করিয়া মারিয়া ফেলিবেই ফেলিবে। ইহাই উহাদের স্বধর্ম্ম। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু উইরাজ সকল সময় ও সকল স্থানে পাওয়া যায় কি না জানি না।

নামটু, উত্তর শান রাজ্য। শ্রীমহেন্দ্রমোহন দাস।

(২৮)

মহারাজ যশবন্ত সিংহ রায়ের বাড়ি ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাকুর্ত্তা গ্রামে ছিল, নিকটবর্ত্তী কুণ্ডা গ্রামে এখনও তাঁহার সমাধি আছে, এবং তাঁহার বংশধরগণ ভাকুর্ত্তার রায় বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়।

(২১)

হাতীকে কপিত্থ (কয়েত বেল) খাওয়াইয়া "গজভুক্তকপিত্থবৎ" কথার সত্যতা পরীক্ষা করা হয় নাই, কিন্তু হাতীর নেদার সহিত প্রাপ্ত একটি কয়েত বেল ভাঙ্গিয়া দেখা গিয়াছে তাহা শূন্যগর্ভ ছিল।

(২২—ক)

উক্ত প্রশ্নের মীমাংসায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন "রামচন্দ্র বিজয়া দশমীতে রাবণ বধ করিয়া বিজয়ী হইয়া বন্ধুদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।" রাবণ বধের পর রামচন্দ্র যে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে ২টি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র বিজয়া দশমীতে রাবণ বধ করিয়াছিলেন এমন কথা বাল্মীকি রামায়ণে নাই।

লক্ষ্মণের হাতে নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিত নিহত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই রাবণ যুদ্ধে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মন্ত্রীগণ রাবণকে বলিয়াছিলেন "অদ্য চতুর্দ্দশী, আগামী কল্য অমাবস্যা, অদ্য প্রস্তুত হইয়া আগামী কল্য যুদ্ধে যাইবেন (রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ৯৩ সর্গ ৩২ শ্লোক)। পরদিন অমাবস্যাতেই রাবণ যুদ্ধযাত্রা করেন এবং আর লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন নাই। জীবিত পর্য্যন্ত দিবারাত্রি মধ্যে মুহূর্ত্ত কালও সংগ্রামের বিরাম ছিল না। সেই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দেবগণের সাত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড ১০৯ সর্গ ৩৭।৩৮ শ্লোক)। অনবরত সাতরাত্রি যুদ্ধ করিয়াও রামচন্দ্র যখন রাবণকে বধ করিতে পারিলেন না, তখন সারথি মাতলি রামচন্দ্রকে

অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া রাবণ বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উপদেশ করেন। রামচন্দ্র মাতলির কথায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া রাবণ বধ করেন (লঙ্কাকাণ্ড ১০৯ সর্গ ৩৯ শ্লোক এবং ১১০ সর্গ ৩ ১৫।১৮ শ্লোক)।

অমাবস্যার দিন রাবণ যখন যুদ্ধ করেন দেবগণও তখন হইতেই যুদ্ধ দর্শন করিতে উপস্থিত ছিলেন (লঙ্কাকাণ্ড ৯৪ সর্গ ৩৬ শ্লোক)। সুতরাং যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দেবগণের যে সাতরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল অমাবস্যার রাত্রিই তাহার প্রথম রাত্রি ধরিতে হইবে। অতএব ষষ্ঠী তিথির দিনের পর রাত্রিই ৭ সাত রাত্রি হয়। এই রাত্রির পর যে দিন হয় সেই দিন সপ্তমী তিথি, এই দিনই রাবণ বধ হয়। দিনের বেলায় রাবণ বধ হইয়াছিল। লঙ্কাকাণ্ড ১১০ সর্গের ৩২ শ্লোকের রাবণ বধের পরের বর্ণনা—

"স্থিতপ্রতশ্চাপ্যভবদ্বিবাকরঃ॥"

"রাবণ নিহত হইলে সূর্য্য স্থিরপ্রভ হইলেন" একথাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোন কারণে তিথিক্ষয় হইয়াছিল ধরিয়া লইলেও অষ্টমী তিথির বেশী হয় না। বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গোৎসবের কোন কথাই নাই, এমন কি একটা দুর্গানামও নাই। সুতরাং বিজয়া দশমীর কথা থাকিতে পারে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক সুগ্রীবের মন্ত্রণা এবং সহায়তায় শত্রুবধে কৃতকার্য্য হইয়া একমাত্র সুগ্রিবকেই আলিঙ্গন করিবার কথা রহিয়াছে। অন্য কাহাকে আলিঙ্গনের কথা নাই। বিজয়ার পর পরস্পর আলিঙ্গনের মূল বাল্মীকি রামায়ণে নাই। কবিবর কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভাষা রামায়ণে রাম-চন্দ্রের দুর্গোৎসব এবং দশমীতে রাবণ বধ ও বিজয়োৎসবের কথা রহিয়াছে। এই বাঙ্গালাদেশে এই ভাষা রামায়ণের যত প্রভাব, বাল্মীকি রামায়ণের তত প্রভাব নাই। অতএব কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণই বিজয়ার পরে পরস্পর আলিঙ্গন, নমস্কার এবং আশীর্ব্বাদের মূল।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

আলস্যের সময় নাই

কোন দেশের যতই কেন দুরবস্থা হউক না, উহার অধিবাসীরা যতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ুক না, কোন সময়েই নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সকল মন্দ অবস্থা হইতেই সকল সময়ে উদ্ধার লাভের পথ থাকে। কিন্তু তা বলিয়া আলস্য ও অনবধানতা প্রযুক্ত দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা দেখিতেছি, প্রথম প্রথম ব্রিটিশভারতের অধিবাসীদের মধ্য হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতে ব্রিটিশসাম্রাজ্য স্থাপিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। এখন ব্রিটিশভারত হইতে কম সিপাহী লওয়া হয়, যাহা লওয়া হয় তাহাও উৎকৃষ্টতম নহে, অধিকাংশ ও ভাল সিপাহী দেশী রাজ্যসমূহ, নেপাল, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে সংগৃহীত হয়। ইহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীন রাখা হয়। কালক্রমে ইহারাও আর কার্য্যক্ষম বা ইংরেজের বিশ্বাসভাজন না থাকিতে পারে; তখন সিপাহী সংগ্রহের নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান ইংরেজকে লইতে হইবে। তাহার উপায়ও হইতেছে। এখন ভারতের সিপাহী দ্বারা মেসোপটেমিয়া, সীরিয়া, আরবদেশের কোন কোন অংশ, য়িহুদীদের দেশ, প্রভৃতি জয় করা হইতেছে, এবং তজ্জন্য ঐসব দেশের লোকদের মনে ভারতবাসীদের প্রতি ক্রোধ সঞ্চিত হইতেছে। যখন ইংরেজের প্রয়োজন হইবে, তখন ঐসব দেশ হইতে ভারতবর্ষকে ইংরেজাধীন রাখিবার জন্য সৈন্য পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার সদৃশ অবস্থা ও ঘটনা ঘটিয়াছে। পুরুবিয়া সিপাহী দ্বারা ইংরেজ পঞ্জাব জয় করে, আবার তৎপরে পঞ্জাবের সিপাহীরা পুরুবিয়াদিগকে ১৮৫৭।৫৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাজিত করে।

আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইবার কল্পনা করি না; তাহার কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। স্বাধীন অন্য উপায়ে হইতে হইবে। কিন্তু আমাদের উপায় যাহাই হউক, ইংরেজদের সুমতি না হইলে তাহারা গোরা ও সিপাহী সৈন্যবল প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে পারে। অবশ্য এরূপ সময়ও আসিতে পারে, যখন ভারতীয়, নেপালী, আফ্রিদি প্রভৃতি সিপাহীরা ভারতবর্ষের নিগ্রহে সাহায্য করিতে রাজী না হইতে পারে। তখন ইংরেজকে অন্যদেশ হইতে—মেসোপটেমিয়া, সীরিয়া, জুডিয়া ও পারস্য দেশ হইতে—সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইতে পারে। আপাততঃ ঐসব দেশ হইতে সৈন্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে তথায় ইউরোপীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল হইলে, ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদের ক্রোধ থাকায়, সৈন্য পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য ঐসকল দেশে ইউরোপীয়দের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই আমাদের জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ-চেষ্টা সফল হইলে ভাল হয়। পরে সেখান হইতে সৈন্য আনিতে পারিলেই যে আমরা চিরপরাধীন থাকিব, এমন নয়। কিন্তু জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের পথে বাধা বাড়িতে দেওয়া ভাল নয়। এইজন্য মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ইংরেজের ক্ষমতা সু-প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা গান্ধি এক প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত একমত নহেন, তাঁহারাও নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে প্রভূত চেষ্টা করুন। শুধু মহাত্মা গান্ধির সমালোচনা করিলে চলিবে না।

"তোমার শিল তোমার নোড়া তোমারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" নীতি সুকৌশলে প্রয়োগ করিবার জন্য এশার কমিটি সুপারিস্ করিয়াছেন। এই এশার কমিটি (Esher Committee) নিযুক্ত হয়, ভারতবর্ষীয় সৈন্যদল সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য। কমিটির রিপোর্ট সুবিস্তৃত। তাহার কেবল দুটি কথার এখানে উল্লেখ করিব। একটি এই, যে, কমিটি চান, যে, ভারতবর্ষের সৈন্যবল পশ্চিম এশিয়ায় (অর্থাৎ পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সীরিয়া, আরব ও জুডিয়া দেশে) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ মানুষ দিবে ভারতবর্ষ, টাকা দিবে ভারতবর্ষ, কিন্তু তাহার দ্বারা শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িবে ইংরেজদের এবং সেই শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িবে কতকগুলি এশিয়াস্থিত জাতির স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য্যের হানি করিয়া। এরূপ কাজে ভারতবর্ষের সম্মতি দেওয়া নানা কারণে উচিত নহে। প্রথমতঃ, কোনও জাতির স্বাধীনতা লোপ বা হ্রাস করিতে অন্য কোনও জাতির সাহায্য করা উচিত নয়। বিশেষতঃ যদি কোন পরাধীন বা দাস জাতি অন্য জাতির স্বাধীনতা হ্রাস বা লোপের কারণ হয়, তাহা অপেক্ষা লজ্জা ও শোকের বিষয় কি হইতে পারে এবং তাহা অপেক্ষা অধঃপাত আর কি হইতে পারে? নিজে দাস হওয়াই ত মহা দুর্গতি; তাহার উপর অন্যের দাসত্বের কারণ হওয়া মহত্তর দুর্গতি। দ্বিতীয়তঃ, এশিয়ায় ইউরোপীয় প্রভুত্ব যত বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত হইবে, আমাদের স্বাধীনতালাভও তত সুদূরপরাহত হইবে। এশিয়ার স্বাধীন দেশসকল ভবিষ্যতে কখন না কখন উহার পরাধীন অংশের স্বাধীনতা লাভের কারণ হইতে পারে, যেমন ইউরোপের স্বাধীন দেশসকল ক্রমে ক্রমে ইউরোপের গ্রীস্, সার্বিয়া, ইতালী, প্রভৃতিকে স্বাধীন হইতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু যদি (জাপান এবং হয়ত চীন ব্যতীত) সমস্ত এশিয়া ইউরোপের পদানত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ উপায়ে এশিয়ার পরাধীন দেশসকলের স্বাধীনতা লাভের আশা বিলুপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষে পশ্চিম এশিয়ার দেশসকলের পায়ে দাসত্বের নিগড় বাঁধিয়া দিতে সাহায্য করিলে ঐসব দেশের লোকেরা পরে ইংরেজের বেতনভোগী সিপাহী হইয়া ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখিতে সাহায্য করিবে। ভারতবর্ষ এখন তাহাদের পরাজয়ে সাহায্য করিতেছে, একথা তাহারা ভুলিবে না, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা তাহাদের মনে জাগরূক থাকিবে।

এশার কমিটির আর-একটি সুপারিস্ এই, যে, ভারতবর্ষের সৈন্যদলের কর্তৃত্ব ভারতগবর্ণমেণ্টের হাত হইতে লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লণ্ডনস্থ ফৌজী দফ্তরের (War Office এর) হাতে ন্যস্ত করা হউক। এখন আমাদের টাকায় যেসব গোরা ও সিপাহী সৈন্য রক্ষিত হয়, তাহাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব না থাকিলেও ভারত-গবর্ণমেণ্টের আছে। কিন্তু এশার কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতগবর্ণমেণ্টেরও কোন কর্তৃত্ব সৈনিক বিভাগের উপর থাকিবে না। মনে হইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি কি? এখন, ভারতপ্রবাসী ইংরেজেরা ভারতীয় ফৌজের কর্ত্তা, তখন না হয় ইংলণ্ডের ইংরেজেরা কর্ত্তা হইবে। তাহাতে প্রভেদ কি? ক্ষতি ও প্রভেদ আছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট আমাদের মত অনুসারে না চলিলেও, তিন জন ভারতীয় উহার মন্ত্রীসভার সভ্য; তাঁহাদের ও ভারতীয় লোকমতের প্রভাব খুব সামান্য হইলেও কিছু আছে; লণ্ডনস্থ ফৌজী দফ্তর্ (War Office) আমাদের সৈন্যদলের কর্ত্তা হইলে ঐটুকু প্রভাবও থাকিবে না। কিন্তু ঐ সামান্য প্রভাবের মায়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আছে। বর্ত্তমান সময়েই আমাদের সৈনিক বিভাগ আমাদের রাজস্বের বৃহত্তম অংশ ব্যয় করে; কিন্তু তাহা হইলেও রাজস্বের মোট পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টকে বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করিতে হয়। সৈনিকবিভাগ লণ্ডনস্থ ফৌজী দফ্তরের অধীন হইলে আমাদের রাজস্ব সম্বন্ধে এই বিবেচনাটুকুরও হ্রাস হইবে। কিন্তু মহত্তম ক্ষতি ও অনিষ্ট ভবিষ্যতে ঘটিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলে ভারতগবর্ণমেণ্ট কালে আমাদের হস্তগত হইবেই, উহাতে আমাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইবেই। তখন যদি ভারতীয় সৈনিক বিভাগ ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে, তাহা হইলে উহার উপরও

আমাদের কর্ত্তৃত্ব হইবে। কিন্তু কর্ত্তৃত্ব এখন হইতে লণ্ডনের ফৌজী দফ্‌তরের হাতে গেলে, ভবিষ্যতে আমরা স্বরাজ পাইলেও উহা নামে মাত্র স্বরাজ হইবে; কারণ, আমাদিগকে ধনে প্রাণে স্বাধীনতায় মারিবার অস্ত্রটি অন্যের করতলগত থাকিবে। সম্ভবতঃ আমাদের পরাধীনতা স্থায়ী করিবার নিমিত্ত সৈনিকবিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভবিষ্যতেও আমাদের অধিকারবহির্ভূত রাখিবার জন্য, এশার্ কমিটি আলোচ্য প্রস্তাব করিয়াছে।

আমরা সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য আমাদের সকলকে স্বরাজলাভ-চেষ্টায় সতত অবহিত রাখা। আলস্যের সময় নাই। মেসোপটেমিয়া দেশে যে-সব ভারতীয় সৈন্য আছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার বিহিত চেষ্টা কর্ত্তব্য। যাহাতে তথায় আর নূতন সৈন্য না যায়, যাইবার জন্য ভর্ত্তি না হয়, তাহার জন্যও ভারতীয় লোকমত উদ্বুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এশার কমিটির অনিষ্টকর প্রস্তাবগুলি যাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ না করেন, তজ্জন্য ঘোরতর আন্দোলন আবশ্যক।

উদ্দাম জীবন

সুপ্ত নিবিড় গভীর রাতে জ্বল্‌ছে শত তারা,
ঘুমের কোলে লুটিয়ে ধরা নত,
আমার বুকের উতল ধ্বনি আস্‌ছে মৃদু কানে,
আপ্‌নায়ে আজ বুঝ্‌ছি অবিরত।
এই ত জীবন, আমার জীবন, এই ত মৃদু নাচা,
অবাধ স্রোতে চপল আগুয়ান,
বিপুল জটিল বিশ্বখানার সকল বাধা টুটে'
চল্‌ছি সুধু চল্‌ছি অফুরান।
সুপ্তি টুটে' শব্দ টুটে' অনিল টুটে যাই—
কোন্ পারে রে কোন্ সে চেনা দেশ?
সময়-পাখীর পাখার পরে চল্‌ছি ভেসে ভেসে
লাগ্‌বো কোথা, কোথা রে মোর শেষ?
নিবিড় যত রাত্রি জাগে, ডাক্‌ছে যত ঝিঁঝি,
ততই যে রে পরাণটারে বুঝি,
বুকের মাঝে উথ্‌লে নদী, কিসের যেন বান
কলকুলিয়ে ছুট্‌ছে সোজাসুজি!
কে মোর সাথে তাল দিয়ে যায়, এম্‌নি কে রে ছোটে,
বিশ্ব সে কি এম্‌নি নিতি ধায়?
তারায় তারায় মুচ্‌কে হেসে বল্‌ছে যেন চুপে
'যায় রে বয়ে যায় রে সবে যায়।'
ছুট্‌ছি আমি, ছুট্‌ছে অণু, ছুট্‌ছে তারাদল,
পাতায় ঘাসে ছুট্‌ছে রে এক প্রাণ,
নিথর বটে নিবিড় নিশা, ঘুমোয় না রে কেউ,—
বিশ্ব ব্যেপে' জীবন-অভিযান।
বিশ্ব হ'তে সুদূর কোরে আপ্‌নাকে আজ আনি'
দেখ্‌ছি আমি সবার সাথে বাঁধা,—
যেই হাসিতে ফুলটি ফুটে, যেই কাঁদনে ঝরে,
সেই সে হাসি, সেই ত আমার কাঁদা।
জীবন আমার, পাগ্‌লা জীবন, পথিক পলাতক,
আমার মাঝে বাঁধ্‌লে কবে বাসা?
সবার সাথে তোমায় আমায় চল্‌বো কতদিন,
কতদিন এ থাক্‌বে ভালোবাসা?
ঐ যে অটুট্ ডাক্‌ছে ঝিঁঝি, এলিয়ে পড়ে আঁধা,
তারায় তারায় কি যেন রে বলে,
জীবন আমার আমার বুকে তুল্‌ছে আলোড়ন,
শিরায় শিরায় চরণ ফেলি' চলে।
নিবিড় রাতে নিথর বাতে মৃত্যু যেন জাগে,
আমার কানে কিসের আনাগোনা,—
জগৎ ব্যেপে' জীবন চলে আঁধার স্রোতে ভেসে—
আমার সাথে হচ্চে জানা শোনা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সংশোধনী।

গত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীর ৪১ পৃষ্ঠায় ৩ ও ৪ পংক্তিতে "গ্রানাইট" পাথরের বাংলা "এক রকমের লাল বেলে পাথর" লেখা হইয়াছে। ইহা ভুল। গ্রানাইট বেলে পাথর নহে, উহা Volcanic stone; ও বেলে পাথর যত নরম, গ্রানাইট তাহা অপেক্ষা অনেক শক্ত। দুয়ের তুলনাই হয় না। ভারতে যত প্রকার ইমারতী পাথর পাওয়া যায়, বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের গ্রানাইট সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রামলীলা।

বাংলা দেশে যে-সময়ে দুর্গোৎসব হয়, পশ্চিমে তখন রামলীলার উৎসব হয়। ইহা সীতা হরণ, লঙ্কার যুদ্ধ ও সীতার উদ্ধারের অভিনয়। সাধারণ অভিনয় হইতে ইহার অনেক পার্থক্য আছে। একটি প্রভেদ এই, যে, ইহাকে হিন্দুগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ মনে করেন, এবং তজ্জন্য, যে বালকেরা সীতা রাম লক্ষ্মণ সাজেন, তাঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন। বিজয়ী রামের সৈন্যদলের মিছিল বাহির হইয়া এবং অতীত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও প্রচেষ্টার চৌকি (tableaux) তাহার অন্তর্ভূত হইয়া রামলীলা সমাপ্ত হয়। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ অশ্বারোহণে তরবারি হস্তে যাইতেছেন, ইহা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যেমন এলাহাবাদের রামলীলায় দেখিয়াছিলাম, এ-বৎসরও তেমনি সজল নেত্রে দেখিলাম। এবার নূতন চৌকিও ছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগ তাহার একটি। ইহাতে আমাদের যখন গৌরব নাই, তখন বাদ দিলেই ভাল হইত। মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহাশ্রমে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা হইতেছে, আর-একটি দৃশ্য। কতকগুলি লোক "অসহযোগিতা কী জয়" অঙ্কিত পতাকা লইয়া যাইতেছে। আর-একটি চৌকিতে যে পতাকা ছিল, তাহাতে শিখদের গুরু গোবিন্দ সিংহের দুটি উক্তি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তাহার বাংলা—

"সওয়ালাখের সঙ্গে এক জনকে লড়াইব,
তবে আমার নাম গোবিন্দ সিং।
"বাজ পাখীর সঙ্গে চড়ুইকে লড়াইব,
তবে আমার নাম গোবিন্দ সিং॥"

এই অসাধ্য সাধন তিনি করিয়াছিলেন।

বহু বৎসর পরে আবার রামলীলা দেখিলাম। শারীর চক্ষু বাহিরের মিছিল দেখিতেছিল, বাষ্পাকুল হওয়ায় তাহাও মধ্যে মধ্যে ঝাপ্‌সা হইয়া যাইতেছিল। অন্তশ্চক্ষু দেখিতেছিল, ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় পূজনীয় রাম লক্ষ্মণ ভারতলক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে কেমন করিয়া শত্রুহস্ত হইতে জিতিয়া আনিলেন। রাম লক্ষ্মণ যতদিন সীতা উদ্ধার করিতে পারেন নাই, ততদিন তাপস ছিলেন। রামলীলায় তাঁহাদের সৈন্য ও অনুচরেরাও সন্ন্যাসীর বেশে মিছিলে যোগ দেয়। ভারতসন্তানগণও যতদিন ভারতলক্ষ্মীকে বন্দিনী দশা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বাধীন করিতে না পারেন, তত দিন তাঁহাদিগকেও তপস্যা করিতে হইবে। তপস্বীর বাহিরের চিহ্ন জটা ভস্ম আদি ধারণ করিতে হইবে না, কিন্তু অন্তরে তপস্বী হইতে হইবে। ভারত-লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাস ব্যসন আমোদ প্রমোদ স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া ভারতসন্তানকে তেমনি একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, সীতার উদ্ধারে রাম লক্ষ্মণ যেমন একাগ্রচিত্ত ও একনিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

সীতাকে ভারতলক্ষ্মীরূপিণী কেন বলিয়াছি, বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝাইতে না পারিলেও, ভারত-সুসন্তান কেহই লক্ষ্মী বলিতে টাকার থলি বুঝিবেন না। লক্ষ্মীশ্রী বলিতে আমরা টাকার থলি বুঝি না। সীতা টাকার থলি ছিলেন না। তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের শ্রী, জ্ঞানের শ্রী, শুচিতার শ্রী, চরিত্রের শ্রী, সাহসের শ্রী, স্বাধীনতার শ্রী, সৌন্দর্য্যের শ্রী, রাজলক্ষ্মীর শ্রী, ছিল।

রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারকল্পে, বনের পশু পক্ষী বানর ভল্লুকের, শত্রুপক্ষের বিভীষণের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন নাই, আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের সঙ্গে মিতালি করিয়াছিলেন। রামায়ণের প্রধান ঘটনাটি ঐতিহাসিক কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও ইহা বলা যাইতে পারে, যে, সুগ্রীব আদির সহিত রামের সখ্যস্থাপন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ আর্য্য-অনার্য্যের মিলন সূচিত করিতেছে। ভারত-লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিতে হইলে ভারতসন্তানগণকেও, কে আর্য্যবংশীয় কে অনার্য্যবংশীয়, কে "স্পৃশ্য", কে "অস্পৃশ্য", তাহার বিচার না করিয়া, সকলকেই এক লক্ষ্যসাধনে ব্রতী হইয়া সকলে সখ্য-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। শত্রুপক্ষের বিভীষণকেও আলিঙ্গন দিতে হইবে।

রামমোহন রায় ও শিক্ষিত বাঙালী।

আশ্বিনের সবুজপত্রে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর একটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা কোন একটি সাহিত্যসভায় পড়া হইবে বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। উহার একস্থানে তিনি বলিতেছেন—

রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে এমন লোক আমার পরিচিত লোকের মধ্যে একান্ত বিরল, অথচ এঁদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন যথোচিত সুশিক্ষিত এবং দস্তুরমত স্বদেশভক্ত। লোকসমাজে অনেকেরই বিশ্বাস যে, রামমোহন রায় বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাঙলার সর্ব্বপ্রথম গদ্যলেখক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে এই যে, তিনি হচ্ছেন বাঙলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লেখক। অথচ তাঁর লেখার সঙ্গে বাঙলা লেখকদেরও পরিচয় এত কম যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা লিখতেও কুণ্ঠিত হন না যে, রামমোহন রায় ইংরাজি গদ্যের অনুকরণে বাঙলা গদ্য রচনা করেছিলেন। এর পর যদি কেউ বলেন যে, শঙ্করের গদ্য হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুকরণে রচিত হয়েছিল তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু আপনাদের একটি খবর দেই, যা শুনে আপনারা শুধু আশ্চর্য্য নয়, অবাক হয়ে যাবেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় কিছুদিন ধরে নানা উপায়ে একদল research scholar তৈরী করবার চেষ্টায় আছেন, কাউকে scholarship দিয়ে, কাউকে ডাক্তার উপাধি দিয়ে, আর কাউকে বা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দিয়ে। এঁদের হাতে যে-সকল গবেষণাপূর্ণ পুস্তক তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে চুয়ান্নখানা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একখানি হচ্ছে—

History
of
Benglee Literature
In The Nineteenth Century.
1800—1825
By
Sushil Kumar De, M. A.,
Premchand Roychand Research Student, Post-Graduate Lecturer, Calcutta University, and Hony. Librarian, Bangiya Sahitya Parishat.

বঙ্গভাষার এই ইতিহাসখানি পুস্তিকা নয়, অক্টেভো সাইজের ৫১০ পাতার পুস্তক। এ পুস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয়নি। যদি কোথাও করা হয়ে থাকে ত, সে নাম সাধারণ পাঠকের চোখে সহজে পড়ে না—তা আবিষ্কার (research) সাপেক্ষ। এ উপেক্ষার কারণ কি? ঐতিহাসিক মহাশয়ের মতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের নাম যে উল্লেখযোগ্য নয় এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, কেন না তিনি গণ্ডা গণ্ডা পণ্ডিত মুন্সি মিশনারি এবং কবিওয়ালাদের বিষয়ে গণ্ডা গণ্ডা পাতা লিখেছেন। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের লাইব্রেরিতে রামমোহনের গ্রন্থ নেই এবং সে-মহাশয় research করেও তার সাক্ষাৎ পাননি।

রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে বাঙলার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যে পরিচয় নেই এর চাইতে তার কি আর বেশি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হতে পারে! (৩৩৪-৩৩৬ পৃষ্ঠা)।

ইহা দ্বারা আরও এই একটি কথা প্রমাণিত হয়, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "গবেষণামূলক" প্রত্যেক পুস্তকই অমূল্য রত্ন নহে। আমরা বাংলা সাহিত্যের এই ইতিহাসটি দেখি নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক "গবেষণাপূর্ণ" ব্যাখ্যানসংগ্রহের একটি পুস্তক দেখিয়াছি যাহার কিয়দংশ লেখক নিজের শ্বশুর মহাশয়ের লিখিত ও কলিকাতা রিভিউয়ে ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে কথাটি স্বীকার করেন নাই। আমরা কলিকাতা রিভিউ ও ঐ পুস্তকটি মিলাইয়া দেখিয়াছি। ইহা সাহিত্যিক চুরি কি না বলিতে পারি না। কারণ, লেখক যদি বলেন, "শ্বশুর মহাশয়ের কন্যার পাণিপীড়নের সময় বরপণ স্বরূপ আমি তাঁহার লেখা নিজের বলিয়া প্রচার করিবার অধিকার পাইয়াছিলাম," তাহা হইলে ইহা অপ্রমাণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত হইবে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন অধ্যাপক মূল্যবান্ গবেষণা ও আবিষ্কার করিয়াছেন। অন্য দেশের অধ্যাপকদের গবেষণায় যেমন, এদেশেরও গবেষণায় তেমনি ভুলচুক থাকিতে পারে। সেইজন্য যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা গবেষণাগুলির পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। সকল বিষয়ে এইরূপ পরীক্ষা করিয়া সমালোচনা করিবার মত যোগ্যতা আমাদের দেশে বেশী লোকের নাই; কোন কোন বিষয়ে আছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব [illegible] সমালোচনার জন্য দেশী সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে দেওয়া হয় না। ২।১ খানা দেওয়া হয়। যে-সব দেশী সম্পাদক সমালোচনার্থ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে-যে বিষয়ের বহি পান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহারা

সেই সেই বিষয়ের বহিও অনেক সময় পান না। সাময়িক পত্রও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন কোন দেশী সম্পাদক পাইয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গবেষণা ছাপিবার জন্য যে দুটি সাময়িক পত্র আছে—একটি সাহিত্য-ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক ও অন্যটি বিজ্ঞান বিষয়ক—তাহা, শিক্ষিত সাধারণ দূরে থাক্, দেশী সম্পাদকদেরও গোচর নহে। ঐ দুটি কাগজ আমরা কখন মডার্ণ রিভিউ বা প্রবাসীর বিনিময়ে পাই নাই, উহাদের বিজ্ঞাপনও কোথাও দেখি নাই। গত ৮ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেনেটের অধিবেশনে কতকটা অনুযোগের সুরে বলেন, যে, সেনেটের সভ্যেরা এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ততঃপক্ষে কৌতূহলপরবশ হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক পত্র দুটিতে লিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এরূপ আশা করা অত্যন্ত বেশী আশা করা হইবে না। আমরাও বলি, ইহা কিছু অসঙ্গত কথা নয়। কিন্তু শিক্ষিত সাধারণের পক্ষ হইতেও ইহা বলা অন্যায় হইবে না, যে, তাঁহারা ঐ কাগজ দুটির অস্তিত্ব জানিবেন কেমন করিয়া? খুব লোমহর্ষণ গল্পের বহিও বিজ্ঞাপন না দিলে বিক্রী হয় না। অতএব গভীর গবেষণা-পূর্ণ কাগজের অস্তিত্ব শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে প্রচলিত কোন উপায়ে না জানাইয়া অনুযোগ করা সঙ্গত নহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিনিট্ প্রভৃতিতে না হয় গোপনীয় কথা আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহা দেওয়া হয় না; কিন্তু সাহিত্য-বিজ্ঞানের কাগজ দুটিতে ত কোন গোপনীয় কথা নাই।

আশু-বাবুর কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে, সেনেটের অনেক সভ্য কাগজ দুটির অস্তিত্বের বিষয় অবগত নহেন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, ইহাই বিস্ময়ের একমাত্র কারণ নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও অনেকে কাগজ দুটির অস্তিত্ব বা মূল্যবত্তা অবগত নহেন বলিয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে তাহার গ্রাহক নহেন। প্রমাণ এই। সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে এম্-এ ক্লাসে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত একটি কৌন্সিল বা মন্ত্রণাসভা আছে। তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির ২৭শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে দেখিলাম,

"Read a letter from some of the University Lecturers, requesting sanction of [illegible] Letters, at reduced price.

"Resolved—

"That two-thirds of the price charged to the [illegible] be charged in the case of University Lecturers."

—

স্বাধীনতা ও স্বার্থত্যাগ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ৮ই অক্টোবরের সেনেটের বক্তৃতায় একজন অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, যে, তিনি "found it impossible to resist the attractions of Government service।" ঐ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছাড়িয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী কেন লইয়াছেন, জানি না। কিন্তু আশু-বাবুর বক্তৃতার ঐ কথাগুলি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে, যে, লোকে স্থায়ী চাকরী, অধিকতর বেতন, পেন্সান প্রভৃতির আর্থিক লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে অন্য কোন মহত্তর সুবিধার জন্য;—যেমন স্বাধীনতার জন্য। এখন কান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গবর্ণমেণ্টের অধ্যাপকদের চেয়ে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণের যে প্রস্তাবের কথা আমরা গত মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছি, তাহা গৃহীত হইলে, এই স্বাধীনতা বহু পরিমাণে লুপ্ত হইবে। এবং এরূপ সন্দেহ করাও অসঙ্গত নহে, যে, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবটি এখন ছুঁচ মাত্র, কিন্তু পরে উহাই ফালে পরিণত হইবে। তখন গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৃত্যদের স্বাধীনতা বা অধীনতা সমান হইবে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সরকারী অধ্যা-পকদের মত ক্রমবর্দ্ধমান অধিক বেতন ও পেন্সান পাইবেন না। তাঁহাদের চাকরীও সরকারী চাকরীর মত স্থায়ী নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব যোগ্য অধ্যাপক পাওয়ার উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতার হ্রাসে বা লোপে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে খুব যোগ্য লোক পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

—

"মানবদেহধারী ভূত।"

উপরে আশু-বাবুর যে বক্তৃতার কোন কোন কথার আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহার শেষ অংশে তিনি

সমালোচকদিগকে 'fleeting humanity" বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভূতেরা যেমন ক্ষণকালের মত দেখা দিয়া মিলাইয়া যায়, এই মানবদেহধারী সমালোচকেরাও তেমনি অল্পকালের জন্য দেখা দিয়াছে, তাহার পর তাহাদের আর নাম-গন্ধও থাকিবে না। নিজের সমালোচকদিগকে ভূত বলা অবশ্য খুব সৌজন্য, শিষ্টাচার ও সুরুচির পরিচায়ক। কিন্তু কেহ যদি মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীর মত তথ্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমালোচনাকেও গালাগালির শ্রেণীভুক্ত মনে করেন, এবং সেই ভ্রমবশতঃ সমালোচকদিগকে ভূত বলিয়া গালি দেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তাহা হইলেও, আশু বাবুর উক্তি সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার থাকে। আমরা অক্ষয় যশের দাবী করি না; কেন না, অক্ষয় যশোলাভের মত কোন কাজ করি নাই। কিন্তু যিনি নিজের সমালোচকদিগকে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত উপ- বা অপ-দেবতা মনে করেন, তিনি অবশ্যই অহঙ্কারে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে চিরকালের জন্য বিরাজমান অমর দেবতা মনে করেন। কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে তাঁহার কোন অমর কীর্ত্তি আছে কি না? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিলেই অমর হওয়া যায় না। অতীত কালের তক্ষশিলা কোথায়, কোথায়ই বা নালন্দ? তাহাদের কর্ম্মী ও আচার্য্যদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে অমর চিরস্থায়ী কিছুই নাই। আপেক্ষিক অমরত্ব কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের, অসাধারণ প্রতিভাশালী কবিদের, সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের, মানবের স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীরদের, এবং এবম্বিধ অন্যান্য লোকদের ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু আশু-বাবু এইরূপ কোন শ্রেণীর লোক নহেন।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে আশু-বাবুর সম্পর্কীয় লোক।

আশু-বাবু অনেক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মী রূপে পরিশ্রম করিতেছেন, এবং তাহার জন্য তিনি কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন নাই। ইহা প্রশংসার কথা। যদি তাঁহার সম্পর্কীয় লোকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিয়া লাভবান্ না হইতেন, তাহা হইলে আরও প্রশংসার বিষয় হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যতদূর শুনিয়াছি, পরীক্ষকতার কাজ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোল-সতেরটি কাজে আশু-বাবুর সম্পর্কীয় লোকেরা নিযুক্ত আছেন। সমুদয় কর্ম্মচারীর প্রকৃত পরিচয় পাইলে সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক বা কম হইতে পারে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি নিয়োগ বিষয়ে প্রবাসীতে সম্প্রতি যে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে আমরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, এইরূপ গুজব শুনা যাইতেছে লিখিয়াছিলাম। ইহাও লিখিয়াছিলাম, যে, লোকের ধারণা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে খুব বেশী ঘাটতি পড়িয়াছে। উহার ১৯২০-২১ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাইতেছে, যে, গুজব মিথ্যা নহে। এই ১৯২০-২১ সালের বজেটটির প্রথম পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে, যে, বৎসর আরম্ভ হইবার সময় কোন্ ফণ্ডে হস্তেস্থিত টাকা (opening balance) কত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আয়—পরীক্ষার ফী প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত টাকা (Fee Fund)। এই ফী ফণ্ডে বৎসরের গোড়ায় উদ্বৃত্ত হস্তেস্থিত কিছু ত ছিলই না; বরং কমতি পড়িয়াছিল ২৪৯১০৮ (প্রায় আড়াই লক্ষ) টাকা। ছাত্রদের মেস্ ফণ্ডেও ৭৩৫৮ টাকা কমতি পড়িয়াছিল। অবশ্য অন্য অনেক ফণ্ডে উদ্বৃত্ত টাকা ছিল। প্রত্যেক বিভাগের টাকা অন্য প্রত্যেক বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বা অনটন পূরণ করিবার জন্য তাহাতে চালান করা যায় না। সার্ তারকনাথ পালিত প্রদত্ত মূলধনের আয়, সার্ রাসবিহারী ঘোষের প্রদত্ত মূলধনের আয়, কোন কোন অধ্যাপকতা বাবদে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী টাকা, ইত্যাদি, কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য খরচ করা যাইতে পারে। যদি সব ফণ্ডের টাকাই সব-রকম কাজের জন্য খরচ করা চলিত, তাহা হইলে, সব ফণ্ড জড়াইয়া, ১৯২০-২১ সালের গোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে কেবল মাত্র ২৩৮৬৭ (তেইশ হাজার চারিশত সাতষট্টি) টাকা ছিল, বলা চলিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সব ফণ্ডের টাকা সব বিভাগের জন্য

খরচ করা যায় না। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয়, যে, ফী ফণ্ডে ২৪৯১০৮ টাকা কম্‌তি এবং ছাত্রদের মেস্‌ফণ্ডে ৭৩৫৮ টাকা কম্‌তি হওয়ায়, যে-যে বিভাগের কাজ ঐ ঐ ফণ্ড হইতে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাদের দেয় অনেক টাকা ১৯১৯-২০ সালের শেষ পর্য্যন্ত অপ্রদত্ত থাকিয়া গিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী বৎসরের আয় হইতে বিলম্বে দেওয়া হইয়াছিল, কিম্বা অন্যান্য ফণ্ডের টাকা অবৈধ রূপে ভাঙ্গিয়া ঐ দুই ফণ্ডের অকুলান পূরণ করা হইয়াছিল। হয়ত উভয় প্রকার অনিয়মই হইয়াছিল। কি হইয়াছিল বলিতে পারি না। সমুদয় হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা (audit) করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক-শূন্য বিচক্ষণ অডিটর নিয়োগ করিলে ইহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

১৯২০-২১ সালের বজেটে দেখা যাইতেছে, যে, নানা প্রকারে ঐ ঘাট্‌তি (deficit) পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অনুমিত হইয়াছে (অবশ্য এই বজেটই সেনেট গ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না)। প্রথমতঃ ধরা হইয়াছে, যে, ১৯১৯-২০ সালে বাস্তবিক প্রাপ্ত পরীক্ষার ফী ৯১২১২৫ টাকার জায়গায় ১৯২০-২১ সালে ১০১৮৫০০ টাকা পাওয়া যাইবে। পরীক্ষার ফী হইতেই লক্ষাধিক টাকা আয় বাড়িবে কি না জানি না। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ বিক্রী করিয়া ১৯১৯-২০ সালে প্রাপ্ত ৪৬৩৮৫ টাকার জায়গায় এ-বৎসর ৮৫০০০ পাওয়া যাইবে, ধরা হইয়াছে। এই বৃদ্ধি হইবে কিনা, তাহাও বলা যায় না। ইহা ছাড়া, অল্পস্বল্প আয় বৃদ্ধি অন্য নানা উপায়েও হইবে, ধরা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না বলিয়া, আয়ের ঘরে দেখান হইয়াছে, যে, পূর্ব্ব-সঞ্চিত ট্রেজরী বিল (Treasury Bills) বিক্রী করিয়া ২২৫০০০ (সওয়া দুই লক্ষ) টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু পুঁজি ভাঙ্গাকে আয় বলা চলে না। যদি কাহাকেও কোন বৎসর পূর্ব্বসঞ্চিত সওয়া দুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ বিক্রী করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল বলা যায় না। টাকার অভাবে যে বিজ্ঞান বিভাগের কাজ ভাল করিয়া হইতেছে না, এবং ব্যবহারিক রসায়ন- ও পদার্থ-বিজ্ঞান (applied chemistry and [illegible] বিভাগের কাজ হয়ত এ বৎসর আরম্ভই [illegible] তাহা আশু-বাবুর কোন কোন বক্তৃতা হইতেও [illegible] যায়। কিন্তু কেহ আর্থিক অবস্থার কথা [illegible] অমনি প্রকৃত অবস্থা ধামা চাপা দিবার চেষ্টা হয়।

আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলে, আরব্ধ কাজ রক্ষা করা এবং তাহাদের সুনির্ব্বাহের ব্যবস্থা [illegible] যুক্তিসঙ্গত; নূতন নূতন কাজ আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু আশু-বাবু ও তাঁহার সমর্থকেরা [illegible] মনে করেন না। সেইজন্য দেখিতে পাই, আমরা যে-সব বিষয় শিখাইবার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা ভাল হইবার পূর্ব্বেই নূতন বিষয় শিখাইবার ব্যয়সাপেক্ষ নূতন আয়োজন হইতেছে। নূতন বিষয় [illegible] শিখাইবার বিরোধী আমরা নাই। আমরা অর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলি, এবং আরব্ধ কাজগুলির সুব্যবস্থা করিয়া তবে নূতন ক্ষেত্রে পা বাড়াইতে বলি।

—

ছাত্রদের আর্থিক অবস্থা।

কিছুদিন পূর্ব্বে ছাত্রদের পরীক্ষার ফী বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়া আশু-বাবু যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতির পুর্ণতার উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে চান যে দেশটাকে যত দরিদ্র মনে করা হয় বাস্তবিক তত গরীব নহে। ৮ই অক্টোবরের বক্তৃতায় বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের কারণ অনুমান করিতে গিয়া তিনি বলেন যে ষষ্ঠবার্ষিক অনেক ছাত্র ছাড়িয়া গিয়াছে। "We have no data to determine whether they left because they could no longer struggle with poverty or because of some other equally potent reason", "তাহারা আর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিয়া চাড়িয়া গিয়াছে, কিম্বা অন্য কোন সমান বলবৎ কারণে ছাড়িয়াছে, তাহা স্থির করিবার মত তথ্য জানা নাই।" তাহা হইলে আশু-বাবু স্বীকার করিতেছেন, যে, ছাত্রদের দারিদ্র্য একটা কারণ হইতে পারে।

সত্য চাপা দেওয়া কঠিন কাজ।

বজেট পেশ্ করিতে বিলম্ব।

বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ভারত-গবর্ণমেণ্ট সেই বৎসরের বজেট বা আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মী এবং কর্ম্মচারীরা ১৯২০-২১ সালের সাতমাস উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর ঐ বৎসরের বজেট সেনেট সভার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বিলম্বের কারণ কি? সাত মাসের অধিককাল ধরিয়া যে-যে প্রকার আয় ও যে-যে রকম ব্যয় হইয়াছে, তাহাকে আনুমানিক আয় ব্যয় বলিবার সার্থকতাই বা কি? বজেট প্রস্তুত ও মঞ্জুর করাইবার উদ্দেশ্য এইরূপ বিলম্ব হেতু বিফল হয়। যে-যে বাবতে ব্যয় সাতমাস ধরিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা ত আর নামঞ্জুর করা চলে না। সুতরাং সেনেটের নিকট তাহা মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করায় প্রকারান্তরে সেনেটকে উপহাসই করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বৎসর গবর্ণমেণ্টের মত ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ না হইলে উপরে লিখিত "সাতমাসের" জায়গায় কমসংখ্যক মাস হইবে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা।

আশু-বাবুর ৮ই অক্টোবরের বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে,

"Two of our most distinguished graduates, Dr. Hemendrakumar Sen and Dr. Phanindranath Ghosh, have been appointed to fill these chairs [of Applied Chemistry and Applied Physics endowed by Sir Rashbehary Ghosh]. The question of the framing of courses to be undertaken in these newly created departments are still under discussion, and it is perhaps doubtful whether the work of instruction may be actually commenced during the current session in view of difficulties created by inadequacy of laboratory accommodation and workshop appliances."

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিভাগে কি কি বিষয় শিখাইতে হইবে তাহা বিস্তারিত ভাবে স্থির করিবার প্রশ্নেরও বিচার এখনও চলিতেছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের যথেষ্ট স্থানাভাব আছে, কার্য্যতঃ-শিক্ষাদানের সরঞ্জামের সংগ্রহ যথেষ্ট হয় নাই, এবং বর্ত্তমান বৎসরে কার্য্য আরম্ভ হইবে কি না সন্দেহ আছে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও অধ্যাপক দুজনের নিয়োগ হইয়া গিয়াছে, এবং বজেটে দেখিতেছি, তাঁহাদের বেতন মাসিক পাঁচশত করিয়া দিবার জন্য বার্ষিক ১২০০০ টাকা ব্যয়ও ধরা হইয়াছে। ইহাকে কি সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা বলা যায়?

—

সার্ব্বজনিক ভাষা।

সকল দেশের সকল মানুষের ভাষা এক হইলে অনেক সুবিধা হয়, যদিও ভাষাবাহুল্য ও ভাষাবৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য হইতে মানুষ তদ্দ্বারা বঞ্চিত হয়। সকল মানুষের ভাষা এক করিবার জন্য এস্পারাণ্টো, ভোলাপুক, আইডো, প্রভৃতি কৃত্রিম ভাষা রচিত হইয়াছে।

যে-সকল কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ভাষা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি সার্ব্বজনিক ভাষা হইবার উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হল্মে অবস্থিত নর্দান্ পীস্ ইউনিয়ন নানা দেশে প্রেরণ করেন। ৫৪টি উত্তর আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৪টিতে বিশেষ কোন ভাষার নাম করা হয় নাই। তাহার পর কোন্ ভাষার সপক্ষে কয়টি উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা লিখিত হইতেছে। এস্পারাণ্টো ১, আইডো ৪, লাটিন ২, জার্ম্মান ১, ফ্রেঞ্চ ৮, লাটিন বা স্প্যানিশ ১, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী ২, স্প্যানিশ ও ইংরেজী ১, ইংরেজী ও এস্পারাণ্টো ১, ইংরেজী ২৯। ইংরেজী খুব বেশী ভোট পাইয়াছে।

যুদ্ধের আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে বৃহত্তম ছিল। যুদ্ধের পর উহার বিস্তৃতি বাড়িয়া ১৫৪১৭৭৫২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা বাড়িয়া প্রায় পঞ্চাশকোটি হইয়াছে। অর্থাৎ উহার আয়তন পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের অধিক এবং লোকসংখ্যা সমগ্র মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম। এরূপ সাম্রাজ্যের রাজভাষার পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া ইংরেজরা পৃথিবীর প্রধান বণিক্-জাতি বলিয়াও ইংরেজী ভাষার বিস্তৃতির সম্ভাবনা আছে। ইংরেজী সাহিত্যও খুব সমৃদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে

বাণিজ্যক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ (United States of America) পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানীয়। ইহাদের ভাষাও ইংরেজী।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা।

আমরা নূতন এক-একটি ভাষা শিখি, নূতন এক-একটি সাহিত্যের চর্চ্চা করি, আর যেন মনের এক-একটি নূতন জানালা খুলিয়া যায়, ও তাহার মধ্য দিয়া বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের নূতন নূতন শোভা ও সমৃদ্ধি দেখিতে পাই। সাংসারিক লাভের জন্যও পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিদের ভাষা জানা আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, জাপানী ও চীন ভাষা শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ছাত্রদিগকে নূতন সুযোগ দিয়াছেন। বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত অধিকবয়স্ক লোকেরাও ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন।

—

ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাহাদের এবং দেশের উপকার হইবে। চোখ, দাঁত, কান, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস প্রভৃতিতে কাহার কি দোষ আছে, ডাক্তারেরা তাহা বলিয়া দিবেন, এবং প্রতিকারের উপায়ও নির্দ্দেশ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে ক্ষীণদৃষ্টি ছাত্রদিগকে বিনালাভে এবং কোন কোন স্থলে বিনামূল্যে চশ্‌মা দিতে পারিবেন, আশা করেন।

—

জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন।

আলিগড়ে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে; আহমেদাবাদে হইয়াছে বা হইবে; অন্য অনেক জায়গাতেও হইবার কথা শুনা যাইতেছে। শিক্ষালয় বৃদ্ধি সুখের বিষয়।

জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ মহৎ উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু জীবিকা অর্জ্জন ও জীবন ধারণের জন্যও জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। খুব বেশীসংখ্যক ছাত্র শেষোক্ত উদ্দেশ্যেই বিদ্যালাভ করিতে যায়। জাতীয়-শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠাতাদিগকে ইহা মনে রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে ছাত্রদের জন্য এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার দ্বারা তাহারা কেবল জ্ঞানী নহে, অধিকন্তু উপার্জ্জকও হইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষালয় বা গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত শিক্ষালয়গুলিতে যাহা শিখান হয়, তাহাতে ছাত্রদিগকে অন্যান্য প্রকার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহার দ্বারা তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও উকীল হইতে পারে। জাতীয় শিক্ষালয়ে শেষোক্ত প্রকার শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই; কেননা তাহা নিষ্ফল হইবে। জাতীয় শিক্ষালয়সকলে সকল রকম এঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও উপায়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী, ভূতত্ত্ববিদ্যা, খনিজবিদ্যা, নৌচালনবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যদি এইসকল বিদ্যা না শিখাইয়া সরকারী নিয়মানুবর্ত্তী বিদ্যালয়সকলের মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে "সহযোগিতাবর্জ্জন", "জাতীয় শিক্ষা", প্রভৃতি বড় বড় কথা ব্যবহার করিবার সার্থকতা থাকিবে না।

সাধারণ শিক্ষার মধ্যে ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষার উপর খুব ঝোঁক দেওয়া উচিত। ভূগোলের এরূপ বহি নির্ব্বাচন বা রচনা করা আবশ্যক, যাহাতে ভূগোলের সহিত পণ্যদ্রব্য-প্রস্তুত-প্রণালী ও বাণিজ্যের সম্পর্ক বুঝা যায়। অন্য দেশের কথা জানিবার আগে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানা উচিত, কোথায় এরূপ কি কি উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ জিনিষ পাওয়া যায় যাহা স্বাভাবিক অবস্থাতেই মানুষের কাজে লাগে বা লাগিতে পারে, কিম্বা যাহা হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার পর জানা উচিত, দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত ও বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ও জলপথ কিরূপ আছে, কিরূপ হইতে পারে ও হওয়া দরকার, এবং বর্ত্তমান পথগুলির কিরূপ সংস্কার ও উন্নতি বিস্তৃতি আবশ্যক। ইহাও জানা উচিত, যে, দেশের কোথায় জলনিষ্কাশন, নদীগর্ভ খনন, খাল খনন, অরণ্য রক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, নদীর পার্শ্বে বাঁধ নির্ম্মাণ, প্রভৃতি কার্য্য, স্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতির

আবশ্যক। ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিতে হইলে ইহার সমুদয় পাহাড় পর্ব্বত দেশবাসীদের হস্তগত করিতে হইবে। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, এই কেতাবী কথা যথেষ্ট নহে। দেশটিকে, দেশের সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক সম্পত্তি সুবিধা ও সুযোগকে আমাদের করায়ত্ত করিয়া ব্যবহারে আনিতে কাজে লাগাইতে হইবে। এই অর্থে পাহাড় পর্ব্বত দখল করার কথা বলিতেছি। পাহাড়-পর্ব্বতের গায়ে কোলে উপরে যেখানে-যেখানে বাস চাষ (দানা ফল তরুকারী প্রভৃতির চাষ) ও খনিজ উত্তোলন আদির কাজ চলিতে পারে, তথায় ভূস্বামী হইয়া দেশীলোকদিগকে বাস চাষ ও খনিজ উত্তোলন আদির কাজ করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে সমুদ্র রত্নাকর। সমুদ্র কেবল রত্নের আকর বলিয়াই রত্নাকর নহে। জল, স্থল, আকাশ হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া তাহা দেশবিদেশে প্রেরণ ও বিতরণ করিবার প্রধান উপায়, এখন পর্য্যন্ত সমুদ্রই আছে। সেইজন্য, আমাদিগকে যেমন সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ ও প্রাণীসকল হইতে ধনলাভের চিন্তা করিতে হইবে, তেমনি ইতিহাস হইতে জানিতে হইবে যে অতীতকালে ভারতের উপকূলে সহস্রাধিক বন্দর ছিল। আবার নূতন করিয়া বন্দর ও পোতাশ্রয় খুলিতে হইবে, জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, দেশবিদেশে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে হইবে, বাণিজ্য করিতে হইবে, এবং সমুদ্রকে জাতীয় জীবনের সহায় করিয়া স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, কবিত্ব, ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদিগকে অবশ্যই শিখিতে হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার পূর্ব্বে জেলার ইতিহাস ও প্রদেশের ইতিহাস শিখিতে হইবে।

ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নিরপেক্ষভাবে লিখিয়া তাৎকালিক জাতীয় জীবন ও সভ্যতার দোষগুণ উভয়ই যদি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ইতিহাস রচনা ও শিক্ষার প্রকৃত সুফল লব্ধ হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যক্তিত্বে এবং গার্হস্থ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিশ্চয়ই নানা সদ্‌গুণ ছিল, নতুবা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত না। অতীত ভারতের এই ভাল দিক্‌টি সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জানা উচিত। অতীত ভারতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দোষ-ত্রুটিও নিশ্চয় ছিল; তাহা না হইলে আমাদিগকে শক্তিহীন হইয়া এত দারিদ্র্য, রোগ, পরাধীনতা, লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার ভুগিতে হইবে কেন? দোষ ত্রুটি না জানিলে তাহার সংশোধন হয় না। অতএব অতীত ভারতের দোষ-ত্রুটিও আমাদিগকে জানিতে হইবে। অর্থাৎ অতীত ভারতের মানুষগুলির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শের দোষত্রুটি জানিতে হইবে; ঐ ঐ জীবন বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহারও দোষ-ত্রুটি জানিতে হইবে।

ভারতবর্ষের মুসলমান-যুগের ইতিহাস ইংরেজীতে প্রথম প্রথম ইংরেজরাই লিখিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান শাসনকালের কেবল বা প্রধানতঃ মন্দ দিক্‌টাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান অধিকারে ভারতের কল্যাণও হইয়াছে। তাহাও প্রদর্শিত হওয়া চাই। মুসলমান বিজেতারা কেবল লুটপাট ও পরদেশ দখল করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া ঠিক্ নয়। ধর্ম্মবিস্তারও হয়ত তাঁহাদের কাহারো কাহারো অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের ও তাঁহাদের শাসনের কেবল ভাল দিক্‌টি দেখাইলে ও দেখিলেই চলিবে না। কারণ, তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি না থাকিলে, প্রথমতঃ হিন্দুশক্তির পুনরুত্থান হইত না, দ্বিতীয়তঃ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অধিকারচ্যুত হইয়া সমগ্রদেশ ইংরেজের পদানত হইত না। অতএব, মুসলমান-ভারতের ভাল মন্দ উভয়ই নিরপেক্ষভাবে দেখিতে ও দেখাইতে হইবে।

মুসলমান ভারতের ইতিহাস রচনা যদি বন্ধুভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহাসিক সহকর্ম্মী হইয়া একযোগে করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়। ভাষার সংযমেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ব্রিটিশভারতের সত্য ইতিহাস রচনা অতি কঠিন কাজ। সাধারণতঃ সকল দেশের ও সকল যুগের ইতিহাস রচনাই কঠিন; সত্যনির্ণয় সহজ নয়। কিন্তু আমরা এখনও ব্রিটিশ জাতির অধীন বলিয়া আমাদের পক্ষে ব্রিটিশ-যুগের ইতিহাস লেখা কঠিনতর। আইন নিশ্চয়ই বাধা দিবে বলিতে পারি না; কিন্তু সহজেই বাধা দিতে পারে।

শাসনকর্ত্তাদের বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা ত আছেই। এসব বাধা অগ্রাহ্য করিলেও, সত্য ইতিহাস রচনার আর-এক বাধা আছে; তাহা ভারতীয়দের মনের ভাব। দেশ-ভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের মনের ভাব ব্রিটিশ শাসনের প্রতিকূল। অন্যদিকে আছে অনেক লোক, যাহারা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে খুশি করিতে চায়। কিন্তু ঐতিহাসিককে বিরোধীর ভাব এবং দাসের ভাব, উভয়ই দমন করিয়া, সত্য যাহা তাহাই লিখিতে হইবে। ইংরেজদের দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে, তাহারা ভারতে অনেক অপকার্য্য করিয়াছে; যতদূর সম্ভব এসব সত্য গোপন না করাই উচিত। কিন্তু মন্দ যাহা, তাহার সবই ইংরেজরা ইচ্ছাপূর্ব্বক, জানিয়া শুনিয়া, মন্দ করিবার জন্যই করিয়াছে, ইহাও ধরিয়া লওয়া উচিত নহে। যেখানে দুরভিসন্ধির প্রমাণ আছে, সেখানে তাহা উল্লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। যেখানে প্রমাণ নাই, সেখানে অভিসন্ধি বিষয়ে কিছু না লিখিয়া কেবল অনিষ্ট ও অপকর্ম্মেরই বৃত্তান্ত যথেষ্ট। ইংরেজদের দ্বারা বা ইংরেজ শাসনে আমাদের ইষ্ট যাহা হইয়াছে, তাহাও দেখিতে ও দেখাইতে হইবে। ব্যক্তিগত ভাবে সম্ভবতঃ অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতহিতৈষী ছিলেন ও আছেন, কিন্তু মোটের উপর ইংরেজরা ভারতে আসিয়াছিল ও এখনও আছে, নিজেদের লাভ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। এইজন্য, যদিও ইংরেজ-শাসনকালে জাত বা সংসাধিত ইষ্ট আমাদের ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার বা গোপন করিবেন না, কিন্তু তাঁহারা ইহাও আগে হইতে ধরিয়া লইবেন না, যে, ইংরেজ কেবল বা প্রধানতঃ ভারতের মঙ্গলের জন্যই ভাল কিছু করিয়াছে। তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, যে, ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষ কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই মঙ্গলকামনা যেসব কাজেরও ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বা ইংরেজদের কি লাভ ও সুবিধা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, বা হইতে পারে। সবস্থলে না হউক, অধিকাংশ স্থলেই ইহা প্রতীত হইবার সম্ভাবনা, যে, ইংরেজ নিজের সুবিধা করিতে যাওয়ায় আনুষঙ্গিক ভাবে আমাদেরও সুবিধা হইয়াছে। অন্যদিকে, ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ইহাও যেন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া না লয়েন, যে, কোনও সরকারী বা বে-সরকারী ইংরেজেরই নিঃস্বার্থ ভারতহিতৈষণা থাকিতে পারে না। মোটের উপর, তাঁহারা যেন বিনা প্রমাণে কিছু না লেখেন।

ইংরেজশাসনের ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ খুব নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ হইলেও হয়ত তাঁহাদের রচিত ইতিহাস সম্পূর্ণ সত্যানুসারী হইবে না। আপাততঃ এ অবস্থার প্রতিকারের কোন উপায় নাই। যে-সব বিদ্বান্ ভারতসন্তান স্বেচ্ছায় বিদেশে বাস করিতেছেন, এবং যাঁহারা হয়ত আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন না, তাঁহারা ইংরেজের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিকূল ভাব পরিহার করিয়া যদি সত্য ইতিহাস রচনায় মন দেন, ও তাহা রচনা করিয়া বিদেশেই প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জগতের লোকের নিকট ব্রিটিশ-ভারতের সত্য প্রকাশিত হইতে পারে, এবং কালক্রমে ঐ সত্য ইতিহাস ভারতবর্ষেও প্রচারিত হইতে পারে।

প্রত্যেক দেশের বিশেষত্ব ও পার্থক্য থাকিলেও, কোন দেশই "সৃষ্টিছাড়া" নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিতও অন্য অনেক দেশের ইতিহাসের সাদৃশ্য আছে। যেসব দোষ-ত্রুটির জন্য ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, অন্য কোন-না-কোন দেশে সেইসব দোষ ছিল বা আছে, এবং তাহার সংশোধনও হইয়াছে বা হইতেছে। আমাদের অধঃপতন, দুর্ব্বলতা, দলাদলি, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, একতার অভাব, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা, জগতের অতীত ও বর্ত্তমান অন্য সব জাতির চেয়ে বেশী নহে। নানাদেশের ইতিহাস পড়িলে ইহা জানা যায়। ইতিহাস জাতীয় নৈরাশ্যের অমোঘ ঔষধ। এই জন্য জাতীয় শিক্ষালয়সকলে নানাদেশের ইতিহাস অধীত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সাহিত্যকে সাহিত্য রূপে শিখাইতে হইবে; উহাকে শুধু ব্যাকরণ ও শব্দার্থ শিখাইবার উপায় করিলে চলিবে না, উহার মধ্যে যে রস আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহা গ্রহণ ও আহরণ করিতে সমর্থ করিতে হইবে।

ড্রইং বা রেখাঙ্কণ সকলকেই শিখান আবশ্যক। ইহাতে হাত ও চোখের শিক্ষা হয়। ইহার নিজের মূল্য ছাড়া, ইহা অপর নানা বিদ্যাশিক্ষায় আবশ্যক

বলিয়াও ইহা মূল্যবান্। গণিত, চিত্রকলা, নানাবিধ কারুকার্য্য, সূত্রধর কর্ম্মকার ও দর্জ্জির কার্য্য, নানা প্রকার এঞ্জিনীয়ারিং, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োজন হয়।

বালক ও বালিকা উভয়কেই সঙ্গীত শিখান উচিত। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে সকলেই পারদর্শী না হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতের রস-গ্রাহিতা শিক্ষার একটি লক্ষ্য হওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

মানবদেহতত্ত্ব, শরীরপালন এবং গৃহ গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান বিদ্যালয়ে দান করিবার বন্দোবস্ত থাকা দরকার। নূতন পল্লী স্থাপন ও তথায় ঘর বাড়ী ও রাস্তা নির্ম্মাণ, নূতন গ্রাম ও নগর পত্তন ও তাহাকে মানুষের স্বাস্থ্যকর আবাসস্থান করিবার সামর্থ্য আপনা হইতে আসে না। ইহা জ্ঞান-সাপেক্ষ। ছোটনাগপুরের গিরিডি প্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছি, পল্লী স্থাপন ও গ্রাম নির্ম্মাণে অনভিজ্ঞতা এবং জমী সম্বন্ধে কৃপণতা ও লুব্ধতা বশতঃ বাঙ্গালীরা অনেক স্বাস্থ্যকর স্থানকে ব্যাধির আকর করিয়া তুলিতেছে। এলাহাবাদে পুরাতন পল্লী ভাঙ্গিয়া নূতন রাস্তা ও ঘর বাড়ী অনেক জায়গায় হইতেছে, কিন্তু কোথাও কোথাও দেখিতেছি আগেকারই মত পরস্পরের গায়ে গায়ে বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, এক ইঞ্চিরও ব্যবধান নাই; এবং এলাহাবাদ শুষ্ক ধূলি-বহুল ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থান হওয়া সত্ত্বেও এইসব স্থানে মিউনিসিপালিটী বৃক্ষরোপণ করেন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ে এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যাহাতে সকল দিকেই জাতীয় উন্নতি হয়। উন্নতির গোড়া বাঁচিয়া থাকা। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে গৃহ, পল্লী, গ্রাম ও নগরকে স্বাস্থ্যকর করিতে হইবে। তজ্জন্য রাস্তা নর্দ্দমা প্রভৃতি এরূপ হওয়া দরকার যাহাতে সহজেই ময়লা জল ও অন্যবিধ জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষিপ্ত ও কৃষির উন্নতিকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

গৃহ, পল্লী, গ্রাম ও নগরকে সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল করিলেই তাহাদের কিছু সৌন্দর্য্য সঙ্গে সঙ্গে জন্মিবে। উৎকৃষ্ট স্থাপত্য, এবং দক্ষ চিত্রকলা দ্বারা তদতিরিক্ত সৌন্দর্য্য বিধান করিতে পারিলে আরও ভাল।

পৌর, জানপদ ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালন বিদ্যা আমেরিকায় সিভিক্‌স্ (civics) নামে অভিহিত। স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করিবার যোগ্য যিনি হইতে চান, তাঁহাকে স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, অধিকন্তু রাষ্ট্রের ও তাহার অধিবাসীদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য পালন করিতে জানিতে ও ব্যগ্র থাকিতে হইবে, এবং সেই জ্ঞান ও উৎসাহ কাজে লাগাইতে হইবে। ভারতবর্ষে সরকারী নিয়ম অনুসারে পরিচালিত বিদ্যালয়সকলে ব্রিটিশ রাজত্বে প্রজাদের সুখ সুবিধা কণ্ঠস্থ করান হয়, বালক-বালিকা-দিগকে "রাজভক্ত" করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রবাসীর সর্ব্ববিধ যোগ্যতা তাহাদের হৃদয়মনে বিকশিত করিবার চেষ্টা করা হয় না। এই বিষয়ে জাতীয় বিদ্যালয়সকল কার্য্যতঃ নিজেদের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে উহাদের প্রতিষ্ঠাতা-দিগের আদর্শ ও দেশহিতৈষণার প্রশংসা করা যাইবে না।

জাতীয় বিদ্যালয়সকলে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে দৃষ্টি থাকা চাই, ইহা বলাই বাহুল্য। খেলিবার জায়গা, ব্যায়াম করিবার জায়গা ও সরঞ্জাম, খেলা ও ব্যায়ামের শিক্ষক ও পরিদর্শক যথেষ্ট থাকা চাই। যেখানে যেখানে সম্ভব, সন্তরণ ও বৃক্ষারোহণ শিখান উচিত। যে-সব দেশ ভারতবর্ষের মত গরীব নয়, সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়েই প্রয়োজন-মত খাইতে দিবার ব্যবস্থা অনেক জায়গায় আছে। ক্ষুধিত দুর্ব্বলদেহ বালক-বালিকাদিগকে আগে খাইতে না দিয়া খেলা করিতে, ড্রিল করিতে, বা ব্যায়াম করিতে বাধ্য করিলে তাহাদের হিত না করিয়া অহিতই করা হয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সব কথাই যে এখানে বলিতে হইবে, এমন নয়। কিন্তু চারিত্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু না বলিলে অনেকে হয় ত মনে করিবেন, আমরা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করি না। বস্তুতঃ আমরা ইহা একান্ত আবশ্যক মনে করি। কিন্তু কি প্রকারে, কোন্ স্থানে, কে, এই শিক্ষা দিলে প্রকৃত হিত হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা সোজা নয়।

হিন্দু শৈশব হইতে বালকবালিকাদিগকে হিন্দুত্ব শিক্ষা দিতে স্বভাবতই আগ্রহান্বিত হইবেন। তদ্রূপ, মুসলমান ইস্‌লাম শিক্ষা দিতে, খৃষ্টিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতে, ব্যগ্র হইবেন। কিন্তু জাতীয় (national) বিদ্যালয়ে সকল ধর্ম্মের ছাত্র-ছাত্রী থাকিতে পারে। তাহাতে কোন একটি ধর্ম্ম বা সকল ধর্ম্ম শিখাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে না। এবং ধর্ম্ম পুঁথিগত জিনিষ নহে, মানুষের আন্তরিক ও বাহ্য জীবনের ভিত্তিগত মূলীভূত বস্তু। এইজন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা আর যে-প্রকারেই দেওয়া হউক, সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল পিতামাতা ও অপর গুরুজনের, এবং সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল শিক্ষকদের আচরণের দৃষ্টান্তে ইহার শিক্ষা না হইলে অন্য সকল প্রকারে ইহার শিক্ষা দান ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

পরার্থপরতা, সকল জগদ্বাসীর প্রতি মৈত্রী ও সকলের হিতৈষণা, এবং সর্ব্বনাশ প্রাণনাশকেও অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুসরণ জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

—

মহাত্মা গান্ধির সহযোগিতা ও সহযোগিতাবর্জ্জন।

কিছু দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধি রাজপ্রদত্ত সম্মান ত্যাগ করিয়া রাজপ্রতিনিধি বড়লাটকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যেমন তাঁহার নির্ভীক সত্যবাদিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি আর-একখানি পত্রে তিনি তদ্রূপ সাহস ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক ভারতপ্রবাসী ইংরেজের উদ্দেশে লিখিত। ইহা কোন কোন ইংরেজী খবরের কাগজে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা সমুদয় ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সকল প্রদেশে প্রচারিত হইলে ভাল হয়। ইহার প্রত্যেক কথায় সকলে সায় দিতে না পারেন, আমরাও পারি না, কিন্তু ইহার প্রধান বক্তব্য যে সত্য, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধি লিখিতেছেন যে উনত্রিশ বৎসর ধরিয়া এরূপ অবস্থার মধ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন, যাহাতে অন্য কাহাকেও বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারিত। ইহা সত্য কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতসন্তানদের যেরূপ লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তিনি নিজ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া বুয়র যুদ্ধে ও জুলু যুদ্ধে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহযোগিতার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহার সহযোগিতা যে ভয়জাত নহে, তিনি যে "গুঁতোর চোটে বাবা" বলেন নাই, তাহা তাঁহার শত্রুরাও স্বীকার করিবে। এহেন মানুষ সুখসম্পদআরাম ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেন সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, ইংরেজদের তাহা জানা ও ভাবা উচিত। কারণগুলি মহাত্মা গান্ধি তাঁহার চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহার কোনটিই বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নয়

মহাত্মা গান্ধির বড়লাটকে লিখিত চিঠিখানির আলোচনার সময় আমরা লিখিয়াছিলাম যে বুয়রদের ও জুলুদের বিরোধী পক্ষের সহায় হওয়া তাঁহার মত লোকের উচিত হয় নাই। যে-কোন জাতি স্বাধীনতা রক্ষা বা পুনর্লাভের জন্য লড়ে, তাহাদের যত দোষই থাকু, স্বাধীনতাকামী কোন ব্যক্তিরই তাহাদের সে সংগ্রামে বাধা দেওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান চিঠিতেও ঐ দুই যুদ্ধের উল্লেখ ও তৎসম্পর্কে গান্ধি মহাশয়ের স্বকার্য্যের উল্লেখ আছে। আমাদের বক্তব্য পূর্ব্ববৎ। গত মহাযুদ্ধেও তিনি দুই প্রকারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে গিয়া নিজ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—I did all this in the full belief that acts such as mine must gain for my country an equal status in the empire "আমি এসমস্ত কাজ করিয়াছিলাম সম্পূর্ণ এই বিশ্বাসে যে আমার কাজগুলির মত কাজ আমার দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অন্য সকলের সমান পদবী লাভে সমর্থ করিবে।" এই বিশ্বাস গান্ধি মহাশয়ের সরলচিত্ততার পরিচায়ক, কিন্তু ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীস্থ লোকদের চরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। তাহাদের ইতিহাসে দেখা যায়, তাহারা এ পর্য্যন্ত এমন কাহাকেও তাহাদের সমান বলিয়া কার্য্যতঃ স্বীকার করে নাই, যাহারা তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত না করিয়াছে, কিম্বা ভবিষ্যতে পরাস্ত করিতেও পারে এরূপ সম্ভাবনা তাহাদের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত না করিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভারতবাসীরা প্রাণপাত অর্থব্যয় ও জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে বলিয়া

তাহারা ইংরেজের সমান পদবী পাইবে, এ বিশ্বাস বা সন্দেহ আমাদের কোন কালেই ছিল না; বরং এই ধারণাই ছিল এবং তাহা অনেক বন্ধুবান্ধবকে বলিয়াও-ছিলাম যে মহাযুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হইলে ভারতবাসীদের আরও অধিক নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হইবে; কারণ ইংরেজের রুশভীতি ও জার্মেনভীতি থাকিবে না। এখন মহাত্মা গান্ধি নিজের ভ্রম বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "though my faith in your good intentions is gone, I recognise your bravery, and I know that what you will not yield to justice and reason, you will gladly yield to bravery", "যদিও তোমাদের সদভিপ্রায়ে আমার বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে, তথাপি তোমাদের সাহস আমি স্বীকার করি, এবং আমি জানি তোমরা যাহা ন্যায় ও যৌক্তিকতার খাতিরে দিবে না, সাহস দেখাইলে তাহা সানন্দে দিবে।" "gladly" "সানন্দে" কথাটি বাদ দিয়া আমরা মহাত্মা গান্ধির সহিত একমত।

অস্ত্রধারণ করিয়া সাহস দেখাইতে এবং ইংরেজকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে যাঁহারা চান বা অবস্থা অন্যরূপ হইলে চাহিতেন, তাঁহারাও সে চিন্তা ত্যাগ করিতে বাধ্য; কেন না, অবস্থা অনুকূল নহে। যাঁহারা মহাত্মা গান্ধির ন্যায় অহিংসাবাদী, তাঁহারা ত অস্ত্রধারণ করিবেনই না। এইজন্য উভয়দলের লোককে কোন-না-কোন প্রকারে সাত্ত্বিক নিরস্ত্র প্রাণপণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধি প্রস্তুত হইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, যদিও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত সমুদয় অনুষ্ঠানের সমর্থন করিতে পারি না। কেন পারি না তাহা প্রবাসীর আগেকার দুই এক সংখ্যায় বলিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

—

দমননীতির ব্যর্থতা।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবং স্বদেশবাসী ও ভারতপ্রবাসী শাসক-শ্রেণীর ইংরেজরা দমননীতির ভক্ত। দমনে প্রত্যাশিত ফল না ফলিলে তাহারা মনে করে ও বলে যে যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নাই, আরও নিগ্রহের দরকার। দমননীতিসমর্থকদের এইরূপ মতিভ্রমই হইয়া থাকে। রুশিয়ায় দমননীতির কোন্ অঙ্গ বা কোন্ মাত্রা বাকী ছিল? কিন্তু তদ্দ্বারা কি রুশজারের সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব রক্ষা পাইল? ভারতবর্ষে কি দেখিতেছি? যুদ্ধের সময় শতশত ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অন্তরায়িত (interned), নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, যুদ্ধের পর জালিয়ানওয়ালাবাগের মত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, সামরিক আইন অনুযায়ী বিচারে কত লোকের ফাঁসী, নির্ব্বাসন, কারারোধ, বেত্রাঘাতদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, প্রভৃতি শাস্তি এবং নানা অকথ্য লাঞ্ছনা, ও অপমান হইয়াছে। অনেক সংবাদপত্র উঠিয়া গিয়াছে, অনেকের নিকট খুব বেশী জামিনের টাকা লওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোক কি ভয়বিহ্বল হইয়া গিয়াছে? তাহার বিপরীত অবস্থাই ঘটিয়াছে। এখন কেবল মহাত্মা গান্ধি নহে, অপর অনেকেও এমন সব স্পষ্ট সত্য কথা খবরের কাগজে লিখিতেছেন এবং বক্তৃতায় বলিতেছেন, যাহা পূর্ব্বে কেহ লিখিত না, বলিত না। তাহা অপেক্ষা অনেক নরম কথা বলায় ও লেখায় পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকের জেল ও নির্ব্বাসন হইয়াছে, অনেক খবরের কাগজ ও প্রেস উঠিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে এখন যাঁহাদের জেল হইতেছে, তাঁহাদের কেহ কেহ আদালতকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন না, অনেকেই সানন্দে জেলে যাইতেছেন ও সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট দমননীতি ত্যাগ করিলে, দমনকার্য্য সহজ করিবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত যত কঠোর ও "বে-আইনী" আইন ও নিয়ম হইয়াছে তাহা রদ করিলে, ইংরেজের মঙ্গল। ভারত এক সময়ে স্বাধীন হইবেই হইবে। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রশ্ন কেবল এই, যে, ইংরেজের সহিত মৈত্রী রাখিয়া ভারত স্বাধীন হইবে, না, ইংরেজের প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ করিয়া স্বাধীন হইবে। ফিলিপিনোরা আমেরিকানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের ভাব পোষণ করিয়া অচিরে স্বাধীন হইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে ইংরেজদের প্রতি তদ্রূপ ভাব পোষণ অসম্ভব করিয়া তোলা ভিন্ন কি ইংরেজদের গত্যন্তর ছিল না, বা নাই?

কর্কের লর্ড মেয়র।

কর্কের লর্ড মেয়র মিষ্টার ম্যাকস্থইনীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরেজপুলিশহত্যা ব্যাপারে সংসৃষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। সামরিক আইন অনুসারে তাঁহার বিচার হয়। তিনি ইংরেজের কোন আদালতের তাঁহার বিচার করিবার অধিকার অস্বীকার করেন; তিনি আইরিশ সাধারণতন্ত্রের দলভুক্ত ব্যক্তি।

স্বর্গীয় টেরেন্স ম্যাক্‌স্থইনী।
আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্ক সহরের লর্ড মেয়র,
তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভে দেশবাসীকে সাহায্য করিয়া,
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচারে দুই বৎসরের জন্য বন্দী হন।
তিনি আদালতে বলেন, যাদের আত্মা স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ,
তাদের বন্দী করিয়া রাখা কারাগারের কর্ম্ম নয়।
তিনি ৭৪ দিন অনশনে থাকিয়া প্রায়োপবেশন করিয়া স্বদেশের
স্বাধীনতার জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।
তাঁর অমর আত্মার প্রভাব দেশে দেশে প্রসারিত
হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি আদালতকে বলেন, আমি এই কর্ক শহরের প্রধান মাজিষ্ট্রেট, এই আদালতকে বে-আইনী বলিতেছি, এবং যাহারা ইহার বিচারকার্য্য চালাইতেছে তাহারা আইরিশ সাধারণতন্ত্রের আইন অনুসারে ধৃত ও দণ্ডিত হইতে পারে।

মহাত্মা ম্যাক্‌স্থইনীর প্রতি আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায়
আইরিশ স্বাধীনতাকামী সিন ফেন দলের সহকর্ম্মী
আমেরিকার মেয়েরা নিউ ইয়র্কের পথে পথে লোকের
সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া ফিরিতেছেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ ছিল না। আদালতের বিবেচনায় সন্দেহের কারণ ছিল। আদালত তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করায় তিনি বলিয়াছিলেন,

"I wish to state that I will put a limit to any term of imprisonment you may impose as a result of the action I will take. I have taken no food since Thursday : therefore, I will be free in a month."

"আমি বলিতে চাই, যে, আপনারা আমার প্রতি যে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, আমার সংকল্পিত কার্য্য দ্বারা তাহার দৈর্ঘ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিব। আমি বৃহস্পতিবার হইতে আহার করি নাই; অতএব, একমাসে আমি স্বাধীন হইব।"

তাহাতে আদালতের প্রধান বিচারক বলিলেন, "on sentence to imprisonment you will take no

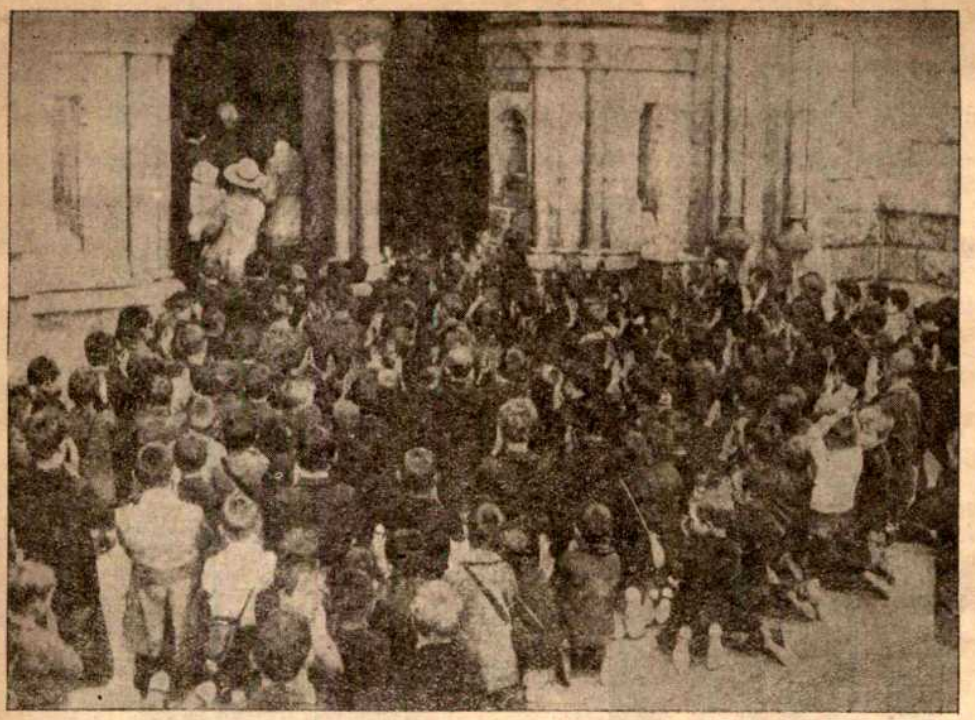

মাহাত্মা ম্যাক্‌সুইনীর মুক্তির জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইতর-ভদ্র ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রায়োপবেশনে মুমূর্ষু ম্যাক্‌সুইনীকে মানুষের নির্ম্মম হৃদয়হীনতা যখন কিছুতেই মুক্তি দিতে চাহিল না, তখন দেশ ভগবানের মন্দিরের দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িল। এই প্রার্থনায় ডাব্‌লিনের এক গির্জ্জায় চার হাজার রেলের কুলি আসিয়া যোগ দিয়াছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গির্জ্জার মধ্যে ঢুকিতে না পারিয়া রাস্তায় বসিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল।

food ?" "কয়েদ হইলে আপনি কোন খাদ্য আহার করিবেন না ?" শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌সুইনী উত্তর করিলেন, "I simply say that I have decided the term of my detention whatever your Government may do. I shall be free, alive or dead, within a month." "আপনাদের গবর্ণমেণ্ট যাহাই করুন, আমি আমার অবরুদ্ধ অবস্থার সীমা স্থির করিয়াছি। মৃত বা জীবিত অবস্থায়, আমি এক মাসের মধ্যে স্বাধীন হইব।" একমাস বলিবার কারণ এই যে তিনি সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিলেন যে একমাস উপবাসী থাকিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইবে, বা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তিনি উপবাসের ৭৪ দিনের দিনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল, যে, ভগবান্ তাঁহাকে উপবাসসত্ত্বেও এতদিন এইজন্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, যে, ইংরেজদের যদি সুমতি হয় এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু ইংরেজরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না, তাহাদের সুমতি হইল না।

ম্যাক্‌সুইনি ইংরেজের আইন অনুসারে দোষী ছিলেন কি না, জানি না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন সাধারণতন্ত্র, তিনি কোন কাজের জন্য ইংরেজদের কাছে দায়ী নহেন। অতি আশ্চর্য্য মানসিক বল ও দৃঢ়তা, অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি এখন, কেবল আয়ার্ল্যাণ্ডে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতার ভক্ত কোটি কোটি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা পাইতেছেন। তিনি যৌবনেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কিন্তু জীবনের দৈর্ঘ্যে জীবনের সার্থকতা নহে, উহার সদ্ব্যবহারেই উহার সার্থকতা। ইংরেজের আইন অনুসারে তিনি দোষীই হউন বা নির্দ্দোষ হউন, আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-লাভ-কল্পে তাঁহার অসাধারণ প্রায়োপবেশন

যাহা করিল, কোনও আইরিশ বীরের সাহসিকতা তাহা করিতে পারে নাই।

—

কংগ্রেসের ভিত্তিভূত নূতন নিয়মাবলী।

কংগ্রেসের ভিত্তিভূত নিয়মাবলীর (constitution) সংশোধিত খস্‌ড়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা নাগপুর কংগ্রেসে বিবেচিত হইবে। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিবার আমাদের সময় ও স্থান নাই। কেবল দুটি বিষয়ে আমাদের মত বলিব। আগে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, আইনসঙ্গত আন্দোলন দ্বারা ভারত-শাসন-প্রণালীর ক্রমিক সংস্কার সাধন করিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্তশাসন লাভ। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়াই এইরূপ রাজনৈতিক অবস্থায় পৌঁছিবে, তখন এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সংশোধিত উদ্দেশ্য এখন নিম্নলিখিতরূপ হইল ;—

"The object of the Indian National Congress is the attainment of Swarajya by the people of India by all legitimate and peaceful means."

তাহার সমালোচনা না করিয়া বলিতেছি, এই উদ্দেশ্যে আমরা সায় দিতেছি। স্বরাজ্য মানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া জাতীয় আত্ম-কর্তৃত্বও হইতে পারে। আমরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া মানুষের মত আত্ম-সম্মান ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে না পারি, তাহা হইলেও উহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার কল্পনাও করিবার অধিকার বা সাহস আমাদের থাকিতে পারে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে হইবে, "legitimate and peaceful means" দ্বারা অর্থাৎ বৈধভাবে এবং অস্ত্র ও শারীরিক বল প্রয়োগ দ্বারা শান্তিভঙ্গ না করিয়া।

এখন যেমন যে প্রদেশ, জেলা, সহর, গ্রাম যত ইচ্ছা প্রতিনিধি কংগ্রেসে পাঠাইতে পারেন, অতঃপর তাহা চলিবে না, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। প্রতিনিধির সংখ্যা প্রদেশাদির লোকসংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হইবে, প্রত্যেক এক লক্ষ লোকের একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

—

ভাঙ্গা ও গড়া।

মহাত্মা গান্ধির মতে আলিগড় কলেজ, কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ও অমৃতসরের খালসা কলেজ এত অনিষ্টকর যে তিনি উহা ভাঙিয়া দিয়া উহাদের স্থানে পবিত্রতর বিশুদ্ধতর ও অধিকতর সত্যাচারী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তিনি যাহা গড়িতে চান, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। কারণ, ঐ কলেজগুলির দোষ আছে, সুতরাং উহাদের চেয়ে ভাল কলেজ হইতে পারে ; এবং শিক্ষার স্থান দেশে যত বাড়ে ততই মঙ্গল। কিন্তু ভাঙায় আমাদের সম্মতি নাই। কারণ আমরা ঐ বিদ্যামন্দিরগুলিকে কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ অনিষ্টের আকর মনে করি না, এবং ভাঙিলেই গড়া যায় না ; ভাঙা যত সোজা, গড়া তত সোজা নয়।

—

"আমার সম্পত্তি"।

গান্ধি মহাশয় গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা ও সংস্রব বর্জ্জন প্রচার করিতেছেন। এইজন্য লক্ষ্ণৌতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে, তিনি সর্‌কারী ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ কেন ব্যবহার করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "উহা তাঁহার সম্পত্তি।" এই উত্তরের অর্থ সহজেই বুঝা যায়—দেশবাসীদের প্রদত্ত অর্থে ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ চলে, সুতরাং উহা দেশবাসীদের সম্পত্তি। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ আদালতও ত দেশবাসীদের টাকায় চলে ; সেগুলিকেও কেন আমরা আমাদের সম্পত্তি বলিয়া কাজে লাগাইব না ? কিন্তু গান্ধি মহাশয় সেগুলি ভাঙিয়া দিতে ও তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধির মত লোকের এরূপ কথার ফাঁকি অবলম্বন আমরা ভাল মনে করি না। যেটা আমার সম্পত্তি তাহার উপর, তাহার আয়ব্যয়ের উপর, তাহার পরিচালনার উপর, আমার কর্তৃত্ব থাকে। কিন্তু সর্‌কারী স্কুল কলেজ আদালতগুলির উপর যেমন আমাদের কোন হাত নাই, ডাক ও টেলিগ্রাফের উপরও তেমনি আমাদের কোন

হাত নাই। সুতরাং কোনটিকেই আমাদের সম্পত্তি বলিতে পারি না। যেটি নইলে আমার চলে না, অন্ততঃ এখন চলে না, সেটি আমার সম্পত্তি, বাকীগুলি আমার সম্পত্তি নয়, এরূপ মর্ম্মের উক্তি সরলসত্যবাদিতাসঙ্গত ও শ্রদ্ধেয় নহে।

—

শিক্ষায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ।

স্কুল-কলেজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ বা সর্‌কারী স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ গান্ধি মহাশয় পাপ মনে করেন; কারণ তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের টাকা দস্যুতা-লব্ধ, সে টাকা লওয়া বা সে টাকায় যে-কাজ চলে তাহার সাহায্য লওয়া পাপ। পরের দ্রব্য জোর করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইলে তাহা দস্যুতা হয় বটে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ট্যাক্স দিতে আপত্তি না করিতেছি, ট্যাক্স দিতে বিরত না হইতেছি, ততদিন গবর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ মনে করিতে পারেন যে ট্যাক্স দিতে আমাদের সম্মতি আছে; ততদিন ট্যাক্সলব্ধ টাকা দস্যুবৃত্তির টাকা নহে।

বাস্তবিক মাহাত্মা গান্ধি ও তাঁহার অনুচরগণ ট্যাক্স দিয়া এই "দস্যুতার" সাহায্য করিতেছেন। অতএব "সহযোগিতা-বর্জ্জন" প্রচেষ্টার প্রথম অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল, ট্যাক্স্ না-দেওয়া। আমরা জানি, এই অনুষ্ঠান ঐ প্রচেষ্টার অন্তর্ভূত; কিন্তু উহা কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল বলিয়া প্রথমেই আরব্ধ হয় নাই। কিন্তু যৌক্তিকতার খাতিরে (to be logical) উহাই যে প্রথম কার্য্য হওয়া উচিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিশ্চিত, যে, ট্যাক্স্ প্রদান হইতে বিরতির পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের টাকাকে ডাকাতির টাকা বলা যায় না।

—

উচ্চতর রাজনীতির জন্য শিক্ষা বলিদান।

মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন, তিনি উচ্চতর রাজনীতির অনুরোধে শিক্ষা বলি দিতে (to sacrifice education for higher politics) প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি কি করিতে চান, না জানায়, ইহার অর্থ বুঝা গেল না। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, বেল্‌জিয়মের কলেজের ছেলেরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লেখা-পড়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। যদি ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সমর ঘটিত, তাহা হইলে আমাদের কলেজের ছেলেরাও যুদ্ধ করিতে গেলে আমরা মনে করিতাম উচ্চতর রাষ্ট্রনীতির খাতিরে তাহারা শিক্ষা বলি দিতেছে। কিন্তু সমরের কল্পনাও কেহ করিতেছে না, করা বাতুলতা। শ্রীযুক্ত গান্ধি ও তাঁহার সহযোগীরা কেবল বর্ত্তমান সর্‌কার-অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলি ভাঙ্গিয়া জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন করিবেন বলিতেছেন; ছাত্রদিগকে কোন প্রকার অস্ত্রহীন সাত্ত্বিক সংগ্রামে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া ত এখনও শুনি নাই।

হইতে পারে, যে, তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য, দেশে একটা ঝড় বওয়ান। জড়ীয় ঝড়ে কলুষিত বাতাস নষ্ট হইতে পারে বটে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে অনেক জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হয়। তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় সামাজিক ঝড়ের সাদৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাদৃশ্য থাকিলেই ফলের সমতা অনুমান করা যায় না; ইহাও বলা যায় না, যে, ইতিহাস-বর্ণিত প্রত্যেক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঝড়েই অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্ট অধিক হইয়াছে।

—

বিশ্বপর্য্যটক লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে।

বাংলাদেশের বর্ত্তমান গভর্ণর লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তেরো বৎসর আগে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে চীনদেশে যান। যখন বৃটিশ-অধিকৃত চীনদেশের টেজিয়ে শহরে গিয়া উপস্থিত হন, তখন সেখানে প্রবাসীর পাঠকদের পরিচিত পুরাতন লেখক শ্রীযুক্ত রামলাল সর্‌কার ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ডাক্তারখানায় লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে উপস্থিত হইলে তিনি অভ্যাগতকে না চিনিয়াও খাতির করিয়া বসিতে চৌকী দেন ও জিজ্ঞাসা করেন—তাঁর কি চাই? লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে চোখের পীড়ার ঔষধ কিছু বোরিক-এসিড চাহিয়া বলেন—ঔষধটি যেন কমিশনার অফ্ কাষ্টম্‌স্ মিষ্টার মেজের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রামলাল-বাবু তখন অভ্যাগত রোগীর সাম্‌নে একটুক্‌রা কাগজ ও পেন্সিল দিয়া তাঁর নাম লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। পর্য্যটক রোগী তখন ডাক্তারকে নাম লিখিয়া দেন—লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে। রামলাল-বাবু একজন অভিজাত লর্ডের সাদাসিধা চালচলন দেখিয়া ও

লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল সর্‌কার কর্ত্তৃক ১৩ বৎসর আগে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

অমায়িক ব্যবহারে প্রীত হইয়া অভ্যাগত লর্ডের একটি ফটোগ্রাফ লইবার প্রস্তাব করেন। লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া পরদিন বেলা দশটার সময় পুনরায় ডাক্তারখানায় আসিতে প্রতিশ্রুত হন। পরদিন ১০টার সময় রামলাল-বাবু ক্যামেরা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং রামলাল-বাবু তাঁর বসা ও দাঁড়ানো দুই ধরণের দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইলেন। লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে ফটোগ্রাফের নেগেটিভ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে রামলাল-বাবু তাঁর নোটবুক বাহির করিয়া লর্ড পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। লর্ড রোনাল্ডশে তাতে লেখেন যে তিনি ইংলণ্ড হইতে রওনা হইয়া প্রথমে কানাডায় যান; সেখান হইতে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ হইয়া জাপানে আসেন; সেখান হইতে মাঞ্চুরিয়া ঘুরিয়া টেঙ্গিয়ে উপস্থিত হন। তার পর তিনি বর্ম্মা দেখিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে পাব্‌লিক সার্ভিসেস্ কলিশনে নিযুক্ত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও পর্য্যটন করেন।

—

দৌড়ে দক্ষ ভারতীয় ওস্তাদ।

খেলায় বা ব্যায়ামে যে বহু লোককে পরাজিত করিয়া জয়ী হয় তাকে ইংরেজিতে চ্যাম্পিয়ান বা ওস্তাদ বলে। য়ুরোপে মাঝে মাঝে সার্ব্বভৌম খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা হয়; তাকে ম্যারাথন বলে। লণ্ডনের হার্নহীল পাড়ায় গানার্সবেরী পার্কে এক ম্যারাথন প্রতিযোগিতা হয়; তাতে ১০ মাইল ও ১৩ মাইল লম্বা দৌড়ে

শ্রীযুক্ত চৌগুলে।

বোম্বাইএর শ্রীযুক্ত চৌগুলে প্রথম হইয়াছেন। চৌগুলের বয়স মাত্র ২১ বৎসর। উইণ্ডসর হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত দৌড়ে তিনি চতুর্থ আসিতেছিলেন; ২০ মাইল দৌড়ের পর তিনি নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। বেল্‌জিয়মের এণ্ট্‌ওার্পে ৬০ জন দৌড়ওয়ালার মধ্যে চৌগুলে ১৯ স্থান লইয়া সার্টিফিকেট পান; তখন তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন, নতুবা ফল আরো ভালো হইত আশা করা যায়। এদেশ থেকে যেসব খেলোয়াড় প্রতিযোগিতা করিতে য়ুরোপে গিয়াছিলেন, তাঁদের খাওয়া ও থাকার

ব্যবস্থা ভালো করা হয় নাই বলিয়াই তাঁদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাঁরা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে ম্যারাথন দৌড় হইয়া গেল। তাতে ২৷ মাইল দৌড়ে অন্যান্য খেলোয়াড় চৌগুলে অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

ভারতবাসীর যন্ত্র উদ্ভাবন।

ভারতবাসী সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান ও বিদ্যায় প্রাচীনকালে বিশেষ মৌলিকতা ও উদ্ভাবনের পরিচয় দিয়াছিলেন, এক যন্ত্র-বিজ্ঞান ছাড়া। পুষ্পক রথ, শতঘ্নি বাণ, জৃম্ভক অস্ত্র প্রভৃতি কেবল কল্পনাতেই ছিল বোধ হয়; জ্যোতিষ গণনার জন্য কিছু কিছু যন্ত্র মানমন্দিরে উদ্ভাবিত ও

শ্রীযুক্ত শঙ্কর আবাজী বীজে।

ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এখনো জীবিত থাকিয়া প্রচলিত আছে ও ব্যবহৃত হইতেছে বোধ হয় ঢেঁকি, তাঁত ইত্যাদি হস্তচালিত যন্ত্র।

ভারতবাসীর এই দুর্নাম মোচন করিয়াছেন বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর অসাধারণ যন্ত্র-উদ্ভাবন-পটুতা বিজ্ঞান-জগৎকে চমৎকৃত ও প্রশংসমান করিয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ছাড়া আর-একজন ভারতবাসী যন্ত্র-উদ্ভাবনে মৌলিকতা দেখাইয়া পাশ্চাত্য যন্ত্র-বিদ্বান-দিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তাঁর নাম শঙ্কর আবাজী বীজে। ইনি মহারাষ্ট্রীয়। এঁর বিবরণ পূর্ব্বে প্রবাসীতে আমরা প্রচার করিয়াছি। সম্প্রতি বীজে ছাপাখানা সংক্রান্ত নানাবিধ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি টাইপ-ঢালা এক যন্ত্র গড়িয়াছেন, যাতে ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম টাইপ ইচ্ছামত অনায়াসে ঢালাই করা চলিবে। এই যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তিনি গত ১১ই আগষ্ট নিউ ইয়র্কের ন্যাশানাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ইন্‌ভেণ্টর্স্ নামক উদ্ভাবক-সমিতির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন—এই সমিতির সদস্য বিশ্ববিশ্রুত ইটালিয়ান মার্কনী অতার টেলিগ্রাফের উদ্ভাবক, ইংরেজ মেজর-জেনেরাল সুইণ্টন যুদ্ধগাড়ী ট্যাঙ্কের উদ্ভাবক, আমেরিক সাইমন লেক আমেরিকার সাব্-মেরিন বা ডুবো জাহাজ উদ্ভাবক। সুতরাং বীজে মহাশয় এঁদের সমকক্ষ উদ্ভাবক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৮৯৫ সালে তিনি দৃষ্টিবিভ্রম-উৎপাদক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বৈজ্ঞানিকদের মন প্রথম আকর্ষণ করেন। ১৮৯৭ সালে চূর্ণ বস্তু ওজন ও বিতরণ করিবার তুলা উদ্ভাবন করিয়া ১৮ জন য়ুরোপীয় প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিয়া পুরস্কার অর্জ্জন করেন। ১৮৯৯ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি নানাবিধ বিজ্ঞাপন-প্রচারক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এঁর প্রথম কারবারে স্বর্গীয় দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতি অংশীদার ছিলেন। এখন টাটা কোম্পানী শ্রীযুক্ত বীজের উদ্ভাবনগুলির অংশীদার হইয়া লণ্ডনে কারবার ফাঁদিতেছেন। ১৯০৯ সালে যখন একবার তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন মহারাষ্ট্রে তাঁর বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হয় এবং মান্দ্রাজে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত মুধলকার এঁর কৃতিত্বের পরিচয় প্রচার করেন। শঙ্কর আবাজী বীজে মহাশয়ের জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে; সুতরাং এখন তাঁর বয়স ৫৩।৫৪ বৎসর।

দেশী সূতা ও দেশী সূতার কাপড়।

আমরা নিম্নে মুদ্রিত পত্রখানি পাইয়াছি—

"এজেলায় স্থানে স্থানে হাতে কাটা সুতা পাওয়া যায়। ঐ সুতায় কাপড়ও কিছু কিছু তৈয়ার হইতেছে। আমি সুতা ও কাপড়ের বহুলপ্রচলন জন্য চেষ্টা করিতেছি। ২০ নং হইতে ৩০ নং সুতা পাওয়া যাইতে পারে। কাপড়ও শীঘ্রই দিতে পারিব আশা করি। কাহারও আবশ্যক হইলে আমার নিকট লিখিতে পারেন।

আবুছর রশিদ খাঁ,
নোয়াখালী।"

আপদ-বিদায়

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌজন্যে।

ব্যর্থা

(গী দ্য মোপাসঁ হইতে)

আমার বন্ধু বুড়ো ডাক্তার বনেট অনেক দিন থেকেই আমায় রায়োঁতে যেতে লিখেছিলেন, কিন্তু কাজের ভিড়ে অনেক দিন তাঁর ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেবার-বার শীতের শেষে রায়োঁতে যাওয়া ঠিক করলাম। এক-দিন আধা-কোয়াসা-ঢাকা সকাল বেলায় রায়োঁর প্লাটফরমে নেমে দেখি আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর ডগ্‌কার্ট্‌খানা চড়ে মাইলটাক দূরে বাড়ীতে পৌঁছোলাম। এক পেয়ালা কাফি খেয়ে নিতেই আমার বন্ধু বলে উঠ্‌লেন, "চল, জায়গাটা দেখ্‌বে চল।"

ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ, মাঝে মাঝে দুচারখানা বাড়ী, তাদের আশেপাশে ফল-ফুলের বাগান, সবই বেশ লাগ্‌ছিল। একটা বুড়ো ওক-গাছের পেছনে একখানা বাড়ীর কাছে থেমে আমার বন্ধু বল্‌লেন, "দাঁড়াও, আমি একটি রোগীকে দেখে এক্ষুনি আস্‌ছি।" এই বলে তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন।

বাড়ীখানা দেখ্‌তে একটু অদ্ভুত রকমের, চেহারাটা বড্ড গম্ভীর, অনেকটা পোড়ো বাড়ীর মত। একটু লক্ষ্য করে বুঝ্‌লাম যে এ-বাড়ীর একটাও জানালা নেই, দেওয়ালের মাঝে মাঝে ফুটো। বাড়ীখানা দেখে মনে হতে লাগ্‌ল যে এখানে এমন কেউ আট্‌কা থাকে যাকে বাইরের কাউকে দেখ্‌তে দেওয়া হয় না। ডাক্তার ফিরে এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। তিনি একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, "আন্দাজটা অনেকটা ঠিকই করেছো। এ বাড়ীর বন্দিনীকে আর কোন দিন বাইরের কাউকে দেখ্‌তে দেওয়া হবে না। বেচারী একেবারে পাগল, আর বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে নেই বল্‌লেই চলে। এর কাহিনী যদিও চিকিৎসাবিদ্যাসংক্রান্ত, তবু বোধ হয় তোমার মন্দ লাগ্‌বে না। শুনবে?" আমি রাজী হওয়ায় তিনি বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

* * * *

বিশ বছর আগে আমি যখন প্রথম ডাক্তার হয়ে আসি, এ বাড়ীর কর্ত্তা আমার হাতে তাঁর মেয়ের চিকিৎসার ভার দিলেন। মেয়েটির বয়স সাত-আট বৎসর, কিন্তু দেখ্‌তে বড্ড বাড়ন্ত। বেচারী এত বয়সেও কথা কইতে শেখেনি। সেই হচ্ছে তার ব্যারাম। হাঁট্‌তে শিখেছিল সে খুবই কম বয়সে। কিন্তু কথা বল্‌তে পার্‌ত না দেখে সবাই তাকে কালা মনে কর্‌ত। কিন্তু দেখা গেল সে কালা নয়—কারণ কোন জোরে শব্দ হলেই সে চম্‌কে উঠ্‌ত। শুন্‌তে সে ঠিক-মতই পার্‌ত। পরীক্ষা করে দেখ্‌লাম যে তার এই বাক্‌শক্তিহীনতার কারণ আর কিছুই নয়—মস্তিষ্কের পরিণতির অভাব।

ক্রমে ব্যর্থা বড় হতে লাগ্‌ল, কিন্তু কথা কিছুতেই ফুট্‌ল না। আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাকে ওষুধ দিতে লাগ্‌লাম, কিন্তু কোন ফল হল না। প্রথমে সে কেবল তার ধাত্রীকে চিন্‌ত, কিন্তু তাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুলিয়ে গেল। মাকে চেনা দূরে থাকুক, "মা" এ-কথাটিই মুখে আন্‌তে পার্‌ত না। কখন কখন সে কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ত—কিন্তু তা অর্থহীন শব্দ বই আর কিছুই নয়। তবে তাকে এক বিষয়ে একটু পরিণত দেখ্‌তাম—সেটা হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তার ভাবের সামঞ্জস্য। পরিষ্কার দিনে সে পাখীর মত আনন্দে শব্দ কর্‌ত; আবার বাদ্‌লার দিনে তাকে কি যেন অজানার জন্য কাঁদ্‌তে দেখা যেত। সূর্য্যের আলো তার ঘরে ঢুক্‌লে সে হাততালি দিয়ে লাফাত।

শেষে আমি অন্য উপায়ে তার বুদ্ধি পরিণত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। খেতে বস্‌লে আর তার জ্ঞান থাক্‌ত না—দিন রাত খেতে চাইত। খাওয়ার সময় কখন্ আসে মনে করে সে এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক্‌ত যে ক্রমে খাবারের ঘণ্টা চিনে ফেল্‌লে। তখন আমি তাকে ঘড়ীর কাঁটা কোথায় গেলে খাওয়া হয় তাই দেখিয়ে দিলাম। এম্নি করে সে ঘড়ী দেখ্‌তে শিখ্‌ল। তখন তার কাজই হল কেবল ঘড়ীর দিকে দৃষ্টি রাখা। কখন্ কোন্ ঘড়ীতে কটা বাজ্‌লে খাওয়া হয় এটা সে খুবই ভাল রকমেই বুঝেছিল। একদিন একটা ঘড়ীর বাজার স্প্রিং খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেটা আর বাজেনি।

ক্রমোন্নতি বা জীবের অভিব্যক্তি।" (৪) আদর্শ। এই জাতীয় জাগরণের যুগে নারীর জীবনযাত্রার আদর্শ কি হইবে? জাতীয় শোভাযাত্রার আদর্শ কি হইবে? জাতীয় শোভাযাত্রার সহযাত্রিণীকে বিশ্বভাবের সহিত পরিচিত হইয়া আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। (৫) ভদ্রতা। "ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক, ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ,—এবং উভচর।" "ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, তার ফুল সংযম।" এই ভদ্রতা সমাজ-জীবনে "অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।" (৬) গ্রীস ও রোম। এটি একটি ফরাসী ইতিহাসের এক অংশের অনুবাদ। গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও সভ্যতার মূল তত্ত্ব ও পরিণতি আলোচিত হইয়াছে। (৭) পাটেল-বিল। বাদী প্রতিবাদী সকল পক্ষের যুক্তিতর্ক আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু লেখিকার মতে বাহিরের চাপে ভেদ কখনো ঘুচিবে না। "বাইরের চাপে বিদেশের শিক্ষায় আমাদের কতকগুলো বাধা ভেঙ্গেছে, কতক-পরিমাণ চৈতন্য জন্মেছে—এক হবার, স্বাধীন হবার, উন্নত হবার দিকে একটা তাড়না ও প্রেরণা এসেছে। বাকিটা কি নিজের ভিতর থেকে হবে না? হিন্দুসমাজ কি বুঝবে না যে ভেদের কাল গিয়েছে, সাম্যের দিন এসেছে? কেউ আর অধীন থাকতে চায় না; কারণ 'সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে'।" "রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন রাজার কাছ থেকে স্বরাজ চাচ্ছি, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও—যে এতদিন মূক ছিল সে ভাষা শিখেছে, যে বধির ছিল সে শুনতে পাচ্ছে, যে অন্ধ ছিল সে আলো দেখেছে, যে পায়ের তলায় পড়ে ছিল সে উঠে বসতে চাচ্ছে; এই বেলা যদি উচ্চ জাতি পুরাতন কৃত্রিম ব্যবধান সরিয়ে ফেলে আপনি নেমে আসে ও সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে যায়, সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে, অসার পদমান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ত ভাল,—তাদেরই পক্ষে ভাল; নইলে অচিরে তাদের মান ধূলোয় লুটবে, সেই সঙ্গে প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। এখনই ত তাই ঘটছে; এখনই ত হিন্দুসমাজ মৃতপ্রায়। কেবল বহিষ্করণ, কেবল তিরস্করণ, কেবল জাতিঃপাত ও দলাদলি করে' ভাল লোক, শিক্ষিত লোক, কৃতী লোককে বর্জ্জন করতে থাকলে কদিন হিন্দুসমাজ টিকবে, কাকে নিয়ে দশজনের মধ্যে একজন হবে?—সঙ্কীর্ণতা দূর করুক, কড়াকড় নিয়ম শিথিল করুক; কিসে হিন্দুয়ানীর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব তাই বিচারপূর্ব্বক রক্ষা করুক; যাতে তার ক্ষয়ক্ষতি, যা কালের অনুপযোগী, উন্নতির বিরোধী, তাই বর্জ্জন করুক;—তবে ত জাত গেলেও জাতি রক্ষা হবে।" এবং এইজন্য শিক্ষিত যুবকদের সহধর্ম্মিণী লাভ করিতে হইবে, তা তিনি স্ববর্ণিনী বা অসবর্ণিনী যাই হোন।

এই বইখানিতে ভাবিবার ও পালন করিবার মতন অনেক গুরু ও উপাদেয় উপদেশ পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আছে। নারীর উক্তি নারীরা পড়িয়া দেখিয়া উপকৃত হইলেই সমাজ গৃহস্থালি পরিবার দেশ সকলকে উপকৃত করিবেন সঙ্গে সঙ্গে—কারণ ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজ ও দেশের উন্নতি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বর্ণনাচাতুর্য্য ও রং ফলাইবার বাহাদুরী আছে—কিন্তু এই গুণই দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; নানা রূপক অলঙ্কার পদোদ্ধার ইত্যাদির অরণ্যে আসল কথা প্রায়ই আড়াল পড়িয়া গিয়াছে—মূল বক্তব্যের ধারাটি চোখের সামনে দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু তা না থাকিলেও পড়িতে ক্লেশ বা মন্দ লাগে না, অলঙ্কার কথাও সুন্দর করিয়াই বলা হইয়াছে। কথা-গুলি সাধারণ অল্পশিক্ষিতা নারীদের পক্ষে একটু গুরুপাক; তবু সকল নারীর ইহা পড়িয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানবের আদি জন্মভূমি—শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত, ২ শঙ্করঘোষের লেন, কলিকাতা। ডিমাই আটপেজি ৪৯০+১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগজের মলাট ২৷৷০ ও বাঁধানো ৩৲ টাকা।

পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় বৈদিক সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন। ৪৫ বৎসর গভীর গবেষণার ফল এই মূল্যবান পুস্তক। পণ্ডিত বিদ্যা-রত্ন মহাশয় এই পুস্তকে দেশী বিদেশী বহু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের মত ও অনুসন্ধান-ফল আলোচনা প্রতিবাদ বা সমর্থন করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের তন্ন তন্ন বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন—সমগ্র মানবজাতি এক মানবদম্পতির সন্ততি; যে দেশে প্রথম মানবসৃষ্টি হয় তাকেই বেদে পিতৃভূমি বলা হইয়াছে। আদি পিতামহের নাম বিরাট, তিনি মেরু পর্ব্বতের অধিবাসী ছিলেন; এই মেরু পর্ব্বতকে বিদ্যারত্ন মহাশয় মঙ্গোলিয়ার আল্‌তাই পর্ব্বত বলিয়া সমাস্ত করিয়াছেন; স্বর্গ নরক অন্তরীক্ষ ভূ ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ প্রভৃতি লোক সমস্তই পৃথিবীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ—পৃথিবীবহির্ভূত কোনো স্থান বা কাল্পনিক নাম মাত্র নয়;—দ্যৌ মঙ্গোলিয়া, পৃথিবী বা ভূ ভারতবর্ষ, ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী তুরস্ক পারস্য—আফগানিস্তান, স্বর্লোক তিব্বত তাতার মঙ্গোলিয়া, মহর্লোক দক্ষিণ সাইবেরিয়া, তপোলোক মধ্য সাইবেরিয়া, সত্য বা ব্রহ্মলোক উত্তর সাইবেরিয়া, জনলোক চীন। এইসব লোক বা দেশের একখানি ম্যাপও আছে। দেবলোক যদি পৃথিবীতে, তবে দেবতা ও মানুষ একই। মঙ্গোলিয়া হইতে দেবতা বা মানুষ ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর সকল দেশে গিয়া বাস করে; পিতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইবার পথই দেবযান বা পিতৃযান—এ দুই শব্দ পারলৌকিক ব্যাপার বোধক নয়। স্বর্গে অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ায় দেবগণের মধ্যে অর্থাৎ অবিভক্ত মানবসমাজে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে তারা নানা দিগ্‌দেশে ছড়াইয়া পড়ে ও আর্য্য নাম গ্রহণ করে; ভারতবাসী মানবেরা সুর ও অসুর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, এবং সুরাসুর যুদ্ধের ফলে অসুরগণ পরাজিত হইয়া অন্তরীক্ষে পলায়ন করে। এই আদি মানবসমাজের ভাষা ছিল দেবভাষা বা সংস্কৃত। এইজন্য জগতের সকল জাতির ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—জুড়িয়া—যাদব; জু—যদু; স্যাক্‌সন—শকসুনু; জর্ম্মন—শর্ম্মন; টয়টন টিউটন—দ্যুতান; আফগান-ঈ-স্তান—অপোগ-স্থান; প্যালেষ্টাইন—পল্লীস্থান; ইস্‌রাইল—আর্য্য; সিথিয়া—শকাব-সথ; আর্‌মেনিয়া—আর্য্যরম; আর্‌মেনিয়ান—আর্য্যমানব; পিরামিড—পুরীমঠ; আলতাই—ইলাস্থায়ী; মঙ্গলিয়া—(মঙ্গ শব্দের অর্থ আকাশ) আকাশসম্বন্ধীয়; ইত্যাদি। এই পুস্তকে বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শব্দসাদৃশ্য দেখিয়া কাহাকেও জ্ঞাতি বিবেচনা করাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিতব্য অভিমতের প্রতি অত্যধিক মমতা ও পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়াছে; এইরূপ অভিমত টেকসই নয় বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত। সাধারণেরও উচিত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার উৎসাহদাতা হওয়া। এই বই ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া বিলাতী প্রকাশকদের দিয়া প্রচার করিলে বিদেশের সুধীসমাজে সমাদর হইতে পারে।

—মুন্সীরাক্ষস।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৭

৩য় সংখ্যা

পুরুষ ও নারী

নারীও মানুষ, পুরুষও মানুষ—প্রথমে গোড়ার এই ঐক্য স্বীকার করিতে হইবে; উভয়কে সমান ভাবে এই সত্য বুঝিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে সুবিধা সুযোগ স্বাধীনতা দিতে হইবে। কিন্তু তারপরে দেখিতে হইবে উভয়ের পার্থক্য, একই মানুষ হইলেও বিভিন্ন আধারের জন্য মানুষ-ধর্ম্ম দুই জনের মধ্যে দিয়া দুই ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে কি রকমে। পুরুষের শিক্ষাসাধনা আর নারীর শিক্ষাসাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন করা চরিতার্থ করা, কিন্তু তাই বলিয়া উভয়ের পন্থা পদ্ধতি ভঙ্গী রীতি সবই যে একরকম তাহা নয়। জগতের একত্ব যেমন সত্য, জগতের বৈচিত্র্যও তেমনি সত্য; বরং এক দিক দিয়া দেখিলে আমরা বলিতে পারি বৈচিত্র্যটাই জগৎকে জগৎ করিয়াছে, পার্থক্যের বিশেষত্বের মধ্যেই সৃষ্টির রহস্য ও সার্থকতা। অনেক সময়ে সব একাকার আমরা করিয়া ফেলি, একত্বের ঐক্যের উপলব্ধির জন্য নয়, কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য, আলস্যবশতঃ—যাহাতে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না, সৃষ্টির নিগূঢ় উদ্দেশ্যও সফল হয় না। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, পুরুষ ও নারীর প্রত্যেকের বিশেষত্ব কোথায়, মানুষসত্তার পুরুষই কোন্ ভাব কোন্ অঙ্গ, আর নারীই বা কোন্ ভাব কোন্ অঙ্গ?

মানুষের আছে দুইটি ভাগ—এক জ্ঞান আর এক শক্তি, মানুষ চাহে জানিতে ও করিতে। মানুষের যে আর একটা ভাগ—প্রেম—তাহা ঐ দুইটির একটির সঙ্গে হইয়া মিশ্রিত হয়, উহারই সহায়ে উহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহা খেলিয়া চলে; অথবা প্রেম অর্থাৎ আনন্দ যেন আছে জ্ঞানের ও শক্তির পিছনে, উভয়কে ধরিয়া স্থিত রহিয়া—আনন্দাৎ হি এব খল্বিমানি।—জ্ঞানের প্রকাশ মনঃশক্তিতে, ইহার ক্ষেত্র বা কেন্দ্র মস্তিষ্ক; শক্তির প্রকাশ প্রাণে, ইহার ক্ষেত্র— যোগের ভাষায়—মণিপুর। আমরা বলিতে চাই, পুরুষ হইতেছে জ্ঞান, আর নারী হইতেছে শক্তি।

পুরুষের সহজ স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা অথবা কেন্দ্রীকরণ মস্তিষ্কে, নারীর সহজ স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা অথবা কেন্দ্রীকরণ প্রাণে। ভারকেন্দ্রের এই আশ্রয়স্থানের বৈষম্যের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ আমরা দেখি, পুরুষ যেন পৃথিবী হইতে কতকটা বহিঃ-প্রকাশ হইতে কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, নারী যেন তাহাদের সাথে আছে নিকটতর ঘনিষ্ঠ নাড়ীর সম্বন্ধেই। পুরুষের মধ্যে সাংখ্যোক্ত পুরুষের সাক্ষী-ভাব সহজই ফুটিয়া উঠে, নারী কিন্তু যেন স্বয়ং প্রকৃতি। প্রকৃতির ধর্ম্মেই নারী ভরপুর, তাই সরসতা সজীবতা ভোগের মর্ম্ম নারীর অযত্নসিদ্ধ কৃতি—নারীর লাবণ্য মাধুরিমা, নারীর সম্মোহনী শক্তি এই প্রাণশক্তিরই ছন্দের তরঙ্গ, এই প্রাণ-শক্তিরই বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। প্রাণশক্তি হইতে দূরে

পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, প্রাণশক্তির এইসকল ঐশ্বর্য্যকে পাইতে হইলে পুরুষকে ফিরিয়া আবার বিশেষ যত্ন চেষ্টা কৃচ্ছ্রসাধনা পর্য্যন্ত করিতে হয়।

জগতের জীবনের জিনিষের উপর নারীর যেমন দখল আছে, পুরুষের তেমন নাই। মস্তিষ্কের জ্ঞানবুদ্ধির কাজ জিনিষকে বুঝা হইতে পারে, কিন্তু জিনিষকে চালাইয়া লওয়া শক্তির কাজ। সাজাইতে গুছাইতে, পরিপাটি করিয়া চালাইতে নারীর দক্ষতা অদ্ভুত। জিনিষের সাথে তাহার আছে কি একটা নিগূঢ় মিল, নারীর হাতে জিনিষ সহজে আপনা হইতেই যেন সাজিয়া-গুজিয়া উঠে। পুরুষ হয় ত দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যথাযথ প্ল্যান একটা দিতে পারে, কিন্তু সেটাকে কার্য্যে পরিণত করা বা সেই ধরণের একটা কিছু বাস্তবে গড়িয়া তুলা কাজে নারীর মত সুপটু পুরুষ নয়। পুরুষ যদি সে রকম করিতে চায় তবে তাহাকে জোর এমন কি জবরদস্তি করিতে হয়, স্থূল শরীর মাংস-পেশীর বিক্রম তাহাকে দেখাইতে হয়। ফলতঃ মাথায় তাহার ভার বলিয়া পুরুষকে যেন পায়ের উপর বেশী জোর করিয়া দাঁড়াইতে হয়—মস্তিষ্কের বুদ্ধিবিচারের আকার ও প্রকার পুরুষেরই বস্তু, তাই প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অথবা প্রয়োজনের দরুন পুরুষ পাইয়াছে শারীরিক বল—মোটা অস্থি, দৃঢ় মাংস, কঠিন পেশী। মনের বুদ্ধির জগৎ হইতে সে যখন কর্ম্মজগতে ফিরিয়া আসে তখন তাহার ভরসা এইসকল। নারীর কিন্তু এসকলের তেমন প্রয়োজন নাই। শারীরিক বল দিয়া জিনিষকে চালাইতে নারী চায় না—শারীরিক বলপ্রয়োগের মধ্যে আছে একটা কৃত্রিমতা, কর্ত্তা ও করণে একটা দ্বন্দ্ব, দ্বৈধভাব। পুরুষের মস্তিষ্ক পুরুষের প্রাণশক্তিকে তরল করিয়া পুরুষকে বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক করিয়া দিয়াছে—নারীর প্রাণশক্তি কিন্তু নারীকে বস্তুর সহিত সংযুক্ত করিয়াই রাখিয়াছে; তাই সহজ সামর্থ্যে নৈপুণ্যে সে যাহা চালায়, পুরুষকে তাহা চালাইতে হয় গায়ের জোরে। স্থূলজগতের সহিত বুঝাপড়ার জন্য নেপোলিয়নকেও স্কুলে বসিয়া ব্যায়াম কস্‌রতাদি আগে অভ্যাস করিয়া লইতে হইয়াছিল—জান্ দার্ককে তাহা কিছুই করিতে হয় নাই। প্রাচীন কালে এমাজনরা যে এমন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ নারীর অদ্ভুত প্রাণশক্তির সহিত তাহারা শারীরিক বলও যোগ করিয়া দিয়াছিল।

নারীর চেয়ে পুরুষের শারীরিক বল বেশী হইলেও, নারীই শক্তি—আধ্যাত্মিক হিসাবে নয়, ভাবের রূপকের কবিকল্পনার দিক দিয়াও নয়, বাস্তবতার দিক দিয়াই। পুরুষ পাইয়াছে শক্তির কাঠাম, বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; কিন্তু নারীর আছে শক্তির ধারা, স্রোত—প্রাণ, আর এই প্রাণ আছে বলিয়াই বাহিরের কাঠামের উপর তাহাকে ভর করিতে হয় না। ভিতরের এই প্রাণ বা জীবনী শক্তিই তাহার দুর্ব্বল কোমল অঙ্গকেও কেমন অঙ্গে সমর্থ করিয়া তুলিয়াছে। তাই সময়ে সময়ে আমরা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাই যে যে-সব পরিশ্রমের কাজ পুরুষদের অভ্যাসের ফল, পুরুষেরা মনে করে তাহাদেরই একচেটিয়া, সে-সব কাজ আমাদের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীরা প্রয়োজন হইলে কেমন অবলীলা-ক্রমে করিয়া ফেলিতে পারে।

পুরুষের শক্তিতে অর্থাৎ শক্তির প্রকাশে, কাজের মধ্যে চঞ্চলতা বেশী; নারী কিন্তু সেখানে বেশী ধীর স্থির। পুরুষের মধ্যে প্রাণশক্তির ভাণ্ডার কম বলিয়া তাহা যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে, উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে—নতুবা পথ প্রকৃতির চাপের সাথে সমান তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। নারীর সে ভাণ্ডার পূর্ণতর বলিয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করার মধ্যে আছে তাহার একটা নিস্তব্ধতা, একটা সংযম, একটা নীরব নিবিড় শক্তিপ্রয়োগ। পুরুষের মধ্যে প্রাণশক্তির শারীর কোষের যত ওলট-পালট যত অপচয় বিপর্য্যয় পরিবর্ত্তন চলিতেছে, নারীর তাহা হয় না। পুরুষের মধ্যে খরচের দিকটা (katabolism) বেশী, নারীর মধ্যে জমার দিকটা (anabolism) বেশী। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, পুরুষ হইতেছে active, আর নারী হইতেছে passive—এই জন্যই নারীর মধ্যে জগতের যৌবনভাব যেমন প্রতিফলিত, পুরুষের মধ্যে তেমন নয়। এই জন্যই আবার নারী যেমন স্বভাবতঃ স্থিতিশীল সংস্কারবশবর্ত্তী, পুরুষ তাহা নয়। পুরুষের চঞ্চল প্রাণ তাহাকে প্রতিনিয়ত

চারিদিকে নিত্য নূতনের দিকে প্রধাবিত করিতেছে, আর তাহার মস্তিষ্কের নিত্য নূতন ভাব চিন্তাও এই কাজের প্ররোচক হইয়া উঠিয়াছে। নারীর ভরা প্রাণ-শক্তি আপনার যথাযোগ্য খাতের মধ্যে ধীরে এক ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিতে চাহিতেছে। তাই দেখি, সামাজিক বিষয়ে হউক, ধর্ম্ম বিষয়ে হউক—আদর্শ বা নীতি বিষয়ে হউক, নারীর মধ্যে প্রাচীনের শক্তি যেমন সহজ আশ্রয় পায়, সেখানে জমাট বাঁধিয়া উঠে, পুরুষের মধ্যে তাহা তেমন হয় না। নূতন কিছুর প্রবর্ত্তক পুরুষই বেশী হইয়াছে—নারী অনুসরণ করিয়াছে শুধু।

কিন্তু শান্ত নদীতেও বান ডাকে, শুষ্ক প্রাণেও জোয়ার আসে; বিশেষতঃ সে নদী সে প্রাণ যদি ভরা থাকে তবে সে বান সে জোয়ারও তেমনি বিপুল হইয়া উঠে। ফলতঃ দেহে স্থলে প্রকাশে নারী যতই প্রশান্ত (passive) হউক না কেন, তাহার প্রাণের সাগরে বহুল চটুল ঢেউএর যতই অভাব হউক না কেন, দেহের ঠিক অপর দিকে ভিতরে, প্রাণেরই মধ্যে আছে যে একটা বিপুল টান, একটা স্তিমিত চঞ্চলতা তাহার কাছে পুরুষের বাহ্য চাঞ্চল্য কিছুই নয়—এ যেন মেঘনার জলের মসৃণপ্রায় পৃষ্ঠ, প্রথম যে দেখে সে আশ্চর্য্য হয় মেঘনাকে লোকে এমন ভীতিপ্রদ মনে করে কেন, কিন্তু সেখানের মাঝিরা জানে ঐ আপাতদৃশ্যমান শান্ত মসৃণতার নীচেই কি ভীষণ তোড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাকাইয়া পাকাইয়া চলিয়াছে আর আকাশে মেঘ দিয়া একটু বাতাস উঠিলেই তার আসল প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হয়। নারীও প্রায় এই রকম। পুরুষের বাহ্যিক চাঞ্চল্য বিক্ষোভ নারীতে তেমন নাই, কিন্তু নারীতে আছে একটা বেগ, একটা তোড়, যাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা অনেক বেশী, আর সব সময় উহা প্রচ্ছন্নও থাকে না। এখানে যদি আলোড়ন পড়ে তবে দুই কূল ভাসাইয়া সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সে চলিয়া যায়—পুরুষ অপেক্ষা নারী ঢের বেশী বিপ্লবসাধক হইয়া পড়ে। ফুলের ঘায়ে নারী মূর্চ্ছা যায়, কে বলে? ঘোর কর্ম্মে নারীর আনন্দ পুরুষ ধারণাও করিতে পারে না—পুরুষ যাহাতে শিহরিয়া উঠে নারী তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে ভাবিতে পারে, নিষ্কম্প হৃদয়ে করিতে পারে। লেডি ম্যাক্‌বেথ শুধু কবিকল্পনা নহে। প্রাচীন রোমে নারী দর্শকেরাই মহানন্দে গ্লাডিয়েটারদিগকে উৎসাহ দিত, স্পেনে সে দিন পর্য্যন্ত নৃশংস বৃষযুদ্ধ দেখিবার জন্য নারীবৃন্দই ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িত। আবার ভালর দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, খৃষ্টের প্রথম শিষ্য—মহম্মদের প্রথম শিষ্য—নারী। দুর্দ্দিনে খৃষ্টের একাধিক শিষ্য খৃষ্টকে পরিহার করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কোন নারীশিষ্যের মনে এ চিন্তাও উঠে নাই। শ্রীরাধিকা নারী বলিয়াই দুই কুল হারাইতে পারিয়াছিলেন, কলঙ্কের পসরা অম্লানবদনে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন,—লজ্জাহীনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে লজ্জাই ভূষণ যার সেই নারী।

নারীর কাজ, তাহার সহজ ধর্ম্ম হইতেছে 'চওয়া'। নারী যে জিনিষ স্পর্শ করে, সে জিনিষকে সে আপনার সাথে মিলাইয়া মিশাইয়া লইতে চায়—তাহার মধ্যে আপনাকে সে নিঃশেষ ঢালিয়া হারাইয়া ফেলিতে চায়, তাহাকে আপনার মধ্যে গ্রাস করিতে, অঙ্গের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে চায়। গ্রাস করিয়া হউক, আপনাকে হারাইয়া হউক, পুরুষ কিন্তু জিনিষের সাথে এ রকম ভাবে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে—জিনিষটি 'হইয়া' যাইতে পারে না। জিনিষ হইতে—সে জিনিষ তাহার যত আপনার যত অন্তরের হউক না কেন—পুরুষ যেন থাকে কেমন তফাতে; আপনাকে ভিন্ন করিয়া জিনিষকে দূরে রাখিয়া তবে জিনিষের সাথে সে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করে। পুরুষ যেন জিনিষ হইতে ততখানি চায় না, যতখানি চায় জিনিষকে দেখিতে, জানিতে তাই দেখি পুরুষের মধ্যে, প্রাণের তোড় যত কমিয়াছে, তত বাড়িয়াছে ভিতরে একটা উদাসীনতা নির্লিপ্ততা একটা উদারতর ধীর দৃষ্টি। এইদিক হইতে পুরুষই passive, নারী active; নারী জিনিষকে পাইলে যেমন আঁকড়িয়া ধরে, পুরুষ ধরে আল্‌গা আল্‌গা ভাবে। যে জিনিষকে নারী ধরিয়াছে, তাহার দৃষ্টি তার মধ্যেই নিবদ্ধ, সেখানেই সে একরকম অন্ধ; পুরুষ কিন্তু একটা জিনিষ ধরিলেও, তাহার দৃষ্টি আরও বাহিরের জিনিষকে

সেইসঙ্গে আলিঙ্গন করিতে চায়, ধরিয়াছি যাহা তাহার সহিত ধরি নাই যাহা তাহার একটা সম্বন্ধও সে খুঁজিতে চলে। নিষ্ঠা জিনিষটি নারীর সহজ ধর্ম্ম ও আদর্শ।

নারীর প্রতিষ্ঠা প্রাণে বলিয়া নির্লিপ্ততা তাহার পক্ষে কিছু কঠিন, আর পুরুষের পক্ষে প্রতিষ্ঠা মস্তিষ্কে বলিয়া তাই এই নির্লিপ্ততা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প-কলা-সৃষ্টিকার্য্যে এই রকম একটা নির্লিপ্ততা অতীব প্রয়োজন, ভিতরের এই নির্লিপ্ততাই শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা। আপনার ভাবের আবেগের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া ভাসাইয়া দিলে সেই ভাবের সেই আবেগের পুনঃসৃষ্টি সম্ভব নয়। বলা হয়, কবিরা সকলে insincere—কিন্তু এ কথার বেশ অর্থ আছে। শুধু ভাবের ভাবুক হইলে কবি হয় না, সেই ভাবকে ফিরিয়া আবার দেখা চাই; এই ফিরিয়া দেখার দরুন ভাবের যে স্বাভাবিক প্রাথমিক অবিকৃত অখণ্ড রূপ তাহা সম্পূর্ণ বজায় থাকে না, যেখানে জাগিয়া উঠে একটা লীলার, অভিনয়ের ভাব—অর্থাৎ যদি বলিতে চাও, বলিতে পার কৃত্রিমতা (insincerity)। কিন্তু এই রকম কৃত্রিমতা ব্যতীত শিল্পসৃষ্টি হয় না। নারীজাতির মধ্যে বহু শিল্পীর উদ্ভব হয় নাই, তাহার একটা প্রধান কারণ, আমরা মনে করি এই যে, নারী হইতেছে স্বভাব-প্রকৃতি, নারীর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই, নারীর সত্তা সহজ সরল অখণ্ড একমুখী। নারী আপনাকে ভাগ করিতে পারে না, প্রাণময় সত্তা তাহার সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া ভরিয়া নিরেট করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রাণময় সত্তার সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ কর্ম্মরচনায়; কিন্তু জ্ঞানরচনায় চাই পুরুষের আত্ম-বিভাজন-ক্ষমতা, আপনাকে আপনার বাহির করিয়া দূরে ধরা। প্রাণের ধর্ম্ম গতি—চলা, সম্মুখেই চলিয়া যাওয়া; জ্ঞানের মধ্যে আছে একটা স্থিতি—ফিরিয়া দেখা, দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করা।

পুরুষ-কবির যদি কিছু অভাব হয় তবে তাহা দেখি এই প্রাণের ক্ষেত্রে, জ্ঞানে ততখানি নয়; নারী-কবিতে সতেজ প্রাণের আবেগের অভাব হয় না, অভাব যদি হয় তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে। শুধু কাব্যসৃষ্টি কেন, সমস্ত জীবন সম্বন্ধেও পুরুষ ও নারীর পক্ষে এই কথাই খাটে। The spirit is willing but the flesh is weak—এটা পুরুষের কথা; নারীর spirit প্রাণ যদি willing ইচ্ছুক হয় তবে তার flesh দেহ কখনও weak দুর্ব্বল থাকে না।

পুরুষের অন্তরাত্মার, তাহার চেতনার বা জ্ঞানের যে আত্ম-বিভাজন-ক্ষমতা, তাহাই দেখা দিয়াছে আবার তাহার তর্কবুদ্ধিতে। Intellectualism বুদ্ধিমত্তা জিনিষটা পুরুষেরই, নারীর নয়। পুরুষের জ্ঞানের পথ, আর নারীর জ্ঞানের পথ,—দুইএ পার্থক্য আছে। পুরুষের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা মস্তিষ্কেই—চিন্তা হইতেছে সে জ্ঞানের উপকরণ, উপায় হইতেছে বিচার বিতর্ক। জিনিষকে আলাদা করিয়া সাম্‌নে ধরিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তবে সে জ্ঞান আহরণ করে। নারী কিন্তু জিনিষ সম্বন্ধে জ্ঞান পায়, জিনিষের প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া দিয়া, জিনিষের সহিত একীভূত হইয়া —এ যেন একটা সহজাত সংস্কারের মত। স্থূল ইন্দ্রিয় যে ভাবে জিনিষের পরিচয় পায়, সাক্ষাৎস্পর্শের ফলে—নারীও তেমনি জিনিষের জ্ঞান পায় একটা অন্তরের সাক্ষাৎস্পর্শের ফলে। পুরুষ সত্যকে পাইবার জন্য চলে ধীরে ধীরে, চারিদিকের সঙ্গতি রাখিয়া রাখিয়া, সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধান্তে; অন্ততঃ সত্যকে এ ভাবে না পাইলে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় এই ভাবে। নারীর পক্ষে সত্যের প্রমাণ একটা নিবিড় অনুভব, একটা প্রাণের স্পর্শ। বের্গসন তাঁহার ইনটুইশনকে একপ্রকার সহানুভূতি (sympathy) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নারীর জ্ঞানের পথ এই sympathy বা Instinctive intuition—প্রাণের ধারার সাথে প্রাণের ধারার একটা সহজ সংযোগ।

তাই দেখি শুধু জানার জন্য জানা, যাহার প্রয়োজন কিছু নাই, যাহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বা সম্পর্ক কিছু নাই এমন বিষয় বা বস্তু লইয়া মস্তিষ্ক চালনা করা নারীর ধাতে নাই। যে জিনিষ নারীর প্রাণ স্পর্শ করে নাই, সে জিনিষের প্রতি নারী দৃষ্টিপাতও করে না, তাহার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ উদাসীন। পুরুষের কিন্তু তাহা নয়; প্রাণের সাথে কোন সম্বন্ধ নাই, এমন জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করাতেও তাহার তর্কবৃত্তির অথবা জিজ্ঞাসুভাবের তৃপ্তি হয়। পুরুষের আছে বুদ্ধির একটা উদারতা, জগতের বিশ্বের সব জিনিষেরই উপর তাহার রশ্মিপাত সে করিতে চায়; কোন জিনিষই

যেন তাহার পর নয়। কিন্তু নারীর প্রাণের বাহিরের জিনিষ নারীর একেবারে পর। পক্ষান্তরে জিনিষ একবার এই প্রাণের ভিতরে পড়িলে তার সম্বন্ধে নারীর সমস্ত সত্তাটি প্রখর সজাগ হইয়া উঠে,—সমস্ত কৌতূহল অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, বুদ্ধিবৃত্তি খেলে একটা তীব্র সংহত বেগে—সে বিষয়ে সহজ তীক্ষ্ণদর্শিতার ফলে এতখানি সে জানিয়া ফেলে যে পুরুষের হাজার উদারদর্শিতাও অবাক্ মানিয়া যায়। পুরুষ কথা বলে মুখে মুখে, নারী কথা বলে প্রাণে প্রাণে ;—মুখের কথা ছড়াইয়া থাকে ছড়াইয়া পড়ে বহুবিষয় লইয়া ; প্রাণের কথা যায় তলের দিকে, অল্পপরিসরের মধ্যে, কিন্তু ভিতরের সাথে জড়াইয়া জড়াইয়া।

নারীর হইতেছে প্রাণের সম্বন্ধ, সুতরাং বস্তুগত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। নারীর ভাবনা চিন্তা চলে বস্তুকে ধরিয়া, রূপ বা মূর্ত্তির আশ্রয়ে। পুরুষ যেমন বস্তুকে হারাইয়া অথবা সরাইয়া শুধু তত্ত্ব লইয়া থাকিতে পারে, নারী কিন্তু সে রকম abstraction লইয়া থাকিতে পারে না, নারী চায় concrete জিনিষ। তত্ত্বকেও ধরিতে বুঝিতে হইলে সে দিবে একটা বিশেষ রূপ, তত্ত্ব যতক্ষণ প্রাণান্বিত হইয়া বাস্তব উদাহরণে না দেখা যাইতেছে ততক্ষণ সে তত্ত্ব তাহার কাছে অস্পষ্ট কুহেলিকার ধাঁধাঁর মত বোধ হয়। বস্তুর মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে জীবনের মধ্যে স্থাপন করিয়া সত্যকে তথ্যকে নারী সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে ; এই রকম জীবন্ত ভাবে যে দার্শনিক জিজ্ঞাসা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই নারীর মস্তিষ্কে স্থান পায়। পুরুষের পক্ষে বস্তু, ঘটনা, বিশেষ বিষয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শুধু excuse—ছুতা, গৌণ অবলম্বন মাত্র; সুবিধা পাইলেই এসকলকে ছাড়িয়া ছাড়াইয়া সে চলে সাধারণ সূত্রের দিকে। শাস্ত্র পুরুষের রচনা হইতে পারে, কিন্তু নারীর ঝোঁক প্রয়োগের উপর।

আর নারী চায় ব্যক্তিগত সম্বন্ধ—আপনার সাথে, নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে মিলাইয়া তবে জিনিষকে ধরিতে বুঝিতে শিখে। এইজন্য এক দিকে তাহার জ্ঞান বুদ্ধি যেমন হয় সজীব বস্তুতন্ত্র, কিন্তু তাহার উপর পড়িয়া যায় একটা নিজের, গণ্ডীর ছাপ। পরের ভাব পরের চিন্তা পরের সৃষ্টিভঙ্গী নারীর পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন—নিজেরই চোখ দিয়া যাহা দেখে তাহা সবখানি রাঙাইয়া তোলে, পরের চোখ দিয়া দেখিতে সে চায় না। নারী হইতেছে Lyric soul - গীতিকাব্যে তাহার প্রতিভা অনেক সহজে ফুটিতে পারে, কিন্তু নাটকের বহু চরিত্রের বহুল দৃষ্টি-ভঙ্গী দেখাইতে তেমন সুপটু সে নয়। নিজত্বকে, বা 'আমি'কে বিলোপ করিতে, ভুলিয়া যাইতে—অন্ততঃ কল্পনায়—পুরুষ যতখানি অনায়াসে পারে, নারী তাহা পারে না। পুরুষের অহমিকা সমস্ত জগৎকেই আপনার করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়। নারী চায় জগতের বিরুদ্ধে আপনার অহমিকাকে দাঁড় করাইতে, আপনার জিনিষকে জগৎ হইতে কুড়াইয়া ছিনাইয়া আনিতে। পুরুষ বিশ্বকে কেন্দ্র করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, নারী আপন আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বপ্রতিষ্ঠা করে।

অথবা নারী হইতেছে যেন কেন্দ্র-মুখী শক্তি আর পুরুষ হইতেছে কেন্দ্র-বিমুখী শক্তি। সমাজ সংসার তাই নারী-কেই কেন্দ্র করিয়া, মধ্যে রাখিয়া, চারিদিকে গড়িয়া সাজিয়া উঠিয়াছে। নারীর স্পর্শেই মানুষের সঙ্ঘ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শুধু পুরুষ লইয়া সঙ্ঘ হয় না—যদিই বা হয় তবে কষ্টেসৃষ্টে, জোর করিয়া, বিধি-বিধানের বাঁধনে ধরিয়া আঁটিয়া রাখিয়া। পুরুষের সঙ্ঘের প্রেরণা কেমন ছড়িয়া-ছুড়িয়া উধাও হইয়া চলা, বিশৃঙ্খল অতিমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারের দিকে, নির্ব্বাণের দিকে। নারীকে ধরিয়া সঙ্ঘ সমাজ সংসার আপনা হইতেই সহজে স্বভাবতঃই তৈয়ারী হইয়া ফুটিয়া উঠে। নারীর যেন আছে একটা ভারের দিক (gravitation),—নীচের দিকে, পৃথিবীর দিকে,—স্পষ্ট স্ফুট জাগ্রত বাস্তবের দিকে তাহা চলে ; আর পুরুষের আছে যেন একটা পাতলা দিক, তাহা চায় উঠিতে (levitation), হাওয়ার দিকে চলিতে।

নারীর মাতৃত্ব—সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা—নারীর মূর্ত্ত প্রকৃতি, নারীর সবখানি নারীত্বের প্রতীক। ভাবের চিন্তার তত্ত্বের জন্ম পুরুষ দিতে পারে, কিন্তু নারীর হইতেছে সজীব বস্তুকে জন্ম দেওয়া। পুরুষের কাজ মানস সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু নারীর কাজ দেহ সৃষ্টি। জীব-আত্মাকে পুরুষ হয়ত জাগাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাকে নামাইয়া আনিতেছে, তাহার আকার রচিয়া দিতেছে নারী। পুরুষ হইতেছে হিরণ্যগর্ভ—তাহার

ভিতরে খেলিতেছে সৃষ্টির স্বরূপ, সৃষ্টির নানা ধারা, যাবতীয় সম্ভাবনা; কিন্তু নারী হইতেছে জাগ্রত বিরাট, প্রকৃতি-মাতা—বাহিরে রূপের মধ্যে কতকগুলি ধারাকে সম্ভাবনাকে বাছিয়া বাস্তব মূর্ত্ত করিয়া ধরিতেছে।

পুরুষের টান তাই ধ্যানের দিকে, নারীর টান প্রকাশের দিকে। নারী চায় ঐশ্বর্য্য, বিভূতি; নারী হইতেছে শ্রী। যাহা শক্তিতে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নারীর প্রাণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট; নারীর আনন্দও শক্তিকে স্বাস্থ্যকে সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরা। দৈন্য জিনিষটি নারীর মনে খাপ খায় না। দীনহীন পুরুষকে সহ্য করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু দীনা হীনা নারী অতি বিসদৃশ দৃশ্য। যাহা সহজ সাধারণ আড়ম্বরশূন্য, পুরুষের স্বাভাবিক অন্তর্মুখীনতা তাহাতেই ভাল শোভা পায়। কিন্তু নারীর প্রতিভা ফুটিয়া উঠে জাঁকজমকের মধ্যে—বর্ণের ছটায়, ছন্দের ঝঙ্কারে, শব্দের মূর্চ্ছনায়, অলঙ্কারের ঘটায়। ভূষণে ভূষণে আপন শ্রীকে চমকপ্রদ করিয়া তোলা যেন নারীর অধিকার। তাই বুঝি গৌরী পাইয়াছিলেন মণ্ডনের উপর মণ্ডন—সা মণ্ডনান্মণ্ডনমন্বভূৎকুং; মহাদেব কিন্তু সপ্তমাতৃকার দেওয়া প্রসাধনগুলি স্পর্শ করিলেন মাত্র, গ্রহণ করিলেন না—তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট তাঁহার স্বভাবদত্ত বেশ—স এব বেশঃ।

পুরুষের বৈচিত্র্য চিন্তায় উপলব্ধিতে, নারীর বিচিত্রতা জীবনে অনুভবে। তাই পুরুষের খামখেয়ালীর মধ্যে একটা নিয়ম পাওয়া যায়—There is a method in his madness—অন্ততঃ তাহা ধরিতে খুব বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু নারী কি একটা নিত্য নূতন ছন্দে রাগে খেলিয়া রাগিয়া উঠিতেছে, তাহা একটা সুনির্দ্দিষ্ট রেখায় টানিয়া দেখান যায় না। পুরুষ ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ হইয়াই যেন বলিয়া উঠিয়াছে—false as the sea। প্রকৃতপক্ষে এই অনৃত একটা বহুল বৈচিত্র্যেরই প্রকাশ—সেই যে

Age cannot wither her, nor custom stale
Her infinite variety.

পুরুষালি ধরণধারণে কেমন একটা ছাপ আছে ন্যায়-শাস্ত্রের সূত্রকে মানিয়া চলা—এক দিকে তাহা যেমন স্পষ্ট স্ফুট দৃঢ়, আর এক দিকে তেমন গ্রন্থীবদ্ধ আড়ষ্ট জড়। মেয়েলি ধরণের আছে কিন্তু লীলায়িত গতি এলায়িত লাস্য, তেমনি আবার একটা ঘোরালো একটা জটিল একটা দুর্ব্বোধ্য কি। রবীন্দ্রনাথের মেয়েলি প্রতিভা আর ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের পুরুষালি প্রতিভার তুলনা আমরা এই প্রসঙ্গে করিতে পারি। পুরুষ যাহা গড়ে সাজায় তাহা যেন সে করে মাপিয়া জুখিয়া, সজাগ থাকিয়া;—নারীর গড়িবার সাজাইবার ভঙ্গিমায় পাই কিন্তু সজীব পদার্থের (organic) অচেতন বা অর্দ্ধচেতন বিকাশ বিন্যাস। পুরুষের হইতেছে বিচারবুদ্ধির পদ্ধতি, আর নারীর হইতেছে প্রাণের অনুভবের পদ্ধতি।

এই প্রাণের অনুভব-শক্তির সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা (sensibility) নারী-প্রকৃতিরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম। নারীর প্রাণের তারগুলি—স্নায়ু-মণ্ডলী যেন মাজা ঘষা, ঝক্‌ঝক্ তর্‌তর্ করিতেছে, সহজে তাহাতে মরিচা ধরে না, সাড়ার গতায়াত তাহার মধ্য দিয়া বিনা আয়াসে অবলীলা-ক্রমে চলিতেছে, ভিতরের বা বাহিরের একটু ধাক্কাতেই নড়িয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পুরুষের স্নায়ুতন্ত্রী যেন অনেকটা স্থূল, অনেকটা নিরেট (rigid), তাহার আটঘাট তেমন খোলা নাই (clogged), তাই সেখানে দরকার একটু বেশী-পরিমাণ ধাক্কা, সেখানে খরচ করিতে হয় বেশী চেষ্টা বা প্রয়াস। নারী সূক্ষ্মজগতের সহিত সহজে সংযুক্ত হইতে পারে। সূক্ষ্মজগতের প্রভাব তাহার উপর খেলিতে তত বাধা পায় না—পুরুষ অপেক্ষা নারী ভাল psychic medium.

কিন্তু নারীরা এই রকম সহজে সাড়ার বশ বলিয়া, কতকগুলি বিশেষ সাড়ার মধ্যেই সে বশীভূত হইয়া পড়ে, স্নায়ুতন্ত্রীগুলি আগেভাগে যেসব স্পর্শ বা ধাক্কা পাইয়াছে সেই অনুরূপই হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি বাঁধা প্রতিক্রিয়া (set reactions) তাহার মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ নূতন স্পর্শ তাহাকে পীড়া দেয়, নূতনকেও সে পুরাতনের খাতে ঢালিয়া দিতে চায়। পুরুষের স্নায়ু এই রকম সহজে অভিভূত হইয়া পড়ে না বলিয়া তাহা বহু ও বহুল দিকে উন্মুখ, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত জিনিষকেও এক সাথে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে।

নারীর সত্তা নিবিড় তীব্র (intense), আর পুরুষের সত্তা বিস্তৃত উদার (wide)। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি নারীর একটা বিশেষত্ব হইতেছে বিচিত্রতা (variety); কিন্তু সে বিচিত্রতা বিষয়ের বিচিত্রতা ততখানি নয়, যতখানি ধরণের বিচিত্রতা—তাহাতে রেখার বৈচিত্র্য ততখানি নাই, যতখানি আছে রঙের বৈচিত্র্য। পুরুষের কৌতূহল যত বিষয় হইতে পারে তাহা লইয়া খেলে; নারীর কৌতূহল খেলে একটা সীমার মধ্যে, তাহার প্রাণের সাথে যাহার সঙ্গতি হইয়াছে এমন জিনিষের মধ্যে। কিন্তু পুরুষ জিনিষের উপর রঙ চড়াইতে তেমন পটু নয়, সে জিনিষ দেখে গ্রহণ করে সাদা-মাঠা ধরণে; নারী যেটুকু জিনিষ ধরে তাহাকে রঙে রাগে খেলাইয়া ফলাইয়া ধরে। তারপর নারীর কৌতূহল হইতেছে বস্তু লইয়া, বস্তুর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিনাটি (details) লইয়া; সেইজন্য বস্তু বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নারীর প্রাণে নারীর চোখে যেন দাগ বসাইয়া জাগ্রত জলন্ত হইয়া দেখা দেয়। পুরুষ বস্তুকে বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দেখিলেও, চায় সে-সকল ছাড়াইয়া উঠিতে, চলিতে চায় তত্ত্বের দিকে সম্বন্ধের দিকে।

পুরুষ- ও নারী-সত্তার, জগতের, মানুষের দুই দিক। এই দুইটি দিক শুধু পরস্পরকে ছুঁইয়া দুইমুখী হইয়া যে দাঁড়াইয়া আছে তাহা নয়—একটি গোলক বস্তুকে আধাআধি কাটিলে যেমন হয় তেমন কিছু নয়। নারী ও পুরুষ একটি রেখা অনুসারে, একটি ধারায়, একটি স্তরে (plane) স্পর্শ করিয়াছে শুধু, তা ছাড়া তাদের সবই বিভিন্ন, বিপরীত—এই ধারণাটিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা বিষম বিচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে, সমাজের গোলমাল এইখান হইতেই উঠিয়াছে। পুরুষ ও নারীর সত্তা দুইদিক হইতে দুইটি বস্তুর জোড়া যোগ নয়—উহারা দুই জনে যুক্ত হইয়া আছে, কিন্তু মিলিয়া মিশিয়া ওতপ্রোতভাবে। সব জিনিষ উভয়েরই মধ্যে আছে, তবে সেসকল জিনিষের প্রকাশের ধরণ ভঙ্গী বিভিন্ন মাত্র—পার্থক্যটি রঙের মধ্যে,—একজনের মধ্যে একটা রঙ গাঢ়, অন্যজনের মধ্যে সে রঙটি একটু তরল, এই কেবল। তাহা হইলেও এই পার্থক্যটুকুই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। জগতের বৈচিত্র্য বুঝিতে হইলে ধরিতে হইলে, খুঁজিতে হইবে আলোছায়ার (shade) মধ্যে। সৃষ্টির নানায় ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্তরাত্মার এই সূক্ষ্ম আলোছায়াসম্পাতে, চোখের গড়নে নয়, কিংবা চাহনির ভঙ্গিমায়। স্থূলে সহজ দৃষ্টিতে যে পার্থক্য দেখিতে পাই সেটা মোটা কথা, সত্য-মিথ্যায় জড়ান। প্রকৃত সত্য হইতেছে সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম সত্য অনুসারে যতদিন পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন শিক্ষা দীক্ষা প্রতিষ্ঠান না গড়িয়া তুলি, ততদিন পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধে থাকিবে জোড়াতাড়ি, সমাজও টলিতে থাকিবে একটা মিথ্যা বা অর্দ্ধসত্যের উপর দাঁড়াইয়া।

আমাদের মনে হয় নারী হইতেছে জীবনের—জীবনীশক্তির—প্রতিরূপ, আর পুরুষ হইতেছে মনের—বুদ্ধিশক্তির—প্রতিরূপ। নারীর মধ্যে সব জিনিষই জীবনের পরিপূর্ণতার সার্থকতার—কর্ম্মের দিকে প্রধাবিত, পুরুষের সব জিনিষ পরিসমাপ্তি পায় জ্ঞানে। পুরুষ হইতেছে তাপঃ শক্তি, নারী হইতেছে হ্লাদিনীশক্তি; নারী পৃথিবী, পুরুষ স্বর্গ। জগতের মধ্যে একটা যে বিবর্ত্তন বা ক্রমপরিণাম চলিতেছে তাহা জড় হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; পশুর ক্ষেত্র প্রাণকে ছাড়াইয়া মানুষ এখন মনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। মনের যে আপন যে বিশেষ ধর্ম্ম তাহা বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানুষের পুরুষ জাতির (অথবা পুরুষ ভাবের) মধ্যে—পুরুষ যেন মানবিকতার চরম সীমায় ঠেলিয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে। কিন্তু এই চরমে পৌঁছার প্রেরণা ও প্রলোভনে পাছে মানুষ তাহার নীচের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাই নারীর উদ্ভব। পুরুষ নীচের পূর্ব্বতন স্তরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু নারী সেই রূপান্তরে পূর্ব্বতনের সত্যকে মিলাইয়া একটা অনন্ত জীবন্ত কিছু সৃষ্টি করিতেছে। পুরুষ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চলিয়াছে, নারী তাহাকে নিজের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই নীচের দিকের টানকে অনেকে হয়ত কুনামে অভিহিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সত্যকার সত্যকে উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়। পুরুষ ও নারীর নিত্যসম্বন্ধ প্রয়োজন—মানুষ যাহাতে ব্যোম ও

পৃথিবীকে যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, যাহাতে সে হইতে পারে—True to the kindred points of Heaven and Home.

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা

আদ্যশিক্ষার মূল।

কেহ কেহ বলিবেন, শিক্ষার যে আদর্শ ধরিতেছি তাহা উত্তম বটে, কিন্তু কোথায় পাইব। দেশ দরিদ্র; টাকা কোথায়? সে শিক্ষক কোথায়? এমন প্রস্তাব চাই, যাহা দেশের পক্ষে সম্ভব। আমি বলি, প্রথমে মানস (ideal) স্পষ্ট করি, তাহার পর বাস্তব। এক বৎসরে, দশ বৎসরেও এই মানস পূর্ণ হইবে না। ইহার পরিবর্তনও উত্তরোত্তর অনুভূত হইবে। তথাপি বাস্তু কর্ম আরম্ভের পূর্বে যেমন তাহার একটা মানসচিত্র রচিতে হয়, নতুবা পরে তাহার সমুদয় অংশের প্রয়োজনের মিল থাকে না, তেমনই শিক্ষা-সৌধের অঙ্গ-পরম্পরা একত্র না দেখিলে গুরু-লঘু যোগ্য অযোগ্য বুঝিতে পারা যায় না। এখন দেখিতেছি, শিক্ষা-সৌধের পোত শীর্ণ, মাথা ভারী হইয়া পড়িয়াছে, গাছের ডগা হইতে শিকড়ে রস নামিতে হইতেছে। প্রথম প্রথম এইরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল। কারণ তখন দেশ-শিক্ষার কথা উঠে নাই; উঠিলেও অসাড় দেশে কথাটা কানে প্রবেশ করিত না। এখন সে দশা গিয়াছে, নিম্ন হইতে উন্নত সোপান রচিবার সময় হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিদ্যালয় ইংরেজী ধরণের।

শিক্ষা, বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে। আরও বিশেষ করিবার নিমিত্ত 'আলয়' ও 'শালা' শব্দদ্বয় একটু পৃথক পৃথক পথে প্রয়োগ করা যাইতেছে। যেখানে কর্ম প্রধান সেখানে 'শালা'; এবং যেখানে পাঠ প্রধান সেখানে 'আলয়' শব্দ যোগ করা হইতেছে। প্রচলিত নামের মধ্যে 'পাঠশালা' নামটিতেও এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। পূর্বকালের গ্রামের পাঠশালায় পঠন অল্প হইত, শিক্ষা—কর্মে অভ্যাস—অধিক হইত। এখনও তাই হয়। কিন্তু পরে যে-সব 'বিদ্যালয়' হইয়াছে, 'বঙ্গ [redacted]লয়' হউক, 'ইংরেজী বিদ্যালয়' হউক,—সে-সবে পাঠশালার ক্রিয়াভ্যাস হ্রাস পাইয়াছে। বিদ্যালয়ে ১০টা হইতে ৪টা পঠনাদি হয়। রবিবারে রবিবারে বিশ্রাম হয়। সেখানে বেঞ্চি চেয়ার টেবিল অনেক, এবং সাধারণতঃ 'শিক্ষক' বলিলেও বঙ্গ বিদ্যালয়ে 'পণ্ডিত', এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ে 'মাষ্টার' 'লেক্‌চারার' 'প্রফেসর' প্রভৃতি বিদ্যা অর্পণ করেন। অর্থাৎ 'আলয়'গুলিতে ইংরেজী ধরণ স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষাশালা দেশীয় হইবে।

ইংরেজী ধরণের সবই মন্দ, তা বলি না। কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া দেশীয় ধরণ যত রাখিতে পারা যায়, তত ভাল মনে করি। দেশীয় ভাব আমাদের সাধ্য হইয়া গিয়া ইহাকে হঠাৎ পরিবর্তন করিলে দেশের প্রা[illegible] বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। পশ্চিম দেশের উত্তম জ্ঞান চাই; কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, পশ্চিমদেশীয় পাত্রে সে জ্ঞান-বারি পান না করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। দুই দিক দিয়া এই মন্তব্য বুঝিতে হইবে,—(১) আন্তর, (২) বাহ্য। দেশ হইতে যে বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিক্ষা লাভ হয়, সেটি দেশীয়। এটি সহজে সাধ্য হয়। আমরা বলি, বালক-বালিকারা চারি পাশে যাহা দেখে, তাহা ধরিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করা প্রশস্ত। কাজে কিন্তু প্রায়ই বিপরীত দেখি। বহির লেখা দেখিয়া দেশে দৃষ্টান্ত খুজি। ক্রিয়াটা আন্তর হইতে বাহ্যে চলিয়া যায়। নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক হইতে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দিতে পারা যায়। পুস্তক-লেখক নিজে যে ভাবে শিখিয়াছেন, হাজার সতর্ক হইলেও তাঁহার কৃত পুস্তকেও সে ভাব চলিয়া আসে। এমন 'ভূগোলবিবরণ' দেখি নাই যাহার আরম্ভে ভূ যে গোলাকার, তাহার চতুর্বিধ প্রমাণ লিখিত হয় নাই; এমন 'পাটীগণিত' দেখি নাই যাহার আরম্ভে 'সংখ্যা' ও 'একক' ও 'গণিত' সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয় নাই। (তবে, 'পাটী' কেন বলে তাহার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। বোধ হয় ইংরেজী arithmetic শব্দের মধ্যে 'পাটী' আবিষ্কৃত হয় নাই।) সে যাহা হউক, বিদ্যালয়ে

যাহা চলুক, শিক্ষাশালায় এই বিধি একেবারে অসঙ্গত হইবে। ইতিহাসে ও বিজ্ঞানে, কলা ও বার্তায়, সকল বিষয়ে ভোক্তা বা 'আমি'র প্রয়োজন প্রধান লক্ষ্য হইবে। যে বিদ্যায়, যে জ্ঞানে 'আমার' প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নাই, তাহা শিক্ষাশালায় বর্জ্জন করিতে হইবে।

সবাই জানি, ইংরেজী পাঠের এমন গুণ যে ছেলে-মেয়েরা 'বাবু' হইয়া পড়ে। ছেলেকে জুতা চাই, জামা চাই, ছাতা চাই; মেয়েকেও কিছু কিছু মেম সাজিতে হয়। কেন হয়, কে জানে। কিন্তু শৈশব হইতে নূতন পরিচ্ছদে সাজিতে সাজিতে অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং যৌবনের চাপল্যের সহিত যুক্ত হইয়া দেশের সমক্ষে উপহাস মনে হয়। এখন দেখি, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার অর্থ অট্টালিকানির্ম্মাণ, চেয়ার-বেঞ্চি-টুল প্রভৃতি পশ্চিম দেশের নানাবিধ গৃহোপ-করণের সমাবেশ। এমন ক্ষেত্রে পালিত হইলে কোন্-ছেলে তাহার অনুরক্ত না হইয়া পড়িবে? আমাদের দেশের পক্ষে, বিদ্যামন্দিরের এই আদর্শ, বিদ্যা-সেবকের সভ্য আদর্শ, সম্পূর্ণ নূতন। আমরা বাড়ীতে জামা গায়ে জুতা পায়ে টেবিলের ধারে চেয়ার বা বেঞ্চিতে বসি না, আমাদের সুধা-ধবলিত অট্টালিকাও নাই। সরস্বতীর মন্দিরে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য স্পৃহণীয় কি না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা ঠিক, ধনশালী জাতি আমাদের শিক্ষাবিধাতা না হইলে আমরা হয়ত দো চালায় তুষ্ট হইতাম, এবং অট্টালিকা নির্ম্মাণের পয়সা দিয়া ছাত্র পালন করিতাম। কিশোর ও যুবার পক্ষে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও কৃচ্ছ্রসাধন, দেশের হিত-জনক হইত। গোবর-নিকানা ঘরে যাহাকে বাস করিতে হইবে, গামছা কাঁধে ধুতি পরিয়া যাহার দিন কাটিবে, তাহার পক্ষে এই নূতন আদর্শ সমুদয় শিক্ষাকে কৃত্রিম করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষা দীক্ষা যেন বাহিরের কিছু; নিত্য-নৈমিত্তিকের কিছু নহে। পোষাক পরিয়া আফিসে যাই; বাড়ীতে পোষাক খুলিয়া স্বস্তি বোধ করি। কারণ আফিসটা আমাদের নয়। গ্রামে জমীদারী কাছারিতে, কিংবা গ্রামের 'ডাকে' (সভায়), সভ্য হইয়া যাইতে হয়, এক-ছোটে যাইবার জো নাই; কিন্তু দো-ছোট-টি নূতন নহে, হয় গামছা নয় চাদর। অথচ সে-সব সভার গাম্ভীর্য্যের ও সম্মানের কিছু মাত্র হানি হয় না শিক্ষাশালায় কেহ আসিয়া তামুক খাইয়া গেল; যাউক না, কোনও ক্ষতি নাই। কারণ গ্রামে তামুক এত চলিত যে তাহা নূতন দেখা হইবে না। কিন্তু জামা গায়ে গিয়া বসাই নূতন। তা ছাড়া, ছেলে-বেলা হইতে গায়ে রোদ জল বাতাস, চোখে আলো লাগাইয়া, দেহ দৃঢ় না করিলে বাঙ্গালী জাতি কোমলাঙ্গ হইয়া পড়িবে, কষ্টকর অর্থকরী কর্ম্মের যোগ্য হইবে না। মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; সকালে ও বিকালে, কিংবা কেবল এক বেলা শিক্ষাশালা খুলিলে জাতিটা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ হইতে রক্ষা পাইবে।

তা ছাড়া গ্রামের বালকবালিকা শিক্ষাশালায় সকালটা দিতে পারিবে না। মায়ের সঙ্গে মেয়ে ঘরকন্নার কাজ করে,—ইহাই ত শিক্ষা; বাপের সঙ্গে ছেলে চাষ খাটে, কলাকর্ম করে, কিম্বা দোকান-পাট দেখে—শিক্ষাই ত পায়। শিক্ষাশালার অর্দ্ধেক শিক্ষা বাড়ীতে পায়; কাজেই ছেলে মেয়ে দুই বেলাই শিক্ষা পায়।

ব্যায়াম শিক্ষা।

শিক্ষার দ্বারা মানসিক বৃত্তির পূরণ হইতে পারে কি না, কে জানে। তথাপি এমন শিক্ষা বাঙ্গালীর চাই যাহাতে বুদ্ধির সহিত ক্রিয়ার যোগ ঘটে, অভিমান ও নির্ভীকতা দ্বারা সত্যবাদিতা ও সত্যকারিতা দৃঢ় হয়, দেহের বল ও শ্রমশালতা বাড়িতে পারে।

দেহের বল-বৃদ্ধি ও জড়তা হ্রাস আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে। হয়ত বাঙ্গালীর অন্নের কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। শৈশবের ব্যায়াম, খেলা ও ছুটাছুটি; লাফালাফি ও অন্যান্য দুরন্তপনা। কিন্তু দশবর্ষ বয়সের পর হইতে একটু একটু ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া যৌবনে তাহা পূর্ণভাবে করিতে হইবে। বিনা উপকরণে ব্যায়াম সর্ব্বত্র সুলভ। মোটের উপর এই ব্যায়ামই ভাল। বলা বাহুল্য, হাঁটা-হাঁটি, দৌড়া-দৌড়ি, কিংবা খেলার একঘেয়ে অঙ্গ-কুঞ্চন ও প্রসারণ ব্যায়াম নহে। খেলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন ও ব্যায়ামের প্রয়োজন এক নহে। রণাভ্যাস (drill) উত্তম; কিন্তু

দেহের বল ও পুষ্টি, অঙ্গের নমনীয়তা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে আনুক্রমিক ব্যায়াম আবশ্যক। কেবল ব্যায়াম নহে; আত্মরক্ষার উপযোগী লাঠীখেলা ও তরবার চালনা শিক্ষাও চাই।

উদ্‌ভাবনাশিক্ষা।

শিক্ষার দ্বারা উদ্ভাবনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। চিত্রলেখন ও শয়শিক্ষা (শয়—হস্ত; manual training) ইহার আদি। চিত্রলেখন দ্বারা উপকল্পনা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, শয়শিক্ষা দ্বারা তাহার জড়মূর্ত্তি করিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বহু শিক্ষক চিত্রশিক্ষা ও শয়শিক্ষার প্রতি প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা মনে করেন, সময়ের অপব্যয়। সে সময়ে দুইটা অঙ্ক কষিলে, কিম্বা দুই পাত পড়িলে ছেলের উপকার হইত। মনে আছে যখন বঙ্গ বিদ্যালয়ে শয়শিক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন অনেক গণ্য মান্য দেশহিতৈষী ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ছেলে কি ধুচনী বুনিতে শিখিবে? আমি বলি, শুধু ধুচনী নহে, তালপাতা বা খেজুরপাতার চাটাই বুনিবে, বাখারী দিয়া খেলা-ঘর গড়িবে, কাগজের ঘুড়ী করিয়া উড়াইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি যথাসাধ্য সবই করিবে। আজ শিক্ষাকালে যে শয়শিক্ষা আরম্ভ হইবে, তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে অভিপ্রায়-কল্পনা (designing) ও মূর্তিনির্মাণে (modelling) দাঁড়াইবে। প্রথম প্রথম অনুকরণ চাই; মন ও চোখ ও হাতের একটু সহযোগিতা অভ্যাস হইলে আর অনুকরণ থাকিবে না, নির্মাণ চলিতে থাকিবে। চতুর শিক্ষক জানেন, অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ অভ্যাস হইতে পারে। আর, নির্মাণে যে ছেলের রতি জন্মিয়াছে, সে কাজের লোকও হইয়াছে। অভিরতি ও অভিনিবেশ দুই ভাই, যেন রাম ও লক্ষ্মণ। তখন চৌদ্দবৎসর বনবাস কিছু নয়, আর গাছ পাথর দিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনও কিছু নয়। তর্জ্জন করিলে, বেত দেখাইলে অভিনিবেশ অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়; অভিরতি জন্মিলে অভিনিবেশ আপনি আসে, আর নির্মাতা হইতে দিলে অভিরতিও চলিয়া আসে। যাহার অভিনিবেশ জন্মিয়াছে, তাহার শিক্ষার পথও খুলিয়া গিয়াছে। দুঃখ হয় আমরা ছেলেগুলাকে বাঁধিয়া পিষিয়া মারিতেছি। বড় হইলে বলি, 'তাইত, ইস্কুল কলেজ এতকাল খোলা হইয়াছে, দেশে উদ্‌ভাবনার চিহ্ন দেখা গেল না।' আমি বলি, অনেক কাল দোড়ী বাঁধিয়া রাখা গিয়াছে; এখন দোড়ী কাটিয়া একটু ছাড়িয়া দিয়া দেখা হউক না। দোড়ীর গুণ নাই এমন নহে; অনুকরণও শিক্ষার সহায়। তথাপি দৌড়াইতেও দেওয়া চাই। কোন্ দিকে কতদূর দেওয়া ভাল, দুঃখের বিষয়, তাহার লেখা-পড়া করিতে পারা যায় না।

নীক্ষক ও পাঠ্য পুস্তক।

যদি বা শিক্ষক পাই, তাঁহার নীক্ষকের (Inspector) উৎসাহ পাই না; নীক্ষকই বা কি করিবেন, তাঁহাকে শিক্ষাধিকারের (Education department) ঘর পূরণ করিতেই হইবে। ইহাও সত্য, ঘরপূরণ ব্যাপার না থাকিলে হয়ত অনেক শিক্ষক ও নীক্ষক নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেন। কারণ, দেশের লোক শিক্ষা-বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কিংবা কল্পনা-হীন। তথাপি মনে হয়, ইস্কুলের (ও কলেজের) ঘর মাপা ও বেঞ্চি গঠা কিংবা শিক্ষকের ও কর্ত্তৃপক্ষের দোষ ধরা কম হইলে শিক্ষার তেজ মন্দা হইত না। যে সময় নীক্ষক মহাশয় বালক-বালিকার বিদ্যা পরীক্ষা করেন, সে সময় তাহাদিগকে পড়াইয়া দেখাইলে শিক্ষকের দোষ সহজে সংশোধিত হইত। বঙ্গবিদ্যালয় ও ইংরেজী ইস্কুলে যে যে পুস্তক পাঠ্য বলিয়া ধার্য্য হয়, এবং বালক-বালিকার অভিরক্ষিতার নিকট অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, নীক্ষক মহাশয় স্বয়ং পড়াইয়া দেখাইয়া লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনা অনায়াসে খণ্ডন করিতে পারিতেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দোষ ঘটে না, এমন নহে। সে দোষ নিবারণের এই উপায় আছে। অন্য উত্তম উপায়ও আছে। পাঠগ্রন্থলেখককে ইস্কুলে লইয়া গিয়া পড়াইতে বলা। এই বিধি হইলে কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখক সাবধান হইতেন, অন্যকে দিয়া তাঁহার বই লেখানা বন্ধ হইত, এবং শিক্ষাধিকারও অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

মানুষের চারি বর্ণ।

বালকবালিকাদিগকে চারি ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। বক্তব্য লাঘব নিমিত্ত, 'ভাগ' না বলিয়া

'বর্ণ' বলি। কেহ ব্রাহ্মণ বর্ণ, কেহ ক্ষত্রিয় বর্ণ, কেহ বৈশ্যবর্ণ, কেহ শূদ্রবর্ণ। মিশ্রবর্ণ অনেক আছে, কিন্তু পঞ্চম বর্ণ নাই। আদ্যশিক্ষা কালে বালকের গুণাগুণ প্রকাশ হইতে থাকে। কোন্ বালক কোন্ বর্ণের তাহা বিচক্ষণ পিতা বিশেষতঃ শিক্ষক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বর্তমান শিক্ষানীতির দোষ এই, স্বাভাবিক বর্ণভেদ অস্বীকার করিয়া দেশের যাবতীয় বালককে ব্রাহ্মণ বর্ণের মনে করিয়া এক বিদ্যালয়ের এক বাঁধা পথে চালিত করিতেছে। এক বর্ণ লইয়া কোনও দেশ চলিতে পারে না; কোনও দেশে সকল বালক এক বর্ণেরও হইতে পারে না। দুঃখের কথা, দেশে ক্ষত্রিয় বর্ণের উপজীবিকা নাই। তাই কেহ ডাকাৎ হইতেছে, কেহ বা গ্রামে ও নগরে দুর্দান্ত পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। অন্য দিকে কেহ প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ণের হইলেও শূদ্রের দাস্য বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। যে শূদ্রবর্ণের, সে দাসত্ব করিলে তাহার পক্ষে ভাল, দেশের পক্ষেও ভাল। বৈশ্যবর্ণের শিক্ষা দেশে যাহা ছিল, তাহাই চলিতেছে। এই বর্ণের শিক্ষাই, অর্থকরী শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ এরূপ নহে যে, বিদ্যার সহিত সম্পর্ক থাকিবে না। আমার বিশ্বাস, অর্থকরী শিক্ষা হইতে বিদ্যা বিসর্জন করাতেই দেশের নূতন নূতন কারুশিক্ষা-শালায় শিক্ষার্থী জোটে না। বিদ্বান্ চাই; জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিদ্বান্ উৎপাদন করিতেই হইবে। বিদ্যার গ্লানি, ধর্মের গ্লানির তুল্য, দেশের মৃত্যুর লক্ষণ। বিদ্যাকে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যাকরী শিক্ষা, বার্তা বা কলা বা বাণিজ্য, এমন কি প্রজাসেবা ও রাজসেবা প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অর্থকরী শিক্ষা।

গুরুর শিষ্যত্ব।

পূর্বকালে ছিল, গুরুর শিষ্য না হইলে বিদ্যা হইত না। একালে সে সত্য খণ্ডিত হয় নাই, শিষ্যত্ব স্বীকার ব্যতীত কর্মজ্ঞান জন্মে না। বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ হইতে পারে; কিন্তু গুরু ব্যতীত শিক্ষিত হইবার উপায় নাই। অর্থকরী শিক্ষায় গুরু অবশ্য চাই। কাজ যত তুচ্ছ মনে হউক, শিষ্য হইতেই হইবে। কলা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিলেই কলা-প্রতিষ্ঠার সামর্থ্য জন্মে না। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে কলাতে দীক্ষিত করিবার বহু আয়োজন আছে, বিদ্যালয়ের যুবকদের অঞ্জনা কিছু থাকে না। তথাপি কোনও কলাস্বামী কলাবিদ্যালয় সমাবৃত্ত যুবককে নিজের স্থানে বসাইতে সাহসী হয় না। কর্ম না করিলে কর্মশিক্ষা হয় না। সে শিক্ষা বিজ্ঞান-শালায় হয় না, কলা শিক্ষাশালায় হয় না। বাণিজ্য সম্বন্ধেও এই কথা কলেজে বাণিজ্যবিদ্যা শিখিয়া বণিক্ হইতে পারা যায় না। অল্প ধনের কর্মে নিজের গুরু নিজে হইতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে প্রচুর ধৈর্য, ও একাগ্রচিত্ততা চাই; অর্থব্যয়ও আছে। ইহাও মনে রাখা কর্তব্য, বিদ্যাকরী শিক্ষায় গুরু পাওয়া যত সোজা, অর্থকরী শিক্ষায় তত সোজা নহে। কারণ, বিদ্যা "যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে"; আর কলা ও বাণিজ্য-জ্ঞান, "যতই করিবে দান তত যায় ক'মে।" কৃষিবার্তায় এমন নহে; আমার ভূমিতে দশ মণ জন্মিলে তোমার ভূমিতে উৎপন্ন কম হয় না। এই যে শিষ্যত্ব বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ শিষ্যত্ব, নীচের ধাপ হইতে শিষ্যত্ব—যে ধাপে কুলী মজুর কাজ করে। বিদ্যার গরিমা মাথায় থাকিলে এইরূপ শিষ্যত্ব স্বীকার সহজ হইবে না। এই কারণে প্রস্তাবিত শিক্ষাশালায় বাল্যকাল হইতেই বালককে কুলীর কর্ম করিতে হইবে।

বর্তমান ইংরেজী শিক্ষিতের দশা।

বিদ্যামহাপীঠের সমাবৃত্ত যুবকদের সাফল্যের আশা অল্প। ইহার প্রধান কারণ, যে যত পড়িয়াছে, সে নিজেকে তত ভুলিয়াছে, যে যত পড়ে, সে তত অজ্ঞ হয়। তাহার মস্তিষ্কের কুঠরী-গুলি পরের বিদ্যায় এমন পরিপূর্ণ থাকে যে, চিন্তার স্থান থাকে না। তাহার সর্জনা ও উদ্ভাবনা লুপ্ত হয়, সে কলের পুতুল হইয়া যাহা পড়িয়াছে তাহা আওড়ায়। পঞ্চতন্ত্রে যে পণ্ডিত-মূর্খের আখ্যান আছে, তাহা মিথ্যা নয়। তর্ক ও বিতর্কের আবর্তে পড়িয়া জ্ঞানের নৌকা ডুবিয়া যায়। কর্ণধারের ভূয়োদর্শন ও স্বয়ং-জ্ঞান অর্থকরী নৌকাকে রক্ষা করে। এই কারণে বলি, যদি বিদ্বান্ হইতে না চাও, যদি বিদ্যামহাপীঠের উচ্চ সোপানে উঠিবার সামর্থ্য

না থাকে, যদি অর্থই কাম্য হয়, তাহা হইলে বি-এ এম্-এ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কাল-ব্যয় ও অর্থ-ব্যয় করিবেন না। ব্যবসায়ীর (ব্যবসায়—industry) শিষ্যত্বে সে সময় সে অর্থ প্রয়োগ করুন। বেতন দিতে হইলে বেতন দিয়া,—লইয়া নহে, দিয়া,—শিষ্য হউন। তাহাও না জোটে, ব্যবসায়ীর কেরাণী হউন, সরকার হউন। বি-এ, এম্ এ হইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। উপাধির মোহ দুই দিনে কাটিয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে প্রাণরক্ষার উপায় অন্বেষণ স্বাভাবিক। প্রাণরক্ষার পর ধনসঞ্চয়ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমুদয় পৃথিবী পড়িয়া আছে, আপনার স্থান আপনাকেই করিয়া লইতে হইবে। ইহাও সত্য, তারা অগণ্য, চন্দ্র একটি। কিন্তু তারা হইয়াও মানব-জমীন্ আবাদে বাধা নাই। এই আবাদ ছাড়িলেই তারা নিবিয়া যায়, চন্দ্রেরও শশ-লাঞ্ছনা বিকট আকার ধারণ করে।

বিজ্ঞান-মহাপীঠ চাই।

কলিকাতা বিদ্যামহাপীঠে প্রবেশ না করিয়াও দেশ-পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য ইহাঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। ইহার বিপরীতও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। তবে দুঃখ হয়, যখনই নূতন বিদ্যা-মহাপীঠ স্থাপিত হইতেছে তখনই কলিকাতা বিদ্যা-মহাপীঠের মাত্র দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে। আদি পীঠ ব্যর্থ হয় নাই; এই পীঠ অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তা বলিয়া নূতন উদ্দেশ্য সাধনের, সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অন্য মহাপীঠ স্থাপনে ক্ষতি কি? মূর্ত বিজ্ঞান শিখাইবার নিমিত্ত মহাপীঠ চাই। ঢাকায় যে নূতন বিদ্যামহাপীঠ হইবে, তাহাকে মূর্তবিজ্ঞান-মহাপীঠ করিলে দেশের একটা বড় অভাব দূর হইত। দেশে টাকা নাই; তাহাতে একই উদ্দেশ্যে একেরই বহু সংস্করণে টাকার টানাটানিতে কোনটাই প্রসারিত হইতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতা বিদ্যা-মহাপীঠে এত কার্যবাহুল্য ঘটিয়াছে যে, বেড়া দিয়া ছোট করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই তর্ক ঠিক হইলে এত বড় ভারতবর্ষে এক বড়লাটের শাসন সুন্দর ভাবে চলিতে পারিত না। আসল কথা, আমরা নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারি না, ঈর্ষানলে পুড়িতে জানি। সে যাহা হউক, অর্থকরী শিক্ষার এক উচ্চাঙ্গে মূর্ত বিজ্ঞান আছে; তাহা অধিশিক্ষার আধার। যদি অন্য শিক্ষার আয়োজন হয়, তাহা হইলে অধিশিক্ষারও হইবে।

গুরুকুল।

আদ্য শিক্ষার সময় ছেলে-মেয়েরা অবশ্য বাড়ীতে থাকিবে। মেয়েদের মধ্যশিক্ষার কাল তাহাদের বাড়ীতে না হইলে চলিবে না। কিন্তু ছেলেদের পক্ষে গুরুগৃহ ভাল। এইরূপ, অন্ত্যশিক্ষা ও অধিশিক্ষার সময় গুরুগৃহ আরও ভাল। আমার বিবেচনায় মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত বিনা বেতনে অবশ্যক করিতে হইবে। ইহার হেতু পূর্বে দেখাইয়াছি। অন্ত্যশিক্ষা ও অধিশিক্ষার কালে গুরুগৃহে না থাকিলে ছাত্রেরা শিক্ষার সময় কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না, হয় শিক্ষার নয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। গুরুগৃহ কিংবা গুরুকুল নামে ডরাইবেন না, কিংবা প্রাচীনকালের গুরু-কুলও মানসনেত্রে দেখিবেন না। এখন ইস্কুল-কলেজের সঙ্গে Boarding house, hostel, mess আছে। এ-সব গুরুকুল বই আর কি, যদিও কুলপতি (superintendent) গুরু না হইয়া প্রায়ই রক্ষী মাত্র। গুরু ও শিক্ষকের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। গুরুর আসন বহু উচ্চে, যেখানে পিতামাতার আসন। শিক্ষকের আসন নিম্নে। শিষ্যকে গুরু মানুষ করিয়া দিবেন, ছাত্রকে শিক্ষক অভীপ্সিত বৃত্তিলাভের যোগ্য করিয়া তুলিবেন। গুরু পিতৃস্থানীয়, শিক্ষক মিত্রস্থানীয়। এই গুরুর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু তাঁহার দয়া ও দাক্ষিণ্য, সত্যতা ও ত্যাগিতা দ্বারা শিষ্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, এবং তাঁহার চরণে শিষ্যের মস্তক ভক্তিভরে নত হইবে। গুরুকে ধর্মপিতা বলিলে চলে। ইহাঁর স্থান যে সে লইতে পারেন না।

শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ।

এই গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে, এত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে; শিক্ষার ব্যয়, গুরুকুলের ব্যয় কে যোগাইবে? প্রশ্নে নৈরাশ্য আছে; কিন্তু উত্তর স্পষ্ট,—যাহার মাথাব্যথা তাহাকেই বৈদ্য খুঁজিতে হইবে, ঔষধ ও পথ্য তাহাকেই সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার মাথা-

ব্যথায় তোমার বেদনা হইবে না। যদি শিক্ষাই একান্ত আবশ্যক মনে কর, অন্য ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া অন্ততঃ বছর কতক চোখ-কান বুজাইয়া শিক্ষাকল চালাইয়া দেও। কারণ কথাটা অপ্রিয় হইলেও, না হইতে কদাচ কুত্রাপি হাঁ হয় নাই।

কাশিমবাজারের মহারাজার বিশ্বকর্মশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পেটাবেল সাহেব টাকার একটা উপায় দেখাইয়াছেন। আমি তাহা অনুমোদন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে উপায় দেশশিক্ষার আদ্যন্ত চলিবে না, স্থানবিশেষে বৃত্তিশিক্ষা-বিশেষে উত্তম চলিতে পারে। তাঁহার প্রস্তাবে ছাত্রেরা শিক্ষার ব্যয় নিজে নিজে উপার্জন করিবে। ছাত্রেরা নিজের হাতে চাষ করিবে, অন্নের যোগাড় হইবে; নিজের হাতে কাপড় বুনিবে, বস্ত্রের যোগাড় হইবে। কিংবা অন্য কিছু উৎপাদন করিয়া তাহার মূল্যে খাওয়া-পরা চালাইবে। কিন্তু দেশটা এতই দরিদ্র যে ইহাদের উৎপন্ন না পাইলে পিতামাতা ভাই-বইন খাইতে পান না। পূর্বেই বলিয়াছি, দেশময় শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ছাত্রদিগকে প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাশালায় ধরিয়া রাখা চলিবে না। তাহাদিগকে এক বেলা, বিকাল বেলা পাওয়া যাইবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে ধরিয়া রাখায় নিষ্ঠুরতা হইবে, ছাত্রদিগের আয়ু ও আরোগ্য নষ্ট হইবে। অতএব যে-সব ছাত্রকে পিতামাতার সংসারে সাহায্য করিতে হয় না, কেবল তাহারা পেটাবেল সাহেবের কল্পিত শিক্ষার ব্যয় কিয়দংশ যোগাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ ছাত্র হাজারে পাঁচজন পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। যে দেশ দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমগ্ন, তাহার উঠিবার শক্তি ও উপায় আবিষ্কার আদৌ সোজা নহে। আদ্যশিক্ষা কালে বালক-বালিকারা তেমন কিছু উপার্জন করে না; কারণ তখন তাহাদের শক্তি থাকে না। এই আদ্যশিক্ষার ব্যয় যোগাইতে পারিবেন না বলিয়া রাজকোষামাত্য এই শিক্ষা এতকাল অবশ্যক করেন নাই।

শিক্ষক।

শিক্ষকশিক্ষাও অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে না। এই শিক্ষক দুইপ্রকার চাই; গ্রামে গ্রামে জ্ঞানপ্রচার নিমিত্ত প্রদেষ্টা এবং শিক্ষাশালায় শিক্ষক। বরং শিক্ষকের কর্ম সহজ, প্রদেষ্টার কর্ম গুরুতর। গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে নিজ জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান বিলাইতে হইবে, লোকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক। যাঁহার আচারে ও ব্যবহারে সংযম অভ্যাস হইয়াছে, অথচ যিনি স্বদেশ-অভিমানী, এইরূপ লোককে কার্য (duties) শিখাইয়া দিয়া প্রদেষ্টা করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে "দেশে জ্ঞানপ্রচার" করিবার ধারা বর্ণনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহা আর বিস্তার করিব না। প্রদেষ্টার কি কি গুণ থাকিবে, কোন্ বিষয়ে কেমন জ্ঞান থাকিবে, কি ভাবে তাঁহার কার্য চলিবে, এসব ১৩২৪ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষের' প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলা গিয়াছে। * প্রদেষ্টাও দুই প্রকার; কেহ অটমান (itinerant), গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বাক্য দ্বারা, গীত দ্বারা, দ্রব্যপ্রদর্শন দ্বারা, চিত্র দ্বারা, যে জ্ঞান যাহাতে সুবিধা তাহাতে উপস্থিত করিবেন। কেহ দেশের হৃদয়স্থ হইয়া মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র পাঠাইয়া গ্রামে গ্রামে জীবন-রস সঞ্চালিত করিতে থাকিবেন। এই-সকল প্রদেষ্টা ও গ্রামের ও নগরের শিক্ষক দিগের মধ্যে নাড়ীর যোগ রাখিতে হইবে। নতুবা একদিকে প্রদেষ্টার কর্মে বিঘ্ন হইবে, অন্যদিকে রসের অভাবে শিক্ষকের জীবন শুখাইতে থাকিবে। শিক্ষকদিগের মধ্য হইতেই নীক্ষক নির্বাচিত হইবেন; কিন্তু নীক্ষক চিরদিন নীক্ষক থাকিবেন না, তাহাঁকে মাপ-জোঁখের কলে পরিণত হইতে দেওয়া হইবে না। কর্মের পরিবর্তন চাই; শিক্ষক কখনও নীক্ষক, নীক্ষক কখনও শিক্ষক, কখনও প্রদেষ্টা, কখনও গুরুকুলপতি, হইবেন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম যেমন দেহের স্বাস্থ্যের অনুকূল, চিত্তের বি-আয়াম তেমন চিত্তের সরসতার অনুকূল। বর্তমানে নীক্ষকের আগমনে শিক্ষকের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া যায়, অথচ উভয়ের পরস্পর সাহচর্য একান্ত আবশ্যক। শাসনের আধিক্যে পালন অন্তর্হিত হইলে অন্তরাত্মা শুখাইয়া যায়।

মধ্যশিক্ষিত যুবক এক বৎসর শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে

* তাহাতে একটা ভুল হইয়াছে—প্রদেষ্টা দশগ্রাম নয়, একশত চাই। কিন্তু বঙ্গদেশে এখন ছোট বড় নীক্ষক কত আছেন কেহ নাকি বলিয়াছিলেন ইস্কুল অপেক্ষা নীক্ষক বেশী। নীক্ষকের আধিক্য দেখিয়া এইরূপ মন্তব্য হইয়া থাকিবে।

আদ্যশিক্ষক হইতে পারিবেন। এইরূপ, অন্ত্যশিক্ষিত যুবক শিক্ষক-শিক্ষা পাইলে মধ্যশিক্ষক হইতে পারিবেন। এইরূপ অধিশিক্ষিত হইতে অন্ত্যশিক্ষক শিখাইয়া লইতে হইবে। ইহা পরের কথা। এখন বঙ্গ- ও ইংরেজী-বিদ্যালয় হইতে, পণ্ডিতশিক্ষালয় হইতে, শিক্ষক নীক্ষক প্রদেষ্টা প্রভৃতি বাছিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। ইদানীর শিক্ষা-প্রাপ্ত পণ্ডিত শিক্ষাশালার সকল কর্ম্মের যোগ্য হইবেন না। তাঁহার পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, তাঁহার শিক্ষা-কলা-জ্ঞানও থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি যে ভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার কর্মস্থানে সে ভাব পাইবেন না। ইহাতে অসন্তোষ জন্মিবে, এবং হয়ত দেশের পুত্রকন্যাকে সে অসন্তোষের ফল ভোগ করিতে হইবে। এই হেতু, ইহাঁকেও কিছুদিন নূতন শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। ইংরেজী ইস্কুলে ও কলেজের লব্ধ-বিদ্যের উৎসাহ থাকিলে, একবৎসরে শিক্ষকের কর্ম্মের যোগ্য হইতে পারিবেন। পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে ও ইস্কুলে ও কলেজে যে-সকল শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের অনেকের দ্বারা কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে। ইহাঁদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত বই লিখিতে হইবে, বৎসরে দুইবার এক এক স্থানে আনাইয়া উপদেশ দিতে হইবে। যে পাঠক এত-দূর পর্য্যন্ত পড়িয়া আসিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, শিক্ষা-নীতি বলি, পদ্ধতি বলি, কিছুতেই প্রকৃত গরু বা শিক্ষকের স্থান লইতে পারে না। গুরুই শিক্ষাশালার প্রাণ। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতেই হইবে।

গুরুকুলে থাকিয়া শিক্ষিত হইবার সময় উত্তম ছাত্র ভাবী শিক্ষকের নিমিত্ত বাছিয়া রাখিতে হইবে। ইহারা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইবে, এবং পরে গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া চারি কি পাঁচবৎসর বিনাবেতনে শিক্ষক হইবে। এইরূপ, শিক্ষকশিক্ষা পাইবার সময় ভাল ভাল ছাত্র বাছিয়া এবং বিনা ব্যয়ে শিখিতে দিয়া ভাবী শিক্ষক সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ, নানা উপায় আছে; কিন্তু এমন কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই যাহাতে অর্থব্যয় নাই।

মধ্যশিক্ষায় চিন্তা।

আদ্যশিক্ষার সুযোগ অবশ্য সকলকেই দিতে হইবে। কারণ, তাহা না দিলে দেশের জন্মলব্ধশক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির তুল্য গুপ্ত থাকিবে। একদিকে আদ্যশিক্ষা অবশ্য দাতব্য, অন্যদিকে অতিশয় কঠিন, অতিশয় ব্যয়সাধ্য। কারণ, যোগ্যাযোগ্য নির্বিচারে দেশের যাবতীয় পুত্রকন্যাকে দিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই থাকিবে, সকলের পক্ষে সমান ক্ষেত্র রচনা অসম্ভব। সকলের বাড়ী, সঙ্গ, সমাজ, আর্থিক অবস্থা সমান নয়। কাজেই অসমক্ষেত্র-পালিত বৃক্ষের ন্যায় অসমক্ষেত্রপালিত শিশুও পুষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে অসমান হইয়া পড়িবেই পড়িবে। বোধ হয় বৈষম্যরক্ষাই বিধাতার ইচ্ছা।

অথচ চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা বহুমুখী হইলেই বহুর মঙ্গল। মধ্যশিক্ষা-আরম্ভে কতকগুলি ভেদ মানিতে হইবে। (১) বঙ্গদেশেও অঙ্গদেশের ন্যায় বহু সমাজ-ভেদ আছে। যাবতীয় সমাজের পক্ষে মধ্যশিক্ষা কি অন্ত্য-শিক্ষা এক করা বাতুলের কর্ম। অবশ্য সকলের পক্ষে নিজজ্ঞান ও দেশজ্ঞান অত্যাবশ্যক; কারণ, সকলকেই বাঁচিতে হইবে, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে হইবে। প্রভেদ এই, সকল সমাজের বা সকল লোকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ এক নহে। (২) দেশভেদেও শিক্ষার বিষয়ের ভেদ কিছু করিতে হইবে। নদীবহুল কি সমুদ্রতটবর্ত্তী লোকের পক্ষে নৌচালন শিক্ষা যেমন আবশ্যক, উচ্চ ভূমি প্রস্তরময় প্রদেশের পক্ষে তেমন নহে। (৩) পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে কাল ছিল, এখন সে কাল আর নাই। এখন অর্থকরী বিদ্যা কিছুই না জানিলে অধিকাংশ প্রজাকে মরিতে হইবে। যে পারে, সে বিদ্যা লইয়া থাকিবে, হয় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিরোধ ভঞ্জন করিবে, কিংবা সরস্বতীরই উপাসক হইয়া থাকিবে। (৪) আর্থিক অবস্থাভেদ শিক্ষাবৈষম্যের এক গুরুতর কারণ। মধ্যশিক্ষা দাতব্য হইলেও অন্ত্যশিক্ষা কিংবা অধিশিক্ষা দাতব্য হইবে না। কতজনকে বৃত্তি দিয়া এই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারিবে? ফলে দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে, অর্থ থাকিলে পণ্ডিত হইতে পারিবে, ধনার্জ্জন-বৃত্তি শিখিতে পারিবে; না থাকিলে মূর্খ থাকিবে, আরও দরিদ্র হইবে। কিন্তু মূর্খেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, বস্ত্রাভাবে শীতে শরীর কাঁপে এবং ইন্‌ফ্লুঞ্জার এক ফুৎকারে প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে। (৫) নয়দশ বৎসর বয়সে নর-নারীর ভেদ আরম্ভ হয়। অতএব আমাদের দেশে বালকবালিকার মধ্যশিক্ষা একত্র একভাবে হইতে পারিবে

না। (৬) বয়সভেদে শিক্ষার ভেদ অবশ্য কর্তব্য। যে শিশু আদ্যশিক্ষা পায় নাই, যে বালক বালিকা বিনা শিক্ষায় বড় হইয়াছে, এবং অপরে যে স্ব স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত হইয়া কোনও ক্রমে জীবনধারণ করিতেছে, সে-সবেরও শিক্ষা চাই। এই ষড়্‌ভেদ স্মরণ করিলে দেশে আপামর নরনারীর শিক্ষা অতিশয় কঠিন বোধ হইবে। আদ্যশিক্ষা বরং সোজা, অপরাপর শিক্ষার আয়োজন সকলের পক্ষে সমান করা অসম্ভব বলিলেও হয়। বৈষম্যলোপের সাধ্য নাই, বোধ হয় বাঞ্ছনীয়ও নয়। ইয়ুরোপে জন্মগত ভেদ নাই, কিন্তু অর্থগত ভেদ প্রবল হওয়াতে ধনসাম্যবাদী (socialists), ও জনসাম্যবাদী (Bolsheviks) রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ করিয়াছে। ইয়ুরোপে জাতিভেদ নাই বলিতেও পারা যায় না। ইংরেজ ও আইরিশ, ফরাসী ও জার্মান প্রভৃতি একজাতি মনে হইলে, শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ এক বর্ণ মনে হইলে, এত কলহ হইত কি? কার সাধ্য, জাতিভেদ-জ্ঞান দূর করে? ভেদজ্ঞানই চিত্তের স্বভাব, এবং তাহা দিয়াই মানুষের ঐহিক উন্নতি। অন্যকে উপমর্দন না করিয়া ভোগ হইতে পারে না। ইহার নামান্তর 'জীবন-সংগ্রাম'। সে-সব দর্শনের তত্ত্ব এখন থাক। ঐহিক সুখ-ভোগ-কামনা স্বভাবতঃ প্রবল। শিক্ষার আদ্য হইতে অন্ত পর্যন্ত এই কামনা দমনের চেষ্টা করিতে হইবে। এইটি দমন হইলে বৈষম্যে কোনও অহিত হইবে না। তখন দেখিব, শিক্ষিতের বড়াই আর নাই; রামা-শ্যামা-মেদো-হরে সবাই অন্ততঃ আদ্যশিক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু এক ভাই রামা যদি জুতা সেলাই করে, আর ভাই শ্যামা মুহরী-গিরি করে বলিয়া মহৎ লোক হয় নাই। সাধারণ গুণ ধরিয়া বিশেষ করা ত চলে না। বিপদ্ এই, বিশেষগুণ আবিষ্কারে কালব্যয় করিতে হয় না, অমুক যে আমার জাতি (species) নয়, সে বোধ শীঘ্র উপস্থিত হয়।

শিক্ষা-পরিপাটি।

সে যাহা হউক, এখানে শিক্ষা-পরিপাটির ন্যূন কল্প লিখিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি।

১। আদ্যশিক্ষা ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স। বালক-বালিকার সমান। শিক্ষার বিষয়,—আচার-ব্যবহার, ক্রীড়া-ব্যায়াম, শয়-শিক্ষা (manual training), দেশজ্ঞান, বাঙ্গালা ভাষা ও সামান্য গণিত।

২। মধ্যশিক্ষা। ১০—১৪ বৎসর বয়স। ১০ বর্ষ বয়স হইলে নর-নারী-ভেদ আরম্ভ, এবং ১২ বর্ষ বয়সে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। জনপদ ও পুর ভেদে শিক্ষার বিষয়ের ভেদ কিছু হইবে। অতএব মধ্যশিক্ষার চারি শাখা কল্পন করিতে হইবে। দুই দুই বর্ষে আরও দুই ভাগ হইবে, মধ্য প্রথম, মধ্য দ্বিতীয়। মধ্যশিক্ষার বিষয়,—আচার-ব্যবহার, ব্যায়াম, চিত্রলেখন, শয়শিক্ষা, দেশ-বৃত্তান্ত, বাঙ্গালা ভাষা ও গণিত।

ক। মধ্য প্রথম শিক্ষা। ১০—১২ বর্ষ বয়স। জানপদ ও পৌর কন্যার শিক্ষা সমান। গৃহস্থালি।

খ। মধ্য দ্বিতীয় শিক্ষা। ১২—১৪ বর্ষ বয়স।

৵০ জনপদে বালকের পক্ষে,—গ্রামের বার্তা, ভৌতিক বৃত্তান্ত (বিজ্ঞান নয়)।

৵০ পুরে বালকের পক্ষে,—জীববৃত্তান্ত, ভৌতিক বৃত্তান্ত, ইংরেজী ভাষা।

৩। অন্ত্যশিক্ষা। ১৪—১৮ বর্ষ বয়স। সাধারণতঃ ১৪ বর্ষ বয়সে কেহ বিদ্যালয়ে, কেহ শিক্ষালয়ে যাইবে। বিদ্যালয়ে কি শিখিবে, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে। ইহার নিমিত্ত ইংরেজী ইস্কুল আছে। বিশেষ এই ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালা দিয়া শিখিবে। এখন অতি অল্প বয়সে ইংরেজী শেখা আরম্ভ হইতেছে, এত অল্প বয়সে যখন বালকবালিকার বিষয়জ্ঞান জন্মে নাই, মাতৃভাষাও শেখে নাই। পুরবাসী বালক ১২ বর্ষ বয়সে ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৮ বর্ষ বয়সে কলেজে গেলে যে কোনও বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় ব্যাখ্যান বুঝিতে পারিবে। জনপদবাসী বালককে ইংরেজী ভাষার নিমিত্ত অতিরিক্ত সময় দিতে হইবে। অন্ত্যশিক্ষা পাইবার পর বালকেরা স্ব স্ব বৃত্তি শিখিবার যোগ্য হইবে, অনেকে বৃত্তি ধরিতেও পারিবে। সমাজের প্রয়োজন বহু, বৃত্তিও বহু। মধ্যশিক্ষিত বালকেরা বহুমুখে ধাবিত হইবে। কিন্তু যাবতীয় অন্ত্য শিক্ষা নগরে কিংবা দুইচারি নগরে না দিয়া যেখানে যে শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ আছে, সেখানে সে শিক্ষা দিতে হইবে। অধিকাংশ শিক্ষার আয়োজন এখন কলি-

কাতায় হইতেছে। ইহাতে দুই দোষ ঘটিতেছে। (১) কলিকাতায় গৃহব্যয় অত্যন্ত, গৃহও স্বাস্থ্যের হানিকর। কখন-কখনও দিবাভাগে কৃত্রিম আলোকে পড়া-শুনা করিতে হয়। বাড়ন্ত বয়সে এইরূপ গৃহকোণে আবদ্ধ হওয়াতে দেশের দৈহিক শক্তির ও চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির হানি হইতেছে। (২) বঙ্গের নগর-বাসী মূঢ় হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতা বড় নহে; বঙ্গদেশই বড়; এই ভাব জাগাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। কলিকাতাবাসী-দেশের বিধাতা; অথচ তাহার অনুদারতা ও কূপকণ্ডূকতা চিরপ্রসিদ্ধ। বিভিন্ন নগরে শিক্ষাশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতাবাসীর উপকার হইবে, শিক্ষার্থীর দেশজ্ঞান জন্মিবে, কলিকাতা ছাড়িয়া নগরে কি গ্রামে যাইতে হইলেই যে দুশ্চিন্তা আসে, তাহার লাঘব হইবে। শিক্ষাশালার নিকটে গুরুকুল থাকিবে। ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুকুলের অধিকাংশ কর্ম ছাত্রেরা নিজে করিবে। এবং সুযোগ হইলে নিজেদের প্রয়োজনীয় ধান-কলাই শাগ-পালা উৎপাদন করিবে। প্রায়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুত্রেরা অন্ত্যশিক্ষাশালায় আসিবে, যাহাতে তাহাদের ব্যয় লঘু হয়, অথচ একটা-না-একটা বৃত্তি শিখিতে পারে, তাহা উদ্দেশ্য হইবে।

সকল ছাত্র চারিবৎসর অন্ত্যশিক্ষাশালায় থাকিতে পারিবে না। অতএব প্রথম দুই বৎসর অন্ত্যপ্রথমশিক্ষা, দ্বিতীয় দুই বৎসর অন্ত্যদ্বিতীয়শিক্ষা হইবে। অন্ত্যপ্রথমশিক্ষা বিদ্যাকরী হইলে বর্তমান "হাই-ইস্কুলে"র সমান হইবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষায় কর্ষণ-কলা-ক্রয়,—এই ত্রিক মধ্যে একটা-না-একটা শিখিতেই হইবে। শিক্ষার বিষয়,—ব্যায়াম, রণাভ্যাস ও আত্মরক্ষার কৌশল; আচারের হেতু স্বাস্থ্যরক্ষা, আয়ু ও বলবৃদ্ধি; ব্যবহারের হেতু, দেশের রাজনিয়ম, আত্মরক্ষা বিষয়ক আইন, জমিদার ও প্রজা, ক্রেতা ও বিক্রেতা বিষয়ক আইন; অর্থনীতি; ত্রিক-এর অন্তর্গত, জীব ও ভৌতিক বিদ্যা ও আবশ্যকগণিত, দেশ-বৃত্তান্ত; ইংরেজী ভাষা। বিদ্যাকরী হইলে ত্রিক সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান, তর্কবিদ্যা; ইতিহাস ও সংস্কৃত ভাষা। এইরূপ, বৃত্তিকরী হইলে বৃত্তি ধরিয়া আবশ্যক জ্ঞান।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বর্তমান ইংরেজী "হাই-ইস্কুলে" দুই চারিটা বিষয়ের অনুকল্প করিলে তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু চাই যে শিক্ষা-শালা; বিদ্যালয় চাই না। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষাশালা জুড়িলে না এটা না সেটা, কোনটাই ভাল চলিবে না।

অন্ত্যশিক্ষার পরে চারি বৎসর অধিশিক্ষাশালায় মূর্ত বিজ্ঞান এবং পরে কর্ষণ, কলা, চিকিৎসা প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয় শিক্ষা হইবে। কোথাও কৃষি-শিক্ষা, কোথাও বহুধনসাপেক্ষ কলাশিক্ষা হইবে। বাণিজ্যের নিমিত্ত অধি-শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

অর্থাৎ অন্ত্যশিক্ষার আরম্ভ হইতে জ্ঞানকরী, বিদ্যাকরী ও অর্থকরী, এই ত্রিবিধ ধারা চালাইতে হইবে। কিন্তু মধ্য-শিক্ষিত হইয়াও ছাত্রকে অকর্মণ্য হইতে হইবে না। ইহাই মানস।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

চিরন্তনী

(১৫)

যে দুই জন মানুষকে অবলম্বন করিয়া সুপ্রকাশের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই চারু আর অবিনাশ দুই ভাই বোন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কাজেই সুপ্রকাশের স্বভাবটা যদি কেহ কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে পারিত ত দেখিত যে জগতের যেখানে যত উল্টা উল্টা জিনিষ আছে তাহার অনেকগুলাই সুপ্রকাশের মনের মধ্যে বেশ পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।

সৌখীন মানুষ বলিলে যাহা বুঝায় সুপ্রকাশকে একটা নিমন্ত্রণ-সভায় দেখিলে লোকের সেই রকমই একটা কিছু মনে হইত। সে পরিপাটি করিয়া বাজারের সেরা কাপড়-চোপড় পরিত, কোঁকড়া চুলগুলা দিনে দশবার দশ রকম করিয়া আঁচড়াইয়া দেখিত যথা-সম্ভব ভাল হইয়াছে কি না, জুতার চামড়া পালিস করিয়া আয়নার মত চক্‌মকে হইয়া না উঠিলে পায়ে দিতেই চাহিত না। বেশভূষা সম্বন্ধে ত ছিল এই রকম। আবার অন্যান্য অনেক বিষয়ে ও তাহার সখের যথেষ্ট নমুনা পাওয়া যাইত। সে বাঁশী বাজাইত, কাব্য পড়িত, গান গায়িত, হয়ত কখন-সখন কবিতাও লিখিত। তাহার ঘরে বিশ্বের যত আধুনিক বই কাগজ সর্বদাই

মজুদ থাকিত, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতের জিনিস দিয়া সে গৃহসজ্জা করিত।

কিন্তু এই যে সৌখীন মানুষটি, একে তাহার সখ কিছুতেই বাঁধিয়া ফেলিতে পারে নাই। দিনের পর দিন একরকম সাধনা করিয়াই যে সখের জিনিস আর ব্যাপারগুলিকে সে গড়িয়া তুলিত, একটা ছোট খেয়ালের একটা হাল্কা ঘায়েই আবার সে সেইগুলিকে বেশ অনায়াসেই ভাঙিয়া ফেলিতে পারিত।

লজ্জা কিম্বা বিনয় যাহাকে বলে সেটা যে তাহার মনের কোন্‌খানে ছিল বলা শক্ত। বড় একটা কাজের জন্য যখন লোকে তাহাকে ডাকিত তখন সে প্রথমেই বলিত আমার দ্বারা একাজ হবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইত, শেষ রক্ষা সেই করিয়াছে যদিও গোড়ায় আপত্তিটা তাহারই সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। মনটা ছিল তাহার স্ত্রীলোকের মতই কোমল, কিন্তু তাহার উপর একটা যে বর্ম্মের মত শক্ত আবরণ ছিল সেইটাই ছিল বড় বিষম সাঙ্ঘাতিক। সেই কঠিন আবরণটায় আঘাত করিতে গিয়া সচরাচর অন্যের চেয়ে তাহার নিজের উপরেই বেশী জোরে ঘা পড়িত। কাজেই যেখানে তাহার কাজে অবিচার দেখা যাইত, সেখানে দুঃখ ভোগ করিতে হইত তাহাকেই সকলের চেয়ে বেশী।

গোপেশ-বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসার পরদিন বিকালে করুণা "রণু" "রণু" করিয়া সারা বাড়ীটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, রণুর গায়ের জামার একটা মাপ লইবে বলিয়া। কিন্তু রণুর দেখা আর মেলে না। আমতলা জামতলা খিড়্‌কির পুকুরের ঘাট সবই খোঁজা শেষ করিয়া করুণা যখন সদর রাস্তার দরজায় উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল পথটা বাহির হইয়া পড়ার মত নির্জ্জন আছে কি না, তখন দূরে একটা তেঁতুল-গাছের ডগায় উঁচু একটা উইঢিবির উপর দেখা গেল দুটি মানুষকে। মাথার রুক্ষ চুল, গায়ের বাদামি রঙের হাত-ছেঁড়া কোট, পরণে দিদির চওড়া লালপেড়ে শাড়ী, আর কাদামাখা খালি পা দুখানি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন যে রণু এ কথা বুঝিতে করুণার বেশী সময় লাগে নাই। কিন্তু অমন অপূর্ব্ব-বেশে সজ্জিত বালক রণু নিশ্চিন্ত মনে নিঃসঙ্কোচে যে দীর্ঘাকৃতি সুদর্শন যুবকটির গায়ে ঠেস দিয়া ধূলামাখা একখানা হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া গল্পে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে চিনিতে করুণার একটু সময় লাগিয়াছিল। লোকটা কে দেখিতে করুণা চৌকাঠটা ডিঙাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। ভাল করিয়া মুখ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া সে একটু একটু করিয়া অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ রণুর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সে তড়াক করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া পাশের সঙ্গীর গায়ের শালে একটা হেঁচ্‌কা টান দিয়া করুণার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "এই রেঃ ভুলে গেছি, দিদি জামার মাপ নেবে বলেছিল।"

করুণা দেখিল রণুর সঙ্গীটি সুপ্রকাশ। ভাইকে ধমক দিবার এখন প্রশস্ত সময় নয় দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। দিদিকে বকুনি দিতে না দেখিয়া রণু কিন্তু সুপ্রকাশকে সুদ্ধ টানিতে টানিতে তাহার সাম্‌নে আনিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি, ভারি না বলা হয়েছিল সুপ্রকাশ-বাবু ত আর ক্ষেপেননি যে দুপুর রাত্রে বাঁশী বাজাবেন! এখন জিগ্‌গেস কর দেখি উনিই বাজাচ্ছিলেন কি না।"

পথের দেখায় ও রণুর অসময়ে ঘরোয়া কথার উল্লেখে করুণার অল্প পরিচয়ের সঙ্কোচ হঠাৎ যেন তিনগুণ বাড়িয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে চোখ তুলিয়া রণুকে একটা নীরব ভৎর্সনা করিতে গিয়া সুপ্রকাশের চোখে-চোখেই চাহিয়া ফেলিল। করুণার লজ্জায় সুপ্রকাশেরও মুখখানা প্রতিফলিত লজ্জায় রাঙাইয়া উঠিতেছিল। সঙ্কোচ জিনিসটাকে যত বাড়িতে দেওয়া যায় ততই সে সীমা ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু একটা সামান্য ঘায়েই অনেক সময় আজন্মের সঞ্চয়ও ভাঙিয়া পড়ে। সুপ্রকাশ কাজেই নিজের লজ্জাকে নিজেই ঘা দিয়া ভাঙিয়া বলিল, "কথাটা উভয় পক্ষেরই সত্য। রাত দুপুরে বাঁশী আমিই বাজাই বটে, আর অমন সময় মানুষের সুখনিদ্রা যে ভাঙে সে যে ক্ষ্যাপা তা ত বলাই বাহুল্য।"

রণু বলিল, "দিদি, উনি কি চমৎকার বাজান জান না। একবার শুনবে?"

করুণা এতক্ষণে অনেকটা সপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আসুন না আমাদের এখানে। একবার শুনিয়ে যদি দেন দয়া করে তা হলে বিকেলটা আজ একটা ভাল কাজেই কাটবে। মানুষকে সুখ দেওয়ার মত বড় কাজ খুব কম আছে।"

সুপ্রকাশ বলিল, "কিন্তু দাতার ভাণ্ডারে কিছু না থাকলে দান করার লোভের মত বিড়ম্বনাও কম আছে।"

রণু বলিল, "আঃ কি শুধু শুধু বক্‌বক্ করছেন, ভিতরে চলুন।" টানিয়াই সে সুপ্রকাশকে তাহাদের দুতলার ঘর পর্য্যন্ত লইয়া গেল।

বাঁশী বাজাইতে সুপ্রকাশের এত লজ্জা কখনও দেখা যায় নাই। তাহার একটা খেয়াল ছিল, কোনো মানুষের মধ্যে সুরের একটু আভাস পাইলেই তাহাকে ধরিয়া বাজাইতে কি গাইতে শেখানো। সুরের ভিতর দিয়া মানুষের প্রাণ মুক্তি পায়। আনন্দেই হউক আর বেদনাতেই হউক সুপ্রকাশের প্রাণ যখন কোনো কিছুর ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, যখন আর কোনো পথে অন্তরের সে প্রাচুর্য্যকে মুক্তি দিবার উপায় কি ইচ্ছা না থাকিত, তখন সুরই তাহার প্রাণের পথ খুলিয়া দিয়া নূতন নূতন পথের সৃজনে লাগিয়া যাইত। মানুষের মনে এই সুরের অনুভূতি আর সুরের খেলা জাগাইয়া তোলা ছিল সুপ্রকাশের একটা নেশা। গ্রামের ছেলেদের সন্ধ্যায় রাত্রে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ধরিয়া সে নূতন নূতন গানের সুর শিখাইত। আজ তাহার সেই সুরচর্চ্চার এমন মাহেন্দ্র সুযোগ দেখিয়াও যে সে কেন ইতস্ততঃ করিতেছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

করুণার মুখের অনুনয় তাহার কানে মিঠাই লাগিয়াছিল, পাল্টা তাহার কানে মধুবর্ষণের সখটাও যে তাহার কিছুমাত্র কম ছিল এমনও বলা চলে না, অথচ কোথা হইতে যত লজ্জার রাশি আজ কি না তাহাকেই পাইয়া বসিল। ইচ্ছা করিতেছিল তাহার সকল সুরের বাছা সুরটি মনের সুরে মিলাইয়া এই মেয়েটিকে শুনাইয়া দিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে মনের ইচ্ছাটা যত বাড়িয়া চলিয়াছে, কাপুরুষোচিত লজ্জাটাও তাহাকে ততই পাইয়া বসিতেছে।

রণুর অকবিজনোচিত অত্যাচারে সুপ্রকাশের লজ্জাকে হার মানিয়া বিদায় লইতে হইল। বাঁশী দুইটাই রণুর কবলে ছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া সুপ্রকাশকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া ধাক্কা মারিয়া একটা বেতের চেয়ারের ভিতর প্রায় উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার দুই হাতে দুইটা বাঁশী একসঙ্গে ঠুসিয়া দিয়া তারপর বাঁশী-সমেত হাত দুখানা তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ছোড়দি, শীগ্‌গির এ ঘরে এস বলছি, সুপ্রকাশ-বাবু বাঁশী বাজাবেন বলে কখন্ থেকে বসে আছেন, তোমায় এখন জিওমেট্রি নিয়ে ভুল ভুল অঙ্ক কস্‌তে হবে না।"

অরুণা বই ফেলিয়া পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। করুণা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "ছিঃ রণু, তোমার কি কোনো কালে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না; দেখ্‌ছ উনি এখন বাজাতে চাইছেন না, আর তুমি গায়ের ধুলো কাদা সুদ্ধ ওঁর ঘাড়ে লাফিয়ে নেচে ওঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ছ।"

রণু লজ্জা পাইয়া সরিয়া আসিল। অরুণা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া লোভনীয় কোনো ব্যাপারের নমুনা না পাইয়া উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা সুপ্রকাশ হাসিয়া বাঁশী দুইটা ঝাড়িয়া মুছিয়া বলিল, "নাঃ, আর একবার সাধিলেই খাইব, বলা আর চলে না। আপনাদের সকলকে ভূমিকাস্বরূপ যে রকম ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লাম তার উপযুক্ত কিছুই শোনাতে পারব না। যা পাবেন তার চেয়ে দামটা বেশী খরচ করে ফেলেছেন; আর দর বাড়ানো উচিত নয়।"

প্রথম পরিচয়ের পরেই আসিয়া লোকের বাড়ীতে বাঁশী বাজাইতে বসিয়া যাওয়াটা অবশ্য সচরাচর সাধারণ লোকে করে না, কিন্তু সুপ্রকাশ স্বভাবত বেশীরকম মুখচোরা ও স্বল্পভাষী ছিল বলিয়াই সঙ্কোচ জিনিসটাকে গায়ের জোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী সপ্রতিভ ভাবে কাজ করিতে পারিত।

বাঁশী শুনিয়া জয়গর্ব্বে রণু নাচিয়া অস্থির। "দেখ্‌লে? কেমন, এখন আমার কথা বিশ্বাস হল? ভারি না বলেছিলে পারেন না।" সুপ্রকাশের কৃতিত্বটা যে রণুরই বাহাদুরির ফল, রণু সদর্পে সকলকে তাহা জানাইয়া দিল।

গান ছিল অরুণার মহা লোভের জিনিস। সে বলিয়া বসিল, "আপনি নিশ্চয় খুব ভাল গান কর্‌তে পারেন, একটা গান করুন না।"

সুপ্রকাশকে গানও গায়িতে হইল। একটা দুইটা নয়, তিন জনের অনুরোধের পালা-ক্রমে বেশ ছয়-সাতটা। গানের পর গানও চলিতেছিল, কথাবার্ত্তা প্রায় বন্ধই ছিল, এমনি গানের স্রোতে দিনের আলো কখন ম্লান হইয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার সুরমুগ্ধদের সুরের নেশা টুটাইয়া দিবার ভয়ে যেন লঘুগামিনী তরুণীর মত অতি ধীরে নিঃশব্দে তাহার ছায়াময় অঞ্চলখানি ঘরে-বাহিরে বিছাইয়া দিল। বালক রণুর সুরের নেশা ক্রমে স্বপ্নপুরের ঘুমপাড়ানী মাসীদের গানের সুরে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া আসিতেছিল। অনেকক্ষণ তাহার সাড়া না পাইয়া একটা গানের শেষে তিন জনে চাহিয়া দেখিল দুই হাতে দুইটা বাঁশী বুকের তলায় চাপিয়া ধরিয়া রণু একটা চেয়ারের পিছনে কুণ্ডলি পাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

করুণা তাহাকে জাগাইয়া অন্য ঘরে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টায় দুই একটা ধাক্কা দিয়া নীচু গলায় কি সব উপদেশ দিল, কিন্তু সে উপদেশ স্বপ্নলোকের হাসিরাশির ভিড় ঠেলিয়া এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। অরুণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল, "তোমার মনে মনে উপদেশ দেওয়া শুনে ত ও এখুনি লাফিয়ে উঠে পড়্‌ল আর কি; এই রণু, ওঠ্‌ বল্‌ছি।" হেঁচকা টানে নিদ্রিত ভ্রাতার সুখস্বপ্ন ছুটাইয়া দিয়া সে তাহাকে টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল।

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "যাক, আমি গান গেয়ে মানুষকে অন্তত ঘুম পাড়াতে পারি এইটুকু জানা গেল। আর কেউ হলে এমন নিজের কৃতিত্বে নিশ্চয়ই খুসী হত না; কিন্তু আমার মত লোকের এর চেয়ে বেশী আশা করা সাজে না। খুব ছোট বেলায় একবার ক্লাসে অঙ্কের পরীক্ষায় ফেল হয়ে একশ'র মধ্যে সাত পেয়েছিলাম বলে দুঃখে কেঁদেছিলাম; তখন দাদা বলেছিলেন, 'কাঁদিস কেন? নম্বর ত পেয়েছিস সাতটা।' তখন থেকেই নিজের পাওনাটা বুঝে নিয়েছি। দাদার সান্ত্বনায় একটা শিক্ষা পেয়েছি যে পাওয়াটাই হচ্ছে লাভ, পাওনা জিনিসটার চেহারাটা নিতান্তই একটা অলঙ্কার।"

সুপ্রকাশের আত্মতৃপ্তির আনন্দ-উচ্ছ্বাসটা একেবারে চাপা দিয়া করুণা বলিল, "গানের সুর মানুষকে যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিক নেই, যেন ঠিক যাদুকরের মন্ত্র।"

সুপ্রকাশ বলিল, "সুর যে মানুষের বন্দী মনের নিরালার খিড়্‌কি দরজা। সংসারের সিংহদরজা সিপাই শান্ত্রী নিয়ে সমস্তক্ষণ যাকে আগ্‌লে রাখে, এই পথেতেই সে তাকে ফাঁকি দিয়ে বিশ্বচরাচরে লোকলোকান্তরে আনন্দে বেরিয়ে পড়ে। সিংহ-দরজার সশস্ত্র প্রহরীর কানে সে গুঞ্জন পৌঁছালেও বেচারা ভাবে বন্দী আমার কড়া পাহারায় আছে।"

করুণা বলিল, "সত্যি, পৃথিবীতে যদি গান জিনিসটা না থাক্‌ত ত মানুষ নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত কিম্বা পাথর হয়ে যেত।"

সুপ্রকাশ বলিল, "জগতে যেমন রূপ-রসের সৃষ্টি আর তার অনন্ত রকম খেলা চলেছে, মানুষের মনেও ত ঠিক তেমনি খেলা সমস্তক্ষণ চলেছে। তার মন কখনও কান্নার স্রোতে ভেসে পড়্‌তে চায়, কখনও রুদ্রের মত তাণ্ডবনৃত্যে মেতে উঠ্‌তে চায়, আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌তে আনন্দে হাসিতে ঝরে পড়্‌তে চায়, কিন্তু প্রকৃতি যেমন বর্ষার জলধারায় প্রাণ ভরে কেঁদে নেয়, বসন্তের বাতাসে ফুলে ফুলে হেসে ফেটে পড়ে, মানুষ ত তা পারে না। একটা মানুষ যদি খামখা কেঁদে ঘরদোর ভাসিয়ে দেয় কি বিশ্বটা ভেঙে চুরমার কর্‌তে চায় কি অন্তত আনন্দে হাততালি দিয়ে দুঘণ্টা নেচে বেড়াতে চায়, তাহলে মানুষ তাকে মোটেই ক্ষমা কর্‌বে না। সৃষ্টিকর্ত্তার ক্যাপামি খামখেয়াল সব মানুষ জোড় হাতে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে, কিন্তু মানুষের পাগ্‌লামি সে নিতান্ত ছেলেমানুষি ভাবে। এখানে তার ক্ষমা সহানুভূতি কিচ্ছু নেই। কিন্তু মানুষের মনের এই ঝোঁকের পাওনাটা ত মেটানো চাই, নইলে ত মানুষ পাথর হয়ে যাবেই। কাজেই মুখে যে কথাটা বলা বারণ, চোখে যেখানে জল ফেলা নিতান্তই বোকামি, সেখানে মানুষ গানের পথে তার মনের সব আশা মিটিয়ে নেয়, ছন্দে সুরে লয়ে সে সব বলে, সব করে।"

করুণা এত কথার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া

পাইতেছিল না। মনটা তাহার খুসি হইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল নিজের অনুভূত কথাগুলি এমন করিয়া মনের মত করিয়া শুনিয়া। তাহাকে নীরব দেখিয়া সুপ্রকাশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "হঠাৎ আমার এরকম বক্তৃতা শুনে বোধ হয় আপনি ভয় পেয়ে গেছেন। প্রথম দিন এসেই কেউ বা গান শুনে ঘুমিয়ে পড়্‌ল, কেউ বা বক্তৃতা শুনে কি করে পালাবেন তাই ভাব্‌ছেন। আমার এই বেলা উঠে পড়াই ভাল।"

করুণা বলিল, "ওকি, আপনি এখুনি চল্‌লেন কেন? আমি মোটেই ভয় পাইনি। চুপ করে ছিলাম, আরো খানিকটা শোন্‌বার আশায়। ভাব্‌ছিলাম আপনার ভাগ্নীর কথা, তার কাছে আপনার গল্প অনেক শুনেছি। আপনার ত সে মস্ত একজন ভক্ত।"

সুপ্রকাশ বলিল, "ওঃ শতদল। আহা, বেচারীর ভারি দুঃখ। পৃথিবীতে যা কিছু অবলম্বন করে ছিল, সবই যেন তার স্পর্শে ঝরে গেল।" সুপ্রকাশের কথার সুরে স্নেহ ও করুণা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল।

করুণা বলিল, "মানুষকে এমন করে নিঃসম্বল করে তুল্‌লে কি নিয়ে যে তারা বাঁচে?"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যেই ত মাঝে মাঝে আমি রাগ করে নিজের খুব আদরের জিনিসগুলো আছ্‌ড়ে ভাঙি, ছুঁড়ে ফেলে দি। লোকে আমায় পাগল বলে, কিন্তু আমার বেশ আনন্দ হয় এই মনে করে যে আমার সব কিছু আদরের জিনিসই আমায় কাঁদিয়ে কেউ ছিনিয়ে নেয়নি, আমি নিজেই তাদের ভেঙে চুরে সেই নিষ্ঠুরকে অন্তত মাঝে মাঝে হার মানিয়েছি।"

তারিণীকান্ত পিছনের বারান্দা হইতে আসিয়া বলিলেন, "করুণা, আমি ভেবে দেখ্‌লাম, তোমার ঘাড়ে অত বড় বোঝাটা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কম টাকা ত নয়!"

করুণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, সে কথা পরে হবে দাদামশায়, সুপ্রকাশ-বাবু এসেছেন।"

তারিণীকান্ত বলিলেন, "ওঃ সুপ্রকাশ, আচ্ছা বোস। করুণা ওঁকে জলখাবার দিয়েছ ত?"

সুপ্রকাশ বলিল, "আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখন উঠি।"

সে রাত্রে সুপ্রকাশের নিভৃত ঘরে সুরচর্চ্চার শেষ যে কখন হইয়াছিল বলা শক্ত। ইস্কুল-বাড়ীর দোতলার ঘরের তরুণী শিক্ষয়িত্রীও সারারাত স্বপ্নে না জানি কিসের সুর-ঝঙ্কারে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কাইয়া উঠিতেছিল।

(১৬)

তখন বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। দুপুর বেলা ঘরের দরজা জান্‌লা সমস্ত বন্ধ করিয়া রাস্তার ধারের গোটা দুই খড়খড়ি তুলিয়া শতদল মেঝেতে আঁচল পাতিয়া ক্ষীণ সূর্য্য-রশ্মিতে কি একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। বাগ্‌দেবী কিন্তু বিরূপ হইলেন। এ রকম হতশ্রদ্ধার পূজা তিনি লইতে রাজি হন না। শতদলের চোখের পরদায় অক্ষরগুলির ছায়া পড়িতেছিল, কিন্তু মনে তাহাদের কোনো অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছিল না। ক্রমে চোখের ছায়াও অস্পষ্ট হইয়া আসিল, ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িল।

ঘুমটা ঘোরালো হইয়া উঠিবার আগেই শতদলের স্বপ্ন-জাল ছিঁড়িয়া গেল মোটরগাড়ীর উৎকট বাস্তব কোলাহলে। সে উঠিয়া বসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝখানের রেখাটাকে পরিষ্কার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় দরজার বাহির হইতে বুড়ো বেহারাটা চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদিমণি, উঠেন, উঠেন, সাহেব ত আ গেলে।"

শতদল বাহিরে আসিয়া দেখিল চাপ্‌রাসীর হাতে চাম্‌ড়ার ব্যাগ আর খুঁটিনাটি তোড়জোড় চাপাইয়া এক হাতে হ্যাট লইয়া অন্য হাতে রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে অবিনাশ উপরে উঠিতেছে।

অবিনাশ উপরে আসিয়া বিরক্তমুখে একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় শতদলকে কুশলপ্রশ্ন করিবে কি না ভাবিতেছিল, কিন্তু কুশলপ্রশ্ন করিতে হইলে মুখের চেহারা-খানা যতখানি মোলায়েম করা দরকার ততখানি নরম মেজাজ হইবার কোনো কারণ এই গরমে খোলা মোটরে ও উত্তপ্ত রেলগাড়ীতে দুপুর বেলা বসিয়া সে খুঁজিয়া পায় নাই, শতদলকে দেখিয়াও মনটা তাহার কোনোদিন অকস্মাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে না। মামাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া শতদল নিজের আঁচলটা গলায় দিয়া অবিনাশের বুটপরা পায়ের একটু দূরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গড়

হইয়া প্রণাম করিল। বাড়ী আসিয়াই প্রথম সম্ভাষণে গায়ের ঝাল মিটানোটা যে উচিত নয় ইহা অবিনাশের জানা ছিল বলিয়াই এতক্ষণ সে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু শতদলের প্রণামটা তাহার পথের সঞ্চিত বিরক্তিটাকে যেন বাহির হইয়া পড়িবার পথ দিল; সে বিরক্ত মুখখানা আর-একটু বাঁকাইয়া ঝাঁঝিয়া বলিল, "আঃ! জ্বালাতন করে মারলে! একটা মানুষ রোদে পুড়ে বাড়ী এসেছে, কোথায় তাকে একটু জল দেবে, বস্‌তে দেবে, না পথের উপর টিপ্ টিপ্ করে মাথা খুঁড়ে ভক্তি দেখাতে বস্‌লে। ঐসব আমি তোমাদের চুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না।"

শতদল উঠিয়া নিজেই ছুটিয়া অবিনাশের ঘর খুলিয়া ঠিক করিতে গেল, চাকরকে জলবরফ সব আনিতে বলিয়া দিল, কিন্তু কুশলপ্রশ্নটা উভয় পক্ষেই চাপা পড়িয়া গেল।

রোদ পড়িয়া আসিতেই খাবার-ঘরে তরমুজের সরবৎ, বেলের পানা, আইসক্রীম, লেমনেড প্রভৃতি দিশী বিলাতী হরেক রকম গ্রীষ্মকালোচিত পানীয় ও খাদ্য সাজাইয়া শতদল বেহারাকে দিয়া অবিনাশকে খবর দিল। অবিনাশ নীচে আসিয়া সোজাসুজি খাইতে বসিয়া গেল। তাহাদের দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তার ঘটা কোনো কালেই ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে বাড়ী আসার ত একটা মান রাখা দরকার। অনেক ভাবিয়া শতদল বলিল, "কুড়ি দিনের জায়গায় একেবারে দু মাস হয়ে গেল। যে খারাপ সময়, আমি ভাব্‌ছিলাম অসুখ বিসুখই হল বা।"

অবিনাশ এককথায় শতদলকে থামাইয়া বলিল, "দুমাস ত কত সময়ই হয়।"

'কেন হয়' আর বলা চলিল না। বাক্যালাপের আর কোনো চেষ্টা কোনো পক্ষেই দেখা গেল না। অবিনাশ আহার সারিয়া ঢাকাই ধুতি চাদর বাহির করিয়া বাবু সাজিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পা দুখানা পাশের গলির ভাড়াটে বাড়ীর দিকেই তাহাকে লইয়া গেল। অভ্যাস-মত হাঁক ডাক না করিয়াই সে দুতলায় উঠিয়া গেল। কলতলায় একটা ঝি দুই হাতে ছাই মাখিয়া বাসন মাজিতেছিল, সে একবার হাঁ করিয়া তাকাইল, তাহার পর ছাইমাখা হাতেই মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া কিছুই না বলিয়া বাসন মাজিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া অবিনাশ দেখিল তারিণীকান্তের ঘরের ছাঁটজোড়া পর্দাটা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কপাট দুখানা হাঁ করিয়া খোলা। ঘরের ভিতর একখানা ভাঙ্গা তক্তপোষে রাজ্যের ছেঁড়া তোষক কাঁথা আর তেলচিটে ওয়াড়হীন বালিশ নিজেদের সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতার শতচিহ্ন লইয়া চোখের সাম্‌নে পড়িয়া আছে। ঘরের চেয়ার টেবিল দুটার একটাও নাই। একটা দড়ির আল্‌নায় খান দুই হলুদ ও কাদা মাখা খাটো একটা ঘামে-ভেজা তৈলাক্ত ময়লা সার্ট আর তেমনি তিন-চার লেসছেঁড়া ফ্রক এলোমেলো ভাবে ঐ উহার গায়ে পড়িয়া আছে। ঘরের এমন চেহারা দেখিয়া অবিনাশের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, তার উপর এতক্ষণেও একটা পরিচিত মুখ না দেখিয়া সে রাগে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে খোলা দরজার চৌকাঠের প্রায় উপরে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল ঘরের মেঝের উপর একটা বড় পিতলের ঘটী উপুড় হইয়া ঘরময় জল থৈ থৈ করিতেছে, সেই জলের মধ্যে বুক দিয়া পড়িয়া একটি মাস আষ্টেকের উলঙ্গ শিশু ঘাড়টা উঁচু করিয়া চার হাত পায়ে জল থাবড়াইতেছে, আর মাঝে মাঝে কি একটা অভাব বোধ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। ঘরের একটা কোণে বোধ হয় শিশুর মা অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। শিশু অবিনাশকে দেখিয়া এক হাত তুলিয়া হাসিয়া উঠিল। অবিনাশ কোন্ এক অচেনা লোকের ঘরে বিনাবাক্যব্যয়ে আসিয়া উঠার লজ্জায় আরও চটিয়া বাহিরে আসিয়া 'অরুণা' বলিয়া একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার দিল।

নিদ্রিতা বধূ জাগিয়া উঠিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া আর-একটু কোণে ঢুকিয়া বসিল। ত্রিতলবাসিনী শৈলজা ডাক শুনিয়া দুই ধাপ নামিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া অবিনাশকে দেখিয়া আপন মনে খানিকটা হাসিয়া ঘুমন্ত খোকাকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল, "ওই খোকা, বল্‌না করুণা-মাসি এবাড়ী ছেড়ে হাওয়া খেতে চলে গেছে।"

খোকাকে কিছু বলিতে হইল না। অবিনাশ অপ্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুত হইয়া রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে হুড়মুড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সোজা বাড়ী চলিয়া গেল। করুণা কোথায় গিয়াছে, কবে গিয়াছে, কবে ফিরিবে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না। শৈলজার হাসির বান তাহার কানে লাগিয়াছিল। করুণার উপর তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল। বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়াই যদি গেল তবে কেন তাহাকে বলিয়া না গিয়া তাহাকে পরের কাছে এমন করিয়া অপ্রস্তুত করিল? শতদলেরই বা কি আক্কেল, কেন সে এ কথাটা তাহাকে বলিয়া রাখে নাই। অবিনাশ যে শতদলকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নাই এবং করুণা যাইবার সময় স্বয়ং অনুপস্থিত ছিল সে কথা দুটো রাগের মাথায় সে ভুলিয়াই গেল।

বাড়ী আসিয়া অবিনাশ ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর ছড়ানো তাহার কাগজপত্রগুলা টানিয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল। বেহারাকে ডাকিয়া তাহার মাথায় দুটা থাব্‌ড়া লাগাইয়া বলিল, "আমি দুদিন বাড়ী না থাক্‌লে কাগজ-পত্রের যদি এমনি দশা হয়, তবে তোমাদের মতন মোষগুলোকে ঘরে পোষা কিসের জন্যে?" সাহেবের কাগজপত্র তাহাদের চিরকালই ছোঁওয়া বারণ, তবু আজ বেচারা নিজের অজ্ঞাত অপরাধে কুণ্ঠিত হইয়া মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য সে মাথার মাঝখানে চুল কামাইয়া তাহাতে খানিকটা মাখন মাখাইয়া রাখিয়াছিল, সাহেবের চড়ের কৃপায় সাহেবেরই হাতে তাহা লাগিয়া গেল। অবিনাশ তাহাতে আরো চটিয়া বেচারাকে আরো গোটা দুই চড় কসাইয়া দিল।

বেহারা আর নূতন কোনো অপরাধ পাছে করিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে-মুল্লুক ছাড়িয়া দৌড় দিল। অবিনাশ মাথাটা প্রায় বুকের মধ্যে গুঁজিয়া কপাল কুঁচ্‌কাইয়া ঘরের মধ্যে খুব ঘন ঘন পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। করুণার এমন অকস্মাৎ অন্তর্ধান কারণ সে ভাবিয়াই পাইতেছিল না। ইচ্ছামত হাওয়া খাইতে যাইবার মত বড়লোক ত করুণাকে মনে করা চলে না, তবে কেমন করিয়াই বা সে গেল, আর কেনই বা গেল? অবিনাশের মনে পড়িল তাহারই দেওয়া দুই হাজার টাকার কথা। করুণা কি তবে তাহারই টাকা লইয়া তাহাকেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গেল? কিন্তু পরের টাকা ধার করিয়া হাওয়া খাইতে যাইবার মত মেয়ে বলিয়া ত করুণাকে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। ধার যখন সে চাহিতে আসিয়াছিল তখনকার কথায় যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছিল তাহাতে ত তারিণীকান্তের জন্যই টাকা বলিয়া মনে হয়। নিশ্চয় বুড়ো ভদ্রলোক কোনো রকমে টাকার গোলমালে পড়ায় মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া করুণার শরণ লইয়াছিলেন।

টাকা লইতে আসিয়া অবিনাশের মনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের ধাক্কায় করুণা যে হাতের নোটের তাড়া ফেলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, তারপর দিনের পর দিন সাধিয়াও যে করুণার দেখা পাওয়া যায় নাই, সে কথাগুলাও আজ অবিনাশের মনে পড়িল। কিন্তু তাহার আজ-কার প্রশ্নের কোনো উত্তর তাহাতে সে পাইল না। অবিনাশের প্রশ্নের ভয়ে যে কেহ দেশত্যাগী হইতে পারে ইহা মনে করা অসম্ভব। অবিনাশের মত ধনে মানে গুণে এমন একটা মানুষ কিছু পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না; সেই মানুষটা তাহার সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিতে চায় আর সেই সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবে কি না এই ভাবনার মীমাংসা করিতে গিয়া যে কোনো মেয়ে এমন অকূল পাথারে পড়ে এমন কাণ্ড ত সে জীবনে শোনে নাই।

অবিনাশের ভারি রাগ হইল করুণার উপর। কি এমন একটা সৃষ্টিছাড়া জীব সে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আদি কাল হইতে যে ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বেলাই তাহাতে মানুষের এত ভাবনা? অবিনাশ কিছু চুরি ডাকাতি করে নাই, জেলও খাটে নাই, মানুষ খুনও করে নাই যে কেরানীর নাত্‌নী তাহার উপর কৃপাদৃষ্টি করিতে এতদিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করিবে। স্ত্রীজাতিকে সে যে জোঁকের সঙ্গে তুলনা করিত সেই তুলনাটা এখানেও তাহার আজ কাজে লাগাইতে ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু তাই বা খাটে কই? দুলক্ষ টাকা যাহার হাতের মুঠায়, দুই হাজার টাকা সে পরকে ঠকাইয়া লইবে কেন? করুণার উপর হাজার রাগ হইলেও এমন কথাটা অবিনাশ মনে করিতে পারিল না।

করুণা যদি আর কাহাকেও ভাল বাসে এই এক উত্তর আছে। অবিনাশ ভাবিল তাহাই হইবে হয়ত। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল সেই অজানা লোকটার মাথা ধরিয়া দেয়ালে ঠুকিয়া দেয়। নিশ্চয়ই সেটা একটা ভবঘুরে ভূত, এক পয়সার মুরোদ নাই। মেয়েমানুষের বিচারবুদ্ধিকে ধন্য! কি দেখিয়া যে তাহারা যত ক্ষ্যাপা পাগ্‌লা আর ভিখিরীর প্রেমে পড়ে তাহার ঠিক নাই। হয় ত সেই হতভাগার জন্যই করুণা টাকা লইয়া গিয়াছে। হয়ত এত দিনে তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রাগে অবিনাশের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। পায়ের কাছে একটা চন্দনকাঠের ছোট্ট টেবিল খাড়া হইয়া ছিল; রাগে সেইটাকেই সে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া দিল। কাঁচের ফুলদানি সমেত টেবিল গড়াইয়া পড়িল, ঘরময় কাঁচের টুক্‌রা ছড়াইয়া পড়িল। খানিকক্ষণ সেইগুলার দিকে তাকাইয়া অবিনাশ বলিল, "Impossible! করুণা এমন কাজ কর্‌তে পারে না। আমাকে দিয়ে সে হতভাগার ঝুলি ভরাবে করুণা এমন মেয়ে নয়।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া অবিনাশ চলিল শতদলের ঘরে। প্রথম থেকেই অবিনাশ করুণার শতদল-প্রীতির উপর চটা ছিল, তাহাকে ডিঙাইয়া শতদলের উপর টান সে সহ্য করিতে পারিত না; কিন্তু মনে মনে চটিয়াও আজ সে শতদলের কাছেই খোঁজ লইতে চলিল। শতদলকে দেখিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তারিণী-বাবুরা কোথায় জান?"

শতদল বলিল, "কোথায় যেন করুণার বেশী মাইনের চাক্‌রী হয়েছে, সেইখানে ওরা সবাই গিয়েছে।"

অবিনাশ বলিল, "সেই কোথায়টা কোন্‌খানে তাই ত তোমায় জিগ্‌গেষ কর্‌ছি।"

শতদল বলিল, "তা ঠিক জানি না।"

অবিনাশ বলিল, "তবে জান কি?"

শতদল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "একটু আগে ছোট-মামার চিঠি এসেছে।"

অবিনাশ বলিল, "তবে ত উদ্ধার করে দিয়েছে। কি? আবার কোথাও টহল দিতে যাচ্ছে?"

শতদল বলিল, "না, এইখানেই দু তিন দিনের মধ্যে আস্‌ছে।——"

শতদল আর কি বলিতে যাইতেছিল, তাহা না শুনিয়াই অবিনাশ "তবে আর কি! ফোর্ট উইলিয়মে কামান দাগ্‌তে বলি গিয়ে।" বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শতদল হয় ত অবিনাশের আদত প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে পারিত; কিন্তু অবিনাশের আর তাহা শোনা হইল না।

রাত্রের খাবারের আয়োজন করিতে করিতে শতদল আর-একবার অবিনাশের দেখা পাইল। মেজাজটা তাহার অনেকখানি নরম হইয়া আসিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "দেখ, দোতলার দক্ষিণের ঘরটায় সব চেয়ে হাওয়া বেশী, ওই ঘরখানা খোকার জন্যে রাখ্‌তে হবে। ওপাশের ঘরখানা আজই একটু গুছিয়ে দিতে বল, আমি ওইটাতে থাক্‌ব এখন।"

শতদল বলিল, "ছোট মামা ত ছাদেই—"

অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আঃ! যা বল্‌ছি তাই কর না, অত কথায় দর্‌কার কি!"

শতদল চুপ করিয়া রহিল।

অবিনাশ খানিক পরে আবার বলিল, "অর্গ্যানটা উপরের ঘরে পাঠিয়ে দিও। নীচে ত পিয়ানোটা আছে। ওটা উপরে থাক্‌লে খোকার কাজে লাগ্‌বে।"

শতদল বলিল, "আচ্ছা, তাই দেব।"

অবিনাশ বলিল, "আর কোণের ঘর থেকে খোকার সব জিনিসপত্র বের করে দক্ষিণের ঘরে রাখিও। নইলে, ও মনে কর্‌বে কোণের ঘরটাই ওর জন্যে আছে।"

শতদল হাসিয়া বলিল, "সে সব আমি জানি।"

অবিনাশ এবার একটু মোলায়েম সুরে বলিল, "জান ত সবই, তোমাদের ভুলে যেতে কতক্ষণ? শেষকালে ও ছেলেমানুষ কষ্ট পাক্।"

শতদল একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। রাত্রে শুইবার পর প্রায় এগারটার সময় ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া অবিনাশ শতদলকে ডাকিয়া বলিল, "শতদল, খোকা কি কালই আস্‌বে লিখেছে? ওঘরের ফ্যানটা ত খারাপ হয়ে গেছে দেখ্‌ছি। কালই যদি লোক না পাওয়া যায়?"

শতদল উঠিয়া আসিয়া বলিল, "না, না, আপনি ঘুমোন গিয়ে, অত ব্যস্ত হবার দর্‌কার নেই, সে দু-দিন পরে আস্‌বে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

পুস্তক-পরিচয়

উন্নত জীবন—শ্রীমোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রণীত। নুর লাইব্রেরী, ১০ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। ৯৮ পৃষ্ঠা। আট আনা।

নানা দেশের মহৎ বিখ্যাত উন্নত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন জীবন কেমন করিয়া উন্নত করিতে হয় ও উন্নত জীবন কাকে বলে। বইখানি চলিত কথ্য ভাষায় সরল ও সরস করিয়া লেখা। লেখকের মন সংস্কারমুক্ত উদার, তাই অনেক শাশ্বত সত্যবাণী তিনি প্রাণের জোর দিয়া বলিতে পারিয়াছেন। বইখানি এমন ভাবে লেখা যে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলেরই চিত্তাকর্ষক ও উপকারী হইবে। বইখানি তেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। (১) জাতির উত্থান। কোনো জাতিকে বাহির থেকে কেউ বড় করিতে পারে না, যদি না জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি বড় হয়। "মনুষ্যত্ব লাভের পথ জ্ঞানের সেবা।" "লেখক সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা।" "জাতি যখন দৃষ্টিসম্পন্ন ও জ্ঞানী হয়, তখন জাগ্‌বার জন্যে সে কারো আহ্বানের অপেক্ষা করে না।" (২) ব্যক্তিত্ব ও শক্তির সফলতা। "জীবনের সকল অবস্থায় নিজেকে বড় করে তোলা যায়।" "জাতীয়তা ও স্বাধীনতার কথা ভাব্‌বার আগে তুমি নিজেকে মানুষ করো। মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্নত ও মার্জ্জিত বিকাশ ছাড়া স্বাধীনতা আর কিছু নয়।" "তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে খাড়া করে তোল, কেউ তোমার উপর অন্যায় আধিপত্য কর্‌তে পার্‌বে না।" "তুমি ছোট বংশে জন্মেছ বলে তোমায় যে দমিয়ে রাখ্‌তে চায় সে বড় ছোট। • • • • বিশ্বাস করো তুমি ছোট নও।" "শিক্ষা জ্ঞানালোচনা চরিত্র ও পরিশ্রমের দ্বারা দরিদ্র হলেও মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র তুমি হতে পারো।" "তুমি যে কাজই কর না কেন, লজ্জা নাই। লজ্জা ওই চুরি করায়, ভিক্ষা করায়, কিংবা মূর্খ হয়ে থাকায়।" (৩) অধ্যবসায়, পরিশ্রম বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা। "চেষ্টার দ্বারা ব্যর্থতাকে জয় কর্‌তে হবে।" (৪) ব্যবসা, শিল্পবাণিজ্য। "ব্যবসার মধ্যে জাতির বেঁচে থাক্‌বার উপকরণ অনেক বেশী। ... তুমি ভাল চাষা, কামার, দর্জি, মিস্ত্রী কারিগর হও।..... চাক্‌রীর জন্য জ্ঞানার্জ্জন করো না।" "সাধুতাকে অবলম্বন করে তুমি ব্যবসা কর—পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জ্জন কর—তোমার আসন নীচে হবে না।" (৫) সাধনা ও পরিশ্রম। "সাধনা—পরিশ্রম ব্যতীত জগতের কোন উন্নতি হয় না।" "যারা কাপুরুষ তারাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে। পুরুষ চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু, তোমার মাথা তোমাকে টেনে তুল্‌বে; তোমার কপাল নয়। একদিন দুইদিন করে জীবনের দীর্ঘ সময় চলে যাচ্ছে—জগতে যাঁরা বড় তাঁরা এ অপচয় সহ্য করেন না।" (৬) মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন—নিজের শক্তি সাধনা। "কোন বংশ চিরকাল সাবেক মর্য্যাদা ও সম্মান নিয়ে টিকে থাক্‌তে পারে না।" তেমনি জাতিও। (৭) কর্ম্মে প্রাণযোগ—দৃঢ় ইচ্ছা। "যে কাজই কর না, তাতে যদি কোন রকমে তোমার মন ঢেলে দিতে পার, তা হলে আর কোন ভয় নাই। সংশয়কে মনে স্থান দিতে নাই।" "বিশ্বাস ও দৃঢ় ইচ্ছার সম্মুখে অসম্ভব সম্ভব হয়ে পড়ে।" (৮) পয়সা কড়ি। "বড়লোক সম্পদশালী হবার অধিকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিরই আছে। তিনি জানেন অর্থ কি ভাবে ব্যবহার কর্‌তে হবে।" "অভাবগ্রস্ত যে, তার চিত্তের স্বাধীনতা থাকে না। তুমি মিতব্যয়ী হও, তোমার মনের স্বাধীনতা বেড়ে যাবে।" "অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের অভাব নিয়েই ব্যস্ত—সে সমাজের কি কাজ কর্‌বে?" "কখনও ঋণ করো না।" "দোকানের বাকী কাপড় গায়ে দিয়ে তুমি ভদ্রতা রক্ষা কর্‌ছ.....বিবেক তোমায় বল্‌বে এটা অপমান ছাড়া কিছু নয়।" (৯) জীবনে মর্য্যাদা। "তুমি চরিত্রবান কি না, তুমি কঠিন সত্যের উপাসক কি না, তুমি জ্ঞানের সেবক কি না।" "তুমি চরিত্রবান ও সত্যবাদী, জ্ঞানের সাধক ও পাপকে ঘৃণা কর,—তুমি যে কোন কাজই কর না—বিশ্বাস করো, তোমার মর্য্যাদা খুব বেশী।" "মানুষের সাম্‌নে যে মানুষকে দিয়ে জুতো খোলে, মানুষের ঘাড়ে চড়ে যে বাতাস খায়—তাকে দেখে তুমি দমে যেও না।" (১০) চাকরী, কাজ, কাম ও ব্যবসা। উদ্যম, চেষ্টা, পরিশ্রম। "চাকরী করা কাজ মন্দ নয়, যখন সেটা হয় মানুষের সেবা—যখন তাতে মর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট না হয়।.....প্রভুর সাম্‌নে যদি মনের বল না থাকে, কঠিন ভাবে সত্য কথা বল্‌তে না পার, প্রয়োজন হলেই চাকরী ছেড়ে দিবার সঙ্গতি না থাকে—তা হলে চাকরী করে তুমি পাপ কচ্ছো।" "স্বাধীন-হৃদয় সত্যের সেবক কামার হও সেও ভাল—নিজেকে যন্ত্র করে ফেলো না।" "চাকরী করে অন্যায় পয়সায় ধনী হবার লোভ রাখ? তোমার চেয়ে মুদি ভাল, মুদির পয়সা পবিত্র।" "কাজ হীন হয় ঐ সময় যখন কাজের ভিতর অসাধুতার সংস্রব থাকে।" (১১) চরিত্র ও চরিত্র-শক্তি। "চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব কর্‌বার আর কিছুই নাই।" "নিজেকে ছোট মনে করা ভুল।" "মানুষ যখন চরিত্রবান হয় তখন তার ভিতর অজেয় পুণ্যশক্তির আবির্ভাব হয়। সে শক্তিকে দমিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব। জাতির প্রত্যেক মানুষ যখন চরিত্রবান হয় তখন তাদের শক্তি হয় অসাধারণ।" (১২) শারীরিক পরিশ্রম। "হাতের কাজে অগৌরব নাই.....অগৌরব হয় মিথ্যায় মূর্খতায় নীচতায়।" "সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যতপ্রকার কাজ শেখা সম্ভব, সে সব শিখে রাখায় আদৌ অমর্য্যাদা নাই।" (১৩) আদর্শ—জীবন্ত আদর্শ। "জীবন্ত আদর্শের মূল্য বেশী।.....শক্তির স্পর্শে এসে নিজের শক্তি জেগে ওঠে।"

বইখানিতে এমনি হাজারো মহামূল্য কথা আছে। সেই কথাগুলি এমন প্রাণ দিয়া বলা যে বলার ভঙ্গীতেই কথাগুলি মনকে স্পর্শ করে। আর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক নানান দেশের নানা শ্রেণীর লোকের কাহিনীর বিচিত্র দৃষ্টান্তগুলি। এই বইখানি ছেলে-মেয়েদের সকলকে পড়িতে দেওয়া উচিত; বিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। দু চারটা ভুল—হয়ত ছাপার—চোখে পড়িল; তাহা ধর্ত্তব্য নয়।

হিন্দু-মুসলমান—শ্রীমহম্মদ খলিলর রহমান সঙ্কলয়িতা। প্রকাশক জোয়াদুল হাকিম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। সোল এজেণ্ট—দি নিউ ইরা পাব্‌লিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছোট, আকারের ৭৫ পৃষ্ঠা। কাগজ খুব ভালো; ছাপা উত্তম; কাপড়ে শক্ত বাঁধা। দাম সাত আনা।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব পাশাপাশি আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে হিন্দু-মুসলমান এক সত্যেরই উপাসক। "ধর্ম্ম যে নিত্য, সত্য; ধর্ম্ম যে চিরদিন এক, সব দেশে সব কালে এক।" "ভেদের সৃষ্টি হয় উপধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা আশ্রয় করিলে। সত্য মাত্রই ঈশ্বর-প্রেরিত তা যে দেশে যে কালে যার দ্বারাই প্রচারিত হোক।" "যাহা সত্য তাহা হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষেই সত্য।.... ভেদ অজ্ঞতাজনিত।" "মানুষের অন্তরের দেবতা যেমন এক, তেমনি বাহিরেও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হউক, সর্ব্বত্র মহাশান্তি বিরাজ করুক।" এই সংস্কারমুক্ত উদার সত্যবাণী সমর্থন করিয়া আমরাও বলি—আমেন, তথাস্তু। বইখানি ছোট, কিন্তু এর উদ্দেশ্য মহৎ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্পাদন। কোরান হইতে বহু বচন ও ধর্ম্মে

মূল তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া দেখানো হইয়াছে যে হিন্দুমুসলমান প্রকৃত সত্য উপাসক ধার্ম্মিক হইলে উভয় সম্প্রদায়ে মিলন সহজ হইবে—ত্যাগ করিতে হইবে উভয়ের সঙ্কীর্ণ মিথ্যা সংস্কার। এই হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য একদিন আবিষ্কার করিয়াছিলেন মহাত্মা কবীর; সেই পথে আমাদিগকেও চলিতে হইবে। তবেই দেশ-জননীর সেবায় দুই সহোদর হিন্দুমুসলমান মনপ্রাণ অর্পণ করিতে পারিবে। যে আহ্বান দেশমাতার মনে অহরহ জাগিতেছে, তাহাই ভ্রাতার কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে; এমন কে পাপিষ্ঠ মাতৃদ্রোহী আছে যে এই আহ্বান না শুনিয়া উদাসীন হইয়া ভেদ লইয়া পৃথক হইয়া থাকিবে?

কৃষক-শিক্ষা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এল-এল্‌বি, ডিষ্ট্রীক্‌ট্‌ এগ্রিকাল্‌চারাল অফিসার, ফরিদপুর।

সাধারণতঃ কি কি উপায়ে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের কৃষি শিল্প সমবায় স্বাস্থ্যরক্ষা গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা এই পুস্তিকায় বিশেষজ্ঞ লেখক সহজ ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। গ্রামের উন্নতির নিম্নলিখিত উপায়গুলি নির্দ্দিষ্ট ও আলোচিত হইয়াছে—(১) কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী, (২) স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, (৩) কৃষিক্ষেত্র, (৪) কৃষি-সমিতি, (৫) গোরক্ষণ, (৬) সমবায়-সমিতি, (৭) যাত্রা ও ছড়া, (৮) কুটীর-শিল্প, (৯) নৈশ বিদ্যালয়। যাঁরা গ্রামের উন্নতি করিতে উৎসুক তাঁরা লেখককে জানাইলে এই পুস্তিকা পাইবেন। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্‌টার এই পুস্তিকার ভূমিকায় আশ্বাস দিয়াছেন—"আমি আশা করি এই প্রবন্ধে যে-সব উপায়ের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে উহা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।" সত্য নাকি? আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল; দেশের উন্নতির চেষ্টা করিলে পুলিশে ঘোলাতন করে ও গভর্মেণ্ট অন্তরায়ন করে। এখন যদি গভর্মেণ্ট দেশোন্নতি করিতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে এ সুযোগ কারো ছাড়া উচিত নয়।

উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সারস্বত সম্মিলন মন্দির, উত্তরপাড়া। ৬৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র। ছয় আনা।

হুগলি জেলার বালি গ্রামের উত্তরপাড়া ক্রমে স্বতন্ত্র প্রসিদ্ধ গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার ইতিহাস, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী, শিক্ষাদীক্ষার কথা এই বিবরণে সংগৃহীত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের কাজে লাগিবে; বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপকরণ বলিয়া ইহা ঐতিহাসিকের সমাদর লাভ করিবে।

মহাজন-সখা—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ। চন্দননগর। ডিমাই ৮ পেজি ১২৮+।০ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কীয় রীতিনীতি আচরণ কর্ত্তব্য হিসাবনিকাশ দেনাপাওনা চালান জিনিস পাওয়ার মোকাম ইত্যাদি বহু বিষয় এই পুস্তকে দেওয়া আছে। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। ব্যবসাদার দোকানদার যাঁরা আছেন বা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁরা এই বই পড়িলে অনেক উপকার ও সাহায্য পাইবেন।

ঈশ কেন কঠ মাণ্ডূক্য উপনিষদ—কাশী, যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত, বিনামূল্যে বিতরিত, ডাকে লইতে হইলে দুই পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

উপনিষদ হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় মহামূল্য পুস্তক। বর্ত্তমান সংস্করণে উপনিষদের মূল, টীকা, ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও প্রত্যেক উপনিষদের পরিচয় ও তাৎপর্য্য আছে। ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে উৎসুক ব্যক্তি এই সুযোগে একখণ্ড করে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে ও পড়িয়া ভাবিয়া বুঝিতে আলস্য করিবেন না। যোগাশ্রমের পক্ষ হইতে উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজ্ঞান সাধারণের মধ্যে প্রচারের এই উদ্যম প্রশংসার্হ।

শ্রীমন্ত—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা ও ময়মনসিংহ। ১৩০+৯ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম নায়ক শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী ও তৎসম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় পাত্র ও ঘটনার সমালোচনা, বইএর গোড়ায় কবিকঙ্কণের পরিচয় ও পরিশিষ্টে কাব্যোল্লিখিত কয়েকটি স্থানের সংস্থান-নির্ণয় আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী বাংলায় এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য। এই বই পরীক্ষার্থী ছাত্রদের উপকারে লাগিবে।

লেখক যে লিখিয়াছেন যে লহনার শ্রীমন্তের প্রতি কোনো বিরাগ ছিল না, তাহা ঠিক নয়; লহনার বিরাগ কেন, আক্রোশ: পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। শ্রীমন্ত তখন শিশু; তার মা খুল্লনা ছেলেকে কোলের কাছে করিয়া ঘুমাইয়া ছিল; কিন্তু "চিয়ায়ে খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো।" খুল্লনা ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল চণ্ডী লহনার খট্টাতলে রাখিল শ্রীপতি লহনাই বোধ হয় শ্রীপতিকে চুরি করিয়া নিজের খাটের তলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু খুল্লনার কাছে জগতের যা কিছু ঘটনা সবই চণ্ডীর কার্য্য বলিয়া প্রতিভাত হইত বলিয়া সে লহনার কার্য্যকেও চণ্ডীর কার্য্য বলিয়াই দেখিয়াছিল। তার পর সিংহল যাত্রার সময় যখন 'লহনার পদে ছিলা কৈল নমস্কার।' তখন লহনা অম্লানবদনে বসিয়াছিল—"বাহুড়িয়া দেশে পুনর্ব্বার আসিহ আর।"

চণ্ডীদাস—শ্রীকরালীকিঙ্কর বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশক—মজুমদার সিংহ এণ্ড কোম্পানী, বৈদ্যনাথ, দেওঘর। সচিত্র। ১৫০ পৃষ্ঠা। বারো আনা বা পাঁচ সিকা।

চণ্ডীদাসের প্রাদুর্ভাব-সময়ে দেশের ও ধর্ম্মের অবস্থা কেমন ছিল; চণ্ডীদাসের জীবনী; চণ্ডীদাসের প্রতিভা, কবিত্ব ও কবিতার সমালোচনা ও নিরূপণ; চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমত, ধর্ম্মতত্ত্ব, রসতত্ত্ব; চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিভাগ ও পদাবলীতে বিবৃত কৃষ্ণলীলার ক্রম; ইত্যাদি বিষয় এই বইএ সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। রচনার অনুসন্ধান পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতার পরিচয় আছে। এই বই চণ্ডীদাসকে বুঝিবার সহায়ক হইবে।

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ। প্রকাশক—শ্রীযতীনচন্দ্র রায় এম-এ, সাহাজাদপুর, পাবনা। রয়াল ৮ পেজি ২৪৯+৫৲ পৃষ্ঠা। দু টাকা।

সতীশবাবু বৈষ্ণবসাহিত্য আলোচনা করিয়া ও পদাবলী সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয় কবিত্ব রচনা-প্রণালী ও বিশেষ-অর্থযুক্ত পদ ব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী ও শব্দসূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এইসকল অপরিচিত পদ-কর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এইসব বৈষ্ণবপদাবলী বঙ্গসাহিত্যরসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।

সাঁজের কথা—শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯।১ ও ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সচিত্র। দেড় টাকা।

আমরা যে বইখানি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি তার শেষের দিকের ফর্ম্মা নাই, বই অসম্পূর্ণ; ১৭৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। এণ্টিক কাগজে ছাপা। বইখানি বেশ মোটা-সোটা। সুতরাং দাম সস্তাই।

ছেলেরা সাঁঝবেলাতে বাড়ীর বয়স্ক মেয়েদের ধরিয়া ঘিরিয়া বসে গল্প শুনিবার জন্য। কিন্তু এখনকার মেয়েরা আর গল্প শোনেন না, মনে করিয়া রাখেন না, গল্প বলিতে জানেন না, গল্প বলিতে লজ্জা বোধ করেন। তাই এখন এই সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার যুগে ছেলে-মেয়েদেরও আত্মনির্ভর হইতে হইয়াছে, তারা নিজে নিজে গল্প পড়িয়া নিজেদের কল্পনার কৌতূহল চরিতার্থ করে। যাঁরা ছেলেমেয়েদের এই গল্প শোনার সাহায্য করেন তাঁরা সমাজহিতৈষী; সুতরাং ছেলে মেয়ে ও তাদের অভিবাবকদের ধন্যবাদের পাত্র। শিবরতন-বাবু ছেলেমেয়েদের সাঁঝের কথা শুনাইয়াছেন; এই কথায় এই গল্পগুলি আছে—বসুমাতা, রত্নমালা, চারি বন্ধু, কেশবতী, ভাগ্যধর, জলদানী কন্যা, রাজ-বুদ্ধি ও চোরের বুদ্ধি, বেণুকা, হরিদাস; বইএর শেষ দেখিতে পাই নাই, বইএর শেষে আরো গল্প আছে কি না বলিতে পারিলাম না; বইএর সূচীও নাই। গল্পগুলি চলিত কথ্য ভাষায় মুখে মুখে গল্প বলার ধরণে সরস করিয়া লেখা; সব গল্পগুলিই চিত্তাকর্ষক ও সুলিখিত।

সাঁঝের ভোগ—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। শিশির পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৪৮ পৃষ্ঠা। কাগজ ছাপা ছবি উত্তম, মলাট সুন্দর। দাম পাঁচ সিকা।

ছেলে মেয়েদের সাঁঝের ভোগ রূপকথার বই—গল্প আছে ছটি—তাপাই, ঠনাঠন দাস, জামাই-বাবু, মোহনকুমারের ঘুম, কৈ-মাছের হিসাব, নবাবের আম খাওয়া। গল্পগুলি ভারি মজার, হাস্যরস-প্রধান, সুতরাং বেশ উপভোগ্য। ভাষা চলিত মুখের কথা, সহজ সরস রচনাভঙ্গী। বইখানি ছেলেদের ত ভালো লাগিবেই, বুড়োদেরও ভালো লাগিবে। ছবিগুলি বেশ ভালো; বাংলা বইএ এমন ভালো ছবি অল্পই দেখা যায়।

রাখালের রাজগি—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী ৪৯ রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। চারখানা রঙিন ছবি আছে; এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা; খুব ভালো কাপড়ে বাঁধা; ৮০ পৃষ্ঠা। দাম মাত্র একটি টাকা, সুতরাং খুব সস্তা।

বাংলার এক কাল ছিল যখন কানু ছাড়া গীত হইত না। মানুষের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া খেলা রঙ্গ প্রেম মান বিরহ মিলন সখ্য বাৎসল্য দাস্য প্রভৃতি মানব জীবনের ও সমাজের যতরকম অবস্থা ও সম্পর্ক হইতে পারে সমস্তই এক কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যে বর্ণিত হইত। কৃষ্ণ ছিলেন যেন চিরন্তন মানব; আবার তিনি ভগবানেরও ভাগীদার হইয়া উঠিয়াছিলেন; এই জন্য কৃষ্ণকথা লোকের মনকে বিশেষ ভাবে রসার্দ্র ও মুগ্ধ করিত। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে কেন্দ্রাতিগ বেগে মানব-জীবন ও মানব-সমাজের কথা বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ও সম্পর্কের লোকের কহিনীতে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের নাম উপন্যাস বা গল্প। দীনেশ-বাবু এই নূতন ছাঁচে পুরাতন মসলা ঢালিয়া পুরাতনকে নূতন গঠন দিয়াছেন। কৃষ্ণের মথুরায় রাজা হওয়ার পর বৃন্দাবনবাসীদের বিরহ-ব্যাকুলতায় ও প্রণয়ের আন্তরিক আকর্ষণে কৃষ্ণের রাজকীয় অটলতা কেমন করিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জের দিকে টলিয়াছিল সেই পুরাতন কহিনীটিকে লেখক কবিত্বরসমধুর মুখের চলিত কথায় সহজ সরল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; মাধুর্য্যের কাছে ঐশ্বর্য্যের পরাজয় দেখাইয়া হৃদয়বৃত্তির জয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ বই শিশু ও বয়স্ক সকলেরই তুল্য মনোরম হইয়াছে।

মুক্তাচুরি—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। গুপ্ত কোম্পানী। ছখানি রঙিন ছবি। ৮২ পৃষ্ঠা। কাগজ ছাপা বাঁধা পরিপাটি। দাম মাত্র এক টাকা ছয় আনা।

এখানিও রাধাকৃষ্ণের পুরাতন গল্পের নূতন সজ্জা। রাখাল ছেলেদের সাধ হইয়াছিল মুক্তা দিয়া গোরু সাজাইতে। কৃষ্ণ বলিলেন—একটা মুক্তা পাইলে তিনি তাহা বুনিয়া মুক্তার বন করিয়া দিতে পারেন। এখন একটা মুক্তাই পাওয়া যায় কোথায়? রাধা রাজ-নন্দিনী; তাঁর কাছেই মুক্তা চাওয়া স্থির হইল। রাধার ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণ নিজে আসিয়া মুক্তা চাহিবেন। তাই তিনি মুক্তা দিলেন না। এই উপলক্ষে কিশোর-কিশোরী কৃষ্ণ-রাধার মান-অভিমান ও অবশেষে মিলন ব্যাপার লইয়া এই কাহিনী। রচনার ধরণ কবিত্বময় ও মনোরম।

রাগরঙ্গ—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। গুপ্ত কোম্পানী। পাঁচখানি রঙিন ছবি। ছাপা কাগজ বাঁধা পূর্ব্ববৎ উৎকৃষ্ট। দাম মাত্র একটাকা।

এও কৃষ্ণকথা। রাধার মান ও রাগের রঙ্গ লইয়া এই কথা রচিত। রচনার ভাষামাধুর্য্যে ও ধরণে পুরাতন জিনিস নূতনের মোহনতা অর্জ্জন করিয়াছে।

নতুন রূপকথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, চন্দননগর। ৬৮ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ বাঁধন সুদৃশ্য। দাম লেখা নাই।

বর্ত্তমান কালের সাহিত্যক্ষেত্রে সুরেশবাবু ভাবুক চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই বইএ দুটি রূপক গল্প আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বিস্তৃত ভূমিকায় গল্প দুটির রূপক তত্ত্ব বিচক্ষণ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। গল্প দুটির তাৎপর্য্য—জগৎ মিথ্যা জগৎ মিথ্যা জপ করিতে করিতে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের কি দুর্গতি হইয়াছে তাই চোখে আঙুল দিয়া দেখানো। শাকদ্বীপের রাজা জীবনগুপ্তের রাজ্যে এক সন্ন্যাসী আসিয়া যেই বলিলেন জীবন ও জগৎ মিথ্যা, অমনি সব প্রজা তাই জপিতে লাগিয়া গেল। "যে রাজ্যে প্রতি বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হয় সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ" উপস্থিত হইল, কারণ "দেশের নরনারীরা জীবনে আস্থা হারিয়েছে, জীবনের আনন্দকে তাড়িয়েছে।" "আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে, তার বিনিময়ে সে লাভ করেছে কেবল মৃত্যু। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে ইহলোকের দুঃখ পরলোকের সুখ হয়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকে সামর্থ্য হয়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা—ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গলাভের সহজ ও সত্য উপায়।" প্রতিবেশী হন রাজা শাকদ্বীপদের নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবতার সুযোগ পাইয়া রাজ্য আক্রমণ করিল; কিন্তু "আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থে একটি লোক অগ্রসর হল না।" কারণ সকল লোকই তখন একাগ্র মনে জপে মগ্ন—জগৎ মিথ্যা যখন, তখন "কি হবে রে ভাই মিথ্যার জঞ্জাল বাড়িয়ে, কোন রকমে দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ভাল।" ফলে দেশ পরাধীন হইয়া গেল। রাজা হনেশ্বর শাকদ্বীপের সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া

বহুমূল্য মণিহার খুলে নিজ হাতে সন্ন্যাসীর গলায় পরিয়ে দিলেন। বল্‌লেন—'মহাত্মন্, আমার পিতৃপিতামহরা সাতপুরুষ ধরে' অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারেননি, আপনি একপুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন। সম্রাট হুনেশ্বরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ও এই যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করে' তাকে কৃতার্থ করুন।' তারপর তাঁর সেনাপতির দিকে চেয়ে বল্‌লেন—'সেনাপতি, সন্ন্যাসীকে আমার সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে রেখে আস্‌বার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক, তার জন্যে এক মাস সময় দিলেম; সন্ন্যাসীকে জানিয়ে দেওয়া হোক, ঐ এক মাস পর থেকে তাঁকে কোন দিন আমার সাম্রাজ্যের সীমানায় দেখ্‌তে পেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে।" অপর গল্পটি পাখীদের নিয়ে লেখা। বৃদ্ধ গৃধ্রের শাস্ত্রবচন শুনে বুলবুলি কেবল জগৎ মিথ্যা বুলিই কপ্‌চাইয়াছিল, তার মধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার ভুলিয়া। এই নতুন রূপকথা রূপককথা; এর অন্তর্নিহিত সত্য তাৎপর্য্য দেশের নরনারী হৃদয়ঙ্গম করিয়া জড়তামুক্ত আত্মপ্রত্যয়ী দেশপ্রিয় হোন লেখকের সঙ্গে আমাদেরও এই আন্তরিক কামনা ও অনুরোধ। রূপকথার রচনার ধরণ মিষ্ট, সরস বেগবান প্রাণবান।

সোনার ঝরণা—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ৬২ পৃষ্ঠা। ছবি আছে। দাম বারো আনা।

ছোট ছেলেদের লেখা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িবার গল্পের বই। আটটি গল্প আছে। গল্পগুলির ভাষা অতি সরল ও সহজ। ছেলেমানুষের লেখা কিনা, তারা পাণ্ডিত্য ফলাইবার লোভে ত এখনো পড়ে নাই। গল্প বলিবার ভঙ্গীও সরস—যে বয়সে গল্প শুনিবার আগ্রহ প্রবল থাকে, সেই বয়সে এরা দুই ভাই গল্প শুনাইতে বসিয়াছে, তাই তাদের ধরণ এখনো আড়ষ্ট গম্ভীর হইবার অবসর পায় নাই। গল্পগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও কৌতুক, মানবচিত্তের রহস্যের আভাস ও অলৌকিক কল্পনার খেলা পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বইখানি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রীতিপ্রদ ত হইবেই; অধিকন্তু তারা তাদের সমবয়সী লেখকদের রচনা পড়িয়া নিজেরাও রচনা করিতে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ অনুভব করিবে।

খোকার বই—শ্রীইন্দুবালা ঘোষাল প্রণীত। ইউ রায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৬৩ পৃষ্ঠা। ছবি আছে। দশ আনা।

এখানিও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িবার গল্পের বই। দশটি গল্প আছে। মেয়েরা নিত্য খোকাখুকীদের গল্প বলিয়া চিত্তবিনোদ করিয়া থাকেন; গল্প বলার কৌশল ও আর্ট তাঁদের অভ্যস্ত বিদ্যা। এই বইএ সেই আয়ত্ত অধিগম্য বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। সরল সরস মুখের চল্‌তি কথায় গল্পগুলি লেখা; গল্পগুলিতে খুব নূতনত্ব আছে। ছেলেমেয়েরা এই বই পাইলে খুসী হইবে, কল্পনার খোরাক পাইবে, নরচিত্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষাও লাভ করিবে।

পার্ব্বণী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ক্যাণ্টোফার লেন, কলিকাতা। দাম ত্রিশ আনা।

এখানি বহুরকি বই। পূজার পার্ব্বণে বাহির হয়, নামান খ্যাতনামা লেখকের লেখায় তোড়া বাঁধিয়া। এতে থাকে গল্প কবিতা প্রবন্ধ রঙ্গ ছবি খবর; সবগুলি ছেলেমেয়েদের উপযোগী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাংলার অনেক নামজাদা লেখকের লেখা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এই বহুরকি বই ছেলেমেয়েদের পার্ব্বণী উপহার দিলে তারা খুসীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

রংমশাল—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীচারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম ন' সিকে।

এখানিও নানা নামজাদা লেখকের লেখার তোড়া, ছেলেমেয়েদের জন্য সংগ্রহ। এতেও গল্প প্রবন্ধ কবিতা রঙ্গ ছবি প্রচুর আছে। ছেলেমেয়েরা এই রংমশাল হাতে পাইলে হাস্যদীপ্তিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে সুনিশ্চিত। এ বাস্তবিকই রঙের মশাল হইয়াছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্দিষ্ট বইএ রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে বাঁশী বাজানোর ছবি না থাকিলেই ভালো হইত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রব্যাখ্যায় যতই কবিত্ব ও আধ্যাত্মিকতা আরোপ করুন না কেন, সম্পাদকদের এই রুচি ও বিচার আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না।

সদৃশবিধান-সংহিতা—শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এইচ-এম-এস প্রণীত। গৌরীপুর, আসাম। দেড় টাকা।

হোমিওপ্যাথীর বাংলা সদৃশবিধান। হোমিওপ্যাথী মেটিরিয়া-মেডিকা অর্থাৎ ভেষজতত্ত্ব পদ্যে এই বইএ লেখা হইয়াছে। কোন্ ঔষধ কি কি লক্ষণে প্রয়োগ করা বিধি তাকেই বলে ভেষজতত্ত্ব। প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন লিপির চেয়ে শ্রুতির উপর নির্ভর ছিল বেশী, তখন আইন চিকিৎসা অঙ্ক প্রভৃতি নীরস বিষয়ের শাস্ত্রও পদ্যে রচিত হইত, কারণ পদ্য শীঘ্র মুখস্থ করা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই ডাক্তার লেখক এই পদ্য ভেষজতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা খুব শক্ত অথচ সহজও; এর প্রচার খুব হইতেছে, ঘরে ঘরে টোট্‌কার বোচ্‌কার মতন একএকটা ঔষধের বাক্স ও বই আজকাল দেখা যাইতেছে। দেশে যেমন রোগের প্রাদুর্ভাব ও চিকিৎসকের অভাব, তাতে দেহধারী মাত্রকেই দেহ বিকল হইলে মেরামত করিবার বিদ্যা অল্পস্বল্প অর্জ্জন করিতে হইবে। এই চিকিৎসা শিক্ষায় বইখানি অনেককে সাহায্য করিতে পারিবে। বইখানি সহজ ভাষায় লেখা; অল্পশিক্ষিত লোকেরও বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

মোহমুদ্গর—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। সর্ব্বমঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডার, ৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। এক আনা।

জগৎ মিথ্যা, কেউ কারো নয়,—এইসব সর্ব্বনেশে কথায় আমাদের সমস্ত জাতিটাকে কর্ত্তব্যবিমুখ উদ্যমহীন জড় পঙ্গু করিয়াছে। এই কর্ম্মকুণ্ঠ জাতি যখন যুগযুগান্তরের জড়তা ঝাড়িয়া একটু গা মেলিতেছে তখন তার মোহ চূর্ণ করিবার জন্য এ মুদ্গর আস্ফালন কেন? এসব ভোলা কথা ভুলিতে দেওয়াই ভালো। এখন আলস্য জড়তা ভাঙিবার মুদ্গর কেউ বাহির করিতে পারেন ত করুন, এসব বকেয়া বাতিল বইএর আর দরকার নাই। যিনি লোককে গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিতে আসিয়াছেন—

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ॥
কস্ত্বং বা কুত আয়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তয় তদ্ ইদং—

তিনিই কিন্তু লজিকের মাথায় মুদ্গর প্রহার করিয়া সম্বোধন করিতেছেন—ভ্রাতঃ! উপদেষ্টা যদি সম্পর্কশূন্য পরকে ভাই বলিয়া আপনার জন করিতে চান, তবে অন্য লোকে যদি আপনার লোককে আপন ভাবে তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। যাই হোক, এসব বাজে বকুনি শুনিবার ও শুনাইবার সময় এখন নয়। এখন শুনাইতে হইবে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্ তৎ কবয়ো বদন্তি!

দক্ষিণেশ্বরে সশিষ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীরমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জমিদার ও ব্যবসায়ী, ২নং লালমাধব মুখার্জ্জির লেন, কলিকাতা। চার আনা, বাঁধাই ছয় আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দক্ষিণেশ্বরের বর্ণনা, পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ এবং ভাব গদ্যে পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মানুষ্ঠান—শ্রীযুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা ঠাকুর-বাটী। মূল্য অনুল্লিখিত।

হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি, দৈনিক অনুষ্ঠান কি কি, সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কত রকম কাণ্ড করিতে হয় বা করা উচিত, নানা দেবীর তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি কবচ স্তোত্র জপনিয়ম ষট্‌চক্রভেদের নিয়মক্রম ইত্যাদি এই পুস্তকে সংক্ষেপে ও বিক্ষিপ্ত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিজ্ঞানের গল্প—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ১২৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র। ছাপা কাগজ উত্তম। দাম এক টাকা।

এই বইএ জড়বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সহজ সরল ভাবে গল্প করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতে এই বিষয়-গুলির গল্প আছে—(১) সূর্য্য, (২) সূর্য্যের তাপ ও আলো, (৩) আলোর উৎপত্তি, (৪) শব্দের উৎপত্তি, (৫) রঙিন আলো, (৬) রঙের খেলা, (৭) মেঘ ও বৃষ্টি, (৮) মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি, (৯) গাছের ঘুম, (১০) রক্ত, (১১) ব্যাঙাচি, (১২) ব্যাঙ, (১৩) মাছ, (১৪) আমাদের খাদ্য, (১৫) শরীরের বিষ। বাংলা ভাষায় যে অল্প দু-চারজন বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ-বাবু একজন প্রধান; তিনি বহুকাল এই একই বিষয়ের আলোচনা করিয়া অভিজ্ঞ ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষকতা করিয়া ছেলেমেয়েদের রুচি ও শক্তির সহিত পরিচিত হইয়েছেন; তাঁর লেখা বই সুতরাং উত্তম হইবারই কথা, হইয়াছেও। লেখার ভাষা সরল ও সরস, বিষয়গুলি সহজ ও প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে গল্পের ধরণে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের সঙ্গে ছেলেমেয়ে-দের পরিচয় ঘটানো অভিভাবকদের কর্ত্তব্য; এই বিজ্ঞানের গল্প সে বিষয়ে নানা দিকে সাহায্য করিতে পারিবে।

শিব-নির্ম্মাল্য—স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিভিন্ন কালের রচনার সংগ্রহ। প্রকাশক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১১৮ পৃষ্ঠা। দাম লেখা নাই।

এখানি কবিতার বই। প্রকাশক বিজয়বাবু লিখিয়াছেন—"যিনি শিব-স্বরূপ মঙ্গলময়কে জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরদিন লোকসেবায় ব্রতী ছিলেন, যাঁহার সকল শ্রেণীর রচনাই জগতের মঙ্গল-কামনায়, তাঁহার কবিতাগুলির শিবনির্ম্মাল্য নাম সার্থক হইয়াছে। কবি দেবভক্ত, স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বার্থত্যাগী; যাহা তাঁহার জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাই তাঁহার রচনাতে ফুটিয়াছে। কবির জীবন ও কবিতা এক সুরে বাঁধা।" বাস্তবিক এই দারিদ্র্যব্রতী স্বার্থত্যাগী শক্তিশালী ভক্ত কবির রচনায় তেজ ও বেগ, সত্যদৃষ্টি ও সহানুভূতি পাশাপাশি প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের কবিদের মধ্যে শিবনাথের আসন উচ্চে। একাধারে কবিত্ব ও শিক্ষা, উদ্দীপনা ও বিষপ্রেম, দুঃখ-বরণে আহ্বান ও পরদুঃখে কাতরতা এই কবিতাগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ছেলেবেলায় চৈতন্যের সন্ন্যাস আগ্রহের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং পড়িতে পড়িতে দুঃখের ছায়ায় মন যে কিরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত তা এখনো মনে পড়ে। [illegible] দুইটি কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই;
নিজে ত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।
সত্য—ধন মান চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর;
এই আশীর্ব্বাদ কর হে ঈশ্বর,
খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা, পূর্ণ কর ভাই।

মহাত্মা শিবনাথের এই বাসনা তাঁর অন্তর-দেবতা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁর এই জ্বলন্ত ত্যাগের ও কর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করুক। তিনি দেশের জন্যও কাতর ছিলেন ও তার মঙ্গলচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন—

রক্তবিন্দু হতে শুনি এ জগতে
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকার,
জীবন-সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্তবিন্দু পড়িল এবার
শত পুত্র হবে বীর অবতার।
ভারত আঁধার। ভারতের ভার
ঘুচাইবে তারা, ভেবে মরে যাই।

কিন্তু দেশসেবার অধিকারী সেই, যে কবির ন্যায় ত্যাগী ও সংযমী—

ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

এই বইখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার বিশেষ উপযুক্ত। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে ইহা পড়িতে দেওয়া উচিত।

নারীর উক্তি—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, ৩ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডিমাই ১৬ পেজি ১৫৩ পৃষ্ঠা। আর্ট পেপারে ছাপা। দাম এক টাকা।

এই বইএ নারীর সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সাতটি প্রবন্ধ আছে। (১) বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাবিচার। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সমাজে ও নারী-প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সেসব সুফলপ্রদ কি কুফলপ্রদ তারই বিশদ বিচার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে "সমাজসংস্কার করিতে গেলেই পুরাতন মন্দের সহিত কতক ভালও লোপ পায়, এবং নূতন ভালর সহিত মন্দও আসিয়া পড়ে।" "বোধ হয় দেখিব যে ক্ষতিপূরণের নিয়মানুসারে প্রায় প্রত্যেক দোষেরই অপর পৃষ্ঠায় একটি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।" এই গুণগুলি লেখিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বুদ্ধির উদারতা বা সাম্যভাব; আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান; সময়ের মূল্যবোধ ও গৃহস্থালিতে সুশৃঙ্খলা ও মনোযোগ; বেশভূষা ও গৃহসজ্জায় পারিপাট্য; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান; পৃথিবীর খোঁজখবর রাখা ও সামাজিক উন্নতিচেষ্টায় যোগ দেওয়া; স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সুমাতা হইবার ক্ষমতা। (২) সমালোচকের পত্র। লেখিকার রচনা গুচ্ছ নামক গল্পের বই সমালোচনা। (৩) সম্বন্ধ। মানুষ জন্মিয়াই নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া যায়; ঘর ও পরের সম্বন্ধের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে পুরুষ ও নারী উভয়কেই; পুরুষ গতি ও নারী স্থিতি; এই গতি-স্থিতির ছন্দই চলা—"যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।" নারী ও পুরুষের "এই চেষ্টাপরম্পরার নামই

ক্রমোন্নতি বা জীবের অভিব্যক্তি।" (৪) আদর্শ। এই জাতীয় জাগরণের যুগে নারীর জীবনযাত্রার আদর্শ কি হইবে? জাতীয় শোভাযাত্রার আদর্শ কি হইবে? জাতীয় শোভাযাত্রার সহযাত্রিণীকে বিশ্বভাবের সহিত পরিচিত হইয়া আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। (৫) ভদ্রতা। "ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম, এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক, ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ,—এবং উভচর।" "ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, তার ফুল সংযম।" এই ভদ্রতা সমাজ-জীবনে "অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।" (৬) গ্রীস ও রোম। এটি একটি ফরাসী ইতিহাসের এক অংশের অনুবাদ। গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও সভ্যতার মূল তত্ত্ব ও পরিণতি আলোচিত হইয়াছে। (৭) পাটেল-বিল। বাদী প্রতিবাদী সকল পক্ষের যুক্তিতর্ক আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু লেখিকার মতে বাহিরের চাপে ভেদ কখনো ঘুচিবে না। "বাইরের চাপে বিদেশের শিক্ষায় আমাদের কতকগুলো বাধা ভেঙ্গেছে, কতক-পরিমাণ চৈতন্য জন্মেছে—এক হবার, স্বাধীন হবার, উন্নত হবার দিকে একটা তাড়না ও প্রেরণা এসেছে। বাকিটা কি নিজের ভিতর থেকে হবে না? হিন্দুসমাজ কি বুঝবে না যে ভেদের কাল গিয়েছে, সাম্যের দিন এসেছে? কেউ আর অধীন থাকতে চায় না; কারণ 'সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে'।" "রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন রাজার কাছ থেকে স্বরাজ চাচ্ছি, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও—যে এতদিন মূক ছিল সে ভাষা শিখেছে, যে বধির ছিল সে শুনতে পাচ্ছে, যে অন্ধ ছিল সে আলো দেখেছে, যে পায়ের তলায় পড়ে ছিল সে উঠে বসতে চাচ্ছে; এই বেলা যদি উচ্চ জাতি পুরাতন কৃত্রিম ব্যবধান সরিয়ে ফেলে আপনি নেমে আসে ও সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশে যায়, সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মবিসর্জ্জন করে, অসার পদমান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ত ভাল,—তাদেরই পক্ষে ভাল; নইলে অচিরে তাদের মান ধুলোয় লুটবে, সেই সঙ্গে প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। এখনই ত তাই ঘটছে; এখনই ত হিন্দুসমাজ মৃতপ্রায়। কেবল বহিষ্করণ, কেবল তিরস্করণ, কেবল জাতিঃপাত ও দলাদলি করে' ভাল লোক, শিক্ষিত লোক, কৃতী লোককে বর্জ্জন করতে থাকলে কদিন হিন্দুসমাজ টিকবে, কাকে নিয়ে দশজনের মধ্যে একজন হবে?—সঙ্কীর্ণতা দূর করুক, কড়াকড় নিয়ম শিথিল করুক; কিসে হিন্দুয়ানীর বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব তাই বিচারপূর্ব্বক রক্ষা করুক; যাতে তার ক্ষয়ক্ষতি, যা কালের অনুপযোগী, উন্নতির বিরোধী, তাই বর্জ্জন করুক;—তবে ত জাত গেলেও জাতি রক্ষা হবে।" এবং এইজন্য শিক্ষিত যুবকদের সহধর্ম্মিণী লাভ করিতে হইবে, তা তিনি স্ববর্ণিনী বা অসবর্ণিনী যাই হোন।

এই বইখানিতে ভাবিবার ও পালন করিবার মতন অনেক গুরু ও উপাদেয় উপদেশ পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আছে। নারীর উক্তি নারীরা পড়িয়া দেখিয়া উপকৃত হইলেই সমাজ গৃহস্থালি পরিবার দেশ সকলকে উপকৃত করিবেন সঙ্গে সঙ্গে—কারণ ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজ ও দেশের উন্নতি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বর্ণনাচাতুর্য্য ও রং ফলাইবার বাহাদুরী আছে—কিন্তু এই গুণই দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; নানা রূপক অলঙ্কার গল্পোদ্ধার ইত্যাদির অরণ্যে আসল কথা প্রায়ই আড়াল পড়িয়া গিয়াছে—মূল বক্তব্যের ধারাটি চোখের সামনে দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু তা না থাকিলেও পড়িতে ক্লেশ বা মন্দ লাগে না, অবান্তর কথাও সুন্দর করিয়াই বলা হইয়াছে। কথাগুলি সাধারণ অল্পশিক্ষিতা নারীদের পক্ষে একটু গুরুপাক; তবু সকল নারীর ইহা পড়িয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানবের আদি জন্মভূমি—শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত, ২ শঙ্করঘোষের লেন, কলিকাতা। ডিমাই আটপেজি ৪৯০+১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগজের মলাট ২৷৷০ ও বাঁধানো ৩৲ টাকা।

পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় বৈদিক সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ৪৫ বৎসর গভীর গবেষণার ফল এই মূল্যবান পুস্তক। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় এই পুস্তকে দেশী বিদেশী বহু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞের মত ও অনুসন্ধান-ফল আলোচনা প্রতিবাদ বা সমর্থন করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের তন্ন তন্ন বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন—সমগ্র মানবজাতি এক মানবদম্পতির সন্ততি; যে দেশে প্রথম মানবসৃষ্টি হয় তাকেই বেদে পিতৃভূমি বলা হইয়াছে। আদি পিতামহের নাম বিরাট, তিনি মেরু পর্ব্বতের অধিবাসী ছিলেন; এই মেরু পর্ব্বতকে বিদ্যারত্ন মহাশয় মঙ্গোলিয়ার আল্‌তাই পর্ব্বত বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন; স্বর্গ নরক অন্তরীক্ষ ভূ ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ প্রভৃতি লোক সমস্তই পৃথিবীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ—পৃথিবীবহির্ভূত কোনো স্থান বা কাল্পনিক নাম মাত্র নয়;—যেমন মঙ্গোলিয়া, পৃথিবী বা ভূ ভারতবর্ষ, ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী তুরস্ক পারস্য—আফগানিস্তান, স্বর্লোক তিব্বত তাতার মঙ্গোলিয়া, মহর্লোক দক্ষিণ সাইবেরিয়া, তপোলোক মধ্য সাইবেরিয়া, সত্য বা ব্রহ্মলোক উত্তর সাইবেরিয়া, জনলোক চীন। এইরূপ লোক বা দেশের একখানি ম্যাপও আছে। দেবলোক যদি পৃথিবীতে, তবে দেবতা ও মানুষ একই মঙ্গোলিয়া হইতে দেবতা বা মানুষ ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর সকল দেশে গিয়া বাস করে; পিতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইবার পথই দেবযান বা পিতৃযান—এ দুই শব্দ পারলৌকিক ব্যাপার বোধক নয়। স্বর্গে অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ায় দেবগণের মধ্যে অর্থাৎ অবিভক্ত মানবসমাজে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে তারা নানা দিগ্‌দেশে ছড়াইয়া পড়ে ও আর্য্য নাম গ্রহণ করে; ভারতবাসী মানবেরা সুর ও অসুর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, এবং সুরাসুর যুদ্ধের ফলে অসুরগণ পরাজিত হইয়া অন্তরীক্ষে পলায়ন করে। এই আদি মানবসমাজের ভাষা ছিল দেবভাষা বা সংস্কৃত। এইজন্য জগতের সকল জাতির ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—জুড়িয়া—যাদব; জু—যদু; স্যাক্‌সন—শকানু; জর্ম্মন—শর্ম্মন; টয়টন টিউটন—দ্যুতান; আফগান-ঈ-স্তান—অপোগস্থান; প্যালেষ্টাইন—পল্লীস্থান; ইস্‌রাইল—আর্য্য; সিথিয়া—শকারসথ; আর্মেনিয়া—আর্য্যরম; আর্মেনিয়ান—আর্য্যমানব; পিরামিড—পুরীমঠ; আলতাই—ইলাস্থায়ী; মঙ্গলিয়া—(মঙ্গ শব্দের অর্থ আকাশ) আকাশসম্বন্ধীয়; ইত্যাদি। এই পুস্তকে বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শব্দসাদৃশ্য দেখিয়া কাহাকেও জাতি বিবেচনা করাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিতব্য অভিমতের প্রতি অত্যধিক মমতা ও পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়াছে; এইরূপ অভিমত টেকসই নয় বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত। সাধারণেরও উচিত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার উৎসাহদাতা হওয়া। এই বই ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া বিলাতী প্রকাশকদের দিয়া প্রচার করিলে বিদেশের সুধীসমাজে সমাদর হইতে পারে।

—মুদ্রারাক্ষস।

বার্থা

(গী দ্য মোপাসাঁ হইতে)

আমার বন্ধু বুড়ো ডাক্তার বনেট অনেক দিন থেকেই আমায় রায়োঁতে যেতে লিখেছিলেন, কিন্তু কাজের ভিড়ে অনেক দিন তাঁর ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেবার-কার শীতের শেষে রায়োঁতে যাওয়া ঠিক কর্‌লাম। এক-দিন আধা-কোয়াসা-ঢাকা সকাল বেলায় রায়োঁর প্লাটফর্‌মে নেমে দেখি আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর ডগ্‌কার্ট্‌খানা চড়ে মাইলটাক দূরে বাড়ীতে পৌঁছোলাম। এক পেয়ালা কাফি খেয়ে নিতেই আমার বন্ধু বলে উঠ্‌লেন, "চল, জায়গাটা দেখ্‌বে চল।"

ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ, মাঝে মাঝে দুচারখানা বাড়ী, তাদের আশেপাশে ফল-ফুলের বাগান, সবই বেশ লাগ্‌ছিল। একটা বুড়ো ওক-গাছের পেছনে একখানা বাড়ীর কাছে থেমে আমার বন্ধু বল্‌লেন, "দাঁড়াও, আমি একটি রোগীকে দেখে এক্ষুনি আস্‌ছি।" এই বলে তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন।

বাড়ীখানা দেখ্‌তে একটু অদ্ভুত রকমের, চেহারাটা বড্ড গম্ভীর, অনেকটা পোড়ো বাড়ীর মত। একটু লক্ষ্য করে বুঝ্‌লাম যে এ-বাড়ীর একটাও জানালা নেই, দেওয়ালের মাঝে মাঝে ফুটো। বাড়ীখানা দেখে মনে হতে লাগ্‌ল যে এখানে এমন কেউ আট্‌কা থাকে যাকে বাইরের কাউকে দেখ্‌তে দেওয়া হয় না। ডাক্তার ফিরে এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। তিনি একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, "আন্দাজটা অনেকটা ঠিকই করেছো। এ বাড়ীর বন্দিনীকে আর কোন দিন বাইরের কাউকে দেখ্‌তে দেওয়া হবে না। বেচারী একেবারে পাগল, আর বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে নেই বল্‌লেই চলে। এর কাহিনী যদিও চিকিৎসাবিদ্যাসংক্রান্ত, তবু বোধ হয় তোমার মন্দ লাগ্‌বে না। শুনবে?" আমি রাজী হওয়ায় তিনি বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

* * * *

বিশ বছর আগে আমি যখন প্রথম ডাক্তার হয়ে আসি, এ বাড়ীর কর্ত্তা আমার হাতে তাঁর মেয়ের চিকিৎসার ভার দিলেন। মেয়েটির বয়স সাত-আট বৎসর, কিন্তু দেখ্‌তে বড্ড বাড়ন্ত। বেচারী এত বয়সেও কথা কইতে শেখেনি। সেই হচ্ছে তার ব্যারাম। হাঁট্‌তে শিখেছিল সে খুবই কম বয়সে। কিন্তু কথা বল্‌তে পার্‌ত না দেখে সবাই তাকে কালা মনে কর্‌ত। কিন্তু দেখা গেল সে কালা নয়—কারণ কোন জোরে শব্দ হলেই সে চম্‌কে উঠ্‌ত। শুন্‌তে সে ঠিক-মতই পার্‌ত। পরীক্ষা করে দেখ্‌লাম যে তার এই বাক্‌শক্তিহীনতার কারণ আর কিছুই নয়—মস্তিষ্কের পরিণতির অভাব।

ক্রমে বার্থা বড় হতে লাগ্‌ল, কিন্তু কথা কিছুতেই ফুট্‌ল না। আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাকে ওষুধ দিতে লাগ্‌লাম, কিন্তু কোন ফল হল না। প্রথমে সে কেবল তার ধাত্রীকে চিন্‌ত, কিন্তু তাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুলিয়ে গেল। মাকে চেনা দূরে থাকুক, "মা" এ-কথাটিই মুখে আন্‌তে পার্‌ত না। কখন কখন সে কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ত—কিন্তু তা অর্থহীন শব্দ বই আর কিছুই নয়। তবে তাকে এক বিষয়ে একটু পরিণত দেখ্‌তাম—সেটা হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তার ভাবের সামঞ্জস্য। পরিষ্কার দিনে সে পাখীর মত আনন্দে শব্দ কর্‌ত; আবার বাদ্‌লার দিনে তাকে কি যেন অজানার জন্য কাঁদ্‌তে দেখা যেত। সূর্য্যের আলো তার ঘরে ঢুক্‌লে সে হাততালি দিয়ে লাফাত।

শেষে আমি অন্য উপায়ে তার বুদ্ধি পরিণত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। খেতে বস্‌লে আর তার জ্ঞান থাক্‌ত না—দিন রাত খেতে চাইত। খাওয়ার সময় কখন্ আসে মনে করে সে এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক্‌ত যে ক্রমে খাবারের ঘণ্টা চিনে ফেল্‌লে। তখন আমি তাকে ঘড়ীর কাঁটা কোথায় গেলে খাওয়া হয় তা দেখিয়ে দিলাম। এম্নি করে সে ঘড়ী দেখ্‌তে শিখ্‌ল। তখন তার কাজই হল কেবল ঘড়ীর দিকে দৃষ্টি রাখা। কখন্ কোন্ ঘড়ীতে কটা বাজ্‌লে খাওয়া হয় এটা সে খুবই ভাল রকমেই বুঝেছিল। একদিন একটা ঘড়ীর বাজার স্প্রিং খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেটা আর বাজেনি।

অগ্নি সে সব ছেড়ে দিয়ে ব্যাপার কি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে যখন আর কোনবার বাজ্‌ল না—সে রেগে ঘড়ীটা ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলে দিলে। এসব দেখে বুঝ্‌লাম যে তার ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু তা অতি ক্ষীণ।

* * * *

এর মধ্যে বার্থার একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর সে ছোট্ট মেয়ে নয়, খুব সুন্দরী যুবতী। যৌবনের উন্মেষ তার স্বভাব পরিবর্ত্তন না কর্‌লেও তার দেহের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে তার সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব, দৃঢ় অথচ চপল গতি, উজ্জ্বল ভাষাহীন চোখের শূন্য এবং চঞ্চল দৃষ্টি, তার ভরাট চুম্বনাকাঙ্ক্ষী ওষ্ঠ—সবই তাকে এক নীরব বুদ্ধিহীন ভেনাসে পরিণত করেছে।

একদিন সকালে বার্থার বাবা আমায় এসে বল্‌লে যে সে বার্থার বিয়ে দিতে চায়। "বিয়ে! সে কি!" আমি অবাক হয়ে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বল্‌ল, "হ্যাঁ, বিয়েই দেব। সবই ত দেখা গেল; কোন রকমেই কিছু যখন হচ্ছে না, তখন একবার দেখা যাক স্বাভাবিক কোন বৃত্তি—যেমন প্রেম কিম্বা স্নেহ—একে ভাল করে কি না। পাত্রও ঠিক করেছি ঐ পাহাড়-তলীর গাস্তোঁ-লুসেল। সে রাজী হয়েছে—অবশ্য টাকা আর সুন্দরী স্ত্রী পাবার লোভে। আপনি কি বলেন?" আমার বল্‌বার কিছুই ছিল না। বুড়ো চলে গেলে তার কথার যৌক্তিকতা ভেবে দেখ্‌লাম। আমার এক বোকা ডালকুত্তার ছানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বেড়ে যাওয়ার কথা মনে করে অনেকটা আশা হল। কিন্তু তখনই মনে হল যে গাস্তোঁটা যে একেবারে পশু!

* * * *

তার পর একদিন খুব পরিষ্কার সকালে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। কোন জাঁকজমক ছিল না। বার্থার কিছুই যেন আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল না—সে তার ঘড়ী আর খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত। পোষাক-টোষাক দেখেও বিশেষ কৌতূহল হয়নি।

বিয়ের পর আমি প্রায়ই ওদের ওখানে যেতাম। গাস্তোঁ তার স্ত্রীকে আদর-যত্নের ত্রুটি কিছুই কর্‌ত না—সব সময়ে খুসী রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। প্রথম প্রথম বার্থা বড় একটা আমল দিত না। কিন্তু মাস কয়েক পরে তার একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্‌লাম। সে তার স্বামীকে চিন্‌তে শিখ্‌লে। খুব ভাল খাবারের জন্য তার যেমন আগ্রহ, গাস্তোঁর জন্য তার মনে ঠিক তেম্‌নি ভাবের আগ্রহ আর ভালবাসা জন্মাল। স্বামীর হাবভাব চলন ফেরন সবই সে খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখ্‌ত—সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ হলেই সে ব্যগ্র হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত। তার শূন্য দৃষ্টি প্রেমের পরশমণিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তার সমস্ত দেহ সুখ ও বাসনার আবেশে এক নতুন শ্রী ধারণ করেছিল।

বার্থা তার স্বামীকে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ভালবেসে ফেল্‌ল। তার দুর্ব্বল অগভীর আত্মা যেন দিন দিন নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেল্‌ছিল। এক দিনের কথা আমার মনে আছে। সারাদিন বাদ্‌লা ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের কালো ছায়া যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখন সে তার স্বভাবগত ভয়ে আর্ত্ত হয়ে উঠ্‌ল। গাস্তো সান্ত্বনা দেবার জন্য গায়ে হাত ফেলাতেই সে পাখীটির মত তার বুকে মুখ লুকিয়েছিল। সে সময় তার মুখ এক গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে—তার ভাষাহীন নির্ব্বোধ হৃদয় আনন্দের আবেশে তন্ময়। তার সেই মৌন প্রেমের সরলতা মানুষের নানা কারিকুরী খাটান প্রেমের বিভিন্ন ভঙ্গী থেকে অনেক গভীরতর মনে হচ্ছিল।

কিন্তু ক্রমে তার স্বামী যেন তার উপরে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এই নির্ব্বাক মেয়েটির লীলাহীন সরলতা তার আর ভাল লাগ্‌ত না—সে সহরে যেতে আরম্ভ কর্‌লে। ক্রমে এইরূপ নিঃসহায় প্রাণীটিকে সারাদিনে এক ঘণ্টার বেশী কাছে রাখ্‌ত না। কিন্তু বার্থার প্রেম এবং আগ্রহ আরও বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। সমস্ত রাত্রি সে তার স্বামীর প্রতীক্ষায় ঘড়ী হাতে করে বসে থাক্‌ত। সামান্য কোন শব্দ হলেই সে উৎসুক হয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াত। অভাগী বুঝ্‌তে পার্‌ত না যে তার কপাল ভেঙ্গেছে।

ক্রমে সে রোগা হয়ে যেতে লাগ্‌ল। আহার নিদ্রা কিছুই ছিল না। মনের আর কোন অনুভূতিই নেই,

সকল আশা সকল চিন্তা সকল বাসনার অতীত সে তার স্বামীকেই কেবল ধ্রুব বলে জেনেছিল। তার অদর্শন তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল। রাত্রি শেষে এক-একদিন যখন গাস্তোঁ বাড়ীতে ফির্‌ত, বার্থার অনাহারে অনিদ্রায় শুষ্ক মুখখানি আনন্দে ভরে যেত। সে অপরাধী স্বামীকে কোন দিনই কিছু বল্‌ত না, কেবল মৌন কাতর তিরস্কারের দৃষ্টিতে একবার ঘড়ীর দিকে দেখিয়ে দিত।

* * * *

এক দিন শুন্‌লাম সে পাগল হয়ে গেছে। গাস্তোঁর এক মাস হল দেখা নেই। বিরহের তীব্রতাতেই সে পাগল। সে পাগ্‌লামি তার এখনও যায়নি। এখনও সে কেবল স্বামীর কথা ভাবে এবং তার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। প্রথম প্রথম সে সব সময়ই একটা ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত দেখে আমি সেটা কেড়ে নি। তার পর যেই একদিন পরীক্ষা কর্‌বার জন্য ঘড়ীটা তার হাতে দিয়েছি, অম্নি সে তীব্র বেদনায় আর্ত্তনাদ করে ঘড়ীটা ফেলে দিল। এখন আর তার সে চেহারা নেই—বড্ড রোগা—চোখ বসে গিয়েছে—মুখের উপর হৃদয়ের আঘাতের ছাপ খুবই স্পষ্ট। যৌবনের প্রারম্ভেই সে বৃদ্ধা হয়েছে।

"তার বাপ মা ?"

"মারা গেছেন।"

আমরা পাহাড়ের মাথার উপর এসে পৌঁছেছিলাম। একদিকে রায়োঁর সবুজ বুনো সমতল ভূমি ক্রোশের পর ক্রোশ অস্পষ্ট কোয়াসায় ঢাকা, আর-একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় দূরে মিলিয়ে গিয়েছে। ডাক্তার আমাকে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌ছিলেন, কিন্তু তাতে আমার মন ছিল না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে এই বিশাল প্রান্তরের উপর সেই উন্মাদ মূক নারীর ব্যথিত আত্মা যেন নীরব আর্ত্তনাদে গুম্‌রে বেড়াচ্ছে।

শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদিকালের কথা

মৃত্যুর পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান।

মৃতদেহ প্রোথিত করাই হোক আর দাহ করাই হোক, ইহা সুনিশ্চয় যে অতি প্রাচীন কালেও সৎকারের সময় বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন হইত। বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির অনুষ্ঠানপদ্ধতি তুলনা করিলেই এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা হইবে।

এ স্থলে গ্রীক এবং লিথুয়েনীয় এই দুই বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির কথা তুলনা করিব।

(ক) মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় রাখা—

কোনও নিকটতম আত্মীয় হস্তের দ্বারা মৃতের চোখ এবং মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা মৃতদেহ ধৌত করিয়া প্রসাধন করিত। তৎপরে পরিষ্কার বস্ত্রে আবৃত করিয়া মৃতদেহ গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা হইত।

লিথুয়েনীয় স্লাভেরা মৃতদেহ ধৌত করাকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিত এবং ইহার সহিত প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান করিত। আত্মীয়ের দ্বারা ধৌত না করাইয়া ইহারা অপরিচিত ব্যক্তিগণকে দিয়া ধৌত করাইত; হয় পুরুষের বেলায় পুরুষ, স্ত্রীলোকের বেলায় স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইত, না হয় উভয়স্থলেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বারা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হইত।

(খ) মৃতের উদ্দেশে ক্রন্দন—

মৃতদেহকে এই অবস্থায় শোয়াইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য যে ঐ সময় সকলে তাহার জন্য কাঁদিতে পারে। গ্রীক আইন-প্রণেতা সোলন (Solon) শুধু নিকটতম স্ত্রীলোক আত্মীয়দের এই বিলাপে যোগ দিবার বিধান করিয়াছেন। শোকের ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস, গণ্ডস্থল নখের আঘাতে ক্ষত করা, বুকে ও মস্তকে আঘাত করা এবং কাঁদিয়া বাঁধিগৎ গাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। হোমর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, স্বভাবসিদ্ধ বিলাপ ছাড়া, পেশাদার গায়কগণকে (professional mourners) স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনের সহিত যোগ দিয়া করুণ সুরে

বিলাপগীতি গাহিবার জন্য নিযুক্ত করা হইত। এখনো নাকি পঞ্জাব ও গুজরাতের দিকে এইরূপ পেশাদার বিলাপকারীর নিয়োগ প্রচলিত আছে। য়ুরোপের নানা জাতির মধ্যেও পেশাদার শোককারী ভাড়া করিতে পাওয়া যায়।

এইসকল প্রথা বর্ত্তমান কালের কিছু পূর্ব্বেও লিথুয়েনীয় সাভদিগের দৈনিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। রুশ দেশে এই বিলাপের ভিতর মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী বলা হইত এবং শোকার্ত্তগণ মৃতের দিকে ফিরিয়া এইরূপ ভাবে প্রশ্ন করিত যেন সে জীবিতই আছে। বিধবা স্ত্রী বহুবার স্বামীর কবরের উপর মূর্চ্ছা যাইত। অধিকাংশ স্থলেই ভান করিয়া এইরূপ করা হইত, কারণ তাহাতে গৌরব বাড়িত এবং লোকে প্রশংসা করিয়া বলিত সে কেমন শোক করিতে জানে!

এইসব শোকোচ্ছ্বাসের মাত্রা এতই হইত যে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের হাত এবং মুখ ছুরি দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত। রুশিয়া দেশে পেশাদার স্ত্রী বিলাপিনী অনেক আছে। ইহারা পয়সা পাইলেই কাঁদিয়া থাকে এবং নিজেদের দক্ষতা দ্বারা সময়ে সময়ে বিশেষ যশ অর্জ্জন করে।

(গ) অন্ত্যেষ্টি যাত্রা—

মৃতদেহকে মাত্র একদিন শায়িত অবস্থায় রাখা হইত। তৃতীয় দিবসের প্রত্যূষে শয্যা সহ শবকে বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত। অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার একখানি পুরাতন চিত্রে দেখা যায় যে, দেহকে একটি উচ্চ শবাধারে গাড়ীর উপর রাখিয়া দুইটি ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পাশে তরবারিধারী পুরুষগণ যাইতেছে এবং পশ্চাতে একদল স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে যাইতেছে।

রুশিয়া দেশে মৃতদেহকে এমন কি গ্রীষ্মকালেও স্লেজে করিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। হাত দিয়া বহিয়া শব লইয়া যাওয়া প্রথাসঙ্গত ছিল না। প্রায়ই মৃতের প্রিয় অশ্বকে গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়া হইত। কোন কোন স্থানে বলদজোড়া মালগাড়ী ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় দিবসে অথবা সাধারণত দ্বিতীয় দিবসেই শবদেহ প্রোথিত করা হইত।

ভিন্‌টেরনিট্‌জের (Winternitz) মতে সমাধিস্থান অথবা দাহভূমির চারিদিকে তিনবার ঘোরা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ প্রথা কিন্তু খাঁটি স্লাভ জাতির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

(ঘ) শ্রাদ্ধের ভোজ—

মৃতদেহ সৎকার করিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিধি অনুসারে পবিত্র হন এবং তার পর মস্তকে মাল্য ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধের ভোজে যোগ দেন। পরলোকগত আত্মার পূজানুষ্ঠানের (cult of the souls) ইহা একটি অঙ্গ ছিল। মৃতের আত্মা নিমন্ত্রণকর্ত্তারূপে উপস্থিত থাকিত বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। এই অদৃশ্য ব্যক্তির উপস্থিতির ভয়েই ভোজের সময় তাহার সম্বন্ধে শুধু প্রশংসাসূচক কথা বলার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির গৃহে আত্মীয়গণ ভোজ পাইত।

মৃতের সহিত প্রদত্ত উপহার।

নব প্রস্তর যুগেই (Neolithic Age) মানব প্রথম মৃতদেহ সৎকারের প্রতি মনোযোগী হয়। মৃত ব্যক্তিকে মাংস, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, গৃহপালিত জন্তু, এমন কি চাকর-বাকর এবং স্ত্রী পর্য্যন্ত উপহার দেওয়া হইত।

স্লাভ জাতীয় লোকেরা এখনও মৃত ব্যক্তির যাবতীয় প্রিয় বস্তু সমাধিস্থানে প্রোথিত করে। টিউটন জাতীয় লোকের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা এখনও দেখা যায়—যদিও এইসকল জাতি অনেক পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যেসকল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ভিতর এই উপহার দেওয়ার প্রথা দেখা যায় না, তাহারাও যে বহু পূর্ব্বে উপহার দিত, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—বৈদিক কালে মৃতের সহিত উপহার-দানের প্রথা দেখা যায় না। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিতে হইবে—ঋগ্বেদের একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত (১০, ১৮) হইতে পাওয়া যায় যে, মৃত যোদ্ধার পত্নীকে স্বামীর পাশে চিতা-শয্যায় শোয়ানো হইত এবং পরে তাহাকে জীবিতের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে উঠিবার আদেশ দেওয়া হইত। ইহা হইতে স্ত্রী এবং অস্ত্র উপহার

দানের প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল বুঝা যায়। হোমরের সময়ের গ্রীকদিগের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। তাহাদিগের মধ্যেও মৃতদেহের ভস্মরাশি বিনা উপহারেই শবের সহিত প্রোথিত করা হইত। একিলিস (Achilles) তাঁহার বন্ধু পাত্রোক্লুসের (Patroclus) জন্য যে চিতা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহার উপর তিনি মধু ও তৈলের কলস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বৃষ অশ্ব ও কুক্কুর সহ বারজন সম্ভ্রান্ত ট্রয়বাসীকেও বলি দিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগের মৃতকে উপহার দেওয়ার স্মৃতি ইহার ভিতর লক্ষিত হয়।

এইসকল উপহার-প্রথায় তারতম্য ছিল। যেখানে সমাধি দেওয়ার প্রথা ছিল, তথায় মৃতদেহের সহিত কবরের মধ্যে এইসকল উপহার নামাইয়া দেওয়া হইত। যেখানে দাহ-প্রথা চলিত ছিল, সেখানে উপহার-দ্রব্য চিতা-ভস্মের পাশে স্থাপন করা হইত, অথবা চিতানলে ভস্মীভূত করা হইত। শেষের এই প্রথা পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। প্রোথিত অথবা দাহ করায় বিভিন্নতা অনুসারে উপহার-দ্রব্যের বিভিন্নতা করা বড় শক্ত।

এইসকল উপহার দানের মূলে এই ইচ্ছা রহিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তিকে এমন কিছু দেওয়া যাহা মৃত্যুর পর তাহার কাজে আসিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, শোকার্ত্তগণ এই-সমস্ত জিনিষ দেওয়ার সময় ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ততটা মনে করিতেন না—মাত্র কুলক্রমাগত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, দেশকালপাত্র অনুসারে এই মূল উদ্দেশ্য উন্নত হয় এবং কালে উপহার-দ্রব্য ভালবাসার স্মৃতিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয়গণের এই মৃত-পূজার মূলে ভয়-মিশ্রিত ভক্তি এবং ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে—এ-কথা বলা যাইতে পারে। আরও একটি কারণ এই যে, জীবিত ব্যক্তিগণ ভগবানের সম্মুখে ন্যায়বিচার অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে তাহার দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত করিতে সাহস পাইত না।

মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার স্ত্রীকে দেওয়ার প্রথা সিথিয়, থ্রেসীয়, লিথুয়েনীয়, স্লাভ এবং টিউটন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত এবং আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় যুগেও যে ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতে বেদের সময় ইহার আর চলন দেখা যায় না। কিন্তু খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে যখন আবার সতীদাহ প্রথার উদ্ভব দেখা যায়, তখন ইহাকে একটা নূতন কিছু বলিয়া মনে না করাই ঠিক—ইহা প্রচলিত স্থানীয় একটি বহুপুরাতন প্রথার পুনরুজ্জীবন মাত্র।

এতক্ষণ বিবাহিত লোকের কথা হইল। অবিবাহিতগণের কি হইত? অবিবাহিতের মৃত্যুতে বিবাহের কতকগুলি অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করা হইত। গ্রীস দেশে বিবাহের জলকলস অবিবাহিত ব্যক্তিগণের সমাধিস্থলে স্থাপিত করা হইত। স্লাভ জাতি সমাধিস্থানে নকল-বিবাহের অনুষ্ঠান করিত এবং মৃত ব্যক্তিকে স্বামী বা স্ত্রী প্রদান করিত। জার্ম্মানিতে এই প্রথার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। হেসে (Hesse) প্রদেশে অবিবাহিত ব্যক্তিগণের শবাধারের পাশে পাশে মাথায় মালা পরিয়া কুমারীগণ যায় এবং চারি সপ্তাহ ধরিয়া শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করে।

প্রাচীনতম স্লাভ এবং রুশীয় প্রথা অনুযায়ী কেবল মাত্র বিবাহিত মৃত ব্যক্তির স্ত্রীই যে তাহার সঙ্গিনী হইত এমন নয়, অবিবাহিত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর যথারীতি বিবাহিত হইলে তাহার অল্পবয়স্কা স্ত্রীকেও যমসদনে মৃত স্বামীর সঙ্গে প্রেরণ করা হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রীসদেশেও স্বামীর অনুগমন প্রথা প্রচলিত ছিল।

এই-সকল কথা সত্য হইলে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তু উপহার পাইবে এমন নয়, পরন্তু তাহার পরজীবনের কথাও জীবিত আত্মীয়গণকে ভাবিতে হইবে। এই ভাবনার মূলে ছিল যে, জীবনের অতি আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান বিবাহ এবং অবিবাহিত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

বেতালের বৈঠক

বেতালের বৈঠকে কোনো প্রশ্ন বা উত্তর ছাপা বা না ছাপা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এর সম্বন্ধে কোনো লিখিত বা বাচনিক কৈফিয়ৎ দিতে আমরা অক্ষম।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

জিজ্ঞাসা।

(৪৩)

হিন্দু-সধবার লক্ষণ—সিঁথিতে সিঁদুর ও বাঁ হাতে 'নোয়া'; ইহাদের প্রচলন কেন ও কবে থেকে? এই ব্যবস্থা কোনো শাস্ত্রে আছে কি না?

শ্রীসুষমা মিত্র।—শ্রীউমা দেবী।

(৪৪)

অমাবস্যা পূর্ণিমা ও একাদশী প্রভৃতিতে যে উপোষের ব্যবস্থা আছে এবং বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ জিনিস আহারের যে নিষেধ আছে—যেমন ত্রয়োদশীতে বেগুন খাওয়া নিষেধ—ইহাদের উৎপত্তি কবে থেকে ও ইহাদের কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না?

শ্রীসুষমা মিত্র। শ্রীপুলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৪৫)

(ক) তৈল মাখিবার সময় একটু তৈল তিনবার মাটিতে ছিটায়। প্রবাদ অশ্বত্থামার মাথায় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করিয়া থাকে। ইহার ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক অথবা শাস্ত্রীয় প্রমাণ চাই।

(খ) লোকে 'হাই' তুলিবার সময় অঙ্গুলী দ্বারা তুড়ি দেয় কেন?

(গ) লোকে হাঁচিলে ও টিক্‌টিকি ডাকিলে যাত্রায় বাধা হয় কেন? কাসিতে অথবা অন্য কোন শব্দে হয় না কেন?

(ঘ) হাঁচিলে 'জীব' বলে কেন?

(ঙ) লোকে সন্ধ্যার সময় একটামাত্র নক্ষত্র দেখিয়া ঘরে যায় না, সাতটা দেখিয়া যায় কেন?

শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪৬)

পুরাণে যে জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে এবং বাইবেলের "Old Testament"এ Genesis অধ্যায়ে যে 'The Deluge' গল্প আছে তার ইতিহাস কি এবং তার প্রমাণের আদি মূল কি?

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ।

(৪৭)

বৈদ্যজাতির উৎপত্তির ইতিহাস কি? সেন ও গুপ্ত উপাধির কারণ ও অর্থ কি? দাশ শব্দ তালব্য শ দিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীপুলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৪৮)

লাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা কোন্ জাতি ছিলেন?

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়।

(৫০)

বাঙ্গালার সুবাদার "সমৎ জানি" (Shamat Jani) কে?

চট্টগ্রামে মীর এহায়া-বংশ একটি অতি প্রাচীন জমিদার বংশ। এক সময়ে তাঁহাদের অতি বিস্তৃত জমিদারী এবং দেশে অসামান্য প্রতাপ ছিল। এখন পর্য্যন্ত তদ্বংশীয়েরা সেই জমিদারীর কিয়দংশ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। স্বনামধন্য হাজী মোহ্‌সেনের মত মীর সাহেবও সাধারণের শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্যয়িত করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তে চট্টগ্রামে 'মীর এহায়া ফণ্ডে'র সৃষ্টি হয়। এই ফণ্ডের অর্থে এক সময়ে 'চট্টগ্রাম বঙ্গ বিদ্যালয়' (যাহা সাধারণতঃ 'মীর এহায়া স্কুল' নামে পরিচিত ছিল) পরিচালিত হইত। এখনও সেই ফণ্ড বাহাল আছে।

মীর এহায়া বংশীয়দের জমিদারী-সংক্রান্ত কাগজপত্রে দেখা যায়, ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক বাঙ্গালার শাসনভার গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে "সমৎ বা সামত জানি" (Shamat Jani) নামক বাঙ্গালার জনৈক সুবাদার তদীয় রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে নবাব নওয়াজিস মোহাম্মদের প্রদত্ত সনন্দ-মূলে তেমুহানী মৌজায় শাহী ৬০ দ্রোণ জমি মীর আবদুর রসিদকে দান করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মীর এহায়ার প্রতিও উক্ত দান বাহাল রাখেন। বলিয়া রাখা আবশ্যক, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই খয়রাতি জমি লইয়া মীর এহায়া বংশীয়দের অনেক মাম্‌লা মোকর্দ্দমা হইয়াছিল। বিচারে ইংরেজ সরকারকে উক্ত সনন্দের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে হয়।

বাঙ্গালার সুবাদারদের মধ্যে "সমৎ বা সামত জানি" নামক কোন সুবাদার ছিলেন বলিয়া প্রচলিত ইতিহাসে দেখা যায় না। কেহ ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলে অত্যন্ত বাধিত ও উপকৃত হইব।

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
('সাধনা'-সম্পাদক)
চট্টগ্রাম।

মীমাংসা।

(১৯)

অগ্রহায়ণের ১৯ মীমাংসা সম্বন্ধে বলিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ফসলী সন অক্‌বর দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছিল। ৯৯৩ হিজরীর যে রাজাজ্ঞা (ফর্‌মান্) দ্বারা ঐ সন প্রচলিত করা হইয়াছিল তাহা আবুল ফজলের আইন অক্‌বরীতে উদ্ধৃত আছে। এই ফর্‌মানে আছে:—"এখন বঙ্গ ও বেহারে লক্ষণাব্দ—যাহা ৪১৫ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, গুজরাত ও দক্ষিণে শালিবাহনের অব্দ—যাহা ১৫০৩ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, মালব ও দিল্লী প্রভৃতি দেশে বিক্রমাদিত্যের অব্দ—যাহা ১৩৪১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, কাঙ্গড়া ইত্যাদি পাহাড়ী দেশে সেই দেশের রাজার অব্দ প্রচলিত আছে···ইত্যাদি।" এই প্রমাণের পর বঙ্গদেশে যে সন ইলাহি ১৩২৭ চলিতেছে তাহা কোন বৈদ্য রাজার প্রচারিত হইতে পারে না। এ অব্দ বা সন কেবল বঙ্গে নহে, সমস্ত উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু যুক্ত প্রদেশের ব্যবসায়ী ও পণ্ডিত-সমাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বত ছাড়িলেন না, যেমন বঙ্গের জ্যোতিষীরা এখনও কোষ্ঠী লিখিতে হইলে শকাব্দাই লেখেন। ভারতের মুসলমানেরা চান্দ্র হিজরী ছাড়িয়া সৌর গণনা গ্রহণ করিলেন না। কেন না, পূর্ব্বে ইহুদীরা মলমাস গণনা করিত। আমাদের যেমন মলমাস হইলে একই নামের দুইটা মাস হয়, সেরূপ না করিয়া তাহারা বলিত এ বৎসর অমুক মাসে বৎসরারম্ভ হইবে। মুসলমানদের নবম মাসে রোজা রাখা হয়, দ্বাদশ মাসে হজ করা হয়; অতএব কখন কোন মাসে রোজা, কখন অন্য নামের মাসে রোজা হইতে লাগিল। প্রথমে মুসলমানেরা এই মলমাস প্রথা অর্থাৎ ১৩ মাসে বৎসর প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল। হিজরী দশম বৎসরে হজরৎ মহম্মদ ভগবদ্-আজ্ঞা পাইলেন যে, "তের মাসে বৎসর হইতে পারে না।" Moreover, the complete number of months with God is twelve months, which were ordained in the book of God on the day whereon he created the heaven and the earth. Verily the transferring of a sacred months to another month is an additional infidelity. The unbelievers are led into an error thereby

কোরানের আজ্ঞার বিরুদ্ধে মুসলমানেরা সৌর মাস গণনা গ্রহণ করিল না, কেবল সর্‌কারি কাগজে ফসলী সন চলিত ছিল।

শব্দবিদ্যানুমোদিত ব্যাখ্যানুসারে "শাল শব্দটি শালিবাহনের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে।" কিন্তু শব্দটি "শাল" না হইয়া "সাল" হইবে, অর্থাৎ বঙ্গে শ, স-র উচ্চারণ ভেদ করা হয় না বলিয়া "শাল" বলা হয় নতুবা শুদ্ধ উচ্চারণ "সাল sal" ও শব্দটি পার্সী। সেইরূপ "শন" শব্দের অংশ না হইয়া "সন sun" হইবে। এ শব্দটি অরবী।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

(৩২)

চারু-বাবু লিখিয়াছেন, "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব-কাল ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ৬৪ পৃষ্ঠা)।"

মন্মথ-বাবু লিখিয়াছেন, "যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানাব্দ খৃঃ পূঃ ১৪০০ (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৭০ পৃষ্ঠা)।"

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘা স্বাসন্ দ্বিজোত্তম। তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দ শতাত্মকঃ॥ ৪।২৪।৩৪

আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালে এক এক নক্ষত্রে সপ্তার্ষির একশত বৎসর স্থিতি কল্পনা করিয়া শতবর্ষাত্মক অব্দ গণনা করিতেন। পরীক্ষিতের অভিষেক-সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিল। তখন কলির শতবর্ষাত্মক দ্বাদশ অব্দ অর্থাৎ ১২০০ অব্দ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব কলিযুগের আরম্ভকাল খৃঃ পূঃ ৩১০১ মধ্যে ১২০০ বৎসর বাদ দিলে ১৯০১ খৃঃ পূঃ অব্দে পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়াছে জানা যাইতেছে। এই সময়ই যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ বা ১৪০০ নহে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

(৩২)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের (Vincent A. Smith) মতে, রামায়ণের অধিকাংশ খ্রীঃ পূ ৫০০ অব্দের পূর্ব্বে রচিত হয়। পরবর্ত্তী কালে অপরাপর অংশ রচিত হয়।

মহাভারত রচনার কাল, তাঁহার মতে, খ্রীঃ পূ ৪০০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় ৪০০ অব্দ। অন্যান্য পণ্ডিতের মত অন্যবিধ।

অন্নদাশঙ্কর রায়।

(৪১ ক)

চন্দ্রকলা = ১৬

রাম = ১

কল্য কোলে ১৬১ এবং বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ এইজন্য = ৪

অতএব এই গ্রন্থখানি ১৬১৪ শকাব্দে প্রণীত হয় বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার।

(৪১ খ)

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধি কান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।"

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই প্রাচীন দিন তারিখ, লগ্ন, কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রভৃতি গণিতে হইলে কতকগুলি সঙ্কেতের আশ্রয় নেওয়া হইত। এখনও হইয়া থাকে। সেই সঙ্কেতগুলি সম্বন্ধে বচন প্রমাণ অনেকের মুখে-মুখেই চলিয়া আসিতেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তকাদিতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। তদনুসারে চন্দ্রকলা শব্দে আমরা ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হই; রাম শব্দ দ্বারা ৩ সংখ্যা; বিধি শব্দে ৪ এবং অনল শব্দে ৩। সুতরাং সমুদয়ে আমরা ১, ৩, ৪, ৩ এই সংখ্যা কয়টি অঙ্কসংখ্যাগুলিকে বিপরীত দিক্ হইতে অর্থাৎ ডান দিক্ হইতে গণনার নিয়ম। তদনুসারে ৩৪৩১ চৌত্রিশ শত একত্রিশ সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত কবিতার তাৎপর্য্য অনুসারে এই স্থলে "অন্তস্থ বামা গতিঃ" এই নিয়ম চলিবে না; যে-হেতু "রাম কল্য কোলে" পদ দ্বারা রামকে কোলে করিবার কথা আছে। অর্থাৎ চন্দ্রকলার কোলে রাম অবস্থিত; একের কোলে তিন অবস্থিত (১৩) তার পর বিধি ও অনলের যোগ করিয়া ১৩৪৩ তেরশত তেতাল্লিশ শকাব্দারই পরিচয় পাওয়া যায়। "শিবের সঙ্গীত রচনা"-কালের সঙ্গে উল্লিখিত ১৩৪৩ শকাব্দা মিলিবে কি না প্রত্নতত্ত্বের সাহিত্যিকগণ বিচার করিবেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য-কাব্যতীর্থ।

(৩৭)

ভিনিগার ১ পাঁইট, ক্রিয়াজোট ৮ আউন্স, একত্রে মিশ্রিত করতঃ তাহাতে ৪ গ্যালন জল মিশ্রিত করিয়া যাহাতে মাখাইয়া রাখা যায় উই প্রভৃতি পোকা তাহার কাছ দিয়াও যাইতে পারে না।

বিলাতি 'সলিগ্‌নাম' উইনাশক, যাহা রেলওয়েতে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সাহা।

(৪২)

শিক্ষার্থীদের আমেরিকায় যাওয়া বলিলেই আমরা "যুক্তরাজ্য" (U. S. A.) বুঝিয়া থাকি। যুক্তরাজ্যের পশ্চিম বা পূর্ব্ব কোন্ উপকূলে নামিলে সুবিধাজনক হইবে শিক্ষার্থীর সেই বুঝিয়া জাহাজ ভাড়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। পশ্চিম উপকূল অর্থাৎ ক্যালিফর্ণিয়াতে যাইতে হইলে জাপান অথবা মানিলা ও হনলুলু হইয়া যাইতে হইবে; ভাড়া উভয় পথেই প্রথম শ্রেণী—১০০০৲, দ্বিতীয় শ্রেণী—৭৫০৲। পূর্ব্ব উপকূল অর্থাৎ নিউইয়র্ক বষ্টন ফিলাডেলফিয়া ইত্যাদি স্থানে নামিতে হইলে কলিকাতা হইতে এক জাহাজেও যাওয়া যায় অথবা লণ্ডন হইয়াও যাওয়া যায়; ভাড়া:—১ম পথে—১ম শ্রেণী—১০০০৲, ২য় শ্রেণী—৭৫০৲; ২য় পথে—উর্দ্ধপক্ষে ১ম শ্রেণী—৯৬০৲, ২য় শ্রেণী—৮০০৲। পূর্ব্বকথিতরূপে স্বকীয় পথ ঠিক্ না করিয়া নিলে শিক্ষার্থীকে অনর্থক অত্যধিক রেলের ভাড়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। মনে করুন যদি কেহ নিউইয়র্ক সহরে নামিয়া ক্যালিফর্ণিয়াতে পড়িতে বাসনা করেন, তবে তাঁহাকে প্রকাণ্ড আমেরিকা মহাদেশটি রেলগাড়ীতে অতিক্রম করিতে হইবে! আমাদের গরীব দেশের ছাত্রগণের প্রত্যেকেরই ডেক্-যাত্রী হওয়া উচিত, তাহা হইলে অনেক পাথেয়ের লাঘব হয়। ভাড়া আমেরিকা পর্য্যন্ত অনুমান ৪০০৲ হইবে। অনেকেই ডেকে যাওয়াকে অপমানের চোখে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু নিশ্চয় তাঁহারা জানেন না যে, ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর সকল যাত্রীই সারাদিন ও রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ডেকের মুক্তবায়ুতে শয়ন করিয়া থাকেন। ঘরের বদ্ধ বায়ুতে সময় অতিবাহন করা তাঁহারা এক রকম অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ছাত্রগণ দেশে ষ্টীমার ও রেলগাড়ীতে ৩য় শ্রেণীতে চড়িয়া খুব অভ্যস্ত এবং গৌরব অনুভবও করিয়া থাকেন। জাহাজের ৩য় শ্রেণী আমাদের ষ্টীমারের ৩য় শ্রেণীর চেয়ে যে ভাল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ৩য় শ্রেণীতে সর্ব্বদাই লোক যাইতেছে, কখনও খালি থাকে না; এ অবস্থায় আমরা কেন পশ্চাৎপদ হইব? যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বদিকস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সবচেয়ে বেশী খরচ, ১৫০৲ টাকা হইলে মাসিক চলিতে পারে। মধ্যপ্রদেশগুলিতে যথা শিকাগো, ইলিনয়, ওহিও, মিশিগান, আইয়োয়া এবং পশ্চিমে কালিফর্নিয়ার দিকে ১০০৲

যুদ্ধের জন্য খরচ কিছু বাড়িয়াছে, নতুবা পূর্ব্বে আরও কম ছিল। আমেরিকাবাসীরা গায়ে খাটিয়া খাওয়াকে সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকে, কাজ যে রকমই হউক না কেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন-চতুর্থ ছাত্রগণই গায়ে খাটিয়া পড়িতেছে এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এজন্য Employment Bureau আছে, কারণ ইহাকে তাহারা প্রধান শিক্ষার সোপান এবং নানারকম অভিজ্ঞতা লাভের উপায় বলিয়া মনে করে। শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় তাঁহার যুক্তরাজ্য পরিভ্রমণ কালে ভারতীয় অধিকাংশ ছাত্রগণকেই বাড়ী হইতে সাহায্য না নিয়া নিজ উপার্জ্জনের উপর পড়িতে দেখিয়া অতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র গুহ।

(৪৩)

হরিদ্রাং কুম্‌কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।
কাঁপাসঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্‌ ॥
কেশসংস্কার-কবরী করকর্ণ-বিভূষণম্‌।
ভর্ত্তুর্‌ আয়ুষ্যম্‌ ইচ্ছন্তী দূরয়েন্‌ ন পতিব্রতা ॥
স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৪ অধ্যায়।

পতিব্রতা ভর্ত্তার আয়ু ইচ্ছা করিলে কখনো সিন্দূর ও করভূষণ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে না; এবং বিধবা হইলে সেসব ধারণ করিবে না।

ন ধত্তে দিব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যং স্থতৈলকম্‌।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খ-সিন্দূর-ভূষণম্‌ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮৩ অধ্যায়।

গোভিল-গৃহ্যসূত্রে ও সংস্কারতত্ত্বে সধবা স্ত্রীর সীমন্তে সিন্দূর ধারণের ব্যবস্থা আছে। ঐ দুই পুস্তকে ও ছন্দোগপরিশিষ্টে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের মধ্যে সিন্দূরধারণের তাৎপর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা এখানে সঙ্গত হইবে না, কারণ তাহা মিথুন-সম্পর্কের সঙ্কেত-রূপক।

হাতে লৌহবলয় ধারণ দেশাচার মাত্র। সধবার চিহ্ন করভূষণ; তাহা দেশাচারে লৌহবলয়রূপে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। ইহার চলন খুব সম্ভব তুকতাকে বিশ্বাস হইতে। ভূত প্রেত লোহাকে ভয় ও পরিহার করে বলিয়া প্রাকৃত লোকের বিশ্বাস। এইজন্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা মাথায় লোহার পেরেক গুঁজিয়া রাখে; সূতিকাগারের দ্বারে লোহা রাখে; শিশুদের শয্যায় মায়েরা কাজল-লতা বাধিয়া দ্যায়; শিশুদের হাতে লোহা বা পায়ে লোহার বেড়ী পরায়; পিতৃমাতৃস্থানীয়দের মৃত্যু হইলে অশৌচের কয়দিন কাচার সঙ্গে একটা করিয়া লোহা বাঁধিয়া রাখে; যে জায়গায় শুইয়া লোক মরে, সে জায়গায় একটা লোহার পেরেক পুঁতিয়া দ্যায়—যেন সেই ব্যক্তি সেই জায়গার মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া ভূত হইয়া না আসিতে পারে; শব দাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া শব-বাহকেরা লোহা স্পর্শ করে—যেন মৃতাত্মা ভূত হইয়া কাঁধীদের কাঁধে চড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া না আসে। যম ভূত-প্রেতের রাজা; সধবার হাতে লোহার ভয়ে সেও তার ত্রিসীমানায় আসিবে না এই বিশ্বাস হইতেই লোহার বালা পরা প্রবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। পরে দেশাচারে তাহা সধবা-চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৪৫)

(ক) তেল মাখিবার সময় মাটিতে তেলের ছিটা দ্যায় অশ্বত্থামার মাথায় পড়িবে এই ভ্রান্ত ও অন্ধ বিশ্বাসে। এর আবার ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কি হইতে পারে? অশ্বত্থামা যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি যথার্থই হন, তবে তিনি ২৪৪৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে যুধিষ্ঠিরের সমসময়ে জীবিত ছিলেন; সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্র নামে পরিচিত কোনো বইএর চুটা শ্লোক অশ্বত্থামাকে চিরজীবী বলিলেই এই বৈজ্ঞানিক যুগে তাহা নিরাপত্তিতে মানিয়া লওয়া মূর্খতারই পরিচায়ক। সুতরাং এই অর্থশূন্য আচারের ঐতিহাসিকতা বা বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাও বুদ্ধিজীবী কোনো মানুষের পক্ষেই প্রশংসার কথা নয়।

(খ, গ, ঘ) কোন্ কালে একজন নিয়ম প্রচার করে—

ক্ষুদ্‌-উৎপতন-জম্ভেষু জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলিধ্বনিঃ।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যশ্চান্যথা তদ্‌-বধী ভবেৎ ॥
কর্ম্মলোচন।

হাঁচিলে জীব, পড়িয়া গেলে ওঠ বলিবে ও হাই তুলিলে অঙ্গুলিধ্বনি করিবে, নতুবা তার বধভাগী হইবে।—আর তারপর আমরা সুবোধ গোপালের মতন বিনা বিচার বিতর্কে আবহমান কাল তাই মানিয়া পালন করিয়া আসিতেছি, এমনি মূঢ় আমরা। তারপর যখন বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের মূঢ়তা ও মূর্খতা ধরা পড়িতে লাগিল, তখন আমাদের অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শোধন করার ধুম লাগিয়া গেল। তখন কোনো বুদ্ধিমান হাই উঠিলে তুড়ি দেওয়ার তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিলেন—হাই তুলিবার সময় অন্তমনস্ক থাকিলে বেশী হাঁ করিতে গিয়া চোয়াল আট্‌কাইয়া যায় (lock jaw), তাহা নিবারণের জন্য হাই তোলার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাই তুড়ি দিবার তাৎপর্য্য। হাঁচি বা হাঁচির সঙ্গে অনেকখানি শ্বাস বাহির হইয়া যায়; যোগ ও প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য শ্বাস ধারণ—যেহেতু শ্বাসই জীবন; সেই জীবন-হানির উপক্রম দেখিয়া লোকে "জীব" অর্থাৎ বাঁচো বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

হাঁচি-টিক্‌টিকির শব্দ শাকুন শাস্ত্রে অশুভ নিমিত্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রসন্তরাজশাকুন নামক পুস্তক ও বহু পুরাণ এইসব অর্থহীন ভয়ের কথায় ভরা। এইসব শাস্ত্রকারেরা দয়া করিয়া একটু নড়িবার চড়িবার সুবিধা রাখিয়া কাশি প্রভৃতিকে বাদ যে দিয়াছিলেন ইহাই ভাগ্য আমাদের উর্দ্ধতন ছাপ্পান্ন পুরুষের ও অধস্তন কত পুরুষের তা কে জানে? কবে যে উঠিতে বসিতে এইসব ভুজুর ভয় ঘুচিবে তার কোনো আশাপ্রদ আভাস ত এখনো পাওয়া যাইতেছে না। মানুষের কাশিটা যদি বা বাদ পড়িয়াছিল, কিন্তু গো-ছাগলের কাশি বাদ যায় নাই—

অজো লুঠতি গৌঃ কাসী ক্ষুতং বা কুরুতে নরঃ।
পশ্যন্ যাত্রা ন কর্ত্তব্যা ক্লীবং পশ্যতি বাগ্রতঃ ॥
—জ্যোতিষাকরঃ।

এইরূপ দুর্নিমিত্ত দর্শনে যাত্রা নিষেধ মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে এত প্রচুর আছে যে পড়িলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহরা কেমন করিয়া নড়িতেন চড়িতেন। আমরা আছি বলিয়াই তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; নইলে এত ধরকাট গণ্ডি নিষেধ বারণ বাঁধনে আড়ষ্ট হইয়া কোনো প্রাণবান পদার্থ বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়। এবং আরো আশ্চর্য্য যে আমরা এখনো সেই শাস্ত্রবচন সুবোধ গো-পালের ন্যায় মানিয়া চলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা বিতর্ক করিতেছি না। অধিকন্তু তার বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজিতেছি।

(ঙ) যেহেতু একজন কে কবে কোন্‌কালে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা খেয়ালবশে বা বোকাদের ভোগা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিল—

একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্মর্ত্তব্যো নারদো মুনিঃ।
তাবদ্‌ ভবতি চণ্ডালো যাবদ্‌ অস্যাং ন পশ্যতি ॥
—কর্ম্মলোচনম্‌।

আর সেই অবধি নির্বিচারে এই অর্থহীন আদেশ পালন করিতে করিতে প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা তারা দেখিলে চঞ্চল হইয়া থাকে যতক্ষণ না আর-একটা তারা দেখে। যে চঞ্চল নয় সে যে এক তারা দেখিলে কেমন করিয়া চঞ্চল হইবে, এবং দুই তারা দেখিলেই যে তার চঞ্চলত্ব কেন ও কেমন করিয়া মোচন হইবে—তাহা ত বুদ্ধিমান জীব মানুষের ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা উচিত। কিন্তু আমরা ভাবনা-চিন্তার ভার শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত জড় হইয়া আছি যে।

(৪৬)

পৃথিবীব্যাপী জলপ্লাবনের উল্লেখ সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়। আমাদের দেশের সাহিত্যের মধ্যে বেদ প্রাচীনতম। বৈদিক সাহিত্যেও জলপ্রলয়ের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১।৮) বর্ণিত আছে যে জলপ্রলয়ের উপক্রম হইলে এক মৎস্য মনুর কাছে উপস্থিত হইয়া মনুকে একখানি বৃহৎ নৌকায় সর্ব্বপ্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ তুলিয়া প্রলয় হইতে প্রাণধারা রক্ষা করিতে উপদেশ দ্যায়। এই মৎস্য তখনো কোনো দেবতার অবতার নয়। তার পরের কালের রচনা মহাভারতে এই মৎস্য ব্রহ্মার অবতার। মনু যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন এক ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া তাঁকে বলে—আমাকে বৃহৎ মৎস্যের ভয় হইতে রক্ষা করুন। মনু মৎস্যকে জল হইতে তুলিয়া জালায় জীয়াইয়া রাখিলেন। রাত্রের মধ্যে মৎস্য এমন বড় হইয়া উঠিল যে জালায় আঁটে না; তখন তিনি তাকে এক জলাশয়ে রাখিলেন; রাতারাতি বৃদ্ধিতে সেই জলাশয়েও কুলায় না। এইরূপে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর জলাশয়ে রাখিতে রাখিতে মনু অবশেষে মৎস্যকে সমুদ্রে রাখিলেন। তখন মৎস্য মনুকে মহাপ্রলয়ের সংবাদ দিয়া নৌকায় করিয়া জগতের প্রাণধারা রক্ষা করিবার পরামর্শ দিল। জলপ্লাবন অপগত হইলে মৎস্য মনুকে প্রজা-সৃষ্টিতে নিযুক্ত করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গেল—

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা যৎপরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ যূয়ঞ্চ ময়াহস্মান মোক্ষিতা ভয়াৎ॥
—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৭।৫২।

মৎস্যপুরাণের প্রথম অধ্যায়েই জলপ্লাবনে মৎস্য-অবতারের উপাখ্যান আছে; মনু যখন মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া জলে ভাসিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই অবকাশে মৎস্য মনুকে সমস্ত পুরাণখানি বলেন। এখানে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার।

শতপথব্রাহ্মণ, মহাভারত ও মৎস্যপুরাণ—এই তিন পুস্তকের উপাখ্যানে বেদ উদ্ধারের কোনো উল্লেখ নাই। ভাগবতের ৮ম স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে আছে যে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বেদ হয়গ্রীব নামক অসুর হরণ করে। ইহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণু শফরীরূপ ধারণ করিয়া রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকট উপস্থিত হন। সত্যব্রত দ্রবিড়েশ্বর বিষ্ণুভক্ত; সলিলাসনে বিষ্ণুর তপস্যা করিতেছিলেন। সত্যব্রত ক্ষুদ্র মৎস্যকে আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ বৃহত্তর জলাশয়ে রাখিয়া রাখিয়া শেষে সমুদ্রে রাখেন। প্রলয়প্লাবন উপস্থিত হইলে সত্যব্রত সেই মৎস্যশৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া নিজেকে ও জগতের জীবধারাকে রক্ষা করেন, এবং

অতীতপ্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে।
হত্বা হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদধরিঃ॥

সেই সত্যব্রত রাজা পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশের এই প্রলয়প্লাবনের অনুরূপ উপাখ্যান নানা দেশে আছে দেখা যায়। বাইবেলের Deluge (Bible, Old Testament, Genesis, Chap. 6. 7. 8) বৃত্তান্ত সুপরিচিত; প্রলয় হইতে যিনি জীবনধারা রক্ষা করেন তাঁর নাম নোয়া।

ক্যালডীয়া দেশের উপাখ্যানে দেখা যায় জিসুদ্রস নামে এক রাজা, ওনিস নামক অর্দ্ধমৎস্য-অর্দ্ধনর দেবতার আদেশে জলপ্রলয় হইতে প্রাণধারা নৌকায় করিয়া রক্ষা করেন। গ্রীস ও সীরিয়া দেশের উপাখ্যানের রাজার নাম ডিউকেলিয়ন্। এসিরিয়ার উপাখ্যানের রাজার নাম হসিসদ্র।

ব্রেজিল, কিউবা দ্বীপ, টেরা ফার্ম্মা, মেক্সিকো, পেরু, প্রভৃতি দেশেও বন্যাপ্রলয়ের উপাখ্যান পৌরাণিক।

সুতরাং এই ব্যাপকতা হইতে অনুমান হয়—মানুষের চিন্তাধারার সমতা হইতে সকল দেশে একই রকমের কাহিনী রচিত হইয়াছিল, অথবা অতি অতীতে বাস্তবিক এক জলপ্রলয় ঘটিয়াছিল।

বিশেষ বিবরণের জন্য Encyclopædia Britannica—article *Deluge*, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা ২০৬—২০৮ পৃষ্ঠা, Maurice's *Hindustan*, Vol. I. p. 543, Encyclopædia of Religion and Ethics ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(৪৭)

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ২৮ অধ্যায়।

পৌরাণিক মতে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমার আদি বৈদ্যের পিতা ও ব্রাহ্মণী তাঁর মাতা। মনু (৮-১০ অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৯১) প্রভৃতি বহু সংহিতাকার অম্বষ্ঠ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের বৈশ্যাস্ত্রীর পুত্র বলিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্যাকে বিবাহ করিতে পারিত; আর সেই-সকল স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানই পিতৃজাতি পাইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং বৈদ্যগণ জাতিতে এখন ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেও আদিতে তাঁরা ব্রাহ্মণই ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁদের বেদ পঠন-পাঠনে অধিকার বর্ত্তিয়াছিল এবং নামই হইয়াছিল বৈদ্য,—অর্থাৎ বেদবিদ্, বেদপারগ, বিদ্বান, পণ্ডিত। বৈদ্যরা এইজন্য ব্রাহ্মণত্ববাচক শর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করিতেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের আবিষ্কৃত চন্দ্রদেবের তাম্রফলকে "গুপ্তশর্ম্মা" উপাধি আছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (৯।৩৬) বলেন যে ঋষিগণ অম্বষ্ঠকে বৈদ্য নাম ও আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করেন। এই অম্বষ্ঠ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও আমরা নানা মুনির নানা মত জানিতে পারি। বৈদ্যবংশের আদিপুরুষের নাম অমৃতাচার্য্য; তাঁর পিতা মহর্ষি গালব, ও মাতা বৈশ্যা বীরভদ্রা বা অম্বা। সেই অম্বার পুত্র বলিয়া বৈদ্যদের অপর বংশনাম অম্বষ্ঠ। আবার কারো মতে অম্বষ্ঠ দেশ আফ্‌গানিস্থানে; সেই অম্বষ্ঠদেশবাসী বংশ অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হয়। অমৃতাচার্য্যের অনেকগুলি কন্যা ছিলেন; নানা মুনি ঐ কন্যাদের পাণিগ্রহণ করেন। মদ্রদেশ (পঞ্জাব)-নিবাসী ঋষি ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যা মলয়াকে বিবাহ করেন। মলয়া ও ধন্বন্তরির পুত্রের নাম হয় সেন। অপরাপর কন্যাদের অপর সাত পুত্র হয়—গুপ্ত, দত্ত, দেব, দাশ, কুণ্ড, নন্দী, সোম। সেইসব পূর্ব্বপুরুষদের নাম এখনো বৈদ্যেরা নিজেদের উপাধি রূপে ব্যবহার করেন এবং দাশ উপাধি তালব্য শ দিয়া লেখেন। সেন ও দাশ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্রবিড়দেশে গিয়া বাস করেন; এবং তাঁদের বংশ দ্রবিড়দেশ হইতে বঙ্গদেশে আসেন। দ্রবিড় দেশে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে হইতেই জৈনধর্ম্ম হীনবল হইতে আরম্ভ করে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। যেসব জৈনপুরোহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্বীকার করে তাহারা শূদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া যায়। দ্রবিড়দেশে বল্লাল নামে

এক জাতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী ছিল ; তারা রাজাদের সৈন্য সেনাপতি যোদ্ধা হইত, বড় বড় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত ; আবার তারা বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞও করিত। এই বল্লাল জাতি তখন দ্রবিড়দেশের খুব প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রবল জাতি ছিল বলিয়া তাদের নাম হয় বল্লাল,—বল্লম মানে বন্যাস্রোত, ও অলম্ মানে রাজা ; তাহা হইতে বল্লালম্ মানে নদীমাতৃক দেশের রাজা ; অথবা বল হইতেছেন যুদ্ধদেবতা, বল্লাল নাম এই যুদ্ধদেবতার নাম হইতেও হইয়া থাকিতে পারে। বল্লাল জাতি বেদাধ্যায়ী হইয়া চোল ও পাণ্ড্য বংশীয় রাজাদের পুরোহিতের কাজও করিত ; তখন তাদের নাম হয় বৈদ্য। যারা যোদ্ধৃবৃত্তি বা পৌরোহিত্য না করিত, তারা হইত চিকিৎসক। দাক্ষিণাত্যে চিকিৎসককে অম্বট্টন্ বলে ; চিকিৎসাব্যবসায় ক্রমে নাপিত জাতের ব্যবসায় হইয়া পড়ে, সেইজন্য এখনো নাপিতদের দাক্ষিণাত্যে অম্বট্টন বলে। অতএব দেখা যাইতেছে বল্লাল-বৈদ্য চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করাতে তৃতীয় নাম লাভ করে অম্বষ্ঠ। তামিল দেশের বল্লাল-বৈদ্যের এক শাখা শানান নামে পরিচিত হয়। রাজেন্দ্র-চোল যখন বঙ্গবিজয় করিতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই বল্লাল-বৈদ্য অম্বষ্ঠ-শানান নামে পরিচিত দ্রবিড়দেশী জাতি বঙ্গদেশে আসেন ও বঙ্গেই থাকিয়া যান। এই জাতি বঙ্গদেশেও প্রবল হইয়া বঙ্গ ও মিথিলার রাজা হন এবং সেন ও কর্ণাট বংশীয় রাজা বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। বঙ্গের সেনরাজারা আপনাদিগকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন ; এই ক্ষত্রিয়-পরিচয় অবলম্বন করিয়া বাঙালী-ক্ষত্রিয় কায়স্থরা সেনরাজাদের কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চান। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বল্লাল-শানান জাতির বংশেই যে বঙ্গের সেনরাজা বল্লাল-সেন উৎপন্ন তাহা এখন ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হইয়া গেছে ; ঐ বল্লাল-শানান জাতি একদিকে যেমন ব্রাহ্মণধর্ম্মী বৈদ্য ছিলেন, অপরদিকে তেমনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী বল্লাল ছিলেন ; সুতরাং সেনরাজাদের কর্ণাটক্ষত্রিয় পরিচয়ে ও সেই বংশের যাঁরা ব্রাহ্মণধর্ম্মী তাঁদের বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিচয়ে কোনো বিরোধ নাই। বঙ্গের সেনবংশ নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন ; বোধ হয় ঐ বংশের আদিপুরুষের নাম চন্দ্র ছিল ; গোবর্দ্ধন আচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী কাব্যে এই কথাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয়।—

সকলকলাঃ কল্পয়িতুম্ প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলক-ভূপতি রেকো রাকা প্রদোষশ্চ ॥

এই শ্লোকে কুমুদবন্ধু ও রাকা চন্দ্রের নামান্তর।

পাণিনি ব্যাকরণে ও ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে দাস ও দাশ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া আছে।—'দসো ভৃত্যে—দাসঃ' ; দাস শব্দের মুখ্য অর্থ দস্যু, গৌণ অর্থ ভৃত্য। 'দন্শ দংশনে...কৈবর্ত্তে দাশঃ' ; দংশন হইতে উৎপন্ন দাশ শব্দের কৈবর্ত্ত ধীবর (যারা মাছকে দংশন অর্থাৎ হত্যা করে) বুঝায়। 'তালব্যান্ত দাশৃ দানে—দাশত্যস্মৈ দাশো বিপ্রঃ' ; তালব্যান্ত দাশ শব্দের মানে দাতা ; যিনি বেদবিদ্যা দান করেন তিনিই দাশ এবং তিনি বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ। এইজন্য বৈদ্যরা শূদ্রত্ব-সূচক দাস না লিখিয়া ব্রাহ্মণত্ব-বোধক দাশ উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—শব্দকল্পদ্রুম "বৈদ্য" শব্দ ; পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও সম্পাদিত জাতিতত্ত্ববারিধি ও মন্দারমালা ; পণ্ডিত শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত History of the Bengali Language (Calcutta University) ; শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাংলার ইতিহাস ও প্রবন্ধ (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, no. 3)।

(৩১)

আমি কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে "হিন্দু" শব্দের প্রচলন-সময় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী লিখিয়াছিলাম ; তাহা ভুল ; খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইবে। দরায়ুস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ পার্সিপোলিস ও নক্শ্-ই-রুস্তম্ শিলালিপিতে ভারতবাসী বুঝাইতে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখা যায় ; ইহা ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বের কাছাকাছি সময়ের লেখা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩২)

সাহিত্যসম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত চতুর্থ সংস্করণ কৃষ্ণচরিত্রে পুরাণ, ইতিহাস, গণিত এবং জ্যোতিষের সাহায্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের স্বীকৃত বিষয় লইয়া আলোচনা করতঃ মহাভারত সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের এবং তাঁহাদের দেশীয় শিষ্যদিগের মত খণ্ডন করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪৩০ বৎসরে ভারত-যুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ এবং যুদ্ধের অনল্প পরেই মহাভারত রচিত হওয়া সুন্দর রূপেই প্রমাণ করিয়াছেন। এ মত এখন পর্য্যন্ত খণ্ডিত হয় নাই। সুতরাং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব খ্রীষ্টজন্মের পরেই মহাভারত রচিত হইয়াছে, পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, বলিতে হইবে। কুরুপাণ্ডবদিগের লোকান্তরের পর মহাভারত রচিত হওয়ার কথা মহাভারতেও রহিয়াছে (ভীষ্মপর্ব্ব ২য় অধ্যায় ১৩ শ্লোক এবং আদি পর্ব্ব ১ম অধ্যায় ৯৪-৯৭ শ্লোক)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব-কাল যে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৪৮ বলিয়াছেন এই অঙ্কই ভুল বলিয়া মনে হয়। ইউরোপীয় কোন পণ্ডিতই ভারত-যুদ্ধের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বেশী নির্দ্দেশ করেন নাই। ভারত-যুদ্ধের-সময়ে অর্জ্জুন যুবক ছিলেন (উদ্‌যোগ পর্ব্ব ১৬৮ অধ্যায় ২৬ শ্লোক)। অর্জ্জুন হইতে যুধিষ্ঠির ১০।১৫ বৎসর বড় হইলেও ভারত যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ৭০।৭৫ বৎসরের বেশী হইতেই পারে না। অতএব যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ কি ১৫০৫ বৎসরের বেশী হয় না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন রামায়ণ খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে দেখিতে পাই রামচন্দ্র হইতে ৩১ পুরুষে কুশের বংশধর বৃহদ্বল অভিমন্যুর হাতে নিহত হন (৪৩)। রামচন্দ্র জীবিতকালেই যে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল রামায়ণই তাহার প্রমাণ। রামচন্দ্র হইতে প্রত্যেক পুরুষের জীবিতকাল ৫০ বৎসর গণ্য ধরিলেও ৩১ পুরুষে ১৫৫০ বৎসর হয়। অতএব ভারতযুদ্ধের ১৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতযুদ্ধের ১৪৩০+১৫৫০=২৯৮০ খৃষ্টপূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে বলিতে হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

(৩৩)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শঙ্খচূড়ের সাধ্বী পত্নী তুলসীর শাপে শ্রীকৃষ্ণ এবং মেরুতন্ত্রে বিষ্ণু গণ্ডকী-শাপে শিলারূপ হওয়ার গল্প রহিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসীরই দেহ গণ্ডকী-শিলা হওয়ার কথা রহিয়াছে (প্রকৃতিবাদ অভিধান, 'তুলসী' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

(১৯)

শ্রীরমাপ্রসাদ লাহা, শ্রীশরচ্চন্দ্র সান্যাল (পি এম বাগচীর ডিরেক্টারী পত্রিকা হইতে), ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব বাংলা সাল প্রবর্ত্তনের ইতিহাস পাঠাইয়াছিলেন ; পুনরুক্তি বলিয়া ছাপা হইল না।

(৩২)

রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে বেতালের বৈঠকে ৩২ সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসায় লেখা হইয়াছে, খৃষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ ও ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে এবং যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব-কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৪৮ অব্দ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই নির্দ্ধারণ দৃষ্টে ইহাই বুঝায় যে যুধিষ্ঠিরের ১৯৪৮ বৎসর পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে। তবে কি যুধিষ্ঠির ঐতিহাসিক ব্যক্তি? এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

বাল্যকালে একখান ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হয়। ইহা অসঙ্গত মনে হয় না। মহাভারতে মগধরাজ জরাসন্ধ একজন পরাক্রান্ত ভূপতি। বিষ্ণু-পুরাণের গণনা মতে জরাসন্ধ হইতে ৩৪ জন রাজার পর বিম্বিসার এবং তৎপরে তৎপুত্র অজাতশত্রু মগধ-সিংহাসনে রাজত্ব করেন (বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায়)। ইঁহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তৎপূর্ব্বের ৩৪ জন রাজার প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ২৫ বৎসর ধরিলে ৮৫০ বৎসর হয়। তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীই মহাভারত রচনার কাল নির্ণীত হয়।

তৎপর রামায়ণের কথা। কেহ কেহ মনে করেন, রামায়ণের ভাষা মহাভারতের ভাষা অপেক্ষা প্রাঞ্জল; সুতরাং রামায়ণ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে রচিত। কিন্তু কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ স্থানে স্থানে মহাভারতের ভাষা একটু জটিল হইলেও সাধারণতঃ উভয় গ্রন্থের ভাষা প্রায় একরূপ। আবার কেহ মনে করেন মহাভারতের সময়ে বিবাহ প্রথা শিথিল ছিল, রামায়ণে সেরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। সামাজিক নিয়ম ক্রমেই সংশোধিত হইয়া উন্নতির দিকে চলিয়াছে; অতএব মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত। একথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে রামায়ণের বহু স্থানে বিশেষতঃ সীতা-বিলাপের অনেক স্থানে একপত্নীব্রত শব্দের উল্লেখ আছে। একপতি যে স্ত্রীর সে একপত্নী (বহুব্রীহি সমাস)। সীতা একপত্নীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা অনুবাদে তত্তৎস্থলে সতীত্ব শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। বাস্তবিক যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণে সতীত্ব শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। একপত্নীত্ব যেখানে ব্রত, সেখানে বিবাহপ্রথা যে শিথিল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

রামায়ণের সময়ে ভারতের অনেক প্রদেশ নিবিড় অরণ্যানীতে সমাচ্ছন্ন ছিল। মহাভারতে অরণ্যের উল্লেখ তত অধিক নাই। রামায়ণে নৌকার উল্লেখ অতি বিরল; মহাভারতে যন্ত্র-পরিচালিত তরণীর উল্লেখ আছে। রামায়ণের সময়ে রাস্তাঘাট প্রায় ছিল না; রামের অনুসন্ধানার্থ-গমন-কালে ভরতকে পথ নির্ম্মাণ করিয়া যাত্রা করিতে হইয়াছিল। মহাভারতে বহুদূরব্যাপী রাজপথের উল্লেখ আছে। দেশের অবস্থার এইসকল পরিবর্ত্তন অল্প সময়ে সাধিত হইতে পারে নাই। বিষ্ণুপুরাণের গণনায়ও এই অনুমান সমর্থিত হয়। রামের জ্যেষ্ঠ তনয় কুশ হইতে ৩১ জন রাজার পর বৃহদ্বল জন্মগ্রহণ করেন; ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গমন করিয়া অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুর্থ অধ্যায়)।

এইসকল রাজবংশের ইতিহাস সত্য হউক বা কল্পিত হউক, কাল গণনায় ইহার কিঞ্চিৎ মূল্য আছে। রাম বা জরাসন্ধকে যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহারা অনুমানে রামায়ণ বা মহাভারত রচনার একটা কালও ধরিয়া লইয়াছেন। কেহ এসকল বিষয়ের মীমাংসার সদুত্তর প্রদান করিলে বাধিত হইব।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

(৯)

বাংলা ভাষায় প্রেততত্ত্ব বিষয়ক 'জন্মান্তর-রহস্য' 'পরলোক-রহস্য' ও 'ছায়াদর্শন'—এই তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'—ইহা ঠিক প্রেততত্ত্বের পুস্তক নহে, তবে ইহাতে আধ্যাত্মিক জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

ইংরেজীতে Proceedings of the Society for Psychical Research—বৃহৎ কিন্তু চিত্তাকর্ষক। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার লিখিত Psychical Research and Man's Survival of Bodily Death প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত—বাঙ্গালীর লেখা এরূপ পুস্তক আর নাই। এতদ্ব্যতীত Standard Works of Hyslop, Myers, Lodge, Coats, and Peebles আছে। কিন্তু আমার পছন্দ শেষের দুজনের বই। এ বিষয়ের পুস্তকাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য the catalogue published by D. B. Taraporevala & Sons, 103, Meadows Street, Fort, Bombay.

(১২ খ)

ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ দেখা যায় না। মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা বিষাক্ত অঙ্গুরী চুষিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী।

(১৮)

দেশী সুতার কাপড়ের হ্যাণ্ডলুম সম্বন্ধে নিম্নের ঠিকানায় খোঁজ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

১। শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল (প্রত্যেকটির মূল্য ৪৲ টাকা)। ২। পোষার খেদা ফারম্, হোসেনাবাদ, নাগপুর, সি পি। ৩। জোয়ারগঞ্জ উইভিং স্কুল, এ বি আর। ৪। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি। ৫। ঢাকা উইভিং স্কুল। ৬। কুমিল্লা আর্টিজান্ স্কুল। ৭। Salvation Army, Calcutta.

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৩৫)

মশারির ব্যবহার সম্বন্ধে চারু-বাবু কবিকঙ্কণের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ইহা অপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ পাইয়াছি—

স্বর্ণখাটে নেত তুলি, উপরে মশারি।
লক্ষ্মী-বেশে তথা গেলা জনক-ঝিয়ারি॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১৫৬ পৃঃ, ১ম কলম, ১১-১২ পংক্তি)।

কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

কাঁকড়া

বাঙালীর সঙ্গে কাঁকড়ার পরিচয় রসনার মারফতে। বাঙালীর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ভোজনবিলাসী কবি; আনারস, পাঁঠা, এণ্ডাওয়ালা তপ্‌সী মাছ, পুলিপিঠে, কাঁকড়া সবাই তাঁর লালারসের সঙ্গে কবিত্বরস ক্ষরণে সাহায্য করিত। তিনি কাঁকড়ার স্বাদ স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

মর্কটেতে কি জানিবে কর্কটের রস।
ভাগ্য যার ভাল, সেই খেয়ে পায় যশ॥

ছেলেবেলা থেকেই শেয়ালের কাঁকড়া ধরার গল্পের ভিতর দিয়া বাঙালী শিশুর কাঁকড়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কাঁকড়ার মতন ভীষণ দাড়া-ওলা প্রাণীকেও ধূর্ত্ত শেয়াল লেজে খেলায়, এই কৌতুকরস ছেলেবেলায় কাঁকড়ার স্বাদরস অপেক্ষাও বেশী রুচিকর মনে হয়। সমুদ্রের কাঁকড়াকে যে লোকে খানিকটা ভয়ের চক্ষে দেখিত, এবং সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী যে এক শেয়ালের কাছেই জব্দ, এর পরিচয় আমরা কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় দেখিতে পাই।—

সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া॥
নৌকার পাশে কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তার বুহিত রহায়॥
আমার দেশের কাঁকড়া রাড়-চোয়াড়ে খায়।
এ দেশের কাঁকড়া ভাই বুহিত রহায়॥
বড়ই সেয়ান সব উত্তর্য়া বাঙ্গাল।
নৌকায় পড়িয়া ডাকে যেমন শৃগাল॥
শৃগালের বোল তারা জলে হৈতে শুনে।
অমনি প্রবেশ কৈল পাতাল ভুবনে॥

তারপর আমাদের কাঁকড়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটে হিতোপদেশের মধ্যে, যে কুলীরক বকের "মৃণালধবলাং গ্রীবাং চকর্ত্ত।"

কিন্তু এসব পরিচয় ভাসাভাসা; যখন কাঁকড়াকে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করা হয়, তখন তার সঙ্গে যোগটা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয় না। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় বিজ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে।

কাঁকড়া মাকড়সা কাঁকড়া-বিছে ও চিংড়িমাছ প্রায় এক শ্রেণীর জীব। কাঁকড়া জন্মমাত্রই বয়স্ক কাঁকড়ার

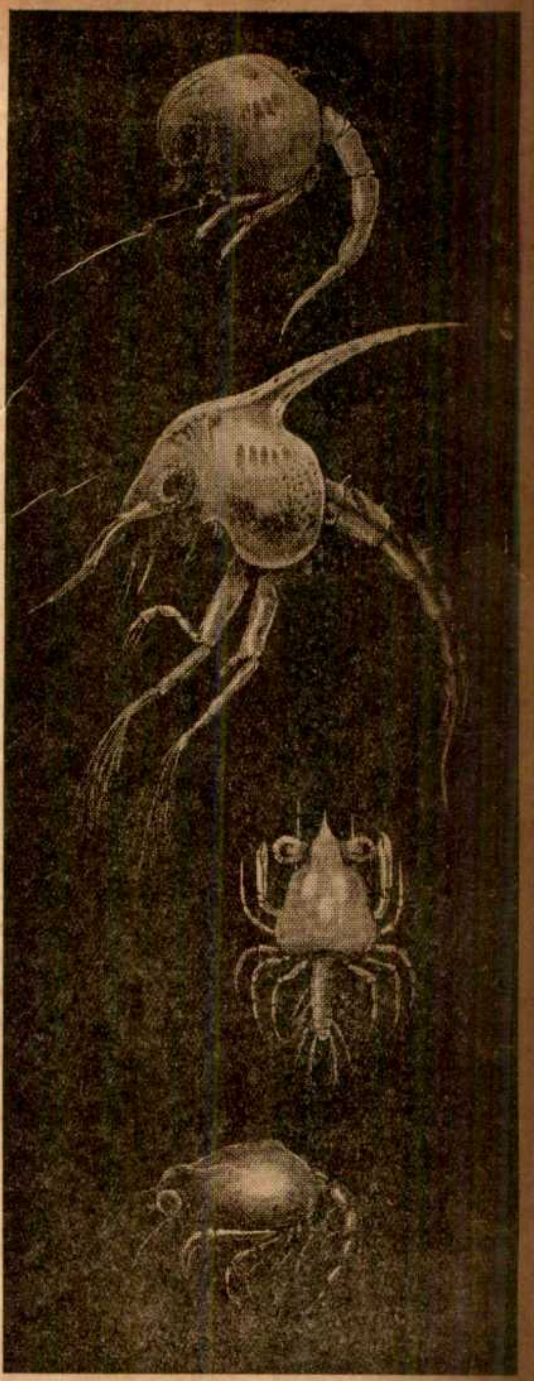

কাঁকড়ার ক্রম-অভিব্যক্তি।
বাচ্চা কাঁকড়া ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন আকার ধরে।

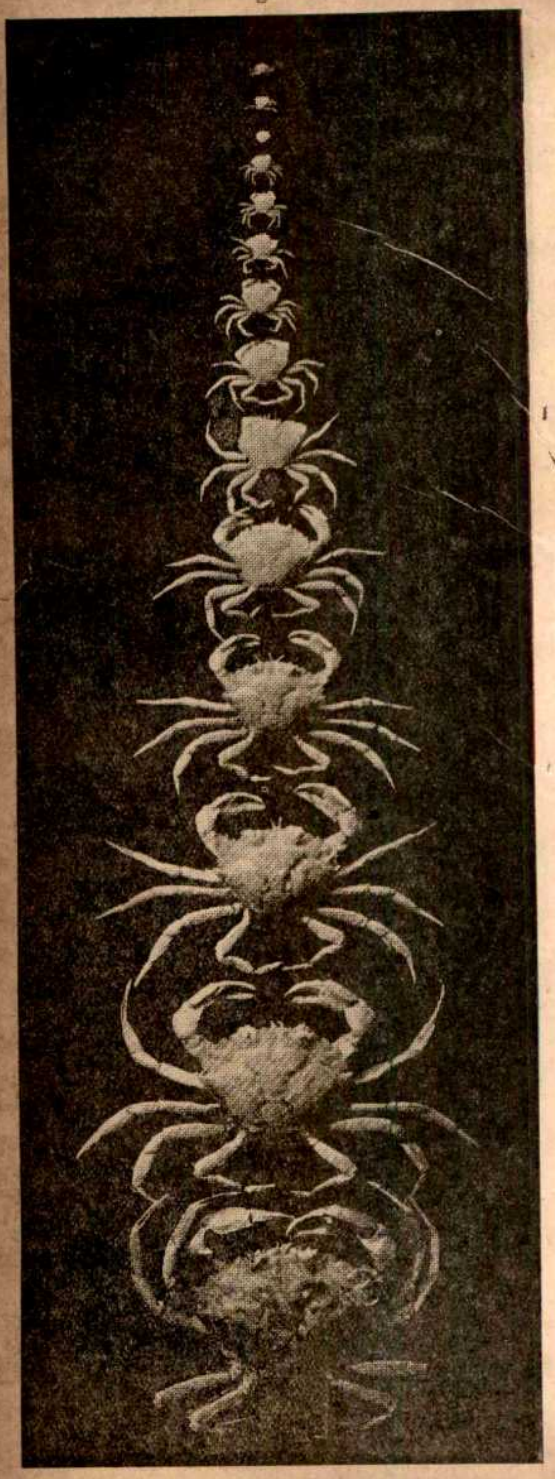

কাঁকড়ার চৌদ্দ দশা।—কুদে কাঁকড়া যেই শুঁড় খড়্গ লেজ গুটাইয়া মা-বাপের মতন চেপ্টা চৌকা আকার পায় অমনি বছর বছর খোলস ছাড়িয়া ছাড়িয়া ক্রমশ বাড়িয়া চলে।

মতন আকারের থাকে না; তখন তাদের চেহারা থাকে কিম্ভূতকিমাকার শুঁড়-ল্যাজ-ওলা পোকার মতন, পরে কাঁকড়ার রূপ ধরে। কাঁকড়ার প্রথমে ডিম হয়, ডিমগুলি পোস্তদানার মতন ছোট-ছোট; তা থেকে যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন সে কত ছোট থাকে সহজেই বোঝা যায়; অতএব কাঁকড়ার যে রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটে তা খুব ক্ষুদে বেলাতেই। তারপর ক্রমাগত খোলস খুলিয়া-খুলিয়া বড় হইয়া চলে।

কাঁকড়া মোটের উপর পঁচিশ রকম। এদের কতক-গুলি স্থলচর, কতকগুলি জলচর, কতকগুলি উভচর। বাসস্থানের তারতম্য অনুসারে তাদের আকার প্রকার স্বভাব আচরণ ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়।

কাঁকড়ার সংস্কৃত সমনাম দশরথ—কারণ তার দশ পা। সে কিন্তু চলে আট পায়ে; সাম্‌নের পা-জোড়া তার আক্রমণ ও সংরক্ষণ করিবার অস্ত্র—দাঁতিকাটা সাঁড়াশীর আকার। কাঁকড়ার পা আকের মতন পর্ব্বে-পর্ব্বে খিলানো। পায়ের উপর দিক হয় ফাঁপা, কেবল নীচের পাবটা হয় নিরেট।

গভীর সমুদ্রের তলাতেও কাঁকড়া থাকে। তাদের পিঠের খোলা এমন শক্ত যে অত গভীর জলের চাপে তা ভাঙিয়া যায় না, অথবা তাদের আকার খর্ব্ব হইয়া পড়ে না; বরং সমুদ্রের কাঁকড়াই আকারে অন্য কাঁকড়ার চেয়ে বড় হয়। অনেক কাঁকড়া বালির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। কাঁকড়া পায়ের নিরেট পাব দিয়া গর্ত্ত খোঁড়ে। এরা আত্মগোপনের জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করে; কাঁকড়া যা-তা একটা কিছু দাড়া দিয়া ধরিয়া পথ চলে, যেন তার শত্রুরা হঠাৎ তাকে চিনিতে না পারে। অনেক রকমের কাঁকড়া নিজেদের পিঠে স্পঞ্জ প্রবাল প্রভৃতি জীবকে বাসা করিতে দিয়া তাদের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া শত্রুকে ফাঁকি দ্যায়। পিঠের খোলার উপর এইরকম জীবজন্তু বহিয়া বেড়াইবার সুবিধার জন্য তাদের খোলার উপর খাঁজ-কাটা দাগ হয়, সেই দাগগুলার মধ্যে মানুষের মুখের একটু আদল থাকে; জাপান হংকং প্রভৃতি দেশের সমুদ্রে একরকম কাঁকড়া দেখা যায়, তাদের পিঠের খোলায় এই মানুষ-মুখের আদ্‌রা বেশ স্পষ্ট—তাই তাদের ভূত-মুখো কাঁকড়া বলে।

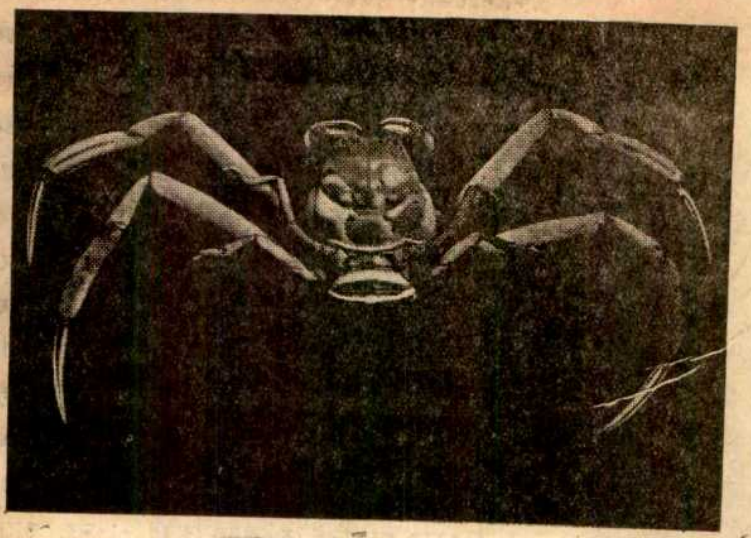

ভূত-মুখো কাঁকড়া
জাপানের এই জাতের কাঁকড়ার পিঠের খোলার উপর এমন দাগ ও টোলটাল থাকে যে তার মধ্যে ঠিক মানুষের ভয়ঙ্কর মুখের আদল দেখা যায়।

অনেক কাঁকড়ার গায়ে আবার বেশ লোম থাকে। এক রকমের কাঁকড়া দেখিতে যেন বেঁড়ে চিংড়ি মাছটি। অনেক সমুদ্রের কাঁকড়ার খোলায় লাল নীল হল্‌দে বিচিত্র সুন্দর রঙের আঁকজোঁক কাটা থাকে। এইসব ছদ্মবেশে তারা শত্রুদের চোখে ধূলা দিয়া ঠকায়। লোমশ কাঁকড়ার লোমে কাদা লেপ্‌টাইয়া থাকে, তাতে তাকে কাদার ডেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কোনো কোনো কাঁকড়া দেখিতে একেবারে হুবহু একটুক্‌রা পাথর, তারা পা দাড়া গুটাইয়া একেবারে নুড়ির মতন পড়িয়া থাকিতে জানে।

কাঁকড়া একদিকে যেমন মাকড়সার মতন ছোট ছোট জাতের আছে, অপর দিকে আবার প্রকাণ্ড আকারেরও আছে। মটুরে কাঁকড়ার আকার মটর প্রমাণ, গোলগাল মটরেরই মতন। এরা জ্যান্ত ঝিনুকের পেটের ভিতর বাসা করিয়া লুকাইয়া থাকে। নরম তুলতুলে ঝিনুকের ...রে থাকিবে বলিয়া প্রকৃতির নিয়মে তাদের দাড়া শোঁয়া খোঁচা সব ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝিনুক যখন খোলা ফাঁক করে তখন জলের সঙ্গে বস্তুকণা তার পেটে ঢোকে; সেইসব তার খাবার। অতি ক্ষুদ্র কণা না হইলে কোমল ঝিনুক তাহা হজম করিতে পারে না; সেই খাদ্যকণা তখন তার দেহে সংলগ্ন থাকিয়া তার পীড়ার কারণ হয়; সেই খচ্‌খচে কাঁটার বেঁধা হইতে আত্মত্রাণের জন্য ঝিনুক লালা দিয়া সেই খাদ্যকণা ঢাকিতে থাকে; ক্রমে সেই লালা-ঢাকা বস্তু মুক্তা হইয়া উঠে। মটুরে কাঁকড়া এইসব বৃহৎ খাদ্যকণা খাইয়া নিজে বাঁচে এবং আশ্রয়দাতা বন্ধু ঝিনুককে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করে; এইরূপ সহযোগিতায় দুজনের ঘরকন্না চলে।

একরকম জলো কাঁকড়া আছে ঠিক মাকড়সার মতন ছোট, আর তাদের পাও মাকড়সার মতন লম্বা লম্বা অতি সরু; তারা এমন হাল্কা যে অনায়াসে জলো ঘাস দল দামের উপর দিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, তাতে পল্কা ঘাস একটু নোয়ও না।

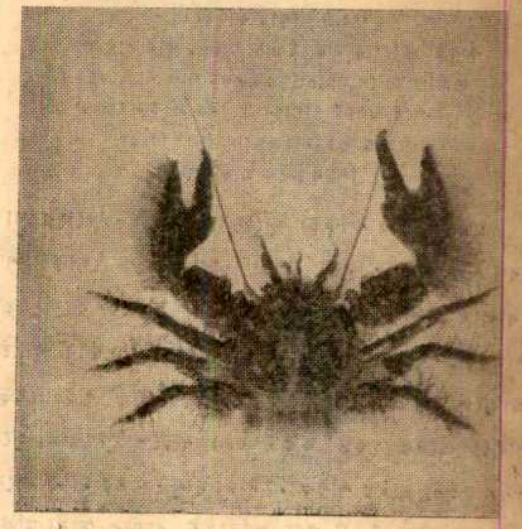

লোমশ কাঁকড়া।

আবার জাপানে একরকম বৃহৎ কাঁকড়া পাওয়া যায়—তার এক দাড়ার ডগা থেকে আর-এক দাড়ার ডগা পর্য্যন্ত ১৮ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তার হয়। এরা নিজেদের প্রকাণ্ড দেহকে লুকাইবার জন্য গায়ে শ্যাওলা, স্পঞ্জ, জলজ দাম গজাইয়া ছদ্মবেশ করে; তবু অষ্টপদী বা অক্‌টোপাস ও বড় বড় মাছ এদের ধরিয়া ধরিয়া খায়।

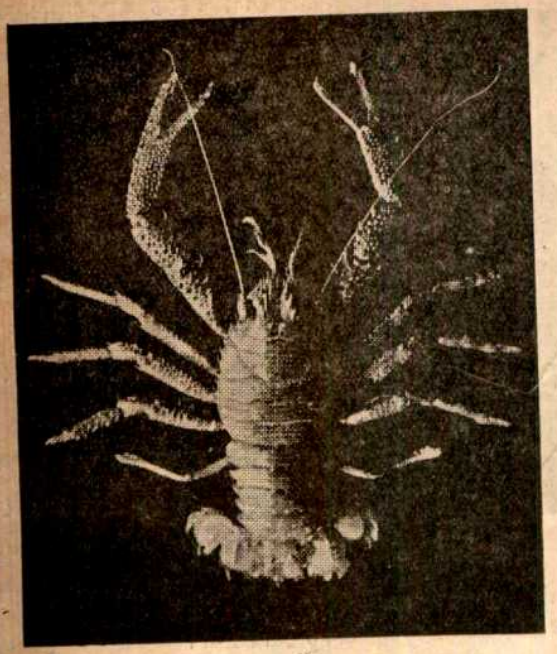

চিংড়ি-আকার কাঁকড়া।
কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ যে এক জাতের জীব তার প্রমাণ।
এর পিঠের খোলা চিংড়ির মতনই থাক থাক, একের
উপরে অপরটি চাপানো। এই কাঁকড়া ছেৎরা
লেজে ভর দিয়া তড়াক তড়াক করিয়া
পিছন দিকে লাফ মারে!

এক রকমের কাঁকড়া আছে যাদের পিছন দিকের খোলা বেশ শক্ত মজ্‌বুত নয়; তাই তারা শামুক গেঁড়ির শক্ত খোলার মধ্যে ঢুকিয়া বর্ম্মাবৃত হইয়া বিচরণ করে; এবং শামুকের খোলের গায়ে আবার কোনো রকম জীব বসাইয়া আত্মগোপন আরো পাকা করে। এরা বাড়ী বহিয়া বেড়ায় বলিয়া এদের গৃহস্থ কর্কট বলা যাইতে পারে। গৃহের দখল লইয়া এদের শরিকানী দাঙ্গা হুজ্জুতও হয় মাঝে মাঝে। এরা বড় ভীতু, একটু শব্দ শুনিলেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া-পড়িয়া লুকায়। এদের ডান দাড়ার সাঁড়াশীটা খুব বড় ও দৃঢ় হয়; সেটা তাদের ঘরের দরজায় আগড়ের কাজ করে। মাছেরা এই কাঁকড়া খাইতে খুব ভালো বাসে; শামুক-খোলে লুকাইয়াও এদের পরিত্রাণ নাই—সমুদ্রের মাছের দাঁতের চাপে শামুক-খোলও গুঁড়া হইয়া যায়; তাই এরা পিঠে এমন কোনো-রকমের জন্তুকে বাসা দেয় যারা মাছের খাদ্য নয়, অধিকন্তু যাদের গা থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। কোনো কোনো গৃহস্থ কাঁকড়া মাথায় ও দাড়ায় ওক্‌ড়ার ফল জন্মিতে দ্যায়, কারণ, মাথা ও দাড়া তাদের প্রায়ই ঘরের বাহিরে রাখিতে হয়। সমুদ্রে যে-সব বোতল ভাঁড় ইত্যাদি পড়ে, গৃহস্থ কর্কট তার মধ্যেও আশ্রয় লইয়া নূতন ধরণের বাড়ীতে বাস করার আনন্দ উপভোগ করিবার চেষ্টা করে।

কর্কটরাজ নামে পরিচিত জীব ঠিক কাঁকড়া নয়, তবে কাঁকড়ার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। তার চেহারাটা যেন একখানা armoured car—পিঠে তার ঢাল, আর ল্যাজ তার বল্লম! তার দাড়া মুখ পা সব খোলার তলে বেমালুম ঢাকা থাকে। কোনো-রকমে চিত হইয়া পড়িলে এরা শক্ত ল্যাজের চাড়া দিয়া নিজেদের উল্টাইয়া উবুড় করে।

কাঁকড়ার আকারই যে কেবল বিবিধ তা নয়, তাদের স্বভাবও বিচিত্র। ডাঙার কাঁকড়াদের জলে চুবাইলেই

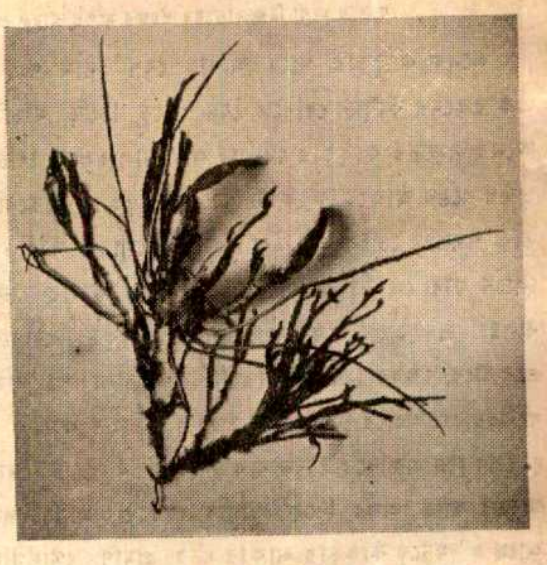

মাকড়সা-কাঁকড়া।
এই কাঁকড়ার আকার ছোট, পা সরু লম্বা লিক্‌লিকে, অবিকল
মাকড়সার মতন। এরা এত হাল্কা যে জলো ঘাসের ডগায়
ডগায় অনায়াসে চলাফেরা করে, ঘাস নোয় না।

তারা মরিয়া যায়; জলো কাঁকড়ারা ক্রমাগত জল দিয়া ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্র ভিজাইয়া রাখিতে না পারিলে বাঁচে না।

এক রকমের কাঁকড়ার ডান দাড়াটা খুব মোটা হয়; তারা যখন চলে তখন এই দাড়া উঁচু করিয়া চলে, যেন কাউকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে মনে হয়। তাই

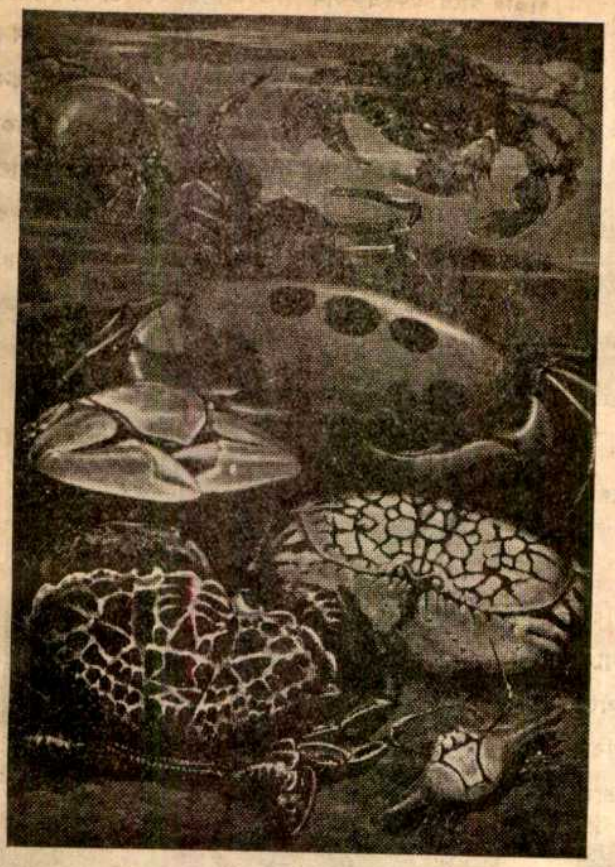

রংচঙা কাঁকড়া।
লাল নীল হল্‌দে সবুজ নানান রঙের কোঁটাকাটা ডোরাকাটা এদের গা।

এদের নাম রাখা হইয়াছে হাতছানি কাঁকড়া। এরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে; গর্ত্তের মধ্যে দেহ ঢুকাইয়া গর্ত্তের মুখের কাছে দাড়াটি জাঁতিকলের মতন পাতিয়া রাখে; কোনো শত্রু গর্ত্তে ঢুকিতে আসিলে জাঁতিকলে আটক ও কাটা পড়ে। সেই আগন্তুক যদি কাঁকড়ার খাদ্য হয় তবে ত কাঁকড়ার পোয়া বারো! এরা দলে-দলে সমুদ্রের তীরে গর্ত্ত করে; এদের গর্ত্ত-খোঁড়া মাটি সমুদ্রের দিকে আলের মতন উঁচু হইয়া-হইয়া ক্রমে সমুদ্রকে হঠাইয়া নূতন ডাঙা উদ্ধার করিতে থাকে।

কাঁকড়া যেমন পরশুরামের মতন সমুদ্রের দখল হইতে কাড়িয়া নূতন ডাঙা তুলিয়া মানুষের উপকার করে, তেমনি মাটি খুঁড়িয়া তলের মাটি উপরে তুলিয়া মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিরও সহায়তা করে। সবচেয়ে তারা মানুষের উপকার করে নিজেদের দেহ মানুষদের খাইতে দিয়া। মানুষ ছাড়া শেয়াল বক সারস কুমীর মাছ অষ্টপদী প্রভৃতি বহু জন্তু কাঁকড়া খাইতে ভালোবাসে।

কাঁকড়া আবার মানুষের অপকার করিতেও পারে কম না। তারা আকের ক্ষেতে পড়িয়া আক খায় খুব, ক্ষেতকে-ক্ষেত উজাড় করে। প্রশান্ত মহা-

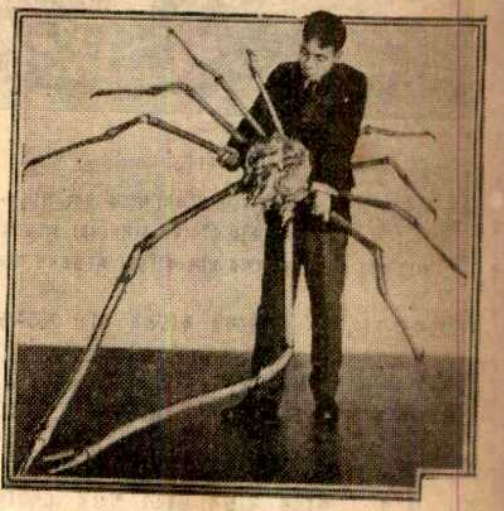

অতিকায় কাঁকড়া।
জাপানী মানুষ ছোট ছোট বেঁটে; সেই অভাবের হরণপূরণ করিতে ভগবান সে দেশের কাঁকড়াকে করিয়াছেন অতিকায়। এর সাম্‌নের দুই দাড়া ছড়াইয়া ধরিলে এক দাড়ার ডগা হইতে অপর দাড়ার ডগার ফাঁক হয় ১৮ ফুট!

সাগরের দ্বীপপুঞ্জে একরকমের কাঁকড়া আছে, তারা নারিকেল-গাছে চড়িয়া নারিকেল পাড়ে; তারপর দাড়া দিয়া ছোব্‌ড়া ছাড়াইয়া নারিকেলের দুই চোখে দাড়ার দুই চোখা খোঁচা বিঁধিয়া মালা ফুটো করে এবং সেই ফুটোর মধ্যে সরু পা চালাইয়া চালাইয়া নারিকেল-শাঁস কুরিয়া-কুরিয়া বাহির করিয়া খায়; নারিকেল-ছোব্‌ড়া গর্ত্তে বিছাইয়া বিছানা পাতে। নারিকেল-খোর কাঁকড়ার গায়ে খুব তেল হয়; তাই লোকে এদের খাইতে পাইলে ছাড়ে না; এক-একটা কাঁকড়া হইতে প্রায় দু সের তেল পাওয়া যায়; সে দেশের লোকেরা এই কাঁকড়ার তেল গলাইয়া ঘিয়ের মতন জমাইয়া রাখে। এদের চেহারা আর প্রবল শক্তির জন্য এদের ডাকাতে কাঁকড়া বলে। এদের দাড়ার এমন জোর যে এক ঝট্‌কায় এরা

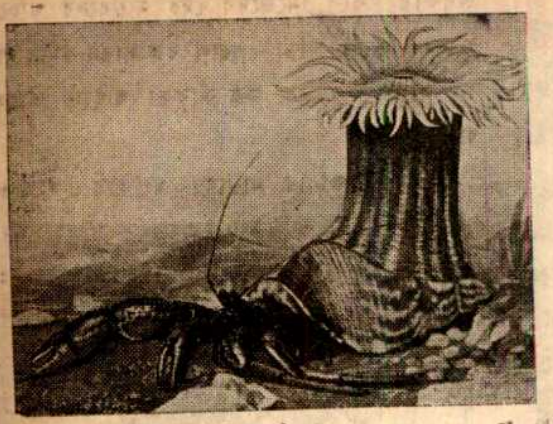

গৃহস্থ-কাঁকড়া।

এই কাঁকড়া শামুক-খোলের মধ্যে ঢুকিয়া থাকে এবং শামুক-খোলের উপর স্পঞ্জ বা প্রবাল-জাতীয় জীবদের বাসা দিয়া আত্মগোপন আত্মরক্ষা ও তাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আত্মভরণ করে।

নারিকেল-মালা বা মানুষের হাতের হাড় মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে পারে। মানুষের গায়ে এমন কোনো হাড় নাই বা এই কাঁকড়ার হাতুড়ি-দাড়ার ঘা খাইয়াও আস্ত থাকিতে পারে। এরা খুব বড়-বড় গভীর গর্ত্ত করিয়া বাস করে; কারণ মানুষ ছাড়া শূওর শেয়াল এদের

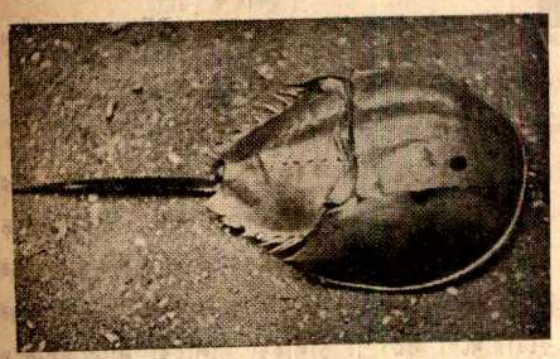

বর্শা-ল্যাজা ঢাল-ঢাকা কাঁকড়া।

এই কাঁকড়ার পিঠের খোলা একটা ঢালের মতন, দাড়া সব তার তলায় ঢাকা থাকে; লম্বা ল্যাজ বর্শার মতন; কোনো রকমে চিত হইয়া পড়িলে ল্যাজের চাড়া দিয়া এরা উবুড় হয়।

গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাহির করিয়া ধরিয়া খাইতে ভালো বাসে। কিন্তু এরা মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া তাদের যে কোনো শত্রুকে একলা বা অসাবধান পাইলে দল বাঁধিয়া আসিয়া আক্রমণ করে এবং সাঁড়াশীর মতন প্রকাণ্ড দাড়া দিয়া এক এক চিম্‌টিতে এক এক পোয়া-মাংস ছিঁড়িয়া ও হাতুড়ি-দাড়ায় ঘায়ে এক-একখানা হাড় ভাঙিয়া রক্ত শুষিয়া নিমেষে নিঃশেষ করিয়া দ্যায়। জার্মান জাহাজ এম্‌ডেন যখন দেশে দেশে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল তখন ইংরেজ ও জাপানী জাহাজের তাড়া খাইয়া এম্‌ডেন এক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লয়; জার্ম্মান মাল্লা দুজন ডাঙায় পালাইয়া বাঁচিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু পরে তাহাদের খোঁজ করিয়া দেখা গেল তাদের কোট পাল্‌টালুন খোলস

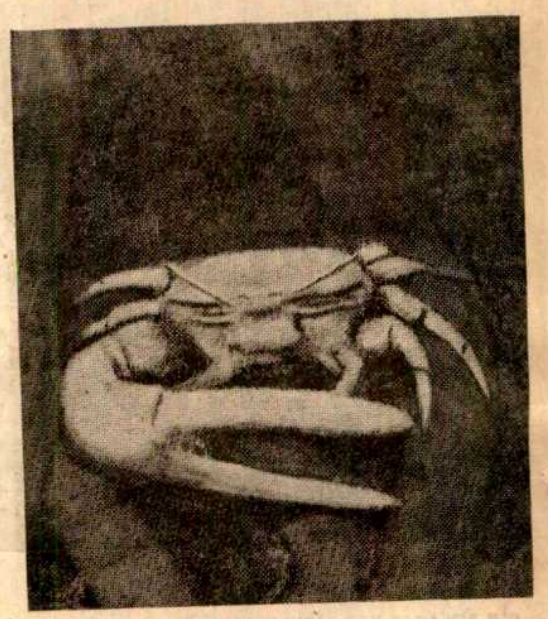

হাতল-কাঁকড়া।

এই কাঁকড়ার ডান দাড়াটা বেমানান বড় হয়। চলিবার সময় এরা সেই দাড়াটি উঁচাইয়া চলে, যেন কাউকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। গর্ত্তে ঢুকিয়া এই হাতটি ফুটার কাছে জাঁতিকলের মতন পাতিয়া রাখে; তাতে শত্রুকে বাধা দেওয়া ও খাদ্যকে বন্দী করা দুই কাজই চলে। এরা আকের ক্ষেত উজাড় করে। চলিবার সময় এদের শক্ত দাড়ার সঙ্গে পিঠের খোলার ঘষাঘষিতে ক্যাঁকোঁ শব্দ হয়; তাই এদের আর-এক নাম বেহালাদার কাঁকড়া।

মাত্র পড়িয়া আছে, আর ডাকাতে-কাঁকড়ারা তাদের হা[illegible] খাইয়াছে, মাস খাইয়াছে, চামড়া লইয়া ডুগ্‌ডুগী বাজাইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। এই ডাকাতে-কাঁকড়ার একটি বন্দী হইয়া সম্প্রতি আমাদের আলিপুরের জীবশালায় আসিয়া সাপের ঘরে আছে; মরিয়া যাইবার

আগে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকারা দেখিয়া আসিবেন একবার।

কাঁকড়ারা ছোটখাট জীব জন্তু হইতে নরমাংস পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দ্যায় না; ফল মূল খাইতেও অরুচি নাই। এরা নিজেরা ত খাবার জোগাড় করেই; আবার যে-সব জন্তুর সঙ্গে বাসা ভাগ করিয়া থাকে, তারা কিছু

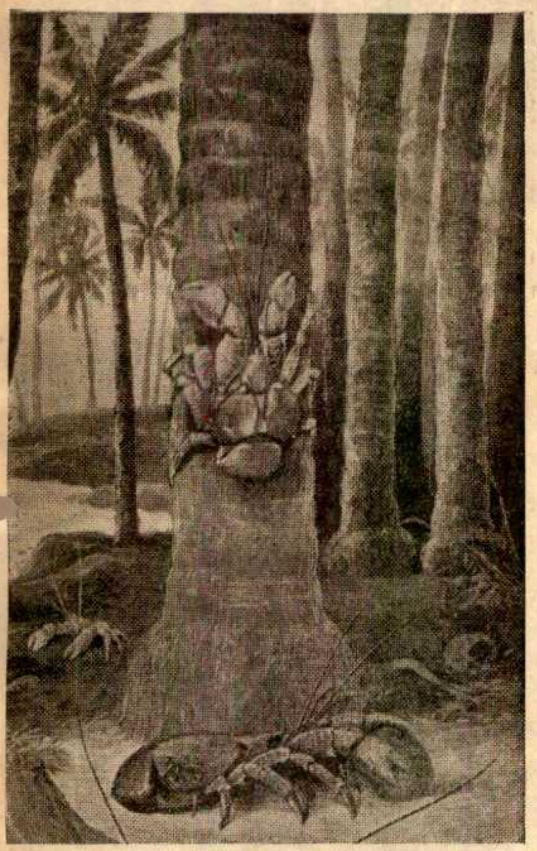

গাছচড়া ডাকাতে-কাঁকড়া।
এরা নারিকেল-গাছে চড়িয়া দাড়া দিয়া ছিঁড়িয়া নারিকেল পাড়ে; দাড়া দিয়া নারিকেল-ছোবড়া ছোলে; নারিকেলের চোখে দাড়ার হুল ফুটাইয়া নারিকেলের মুখটি খোলে; দাড়া ঢুকাইয়া শাঁস কুরিয়া খায়; এবং নিজেদের গর্ত্তে নারিকেল-ছোবড়ার বিছানা পাতে।

খাবার সংগ্রহ করিলেও তাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়। এক রকম সমুদ্রের কাঁকড়া আছে তারা প্রবাল-জাতীয় একরকম জীব দুই দাড়ায় দুটি ধরিয়া সাঁতার দ্যায়; এই প্রবালের গা থেকে আলো বাহির হয়; সেই আলোয় কাঁকড়া শিকার দেখিয়া মুখ দিয়া ধরে; প্রবালও নিজের খাবার জন্য শিকার ধরিতে ধরিতে যায় এবং কাঁকড়া একটুও চক্ষুলজ্জা না করিয়া তাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া কাড়িয়া খায়—যদিও কাঁকড়ার চোখ দুটা তার দেহ ছাড়া।

কাঁকড়ার আকৃতির মধ্যে বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে তার শরীর-ছাড়া চোখ—যেন দুটো দেশালাইয়ের কাঠি মাঝখানে ভাঙ্গিয়া মাথায় পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে—আর মোটা দুটা দাড়া। কোনো কোনো কাঁকড়ার আবার ল্যাজও থাকে। কাঁকড়া খুব দ্রুত খর-খর করিয়া দৌড়িতে পারে; পাশ ফিরিয়াও চলিতে পারে। যে-সব কাঁকড়া জলের, তাঁদের পায়ের পাতা ঠিক নৌকার দাঁড়ের মতন হয়, তাতে এরা খুব সাঁতার দিতে পারে। মদ্দা কাঁকড়ার আকার ও দাড়া সাধারণত বড় হয়। যৌবন দশায় কোনো কোনো কাঁকড়ার গায়ে নানান রঙের চিত্র-বিচিত্র দাগ ফুটিয়া বাহির হয়।

ডাঙার কাঁকড়ারা ডিম পাড়িয়া গর্ত্তে রাখে; জলো কাঁকড়ারা ডিম নিজের বুকে করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়। ডিম হইলেই মদ্দা কাঁকড়ারা খাইয়া ফেলে; এইজন্য মাদি কাঁকড়া গর্ভ ধারণ করিয়াই স্বামী হত্যা করে সন্তান রক্ষার জন্য। ডিম হইতে বাচ্চা জন্মিতে আরম্ভ করিলে মা মরিয়া যায়; অনেকের বিশ্বাস মা বুকে করিয়া সন্তানদের রাখে, কিন্তু সন্তানেরা এমনই কৃতঘ্ন যে মার বুক কুরিয়া খাইয়া মাকে মারিয়া ফ্যালে। কাঁকড়ার বাচ্চা বসন্ত কালে হয়।

কাঁকড়া প্রায়ই দল বাঁধিয়া থাকে; কিন্তু মদ্দায় মদ্দায় দেখা হইলেই লড়াই লাগে ও পরাজিত শত্রুকে জেতা কর্কট চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফ্যালে। এদের এক এক দলে চার-পাঁচ শত কাঁকড়াও থাকে। এক জাতের কাঁকড়ার চলিবার সময় পিঠের দুটো খোলার জোড়ের মুখে ঘসাঘসিতে এক রকম ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হয়; বহু কাঁকড়ার দলবদ্ধ যাত্রার সময় সেই শব্দ বহু-দূর হইতে শোনা যায়। একরকম কাঁকড়ার মোটা দাড়ার সঙ্গে পিঠের খোলায় ঘসাঘসি হয় ও তাতে ক্যাঁকো শব্দ হয়; তাই তাদের বেহালাদার কাঁকড়া বলে।

কাঁকড়া বেশী খাইলে আমবাত উদরাময় রক্তপিত্ত

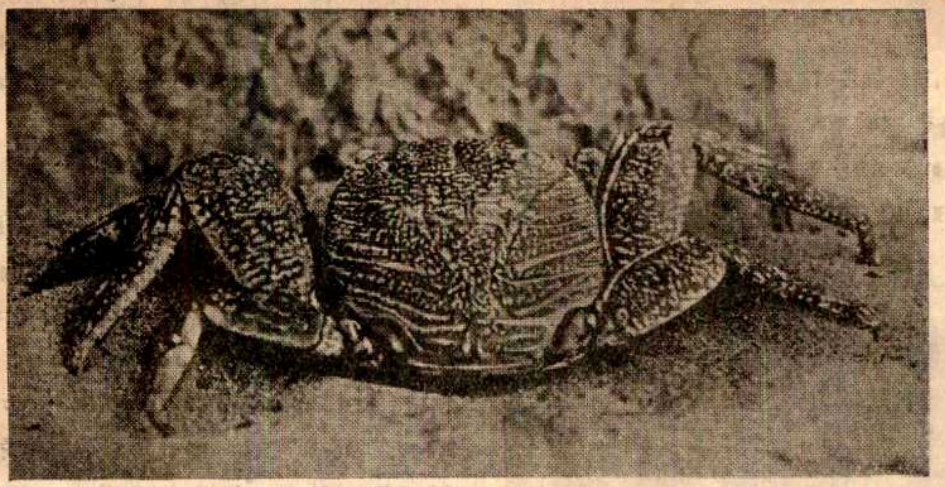

চিত্র কাঁকড়া।
এই কাঁকড়া খাড়া পাহাড়ে উঠিতে ভালোবাসে, পাহাড়ের ফাটলে বাস করে। এরা পাখীর বাসা লুটিয়া ডিম বাচ্চা খাইয়া থাকে।

প্রভৃতি পীড়া হইতে পারে। আবার কাঁকড়া অনেক রোগের ঔষধও।

"উড়িষ্যা অঞ্চলের সমুদ্রকূলে পাঁচ ছয় রকম কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় কাঁকড়ার বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত, যেন টক্‌টকে জবা-ফুল! মানব-হস্তের কঠিন স্পর্শে ইহারা মরিয়া যায়, তখন আর দেহের বর্ণ রাঙ্গা থাকে না, কালীর মত কালো হইয়া যায়। তদ্দেশীয় ধীবরগণ সর্দ্দী কাশি হইলে এই কাঁকড়া ছেঁচিয়া রস খায়। তাহাদের বিশ্বাস—কাশির এমন চমৎকার ঔষধ জগতে নাই। চাঁদীপুরে কাঁকড়ার রস খাইয়া এক ধীবরপুত্রকে আমি কঠিন কাস-রোগ হইতে মুক্তি লাভ করাইয়াছি। দুর্গন্ধি 'কড্‌লিভার' খাইতে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা একবার লাল কাঁকড়ার রস খাইয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস—যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বালেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে চাঁদীপুরের সমুদ্রতীরে আমি এই শ্রেণীর কাঁকড়া অসংখ্য দেখিয়াছি। সামান্য প্রয়াসেই ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়ে।

"যাঁহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল, কাঁকড়া তাঁহাদের পক্ষে বড়ই উপকারী। যক্ষ্মা রোগে কর্কট একটি সুপথ্য। কিন্তু উদরাময়, শোথ, অজীর্ণ (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া), উদরী, গুল্ম,

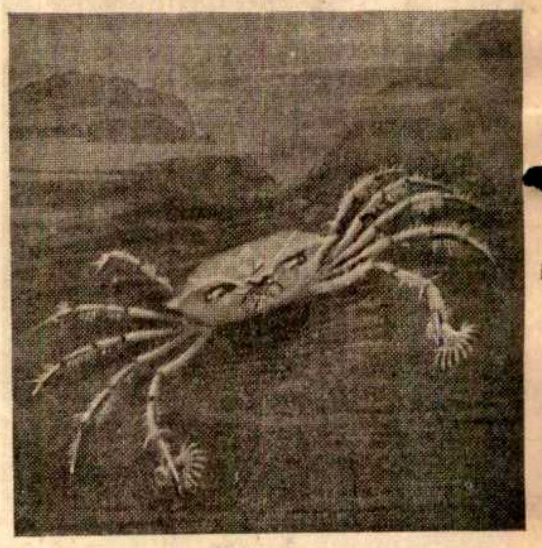

মশালচী কাঁকড়া।
এই কাঁকড়া দু হাতে দুই স্বয়ংপ্রভ প্রবাল ধরিয়া টেরা চোখে শিকার খুঁজিতেছে। প্রবালেরা যে কেবল আলো দেখাইয়া কাঁকড়ার শিকার সন্ধানে সাহায্য করে তা নয়, প্রবাল নিজের খাবার জন্য কোনো শিকার ধরিলে কাঁকড়া তার মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে একটুও চক্ষুলজ্জা বোধ করে না—যদিও কাঁকড়ার চোখ দুটা ড্যাবা-ড্যাবা দেহ-ছাড়া।

যকৃৎ, প্লীহা, অর্শ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা এবং বাতরোগে কাঁকড়া-ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

"শিশু (১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) এবং গর্ভিণীর পক্ষে কাঁকড়া অত্যন্ত অহিতকারী।

"মস্তিষ্ক-রোগে ও বধিরতায় কাঁকড়া ঔষধির কার্য্য করিয়া থাকে।

"যে-সকল পুরুষের সন্তান হয় না এবং যে-সকল রমণী পুনঃ পুনঃ কন্যা প্রসব করেন, কর্কট-ভোজনে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

"কর্কটের অস্থির সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখন সহ চাটিয়া খাইলে, রক্তপিত্তজনিত রক্ত-বমন তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

"কাঁকড়ার দাড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া চরণতলে প্রলেপ দিলে, ছেলেদের শয্যামূত্ররোগ ও দাঁত-কড়মড়ানি ভাল হয়। নিজ দেহেই ইহা আমি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

উটের পিঠে তাঁবু।

"যে দিন কাঁকড়া ভক্ষণ করিবেন, সে দিন মূলা, দুগ্ধ, ডিম্ব এবং কোনও প্রকার দাল খাইবেন না। শাস্ত্র-মতে এগুলি কাঁকড়ার পক্ষে সংযোগবিরুদ্ধ।

"অলাবুযুক্ত কর্কট যে কেবল মুখপ্রিয় তাহা নহে, উপকারীও বটে। কাঁকড়া পেট গরম করে—অলাবু কাঁকড়ার এই গুরুতর দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

"কাঁকড়া ভোজনের পর তরল দধি পান করিবেন।

"দুগ্ধদোহনের সময় যে গাভী অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহার গলদেশে কাঁকড়ার কানকুয়া বাঁধিয়া দিলে গাভী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে।"—শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম-এ; আয়ুর্ব্বেদ, মাঘ ১৩২৩।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

উটের পিঠে তাঁবু—

উট মরুভূমির একমাত্র যান। গোরু, ঘোড়া, হাতী,—মানুষের খুব উপকার করে বটে; কিন্তু জ্বলন্ত মরুভূমির মধ্যে উট মানুষের যে উপকার করে তা অন্য-সব জন্তুর উপকারের চেয়ে ঢের মূল্যবান। মরুভূমির আগুনের মত রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টকর। তাই আরব দেশের রমণীরা উটের পিঠে একরকম আতপত্র বসাইয়া তার মধ্যে ছায়ার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডায় বসিয়া মরুভূমির মধ্য গিয়া যাতায়াত করেন। এই আতপত্রকে তাঁবু বলা যাইতে পারে। ছবিতে তাঁবুটির আকৃতি দেখিতে পাইবেন। দুই জন আরব রমণী মুখ বাহির করিয়া হাওয়া খাইতেছেন আর উটটি বিশ্রাম করিতেছে। নিজেদের কোন কাজে বা দেশের কাজে আরব রমণীরা এইরূপে যাতায়াত করেন। উটের পাশে পাশে একটি লোক পথ দেখাইয়া চলিতে থাকে।

উটেরা সাধারণতঃ দিনে পঁচিশ মাইল চলিতে পারে। দ্রুতগামী উটেরা দিনে পঞ্চাশ মাইলও যাইতে পারে। কয়েক দিন জল না খাইয়া যে উটেরা থাকিতে পারে তা অনেকে জানেন, কেননা তারা শরীরে জল জমাইয়া রাখে।

চীনদেশে দোষীর সাজা

চীন দেশ ও জাপান দোষীদের সঙ্গত শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে দোষের গুরুত্ব অনুসারে সাজাও গুরু হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া চীন দেশে এখনো দোষীদের সাজা দিবার নানা রকম ব্যবস্থা আছে। তাদের মধ্যে একটি এই।

সেখানে দোষীদের ধরিয়া আনিয়া বড় রাস্তার ধারে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, আর তাদের গলায় পিঁড়ির মত চৌকো মোটা কাঠ মাথা গলাইয়া পরাইয়া দেওয়া হয়। এই কাঠের উপর দোষীদের দোষের কাহিনী লেখা থাকে। রাস্তা দিয়া যে-সব লোক যাওয়া-আসা করে তারা দাঁড়াইয়া এদের দেখে এবং দোষের কথা পড়ে। ইহাদের সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। পুলিশের লোক ইহাদের পাহারা দিতে থাকে। এ শাস্তি বড় ভীষণ শাস্তি! একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে পাপীর মূর্ত্তিতে অপরাধের কাহিনী বুকে করিয়া

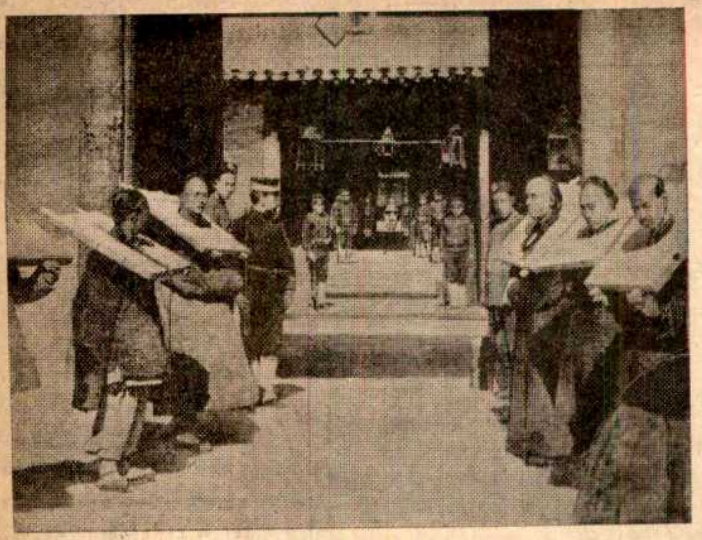

চীনদেশে দোষীর সাজা।

দাঁড়াইয়া নানা লোকের অবজ্ঞা ও সমালোচনা সহ্য করার অপেক্ষা লজ্জা আর কিছু নাই। ইহার অপেক্ষা খানার মধ্যে পুলিশ যদি পঞ্চাশ ঘা বেত মারে বা আঙুল কাটিয়া দেয় তাহাও বোধ হয় ভাল। সকল দেশেই অপরাধীদের শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া নানা রকমে নির্য্যাতন করা হয়। তার চেয়ে এ-রকম শাস্তি বোধ হয় কোন অংশে লঘু নয়।

—

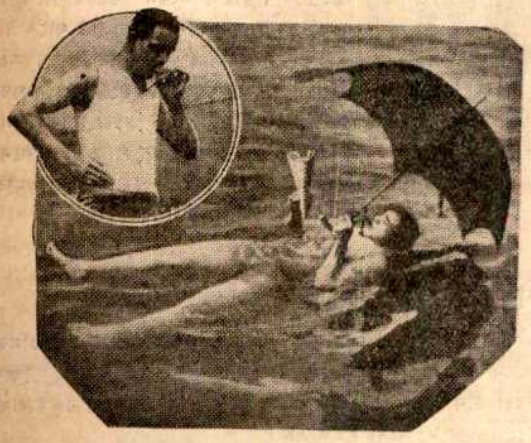

সাঁতারে আরাম।

সাঁতারে আরাম—

সাঁতার কাটিতে কাটিতে হাঁপাইয়া গেলে মাঝে মাঝে বিশ্রামের দরকার হয়। মনে করুন ঝাঁপাই-ঝুড়িয়া যখন পুকুরের মাঝখানে আসিলাম তখন মনে হইল—যদি একটা কিছু ধরিয়া একটু থামিতে পারিতাম ত বেশ হইত। 'বেশ হইবার' এক উপায় সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক-রকম জামা সম্প্রতি তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার সাহায্যে সাঁতার কাটিতে কাটিতে জলাশয়ের মাঝখানে বেশ বিশ্রাম করা চলে। ছবিটির উপরের কোণে যে লোকটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে উহার গায়ে এই নূতন জামা রহিয়াছে। একটি নলের সাহায্যে ফুঁ দিয়া জামাটি ফুলাইয়া লইতে হয়। ছবিতে আরো দেখুন লোকটি এই জামা পরিয়া কেমন সহজ ভাবে জলের উপর শুইয়া রহিয়াছে এবং ছাতা মাথায় দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে কাগজ পড়িতেছে! সাঁতারেও এত আরাম! মজার কথা!

—

একসঙ্গে চারিটি কলা—

যমজ কলা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, —একটি কলা আর-একটির গায়ে লাগিয়া উভয়ে জুড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু চারিটি কলা একসঙ্গে জুড়িয়া গিয়া একটি বড় বেগুনের মত আকার পাইয়াছে এমন কলা আমাদের

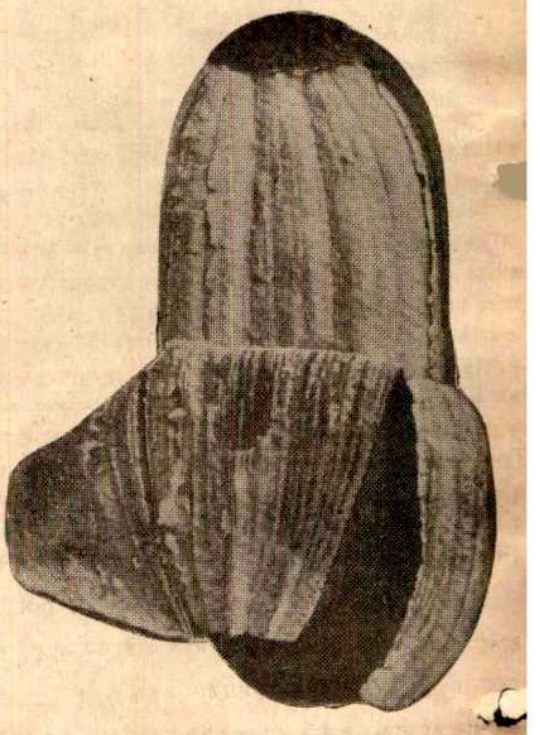

একসঙ্গে চারিটি কলা।

চোখে পড়ে না। আর চোখে পড়াইবার মত উৎসুক অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি আমাদের নাই। প্রকৃতির এ-রকম খেয়াল হয়ত আমাদের দেশেও ঘটিতেছে, কিন্তু আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না।

সম্প্রতি আমেরিকায় এই রকম একটি কলা পাওয়া গিয়াছে। আমরা তার ছবি দিলাম। কলাটির আধখানা অবধি খোসা ছাড়াইয়া

দেখান হইয়াছে। ইহাতে কলাকয়টির পরস্পর জোড়া লাগার খাঁজ দেখা যাইতেছে।

—

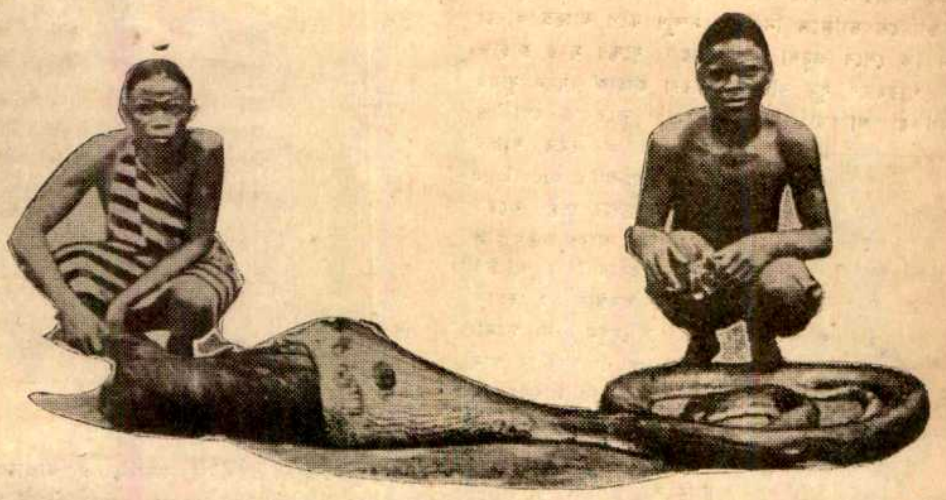

সাপের শুওর গেলা ভূরিভোজনের বিপত্তি।

ভূরিভোজনের বিপত্তি—

পাইথনের নাম হয়ত আপনারা অনেকে জানেন। ইহা এক রকমের সাপ, অনেকটা আমাদের 'ঢ্যামনা' সাপের মত। ইহার দাঁতে নাই। ছাগল, শুয়োর প্রভৃতি ইহার খাদ্য।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে সানন্দে উদর পরিপূর্ণ করিয়া গলায়-গলায় খাইলে সে ভোজনের ফল যে সব সময় সুবিধাজনক হয় না তা অনেকেই জানেন। এই পাইথন মহাশয়রা এই রকম ভোজনে নিজেদেরকে প্রায়ই বিপদাপন্ন করিয়া ফেলেন। ক্ষুধার তাড়নায় একটা পাইথন একবার একটি শূকরকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। গলার খানিক দূর গিয়া শূকরটি আর নামিতে চায় না! এ ত সাপে ছুঁচো গেলা নয়, এ আস্ত শুওর গেলা! অবস্থা যখন এই রকম তখন সেখানে কয়েকটি বন্য শিকারী আসিয়া হাজির হয়। তারা পাইথন মহাশয়ের বিপদে দুঃখিত হইয়া তাঁর গলাটি কাটিয়া শূকরটি বাহির করিয়া তাঁকে মুক্তি দিল। শেষে তারা শূকরটিকে রাঁধিয়া খাইল এবং পাইথন-রাজকেও সেই সঙ্গে সুপথ্য করিয়া লইল। ভূরি ভোজনে একেবারে মুক্তিলাভ!!

—

ধর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন—

ফিলিপিনোর ধর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন।

ছবি দেখিয়া সকলে ভাবিবেন—এ আবার কোন্ জন্তু! এটি কিন্তু মানুষের ছবি—একজন ফিলিপাইনবাসীর।

ফিলিপাইন দ্বীপে যে-সব লোক নিজেরা কোন পাপ কাজ বা অপরাধ করিয়াছে মনে করে তারা নিজেদের শাস্তি নিজেরাই বিধান করে। বড় বড় পর্ব্বের দিন তাদের শাস্তির বা কৃচ্ছ্রসাধনের দিন। ধর্ম্মের জন্য এ বড় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন।

পর্ব্বের দিন অপরাধীরা মুখে একটুক্‌রা সাদা কাপড় চাপা দেয় এবং মাথার উপর ডাল-পালা ও পাতার একটি মালা পরে। এই মালাটি বোধহয় যীশুখৃষ্টের কাঁটার মুকুটের নিদর্শন। ইহারা হাতে একটি করিয়া বাঁশের ডাণ্ডা লয় এবং তাহা দিয়া নিজেদের গায়ে জোরে জোরে আঘাত করিতে থাকে। এই আঘাতের ফলে গা দিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে। রক্ত থামাইবার জন্য শরীরের জায়গায় জায়গায় শক্ত করিয়া দড়ি বাঁধে। সকাল হইতে সমস্ত দিন ইহারা এইরূপে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় কোন পুকুরে স্নান করিয়া ইহারা বাড়ী ফেরে। ম্যানিলা সহরে আজকাল এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পর্ব্বের সময় শত শত অনুতাপী সহরের বাহিরে গিয়া এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করে।

গুপ্ত।

—

"ভূতের থুতু"—

ঝোপে, জঙ্গলে, পথের ধারে—ছোট ছোট গাছের গায়ে থুথুর মত বুদ্বুদময় এক প্রকার জলীয় পদার্থ লাগিয়া থাকিতে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। জিনিষটি লালার মত পিচ্ছিল এবং বুদ্বুদময়, কিন্তু উহার উৎপত্তি কোথা হইতে তার সন্ধান অনেকেরই জানা নাই বলিয়া ইহা "ভূতের-থুথু" বা "ভূতের-লালা" নামে পরিচিত। অনেকের ধারণা যে হয়ত ইহা ব্যাঙের লালা, না হয় উদ্ভিদদেহের ক্ষত-নিঃসৃত রস। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা উভয়ের মধ্যে কোনটিই নহে। সেদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে নিম্নে ছারপোকার মত যে পোকার

চিত্র দেওয়া হইল ইহা সেই পোকার দেহনিঃসৃত রস ও বুদ্বুদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সম্ভবতঃ শত্রুচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার উদ্দেশ্যেই এই পোকা গুহ্যদ্বার দিয়া প্রথমতঃ খানিকটা পিচ্ছিল রস বাহির করিয়া নিজের বুকের তলার দিকটায় জমা করে, তার পর তাতে ফু দিয়া দিয়া বুদ্বুদ ছাড়িতে ছাড়িতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এমন কি শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। যুদ্ধের সময় জাহাজ হইতে বহু পরিমাণে ধুম বহির্গত করিয়া জাহাজ যেমন ধুমের আড়ালে থাকিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, এ পোকাও বোধ হয় প্রকৃতিদত্ত শক্তির প্রভাবে এইরূপ camouflage বা আত্মগুপ্তির চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে আরও কতকগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। সাধারণ অবস্থায় (১ হইতে ৩নং চিত্র দেখুন) বা গমনাগমনের সময় পোকাটি যে স্থান দিয়া যায় তাহার সহিত নিজ শরীর সমান্তরাল রাখিয়া চলে। কিন্তু যখন লালা ও বুদ্বুদ ছাড়িতে বসে (৪নং চিত্র দেখুন) তখন মুখ নীচের দিকে রাখিয়া পশ্চাৎভাগ উপরের দিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইতে থাকে (৪নং চিত্র)। চিত্রপরিচয় (১) স্বাভাবিক চেহারা। (২) ৪ গুণ বড়। (৩) ২৫ গুণ বড়। (৪) বুদ্বুদ ছাড়িবার সময়ের অবস্থা। এই পোকার বৈজ্ঞানিক নাম কি কেহ যদি জানেন তবে জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

ভূতের থুতুর পোকা।

"পিয়েমডি"

—

শিশু-প্রতিভা—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে আমেরিকার এক বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা বেরিয়েছিল। এবার আমরা আমেরিকারই এক অদ্ভুত ছেলের কথা বল্‌ব।

ছেলেটির নাম এডওয়ার্ড রোচি হাডি। নিউ-ইয়র্কে তার বাড়ী। তার বয়েস এখন মোটে বার বছর। সে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে ছোট স্কলার। তার এই অল্প বয়সের মধ্যে সে ১২টা ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছে। ভাষা শিক্ষা ছাড়া তার আসীরীয় আর বাবিলনীয় ইতিহাস অধ্যয়ন কর্‌বারও সখ আছে; এবং এই জন্যে সে চিত্রলিপিও আয়ত্ত করে ফেলেছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

—

হংসাকৃতি রাঙা-আলু—

প্রবাসীতে আমরা বরাহ-অবতার গোল-আলুর ছবি ছাপিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রমোহন বসু আমাদের একটি হংসাকৃতি রাঙা-আলু দিয়া গেছেন। এই আলুর ঠোঁটটি কেবল জোড় দেওয়া; বাকী সমস্তটাই স্বভাবত ঐ আকারে জন্মিয়াছিল। হাঁসের গায়ের দুধারে ডানা মুড়িয়া রাখার খাঁজটি পর্য্যন্ত অবিকল হইয়াছে। সেই আলুর ফটোগ্রাফ এখানে ছাপা হইল।

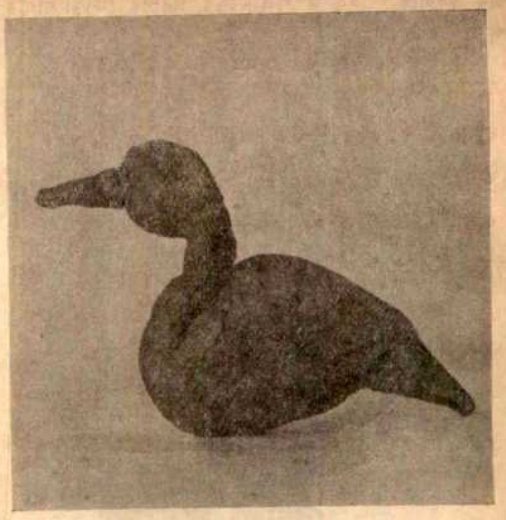

হংসাকৃতি রাঙা-আলু।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

—

শ্যামার শিশ

যায় বহে' যায় সুরের লহর
মুখর করি' চতুর্দ্দিশ,
পুষ্পবীথির অন্তরালে
শ্যামা আজি দিচ্ছে শিশ্!
মিষ্ট যত আছে ধরায়
সব যেন ঐ সুরে গড়ায়,—
মরি! সুরপুরীর সুধা-সরিৎ
নাম্‌ল ওকি মর্ত্তে?—ঈস্!

সুধা ছানি' অধরপুটে
ঐ যে পাখী গাইচে গান,
কোন্ অ-ধরে ধর্‌তে গো তার
এমন মিঠা সুরের টান?
রঙীন উষার পানে চেয়ে
ফেল্‌চে যে ঐ কানন ছেয়ে
ওরে পরাণ-কাড়া ঐ সুরেতেই
কবি-হৃদয় সুরটি দিস্।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

"ওম্"

অনেকের বিশ্বাস কেবল "ব্রহ্ম" অর্থেই 'ওম্' শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে; বাচস্পতির অভিধানের মতে ইহার অর্থ—প্রণব, আরম্ভ, স্বীকার, অনুমতি, অপাকৃতি, অস্বীকার, মঙ্গল, শুভ, জ্ঞেয় এবং ব্রহ্ম।

কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ইহার মৌলিক অর্থ "হাঁ"।

ঐতরেয় আরণ্যকে এই অংশ পাওয়া যায়:—

"পরাক্ বা এতৎ রিক্তম্ অক্ষরম্ যৎ এতম্ 'ওম্' ইতি। তৎ যৎ বিম্ চ 'ওম্' ইতি আহ; অত্র এব অস্মৈ তৎ রিচ্যতে। সঃ যৎ সর্ব্বম্ ওম্ কুর্য্যাৎ রিক্ত্যাৎ আত্মানম্ সঃ কামেভ্যঃ ন অলম্ স্যাৎ।"

অর্থাৎ এই যে 'ওম্' অক্ষর ইহা সম্মুখগামী এবং শূন্য। যখন কেহ কোন বিষয়ে 'ওম্' বলে, তাহা হইলে সে সেই বিষয় ভোগে বঞ্চিত হয়; যদি সে সমুদয় বিষয়েই 'ওম্' বলে, সে আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত করে এবং সে কিছুই ভোগ করিতে পারে না।

ইহার পরেই আছে:—

"অথ এতৎ পূর্ণম্ অভ্যাত্মং যৎ 'ন' ইতি। সঃ যৎ সর্ব্বম্ 'ন' ইতি ব্রূয়াৎ, পাপিকা অস্য কীর্ত্তিঃ জায়েত, সা এনম্ তত্র এব হন্যাৎ।"

অর্থাৎ এই যে 'ন' অক্ষর, ইহা আত্ম-বিষয়ে পূর্ণ; যে সমুদয় বিষয়েই 'ন' (না) বলে তাহার কীর্ত্তি পাপময়ী হয়, ইহা তাহাকে বিনাশ করে।

ইহার পরেই ঋষি সিদ্ধান্ত করিতেছেন:—

"অস্মাৎ কালে এব দদ্যাৎ, তৎ কালে ন দদ্যাৎ।"

২।৩।৬।

সুতরাং যথাকালে দান করিবে এবং অসময়ে দান করিবে না।

এ স্থলে দানের দৃষ্টান্তে 'ওম্' এবং 'ন' উক্তির ফলাফল বলা হইতেছে। যে দান বিষয়ে কেবলই বলে 'ওম্' অর্থাৎ কেবলই বলে "হাঁ, দিলাম," সে সর্ব্বস্বান্ত হয়; এবং যে কেবলই বলে 'ন' অর্থাৎ কেবলই বলে "না, দিব না" তাহার সর্ব্বস্ব থাকে বটে কিন্তু তাহার দুর্নাম প্রচারিত হয়।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে 'ওম্' এবং 'ন' বিপরীত অর্থ প্রকাশক। 'ন' অর্থ 'না'; সুতরাং 'ওম্' অর্থ "হাঁ"। পূর্ব্বোক্ত অংশের অর্থ—যে কেবলই বলে 'হাঁ, দিলাম' তাহার কিছুই থাকে না, আর যে সর্ব্বদাই বলে 'না, দিব না, সে নিন্দিত হয়।'

এই আরণ্যকেরই অন্য এক স্থলে 'ওম্' এবং 'ন' বিরোধী অর্থ প্রকাশক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে:—

যৎ বাচঃ 'ওম্' ইতি, যৎ চ 'ন' ইতি=বাক্যের যাহা 'ওম্' (অর্থাৎ হাঁ) এবং বাক্যের যাহা 'ন' (অর্থাৎ না) ইত্যাদি। ২।৩।৮।

শতপথ-ব্রাহ্মণে এই অংশ আছে:—

অশ্বঃ ন দেববাহনঃ ইতি। অশ্বঃ হ বৈ এষঃ ভূত্বা দেবেভ্যঃ যজ্ঞম্ বহতি। যৎ বৈ 'ন' ইতি ঋচি, 'ওম্' ইতি। তস্মাৎ আহ অশ্বঃ ন দেববাহনঃ ইতি। ১।৪।৩।৩০

ইহার অর্থ—(শ্রুতিতে আছে) অশ্বঃ ন দেববাহনঃ ইতি এখানে বলা হইতেছে তিনি অশ্ব হইয়া দেবগণের নিকট যজ্ঞ বহন করেন। ঋকে যে 'ন' অক্ষর আছে তাহার অর্থ 'ওম্'। সেই জন্যই বলা হইয়াছে "অশ্বঃ ন দেববাহনঃ" ইতি (=অশ্বের ন্যায় দেববাহন)।

ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে 'ন' অক্ষরের প্রধানতঃ দুইটি অর্থ—(১) 'না'; (২) ন্যায়; "ইব"। আমাদিগের মনে হয় প্রথম অর্থই মৌলিক। এই অর্থ হইতে কি প্রকারে দ্বিতীয় অর্থ উৎপন্ন হইল তাহার একটি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। "অশ্বঃ ন দেববাহনঃ।' মৌলিক অর্থ "দেবগণের বাহন" কিন্তু "অশ্ব নহে"। বাহন বলিলেই লোকে 'অশ্ব' বুঝিয়া থাকে। এখানে বাহনের কথা বলা হইল, কিন্তু এ বাহন অশ্ব নহে। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইল "দেববাহন, কিন্তু অশ্ব নহে।" এ স্থলে 'দেববাহন' এবং 'অশ্ব' এক নহে; কিন্তু এক না হইলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। অশ্বের যে কার্য্য, দেববাহনেরও সেই শ্রেণীর কার্য্য। উভয়েই বহন করে। কোন সাদৃশ্য না থাকিলে 'দেববাহন' শব্দ ব্যবহার করিয়া

ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই "অশ্ব নহে" ইহা বলা হইত না। কেহ কখন বলে না "পুরোহিত কিন্তু চর্ম্মকার নহে"। পুরোহিতের কার্য্য এবং চর্ম্মকারের ব্যবসায় এক নহে; উভয়ের কার্য্যের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। সাদৃশ্য নাই বলিয়াই লোকের মনে কখন সন্দেহ হয় না যে পুরোহিত চর্ম্মকার কি না। সুতরাং "পুরোহিত কিন্তু চর্ম্মকার নহে" এ প্রকার ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক হয় না এবং এ প্রকার ভাষাও অর্থশূন্য। কিন্তু লোকে স্থল বিশেষে বলিতে পারে "পুরোহিত কিন্তু ব্রাহ্মণ নহে"। পুরোহিত বলিলেই লোকে ভাবে ব্রাহ্মণ; কিন্তু কোন স্থলে যদি পুরোহিত ব্রাহ্মণ না হয়, তাহা হইলে বলিতেই হয় "পুরোহিত কিন্তু ব্রাহ্মণ নহে।"

শতপথ-ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত অংশের অর্থও অনুরূপ। 'দেববাহন' বলিলে লোকে হয়ত বুঝিবে 'অশ্ব'; এইজন্য বলা হইল কিন্তু "অশ্ব নহে"। "অশ্বঃ ন" অংশের মৌলিক অর্থ "অশ্ব নহে"। দেববাহন অশ্ব নহে, কিন্তু অশ্বের সহিত দেববাহনের সাদৃশ্য রহিয়াছে; সুতরাং "অশ্বঃ ন" অংশের দ্বিতীয় অর্থ "অশ্বের ন্যায়" অর্থাৎ "ন"=ইব= ন্যায়। যাহা "অশ্বের ন্যায়" তাহা এক অর্থে "অশ্বই"; কিছু ত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'ন' অর্থ "হাঁ" হইয়া গেল। ইহা বুঝাইবার জন্যই ঋষি পূর্ব্বোক্ত অংশে বলিয়াছেন :—বৎ বৈ 'ন' ইতি ঋচি, 'ওম্' ইতি= ঋকে যে 'ন' আছে, তাহার অর্থ 'ওম্' অর্থাৎ "হাঁ"।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই অংশ হইতেও বুঝা যায় 'ন' এবং 'ওম্' বিপরীত অর্থ প্রকাশক। 'ন' অর্থ 'না'; সুতরাং 'ওম্' অর্থ "হাঁ"। ইহাই 'ওম্'এর প্রাচীন অর্থ।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বন্ধু

(শেখ সাদীর পারসী হইতে)

দোষ ঘাঁটে, রোষ করে, ঘোষে সদা মন্দ,
তারা মোর বন্ধু যে খাঁটি।
গুণ গাহে শতমুখে, দোষে থাকে অন্ধ,
তারা মোরে ক'রে দিল মাটি॥

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

বিয়ের ফুল

কুমুদ আসাতে হীরক যেমন উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কুমুদ আবার আসিবে ভাবিয়া হীরক তেমনি ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে কুমুদকে তার দিদি যদি ছাড়িয়া না দ্যায়, তাকে হঠাৎ চাকরীর জায়গায় চলিয়া যাইতে হয়, ত বেশ হয়। সমস্ত রাত এইসব ভাবনাতে হীরকের ভালো করিয়া ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে সেবা হীরকের ঘরে আসিয়া নিত্যকার মতো তার খাটের কাছে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া হীরকের জলখাবার একটি টুলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল। হীরক হঠাৎ সেবার হাত ধরিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিল—সেবা, আমায় তুমি ভালো কোরে তোলো।

সেবা আশ্চর্য্য ও খুসী হইয়া বড় বড় চোখ দুটি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল ও বিস্ময়ের আতিশয্যে বিস্ফারিত করিয়া হীরকের দিকে তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল—আপনি ত ভালো হয়ে গেছেন!

হীরক কাতর মুখে জিজ্ঞাসা করিল—আমি ভালো হয়ে উঠ্‌লে তুমি আমাকে ছেড়ে চোলে যাবে না?

সেবা হাসিয়া বলিল—আপনি না তাড়িয়ে দিলে ত আমার যাবার জো নেই।

হীরক সেবার উত্তরের রকম শুনিয়া একটু দমিয়া গিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—জো নেই কেন? তোমার ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পূর্ণই আছে।

সেবা গম্ভীর হইয়া বলিল—না, আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি।

হঠাৎ হীরক গম্ভীর হইয়া সেবার হাত ছাড়িয়া দিল। সেবার হাত হঠাৎ আশ্রয়চ্যুত হইয়া আছড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িল। সেবা আর-একবার হীরকের মুখের দিকে কাতরতাভরা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আবার হেঁট হইয়া পাঁউরুটির চিল্‌তেয় মাখন মাখাইতে লাগিল।

ভাবপ্রবণ হীরকের অভিমান উথলিয়া উঠিয়াছিল—সেবা মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া তাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, কেবল তার জন্যই তার প্রতি সেবার কোনো

টানই নাই! তার প্রতি সেবার ভালোবাসার অভাব হীরকের মনকে পীড়া দিয়া ব্যস্ত উতলা করিয়া তুলিল। কি করিলে সে সেবার ভালোবাসা পাইতে পারে এই চিন্তাতে সে এমন ব্যস্ত তন্ময় হইয়া উঠিল যে তার মনে রমার অভাবের বেদনা একরকম চাপা পড়িয়াই গেল।

সেবাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না হীরকের মন কি বলিতেই বা চায়, আর কি জানিতেই বা চায়। সে যে মেয়ে—সে পরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তার সেবা করিতে পারে, যাকে ভালোবাসে তার জন্ত অনায়াসে প্রাণপাত করিতে পারে, কিন্তু আমি তোমায় ভালোবাসি এই কথাটি সে কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না যতক্ষণ না সে পুরুষের দিক থেকে অজস্র প্রমাণ ও ক্রমাগত অনুরোধের আগ্রহভরা তাগাদা পায়। তাই সেবা হীরকের অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে অস্পষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য হইতেছিল। কিন্তু হীরকও সেবাকে স্পষ্ট প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেছিল না, কি জানি যদি তার প্রশ্ন সেবার না'র আঘাতে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু হীরকের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ঐ একটি অক্ষরের উত্তর হাঁ কি না শুনিবার জন্ত; কারণ, কখন কুমুদ আসিয়া উপস্থিত হইয়া যে-উত্তর হাঁ এখনও হইতে পারে তাকে না করিয়া তুলিবে তার ত ঠিক নাই। সেবা কিন্তু কুমুদেরই আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল; বসন্তের আগমনে যেমন গাছপালার অন্তর হইতে আনন্দ রূপ ধরিয়া পুষ্পপল্লবের আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে, তেমনি কুমুদের আগমনে বন্ধুপ্রীতি দাম্পত্য-প্রীতিকেও স্পষ্ট ও সুপ্রকাশ করিয়া তুলিবে; তাদের যে মিলন অকস্মাৎ ঘটিয়াছিল তার উপলব্ধিও একদিন অকস্মাৎ হইবার নয়, তাহা কালের কোলে লালিত হইয়া বিনা আড়ম্বরে হয়ত উভয়ের অগোচরেই উভয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিবে; এর জন্ত অপেক্ষা চাই।

অনেকদিন পরে আজ হীরক সমস্ত দিন সেবাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে কাছে রাখিতেছিল; সেবা একটু কোনো কাজে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেই হীরক ব্যস্ত হইয়া একটু পরেই চীৎকার করিতেছিল 'সেবা' 'সেবা', অথবা লোকনাথকে খুঁজিতে পাঠাইতেছিল—'লোকাদা, দেখ্ ত তোর বৌমা কি করছে?' রুগ্ন শয্যাগত শিশুর মতন আজ সে সেবাকে একবার একটু চোখের আড়াল হইতে দিতে পারিতেছিল না, সেবার মন যে তাকে দখল করিয়া বসিতে হইবে কুমুদ ফিরিয়া আসিবার আগেই আজ আবার আগের মতন সেবাকে বই পড়িয়া গান গাহিয়া গল্প করিয়া হীরকের আবদার রাখিতে হইতেছিল; আজ বালিকা-বিদ্যালয় জমিদারী কেউ আর আমল পাইতেছিল না; ম্যানেজার কোনো কাজ লইয়া সেবার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিলেই হীরক বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল—বাড়ী-সুদ্ধ লোকের কেবল বৌমা বৌমা বৌমাই যদি সব কাজ করবে ত তোরা আছিস্ কি করতে যা—ম্যানেজারবাবুকে বল্‌গে যা - বৌমা যেতে পারবে না। সেবা যদি একটু উঠিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছিল—'ম্যানেজার বাবু কি বল্‌ছেন, আমি চট্ কোরে শুনে আসব একবার?' অমনি হীরক ছেলেমানুষের মতন মুখ ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিতেছিল—'আমার কাছে থাক্‌তে তোমার ভালো লাগে না একটুও, না?' আর সেবার ওঠা হয় না। হীরকের এই আগ্রহ ও আসক্তি সেবাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল, সে যে-বস্তুর স্বাদ পাইয়া হারাইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইয়া তার আর আনন্দের অবধি ছিল না। সেবা ত কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া মিশিবার অবসর পায় নাই, সে হীরককেই প্রথম একেবারে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া পাইয়াছিল; তাই তার কুমারী ভালোবাসা হীরকের দিকেই ধাবিত হইয়াছিল; এখন তার ভালোবাসার প্রতি-দান হীরকের কাছ হইতে পাইয়া তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এবং এই পরম লাভের জন্ত তার অন্তর কুমুদের কাছেই কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল; ভাগ্যিস কুমুদ আসিয়াছিল তাই জীয়ন-কাঠির স্পর্শে হীরকের মরণাপন্ন মন প্রণয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিল! সেবার মন কুমুদের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

বিকালের গাড়ীখানা যখন হুসহুস শব্দ করিয়া চলিয়া গেল তখন সেবা বলিল—কুমুদ-ঠাকুরপো এই গাড়ীতে এলেন কি না কে জানে? ষ্টেশনে একবার গাড়ীটা পাঠালে হত।

সমবয়সী যুবকদের মজ্‌লিসে অবিভাবক বৃদ্ধের অকস্মাৎ

আবির্ভাবে যেমন তাদের আনন্দকোলাহলের তাল কাটিয়া যায়, সারা দিনের জমাট আনন্দ-মিলনের মাঝখানে কুমুদের নাম হওয়াতে হীরকের মনের ভরা সুরের তাল কাটিয়া গেল—সে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—হ্যাঃ! কুমুদ ত আর তোমার মতন ক্ষ্যাপেনি যে কাল দিদির বাড়ী গিয়ে আজই চোলে আস্‌বে? কুমুদকে তোমার খুব ভালো লেগেছে, না?

সেবা হীরকের প্রশ্নের গূঢ় অভিসন্ধি না বুঝিয়াই সরল ভাবে বলিয়া ফেলিল—লাগ্‌বে না? আপনি যে বলেছেন—More than my brothers are to me!

হীরক আরো গম্ভীর হইয়া পড়িল। কিন্তু যতই তার মনে হইতেছিল সেবা অনায়ত্ত হইয়া যাইতেছে, ততই তাকে আয়ত্ত করিবার আগ্রহ হীরকের প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। হীরক অনুভব করিতেছিল—কালবৈশাখীর মেঘ যেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ-ঝড়ের হাওয়ার পিঠে চড়িয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে, তার মনের মধ্যেও তেমনি একটা ছুনিবার উন্মত্ত আবেগ ও অস্বস্তি সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন অন্ধকার করিয়া তুলিতেছে। হীরক হঠাৎ সেবার হাত ধরিয়া তাকে কাছে টানিয়া বলিল—সেবা, আমি ত তোমাকে তুমি বল্‌ছি অনেক দিন থেকে; কিন্তু আমি কি তোমার চিরকালই আপনি থেকে যাব? কুমুদকে ত একদিনেই তুমি বল্‌লে?

সেবা হাসিয়া হীরকের মুখের উপর দৃষ্টি হইতে প্রণয়-ধারা বর্ষণ করিয়া বলিল—কুমুদ-ঠাকুরপো যে জোর কোরে তুমি বলিয়ে ছাড়্‌লে।

হীরক অভিমানে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—তোমার সঙ্গে কি আমার জোরের সম্পর্ক যে জোর কোরে তোমার কাছ থেকে আদর আদায় কর্‌তে হবে? যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ!—তার মূল্য কি?

হীরক ভুলিয়া গিয়াছিল যে প্রণয়ের ধারা এই যে সে কিছু স্বয়ং উপযাচক হইয়া দ্যায় আর কিছু পুঁজি করিয়া রাখে অপরের অপহরণের জন্য; দান করিতে হইলে এক-জনকে যেমন হাত উবুড় করিতে হয়, অপর জনকে তেমনি হাত পাতিতেও হয়; কেবল ভিক্ষার্থী হইয়া হাত পাতাতে যেমন অপমানের লজ্জা আছে, কেবল দিতে গিয়া দানকে অবহেলায় মাটিতে ফেলাতেও তেমনি অপমানের লজ্জা আছে। হীরক এই কথাটা ভুলিয়া বসিলেও সেবা ভুলিয়া যায় নাই; তবু সে নিজে হীনতা স্বীকার করিয়া লজ্জিত হাসিমুখে বলিল—চলো, বাগানে বেড়িয়ে নিয়ে আসি—অনেক দিন বাগানে যাওনি, কত ফুল ফুটেছে দেখ্‌বে চলো।

সেবা এত সহজে তাকে তুমি বলিল দেখিয়া হীরকের মনের সমস্ত ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। হীরক হাসিয়া বলিল—তবে তোমার এই দুর্ব্বহ বোঝাটিকে তুলে নিয়ে চলো।

সেবা খুসী মনে হাসিয়া বলিল—দুর্ব্বহ মনে কর্‌লে এ বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতাম না।

সেবার মুখ থেকে তার প্রণয়ের এই একটু অভাস-পরিচয় পাইয়াই হীরক আজ কৃতার্থ হইয়া গেল। সে বলিল—আমি আর বোঝা হয়ে থাক্‌ব না সেবা। আমি চেষ্টা কোরে ভালো হয়ে উঠ্‌ব। তুমি আমায় ধরো ত দেখি, নিজে উঠ্‌তে পারি কি না।

সেবা অতি আনন্দিত হইয়া তাড়াতাড়ি হীরকের বেড়াইবার চেয়ার-গাড়ীখানা ঠেলিয়া আনিয়া হীরকের খাটের সঙ্গে ঠেকাইয়া রাখিল, এবং হীরককে ধরিয়া অনেক কষ্টে বিছানা হইতে তুলিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিল। একলা সেবা অবশাঙ্গ হীরককে তুলিয়া গাড়ীতে বসাইবার পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল, এবং হীরকও অবশ অঙ্গ তুলিয়া গাড়ীতে বসিবার চেষ্টায় হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল; তবু দুজনেই নিজের নিজের কৃতকার্য্যতার আনন্দে এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। তারপর সেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দম লইয়া হীরককে ঠেলিয়া বাগানে লইয়া চলিল।

বাগানের মধ্যে নামিয়া হীরক দেখিল কেয়ারীতে কেয়ারীতে হাজারো গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাদের কত যে রং—লাল হল্‌দে শাদা গোলাপী,—এক লালেরই কত রকম আভা—ফিকে ঘোর কাল্‌চে বেগুনে খয়েরী! বিলাতী মসুর্‌মী-ফুলের ক্ষেতের পাশে সর্ষেফুলেরও জর্দা জলুশ বাগানে যেন রূপের আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সেবা হীরককে ঠেলিতে ঠেলিতে শেফালী-বীথিকায় লইয়া গেল,—একটা পথের দুধারি কেবল শিউলী-ফুলের গাছ; সন্ধ্যা-বেলার মুখ আঁধার করা দেখিয়া গাছগুলি যেন শত শুভ্র

দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। শিউলীফুলের সঙ্গে নিশারাণী হাস্নুহোনার গন্ধ মিশিয়া এ-দিকটার বাতাস যেন উগ্র গন্ধে আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। হীরক পিছন দিকে মাথা হেলাইয়া সেবার দিকে চোখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—"ফাগুন লেগেছে বনে বনে !"

সেবার চোখ তখন কিন্তু হীরকের দিকে ছিল না, সে সাম্‌নের দিকে তাকাইয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিয়া উঠিল—কুমুদ-ঠাকুরপো আস্‌ছেন !

হীরকের সমস্ত কবিত্ব যেন বুকে ছোরা বিঁধিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। সে মাথা সোজা করিয়া দেখিল—বাস্তবিকই কুমুদ হাসিমুখে সেইদিকে আসিতেছে ! হীরকের মুখ রাগে ঈর্ষায় হতাশার ভয়ে নীল হইয়া উঠিল।

হীরক বাগানে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে দেখিয়া কুমুদ খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কুমুদ এত শীঘ্র ফিরিয়াছে দেখিয়া সেবা খুসী হইয়া উঠিয়াছিল,—তাই তাদের দুজনের কারোই লক্ষ্য ছিল না হীরকের মুখের ভাবের দিকে। কুমুদ কাছে আসিয়াই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—'প্রণাম বৌদিদি।' তারপর সে হীরকের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—সকাল সন্ধ্যা এমনি কোরে বেড়ালে পনেরো দিনেই দুর্ব্বলতা সেরে যাবে। আমি দিন পনেরো আছি ; যে দিন যাব সে দিন তুই আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পার্‌বি নিশ্চয় !

হীরকের মুখ শুকাইয়া উঠিল -পনেরো দিন থাকিবে ! নিজের দিদির বাড়ী একদিনের ঝাঁকি-দর্শন দিয়া ছুটিয়া আসিয়া এখানে আড্ডা গাড়িবার মানে কি ?

হীরককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেবা বলিল—তুমি এত শিগ্‌গির আস্‌বে আমরা মনে করিনি। তোমার দিদি ছেড়ে দিলেন যে ?

কুমুদের দিদি হীরকেরও দিদির মতন। হীরকের অসুখ ও কুমুদের আগমনে তার উল্লাসে উঠিয়া বসার কথা শুনিয়া তিনি আর কুমুদকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। কুমুদ সে কথা না বলিয়া হাসিয়া বলিল—নতুন দিদির টানের জোর এমন প্রবল হল যে পুরোনো দিদিকে ছেড়ে দিতেই হল !

সেবা সুখী হইয়া হাসিতে লাগিল। কুমুদও হাসিল, কিন্তু হীরকের কানের ভিতর হইতে মনের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করিয়া উঠিল।

কুমুদ হীরকের গাড়ীর পিছনে গিয়া হাতল ধরিয়া সেবাকে বলিল—ছাড়ুন, আমি গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

সেবা হাতলে একটা হাত রাখিয়া গাড়ীর পাশে পাশে চলিতে লাগিল এবং কুমুদ গাড়ী ঠেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সেবা ও কুমুদ নানা কথা বলিতেছিল, ক্ষণে ক্ষণে হাসিতেছিল, কিন্তু হীরকের মনে স্বস্তি ছিল না। ভগবান যে মানুষের মাথার পিছনে চোখ না দিয়া মানুষকে কতখানি অসুবিধায় ফেলিয়াছেন হীরক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। কুমুদ ও সেবা ঠিক তার মাথার পিছনে দাঁড়াইয়া চলিতেছে, অথচ সে তাদের মুখের ভাব ও ইঙ্গিতের সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া আছে, এতে হীরকের বিরক্তি মন ছাপাইয়া উঠিতেছিল। খানিক-দূর গিয়া হীরক হঠাৎ বলিল—আমার আর বেড়াতে ভালো লাগ্‌ছে না।

কুমুদ বলিল—আচ্ছা একটু বসা যাক তা হলে। কুমুদ গাড়ী ঠেলিয়া একটা বেঞ্চির কাছে দাঁড় করাইয়া বলিল—বসুন বৌদিদি।

হীরকের গাড়ীর দু পাশে সেবা ও কুমুদ বসিল। সেই জায়গাটা বাগানের এক টেরে ; তার পরেই বিস্তৃত মাঠ। মাঠে আকের ক্ষেতে আক কাটিয়া চাষারা গাড়ী বোঝাই করিতেছে ; আলু তুলিয়া বস্তাবন্দী করিতেছে ; কোথাও মটর কলাই মাড়া হইতেছে। সেবা সেইসব দেখিতে দেখিতে বলিল—চাষাদের এত জায়গা, কেউ একটা বাগান করে না ! আমি হলে খালি বাগানই কর্‌তাম।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—তা হলে আপনাকে হয় ভোম্‌রা নয় প্রজাপতি হতে হত। মানুষের ত শুধু মধু খেয়ে পেট ভরে না। আর চাষাদের ক্ষেতও ত বাগানই। আপনাদের বাগানের মধ্যে এতটুকু কেয়ারীর মধ্যে গোটাকতক গাছ জীয়ানো থাকে, আর ওদের বড় বড় ক্ষেতে মস্ত্রী গাছ জন্মে। আপনাদের সঙ্গে তফাৎ ওদের এই যে আপনারা কেবল ফুল পেয়েই তুষ্ট,—মা ফলেষু কদাচন ;—আর ওরা নিষ্ফল কিছুই যেতে দ্যায় না, ওদের কর্ম্মণ্যে-বাধিকারঃ ফল আদায় কর্‌বার জন্যেই। সমস্ত দেশের

লোক যদি আপনার মতন কবি হত বৌদিদি, তবে কারো আর বাঁচ্‌তে হত না।

সেবা কুমুদের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। কুমুদও হাসিতে লাগিল। কিন্তু হীরক সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। সে সেবা ও কুমুদের অসঙ্কোচ গল্প ও হাসি শুনিয়া এমন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, অথচ কিছু বলিতেও পারিতেছিল না। হঠাৎ হীরক দেখিল কুমুদের রূপো-বাঁধানো মোটা বেতের ছড়িটা তার গাড়ীর কাছে মাটিতে পড়িয়া আছে। সে ঝুঁকিয়া সেইটা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অতদূর ঝুঁকিতে পারিতেছিল না। সেবা তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুমুদ চট্ করিয়া সেবার হাতের উপর হাত রাখিতেই সেবা কুমুদের দিকে চোখ ফিরাইল এবং কুমুদ চোখের ইসারা করিয়া বারণ করিল—সেবা যেন লাঠিটা কুড়াইয়া না দ্যায়, হীরক নিজের চেষ্টাতেই ওটা তুলুক। সেবা কুমুদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লাঠি তুলিতে নিবৃত্ত হইয়া সোজা হইয়া বসিল। হীরক পাশে ঝুঁকিয়া ছিল বলিয়া দেখিতে পাইল—সেবার হাতের উপর কুমুদ হাত রাখিয়া ইসারা করিয়া হাসিল ও সেবাও হাসিল। তাকে গোপন করিয়া তাদের এই ইসারা ও হাসি হীরকের অন্তর্দাহ উপস্থিত করিল। সে এক ঝট্‌কায় নিজের আড়ষ্ট শিরদাঁড়াকে বাঁকাইয়া নাচু হইয়া লাঠিটা কুড়াইয়া লইল; এবং যেমন করিয়া লগি ঠেলিয়া লোকে নৌকা বায়, তেমনি করিয়া মাটিতে লাঠির গুঁতো মারিয়া মারিয়া গড়গড়ে গাড়ীটাকে চালাইয়া হীরক একলাই বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। সেবা তাড়াতাড়ি গাড়ী ধরিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্ত উঠিতেছিল; কিন্তু কুমুদ বারণ করিল—না, আপনি যাবেন না, ওকে হাত পা নেড়ে পরিশ্রম কর্‌তে দিন, ওর শরীরের স্বচ্ছন্দতা muscle-control আবার ফিরে আসুক।

সেবা একটু খুসী একটু ভীত হইয়া বলিল—উনি কিন্তু রাগ কোরে যাচ্ছেন।

কুমুদ হাসিয়া বলিল—যাক্। চিরকাল ওর একটুতেই রাগ, আবার একটুতেই খুসী। Will force জাগ্‌বার জন্তে একটা excitant কিছু চাই ত। এই রাগের উত্তেজনায় ওর ইচ্ছাশক্তি যে জাগ্‌ল এতে ওর ঢের উপকার হবে। ও সহজ মানুষ হয়ে যাবে দেখ্‌বেন।

বন্ধু ডাক্তারের এই আশ্বাসে সেবার মন আনন্দিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মুগ্ধ অতৃপ্ত আকুল দৃষ্টিতে হীরকের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মোড় ঘুরিবার সময় মুখ ফিরাইয়া হীরক দেখিল সেবা ও কুমুদ প্রফুল্ল হাসিমুখে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, সে যে রাগ করিয়া একলা চলিয়া যাইতেছে সে দিকে তাদের লক্ষ্যও নাই। হীরক মনের সমস্ত রাগের চিহ্ন মুক মাটীর বুকে লাঠির গুঁতায় রাখিতে রাখিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ীর সিঁড়ির কাছে গিয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ স্বরে হীরক চীৎকার করিয়া উঠিল—এই, কে আছিস?

অমনি তাড়াতাড়ি লোকনাথ ও অপর চাকর একজন ছুটিয়া আসিয়াই দেখিল হীরক একলা লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং এই গুরু পরিশ্রমে সে হাপরের মতন হাঁপাইতেছে ও ফাগুন মাসের শীতেও তার কপাল হইতে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। লোকনাথ ছুটিয়া কাছে আসিতেই হীরক লাঠি তুলিয়া তাকে এক ঘা কশাইয়া দিয়াই লাঠি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—তোরা সব কোথায় থাকিস্ লোকাদা? আমার মা কি রমা থাক্‌লে তোরা আমাকে কখনো এমন কোরে একলা ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তিস্‌নে!

হীরক শিশুর মতন রাগে অভিমানে ব্যথায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ লোকনাথ বিনা বাক্যে গাড়ী ঠেলিয়া ঘরে তুলিল এবং শিশুকে যত্ন করিবার মতন সস্নেহ সন্তর্পণে হীরকের গায়ের ঘাম মুছাইয়া, কাপড় জামা বদ্‌লাইয়া, ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। হীরক বিছানায় শুইয়া বলিল—লোকাদা, আমি একটু জল খাব।

লোকনাথ দৌড়িয়া গিয়া একটা কাঁচের গেলাসে করিয়া কমলা-লেবুর সরবৎ আনিয়া দিল, হীরক এক চুমুকে সেটা পান করিয়া ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল ও দেখিতে দেখিতে মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সেবা ও কুমুদ যখন হীরকের ঘরে আসিয়া ঢুকিল,

তখন দেখিল হীরক ঘুমাইতেছে, লোকনাথ তার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

সেবা মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—লোকনাথ-দাদা, উনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

লোকনাথও সেবার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সেবা যদি হীরককে দেখিতে শুনিতে না পারে, তবে কেন সেবা তার হাতের কাজ কাড়িয়া লয়? সে ত হীরককে মানুষ করিয়া এত বড় করিয়াছে, যতদিন না মরিতেছে ততদিন সে তার খোকা-বাবুকে দেখিতে পারিবে। অসুস্থ খোকা একলা গাড়ী ঠেলিয়া ঠেলিয়া আসিল, অথচ তাহা দেখিয়াও সেবা বা কুমুদ কেউ যে তাকে সাহায্য করিল না এর মানে কি, আর হীরকের এই ক্রোধের কারণই বা কি? লোকনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হীরকের মনের সন্দেহ অশিক্ষিত সাধারণ লোক তারও মনে গিয়া উঁকি মারিতেছিল। তাই সে সেবার প্রশ্নের উত্তর কথায় দিতে না পারিয়া কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে—হ্যাঁ, হীরক ঘুমাইয়াছে।

সেবা মৃদুস্বরে বলিল—আমি এখানে থাকছি লোকনাথ-দাদা, তুমি ডাক্তার-ঠাকুরপোকে মুখহাত ধোবার জল দাওগে। ইনি উঠলে একসঙ্গে খেতে দেবো।

কুমুদের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তখনো হীরকের ঘুম ভাঙিল না। সেবা লোকনাথকে ডাকিয়া বলিল—দাদা, তুমি একটু বাবুর কাছে বোসো, আমি দাদামশায় আর ডাক্তার-ঠাকুর-পোকে খাবার দিয়ে আসি। বাবু উঠলেই আমায় ডেকো।

সেবা লঘু নিঃশব্দ পদে হনহন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেবা আনন্দ-বাবু ও কুমুদকে খাওয়াইয়া বাড়ীর চাকরদাসীদের খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া হীরকের খাবার ফুটন্ত গরমজলে বসাইয়া লইয়া যখন আবার হীরকের ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি ১১টা। সেবা টেবিলের উপর হীরকের খাবার সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—লোকনাথ-দাদা, তুমি খাওগে যাও। আমাকে ষ্টোভটা আর স্পিরিটের বোতলটা দিয়ে যেয়ো, দুধ গরম কোরে দিতে হবে।

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল—আপনার খাওয়া হয়েছে বৌমা?

সেবা ঈষৎ একটু হাসিয়া বলিল—না, ওঁর এখনো খাওয়া হয়নি, আমি খাব কি কোরে। কামিনীকে বোলে এসেছি আমার খাবার ঢেকে রাখ্‌তে।

হীরককে সেবার অবহেলা করিবার যে যে কারণ লোকনাথের মনে ক্রমশ সঙ্গত ও সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল, সেবার এই কথায় সব ভেস্তিয়া গেল। লোকনাথ বুড়া গোলে পড়িয়া ঠোঁট উল্টাইয়া মনে মনে স্বীকার করিয়া গেল ব্যাপারটা সে একটুও বুঝিতে পারিতেছে না।

লোকনাথ খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—হীরক তখনো ঘুমাইতেছে ও সেবা তার মুখের কাছে বসিয়া হীরকের বালিসে কণুই-এর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া তার কপালে মাথায় ধীরে সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতেছে। লোকনাথ সেবার খুব কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও স্নেহের সহিত বলিল—রাত যে বারোটা বেজে গেছে বৌমা!

সেবা চুপিচুপি বলিল—তুমি শোওগে, দরকার হলে ডাকব।

লোকনাথ ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আর আপনি?

সেবা বলিল—উনি উঠে না খেলে ত আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারব না।

লোকনাথের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে পাশের ঘরের মেঝেতে বিছানার লেপ ঢাকা দিয়া শুইতে শুইতে বলিল—হরি হে!

এই হরি হে ডাকের মধ্যে অনেকখানি অকথিত আনন্দ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সেই রহস্যময়ের চরণে নিবেদন করিয়া বুড়া শুইয়া পড়িল।

হীরকের যখন ঘুম ভাঙিল তখন রাত্রি একটা। সে চোখ মেলিয়াই দেখিল সেবা একেবারে তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আছে। হীরক অশুচি স্পর্শের সঙ্কোচে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—ঘরে আর কে আছে?

সেবা বলিল—আর কেউ নেই। রাত অনেক হয়েছে।

এত রাত পর্য্যন্ত যে সেবা তার জাগরণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া হীরক বলিল—তোমাকে একলাই আমি খুঁজ্‌ছিলাম। দেখ, আমি জানি যে আমি

পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু, আমার মতন লোককে তুমি ভালোবাস্‌তে পারো না। আমার সঙ্গে বিয়ের মন্ত্র গোটাকত পড়া হয়েছিল বোলেই যে তোমার মন আমাকেই ভালোবাস্‌তে বাধ্য এমন ভাব্‌বার মতন মূর্খও আমি নই। তুমিও যখন আমাকে ভালোবাস্‌তে পারোনি, আমিও তোমাকে ভালোবাস্‌তে পারিনি, তখন আমাদের পরস্পরকে জড়িয়ে না রেখে পৃথক ও দূর হয়ে যাওয়াই উচিত। আমাদের বিয়ে বোলে যে একটু অনুষ্ঠান হয়েছিল তা সমাজ আইন বা ধর্ম্ম কারো চোখে বিবাহের বন্ধন বোলে স্বীকৃত হবে না —তখন আমার অশৌচ অবস্থা, আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মন্ত্র পড়াও অসম্পূর্ণ, তার উপর তুমি আমি অসবর্ণ—এ অবস্থার বিয়ে বিয়েই নয়। মানুষ কাউকে বিয়ের মন্ত্র না পোড়েও ভালোবাসে, আবার কাউকে বিয়ের মন্ত্র পোড়েও ভালোবাস্‌তে পারে না; কিন্তু বিয়ের মন্ত্র পড়া হলে স্বাধিকারের একটা বোধ জন্মে। সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেখ্‌লে মন কষ্ট পায়—ভালোবাসা না থাক্‌লেও। আমারও সেই রকম কষ্ট হচ্ছে। দোহাই তোমার, তুমি আমারই বাড়ীতে থেকে আমারই চোখের সাম্‌নে আমার অধিকারবোধকে ব্যঙ্গ কোরো না; তুমি আমাকে দয়া করো, আমাকে মুক্তি দিয়ে তুমি আর যেখানে খুসী যাও। ঐ দেরাজটার টানার মধ্যে আমার জমিদারীর দানপত্র আছে দাও দেখি।

সেবা আড়ষ্ট আকাট হইয়া হীরকের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতেছিল। হীরক প্রায় স্বাভাবিক স্বরেই এইসব কথা বলিতেছিল, তাতেই সেবা বুঝিতেছিল ভাবপ্রবণ ও আবেগময় হীরক কত বেশী রাগিয়াছে যাতে তার ক্রোধ এমন উচ্ছ্বাসহীন শান্ত হইয়াছে। কোনো কোনো কঠিন বস্তু উত্তপ্ত হইতে হইতে শুভ্র হইয়া উঠে—হীরকের এই উত্তাপও যেন তেমনি বিষম। সেবা ভয়ে দুঃখে লজ্জায় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গিয়া হীরকের দানপত্র আনিয়া দিল।

হীরক সেই দানপত্র হাতে লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—আমার এই জমিদারীটাই হয়েছে যত নষ্টের মূল! তুমি ফুলের বাগানে সুখে থাক্‌বার লোভে আমাকে গ্রহণ কর্‌তে স্বীকার করেছিলে। এই লোভ থাকাতেই তুমি এখনো আমায় ছেড়ে তোমার মনের পথে যেতে পাচ্ছ না। কাল সকালে আমি আমার সমস্ত জমিদারী তোমাকে লেখাপড়া কোরে ছেড়ে দেবো—তুমিও দয়া কোরে আমাকে ছেড়ে দিয়ো, আমারই চোখের সাম্‌নে থেকে আমাকে উপহাস আর উপেক্ষা কোরে জ্বালিয়ো না। আমি রেহাই চাই, রেহাই চাই!

এই শেষের কথা কয়টা একটু জোর গলায় তীব্রস্বরে বলিয়া হীরক দানপত্রখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া সেবার গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্রুর স্বরে বলিল—আমার জমিদারী ত মেয়ে-পাঠশালার বেনামীতে বেহাত করেইছিলে, সেইটা আমি প্রকাশ্য ভাবেই তোমায় দিয়ে দেবো কালই সকালে। তুমি ফুলের বাগানে মনের মতন লোক নিয়ে সুখে থেকো, আমায় বুদ্ধিতেও পঙ্গু মনে কোরে আমার চোখের সাম্‌নে আমায় জ্বালিয়ো না।

এই মিথ্যা তিরস্কারের অপমানে সেবার মন রাগে ও দুঃখে যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, সে আর আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। হীরকের সাম্‌নে পাছে কোনো দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া উল্কার মতন ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া বাগানের মধ্যে নামিয়া গেল। হীরক উত্তেজনায় ক্লান্ত হইয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ শীতের রাত্রি। ঝিঁঝিঁ ডাকার শব্দটুকুও কোথাও নাই। কেবল নিস্তব্ধতার একটা থমথমে ঝমঝমে আওয়াজ কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতেছিল। আর তারই মধ্যে আসিয়া লাগিতেছিল একটা চাপা কান্নার গোম্‌রানো। হীরক কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল—এই কান্না কি সত্য, না তার মনের ভ্রম।

কিছুক্ষণ পরে হীরকের মনে হইল একজন কে যেন জুতার শব্দ চাপিয়া চাপিয়া সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া বাগানে নামিয়া গেল। অমনি হীরকের মনে হইল—ও নিশ্চয় কুমুদ!

সেবার সঙ্গে সে এখনি সমস্ত সম্পর্ক পরিহার ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তাকে চিরবিদায় দিয়াছে; কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ গোপনতার মধ্যে সেই সেবার কাছে কুমুদ চোরের মতন যাইতেছে ভাবিতেই হীরকের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল, তার অবশ দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অল্পক্ষণ বিছানায়

পড়িয়া ছট্‌ফট করিল, তার পর উঠিয়া বসিল,—হঠাৎ তার কানে গেল দুজনের চাপা গলার কথা! হীরক আপনার দেহের অবশতা ভুলিয়া উত্তেজনার ঝোঁকে খাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িল ও অনেক দিনের অব্যবহৃত দুর্ব্বল পায়ে টলিতে টলিতে সে দালানে গিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে গোপনে রাখিয়া অপরদের দেখিবে ও কথা শুনিবে বলিয়া হীরক দালানের জোড়া থামের মাঝখানে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—শুভ্র জ্যোৎস্নায় বাগান ভরিয়া গিয়াছে, যেন বসন্তলক্ষ্মী ক্ষীরসাগর হইতে সুধার ঝারি ফুলের সাজি হাতে করিয়া উত্থিত হইতেছেন! সেই পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ বাগানের কোলে সিঁড়ির নীচের ধাপে বসিয়া সেবা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, আর তার গা ঘেঁষিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া আছেন বৃদ্ধ আনন্দ-বাবু। সেবা কান্নার ভিতর হইতে কথা ছাঁকিয়া তুলিয়া বলিতেছে—দাদামশায়, আপনারা ফুলের বাগানের লোভ দেখিয়ে আমাকে এখানে এনেছিলেন; বাগানে ত ফুল প্রচুর ফুটেছে, কিন্তু এতে ত মনের লোভ মিটছে না! আমার মনের বাগানের ফুলও যে ফুটে উঠ্‌ছিল দাদামশায়। আমার বিনা দোষে উনি আমাকে অপমান কোরে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করতেচাচ্ছেন। আমার মনের বাগানে যে ফুল ফুটেছিল সে ত তাঁকেই অর্ঘ্য দেবো বলে প্রতিদিন প্রতীক্ষা করছিলাম, তিনি ত একবার ফিরেও দেখলেন না! এ আমার কী হল দাদামশায়। আমি ওঁকে ছেড়ে যাবই বা কোথায়, কেমন কোরে, আবার থাক্‌বই বা কেমন কোরে? উনি বল্‌ছেন যে আমাদের বিয়ে অসিদ্ধ, কিন্তু আমি ত প্রতিদিন টের পাচ্ছি সে বন্ধন আমার দিকে কত-খানি দৃঢ় অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। দাদামশায়, আবার আমাকে আপনার বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন—আজই, রাত্রেই চারটের গাড়ীতে; দিনের বেলা আমি ওঁর দিয়ে, লোকের সাম্‌নে দিয়ে যেতে

সেবা ফুলিয়া ফুলিয়া
দুই চোখ দিয়া

—তাই চ দিদি। হঠাৎ তোকে হীরকের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ভালো করিনি। মহাদেব বুঝেছিলেন যে গৌরীকে পেতে হলে তপস্যা করতে হয়, অনায়াসলব্ধ বস্তুর মূল্যবোধ হয় না। তোর অভাব না হলে হীরক তোর মূল্য বুঝ্‌বে না চ ভাই, এই বুড়ো ঠাকুরদাদা আজ তোকে নিয়ে ele.. করবে।

এই গভীর দুঃখ-বেদনাকে বৃদ্ধ রসিকতা করিয়া ভুলাইয়া দিবার জন্য চোখের জল মুছিতে মুছিতে হাসিলেন। সেবাও চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার জন্য আনন্দ-বাবু ও সেবা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন হীরক টলিতে টলিতে অবশ অনভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ির ধাপ নামিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়াই সেবার দুই চোখ বিস্ময়ে ভয়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, আনন্দ-বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—সেবা, যা যা ভাই, হীরককে ধর্‌গে, এখুনি ঠিক্‌রে নীচে পোড়ে যাবে।

সেবা ছুটিয়া আসিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া হীরককে বুকের কাছে ধরিল, হীরকও তার এক হাত সেবার গলায় রাখিয়া আর-এক হাতে সেবার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—চলো আমরা বাগানে যাই।

সেবা ধীরে ধীরে সন্তর্পণে হীরককে এক এক ধাপে নামাইয়া নীচে লইয়া যাইতে লাগিল। আনন্দ-বাবু হাস্যোজ্জ্বল মুখে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

হীরক বাগানে গিয়া সেবার মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত হাসিমুখে বলিল—বড় ভুল করেছিলাম সেবা, আমাকে ক্ষমা করো। আজ এতদিনে আমাদের মিলন-বসন্তের সুখের জ্যোৎস্নায় বিয়ের ফুল ফুট্‌ল! চলো দুজনে বাইরের বাগান ফেলে নিয়ে যাই—আজ আমাদের অন্তরে বাহিরে

লজ্জিত হাসির আভা লাগিয়া তার
নিল।

দেশের ডাক

(ব্রায়ান্ট্ হইতে)

ফেলে রেখে আয় কোদাল কুড়ুল, পড়ে থাক্ তোর হল,
ছুঁড়ে ফেলে দে রে দোয়াত কলম কেতাব কাগজ কল।
ধর্ হাতে অসি বর্শা ভল্ল বন্দুক ধনুশর,
সমর-ক্ষেত্রে যেতে হবে তোরে, ওঠ্ গে অশ্ব'পর।

ডেকেছে স্বদেশ, ডেকেছে জননী, ডেকেছে কাতর ভাই;
রক্তের বানে ভেসে গেল সব, দেরি নাই—দেরি নাই!
বর্ম্মে আবরি এসেছে বৈরি দংশিতে জননীরে;
শত্রুর সাথে—নিয়তির সাথে—যুদ্ধ। ভাবিস্ কি রে?

অই হের সবে শানের মতন অটল যুদ্ধরত—
ত্রস্ত চকিত পালায় শত্রু, ধন্য রে বীর যত!
এনেছে যে বাহু ব্যাঘ্র ধরিয়া, লৌহ পিটিয়া গড়ে,
শত্রু-শিবিরে অগ্নি-বৃষ্টি তাহারাই আজি করে।

ডেকেছে স্বদেশ, আয় তোরা ওরে জা'তের শ্রেষ্ঠ জা'ত,
সয়েছিস্ কত করকা বৃষ্টি ঘূর্ণী ঝঞ্ঝাবাত!
পাহাড়ের মত হ' দেখি অচল, দাঁড়া দেখি একবার,
এ যে রে তোদের ভালবাসা দেশ, দাঁড়া সবে বাঁধি সার।

আয় আয় তোরা, যাহাদের বাড়ী এদেশের নদীকূলে,
এ দেশের গ্রামে বন্দরে তীরে অথবা তরুর মূলে,—
বর্ষা-স্ফীত নদী-গর্জ্জনে তট-তরু উন্মূলি
কিম্বা সাগর-ঊর্ম্মি সমান আক্রোশে ফুলি ফুলি।

আছি যেথা মোরা পুণ্যভূমি এ পিতামহদে
আমাদের কাজ—ভাল করে তারে আমা
হোক্ রণ তবে যতদিন নাহি আ
শক্তির সাথে চির-অ

মা

দুইটি পুত্রসন্তান নষ্ট হইবার পর, সোঁৎসেঁতে অন্ধকার আঁতুড়ঘর উজ্জ্বল করিয়া যখন একটি জীবন্ত মেয়ে জন্মাইল, বিভা হাতে স্বর্গ পাইল। হোক্‌না সে মেয়ে, সেই তার সাত রাজার ধন, তার মাথার মণি, তার বুকের হার। আঁতুড়ঘরের একটি মাস এই নবজাতা কন্যা লইয়া সে কত রকমের আদর করিয়া কত স্নেহে স্তন দিয়া আপনার তৃষিত মাতৃহৃদয়ের সকল পিপাসা দূর করিল। ছোটবেলায় সেই যে প্রাইজের পুতুলটিকে সে কত আদরে রাখিত, কত সাজে সাজাইত, কত স্নেহে রোজ রাতে বুকে করিয়া শুইত, সেই পুতুলটি যেন সজীব হইয়া তাহার কোলে ফিরিয়া আসিল। তুল্‌তুলে হাত, টুক্‌টুকে পা, ননীর মত কোমল গা, ভোম্‌রার মত কালো কোঁকড়ানো চুল; রেশমের মত নরম সমস্ত দেহ সে চুমোয় চুমোয় ভরিয়া দিত। একরত্তি ত শরীর, কিন্তু মেয়ের গলা বড় কম নয়, কাঁদিয়া যখন সমস্ত বাড়ী আকুল করিয়া তুলিত বিভা তাহাকে বুকে অতি নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ভুলাইত। আর যখন মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মায়ের হাসি অনুকরণ করিয়া হাসিত, বিভা সব ভুলিয়া অনিমেষ নয়নে সেই মিষ্টি হাসি চোখ ভরিয়া দেখিত। খুকী যখন ঘুমাইয়া পড়িত, বুকের স্পন্দনধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দ ঘরে শোনা যাইত না, সেই ঘুমন্তশিশুর দিকে চাহিয়া তাহার কত কথা মনে হইত, সে দিবাস্বপ্ন দেখিত। মেয়েটি তার মায়ের মত দুঃখিনী হইবে না, নিজের জীবনে যেসব সাধ মেটে নাই, যেসব আশা ব্যর্থ হইল, তার মেয়েটির জীবনে সেসব আশা পূর্ণ হইবে। নিজে ভালো করিয়া লেখাপড়া [illegible]তে পারে নাই; যে মিসনারী স্কুলে সে বরাবর প্রথম [illegible]য়াছিল, তাহাতে বেশীদূর লেখাপড়া শেখানো [illegible]হার বাবা কোন বড় স্কুলে ভর্ত্তি [illegible]তারপর তাহার বিবাহ [illegible]রীবের ঘরে

পড়িয়া ছট্‌ফট করিল, তার পর উঠিয়া বসিল,—হঠাৎ তার কানে গেল দুজনের চাপা গলার কথা। হীরক আপনার দেহের অবশতা ভুলিয়া উত্তেজনার ঝোঁকে খাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িল ও অনেক দিনের অব্যবহৃত দুর্ব্বল পায়ে টলিতে টলিতে সে দালানে গিয়া দাঁড়াইল। নিজেকে গোপনে রাখিয়া অপরদের দেখিবে ও কথা শুনিবে বলিয়া হীরক দালানের জোড়া থামের মাঝখানে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—শুভ্র জ্যোৎস্নায় বাগান ভরিয়া গিয়াছে, যেন বসন্তলক্ষ্মী ক্ষীরসাগর হইতে সুধার ঝারি ফুলের সাজি হাতে করিয়া উত্থিত হইতেছেন! সেই পুষ্পপল্লবসমৃদ্ধ বাগানের কোলে সিঁড়ির নীচের ধাপে বসিয়া সেবা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, আর তার গা ঘেঁষিয়া মাথায় হাত রাখিয়া বসিয়া আছেন বৃদ্ধ আনন্দ-বাবু। সেবা কান্নার ভিতর হইতে কথা ছাঁকিয়া তুলিয়া বলিতেছে—দাদামশায়, আপনারা ফুলের বাগানের লোভ দেখিয়ে আমাকে এখানে এনেছিলেন; বাগানে ত ফুল প্রচুর ফুটেছে, কিন্তু এতে ত মনের লোভ মিটছে না! আমার মনের বাগানের ফুলও যে ফুটে উঠ্‌ছিল দাদামশায়। আমার বিনা দোষে উনি আমাকে অপমান কোরে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত কর্‌তেচাচ্ছেন। আমার মনের বাগানে যে ফুল ফুটেছিল সে ত তাঁকেই অর্ঘ্য দেবো বলে প্রতিদিন প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম, তিনি ত একবার ফিরেও দেখ্‌লেন না! এ আমার কী হল দাদামশায়। আমি ওঁকে ছেড়ে যাবই বা কোথায়, কেমন কোরে, আবার থাক্‌বই বা কেমন কোরে? উনি বল্‌ছেন যে আমাদের বিয়ে অসিদ্ধ, কিন্তু আমি ত প্রতিদিন টের পাচ্ছি সে বন্ধন আমার দিকে কত-খানি দৃঢ় অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। দাদামশায়, আবার আমাকে আপনার বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন—আজই, রাত্রেই চারটের গাড়ীতে; দিনের বেলা আমি ওঁর দিয়ে, লোকের সাম্‌নে দিয়ে যেতে

—তাই চ দিদি। হঠাৎ তোকে হীরকের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ভালো করিনি। মহাদেব বুঝেছিলেন যে গৌরীকে পেতে হলে তপস্যা কর্‌তে হয়, অনায়াসলব্ধ বস্তুর মূল্যবোধ হয় না। তোর অভাব না হলে হীরক তোর মূল্য বুঝ্‌বে না। চ ভাই, এই বুড়ো ঠাকুরদাদা আজ তোকে নিয়ে চড়াও করবে।

এই গভীর দুঃখ-বেদনাকে বৃদ্ধ রসিকতা করিয়া ভুলাইয়া দিবার জন্য চোখের জল মুছিতে মুছিতে হাসিলেন। সেবাও চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার জন্য আনন্দ-বাবু ও সেবা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন হীরক টলিতে টলিতে অবশ অনভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ির ধাপ নামিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়াই সেবার দুই চোখ বিস্ময়ে ভয়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, আনন্দ-বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—সেবা, যা যা ভাই, হীরককে ধর্‌গে, এখুনি ঠিক্‌রে নীচে পোড়ে যাবে।

সেবা ছুটিয়া আসিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া হীরককে বুকের কাছে ধরিল, হীরকও তার এক হাত সেবার গলায় রাখিয়া আর-এক হাতে সেবার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—চলো আমরা বাগানে যাই।

সেবা ধীরে ধীরে সন্তর্পণে হীরককে এক এক ধাপে নামাইয়া নীচে লইয়া যাইতে লাগিল। আনন্দ-বাবু হাস্যোজ্জ্বল মুখে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

হীরক বাগানে গিয়া সেবার মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত হাসিমুখে বলিল—বড় ভুল করেছিলাম সেবা, আমাকে ক্ষমা করো। আজ এতদিনে আমাদের মিলন-বসন্তের সুখের জ্যোৎস্নায় বিয়ের ফুল ফুট্‌ল! চলো দুজনে বাইরের বাগান [illegible] চলে নিয়ে যাই—আজ আমাদের অন্তরে বাহিরে

[illegible] লজ্জিত হাসির আভা লাগিয়া তার

সেবা ফুলিয়া ফুলিয়া [illegible] গিল।

দুই চোখ দিয়া [illegible]

দেশের ডাক

(ব্রায়ান্ট্ হইতে)

ফেলে রেখে আয় কোদাল কুড়ুল, পড়ে থাক্ তোর হল,
ছুঁড়ে ফেলে দে রে দোয়াত কলম কেতাব কাগজ কল।
ধর্ হাতে অসি বর্শা ভল্ল বন্দুক ধনুশর,
সমর-ক্ষেত্রে যেতে হবে তোরে, ওঠ্ গে অশ্ব'পর।

ডেকেছে স্বদেশ, ডেকেছে জননী, ডেকেছে কাতর ভাই;
রক্তের বানে ভেসে গেল সব, দেরি নাই—দেরি নাই!
বর্ম্মে আবরি এসেছে বৈরি দংশিতে জননীরে;
শত্রুর সাথে—নিয়তির সাথে—যুদ্ধ। ভাবিস্ কি রে?

অই হের সবে শানের মতন অটল যুদ্ধরত—
ত্রস্ত চকিত পালায় শত্রু, ধন্য রে বীর যত!
এনেছে যে বাহু ব্যাঘ্র ধরিয়া, লৌহ পিটিয়া গড়ে,
শত্রু-শিবিরে অগ্নি-বৃষ্টি তাহারাই আজি করে।

ডেকেছে স্বদেশ, আয় তোরা ওরে জা'তের শ্রেষ্ঠ জা'ত,
সয়েছিস্ কত করকা বৃষ্টি ঘূর্ণা ঝঞ্ঝাবাত!
পাহাড়ের মত হ' দেখি অচল, দাঁড়া দেখি একবার,
এ যে রে তোদের ভালবাসা দেশ, দাঁড়া সবে বাঁধি সার।

আয় আয় তোরা, যাহাদের বাড়ী এদেশের নদীকূলে,
এ দেশের গ্রামে বন্দরে তীরে অথবা তরুর মূলে,—
বর্ষা-স্ফীত নদী-গর্জ্জনে তট-তরু উন্মূলি
কিম্বা সাগর-ঊর্ম্মি সমান আক্রোশে ফুলি ফুলি।

আছি যেথা মোরা পুণ্যভূমি এ পিতামহদে
আমাদের কাজ—ভাল করে তারে আমা
হোক্ রণ তবে যতদিন নাহি আ
শক্তির সাথে চির-অধি

মা

দুইটি পুত্রসন্তান নষ্ট হইবার পর, সোঁৎসেঁতে অন্ধকার আঁতুড়ঘর উজ্জ্বল করিয়া যখন একটি জীবন্ত মেয়ে জন্মাইল, বিভা হাতে স্বর্গ পাইল। হোক্‌না সে মেয়ে, সেই তার সাত রাজার ধন, তার মাথার মণি, তার বুকের হার। আঁতুড়ঘরের একটি মাস এই নবজাতা কন্যা লইয়া সে কত রকমের আদর করিয়া কত স্নেহে স্তন দিয়া আপনার তৃষিত মাতৃহৃদয়ের সকল পিপাসা দূর করিল। ছোটবেলায় সেই যে প্রাইজের পুতুলটিকে সে কত আদরে রাখিত, কত সাজে সাজাইত, কত স্নেহে রোজ রাতে বুকে করিয়া শুইত, সেই পুতুলটি যেন সজীব হইয়া তাহার কোলে ফিরিয়া আসিল। তুল্‌তুলে হাত, টুক্‌টুকে পা, ননীর মত কোমল গা, ভোম্‌রার মত কালো কোঁকড়ানো চুল; রেশমের মত নরম সমস্ত দেহ সে চুমোয় চুমোয় ভরিয়া দিত। একরত্তি ত শরীর, কিন্তু মেয়ের গলা বড় কম নয়, কাঁদিয়া যখন সমস্ত বাড়ী আকুল করিয়া তুলিত বিভা তাহাকে বুকে অতি নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ভুলাইত। আর যখন মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মায়ের হাসি অনুকরণ করিয়া হাসিত, বিভা সব ভুলিয়া অনিমেষ নয়নে সেই মিষ্টি হাসি চোখ ভরিয়া দেখিত। খুকী যখন ঘুমাইয়া পড়িত, বুকের স্পন্দনধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দ ঘরে শোনা যাইত না, সেই ঘুমন্তশিশুর দিকে চাহিয়া তাহার কত কথা মনে হইত, সে দিবাস্বপ্ন দেখিত। মেয়েটি তার মায়ের মত দুঃখিনী হইবে না, নিজের জীবনে যেসব সাধ মেটে নাই, যেসব আশা ব্যর্থ হইল, তার মেয়েটির জীবনে সেসব আশা পূর্ণ হইবে। নিজে ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই; যে মিসনারী স্কুলে সে বরাবর প্রথম [illegible] দিয়াছিল, তাহাতে বেশীদূর লেখাপড়া শেখানো [illegible] তাহার বাবা কোন বড় স্কুলে ভর্ত্তি [illegible] তারপর তাহার বিবাহ [illegible]

তাহার মেয়ের এসব কোন দুঃখ থাকিতে সে দিবে না। কত কথা সে শুইয়া শুইয়া ভাবিত। মাঝে মাঝে মনে বড় তর্ক উঠিত মেয়ের কি নাম হইবে; কত নাম মনে পড়িত, কোনটাই পছন্দ হইত না। স্কুলে যাহাদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়িয়াছিল, যাহারা তাহার সবচেয়ে বন্ধু ছিল, তাহাদের নাম ভাবিত; কোনটাই মনের মতন নয়।

আঁতুড় হইতে উঠিবার সঙ্গেসঙ্গেই বিভার সব দিবাস্বপ্ন দেখা শেষ হইল। শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত কাজই তাহাকে করিতে হইত। গরীবের ঘরে আজকাল ঝি রাখা যায় না, বাড়ীর ঝি-বামুনের কাজ সবই সে করিত। যদিও সংসার খুব বড় নয়, তবু একহাতে জল তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনোন ধরানো, বাট্‌না বাটা, কুট্‌নো কোটা, রান্না করা, খাওয়ানো, সব কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া—সব কাজ করিয়া উঠিতে তার প্রায় সমস্ত দিনই কাটিয়া যাইত। দুপুরে কোনদিন দুই এক ঘণ্টা ছুটি মিলিলে পাশের বাড়ীতে তাহার সখী ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত একটু গল্প করিয়া আসিত।

এবার বিভা সব কাজের মধ্যে কি নতুন সুখ পাইল। এই আনন্দের কণা একরত্তি মেয়ে আসিয়া তাহার সমস্ত দিনরাত আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এই ঘর সত্যিই তারই ঘর, এই বাড়ীতে তাহার মেয়ে জন্মিয়াছে, মানুষ হইয়া উঠিবে।

আগে সংসারের সব কাজ শেষ করিতে কত বেলা হইত; কিন্তু এখন এত তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ হইয়া যায়, দেখিয়া সে নিজেই অবাক হয়। এখন যে তার ছুটি চাই। তার মাতৃহৃদয় সকল কাজের মধ্যেও বারবার সেই মেয়েটির দিকে ছুটিয়া যাইত। কতদিন কতবার কাজ ফেলিয়া সে ছুটিয়া দেখিয়া যাইত, খুকী শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে কি না; একদিন এম্নি করিয়া ভাত ধরাইয়া ফেলিয়াছিল, শাশুড়ীর নিকট বকুনী খাইল; আর একদিন শাশুড়ী দেখিলেন তাঁর তরকারীর একগালে ধুলো আর একগালে ছাই। বুঝিলেন, মেয়ে উনোনে আগুন দিতে দিতে খুকীকে দেখিতে আসিয়া একটু আদর করিয়া যাইবার লোভ সাম্‌লাইতে পারেন নাই। বধূর আদরের ঘটা দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

কিন্তু এই আদর করার গর্ব্ব আর বেশীদিন রহিল না। বিভা রোজ রোজ ভাবিত তাহার খুকী প্রতিদিন কতখানি বাড়িতেছে; রাতে ঘুমাইবার পূর্ব্বে খুব ভালো করিয়া দেখিয়া লইত, আবার প্রভাতে উঠিয়াই দেখিত, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না খুকী কত বাড়িল। তাহার বোধ হইত খুকী যেম্নি ছোট্ট জন্মিয়াছিল ঠিক তেম্নি আছে, ভাবিত রোজ দেখি বলিয়া কিছু বুঝিতে পারি না, খুকী আমার নিশ্চয় বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে।

খুকীর বয়স প্রায় যখন দুইমাস হইল, একদিন সকালে উঠিয়া বিভার মনে হইল, খুকী যেন মোটেই বাড়িতেছে না, সে আরও ছোট হইতেছে, জন্মিবার সময় তাহার যে শ্রী ছিল তাহাও দিন দিন চলিয়া যাইতেছে; খুকীর গায়ের ফুলের মত নরম চাম্‌ড়া যেন বুড়োমানুষদের গায়ের চাম্‌ড়ার মত শুক্‌নো হইয়া যাইতেছে। তাহার বড় ভয় হইল। নিশ্চয় খুকীর কোন অসুখ করিয়াছে।

সকালে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া খুকীকে কোলে করিয়া সে ডাক্তারের স্ত্রীর বাড়ী গিয়া পড়িল। ডাক্তার-বৌরও বোধ হইল, খুকী ভালো নেই, তবু মুখে বলিলেন, বিভা ভুল দেখিতেছে।

বিভা বলিল—ভাই, মায়ের চোখ কখনও ভুল দ্যাখে না।

সে ডাক্তার-বাবুকে দেখাইয়া ছাড়িল।

কয়েকদিন কাটিল; রোজ বিভার মনে হইত খুকী যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে, আরও ছোট হইতেছে। তাহার ছোট দেহের ভিতর যেন অনেকগুলি বড় বড় রোগ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহারা শীঘ্রই মুখস খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

বাস্তবিকই খুকীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইতেছিল। সে ভয়ঙ্কর অশান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কান্না লাগিয়াই আছে, প্রায় দুধ বমি করে, চোখদুটি আর হীরার মত জ্বলে না, সমস্ত দেহ রক্তহীন, গা গরম। ভাবিয়া ভাবিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিভাও দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এক রাতে খুকী কি কান্নাই কাঁদিল; মাতৃহীন অন্ধ পক্ষীশাবকের মত করুণ সুরে সমস্ত বাড়ী আকুল করিয়া রহিয়া রহিয়া বার বার সারারাত ধরিয়া কাঁদিল; পাশের বাড়ীর ডাক্তার-বাবুর ঘুম কতবার ভাঙ্গিয়া গেল।

আর সেই কান্নার সঙ্গে কি ফোঁস্ ফোঁস শব্দ, বার বার নাক বুজিয়া যাইতেছে, এই বুঝি নিশ্বাস প্রশ্বাস আট্‌কাইয়া যায়।

বস্তুতঃ মায়ের চোখ ভুল দেখে নাই; রোগগুলি কোথায় লুকাইয়াছিল, দিনের পর দিন একে একে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। মুখের ভিতর ঘা হইল, কিছু হজম হয় না, মাথার চুল খসিয়া পড়িল, সমস্ত শরীর ঝরাপাতার মত শুক্‌নো, আর কি কান্না! সে ক্রন্দন সূচের মত সূক্ষ্ম, শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের মত তীক্ষ্ণ—অন্ধকার শ্রাবণরাতে বিজনবনে ঝোড়ো হাওয়া যেমন থাকিয়া থাকিয়া শিশু শালগুলি আন্দোলিয়া গর্জ্জিয়া ওঠে—তেম্নি উদাস, তেম্নি করুণ। সেই ক্রন্দন-আকুলিত গৃহে বিভা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কাজ করিত। দিনের আহার গেলো, রাত্রির নিদ্রা গেলো। সেই কান্নায় বাড়ীর লোকেরা অস্থির হইল, প্রতিবেশীরা গালাগালি দিল।

ডাক্তারবাবু নব্যযুবক, বছরকয়েক মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়াছেন। রোজ দুবেলা দেখিয়া যাইতেন, স্ত্রীর সহিত বিভার সখীত্ব আছে বলিয়া কোন ফি লইতেন না।

কিন্তু ঔষধের দাম আছে ত। গোড়ায় ঔষধ আসিল। তারপর একদিন শাশুড়ী বলিলেন—"দুই মাসের মেয়ের অসুখে ঔষধের শিশিতে যে ঘর ভরে গেলো, একটু ত সর্দ্দি হয়েছে, অত ডাক্তার আন্‌বার ঘটা কেন বাবু; আর ওই কচি মেয়েকে একগাদা ওষুদ খাওয়ালে ত মরেই যাবে—" অর্থাৎ কিনা তাঁহাদের গরীবের সংসারে এক কচি মেয়ের অসুখে অত সখ করিয়া ঔষধ কিনিয়া বাজে খরচ করিবার টাকা নাই। তাছাড়া খুকীর যে-সব ঔষধ দরকার তাহা ও ছোট সহরে কোথায় মিলিবে, আর এ রোগে কোন চিকিৎসা নাই। ডাক্তার-বাবু বিভার মন খুসি করিবার জন্য প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিয়া যাইতেন, অতি অল্প দামের সহজ ঔষধ দিতেন।

মুখ হইতে ঘা সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়িল, দেহের রং তামার মত হইল। বিভা সেই চিরক্রন্দসী রুগ্না কন্যাকে সমস্ত রাত বুকে জড়াইয়া রাখিত, কত রকমে আদর করিত, সে কান্না কিছুতেই থামিত না। বিভা প্রথমে ভাবিয়াছিল, খুকী যখন প্রথম আধআধ স্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিবে কি মিষ্টি শুনাইবে। সে কান্নার মধ্যে বিভা শুনিত খুকী 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে। এই কাতর ক্লান্ত করুণ স্বরে মা ডাকা তাহার সহ্য হইত না। 'সোনা আমার' 'মাণিক আমার' 'কি কষ্ট হচ্ছে মা—মরে যাই।' তারাভরা রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহর আকুল করিয়া সেই বিরামহীন কান্না, 'মা' 'মা'। তাহার বুকের রক্ত দিলে, তাহার জীবন দিলেও কি এ কান্না থামানো যায় না?

এক তারাভরা অন্ধকার রাতে সে কান্না একেবারে থামিয়া গেল; বিভার ঘর অন্ধকার করিয়া খুকী চলিয়া গেল।

* * * *

ডাক্তার বিভার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন—"রোগটা বড় ছোঁয়াচে ছিল, খুকীর কাপড় জামা বিছানা সব যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।" বিভা প্রথমে মোটেই রাজী হয় নাই; কিন্তু ডাক্তার-বাবুর হুকুম, কি করে। সে শুধু একটি জামা ও একজোড়া মোজা লুকাইয়া রাখিয়াছিল; রোজ দুপুরে সব কাজ সারিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ট্র্যাঙ্কের সব তলা হইতে মোজা ও কেশের গুচ্ছ বাহির করিত, দুই হাতে ধরিয়া চুমো খাইয়া কত আদর করিত, কত কাঁদিত।

সে দুপুরে ঘরে একা বসিয়া থাকিতে পারিল না, যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে। ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পাশের বাড়ীতে তাহার বন্ধুর নিকট চলিল। ডাক্তার-বাবুর এক দেড় বছরের খোকা আছে, তাহাকে আদর করিয়া আসিলে মন তবু কিছু তৃপ্ত হইবে। বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেই তাহার মনে পড়িল, ডাক্তার-বাবুর খোকাকে ছোঁয়া যে তার বারণ, খুকীর ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ হইয়াছিল বলিয়া খোকাকে আদর করিতে বিভার হুকুম নাই। তবু একবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য সে ছুটিল।

খিড়্‌কীর দরজা দিয়া ভিতরের ঘরে ঢুকিতেই বিভা শুনিতে পাইল, বাহিরের ঘরে বসিয়া ডাক্তার-বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হঠাৎ তাহার নামটা কানে আসিল। উৎসুক হইয়া বিভা দরজার গোড়ায়

আগাইয়া লুকাইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল ; কি একটা অজানা ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। একটা কথা খুব জোরের সহিত তাহার কানে আসিয়া বাজিল, "কি করবে, ও সব ভগবানের নিয়ম, বাপ করে পাপ, আর ছেলেমেয়েরা অমন ভুগে মরে—"

বিভা আর শুনিতে পারিল না, তাহার দুই কানে কে আগুনে গলা সীসা ঢালিয়া দিয়াছে, সমস্ত মাথা জ্বলিয়া যাইতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর বাহির হইয়া নিজের ঘরে গিয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ কাঁদিল, কি এক ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর নির্জ্জীব নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। এমন ভয় জীবনে সে কখনও পায় নাই। ডাক্তার-বাবুর সব কথা সে বোঝে নাই, তবু যেন সে বুঝিয়াছে। কি পাপ, তাহার স্বামী কি পাপ করিয়াছেন, ডাক্তার-বাবু কি বলিলেন—ভাবিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, তাহার মাথার রক্তস্রোত বরফের মত ঠাণ্ডা, চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইবে, কি অজানা ভয়ে মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া রহিল।

তাহার বুকের একদিক হইতে অপর দিক কে যেন তুরপুনের পর তুরপুন চালাইয়া ছেঁদা করিয়া দিয়াছে, সেই শূন্য হৃদয় হইতে মা কাঁদিয়া উঠিল—"ওঃ"—আর সে সহ্য করিতে পারে না।

সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া বিভা বিমনা হইয়া উঠানের সাম্‌নে বসিয়া ছিল। লাউয়ের সরু ফালির মত পঞ্চমীর চাঁদ হইতে জ্যোৎস্না সাম্‌নে লাউকুমড়ার মাচার উপর ঝরিয়া পড়িতেছে ; অদূরে ঘুঁটেভরা ভাঙাপাঁচিলে কতকগুলি মশা ভন্‌ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে ; বিভা শূন্যমনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। শাশুড়ী পাশে আসিয়া বসিলেন।

'শুন্‌তে পাচ্ছো মা—"

"কি বৌমা ?"

"খুকী আমায় ডাক্‌ছে—এই যে দুবার ডাক্‌লে—মা—মা—"

শাশুড়ী উপরে চাহিয়া দেখিলেন দুইটি পেঁচা উড়িয়া গেল, ভাবিলেন বৌমা কি সত্যই পাগল হইল।

'শুন্‌তে পাচ্ছো মা—'

'কি মা ?'

'খুকী আমার আস্‌ছে, শব্দ শুন্‌ছো ? কি মিষ্টি পায়ের আওয়াজ—ওই যে তুলসীতলার কাছে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে—'

শাশুড়ী বধূর দীপ্ত মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

'মাণিক আমার, বাছা আমার, ওরে ওখানে যে বড় ধুলো—যাচ্ছি সোনা—'

এমন ব্যাপার শাশুড়ী জীবনে কখনও দেখেন নাই।

তুলসীতলার নিকটে যেখানে একদল পেঁপে-গাছের তলায় জমাট অন্ধকারের উপর চাঁদের আলো ঝিকিমিকি করিতেছে, আর হাওয়ায় পুঁইশাখাগুলি কাঁপিয়া সন্‌সন্ শব্দ হইতেছে, তাঁহার বধূমাতা দুই হাত প্রসারিত করিয়া সেই অন্ধকার দেওয়ালের কোণের দিকে ছুটিয়া গেল।

বেশীদূর যাইতে হইল না, দুই পা যাইতেই গোবোর-লেপা উঠানে বিভা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেই সন্ধ্যা হইতে বিভার ফিটের ব্যারাম সুরু হইল।

* * * *

স্বামী আসামের চা বাগানে কি কাজ করেন, কন্যার মৃত্যুর কথা শুনিয়া স্ত্রীর সহিত কয়েকমাস চিঠি দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন। বছর দেড়েক বাদে ঘরে ফিরিয়াছেন।

রাতের সব কাজ শেষ করিয়া বিভা তাহার শাশুড়ীর কাছে আসিয়া বসিল।

'কি বৌমা ?'

'মা, আজ আমি তোমার কাছে শোব।'

'সে কি বৌমা—'

'না মা—সে আমি বল্‌তে পার্‌বো না মা, কিছুতেই পার্‌বো না'—সেই ডাক্তারের কয়েকটি কথা বিভার মনে পড়িল—'তোমার কাছেই শোব, মা'—

শাশুড়ী বৌমার ভয়ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিলেন মুখ কিরূপ বিকৃত হইয়া আসিতেছে, চক্ষু নিষ্প্রভ হইতেছে, এই বুঝি ফিট হয়। ওই রোগটিকে তিনি বড় ভয় করিতেন।

'আচ্ছা মা, আমার কাছেই শুয়ো, অসুখ কর্‌ছে কি ?—'

ভাবিলেন এখন হয়ত মনটা কিছু খারাপ আছে, একটু পরেই উঠিয়া যাইবে।

শাশুড়ী যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। অনেক রাত পর্য্যন্ত বিভা শাশুড়ীর পাশে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, ডাক্তারের প্রতি কথা তাহার মনের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

তখন মাঝরাত, বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত হইয়া দিশাহারা হইয়া ধীরপদে উঠিয়া স্বামীর ঘরের দিকে চলিল। দরজার গোড়ায় আসিয়াই থমকিয়া দরজাটা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল। কি অজানা ভয়ে সমস্ত দেহ অসাড় হইয়া গেল, মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের স্নায়ুতে শিরায় যেন বরফ-জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

বাহিরে জ্যোৎস্না থমথম করিতেছে। লাউয়ের মাচা নাচাইয়া, পেঁপে গাছগুলি দোলাইয়া, ঘোষেদের আমবাগান কাঁপাইয়া ঘুমন্ত গ্রামের উপর দিয়া স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া গেল।

নিস্তব্ধ রাত্রি আকুল করিয়া বিভার কানে এক কান্না আসিয়া বাজিল, 'মা—মা'—যে কান্না সে রাতের পর রাত জাগিয়া মুমূর্ষু শিশুকে বুকে জড়াইয়া শুনিয়াছে, সেই বিরাম-হীন কান্না,—সেই তীব্র আকুল ক্রন্দনধ্বনি তুলসীতলার পাশ দিয়া লাউয়ের মাচার উপর হইয়া পেঁপে-গাছের তলা দিয়া আমবাগান আকুল করিয়া তালদিঘি কাঁপাইয়া সুপ্ত-গ্রাম ছাড়াইল, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া গ্রামের শেষে প্রান্তর ছাড়াইয়া দিকচক্রবালে মিশিয়া গেল। বিভার হিম দেহ জ্বলিয়া উঠিল, সেই ক্রন্দনধ্বনি যেন দেহের প্রতি লোমকূপ সূচের মত বিদ্ধ করিতেছে, অগ্নিশলাকার মত দগ্ধ করিতেছে, কানে আঙুল দিয়া সে চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে কোনোমতে উঠিয়া বিভা স্বামীর বিছানার একধারে জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুম চোখে আসে না। সে দরজা খুলিয়া আসিয়াছিল, একটা দমকা বাতাস আসিয়া দরজার কোণে প্রদীপ নিভাইয়া দিল; বাহিরের আকাশে একখণ্ড কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িল, বিভার আবার বড় ভয় করিল, আর্ত্তস্বরে ডাকিল, 'ওগো!' স্বামী নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, কোন সাড়া মিলিল না।

সহসা বিভার মনে হইল তাহার গায়ে কাহার প্রশ্বাস পড়িতেছে, ভাবিল ভয় পাইয়া বুঝি স্বামীর খুব কাছে সরিয়া আসিয়াছে। না, এ ত স্বামীর নয়, এ এত মৃদু, ছোট ছেলের নিশ্বাসের মত। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শ থামিয়া গেল। অতি ভয়ে ধীরে বিভা একটু হাত বাড়াইল, কাহার তুষার-শীতল দেহ হাতে ঠেকিল। না, এ ত স্বামীর দেহ নয়, এ মাংস যে বড় নরম, তুলতুলে, কি কচি পা, ছোট হাত, এই যে মাথাটা, মুখের উপর একবার হাত বুলাইল—চিনিয়াছে, সে চিনিয়াছে, অন্ধকারে মুখের উপর হাত বুলাইয়াই মা মেয়েকে চিনিতে পারে—এ ত তার সেই মরা মেয়ে, স্বামী ও তাহার মধ্যে স্থির হইয়া শুইয়া আছে!

কথাটা বিদ্যুতের মত মনে পড়িয়া চমকিয়া উঠিতেই সে যেন ইলেক্‌ট্রিক শক্ পাইল। শিহরিয়া, বিছানা ছাড়িয়া মেজের উপর ঘরের দেওয়ালের কাছে গড়াইয়া পড়িল; আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকিতে চাহিল, 'ওগো!'—কণ্ঠে স্বর ফুটিল না; বজ্রদীর্ণ তরুর মত আড়ষ্ট হইয়া নির্ব্বাক পড়িয়া রহিল। স্বামী কোন সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিছানার একপাশ হইতে অপর পাশে ফিরিলেন।

বাহিরে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, চাঁদের আলো দরজা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলোয় পথ দেখিয়া কোনমতে বিছানা না মাড়াইয়া অন্ধকার ঘর হইতে বিভা স্বপ্নচালিতের মত বাহিরে দালানে চাঁদের আলোয় আসিয়া দাঁড়াইল। একটা ইঁদুর চৌকাটের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল; স্বামী কোলের কাছের এক ছোট বালিশ মেজের উপর ফেলিয়া দিলেন।

আবার সেই করুণ ক্রন্দন। যে ধ্বনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আকাশে মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া প্রতিধ্বনির মত ফিরিয়া আসিতেছে; সমস্ত বনপ্রান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুমন্ত গ্রাম পার হইয়া ডাক্তার-বাড়ীর পাশ দিয়া স্বামীর ঘরের ভিতর হইতে ওই দরজার ভিতর দিয়া সেই করুণধ্বনি ফিরিয়া আসিতেছে, জ্যোৎস্না-বিধৌত আকাশ ফাটিয়া সমস্ত মাটির তলা হইতে সেই কান্না উঠিতেছে—'মা'—'মা'—'মা'—

বিভা আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে স্নায়ুতে কে আল্‌পিনের পর আল্‌পিন বিঁধিতেছে।

জন্স মেটারলিঙ্ক প্রমুখ আধুনিক বিগ্রহপন্থীদের আধ্যাত্মিক অলৌকপন্থার সঙ্গে এই ভৌতিক অলৌকপন্থার একটা প্রকারগত পার্থক্য রহিয়াছে। সুপ্রাচীন ভূতপরীর গল্প ও থিওফাইলাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া রজার বেকন, ফাউষ্ট পর্য্যন্ত গূঢ়তত্ত্বান্বেষীদের অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের মধ্যাহ্নীয় যুগে যে witchcraft বা ডাকিনীতন্ত্রের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাদের সঙ্গেও পোয়ের সাহিত্যের বিভিন্নতাটা স্থূল দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। এই বিশেষ রকমের অলৌকপন্থী মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে একমাত্র পোয়ের স্বদেশবাসী হথর্ণই তাঁর কতকটা সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু হথর্ণের মধ্যে তত্ত্বের দিকটাই প্রবল; তাঁর গল্পগুলিতে তা আল্‌গা এবং [illegible] রূপে ভারি হইয়াই রহিয়া গিয়াছে, [illegible] মিশিয়া যায় নাই। [illegible]

দিয়াছেন। এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার প্রধান [illegible] হইয়াছে তাঁর হাস্যরস। এই গল্পগুলির বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার জিনিষ হইয়াছে অলৌকরসের পাশাপাশি এদের এই হাস্যরস। প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন ভাবে একটা হাস্যরসের ধারা অনেকগুলি গল্পের মধ্যেই বহিয়া চলিয়াছে। তুলার মাণ্ডল কালেক্টরের অদ্ভুত ছবি দিয়া এবং থিয়সফিষ্ট বন্ধুকে ব্যঙ্গ করিয়া ক্ষুধিত পাষাণের আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে। 'দুরাশা'য় এবং 'কঙ্কালে' গল্পকারের সঙ্গে নায়িকার কথোপকথনের মধ্যেও এই হাস্যরস রহিয়াছে। 'মণিহারার' ইস্কুল-মাষ্টারটি হাস্যরসেরই সৃষ্টি।

ভিতরকার অলৌকপন্থী গল্পটি যতই জমিয়া আসুক না কেন, রবীন্দ্রনাথ বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ [illegible] প্রকাশ্য দিবালোক দিয়া ঝাপ্‌সা [illegible] দিয়াছেন অথবা

রশ্মিটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তাঁর মনের অত্যদ্ভুত ঐকান্তিকতার নিবিড়তার সঙ্গে হাসির আলোকের একটা স্বাভাবিক বিরোধ রহিয়াছে। পোয়ে হাসিতে জানেন না বলিয়াই তাঁর সৃষ্ট জীবেরা অধিকাংশই শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।

হাসি জগদ্ব্যাপারের তাল রক্ষা করে, কোনো-কিছুকে তা আত্যন্তিকতায় পর্য্যবসিত হইতে দেয় না। অতি-নিবিড়তাকে সে সহ্য করিতে পারে না, চারিদিক হইতে যা খাপছাড়া হইয়া উঠে তার হাস্যজনকতার দিকে সে দশজনের চক্ষু খুলিয়া দেয়। এই হাসির আলোকের অভাবে মানবমনের তাল কাটিয়া যায়, সুরের ব্যতিক্রম হয়, ছন্দ এলাইয়া পড়ে, সমতা নষ্ট হয়। ইহার অভাবেই পোয়ের মন এমন আশ্চর্য্যরূপে একমুখী [illegible] সূক্ষ্মতার সুচাগ্র[illegible] স্মৃতি বহন করিয়া লোকলোচনের বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে এমনি একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ প্রাসাদের; মনুষ্য-লোকের কলকোলাহলের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিটিও সেখানে গিয়া পৌঁছায় না, জীবনের সুখ-দুঃখ-খচিত রঙীন ছায়া-লোকের রেখাটি মাত্র সেখানে উঁকি মারিবার পর্য্যন্ত অবসর পায় না; কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে! ধীরে ধীরে ছবির একমাত্র পরিপার্শ্ব যে প্রাসাদ তাও কোথায় মিলাইয়া যায়; এমন কি প্রিয়াটিও তাঁর সমস্ত দেহমন, সমস্ত সত্তা লইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যান; পড়িয়া থাকে শুধু একজোড়া নীল চোখ অথবা একপাটি শুভ্র দাঁত, একজোড়া দেহহীন চোখ তাদের আলৌকিক চাহনি লইয়া, একপাটি দাঁত তাদেরই [illegible] অদ্ভুতা বিকাশ করিয়া! মনের যার এইরূপ [illegible] আলুথালু, দশজনের সহিত [illegible] ক্ষমতা তার থাকে না,

জীবনের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ নহে, সেখানে দুর্যোগ-রাত্রের পুঞ্জীভূত ভয়কে ভেদ করিয়াও সুদূর গ্রাম্যযাত্রীর কোলাহলের প্রতিধ্বনি আসিয়া পৌঁছিতে পারে। পোয়ের Ligeia ও Eleonora মধ্যে হয়ত রবিবাবুর "নিশীথে" গল্পের বীজের সন্ধান মিলিবে।

"And then and then I throw myself hurriedly at the feet of Eleonora, and offered up a vow to herself and to Heaven, that I would never bind myself in marriage to any daughter of Earth—that I would in no manner prove recreant to her dear memory."

এই প্রতিজ্ঞা "নিশীথের" "তোমার ভালবাসা আমি কোনকালে ভুলিব না"কে স্মরণ করাইয়া দেয়। "নিশীথের" মনোরমা হইয়াছেন "the blue-eyed Lady Rowena." কিন্তু মৃতা রাওয়েনার মধ্যে লিজিয়া আবির্ভাবের মত অপূর্ব্ব এবং ভয়ঙ্কর "নিশীথের" মধ্যে কিছু নাই। আবার "নিশীথের" দাম্পত্যচিত্রের যে বাস্তবতা, যে সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্য, পোয়ের গল্পে তার আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়পত্নীগ্রাহীর মনস্তত্ত্ব লইয়া উভয়েই গল্পের ভিত্তিপত্তন করিলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে বিস্তর। পোয়ের মধ্যে যা সরল রেখার মত ঋজু ও সূক্ষ্ম, একক ও অনুপ্রবেশকুশল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাই বিভিন্ন চরিত্র ও রসের সমাবেশে সুবলয়িত মোলায়েম হইয়া দেখা দিয়াছে; পোয়েতে যা কালো রজনীর মত জমাট ও নিবিড়, রবীন্দ্রনাথে তাই কতকটা তরল হইয়া বিচিত্র বর্ণরূপে বহুভঙ্গিম রুচির হইয়া উঠিয়াছে; পোয়ের মধ্যে যা জমিয়া বাহিরের সত্যকার ভাবের জিনিষের মত মনে চিরস্থায়ী বিভ্রম জন্মায়, তাকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মন হইতে বহির্নিক্ষিপ্ত ক্ষণিক আবছায়া বলিয়া চিনিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হয় না।

পোয়ের চিত্তের এই ভয়ঙ্কর অতি-নিবিড়তাই হইয়াছে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, আবার ইহাই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বলতাও বটে। ইহার ভালোমন্দ তাঁকে দুই ভোগ করিতে হইতেছে।

সাহিত্যের আদি মহারথ বাল্মীকি-হোমরেরা তাঁদের রথ হাঁকাইয়াছিলেন মানব-মনের রাজপথে, সেখানে সর্ব্বসাধারণ আপনাদের সুখ দুঃখ লইয়া আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে পুত্রবিরহিতা মাতার ক্রন্দন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ছুটিয়াছে, প্রেমিকা পথকণ্টকে আপনার পদদ্বয় রাঙিয়া লইয়া তার অভিসার-যাত্রায় চলিয়াছে, বীর তার শোণিত-লোলুপ শাণিত তরবারি লইয়া অগ্রসর হইতেছে। "বহুমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহুদিবসের সুখে দুখে আঁকা, লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা" সুন্দর এই রাজপথ! এখানে সবই সবল ও বলিষ্ঠ, আপন আপন সীমা-রেখায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট।

আধুনিকেরা সর্ব্বসাধারণের এই রাজপথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁরা মানব-মনের যে পথে চলিয়াছেন সে পথে লোক-চলাচল বেশী নাই, ভিড় খুব কম। সেখানে উজ্জ্বল দিবালোক কিছু প্রতিহত হইয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে আলোকের সঙ্গে বহুল পরিমাণে ছায়ার সমাবেশ হইয়াছে। সব জিনিষেরই সীমারেখা সেখানে অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। যে দু'চার জন সমজ্‌দার এই পথের মোহকে চিত্তদেশে ঘনাইয়া লইয়াছেন, তাঁদের পক্ষে পুরোণো রাজপথে ফিরিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু রাজপথের দিবালোককেই ভাঙিয়া চুরিয়া, বিচিত্র অনুপাতে ছায়ার সহিত মিশাইয়া তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের কারবার চালাইতেছেন।

এই আধুনিকদের মধ্যে যে দুই-একজন অত্যাধুনিকতম, তাঁরা এই পথকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁরা চলিয়াছেন মানব-মনের সে চোরাগলিতে যেখানে সূর্য্যালোক প্রবেশের সামান্য ফাঁকটি পর্য্যন্ত নাই। এই চিরন্তন রাত্রির ভয়ঙ্করতায় চিত্ত ডুবাইয়া এঁরা তাঁদের পিছনের পথিকগণকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু এই দুর্গম গহন পন্থায় প্রবেশের দুঃসাহস কয়জনের আছে? এঁরা আশ্বাস দিতেছেন—এ অন্ধকার নয়, পাতলা সূর্য্যালোককে নিবিড় ভাবে জমাইয়া তুলাতেই তার এই চেহারা দাঁড়াইয়া গিয়াছে! কিন্তু বিশ্বাস করে কে?

সূর্য্যালোককে প্রগাঢ় করিতে করিতে একেবারে রাত্রির মত নিকষ-কৃষ্ণ করিয়া দেওয়ার মধ্যে নৈপুণ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে না আছে সুখ ও স্বাস্থ্য, না আছে আনন্দ ও জীবনের কল্লোল, না আছে মনের সুবিপুল আশ্বাস আর নয়নের তরঙ্গায়িত সলীল শ্যামলতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "গুপ্তধনে"র মৃত্যুঞ্জয়ের মত আমাদিগকে মানব-মনের অতলস্পর্শ অন্ধখনির ঝুটা মণিমাণিক্যগুলির প্রবল মোহ হইতে এই শ্যামস্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল ধরণীর কোলে যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন সেইজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

শিশু-রাজ্য

সেথানে আকাশ রাঙা, রাঙা রবি ওঠেনি;
কমলেরা চোখ মাজে, এখনও ফোটেনি।
ডাক শেখে বিহগেরা বসি নিজ কুলায়ে,
বহে শিশু-সমীরণ লতিকারে দোলায়ে।

২

কথা সেথা ভাঙা ভাঙা, রাঙা রাঙা অধরে;
প্রাচীরের বাধা নাই অন্দরে সদরে।
সুর-ফাঁক সঙ্গীতে হার মানে বাঁশরী,
তালহীন নৃত্যেতে তন্ময় আসরই।

৩

সাজ সেথা নগ্নতা, কাজ সেথা অকাজে,
তারি সাথে বাধে রণ প্রিয়তম সখা যে।
হাস্যেতে যত শোভা, তত শোভা রোদনে—
ঘুমায় তত ধুম্, যত ধুম বোধনে।

৪

যেই দেশে গঞ্জ গেলে শতদলবাসিনী
আজও সেথা কমলার পেচকেরা আসেনি,
রূপ সেথা সেধে পরে কুরূপের ভূষাকে,
কুহেলিতে ঢেকে রাখে শরতের উষাকে।

৫

নবনীর অবনী সে লাবনির খনি গো,
উঠে সেথা রাখালের নূপুরের ধ্বনি গো,
ফুটে সেথা গোপালের কচি মুখ হসিত,
জাগে সদা যশোদার আঁখিযুগ তৃষিত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দেশের কথা

একে ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতার জন্য লোকের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই ব্যাধিপীড়নে এবং চিকিৎসকের অভাবে তাহাদের দুর্দ্দশা যে কিপ্রকার চরমে দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। পল্লীতে-পল্লীতে রোগার্ত্তের দারুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে।—নীহার।

অনাহার-দুর্ব্বল শরীর ব্যাধি-প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়ে। রোগের কারণ সকল স্থানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে; যারা উপযুক্ত ও যথেষ্ট আহার পায় তারা সেই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়, যারা অনাহার-দুর্ব্বল তারা রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশব্যাপী নানা ব্যাধির তাণ্ডবলীলার কারণ দেশের লোকের অন্ন-বস্ত্রজলের অভাব, শিক্ষাদীক্ষার অভাব, জীবনের আনন্দের অভাব। এই অভাবে আমাদের স্বভাবও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমাদের মনের সাহস নাই, আত্মসম্মানবোধ নাই, ব্যবসায়ে সততা নাই, কর্ম্মে উৎসাহ নাই, কিছুতে আশা নাই। দেশের অন্নাভাব যে কত প্রবল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ হইতে—

এ-সহরের পাকঘরে প্রবেশ করিয়া ভাত চুরি করিয়া খাওয়া চোরের উপদ্রব এখনও কমে নাই। অনেক বাসাতেই রাত্রিতে পাকঘরে চোর প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতেছে।—রঙ্গপুর-দর্পণ।

দেশব্যাপী অভাব ও সর্ব্ববস্তুর দুর্ম্মূল্যতার কারণ কি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এক অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটিতে দেশী বেসরকারী লোকই বেশী ছিলেন। তাঁদের অনুসন্ধানের ফল আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম। কিন্তু অনুসন্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিকারও যে চাই।

দেশময় দুর্ম্মূল্যতার কারণ অনুসন্ধানকল্পে গত ১লা জুলাই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট একটি "হাই প্রাইসেস্" কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি ২২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

চাউল

কমিটি মনে করেন নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে—

(১) যে-পরিমাণ চাউল প্রয়োজন সেই পরিমাণ চাউল সরবরাহ হইতেছে না।

(২) বিদেশে চাউল রপ্তানি।

(৩) ব্যবসায়িগণের অতিরিক্ত লাভ।

(৪) কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে বহু মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর সৃষ্টি।

১৯১১-১২ সালে ২০,৪৩৭,০০০ একর পরিমিত স্থানে ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯১৮-১৯ সালে ২১,৩৩০,০০০ একর পরিমিত স্থানে ধানের চাষ হয়। কিন্তু উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ শতকরা ৮টন হিসাবে কমিয়া যায় অর্থাৎ ৮৬৩৫০০০টন হইতে ৬৯০১০০০ টনে দাঁড়ায়। পাটের চাষ, ১৯১৮-১৯ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯১৯ সালের পূর্ব্ববঙ্গের ভীষণ ঝড়, উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাব, চাষের গরুর অভাব, ব্রহ্মপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে অবাধ চাউল আমদানির প্রতিবন্ধকতা, জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পরিমাণে গম রপ্তানি ও পশ্চিম ভারতে গমের অভাব পরিপূরণার্থ বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিম ভারতে চাউল রপ্তানি, কৃষি শিক্ষার অভাব, পূর্ব্ববঙ্গের জমীতে পানা-কচুরির প্রভাব, চাষের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব প্রভৃতি কারণে যে পরিমাণ চাউল প্রয়োজন সেই পরিমাণ চাউল সরবরাহ হইতেছে না।

কমিটি দেখাইয়াছেন, গড়পড়তা দৈনিক জনপ্রতি অন্যূন দশ ছটাক চাউলের প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গদেশের ব্যবহারযোগ্য যে চাউল পাওয়া যায় তাহাতে জনপ্রতি দশ ছটাক চাউল পড়ে না। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সম্বন্ধে যে হিসাব প্রদান করিয়াছেন তাহা এই—

১৯১৩-১৪
১৯১৫-১৬
১৯১৬-১৭ } শ্রমপ্রতি—৪৷৷—৯৷৷ ছটাক।

১৯১৪-১৬
১৯১৮-১৯ } জনপ্রতি ৭ ছটাক।

দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান চাউল মজুত না থাকা সত্ত্বেও বিদেশে চাউল রপ্তানি হইতেছে। ইহা দুর্ম্মূল্যতার প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্টের হিসাবে ৫০০০০০০০ টন খাদ্যদ্রব্যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গবাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও বীজের জন্য ১৫০০০০০০ টন প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন বৎসরে ভারতবর্ষে ৫৫০০০০০০ টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় না। ১৯১৭-১৮ সালে ৬৩০০০০০০ টন গম, বার্লি, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি জন্মে। ১৯১৮-১৯ সালে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ ৪২৫ লক্ষ টন দাঁড়ায়।

চাউলের দুর্ম্মূল্যতা নিবারণ সম্বন্ধে কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে—

(১) যে পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া দেশের অভাব পরিপূরণের পর প্রকৃত প্রস্তাবে শস্য উদ্বৃত্ত না থাকে সেই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানি রহিত করা হউক।

(২) বঙ্গদেশে ফসল ভাল না হইলে বঙ্গদেশ হইতে ভারতবর্ষের অন্যত্র চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে হইবে।

(৩) চাউল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য শস্যের উপর খুব উচ্চহারে রপ্তানি-শুল্ক স্থাপন করা উচিত। ইহাতে এক দিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে অন্যদিকে তেমন রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস হইয়া অধিক পরিমাণে শস্য এদেশে মজুত থাকিবে।

(৪) জাহাজের ভাড়া হ্রাস ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে চাউল রপ্তানির সুযোগ দিতে হইবে।

(৫) ব্রহ্মদেশীয় চাউলের পাইকারী ও খুচরা দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই দরে বাজারে বিক্রয় করার জন্য ব্যবসায়িগণকে বাধ্য করিতে হইবে।

(৬) অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় ব্রহ্মদেশীয় চাউল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা উচিত।

(৭) ফসল জামিনে রাখিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহ যেন কৃষকদিগকে টাকা ধার দেয় তেমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণের অতিরিক্ত লাভের পন্থা রুদ্ধ করিতে হইবে।

(৮) চাউলের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি সিভিল সাপ্লাইয়ের ডিরেক্টরকে পরামর্শ দিবেন।

(৯) কয়েকটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ও কৃষিশিক্ষার প্রসার করিতে হইবে। ইহার ফলে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

(১০) অতিরিক্ত লাভের পথ বন্ধ করণার্থ একটি প্রফিটিয়ারিং আইন বিধিবদ্ধ করা কমিটি সঙ্গত মনে করেন।

(১১) সমুদয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্দিষ্ট করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া এডভাইসারী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন করিতে হইবে।

(১২) খাদ্য শস্যের কো-অপারেটিভ রিজার্ভ গোলা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

বস্ত্র।

বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা নিবারণ সম্বন্ধে কমিটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই—

(১) আদর্শ বস্ত্র বয়নের ব্যবসা করিতে হইবে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের স্বত্বাধিকারিগণকে শতকরা ২৫টি তাঁত আদর্শ বস্ত্র বয়নের জন্য রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য করিতে হইবে।

(২) বর্ত্তমান সময় বস্ত্রব্যবসায়িগণ যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহা দমনকল্পে আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। কমিটি বলেন যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণের এদেশে অতিরিক্ত লাভের পথ বন্ধ করার উপায় অবলম্বিত না হইবার কোন কারণ নাই।

(৩) কলিকাতা মিউনিসিপালিটির মধ্যে সাধারণতঃ গাঁইট হিসাবে কাপড় বিক্রয় প্রথা রহিত করিতে হইবে। গাঁইট হিসাবে কাপড় বিক্রয়ের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হইতে বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

(৪) নূতন নূতন কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। লাইট রেলওয়ে কোম্পানীসমূহকে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে লাভের একটা গ্যারেণ্টি দেন, কাপড়ের কলওয়ালাগণকেও তদ্রূপ লাভের [redacted] দিবেন।

(৫) জার্ম্মেন গবর্ণমেণ্ট বিট-চিনির শিল্পের প্রসারকল্পে যে [illegible] করিয়াছিলেন বস্ত্রশিল্পের প্রসারকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্টেরও তদ্রূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

(৬) হ্যাণ্ডলুম ও ফ্লাইশাট্‌লের দ্বারা জনসাধারণকে বস্ত্র-নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা প্রদান বিধেয়। তন্তুবায়গণের কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করিয়া বস্ত্রবয়নে তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৭) তন্তুবায়গণকে সূতা সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্যও প্রয়োজন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট লাভের একটা গ্যারেণ্টি দিবেন।

(৮) বৈদেশিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের উপর যে শুল্ক আছে তাহা এবং ভারতীয় ঐরূপ জিনিষের উপর যে আবকারী শুল্ক আছে তাহা রহিত করিতে হইবে।

চিনি, দুধ ও ঘি।

চিনি দুধ ও ঘি সম্বন্ধে কমিটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে দেশে চিনির কারখানা ও আকের চাষ যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গোবৎস হত্যা ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে গরু রপ্তানি বন্ধ করিতে হইবে। ১৯১৬-১৯ সাল পর্য্যন্ত তিনটি মিউনিসিপালিটিতে ১৪৩০০০ গোবৎস হত্যা করা হইয়াছে। মাড়োয়ারীগণ কাপড়ের ব্যবসায়ের ন্যায় ঘিয়ের ব্যবসায়ও একচেটিয়া করিয়াছে। তাহাও গবর্ণমেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।—জ্যোতিঃ

তারপর বস্ত্রের কথা। বস্ত্র-সমস্যা এখনও কঠোর সমস্যা হইয়াই রহিয়াছে।—

বস্ত্র-সঙ্কট—বহুদিন হইতে কাপড়ের দর অতিশয় দুর্ম্মূল্য থাকায় বস্ত্রাভাবে লোকের যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইতেছে। গত শারদীয় উৎসবের সময় কাপড়ের দর অতি সামান্য একটু মাত্র কমিয়াছিল; এখন আবার ক্রমে চড়িতেছে। এই শীতের দিনে এখন বস্ত্রাভাবে লোককে অতি কষ্টে দিন কাটাইতে হইতেছে। গরীব দুঃখী ব্যক্তিরা এখন বস্ত্রাভাবে শীত ও হিম ভোগ করিয়া বহুল পরিমাণে রোগগ্রস্ত হইতেছে।

দুর্ম্মূল্যতার কারণগুলির প্রতিকারের উপায় কতক আছে গবর্মেণ্টের হাতে, কতক আমাদের নিজেদেরই হাতে। বিদেশীপ্রধান গবর্মেণ্টকে বিদেশী প্রীতি ছাড়াইয়া স্বদেশ-প্রীতিতে আকৃষ্ট করিতে হইবে আমাদিগকেই ও নিজেদের যাহা আয়ত্তাধীন তার জন্যও আমাদেরই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের অভাব মোচনের জন্য নানাক্ষেত্রে অল্পস্বল্প চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা দেশের বিস্তৃতি ও অভাবের তুলনায় অত্যল্প। তবু এর জন্য যাঁরা চেষ্টা করিতেছেন তাঁরা ধন্যবাদভাজন ও তাঁদের দৃষ্টান্ত দেশের অনুকরণীয়।

বিদ্যালয় স্থাপন—চট্টগ্রাম জিলার গাছবাড়ীয়া গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতা ও চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুত [redacted]রায় মহাশয় পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন, এবং [redacted]শস্বী কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয় দুই হাজার [redacted]য় বিদ্যালয়ের উপযোগী আর-একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ও তদীয় সহযোগী শিক্ষকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় কৃষকবালকগণ অতীব উৎসাহের সহিত তথায় যোগদান করিয়াছে। সম্প্রতি নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য ডিষ্টিক্‌ট্‌বোর্ড হইতে কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়ের শাখারূপে একটি সুপরিচালিত বয়ন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

শ্রীজনজমোহন চক্রবর্ত্তী, বি এ
গাছবাড়ীয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক;
গাছবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম।

রোগীনিবাস—বঙ্গদেশের সহস্র সহস্র লোক চিকিৎসার অভাবে নানা ব্যাধিতে অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় ব্যথিত হইয়া চূড়ামণ ষ্টেটের যুবক জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মাতা রাণী দুর্গামণি চৌধুরাণীর নামে ১৮টি রোগী থাকিবার উপযোগী একটি রোগী-নিবাস দিনাজপুর জেলার দুর্গাপুর গ্রামে স্থাপন করিয়াছেন। চূড়ামণ ষ্টেট্ বঙ্গে ইংরেজ অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত এবং বংশপরম্পরায় এই ষ্টেটের জমিদারগণ বিবিধ জনহিতকর কার্য্য দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছেন। এই ষ্টেট্ হইতে হাইস্কুল, উচ্চ প্রাইমারী স্কুল, বিনা বেতনে নিম্ন প্রাইমারী স্কুল, ডাক্তারখানা, ইন্দারা খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, পুরীতে সমুদ্রধারে পান্থশালা, দার্জ্জিলিং লাউইস্ স্যানিটোরিয়াম নামক স্বাস্থ্যনিবাসে দুইটি ক্রি বেড প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য দ্বারা দেশের প্রভূত স্থায়ী কল্যাণ সাধন করা হইয়াছে। —শ্রীবিধুভূষণ বসু।

২২ হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীপুষ্কর-যাত্রীনিবাস—আপনারা সকলেই অবগত আছেন হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীপুষ্করবাজ আজমীর বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। অশ্বযানে যাইতে হয়, পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পথ, দুর্গম না হইলেও নিতান্ত সুগমও নহে। আজমীর ষ্টেশনে কিম্বা তাহার সন্নিকটে বঙ্গদেশীয় তীর্থযাত্রীগণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের সুবিধার জন্য বিশেষ কোন প্রকার বিশ্রামাগারের বন্দোবস্ত নাই। এই কষ্ট ও অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আজমীরস্থ সদাশয় বাঙ্গালী মহোদয়গণ তীর্থযাত্রী বাঙ্গালীদিগের এবং পরিব্রাজক বাঙ্গালী সাধুসন্ন্যাসীদিগের অবস্থানের জন্য ষ্টেশনের সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানে একটি যাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই যাত্রীনিবাসে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী নিয়মমত বাঙ্গালী যাত্রীগণের সুবিধার, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বাসের জন্য সকল বন্দোবস্ত করা হইবে।

এই সদুদ্দেশ্যে আজমীর ষ্টেশনের অতি সন্নিকট সদর রাস্তার উপর একটি প্রশস্ত ভূমিখণ্ড সম্প্রতি ক্রয় করা হইয়াছে। স্থানীয় বাঙ্গালীগণের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহারা ধনশালী নহেন। সুতরাং বিদেশে বাঙ্গালীদিগের এই পুণ্যকীর্ত্তি রক্ষা করিতে এবং এই প্রস্তাবিত সদনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করিতে সমগ্র বঙ্গবাসীর সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রয়োজন। এইজন্য দেশস্থ ও বিদেশস্থ ধর্ম্মপ্রাণ এবং স্বজাতি-হিতৈষী বাঙ্গালী মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই, যে, তাঁহারা হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতীর্থদর্শনাভিলাষী বাঙ্গালী যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য এই সদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

এই সদনুষ্ঠানকর্ম্মে যিনি যেরূপ অর্থ সাহায্য করিবেন তাহা যত সামান্যই হউক না কেন সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে এবং জ্ঞাতৃগণের নাম সাময়িক বাঙ্গলা পত্রেও প্রকাশিত হইবে। অর্থ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ঠিকানা—
শ্রীহরিদাস গোস্বামী, কোষাধ্যক্ষ,
শ্রীপুষ্কর যাত্রীনিবাস,
আজমীর (রাজপুতানা)।

ঢাকায় জাতীয় মাদ্রাছা—ঢাকায় খেলাফত কমিটীর উদ্যোগে এবং মওলানা আবুল কালেম আজাদের নেতৃত্বে গত ৫ই নভেম্বর তারিখে জাতীয় মাদ্রাছা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে-সকল ছাত্র এই মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা খেলাফৎ কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করুন।—মোহাম্মদী।

গতকল্য নওয়াদাতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় স্কুলের অর্দ্ধেক ছাত্র উহাতে যোগদান করিয়াছে।—নবযুগ।

জাতীয় মাদ্রাছা।—গত ৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতার নাখোদা মছ্‌জেদে জাতীয় মাদ্রাছার প্রতিষ্ঠা উৎসব নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অ-সহযোগিতা আন্দোলনের আরম্ভ-কাল হইতে যে শুভ অনুষ্ঠানের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল গত শুক্রবারে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

—মোহাম্মদী।

নৈশ বিদ্যালয়।—ত্রিপুরা জেলার বাতিসা গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা ৪০ জনেরও

অধিক। ইহা ছাড়া এই গ্রামে দুইটি প্রাইমারী বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহানুভূতি আছে।—সম্মিলনী।

ইসলামাবাদ বয়ন-বিদ্যালয় ও কারখানা।—পেন্সেনপ্রাপ্ত পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর মৌলা বাহাতআলী, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি-বর্গের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সহরে আলিমামুর ঘাট রোডে "ইসলামাবাদ বয়ন-বিদ্যালয় ও কারখানা" নামে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় প্রস্তুত তোয়ালে ও চাদর আমরা দেখিয়াছি। এই-সমুদয় জিনিষ বিলাতী জিনিষ হইতে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নহে। আপাততঃ কানপুরের সুতা ও দেশী চরকার কাটা সুতা ব্যবহার করা হইতেছে। তাঁহারা আশা করেন, সত্বরই তাঁহারা সমুদয় জিনিষ দেশীয় চরকার সুতায় প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। সম্প্রতি তিনটি ফ্লাইশাট্‌ল্ ও একটি হ্যাণ্ড্‌লুমে কাজ চলিতেছে। আরও কয়েকটি ফ্লাইশাট্‌ল্ আনাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ঘরে সুতা কাটিয়া এই কারখানায় উপস্থিত করিলে উচিত মূল্যে তাহা গ্রহণ করা হইবে। আমরা কারখানা ও তৎসংশ্লিষ্ট বয়ন-বিদ্যালয়ের উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনা করি।—জ্যোতিঃ ও ঢাকা গেজেট।

চেরাপুঞ্জীতে তত্ত্ববিদ্যা কলেজ—ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষাদানের নিমিত্ত চেরাপুঞ্জীতে এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২০ জন খাসিয়া প্রচার কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় খাসিয়া পাহাড়ে পাঁচ শতের অধিক নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।—জনশক্তি।

সদনুষ্ঠান।— ভবানীপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমাদপুর গ্রামে "মহেন্দ্র চতুষ্পাঠী" নামে একটি টোল স্থাপিত করিয়াছেন। কাব্য বেদান্ত ও তর্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র-মোহন তর্কতীর্থ মহাশয় ঐ স্থানে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রগণের আহার বাসস্থান এবং যোগ্যতানুসারে অতিরিক্তও সুব্যবস্থা আছে। ইচ্ছানুসারে ছাত্রগণ ডাক্তার-বাবুর প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদও পড়িতে পারিবেন। এখনও কয়েকটি বৃত্তি খালি আছে। ব্যাকরণে বুৎপন্ন ও ন্যায়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের আবেদন সমাদরে গৃহীত হইবে। দেবেন্দ্র-বাবুর এই সৎকীর্ত্তি শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের অনুকরণ-যোগ্য। ছাত্রগণ কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ১৫ নং পদ্মপুকুর রোডে ডাক্তার বাবুর নিকট এবং তৎপরে চতুষ্পাঠীর ঠিকানায় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।—এডুকেশন গেজেট।

মেথর শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন।—সম্প্রতি গোয়াড়ী সহরে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী, বার-আট-ল মহোদয়ের ভবনে অন্ত্যজ জাতি অর্থাৎ মেথরদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ অনুকরণে গোয়াড়ীতেই শ্রমজীবী কোচম্যান মজুর প্রভৃতির অধ্যয়ন জন্য আর-একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বড় সুখের বিষয়।—বঙ্গরত্ন।

ভবানীপুর "গদাধর আশ্রম"।—কলিকাতা ভবানীপুরের ভূতপূর্ব্ব স্বনামধন্য চিকিৎসক রায় ৺ যাদবচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের পুত্র মনুরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয় একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া স্বীয় আবাস ও গৃহসজ্জাদি লোকহিতার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। বিগত ৭ই নভেম্বর তারিখে বেলুড় মঠ হইতে শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ স্বামী ও তাঁহার সহচরগণ ভবানীপুরে গমন পূর্ব্বক যোগেশ-বাবুর বাটীতে রামকৃষ্ণ দেবের পূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া যোগেশ-বাবুর ভবনে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর এই আশ্রম "গদাধর আশ্রম" নামে পরিচিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা পরিচালিত হইবে। যোগেশ-বাবু পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করিয়া অথবা জ্ঞাতিগণকে বিষয় সম্পত্তি প্রদান না করিয়া লোকহিতার্থ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করাতে অসাধারণ ঔদার্য্য ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই।—সম্মিলনী।

সদনুষ্ঠান।—বরিশাল-মেহেন্দিগঞ্জ থানার অধীন গোবিন্দপুর-গ্রাম নিবাসী, ভোলার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এল ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার, বি-এ, বি-টী, প্রমুখ কতিপয় যুবক ৫।৬ মাস অবধি গোবিন্দপুর গ্রামে একটি "দরিদ্রনারায়ণ-সেবাভাণ্ডার" স্থাপন করিয়াছেন। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও প্রত্যহ উঁহাদের দলস্থ যে কোনো একটি যুবক একটি "ভিক্ষা ঝুলি" হস্তে ভবানীগঞ্জ লাইনের দাদপুর ষ্টিমার ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা সংগ্রহ করেন। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে এই অল্প সময়ের মধ্যেই উঁহারা অনেক দীনদুঃখীর অন্নবস্ত্র দানে আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন।—

ঢাকা গেজেট; ও কাশীপুর-নিবাসী।

দরিদ্রে দান।—মুকুন্দপুর থানার অন্তর্গত খান্দারপাড় গ্রামে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন ও স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন মহাশয়দ্বয়ের সুযোগ্য বংশধরগণ খান্দারপাড় ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষগণকে গত শারদীয় পূজার নবমীর দিনে ২০ মণ চাউল ও ২৩২ খানা নূতন বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। দাতাগণের এই সদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত সময়ে দান বিশেষ প্রশংসনীয়। শুনা যায় এই জিলার আরও ২।১টি স্থানে এইরূপ দানশীল ব্যক্তি অন্ন বস্ত্র ও অর্থ দান করা হইয়াছে। কোথাও বা চারি পাঁচ হাজার লোককে এক বেলা পেট ভরিয়া আহার করান হইয়াছে।

এইসকল দানশীল ব্যক্তিবর্গকে দীর্ঘজীবী করুন।—কল্যাণী।

দান।—কাঙ্গনগোরপাড়া গ্রামবাসী শ্রীযুত কিশোরচন্দ্র দত্ত উক্ত গ্রামে একটি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠার্থ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—জ্যোতিঃ।

মেদিনীপুর রিলিফ ফণ্ড।—গত ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত মেদিনীপুর রিলিফ ফণ্ডে মোট ১,৩৮,৭০৫৷৶৮ সংগৃহীত হইয়াছে।

—মোসলেম হিতৈষী।

আপনারা বোধ হয় কাঁথি 'নীহার' পত্রিকায় রামনগর ও এগরা থানার পাঁঠ অঞ্চলের বন্যা-পীড়িত অত্যন্ত নর-নারীর অবস্থা পাঠ করিয়াছেন। এই অঞ্চল প্রতি বৎসর বন্যার জলে ও অতিবৃষ্টির ফলে বার্ষিক অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হয়। তদুপরি বস্ত্রাভাব, শিক্ষাভাব ও রোগের প্রাচুর্য্য ত আছেই। সম্প্রতি এই অঞ্চলে আমরা একটি সেবাশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। আমরা এ-জন্য উপযুক্ত স্থানে সেবাশ্রমের উপযোগী একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যিনি বা যাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন, দয়া করিয়া তাঁহার ঠিকানা আমাদিগকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব। ইহাই আমাদের কাতর অনুরোধ।

ভবানীচরণ পাহাড়ী।
পোঃ—বাসুদেবপুর,
গ্রাম গড় চিরুলিয়া,
মেদিনীপুর।

অনুকরণীয় বটে—বঙ্গযোগিনী বিক্রমপুরের অন্তর্গত একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কতিপয় উদ্যমশীল যুবকের চেষ্টায় "বঙ্গযোগিনী জনসাধারণ সভা" নামে তথায় একটি জনহিত

কারী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য—জনসমাজ, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে গ্রামের উন্নতি বিধান। গ্রামে-গ্রামে এরূপ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় ও অনুকরণীয় বটে।—ঢাকা-গেজেট।

সদনুষ্ঠান—বিক্রমপুর-ভাগ্যকুল ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কামারসী গ্রামে স্থানীয় উদ্যমশীল যুবকগণের চেষ্টায় একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মালোচনার সহিত লোকসেবাও এই সভার সভ্যগণের উদ্দেশ্য। গত ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে দরিদ্রগণের সাহায্যকল্পে ৭ সাত মণ চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। একান্ত দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—ঢাকা-গেজেট।

ব্রাহ্মণডাঙ্গা দাতব্য-চিকিৎসালয়—সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে, ব্রাহ্মণ-ডাঙ্গা গ্রামে, একটি আউটডোর দাতব্য ডাক্তারখানা স্থাপিত হইতেছে।

—কল্যাণী।

খৃষ্টানদিগের দাতব্য-চিকিৎসালয়—নদীয়া জেলার নানাস্থানে ভ্রমণকালে খৃষ্টান মিশনারীগণের হাসপাতালের কার্য্যকলাপের কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। সুদূর মফঃস্বলের নানাস্থানে খৃষ্টান মিশনারীগণের এইসকল হাসপাতাল দ্বারায় সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। শিকারপুরের রেভারেণ্ড ডিস্‌বেরী সাহেব আমাদিগকে বলিয়াছেন—আমি যেদিন ঐ অঞ্চলে ছিলাম তার একদিনেই ১৭৪টি রোগীর চিকিৎসা শিকারপুরের মিশনারীর হাস-পাতালে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা বড় সহজ ব্যাপার নয়। রেভারেণ্ড ডিস্‌বেরী সাহেব প্রমুখ যাঁহাদের উদ্যোগে এই-সকল হাসপাতাল পরিচালিত হইতেছে আমরা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।—রায়ত।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। আমাদের ধন—ধান্য যব প্রভৃতি শস্য। আমাদের শস্যহানি ঘটিলেই আমরা অনাহারক্লিষ্ট ও কাজে কাজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি। আমাদের মুখের গ্রাস নষ্ট হয় নানা রকমে। খাদ্য শস্য প্রতিবৎসর বিদেশে রপ্তানি হয় প্রচুর—

চাউল রপ্তানি।—কলিকাতায় কষ্টম বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে বেরীন দ্বীপপুঞ্জ, মল্কট, ডোবাই, মেকরান উপকূল, কোহট ও বসেরা ব্যতীত অন্যত্র ১০০০০ টন চাউল রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হইবে। রপ্তানিকারকগণকে প্রতি দুই হাণ্ড্রেড্‌ওয়েট ওজনের বস্তায় ৫।০ টাকা করিয়া প্রিমিয়াম দিতে হইতে।—জ্যোতিঃ।

সংস্কৃতে কৃষির ক্ষতিকারক ছয়টি ব্যাপারকে ঈতি বলে—

অতিবৃষ্টির্ অনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

এইসব ঈতির প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইয়া শেষ করিবে।—

ইন্দুর দ্বারা ক্ষতি—ইন্দুরের অত্যাচার আমরা কম বেশী সকলেই সহ্য করি। কিন্তু এই ইন্দুর যে আমাদের কি পরিমাণে সর্ব্বনাশ করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই কোন ধারণা নাই। সম্প্রতি "টাইম্‌স্" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ভারতের দারিদ্র্যের জন্য এই ইন্দুরেরা কতদূর দায়ী, তাহা এই হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে। ইন্দুরের মোট সংখ্যা—৮০,০০,০০,০০০। প্রত্যেকটি ইন্দুর বৎসরে ৩ সের করিয়া শস্য হজম করে। ইহা ছাড়া ক্ষতিও করে প্রচুর। তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের বাৎসরিক মূল্য ১৫ কোটি টাকা, এবং তাহারা যে ক্ষতি করে তাহার দাম ৩০ কোটি টাকা। গত বিশ বৎসরে ইন্দুর ভারতের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহারা যে রোগ বিস্তার করে তাহার দ্বারা যত লোক মরিয়াছে এবং যত লোক অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ ৬০৩ কোটি, শস্য প্রভৃতির ক্ষতি ৬০০ কোটি, প্লেগের প্রতিকার প্রভৃতির জন্য ব্যয় ৩৯।০ কোটি—মোট ১,২৪২।০ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে ঋণ ছিল ইন্দুরের জন্য এদেশে যে অপচয় তাহা সেই ঋণের পাঁচগুণ এবং যে আয় ছিল তাহার সাত গুণ।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

মূষিক ও মূষিকধর্ম্মী বিদেশীদের কবল হইতে নিজেদের মুখের গ্রাস রক্ষা করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পব্যয়-সাধ্য কৃষির কাজে আমাদিগকে হাত দিতে হইবে।

এখনও বঙ্গদেশে উপযুক্ত পরিমাণ লঙ্কার চাষ হইতেছে না। বঙ্গের বহু জেলার লোক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধানের চাষ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে। বহু ধান্য-ক্ষেত্র লঙ্কা চাষের উপযোগী। অন্ন-ক্লিষ্ট বঙ্গবাসী বহু লক্ষ বিঘা জমিকে দোফসলী করিয়া বিপুল লঙ্কার চাষ করিতে পারে। লঙ্কা চাষে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত।

—মোহাম্মদী।

কৃষির সাহায্য করে ও পুষ্টিকর সুখাদ্য জোগায় আমাদের গোধন। ইহাদের রক্ষা পালন ও পুষ্টি উন্নতির চেষ্টা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থবুদ্ধি হইতেই করা উচিত।

গোবৎস ও গো-হত্যা বন্ধ।—বোম্বাই হবলী মিউনিসিপালিটী দুগ্ধবতী গাভী এবং বৎস হত্যা বন্ধ করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট।

গোহত্যা বন্ধ—পঞ্জাব লাহোর মিউনিসিপালিটি সহরে দুগ্ধবতী গাভী এবং বৎস হত্যা বন্ধ হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাব মঞ্জুরীর জন্য পাঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি হইতেও এইরূপ ব্যবস্থা করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তিনি হিন্দুমুসলমান সকলের ধন্যবাদভাজন।

দেশের লোকের কেবল বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করিলেই চলিবে না; সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—সকল বিষয়েরই উন্নতি করিতে হইবে। নতুবা দেশ কখনো অগ্রসর বলশালী জাতিদের দেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। আমাদের সামাজিক নিয়মে ত্রুটি ও সঙ্কীর্ণতা আছে বলিয়াই এক সমাজ ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লোকে অপর সমাজ ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।—

এছলাম গ্রহণ—ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামনিবাসী শ্রীরমণী-মোহন দত্তের ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত জলপাইগুড়ি জেলার নাথোরা হাট ডাকঘরের অধীন আবদুল গফুর মিঞা নামক একজন চা-বাগানের ম্যানেজারের নেকাহ দেওয়া হইয়াছে। তাহার মোছলমানী নাম রাখা হইয়াছে—আখিউন্‌নেছা।

মৌরনদী থানার অন্তর্গত কলাপাড়া নিবাসী দুর্গাচরণ দাস নামক জনৈক কায়স্থ স্বজাতির ভয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া মেহেন্দিগঞ্জ পোতারহাট মছ্‌জিদের ইমাম মুন্‌শী আব্‌দুল হাফেজ ছাহেবের হস্তে স্বেচ্ছায় সনাতন এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া লস্করপুর ফজ্‌লুল করিম চৌধুরী ছাহেবের বাড়ী থাকিয়া কলেমা নমাজ ইত্যাদি শিক্ষা করিতেছেন। নবদীক্ষিত ভ্রাতার নাম রাখা হইয়াছে আব্‌দুল্লহ্‌। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এছলামে কায়েম রাখুন।

বিগত ২২শে আশ্বিন শুক্রবার দিনাজপুর জেলার রাণীর বন্দর বারবিষা গ্রামে মছ্‌জিদে জুমার নমাজান্তে সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক জনাব মাওলানা মনীরউদ্দীন আন্‌ওয়ারী ছাহেবের হস্তে মৃগনয়নী দাসী নাম্নী জনৈকা হিন্দু-মহিলা স্বেচ্ছায় পবিত্র এছলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছে। তাহার এছলামী নাম মরিয়ম খাতুন রাখা হইয়াছে। এতদঞ্চলের পীর মাওলানা আবদুল করীম ছাহেব মুঃ মিরউদ্দীন সরকার নামক জনৈক যুবকের সহিত তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই নবদীক্ষিতা ভগিনীর এছলামে স্থায়িত্ব এবং সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিতেছি।—আল্‌-এছ্‌লাম্‌।

আমাদের ধর্ম্মের আর-এক ত্রুটি—তাহা অন্য ধর্ম্মের লোককে অন্তর্ভুক্ত করিতে বিমুখ। এই সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিতে হইবে। এ-বিষয়ে আমাদের মধ্যে যে ঔদার্য্য জাগিতেছে তাহা বড়ই আনন্দের সংবাদ।—

"হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্কমোচন"। দক্ষিণভারতে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রদেশ, তামিল ও কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশসমূহে পঞ্চম ও থিয়াদিগের দুর্দ্দশা ভীষণ। এ উত্তর ভারতের অস্পৃশ্যতা নহে—স্পর্শেতেই দোষ, কিন্তু সেখানে এ দোষ এত মারাত্মক যে বেচারাদিগকে কিছু দূরেই থাকিতে হইবে, কণামাত্র ব্যতিক্রমে "দোষ" অঙ্গব্যাপিয়া সঞ্চারিত হইয়া যায়। মানুষে মানুষ এতটা পার্থক্য অন্য কোন সমাজে নাই, কেবল হিন্দুসমাজেই বর্ত্তমান। দক্ষিণভারতে হিন্দুপ্রাধান্য অধিকদিন বর্ত্তমান থাকায় ঐ স্থানে উহা আরও দৃষ্টিকটু, আরও বীভৎস। সেইজন্য মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তি অতি দুঃখে লিখিয়াছেন সামাজিক উন্নতির জন্য যদি ধর্ম্ম ত্যাগকে সমর্থন করা যায়, তাহা হইলে তিনি পঞ্চমদিগকে নিঃসঙ্কোচে ধর্ম্মত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বাহিরের সুবিধা অসুবিধায় ধর্ম্মত্যাগ, সমর্থনযোগ্য নহে। তা বলিয়া পঞ্চমদিগের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গস্বরূপ হইলে, তাঁহার মতে যাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী হইয়া ধর্ম্মের নামে যে কোন পাপের প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের আবশ্যক অঙ্গস্বরূপ নহে, উহা সমাজ-শরীরের একটা অস্বাভাবিক বৃদ্ধিমাত্র। অতএব প্রবল চেষ্টায় উহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। এক্ষণে একদল হিন্দু ধর্ম্মসংস্কারক হিন্দুধর্ম্মের এই কলঙ্ক মোচন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। অতএব কাহাকেও আর ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না।

—"নবসঙ্ঘ"।

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে বোম্বে হিন্দুমিশনারী সমিতির চেষ্টার ফলে ২৬ জন খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকারী হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ ফিরিয়া আসিয়াছে।

—যশোহর।

দুঃখের বিষয় জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ই সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে পারে নাই। এর একটি চমৎকার চিত্র আছে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্ত্তন গল্পে; যে গল্পের নাম শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিতে চাহেন—ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর! এক সমাজ ত্যাগ করিলেই যে অন্য সমাজে সম্মান লাভ ঘটিবে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। এর দৃষ্টান্ত—

খৃষ্টানদিগের মধ্যে জাতিভেদ।—ত্রিচিনাপল্লীতে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের কোন এক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি অনেক খৃষ্টান সমবেত হয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বহু "পঞ্চম"ও এই উৎসবে যোগ দিয়াছিল। উচ্চ শ্রেণীর খৃষ্টানদের জন্য নির্দ্ধারিত আসনে কয়েকটি "পঞ্চম" জাতীয় খৃষ্টান বালিকা বসিতে যাইয়া নিরতিশয় লাঞ্ছনা ভোগ করে। এই কারণে তত্রত্য খৃষ্টধর্ম্মী পঞ্চমেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া স্বতন্ত্র এক সভা করিয়া এই মন্তব্য পাশ করিয়াছে যে যতদিন না জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া হয় ততদিন তাহারা গীর্জ্জাঘরে প্রবেশ করিবে না। এই বিভ্রাটে ৪ জন পুরুষ, ২ জন নারী, ১ জন বালক সোজাসুজি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।—সম্মিলনী।

স্বসমাজের সঙ্কীর্ণতার অত্যাচার ও অবিচারে উত্যক্ত হইয়া স্বসমাজ ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরসমাজ ও পরধর্ম্ম অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নয়; তাহাতে অত্যাচারীদের চৈতন্য হয় না, অত্যাচারের প্রতিকার হয় না। অত্যাচরিতদের কর্ত্তব্য অত্যাচারীদের বাধা দিয়া নিজে মনুষ্যত্বের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার দৃঢ় চেষ্টা করা। এ সম্বন্ধে বঙ্গের নমঃশূদ্র জাতির উদ্যম প্রশংসার ও অণুকরণের যোগ্য।—

নমঃশূদ্র জাতির আকাঙ্ক্ষা—খুলনার এলাকায় উচ্চশিক্ষিত অনেক নমঃশূদ্র-সন্তান আছেন তাঁহারা উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া জাতির নাম বদ্‌লাইতে অভিলাষ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাব শুনিবেন কি না, ভগবান জানেন। ৺পূজার পূর্ব্বে খুলনায় কনফারেন্স হলে তাঁহাদের একটা সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় উঁহারা একটি মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আগামী লোক-গণনার সময়ে তাঁহারা 'নমঃশূদ্র' জাতির পরিবর্ত্তে "আর্য্য ব্রাহ্মণ" বা "ব্রাহ্মণ সন্তান" বলিয়া জাতি লিখাইতে গভর্ণমেণ্টকে আবেদন করিবেন, বরিশালের নমঃশূদ্র সমাজ অবশ্য তাঁহাদের সঙ্গে এক যোগ্য কার্য্য করিবেন।—কাশিপুর-নিবাসী।

ঔদার্য্য ও সর্ব্বজনপ্রীতি ধর্ম্মের ভিতরকার বড় কথা। সকল ধর্ম্মেরই ইহা লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেমন এক ধর্ম্মের সমাজে উচ্চ নীচে ভেদ সমাজের অকল্যাণকর, তেমনি এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে বিদ্বেষ দেশের পক্ষে অশুভজনক। সকল ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা এক অদ্বিতীয়, ধর্ম্ম মূলে এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত; কেবল দেশ ও কাল

ভেদে ধর্ম্মের যাহা বাহিরের খোলস সেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতির বিভিন্নতা ঘটে। কিন্তু উদার সত্যদর্শী হইলে এই বিভিন্নতার আভ্যন্তরীণ ঐক্য দেখা সহজসাধ্য হয়। সে বৎসর পাঞ্জাবের হাঙ্গামায় হিন্দু মুসলমানের মহা-মিলন ঘটিয়াছিল। আজ আনন্দের সহিত সেই জাতীয় একটি মিলনের সংবাদ আমরা দিতেছি।—

একসঙ্গে পুরাণ ও কোরাণের পূজা।—সম্প্রতি সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুরা নামক স্থানে হিন্দুর পুরাণ ও মুসলমানদের কোরাণ একখানা পালঙ্কের উপর পাশাপাশি স্থাপিত হইয়া পূজিত হইয়াছে। হিন্দু পণ্ডিতগণ ও মুসলমান মৌলবীগণ ঐ পালঙ্ক কাঁধে করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন এবং বহু-হিন্দু-মুসলমান-সমন্বিত এক বিরাট শোভাযাত্রা উহার অনুগমন করিয়াছিল। এবার দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষে অনেক মুসলমান তাঁহাদের গৃহ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত সমেদের বাড়ীর সাজসজ্জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত সমেদ তাঁহার প্রজাগণকেও তাহাদের দোকান আলোকমালায় সজ্জিত করিতে বলিয়াছিলেন।—সম্মিলনী।

বৈদিক ঐক্যমন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানকে আহ্বান করিয়া বলি—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্—তোমরা সকলে এক পথে চলো, এক কথা বলো, তোমাদের সকলকার মন এক বলিয়া জানো!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

বিলাতযাত্রীর পত্র

হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেচি। কাছে থেকে তোমাদের যে সান্ত্বনা করতে পারতুম এত দূর থেকে তা আর সম্ভব হয় না। তোমাদের চিঠি আসতে এবং আমার উত্তর পৌঁছতে যে দীর্ঘ সময় যাবে সেই সময়ই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি তোমাদের শুশ্রূষা করবে। জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে—আমরা যা ভাবি আর যা বলি তার মধ্যে অন্ধকার থেকে যায়, কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে, আমরা ভাগ করে দেখি। ঘরের মধ্যে আমরা আলো জ্বালি, কেননা তখনকার মত ঘরের মধ্যেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু সেই আলো জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোট ঘর আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন সেও সেই আলোকিত ছোট ঘরের মত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংহত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলাস্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই—আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশত অংশমাত্রকে একান্ত করে জানচি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জ্বলচে কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অথণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েচে—এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে আলোতেও তার মা আছে অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মত—আমরা বৃথা ভয়ে কাঁদি, জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে সত্যকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্ত্তিকে দেখ, সে মূর্ত্তি আনন্দ-মূর্ত্তি। চারিদিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করচে; বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ-রূপ কি কখনই টিঁকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো সত্য না থাকত? রাত্রে আমরা ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয় জানা আছে যে, সে নিভলেও সূর্য্য কখনো নিভবেনা। বিশ্বের মধ্যে মহাপ্রাণই হচ্চে অনির্ব্বাণ সত্য, সেইজন্যেই ক্ষুদ্রপ্রাণ নিভলেও ভাবনা নেই। যা ও যা হাঁ তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখচি, সেই হাঁ-কেই বিশ্বাস কর, না-কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস কর, কুয়াসাকে না। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয়বাণী ঘোষণা করচে,—মৃত্যু কোনোমতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারচে না। মেঘ বারেবারে এসে সূর্য্যকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্চে কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারেছ না। মৃত্যু তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্চে কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করতে পারবেনা। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা কর, মৃত্যুকে না। যাকে ভাল বেসেচ, যাকে সত্য বলে জেনেচ, সে মৃত্যুতেও সত্যই আছে—এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর। ইতি ২৭ আশ্বিন, ১৩২৭।

(শান্তিনিকেতন, অগ্রহায়ণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ম্যালেরিয়া এবং তাহার প্রতিকার

ম্যালেরিয়া শব্দটি ইটালিয়ান; অর্থ দূষিত বায়ু, পূতিগন্ধময় বাষ্প। ম্যালেরিয়া বিষ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুসংখ্যা ৯২৫৫৪৬ এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১০৬১০৪১। প্রতি বৎসরে যদি মৃত্যুসংখ্যা এই হারে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বঙ্গের এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানের দশা কি ভয়াবহ, শোচনীয় হইবে, তাহার ধারণা করা সুকঠিন।

ম্যালেরিয়া-বিষের সম্বন্ধে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে এবং এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে।

ম্যালেরিয়া কোন্ কোন্ জায়গায় বহু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।—

(১) পচা খানা, ডোবা এবং বিল, (২) পুকুর হইতে জল নির্গত হইয়া শুষ্ক হইলে, (৩) শুষ্ক ঘাস, খড়, জঙ্গলপূর্ণ স্থান বর্ষায় জলপ্লাবিত হইলে, (৪) যে পর্ব্বতে প্রস্তর-সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত তদভ্যন্তর উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ হইলে, (৫) কোন ভূমি নূতন কর্ষিত

হইবার সময়, (৬) প্রস্তর ও বালুকাময় স্থান উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থে পূর্ণ থাকিলে, (৭) এবং বর্ত্তমান প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যে স্থানে মশকের গতিবিধি অত্যন্ত বেশী।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল, ম্যালেরিয়াক্রান্ত জল-বায়ুই ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু গবেষণার ফলে সুস্থির করিয়াছেন যে, এই মত ভ্রমাত্মক এবং এক প্রকার জীবাণুই ম্যালেরিয়ার উৎপাদক।

নানা পরীক্ষার পর স্যর্ রোনাল্ড ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, জীবাণুই ম্যালেরিয়ার হেতু। এই জীবাণু প্রথমতঃ অ্যানোফেলিস জাতীয় মশককুলকে এবং কিউলেক্স জাতীয় অপর মশককুলকে আক্রান্ত করে। পরে প্রথম জাতীয় মশককুল মানব-দেহ দংশন করিয়া এবং দ্বিতীয় প্রকার মশককুল পক্ষীদেহ দংশন করিয়া ম্যালেরিয়া-বিষ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে। শৈশবে ইহারা জলচর কৃষ্ণবর্ণ পোকা, বড় বড় পিলের ন্যায় দেখিতে, পরে বড় হইলে ইহারা চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ায়। এই ম্যালেরিয়া-বিষ আমরা নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি।

অনেকে অনেক ভাবে ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা সাধারণের জ্ঞাত থাকা বিধেয়।

(১) ম্যালেরিয়া-বিষে পূর্ণ জলাশয় প্রভৃতিতে বাসক পাতা নিক্ষেপ করিলে মশকের ডিম্ব নষ্ট হইয়া যায়, অথচ জল নষ্ট হয় না।

(২) ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের কাষ্ঠ ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট করে। এই বৃক্ষের তৈলের ঘ্রাণ লইতে অনেক চিকিৎসক পরামর্শ দেন।

(৩) হংস মশক-ডিম্ব খায়। কাজেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশে হংস-পালন ম্যালেরিয়ার হাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাওয়ার কারণ, সন্দেহ নাই।

(৪) অনেকের মতে ম্যালেরিয়ায় দেশে উচ্চ খাটে মশারি খাটাইয়া শয়ন করা বিধেয়। তাঁহাদের ধারণা ম্যালেরিয়া-বিষ মশারির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

(৫) কুইনাইন সেবন করিলে ম্যালেরিয়া কীটাণু মরিয়া যায়।

(৬) ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশে সুপ্রশস্ত খাদ বহু পরিমাণে কাটিলে ম্যালেরিয়া-মুক্ত হওয়া যায়। গভীর জলাশয় এবং বেগবতী স্রোতস্বতী ম্যালেরিয়া-নিবারক।

ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানের জল প্রায়ই দূষিত। এই জল প্রত্যহ সুসিদ্ধ করিয়া সেবন বিধেয়। পরে এই জল রুচি অনুসারে উষ্ণ ও শীতল ভাবে পান করা যাইতে পারে; এবং যাহাদের পক্ষে সম্ভব, এই সুসিদ্ধ জল ফিল্টার করিয়া পান করা অতি সঙ্গত। বাড়ীর চারিপাশে যে ডোবা নালা বিদ্যমান, তাহা বন্ধ করাই কর্ত্তব্য। যদি সেগুলি রাখার বিশেষ কোন আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে যথাসাধ্য সে-গুলি পরিষ্কৃত রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে তথায় পলিত উদ্ভিদ্ সঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাড়ীর চারি পাশের জঙ্গল পরিষ্কৃত রাখা বিধেয়। আবদ্ধ জল কোথাও না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে প্রাতঃকালীন এবং সন্ধ্যা-শিশির অত্যন্ত অনিষ্টকর। যাহাতে কেহ সে সময়ে শিশিরে বাহির না হয়, সে বিষয়ে অভিভাবকের দৃষ্টি রাখা বিধেয়। ম্যালেরিয়া-দুষ্ট স্থানে দিবা-নিদ্রা অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা সহজসাধ্য। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত পরিমাণে অন্যান্য উপায়গুলিও সাধ্যানুসারে অবলম্বনীয়।

কেবল কুইনাইনের সেবক না হইয়া, ম্যালেরিয়া-কীটাণুর বাসস্থান দূরীকরণে সচেষ্ট হইবেন। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

(স্বাস্থ্য-সমাচার, অগ্রহায়ণ) শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি-এ।

ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

Fever (malarial) is a euphemism for insufficient food, scanty clothing and unfit dwelling.

সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর ১১৩•••••• লোক এক ম্যালেরিয়া-জ্বরে শমন-ভবনে গমন করে।

মহামারী (Plague) যখন এদেশে অতি প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তখনও উহাতে মৃত্যুর হার এত অধিক হয় নাই। কলের', আমাশয় ও উদরাময়েরও একযোগে মৃত্যুর হার ম্যালেরিয়ার সমতুল্য নহে। সেদিন ইয়োরোপে যে মহাসমর হইয়া গেল, তাহাতেও উভয় পক্ষে এত লোকক্ষয় হয় নাই।

মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই রোগে কত লোক অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে ভীত হইতে হয়। ইহার উৎপাতে দেশের ধনাগমের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এজন্য ইহাকে নিঃসঙ্কোচে "Political disease" বলা যাইতে পারে।

এই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার সহিত প্রচলিত শিক্ষা-প্রথা, সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি ও বাণিজ্য-নীতির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। এই বিষয়-গুলির আবশ্যক পরিবর্ত্তন না করিয়া দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরী-করণের চেষ্টা বৃথা।

যে-সকল স্থানে লোকাভাব ও বহু পতিত জমি আছে, সেই-সকল স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী দেখা যায়। পক্ষান্তরে যে স্থানে বহু লোকের বাস, পতিত জমির অভাব, সে স্থানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম। অতএব ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে যদি কোন প্রকারে উপযুক্ত পরিমাণ লোকের বসতি হয়, তবে সে স্থান ম্যালেরিয়াশূন্য হইতে পারে। এইরূপ ম্যালেরিয়াদুষ্ট স্থানে লোকের ঘন বসতি হইতে পারে দুইটি উপায়ে—(১) যদি সুযোগ ও সৌভাগ্য ক্রমে বহু সরকারী আফিসাদি স্থাপিত হইয়া স্থানটি হঠাৎ সহর হইয়া যায়; (২) যদি স্থানটি একটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়।

যখন ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে "Political disease" আকারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে, তখন উহাকে বিদূরিত করিতে হইলে Political measure গ্রহণ পূর্ব্বক চিরপ্রচলিত শিক্ষাপ্রথা ও বাণিজ্য-নীতির সংস্কার করিয়া ম্যালেরিয়ার মূল কারণ দরিদ্রতা ও জনলোপের প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিলেই দেশে ধনাগম হয়; দেশের অর্থ দেশে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। পতিত জমিগুলি বাসস্থান নির্ম্মাণ ও গবাদির চারণ-ভূমিতে পরিণত হয়। কাজেকাজেই ম্যালেরিয়ার কারণ দূরীভূত হইয়া যায়।

কুইনাইন সেবন, মশারি ব্যবহার, কেরোসিন্ বা ফরমালিন্ (Formaline) দ্বারা মশকী-শাবক নাশ, পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ও অন্য রূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষ অপনয়ন প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে ম্যালেরিয়া কিয়ৎপরিমাণে কমিতে পারে বটে, কিন্তু উহার মূলোৎপাটন হইবে না। কারণ ম্যালেরিয়ার মূল কারণ অন্তর্নিহিত মর্ম্মগত দরিদ্রতা দূর করিবার প্রধান উপায় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি।

যদি কখন শিল্প-বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতি সাধন হয়, তখন ভারত পুনরায় শ্রীসম্পদ ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শান্তি ও গৌরব ভোগ করিবে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, অগ্রহায়ণ) শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র, এল-এম-এস।

আলোচনা

নরবলি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে নরবলি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে সুশ্রুত প্রথার মূলে নরবলির ধারণা বর্ত্তমান। কিন্তু ইহা ভুল। এই প্রথার মূলে শরীরের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান। ইহা কোরান মজিদের উক্তি হইতে সমর্থন করা যায়। বিস্তারিত লেখা এখানে সুসঙ্গত নহে।

খাদেমল এছলাম।

সুশীল-বাবুর বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস

গত অগ্রহায়ণ মাসে বাবু সুশীলকুমার দে কৃত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস নামক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি গ্রন্থের একটি প্রতিকূল সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গবেষণামূলক' প্রত্যেক পুস্তকই অমূল্য রত্ন নহে। মন্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই, কারণ এই মন্তব্য পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেই খাটে। দুই বৎসর পূর্ব্বে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকের একখানি গ্রন্থ আমরা অযোগ্য বিবেচনায় এম্-এর পাঠ্যতালিকা হইতে বাদ দিয়াছি। তবে সুশীল-বাবুর এই গ্রন্থখানি সেই শ্রেণীর কি না তাহা বিচার্য্য। তাঁহার অপরাধ তিনি তাঁহার গ্রন্থে রাজা রামমোহনের নাম করেন নাই। রাজার প্রকাশিত বাঙ্গালা রচনার সময় ১৮১৫ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ অঃ। তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর অর্দ্ধেক ১৮২৫ সালের পূর্ব্বে ও অর্দ্ধেক তাহার পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুশীলবাবুর বর্ত্তমান গ্রন্থে ১৮০০—১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। ১৮২৫ সালে রাজার রচনা-কাল শেষ হয় নাই। সুশীল-বাবুর গ্রন্থের নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীও ১৮২৫ সালে শেষ হয় নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ডে তিনি রামমোহনের রচনার আলোচনা করিবেন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ভূমিকায় তিনি ইহা বলিয়াছেনও (p. xiv);—Some of the works of Raja Rammohan Roy and his colleagues belong chronologically to this period, but from the standpoint of literary history, they embody a subsidiary movement which comes into relief a little later, and are, therefore, deliberately reserved for later treatment. যিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়াছেন, তিনি যে রামমোহনের গ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন এরূপ সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় না। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য সর্ব্বসমেত চারিখানি গ্রন্থ বা চারিটি প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়। সুশীলবাবুর বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার বৃত্তির প্রথম গ্রন্থ। ঐ সম্পর্কে আরও তিনিখানি গ্রন্থে তিনি ১৮২৬ হইতে ১৯০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিবেন। একটু ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা করিলে অসঙ্গত হইত না।

প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বইখানি দেখেন নাই। কেবল সমালোচনা পড়িয়াই কি কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত? বিশেষতঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তি যখন প্রবাসীতেই এই পুস্তকের ও গ্রন্থকারের প্রশংসা করিয়াছেন (প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৬, ১৯৬ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কথা হইতে পারে যে বৈজ্ঞানিক রায় মহাশয় অপেক্ষা সাহিত্যিক চৌধুরী মহাশয়ের মত এই বিষয়ে অধিক আদরণীয়। কিন্তু আরও দুইজন পণ্ডিত সুশীলবাবুর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থ পরীক্ষার ভার দিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উপর। এই উভয় পণ্ডিতের অনুমোদনে সুশীলবাবুর গ্রন্থ বৃত্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় কোন মারাত্মক অপরাধ করেন নাই।

কে শ্বশুরের রচনা নিজের নামে চালাইয়াছেন তাঁহার নাম প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করেন নাই। আমার অনুমান সত্য হইলে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন এবং কোন সরকারী কলেজের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যান-সংগ্রহ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত বাদ-প্রতিবাদে অপর কোন কলেজের অধ্যাপকের কৃত কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রশংসা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং আশা করি অন্য কলেজের অধ্যাপকের অপকর্ম্মের অপরাধের ভাগীও বিশ্ববিদ্যালয় হইবেন না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

সম্পাদকের বক্তব্য।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের পুস্তক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য আশ্বিন মাসের "সবুজপত্রে" ছাপা হয়। তাহার পর উহা দৈনিক "হিন্দুস্থান" কাগজে উদ্ধৃত হয়। এই প্রকারে উহা দুই বার প্রকাশিত হইবার পরও উহার প্রতিবাদ হয় নাই। এই দুটি কাগজ নগণ্য নহে। প্রমথ-বাবু বিখ্যাত সাহিত্যিক, বিদ্বান্ ও ব্যারিষ্টার; সুতরাং তিনি বিনা প্রমাণে কথা বলিবেন না, এই ধারণা থাকা অসঙ্গত নহে। তাঁহার সবুজপত্রের লেখকদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও আছেন। "হিন্দুস্থান"ও সুপরিচালিত কাগজ, উহার সম্পাদক এম্-এ উপাধিধারী, পূর্ব্বে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাগজে যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে, কোথাও তাহার প্রতিবাদ না হওয়ায়, আমরা তাহা সত্য মনে করিয়া তাহা বহু বিলম্বে অগ্রহায়ণ মাসে উদ্ধৃত করি এবং সেই বিশ্বাসে মন্তব্যও করি। মূল বহিখানি দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে উচ্চতম আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য হইত। তাহা আমরা না করায় আমরা অবশ্যই নিন্দাভাজন হইয়াছি। আমাদের ত্রুটির পরিমাণ ন্যায়বান্ লোকেরা স্থির করিবেন। তাঁহারা ইহা মনে রাখিবেন, যে, সংবাদপত্র পরিচালনে উল্লিখিত উচ্চতম আদর্শের অনুসরণ সচরাচর সুসাধ্য নহে; সচরাচর বিশ্বাসযোগ্য লেখকের ও পত্রিকার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়।

যিনি নিজের শ্বশুরের জিনিষ নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন, এ[illegible] আমরা তাঁহার কোন পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী লোকদের মৃত ও জীবিত শ্বশুরাদি লোকেরা তাঁহাদিগকে কখন্ গোপনীয় কি উপায়ে সাহায্য করেন, তাহা ঠিক্ জানা ও প্রমাণ করার ভার আমরা লইতে অক্ষম। বক্ষ্যমান অধ্যাপকের যে ব্যাখ্যান-মালায় এই সাহিত্যিক চুরি আছে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম বেতনভোগী ব্যাখ্যাতারূপে প্রদান করেন।

সুতরাং তৎকালে গোষ্টগ্রাজুয়েট কৌন্সিল আদির উদ্ভব না হইয়া থাকিলেও, এরূপ ব্যাখ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে প্রযুক্ত হওয়ার কলঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করিয়াছে কি না, তাহার চুলচেরা বিচার করিতে আমরা অসমর্থ।

অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও অধ্যাপকের যে-বহি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচন করেন নাই, আশা করি তাহা ঐ অধ্যাপকের কোন নৈতিক ত্রুটির জন্য নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের রচিত সব বহি আমাদের হাতে পড়ে না, যাহা পড়ে তাহার সমস্ত পড়িবার সময় আমাদের নাই, এবং বহিগুলির সমালোচনা করিবার মত বিদ্যাও আমাদের নাই। কিন্তু অন্য যোগ্য লোকের সমালোচনা পড়িয়া মনে হয়, অক্সফর্ডের অধ্যাপকদের বহিগুলির চেয়ে বেশী পরিমাণ মেকি আমাদের কোন কোন অধ্যাপক চালাইতেছেন। আমরা নাম না করিয়া একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রন্থকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি-ও-পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। বিলাতের বিখ্যাত সাপ্তাহিক স্পেক্টেটরের তাঁহার বহির সমালোচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

" .A work pretending to be a scholarly production should quote correctly, and be put into fairly grammatical and idiomatic English." তাহার মানে সমালোচিত বহিখানিতে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে ভুল আছে, এবং বহিখানিতে ইংরেজী ব্যাকরণের ও ইডিয়মের ভুল আছে!

"They [the publishers] should insist that all Indian words, and particularly proper names, should be transliterated on some consistent system, which if it happens not to be the now universally adopted system drawn up at the Geneva Oriental Congress, should be explained on a fly-sheet." অর্থাৎ সমালোচিত বহিখানিতে দেশী নামের ইংরেজী বানান কোন বিদ্বজ্জনসম্মত প্রণালী অনুসারে করা হয় নাই।

বহিখানি যে মৌলিক গবেষণা-প্রসূত নহে, সারসংগ্রহ মাত্র, সমালোচক এই মত ব্যক্ত করিতেছেন।

"His book is a useful, if somewhat summary, compendium of what British, French, and German writers have told us.. "

বাক্যটির বাকী অংশ উদ্ধৃত করিলে বহিটি সনাক্ত হইয়া পড়িবে, সেইজন্য বিরত রহিলাম। গ্রন্থকারের উপাধি আদির উল্লেখ করিয়া সমালোচক বলিতেছেন—

"Of such men we are entitled to demand scholarly accuracy in the smallest detail. Mr.—, as the nature of his book requires, has quoted freely from the works of English, French, German and other [authors]. Let one example out of many suffice. On page— the distinguished Professor of Sanskrit at the College de France is misquoted thus * * * Such a citation is almost a discourtesy to the reader and to the learned author cited.

গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ফরাসী ভাষা না জানিয়াও ফরাসীতে পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া এইরূপ বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। তাঁহার যে বানানজ্ঞানও নাই, সমালোচক তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই। যথা—

Surely Mr.— might have found among his English colleagues at the University . some one competent and willing to correct glaring faults of style, idiom and spelling. The book is probably intended for the use of university classes, and such slipshod [illegible] its production displays is one of the worst examples for Indian students, already too prone to be careless and unidiomatic in their use of a difficult foreign tongue.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত আর-একটি গবেষণায় দেখিলাম, "তৈত্তিরীয়"কে "তৈতরেয়" বলা হইয়াছে। ইহা ছাপাখানার ভূতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতে পারে। কিন্তু সে বেচারা "ঐতরেয়" ও "তৈত্তিরীয়" দুটি নাম জানিয়া একটিকে আর-একটি বলিয়া ভ্রম করিবার সম্ভাবনা আছে কি? এই গবেষক সংস্কৃত ছাড়া, গ্রীক ও ফরাসীও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ভাষাগুলি তিনি জানেন কতটা পণ্ডিতম্মন্যতা বংশানুক্রমে ও ঔষাহিক সূত্রে লোকে পায় কি না জানি না।

প্রবাসীর সম্পাদক।

—

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "ভুল স্বীকার"।

উপরের ঐ মন্তব্য সমস্তটি কম্পোজ ও কিয়দংশ প্রেসে যাইবার পর ২৭শে অগ্রহায়ণ কার্ত্তিক মাসের সবুজপত্র হস্তগত হইল। উহাতেও কাহারো কোন প্রতিবাদ নাই; প্রতিবাদের খোঁটা কেবল প্রবাসী-সম্পাদকেরই পাওনা! এমন কি যদি দোষটা প্রথমতঃ অন্যেও করে! কেন না, আর-একবার "নব্যভারত" হইতে কিছু উদ্ধৃত করায় প্রতিবাদ নব্যভারতে হয় নাই, কিন্তু প্রবাসীতে হইয়াছিল! যাহা হউক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "ভুল স্বীকার" করিয়া লিখিতেছেন:—

"ভুল স্বীকার

"রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমার লেখা যে প্রবন্ধটি গত মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-র উপর এই বলে' দোষারোপ করি যে, তাঁর History of Bengalee Literature-এ রামমোহন রায় একেবারে উপেক্ষিত হয়েছেন।

"সম্প্রতি আমার কোন বন্ধু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে [illegible] মহাশয় তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রে রামমোহন রায় সম্বন্ধে নীরব থাকবার কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজের কথা আমি এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

'Some of the works of Raja Rammohan Ray and his colleagues belong chronologically to this period but from the standpoint of literary history, they embody a subsidiary movement which comes into relief a little later; and are, therefore, deliberately reserved for later treatment.'

"তাঁর গ্রন্থের মুখপত্রটি আমি পূর্ব্বে পড়িনি, সেই কারণেই আমি তাঁর উপর এই অন্যায় দোষারোপ করেছিলুম। এর জন্য আমি যথার্থ দুঃখিত ও লজ্জিত। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমারের উপর আক্রমণ করবার আমার অবশ্য কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না, আমি কেবল রামমোহন রায়ের রচনা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের অজ্ঞতার একটি উদাহরণস্বরূপ উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করি। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার আমার নিকট সুপরিচিত এবং তিনি জানেন যে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর লেখায় আমি কতদূর পক্ষপাতী; সুতরাং আমার কথা যদি তাঁর এবং তাঁর বন্ধুবর্গের মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।"

প্রবাসীর সম্পাদক।

—

"আমার সম্পত্তি।"

সম্পত্তি" পাঠ করিয়া কতকটা দুঃখিত এবং কতকটা জিজ্ঞাসু হইয়া আপনাকে এই পত্র প্রেরণ করিতেছি। আপনার মন্তব্যে ("আমার সম্পত্তি") আপনি লিখিয়াছেন "যেটি নইলে আমার চলে না, অন্ততঃ এখন চলে না, সেটি আমার সম্পত্তি, বাকীগুলি আমার সম্পত্তি নয়।" তার- এবং ডাক-বিভাগ আমার সম্পত্তি, এই কথার দ্বিতীয় অর্থ কি "বাকীগুলি আমার সম্পত্তি নয়" এই রকমেরই? এই ধরনের অর্থ কি টানিয়া-বাহির-করা অর্থ নহে? মহাত্মাজি কি স্পষ্ট কোন ক্ষেত্রে এমন কথা বলিয়াছেন যে "তার- আর ডাক-বিভাগ ব্যতীত বাকীগুলি আমার সম্পত্তি নয়"? বলিয়া থাকিলে আমাদের মত অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহা জানাইবেন। আপনি কি মনে করেন না, গোটা ভারতবর্ষ ভারতবাসীর—এবং ইংরেজ কেবল রাজা হিসাবে ভারতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে? তা যদি হয়, তবে কি Postal departmentকে আমার সম্পত্তি বলা চলে না? আমার সম্পত্তির কোন অংশ প্রয়োজন বোধে বিনষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই যে বাকী সম্পত্তিগুলি বিনষ্ট করিতে হইবে এবং না বিনষ্ট করিলে "বাকীগুলি আমার সম্পত্তি নয়" এই যুক্তি কি বাস্তবিক খাঁটি? হইতে পারে মহাত্মাজি (আমরা স্বীকার করি না যে মহাত্মাজির সরকারী general lineএর school college উচ্ছেদসাধন অন্যায়) বিরোধী নন কো-অপারেশন দলের মতে স্কুল কলেজ যেগুলি সরকারী দানে এবং সরকারের পূর্ণ ব্যবস্থায় চালিত সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা নিতান্তই ভুল। ভুল আর চালে আস্‌মান-জমিন প্রভেদ। কোন ব্যক্তি কোন কাজে ভুল করিল সে এক কথা, আর কোন ব্যক্তি চালিয়াতি করিল সে আর-এক কথা। আমরা বুঝিতে পারিলাম না আপনি মহাত্মাজির "কথায় ফাঁকি" কোন্ ফাঁকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বিদেশী দ্রব্য ক্রমশ বর্জ্জন সম্বন্ধেও গত নভেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউতে আপনি মহাত্মাজি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়াছেন যে তিনি প্রথমে জানিয়া-শুনিয়াই বিদেশী বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরে তাহা (unwise) অবিবেচনার কাজ হইল বলিয়া এখন তিনি (মহাত্মাজি) স্বদেশী বস্তু যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ প্রথম ত্রুটিকে কথার কৌশলে ধামা চাপা দিতেছেন। এ স্থলেও আমাদের বক্তব্য ইয়ং ইণ্ডিয়ার পৃষ্ঠায়—মহাত্মাজি ঐ করেন গুড্‌স্ বর্জ্জন সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়াছেন তাহাতে মহাত্মাজির সরলতায় বিশ্বাস না করিয়া আপনি কেবল ছাপার অক্ষরের কএকটি শব্দ বসাইয়া এমনতর ভাবে মহাত্মাজিকে আক্রমণ করিলেন কেন? তিনি যখন স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"আমি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারি মূল উদ্দেশ্য ভাবিয়াছিলাম বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন কর এ যুক্তি অচল—তখন আবার জোর করিয়া তাঁহাকে সাধারণের সম্মুখে হীনচরিত্র প্রমাণের এমনতর চেষ্টা কেন? মহাত্মাজির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রগাঢ়—এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে অন্যায় অযথা মন্তব্য কোন শ্রদ্ধেয় ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতেও বাহির হইলে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। মহাত্মাজির কার্য্যে ভুলচুক থাকিতে পারে—কারণ মানুষ যখন ঈশ্বর নয় (ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণা অস্পষ্ট, কাজেই তিনিও কি শ্রেণীর জীব কি জানি) তখন সে যে ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে চলিবে সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু মহাত্মাজির সমস্ত জীবনী আলোচনা করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহা বেশ স্পষ্ট মনে হয় যে ন্যায় অন্যায় বোধের সত্যেই তাঁহার সাধনা। তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন কিন্তু তিনি ধাঁটি। আপনার ঐ দুটি মন্তব্যই তাঁহার সেই ধাঁটিত্বের প্রতি কলঙ্কের আঁচড় কাটিয়াছে বলিয়া মনে করি। চরিত্রের মহত্ত্বেই গান্ধী,—মহাত্মা—সেই মহাত্মা সম্বন্ধে কস করিয়া "কথার ফাঁকি" "সরল সত্যবাদিতা-সঙ্গত ও শ্রদ্ধেয় নয়" এসব মন্তব্য লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া সত্যই, যাহারা সাধু-ভক্ত তাহাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছেন। ইতি শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

—

সম্পাদকের মন্তব্য।

আমরা শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধী মহাশয়কে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহাকে সরল সত্যবাদী লোক মনে করি। ডাক- ও তার-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি তাঁহার মত সরল সত্যবাদী লোকের উপযুক্ত হয় নাই, ইহা বলাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল। সরকারী অন্য কোন বিভাগ তাঁহার সম্পত্তি নহে, ইহা তিনি বাক্যে বলেন নাই, কিন্তু সরকারী শিক্ষায়তনগুলির প্রতি তাঁহার ব্যবহার ও তৎসম্বন্ধে ছাত্রদের ও আমাদের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত মনে করি না, যে, সেগুলিকে যেন তিনি আমাদের সম্পত্তি মনে করেন না। অথচ সেগুলিও আমাদের প্রদত্ত টাকা দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত বলিয়া, তার- ও ডাকবিভাগেরই মত একই অর্থে আমাদের সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

যাহার ভিতরে বা পশ্চাতে আসল বস্তুটি নাই, তাহাকেই আমরা কথার ফাঁকি মনে করি। গান্ধী মহাশয়ের আলোচ্য কথা সেই জাতীয়।

যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক লোকও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" বলিয়া সমালোচনার হাত এড়াইতে পারেন নাই। গান্ধী মহাশয়ের সব কথাই তাঁহার নিজের চরিত্রের অনুরূপ হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত মনে করিতেছি না। তিনি যেমন জ্ঞানে অভ্রান্ত নহেন, তেমনি নৈতিক ত্রুটিরও ঊর্দ্ধে না হইতে পারেন।

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে তিনি ইয়ং ইণ্ডিয়াতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়াছি। যে মানুষ সকল বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন অসম্ভব বলিয়া লিখিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া কংগ্রেসের বিদেশী পণ্য বর্জ্জন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা এখনও আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করি।

কাহারও সাধুভক্তিতে আঘাত দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু সার্ব্বজনীন কাজে নিযুক্ত সাধু অসাধু বন্ধু অবন্ধু পরিচিত অপরিচিত সকল লোকের সার্ব্বজনিক কাজ ও কথার আলোচনা অপক্ষপাতে করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা তাহার চেষ্টা করি। অজ্ঞতা ও অজ্ঞানকৃত পক্ষপাত বশতঃ দোষ ত্রুটি আমাদের হইয়া থাকে।

ঈশ্বর 'কোন্ শ্রেণীর জীব", ইত্যাদি ভাষা প্রয়োগ করিয়া লেখক ঈশ্বরভক্তদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন কি না, তিনি তাহা বিবেচনা করিবেন। প্রবাসীর সম্পাদক।

—

সংশোধনের সংশোধন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীর ১৭৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় যাহা সংশোধন করিয়াছেন তাহারও সংশোধন আবশ্যক মনে করি। তিনি দাক্ষিণাত্যের Graniteকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বলিয়াছেন কিন্তু Petrology হিসাবে দক্ষিণ ভারতবর্ষে শক্ত গ্রানাইট নাই। যাহা আছে তাহা charnockite doterite ও diorite। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় ঠিক ভূতত্ত্ব হিসাবে যাহাকে Granite বলা উচিত তাহা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দেখি নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে গ্রানাইট "Volcanic stone"। ইহা নিতান্তই ভুল, কারণ গ্রানাইট Plutonic rock, volcanic নহে। শ্রীকিরণকুমার সেনগুপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আশা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কতকগুলি যুবক বোমা ছুড়িয়া ইংরেজ মারিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল, তখন আমরা তাহাদের কাজের সমর্থন করিতে পারি নাই। সেরূপ কাজ ধর্ম্মনীতিসঙ্গত মনে হয় নাই। তা ছাড়া, ঐরূপ উপায়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু ঐ যুবকদলের কাজের সমর্থন করিতে না পারিলেও, বিদ্বেষের হাওয়া হিতকর মনে না হইলেও, দেশের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা হইতে মনে একটা আশাও জন্মিয়াছিল। তাহার আগে দেশের লোক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ আম্‌লাদের নিকট, ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের নিকট, ইংরেজ জাতির নিকট, প্রতিবাদ, নিবেদন, ভিক্ষা, কান্নাকাটি অনেক করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এ অবস্থায় পরের কৃপাজীবী লোকদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক্ এই সময়ে দেশের লোকদের মনে এই ভাব আসে, যে, আমরা ইংরেজের কাছে বাংলা-দেশকে অখণ্ড করিয়া দিবার যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, তাহা ত তুচ্ছ ব্যাপার, আমরা স্বাবলম্বন দ্বারা সমগ্র ভারত-বর্ষকে স্বাধীন করিতে পারি। এই যে মানবাত্মার অজেয়-তায় বিশ্বাস, এই যে মানবাত্মার "অসাধ্য সাধন" ক্ষমতায় বিশ্বাস—এই আন্তরিক বিশ্বাসের বাহ্য প্রকাশ নানা রূপ ধারণ করিয়াছিল। বোমা নিক্ষেপ তাহারই একটি বিকৃত রূপ। বোমা নিক্ষেপে আমাদের সম্মতি না থাকিলেও, উহা যে-আন্তরিক বিশ্বাসের একটা বাহ্য বিকৃত প্রকাশ, তাহাকে আমরা আশার কারণ মনে করিয়াছিলাম।

দেশের আবার সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ মনের ভাব প্রধানতঃ বাংলাদেশে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের লক্ষণ দেখিলে বরং বলিতে হয়, বাংলাদেশ অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশেই এই ভাব প্রবল হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই ভাব আর কিছু নয়, পরানুগ্রহজীবিতায় অবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বনে বিশ্বাস। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ভাব প্রধানতঃ দৈহিক ও জড়ীয় বলে বিশ্বাসের আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। এখন, প্রধানতঃ গান্ধী মহাশয়ের প্রভাবে, যাঁহারা দৈহিক ও জড়ীয় বলে বিশ্বাসী তাঁহারাও আত্মিক শক্তির দ্বারা কার্য্যোদ্ধার নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। যে নীতিই অবলম্বিত হউক, দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থায় যে আশার কারণ দেখিয়াছিলাম, এখনও সেই কারণ দেখিতেছি। এখন দেশের লোক আত্মার অজেয়তায়, আত্মার "অসাধ্য সাধন" ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেছে, এবং সেই জন্য ভারতবর্ষের মত নিরস্ত্র, দরিদ্র, নিরক্ষর ও রোগজীর্ণ দেশের পক্ষেও স্বাবলম্বন দ্বারা স্বাধীন হইবার সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেছে। ইহাই আশার কথা। কি কি অনুষ্ঠান ও উপায় দ্বারা এই আশা ফলবতী হইবে, সে বিষয়ে গান্ধী মহাশয়ের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মতের মিল না থাকিলেও, তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করিয়াছেন। এইজন্য আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তিনি যে-যে উপায়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া দেশকে রাষ্ট্রীয় মুক্তি দিতে চান, তাহা সফল না হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া আত্মকর্তৃত্ব লাভের যে ইচ্ছা জাতির প্রাণে জাগিয়াছে, তাহা কোন-না-কোন প্রকারে সফল হইবেই।

—

দুই কোটি লোকের বলি।

কোন-কোন খবরের কাগজে বাহির হয়, যে, গান্ধী মহাশয় বলিয়াছেন, যে, যদি দুকোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়েও স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তাহাতেও তিনি রাজী আছেন। এরূপ কথা তিনি বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। খুব সম্ভব, তিনি ঠিক্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিকৃত হইয়া উক্ত প্রকারে প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক, কথাটা যে আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা সহজেই হইবে, এবং হইতে পারে। কারণ, আত্মবলিদান কাহারও আদেশ বা রাজী-হওয়া-না-হওয়ার উপর নির্ভর করে না; এবং "অপরের আত্মবলিদানে আমি রাজী আছি", বলিলে কথাটা ভাল শুনায়ও না;—যদিও ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, গান্ধী মহাশয় অপরকে যাহা

করিতে বলিবেন, নিজেই সর্ব্বাগ্রে তাহা করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইবেন।

যাহা হউক, কথাটার এই সমালোচনা যাহাই হউক, উহার ভিতর খাঁটি সত্য আছে। সেই সত্যটি এই, যে, যদি ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে দুই কোটি লোক পণ করে, যে, সর্ব্বস্ব যাক্, সর্ব্বসুখ যাক্, প্রাণ যাক্, তাহাও স্বীকার, কিন্তু তাহারা স্বাধীনতা না পাইলে সন্তুষ্ট হইবে না, প্রাণ থাকিতে তাহা লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে না, এবং সেই চেষ্টা তাহারা হিংসা-বিদ্বেষের পথে করিবে না, তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতা-লাভ অনিবার্য্য।

—

গান্ধী মহাশয়ের প্রভাব।

গান্ধী মহাশয় অপেক্ষা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বাগ্মী, ধনী, মানী, লোক দেশে আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। কিন্তু তাঁহার প্রভাবের কাছে অন্য সকলের প্রভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে কেন? তাহার কারণ অনেকগুলি।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব, সর্ব্বসুখ এবং প্রাণ পণ করিয়াছিলেন, বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন, এবং তিন বার স্বেচ্ছায় জেলে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও স্বেচ্ছায় জেলে গিয়াছিলেন। তিনি ব্যারিষ্টার, পসার খুব ছিল। ব্যারিষ্টারী তিনি অনেক বৎসর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাজমন্ত্রী ছিলেন। এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়া তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছেন, নিজের হাতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট থাকিয়া তপস্বীর মত জীবন ধারণ করেন, খালি পায়ে চলেন, রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। তিনি নির্ভীক লোক। গুজরাতে কায়রা জেলায় প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছিল। প্রথম-প্রথম বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই প্রজাদিগের প্রতি নানা প্রকার শাস্তির বিধান করিয়া শেষে তাহাদের খাজনা মাফ্ করিতে বাধ্য হন। বিহারের চম্পারন জেলায় তিনি নীলকরদের অত্যাচার নিবারণ জন্য গিয়াছিলেন। তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেলে পাঠাইবার ভয় দেখাইয়া ঐ জেলা ছাড়িয়া যাইতে বলেন। তিনি ভীত না হইয়া ঐ জেলায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন, এবং পরে বিহার গবর্ণমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম প্রত্যাহার করেন। তাহার পর প্রজাদের দুঃখ নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করেন, গান্ধী মহাশয়ও উহার সভ্য ছিলেন। তাহাতে তাঁহার অধিকাংশ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এইরূপে নানা কাজে তাঁহার নিজের সুখসমৃদ্ধিতে বিরাগ এবং লোকহিতসাধনে অনুরাগ দেখা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি আইনের ভয় না করিয়া সুস্পষ্ট ভাষায় গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রভাবের অন্য একটি কারণ আছে বটে—তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্য ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপকারিতা ও প্রয়োজন স্বীকার করেন, যদিও সঙ্গে সঙ্গে "অস্পৃশ্য" ও অনাচরণীয় জাতিদের প্রতি হিন্দু সমাজের ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তাঁহার অপেক্ষাও গোঁড়া লোক আছেন, তাঁহারা তাঁহার মত সমুদ্র লঙ্ঘন করেন নাই, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি হিন্দু সমাজের ব্যবহারের নিন্দাও করেন না। তথাপি, তাঁহাদের প্রভাব গান্ধী মহাশয়ের প্রভাবের সমান নয়। বস্তুতঃ তাঁহার প্রভাবের মূল তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও দেশহিতে আত্মোৎসর্গ, তাঁহার সাধু বিলাসবিহীন তপস্বীর ন্যায় জীবন, দেশহিতার্থ তাঁহার কারাবাস ও অন্যবিধ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহন, তাঁহার সাত্ত্বিকতা ও একান্ত নির্ভীকতা, এবং তাঁহার কথায় ও কাজে পার্থক্যের অভাব। ইহার উপর তিনি জাতিভেদ মানায় তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক দেবতার মত উচ্চ স্থানে স্থাপন করিয়াছে।

এইরূপ প্রভাব দ্বারা মানবের অনেক হিত করা যায়। কিন্তু বিস্তর লোকে যে প্রায় সব বিষয়েই তাঁহাকে অভ্রান্ত ভাবিয়া নির্বিচারে তাঁহার মত গ্রহণ করে, ইহা অনিষ্টকর। বিনা বিচারে কাহারও মত গ্রহণ করা উচিত নয়।

যাহা হউক গান্ধী মহাশয়ের অভ্যুদয়ে একটা সুফল এই হইয়াছে, যে, এখন আর মেকীতে সহজে চলিবে না। লোকহিতার্থ আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগ, অকপট ব্যবহার, নির্ভীকতা, পবিত্র চরিত্র ও সাধুজীবন,—এই সকল না

পূর্ব্ব আফ্রিকায় বাঙালীদের অতিথি শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ সাহেব।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাঙালীরা শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন। বিদেশেও বাঙালী শিক্ষকের কাজ রহিয়াছে।

—

নিখিল ভারতীয় কার্য্যে বাঙালী।

আধুনিক কালে ভারতবাসীদের ঘুম ভাঙিবার সময় হইতে যে-যুগ চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে অনেক মনীষী রামমোহনের যুগ বলিয়াছেন; কারণ, মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আদর্শ আমাদের দেশে তিনিই প্রথমে উপলব্ধি করেন, এবং ঐ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টাও তিনিই প্রথমে করেন। তাঁহার পর হইতে সব বিষয়ে ও দিকে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অগ্রণী হইয়া আসিয়াছে কি না, তাহার বিচার করিতে চাই না। তবে, অনেক বিষয়ে বাঙালীরাই যে পথ-প্রদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা পথ দেখায়, তাহাদের লাগাল আর কেহ পরে পাইতে পারিবে না, বিশ্বের এমন কোন বিধান নাই। কিন্তু যদি কোন সময়ে পথপ্রদর্শকদের স্বজাতীয় লোকেরা পশ্চাতে পড়িয়া যায়, কিম্বা একেবারেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে সমগ্রভারতীয় কোন কার্য্যে বা প্রচেষ্টায় আমরা কোন বাঙালীকে নেতার আসনে অধিষ্ঠিত দেখিতেছি না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দেশ যে দুই প্রধান দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার একটির প্রধান নেতা গান্ধী মহাশয়। তিনি বাঙ্গালী নহেন। তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য তাঁহার দলের হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত মোতীলাল নেহরু। শুনিয়াছি, ওকালতীতে তাঁহার মাসিক আয়

কলিকাতায় বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হওয়ায় এইসকল স্থান হইতে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইবে। ভারতবর্ষের লোকেরা বিদেশীর সহিত সম্পর্কচ্যুত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়াছে। এখন নানা প্রকারে বিদেশীদের সহিত আবার ভাব, চিন্তা ও সভ্যতার নানা অঙ্গের আদান প্রদান ঘটিলে সকলের উপকার হইতে পারে, এবং এশিয়ার নানা জাতি লইয়া একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা এইসমুদয় জাতির শক্তি বাড়িতে পারে। কিন্তু শুধু একটি বিহার দ্বারা ইহা হইতে পারে না। ইহার সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিল্প অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অনুশীলনের জন্য যদি একটি শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়, এবং যদি তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনের সমকক্ষ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সহিত বৌদ্ধ দেশসকলের সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হইতে পারে। অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহাশয় এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

যাহার দিবার কিছু নাই, দিবার ক্ষমতা নাই, লইবার ক্ষমতাও তাহার নাই। আমরা প্রাচীন কালে জগৎকে, এশিয়াকে কি দিয়াছিলাম, তাহার দ্বারা এখন বিদেশীরা ভারতবর্ষে আকৃষ্ট হইবে না—যদিও প্রাচীন স্থান, ভগ্নাবশেষ মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, সমাধিমন্দির প্রভৃতি দেখিবার জন্য আসিতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আত্মার সমৃদ্ধি যে-সকল গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ অংশ ত এখন মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার জন্য ভারতবর্ষে আসা অনাবশ্যক। বরং অনেক গ্রন্থের জন্য (এবং চিত্র ও মূর্ত্তির জন্যও) লোককে লণ্ডন, অক্সফর্ড, প্যারিস্, বার্লিন, বোষ্টন, তোকিও প্রভৃতি নগরে যাইতে হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যদি আমাদের সাত্ত্বিকতা, প্রতিভা ও সত্যদর্শনক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেই আমরা বিদেশাগত লোকদিগকে শ্রদ্ধান্বিত সত্যানুসন্ধিৎসু করিতে পারিব;—তাহাদিগকে কিছু দিতে পারিব, এবং তাহাদের নিকট হইতেও কিছু পাইতে পারিব। অতএব শিক্ষায়তনের জন্য শিক্ষক আমাদিগকে যোগাইতে হইবে, এবং প্রকৃত জ্ঞানশালী এরূপ শিক্ষিত সমাজ গড়িতে হইবে, যাহাদের সংসর্গ বিদেশীদের নিকট স্পৃহণীয় বোধ হইবে।

বুদ্ধদেবের অস্থি-পেটিকা।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় বাঙ্গালী।

গত জানুয়ারী মাসে যখন বোলপুরের অধ্যাপক এণ্ড্রুজ্ সাহেব পূর্ব্ব আফ্রিকার রাজধানী নাইরোবী গমন করেন, তখন তথাকার বাঙালীরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল দে গত তেইশ বৎসর তথায় বাস করিতেছেন। তিনি সেখানে সপরিবারে বাস করেন। তথায় আরো কেহ কেহ সপরিবারে বাস করেন। হীরালালবাবুর বাড়ীতেই এণ্ড্রুজ্ সাহেবের সম্বর্দ্ধনা হয়। বাংলা গান হয়, এবং বাংলা অভিনন্দনপত্র পঠিত হয়। হীরালালবাবুর অন্তঃপুরে মহিলারা সম্মিলিত হন। সেখানে তাঁহার পত্নী এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে প্রত্যুদ্গমন করেন ও তাঁহার দশবৎসর-বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী এতদুপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তৎপরে অতিথি মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন এবং সমাগত সমুদয় ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দেন। চা ও সন্দেশ জলযোগ করিবার পর যে ফটো-গ্রাফটি লওয়া হয়, আমরা তাহা মুদ্রিত করিলাম।

অল্পসংখ্যক হইলেও পূর্ব্ব আফ্রিকাতে বাঙালী আছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। আশা করি ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক বাঙালী বণিক্ বিদেশে যাইবেন।

অনাগারিক ধর্ম্মপাল তাঁহার মাতা মহা- উপাসিকা মল্লিকার নামে	৫০০০৲
ডাক্তার ও মিসেস্ সী এ হেবতীরত্ন	২০০০৲
„ „ এন্, ডি, ষ্টীফেন ডিসিল্‌ভা	১৫০০৲
পী, এ, পেরিস্	১০০০৲
ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দান	৩৬৮৬৲

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের মধ্যে বাঙালীদের দান কিছু থাকিতে পারে। নতুবা কোন বাঙালী ইহাতে বেশী কিছু দান করেন নাই,—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও না। স্থানের সংকীর্ণতা বশতঃ বিহারটি জাঁকাল হয় নাই। তথাপি ইহার গঠনপারিপাট্য প্রশংসনীয়। ইহার সম্মুখ-দৃশ্য দেখিলে প্রাচীন কোন কোন গুহামন্দিরের স্থাপত্য মনে পড়ে। ইহার দ্বিতলের প্রাচীর-গাত্রে ও ছাদের নিম্নপৃষ্ঠে অজণ্টা-গুহার চিত্রাবলীর অনুকরণে অনেক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অল্পসংখ্যক মূর্ত্তির চিত্রণ মন্দ হয় নাই; কিন্তু মোটের উপর এই অনুকৃত চিত্রগুলির প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

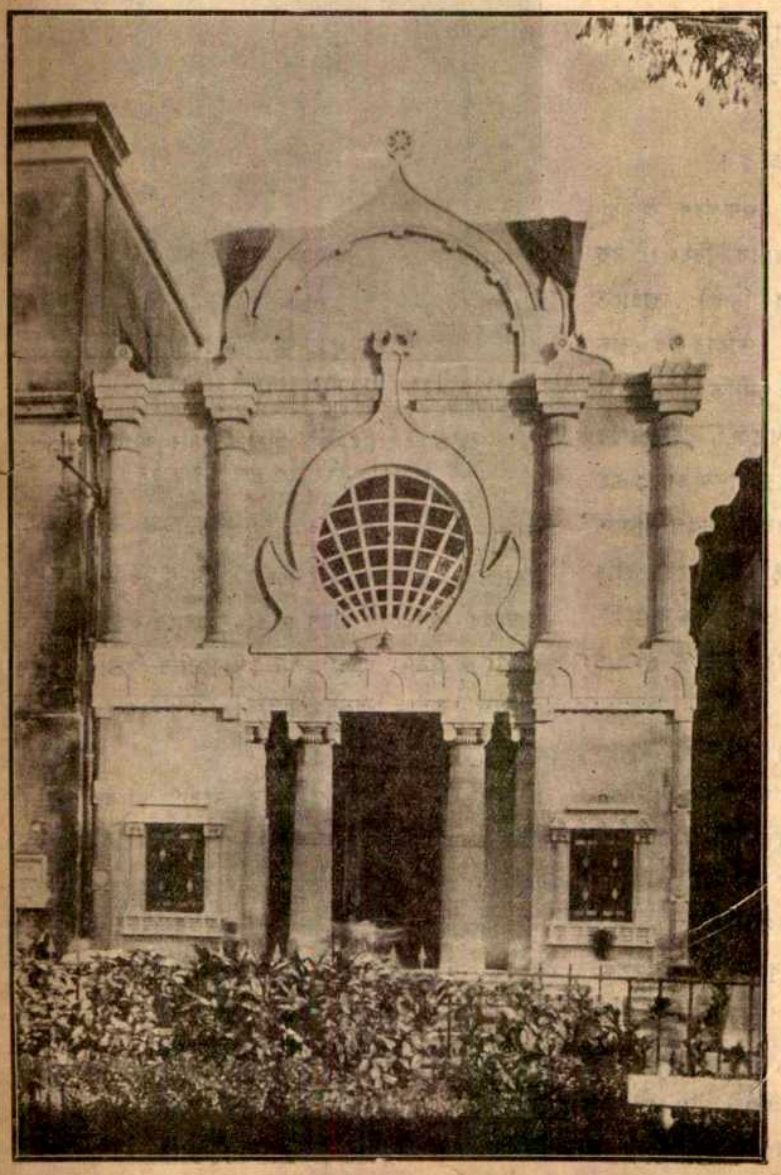

বৌদ্ধ বিহার, কলিকাতা।

বৌদ্ধরা তাঁহাদের ধর্ম্মমত অনুসারে এই বিহার ও তন্মধ্যস্থ বুদ্ধাস্থিখণ্ডকে পবিত্র মনে করিবেন। বুদ্ধদেব হিন্দুদের অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া খাঁটি হিন্দুদের নিকটও এই বিহার তীর্থবিশেষে পরিণত হইতে পারে। যে-কেহ বুদ্ধদেবের জীবন ও উপদেশের জন্য তাঁহাকে ভক্তি করেন, তাঁহারই নিকট সেই প্রাচীন সর্ব্বজীবপ্রেমিক সন্ন্যাসীর স্মৃতির সহিত জড়িত এই স্থান পবিত্র বিবেচিত হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্য গুরুত্বও আছে।

পুরাকালে এশিয়ার অধিকাংশ দেশ, বিশেষতঃ মধ্য, পূর্ব্ব, ও দক্ষিণ এশিয়া ভারতবর্ষের প্রভাবে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণই প্রধানতঃ ভারতবর্ষের আলোক এইসকল দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এইসকল দেশে এখনও বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী।

থাকিলে আর কাহারও বেশী বা স্থায়ী প্রভাব জন্মিবে না। শুধু বাক্‌চাতুরী ও চালাকিতে চলিবে না। শুধু পরের জন্য ত্যাগের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। হাজার হাজার টাকা রোজ্‌গার করিয়া তাহার অধিকাংশ নিজের ও পরিবারবর্গের বিলাস ব্যসন আরাম ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিতে নিয়োগ করিয়া বহু সহস্র বা লক্ষটাকা দান করিলেও মানুষের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতে কেহ পারিবে না। লোকহিতার্থ নিজের সময়, শক্তি, ধন, সব দিতে হইবে, হাজার হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা রোজ্‌গার ছাড়িতে হইবে। তবে তাঁহাকে লোকে নেতা বলিয়া মানিবে।

—

কলিকাতায় বৌদ্ধ বিহার।

বুদ্ধদেবের মত মানুষ যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ভারতের একটি গৌরবের বিষয়। বহু শতাব্দী ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। তাহার পর বৌদ্ধ সম্প্রদায়-সকলের মধ্যে নানা কুসংস্কার ও দুর্নীতি প্রবেশলাভ করায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কমিতে থাকে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান এবং ভারতবর্ষে মুসলমানপ্রাধান্য স্থাপন বশতঃ এই ধর্ম্ম এদেশে লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে। সমগ্র ভারতে মোটামুটি তিনলক্ষ বৌদ্ধের বাস, তাহার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ বাংলাদেশের অধিবাসী। এই বৌদ্ধ বাঙালীদের অধিকাংশের নিবাস চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ও উত্তর বঙ্গে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে লোপ পাইলেও বৌদ্ধ কীর্ত্তি লোপ পায় নাই। বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, সারনাথ, অজণ্টা, সাঁচী, প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ কীর্ত্তি বৌদ্ধ প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তদ্ভিন্ন অনেক প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ হইতেও অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ ইতিহাস হইতে জানা যায়, বুদ্ধদেবের অস্থিখণ্ড আটটি স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী ভট্টিপ্রোলু নামক গ্রামের ভগ্নাবশেষ হইতে স্ফটিকনির্ম্মিত আধারে রক্ষিত তাঁহার একটি অস্থি পাওয়া যায়। উহা সম্প্রতি বড়লাট বঙ্গের গবর্ণরের মারফৎ মহাবোধি সভাকে অর্পণ করেন। মহাবোধি সভা উহা

বুদ্ধদেবের অস্থি-পেটিকা লর্ড রোনাল্‌ডশে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বৌদ্ধ মহাবোধি সভার প্রতিনিধি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে ন্যস্ত করিতেছেন।

কলিকাতায় গোলদীঘির পূর্ব্ব দিকে নির্ম্মিত শ্রীধর্ম্মরাজিক চৈত্য বিহারে রক্ষা করিয়াছেন। গবর্ণরের নিকট হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ গ্রহণ ও তাহা বিহারে রক্ষণ উপলক্ষ্যে খুব ঘটা ও জনতা হইয়াছিল। মহাবোধি সভার প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধাস্থি গবর্ণরের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশেই বৌদ্ধের সংখ্যা অধিক। সুতরাং বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহরে বুদ্ধাস্থি রক্ষণ সুব্যবস্থা হইয়াছে। বিহার নির্ম্মাণ প্রধানতঃ অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহাশয়ের চেষ্টাতে হইয়াছে। ইহার জন্য যিনি যাহা দান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

হোনোলুলু-নিবাসিনী শ্রীমতী মেরী ফস্‌টার	৬৫১২৩৲
বড়োদার মহারাজা শ্রীসয়াজীরাও গায়কবাড়	১০৭৪০৲
অনাগারিক ধর্ম্মপাল তাঁহার পিতা মুদালিয়র হেবতীরত্নের নামে	৫০০০৲

সদ্য বিধবা

চিত্রকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের সৌজন্যে।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৭

৪র্থ সংখ্যা

রামদাস

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীর অভাব নাই। তাহাদের অধিকাংশেরই মতে নলিনী-দলগত-জলম্ অতিতরলম্ তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয়চপলম্। অতএব, এ মায়া-প্রপঞ্চময় সংসার জ্ঞানীজন বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্বামী রামদাস এই 'প্রপঞ্চই পরমার্থ' বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। বাল্যকালে একদিন চিন্তামগ্ন বালককে জননী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'এত ভাবিতেছ কি?' বালক উত্তর করিয়াছিলেন 'বিশ্বের কথা।' বালকের বিশ্ব খুব বড় নহে। উত্তর জীবনে তিনি দিবারাত্রি নিজের দেশের কথাই ভাবিতেন। জাগ্রতে দেখিতেন—দেশে ধর্ম্ম নাই, অন্ন নাই, দেশবাসী অনাহারে মরিতেছে, তাহার উপর বিধর্ম্মী রাজার দুঃসহ অন্যায় অত্যাচার। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেন—তাঁহার মহারাষ্ট্রে,'আনন্দ বনভুবনে', আবার ধর্ম্মের দুন্দুভি নাদিত হইতেছে, দিগ্‌বিজয়ী শত্রুর শক্তি চূর্ণ হইয়াছে, পররাজ্যলোলুপ শত্রুর পতন হইয়াছে, স্নান-সন্ধ্যার নিমিত্ত জলের আর অভাব নাই।

রামদাসের পিতৃদত্ত নাম নারায়ণ। পিতার নাম সূর্য্যাজী পন্ত, মাতার নাম রাণুবাই। তিন বৎসরের বড় এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম গঙ্গাধর। মহারাষ্ট্রের জাম্ব গ্রামে, ১৫৩০ শকে, কীলক সম্বৎসরে চৈত্রমাসে রামনবমীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময় এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। উভয় ভ্রাতারই অতি অল্প বয়সে উপনয়ন হইয়াছিল। কিন্তু পিতা সূর্য্যাজী যখন গঙ্গাধরকে শুভদিন দেখিয়া দীক্ষা দিবার আয়োজন করিলেন। সেদিন নারায়ণের চিত্তও বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার নিকট কিন্তু তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইল। কারণ তিনি তখন নিতান্ত অপরিণতবুদ্ধি বালক। ক্ষোভে ও দুঃখে নারায়ণ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে উপস্থিত হইলেন এক নদীর তীরে, প্রবল প্লাবনে তাহার উভয় কূল ভাসিয়া গিয়াছে। বিপুল কল্লোলে বিরাট জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন না। তিনি সেই প্রবল প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—

তীন গাঁবে বাহত বাহত।
গেলে তো সূর্য্যোদয় হোত।
তঁব একে গ্রামাসমীপ।
ঐলথড়ী সানন্দে।

ছয় ক্রোশ সন্তরণ করিতে করিতে সূর্য্যোদয় হইল; তখন একে গ্রামের সমীপে তিনি সানন্দে নদীর তীর দেখিলেন। এক ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হইয়া বালককে বস্ত্র ও উপবীত দিলেন। নারায়ণ সেই গ্রাম হইতে নদীর তীরপথে আবার চলিতে লাগিলেন। আসিলেন গোদাবরীর পুণ্যতীরে পঞ্চবটী-ক্ষেত্রে শ্রীরামের দেউল আছে

সেইখানে। এইখানে ধ্যান-ধারণায় তাঁহার বার বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রীরামের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি আবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন, দেশের অবস্থা দেখিবার জন্য। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত দ্রব হইল। তিনি দেশের তৎকালীন অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বড় করুণ।

পদার্থ মাত্র তितुका गेला।
सुस्ता देश चि उरला।
येने करिता बहुतालां।
सङ्कट झालें॥
मानसां खावया धान्य नाहीं।
आथरुण पांघरुण ते हि नाहीं।
घर करायां सामग्री नाहीं।
कये करिता॥
काहींच पाहता धड़ नाहीं।
विचार सुचेना काहीं।
अखण्ड चिन्तेचा प्रवाहीं।
पड़िले लोक॥
प्राणीमात्र जाले दुःखी।
पाहता कोनही नाहीं सुखी।
कठिन काल ओरखी।
धरीनात कोनी॥

धन সম্পদ সমস্তই গিয়াছে, কেবল দেহমাত্র পড়িয়া আছে, সুতরাং অনেকেরই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মানুষের খাইবার ধান্য নাই। বিছানায় পাতিবার বা গায়ে দিবার কাপড় নাই, ঘর করিবার উপাদান নাই, লোকে কি করিবে? কোন কাজেই মঙ্গল দেখিতে পাই না, কোন উপায় মনে আসে না, লোক অখণ্ড চিন্তা-প্রবাহে পড়িয়া গিয়াছে। প্রাণীমাত্রই দুঃখী, কাহাকেও সুখী দেখিতে পাই না। কঠিন কাল পড়িয়াছে দেখিয়া কেহই আর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করে না।

এই দারুণ অভাব দেখিয়া রামদাসের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে—

काहीं मिलेना मिलेना मिलेना खायला।
ठाँव नाहींरे नाहींरे नाहींरे जायाला।
खाइबार किछु मिले ना मिले ना मिले ना।
याइबार ठाँई नाई नाई नाई रे॥

কিন্তু কেবল এই অন্নকষ্টে মহারাষ্ট্রের দুঃখ পর্য্যবসিত হয় নাই। দেশে রাজার শাসন নাই। অশান্তি উপদ্রব চতুর্দ্দিকে, নারীর সম্মানও নিরাপদ নহে। অনাহারে কেহ মরিতেছে, কেহ দেশত্যাগ করিতেছে, কত গ্রাম পরিত্যক্ত হইতেছে, সমস্ত শস্য ধান্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত ব্রাহ্মণীকে ভ্রষ্ট করা হইয়াছে, দেশান্তরে বিক্রয় করা হইয়াছে, কত সুন্দরী নানা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে।

किती येक मृत्यासिते योग्य जाले।
किती येक ते देश त्यागोनि गेले॥
किती येक ग्रामेचिते बोस जाली।
पिके सर्व धान्य च नाना बुडाली॥

* * * *

किती गुजिनी ब्राह्मणी भ्रष्टवीला।
किती शामुखी जाहजी फाकवीला॥
किती येक देशान्तरी त्या वीकिल्या।
किती सुन्दरी हाल होऊनी मेल्या॥

দেশে তখন সর্ব্বত্রই পশুবলের প্রাধান্য। দৈহিক শক্তির রাজত্ব বোধহয় আর কখনও সেখানকার লোক এমন অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নাই। তাই রামদাস বড় দুঃখে লিখিয়াছেন—ন্যায় বুড়ালী বুড়ালী জাहালী সির্জোরী—ন্যায় ধ্বংস হইয়াছে, সকলে স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

রামদাস সন্ন্যাসী, কিন্তু সংসারবিরাগী নহেন। সংসারের হিতে দেশের হিতে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীই চিরদিন লোকশিক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেকালে যাঁহারা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সংসারবিরাগী। শাস্ত্র হইতে তাঁহারা বৈরাগ্যের উপদেশগুলিই উপবাসক্ষিন্ন স্বদেশবাসীগণের জন্য বাছিয়া বাহির করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—এই যে জগৎ, ইহা মিথ্যা, সত্যের আভাসমাত্রও এখানে পাইবে না। স্ত্রী পুত্র কন্যাও মিথ্যা, তাহাদের মায়া-রজ্জুতে আবদ্ধ হইও না। তাহারা যদি চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া

মরেও, তবু বিচলিত হইও না, চিত্তের শান্তি ক্ষুব্ধ হইতে দিও না, শান্ত সমাহিত হইয়া কেবল ভগবানের নাম কীর্ত্তন কর। অনাহারে ক্লিষ্ট পুত্র-কলত্রের করুণ ক্রন্দনধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দাও; মৃদঙ্গ করতাল না মিলে যদি, পাথরের ত অভাব নাই, পাথর বাজাইয়া নাম কীর্ত্তন কর। উপবাস? উপবাসে ভয় পাইও না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরীতে যাইয়া পারিজাতের মালা পরিয়া পেট ভরিয়া অমৃত খাইবে। এই শিক্ষায় লোকের মন স্বভাবতঃই কর্ম্মবিমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সাধুসন্তগণের বেদান্ত-মহিমা অজস্র কীর্ত্তনেও সাধারণের চিত্ত জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইল না। রামদাস বুঝিলেন যাহারা এতদিন কেবল শুনিয়া আসিয়াছে সংসার অসার, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে প্রপঞ্চেই পরমার্থ মিলে। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ মূর্খ ভগবানের মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবে? করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাষ্ঠে রান্না হয় না, আম কাঁঠাল কলা প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না। দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে লোকের নিকট ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে। রামদাস এইজন্য একটি নবীন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা জনসেবাতেই জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, কর্ম্মের ও জ্ঞানের মহিমা বিশেষ করিয়া প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। সমর্থ রামদাস স্বামী এই উদ্দেশ্যে একদল শিষ্যকে সুশিক্ষিত করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করিলেন। তিনি নিজে রহিলেন সজ্জনগড়ের চাফল মঠে। কল্যাণ স্বামীকে সীনা নদীর তীরে ডোম-গাঁওয়ে মঠ বাঁধিয়া দিলেন। উদ্ধব স্বামীর উপর গোদাবরীর দুইতীরে দুইটি মঠের ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপ দেবদাস, বালকরাম, ত্র্যম্বক গোসাঞি, গোবিন্দ রামচন্দ্র প্রভৃতি শিষ্য মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে রামদাসী মঠের মোহন্ত হইয়া বসিলেন। নবীন সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছাইয়া গেল। এইসকল মঠবাসী শিষ্যদিগকে রামদাস স্বামী উপদেশ দিলেন—

শরীর परोपकारी लावावें।
बहुतांच्या कार्य्यास यावें।
उणे पडो नेदावे।
कोनी येकाचें॥
दुसऱ्याचे दुःखे दुःखवावे।
परसन्तोषी सुखी व्हावे।
प्रणि मात्रास मेलउन घ्यावे।
वऱ्या शब्दे॥
बहुतांचे अन्याय क्षमावे।
बहुतांचे कार्य्यभाग करावे।
आपल्या परीस व्हावे।
पारिखे जन॥
आलस्य आवघा च दवडावा।
येत्न उदंडचि करावा।
शब्द मत्सर नकरावा।
कोनी येकाचा॥
पेरिले ते उगवते।
बोलल्या सारिखे उत्तर येते।
तरी मग कर्कश बोलावे ते।
काय निमित्य?॥
स्व ये आपन कष्टावे।
बहुतांचे सोसीत जावे।
झिजोनि कीर्त्तिस उरावे।
नाना प्रकारे॥

শরীর পরোপকারে লাগাইবে। সকলের কার্য্য করিবে, কাহারও বিষয়ে যেন কম না হয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত হইবে, অপরের সন্তোষে সুখী হইবে। মিষ্ট বাক্যে প্রাণীমাত্রেরই একতা সম্পাদন করিবে। সকলের অন্যায় ক্ষমা করিবে, সকলের কার্য্য করিবে, অপরকে নিজের তুল্য মনে করিবে। আলস্য সম্পূর্ণরূপে দমন করিবে, প্রভূত পরিশ্রম করিবে, কাহাকেও ঈর্ষাযুক্ত বাক্য বলিবে না। যাহা রোপণ করা যায় তাহাই অঙ্কুরিত হয়, অতএব যেরূপ বলিবে সেইরূপ উত্তর পাইবে, তবে কি নিমিত্ত কর্কশ বাক্য বলিবে? নিজে কর্ম্ম করিবে, অপরের (উপ　　) সহ্য করিয়া যাইবে, শরীর ক্ষয় করিয়াও

নানাপ্রকারে কীর্ত্তি রাখিবে। এই ধর্ম্ম, লোক-সেবার ধর্ম্ম। এই উপদেশ সাধারণ শিষ্যদিগের প্রতি।

মঠধারী মোহন্ত শিষ্যগণকে স্বামী বলিতেছেন—চন্দন [illegible] পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ জানা যায় নাই, চন্দন ও অন্যান্য বৃক্ষ একই শ্রেণীতে ছিল। যেজন কথার অনুরূপ কার্য্য করে, নিজে করিয়া উপদেশ দেয়, লোক তাহার কথাই সত্য বলিয়া মানে। সমস্তই খুব বড় চাই, সুতরাং খুব কড়াকড়িও চাই, মঠ করিয়া অহঙ্কার করিও না।

জম্ববরী চন্দন ঝিजेना।
তম্ববরী সুগন্ধ করেনা॥
চন্দন আণি বৃক্ষ নানা।
সগট হোতী॥
বোলণ্যা সারিখে চালণে।
স্বয়ে করুণ বোলনে॥
তয়াচী বচনে প্রমাণে।
মানিতী জন॥
সমুদায় পাহিজে মোঠা।
তরী তণাবা অসাবী বরকটা।
মঠ করুণ তাঠা।
ধরু নয়ে॥

যাহা কিছু করিবার, তাহাতে আলস্য করিবে না। আলস্য করিলে পরমার্থের অনেক হানি হয়। সন্তরণকারী নিমজ্জনোন্মুখকে রক্ষা করিবে, সামর্থ্য থাকিতে ডুবিতে দিবে না, বিবেকী পুরুষ মূর্খকে জ্ঞানবান করিবে।

কাহী সমুদাব করণে।
যে বিশী আলস্য ন করণে।
আলস্য করিতা উদণ্ড উণে।
দিসেল পরমার্থী॥
পোহণারে বুড়তে তারাবে।
সামর্থ্যে বুড়ো নেদাবে।
মূর্খতে সাহাণে করাবে।
বিবেকী পুরুষে॥

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে রামদাস স্বামী তাঁহার শিষ্যদিগের উপর যুগপৎ লোকশিক্ষা ও লোকসেবার ভার দিয়াছিলেন। এমন কঠিন ভার সহসা কাহারও উপর দেওয়া চলে না। সুতরাং রামদাস স্বামী সহসা কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। প্রথমে তাঁহার মোহন্ত শিষ্যেরা সন্ন্যাস ও দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু যুবককে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তারপর উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে চাফলে রামদাস স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রামদাস বয়স্ক ব্যক্তিকে সাধারণতঃ সন্ন্যাস দিতেন না, কারণ তিনি প্রচার করিতেছিলেন—সংসারীর কর্ত্তব্য, কর্ম্মের মহিমা। উপযুক্ত তরুণেরা দেশসেবার মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসিলে তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না।

বাঙ্গালীর ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা মহিলাদিগকে অন্তঃপুরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। মহারাষ্ট্রে বহু বীর রমণী অসি হস্তে সমর-ভূমিতে আপনাদের শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাবিত্রী-বাই নামে একজন প্রভু-কায়স্থ মহিলা অকুতোভয়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মুঘলবিজয়ী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অহল্যা-বাইর মত বহু প্রতিভাশালিনী মহিলা আপনাদের শাসনদক্ষতার জন্য ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু রামদাস, ব্রাহ্মণ রামদাস, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পৃষ্ঠপোষক রামদাস দেশ-সেবার অধিকার হইতে রমণীদিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অকা-বাই ও বেণা-বাইর নাম মহারাষ্ট্রের সকলের নিকট পরিচিত। অকা-বাইর উপর রামদাস চাফল মঠের রন্ধনের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বেণা-বাইর উপর ছিল গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যার ভার। এই বেণা-বাই সীতা-স্বয়ম্বর নামক একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আপা-বাই নামে আর-একটি সুকণ্ঠ মহিলা কীর্ত্তন করিতেন, রামদাস স্বামীও কখনও কখনও তাঁহার কীর্ত্তন-সভায় উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য জনের উপর যোগ্য ভার ন্যস্ত হইত, কিন্তু সকল শিষ্য বা সকল শিষ্যাকে রামদাস সকল কার্য্য করিবার অধিকার দেন নাই। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি দেখিতে পারিতেন না, মঠের শৃঙ্খলার এতটুকু হানি হইলেই তিনি অপরাধীকে গুরুতর

শারীরিক দণ্ড দিতেন। একবার তিনি তাঁহার এক মোহন্ত শিষ্যকে বেত মারিয়াছিলেন।

রামদাসের শিষ্য ছিলেন অনেক, ভক্ত-সংখ্যা আরও অনেক, তাহাদের মধ্যে মুকুটধারী নরপতি ও লক্ষপতিও ছিল; কিন্তু তিনি গুরুগিরির ব্যবসাটা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। শিষ্যের নিকট কখনও কিছু প্রার্থনা করিতেন না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

আমচী প্রতিজ্ঞা ঐসী।
কাহীন মাগাবে শিষ্যাসী॥

আমার প্রতিজ্ঞা এই যে শিষ্যের নিকট কিছু চাহিব না। প্রবাদ আছে যে ছত্রপতি শিবাজী একদিন দানপত্র লিখিয়া রামদাসকে তাঁহার সমস্ত রাজ্য দান করিয়াছিলেন, রামদাস শিবাজীর রাজ্য শিবাজীকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—মনে রাখিও আজ হইতে তোমার এ রাজ্য বৈরাগীর রাজ্য, তুমি রাজ্যের সেবকমাত্র। সেই হইতে বৈরাগীর উত্তরীয় মারাঠা সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা হইয়াছিল। সেই পতাকার পতন ইংরেজের কামানের গুলিতে হয় নাই, তাহার পতন হইয়াছে মারাঠা জাতি শিবাজী ও রামদাসের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া।

দেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তিনি এতগুলি মঠ স্থাপন করিলেন, তাঁহারই জীবিতকালে তাঁহার আনন্দ-বনভুবনে অত্যাচারের ধ্বজদণ্ড ধূলিলুণ্ঠিত হইতে দেখিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সে তাঁহার হৃদয়ে যে ব্যথা বাজিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি বাহিরে মঠের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে কঠিন শাস্তি দিতেন, শিবাজীর দুর্ব্বৃত্ত পুত্র সাম্ভাজীকে কুশাসনের জন্য তীব্র ভৎর্সনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই কাঁদিত চারিদিকে অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া। তাঁহার চিত্তের বেদনা কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে।—মোহন্তগিরি সুখের নয়, ইহাতে অপার দুঃখ, লোকের অপার দুঃখ শুনিতে বুক ফাটে। লোকেরা নানা-রূপ বিকারী, তাহারা অনেক অন্যায় করে, চক্ষু আর ইহা কত দেখিবে, কর্ণ কত শুনিবে। বলিলে দুঃখ বোধ করে, কিন্তু অন্যায় নষ্ট হয় না, হিত কথা বলিলে হিত বোধ করে না, শুনিতে কষ্ট বোধ করে। মঙ্গলের নিমিত্ত সকলই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে কিছুই সুখ নাই।

মহন্তী সুখাচী নাহী।
যেথে দুঃখ উদণ্ডহী।
উদণ্ড দুঃখ লোকাচে।
ঐকতা উর ফাটতো॥
লোক হে বিকোরী-নানা।
কার অন্যায় বর্ততী।
পাহাবে কিতী তে ডোরা।
ঐকাবে শ্রবণ কিতী॥
বলিতা দুঃখ মানিতী।
অন্যায়ে ঘাত নেণতী।
সাঙ্গতা হিত বাটে না।
ঐকতা ত্রাস মানিতী॥
অখণ্ড সর্ব্ব সোসাবে।
ভলে পণাচি কারণে॥
পরন্ত সুখ তো নাহী।
কাহী কাহী ক্বচিত হী॥

যাহার চিত্ত লোকের নৈতিক অবনতি ও আর্থিক অভাব দেখিয়া এত কাঁদে, কি করিয়া বলিব তিনি সংসারে বিরাগী! রামদাসের বৈরাগ্য আত্মত্যাগে, সংসারের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না।

রামদাস দেশসেবার নিমিত্ত সাহিত্যসেবাও করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছোট ছোট কবিতা, অভঙ্গ ও রামায়ণের সুন্দরা ও যুদ্ধকাণ্ড এবং দাসবোধ পাওয়া গিয়াছে। দাসবোধ রামদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিখদের যেমন গ্রন্থসাহেব, রামদাসী সম্প্রদায়ের সেইরূপ দাসবোধ। বেদ ও পুরাণ অপেক্ষাও তাহারা এই গ্রন্থখানির সম্মান করে, কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহারা মীমাংসার সন্ধান দাসবোধেই পায়। রামদাস লিখিতেন সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীর জন্য। সুতরাং তাঁহার রচনায় পণ্ডিতী ভাষার বড় অভাব। পদগুলি সরল মধুর, কিন্তু সজীব। রামদাসের ব্যক্তিত্ব তাহার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত, পড়িলে মনে হয় যেন স্বামী রামদাস সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু এই রচনার সরলতাই দাসবোধের একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব নহে। এই দাসবোধের একাদশ দশকে স্বামী রামদাস সাধারণ ধর্ম্মের

কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশপ্রেম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইখানে তিনি বলিয়াছেন হরিনামকীর্ত্তনের মত রাজনীতি-চর্চ্চাও প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোন হিন্দু সন্ন্যাসী এমন কথা বলিয়াছেন কি না জানি না। এই গ্রন্থেই তিনি বৈরাগ্যে পরমার্থবাদের পরিবর্ত্তে অতি অভিনব-প্রপঞ্চে পরমার্থবাদ প্রচার করিয়াছেন। রামদাস যাহা বলেন—স্পষ্ট করিয়া বলেন। তাঁহার ভাব কখনও ভাষার পেঁচে অস্পষ্ট হয় নাই, অর্থ অলঙ্কারের ভারে চাপা পড়িয়া যায় নাই। তাই তাঁহার আনন্দ-বন-ভুবনের স্বপ্নে যেমন পররাষ্ট্রলোলুপ পাপীর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইরূপ দাসবোধেও স্বভাবতঃই বিধর্ম্মী দুর্জ্জনের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। এক কথায় বলা যায় দাসবোধ, স্বদেশ-প্রেমের বেদ।

দাসবোধের হিন্দী অনুবাদ আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ এখনও হয় নাই। ভারত-বর্ষের অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বড় সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়। বাঙ্গালা ভাষার বাছা বাছা বই হিন্দীতে মারাঠীতে গুজরাতীতে অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু ঐসকল ভাষার ভাল ভাল বইগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ নাই। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি একদিন আমাকে দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন ঐসকল ভাষায় অনুবাদের যোগ্য বই থাকিলে বাঙ্গালায় অনুবাদ হইত। জানি না, তিনি রামদাসের দাসবোধ, তুকারামের অভঙ্গ, নামদেবের অভঙ্গ ও আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে হরি নারায়ণ আপ্‌টের বইগুলি অনুবাদের যোগ্য মনে করেন কি না; আমার কিন্তু মনে হয় বাঙ্গালীর মনের এই সঙ্কীর্ণতা তাহার অযোগ্যতার পরিচায়ক। দাসবোধের প্রসঙ্গে আর-একটি প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন। রামদাসের ভক্তেরা মনে করেন যে সমর্থ স্বামীই (রামদাস) মহারাষ্ট্র জাতীয় জীবনের প্রথম উদ্বোধন করেন, শিবাজী তাঁহার হাতের যন্ত্র মাত্র ছিলেন। শিবাজীর সহিত রামদাসের কবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে রামদাসের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই শিবাজী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে অধ্যাপক ভাটে বলেন যে শিবাজীর উপর রামদাসের যতটুকু প্রভাব, তদপেক্ষা রামদাসের উপর শিবাজীর প্রভাব অনেক বেশী। তিনি বলেন যে দাসবোধ দশম-দশকেই রামদাস শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সপ্তম দশকে রামদাস লিখিয়াছেন—

সরলা শব্দাচী ঘট পট।
আলা গ্রন্থাচা সেবট।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে 'সেবট' বা সমাপ্তির আর বেশী দেরী নাই। শ্রীযুক্ত বিনায়ক লক্ষ্মণ ভাবেও তাঁহার মহারাষ্ট্র-সারস্বতে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দাসবোধের প্রথম অংশে সাধারণ বেদান্তবাদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাস্তবিক দেখিতে হইলে ঐ অংশের যথার্থ সমাপ্তি একাদশ দশকের পূর্ব্বেই হইয়াছে। তারপর একাদশ দশকে হঠাৎ নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। অধ্যাপক ভাটে বলেন যে দাসবোধের প্রথম অংশ রচনার সময়ে রামদাস শিবাজীর সহিত পরিচিত ছিলেন না। শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই প্রথম অংশ সমাপ্ত হইয়াছিল, তারপর শিবাজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া রামদাস দাসবোধের দ্বিতীয় অংশ রচনা করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত জুড়িয়া দেন। বাস্তবিক এই উভয় অংশের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নাই। অধ্যাপক ভাটে আরও বলেন যে চাফলের দানপত্র শিবাজীর শেষ বয়সে লেখা। শিবাজী রামদাসকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহাতে অল্পবয়সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই দানপত্র আরও অনেক দিন আগে লিখিত হইত। এই যুক্তি একেবারে অসার বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। কিছুদিন পূর্ব্বে পুণার ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডল একখানি শিবকালীন কাগজ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিবাজী আর-একজন ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর প্রায় সমসাময়িক জীবনচরিত সভাসদ-বখরে (এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে) রামদাসের নামের উল্লেখ একবারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিবাজী ও রামদাস উভয়েই দেশভক্ত। উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক। সুতরাং পন্থা বিভিন্ন হইলেও

তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সাক্ষাৎ হওয়ার পর শিবাজী রামদাসকে খুব ভক্তি করিতেন, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কারণ স্বামী সমর্থ শিবাজী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং মহারাষ্ট্রে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠায় শিবাজী রামদাসের হস্তের যন্ত্র মাত্র ছিলেন এমন কথা বলা চলে না। শিবাজী ও মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের মত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কাহারও হস্তের ক্রীড়নকমাত্র থাকিতে পারেন কি না তাহাতে খুবই সন্দেহ আছে। রামদাসকে বড় করিবার জন্য শিবাজীকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। স্বামী সমর্থ মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের জন্য এবং মারাঠী সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। অপর পক্ষে শিবাজীকে বড় করিবার জন্যও রামদাসকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা উভয়েই স্বাধীন ভাবে দেশমাতৃকার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতই তাঁহাদিগকে জীবনের মধ্যপথে মিলিত করিয়াছিল। শিবাজীর ভক্তি ও রামদাসের স্নেহ তাঁহাদের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে পরস্পরের সহায়তা করিয়াছে। এইটুকু বলিলেই বোধ হয় রামদাসের নিকট শিবাজীর ও শিবাজীর নিকট রামদাসের ঋণের সম্যক পরিচয় দেওয়া হইল।

শিবাজীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামী রামদাস দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—আমার শরীর নষ্ট হইল, কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপ দাসবোধ রহিল, আমার উপদেশ রহিল, তদনুসারে কাজ করিও, খেদ করিও না।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, অসাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই আমরা অবতারত্ব আরোপ করি। রামদাসও এই দুর্গতি হইতে রক্ষা পান নাই। শিবাজীকে তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিরা শিবের অবতার বলিয়া মনে করিত, আর ভক্তগণের মতে রামদাস ছিলেন মারুতির অবতার। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, মানুষের চরিত্রবল অপেক্ষা অন্য কোন শক্তি বলবত্তর হইতে পারে কি না, মহত্তর হইতে পারে কি না, সে তর্ক তুলিলে বোধহয় ভক্তবৃন্দ নাস্তিক বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু এই অবতারবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। স্বামী রামদাস অবতার; সুতরাং তাঁহার আদর্শ অনুকরণের অতীত বলিয়া ধারণা করিয়া লোকে সে চেষ্টা হইতে একেবারে নিবৃত্ত ও পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা আজিও মহারাষ্ট্রে বর্ত্তমান। তাঁহারা রামদাসের পূজা করেন, দাসবোধ পাঠ করেন, নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, কিন্তু যে দেশসেবা রামদাসের জীবনের ব্রত ছিল তাহা বোধহয় তাঁহারা আর-এক অবতারের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

কাক

প্রকৃতি-মায়ের আদুরে দুলাল
একেবারে বয়ে-যাওয়া!
ভোর হ'তে উঠে নেই কোন কাজ
খালি খাওয়া আর খাওয়া!
নৈবেদ্য যে দেবতার ধন
তা'তেও ডাকাতি!—একি জ্বালাতন!
ছেলের খাবার কেড়ে খেয়ে তোর
দেখিনি লজ্জা-পাওয়া!
বেজায় বেহায়া বখাটে রে তুই
একেবারে বয়ে-যাওয়া!

২

বিয়ের বাড়ীর আঙিনাতে যেথা
উলু-উলু উৎসব,
সেখানেও শুনি, দুরন্ত, তোর
সু-উচ্চ কলরব।
শ্মশানে যেথায় শুধু হাহাকার,
সেখানেও, পাজি, তোর চীৎকার!
সবখানে তোর আব্দার ওরে
বাড়াবাড়ি যেন সব!
বসন্ত-শীত-বর্ষা-শরৎ
চিরকেলে বেয়াদব!

"বনফুল"

সুকান্ত

এই নোটবুকের শেষপাতাগুলি যে এমনি শূন্য থাকবে তা কে ভেবেছিল। সারা সকাল ধোরে এর পাতাগুলো ওল্টাচ্ছি; কেমেষ্ট্রির নতুন সব ফর্‌মূলা, নতুন-নতুন উদ্ভাবনের ইতিহাস, জার্ম্মান অ্যামেরিকান রাসায়নিক পত্রিকা থেকে টোকা নোট, কত কথাই লেখা রয়েছে এতে। এই কেমিক্যাল রিসার্চ্চ ওয়ার্কের নোটবুকখানি আমার যৌবনের সাধনার ইতিহাস। এর পাতায়-পাতায় আমার কত তপস্যা কত আনন্দ কত স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে। যাক্, সব চুকে গেল, সব স্বপ্ন সব সাধনা শেষ হল।

ডাক্তার বারবার বল্‌ছেন, সুকান্তবাবু ও-খাতাগুলো হাতে নিয়ে অত ভাব্‌বেন না; ওতে মন আরো খারাপই হবে, জ্বর বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। কিন্তু এই বই আর খাতাগুলো কেড়ে নিতেও তিনি বলেন না। তিনি জানেন যে মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েছি, এ শেষের কটাদিন ল্যাবরেটরীর খাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে যদি একটু শান্তি পাই। পাতাগুলো ওল্টাচ্ছি, কখনো এক-এক পাতার মাঝখানে চোখ দুটো শ্রান্ত পাখীর মত চুপ কোরে পোড়ে থাকে, কখনো পাতার পর পাতা উল্টে যাই।

এই পরীক্ষাটা যদি আর একবছর কর্‌বার সময় পেতুম, একটা নতুন এলিমেণ্ট কি ল' বের কর্‌তে পার্‌তুম বোধ হয়। আর সাল্‌ফিউরিক এসিড্ বার কর্‌বার যে নতুন সহজ উপায়টা ভেবেছিলুম্ তা ত ঠিকই হয়েছিল। কাল এক জার্ম্মান পত্রিকায় পড়্‌লুম্, সেখানকারও এক রাসায়নিক এই উপায়টাই বের কর্‌তে চেষ্টা করেছেন। গেল মেলে জার্ম্মান পত্রিকাগুলো পেয়ে এত খুসী হয়েছি! তাদের মনের সঙ্গে আমাদের মনের যোগসূত্রটা যুদ্ধের আগুনে পুড়ে গেছ্‌ল, এখন রক্তের নদীর ওপর আবার যাতায়াতের সরু সাঁকো পড়েছে। এ ক'দিন ধরে শুয়ে কেবল এই জার্ম্মান পত্রিকাগুলো পড়েছি। আমি যে-সব নতুন রাসায়নিক পরীক্ষা কর্‌ব ভেবেছিলুম তার কতক-গুলো বার্লিনের এক বৈজ্ঞানিক দম্পতী যুদ্ধের তাড়ায় দিনরাত কাজ কোরে পরীক্ষা করেছেন, ফলও পেয়েছেন, দেখে এত আনন্দ হল! পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো কোণ থেকে যে-কোনো বিজ্ঞানতপস্বী সাধনা সেরে নূতন জিনিষ উদ্ভাবন করেছেন তার খবর পেলেই মন আনন্দে ভোরে যায়।

কিন্তু এখনও যে অনেক নূতন পথে খোঁজ্‌বার আছে। প্রতিদিন ব্যবহারের জিনিষগুলো আরও সহজে সস্তায় কি কোরে তৈরি হতে পারে তা ভাব্‌বার আছে। এই কেমিষ্টের পুঁথি ভোরে অনেক দূরপথ যাত্রার খস্‌ড়া তৈরি করেছিলুম, কিন্তু যাত্রা সুরু হতেই যে থাম্‌বার ডাক এল!

এটা কি আমার গর্ব্ব? যে কটি রিসার্চ্চ থিসিস্ পাঠিয়েছি তা ত পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা আদরের সহিত গ্রহণ করেছেন। যদি কাজ কর্‌তে পার্‌তুম, হয়ত দু-একটি জিনিষ বার কর্‌তুম যা কোনো দেশের কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবেননি। হ্যাঁ, সব পথেরই সন্ধান হবে, তবু আমি হয়ত অনেক আগে এ জগৎকে পথের খোঁজটা দিতে পার্‌তুম।

যাক্, সব চুকে গেছে; তার জন্যে কোনো দুঃখ নেই। এ দু'পাত লিখেই হাতটা ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ছে; কেশে কেশে বুকটা শ্রান্ত, পাঁজরগুলো বেদনায় ভরা। বুকটা আবার ব্যথা কোরে উঠ্‌ল, এখন কাশি হলেই খানিকটা রক্ত উঠ্‌বেই।

* * *

আমার জান্‌লার ঠিক তলা দিয়ে সবার আনাগোনার রাঙামাটির লাল পথ। সকালে এই পথ দিয়ে যাত্রীরা বৈদ্যনাথ-মন্দিরে যায়; সন্ধ্যেবেলা এই পথ দিয়ে রংবেরংএর কাপড়পরা বাঙ্গালীছেলেমেয়েরা ধারওয়া নদী থেকে বেড়িয়ে ফেরে। কোন্ পাহাড়ের কোল থেকে এ পথ নেমেছে, কত শালবন ডিঙিয়ে কত গিরিনদী পেরিয়ে কত কাঁকরভরা প্রান্তরের ওপর দিয়ে সহরে এসে পৌঁচেছে, তারপর বাজারের মধ্য দিয়ে মন্দিরের পাশ হয়ে দোকান-গুলোর তলা দিয়ে মাঠ পেরিয়ে এক হাত সে বাড়িয়ে দিয়েছে নন্দন-পাহাড়ের দিকে, আর-এক হাত বকের তৃষিত-কণ্ঠের মত ধারওয়ার দিকে নেমে গেছে। সেখানে সোনার বালুকারাশির উপর দিয়ে রূপার সুতার মত এক সরু জল-ধারা বয়ে যাচ্ছে; বহুদূর ঘুরে পথটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে এই রূপালি জল পান কোরে আকক্ষেতের পাশ দিয়ে লাফিয়ে

উঠে গেছে, তারপর রেল-লাইনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটেছে। এই পথটির দিকে তাকিয়ে আমার দিন কাটে, রাত আসে, রাত যায়, দিন আসে।

দুপুরের আলোয়-ভরা এই সোজা পথ খোলা পথ খোলা মাঠ খোলা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি, চেয়ে আছি, কি সুন্দর কি স্বচ্ছ নীল, কোথাও একটুকরো সাদা মেঘও নেই। এই আকাশটার দিকে চেয়ে-চেয়ে কতদিন কাটানো যায়, একটুও অতৃপ্তি হয় না। আর এই আলোর দিকে তাকিয়ে দিনে যেন স্বপ্ন দেখা যায় স্বপ্ন শোনা যায়, কি একটা মোহের আবেশে মন ভরে আসে। পৃথিবীর রূপকে দুচোখ ভোরে পান কোরে নিচ্ছি; এতদিন কখনো মাটির দিকে আকাশের দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আমার দিন কেটেছে ল্যাবরেটরীর গ্যাসের গন্ধে, বুন্‌সেন বার্নারের আলোয়, ষ্টেটটিউবের সঙ্গে, এসিড্ আর সল্ট্‌দের রাজ্যে। আর রাতও ত তেমনি কেটেছে। নানা দেশের কেমিক্যাল জার্ন্যাল পড়্‌তে-পড়্‌তে কত রাত জেগেই কেটেছে।

ছুটি, চিরদিনের জন্যে জন্মের মত ছুটি পেয়েছি, সব পরীক্ষা করা থেকে সব বইপড়া থেকে ছুটি। মৃত্যুর পরওয়ানা যেদিন ঘরের দুয়ারে এল, আমার ছুটি মিল্‌ল। রূপে রসে গন্ধে ভরা পৃথিবীতে মুক্তি পেলুম্, তাই এই কাঁকরছড়ানো শুক্‌নো মাটির দিকে, ওই কালোপাথর-ভরা বৃক্ষহীন নন্দন-পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছি। বাঙ্গলার মাটির দিকে চাইলেই মনে হয়, এ সত্যিকারের মা, এর অজস্র সম্পদ্, অফুরন্ত দান, সেই সুজলা সুফলা মাতার কি দিব্য শ্রী! কিন্তু এই ছোটনাগপুরের মাটির দিকে চাইলেই মনে হয়, এ যেন তাপসিনী, এর গৈরিক বেশ, মুণ্ডিত কেশ, রুক্ষ মূর্ত্তি; তপস্যার অগ্নিতে আপনাকে দগ্ধ কোরে মাটিকে পাথর করেছে। তবু কৃপণের ধনের মত চারিদিকেই যেখানে যেটুকু রং যেটুকু শোভা আছে তাই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে চোখ দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পথের ওধারে একটি ছোট সোনারংএর ধানক্ষেত; তার পাশেই উঁচু জমিতে আরও ছোট একটি হল্‌দে সর্ষেক্ষেত; তার পাশে আরও উঁচু জমিতে এক ছোট মাটির কুঁড়ে ঘিরে সবুজ বাঁশঝাড়। একটা শঙ্খচিল জান্‌লার পাশ দিয়ে উড়ে গেল, তার আধেক শাদা আধেক কালো পাখাদুটির দিকে চেয়ে-চেয়ে চোখ দুটি আকাশের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছল, সেখানে পাহাড়ের কালো মাথাটা আর একটা খেজুর-গাছের লম্বা পাতাগুলো নীল পটে আঁকা রয়েছে।

পাহাড়টার মত চুপ কোরে পোড়ে আছি দশদিন ধোরে, —দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। সমস্ত দুপুরটা কি নিঝুম, যেন রৌদ্রময়ী রাত। পাশের জনহীন বাড়ীটা কি নিস্তব্ধ, সব ঘরের দরজা জান্‌লা বন্ধ, একটু সাড়া শব্দ নেই।

চোখটা যখন বুজে আস্‌ছে, কানে কত রকমের আওয়াজই এসে বাজ্‌ছে। পাশে স্তব্ধ বাড়ীর ছাদে একটা ঘুঘু করুণ সুরে ডাক্‌ছে, কয়েকটা চড়াই-পাখী ফর্‌ফর্ শব্দে উড়ে গেল। একটা বোল্‌তা ঘরে ঢুকে বোঁ বোঁ কর্‌ছে, সার্সির কাঁচে বারবার ধাক্কা খাচ্ছে। একটা দম্‌কা বাতাস বয়ে গেল, পাশের বাড়ীর বন্ধ দরজা জান্‌লা কেঁপে বাতাসের ধ্বনি ঘুরে ঘুরে উঠ্‌ল। ছাদের এক কোণে দুটো পায়রা বাসা করেছে, তারা জেগে ডেকে উঠ্‌ল।

চারিদিকের আকাশ আলো মাটির দিকে ক্ষুধিত নয়নে চেয়ে আছি।

* * *

সব কথা যে গুছিয়ে লিখি এমন ইচ্ছে নেই, শক্তিও নেই, সব এলোমেলো লিখে যাচ্ছি। এই নিষ্ফলঙ্ক নীল আকাশ যেন কার অচঞ্চল চোখের নীলতারার অনিমেষ চাউনি; এই আঁখির আলোয় মুগ্ধ হয়ে দুধের মত শাদা বকের দল উড়ে উড়ে ফিরছে, কোথায় সব হারিয়ে গেল। এমনি আমার মনের আকাশে কত কথার ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষণিকের মধ্যে কোথায় সব মিলিয়ে যায়। আমার মনটাও ওই আকাশের মত নির্ম্মল, কোথাও একটু চিন্তা একটু দুঃখের লেশ নেই, সব ভাবনা সব চেষ্টা শেষ হয়ে গেছে, মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা কোরে আছি।

মনটায় বোসে কে যেন কথার মাকড়্‌সার জাল বুন্‌ছে, তা ধোরে লিখ্‌তে গেলেই ছিঁড়ে যায়। এ আপদ ত আমার ছিল না, অসুখেতে স্নায়ুগুলো নিশ্চয় দুর্ব্বল বিকল হয়ে গেছে, তাই বোসে বোসে সূক্ষ্ম জাল বুন্‌ছি।

যাতায়াতের লালপথের দিকে তাকিয়ে আছি, একটা ভাড়াটে গাড়ী রাস্তার ধুলো উড়িয়ে এদিকে আস্‌ছে, পূর্ণ

কালো ঘোড়া ছুটোর ওপর কোচ্‌মানের জীর্ণ চাবুকটা সপাসপ্‌ পড়্‌ছে, গাড়ীর মাথাটা ট্রাঙ্ক বেডিং বাস্কেট পুঁটুলি মোটে মোটে ভরা, একটি ছোট ছেলে ও একটি মেয়ে গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আনন্দের সঙ্গে চারিদিক দেখ্‌ছে; কি একটা হাসির কথা হল, ঘড়ঘড় শব্দ ছাপিয়ে কি মিষ্টি হাসির শব্দ। পাশের জনহীন বাড়ীটার সাম্‌নেই গাড়ীটা দাঁড়ালো। একটি যুবক আগে নাব্‌লেন, তারপর একটি মেয়ের হাত ধোরে একটি বৃদ্ধ নাব্‌লেন, তারপর একটি ছোট ছেলে আর একটি ছোট মেয়ে। পেছনে আর-একটি গাড়ী এল, দর্‌ওয়ান চাকর বামুনদের হাঁকাহাকি ডাকাডাকি চেঁচামেচি জিনিষপত্র নাবাবার দুম্‌দাম শব্দ, আর তার মাঝে ছোট ছেলে-মেয়েদের হাসি।

তলার রাঙা পথটা অন্ধকারে ভোরে আস্‌ছে, কয়েকটি বাঙালী মেয়ে গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছেন, ওই হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ী পরা মেয়েটি লাল বারাণসী শাড়ী পরিহিতাকে হেসে বল্‌ছেন—"তোমাদের ত ভাই দশ মিনিট লেগেছে, আমি পাঁচ মিনিটে নন্দন পাহাড়ে উঠেছি।" নীল-শাড়ী-পরা কিশোরীটি কি ফোড়ং দিলেন শোনা গেল না, তারপর কথা কাটাকাটি আর হাসি।

এখানে এসে বাঙালী মেয়েদের ঘোম্‌টা খোসে পড়েছে, হাঁড়ি-বেড়ির শিকল কেটে রান্নাঘর ভেঙ্গে উদার আকাশের নীচে মুক্তি পেয়েছেন, আমি যেমন ল্যাবরেটরী থেকে ছুট পেয়েছি। বাঘ যেমন প্রথম মানুষের রক্ত পান কোরে উল্লসিত হয়ে আরও রক্তের জন্যে মত্ত হয়ে ঘোরে, এঁরাও তেম্নি প্রথম মুক্তির আস্বাদ পেয়ে সমস্ত বাহিরের স্বাধীনতা লুট কর্‌বার জন্যে বেরিয়েছেন। পথের অন্ধকারে মুখগুলি দেখা যাচ্ছে না, কথাগুলি কানে এসে বাজ্‌ছে। কে কতদূর বেড়িয়েছেন, কে কোথায় কোথায় গেছেন, এইসব গল্প। আমার চলা ত বন্ধ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে শুয়ে আছি, ওঁদের চলাচলের গল্প শুনেই তৃপ্তি।

* * *

জনহীন বাড়ীখানা লোকজনে ভোরে গেছে, দিনরাত শুয়ে শুয়ে কত রকমই শব্দ শুন্‌ছি। মনে হয় যেন গতির জগৎ থেকে শব্দের জগতে এসে পৌঁচেছি, সব ধ্বনি একটা রহস্য একটা অর্থ নিয়ে কানে বাজে। আমার [redacted] ঘরের পুবের জান্‌লা দিয়ে দেখা যায় পাশের একতলা বাড়ীর রান্নাঘরখানি আর একটি শোবার ঘর। ওই ঘরটিতে মেয়েটি তার বই-খাতাগুলি টেবিলে গুছিয়ে আড্ডা করেছে।

আগুনের গানটা কানে বড় মিষ্টি লাগ্‌ছে। কতদিন গ্যাসের ক্লাস্ক নিয়ে যখন এসিড ফুটিয়েছি তার মধ্যে ত কোনো ছন্দ শুন্‌তে পাইনি। কিন্তু আজ সকালে মেয়েটি যে তার বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার জন্যে বিশেষ কোরে আপন হাতে কি ঝোল রাঁধ্‌ছিল, সমস্ত রান্নাটা যেন একটা গানের মত শোনাচ্ছিল জলের ঝরঝর, তেলের কলকল, ঝোলের থল-থল শব্দ আর তার সঙ্গে তার হাতের বালাচুড়ি তাল দিচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছিলুম সে আহ্লাদ কোরে বাট্‌না বাট্‌লে, বিশেষ কোরে কুট্‌নো কুট্‌লে, ঝোলটি নামিয়ে তার মুখ আনন্দে ভোরে গেল। মনে হচ্ছে ওই রান্নাঘরের মন্দিরে বোসে ওই উনুনের আগুনের হোমানলে মেয়েটি তার পিতাকে পূজা কর্‌ছে।

আর ওর ওই বস্‌বার ঘরটির দিকে তাকিয়ে কত কথা যে ভাব্‌ছি। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি, লজ্জা হচ্ছে। মেয়েদের জগৎটা আমার সম্পূর্ণ অজানা। বাড়ীতে মা, বোন, মাসি, পিসি, কাকি,—তাদের সঙ্গে খাবার সময় দুচারটে কথা ছাড়া কখনো বোসে গল্প করিনি, ঘরের বাহিরে মেয়েদের সঙ্গে কখনো মিশিনি। নাটক নভেল কবিতা পোড়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হয় শুনেছি, তাও আমার ভাগ্যে হয়নি। কবিতা আমি ঠিক বুঝিনি, কত নভেলের দুচারপাত পোড়ে বই ফিরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আজ যে কথাগুলো মনের মধ্যে জম্‌ছে সেগুলো যদি মিলিয়ে লিখ্‌তে পার্‌তুম হয় ত কবিতা হত। নিশ্চয় অসুখে আমার মনের স্বাস্থ্য ঠিক নেই, বড় সেন্টিমেণ্টাল হয়েছি।

কিন্তু ওর ওই বস্‌বার ঘরটি বড় সুন্দর। টেবিল চেয়ার তক্তা জিনিষগুলো সব অগোছালো পোড়ে রয়েছে; টেবিলে বই খাতা চিরুনি আয়না দোয়াত দেশলাই বিস্কুটের বাক্‌স —সব ছড়ানো, তবু যেন ঘরটি শ্রীতে ভরা। ওখানে যে একটি তরুণী নীড় বেঁধেছে, তার গলার সুরে চোখের চাউনিতে দেহের সৌরভে সমস্ত ঘর ভরা।

চায়ের পেয়ালার টুংটাং, চলার টুক্‌টাক্‌, বসার ফিস্‌ফাস,

কত রকম শব্দ। সব কথা কানে আস্‌ছে না, কিন্তু একটা সুর এসে বাজ্‌ছে। কত রকমের কথা গুঞ্জরণ কোরে উঠ্‌ছে, কখনো আদরের কখনো বেদনার কখনো ভর্ৎসনার কখনো বা অতিমিষ্ট হাসির। "বাবা, এত বেলা পর্য্যন্ত কি বোলে ওখানে বোসে ছিলে;" "আঃ, দরওয়ান আবার বলে পাঁউরুটি ছোঁব না;" "দাদার আর বাজার শেষ হয় না, কোন্ বন্ধুর বাড়ী গল্প হচ্চে আর কি;" "খুকি, কি বল্‌ছিস, আর একখানা বিলকুট্ না বিস্কুট, এই ত ভাত খাবার সময় হল, আচ্ছা, যা ওই টিনের বাক্সয় আছে;" "বুলু, লক্ষ্মী ভাইটি তেল মেখে চান কোর্‌তে যাও;" "ঠাকুর, তোমার ডাল্‌লাটা হল? সরো, বাবার ঝোলটা যে আমার শীগ্‌গীর কোর্‌তে হবে—"

প্রতি দিনরাত ঘরে যে কথাগুলি এতবার শুনেছি এতবার বলেছি তা যে এত মিষ্টি হতে পারে তা যেন আজ নতুন কোরে আবিষ্কার কর্‌ছি। এ আমার সব রাসায়নিক আবিষ্কারের চেয়েও যেন বড়।

সমস্ত বিকেল ওদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছি—"দিদি গো দিদি, বেড়াতে যাবে না?" "দিদি, আমার সেই নীলাম্বরীটা বার করে দাও।" "দিদলি ভাই, তোমার সেই বাসন্তী রংএর শাড়ীটা পোরে বেড়াতে যেতেই হবে।" "মিনির দিদি কেমন ভাল ভাল কাপড় পোরে বেড়ায়।" "খুকি, তোর গিন্নিপনা রাখ্। বুলু, লক্ষ্মী ভাইটি, মোজা পর, ধারওয়া বেড়াতে যাবে পোলের ওপর দিয়ে।" "দিদিমণি, রাতে কি কি রান্না হবে?" "ওই কুটনো কোটা আছে; আচ্ছা ঠাকুর, এইটুকু ঘি আছে বল্‌তে নেই, রাত্তিরে এখন লুচি হয় কি কোরে।—বুলু ভাই, বাবার ঘর থেকে শালটা নিয়ে আয়—দাদার আর ঘুম ভাঙ্গে না, দাদা অ দাদা,—খুকি একটু জল নিয়ে আয় ত—"

* * * *

কাল বিকেলে সতীশ দেখা কর্‌তে এল, স্কুলে তার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলুম। স্কুল-কলেজের মোড়-পথে এসে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, দশবছর পরে এই দেখা। তাকে পেয়ে ছেলেবেলার দিনগুলো যেন ফিরে পেলুম; পুরোনো ছেলেদের পুরোনো মাষ্টারদের কত গল্প হল। নানা গল্পের মধ্যে বোলে ফেল্‌লুম, "ভাই, একটা গান গাও না; মনে আছে এক প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসনে তুমি গান গেয়েছিলে, বেশ লেগেছিল।" সে বল্‌লে, "আমি ত তেমন গান গাইতে জানি না, আমার বোন বেশ জানে, তাকে কাল নিয়ে আস্‌ব।" আমি বল্‌লুম, "না—না, দর্‌কার নেই।" সে বল্‌লে, "তাতে আর কি হয়েছে, সে খুব খুসী হয়েই আস্‌বে। এমন অসুখে তুমি একা পোড়ে রয়েছ।"

* * *

কাল বিকেলে সতীশ তার বোনকে নিয়ে এসেছিল। বাইরের মেয়েদের সঙ্গে কখনো মিশিনি, ও সব এটিকেট্ মোটেই জানি না; তারপরে একটি অবিবাহিতা মেয়েকে কেমন কোরে অভ্যর্থনা কর্‌তে হয়, ব্রাহ্মসমাজের কি আইনকানুন আছে কিছুই জানা নেই। প্রথমে বড় ভয় হয়েছিল, মেয়েটি হয়ত ভাব্‌ছে, কি অসভ্য! ভাল মনে করেই কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌ব, কি মত প্রকাশ কোরে ফেল্‌ব, হয়ত সেটা আচারবিরুদ্ধ মনে হবে। তাই সতীশকে বলেছিলুম, দর্‌কার নেই।

ঘরে ঢুক্‌তেই দুহাত জোড় কোরে একটি ছোট নমস্কার কর্‌লুম। সেও অতি বিনয়ের সহিত মাথা নোয়ালে। অতি সহজ ভাবেই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু কোরে দিলে, কোথাও একটু সঙ্কোচ নেই, কিছু বাধ্‌ল না! আশ্চর্য্য, আমারও কোথাও কিছু ঠেক্‌ল না। সরল সহজ ছোট ছোট কথাগুলি—কয়েক মিনিট কথা কয়েই আমার সম্বন্ধে সব জেনে নিলে, কতদিন অসুখ করেছে, কে কে ডাক্তার দেখেছেন, কে কি মত প্রকাশ করেছেন, কি চিকিৎসা চল্‌ছে। সতীশ হেসে বল্‌লে, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে জেনে তার বোন্ তার এক বন্ধু ডাক্তারের মেয়ের কাছ থেকে যক্ষ্মা সম্বন্ধে বই আনিয়ে সারা দুপুর পড়েছে। মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সে সব কথা চাপা দিয়ে বল্‌লে, "আপনাকে এতক্ষণ বকানো বড় অন্যায় হচ্ছে, এখন দেহমনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম বড় দর্‌কার।" সতীশ দুষ্টুমি কোরে বল্‌লে, "একদিনে একখানা বই পোড়েই যে ডাক্তার হয়ে ছেড়েছ।" "চুপ কর দাদা, কি যা-তা বলো!" তারপর একটু থেমে বল্‌লে, "দাদা বল্‌ছিল, আপনি গান শুন্‌তে বড় ভালবাসেন। আমি খুব ভাল গাইতে পারি না, ভাল লাগ্‌বে কি আপনার?" কথা

সুরে কোথাও একটু অস্বাভাবিক গর্ব্ব ছিল না। আমি বল্‌লুম, "আপনি নির্ভয়ে গান গান; আমি জীবনে ক'বার গান শুনেছি তা আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়।" সে অতি মধুর হাস্‌লে, আবার বল্‌লে, "কিন্তু গান শোনা ত একটা excitant হতে পারে, একবার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করা উচিত নয় কি?" সতীশ বল্‌লে, "আচ্ছা; তোর ডাক্তারি রাখ্, এবার গান আরম্ভ কর্ দেখি।" আমি কিছু বল্‌লুম না। সে আমার শীর্ণ কালো মুখের দিকে চাইলে; নিশ্চয় সে আমার চোখের ভাষা বুঝেছিল। আমি ভাব্‌ছিলুম, "ডাক্তারকে আর কেন? জীবনের পাত্রখানা ত কিছুই ভরা হ'ল না, ভাঙ্‌বার সময় এল, শূন্যপাত্রে একটুখানি গানের সুধা দাও।"

সন্ধ্যার রাঙ্গা আলো মধুর কোরে আমার জান্‌লার পাশে বোসে কত গান সে গেয়ে গেল। গানের মাঝে বল্‌লুম, "সব গানের মানে যে বুঝ্‌ছি না।" সে বল্‌লে, "গান গাইবার কথা ছিল, মানে বোঝাবার কথা ত ছিল না;—আর সব কথার মানে নাইবা বুঝ্‌লেন, আমিই কি বুঝি! ঠিক্ সুরটা বাজ্‌লেই হল।" কি মিষ্টি সে হাসি।

সাড়ে সাতটা বাজ্‌ল; আকাশ তারায় তারায় ভোরে গেছে। শেষের গানটা তাড়াতাড়ি সেরে সে লাফিয়ে উঠ্‌ল, "বাবার খাবার সময় হয়েছে, আমায় যে এখুনি যেতে হবে; দাদা, তুমি তাহলে বোসো।" "মাঝে মাঝে এসে তাহলে—" সে বাধা দিয়ে বল্‌লে, "নিশ্চয়ই আস্‌ব, তবে ডাক্তারকে একবার জিজ্ঞেস কর্‌বেন।" তাড়াতাড়ি সে চোলে গেল। ভাব্‌ছি, আরও কি বলা উচিত ছিল, ধন্যবাদ জানানো—আরও কিছু! কিন্তু সে যে নেহাৎ মৌখিক ভদ্রতা, মুখে তখন এল না।

* * *

পাঁচটা বাজে, আর একটু পরেই সে আস্‌বে। আস্‌বে যে তার ত কোনো কথা নেই, সে ত এখানে এক যক্ষ্মা রোগীকে গান শোনাতে আসেনি, সে এসেছে বেড়াতে, আমার কাছে বিকেলটা নষ্ট কর্‌তে আস্‌বে কেন! তবু যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বোসে আছি, ঠিক জানি সে আস্‌বে।

* * *

এ ক'দিন লেখ্‌বার একটুও সময় পাইনি, মনের ছুটি নেই। রোজ বিকেলে মেয়েটি আসে, সতীশও আসে, গানে গল্পে রঙিন সন্ধ্যা সুন্দর মধুর হয়।

এবার পাশের বাড়ীটিতে সত্যই গান বাজ্‌ছে। মেয়েটি নানা কাজের মধ্যে হঠাৎ কোনো গানের দুচার লাইন গেয়ে ওঠে; সে যেন গানের ফোয়ারা; রান্নাঘরে ঢুক্‌ল, ঠাকুরকে কি হুকুম কর্‌লে, কি একটা গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এল। চা তৈরি কর্‌ছে, খুকিকে জামা পরিয়ে দিচ্ছে, একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ কোরে গাইছে, খুকিও তার সঙ্গে তাল দিচ্ছে। মশারির দড়িগুলি খুল্‌ল, টেবিলের বইগুলি ঝেড়ে গোচাচ্ছে, গাইছে "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর।" প্রভাতের নির্ম্মল উদার আলোয় এই বর্ষার সজল অন্ধকারের মেঘমল্লারের গান বড় মধুর শোনাচ্ছে, এতে বিরহের ব্যথার সুর একটুও নেই; আমার মনে হচ্ছে যেন আমার মন্দির পূর্ণ, হৃদয় কানায় কানায় ভরা।

মাঝে মাঝে যখন আমার ছোট কালো চোখদুটি তার দীর্ঘ উজ্জ্বল চোখ দুটির ওপর গিয়ে পড়ে, কিসের আলো ওই চোখ দুটিতে ঝলজ্বল কোরে ওঠে। সে কি প্রেমের, না করুণার?

সুন্দরী? তা জানি না; নারী-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোনো চর্চ্চা কখনো করিনি। এই কথাটাই বল্‌তে পারি, সে বেশ, বেশ ভালো, আমার ভারি ভালো লাগে তাকে। ইচ্ছে করে, শুয়ে শুয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধোরে তার সঙ্গে কথা কই।

কাল রাতে মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কচ্ছিল, কয়েকটি কথা কানে এল। "ছেলেটির বড্ড অসুখ বাবা।" "এখানে এসে একটুও সারছে না মা?" "একটু সেরেছেন, আগে একশ-এক জ্বর থাক্‌ত, আমাদের আসার কয়েকদিন পর থেকে একশয় নেবেছে, কাল নিরেনব্বই হয়েছিল। ভারি গান শুন্‌তে ভালবাসেন।" "তা তুমি যখন সময় পাবে মা, একটু গান শুনিয়ে এস, তবে বেশী কাছাকাছি বোসো না।" "সে ভয় নেই বাবা, তিনি ত প্রথমে ঘরে ঢুক্‌তে দিতেই চাননি; তারপর বিছানা থেকে দূরে ঘরের শেষ কোণে জান্‌লার পাশে বসান। বড্ড একা পোড়ে আছেন।"

*　　*　　*

কটা দিন যে কাটল, খেয়াল নেই। শুয়ে শুয়ে আকাশ আর আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে আগেকার ঘণ্টাগুলো বড় ধীরে কাটত, যেন শ্রান্ত পাখীর দল ক্লান্ত ডানা অতি মৃদু চলিয়ে নিঃশব্দে উড়ে চলেছে। এখনকার ঘণ্টাগুলো যাচ্চে হাত ধরাধরি কোরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সঙ্গীতমুখরা হয়ে। এক এক মুহূর্ত্ত যেন এক এক পেয়ালা, তা থেকে সুধা উপ্‌ছে পড়্‌ছে।

আমাদের দুজনের মনের দুটো দরজা একেবারে খুলে গেছে, আনাগোনার অন্ত নেই। কোনো কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে দুজনেরই কিছু বাধে না। উষা সময়ে অসময়ে দিনে শতবার আসে, গল্প করে, খবরের কাগজ বই পোড়ে শোনায়, গান গাওয়া কমেছে। আমার ঘরের এই জান্‌লা দরজা দিন রাতই খোলা থাকে; তার ঘরের জান্‌লা আগে কেবল রাতে বন্ধ হত এখন আর তাও হয় না। সে খুব ভোরে ওঠে, উঠেই আমার ঘরের দিকের জানলাটিতে এসে হেসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—কেমন ঘুম হল, কতক্ষণ ঘুমিয়েছি। চুলগুলোও ঠিক্ কোরে নেয় না। অনেক রাত্রে চাকরদের খাওয়া যখন শেষ হয়ে গেছে, বাড়ীর দরজা যত খিল দেওয়া আছে কি না, তার বাবার ও খুকির শোবার ঘরে জান্‌লা সব বন্ধ করা হয়েছে কি না দেখে সে যখন তার নিজের ঘরের জান্‌লার কাছে আসে, তখন আমার ঘরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কোনো কোনো দিন জিজ্ঞেস করে—ঘুমিয়েছি কি; সাড়া দিলে বলে—শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়ুন। দিনেও কতবার নানাকাজের অবসরে জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস করে—কি পড়্‌ছি, কি কর্‌ছি, খাওয়া হয়েছে কি না! এত সরল সহজ তার কথাগুলি!

কিন্তু রান্নাঘরের জান্‌লা থেকে সে ত মুখ তুলে কথা কয় না। কেন? সেখানে নিজের হাতে রেঁধে তার পীড়িত পিতাকে সেবা কোরে সে আনন্দ পাচ্ছে; কিন্তু আমাকে সে ত রান্না দিয়ে শুশ্রূষা কর্‌তে পার্‌ছে না, তাই হয়ত সে ব্যথা পায়, কথা কইতে লজ্জা বোধ করে। হয়ত যা ভেবেছি সব মিথ্যে, কিন্তু ভাব্‌তে বেশ ভাল লাগে।

প্রভাতের আকাশের দিকে চেয়ে আছি, পৃথিবী কি সুন্দরী।

*　　*　　*

কাল বিকেলে কত কথাবার্ত্তা হল; আমি এখন সেরে উঠ্‌ছি দেখে সতীশ কত আনন্দ কর্‌লে। বোনটিকে ঠাট্টা কোরে বল্‌লে, "তুমি এইবার এইখানে একটি স্যানিটেরিয়াম্ খোলো। গান শুনে যখন যক্ষ্মা রোগও সার্‌ছে, তখন তোমার গলায় আশ্চর্য্য দৈবশক্তি আছে নিশ্চয়।" মেয়েটি কিছু বল্‌লে না, মুখ রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠ্‌ল। আমি ভাব্‌লুম, গুণ কার, গানের, না গায়িকার, না শ্রোতার। সতীশ বল্‌লে, "ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে গেছেন, এমন গ্যালপিং থাইসিস্ কেস্ যে এমন পরিবর্ত্তন হতে পারে!" এখন থেকে একটু উঠে উঠে বেড়াতে আরম্ভ কর্‌তে হবে, তার বন্দোবস্ত কর্‌ছি। নিজের মনেও যেন একটা আশা হচ্ছে, বাঁচ্‌তে পারি। নিজে যখন হাল ছাড়্‌লুম, কোন্ কাণ্ডারী এসে হাল ধরেছে, তরী ভিড়্‌তেও পারে, সুন্দরী পৃথিবীর ঘাটে বাঁধা থাক্‌তেও পারি! বাঁচ্‌তে সত্যি বড়ই ইচ্ছে কর্‌ছে। মনে হচ্ছে জীবনের অনেক যে বাকী রয়েছে, শুধু কেমিক্যাল রিসার্চ্চ নয়; পৃথিবীর কত শোভা আছে, নারীর রূপও মুগ্ধ কর্‌ছে।

*　　*　　*

বাঁচ্‌ব কি না জানি না, কিন্তু একটুও দুঃখ নেই। কি তীব্র আনন্দে সব ভরা। মনের এ অবস্থাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। এমন আমার কখনও হয়নি। যা দেখি যা শুনি যা ভাবি সব যেন মধুভরা! মাঝে মাঝে ভাবি হয়ত এটা মস্তিষ্কের বিকার, মনের অস্বাস্থ্য। চারিদিক এত সুন্দর—ওই পাখীটে গাছটা পাথরটা, মানুষেরা, সব এত মিষ্টি। সে মেয়েটি যখন এসে ঘরে বসে মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছি, মেয়েটি এখন কি কর্‌ছে। রোগীর পথ্য রাঁধ্‌ছে, বাবার ঘরটি ঝাড়্‌ছে, খুকিকে স্নান করাচ্ছে, দাদার জামার বোতাম পরাচ্ছে, কি বই পড়্‌ছে, কি আমার কাছে একটু ঘুরে যাবে ভাব্‌ছে।

*　　*　　*　　*

মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, চারিদিক এত নিস্তব্ধ

মনে হয় পৃথিবীর বুকের ক্রন্দনধ্বনি শোনা যাচ্ছে; কিন্তু সে ধুক্‌ধুকানি শব্দ আমার বুকের; সেখানে যক্ষ্মা-বীজাণুর সঙ্গে জীবনীশক্তির লড়াই বেধেছে; কে জয়ী হবে, কখন্ স্পন্দনধ্বনি একেবারে থেমে যাবে বলা যায় না। জান্‌লার দিকে চেয়ে থাকি, ওই ঘরে প্রেমকরুণাভরা আর-একটি বুক ধুকধুক করছে, সে শব্দ যেন বছরের পর বছর না থামে। তারাগুলো এত কাছে মনে হয়, মাথার গোড়ায় তারা যেন আলোর মালা জ্বালিয়েছে।

* * * *

ওদের বাড়ীতে এক নতুন ভদ্রলোক এসেছেন, ওদের অতিথি। সতীশ বল্‌লে, "ভদ্রলোক আমেরিকা-ফেরৎ, কৃষিবিদ্যা-সন্ধানে কি পোড়ে এসেছেন, এখন গবর্ণমেণ্টের কি চাক্‌রীর সন্ধানে আছেন।" সতীশ হেসে বল্‌লে, "তবে আমেরিকার মাটি আর মিশিশিপির জলহাওয়া না হলে এখানে তিনি চাষ করতে পারবেন না।" মেয়েটির সঙ্গে তার নাকি বিবাহের কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

* * *

জ্বরটা আবার বাড়্‌ছে, হুঁসশক্তিও কোমে যাচ্ছে। ডাক্তার মুখ কালো কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কাল পাশের বাড়ীতে বড় ঝগ্‌ড়া হয়ে গেল; ঝগ্‌ড়াটা আমাকে নিয়েই। নতুন ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ গৃহস্বামীর নিকট মেয়েটির নামে নালিশ কর্‌ছিলেন, "এম্নি কোরে যক্ষ্মা-রোগীর বাড়ী যাওয়া ত স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়; তাছাড়া যক্ষ্মা-রোগীর বাড়ীর পাশে থাকাটাও ঠিক নয়।" বৃদ্ধ লোকটি ধীরে বোঝাচ্ছিলেন, যাতে বীজাণু বাইরে না ছড়াতে পারে তাতে আমি কত যত্ন নিই। উষা পাশের ঘরে বুলুকে স্কুলের আঁক বুঝিয়ে দিচ্ছিল; কথাটা উঠ্‌তেই ঝড়ের মত ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। এই সরল মিষ্টি ছোট মেয়েটির ভিতর যে এত তেজ লুকিয়ে ছিল জান্‌তুম না। সে দীপ্ত কণ্ঠে গিয়ে বল্‌লে তার বাবা সবই জানেন; সে যে আমার কাছে গান শোনাতে আসে, জান্‌লায় দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে গল্প করে তা তিনি নিজেও শুনেছেন। আর এ বিষয়ে কি বিপদ আছে তা বোঝ্‌বার বুদ্ধি এখনও তার বাবার আছে। তারপর কত কথা কাটাকাটি চল্‌ল। বৃদ্ধের ব্যথিত কণ্ঠ, ভদ্রলোকটির রুক্ষ ও মেয়েটির দীপ্ত।—কিছুক্ষণ পরে নতুন ভদ্রলোকটি সুড়সুড় কোরে ঘর ছেড়ে বাইরে চোলে গেলেন।

বাস্তবিকই মেয়েটির অন্যায় নতুন অতিথিটির একটু যত্ন নেয় না। অতিথিটি আশা করেন, বিকেল বেলা মেয়েটি তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যায়; তা নয়, সে আমার সঙ্গে গল্প কর্‌তে আসে। আমিও সেদিন বল্‌লুম, এটা বড় অন্যায় হচ্ছে। উষা শুধু একটু মিষ্টি হাস্‌লে।

* * *

সাম্‌নের মাঠে একটু বেড়াব বোলে ভাব্‌ছিলুম, ডাক্তার বারণ কোরে গেলেন, এ তিনদিন জ্বরটা বড় বেড়ে উঠেছে। পাশের বাড়ীর গানগুলো বড় বেসুর বাজ্‌ছে; উষা তার কাজের মাঝে আপন মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠে না, বার বার জান্‌লায় দাঁড়িয়ে হেসে গল্প করে না, দু-একবার আসে। বাড়ীতেও দিনে একটিবার আসে, যেন হাজ্‌রি দিতে।

* * *

কাল সন্ধ্যাবেলায় ট্রেনে ভদ্রলোকটি চোলে গেছেন। মেয়েটির মুখে হাসি ফিরে এসেছে; আজ সারা দুপুর আমার এখানে কাটালে। কত গল্পই যে হল। রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কারের গল্প, বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন স্বপ্নের গল্প —সে ছোট মেয়েটির মত যেন অবাক হয়ে রূপকথা শোনে। আজ বোঝাচ্ছিলুম, এক কালো কয়লা থেকে কেমন কোরে আল্‌কাৎরা আর সুগন্ধি এসেন্স তৈরি হয়। সে হেসে বল্‌লে, "অত বানিয়ে বল্‌বেন না।" যখন আল্‌মারি থেকে বই আন্‌তে বল্‌লুম, সে হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা, মেনে নিচ্ছি।" আর যখন আমার অসমাপ্ত রাসায়নিক পরীক্ষার কথাগুলো বলি, তার চোখ জ্বলজ্বল করে, আমার ভারি ভাল লাগে।

* * *

গানে গানে দিন রাত ভোরে গেছে। রাতের সব কাজ সেরে খোলা জান্‌লার পাশে এসে সে সেতার বাজাতে বসে। তারাভরা রাত্রির প্রহরগুলি ঝঙ্কারে ভোরে যায়;—এই সেতার-ঝঙ্কারে-ভরা রাত জীবনে আমার কটাই বা এসেছে, কটাই বা আস্‌বে?

* * *

পাশের বাড়ীতে ভোর বেলা থেকে হাঁকা-হাঁকি ডাকা-ডাকি পোড়ে গেছে, আজ সকালেই তারা যাবে।

কাল রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ কোরে সতীশ ও তার বোন এসেছিল, অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প হল। আমি ও সতীশই বেশী কথাবার্ত্তা কইছিলুম, ঊষা এককোণে চুপ কোরে বসেই রইল। আমি হেসে বল্লুম, "একটা শুনিয়ে যান্, এ জন্মে ত আর গান শুন্তে পাব না, এই জীবনের শেষ-গান শোনা হবে।" অন্যদিন এম্নি ভাবের কথা বল্লে সে কত রেগে উঠ্‌ত, কত প্রতিবাদ কর্‌ত; কাল রাতে কিছুই বল্লে না, চাপা গলায় একটা গান গাইলে। বল্লুম, "ঠাণ্ডা লেগেছে কি?" "কি জানি গলাটা কেমন ভেঙ্গে গেছে।" রাতে বিদায়ের সময় বোলে গেল, "আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বেন, কোল্‌কাতায় গিয়ে আমাদের বাড়ী যাবেন, নইলে ভারি রাগ কর্‌ব। আর দাদাকে চিঠি দেবেন, কেমন আছেন জানাবেন ঠিক;—ও-বিষয়ে কুড়েমি কর্‌লে বড় অন্যায় হবে।"

আমি হেসে বল্লুম, "কিছুদিন আমার চিঠি পেতে পারেন, তারপর আর নয়।"

সে বল্লে, "কেন?"

আমি বল্লুম, "পরলোক আর এ লোকের মধ্যে ত কোনো মেল্-সার্ভিস্ নেই।"—

মাথা নত কোরে চুপ কোরে ঘর ছেড়ে সে চোলে গেল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত খোলা জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাত যখন বারোটা বাজ্‌ল, বল্লুম, "ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে যে, গলা ত একে ভেঙ্গে গেছে।" "আপনি এখনো জেগে বুঝি?"—ধীরে জান্‌লা থেকে সোরে গেল।

নির্ভয়ে অনেক কথা বলেছি, কিন্তু একটা কথা যেন বলা হয়নি, সে কথাটি বলি-বলি কোরে বলা হয়নি, সে কথাটি যে কি ঠিক তা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। এখন ওই বাড়ীর দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে, সে কথা বল্লে হয়, এখনও সময় আছে, সেটা "ভালবাসি"। এই ভালবাসা কি ঠিক, এর প্রকৃতি কেমন, রূপ কি, ঠিক্ বুঝিনি। তাকে কি ভালবেসেছি, ঠিক্ জানি না। তবে এই কথা বল্‌তে পারি, "তোমায় বড় ভাল লেগেছে, তোমার গলার কথা তোমার চোখের চাউনি তোমার হাতের কাজ সব বড় আনন্দ দিয়েছে।"

জীবনের দুটি প্লট্ তৈরি করেছিলুম। একটা এই—ডি-এস্‌সি পাশ কোরে কোনো জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি হয়ে প্রফেসরি করা বা কোনো ম্যানুফ্যাক্‌-চারিং হাউসে কেমিষ্ট হওয়া—সারা জীবন নূতন নূতন পথ খুঁজ্‌ব, নব-নব পরীক্ষা কর্‌ব। আর একটা মায়ের মত যক্ষ্মায় মৃত্যু। শেষেরটাই ঘট্‌ল। কিন্তু প্লটের কোনোখানে এই মেয়েটির স্থান ত রাখিনি; কোন্ অজানা পথ দিয়ে অতর্কিতে সে এল, কেমন কোরে সে চোলে যাচ্ছে। বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোরে কোনো দিন ভাবিনি; বাড়ীতে তাড়া দেবার কেউ ছিল না; তা ছাড়া বংশানুক্রমে যক্ষ্মা হতে পারে ভেবে বিয়েটা ঠেকিয়ে-ঠেকিয়ে পেছিয়েই রেখেছি। তবু এই কথাটি মনের মধ্যে কাঁটার মত ব্যথা দিচ্ছে যে, যদি তাকে বলি, কি হয় কে জানে। কিন্তু বিবাহের অধিকার যে আমার নেই; আজ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি এই জন্যেই বলি-বলি কোরে এই কথা বলা হয়নি। ও ভাব্‌ছি, বল্লে হয়, এখনও সময় আছে, এখনি সে চ আস্‌বে। এই ত এক ব্রাহ্ম মেয়ের সম্বন্ধে শুনেছি, তিনি একটি ছেলেকে বড় ভালবাস্‌তেন, তারপর ছেলেটির যক্ষ্মা হল, মেয়েটি তবুও জোর কোরে বিবাহ কর্‌লেন, আপন শুশ্রূষায় তাকে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন। আমিও ত বেশ সেরে উঠ্‌ছিলুম, জ্বর খুব কোমে গিছ্‌ল, ওর যত্ন প্রেম পেলে সেরে উঠ্‌তে পারি। কিন্তু সেই আমেরিকা-ফেরৎটি,—তার স্বাস্থ্য আছে, অর্থ আছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।

হয়ত সমস্তটাই আমার বোঝ্‌বার ভুল। অন্ধদৃষ্টি দিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি; এই গান শোনানো গল্প করা—হয়ত এই ওঁদের সমাজের স্বাভাবিক ভদ্রতা, সবার সঙ্গে এঁরা এম্নি আপনার মতই মেশেন। যদি ভুলই হয়, শেষের এই কটা দিন যদি এই ভুল নিয়ে একটু আনন্দ পেয়ে থাকি, সে ভুল ভেঙ্গে কি হবে?

* * * *

সাম্‌নের লাল মাটির রাঙাপথ দিয়ে ট্রাঙ্ক-বেডিং-বোঝাই করা ভাড়াটে গাড়ী চোলে গেল। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে

খুকি ও বুলু রুমাল নাড়্‌লে, আমিও আমার রুমালটি তুলে নাড়্‌লুম। গাড়ীতে ওঠ্‌বার সময় ঊষা বড় ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে আর দেখা কর্‌তে বল্‌লুম না, দাদাকে কিন্তু ঠিক চিঠি দেবেন।" সতীশও কি একটা কথা বোলে উঠ্‌ল, ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। লাল ধুলো উড়িয়ে গাড়ী চোলে গেল, খুকি ও বুলু আমার বাড়ীর দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু ঊষা মুখ ফিরিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে রইল। ভেবেছিলুম, সকালে একটু সময় কোরে সে একবার আস্‌বে। জিনিষপত্র যখন বাঁধা হয়ে গেছে, খাওয়াও শেষ হল, সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমার বাড়ীর দিকেই আস্‌ছিল দেখ্‌লুম; সিঁড়িতে পায়ের শব্দও শুন্‌লুম, অর্দ্ধেক সিড়ি উঠে শব্দ মৃদু হল, আর-একটু পরে একেবারেই থেমে গেল, তারপরে শব্দ আরও ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। একটু পরেই দেখি যে সে পথ দিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্চে, জান্‌লার দিকে তাকালে না, রুমালে মুখ গুঁজে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে চোলে গেল।

গাড়ীটা পথের শেষ প্রান্তে মিশিয়ে গেছে যেন আকাশের গায়ে একটি ছোট পাখী।

* * *

পাশের বাড়ীটা আবার নিঝুম, সব গান থেমে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে বাতাসের একটা হাহা শব্দ; কোথায় একটু বালি খস্‌ছে, দরজা কাঁপ্‌ছে, জান্‌লা দুল্‌ছে! যেন বাজ্‌তে বাজ্‌তে সেতারের সব তারগুলো ছিঁড়ে গেল, শুধু একটি তার একটু কাঁপ্‌ছে।

* * * *

সারাদিন ধোরে কত গানের কত লাইন কত সুর মনে ঘুরে ঘুরে ফেরে। পাশের বাড়ীর ছাদে একটা ঘুঘু ডেকে ডেকে চুপ কর্‌ল। একটা ভ্রমর ঘরে ঢুকে ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে, সব দরজা জান্‌লা খোলা, তবু সে যেন বেরুবার পথ পাচ্ছে না, বারবার ছাতে দেওয়ালে আঘাত খেয়ে ফিরে আস্‌ছে।

* * * *

একটা লাইন মনে পড়্‌ল, "ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু!" প্রভু, আমার এই বেদনা ক্ষমা কর; যা পেয়েছি এই জীবনে, যা করেছি, যা পার্‌লুম না, তার জন্যে ক্ষমা কর।

ল্যাবরেটরীর নোটবুকগুলো আবার ওল্‌টাচ্ছি; ভেবে ভেবে যদি একটা নতুন থিওরি বের কর্‌তে পারি।—আর ওল্‌টাতে ভাল লাগে না।

* * * *

শুক্ল একাদশীর রাত্রি। সে আমাকে ওমর খইয়াম্ পোড়ে শুনিয়েছিল; আজ সারা দুপুর আবার বইখানা পড়্‌লুম। একটা ষ্ট্যাঞ্জা পোড়ে পোড়ে একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে—

Ah Love! could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits—and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire.

আজ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তাকে যে আমার ভাল লাগ্‌ছিল সেইটেই ভালবাসা।

* * * *

আমার এ খাতাখানার শেষপাতা যে এম্নি কোরে ভর্‌বে তা কে ভেবেছিল। সারা সকাল ধোরে পাতাগুলো ওল্টাচ্ছি, ওল্টাতে আর ভাল লাগে না। যাক্, সব চুকে গেল। ঊষা, সত্যই সে আমার জীবনে অরুণবরণা ঊষার মত এসেছিল, ঊষার স্বপ্ন শেষ হল! পাঁচ অঙ্কে জীবনের অভিনয় শেষ হয়ে মৃত্যুর যবনিকা পড়ে! এই পাঁচ অঙ্কে নারী পাঁচরূপে আসে! মাতা হয়ে সে আপন স্নেহকোলে জন্ম দেয়, বোন্ হয়ে সে ছেলেবেলায় খেলা করে, প্রিয়া হয়ে সে যৌবনে মন ভুলিয়ে ঘর বাঁধায়; কন্যা হয়ে সে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বার্দ্ধক্যে পৌত্রী হয়ে সে জীর্ণ জীবনতরীটার ছিন্নপ্রায় দড়ি পৃথিবীর ঘাটের দিকে টেনে ধোরে থাকে।

শৈশবেই আমি এই রোগে মাকে হারিয়েছি; আপনার বোন্ বল্‌তেও আমার কেউ ছিল না, যেটি জন্মেছিল খুব ছোট বেলাই মারা গেল। যৌবনের এই অঙ্কটি আরম্ভ হতেই মৃত্যুর যবনিকা পড়েছে। আমি নিজে ত বেশ বুঝ্‌ছি, কাল ডাক্তারও সিঁড়ি দিয়ে নাব্‌তে নাব্‌তে চাপা গলায় বল্‌লেন, আশা নেই

আবার কোথায় কিরূপে জন্মাব, পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মাব কি না জানি না। আত্মা কি জানি না। আমি শুধু জানি বিশ্বের সব জিনিষই অমর, কেউ হারায় না, লয়

পায় না, শুধু রূপ হতে রূপে যাওয়া। মনে পড়্‌ছে, ফার্ষ্ট-ইয়ারে আমাদের কেমেষ্ট্রির ডিস্‌পেপ্‌টিক্ প্রফেসরটি Law of Conservation of Dalton বোঝাতে তিন দিন তিন ঘণ্টা কি বক্তৃতাই না করেছিলেন, তবু আমরা কিছু বুঝিনি। কিন্তু আজ সে Lawটা এত সহজেই বুঝ্‌ছি, এত সত্যি মনে হচ্ছে; solid, liquid, gas, মাটি, জল, হাওয়া, সব জিনিষ এক হতে আর-এক রূপে চলেছে, কেউ হারাচ্ছে না, প্রত্যেকে কি বহুরূপী!

আবার যদি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মাই, ভারি ইচ্ছে করে, আমি ও সে এক বাড়ীতে ভাই বোন হয়ে জন্মাই, সে আমার ছেলেবেলার সব খেলা সব পড়া সব গান গল্পের সঙ্গী থাক্‌বে।

* * *

সন্ধ্যার আলো কি করুণ লাগ্‌ছে, যেন কোন্ মুমূর্ষু পাখীর চোখের আলো। সাম্‌নে ধানের ক্ষেত থেকে সব ফসল কাটা হয়ে গেছে; শূন্য মাঠে একটা শাদা বক মুখ গুঁজে পোড়ে রয়েছে।

মাঝে মাঝে ভারি ইচ্ছে করে একটা চিঠি লিখি,—একটা ছোট লাইন লিখে দিই, তোমায় কত ভাল লেগেছিল। না, আমার মনের কোনো ভাব জানাবার আমার অধিকার নেই। আমার রোগের স্মৃতি এক ক্ষীণ আঁচড়ের মত তার মনে আঁকা আছে। কয়েকদিন পরেই আমার জীবন শেষ হবে, সে দাগও মুছে যাবে। সেখানে গভীর ক্ষত কোরে দাগা রেখে যাব না, কাউকে ব্যথা দিতে মোটেই চাই না। সুখে থাকো; তোমার কল্যাণ হোক্। তোমার সংসার আনন্দে ভরা থাক্।

মনে আমার একটুও বিদ্রোহ নেই, বেদনা নেই। কিন্তু এখানে এসে এই মেয়েটিকে নিয়ে এই যে ঘটনাটি ঘোটে গেল, এ যেন একটা গল্পের মত। কেন বিশ্বশিল্পী এম্নি কোরে জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার প্রতিঘাতে প্রতি মানুষের জীবনের গল্প লিখে চলেছে, কেন সে এ প্লটটা এম্নি কোরে শেষ কর্‌ল, তা সেই জানে, আমি ত বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

* * *

সারা রাত আর ঘুম হয় না। নীল আকাশের সাগর ভোরে অগণিত তারার উজ্জ্বল দ্বীপগুলোর দিকে চেয়ে থাকি, বার বার মনে হয় মৃত্যু আমায় ডাক্‌ছে, চুপেচুপে সে বল্‌ছে নিয়ে যাবে সে গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় নীহারিকার অগ্নিময় পথ দিয়ে লোক-লোকান্তরে অন্তহীন পথ যাত্রায়, মঙ্গলগ্রহ প্রদক্ষিণ কোরে বৃহস্পতি পেরিয়ে অগ্নি-মেখলা শনি ডিঙ্গিয়ে ইউরেনাসের পাশ দিয়ে বরুণতারা ছাড়িয়ে সে একেবারে নিয়ে যাবে অসীম তারা-লোকে!

সারারাত হাওয়ায় কত রকমের শব্দ; গাছগুলো দুলিয়ে পাশের বাড়ী কাঁপিয়ে সে বারবার বলেছে, কোথায় যাবে। তারাগুলো দীপ্ত চোখে চেয়ে ডেকেছে, এসো, এসো। ভোর বেলা একে একে তারাগুলো সব মিলিয়ে গেল, অরুণবরণা উষার কোলে সূর্য্য সোনার শিশুর মত জন্ম নিল, চারিদিক আলোয় আলোয় ভোরে এল।

এখন নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ আলোয় ফেটে যাচ্ছে, উষার একটি গানের সুর এই প্রভাতী আলো ভোরে বাজ্‌ছে "আরো আলো, আরো আলো, মোর নয়নে প্রভু ঢালো।" কিন্তু এই প্রখর আলোর দিকে শীর্ণ চোখে চাইতে পার্‌ছি না; এত আলো হয়েছে, চোখ দুটো বুঝি ফেটে যাবে। দিনের আলো বেড়ে উঠ্‌ছে; বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার চোখের আলো নিবে আস্‌ছে—আর লিখ্‌তে পার্‌ছি না, আর লিখ্‌তে চাই না, আলোয় চোখ দুটো ফেটে যাক, আলোয় আলোয় চারিদিক দীপ্ত হয়ে উঠুক।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

বসন

দুঃখ-সুখের সূক্ষ্ম বসনখানি,
জীবন মাঝে হচ্চে বয়ন জানি।
প্রতি দুখের পার্শ্বে উজল সেই
সুখের পোড়েন্ রেশ্‌মী সুতার খেই!

এই ত সঠিক, এম্নি হওয়াই চাই—
মানব-জীবন দুঃখ-সুখের ভাই!
এইটি তোমার যেম্নি হবে জানা,
বিশ্বে তোমার কোথায় বাধা, মানা?

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

চিরন্তনী

(১৭)

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষা দিবার পর সুপ্রকাশ বাহির হইয়াছিল নিজের দেশটা ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইবার জন্য। কিন্তু একমাত্র বাংলা দেশটুকু দেখিতেই তাহার মাসের পর মাস কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিত না। হয়ত কোনো গ্রামে গিয়া দেখিল গ্রামের একমাত্র পথ নামের যোগ্য পথটি অর্দ্ধেক ধসিয়া গিয়াছে, গ্রামের লোকেরা সকলেই এ উহার ঘাড়ে কাজটা চাপাইয়া দিবার আশায় নিজে অসুবিধা সহ্য করিয়াও চুপ করিয়া আছে, যাহার দায় বেশী সেই উদ্যোগী হইবে। সুপ্রকাশ দশজনকে বলিয়া কহিয়া যেন তাহারই মাতৃদায় উপস্থিত এমনি মিনতি করিয়া সকলকে সাধিয়া সেই কাজে লাগিয়া গেল। দুই দিনের জায়গায় একটা গ্রামেই হয়ত একমাস কাটিয়া গেল।

দেখা গেল সহরে বেড়াইতে তাহার যতদিন লাগে গ্রামে তাহার চারপাঁচ গুণ প্রায়ই লাগিয়া যায়। বিশেষত যদি সে-গ্রামের দুইচার জনের সঙ্গে আলাপ থাকে।

রাজগঞ্জের গোপেশ-বাবুর খুড়তুতো ভাই ছিল সুপ্রকাশের বন্ধু। সেখানে আসিয়া সে শুনিল বন্ধুর দাদা এক মেয়ে-ইস্কুলের সেক্রেটারী হইয়াছেন, ইস্কুলটাকে বড় এবং ভদ্র করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু যতদিন শিক্ষয়িত্রী না জোটে ততদিন কেবল পুরাতন পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, তাহা হইলে মেয়েরা ঘুঁটে দেওয়া, শশা চুরি করা এবং গরুকে জাবনা দেওয়ার বেশী কিছু শিখিয়া উঠিতে পারিবে না। গোপেশ-বাবুর ভাই রমেশ বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, আমি পণ্ডিত-মশায়ের গরুটার ঠ্যাং ভেঙে এখুনি ওখান থেকে বিদায় করছি। তারপর সুপ্রকাশ আর আমি দুজনে মিলে রাতারাতি সব কটা মেয়েকে সফ্রাজেট বানিয়ে ছেড়ে দেব। কি বলিস রে, এখানে মাসখানেক থেকে যেতে পারবি?" সুপ্রকাশ ত রাজি! কিন্তু গ্রামের মাতব্বর লোকে দুটো আইবুড়ো ছোঁড়ার হাতে মেয়েগুলোকে ছাড়িয়া দিতে মোটেই রাজি নন। অগত্যা পণ্ডিতকে রাখিয়া দুই বন্ধুতে তাহার সহকারী হইয়া বসিল।

মেয়েদের সফ্রাজেট করিয়া তুলিবার আগেই শিক্ষয়িত্রী আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু গ্রামে একটা পুকুর উৎসর্গের ধুম পড়িয়া যাওয়াতে সুপ্রকাশকে আবার বন্দী করা হইল। বন্দী হওয়াতে যে সুপ্রকাশের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল তাহা বলা চলে না; কারণ যে শিক্ষয়িত্রীটি তাহার কাজের ভার হরণ করিয়া তাহার মুক্তিপথ খুলিয়া দিয়াছিলেন তিনি স্বয়ংই যেন ক্রমে সেই পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইলেন।

জরার কবলে মানুষ যতদিন না পড়ে ততদিন প্রতি পায়ে পায়েই তাহার পথটি নূতন রূপে দেখিতে সে উন্মুখ হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথম দিন, হইতেই যে জগতের সঙ্গে দেখা শোনা, তাহার মধ্যেও মানুষ রহস্যের আর তল খুঁজিয়া পায় না। সুপ্রকাশের চোখে সুন্দরী তরুণীর মূর্ত্তি ত কতই পড়িয়াছে। তবু আজ তাহাদেরই মত এই আর-একটি তরুণীর মধ্যে সে ক্ষণিকের দর্শনে কেন যে নূতন মাধুরীর আভাস পাইল তাহা কে জানে? সে ত দেখা দিয়াছিল পৃথিবীর আর পাঁচজনেরই মত করিয়া, তবু আজ শুধু একজন হইয়া সে সুপ্রকাশের দৃষ্টিপথ কেন যে জুড়িয়া বসিতে চাহিতেছিল সে কথা মানুষকে বুঝাইয়া বলিতে সে পারিত না। মানুষের চিরপুরাতন দৃষ্টির এ চিরনূতন বিভ্রম-ত আজ প্রথম হয় নাই!

পোড়ো ইস্কুল-বাড়ীটায় নিত্য যাওয়া-আসার ছুতা যে খুঁজিয়া মরিতেছিল, সে উৎসাহী কর্ম্মীর কাজের অভাব কি কখনও হয়? সহরের মানুষ কাজের সাথীকে কাজের ভিতর দিয়াই দেখে; কিন্তু কর্ম্মচক্র তাহার বিপুল আকার আর অবিরাম ঘর্ঘরধ্বনির সাহায্যে যেখানে মানুষের চোখকান বন্ধ করিয়া ফেলে না সেইসব পল্লীর কোলে কাজকে ছাড়াইয়া মানুষটা অনায়াসেই অগ্রসর হইয়া আসে। সুপ্রকাশ কবে যে কাজের সীমা আর ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের দেনা পাওনা সুরু করিল তা তাহার নিজের উন্মুখ মনও ধরিতে পারে নাই; তবে এটুকু সে বুঝিয়াছিল যে যাহার সঙ্গে দেনাপাওনা করিতে পারিলে সে নিজকে ধন্য মানিত সে-ই তখনও দাঁড়াইয়া ছিল দর্শকের জায়গায়, বন্ধুত্বের কোটায় আসিয়া পড়িয়াছিল অন্য আর

সবাই। ইহার জন্য দোষী সুপ্রকাশ আপনাকেই ঠিক করিয়াছিল; অন্ধ ত আর পরের দৃষ্টির দোষ ধরিতে পারে না।

অদর্শনে আপন মনে মনের কথা যাহার কানে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিত, দর্শন পাইলে কিন্তু তাহাকেই যাহা শুনাইত তাহা সভা ডাকিয়া বক্তৃতা দিলেও চলিত। গান-গল্পের পালা শেষ হইলে ক্লান্ত হইয়া যখন সকলে বিদায় লইত তখনও সে নিস্তব্ধ সভায় দুটি মানুষ বসিয়া থাকিত। অন্তর তাহাদের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত বলিয়াই বোধহয় বাহির অমন শান্ত স্থির হইয়া আসিত। কি একটা কথা যেন এ উহার মুখে শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, কিন্তু কিসের একটা ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম তাহাদের সে কথা তুলিতে দিত না, সে রাজ্যে একটু উঁকি দিতেও দিত না।

বাড়ী ফিরিয়া সুপ্রকাশ রোজই ভাবিত, যে কথাগুলো বলতে চাই, শুধু সেইগুলোই বলা হয় না; আর যে কথাকটা শুনতে চাই, শুধু সেইগুলোই শোনা হয় না; এ-ব্যাপার মন্দ নয়। আড়াল জিনিসটায় কল্পনার খোরাক জোটে ভাল, ভিতরটা কেবলই রঙীন হয়ে উঠতে থাকে, তাই বোধহয় আমার ভূমিকার আর শেষ নেই।

আমের মুকুলঝরা পুরানো দালানের জ্যোৎস্না-ধোওয়া কোণটিতে যে তন্বী সুন্দরী তাহার রহস্যগভীর ভাবদীপ্ত চোখ দুটি তুলিয়া উন্মুখ হইয়া নীরবে তাহার গান গল্প শুনিত, সুপ্রকাশের ইচ্ছা করিত তাহার সেই তরুণ হৃদয়ের রহস্যালোকের একটুখানি সন্ধান পাইতে, ইচ্ছা করিত তপস্বিনীর মত ক্ষীণ উজ্জ্বল এই মূর্ত্তিটি কোন্ তপস্যায় [illegible] তাহা একটুখানি জানিতে, কিন্তু ইচ্ছাটা অত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় কথায় তাহা প্রকাশ করিতে সে পারিত না। মন যাহা বলিতে চাহিত, গানের সুরে যদি তাহা ধ্বনিয়া উঠিত, তাহা হইলে সুপ্রকাশ সে গান গাওয়ার পরই তাহার সুর তাল মান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া নিজের মনের কথাটাকে ঢাকিতে চাহিত।

করুণা যখন অবিনাশের কথার উত্তর না দিয়াই, এমন কি কোনো চিঠি পত্র পর্য্যন্ত না লিখিয়া পলাতক আসামীর মত গোপনে রাজগঞ্জে পলাইয়া আসিয়াছিল, তখন সে ঠিক করিয়াছিল, তাহার ভীরু মনকে এই নির্জ্জনে বসাইয়া সে সাহসী করিয়া তুলিবে। যে তাহার জন্য এত করিল তাহারই নাম সে মনকে জপাইবে, সকল দ্বিধা সে দূর করিয়া দিবে, তারপর একদিন মন স্থির করিয়া সকল কথা লিখিয়া শেষ কথা বলিয়া পাঠাইবে।

বসন্তের বাতাসে শীতে জীর্ণ পাতা ঝরিয়া যাইতে পথ পায় না, ঝরা পাতার কোনো আপত্তি দক্ষিণ পবন শোনে না, তাহার এতদিনের বন্ধন সে একটি ঘায়ে শিথিল করিয়া দেয়। পল্লীর বসন্তলক্ষ্মী করুণাকেও তাঁহার স্পর্শে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার মনের এতসব দৃঢ় সংকল্প যে কখন কেমন করিয়া মলয়-পবনের ঢেউ লাগিয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছিল তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। তাহার পর সেই দখিনা বায়ুর একটি ঢেউ যে তাহার মনের দুয়ারে নূতন কি উপহার কখন রাখিয়া গিয়াছিল তাহাও বুঝিয়া দেখিবার আগেই উপহারটি সে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

দূরে আসিয়া মনকে শক্ত করিয়া সে মনে যাহার আসন পাতিবে ভাবিয়াছিল, সে মনের অবস্থা দেখিয়া একদিন সে আপনি চমকিয়া উঠিল। সুপ্রকাশকে দেখিয়া তাহার আনন্দ হইত, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? আনন্দ মানুষকে দেখিলে মানুষের হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে যখন বেদনা আসিয়া জুটিল, তখন করুণা যেন জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার এত দিনের সাধনার ধন আজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু যে বেশে তাহার আসিবার কথা তাহা ত আসিল না।

ইস্কুলের কাজের শেষে বাড়ীর কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া রোদপড়া মাঠের শান্ত শ্রীর দিকে সে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু সে ত শুধু সেই পল্লীশ্রীটুকুর মায়ায় নহে। সে যে কাহার আশাপথ চাহিয়া থাকিত তাহা নিজের কাছেই সে স্বীকার করিতে চাহিত না। কোনো দিন সে আসিত, কোনো দিন আসিত না। মাঠের পারে পথের বাঁকে সুপ্রকাশের চঞ্চল গতি দেখা দিবা মাত্রই করুণার মনটা আনন্দে উৎসুক হইয়া উঠিত, কিন্তু তখনি একটা নিবিড় বেদনা আসিয়া তাহার সে আনন্দটুকু ডুবাইয়া দিত। মনে হইত যতক্ষণ দেখি নাই ততক্ষণ দেখার আশাই দেখাটাকে মধুর করিয়া রাখিয়াছিল; এখন সে প্রতি পলে পলে দেখার আনন্দটা

ফুরাইয়া আসিতেছে। যে দেখার আশাপথ চাহিয়া সে এতক্ষণ বসিয়াছিল, সে দেখা যে আর আশার জিনিস রহিল না, সে দেখা যে অতীতে লুকাইয়া যাইতেছে, হাজার তপস্যা করিলেও যে আর সেই অতীত দেখাকে ফিরাইয়া পাইবে না, এই বেদনা তাহার বুকে বড় বাজিত। আনন্দ যে অক্ষয় হয় না, যত পাওয়া যায় পলে পলে সে যে ততই ক্ষয় হইয়া যায় একি কম দুঃখ! প্রতি দিনের দেখার সঙ্গে সেদিনকার প্রথম দর্শন তাহার জীবন-পথ হইতে চিরদিনের মত দূরে চলিয়া গেল এই কথাটা করুণার মনে জাগিয়া উঠিত।

করুণার বেদনা আরো তীব্র হইয়া উঠিত যখন সে মনে করিত তাহার এ আনন্দ-ধনি তাহার চেয়ে আপনার কাহার। করুণা রাত্রে বিছানায় শুইয়া চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়া ফেলিত ভগবানের এ অদ্ভুত বিচার দেখিয়া। যাহার জন্য সে মনকে গড়িতে আসিয়াছিল, যে তাহার জন্য পথ চাহিয়া আছে, তাহার দারিদ্র্যের সম্মান যাহার উপর নির্ভর করিয়া আছে, তাহাকেই কিনা সে আজ দূরে ঠেলিয়া দিল, আর মন ভরিয়া তুলিল তাহার স্বপ্নে যাহাকে সে এখনও ভাল করিয়া চেনেও নাই, যাহার সঙ্গে তাহার দুঃখ-দারিদ্র্যের কোনোই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক যদি কিছুই না থাকিত তবু সে ছিল মন্দের ভাল; কিন্তু আছে যে বড় কঠিন সম্পর্ক। এ যে তাহার দারিদ্র্যের বন্ধুর একমাত্র স্নেহের পাত্র।

কিশোর বয়স হইতে আপনাকে কেন্দ্র করিয়া কত স্বপ্নের মালা আর গল্পের জাল রচনা করা ছিল তাহার এক নেশা। সেসব কল্পনার রাজ্যে কত মানুষের মুখ, কত ঘরের ছবি, কত গানের সুর ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া আসিত আবার মিলাইয়া যাইত। সেসব ছিল করুণার মনোলোকের খেলা। সে জানিত বাস্তবে যদি ইহাদের অস্তিত্ব থাকে তবু তাহার কাছে ইহারা ঐ খেলার বেশী কিছু নয়। কিন্তু মনের এই খেলার ভিতর দিয়াই সে আসলের রূপ গড়িয়া তুলিতেছিল। তাহার খেলাঘরে কোনো মানুষ তাহার জড়রাজ্যের সমস্ত ভালমন্দ লইয়া দেখা দিত না। ভ্রমর যেমন ফুলের মধুটুকু মাত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়, করুণার কিশোর মন তেমনি করিয়া আপনার অজ্ঞাতে মানুষের মন, মানুষের রূপ, তাহার চিরন্তনী প্রীতির লীলা, সকল কিছুর ভিতর হইতেই তাহার মধুচক্রের জন্য মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাই প্রথম যখন সে প্রণয়ীর দর্শন পাইল তখন প্রণয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব না হইলেও সে সাড়া দিতে পারিল না, কারণ তাহার আকৈশোরের কল্পরাজ্যে তাহার মানসগগনবিহারীর কথার সুরে প্রেমের স্পর্শে তাহার মনোবীণা যেমন আপনি বাজিয়া উঠিত, বাস্তবে ত সে তাহার কোনো আভাস পাইল না। তাহার কল্পলোকের স্থান যে পৃথিবীতেও আছে, তাহা তাহার কল্পলোকই তাহাকে বুঝাইয়াছিল তেমনি করিয়া যেমন করিয়া বালিকার মাটির খোকার স্পর্শ তাহার প্রাণময় সন্তানের স্বপ্ন সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু তবু করুণা আশা করিয়াছিল, একদিন এই মানুষের ভিতর দিয়াই তাহার সেই আনন্দময়কে সে খুঁজিয়া পাইবে। তাহাকে পাওয়া যে তাহার বড় দরকার ছিল, তাই সে সাধনা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবে বলিয়া উমার মত তপস্যা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আজ এ তাহার কি হইল? তপস্যায় বসিবার পূর্ব্বে শিবের যে রূপ সে দেখিল তাহাতে ত আর সে মিথ্যার সাধনা করা চলে না। আজ তাহার মনে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহাকে চিনিতে ত আজ তাহার মনে আর দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চাই না। সে যে তাহার ঝঙ্কারে আর-সব সুর ডুবাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহার স্পর্শে আজ এ সকল-ডোবান সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ত সে চায় নাই।

মনোলোকের এইসব সংগ্রাম লইয়া যখন করুণা ব্যস্ত, তখনই এক দিন বৃদ্ধ তারিণীকান্ত তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে আর-একটা কথাও ভাবিবার আছে যেটা নিতান্ত মাটির পৃথিবীর মোটা কথা। প্রথম দিনের গানের মজ্‌লিসের শেষে তারিণী যে বলিয়াছিলেন "তোমার ঘাড়ে অতবড় ঋণের বোঝাটা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়," সেই কথাটার পুনরাবৃত্তি তাহার পর ক্রমাগতই হইতে লাগিল।

তারিণীকান্ত রোজই বলিতে লাগিলেন, "দেখ দিদি, এ আমার মহাপাপ হচ্ছে, ঋণী হয়ে মরার চেয়েও আমার অপরাধ বেশী হবে, যদি আমি আমার অপরাধ তোমার মত কচি মেয়ের মাথায় চাপিয়ে যাই।"

করুণা শেষে একদিন বলিল, "কিন্তু যা হবার তা ত হয়ে গেছে, তারা ত ধার শোধের টাকা আবার ফিরে দেবে না কাজেই ওর আর অন্য পথ নেই।"

তারিণীকান্ত যেন নূতন ভাবনায় পড়িয়া বলিলেন, "তা বটে, তবে কি করা যায়?"

করুণা কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল, "কি আর করা যাবে? আর কিছু হয় না।"

তারিণীকান্ত এরকম উত্তরে খুসি হইতে না পারিয়া বলিলেন, "না, দিদি, সে হতেই হবে। তুমি বল কার টাকা, আমি তার হাতে পায়ে ধরে তোমার ঋণ আবার আমার করে নেব। তার কাছে খত লিখে আজীবন খেটে শোধ দেবার কথা দিয়ে আস্‌ব।"

করুণা একটু মৃদু হাসিল। তারপর বলিল, "দাদামশায়, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ! তোমার আজীবন আর আমার আজীবন যে এক নয় এটা কি সে জানে না যে তোমার কথায় রাজি হবে?"

তারিণীকান্ত বলিলেন, "কিন্তু দিদি, আমি ভেবে দেখ্‌লাম, যে মানুষ তোর শুধু মুখের কথায় দু-হাজার টাকা দিতে পেরেছে, সে কি একটা বুড়োর কান্নায় তোকে মুক্তি দেবে না? সুদখোর পাষাণ সে যে নয় তা ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছি।"

করুণা অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া বলিল, "দাদামশায়, তুমি এমন অবুঝের মত কথা কি করে বল? আচ্ছা, ধর্‌লাম না হয় সে তোমার কথায় রাজি হল, কিন্তু যদি তুমি ঋণ শেষ করে না যেতে পার, তবে ধর্ম্মত আমিই আবার দায়ী হব কি না? যার দয়ার উপর তুমি অতটা আস্থা রাখ, তার কাছে কি তোমার নাত্‌নী আইনের ফাঁকি খুঁজে ঋণের দায় এড়াবে?"

তারিণীকান্ত কথাগুলো যে বোঝেন নাই তা নয়, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া তিনি যে দুর্ব্বলতার বশে এত বড় দায়টা করুণার মাথায় চাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই দুর্ব্বলতার ফলটা ফিরাইবার জন্য তাঁহার মনটা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল যে তিনি যে-কোনো সূত্র ধরিয়াই একটু কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িতেছিলেন। স্নেহের অধিকারে পিতাকে ঋণমুক্ত করিতে সন্তানের অধিকার আছে বটে, কিন্তু স্নেহের অধিকারে নিজের ঋণ সন্তানকে দিয়া যাইবার অধিকার কি কাহারও আছে?

তারিণীকান্ত অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দিদি, সে দয়ার সাগরটি কে আমায় শুধু সেইটুকু বল। যা করেছি তা ফেরান ত যাবে না; তোর মনেই যে ঋণ এঁকে দিয়েছি, তা পরকে বলে মুছে নেব কি করে? কিন্তু কার কাছে ঋণী হয়েছি, জেনে রাখ্‌লে আমার দুর্ভাবনাটা কম্‌বে।"

করুণা মহা বিপদ বোধ করিল। নামটা করিতে আজ তার বাধিতেছিল নানা কারণে। তাহার মনে হইল যেন ঐ নামটার সঙ্গেই মানুষটার সঙ্গে তাহার সকল সম্পর্ক তাহার মনের সকল দ্বন্দ্ব বাহির হইয়া পড়িবে। করুণা চুপ করিয়া রহিল। তারিণীকান্ত ভাবিলেন পাছে তিনি কোনো গোলযোগ বাধাইয়া বসেন সেই ভয়ে করুণা ইতস্তত করিতেছে। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার অমতে কিছু কর্‌ব না। নামটি বলে কেবল আমার দুর্ভাবনাটা ঘোচাও। সেটা যে আমার বুকে চেপে রয়েছে।"

করুণাকে অগত্যা বলিতে হইল। মুখখানাকে যথা সম্ভব সপ্রতিভ করিয়া করুণা বলিল, "অবিনাশ-বাবু।"

তারিণীকান্ত যেন চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "অবিনাশ! সত্যি? কিন্তু সে ত শুনেছি বন্ধকী না হলে এক পয়সা ধার দেয় না।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারিণীকান্তের মুখখানা কেমন উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হইয়া আসিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দিদি কি নিজেকে বাঁধা দিয়ে এলি?"

করুণার অতিশুভ্র মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠিল। সে কি একটা উত্তর দিতে দিতে থামিয়া গেল। তারিণীকান্ত উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, "আমার দুর্ভাবনাটা কাট্‌ল।"

করুণা তাঁহার পিছনে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "এই মাস থেকেই কিন্তু আমার ঋণ শোধ সুরু কর্‌তে হবে।"

তারিণী বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, আমিও তোর সঙ্গেই লেগে যাব, একটা ছেলে পড়ান জুটিয়ে নিয়েছি। তবে আমার পালাটায় শুধু রূপোই থাক্‌বে, রসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

(১৮)

সেদিন সন্ধ্যায় সুপ্রকাশ যখন করুণার পুরানো গানের বইখানা চাহিয়া শুনিল সেখানা আর-একজন কে লইয়া গিয়াছে, তখন সুপ্রকাশের কথায় কিছু মাত্র ব্যস্ততার লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও করুণা কেন জানি না হুড়োহুড়ি করিয়া সেখানা উদ্ধার করিয়া আনিল। বইখানা যে ফিরাইয়া পাওয়া গিয়াছে এই খবরটা নিতান্তই একটা সাধারণ খবর; কিন্তু পরদিন সুপ্রকাশ বইখানা আর চাহিল না দেখিয়া করুণা সে খবরটা আর কিছুতেই দিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কেবলি ভয় হইতেছিল. পাছে তাহার বই ফিরাইয়া আনার আগ্রহ ও অতিব্যস্ততাটা এই খবর দিবার ছুতায় সুপ্রকাশের কাছে ধরা পড়িয়া যায়। করুণা অনেক ভাবিয়া সুপ্রকাশ আসিবার আগে বইখানা ঘরের টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল, যদি আপনা-আপনি সেখানা সুপ্রকাশের চোখে পড়িয়া যায়। কিন্তু সুপ্রকাশ ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে করুণা একবোঝা খাতাপত্র তাহার উপর চাপা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। যেন টেবিলের উপর বইখানা রাখার একটা অতিবড় কৈফিয়ৎ না দিলে তাহার মাথায় কোন্ বিচারকের শাস্তির বজ্র এখনি ভাঙিয়া পড়িবে। বই না চাহিয়াই সুপ্রকাশ চলিয়া গেল।

সুপ্রকাশ চলিয়া যাইতেই খাতার বোঝার ভিতর হইতে বইখানা বাহির করিয়া করুণা পাতা উল্টাইতে বসিল। কতদিন ধরিয়া যেসব গান সে শুনিয়াছে আজ যেন তাহারা সব তাহারই মনের ছবি হইয়া চোখের কাছে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

করুণার ইচ্ছা করিতেছিল এই ছোট বইখানা উপলক্ষ্য করিয়া ইহার উপর ভর দিয়া তাহার মনের কথাগুলি সুপ্রকাশের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার একটি কথার আগ্রহ এ হাজার কথার মধ্যে যে কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা বুঝাইয়া দিবে কে, ছাপার অক্ষরের এই বইখানির সবকটি কথাই এক ছাঁচে ঢালা, তাহার বিশেষ কথায় তাহার কণ্ঠের আকুলতা দৃষ্টির ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিবে কি করিয়া?

টেবিলের একধারে একটা কাঁসার গেলাসে গোটাকতক পদ্মফুল সাজান ছিল। তাহারই একটা ফুল তুলিয়া ধরিতেই ঝরঝর করিয়া পাপ্‌ড়িগুলি খসিয়া পড়িল। করুণা তাহার মনের মতন গানগুলির পাতায় পাতায় একটি করিয়া পাপ্‌ড়ি সাজাইয়া রাখিল। বইখানার গোড়ার পাতায় বড় করিয়া নিজের নাম লিখিল; বাঁশীর সুরে প্রথম যে গানটা সুপ্রকাশের মুখে শুনিয়াছিল তাহার পাশে লাল পেন্সিল দিয়া একটা দাগ দিল। কিন্তু পেন্‌সিলের লাল দাগটা ফুটিয়া উঠিতেই করুণা ছুটিয়া গিয়া একটা রবার আনিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া দাগটা তুলিয়া ফেলিল। দাগটা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাতাটার এমন চেহারা হইল যে লাল দাগ থাকা তাহার চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল। করুণা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। ছি, ছি, একি বেহায়ার মত কাজ সে করিল! দাগটা দিয়া উঠাইবার এ প্রচণ্ড চেষ্টার অর্থ কে না বুঝিবে? হঠাৎ যেন সে বাহিরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে নিজেরই এই ছেলেমানুষী আর পাগ্‌লামি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে ত এমন পাগল কোনো দিন ছিল না। কোথায় গেল আজ সেই ধীর স্থির বিচক্ষণ করুণা? বিশ্বে যে পাগ্‌লামির হওয়া কত ধীরবুদ্ধির বুদ্ধি হরিয়া লইতেছে, সেই যে আজ শান্তমতি করুণার মনে পাগ্‌লামির রং ধরাইয়া দিয়াছে তাহা বিচারক করুণা বুঝিল না।

করুণা আরও দুই একটা জায়গায় অকারণ দাগ দিয়া ঘসিয়া তুলিয়া প্রথম দাগটার নিঃসঙ্গতার ইঙ্গিতটা ঘুচাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে কাহার পায়ের শব্দে চাহিয়া দেখিল সুপ্রকাশ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সুপ্রকাশ যদি অলক্ষ্যে একমুঠা ফাগও করুণার মুখে ছুঁড়িয়া মারিত তাহা হইলেও বোধহয় সে এমন অকস্মাৎ রাঙিয়া উঠিত না। তাহার রক্তিম মুখের দিকে তাকাইয়া সুপ্রকাশ নির্ব্বাক হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু তাহাতে ব্যাপারটা আরোই অদ্ভুত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমি সেই গানের বইখানার কথা জান্‌তে এসেছিলাম, সেখানা পেয়েছেন কি?"

করুণা বইখানা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুপ্রকাশ সেখানা দেখিয়া বলিল, "এই যে বইটা পেয়েছেন দেখ্‌ছি। আপনার দর্‌কার না থাকে ত দিন না।"

করুণা কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। পদ্ম-ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি তখনও গানের পাশে-পাশেই সাজানো রহিয়াছে। সুপ্রকাশের সাম্‌নেই সে কটা ঝাড়িয়া ফেলা যায় না, কিন্তু বইখানা না দিবারও ত কোনো সঙ্গত কারণ তখন তাহার মাথায় আসিয়া উঠিতেছিল না। করুণার এইরকম বিপদগ্রস্ত ভাবের অর্থ কিছু না বুঝিয়া অথচ তাহাকে একটু স্থির হইতে দিবার সময় দেওয়া দরকার বুঝিয়া সুপ্রকাশ আর কোনোও কথা না বলিয়া মুখ নীচু করিয়া সেই গানের বইখানার পাতাই উল্টাইতে আরম্ভ করিল। গানের কথা তাহার চোখে পড়িতেছিল না, সে কেবল নিজেকে একটা কাজে লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টাতেই পাতা উল্টাইতেছিল, মনে-মনে ভাবিতেছিল করুণার এমন ব্যাধভয়ভীতা হরিণীর মত বিড়ম্বিত অবস্থার কথা। তাহার ভীত চোখ, রক্তিম মুখ আর স্খলিত অঞ্চলে তাহাকে সুপ্রকাশের চোখে বড় সুন্দর লাগিয়াছিল, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব রূপসৃষ্টির কারণটা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

করুণা দেখিতেছিল তাহারই চোখের উপর গানের পাশের পাপ্‌ড়িগুলি এক-একটি করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। সুপ্রকাশ না জানি কি বলিবে, না জানি কি ভাবিবে? দুই একটা পাপ্‌ড়ি উড়িয়া আসিয়া করুণার গায়ে পড়িল, সুপ্রকাশ কিন্তু সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করিল না। খানিক পরে কেবল বলিল, "বইখানা নেব, না থাক্‌বে?"

যাহা সে লুকাইতে চাহিতেছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া করুণা বাধা দিবার আর কোনো কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, "না, নিন, আমার কিছু দরকার নেই।"

আর কিছু না বলিয়া সুপ্রকাশ বইখানা লইয়া চলিয়া গেল।

পদ্ম-পাপ্‌ড়িগুলি যে বিশেষ এক-একটি গানের ভূষণ হইয়া তাহাদের পাশে-পাশে বিরাজ করিতেছিল সুপ্রকাশের মাথায় সে কথাটা প্রথমে ঢোকে নাই। সে বাড়ী আসিয়া অনেক ভাবিয়া স্থির করিল যে এই পাপ্‌ড়িগুলিকেই সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্ত বোধহয় তাহাদের বইয়ের পাতায়-পাতায় চাপ দিয়া রাখা হইতেছিল। ফুলপাতাকে এমনি করিয়া বহুকাল জিয়াইয়া রাখিবার বিলাতী দস্তরটা যে বঙ্গবালাদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে একথা সুপ্রকাশের জানা ছিল। ফুল রাখার জন্তই অনেকে ফুল রাখে, সব সময়ই যে তাহা স্মৃতির সৌরভে আকুল বলিয়া রাখে তাহা নয়।

কিন্তু করুণার তখনকার মুখখানা মনে করিয়া সুপ্রকাশ নিজের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে বইখানার পাতা খুলিয়া একটি একটি করিয়া পাপ্‌ড়ি তুলিয়া দেখিতে লাগিল, ইহার ভিতর কোনো রহস্ত আবিষ্কার করা যায় কি না। হঠাৎ একটা পাপ্‌ড়ির পাশের গানের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। এই সেই গানটি নদীর ধারে চাঁদনী রাত্রে যাহার সুর সে বাঁশীর কানে-কানে সেই বিশেষ দিনে গাহিয়াছিল, যাহার সূত্রে তাহার সুরজ্ঞানের কথা তাহার মুগ্ধ শ্রোত্রীর কানে প্রথম উঠিয়াছিল। তাহার পর আরও কত জ্যোৎস্নাময়ী রজনী গিয়াছে, এই গানের সুর আরো কত দিন চন্দ্রের সুধার মত তাহার মনকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু সেই নদীর ধারের নির্জ্জন গাছতলা, সেই লুপ্তস্রোত নদীগর্ভের শুভ্র বালুকারাশির আর প্রয়োজন হয় নাই। একজোড়া চোখের সুরমুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যেই সে-সব সৌন্দর্য্য সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। সুপ্রকাশ দেখিল গানের কথার পাশের কি একটা রেখাকে তুলিয়া ফেলিবার প্রবল চেষ্টা পাতাটিকে জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কি একটা আনন্দে সুপ্রকাশের রক্তস্রোত একটু যেন নাচিয়া উঠিল। সুপ্রকাশ পাতা উল্টাইয়া পদ্ম-পাপ্‌ড়ির চিহ্ন ধরিয়া আরো দুই একটা গান আবিষ্কার করিয়া খুসী হইয়া বইখানা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। তাহার পর হঠাৎ একটু বিষণ্ণ হইয়া বইখানার মধ্যে আরো যেন কি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বর্ষশেষের সন্ধ্যা। একটা আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় বসন্তলক্ষ্মীর নৃত্যচপল গতি যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রিয়বিচ্ছেদকাতর তরুণীর অশ্রুভারাক্রান্ত আঁখিপল্লবের মত গাছের ডালপালাগুলিও মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। শুক্‌নো পাতার কোলে আম্রমুকুল হাসিয়া ঝরিয়া উড়িয়া পড়িতেছে না। পশ্চিম আকাশে সূর্য্যের শেষ রশ্মিজাল যেন সহস্র বাহু দিয়া আজিকার দিনান্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বিদায়-চুম্বন দিয়া যাইতেছে।

করুণা ব্যস্ত হইয়া রান্নাঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজ অগ্নিদেবও বোধহয় বর্ষবিদায়ের ব্যথায় অশ্রুময় হইয়া উঠিয়াছিলেন, উনানের কয়লা আর কিছুতেই ধরিতেছে না। আজকার দিনটা এমন করিয়া মাটি করিবার ইচ্ছা করুণার মোটেই ছিল না। কিন্তু বিধি বাম। সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, ভিজা কয়লার ধোঁয়ায় আর বিরক্তিতে করুণার চোখে জল ততই ভরিয়া উঠিতেছিল। তাহার চুলে চোখে মুখে ছাই উড়িয়া পড়িয়াছিল, দুই হাত কয়লার কালিতে ভরিয়া গিয়াছিল; আঁচলটা লুটাইয়া তেলের বাটির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। রণু সদর দরজার কাছ হইতে একটা হাঁক দিয়া চলিয়া গেল, "দিদি, সুপ্রকাশ-বাবু এসেছেন।"

করুণা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তেলে ভিজা আঁচলটা কয়লার কালিমাখা হাতের উপর আসিয়া পড়িয়া আরো কিম্ভূতকিমাকার হইয়া উঠিল। জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া করুণা দেখিল রণু ছুটিয়া আম-বাগানের ভিতর চলিয়া গেল। এই বেশে সুপ্রকাশের সাম্‌নে সে কি করিয়া বাহির হইবে ভাবিয়া পাইল না। ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বসিতে বলিতেও মুখে বাধিল, দেখা দিতেও পা উঠিতেছিল না। অরুণাকেও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। হাতপাখাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া করুণা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ঘড়ার জলে হাত ধুইতে বসিল। তেলে কালিতে মিশিয়া যা বিচিত্র বাহার খুলিয়াছিল, তাহা দূর করা গেল না। রাগ করিয়া সে ঘটীটা গড়াইয়া ফেলিয়া দিল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া যে ফিটফাট হইয়া আসিবে তাহারও জো নাই, পথেই ত তাহা হইলে সুপ্রকাশের সাম্‌নে পড়িয়া যাইতে হইবে। করুণা ঘরের ভিতর গুম হইয়া বসিয়া রহিল; কয়লা-মাখা হাতে আর কাহারও সাম্‌নে বাহির হইতে ত তাহার কোনও দিন এত লজ্জা হয় নাই, আর আজ বাহির হইবার জন্য মনটা বুকের ভিতর আছাড় খাইতেছে, তবু এইটুকুর জন্য তাহার এত লজ্জা কিসের? রাগে বিরক্তিতে করুণার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে আঁচলেই তেল কালি মাখা হাত দুখানা ভাল করিয়া মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল কাহারও সাড়া না পাইয়া ঘরের দরজার উপর গানের বইখানা রাখিয়া সুপ্রকাশ চলিয়া যাইতেছে। তাহার চওড়া জরির আঁচল দেওয়া চাদরের কোণটুকু শুধু একবার চোখের সাম্‌নে দিয়া ঝল্‌কাইয়া গেল।

নিজেকে ধরিয়া খুব জোরে গোটা দুই ঝাঁকুনি যদি দেওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় করুণা তখন একবার হাতের সুখটা করিয়া লইত। কিন্তু তাহা যে যায় না। করুণার ইচ্ছা করিল চীৎকার করিয়া ডাকে, কিন্তু কি বলিয়া ডাকিবে সে? মনে মনে সব ভুলিয়া মানুষকে ডাকিলে নাকি সেও অন্তরের ডাকে সাড়া দেয়। করুণা দরজায় দাঁড়াইয়া এক মনে কেবলি জপিতে লাগিল, "ফিরে এস, ওগো ফিরে এস।"

শিবের জটার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে আকাশ ভরিয়া উঠিল। একটা প্রচণ্ড দম্‌কা বাতাসে স্তব্ধ গাছপালা সব যেন একসঙ্গে বুকফাটা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। ঘরের যত দরজা জানালা একসঙ্গে যেন অভিমান-ভরে আছড়াইয়া পড়িল। অন্ধকার দরজা ছাড়িয়া করুণা আসিয়া ঘরের মেঝেয় শুইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার যে রান্না বাকি? চোখের পতো মুছিয়া সে রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল।

রাত্রে গানের বইখানা খুলিয়া করুণা দেখিল, তাহার পদ্ম-পাপ্‌ড়িগুলি একটিও নাই। হাসিয়া সে বইখানা সযত্নে তুলিয়া রাখিল। কোথায় গেল পাপ্‌ড়িগুলি? ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে কি? তাহ'লে কি একটিও বাকি থাকিত না?

আজ বৎসরের শেষ দিন। আজ বিদায়ের দিনে শীতের শেষের বসন্তের আমেজের মত একটা নূতন রূপে একজনকে দেখিতে পাইবে বলিয়া করুণা আশা করিয়াছিল। তাহার সে আশার কোনও পূর্ব্বাভাস সে পায় নাই। কিন্তু তাহার মন যে একান্তে কেবল তাহাই চাহিতেছিল ইহাই কি যথেষ্ট কারণ নয়! কোনোদিন যে কথা সে তাহার প্রিয়ের মুখে শুনে নাই, আজ সেই-সব কথা তাহার মুখে সে নিজের মনে দেখা হইবার আগেই সাজাইয়া রাখিয়াছিল; কোনো দিন যে হাসি সে তাহার চোখে মুখে দেখে নাই, আজ ভোর না হইতে

শুধু শুধু আপন মনে কত কারণে সেই হাসির রঙে তাহার অনাগত অতিথিকে সাজাইয়াছে। কিন্তু সে যখন আসিল, তখনই কি ছাই তুচ্ছ বেশ-ভূষার লজ্জা তাহাকে ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখিল? করুণার মন তাহাকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছিল, সে বাণী রোজকার মত আজও ত মিথ্যা হইতে পারিত, তাহার চেয়ে এই কল্পনার মাধুর্য্যই ভালো ভাবিয়া করুণা আপনাকে সান্ত্বনা দিল। গানের হারানো পাপ্‌ড়িগুলি লইয়া সে কি একটা আনন্দের সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই আনন্দের দোলায় ক্ষণে ক্ষণে সে শিহরিয়া উঠিতেছিল, আবার শুধু কল্পনার খেলা বুঝিয়া বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

ভালো করিয়া ঘুম না হইতেই করুণার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত ধরিয়া যে-সমস্ত স্বপ্ন সে দেখিয়াছে, তাহাদের স্মৃতি তখনও মুছিয়া যায় নাই। আম-বাগানে সারা রাত বসন্তের বিদায়-বাঁশী ধরণীর কানে কানে ডাকিয়া গিয়াছে, করুণা স্বপ্নে আর কাহার যেন বাঁশীর সুর শুনিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে; শেষ রাত্রের হাওয়ায় তাহার নিজেরই খোলা চুল চোখে মুখে বুলাইয়া গিয়াছে, তাহারই মৃদু স্পর্শে সে কাহার যেন স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়াছে। সেই সারারাতের দেখা মানুষটিকে আবার দেখিবার লোভে করুণার ইচ্ছা করিতেছিল আবার চোখ বুজিয়া স্বপ্নপুরে ফিরিয়া যায়। অনেক চেষ্টাতেও ঘুম কিন্তু আর আসিল না। যাহাকে মানুষ সাধিয়া ফেরে, সাধাইবার নেশা তাহাকেই চাপিয়া ধরে, তাই নিদ্রাদেবীও আজ মান করিয়া বসিলেন।

যাহাকে ঘুমন্ত চোখে দেখিবার লোভটুকু ছাড়িতে করুণার কষ্ট হইতেছিল, ঘরের বাহিরে আসিয়া সবার আগেই পথের বাঁকে তাহাকে দেখিয়া করুণার নববর্ষ যেন সার্থক হইয়া গেল। পুরাতন বৎসরের রাত্রির ঘন অন্ধকারের কোলেই যেমন নববৎসরের আলো ফুটিয়াছে, তেমনি কি তাহার অশ্রুধারার কোলেই হাসির আলো জ্বলিয়া উঠিবে?

করুণা ছুটিয়াই আরো খানিকটা আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। সুপ্রকাশ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, "কাল সন্ধ্যায় এসে ফিরে গিয়েছি, তাই আজ সকাল হতেই এসে হাজির হলাম।"

করুণা বলিল, "নববর্ষের দিন সবার আগে আপনারই মুখ দেখ্‌লাম।"

সুপ্রকাশ হাসিতে সমস্ত মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া একবার করুণার দিকে তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমিও বৎসরের প্রথম দিনে সবার আগে এই পথ ধরে যাত্রা করেছিলাম, তবে পথে অনেক বাজে মানুষের মুখ দেখা হয়ে গিয়েছে; তা পৃথিবীতে সুন্দরের সন্ধানে যেতে অসুন্দরকে পার হয়ে আস্‌তে ত হবেই। তা নইলে আর সুন্দরের মূল্য কি?"

করুণা এই কথা কয়টির মধ্যে যে সুরটি শুনিল তাহাতে তাহার সমস্ত মনটা যেন এক নিমিষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যেই রাজ্যের শুভ ইচ্ছায় ধারা বর্ষণ করিতে করিতে অরুণা ও রণু আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা বলিল, "বছরের প্রথম দিন সকালে উঠেই আপনাকে দেখ্‌লাম, সুপ্রকাশবাবু, রোজ সকালেই আপনাকে দেখব নাকি? তাহলে ত আমাদের এই ভাঙা দালানেই আপনাকে বাসা বাঁধ্‌তে হয়।"

রণু বলিল, "হ্যাঁ বেশ্‌ ত; এইখানেই থেকে যান।"

সুপ্রকাশ বলিল, "তা আর হল না ভাই; বছরের প্রথমেই আজ আমি যাত্রা করছি; আজ আমার অযাত্রা যাত্রা না হয়, তাই তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এলাম। এই পৃথিবীটার সব কিছুই আমরা জন্মাবার এত আগ থেকে গড়্‌তে সুরু করেছে যে নিতান্ত দুচার দিনের জন্যে আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের পথ চেয়ে চল্‌লে তার নিজের পথ বদ্‌লাতে হয়। কাজেই সকলের আনন্দের দিনটাতেই আমার নিরানন্দের দিন করতে হল। তবে তোমরা যদি মনে রাখ, তাহলে দূর থেকেও তোমাদের যে স্পর্শ পাব তাই আমার অনেক হবে।"

রণু মহা গোলমাল করিয়া উঠিল, "না, না, যেতে পাবেন না, ভারি অন্যায়।" করুণা ভাবিতে লাগিল, "এ বিদায় কার কাছে চাওয়া?" রণু ও অরুণা দাদা-মহাশয়কে খবর দিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। করুণা বলিল, "তাই আজ আপনি চলে যাচ্ছেন? এত শীগ্‌গির যাবেন কি ত

ভাবিনি। নববর্ষের দিনই আপনি মনটা খারাপ করে দিলেন।"

সুপ্রকাশ বলিল, "তাই জন্যেই ত বর্ষশেষের দিনে এসেছিলাম সেটা দুঃখের দিন বলেই। কিন্তু আমার নিজের দিক থেকেই অবিশ্যি ভেবেছিলাম আর কারুর মন আমার যাওয়ায় খারাপ হবে এতটা ভাগ্যবান নিজেকে ভাবিনি। কিন্তু কাল ত আপনার দেখা পেলাম না। তাই আজ আপনাদের আনন্দের দিনেই নিজের বিদায়ের পালাটা সেরে যাচ্ছি।"

করুণা চুপ করিয়া রহিল। মনের মধ্যে তাহার হাসি-কান্নার কি একটা যেন যুদ্ধ চলিতেছিল, সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সুপ্রকাশ বলিল, "আমি ত চল্‌লাম। আবার কবে দেখা হবে জানি না। ততদিনে হয়ত আমি বলে যে একটা মানুষ ছিলাম, এ কথাই ভুলে যাবেন। কিম্বা হয়ত এ-লোকে ততদিন থাকবই না। মানুষের জীবনটা বাস্তবিক বড় ছোট। তার সব দেখে শুনে আশ মিটিয়ে জগৎটাকে ভোগ করে ত যাওয়া যায়ই না, সবচেয়ে বড় জিনিষ যা মানুষের সেইটারই স্বাদ পাবার আগে কত মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই জন্যেই বোধ হয় লোভী মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের এত মনোমোহন রূপ কল্পনা করে তার নিমিষের সুখগুলিকে অনন্ত করতে চায়। সত্যি নয় কি?" সুপ্রকাশ যেন কি একটা সূত্র খুঁজিতেছিল, তাহার চোখে মুখে আকুল আগ্রহ নিবিড় বেদনায় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটিমাত্র কথার সন্ধানে সে হাজার কথার মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, কথাটি তাহার কোথায় পৌঁছিবে না জানি?

করুণা মুখ নীচু করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল, একবার মাত্র মুখ তুলিয়া সে তাহার দিকে তাকাইয়াই আবার মুখ নামাইল। তাহার কথা আজ ফুটিতে চাহিতেছিল না। আর একটুক্ষণ তাহাদের এ মৌন সভা চলিলে ফল কি হইত জানি না। কিন্তু তখনই কলরব করিতে করিতে বাড়ীর আর-সকলে আসিয়া পড়িতেই সে মৌনতার মায়াজাল নিমেষেই টুটিয়া গেল।

সুপ্রকাশ চলিয়া গেল। যাইবার সময় তারিণীকান্ত বলিয়া দিলেন, "বাড়ী গিয়ে সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। আমাদের কথা সব বোলো, আর তারা হয়ত সব জানেই। কি বল করুণা, অবিনাশ নিশ্চয় আমাদের এখানকার কথা শুনেছে?"

করুণা উত্তর দিল না। সুপ্রকাশ একবার তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল। অবিনাশের কথা ত সে কোনো দিন ইহার মুখে শোনে নাই। সুপ্রকাশের বিস্ময়টা কিন্তু করুণার চোখে পড়িল না।

সুপ্রকাশকে বিদায় দিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল। পথের মোড়ে পৌঁছিয়া সে দেখিল করুণা তখনও দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। সুপ্রকাশ ফিরিয়া তাকাইতেই করুণা ঘরে ঢুকিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

অমারাতের পাড়ি

আঁধার রাতে গঙ্গা বহে
মৃদুল কলকলে,
তীরে তীরে আলোকশিখা
মণির মত জ্বলে।
নিথর জলে সুথির তরী,—
চৌদিকে তার আলোর পরী
মন ভরি', ফের দাঁড়ায় সরি'
হাসির খলখলে!

অঙ্গ বেড়ি' উত্তরী' এই
মলিন শত-গিরা,
খুঁটে খুঁটে জ্বল্‌চে যে তার
জ্যোতির কণা হীরা!
গুটির যেন রেশ্‌মী-ঢাকা
ভিতরটিতে আঁধার আঁকা,—
এই থাকা, ফের রঙীন-পাখা
সুখের শতদলে।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

বজ্রতারা

বৌদ্ধদের মতে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার স্থান সক-দেব-দেবীর উপরে। ইঁহাদের পঞ্চসন্তান—পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ,—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘ-সিদ্ধি। এই আদিবুদ্ধ ও পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ সদাই ধ্যানে মগ্ন আছেন, জগৎ সৃষ্টি রক্ষা ও সংহার ব্যাপারে ইঁহারা একান্ত উদাসীন। সেই ভার পঞ্চধ্যানীবুদ্ধাত্মজ পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ত্বের হাতে। বৈরোচনের আত্মজ সামন্তভদ্র, অক্ষোভ্যের বজ্রপাণি, রত্নসম্ভবের রত্নপাণি, অমিতাভের অবলোকিত এবং অমোঘসিদ্ধির বিশ্বপাণি। এক এক যুগে জগতের ভার এক এক বোধিসত্ত্বের উপর থাকে। সামন্ত-ভদ্র, বজ্রপাণি ও রত্নপাণি এক এক যুগের ভার বহন করিয়া বিশ্রাম লইয়াছেন; এখন অবলোকিতের যুগ। অব-লোকিতের বহু প্রকার-ভেদ আছে, তাঁদের শক্তি তারাও অনেক রকমের। বর্ণভেদে তারা-মূর্ত্তিগুলির পাঁচ ভাগ করা যায়,—সিতা, পীতা, শ্যামা, নীলা ও রক্তা। প্রত্যেক বর্ণে আবার বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি আছে। পীতা তারার এক প্রকার ভেদ বজ্রতারা।

ফরাসী পণ্ডিত ফুসের বৌদ্ধ মূর্ত্তিতত্ত্ব নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৯-৭১ পৃষ্ঠায় বজ্রতারার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ফুসে সেই পুস্তকে দেবীর ধ্যান দিয়াছেন এবং একখানি ছবিও দিয়াছেন। ফুসে লিখিয়াছেন মূর্ত্তিখানি ব্রঞ্জের। কিন্তু আসলে বোধ হয় অষ্টধাতুর। একটি বিকশিত অষ্টদল পদ্মের অভ্যন্তরে দেবী বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিখানি এখন কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। নীচের তলায় দক্ষিণের কোঠার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি গ্ল্যাস-কেসে মূর্ত্তিখানি রক্ষিত ছিল, কৌতূহলী পাঠক দেখিয়া আসিতে পারেন। মূর্ত্তিখানি ভাগলপুর জেলার পাথরঘাটা নামক স্থানে প্রাপ্ত।

অল্পদিন হইল ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া থানার অন্তর্গত মাঝবাড়ী গ্রামের এক পুরাতন দীঘি হইতে অবিকল কলিকাতা যাদুঘরের মূর্ত্তির মত একটি বজ্রতারার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভাগীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত জে টি রাঙ্কিন, ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে এ এবং গোপালগঞ্জের মহকুমাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মহোদয়গণের সমবেত চেষ্টায়, বিশেষতঃ সুরে ঐকান্তিক যত্নে মূর্ত্তিটি ঢাকা মিউজিয়মের জন্য স হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি তাম্রনির্ম্মিত।

একটি মুসলমান গৃহস্থ মহিলা কর্ত্তৃক মূর্ত্তিখানি আ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত পুরাতন দীঘিতে স্নান নামিলে মূর্ত্তিখানি তাহার পায়ে ঠেকে। যখন আ হয় তখন মূর্ত্তিখানি প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। কিন্তু ছেলে-মেয়েদিগকে খেলিতে দেওয়ায় এবং বিগত ম ঘর পড়িয়া ইহার নানা অঙ্গ ভাঙ্গিয়া ও হ গিয়াছে।

নাগবালা। (মূর্ত্তির একদিক), (বর্দ্ধিতায়তন)।

ফুসে কর্ত্তৃক উদ্ধৃত সাধনা বা ধ্যানে দেখা বজ্রতারাকে "মাতৃমণ্ডল-মধ্যস্থাং" ও "বিশ্বপদ্মাসন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিকশিত কমলা বজ্রতারার কল্পনার পথপ্রদর্শক বোধ হয় এই বিশেষণ। মণ্ডলে অবস্থানকালে তারাদেবী অষ্টসখ পরিবৃত হইবেন। ইহাদের চারিজন যোগিনী, বজ্রাঙ্কুশী, বজ্রপাশী, বজ্রস্ফোটী ও বজ্রঘণ্টা। অপর জন তারা,—যথাক্রমে পুষ্প, ধূপ, দীপ ও গন্ধের অধি

যোগিনীগণ মণ্ডলের চারি দিকের চারি দ্বার রক্ষা করেন; তারাগণের অবস্থান চারি কোণে।

একটি বিকশিত অষ্টদল পদ্মের মধ্যে বঙ্গীয় শিল্পীগণ বজ্রতারার এই মণ্ডল রচনা করিয়া বিশেষ নিপুণতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বোদ্ধা মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। বজ্রতারার অবস্থান পদ্মের বীজকোষের উপরে; অষ্ট সখীর স্থান করা হইয়াছে অষ্টদলের ভিতরের দিকটায়। পাপ্‌ড়িগুলি উঠান নামান যায়। পাপ্‌ড়িগুলি উপরে টানিয়া উঠাইয়া একটি ঢাক্‌না দিয়া ঢাকিয়া দিলেই পদ্মটি যেন মুদ্রিত হইয়া গেল, অন্ধকার

যোগিনীমূর্ত্তি—অষ্টম পাপ্‌ড়ির উপর। (বর্দ্ধিতায়তন)।

পদ্মগর্ভে বজ্রতারা যেন তাঁহার অষ্ট সহচরীতে পরিবৃত হইয়া মণ্ডলে বসিলেন। ঢাক্‌নাটি সরাইয়া নিলেই পদ্ম বিকশিত হইল, ভক্তদের নিকট বজ্রতারা সগৌরবে প্রকাশিত হইলেন। যেন তিনি এইমাত্র মণ্ডলের ধ্যানতন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া ভক্তদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, ভক্তগণ সভয় বিস্ময়ে দেবীর সম্মুখে প্রণত হইল! সূর্য্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে কমলিনী মুদিত হয় এবং অরুণোদয়ে পুনরায় হাসিয়া ফুটিয়া উঠে বলিয়া কবিপ্রসিদ্ধি আছে। বজ্রতারার পুরোহিতগণ বোধ হয় এই কবিপ্রসিদ্ধি কাজে লাগাইতেন। সন্ধ্যার আগমনে বজ্রতারার অষ্টদল পদ্ম মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় তারাদেবীকে কূটস্থ করা হইত, প্রভাতে পদ্ম বিকশিত করাইয়া দেবীকে প্রকাশিত করা হইত।

সাধনা অনুসারে বজ্রতারার হাত আটটি, মুখ তিনটি, প্রত্যেকটি মুখে তিনটি নেত্র। মুখগুলি দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া যথাক্রমে হল্‌দে, কাল, সাদা, এবং লাল রঙ্গের। তিনি কুমারীর সমস্ত লক্ষণ-সমন্বিতা, রক্তচ্ছটা-মণ্ডিত হইয়া তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে তাঁহার অষ্ট সহচরী। তাঁহার দক্ষিণ হস্তগুলিতে যথাক্রমে বজ্র, বাণ,

যোগিনীমূর্ত্তি—ষষ্ঠ পাপ্‌ড়ির উপর। (বর্দ্ধিতায়তন)।

শঙ্খ ও বরমুদ্রা; বাম হস্তগুলিতে যথাক্রমে নীলপদ্ম, ধনু, অঙ্কুশ এবং পাশ।

ফরিদপুর হইতে প্রাপ্ত মূর্ত্তিখানির কতক কতক অংশ দুর্ভাগ্যক্রমে ভাঙ্গিয়া ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। খোদ বজ্রতারার মূর্ত্তিখানিই ভাঙ্গিয়া হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পদ্মের বীজকোষের উপর ললিত-ভঙ্গীতে স্থাপিত দেবীর পা দুখানি এখনও আছে। সচল অষ্টদলগুলির মাত্র পাঁচটি আছে; তাদেরও আবার তিনটির

বজ্রতারা—কোটালিপাড়া, ফরিদপুর হইতে। (সম্মুখ দিক)।

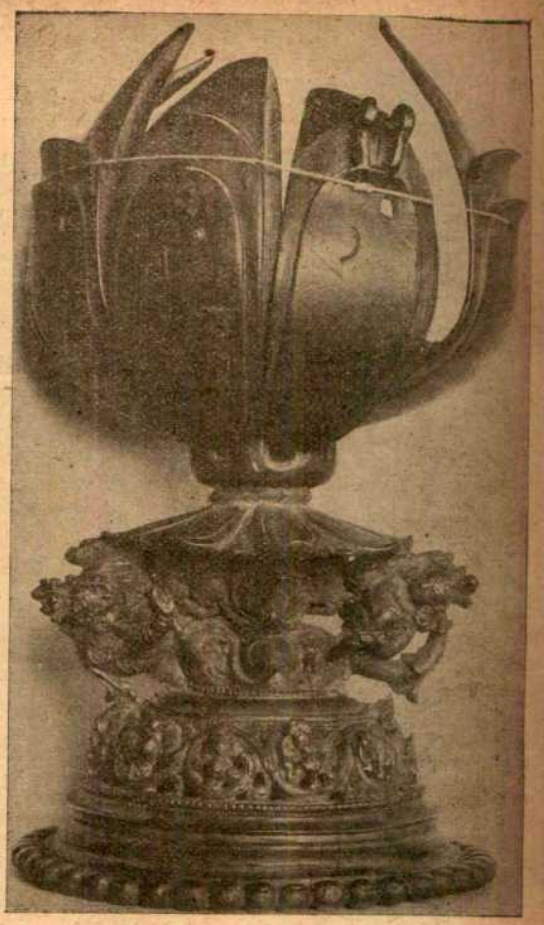

বজ্রতারা। (পশ্চাৎ দিক)।

মধ্যের সহচরীমূর্ত্তিগুলি হারাইয়া গিয়াছে। মাত্র দুইটি দলের সহচরীমূর্ত্তি দুইটি আছে।

সচল দলগুলির উপরে ১ ২ করিয়া নম্বর খোদা আছে। সচল অষ্টদলের নীচে আবার আবদ্ধ আটটি দলের একটি সারি আছে।—তাহাদের উপরও ঐরূপ নম্বর খোদা আছে। উপরের সারির নম্বর হইতে দেখা যায় যে ১-৩-৬-৭-৮ নম্বরের দলগুলি আছে, বাকী তিনটি হারাইয়া গিয়াছে। যে দলগুলি আছে তাহাদের মধ্যে ৬ ও ৮ নম্বরের দলের ভিতর দিকে সহচরীর মূর্ত্তি আছে।

ফুসে কর্ত্তৃক প্রদত্ত বজ্রতারার বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে দেবীর চারিদিকে সহচরী-মণ্ডলীর অবস্থান নিম্ন চক্রানুরূপ হওয়া আবশ্যক।

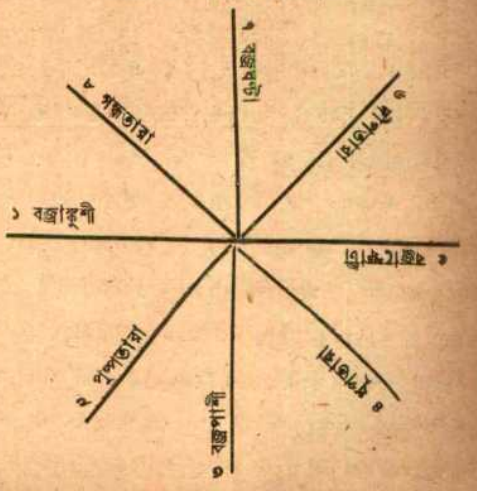

উপরে চিত্রিত চক্রের মতে দেখা যায় যে ৬ ও ৮ নম্বর দলের উপর যথাক্রমে দীপতারা ও গন্ধতারার অবস্থান

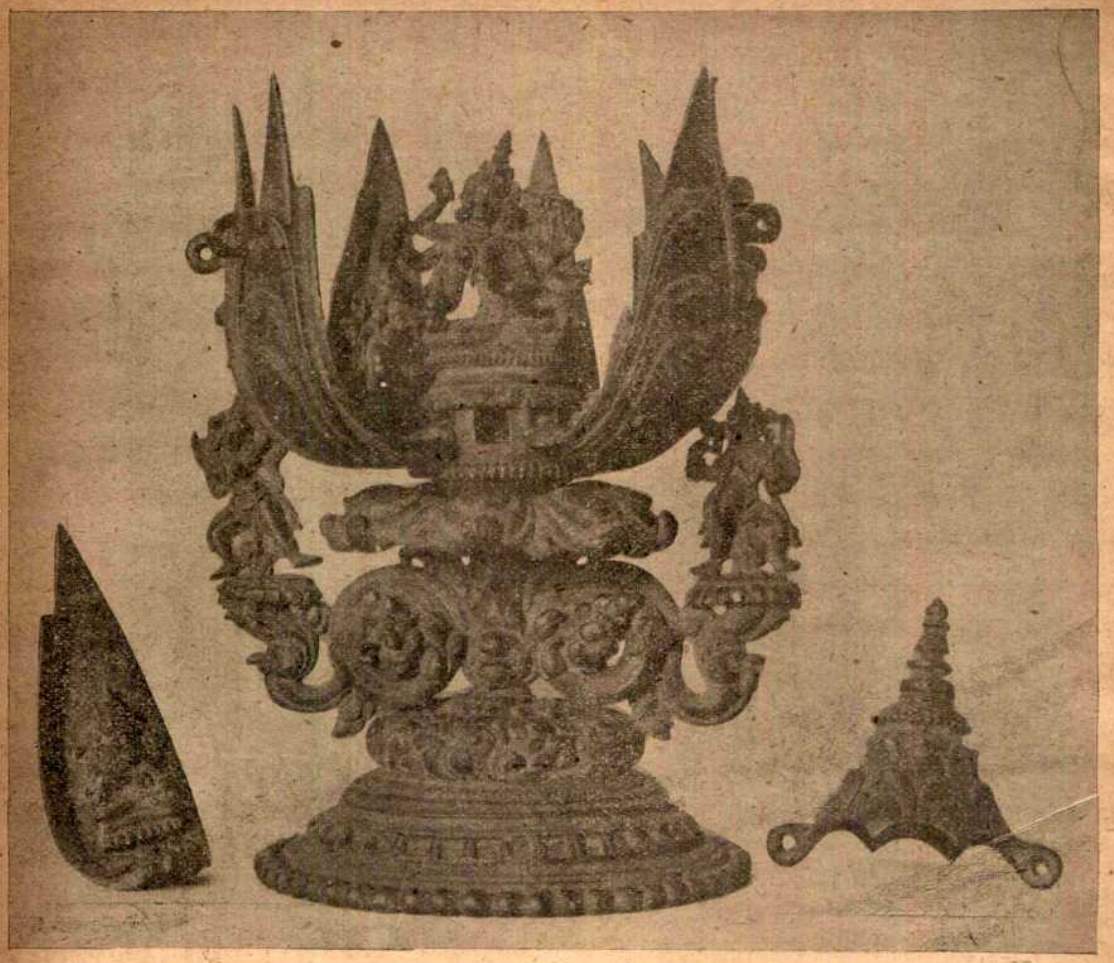

বজ্রতারার মূর্ত্তি—পাথরঘাটায় প্রাপ্ত। কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত।

হওয়া উচিত। বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে কিন্তু ঐ ঐ দল দুইটির উপর যে দুইজন সহচরী আছেন, তাঁহাদিগকে দীপতারা ও গন্ধতারা বলিয়া মনে হয় না। এই সখী দুইজন নৃত্য-পরায়ণা। দক্ষিণ পদ উন্মত্ত নৃত্যভঙ্গীতে বাম হাঁটুর নিকটে উত্থিত। নৃত্য-ভঙ্গ বাম পদের উপর দুইজনই দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে কি রকম এক উন্মত্ত আনন্দের ও রহস্যময় বিস্ময়ের ভাব। নয়নদ্বয় মদবিঘূর্ণিত ও বিস্ফারিত। গলায় হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বমান মালা, বোধ হয় নরমুণ্ড-গ্রথিত। উভয়েরই বাঁ হাতে নরকপাল; ৬ নম্বরের দক্ষিণ হাতে এক কর্ত্তরি বা কাটারি আকাশের দিকে উত্থিত। ৮ নম্বরের দক্ষিণ হাতে এক শব্দায়মান ডমরু। ইহাদিগকে তো গন্ধ ও দীপের তারা বলিয়া বোধ হয় না। হইতে পারে মূর্ত্তিগুলি দল হইতে খুলিয়া গিয়াছিল এবং অজ্ঞ লোকে যে দলে খুসী লাগাইয়া রাখিয়াছে। ডমরু-ধ্বনি সহকারে নৃত্যকারিণীকে বজ্রাস্ফোটী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু কাটারি হাতে অপরজন কে? একজটা বা কুরুকুল্লা দেবীর হাতে কাটারি ও নরকপাল থাকে বলিয়া জানি। কিন্তু একজটা দেবী এখানে কেন?

বীজকোষের উপর ললিত ভঙ্গীতে বিন্যস্ত বজ্রতারা দেবীর যুগলপদ দেখিয়াই বুঝা যায় যে সাধনায় যে দেবীর ধ্যানাসনে বসিবার ব্যবস্থা আছে তাহা সব সময় শিল্পীগণ মানিয়া চলিত না। এইখানে তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দেবী দুই পা একত্র করিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিলেন। ফটোগ্রাফে এই পা দুখানি ভাল উঠে নাই। বৃদ্ধাঙ্গুলী-

দ্বয়ের উপর ভর দিয়া এই পা দুখানি এমন সুন্দর ভঙ্গীতে স্থাপিত যে আঁকিতে জানিলে আঁকিয়া দেখান যাইত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সচল অষ্টদলের নিম্নে আবদ্ধ অষ্টদলের এক সারি আছে। এই আবদ্ধ অষ্টদলের প্রত্যেক দুইটি দলের মধ্যে আবার এক-একটি ক্ষুদ্রতর দল আছে। সমগ্র ফুলটি একটি স্থূল বৃন্তের উপর স্থাপিত, বৃন্তের দুই ধারে দুইটি দ্বিফণা নাগ-যুবতী আবদ্ধ দলের সারির নিম্ন দেশ রক্ষা করিতেছে। নাগযুবতীদ্বয়ের পুচ্ছ বৃত্তাকারে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে, এবং একই পুচ্ছ হইতে দুইটি শরীর নির্গত হইয়াছে।

মূর্ত্তিখানির নিম্নদেশ একটি ঘণ্টার আকৃতি। ঘণ্টার হাতল যেখানে থাকে সেই স্থান হইতেই পদ্মবৃন্ত উত্থিত হইয়াছে। ৪৩টি গুটিকার মালা দিয়া ঘণ্টাকৃতি নিম্নদেশের প্রান্ত সুশোভিত। তাহারই কিছু উপরে একটি মনোরম লতাপাতার বেষ্টনী খোদিত। লতাটি বাঁকিয়া এগারটি বৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের ছয়টির মধ্যে যথাক্রমে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র হংস, মর্কট, হস্তী, মৃগ, শশক ও সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত, বোধ হয় বুদ্ধদেবের জাতকাবলির স্মারক। প্রস্ফুটনের নানা অবস্থার পদ্মের কলি দ্বারা অন্য পাঁচটি পূর্ণ।

মূর্ত্তিখানির শিল্পনৈপুণ্য নয়নমনোহর। সম্পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল, কোন সন্দেহই নাই। সহচরী মূর্ত্তি দুইটি এবং ডবল নাগিনী দুইটি দৈর্ঘ্যে ১½ ইঞ্চির বেশী নহে। কিন্তু এই অল্পায়তনের মধ্যেই শিল্পী দিব্বি ভাবের খেলা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গঠনও চমৎকার।

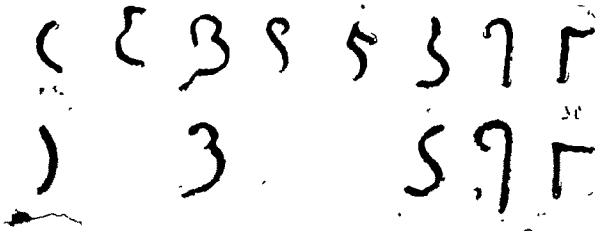

বজ্রতারার পদ্মাসনের পাপড়ির উপরকার অঙ্ক-সংখ্যার আকৃতি।

সৌভাগ্যক্রমে মূর্ত্তিটি কত দিনের তাহা মোটামুটি একরূপ বলা যায়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দুই সারি দলে ১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত নম্বর দেওয়া আছে। আবদ্ধ সারির সবগুলি নম্বরই আছে, সচল সারির তিনটি নম্বর হারাইয়া গিয়াছে। দুই সারির যে নম্বরগুলি আছে তাহাদের উভয় সারির আকৃতি প্রায় এক রকমেরই, কিন্তু দুইটিতে সামান্য বিভিন্নতা আছে। এক অঙ্কের আকৃতিতে বিভিন্নতাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। উপরের দলে ১ লেখা হইয়াছে) এইরূপে, কিন্তু নীচের দলের একের চেহারা এইরূপ (। অন্য চারিটি অঙ্কের উপরের ও নীচের আকৃতিতে বিশেষ বিভিন্নতা নাই। অঙ্কগুলির যে আকৃতি আমরা এই পদ্মদলের উপর খোদিত দেখিতে পাই তাহা অক্ষর-তত্ত্ববিদগণ ৯ম—১১শ শতাব্দীর আকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাজেই এই মূর্ত্তিখানা প্রায় এক হাজার বছরের পুরাণো।

উত্থিত দলগুলির অগ্রভাগ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত মূর্ত্তিখানি মাত্র ৭ ইঞ্চি লম্বা।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

খলিফা ও তুর্কীর সুল্‌তান

আজকাল খেলাফত সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে সকলের তুর্কীর সুল্‌তানের সহিত খলিফার কি সম্বন্ধ ও খলিফার প্রতি মুসলমানের কি কর্ত্তব্য তাহা কিছু জানা উচিত। সেইজন্য আমি সংক্ষেপে খেলাফতের বিষয় আলোচনা করিব।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার হইবার পূর্ব্বে আরব দেশীয় লোকেরা নানা দলে বিভক্ত ছিল। মহম্মদই "এক ঈশ্বর" এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমগ্র আরবদেশ এক করেন।

সমস্ত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীরা মহম্মদকেই তাহাদের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ব্যাপারের নেতা বলিয়া মানিত। মহম্মদের মৃত্যুর পর কে যে উভয় ধর্ম্মের ও রাজনৈতিক বিষয়ের নেতা হইবেন তাহা লইয়া সেই সময়ে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও রাষ্ট্রীয় নেতারাই "খলিফা"। ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার তখন অভিন্ন ছিল। প্রথমে খলিফা কোন বংশানুযায়ী ছিল না—খলিফা নির্ব্বাচন লোকদের উপর নির্ভর করিত।

মহম্মদের মৃত্যুর পর "আবুবকর" প্রথম খলিফা বলিয়া

নির্ব্বাচিত হন। তারপর ক্রমান্বয়ে 'ওমার', 'ওস্‌মান', 'আলি' খলিফা নির্ব্বাচিত হন। আলির পরই "ওস্‌মান বংশীয়" "মুবাইয়া" খলিফা হন। ইহাঁর সময় হইতেই খলিফা বংশানুযায়ী হয়। 'মুবাইয়া' কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত খলিফা-বংশ "ওমায়েদ" বংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই খলিফাবংশ ৬৬১ খৃঃ—৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই খলিফাবংশের পর 'আব্বাস্ বংশীয়' "আবুল আব্বাস্" খলিফা হন। আবুল-আব্বাস্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বংশ "আব্বাসায়েদ" ৭৫০ খৃঃ—১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রথমোক্ত চারিজন নির্ব্বাচিত খলিফা মদিনায় রাজত্ব করিতেন। পরে "ওমায়েদরা" ডামাস্কাসে ও 'আব্বাসায়েদরা" বাগ্‌দাদে রাজত্ব করিতেন। যদিও এই সময়ে স্পেনে, আফ্রিকায়, ঈজিপ্টে, ভারতবর্ষে, ও তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে স্বাধীন মুসলমান নৃপতি ছিলেন এবং যদিও তাঁহারা খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না, তবুও তাঁহারা কখনও খলিফা উপাধি ধারণ করেন নাই। যদিও খলিফার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের নেতা বলিয়া গণ্য হইতেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ভারতবর্ষীয় মুসলমান নৃপতিগণ "খলিফার" উপঢৌকন মহাগৌরবের জিনিস মনে করিতেন। তবেই আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে 'খলিফা' সমগ্র ইস্‌লাম সমাজের সকল সময়ে ধর্ম্মীয় নেতা ছিলেন।

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মুঘল বংশীয় হুলুগ্-খাঁ (Hulagu) বাগ্‌দাদ ধ্বংস করেন। বাগ্‌দাদের শেষ খলিফা "আল্-মুস্তাসেম্" নিহত হন। এই সময় 'খলিফার' চিহ্ন লুপ্ত হইবার মতন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইল না।

এই সময়ে ঈজিপ্টে "বেইবারস্" নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি খলিফার এই দশা দেখিয়া আব্বাসায়েদ বংশীয় "মুস্তাসসের"কে ঈজিপ্টে লইয়া গিয়া "খলিফা" বলিয়া মানেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজে 'সুল্‌তান' উপাধি লয়েন। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'খলিফারা' ঈজিপ্টে থাকিতেন—যদিও তাঁহাদের পূর্ব্বের ক্ষমতা ও প্রতাপ কিছুই ছিল না। তাই একজন লেখক লিখিয়াছেন—"...But a shadow survived in Egypt—a race of mock caliphs, having the name without the substance, a mere spectre as it were." তথাপি তাঁহারা সমগ্র মুসলমান নৃপতিগণ দ্বারা ও ইস্‌লাম ধর্ম্মীয় লোক দ্বারা ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজিত হইতেন।

যখন খলিফারা ঈজিপ্টে ছিলেন সেই সময় ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান তুর্কী সাম্রাজ্যের স্থানে "ওসমান্‌লী" নামে এক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে খুব বলশালী হইয়া উঠিলেন এবং অনেক রাজ্য জয় করিয়া ফেলেন। এই সময়ে ঈজিপ্টের সুল্‌তানেরা হীনবল হইয়া পড়েন। ঈজিপ্টের সুলতানেরা পূর্ব্বের প্রতাপ, ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। যখন 'ওসমান্‌লী' বংশীয় প্রবল সুল্‌তান সেলিম ক্রমশঃ ঈজিপ্টের সুল্‌তানদের রাজ্য অধিকার করিতেছিলেন সেই সময় ঈজিপ্টের শেষ সুল্‌তান "কায়সু-আল-খুরী" ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে "মার্জ্জ্-ভাবিক" ক্ষেত্রে সেলিমকে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু যুদ্ধে নিহত হন। খলিফা "আলমুতাওয়াকিল" সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের পর ওসমান্‌লী সুল্‌তান খলিফা আল্‌মুতাওয়াকিলকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং সুল্‌তান উপাধি প্রাপ্ত হন। সুল্‌তান সেলিম ঈজিপ্টরাজধানী 'কাইরো' অধিকার করেন। প্রত্যাগমনের সময় খলিফাকে লইয়া যান ও তুর্ক-রাজধানী কনস্তান্তিনোপলে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই খলিফা সুল্‌তান কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এবং সেলিমের উত্তরাধিকারী সুলেমান পিতার এই অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ খলিফা আল্-মুতাওয়াকিলকে কারাগার হইতে বিমোচন করিয়া সম্মানের সহিত রাজধানীতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম ধর্ম্মের গুরু খলিফা আল্‌মুতাওয়াকিল নিজের খলিফা-ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং ওস্‌মান্‌লী সুল্‌তানকে খলিফা-ক্ষমতা দিয়া ঈজিপ্টে বাস করেন। সেই দিন হইতে প্রকৃতপক্ষে ওস্‌মান্‌লী সুল্‌তানরা খলিফা। তাঁহারা সেইদিন হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের নেতা।

অনেকে বলেন যে তুর্কীর সুলতান্‌রা খলিফা নহেন। কিন্তু আপনাদের দেখাইয়াছি যে ন্যায়তঃ তাঁহারাই এখন প্রকৃত খলিফা। অনেকে বলেন মহম্মদের বংশীয় কোন

লোক খলিফা হইবার উপযুক্ত। কিন্তু খলিফা কোন বংশানুগত নয়। মহম্মদ নিজেই কোন খলিফা ঠিক করিয়া যান নাই। লোকেরা যাঁহাকে উপযুক্ত মনে করিয়াছিল তাঁহাকে খলিফা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। যখন আব্বাসায়েদ খলিফা নিজে তুর্কী সুল্‌তানের হাতে খলিফা-ক্ষমতা অর্পণ করেন তখন তুর্কীর সুল্‌তানেরাই যে ইতিহাস-সম্মত প্রকৃত খলিফা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দূরে-দূরে

যদি　বাহুর বাঁধনে ধরা নাহি দিবে,
　　দূরে থাকা যদি সাধ,
তুমি　কমলের হিয়া নিয়া দাও গ'ড়ে
　　এ হিয়া আমার নাথ!
অরুণের মত যামিনীর শেষে
মাঝে মাঝে তুমি দেখা দিয়ো এসে,
সুদূর বিরলে দাঁড়াইয়া শুধু
　　করিয়ো দৃষ্টিপাত—
আমি　কমলেরি মত নয়নে হেরিয়া
　　মিটাব মর্ম্ম-সাধ!

তুমি　লইয়াই এস হায়ণের মধু,
　　মৃদু সুকোমল জ্যোতি,
আর　নিদাঘ-দিবারি প্রচণ্ড জ্বালা—
　　নাহি ক্ষতি! নাহি ক্ষতি!
আমি　সমান হরষে উঠিব দুলিয়া,
হৃদয়ের দল ধরিব মেলিয়া,
কমলেরি মত দূরে দূরে একা
　　করিব জীবন-পাত—
দূরে থাকি' ওই পদে নিবেদিব
　　পরাণের প্রণিপাত!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

কাব্যমাত্রই প্রধানতঃ রসাত্মক বাক্য; সুতরাং কোন কাব্যকে রসের দিক থেকে বিচার না করিয়া যদি তাহার মধ্যে আমরা তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শুধু যে কবির প্রতি অবিচার করা হয় তাহা নয়, কাব্যোপভোগেও আমরা অনধিকারী বলিয়াই প্রমাণিত হয়। তাই ম্যাথু আর্নল্ড ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যসমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার যদি কোন ফিলজফি থাকে তবে তাহাই তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যই সকলের সমধিক উপভোগ্য। এ-কথা সকল কবির সকল শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু যে কাব্য বা গান ভগবদ্‌বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত তাহার মধ্যে তত্ত্বের প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা আছে—বিশেষতঃ সেই-সকল দেশে যেখানে ভগবানকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট creed বা অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই কারণেই ইংরেজি সাহিত্যে ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। কাউপারের Olney Hymns অপাঠ্য, এমন কি মিল্‌টনেরও বিরাট কল্পনা যখনই থিয়লজির আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইয়াছে তখনই তাহা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্যারাডাইস্ রাষ্টের অনেক স্থলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, এখানে ভগবানকে তত্ত্ব বা মতের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া ফেলা হয় নাই। ভগবৎতত্ত্ব বা দর্শনের প্রচার যে এখানে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু মানবের ব্যক্তিগত জীবনে ভগবান ভক্তি ও অনুভূতির সামগ্রীই হইয়া আছেন, তত্ত্ব বা দর্শনের নহে। শুধু তাহাই নহে। হিন্দু পরমেশ্বরকে মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না। তিনি যেমন জলেস্থলে গ্রহনক্ষত্রে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তেমনই আবার মানবের দৈনন্দিন জীবনে—তাহার সুখে দুঃখে, প্রেমে বিরহে—তিনিই নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিতেছেন। তাই হিন্দু কবি যখন মানবজীবন লইয়া কাব্য রচনা করিতে বসেন তখন ভগবানকে ভুলিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; আর হিন্দু সাধক যখন

ভক্তির প্রবল বেগে চালিত হইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ভগবন্‌মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন তাঁহার সেই গানের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ও মানব প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। তাই হিন্দুর পারমার্থিক কাব্য ও গান জগতের সাহিত্যে অতুল। কারণ তাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাহিত্য। কবীর, তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ—ইঁহাদের উদ্ভব ভারতবর্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হয়ত এমন-কিছু নূতন নহে। হিন্দুর যে ধর্ম্মসাধনা উপনিষদে ও গীতায় চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভক্তিগদগদ গান ও কোমলকান্ত পদাবলীতে যাহার স্রোত কতশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটি ধারা নবরবিকিরণসম্পাতে অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া হিন্দুর চিরন্তন আনন্দবার্ত্তা বহন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তাই বোধহয় বাঙ্গালীর নিকট গীতাঞ্জলি তত বেশী আদৃত হয় নাই যত হইয়াছে পাশ্চাত্য দেশে। কারণ পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এই প্রেম ও আনন্দের গানে এমন একটি রসের সন্ধান পাইয়াছে, অনাবিল কাব্য-সৌন্দর্য্য ও আন্তরিক ভক্তিভাবের এরূপ এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়াছে, যাহা তাহাদের নিকট যে কেবল সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের ভোগোন্মত্ত অশান্ত প্রাণের সম্মুখে শান্তি ও আনন্দের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ইহার তুলনা খুঁজিতে তাহাদিগকে মধ্য যুগের টমাস-এ-কেম্পিস, ফ্রান্সিস্-এসিসি প্রভৃতি ভক্তদের কথা স্মরণ করিতে হইয়াছে; কেহ কেহ ডেভিডের গান ব্যতীত ইহার সহিত তুলনা করিবার আর কিছু খুঁজিয়া পান নাই। এক-জন লেখক আমেরিকার একখানি বিখ্যাত পত্রে গীতাঞ্জলির সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিলেন, রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও আধ্যাত্মিকতার যেরূপ চমৎকার মিলন সাধন করিয়াছেন পাশ্চাত্যের কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সেরূপ পারেন নাই—মিল্টন, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, এমন কি ডান্টে পর্য্যন্ত না। (North American Review for May, 1913)

কিন্তু আমাদের চক্ষে গীতাঞ্জলির নূতনত্ব এত বেশী না হইলেও ইহা যে কবির সারা জীবনের একনিষ্ঠ কাব্য-সাধনারই পরিণতি তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং ইহার মূল উপনিষদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় নিহিত থাকিলেও ইহা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এ-কথাও ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গীতাঞ্জলির এই বিশেষত্বটুকুই আলোচনা করিব। এবং সে বৈশিষ্ট্য ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারায় কিরূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গীতাঞ্জলির পাঠকমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে যাহা চক্ষে পড়ে তাহা হইতেছে কবির অসাম্প্রদায়িকতা। যদিও হিন্দুর ধর্ম্মসাধনা কখনও কোন বিশেষ ক্রীডের গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই, তথাপি বিভিন্ন সাধক এক-একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া ভগবল্লাভের চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন। বৈষ্ণবের মধুর ভাব কিম্বা শক্তির জগন্মাতা কালীতারা রূপ কল্পনা একই সাধারণ ভাবের অভিব্যক্তি হইলেও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-নাথ উপনিষদের ভাবেই বিশিষ্টরূপে ভাবুক; কিন্তু তাহা হইলেও ভক্তির এই বিভিন্ন ধারাও তাঁহার নিজস্ব ধারার সহিত মিলিত হইয়া এমনই এক উদার ভাবস্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহা পান করিয়া সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত তৃপ্ত হইতে পারে। তিনি একাধারে বৈষ্ণব, শাক্ত ও বৈদান্তিক, এবং একজন খৃষ্টানও স্বধর্ম্মমতের অনুকূল অনেক ভাব ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। কিশোর 'ভানুসিংহ' প্রৌঢ় সীমায় উপনীত হইয়াও যে বৈষ্ণব-প্রীতি হারান নাই তাহার প্রমাণ গীতাঞ্জলির অনেক গানেই রহিয়াছে। শ্রাবণে মেঘের দিনে সকলের অন্তরতম ধন যখন নিশার মত নীরবে সবার দিঠি এড়াইয়া পথিকহীন পথের পরে বাহির হন, কবি তখন তাঁহাকে আপনার কুঞ্জকুটীরে আহ্বান করেন—

হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন সম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

মেঘমেদুর অম্বর রাধার অভিসারের সহায় হইয়াছিল। এখানেও দেখি, যখন 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে' তখন কবি তাঁহারই আকুল প্রতীক্ষায় 'একা দ্বারের পাশে' বসিয়া আছেন।

তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে' কাটে আমার এমন বাদল বেলা !

আবার 'ঝড়ের রাতে' তিনি অভিসারে বাহির হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কবি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন।

নাই যে ঘুম নয়নে মম, দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার !

কখনও বা গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন ভক্তের পাশে নীরবে তিনি আসিয়া বসেন। ভক্ত তাহা জানিতে পারে না। পরে যখন, 'জেগে দেখে দখিন হাওয়া পাগল করিয়া, গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া,' তখন বুঝিতে পারে কে আসিয়াছিল, আর তাঁহাকে যে পাইয়াও পাইল না এই দুঃখে সে রাধার ন্যায় নিজেকে ধিক্কার দিয়া গাহিতে থাকে—

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী !
এসেছিল নীরব রাতে বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী।

আবার যখন দিনের অবসানে ধরণীতে সাঁঝের ছায়া নামিয়া আসে, যখন 'জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে', আর 'বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া', তখন তিনি রাধারই ন্যায় 'কলসখানি ভরে নিতে' ঘাটে যান। তখন তাঁহার 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া'; কারণ, 'ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে'।

গীতাঞ্জলিতে রাধাকৃষ্ণের রূপক স্পষ্টভাবে রক্ষিত না হইলেও ইহার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ যে কিরূপ বহিয়া চলিয়াছে তাহা উপরের উদাহরণগুলি হইতেই বিশেষরূপে উপলব্ধ হইবে। আবার শাক্ত সাধকের ন্যায় তিনি ভগবানকে জননীরূপেও আহ্বান করিতেছেন—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার,
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।

অন্যত্র তিনি আবার জননীর প্রসাদ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন।—

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ-কণে।

কিন্তু এইসব ভাবধারার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া যে সুর গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানের মধ্যে বাজিতেছে তাহা হইতেছে উপনিষদের আনন্দের সুর—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—রসো বৈ সঃ—ভগবানকে আনন্দময়রূপে হৃদয়-মধ্যে নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার জন্য ভক্তপ্রাণের আকুলতা। এই একটিমাত্র ভাব গীতাঞ্জলির মধ্যে নানা আকারে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভগবানের আনন্দরূপের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গদ্য প্রবন্ধে একস্থলে বলিতেছেন,—"তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি ত লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্য্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই, সেখানে কি ঐশ্বর্য্য, কি সৌন্দর্য্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন।"

এই ভাবই গীতাঞ্জলির অনেক গানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একটিতে তিনি বলিতেছেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

কিন্তু দিকে দিকে ভগবানের এই আনন্দ-মূর্ত্তির প্রকাশ সত্ত্বেও অবসাদগ্রস্ত মানবজীবন সকল সময় ত 'নিবিড় সুধায়' ভরিয়া উঠে না, আনন্দের এই অনন্ত প্রবাহ হৃদয়কে ত প্লাবিত করিতে পারে না। তাহা হইলে আর তাঁহার দর্শন লাভ হইল কৈ? তাই কবি নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে গাহিতেছেন—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে?
* * *
রয়েছ তুমি এ-কথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে?

প্রাণে যখন এই ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে তখন আর তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। তখনই মানুষ সত্যসত্যই বুঝিতে পারে—

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।
এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।

ভগবানের আনন্দময়ত্বের সঙ্গে যে ভাবটি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংসৃষ্ট রহিয়াছে তাহা বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ভগবানের বিচিত্র বিকাশ ও অনন্তরূপ দর্শন। ইংরেজিতে [illegible]কে pantheistic nature-worship বলা যাইতে পারে। তিনি প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রকৃতি-পূজাতেই তাঁহারই পূজা। তাই দেখি কবি কখনও শারদলক্ষ্মীকে আহ্বান করিতেছেন—

এস গো শারদ লক্ষ্মী তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলোঝলমল বন-গিরি-পর্ব্বতে,
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত-শতদল শীতল-শিশির-ঢালা।

আবার কখনও বা বর্ষার জলভারাবনত মেঘের আবাহনে তিনি গাহিতেছেন—

এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে,
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।

এই সসীম প্রকৃতিরাজ্যের রূপসাগরের মধ্যে সেই অসীম, সেই অরূপ রতনের সন্ধান করিতে হইবে।

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌ব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

মানবজীবনেও এই সত্যই অন্যরূপে প্রকটিত হইতেছে। ক্ষুদ্র মানুষের হাসি-কান্না স্নেহ-প্রেম সেই অসীমেরই আভাস আনিয়া দেয়। এখানেও এই সীমার মধ্যে সেই অসীমেরই লীলা চলিতেছে।

সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

গীতাঞ্জলিতে এই যে ভাবটা প্রকাশ হইয়াছে, কবি বলেন, ইহাই তাঁহার সমগ্র কাব্যসাধনার মূলে রহিয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখিতেছেন,—"আমার ত মনে হয় আমার সমস্ত কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" অতি অল্প বয়স হইতেই এই ভাবটি কবির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার প্রথম যৌবনে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্য-কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবও ইহাই। "এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ-বন্ধন মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুরই বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেইখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই। * * * প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে এক-দিকে যতসব পথের লোক, যতসব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনো-মতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীম মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসী-মের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।" (জীবনস্মৃতি)

এই যে প্রেমের পথ দিয়া অসীমকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, ইহা হইতেই কবির বিশ্বপ্রেমের উদ্ভব। বাহ্য প্রকৃ-তির রূপসাগরে ডুব দিয়া তিনি যেমন অরূপের সন্ধান পান; তেমনই মানবের কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া, তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তিনি সেই অসীমেরই সমীপে উপস্থিত হইবেন এই আশা করেন। তিনি জানেন—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে, নয় বিজনে, নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

কিন্তু এই প্রেম কি সহজে লাভ করা যায়? ইহাও সাধনা-লভ্য। কবে যে ইহা সম্ভব হইবে তাহা কবি জানেন না।

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হ'তে পারব কবে ?
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হ'তে পারব কবে ?

কিন্তু তাঁহার আশা আছে—

যখন আমি পাব তোমায় নিখিল মাঝে
সেইখনে হৃদয়ে পাব হৃদয়রাজে।

নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে না পারিলে, যাহারা 'সবার অধম, দীনের হতে দীন', যাহারা 'সবার নীচে, সবার পিছে' তাহাদের ভালবাসিতে না পারিলে ভগবৎপ্রেম নিরর্থক।

কবির স্বদেশপ্রেমও এই বিশ্বপ্রেমের উদারভাবে অনুপ্রাণিত। ভারত শুধু তাঁহার নিজের দেশ নহে, ইহা 'মহামানবের সাগরতীর'। আর এই ভারতের মধ্যে যাহারা পতিত জাতি বলিয়া অপমানিত ও নিপীড়িত তাহাদের জন্য করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

আমরা দেখিলাম, ভগবান আনন্দরূপে বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং প্রেমরূপে বিশ্বমানবের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এতক্ষণ আমরা তাঁহার শিবসুন্দর মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার যে অন্য মূর্ত্তিও আছে, তিনি যে দুঃখ ও অশুভরূপেও আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাও কবি আমাদিগকে ভুলিতে দেন নাই। কিন্তু ইহা সেই আনন্দময়েরই রুদ্ররূপ। দুঃখ ত সত্য নহে, একমাত্র সত্য হইতেছে আনন্দরূপম্। তবে আমরা চক্ষের সাম্‌নে নিরন্তর এত দুঃখ এত কষ্ট দেখি কেন ? নিজেরাও ত দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত হইতেছি ? অতএব কিরূপে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি ? রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের ছোট মনের ছোট ছোট বিষাদ অবসাদ নৈরাশ্য নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়, আনন্দরূপম্ অমৃতং আর দেখিতে পাই না ; নিজের কালিমা দ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা, কেবল অসম্পূর্ণতা, কেবল অভাব দেখি ;—কাণা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া উঠে,—যে আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে বন্ধনে, দুঃখে দারিদ্র্যে, অপকারে অপমানেও তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারি প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই, ক্ষতি নাই, অসম্মান নাই।" (ধর্ম্ম, ১৯১-২ পৃষ্ঠা)।

'নৈবেদ্যে'র একটি গানে ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই,—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই।

'খেয়া'র কবি দুঃখকে ভগবানের মূর্ত্তিরূপে বরণ করিতেছেন,—

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা নিবিড় করে' ধরিব হে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'দুঃখ' শীর্ষক প্রবন্ধেও দুঃখের সহিত ভগবানের এই একাত্মতাপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

হে পিতা, তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ ; হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্। (ধর্ম্ম, ১২৯ পৃষ্ঠা)

'গীতাঞ্জলি'তেও এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য ভীষণ হইলেও মঙ্গলকর, তাঁহার তীব্র তালের আঘাতে মানুষের বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও যে, তাহাতে সমস্ত সন্দেহ মন হইতে পলায়ন করে, সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি 'সেই প্রচণ্ড মনোহরে' প্রেমের অঞ্জলি দিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

নাচো যখন ভীষণ সাজে তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে সন্দেহ বিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার দিক্ সে রসাতল।

তারপরে যখন সত্যসত্যই রুদ্রের দীপ্তবজ্র ভক্তের বক্ষে

পড়িয়া সেখানে দাবাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, তখনও সে অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে বন্দনা করিতে থাকে—

এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো;
এমনি করে' হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই ত পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোল আগুন করে' আমার যত কালো।

আর মৃত্যু? সে ত 'আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা'—বরবধূর মিলন। তাহার জন্য আমার ভয় কি? দুঃখ কি? শ্মশানচারী মহাদেব যখন গৌরীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার জননী শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিলেও এবং পিতা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেও গৌরী নিজে কি ভীতা হইয়াছিলেন?

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নীচোলাবরণ।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমরাও কি ক্রন্দন-কোলাহলের মধ্যে এইরূপে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব না? সারা জনম যাহার লাগিয়া সুখ-দুঃখের বোঝা বহিয়া বেড়াই, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যাহারই দিকে নিরন্তর ধাবিত হয়, তাহার সহিত মিলনই ত জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।—

বরণ-মালা গাঁথা আছে আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে আসবে বরের সাজে?
সেদিন আমার রবে না ঘর, কেইবা আপন কেইবা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। যাহা কিছু আবির্ভাব তাহা সেই আনন্দরূপেরই আবির্ভাব। দুঃখে মৃত্যুতে সেই আনন্দময়েরই প্রকাশ। এই বাণী শুধু গীতাঞ্জলিতে নয়, অন্যত্রও নানারূপে তিনি প্রচার করিয়াছেন। রুদ্রের ভীষণ মুখ দেখিয়া তিনি সেই প্রাচীন ঋষির অভয় মন্ত্র শুনাইতেছেন—রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। কিন্তু তাঁহার যে 'সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তাঁহার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা'—

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

অতএব

'হে ভয়ঙ্কর, হে শঙ্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা, উদ্যত চেষ্টার দ্বারা, অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে জয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ কর।' (ধর্ম্ম, ১৩১ পৃষ্ঠা)

এমনই করিয়া আনন্দের বার্ত্তা জগতে বড় বেশী লোক প্রচার করেন নাই। এমনই করিয়া দুঃখ ভয় মৃত্যু অবসাদ তুচ্ছ করতঃ আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে শিক্ষা দিতে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে অধঃপতিত ভারতবর্ষে আর কেহ আবির্ভূত হন নাই। বিবেকানন্দের সহিত আধ্যাত্মিক জগতে রবীন্দ্রনাথের যে শুধু এইখানেই মিল তাহা নহে। মানবের হিতসাধন দ্বারা ভগবল্লাভের যে পথ, বিবেকানন্দ তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথও এই প্রেমের পথ দিয়াই, এই কর্ম্মযোগে বিশ্বমানবের সহিত এক হইয়াই আনন্দময়ের দর্শনলাভ সম্ভব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার তুলনায় জপতপ ধ্যানধারণা দ্বারা মুক্তিলাভ-চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নহে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।
রাখ্ রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করচে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ, খাটচে বারমাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পরে।

এই জন্যই ত অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' এবং ইহাই যে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্ন্যাসীর জীবনে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' একদিকে তিনি যেমন রূপরসগন্ধময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিতে চাহেন না, কারণ এই সৌন্দর্য্যের, এই আনন্দের মধ্যেই ভগবান আছেন, অপর দিকে তেমনই আবার তিনি মানবের কর্ম্মকোলাহল হইতেও নিজেকে সরাইয়া লইতে ইচ্ছা করেন না, কারণ সেখানেও সেই তিনিই রহিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে কবি বিষয়ভোগাসক্তি বা সাংসারিক মোহান্ধতা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি তাঁহার [illegible]ন্ধে বলিতেছেন—

[illegible] রেশমপশম, আসনবসন, স্বর্ণরৌপ্য আমার কে? তাহারা [illegible]মাকে কি দিতে পারে? তাহারা আমার পরম সম্পৎকে [illegible] করিতেছে, কেবল তাহাদের পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ে গর্ব্ব-[illegible] করিতেছি। * * সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন, মলিন; কেবল বসনে ভূষণে, উপকরণে, আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না, কারণ শয্যা আসন বেশভূষার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি, জড় উপকরণ-জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া দিয়াছি —সেইসকল ধূলিময় পদার্থের ধূলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। * * * সকল মঙ্গলকর্ম্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচ জনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবন যাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে বাহিরে, জ্ঞানে ধর্ম্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না। (ধর্ম্ম, ৫২ পৃষ্ঠা)

এই 'জাল-জঞ্জালগুলিতে' যদি মানুষের হৃদয় মন জড়াইয়া যায় তাহা হইলে তাহার উপরে উঠিবার সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তখন হয়ত তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতা মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। গীতাঞ্জলির একটি গানে কবি বলিতেছেন—

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়।
তবু জান মন তোমারে চায়।

এই আক্ষেপ অন্যান্য গানেও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—

বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে।

আবার—

কত মায়ায় বাঁশীর সুরে ডাক্‌বে আমায় মিছে।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্ব্বলতা, যে, সে এসব মোহবন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে না।

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়ায়ে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
জানিহে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা সম,
তবু যা ভাঙা চোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তখন তাঁহারই শরণ লওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।—

তোমার দয়া যদি চাহিতে নাও জানি,
তবুও দয়া করে' চরণে নিয়ো টানি।
আমি যা গড়ে' তুলে আরামে থাকি ভুলে
সুখের উপাসনা করি গো ফলে ফুলে,
সে ধূলা-খেলাঘরে রেখোনা ঘৃণাভরে
জাগায়ো দয়া করে বহ্নিশেল হানি।

শেষে যখন সত্যসত্যই তিনি বহ্নিশেল হানিয়া মানবের তুচ্ছ পার্থিব সুখসম্পদ ভস্মীভূত করিয়া দেন, তখন যে প্রকৃত ভক্ত সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গাহিতে থাকে—

আমি বহু বাসনারে প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে!
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে'।

এই বিষয়সুখ-লালসার সহিত অহঙ্কার জড়িত হইয়া আছে। ইহাকেও দূর করিতে হইবে। কিন্তু

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কার,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া ভারে;
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়!
তুমি জান মন তোমারে চায়।

তখনও তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করিতে হয়—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

কিন্তু যখন হৃদয়ে ভগবদ্দর্শনজনিত ভূমানন্দের সঞ্চার হয়, যখন সেই 'আনন্দেরই সাগর থেকে' বান আসিয়া মানুষকে অনন্তের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন এক নিমেষে বিষয়াসক্তি ছুটিয়া যায়,—তখন আর কাহারও কথা না শুনিয়া মন সেই আনন্দময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করে—

কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা?
ভয়ের কথা কে বলে আজ, ভয় আছে সব জানা।

এখন হইতে সাধনপথের সমস্ত বাধা দূর হইল। সম্মুখে আনন্দ-সাগর; আর তাহাতে ও কোন্ কাণ্ডারী তরণী বাহিয়া চলিয়াছেন? তাঁর অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া লাগিয়াছে। আহা! এ তরী—

কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

এইখানে আমার গীতাঞ্জলিব্যাখ্যা শেষ করি। আমি তত্ত্বের সন্ধানে এই গীতিকুঞ্জে প্রবেশ করি নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গান কবিতা হৃদয়ের বস্তু, হৃদয় দ্বারাই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমি আমার প্রাণের অনুভূতি দিয়া এই গানগুলির মধ্যে যতটুকু প্রবেশ করিতে পারিয়াছি তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম, যুক্তিতর্কের সাহায্যে কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাই নাই। আমি যে ভাবধারার বিবৃতি করিলাম তাহা কাব্যরসের দিক হইতে, ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক হইতে। সুতরাং যদি অন্য কেহ এই গানগুলির মধ্যে অন্যরূপ ভাবের লীলা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলেও পরস্পরকে ভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই। কারণ শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য মাত্রেরই এই গুণ আছে যে, তাহা বিভিন্ন পাঠকের নিকট বিভিন্ন ভাবের উৎসরূপে প্রতিভাত হয়। তা' ছাড়া, আমি গীতাঞ্জলির অংশমাত্র লইয়া আলোচনা করিলাম। সমগ্র কাব্যখানির উপর আরও অনেক বলিবার আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

সহযোগিতার পরিণাম

যাহারা কুণ্ঠিত দিতে তোমারে সম্মান,
তাহাদের কাজে করি সহায়তা দান,
ক্রমশ করিবে ক্ষুণ্ণ ন্যায্য স্বাধিকার,
আপনার পায় হানি' আপনি কুঠার॥

শ্রীজ্ঞানকীনাথ দত্ত।

"বিশ্বভাষা"

(Universal Language)

মানব-সভ্যতার বিকাশকাল হইতেই ভাষার বিভিন্নতা-হেতু অসুবিধা অনুভূত হইয়া আসিতেছে। কারণ যত বড় ভাষাতত্ত্ববিদই হউন না কেন, তিনি আর কয়টি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারেন? আসিরীয়, গ্রীক, লাতিন, আরবী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা জ্ঞান প্রচারের উপায় স্বরূপে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। জাতীয় ভাবের (spirit of nationality) প্রচারের সহিত সাহিত্যের ভাষার সংখ্যা বহুলপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ সাধারণত অশুদ্ধ অনুবাদের মধ্য দিয়া অথবা অসম্পূর্ণ শিক্ষার সাহায্যে অন্য ভাষার পুস্তক হইতে জ্ঞান লাভ করেন।

এই সমস্যার সোজা সমাধান করিতে হইলে বর্ত্তমান কোনো একটি ভাষাকে আন্তর্জ্জাতিকরূপে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য গ্রহণ করা দরকার। লাতিন কিম্বা ক্লা[illegible] স্কুলের পরবর্ত্তী গ্রীক ভাষা (post-classical Gre[illegible] প্রভৃতিকে যদি মৃত ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব হয় তাহা হইলে জীবিত কোন ভাষা লইলেও অনেক মুস্কিল আছে। যে বিশিষ্ট জাতির ভাষা গ্রহণ করা হইবে সেই জাতি যাহাতে অযথা সুবিধা না পায় এবং অপর জাতির মনে যাহাতে ঈর্ষার উদ্রেক না হয়, সে জন্য নরওয়ে-দেশের ভাষার মত একটি ভাষা গ্রহণ করাই উচিত। অল্পসংখ্যক লোকে এই ভাষা বলে, অথচ ইহার ধরণও অনেকটা সোজা রকমের।

সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন বিদেশী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। স্বভাব-জাত কোন ভাষাই সোজা নয়। সকল ভাষাই অল্পবিস্তর শক্ত, কারণ ভাষা যুক্তিশাস্ত্রের আদেশ খুব কমই মানে। সকল ভাষারই শব্দসম্পদের ভিত্তি কতকটা খেয়ালের উপর অবস্থিত। কতকগুলি শব্দ ছাড়া অর্থ এবং ধ্বনিতে কোন যোগাযোগ নাই।

এমন কি, ভাষার যে অংশ সাধারণ নিয়মের অধীনে আনা যায় তাহাও অনিয়ম এবং ব্যতিক্রমে পরিপূর্ণ। যখন

আমরা একটি বাক্য আয়ত্ত করিয়াছি, তখন অপর বাক্যটি তাহারই অনুরূপ হইবে,—এমন কথা আমরা বলিতে পারি না।

সে জন্য পরবর্ত্তী কাজ এই যে—বর্ত্তমান কোন ভাষাকে নিয়মিত এবং যুক্তিযুক্ত ভাবে গড়িয়া লওয়া। এ বিষয়ে সহজসিদ্ধ পন্থা অনুসারে কতকগুলি শব্দকে ভিত্তি করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত; এবং এইসকল শব্দ হইতে প্রত্যয় বিভক্তি যোগে এবং সমাস করিয়া নানা শব্দ প্রস্তুত করাই ঠিক। এইরূপে প্রস্তুত অনেক শব্দের অসুবিধাজনক দৈর্ঘ্য হেতু মূল শব্দগুলিকে একাক্ষরিক (monosyllabic) আকারে পরিবর্ত্তিত করার চেষ্টা হইবে; অবশ্য ইহাতে যেন আকার, অর্থ এবং উচ্চারণের অসুবিধা না ঘটে।

এইসকল নিয়মানুযায়ী সুপ্রসিদ্ধ Volapuk ভোলাপুক ভাষা উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল (১৮৮০)। ইহাই সর্ব্বপ্রথম তৈরি-করা ভাষা এবং ইহার সফলতাও কতকটা হইয়াছিল। ইহার শব্দসমূহ তৈরি করা, কিন্তু ইহার ব্যাকরণ অনেকটা মৌলিক ছিল।

ভোলাপুকের ধ্বংসাবশেষের উপর (Esparanto) এস্পারাণ্টো নির্ম্মিত হয়। ১৯০৭ সালের মধ্যেই এস্পারাণ্টো সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া পড়ে এবং ইহার সহযোগী সকল ভাষার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইতে থাকে।

ব্যাকরণ ভাগে এস্পারোণ্টো কতকটা মৌলিক এবং কতকটা ধার-করা। ইহার শব্দসমূহ কোন একটা বিশেষ ভাষা হইতে লওয়া নয়—গ্রীক লাতিন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত। শব্দগুলি প্রায় যেমন তেমনিই আছে, কেবল বানান বদল করা হইয়াছে। সমাস-পদ্ধতি এবং বিভক্তি প্রত্যয় যোগে শব্দ তৈরি করাতে মোট ধাতুর সংখ্যা দুই হইতে তিন হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

অবশ্য ইহার ভিতর সাহিত্য, বিজ্ঞান বা শিল্প সম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক কথাগুলি ধরা হয় নাই—যেমন professor, telegraph ইত্যাদি। এগুলিকে যথাসম্ভব কম পরিবর্ত্তন করিয়া এস্পারাণ্টো ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এস্পারাণ্টোর ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী (Idiom Neutral) ইডিয়াম নিউট্রাল (১৯০২)। পেট্রোগ্রাডের Akademi Internasional de Lingu Universal নামক বিশ্ব-ভাষা সম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক সমিতি এই ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে উক্ত সমিতির ডিরেক্টর (M. Rosenberger) রোজেনবের্গের মহাশয়ই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। অধুনা মৃত ভোলাপুক এবং এস্পারাণ্টো ভাষাভাষীর অনেকে এই ভাষা ব্যবহার করেন।

এই নূতন ভাষার লক্ষ্য করিবার প্রধান জিনিস এই যে ইহার শব্দসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশীর ভাগ ভাষায় যে-সমস্ত ধাতু আছে সেই-সমস্ত ধাতু লইয়াই গঠিত। ইংরেজী ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয়, ইতালীয়, রুশীয় এবং লাতিন—ইউরোপের এই প্রধান সাতটি ভাষার শব্দসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, আন্তর্জ্জাতিক ধাতুসমূহের সংখ্যা যত কম মনে করা যায় তাহা নয়—বরঞ্চ ইহাদের সংখ্যা ঢের বেশী। বহুসংখ্যক ধাতুই সাতটি ভাষায় পাওয়া যায়। চারটি বা তদপেক্ষা কম ভাষায় পাওয়া যায় এইরূপ ধাতু বা শব্দের সংখ্যা খুবই কম। এইরূপ হওয়াতে জার্ম্মান বা ইংরেজী শব্দের সহিত রোমীয় শব্দাংশের জোড়াতাড়া লাগান হয় নাই—যেমন এস্পারাণ্টোতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাতে শ্রুতিকঠোরতাও জন্মিয়াছে। এইজন্য এস্পারাণ্টো ভাষার অনেক শব্দ একটি ভাষা জানে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে অবোধ্য। কিন্তু ইডিয়াম নিউট্রালের শব্দসমূহ রোমীয় লাতিনের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিলেই হয়।

মোটের উপর নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইডিয়াম নিউট্রাল এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত সকল ভাষার মধ্যে সোজা। শিক্ষিত ইউরোপীয়গণের সকলেই এই ভাষা সহজে বুঝিতে পারে এবং এস্পারাণ্টো শিখিতে যাহাদের বহুদিন লাগে তাহারা কয়েক মিনিটেই এই ভাষা পড়িতে পারিবে।

প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জ্জাতিক ভাষা আরবী, চীনা, জাপানী সকল ভাষা-ভাষীরই উপযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের "বিশ্বভাষা"র সৃষ্টি দক্ষ-ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা হওয়া উচিত —ইহা সখের কাজ নয়।

(১) একটি ভাষার উদ্‌ভাবন করিতে গেলে প্রথমে দেখিতে হইবে ইহাতে কি কি ধ্বনি থাকা উচিত। ব্যঞ্জ-

হারিক ধ্বনিবিজ্ঞানের (practical phonetics) সাহায্যে এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত।

(২) তারপর এই-সকল ধ্বনি কি ভাবে লেখা হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে। International Phonetic Associationএর লিপিমালার মত কোন লিপিমালায় ইহা লেখা যাইতে পারে।

(৩) এই নূতন ভাষার ব্যাকরণ কোন চলিত ভাষার ব্যাকরণের অনুকরণমাত্র হইবে না। ইহাকে ব্যাকরণের মূলতত্ত্বের উপর সৃষ্টি করিতে হইবে। বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও ধরণধারণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এবং সমস্তগুলিকে তুলনা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার অংশটুকুকে বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং পারিলে তদপেক্ষা ভালও করিতে হইবে।

(৪) শব্দসমষ্টি যেমন-তেমন ভাবে উদ্‌ভাবিত করা অসম্ভব। ইংরেজীতে যাহাকে অর্থপ্রকাশের Symbolic Method বলে তাহার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। শব্দ এবং শব্দের অর্থ—এই দুয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য—যেমন cuckoo প্রভৃতি ধ্বনি-অনুকারী শব্দ, hush প্রভৃতি বিস্ময়াদিভাবসূচক শব্দ; এবং thou, me, mother প্রভৃতি অঙ্গচালনসহ শব্দ। এইরূপভাবে শব্দের সৃষ্টি করা বড় শক্ত, কেননা উভয়ের সম্বন্ধ খুবই কম এবং অস্পষ্ট। কিন্তু ঠিক-ঠিক ভাবে করিতে পারিলে উপাদান যথেষ্ট আছে।

এই বিশ্বভাষা সাহায্যকারী ভাষা মাত্র হইবে না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে এবং এমন কি স্বকীয় ভাষা অপেক্ষা ভাব প্রকাশে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইবে এবং বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তা প্রকাশে ইহার দ্বারা আরও সুবিধা হইবে। নূতনত্বের জন্য ইহা প্রথম প্রথম বিসদৃশ বোধ হইবে। ইহা শিখিতে হইবে এবং শেখাতে কষ্টও কিছু হইবে—কারণ ইহার ব্যবহারে নির্ভুলভাবে ভাব প্রকাশ করিতে হইবে এবং স্বকীয় ভাষার অনিয়ম প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিন্তু মুস্কিল সকলের পক্ষেই সমান হইবে—একজনের অসুবিধা আর একজনের সুবিধা এমন হইবে না।

বাধা অনেক আছে। তবে ইতিমধ্যে কোন একটা চলিত ভাষাকে আপাতত গ্রহণ করিয়া এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা সম্ভবপর হইতে পারে। *

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক

সাধারণের পাঠোপযোগী প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় প্রথমে ১২৬৬ সালে কলিকাতায় অনুবাদক সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির নাম "জীবরহস্য"। ইহার আকার ডিমাই ১২ পেজী, ৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য চৌদ্দ পয়সা। অনুবাদক সমিতির অধ্যক্ষ রেভেরেণ্ড লং সাহেব বহু ইংরেজি পুস্তক হইতে নানাপ্রকারের প্রাণীদের বিবরণ সঙ্কলন করেন এবং ঐ সমিতির সম্পাদক সঙ্কলিত বিষয়গুলি বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ ও সুপাঠ্য হইয়াছিল। সে সময়ে ঐ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুশীলার উপাখ্যানের ন্যায় ইহারও বহুল প্রচার হইয়াছিল। এক বৎসরে তিন সহস্র পুস্তক বিক্রীত হয় এবং পর বৎসরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। দুই বৎসর পরে আর-একখানি পুস্তক "জীবরহস্য দ্বিতীয় ভাগ" বাহির হয়। সেখানি ডিমাই ১২ পেজী ২১০ পৃষ্ঠায়, আর তাহার দাম সাত আনা ছিল। এই দুই পুস্তকে প্রাণিবিজ্ঞানের কোন বিশেষ ধারা বা বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দেরও কোন স্থিরতা রক্ষিত হয় নাই।

১২৬৬ সালে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট-পাঠশালার শিক্ষক বাবু সাতকড়ি দত্ত কর্ত্তৃক পাঠশালার বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী "প্রাণিবৃত্তান্ত প্রথম ভাগ" নামে এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক সমস্ত পাঠশালায় পড়ান হইত। ১২৭৭ সালে ইহার অষ্টম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বিত হয়। এই পুস্তকে class ও orderএর প্রতিশব্দ 'শ্রেণী' ও 'বর্গ' করা হইয়াছিল, এবং এই দুই প্রতিশব্দ পুস্তকে আদ্যোপান্ত রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্নার্থবোধক family, genus, speciesএর কোন প্রতিশব্দ করা হয় নাই,—এক 'জাতি" শব্দ দিয়াই সেগুলিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

ইহার পর ১৩১০ সালে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'সরল প্রাণিবিজ্ঞান' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সকল শ্রেণীর প্রাণীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধারাবাহিকরূপে লিখিত হয়। ইহাতে class, order ও familyর প্রতিশব্দ ছিল, কিন্তু genus ও speciesএর প্রতিশব্দ ছিল না। পারিভাষিকের প্রতিশব্দেরও কোন

---

* প্রসিদ্ধ ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুইট সাহেবের প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।—লেখক।

প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে ১৮০ পৃষ্ঠায় "সার্ব্বজনিক ভাষা" প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের সঙ্গে পঠিতব্য।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

স্থিরতা রক্ষিত হয় নাই। যথা—"যাবতীয় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।" এখানে শ্রেণী class। আবার দেখি "তীক্ষ্ণদন্ত শ্রেণী", "পিপিলিকাভুক শ্রেণী"। এখানে শ্রেণী, order বা বর্গ। 'জাতি' শব্দটাও কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যথা "ইন্দুর, শশক, কাঠবিড়াল বীবর, সজারু এই শ্রেণীস্থ। জাতিগত বিশেষ লক্ষণ…' । এখানে জাতিগত অর্থ শ্রেণীগত (order)। সুতরাং জাতিও orderএর, শ্রেণীও orderএর প্রতিশব্দ হইল। "পিপীলিকাভুক্, শ্লথ ও বর্ম্মধারী এই শ্রেণীস্থ। বনরোহিত ভিন্ন এই বর্গীয় আর সকল জন্তু দক্ষিণ আমেরিকাবাসী।" এখানে শ্রেণী order, বর্গ order। আবার দেখি "তিমিজাতীয়"—তাহার মধ্যে দেখি শিশুক। সুতরাং এখানে "জাতীয়"=order, whale-order. "পিপিলিকাভুক দুই জাতীয়।" এখানে জাতি=প্রকার।

১৩১০ সালে গুপ্তপ্রেস হইতে বাবু শ্রীবাসচন্দ্র চট্টরাজ প্রণীত "প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণীরাজ্য (স্তন্যপায়ী) প্রথমখণ্ড" প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজী ২০৯ পৃষ্ঠা; ছবি নাই, দাম এক টাকা। পুস্তকখানি বেশ বড় এবং ইহাতে অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবরণ আছে। প্রত্যেক বর্গের পূর্ব্বে ইংরেজিতে সেই বর্গের নাম এবং প্রত্যেক প্রাণীর বাঙ্গালা নামের পার্শ্বে ইংরেজিতে তাহার 'গণ'নাম ও 'জাতি'নাম অর্থাৎ genus ও species দেওয়া আছে। কিন্তু এইসকল ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ করা হয় নাই। পুস্তকের প্রারম্ভে কেবল বলা হইয়াছে, "বিশাল প্রাণিরাজ্য পাঁচটী শাখারাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক শাখারাজ্য আবার নানা শ্রেণী, শাখা, জাতি প্রভৃতিতে বিভক্ত।" এইসকল শব্দ যথাক্রমে kingdom, sub-kingdom, class, order ও familyর প্রতিশব্দ। পুস্তকের প্রাণীদের বিবরণাংশ উত্তম হইয়াছিল।

ইহার পর কলিকাতায় সিটিবুক সোসাইটি হইতে "জীবজন্তু" "চিড়িয়াখানা" ও "পশুপক্ষী" তিনখানি পুস্তক বাহির হয়। এই তিনখানি পুস্তকে যে কয়টি মুখ্য ইংরেজি বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ করা হইয়াছে তাহা তিন পুস্তকেই এক, এবং সেইসকল প্রতিশব্দই আদ্যোপান্ত যথোচিত ব্যবহৃত হইয়াছে, ওলট্‌পালট্ হয় নাই।

১২৬৬ সাল হইতে ১৩২৬ সাল পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠোপযোগী প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক অতি অল্পসংখ্যকই প্রকাশিত হইয়াছে।

আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল বাঙ্গলা পাঠশালাসমূহে সরল বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সেইজন্য অনেক "বিজ্ঞান রীডার"ও প্রকাশিত হইয়াছে। সেইসকল পুস্তকে গ্রন্থকারগণ একএকটি ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের একএকটি বাঙ্গলা প্রতিশব্দ স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া লইয়াছেন। এক পুস্তকের প্রতিশব্দের সহিত অপর পুস্তকের প্রতিশব্দের মিল নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে একই পুস্তকের একটি প্রতিশব্দ সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯১১ খৃঃ H. Armistead এবং S. C. Mahalanobis দ্বয় Science Reader লিখেন—বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার অনুবাদ করেন। লেখক ও অনুবাদক সকলেই জীববিজ্ঞানে কৃতী। এই পুস্তকের প্রথমভাগে আছে—class=শ্রেণী, শ্রেণীর ছোট ছোট ভাগ=বর্গ (order), বর্গের ছোট ছোট দল=জাতি (family)। পুস্তকের সর্ব্বত্র এইসকল প্রতিশব্দ নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যথা—"মাংসাশী স্তন্যপায়ী পশুবর্গের (order) মধ্যে বহুসংখ্যক পশু আছে; উহাদিগকে বিড়ালজাতি, কুকুরজাতি, ভল্লুকজাতি, সীলজাতি প্রভৃতি কয়েকটি জাতিতে (tribe) বিভক্ত করা হইয়াছে।" "রোমন্থক জীবগণ নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—গরু, ভেড়া, ছাগল, হরিণ, কৃষ্ণসার (antelope), উষ্ট্র ও জিরাফ।" এখানে শ্রেণী শব্দ class-বাচক নহে, family or tribe, জাতি-বাচক। আবার দেখি বানরের বিবরণে, "এইজন্য লোকে ইহাদিগকে চতুর্হস্ত (four-handed) জীবও বলিয়া থাকেন। বানর, বেবুন ও বনমানুষ এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।" এখানে 'জাতি' অর্থ family বা tribe নহে, order বা বর্গ। "বনমানুষদের ভিতর যে বংশ (family) সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ক্ষমতাপন্ন তাহাই গরিলা নামে অভিহিত।" বনমানুষরা একটা family; family simiidae। তন্মধ্যে গরিলা একটা বংশ [redacted] family নহে। গরিলা একটা genus বা 'গণ' বটে। genusকে [redacted] বলিতে হয় বলুন, কিন্তু familyকে আর বংশ বলা চলে না, কা[redacted] familyর প্রতিশব্দ "জাতি" এই পুস্তকেই পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এই সামান্য ত্রুটির জন্য অনুবাদক মহাশয়ই দায়ী। তিনি একটু সাবধান হইয়া লিখিলেই এই দোষ থাকিত না।

বহুকাল হইতে পাঠশালায় বিজ্ঞান পড়ান হইলেও বাঙ্গলায় পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন সকল গ্রন্থকারই স্ব স্ব রুচি অনুসারে করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই নিজের সঙ্কলিত শব্দের যথাযথ প্রয়োগ নিজের পুস্তকেও করিতেছেন না। তাহাতে বালকদিগের পক্ষে পারিভাষিক শব্দ জানিবার এবং সেইসকল শব্দের যথাযথ প্রয়োগ শিখিবার পক্ষে অন্তরায় ঘটিতেছে। বাঙ্গলায় পারিভাষিক শব্দও গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এদেশে ছেলেদের পড়িবার জন্য ক্রমাগত রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, না হয় পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি কাল্পনিক গল্পের বহি বাহির হইতেছে বয়স্কদের পড়িবার জন্য কেবল নাটক নভেল বাহির হইতেছে। তাই যখনই ছেলেদের বা বয়স্ক সাধারণের পাঠের উপযোগী প্রাণিবিজ্ঞান বা অপর কোন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক বাহির হয়, তখনই মনে আনন্দ হয়, আর সেই পুস্তক পড়িতে আগ্রহ হয়।

জগদানন্দ-বাবু "পোকামাকড়" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং অধ্যাপক একেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক পুস্তকখানি বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজী, ৩৩০ পৃষ্ঠা; দাম দুই টাকা। জগদানন্দ-বাবু বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছেন এবং সুলেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও আছে, সেইজন্য পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হয়। পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করিলাম।

পোকামাকড়ের কথার বই, ছেলেদের জন্য লেখা, দামও দুই টাকা, মনে করিয়াছিলাম পুস্তকখানিতে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি থাকিবে। বইখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, ছবির সংখ্যা অতি অল্প, যে কয়খানি ছবি আছে তাহাও নক্সার মত (diagramatic)।

পুস্তকের নিবেদনে লেখা আছে, "পুস্তকখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিয়াছি, এইজন্য যেসকল পোকামাকড় আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই তাহাদেরই জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে বিশেষ ভাবে স্থান পাইয়াছে।"

পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পড়িলাম, "আমরা এই পুস্তকে জড়ের কথা বলিব না এবং গাছপালা প্রভৃতি যেসকল জীবকে উদ্ভিদ্ বলা হয়, তাহাদের কথাও আলোচনা করিব না। ছাগল, গোরু, মাছ, পোকামাকড় যে সকল জীবকে প্রাণী বলি, কেবল তাহাদেরই ক্রমে পরিচয় দিব।" কথা কটি পড়িয়া মনে বড় খটকা লাগিল। পোকামাকড়ের পুস্তকে ছাগল, গোরু, মাছ-এর কথাও থাকিবে ইহার কারণ বুঝিলাম না। পোকামাকড়ের পুস্তকে ইহাদের বিবরণ থাকিলে সেই

একটু অবৈজ্ঞানিক হয়, কিন্তু 'অধিকন্তু ন দোষায়।' আমি কিন্তু পুস্তকের কোন স্থানেই ছাগল, গোরু, মাছের কোন জীবনবৃত্তান্ত খুঁজিয়া পাইলাম না।

এ পুস্তকে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের যে-সকল ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ আছে তাহাদের কতকগুলির বাঙ্গলা প্রতিশব্দ করা হইয়াছে—যথা শাখা = Branch, or Phyllum, 'বর্গ' = class, (লুতা-বর্গ); দল = order; family, genus, speciesএর প্রতিশব্দ নাই। যে-সকল প্রতিশব্দ আছে তাহাও সর্ব্বত্র এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন "পতঙ্গের দল", এখানে 'দল' = class। "ঋজুপক্ষ পতঙ্গের [illegible]।" এখানে 'দল' = order। আবার "জাতি" শব্দ দিয়া order, [illegible]ily, genus নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন, "এই উকুনেরা উইজাতীয় প্রাণী" (২৫৮পৃ); "কুমুরে পোকারাও গোলুতা ও ভীমরুলের জাতীয় প্রাণী"; (১৮৯পৃঃ) "উকুন পতঙ্গজাতীয় প্রাণী" (২৫৯পৃঃ); "জলফড়িং উইএর জাতিভুক্ত" (২৫০ পৃঃ)। ২৯ পৃষ্ঠায় দেখি "তাঁহারা গোরুকে বৃষ জাতির (Bos) অন্তর্গত করেন।" ইহার কয়েক লাইন পরেই আছে, "অন্য রোমন্থক প্রাণী হইতে পৃথক করিবার জন্য তাহাদিগকে শেষে গো-জাতিতে ফেলা হইল।" এক এক 'গণের' (genus) বা জাতির একএকটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়, যেমন Bos। ইংরেজিতে ত Bos নামটা বদ্‌লায় না, বাঙ্গালায় তবে কেন 'বৃষজাতি' পরে 'গো-জাতি' হইয়া যায়?

পুস্তকে প্রথম ৭৬ পৃষ্ঠায় আমিবা হইতে তারামাছ পর্য্যন্ত প্রথম চারি শাখার যে-সকল প্রাণীদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্রকায়। যাঁহাদের বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্র (compound [illegible]croscope) আছে, এবং যাঁহারা ঐ যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদেরই সেইসকল প্রাণী দেখিবার সুযোগ হয়। আবার এইসকল শাখার অনেক প্রাণীই সমুদ্রবাসী। আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সেইসকল প্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নহে। এইসকল প্রাণীর সহিত বালকদিগের বা সাধারণ পাঠকগণের পরিচয় নাই, পরিচয় হইবার সম্ভাবনাও নাই। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন, "আমি এই প্রাণী (অর্থাৎ তারামাছ) কখনো চোখে দেখি নাই।" সুতরাং ইহাদের যেসকল বিষয়ের বিবরণ দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, সেসকল সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হওয়া কষ্টসাধ্য। এইসকল বিষয় B. Sc, M. Sc., ছাত্রদের শিক্ষণীয়। এই কয়টি অধ্যায় পুস্তকে না থাকিলেই ভাল হইত।

প্রথম কয়েক অধ্যায়ে Evolution বা অভিব্যক্তিবাদ এবং সেই সঙ্গে ভগবানের অভিপ্রায় ও করুণা যেসকল যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, সেসকল যুক্তির পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই, এবং সেসকল যুক্তিও পাঠকের নিকট সুযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না।

যেমন ১২ পৃষ্ঠায় "সকল প্রাণীই বিধাতার স্নেহের পাত্র। সিংহ-ব্যাঘ্র লতা পাতা ফলমূল খায় না, দুর্ব্বল পশুদের মাংসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কাজেই সিংহ-ব্যাঘ্রের খাদ্যের আয়োজন এবং তাহাদের বংশ রক্ষার উপায় বিধাতাকে করিতে হয়, আবার ইহাও তাঁহাকে দেখিতে হয় যেন সেইসকল বলবান প্রাণীর উৎপাতে দুর্ব্বলেরা প্রাণ হারাইয়া নির্ব্বংশ হইয়া না যায়। এই দুই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য দুর্ব্বল প্রাণীরা যাহাতে বহু সন্তান প্রসব করে, জগদীশ্বর তাহার বিধান করিয়া দিয়াছেন।" ইহার পর একপৃষ্ঠা উল্টাইতেই ১৪ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনে দেখি "বলবান প্রাণীদের অত্যাচারে ইহাদের (অর্থাৎ দুর্ব্বল প্রাণীদের) অনেকেরই বংশ লোপ হইয়াছে।" সহজেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, জগদীশ্বর যদি সবল দুর্ব্বল সকল প্রাণীরই বংশ রক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন, তবে কেন দুর্ব্বল প্রাণীর বংশ লোপ হয়? ১৩ পৃষ্ঠায় হেডিং হইতেছে "প্রাণিহত্যার অন্য কারণ।" ইহাতে আছে, "জগদীশ্বর প্রথমে কোটি কোটি প্রাণী সৃষ্টি করিয়া এই পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে খাবার লইয়া আরামের সামগ্রী লইয়া তাহাদের মধ্যে ঘোর মারামারি হানাহানি হইয়াছিল। এই যুদ্ধে যাহারা একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বা নানারকম ফন্দি আঁটিয়া জিতিতে পারিয়াছিল তাহারাই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেইসকল গুণের উন্নতি করিতে করিতে এখন প্রাণীদের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা হারিয়া আসিতেছিল তাহারাই এখন নিকৃষ্ট প্রাণী।" যাহারা জিতে তাহারাই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া উন্নতি করিতে থাকে, আর যাহারা হারে তাহারাই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া হারিয়া আইসে ও অবনতির পথে যায়, ইহার মর্ম্ম বুঝা কঠিন। একটা প্রাণী আর কতদিন বাঁচে? জিতিলেও মরে, হারিলেও মরে। সে কি করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার গুণের উন্নতি বা অবনতি করিতে থাকিবে? ২৯ পৃষ্ঠায় দেখি "জলেই সকল প্রাণীর প্রথম জন্ম হইয়াছিল।" ইহার অর্থ বুঝা কঠিন। পাখীর বা গোরুর প্রথম জন্ম ত জলে হয় নাই। ইংরেজি পুস্তকে যখন পড়ি "Life began in the Sea" অথবা "The first animals lived in the ocean" (Jerdon & Heath, Animal Forms) তখন বুঝিতেও কষ্ট হয় না এবং অসত্য বলিয়াও বোধ হয় না। ইংরেজি কথাকটিতে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, বাঙ্গলা কথায় সে ভাব ব্যক্ত না হইয়া অন্য অর্থ হইয়াছে। ২০ পৃষ্ঠায় দেখি "জগদীশ্বর যে কোটি কোটি প্রাণীর জন্ম দিয়া জলে স্থলে আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহারা দলে দলে মরিয়া যাউক ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়।" "পরস্পরের মধ্যে মারামারি চলুক এবং সকলে এই লড়াইতে যোগ দিয়া পরস্পরকে উন্নত করুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।" লড়াইতে কাটাকাটি মারামারি চলিবে অথচ দলে দলে মরিবে না—ভগবানের অভিপ্রায় ভাল, তবে যে আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি দলে দলে প্রাণী যুদ্ধে ও বিনা যুদ্ধে মরিতেছে—সে কাহার অভিপ্রায়ে? এইসকল বিষয় এইরূপ ভাবে লিখিলে কোন লাভ হয় না। এইরূপ ভাবের অনেক অবান্তর কথা যদি পুস্তক হইতে ছাঁটিয়া ফেলা যায় তবে পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়ের কোন হানি হয় না, এবং পুস্তকের কলেবরও অনেক কমিয়া যায়।

এই পুস্তকে যেসকল প্রাণীর বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহাদের অনেকেরই দেহের আভ্যন্তরীণ গড়ন ও স্বভাব-প্রকৃতির বিষয়ের তথ্যের অনেক ভুল আছে। সেসকল ভুলের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞেরাই জানিতে পারেন, সাধারণ পাঠকে পারেন না। আবার এমন অনেক ভুল আছে যাহা সাধারণ পাঠকেই ধরিতে পারেন। সর্ব্বাপেক্ষা দোষের বিষয় হইয়াছে, বিরুদ্ধ বর্ণনা,—অর্থাৎ একই বিষয় একস্থলে এককপে, অন্য স্থলে অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এ পুস্তকে অনেক ভুল আছে, এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলে গ্রন্থকারের প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়। সেইজন্য আমি কতকগুলি ভুলের উল্লেখ করিতেছি।

(২২ পৃঃ) "কোষের আকৃতি স্থির থাকে না"। "মাংসপেশীর কোষ লম্বা, যকৃতের কোষ মৌচাকের কুঠারির মত।" গ্রন্থকারের বক্তব্য বোধ হয়—দেহের সকল কোষের আকৃতি ও আয়তন সমান নয়।

(২২ পৃঃ) "ছবির প্রত্যেক কোষের মধ্যে তোমরা একএকটা কাল বিন্দু দেখিতে পাইবে—ইহাকে কোষসামগ্রী বলে।" "ঐ জিনিষটাকে ঘিরিয়া আর-একটি বস্তু থাকে,—ইহাকে জীবসামগ্রী বলে।" "প্রাণীর দেহের সেই ছোট কোষের ভিতরকার কোষ-সামগ্রী এবং জীবসামগ্রীর মত আদরের দ্রব্য আর নাই। তাই যাহাতে হঠাৎ নষ্ট না হয় তাহার জন্য এই দুইটি জিনিষের চারিদিকে খুব মজবুত প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকে।" প্রাণিদেহের সকল কোষের চারিদিকে মজবুত প্রাচীর থাকে

না। আমিবা কোষের আবরা বা 'মজবুত প্রাচীর' দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেহেরও সকল কোষের প্রাচীর দেখা যায় না। আবরণে আবৃত বা অনাবৃত জীবনধাতুকে 'কোষ' বলে।

২৩ পৃঃ "কোষসামগ্রী (অর্থাৎ nucleus) অতি ছোট এবং তরল জিনিষের মত, তাহার গোল লম্বা বা চৌকা আকৃতি থাকিতে পারে না।" একথা ঠিক নহে। "কোষসামগ্রীরও আকৃতি থাকে। অনেক এককোষী প্রাণীর কোষে তাহা দেখা যায়। কাহারও চৌকা, কাহারও বর্ত্তুলাকার, কাহারও ডিম্বাকার, কাহারও দণ্ডাকার কোষ-সামগ্রী বা nucleus দেখা যায়।

২৩ পৃঃ "প্রাণিদেহের কোষের ভিতরকার সেই কোষসামগ্রী যখন পুষ্ট হইয়া পড়ে তখন তাহা একটি কোষের মধ্যে আটক থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় তাহা আপনা হইতে দুই ভাগ হইয়া পড়ে।" কোষ-সামগ্রী বা nucleus কখনই এত বড় হয় না যে 'কোষপ্রাচীর' পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে ও তাহাতে আটক থাকিতে পারে না।

৩০ পৃষ্ঠা "পিঁপড়ের মত একটি ছোট প্রাণীর শরীরে কোটি কোটি কোষ থাকে। এইসকল কোষের প্রত্যেকটি পুষ্ট হইয়া আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া দুইটি কোষের উৎপত্তি করে। ক্রমে সেই দুটি হইতে চারিটি, চারিটি হইতে আটটি ইত্যাদি করিয়া অসংখ্য নূতন কোষের সৃষ্টি হয়।" পিঁপড়ের দেহে 'কোটি কোটি' কোষ আছে সত্য, কিন্তু সেইসকল কোষের প্রত্যেকটিই যদি ভাঙ্গিয়া অসংখ্য নূতন কোষের সৃষ্টি করিতে থাকে, তবে তিন চারি দিনের মধ্যেই পিঁপড়াকে হাতীর আকার ধারণ করিতে হয়। তা ত হয় না। গ্রন্থকারের বক্তব্য বোধ হয় প্রাণী-শরীরের কোটি কোটি কোষ একটি কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৩৬ পৃঃ "এককোষ প্রাণীদের দেহে একবিন্দু রক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই হৃৎপিণ্ডের দরকার হয় না। শরীরে যে কোষসামগ্রী থাকে, তাহাই রক্তের মত সকল শরীরে চলাফেরা করে।" কোষ-সামগ্রী রক্তের ন্যায় কোষের সকল শরীরে চলাফেরা করে না।

৩৭ পৃঃ "এককোষ প্রাণীর সেই আঠার মত দেহটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া তোমরা যদি খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও, তবে দেহের প্রত্যেক খণ্ড হইতে একএকটা নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হইবে।" আমিবাকে বা অপর কোন এককোষী প্রাণীকে যদি ছোট ও বড় দুই খণ্ড করা যায়, আর ছোট খণ্ডটাতে nucleus বা কোষসামগ্রী থাকে, আর বড় খণ্ডটাতে না থাকে, তবে সেই nucleus-যুক্ত ছোট খণ্ডটিই বাঁচিবে ও বড় হইবে এবং পুনরায় দ্বিখণ্ড হইয়া নূতন দুইটি প্রাণী হইবে। কিন্তু nucleus-হীন বড় খণ্ডটা কিছুকাল পরে সঙ্কুচিত হইয়া মরিয়া যাইবে। যে-সকল খণ্ডে nucleus-এর খণ্ড থাকে সেইসকল খণ্ডই বাঁচে, অপর খণ্ডসকল মরিয়া যায়।

৫০ পৃঃ "হাইড্রা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না।" (৫৩ পৃঃ) "তাহারা টোপাপানা, পদ্মের পাতা, সেওলার গায়ে শরীর আটকাইয়া ঝুল খাইয়া জীবন কাটায়।" এক কথাও ঠিক নহে। হাইড্রা চলাফেরা করে, একস্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, একস্থানে ঝুল খাইয়াই জীবন কাটায় না।

৫৩ পৃঃ "একটু আঘাত পাইলেই হাইড্রাদের শুঁয়োর গায়ের সেই কোষের বিষ ফাঁসের নলের ভিতর প্রবেশ করে। ইহাতে সেগুলি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোষ ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। তারপরে বিষভরা ফাঁসগুলি শিকারকে এমন জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গায়ে এমন বিষ চালিতে আরম্ভ করে যে শিকার অবশ হইয়া পড়ে।" কোষ যদি চুরমারই হইয়া গেল, সে আর দেহের অঙ্গ রহিল না, তখন তাহার ফাঁসের নল শিকারকে আর কিরূপে জড়াইয়া ধরিবে? আঘাত পাইলেই কোষের ফাঁস বাহির হয় না। যাহা হাইড্রার খাদ্য নহে (বালি, পাথর প্রভৃতি) তাহার আঘাত এবং নিজ দেহের শুঁয়ায় শুঁয়ায় আঘাত সর্ব্বদাই সেইসব কোষে লাগে, তাহাতে কোষ হইতে ফাঁস বাহির হয় না, আর কোষও 'চুরমার' হয় না। যে দ্রব্য খাদ্য বলিয়া হাইড্রা জানিতে পারে তাহারই আঘাতে কোষের ফাঁস বাহির হয়। কোষের discharge অর্থ কোষ ভাঙ্গিয়া চুরমার নয়।

৬৫ পৃষ্ঠায় তারামাছের একটি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিবরণ ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে। ছবির সঙ্গে বিবরণ মেলে না, বিবরণেও ভুল আছে। "আগে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা তারামাছের উপরের পিঠের ছবি" (অর্থাৎ যে পিঠে মুখ থাকে)। "মাঝে যে কালো দাগটি দেখিতেছ তাহাই ইহার মুখ এবং প্রত্যেক হাতে শিকড়ের মত যে শুঁয়ো বাহির হইয়াছে ঐগুলি ইহার পা। তারপরে দুই হাতের মাঝখানে যে কালো দাগটি দেখিতেছ তাহা জল প্রবেশের পথ।" ছবিতে মাঝের কালো দাগটি নাই, সেটি থাকিলে তাহাকে মুখ বলার ভুল হইত, কারণ তারামাছের যে পিঠে মুখ থাকে, সে পিঠে জল প্রবেশের পথ থাকে না। ছবিতে যেসব শুঁয়া দেখান হইয়াছে তাহা তারামাছের পা নয়, spines বা কাঁটা। পা থাকে প্রত্যেক হাতের মাঝখানে লম্বালম্বি একটা খাঁজের মাঝে (ambulacral groove)।

৬৬ পৃঃ "ইহাদের পাঁচটা হাতের ভিতর পাঁচটা পাকযন্ত্র থাকে।" "যাহার অঙ্গে পাঁচটা উদর, সে জানোয়ার কি-রকম ভয়ানক একবার ভাবিয়া দেখ।" উদর পাঁচটি নহে, একটিমাত্র। পাঁচ-থলিয়া-বিশিষ্ট একটি পাকযন্ত্র। সেই একটি উদরের একএকটি কোণ বা থলিয়া একএকটি কাঁপা হাতের মাঝখান পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

৮৮ পৃষ্ঠায় "শরীরের ডাইনে এবং বামে এই রকম সম্পূর্ণ পৃথক্ স্নায়ু সকল প্রাণীর দেহে দেখা যায় না। কেঁচো, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের দেহেই ইহা আছে।"

'প্রাণী'—"সকলপ্রাণী" পুস্তকের অনেক স্থলেই দেখা যায়, তাহা যে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। মাছ সরীসৃপ পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে ডাইনে ও বাঁয়ে স্নায়ু দেখা যায় না, কেবল পোকামাকড়ের দেহেই দেখা যায়, একথা ঠিক নয়। ঐসকল প্রাণীর দেহেও আছে, দ্বৈপার্শ্বিক সমতা or bilateral symmetry উহাদের দেহেও আছে।

৩৫৬ পৃঃ "শঙ্খ ও কড়ি দেখিতে সুন্দর। কিন্তু যখন জীবন্ত থাকে, তখন তাহাদের দেখিয়া সকল জলচর প্রাণীই ছুটিয়া পালাইয়া যায়।" সকল জলচর প্রাণী বলিলে octopus, মাছ, কাছিম, তিমিও বুঝায়। তাহারা কেহই কড়ি ও শঙ্খ দেখিয়া ছুটিয়া পালায় না। অনেক জলচর প্রাণী কড়ি ও শঙ্খ ধরিয়া খায়।

২৭৫ পৃষ্ঠায় "শল্কপক্ষ পতঙ্গের দল (Lepidoptera)। ইহারা প্রজাপতি ও রাত্রিচর প্রাণী।" রাত্রিচর প্রাণী বলিলে ত পেঁচা, চামচিকা, বাদুড় প্রভৃতি অনেক প্রাণীই বুঝায়; তাহারা কেহই শল্কপক্ষ পতঙ্গের দলে নহে।

পাটাক্রিমি বা ফিতাক্রিমির (tape worm) কথায় বলা হইয়াছে (১০০ পৃঃ) "ইহার মাথা অত্যন্ত ছোট, কিন্তু গায়ের রস চুষিয়া খাইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি সুন্দর।" "মাথা দিয়াও ক্রিমিরা মানুষ ও পশুর পেটের ভিতরকার সার অংশ চুষিয়া খায়। তা ছাড়া মাথায় বঁড়শির মত অস্ত্র আছে।" "যেসকল চুষনী দিয়া ইহাদের দেহ গঠিত, তাহার প্রত্যেকটিতে সেইরকম বঁড়শি এবং রস চুষিবার ব্যবস্থা আছে।" মাথার sucker এবং hooks আছে। sucker অর্থ রস চুষিয়া খাইবার যন্ত্র নহে। sucker দিয়া রস খায় না। সেগুলি মাথাকে একস্থানে আট্‌কাইয়া রাখিবার যন্ত্র।

দেহে যেসব টুকরা আছে তাহার কোনটাতেই hooks বা suckers নাই। মাথা বা অন্য টুক্‌রার উপরের ত্বক দিয়াই খাদ্যরস ক্রিমির শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

১০১ পৃঃ "পাটাক্রিমিদের দেহের কোন অংশে স্নায়ুর নামগন্ধ পাওয়া যায় না।" একথাও ঠিক নহে। মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরের দুই পাশে দুটি স্নায়ুরজ্জু stout chord শরীরের শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। (১০৫ পৃঃ) "মানুষের শরীর হইতে যে কেঁচোর মত গোল ক্রিমি বাহির হয়,...তাহাদের দেহে কেঁচোর মত দাগ কাটা আছে।" ইহাও ঠিক নয়। "These worms are characterised by having a thread-like body, covered with a tough elastic integument but showing no distinct traces of being divided into segments like those of leeches and earthworms." (Royal Nat. History) মানুষের পেটে ৬ ইঞ্চ হইতে ১০।১২ ইঞ্চ লম্বা Ascaris lumbricoides, এবং সিকি ইঞ্চ লম্বা oxyuris vermicularis, দুই রকমের গোল ক্রিমি দেখা যায়। ইহাদের কাহারও দেহে দাগ কাটা দেখা যায় না।

১৪৭ পৃঃ "পতঙ্গদের দেহের অনেক জায়গায় নিশ্বাস টানিবার নল থাকায় তাহারা অন্য প্রাণীর চেয়ে অনেক অক্সিজেন পায়। এই জন্য পতঙ্গেরা এত ছুটাছুটি করিয়াও ক্লান্ত হয় না।" প্রাণীদের দেহের প্রত্যেক কোষেরই অক্সিজেন পাওয়া দরকার, তাহার ব্যবস্থা সকল প্রাণীর দেহেই আছে। যে-সকল প্রাণী খুব ছুটাছুটি করে তাহাদের শরীরের কোষসকলের জীবনধাতুর দ্রুত ভাঙ্গন গড়ন হয়, সেইজন্য কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি দ্রুত পরিত্যক্ত ও অক্সিজেন দ্রুত গৃহীত হয়। মাছ, পাখী ও স্তন্যপায়ীরা খুব ছুটাছুটি করে, তাহাদের দেহে পতঙ্গের মত নল লাগানো নাই। তাই বলিয়া তাহাদের respiratory efficiency পতঙ্গদের অপেক্ষা কম নয়। পতঙ্গেরা ক্লান্ত হয় না, একথাও ঠিক নয়। পতঙ্গও বসে, বিশ্রাম করে, নিদ্রা যায়। ক্লান্তি জীবদেহের ধর্ম্ম।

১৫৮ পৃঃ "পতঙ্গদেহে হৃৎপিণ্ড আছে কিন্তু শরীরের কোন যায়গায় শিরা উপশিরার খোঁজ পাওয়া যায় না।" একথা ঠিক নহে। পতঙ্গের শরীরের বিভিন্ন স্থানে arteries বা শিরা সকল গিয়াছে।

৩১৭ পৃঃ "ফড়িংদের কান দেহের যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়।" কোনো ফড়িংএর কান তাহার দেহের যেখানে-সেখানে থাকে না। তাহার দেহের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানেই থাকে।

৩৪৩ পৃঃ "কাঁকড়া-বিছারা একসঙ্গে অনেক ডিম প্রসব করে... কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়।" কাঁকড়া-বিছা ডিম প্রসব করে না। ডিম পেটের ভিতরে থাকিয়াই ফুটে, পেট হইতে পরে বাচ্চা বাহির হয়।

৩৪৭ পৃষ্ঠায় কেন্নোর কথায় আছে "ইহাদের দেহের প্রত্যেক আংটি হইতে এক জোড়া করিয়া পা বাহির হইয়াছে।" কেন্নোদের দেহের অধিকাংশ আংটি হইতেই দুই জোড়া করিয়া পা বাহির হয়। এইজন্য এই শ্রেণীর নামই হইয়াছে Diplopoda.

৩৫৯ পৃঃ "কেবল ঝিনুকেরই যে দুইখানা খোলা আছে তাহা নয়। সমুদ্রের অনেক বড় বড় শামুকের দেহেও দুইখানা করিয়া খোলা দেখা যায়।" যাহাদের শামুক বলি, তাহারা একখোল-বিশিষ্ট mollusk। যাহাদের ঝিনুক বলি, তাহারা দ্বি খোল-বিশিষ্ট mollusk। কোন শামুকের দেহে দুইটা খোল হয় না। দুইটা খোল বা bivalve হইলে তাহাকে শামুক বলি না।

এইসকল ভুল কেবল বিশেষজ্ঞেরাই ধরিতে পারেন। আবার অনেক ভুল আছে যাহা সাধারণ পাঠকই ধরিতে পারেন। যেমন (৯৭ পৃঃ) জোঁকের মুখ ও পিছন দুই দিকেই দুটা মোটা ফাঁক আছে, দুই দিক দিয়াই ইহারা রক্ত চুষিয়া খায়। যাহাদের গায়ে জোঁক লাগিয়াছে তাহারা সকলেই জানে জোঁক মুখের দিক দিয়াই রক্ত চুরিয়া খায়, পিছনের দিক দিয়া খায় না।" জোঁকের পিছন দিকে একটা বাটির মত sucker আছে, সেটা চলিবার সময়ে কাজে লাগে। সে sucker রক্ত চুষিবার যন্ত্র নয়, তার ভিতরে কোন ছিদ্র নাই যাহা উদরের সঙ্গে সংযুক্ত, কাজেই সে sucker দিয়া রক্ত চুষিতে পারে না।

১২৩ পৃঃ "আমরা আগেই বলিয়াছি পোকা-মাকড়ের দেহে যত গাঁট থাকে, তাহার প্রত্যেকটি হইতে জোড়া জোড়া পা বা ডানা বাহির হয়।" তাহা ত হয় না। ফড়িং, আরসুলা, প্রজাপতি, কাঁকড়াবিছা ইত্যাদির দেহের সব গাঁট হইতে ত পা বা ডানা বাহির হয় না।

১৩৪ পৃঃ "চিংড়ির শরীরের যেমন মাথা ও লেজ এই দুই মোটামুটি ভাগ আছে, কাঁকড়াদের দেহও ঠিক সেইরকম দুই ভাগে ভাগ করা আছে।" (১৯৫ পৃঃ) "চিংড়িদের মত ইহাদেরও শরীরে গাঁটে গাঁটে পা আছে।" কই তা ত নাই, কাঁকড়ার লেজের কোন গাঁটেই পা নাই।

১৪৯ পৃঃ "তিনটি বড় অংশ লইয়াই আমাদের পায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...পতঙ্গদের পায়ে ঐ রকম দুইটি অংশ আছে, পা ও জানু।" একটা ফড়িং বা আরসুলার পা দেখিলেই বুঝা যায়, যে, আমাদের পায়ের মত তাতে (উরু, জংঘা, চরণ) তিনটা ভাগ ত আছেই, তা ছাড়া আরও দুইটা ভাগ আছে।

১৮৪ পৃঃ "বোল্‌তাদের জন্মের সময়ে যে আকার থাকে বয়সের সঙ্গে তাহা কখনই বাড়ে না।" বোল্‌তার জন্ম ত হয় ডিম ফুটিয়া। সে সময়ে তাহার আকার যত বড় থাকে বয়সের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাহা বাড়ে, নতুবা অত বড় হয় কি করিয়া? পাখা গজাইবার পর দেহ আর বাড়ে না। পাখা গজায় যৌবন প্রাপ্ত হইলে। যৌবন বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে কোন প্রাণীর দেহই আর বাড়ে না।

৩০৯ পৃঃ "গান্ধীপোকারা সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় বৃদ্ধি পায় না।" তাহাদের দেহ বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাদের দেহের রূপান্তর হয় না।

১৮৭ পৃষ্ঠায় ভীমরুলের কথায় বলা হইয়াছে, "বোল্‌তা যেমন খোলা জায়গায় চাক বাঁধে, ইহারা তাহা করে না।" আমি ত ভীমরুলদের বহু স্থানে খোলা জায়গায় চাক বাঁধিতে দেখিয়াছি। ভীমরুলের চাকের উপর একটা আবরণ থাকে, বোল্‌তার চাকে সে আবরণটা থাকে না। চাকটা ভিন্ন রকমের।

অবশেষে কয়েকটি বিরুদ্ধ বর্ণনার উল্লেখ করিতেছি। ৯২ পৃষ্ঠায় কুকুরের গায়ের আঁটুলি "আহারের চেষ্টায় কখনো চলা ফেরা করে না।" "যদি কুকুরের গা হইতে আঁটুলি ধরিয়া তোমরা বাগানের ঘাসের মধ্যে ছাড়িয়া দাও তবে তোমরা দেখিবে সে অন্য এক প্রাণীর গায়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।" আমি ত দেখিতেছি আমার কুকুরের গায়ের আঁটুলি-পোকারা আমার ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চলা-ফেরা খুবই করে। ইহাদের স্ত্রীরাই রক্ত খায়, পুরুষরা নহে। "These ticks are not however found exclusively upon the hosts; they also occur on the ground and under stones where pairing and hatching of the eggs take place."

Parasiteএর সংজ্ঞা ও উদাহরণ ঠিক হয় নাই। "পরের অনিষ্ট করিয়া নিজেরা আহার করে বলিয়াই, আমরা এইসব প্রাণীকে পরাশ্রিত নাম দিলাম।" পরের অনিষ্ট করিয়া ত সকল মাংসাশী প্রাণীই খায়। তাহারা সকলেই parasite নহে। আবার আমাদের শরীরে অনেক parasite বাস করে, তাহারা আমাদের কোনই অনিষ্ট করে না।

১১১ পৃঃ "সমস্ত পৃথিবীতে ছোট-বড়তে মিলিয়া তিন লক্ষ রকমের প্রাণী আছে।" (১১৩ পৃঃ) "পণ্ডিতেরা তিন লক্ষ পোকামাকড়কে স্বভাব ও আকৃতি দেখিয়া ভাগ করিয়াছেন।" শুধু পোকামাকড়ই (Insects) যদি তিন লক্ষ হইল, তবে সমস্ত প্রাণী তিন লক্ষ কি করিয়া হইবে? এক আরথোপোডা (Arthopoda) শাখায় বার লক্ষ রকমের বা জাতির প্রাণী হইবে।

১২০ পৃঃ "ছয় যোড়া পায়ের মত অংশ লইয়া চিংড়িদের মুখ প্রস্তুত হইয়াছে" (১২১ পৃঃ) "মুখের ছয় যোড়া অঙ্গ ছাড়া ইহাদের দাড়ার কাছ হইতে আরো তিন যোড়া অঙ্গ বাহির হয়।" ইহার কয়েক লাইন নীচেই আছে 'চিংড়িদের মুখে যে তিন যোড়া অঙ্গের কথা বলিলাম তাহা দিয়া এইসকল কায চলে।"

১২১ পৃঃ আমরা কোনো জিনিস ছিঁড়িয়া খাইবার সময়ে চোয়াল উপর নীচে নাড়া-চাড়া করি, ইহাতে খাদ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, কিন্তু চিবান হয় না। চিবাইতে হইলে চোয়ালকে পাশাপাশি চালাইতে হয়।" আবার ১৫৫ পৃষ্ঠায় দেখি "আমরা প্রায়ই চোয়াল উপর নীচে নাড়াইয়া খাদ্য চিবাই।"

১২৫ পৃঃ "চিংড়িদের মাথায় যে কালো কালো দুটি চোখ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটিতেই শত শত ছোট চোখ আছে। এতগুলি চোখ আছে বলিয়াই ইহারা বড় প্রাণীদের চেয়ে অনেক ভালো করিয়া দেখিতে পায়।" আবার ১৪৮ পৃষ্ঠায় দেখি "কাক, চিল, শকুনি বা অপর প্রাণীরা দুটি ছোট চোখ দিয়া যেমন দেখিতে পায়, পতঙ্গেরা হাজার হাজার চোখ দিয়াও সে রকম দেখিতে পায় না।" চিংড়িদের শত শত চোখ আছে বলিয়াই যে তাহারা দুই-চোখো বড় প্রাণীদের চেয়ে ভাল দেখিতে পায় তাহা নহে।

১১৪ পৃঃ "পতঙ্গদের শরীরে মাথা, বুক ও লেজ এই তিনটি অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। বুকের তলায় ছয়খানি পা থাকে।" ১৪২ পৃষ্ঠায় "তিনটি গাঁইট লইয়া ইহাদের বুকের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই গাঁইট-গুলির প্রত্যেকটি হইতে এক যোড়া পা বাহির হইয়াছে।" সুতরাং বুকেই তিনযোড়া পা। কিন্তু ২৬১ পৃষ্ঠায় দেখি "মাথা বুক ও লেজ লইয়াই পতঙ্গের দেহ।...প্রায়ই বুকের অংশে এক যোড়া পা থাকে। বাকি দুই যোড়া লেজের দিকে থাকে।" এখানে বুকে একযোড়া ও লেজে দুইযোড়া পা কেন হইয়া গেল?

১১৫ পৃষ্ঠায় মাকড়সাদের "পেটের তলার আংটিগুলি প্রায় চেনা যায় না।...পেটের তলায় চারি যোড়া অর্থাৎ আটখানা পা থাকে।" আবার ৩২৮ পৃষ্ঠায় দেখি "মাথার অংশ হইতে আটখানা পা বাহির হয়।"

১৫০ পৃঃ মাছিরা দেয়ালের গা বাহিয়া উঠিতে পারে, পড়িয়া যায় না। কি করিয়া উঠে? একটা চাবির ছিদ্র মুখে পুরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া যদি সেই ছিদ্রটা ঠোঁটে লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে চাবিটা ঠোঁটে আটকাইয়া থাকে। মাছির পায়ের পাতায় কতকটা সেই রকম ব্যবস্থা আছে। পায়ের তলা হইতে উহারা বাতাস টানিয়া লইতে পারে। এইজন্য বাহিরের বাতাসের চাপে পা দেওয়ালের গায়ে আট-কাইয়া থাকে। মাছির কথা যখন বলিব তখন ছবি দিয়া এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিব।" ২৯০ পৃষ্ঠায় মাছির কথা আছে, কিন্তু তাহার পায়ের কোন ছবি নাই, ব্যাপারটাও যাহা বুঝান হইয়াছে তাহা অন্য প্রকার। "ইহাদের পা-কয়েকটি বড় মজার। বিড়ালের পায়ের তলায় যেমন উঁচু মাংসপিণ্ড থাকে, ইহাদের পায়ের নীচে সেইরকম দুটি উঁচু অংশ দেখা যায়। সেগুলি ছোট ছোট লোমে ঢাকা থাকে। মাছিরা যখন দেয়ালের গায়ে পা লাগাইয়া হাঁটিয়া বেড়ায়, তখন ঐসকল লোম হইতে আঠার মত এক রকম জিনিস বাহির হইতে আরম্ভ করে। ইহা পাগুলিকে দেওয়ালের গায়ে আটকাইয়া রাখে।"

১৭৭ পৃঃ "পাখীরা যেমন ডানা গুটাইয়া ডালে বসে, বোলতারা সে-রকম ডানা গুটাইয়া বসিতে পারে না। যখন স্থির হইয়া দাঁড়ায় তখন ডানা কয়েকখানিকে শরীরের উপরে উঁচু করিয়া রাখে।" কিন্তু ২৭৮ পৃষ্ঠায় দেখি "মাছি ও বোলতারা যেমন ডানা গুটাইয়া পিঠের উপর ফেলিয়া রাখে, প্রজাপতিরা তাহা কখনই করে না।"

৩০১ পৃঃ "মাকড়সার চোখের কথা এখনও বলা হয় নাই। দু'তের উপরে যে আটটি দাগ থাকে, সেইগুলিই উহার চোখ।" ইহার দুই লাইন নীচেই আছে "মাকড়সাদের মাথার উপরে কেবল আটটি চোখ থাকে।"

৩৪১ পৃঃ "মাকড়সাদের দেহে যেমন মাথা ও লেজ, আর কিছুই নাই, ইহাদের (অর্থাৎ কাঁকড়াবিছাদের) দেহ ঠিক সেই রকম।" ৩৪২ পৃঃ "তেঁতুলের বিচির মত ছয়টা গাঁইট লইয়া ইহাদের লেজ।" শেষ ছয়টা গাঁইট লইয়া যদি ইহাদের লেজ হইল, তবে ছবিতে যে এই ছয়-গাঁইট-যুক্ত লেজ ও মাথার মধ্যস্থলে আরও কতকগুলি গাঁইট-বিশিষ্ট একটা মোটা অংশ আছে, সেটা কি? মাথা ও লেজ ছাড়া ত আর কিছুই নাই।

আরও দুই তিন স্থলের বিবরণ ঠিক হয় নাই। যেমন ৯০ পৃষ্ঠায় 'কিন্তু যদি কোন রকমে ইহাদের (অর্থাৎ কেঁচোদের) দেহ খণ্ডিত হইয়া পড়ে, তবে প্রত্যেক খণ্ড হইতে একএকটা নূতন কেঁচো জন্মে। যদি তোমরা কেঁচো পুষিতে চাও, তবে একটা বাচ্চা কেঁচোকে টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া, ভিজে মাটির মধ্যে রাখিয়া দিয়ো। কিছুদিন পরে দেখিবে, উহার শরীরের প্রত্যেক টুক্‌রা হইতে এক একটি নূতন কেঁচো হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" একটা কেঁচোকে দুই খণ্ড করিয়া একটা গামলায় পরিষ্কার ভিজা মাটির মধ্যে রাখিয়া দেখিয়াছি, দুইখণ্ডই মরিয়া পচিয়া গিয়াছে। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া রাখিলে কোন খণ্ডই বাঁচে না। আমাদের দেশের জল-বায়ুর গুণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক এ পরীক্ষা সফল হয় না। গ্রন্থকার এ পরীক্ষায় সফল হইয়াছেন কি না জানি না। Wood's Natural History Readers এ কেঁচোর বিবরণে দেখি "Many people imagine that if a worm is cut into two pieces, each will grow into a separate worm. This is a great mistake, however, for the animal will die in the end, although it may not expire for days or even weeks after receiving the injury."

তারামাছের বেলায় দেখি (৭০ পৃঃ) "তোমরা যদি একটি তারা-মাছকে ধরিয়া ও কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও, তবে তাহার দেহের প্রত্যেক ছোট অংশ হইতে একএকটি নূতন তারা মাছের সৃষ্টি দেখিবে।" তারামাছকে যদি শরীরের মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলা যায়, অথবা তাহার সম্পূর্ণ একখানি 'হাত' শরীরের গোল অংশের নিকট হইতে কাটিয়া ফেলা যায়, তবে সেই দুই অর্দ্ধ খণ্ডই নষ্ট অংশের পুনর্গঠন করিয়া দুইটি পূর্ণ তারা-মাছ হইবে। হাত ছিঁড়িয়া গেলে নূতন হাত গজায়। কখন কখন সেই হাতখানারও গোড়ার দিক হইতে আরও ছোট চারিখানা হাত বাহির হইয়া একটা পূর্ণ তারামাছ হয়। কিন্তু কুচি কুচি করিলে হয় না। একটা হাতকে যদি পাঁচ ছয় খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা যায়, তবে সেইসকল খণ্ড আর বাঁচিবে না, দেহের অবশিষ্ট অংশও গড়িতে পারিবে না।

বিজ্ঞানের পুস্তক বিশেষতঃ যাহা ছেলেদের জন্য লিখিত হয় তাহার লিখনভঙ্গী যদি শিথিল হয়, চিন্তা ও যুক্তি যদি অসংবদ্ধ হয়, বর্ণনীয় বিষয় যাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার বিবরণ যদি যথাযথ না হয়, তবে সে পুস্তক দ্বারা বিজ্ঞান শিখাইবার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

জগদানন্দ-বাবু সুলেখক, বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের তাঁহার চর্চ্চা আছে, তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করি, তাই তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। তিনি যদি একটু সাবধান হইয়া লিখিতেন, তবে আর উল্লিখিত দোষ ত্রুটি থাকিত না এবং তাঁহার "পোকামাকড়" সাধারণের পাঠের উপযোগী প্রাণিবিজ্ঞানের একখানি সুন্দর পুস্তক হইত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বিবাহের ব্যাকরণ

১

নববধূ এলেন বটে চেপে রূপার পাল্কী,
ঘরে কিন্তু নেই ঠিকানা খাবেন তিনি কাল কি!
মেয়ের বাপের রক্ত চুষে বাজ্‌ল বটে বাদ্য,
ঘরে কিন্তু নেইক রে হায় পেটে দেবার খাদ্য!
খাবেন কি তা ঠিক না হতেই এলেন একটি পুত্র,
সফল হ'ল সংস্কৃতের অসাধারণ সূত্র!
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজ্‌ল ঠনন্ ঠঙ্
"বি" পূর্ব্বক "বহ" ধাতু, তার উত্তর "ঘঞ্"।

২

প্রথম যখন এলেন বধূ দেহভরা লজ্জা,
আলতা-পরা পা দুখানি, রাঙা রাঙা সজ্জা,
চুপিচুপি বলেন কথা, মাথায় আছে ঘোম্‌টা,
সার করেছেন লাজের চোটে আঁধার ঘরের কোণটা!
কিন্তু যখন দু'দিন পরে বাহির হ'ল অগ্নি,
বল্লেন হেঁকে, "তাড়াও পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী!"
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজ্‌ল ঠনন্ ঠঙ্
"বি" পূর্ব্বক "বহ" ধাতু, তার উত্তর "ঘঞ্"।

৩

স্বামী মশায় লেখা পড়া শিখেছিলেন উচ্চ,
পুচ্ছ 'পরে ছিল তাঁহার উপাধিরও গুচ্ছ।
বধূ গেলে বাপের বাড়ী বিরহেতে সদ্য
লিখে ফেল্লেন চিঠি এ.টা মস্ত বড় পদ্য!
কিন্তু তাহার আঁকা-বাঁকা এইসা এল উত্তর
যে রাগের চোটে স্বামী মশায় বলে উঠ্‌লেন "দুত্তোর!"
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজ্‌ল ঠনন্ ঠঙ্
"বি" পূর্ব্বক "বহ" ধাতু, তার উত্তর "ঘঞ্"।

৪

এম্‌নি করে সুখে দুখে গেল কয়েক বর্ষ,
স্বামীর হল 'ম্যালেরিয়া' 'বহুমূত্র' 'অর্শ'!
ক্রমাগত ছেলে হ'য়ে বধূ হলেন রুগ্ন,
দেহলতা হ'য়ে গেল কাঠির মত শুকন!
একদিন হঠাৎ মরেও গেলেন ছেড়ে এ ঘরকন্না,
ঘটক মশাই নতুন করে দিলেন আবার ধন্না!
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজ্‌ল ঠনন্ ঠঙ্
"বি" পূর্ব্বক "বহ" ধাতু, তার উত্তর "ঘঞ্"!

"বনফুল"

কাপড়ের কল

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে আমাদের গ্রামের ও চতুষ্পার্শের কাপড়ের কল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটা ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলাম। ইঙ্গিত পাইয়া বহু লোক সেই বিষয়ে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই অল্প কয়েক দিনের ভিতর আমার নিকট বহু পত্র ও বহু প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন পত্র লিখিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমার ন্যায় অকর্ম্মা ব্যক্তিরও বহু শক্তি ও সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা মনে করিতেছি। অতএব অদ্য পুনঃ প্রবাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাপড়-কল-কুতূহলী পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইলাম।

১। আমাদের গ্রামের ও আশেপাশের কাপড়ের কলগুলিতে fly shuttle এ কাপড় বুনা হয়। অবশ্যই বিলাতী ইস্পাতনির্ম্মিত লুমেই ঐ ব্যবস্থা। কাঠের কলগুলিতে হাতে মাকু টানিতে হয়।

২। বিলাতী লুমের দাম ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে ১০০৲।১২৫৲ ছিল। তারপর ২০০৲ পর্য্যন্ত হয়। সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চারিশত পাঁচশত টাকাতেও উহা এখন মিলে না। আম্‌দানী বন্ধ।

৩। কাঠের তাঁত আমাদের দেশের মিস্ত্রীরাই এখন তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। উহার মূল্য ও মজুরী কাঠের দাম সহিত ১৮ টাকা হইতে ২০ টাকার মধ্যেই সঙ্কুলান হয়। শ্রীরামপুরের আম্‌দানী কাঠের কলও বিরল নহে।

৪। ১১০০ শানা, ৪০ নং তানা, ১০ হাত ৪৪″ ইঞ্চি ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে। মিহি সুতার কাজ করিতে সময় একটু বেশী দরকার, কাজেই মজুরী বেশী। সাধারণতঃ মুসলমানরমণীদের মোটা শাড়ী এবং সর্ব্বসাধারণের পরিধানের তকম এই দুই রকমই জোড়া তৈয়ারী হয়। উহার খুব কাটতি। মূল্য ছয় হাত পরিমাণ চৌদ্দ আনা বা একটাকা। তাহা ছাড়া ছোট ছোট তাঁতে প্রতিদিন বহু গামছা তৈয়ার হইতেছে।

৫। সুতাতে ভাতের মাড় না দিয়া আতপ চাউলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া যে মাড় হয় তাহাই ব্যবহৃত হয়।

৬। একমাত্র আমাদের গ্রাম হইতেই প্রতিমাসে দুই হাজার জোড়া কাপড় সরবরাহ হইতে পারে। অবশ্যই উল্লিখিত কাপড়।

আছে। এক ব্যয়হ্রাস, আর এক আয়বৃদ্ধি। কেহ যেন মনে না করেন, ব্যয়হ্রাসের দিকে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চতুরদৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু তিনি ব্যয় হ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন, অনাবশ্যক অধ্যাপক ও শিক্ষকের সংখ্যা কমাইয়া কিম্বা অল্পকর্ম্মী শিক্ষাদাতাদের বেতন হ্রাস করিয়া নহে,—অন্য, অদ্ভুত ও অন্যায়, উপায়ে। আশুবাবু সীণ্ডিকেটে যে প্রস্তাব করেন এবং যাহা তথায় নামঞ্জুর হওয়ায় সেনেটে উপস্থাপিত হয় নাই, তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল :—

That the following alterations be made in the scale of remuneration to Examiners (Calendar for 1918-19, Part I, page 716) :—

(*a*) The fee for Paper-setting at the M.A. and M. Sc. Examinations be abolished.

(*b*) The fee for Paper-setting be abolished in the case of the following Examinations :—

Matriculation Examination.
I.A., and I.Sc. Examinations.
B.A., and B.Sc. Examinations.
L.T. and B.T. Examinations.
Preliminary, Intermediate and Final Examinations in Law.
M.L. Examination.

(*c*) That the fee for examining an answer paper be reduced by two annas in the case of the following Examinations :—

Matriculation Examination.
I.A. and I.Sc. Examinations.
B.A. and B.Sc. Examinations (Pass).

(*d*) That the fee for examining an answer paper be reduced by eight annas in the case of the following examinations :—

B.A. and B.Sc. Examinations (Honours).
M.A. and M.Sc. Examinations.
Preliminary, Intermediate and Final Examinations in Law.

অর্থাৎ যে-দুটি প্রধান কাজের জন্য পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ফী লওয়া হয়, তাহার একটি বিনিপয়সায় বেগার ধরিয়া সারিবার, এবং অন্যটি খুব কম পয়সা দিয়া সারিবার ফন্দী আশুবাবু স্থির করেন। প্রশ্ন নির্ব্বাচন করা পরিশ্রমের কাজ ও দায়িত্বের কাজ। আশু বাবু প্রস্তাব করেন, যে, ইহা বিনিপয়সায় করাইতে হইবে। তাহা হইলে কাজ যে কত উৎকৃষ্ট হইত ও কেমন যোগ্য লোকের দ্বারা হইত, বুঝাই যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করিবার ফী পরীক্ষকদিগকে কম দিবার প্রস্তাব করা হয়। এই আক্রা গণ্ডার দিনে ন্যায়াধীশের এই ন্যায়-বিচার। উত্তর পরীক্ষা করা একান্ত একঘেয়ে ও বিরক্তি-জনক কাজ। তাহাতে আবার কম পয়সা দিলে কিরূপ যোগ্য লোকের কাছে কত উৎকৃষ্ট কাজ পাওয়া যাইত, বলিয়া দিতে হইবে না।

পরীক্ষার ফী হইতে আয় হয় খুব বেশী, সাক্ষাৎভাবে পরীক্ষার কার্য্যে ব্যয় হয় অপেক্ষাকৃত কম। উদ্বৃত্ত প্রভূত অর্থ পরীক্ষার সহিত অসংপৃক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হয়। তাহার উপর সাক্ষাৎ পরীক্ষার ব্যয় আরও কমাইয়া অন্যদিকে ব্যয়ের সংকুলন করিবার চেষ্টা কি ন্যায়সঙ্গত? দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৯-২০ সালে পরীক্ষার ফী হইতে আয় হয় ৯১২১২৫ (নয় লক্ষ বার হাজার একশত পঁচিশ) টাকা। পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক, পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যয়, এবং উত্তরের খাতা, এই তিন বাবতে পরীক্ষার ব্যয় হয় ৩৭৫২৭৪৲ (তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশত চুয়াত্তর) টাকা; ধরুন না হয় চারিলাখ টাকা। তাহা হইলেও উদ্বৃত্ত ছিল পাঁচলক্ষ টাকার উপর। একলাখের কিছু উপর রেজিষ্ট্রার কণ্ট্রোলার প্রভৃতির বেতনে ব্যয় হয়। ইহার সমস্তটাই পরীক্ষার ব্যয় মনে করিলে, তবু চারিলাখ টাকার উপর উদ্বৃত্ত থাকে। যে-বাবতে আদায়ী টাকায় এত উদ্বৃত্ত থাকে, সেইজন্য অর্থব্যয় কমাইয়া পরীক্ষাগুলিকে কতকটা প্রহসনে পরিণত করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মূল্য অবশ্য খুবই বাড়িয়া যাইত! এখনই ত অন্য প্রদেশের লোকেরা বলে, যে, কলিকাতার ফার্ষ্ট ডিবিজনে পাস অধিকাংশ ছেলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ডিবিজনে পাসেরও অধম।

—

সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলনের প্রভাব।

সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলন নেতাদের অথবা চেলাদের আশানুরূপ সফল না হইলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থও হয় নাই। এই আন্দোলনের লক্ষ্য প্রধানতঃ তিনটি ছিল। প্রথম, সরকারী বা সরকারের সাহায্য ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ইস্কুল-কলেজসমূহ হইতে ছাত্র ভাঙাইয়া লইয়া সেগুলির বিনাশ সাধন। এ পর্য্যন্ত ওরূপ কোন শিক্ষালয় উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু অল্পাধিক ছাত্র অনেক জায়গাতেই ঐরূপ ইস্কুল কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। যেখানে-যেখানে তাহারা পড়িবার জন্য "জাতীয়" বিদ্যালয় পাইয়াছে, সেখানে যদি তৎসমুদয়

স্থায়ী ও সুপরিচালিত হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের জ্ঞানোপার্জ্জনের ব্যাঘাত হইবে না। ছাত্রদের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বেই স্কুল কলেজ ছাড়ার বিরোধী আমরা আন্দোলনের আরম্ভ অবধি এখন পর্য্যন্ত আছি। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে যিনি যত খারাপ বলিতেছেন এবং উহাকে আমাদের যত লাঞ্ছনা, অপমান ও অধোগতির কারণ বলিতেছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা ইস্কুল কলেজ ছাড়ার সার্থকতা বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিলাম, যে, যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের এত অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ, তাহার শাসন ও নিয়মের অধীন শিক্ষালয়ে থাকিলে ছাত্রদের লাঞ্ছনা হয় এবং আত্মসম্মানের হানি হয়। কিন্তু ছাত্ররা ঐসব শিক্ষালয়ের বাহিরে আসিলেই কি লাঞ্ছনা, অপমান ও অধোগতির কারণ ইংরেজ-শাসনের প্রভাব ও শক্তির হাত এড়াইতে পারে? ছাত্র অছাত্র আমরা সকলেই কি সর্ব্বত্র একই প্রভাব ও শক্তি অনুভব করিতেছি না? উনিশ-বিশ থাকিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য ছাত্রদের জ্ঞানলাভের পথ বন্ধ করা ভাল নয়। অনেকে বলিতেছেন, এটা যুদ্ধ, যুদ্ধে অন্য দেশের ছেলেদের মত আমাদের ছেলেরাও স্বার্থত্যাগ করিয়া লড়িবে। বেশ কথা। কিন্তু যুদ্ধটা কোথায়? আর অন্য দেশে কি কেবল ছাত্রেরাই লড়িয়াছে? আইনজীবী, বণিক, দোকানদার, কেরানী, শিক্ষক, অধ্যাপক, মজুর, পুরোহিত, কারিকর,—সমর্থ বয়সের সব শ্রেণীর লোক লড়িয়াছে। এখানে কেবল ছাত্রেরাই নিরস্ত্র সাত্ত্বিক আত্মিক সমরে নামিবে? সশস্ত্র দৈহিক যুদ্ধের মত নিরস্ত্র সাত্ত্বিক আত্মিক যুদ্ধেও শিক্ষা ও নিয়মাধীনতার আবশ্যক, বরং বেশী আবশ্যক। এই শিক্ষা ও নিয়মাধীনতা, এই সংযমের উপদেশ ও অভ্যাস তাহারা কোথায় কাহার নিকট হইতে পাইতেছে?

আন্দোলনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যপদপ্রার্থী যেন কেহ না হন, হইলেও যেন কেহ তাঁহাকে ভোট না দেন। এবিষয়েও আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। মধ্যপ্রদেশে সাতটি নির্ব্বাচনক্ষেত্রে এবং অন্য দুই এক জায়গাতেও কোন পদপ্রার্থী হয় নাই, অন্য অনেক স্থানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, কোথাও কোথাও অতি অল্পসংখ্যক নির্ব্বাচক ভোট দিয়াছেন, এবং মোটের উপর দেশময় যথেষ্ট নির্ব্বাচক ভোট দেন নাই। আমরা এখানে কেবল ফল যাহা হইয়াছে তাহাই লিখিতেছি, সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ বক্তব্য আগে আগে বলিয়াছি। পুনরুক্তি করিব না।

আন্দোলনের তৃতীয় লক্ষ্য, আইনজীবীদিগকে আদালত ছাড়ান। সামান্য পরিমাণে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আইনজীবীরা বিদেশী জিনিষের ব্যবসাদারদের চেয়ে ভাল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একটা কোন আদর্শ অনুসারে কাজ করিবার নিমিত্ত ক্ষতি সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু একজনও বিদেশী জিনিষের ব্যাপারী বিদেশী জিনিষ বিক্রী বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। বস্তুতঃ বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন করাইবার দিকে আন্দোলনের নেতারা এখনও তেমন দৃষ্টি দিতেছেন না।

—

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন।

"অশোক-গুচ্ছ" প্রভৃতি প্রণেতা কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল গাজীপুরে। তিনি এলাহাবাদে কিছুকাল ওকালতী প্রথমে করিয়াছিলেন। "সাহিত্যে" তাঁহার রচিত কবিতা পড়িয়া লোকে প্রথমে তাঁহাকে খাঁটি কবি বলিয়া চিনিতে পারে। পরে "ভারতীতে"ও তাঁহার পদ্য ও গদ্য অনেক রচনা বাহির হইয়াছিল। যখন এলাহাবাদ হইতে "প্রবাসী" প্রকাশিত হয়, তখন তিনি গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। ইদানীং তিনি দেরাদুনে বাস করিতেন।

—

সাহিত্যাচার্য্য জেম্‌স্ ড্রামণ্ড্ এণ্ডার্সন্।

বাংলা সাহিত্যের পরম বন্ধু বহুভাষাবিৎ সুরসিক ও সহৃদয় সাহিত্যাচার্য্য জেম্‌স্ ড্রামণ্ড্ এণ্ডার্সনের মৃত্যু হইয়াছে। এই-দেশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাংলা অক্ষর, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। চিঠিতে অনেক সময় "শ্রীইন্দ্রসেন" স্বাক্ষর করিতেন। পাশ্চাত্য জগৎকে বাংলা সাহিত্যের কথা জানাইতে তাঁহার মত এখন আর কেহ নাই।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে ভাবিতে হইবে যে, বাঙ্গালী যোগ্যতা থাকিতেও কোন কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেছে কি না, এবং যদি এরূপ হয়, যে, যোগ্যতা না থাকাতেই বাঙালী কোন কোন কাজ পাইতেছে না, তাহা হইলে এই যোগ্যতার অভাবের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দোষ, ত্রুটি বা অসামর্থ্য দায়ী কি না।

ভুল বুঝিবার ও বুঝাইবার সম্ভাবনা থাকায় বলিতেছি, যে, বাঙ্গালীর যোগ্যতা না থাকিলেও বাঙ্গালীকে কাজ দিতে হইবে, আমরা এরূপ কোন নীতির সমর্থক নহি। অ-বাঙ্গালী যোগ্যতম কিম্বা বাঙ্গালী অপেক্ষা যোগ্যতর হইলেও তাঁহাকে কাজ দেওয়া হইবে না, এ নীতিও নিন্দার্হ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি যখন বঙ্গদেশে স্থিত, প্রধানতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদের জন্য, এবং বাঙ্গালীর দেওয়া টাকার উপর ইহার নির্ভর, তখন যোগ্য বাঙ্গালীকেই বিশেষ ভাবে কার্য্যক্ষেত্র দেওয়া, এবং বাঙ্গালীকে যোগ্যতম করিয়া তোলা ইহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য মনে করি। এই কর্ত্তব্য সাধিত হইতেছে কি না, শিক্ষিতসাধারণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অ-বাঙ্গালীরা টাকা পাইতেছেন, কি বাঙ্গালী পাইতেছেন, প্রধানতঃ এই ভাবে বিষয়টির আলোচনা আমরা করিতে বা করাইতে অনিচ্ছুক। সত্য আবিষ্কার, জ্ঞান আহরণ, ও জ্ঞান দান করিবার যথেষ্ট সুযোগ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ বাঙালী পাইতেছেন কি না, তাহাই বিচার্য্য।

দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয় হইয়াছে। কুলি মজুর মুটিয়া মাঝি কারিগর হাজারে হাজারে বাহির হইতে বঙ্গে আমদানী হইয়া চলিতেছে। বড় বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, প্রভৃতির নিকট বাঙালীর পরাজয় হইয়াছে। ছোট ছোট বিস্তর দোকানও বাংলার ছোট ছোট সহরে পর্য্যন্ত ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা খুলিয়াছে। বঙ্গের বৃহত্তম কারবার পাটের কলে বাঙ্গালী প্রথম হইতেই হারিয়া আছে। একটি কাজ ছিল—সেটি লেখাপড়ার কাজ, বিদ্যার কাজ;—যাহাতে বাঙ্গালী নিজের প্রদেশে এবং সমুদয় উত্তর ভারতে ও মধ্য প্রদেশে অগ্রণী ছিল, তাহা শিক্ষকতা ও অধ্যাপকতা। ইংরেজ অধ্যাপকের আমদানী আগে হইতেই চলিত; যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার রাজনৈতিক কারণ ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেরই ভিন্ন প্রদেশ হইতে অধ্যাপকের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র। ইহা কি বাঙালীর মানসিক পরাজয় সূচনা করিতেছে?

—

শিক্ষার উপর ট্যাক্স্।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট স্থির করিয়াছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের "জানিত" (recognised) প্রত্যেক বিদ্যালয়কে বার্ষিক ১০০৲ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হইবে। এপর্য্যন্ত কিছু দিতে হইত না, এখন হইবে; তাহাতে সরল পাড়াগেঁয়ে লোকেরা সহজেই মনে করিতে পারে, কর্ত্তারা বুঝি নূতন কিছু উপকার করিতে যাইতেছেন, এবং সেই জন্য টাকা চাহিতেছেন। তা নয়। নূতন উপকার কিছু হইবে না। তাঁহারা আগেও যেমন ফী লইয়া ছেলেদের পরীক্ষা করিতেন, এখনও তাই হইবে; বেশী কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার অভাব হইয়াছে; সুতরাং যাহাদের উপর জুলুম চলে তাহাদের নিকট হইতেই টাকা আদায় হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় বহুৎ টাকা চান; সরকার তাহা দিতে অনিচ্ছুক; সুতরাং অল্পসংখ্যক সরকারী ইস্কুল হইতে সামান্য কিছু টাকা দিয়া তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবার লোভে গরীব বেসরকারী ইস্কুলগুলির উপর জুলুমে তাঁহারা (অর্থাৎ তাঁহাদের তরফ হইতে ডিরেক্টর হনেল সাহেব) আপত্তি করেন নাই। তা ছাড়া, সেনেটে গৃহীত প্রস্তাবে আছে, যে, কোন ইস্কুলের সমস্ত টাকা যদি ইস্কুলের জন্যই ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে ঐ ইস্কুলকে ১০০ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ দিতে হইবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলগুলি ৫০ করিয়া দিয়াই অব্যাহতি পাইবে। যে-সব ইস্কুলের মালিকেরা উহা হইতে ব্যক্তিগত ভাবে লাভ খান, তাঁহাদিগকে পুরা ১০০ দিতে হইবে। এখানে জিজ্ঞাস্য, গবর্ণমেণ্ট যদি নিজের কোন ইস্কুল হইতে টাকা লইয়া অন্যত্র ব্যয় করেন, তাহা হইলে সেই ইস্কুলকে ১০০ দিতে হইবে কি না? জিজ্ঞাসার কারণ, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে

পড়িয়াছিলাম, হেয়ার ইস্কুল হইতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হয়।

ট্যাক্‌সের একটা সাধারণ নীতি আছে, যে, যাহাদের উপর ট্যাক্‌স্ বসে, তাহাদের আয় অনুসারে উহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এখানে কিন্তু সেরূপ কোন নীতি অনুসৃত হয় নাই। কলিকাতার যে-সব ইস্কুলের ব্যবসাদার মালিকরা ইস্কুল করিয়া ধনী হইয়াছেন, তাঁহাদের দেয় ট্যাক্‌স্ ১০০, আবার মফঃস্বলের গরীব ইস্কুলের দেয়ও ১০০!

বুঝিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার দরকার। ইস্কুলের চেয়ে কলেজগুলির সঙ্গে ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক; তাহাদের ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিদর্শন করেন, মেসের বন্দোবস্ত করেন, ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইত্যাদি। কোন কোন কলেজের মালিক তাহা হইতে বেশ রোজ্‌গারও বহুকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের উপর ট্যাক্‌স্ কেন বসিল না?

সকলেই জানেন, ইস্কুলের শিক্ষকদের মত অল্পবেতনভোগী ভদ্র শিক্ষিত লোক আর নাই। ইস্কুলের যদি দুপয়সা আয় হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ন্যায়বান্ লোকই প্রথমেই বলিবেন, গরীব শিক্ষকদের বেতন বাড়ুক। তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় জেদ না করিয়া, চেষ্টা না করিয়া, আগে নিজের সুবিধার জন্য অর্থশোষণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন! বিস্তর স্কুলের সাজসরঞ্জাম আস্‌বাব লাইব্রেরীর দুর্দ্দশা অত্যন্ত অধিক। তাহা দূর হউক বা না হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা চাই। উহার অনেক অধ্যাপক ও শিক্ষকের যথেষ্ট কাজ নাই, তবু তাহাদিগকে পুষিতে হইবে; কিন্তু গরীব স্কুলমাষ্টারদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিবার দরকার নাই! আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত জানি, যে, বিশ্ববিদ্যালয় আগেই শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে কি কাজ দেওয়া যায়, তাহার খোঁজ পড়িল! এরূপ একাধিক দৃষ্টান্ত জানি। আদালতে ইহা প্রমাণ করিবার মত দলিল আমাদের কাছে নাই; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ ক্লাসে কে কোন্ দিন হইতে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার টাইম্‌টেব্‌ল্ মুদ্রিত ও সাধারণের হস্তগত হয় না।

সেনেট কিছুদিন পূর্ব্বে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফী বাড়ান হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা নামঞ্জুর করেন। গবর্ণমেণ্ট গরীব ছাত্রদের উপর দয়া করিয়া যে উহা নামঞ্জুর করেন, তাহা নয়; নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের ষষ্ঠ ভল্যুমের ১৯৩ পৃষ্ঠায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্গঠন করিবার ব্যয়ের একটি তালিকা দিয়াছেন। পুনর্গঠনের একটি প্রস্তাব, প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষাদ্বয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে সরাইয়া লওয়া। তাহা লইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক্‌সান্ হইবে; কারণ ঐ দুই পরীক্ষার ফী আর বিশ্ববিদ্যালয় পাইবেন না। এই ক্ষতিপূরণ জন্য কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লাখ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি পরীক্ষা দুটির ফী বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে তিন লাখ অপেক্ষা বেশী ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ফী বৃদ্ধির প্রস্তাব নামঞ্জুর করেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

যাহা হউক, সেনেট এই এক রকম প্রস্তাবে হারিয়া আর-এক দিক্ দিয়া সেই ছাত্রদেরই পিতামাতার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবেন, দেখিতেছি। ১৯১৯-২০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হয় মোটামুটি সতের হাজার। "জানিত" ইস্কুলের সংখ্যা মোটামুটি ৮৫০। তাহা হইলে গড়পড়তা প্রত্যেক ইস্কুল হইতে ২০ জন পরীক্ষার্থী আসে। প্রত্যেক ইস্কুলের উপর সেনেট ট্যাক্‌স্ বসাইতেছেন ১০০৲। অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ফী ৫৲ টাকা করিয়া বাড়াইলে সেনেট পাইতেন প্রত্যেক স্কুল হইতে গড়ে ৫৲ × ২০ = ১০০৲, এবং এখনও তাহাই পাইবেন। ইস্কুলগুলি যাহা দিবে, তাহা ছাত্রদের নিকট হইতেই, তাহাদের বেতন বাড়াইয়া বা অন্য উপায়ে, আদায় করিবে। অন্যান্য দেশে শিক্ষার ব্যয় কমান হইতেছে। ধনী ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে এত অধিকসংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে যে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক ছাত্র বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছে। গরীব বঙ্গে কিন্তু শিক্ষার ব্যয় বাড়ান হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় সমান করিবার দুটা পথ

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বাঙালী, এবং তাঁহার ক্ষুদ্র দলের প্রধান চেলারা বাঙালী। ভারতের বাহিরে ভারতবাসীদের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার, রাজনৈতিক আন্দোলন ও শিক্ষাদান, প্রধানতঃ এই তিন প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। স্থায়ী ভাবে ধর্ম্মপ্রচার আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙালীরা করেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্য কোথাও কোথাও আর্য্য সমাজের হিন্দীভাষী প্রচারকেরা করেন। রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতের বাহিরে বিলাতে যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানস্থানীয় একমাত্র বাঙ্গালী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। আমেরিকায় ভারতীয় আন্দোলকদের দুই দল। এক দল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বরাজ চান; ইহাঁদের নেতা ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। ইহাঁর আমেরিকাস্থ প্রধান সহযোগীরা বাঙ্গালী নহেন। ইহাঁদের মুখপত্র আমেরিকা হইতে প্রকাশিত ইয়ং ইণ্ডিয়া। অন্য দল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান। এক সময়ে ইহার অন্যতম নেতা ছিলেন হরদয়াল। এই দলভুক্ত কোন কোন বাঙালী যুদ্ধের সময় আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। এখন কয়েকজন বাঙ্গালীকে এই দলের নেতা বলিয়া মনে হয়;—যথা, তারকনাথ দাস, সুরেন্দ্র কর, বসন্তকুমার রায়, হেরম্বলাল গুপ্ত, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের বাহিরে প্রবাসী ভারতীয়দিগকে শিক্ষাদান কোথাও কোথাও আর্য্য-সমাজের লোকেরা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা বাঙ্গালী নহেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থায়ীভাবে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত বাঙালীই হইয়াছেন। আইওআ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু বহু বৎসর ধরিয়া অধ্যাপকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। অক্সফর্ডে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এখন তাহা ছাড়িয়া আসিয়াছেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার অনেক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানের কথা বক্তৃতা দ্বারা ও সাময়িক পত্রে লিখিয়া প্রচার করিতেছিলেন। তিনি এখন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আসিয়াছেন। এই কাজ এবং বিদেশে বাঙ্গালী অধ্যাপকদের কাজ আমরা নিখিলভারতীয় কাজের মধ্যে গণ্য করিতেছি। কারণ, এইরূপ কাজের দ্বারা ভারতবর্ষের লোকেরা জ্ঞানী ও সভ্য বলিয়া মানবসমাজে পরিচিত হয়।

পৃথিবীতে মনস্বী-সমাজে যাঁহাদের নামে ভারতবর্ষ পরিচিত, সেই-সকল ভারতসন্তানদের মধ্যে অন্য কোন প্রদেশের লোকদের চেয়ে বাঙালীর নাম নীচে নহে। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও চিত্রশিল্পী বলিয়া বাঙালীর কৃতিত্ব ও খ্যাতি ভারতীয় অন্য কোন প্রদেশের লোকের অপেক্ষা কম নহে। ইহাঁদের কাজ নিখিলভারতীয় ত বটেই, সমুদয় জগতেরও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাঁদের কাছাকাছি যান, এরূপ লোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে না। ইহাঁরা বৃদ্ধ হইয়াছেন, ইহাঁদের স্থলাভিষিক্ত কাহারা হইবেন? উদীয়মান সূর্য্য আশার আভাষ দেয়। সেই উদীয়মান সূর্য্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে কে?

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙালী।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বাঙালীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাঁহাদের নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের আলোচনা স্থান ও সময় পাইলে করিব। এখন কেবল বুঝিতে চাই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীর প্রতিভার ও মনস্বিতার যথেষ্ট কার্য্যক্ষেত্র আছে কি না, কিম্বা, অন্য দিক্ দিয়া বলিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ যে নূতন সত্যের আবিষ্কার, অনুশীলন ও প্রচার, তাহা প্রধানতঃ বাঙালী দ্বারা হইতেছে কি না, এবং তাহা করিবার মত শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীকে দিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন কি না। অর্থাৎ ইহার প্রধান প্রধান গবেষক ও অধ্যাপকের কাজ বাঙালীরা করিতেছেন কি না, করিবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছেন কি না, বিবেচিত না হইলেও তাঁহাদের যোগ্যতা আছে কি না, ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান অধ্যাপকের পদগুলির কথা লিখিতেছি ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয়পত্রিকা হইতে লিখিতেছি। ১৯২০র ঐ বহি কিছু দিন আগে বাজারে পাই নাই; এখন বাহির হইয়াছে কি না জানি না।

অর্থবিজ্ঞানের মিণ্টো অধ্যাপকের পদে এ পর্য্যন্ত তিন জন নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে একজন পঞ্জাবী ও একজন ইংরেজ। বর্ত্তমান অধ্যাপক বাঙ্গালী।

দর্শন শাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ্জ অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন। তিনি মৈসূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার জায়গায় এস্ রাধাকৃষ্ণন্ নামক একজন মান্দ্রাজী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদের প্রার্থী ছিলেন ছয়জন, তন্মধ্যে পাঁচজন বাঙ্গালী। ইহাঁদের কেহ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিম্বা তাঁহার সমকক্ষ কি না বলিতে পারি না; কারণ আমরা দর্শনে পণ্ডিত নই, এবং এই ছয়জনের দার্শনিক কৃতিত্বের সহিত পরিচিত নহি। কিন্তু একটা কথা সুনিশ্চিত, যে, হয় (১) বাঙ্গালী যোগ্যতম ছিলেন না, কিম্বা (২) যোগ্যতম থাকিলেও নির্ব্বাচিত হন নাই।

উচ্চতর গণিতের হার্ডিং অধ্যাপকের পদে এ পর্য্যন্ত যে দুজন নিযুক্ত হইয়াছেন, উভয়েই ইংরেজ। যোগ্য বাঙ্গালী নাই, কিম্বা থাকিলেও যোগ্য বিবেচিত হন নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার কারমাইকেল অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত দুজন নিযুক্ত হইয়াছেন, এক জন, ডাঃ টিব, জার্মেন, অন্য ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয়, শ্রীযুক্ত দিবাকর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। এই কাজের জন্যও হয় (১) যোগ্য বাঙালী কেহ নাই, কিম্বা (২) থাকিলেও নির্ব্বাচিত হন নাই।

রসায়নের পালিত অধ্যাপকের পদে প্রথম হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিযুক্ত আছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকের পদে প্রথম হইতে অধ্যাপক সী, ভী, রামন্ নিযুক্ত আছেন। এ স্থলেও দেখিতেছি, (১) যোগ্য বাঙ্গালী পাওয়া যায় নাই, কিম্বা (২) থাকিলেও নিযুক্ত হন নাই।

ফলিত গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকচতুষ্টয়ের পদে এ পর্য্যন্ত পাঁচজন নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনজন বাঙালী ও দুইজন অবাঙালী। এখানেও সব কাজের জন্য (১) যোগ্য বাঙ্গালী জুটে নাই, কিম্বা (২) যোগ্যতা সত্ত্বেও বাঙ্গালীকে নিয়োগ করা হয় নাই।

শুনিয়াছি, কৃষি না উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান কি একটার অধ্যাপক আছেন ব্রুল সাহেব।

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে এ পর্য্যন্ত দুজন লোক নিযুক্ত হইয়াছেন; প্রথম জার্মেন, দ্বিতীয় পার্শী। (১) যোগ্য বাঙ্গালী নাই কিম্বা (২) নির্ব্বাচিত হন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে এ পর্য্যন্ত যে দুজন নিযুক্ত হইয়াছেন, উভয়েই ইংরেজ। আমাদের মন্তব্য পূর্ব্ববৎ।

আর এক শ্রেণীর অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের নাম রীডার। এ পর্য্যন্ত ৩১ জন রীডার নিযুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালী চারি জন।

বাকী যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েটদিগকে জ্ঞান দান করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষক বলা হয়। ইহাঁদের অধিকাংশ বাঙ্গালী। কিন্তু উচ্চতম ও অধিকতম মাহিনার কাজগুলিতে বাঙ্গালী কি পরিমাণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যে, হয় সকল বা অধিকাংশ উচ্চতম বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চতম জ্ঞান দানের দিক্ দিয়া বাঙ্গালীরা এখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাঁহাদের নিজের করিবার যোগ্য হন নাই, কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের এরূপ যোগ্যতা আছে তাঁহারাও কোন না কোন কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিবার অবসর পান নাই। সম্ভবতঃ উভয় কারণই বিদ্যমান আছে। নিকটস্থ যোগ্যতম লোকদেরও একটা অসুবিধা বরাবরই আছে। তাঁহাদের যোগ্যতা অযোগ্যতা ছাড়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা কথা কর্ত্তৃপক্ষের কানে যায়, তাহাতে, এবং খোসামোদ করা বা না-করা জন্য, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্দ বা ভাল ধারণা জন্মে। এই হেতু সময়বিশেষে অযোগ্য বা কমযোগ্যও কার্য্যক্ষেত্র পায়, যোগ্যও পায় না।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের, গ্রাম্য চৌকিদার হইতে বড় লাট পর্য্যন্ত, ছোট বড় সব ভৃত্য ধরিলে, ভারতবাসীরাই অধিকাংশ কাজ করে; কিন্তু বড় কাজগুলি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করা যায় কি না, সুধীভির্বিভাব্যম্। কলিকাতা

১৫।১৬ হাজার টাকা ছিল, হাতে ৫।৬ লাখ টাকার মোকদ্দমা ছিল, এবং বায়না লওয়া ছিল প্রায় দেড় লাখ টাকা; বায়না তিনি ফেরত দিয়াছেন, এবং ওকালতী ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার কিছু পুঁজীও আছে বটে। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও বৃদ্ধ অথবা সম্পত্তিশালী নেতৃত্বকামী কোনও বাঙালী আইনের ব্যবসা ছাড়িয়া নেতা হইতে চান নাই। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামক দৈনিক ইংরেজী কাগজের জন্য পণ্ডিত মোতীলালকে খুব বেশী লোক্সান দিতে হইয়াছে। সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টার প্রধান মুসলমান নেতারা কেহ বাঙ্গালী নহেন। ঐ প্রচেষ্টার বিরোধীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অন্য কোন বাঙ্গালী চিন্তাশক্তি, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয়ের জ্ঞান, বা কর্ম্মোৎসাহ ও কর্ম্মশক্তিতে শ্রেষ্ঠ নহেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর, দীনশাহ্ এদুলজী ওয়াচা, শিবস্বামী আয়ার, প্রভৃতির সমকক্ষ বাঙালী রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্রে কে আছেন? অধুনা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার যোগ্যতম সভ্যের নাম করিতে গিয়া কেহ কোন বাঙ্গালীর নাম করে নাই। একেবারে গান্ধীর দলের নহেন, কিন্তু ঠিক্ "নরমপন্থীও" নহেন, এরূপ নেতাদের মধ্যেও যোগ্যতম লোকের নাম করিতে হইলে লোকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপৎ রায়, প্রভৃতির নাম করে, কোন বাঙালীর নাম করে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বহু বৎসর হইতে ওকালতী ছাড়িয়া দেশসেবকের কাজ করিতেছেন, লালা লাজপৎ রায়ও তাই। বঙ্গে এরূপ লোক কেহ নাই।

রাজনৈতিক ও সামাজিক হিতসাধনের জন্য শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতসেবক সমিতি স্থাপন করেন। উহার শাখা ভারতের বহু প্রদেশে হইয়াছে, এবং তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট বহু যোগ্য লোক যোগ দিয়াছেন। বঙ্গে উহার কোন শাখা স্থাপিত হয় নাই, এবং উহার তুল্য কোন প্রতিষ্ঠানও খোলা হয় নাই। সম্প্রতি লোক-মান্য টিলকের নামে যে বিদ্যালয়টি রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য খোলা হইয়াছে, তাহা বঙ্গে বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হইয়াছে লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের দ্বারা। সমগ্র ভারতের মুসলমান রাজনৈতিক নেতা আগেও ছিলেন অ-বাঙালী, এখনও অ-বাঙালী।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাংলা দেশ অগ্রসর, কিন্তু নারীর শিক্ষায় নহে। গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্কশূন্য শিক্ষায় এবং সকল প্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে। আমাদের জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ এবং তাহার কলেজ আছে বটে; কিন্তু ঐ কলেজে প্রধানতঃ রোজ্‌গারের উপায় শিখান হয়। হরিদ্বারের গুরুকুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য শুধু রোজ্‌গার নহে; তথায় উহার সংস্থাপক ও পরি-চালকদের মনের মত মানুষ গড়িবার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানুষ গড়িবার চেষ্টায় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহারও শেষ দুটি শ্রেণীতে তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, নতুবা ছাত্র মিলিবার সম্ভাবনা নাই বা অল্পই আছে। হরিদ্বারের গুরুকুলে সরকারী কোন প্রকার পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রস্তুত করা হয় না, তথাপি তথায় সর্ব্বদাই কয়েক শত ছাত্র পড়ে; কিন্তু বঙ্গে বাঙালী ছাত্র ঐরূপ কোন বিদ্যা-লয়ে জুটিবার সম্ভাবনা না থাকায় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন নাই। এখন আবার "জাতীয় শিক্ষা"র জন্য আন্দোলন চলিতেছে। ফল কিরূপ দাঁড়ায় দেখিতে হইবে।

বাংলাদেশে পুনার দাক্ষিণাত্য শিক্ষণ-সমিতির মত দারিদ্র্যব্রতী কোন শিক্ষক-সমিতি নাই, এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত ফার্গসন কলেজের মত কোন কলেজ নাই। এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা এবং লাহোরের দয়ানন্দ এংলো-বৈদিক কলেজের মত দানপ্রাপ্ত বহু লক্ষ টাকা মূলধনবিশিষ্ট কোন কলেজও বঙ্গে নাই। সমুদয় ভারতবর্ষে যত মুসলমান আছেন, তাহার শতকরা ৪০ জনের উপর বঙ্গের অধিবাসী, ২০ জনের উপর পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী, ১০ জনের উপর আগ্রা-অযো-ধ্যার অধিবাসী, ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমানদের প্রধান বিদ্যাপীঠ বঙ্গের বাহিরে আলিগড়ে অবাঙালী মুসলমানের

দ্বারা স্থাপিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। উহা সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এখন মুসলমানি যে "জাতীয়" বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল, তাহাও আলিগড়ে এবং অবাঙালী দ্বারা। মিসেস্ এনি বেসাণ্টের দ্বারা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গের বাহিরে। তাহার সহিত সংসৃষ্ট প্রধান দেশী লোকেরা বাঙালী নহেন। সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য অভিপ্রেত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার প্রধান উদ্যোগী পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বাঙালী নহেন, অন্যতম প্রধান কর্ম্মী পণ্ডিত সুন্দরলালও বাঙালী ছিলেন না।

সমুদয় ভারতবর্ষে একটি সাধারণ ভাষা ও একবিধ লিপি প্রচলিত করিবার চেষ্টা কাহার মস্তিষ্ক হইতে প্রথম বাহির হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু হিন্দীকেই ঐ ভাষা ও নাগরীকে ঐ লিপি করিবার চেষ্টার প্রাদুর্ভাব বেশী। ঐ চেষ্টার প্রধান উদ্যোগী কিছুদিন পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র ছিলেন। এখন কে প্রধানতঃ ঐ চেষ্টা করিতেছেন, জানি না, কিন্তু তিনি বাঙালী নহেন। গান্ধীমহাশয় একজন প্রধান উদ্যোগী বটেন।

সামাজিক সংস্কারের আরম্ভ নানাদিক্ দিয়া বঙ্গেই সর্ব্ব প্রথমে হয়। কিন্তু উহার চেষ্টা বহুকাল হইতে বাঙালীর হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা বাংলা অপেক্ষা অন্য সব প্রদেশে বেশী হইতেছে। কেশবচন্দ্র সেনের পর বাল্যবিবাহ নিবারণ চেষ্টা প্রধানতঃ বঙ্গেতর কোন কোন প্রদেশেই হইয়াছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহ আরব্ধ হয় বঙ্গে, কিন্তু এখন চলিতেছে বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে। সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টার নেতা ছিলেন স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, এখন নেতা হইয়াছেন নারায়ণ-গণেশ চন্দাবরকার।

কলকারখানা ও শিল্পবিষয়ক কন্‌ফারেন্সের আফিস্ ও কর্ম্মী বঙ্গের বাহিরে ও অবাঙালী। বাণিজ্যবিষয়ক কংগ্রেসেরও তাই।

ছাত্রদের কন্‌ফারেন্স্ কয়েক বৎসর ধরিয়া বিহার, আসাম, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি প্রদেশে হইতেছে, কিন্তু বঙ্গে হয় নাই। সুতরাং যখন সমুদয় ভারতবর্ষের ছাত্রদের কন্‌ফারেন্সের কথা উঠিল, তখন প্রস্তাবটি স্বভাবতঃ বঙ্গের বাহিরেই উঠিল, এবং তাহার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছেন একজন মহারাষ্ট্রীয়।

ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির নেতৃত্ব কাহার হাতে তাহাও বিবেচনার বিষয়। সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজের একজন কোন বড় নেতা নাই। প্রধান প্রধান নেতা যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কেহ বাঙালী নহেন। সমুদয় ভারতের মুসলমানদেরও একজন ধর্ম্মবিষয়ক নেতা নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও রাজনীতি এখন পরস্পরের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম ও রাজনীতির প্রধান নেতারা বাঙ্গালী নহেন, অথচ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা যত, অন্য কোন প্রদেশে তত নহে। দেশীয় খৃষ্টিয়ানদের নেতা বাঙালী কি না, জানি না; বোধ হয় নয়। একমাত্র বাংলা দেশেই ভারতীয় বৌদ্ধ বেশী আছেন, কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধদের নেতৃস্থানীয় কোন বাঙালী বৌদ্ধের নাম আমরা অবগত নহি। বাঙালী জৈন কেহ আছেন কি না, জানি না; তাঁহাদের নেতা বাঙালীর হইবার কথা নয়। বাঙালী শিখ্ ২।১ জন আছেন বা ছিলেন; শিখদের নেতাও বাঙ্গালীর হইবার কথা নহে। আর্য্যসমাজের কোন দলের নেতা বাঙ্গালী নহেন। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত কিম্বা তাঁহাদের স্থান কতকটা পূরণ করিবার মত লোক নাই। তবে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ প্রধান কর্ম্মী এখনও বাঙালী আছেন বটে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিলাম না, কারণ তিনি নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের বা উহার কোন শাখার প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্ম্মীরা এখনও বাঙ্গালী। কিন্তু এখন এই মিশন প্রধানতঃ অনশনক্লিষ্ট ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি এখন পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ বা ভগিনী নিবেদিতার মত ভারতের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, বা রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও জীবনকে পুষ্ট করিতেছেন না। আমরা জানি, "প্রবুদ্ধ ভারত" ও "উদ্বোধন" এইরূপ কার্য্য কিছু করেন, এবং ভালই করেন।

৭। ভদ্রলোকের পরিধানের উপযুক্ত যেই কাপড় তৈয়ারী হয় তাহা বাজারের কাপড়ের সমকক্ষ হইলেও প্রতিজোড়ায় দাম দুই তিন আনা বেশী পড়িবে। মোটামুটি বর্ত্তমান সময় পাঁচটাকা জোড়ার কম পরিধানযোগ্য কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না। কলওয়ালার লাভের অংশও ইহারই মধ্যে থাকিয়া যায়।

৮। সুতার কল আমাদের অঞ্চলে নাই। সাধারণতঃ ঢাকা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতির সুতা ব্যবসায়ীগণ চালান করিয়া থাকে। ঐ সুতা অধিকাংশই বিলাতী।

৯। সুতার কল, তুলার চাষ ও চরকার দাম সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

১০। দেশী সুতার কারখানা প্রতিষ্ঠাপিত হইলে এই সমস্ত তাঁতের সাহায্যে আমাদের বহু অভাব দূরীভূত হইতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষে এই প্রকার প্রচেষ্টা চলিলে বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। বিগত বর্ষে ভদ্র গৃহস্থের মেয়েদের পরিধানোপযোগী লাল-সুতার নির্ম্মিত যে-সমস্ত দশহাতী শাড়ী হইয়াছিল তাহা বস্তুতই উল্লেখ-যোগ্য। সুতার মহার্ঘতায় কলওয়ালাগণ বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কবি দেবেন্দ্র

শ্যামার শিশে সুরের স্তবক হেন
প্রাণ ছিল যার গানের উছাস-ভরা,
কণ্ঠ তাহার হঠাৎ নীরব কেন
শিউলি-বীথির শেষ বুঝি ফুল ঝরা।
বাজ্‌ল কখন বিসর্জ্জনের বাঁশী,
আঁধার এল মুগ্ধ আঁখির 'পরে ;
গোলাপ যখন ফুটছে রাশি রাশি
গোলাপ-ফুলের ভক্ত গেল ম'রে !—
মিলিয়ে গেল মরণ-হারা গানে ;
ঝর্ণা হ'ল হঠাৎ গতিহারা ;
যম-নিয়মের তপ্ত মরুস্থানে
হারিয়ে গেল সরস্বতীর ধারা।
প্রাণের ভাঁড়ার উঠ্‌ছে রিক্ত হ'য়ে,
সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে আঁখির পাতা,
একে একে বৈতরণীর তোয়ে
ডুব্‌ছে মাণিক ; হচ্ছে নীরব গাথা।
দরাজ প্রাণের সেই হাসি আজ খুঁজি,
গান গাওয়া সেই তেম্‌নি দরাজ সুরে ;
"দরদী নেই তেমন দরের বুঝি"
—শোকের হাওয়ায় রক্ত-অশোক ঝুরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চশস্য

দশ হাজার বছরের আধুনিক পোষাক—

ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে history repeats itself অর্থাৎ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ কথা খুব খাঁটি। আজকাল য়ুরোপে মেয়েদের হাফ-হাতা জামা আর চোঙা-ঘের ঘাঘ্‌রা পরার খুব চলন দেখা যায়। এমন পোষাক য়ুরোপের নূতন প্রবর্ত্তন নয়। দশ হাজার বছরের পুরানো মিশ[illegible] একটি রমণী-মূর্ত্তি ফ্রান্সের লুভর্‌ জিয়ামে আছে; তার পোষাক [illegible] হাজার বছরের পুরাতন নিশ্চয়ই, অথচ তার ধরণটা নিতান্তই আধুনিক! আশ্চর্য্য বটে।

দশ হাজার বছরের আধুনিক পোষাক।

উড়ো বাইসাইকেল—

আমেরিকার আকাশচারী সমিতি (Aerial League) উড়ো বাই-সাইকেল রচনার জন্য ২৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। যুদ্ধের আগেও ফ্রান্সে এর জন্য ১০০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তার ফলে নানান জনে নানান রকমের উড়ো বাই-সাইকেল গঠন করিয়া প্রতিযোগিতা করে। প্রতিযোগিতায় পিছন দিকে ভর করিয়া সম্মুখ উঁচাইয়া উড়িবার চেষ্টায় কত প্রতিদ্বন্দ্বী যে ডিগ্‌বাজি খাইল তার ইয়ত্তা নাই। ১৯১২ সালে লাভেলাদোয়া নামে একজন মাটি থেকে ৮ ইঞ্চি উঁচুতে উঠিয়া শূন্যে শূন্যে ৪০ ইঞ্চি পথ বাইসাইকেল

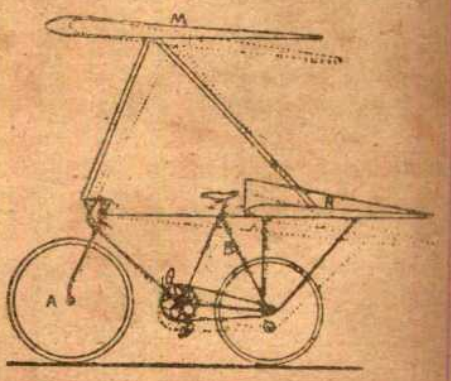

উড়ো বাইসাইকেল।

চালাইয়া যাইতে পারেন। ১৯১৪ সালে পুল্‌ঁা নামে একজন ৪ ফুট উঁচু দিয়া ৪০ ফুট বাইসাইকেলে উড়িয়া যাইতে পারেন। এই চেষ্টা এখন আরো চলিতেছে। অল্পদিন পরেই হয়ত দেখা যাইবে পাখীদের

বিলাতে হাতের তাঁত।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাঁকও শারীর শক্তি ব্যয় করিয়াই আকাশ ছাইয়া উড়িয়া ফিরিতেছে।

—

বিলাতে হাতের তাঁত—

যুদ্ধের জন্য বিলাতী বহু কারখানাই বিশৃঙ্খল হইয়া গেছে। এর ফলে কেবল যে আমাদের পর-নির্ভর দেশেই জিনিস দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ হইয়াছে তা নয়, সেদেশের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। এর জন্য গৃহশিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা যেমন এদেশে তেমনি সেদেশেও চলিতেছে। কারখানা-শিল্পের চেয়ে গৃহশিল্পের সুবিধা এই যে কারিগরেরা নিজের নিজের বাড়ীতে স্বয়ংপ্রভু হইয়া মাবাপ ভাইবোন স্বামীস্ত্রী মিলিয়া কাজ করে; এই শ্রমের মধ্যে আপনাদের প্রাণের দরদ থাকে, পরস্পরের মধ্যে মমতার যোগ থাকে, পরের হুকুমের কড়া পীড়নে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হয় না, অচেনা জন-অরণ্যে পারিবারিক প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্ছৃঙ্খল একাকী হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। এইসব সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হলাণ্ড ও ডেন্‌মার্কের লোকেরা কারখানার চেয়ে গৃহশিল্পকেই বেশী আদর করিয়া ঘরে ঘরে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বহুকাল হইতেই করিয়া আসিয়াছে। মানুষের হাতের কাজে একটা প্রাণের সম্পর্ক থাকে; কারিগর শিল্প প্রস্তুত করিয়া সৃষ্টির আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করে; কিন্তু কারখানায় মজুর যেন কলের নিকৃষ্ট অঙ্গ হইয়া থাকে। হাতের কাজ করিলে মন ও দেহ দুই সুস্থ থাকে; তাই আজকাল স্নায়বিক দুর্ব্বলতা রোগে রোগীদের হাতে তৈরী শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিয়া চিকিৎসা করা হয়। পারসীকরা তাদের গালিচায় উপাসনা ও প্রার্থনার মন্ত্র বুনিয়া তুলে; সুইডেনের বাসিন্দারা কম্বলে দেশের রূপকথা বোনে; আমেরিকার আদিম বাসিন্দারা কাপড়ে প্রকৃতির শক্তিলীলার ছবি বুনিত; এবং এমনি করিয়া দেশের ও জাতির মনের ছাপ শিল্পে কায়েমী হইয়া থাকিবার অবসর পায়। আমাদের দেশেও শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা কাপড়ের পাড়ে "বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি গান বুনিয়া দেশের ইতিহাসের ভাবধারাকে প্রাণের আবেগে বেগবান করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। এক এক কারিগরের এক এক রকম নক্‌সা তার মনের বিশেষত্বকে আকার দিয়া প্রকাশ করিয়া ধরিবার অবকাশ পায়। হাতের কাজ সুন্দর সস্তা ও টেকসই হয়। এজন্য য়ুরোপ-আমেরিকায় হাতের তাঁতের পুনঃ প্রবর্ত্তনের খুব চেষ্টা চলিতেছে। আমাদেরও এই দিকে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—

মানুষের বিবর্ত্তন—

ডারউইন এবং ওয়ালেস নির্দ্ধারণ করেন যে মানুষ বানরজাতীয় জীবের বিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। শিম্পাঞ্জী গরিল্লা প্রভৃতি বনমানুষ ও মানুষের আকৃতিতে এতখানি বৈষম্য আছে যে বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে আরো কোনো একরকম হব-হব-মানুষ জীব থাকা উচিত বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের আন্দাজ। এই অনাবিষ্কৃত সোপানটিকে বৈজ্ঞানিকেরা missing link অর্থাৎ জীবশৃঙ্খলের হারানো গ্রন্থি বলেন। সম্প্রতি দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলে একরকম বানর দেখা গিয়াছে, যাকে বৈজ্ঞানিকেরা এই missing linkএর একটি গ্রন্থি বলিতেছেন। এই বানর বা বনমানুষের নাম টার্সিয়াস্; এর নাক থ্যাবড়া, চোখ বাটির মতন, গা লোমশ, আঙুল দীর্ঘ; এরা বৃক্ষবাসী। এই বনমানুষ বোর্ণিয়ো (বরুণিকা) জাভা (যব) প্রভৃতি ভারত-সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে দেখা গিয়াছে; সে দেশের লোকেরা এ'কে ভূত বলে; দেখিয়া ভূত দেখার মতন ভয় পায়। ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইলিয়ট স্মীথ্ বলেন যে বনমানুষ হইতে মানুষ হইবার ঠিক আগের ধাপ এই টার্সিয়াস। এই মত বিদ্বজ্জনসমাজ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

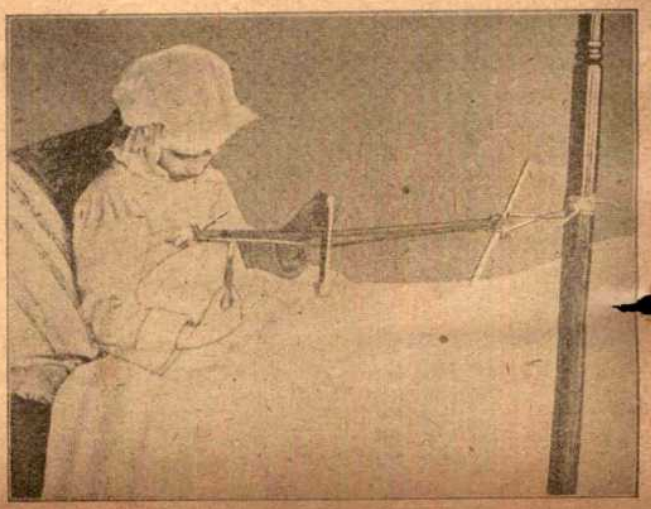

বিলাতে হাতের তাঁত।

মানুষ বিবর্ত্তনের আগের ধাপের বনমানুষ।

পৃথিবীর আদি যুগে যখন সরীসৃপ ধরণীর পৃষ্ঠে একাধিপত্য করিতেছিল তখন হইতে জীববিবর্ত্তনের আরম্ভ ও তার বর্ত্তমান শেষ উদ্ভব মানুষ; মানুষের আবির্ভাবের ঠিক আগে ছিল এই টার্সিয়াস, এবং পরে আবার কোন্ রকম জীব উদ্ভূত হইবে কে জানে। এই বনমানুষের নাক এত থ্যাব্‌ড়া যে নাই বলিলেই হয়; এইজন্য তারা দুচোখে একসঙ্গে দেখিতে পায়—এটিই সকল জীবের মধ্যে মানুষের বিশেষত্ব। টার্সিয়াসের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণতর হওয়াতে তার স্পর্শজ্ঞান প্রবল হইয়াছে, হাত পা কর্ম্মপটু ও ইচ্ছাধীন হইয়াছে। মানুষের মস্তিষ্কের সম্পূর্ণতা হওয়াতেই সে জীবরাজ্যের প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; অন্যান্য প্রাণী মানুষের চেয়ে বলবান হইয়াও মানুষের বুদ্ধিশক্তির কাছে হার মানিয়াছে। মানুষের এই বুদ্ধিবিকাশের মূলে আছে তার দৃষ্টিশক্তি; দুচোখো দৃষ্টিপথ অবাধ হয় নাকের বাধা অপসারিত হইলে। মানুষ ছাড়া অপরাপর জীবের নাক ঠোঁট মুখ এমন বড় ও সুচালো হয় যে দুই চোখের দৃষ্টি এক বিন্দুতে গিয়া সম্মিলিত হইতে পারে না—বরাবর সমান্তরালে চলিয়া যায়। তাতে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হয় না; ইতর জীবেরা বস্তুর দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ বোধ করিতে পারে না বলিয়া তাদের চোখে সব বস্তুই চেপ্টা দেখায়। ঘোড়া কুকুর গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুর মুখ লম্বাটে বলিয়া তাদের দুই চোখের দৃষ্টির মাঝখানে আড়াল পড়ে, এবং কোনো বস্তুর উপর একচোখো দৃষ্টি পড়াতে সে বস্তুর আকার সম্বন্ধে তাদের সম্পূর্ণ ধারণা হয় না; তারা কোনো বস্তুকে ভালো করিয়া দেখিতে চাহিলে একবার মুখ ফিরাইয়া এ-চোখ দিয়া দেখে, আবার মুখ ঘুরাইয়া ও-চোখ দিয়া দেখে, এবং দুবার দুচোখে দেখিয়া যে বোধ জন্মে তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যাদের বস্তুজ্ঞান অল্প তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও অনুন্নত। বানর গাছ-চড়া

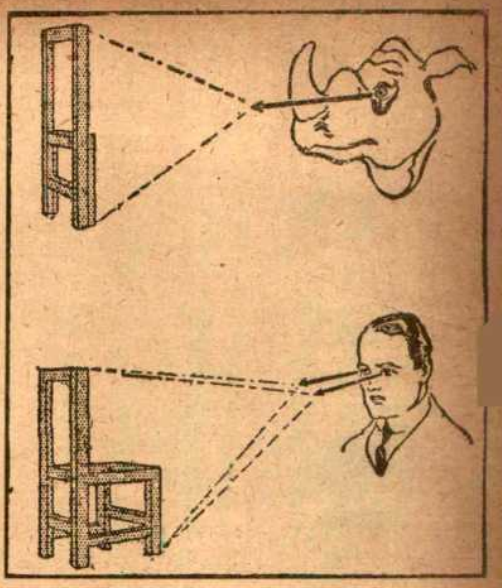

গণ্ডারের একচোখো দৃষ্টিতে একখানা চেয়ার চেপ্টা দেখায়। কিন্তু মানুষের দুচোখো দৃষ্টিতে চেয়ারখানার সর্ব্বাবয়ব সুস্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে।

অভ্যাস করাতে তাকে বস্তুজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইয়াছে, এবং তার ফলে তার নাক থ্যাব্‌ড়া হইয়া পড়িয়াছে। এই বানরের মধ্যেও আবার নানা জাত ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া না-বানর না-মানুষ হইতে হইতে মানুষে পরিণত হইয়াছে, তখন সেই আদিম মানুষ গাছ ছাড়িয়া মাটিতে হাঁটিতে অভ্যাস করে; ও তার ফলে তার পা মাটিতে চলার উপযুক্ত, হাত গাছের ডাল ধরা ছাড়িয়া কাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে; এবং গাছে যে মস্তিষ্ক উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আরও উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।　　কয়ালী।

—

টাকের উপর বিজ্ঞাপন—

আজকালকার সভ্যতার যেমন নানা দিক দিয়া উন্নতি হইতেছে, তেমনি বিজ্ঞাপন দিবারও নানা রকম রীতির প্রচলন হইতেছে। রাস্তার ধারে দেয়ালে, আলোর থামে বিজ্ঞাপন দেওয়া অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এখন আবার রাস্তার ধারে লোকের বাড়ীর ছাদের কার্ণিশের নীচে ফাঁকা জায়গাটুকুও বিজ্ঞাপনে ভর্ত্তি হইতেছে। বড় বড় মোটা কাগজে বিজ্ঞাপন লিখিয়া ভাড়া-করা লোকের বুকে ও পিঠে ঝুলাইয়া দিয়া তাকে শহরময় ঘুরানোর প্রথাও আজকাল বিরল নয়। ইহাতে বিজ্ঞাপন জীবন্ত হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য বিজ্ঞাপন দিবার পদ্ধতি সম্প্রতি ফ্রান্সের পারী শহরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকের অঙ্গের ফাঁকটুকুও এইবার বিজ্ঞাপনে পূর্ণ হইল।

পারী শহরে একটি হোটেলওয়ালা একজন টাকওলা লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া তার টাকের উপর বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—"আসুন, আসুন, আজ বিকেলে আমাদের হোটেলে আসুন।" লোকটি মাথাটি রাস্তার দিকে ফিরাইয়া বসিয়া থাকিত। অবশ্য বিজ্ঞাপনের জন্য বৃদ্ধ যথেষ্ট টাকা পাইত।

টাকের উপর বিজ্ঞাপন।

আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনের এরূপ ব্যবস্থা চলিলে মন্দ কি? অকেজো বুড়োদের বিশ্রামও হয়, সঙ্গে সঙ্গে পয়সা উপার্জ্জনও হয়। অকেজো টাক টাকা আনিলে বুড়োদের লাভ যথেষ্ট। এ ত বিনা পরিশ্রমে পয়সা উপার্জ্জন!

—

পেঁট্‌রার ভিতর ঘরকন্না—

'খাটের তলায় ঘরকন্না'র খবর আমরা আগে দিয়াছি। আজ আমরা 'পেঁট্‌রার ভিতর ঘরকন্না'র খবর দিব। মানুষের থাকা, খাওয়া ও শোওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস অনেক লাগে। একটি পেঁট্‌রার ভিতর এই-সমস্ত জিনিস এক জায়গায় পাইলে কম সুবিধা ও আনন্দের কথা নয়, বিশেষতঃ এই দুর্ম্মূল্যের দিনে অল্প বেতনে যারা বাধ্য হইয়া শহরে বাস করে তাদের পক্ষে।

সম্প্রতি একটি নবীন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এমন সব ঘরকন্নার আস্‌বাব সৃষ্টি করিয়াছেন যেগুলি অনায়াসে একটি পেঁট্‌রার ভিতর পুরিয়া লইয়া যেখানে-সেখানে যাওয়া-আসা করা যায়। এই ফরাসী বৈজ্ঞানিকের নাম—এম লুভে। তাঁর আবিষ্কৃত জিনিষগুলি মুড়িয়া এক জায়গায় করিলে সেগুলি পরিমাপে হয়—৪৯ × ৫৪ × ৩৩ ইঞ্চি। অর্থাৎ একটি বড় পেঁট্‌রার ভিতর পুরিয়া বাড়ীর দরজা দিয়া তাহা সহজেই গলাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। ইহাতে পাঁচ প্রকারের আস্‌বাব-পত্র থাকে। সেগুলি ছড়াইয়া পাতিলে ঘরের মেঝের ৭৮ × ১০৩ ইঞ্চি জায়গা দখল করে।

এখন এই আস্‌বাবপত্রগুলি কি কি দেখা যাক্। লুভের ঘরকন্নায় এই-এই জিনিস থাকে—

(১) দুইটি লোকের শুইবার মত একটি বিছানা।
(২) বিছানার তলায় দিবার মত স্প্রিং, তার মাদুর, চাদর ও অন্যান্য জিনিস।
(৩) শিশুর খাট ও তার বিছানা।
(৪) একটি টেবিল—৪৯ × ৩০ ইঞ্চি।
(৫) তিনজন লোকের ডিস রাখিয়া খাইবার মত লম্বা একটি টেবিল।
(৬) একটি সেলাইএর কল।
(৭) একটি দুইচাকাওয়ালা টমটমের মত গাড়ী।

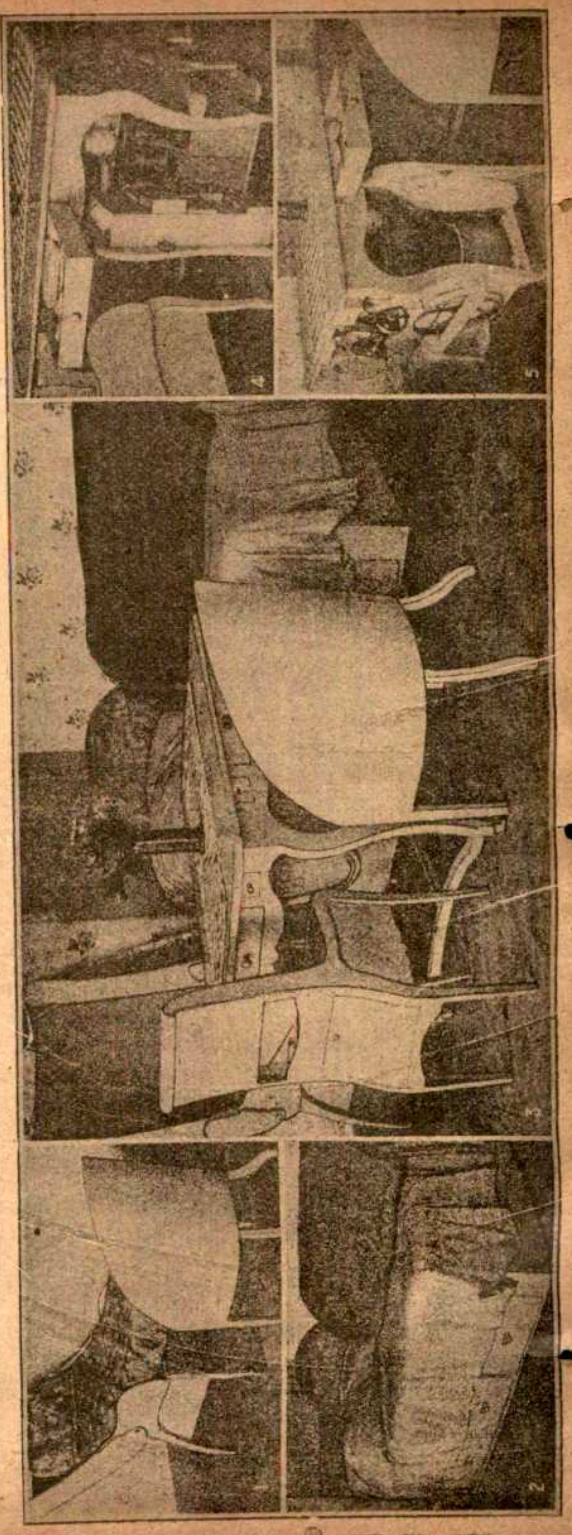

পেঁট্‌রার ভিতর ঘরকন্না।

(৮) দুইটি বড়-বড় চেয়ার।
(৯) একটি শিশুদের চেয়ার।
(১০) একটি বড়দের ও একটি শিশুদের টুল।
(১১) একটি ছেলেদের বেঞ্চ।
(১২) ডেস্ক ও পোষাকের টেবিল হইবার উপযোগী একটি কাঠের জিনিস।
(১৩) কামাইবার জন্য আয়নাযুক্ত একটি টুল।
(১৪) একটি মেয়েদের বড় আয়না।
(১৫) একটি মেয়েদের সেলাইএর টেবিল ও তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।
(১৬) ছুতারের কাজ ও ঘটী-বাটি সারাইবার কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি সমেত একটি বাক্স।
(১৭) একটি ষ্টোভ।
(১৮) জল রাখা ও কাপড় কাচার জন্য একটি বৃহৎ টব।

এবং বাসোপযোগী অন্যান্য অনেক জিনিস, যেমন—ল্যাম্প, ছবি, কাপড়, আল্না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দেখিয়া লোকে অবাক হইবেন যে, এত জিনিস একটি পেট্‌রায় ধরে কি করিয়া! কিন্তু মুড়িয়া-ভাঙিয়া রাখার কৌশলে ইহা সম্ভব হইয়াছে।

—

শানানো দাঁত—

আফ্রিকার ওয়াকাম্বা জাতির লোকেরা দাঁত সম্বন্ধে ভারী যত্নশীল। তারা উকো দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তাদের দাঁতের ডগ কুকুরের দাঁতের মত ধারাল করে। এই কাজের জন্য তাদের মধ্যে কারিকর আছে। কারিকররা রুগ্ন লোকদের দাঁত ঘসিয়া ঘসিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়, যাহাতে তারা কাঁচা মাংস সহজে ছিঁড়িয়া খাইতে পারে।

দাঁতে-শান।

আফ্রিকার অসভ্য জাতিদের মধ্যে এই ওয়াকাম্বা জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য। ইহারা মাত্র কয়েকটি গরুর বদলে নিজেদের স্ত্রীদের বেচিয়া ফেলে। ইহারা সকলেই কাঁচা মাংস খায় এবং জিনিষপত্র অল্পই বাঁধিয়া থাকে।

শানানো দাঁত।

দাঁত ধারাল করিয়া সেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিলে যে মানুষকে বিশ্রী দেখায় ওয়াকাম্বা জাতির সেদিকে দৃষ্টি নাই। ছবিতে দেখুন একজন কারিকরের কোলে শুইয়া একজন দাঁতে শান দেওয়াইয়া ধারাল করিয়া লইতেছে।

—গুপ্ত।

—

বিলাতী পানার সদ্ব্যবহার—

কয়েক বৎসর হইল বিলাতী পানা বা জার্ম্মান পানা বা কচুরী (Water hyacinth, Eichornea speciosa) নামক আমেরিকার এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ আব্রহ্ম-ভারতবর্ষের নানা অংশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রহ্মের ইরাবতী (Irawadi) নদীতে ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে জাহাজাদির চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পদ্মানদীতেও এই উদ্ভিদ চাপে চাপে ভাসিয়া আসিতে দেখা যায়। কলিকাতার আশেপাশে খানা ডোবা ও পুকুরেও ইহার অভাব নাই। এই অকেজো উদ্ভিদের বিনাশ সাধনের জন্য নানা চেষ্টা চলিতেছে। আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধের জল সেচন দ্বারা ইহা নির্ম্মূল করা যায় বটে, কিন্তু ব্যাপার ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং যদি কোন ভাল কাজে লাগান যায় তবে এ কাজ সহজেই সমাধা হওয়ার সম্ভাবনা। ঢাকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রের (Agricultural Farm) কর্ত্তৃপক্ষগণ পরীক্ষার ফলে স্থির করেন যে ইহার ছাইয়ে যে পরিমাণ উদ্ভিদসার-উপযোগী পটাস (Potash) আছে তাহাতে উহার ছাই ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য সাররূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইহেতু কলিকাতার শ ওয়ালেস এণ্ড কোম্পানী (Shaw Wallace & Co.) ইহার ছাই (শুনিয়াছিলাম মন প্রতি দশ টাকা দরে) বহুল পরিমাণে খরিদ করিতে প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ উদ্ভিদ যে টাট্‌কা অবস্থায়ও মানুষের কাজে লাগিতে পারে তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন স্থানের লোকে ইহার কচি অংশ শাকরূপে আহার করিয়া দেখিয়াছে যে আস্বাদ মন্দ নয়, অথচ ব্যবহারে কোন অনিষ্টও হয় না। এ দেশে ত্রিপুরাই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক কি না জানি না। সেদিন আমেরিকার একখানি পত্রিকায় (California Monthly Bulletin, vol. X. no. 3) দেখিলাম

ফ্লোরিডা (Florida) অঞ্চলের লোকেরা ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং ঐ অঞ্চলের গরুমহিষাদি আগ্রহের সহিত ইহা খায়। আজকাল মাঝে মাঝে যেরূপ প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় এবং পশুখাদ্য ঘাসের যেরূপ অভাব—এরূপ ক্ষেত্রে দ্রুতবর্দ্ধনশীল এই উদ্ভিদকে এ দেশেও বহুল পরিমাণে খাদ্যের কাজে লাগাইতে পারিলে মন্দ হয় না।

'পিয়েমডি।'

—

রেডিয়ামের শক্তি—

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে এক পাউণ্ড রেডিয়ামে এত শক্তি নিহিত আছে যে ১৫ লক্ষ টন কয়লার কার্য্য করিতে পারে। ইহা একখানি ১৫ হাজার টনের যুদ্ধজাহাজ ঘণ্টায় ১৫ মাইল হিসাবে বৎসর ধরিয়া চালান যাইতে পারে অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ মাইল চালান যায়। দুঃখের বিষয় ১ পাউণ্ড রেডিয়ামের মূল্য প্রায় ২ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ কোটী টাকা।

—

পাথরের কাদা—

ইংলণ্ডে পিটারবরোর সন্নিকটে অণ্ডন নামে একটি ছোট গির্জ্জা আছে। ইহার ভিতরে একটি সমাধিশিলা আছে। উহা কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেলে প্রস্তুত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৃষ্টি হইবার উপক্রম হইলে ঐ সমাধিশিলা হইতে কাদা পড়িতে থাকে। তত্রস্থ লোকে ঐ শিলাকে বায়ুমান যন্ত্র বলিয়া মনে করে।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

—

২,৫০০,০০০ টাকার বই—

এন্‌সাইক্লোপেডিয়া এমন হওয়া চাই, যাতে সাধারণতঃ আমাদের মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় তার সম্পূর্ণ উত্তর থাকে। সম্প্রতি Harmsworth's Universal Encyclopædia বলে একখানা বই বেরুচ্ছে। তাকে তার নামের উপযুক্ত কর্ত্তে খরচ পড়্‌বে প্রায় ২,৫০০,০০০ টাকা। তার মধ্যে যেসব প্রবন্ধ থাক্‌বে, তার পারিশ্রমিক প্রায় ২০০,০০০, টাকা; ছবি আঁকা ও তার ব্লক তৈরি কর্‌তেও প্রায় ২০০,০০০ টাকা; তার ওপরে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা, সাজান ইত্যাদির জন্যে বহুলোকের তিন চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের দাম, ছাপার খরচ, কাগজের দাম ইত্যাদি।

প্রায় ছয় বছর আগে এই Encyclopædiaর সম্পাদক আর-দুতিন জনের সাথে এই বইয়ের খস্‌ড়া তৈরি কর্‌তে আরম্ভ করেন। তারপর এই কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, সহস্র সহস্র টাকা খরচ করে, সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার অনুসন্ধান করে, তাঁদের এই বই তৈরি শেষ হয়েছে।

—

বায়স্কোপে চোখের জল—

বায়স্কোপে শোকের দৃশ্যে মাঝে-মাঝে অভিনেত্রীদের চোখের জলের ছবি দেখা যায়। বায়স্কোপের প্রথম যুগে সে-সব জায়গায় গ্লিসিরিনের সাহায্য নেওয়া হ'ত। কিন্তু এখনকার দর্শক আর গ্লিসরিনের চাক্‌চিক্যে ভুল্‌তে চান্ না; শান্ত মুখে চোখের জলের দাগের ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ে। তাই আজকাল অভিনেত্রীদের মনে সত্যি দুঃখের ভাব এনে তাঁদের চোখ দিয়ে সত্যি চোখের জল বের করে, ছবি নেওয়া হয়। আর সেই জন্যেই সে-সব ছবি জীবন্ত হয়ে উঠে।

এইজন্যে যে-সবের সাহায্য নেওয়া হয়, তার মধ্যে সঙ্গীতের প্রচলনই সবচেয়ে বেশী।

মেরী পিক্‌ফোর্ডের The Little Princess নামক অভিনয়ে নায়িকার পিতার মৃত্যুর দৃশ্যে, the Little Princess রূপে মেরী পিক্‌ফোর্ডকে চোখের জলের সাথে অভিনয় কর্ত্তে হয়েছিল। সে দৃশ্যের অনেকবার রিহার্শেল দেওয়া সত্ত্বেও সেটা স্বাভাবিক হচ্ছিল না। তখন একজন পিয়ানোবাদক "From the land of the sky-blue-water" গানটি বাজাতে লাগ্‌লেন। ছবির এই অশ্রুমাখা অংশের করুণ অভিনয় এই সঙ্গীতই সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলেছিল।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

—

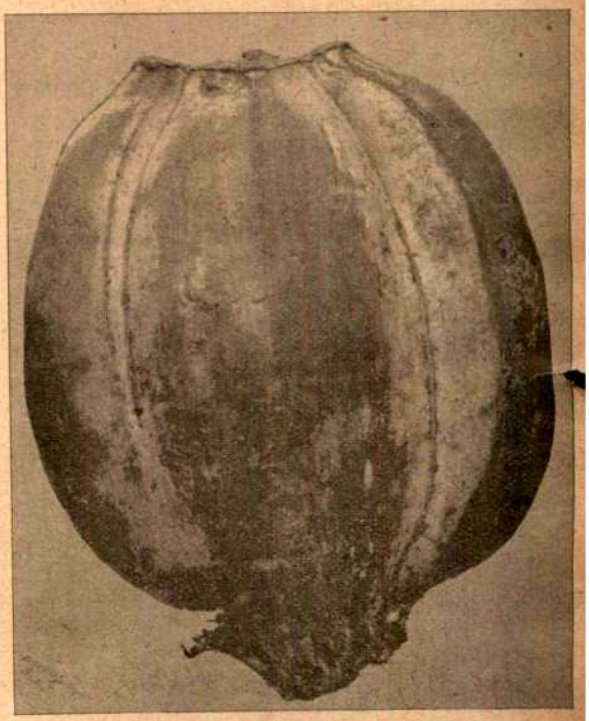

একসঙ্গে চারিটি কলা।

একসঙ্গে চারিটি কলা—

পৌষের প্রবাসীতে একসঙ্গে জোড়া চারিটি কলার ছবি দেওয়া হইয়াছে এবং সেইরূপ জোড়া কলা এদেশে পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এদেশেও যে সেরূপ কলার অভাব নাই তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একসঙ্গে জোড়া চারিটি হয়ত বা ছয়টি কলা পাঠাইলাম।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সিংহ।

—

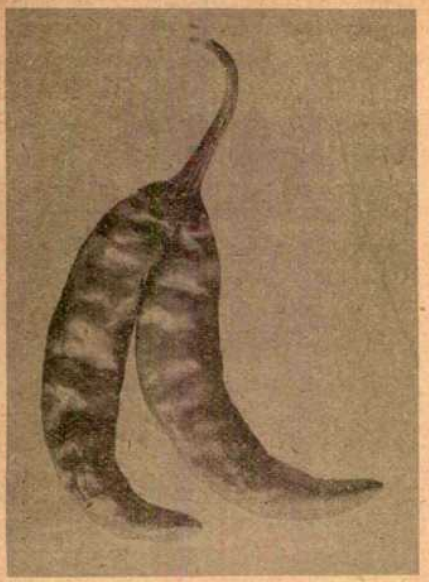

এক বোঁটায় দুই লঙ্কা।
এই দুটি লঙ্কা একটি ফুল হইতে জন্মিয়াছিল।

এক বোঁটায় দুই ফল—

দুজন ভদ্রলোক আমাদের একটি জোড়া লঙ্কা ও একটি জোড়া বেগুন পাঠাইয়াছেন। তাহার ছবি এখানে দেওয়া গেল। লঙ্কা ও বেগুন দুটি এক বোঁটায় এক ফুল হইতে জন্মিয়াছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

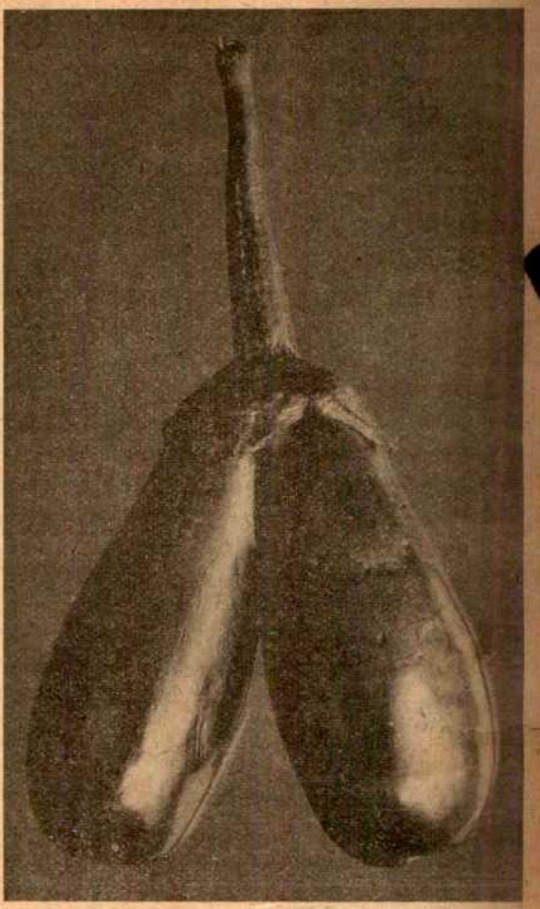

এক বোঁটায় দুইটি বেগুন।

ব্যঙ্গ-চিত্র

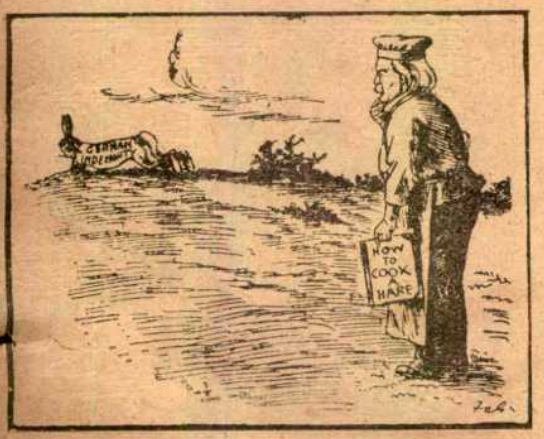

গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল।

রাঁধুনি—বলা সোজা যে ধরে রাঁধ।

জার্ম্মানির কাছ হইতে জরিমানা আদায়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীর দুর্ভাবনা।

১৯২০ সালের আয়র্ল্যাণ্ড।

"ওহে, তুমি কোন্ দলে?"

"ন্যায় আর স্বাধীনতার। আর তুমি?"

"শান্তি আর শৃঙ্খলার।"

শান্তি-দূত।

আজ মহাযুদ্ধের পর তুর্কীর কাছে শান্তির দূত ঘুঘু আসিয়াছে অগ্নিত পাখার বিদ্ধ হইয়া—বাণবিদ্ধ কপোত! শান্তির এই মূর্ত্তি দেখিয়া তুর্কীর চোখ কপালে উঠিয়াছে, মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে। সে ভাবিতেছে এই ঘুঘু বুঝি তার তিটের চরে!

বটের চারা!

জাপান—এ কি হে বুড়ো "শ্যাম", আমার পুচ্‌কে ছেলেটিকে দেখে আঁত্‌কে উঠ্‌ছ কেন?

জাপানীদের আমেরিকায় উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবার উদ্যোগ দেখিয়া আমেরিকার ভীতি ও জাপানের উক্তি। আমেরিকাকে শ্যাম বলে।

গরু খাড়ু হাত পোড়ালে বাঁধার

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব!

ইংরেজের কাছে জার্ম্মানীর দেনা পাহাড়-সমান। বাড়ী-সমান তার প্রতিশোধ আশিলে ইংরেজ বর্ত্তিয়া যায়। দেখে আমার বুদ্ধি

অবোলার উপর বোল্‌বোলা !

জুলুম্‌বাজির শাস্তি বটে !

কমষ্টেবল্—কি হে ছোক্‌রা, 'স্বাধীন, স্বাধীন' বলে বড় যে চেঁচাচ্ছিলে ; এবার চল জেলে, মজা দেখ্‌বে।

"জন্-বুলে"র পায়ে বোমা ! ফাটে বুঝি !!

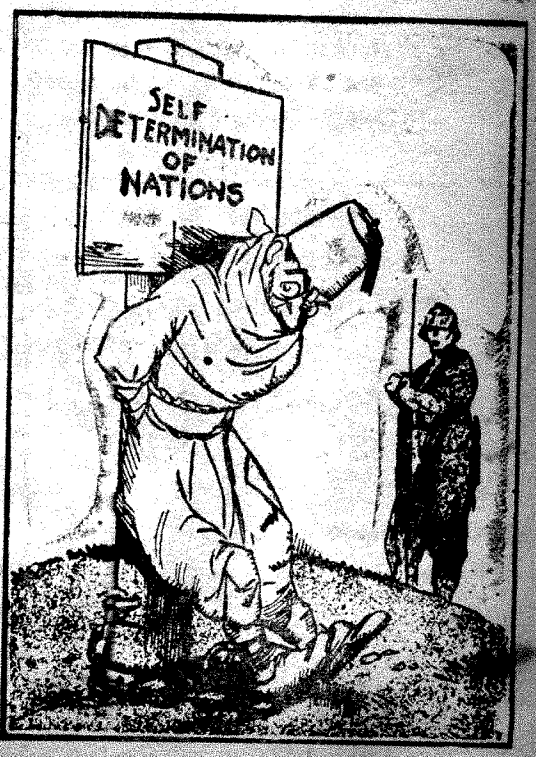

রাষ্ট্রের আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

যুক্তবেণী

হিল্লোলে হেথা দোলে লাবণ্য পাথার !
বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !
কার রূপে পায় রূপ নিশীথের নিদালি !
কার বুকে ভস্মে ও চন্দনে মিতালি !
ললিত-গমনা কে গো তরঙ্গভঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খর রবি মুরছায় কার শ্যাম অঙ্গে !
তোড়ে পাড় তোলপাড় কার গতি-রঙ্গে !
নীল মাণিকের মালা শোভে কার বেণীতে !
কে সেজেছে ফেনময় ধুতুরার শ্রেণীতে !
মাধব-বধূটি কে গো 'হর-অরধঙ্গা' !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

কালীয় নাগের কালো নির্ম্মোক পরে কে !
হর-জট-ভুজগেরে ভুজতটে ধরে কে !
আঁখি হায় কে ভুলায় তরলিত তন্দ্রা !
সাগরের বোল্ বলে কে ও ভাল-চন্দ্রা !
শরীরিণী স্বপ্ন এ, সরণি ও সংজ্ঞা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

ছায়া-ঘন দেহে কার স্নেহ আর শান্তি !
কে চলেছে ধুয়ে ধুয়ে ধরণীর ক্লান্তি !
এ যে আঁখি ভুলাবার—ভুলাবার মূর্ত্তি !
ও যে চির-উতরোল কল্লোল-স্ফূর্ত্তি !
সুখে এ যে মোহ পায় ও বাজায় ডঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালো চুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সখী-সুখে মুখে মুখে দুহুঁ নিঃসঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

খুলে যায় মুহু আজ অন্তর-দৃষ্টি !
অবচন একি শ্লোক ! অপরূপ সৃষ্টি !
সাম্যের একি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত !
নিত্যের ইঙ্গিত—এ মিলন-তীর্থ !
টুটে ভেদ-নিষেধের শিলাময় জঙ্ঘা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

বিধি-কৃত সংহিতা ! হের দ্যাখ নেত্র !
আর্য্য-অনার্য্যের সঙ্গম-ক্ষেত্র !
গলাগলি কোলাকুলি আলো আর আঁধারে !
ঢেউএ ঢেউ গেঁথে গেঁথে চলে মেতে পাথারে !
আঙুলে আঙুল বাঁধা ভেদ-বাধা-লঙ্ঘা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব !
অমা চুমে পূর্ণিমা ! অপরূপ দৃশ্য !
চুয়া মিলে চন্দনে ! বর্ণ ও গন্ধ !
চির চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ !
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

অপরূপ ! অপরূপ ! আনন্দ-মল্লী !
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !
দ্রবময়-দর্পণে হরিহর-মূরতি !
অপরূপ ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি !
মন হরে ! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

পাবনা জেলার পৌষপার্ব্বণ উৎসবে গ্রাম্য সঙ্গীত

পৌষ সংক্রান্তিতে এই উৎসব হইয়া থাকে। পৌষ মাসের দশ বার দিন থাকিতে গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে এই সঙ্গীতগুলি বালকগণ গান করে এবং গৃহস্বামীর নিকট কখনও পয়সা, কখনও বা চাউল বা ডাউল লইয়া থাকে। পরে সংক্রান্তি দিবসে মাঠের ভিতর অথবা জঙ্গলের ধারে চুলী কাটিয়া ঐগুলি এবং পয়সা দ্বারা দুগ্ধ মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া একসঙ্গে সকলে মিলিয়া পাক করিয়া খায়। এইরূপ

খাওয়াকেই "বনভোজন" বা সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় "জোলামুনি খাওয়া[১]" বলে।

পাবনা জেলার কোন কোন স্থানে এই উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত হইতে দেখা যাইত ;—কিন্তু বর্ত্তমানে তেমন হয় না। মুসলমান ও হিন্দু জাতীয় বালকগণ এখনও গ্রামে গ্রামে গিয়া এইরূপ গান করিয়া থাকে ; এইসকল গানের সঙ্গে তেমন কোনও বাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

এই জেলার উল্লাপাড়া অঞ্চলে—নয়ানগাতী, শিংগাতী, ভট্টকাক প্রভৃতি গ্রামে যেরূপ সঙ্গীতাদি শুনিয়াছি, তাহারই কয়েকটি মাত্র এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই-সকল সঙ্গীতের অনেক সময়ে কোনও বিশেষ অর্থ থাকে না, তবুও যেগুলির কিছু অর্থ আছে সেইগুলিই কেবল প্রকাশ করিলাম। সোনারায়ের উপাখ্যানটিরই কয়েকটি মাত্র গান উদ্ধৃত হইল।

সঙ্গীতগুলি কৃষকবালকগণের মুখে যেরূপ ভাবে শুনিয়াছি অবিকল সেইরূপ গ্রাম্যভাষায় কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়াই লিখিত হইল। গান গুলিতে র স্থানে ড় এবং ড় স্থানে র উচ্চারণ করিতে হইবে।

(১)

সোনারায়ের কথা-মাহাত্ম্য।

দুত্তর—দুত্তর—
সোনারা'র চ্যালা আ'ল বচ্ছর আন্তর ;
সোনারা'র চ্যালা দেখে যে করিবে হ্যালা
দুই চক্ষের দুই মুণি দিয়া বাড়াবে দুই ঢ্যালা।
হেলা নয় রে ঢোলা নয় রে গায় তো আ'ল জ্বর,
এমন তো দেখি নাই জুংলিপুরের বর ;
জুংলিপুরের বর নয় রে মুখে চাপ দাড়ি
হেলিতে দুলিতে যায় গোয়াল্‌নীর বাড়ী।
—'গোয়াল্‌নি, গোয়াল্‌নি, দধি দেও মোরে' ;
'ঘোটগরু বাথানে গেছে, দধি নাই ঘরে।'
—'ছিকার উপর দধি থুইয়া পীরেকে ভাঁড়ালি ?'
'আগে যদি জান্তাম রে তুমি আমার পীর,
আগে দিতাম দুধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর।'

(২)

সোনারায়ের জন্ম।

উত্তর থেকে আ'ল একই বামন পণ্ডিত,
বামনের নামটি "তরিপত্র", বামনীর নামটি "খাজা" ;
সেই না ঘরে জন্ম নিল সোনারা' এক রাজা।
দশমাস দশদিনে উৎপন্নি হইল,
নগরেতে ছিল দাইমা ডাকিতে লাগিল ;—
'আয় আয় দাইমাও রে, আমার প্রাণ তো যায়।'
একো ডাক, দুইও ডাকো, তিনো ডাকো দিল,
নগরেতে ছিল দাইমা আসিয়া পৌঁছিল।
ব্যাড়ার বাল্লুন কেটে ঘরেতে সাঁধাইল,
ঘরেতে সাঁধাইয়া দাইমা ধামাতে বসাইল ;
হেনকালে সোনারা'রে ভোমন্তে পড়িল।
ছাওয়াল ধোয়াইয়া দাইমা কোলে তুলে নিল,
সোনার জিল্লিয়া দিয়া পরিচ্ছেদ করিল।
—'তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা, আমাক্ দিবা কি ?'
'নগদে পাঁচটি টাকা তোমাক্ দিয়াছি।'
'তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা, আমাক্ দিবা কি ?'
'শুইয়া থাকার সোনার খাটখানা তোমাক্ দিয়াছি।'
'তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা, আমাক্ দিবা কি ?'
'খানা খাওয়ার সোনার থালখানা তোমাক্ দিয়াছি।'
'তোমার ছাওয়াল তুমি লও মা, আমাক্ দিবা কি ?'
'পান খাওয়ার সোনার বাটা তোমাক্ দিয়াছি।'
বুঝে সুঝে নিয়ে তবে ছেলে কোলে দিল,
এই অবধি সোনারায়ের জন্মে শেষ হ'ল ॥

(৩)

সোনারায়ের বিবাহ।

দুত্তর, দুত্তর—
দুত্তর দুরা ঘরখানি রে ঘন গাঁঠে রুয়া,
ঘন গাঁঠের রুয়ারে বটাবটী পান ;
বটাবটী পান রে দুই পীর ব'সে খায় ;
দুই পীর সুগুতি ক'য়ে হয়্যানিশি যায়।
হয়্যানিশির বাঘ ভাল্লুক দেখিয়া পলায়,
না পলায়ো রে বাঘ ভাল্লুক, না পলাস্ রে তোরা,
নিশান গড়িয়া দে দরজী (১) খেলাই মোরা।
নিশান খেলাতে পীরের মন হ'ল টিয়া (২)।
জাগ্যা জুগ্যা দিওরে সোনারা'র বিয়া।
আস্‌মানেতে ছিল ফুল পড়িল ঝরিয়া,
সেও ফুলে হ'ল না রে সোনারা'র বিয়া ;
আম্‌ল ক্যাচড়ার ফুল কোঁচড়া ভরিয়া,
সেও ফুলে হ'ল না রে সোনারা'র বিয়া।
—'আবার যাত রে মালি ফুলের লাগিয়া'
আন্‌ল মালের ফুল মালতি (৩) ভরিয়া,
সেও ফুলে হ'ল না রে সোনারা'র বিয়া।
—'আবার যাত রে মালি ফুলের লাগিয়া।'
আন্‌ল বোড়র ফুল চোড়র কানে দিয়া।
সেও ফুলে হ'ল না রে সোনারা'র বিয়া।
'আবার যা ত রে মালি ফুলের লাগিয়া।'
আন্‌ল পদ্মর ফুল পদরি ভরিয়া'
সেও ফুলে হ'ল না রে সোনারা'র বিয়া।
'আবার যা ত রে মালি ফুলের লাগিয়া।'
আন্‌ল খোলায় ফুল তরাজে কাটিয়া।
সেই ফুলে হ'য়ে গেল সোনারা'র বিয়া।

(১) এক প্রকার ক্রীড়া। (২) একপ্রকার পক্ষী। এখানে তাহার [illegible] বুঝাইবে অর্থাৎ 'চঞ্চল'। (৩) মালই। নারিকেল-মালা।

পাড়াপশীর ঝি বিটি পোছে ডাক দিয়া—
'সোনারায় বিয়া ক'রে ব্যাভার পা'লা কি ?
'এক পাছি গাই বাছুর, আর পাব কি ?'
—'সোনারায় বিয়া ক'রে ব্যাভার পালা কি ?'
'এক পাছি থালি লোটা, আর পাব কি ?'
—'সোনারায় বিয়া ক'রে ব্যাভার পালা কি ?'
'এক পাছি জুতা ছাতি, আর পাব কি ?'
—'সোনারায় বিয়া ক'রে ব্যাভার পালা কি ?'
'এক পাছি পানের বাটা, আর পাব কি ?'
—'সোনারায় বিয়া ক'রে ব্যাভার পালা কি ?'
"এক পাছি কত্তী ঘোড়া, আর পাব কি ?'
—'সোনারায় বিয়া ক'রে ব্যাভার পালা কি ?'
"শ্বশুরবাড়ীর একটি 'কন্যা' দানে পায়াছি ॥"

(৪)

পীর-মাহাত্ম্য ।

ওপার দিয়া কেশব সাধু ডিঙ্গা বয়ে যায়,
এপার থেকে পীর সোনারা' ডাক দিয়ে কয়,—
'তোমাক বলি কেশব সাধু আমার বাক্য ল্যাও—
কার্ত্তিলার মজ্জিদে যাব, পার ক'রে দাও ।'
—'ধনমালে ভরেছি ডিঙ্গা, গুণে না লয় ভার ;
কেমনে করিব পার ফকির আল্লার ?'
'যাও যাও রে কেশব সাধু ডিঙ্গা ত ভাটাইয়া,
আরও শাস্তি দিব কিছু সমাজে বসিয়া ।'
নামাজে বসিয়া পীর রে করিল গমন,
একে একে সেজে আ'ল মেঘ বারজন ।
—'কি কাজে ডেকেছ পীর রে, সেই কাজেই করিব ।'
'তোমাক্ বলিবার মেঘ রে আমার বাক্য ল্যাও,
কেশব সাধুর চৌদ্দ ডিঙ্গা বিনাশ ক'রে দাও ।"
কেউ না করে ঝড় অন্ধকার, কেউ না করে ভার,
দরিয়ায় টল্‌মল্ করে কেশব সাধুর নাও ;
দাঁড়্যা কাঁদে দাঁড় ধরিয়া, গল্যা কাঁদে ছাদে,
লক্ষের ব্যাপারী কাঁদে ডওয়ার মাঝারে,
আগা ডুবিল, পাছা ডুবিল, ডুবিল নায়ের গুড়া,
একে একে ডুবে গেল মাস্তলেরই চূড়া ।
তারপরে উঠিল ডিঙ্গা আল্লার ফরমান,
সেই ডিঙ্গায় বোঝাই আছে কেতাব আর কোরান ।
তারপরে উঠিল ডিঙ্গা নামে গোলই চোলই,
চৌদ্দ রাজার দেশে থেকে দেখা যায় তার গোলই ।
তারপরে উঠিল ডিঙ্গা নামে যার কাশিয়া,
একে একে উঠিল তবে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসিয়া ॥

(৫)

বাসরঘরে "ধাঁধা" ।

একখানি ঘর রে হিচল পিচল,
তারি উপর প'ড়ে র'ল ছয় জোরা পিতল ;
ছয় জোরা পিতল দিয়া গড়ালাম নাও,
সেই নায়ে চ'ড়ে যাবে সোনারায়ের মাও ;
সোনারায়ের মাও রে সে বড় চতুর,
চালেতে শুকায় রে চাম্পা'বই ফুল ।

হোক্কা টানে গামুর গুমুর কল্‌ক্যা মজুমদার,
তারি উপর টিপ ধরেছে ধুমা পলদার ;
ধুমা পলদারের বেটা হাজারি বাজারি,
এক লক্ষি দিব রে গোলা হাওয়ারি নাওয়ারি,
বা'রবাড়ী দিব রে 'সোবনের' কাছারী ;
তারি উপর তুলে দিব ফুলের টুঙ্গি ঘর,
তারি উপর তুলে দিব অষ্ট অলঙ্কার ॥

(৬)

আল্ লড়ি দিয়া যায় রে বাঁটই—
পা'ল লড়ি দিয়া যায়,
গোড়া লড়ির বাড়ি খেয়ে
বাপের বাড়ী যায় ।
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে—
বাপের বাড়ী যাব্যা তুমি,
চুল ধরিয়া আন্‌ব আমি,
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে—
'চুল ধরিয়া আন্‌ব্যা তুমি,
গো'ড় খাইয়া পড়্‌ব আমি ।'
'গড় খাইয়া পড়ব্যা তুমি,
কোলে ক'রে আন্‌ব আমি ।
'কোলে ক'রে আন্‌ব্যা তুমি,
গাঙ্গে গিয়া ধুইব আমি ।'
'গাঙ্গে নিয়া ধুইবা তুমি,
গাঙ্গ-মৎস্য হইব আমি ।'
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে—
'গাঙ্গ-মৎস্য হইবা তুমি,
জাল্যা দিয়া ছাক্‌ব্যা আমি ।'
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে—
'জাল্যা দিয়া ছাক্‌ব্যা তুমি,
আকাশ-তারা হব আমি ।'
'আকাশ তারা হব্যা তুমি,
তীর বাঁটুল দিয়া মারব আমি ।'
'তীর বাঁটুল দিয়া মার্‌ব্যা তুমি,
ঘরা'র (১) তলে পলাব আমি ।'
'ঘরার তলে পলাবে তুমি,
ঘরায় আগুন দিয়া মারব আমি ।'
'ঘরায় আগুন দিয়া মার্‌ব্যা তুমি,
সর্ষ্যা হ'য়ে র'ব আমি ।'
'সর্ষ্যা হয়ে রবে তুমি,
কবিতর হয়ে খুটুব আমি ।'
'কবিতর হয়ে খুটুব্যা তুমি,
ইন্দুর হয়ে রব আমি ।'
"ইন্দুর হয়ে রবে তুমি,
বিলাই হয়ে মারব আমি ।"
শ্যামের চিকণ কালার বাঁটই রে— ॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় ।

(১) নাড়া ধানের শুষ্ক মোটা খড়, যাহা ধান কাটিবার পরে [redacted] করা হয় । পরে এগুলি সারের জন্য ব্যবহৃত হয় ।

পঞ্চজনাঃ বলিতে গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, অসুর ও রাক্ষস জাতিকে বুঝায়—ইহাই যাস্কের নিজের মত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত মতের কোনটিকেই সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। আচার্য্য ম্যাক্‌স্‌মূলর বলেন যে বৈদিক যুগের আদিতে আর্য্যেরা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত ছিলেন; এই পঞ্চজনাঃ সেই পাঁচ জাতিকেই বুঝাইতেছে। ndia : What Can It Teach Us, p. 95, note.)

রোটের (Roth) মতে উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমের অধিবাসী অনার্য্যেরা এবং মধ্যদেশবাসী আর্য্যেরা —এই পাঁচ জাতি। এই মত সমর্থন করিয়া গেল্‌ড্‌নার (Geldner) বলেন যে পৃথিবীর সকল লোককে এ-কথায় বুঝাইতেছে—চারিদিকে অন্যান্য জাতি বাস করে এবং মধ্যস্থলে ভারতীয় আর্য্যেরা বাস করে। অন্য স্থানে (Glossary of the Rig-Veda) গেল্‌ড্‌নার বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা পাঁচ জাতিকে কিংবা সমগ্র মানব-সমাজকে জানাইতেছে।

মুইর বলেন (Muir's Sanskrit Texts. Vol. I, p. 176) যে পঞ্চজনাঃ এই কথাটিতে কেবল আর্য্যদিগকে নহে, পৃথিবীর সকল জাতিকেই বুঝাইতেছে। 'ইমাঃ যাঃ পঞ্চ প্রদিশো মানবীঃ পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' অথর্ব্ববেদের এই উক্তি (৩-২৪-২) অনুসরণ করিয়া তিনি বলেন যে চারিদিক অপর জাতির বাসস্থান এবং মধ্যদেশ—'ধ্রুবাদিক্' (অথর্ব্ববেদ ৪-১৪-৮, ১৮-৩-৩৪) ভারতীয় আর্য্যের অধিষ্ঠান-ভূমি। মুইর আরও বলেন যে 'পঞ্চ' পাঁচকে আমরা অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যারূপে লইতে (যেমন বাংলায় পাঁচজন বলিতে সাধারণকে বুঝায় তেমন) পারি না, কারণ বেদে সেরূপ প্রয়োগ লক্ষিত হয় না।

জিমার (Zimmer) রোট ও গেল্‌ড্‌নারের মত স্বীকার করেন না। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে বেদে আর্য্য ও দাসের (অনার্য্যের) প্রভেদ এত সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যাহাতে পঞ্চজনাঃ এই এক কথায় সব মানুষকে বুঝায় বলিয়া বোধ হয় না। আরও বেদে জনাঃ বা জনাসঃ সর্ব্বত্র আর্য্যদিগের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। [দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্ত দেখুন।]

ঋগ্বেদের এক জায়গায় (৯ মণ্ডল, ৬৫ সূক্ত, ২৩ ঋক্) বলা হইয়াছে 'য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যে বাজনেষু পঞ্চসু॥' অর্থাৎ সোম যিনি ঋজীকদিগের মধ্যে বাস করেন, যিনি কৃত্বদিগের মধ্যে বাস করেন, যিনি সরস্বতী প্রভৃতি নদীর নিকটে থাকেন কিংবা যিনি পাঁচ জাতির মধ্যে থাকেন।

অন্যত্র বলা হইয়াছে—

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী। বাজে বাজে হব্যাভূৎ॥ (৬-৬১-১১)

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে পঞ্চজাতাঃ অর্থাৎ পাঁচ জাতি সরস্বতী-তীরে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সোমরসের প্রচার ছিল।

'একং নুত্বা সৎপতিং পাঞ্চজন্যং জাতং শৃণোমি যশসং জনেষু'—৫ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের এই একাদশ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে ইন্দ্র পাঞ্চজন্য অর্থাৎ পাঁচ জাতির দেবতা।

এইরূপ আমরা ৯ মণ্ডলের ৬৬ সূক্তের ২০ ঋকে পাই—'অগ্নিঃ ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে-মহাগয়ম্॥ এখানে অগ্নিকেও পাঞ্চজন্য বলা হইয়াছে।

এইসকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জিমার বলেন ইহাতে কেবল আর্য্যগণই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ অনু, দ্রুহ্যুঃ, যদু, তুর্ব্বশ এবং পুরু এই পাঁচ বংশের কথা বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে—

'যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্ব্বশেষু যদ্ দ্রুহ্যুষু অনুষু পুরুষু স্থঃ।
অতঃ পবি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য॥'

১-১০৮-৮।

আমরা ঐ পাঁচ বংশের উল্লেখ পাইতেছি। চারিটির উল্লেখ আর-এক স্থানে পাই (৮-১০-৫)।

জিমার ইহাও স্বীকার করেন যে পঞ্চজনাঃ এই কথাটি ঋগ্বেদের পরে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে জিমারের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। হপ্‌কিন্স (Journal of American Oriental Society, Vol, 15, p. 260) জিমারের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন তুর্ব্বশ নামে কোন বংশ ছিল না—কেবল যদুবংশীয় এক রাজার নাম ছিল তুর্ব্বশ। কিন্তু তাঁহার যুক্তি খুব দুর্ব্বল।

একটি চামেলির প্রতি

চামেলি তুই বল্,—
অধরে তোর কোন্ রূপসীর
রূপের পরিমল!

কোন্ রজনীর কালো কেশে
লুকিয়েছিলি তারার বেশে,
কখন খ'সে পড়্লি এসে
ধূলির ধরাতল!

কোন্ সে পরী গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন্ প্রমদার সুধার ভারে
টুপ্‌টুপে তোর দল!

কোন্ তরুণীর তরুণ মনে
জাগ্‌লি রে কোন্ পরম ক্ষণে,
বাইরে এলি বল কেমনে
সঙ্কোচে বিহ্বল!

সুন্দরী কোন্ বাদ্‌শাজাদীর
কামনা তুই মৌন-মদির,
বান্দা-হাটের কোন্ সে বাঁদীর
তুই রে আঁখিজল!

জ্যোৎস্না-জলের তুই নলিনী,
পাল্‌লে তোরে কোন্ মালিনী,
কোন্ হাটে তোর বিকিকিনি
জান্‌তে কুতুহল!

সবুজে ঝোপের পান্না-ঝাঁপি
রাখ্‌তে নারে তোমায় ছাপি',
বাতাস দেছে ঘুরিয়ে চাবি
আল্‌গা মনের কল!

সৌরভে তোর স্বপন বুলে,
বুল্‌বুলে দ্যায় কণ্ঠ খুলে,
পাপিয়া মাতাল মনের ভুলে
বক্‌ছে অনর্গল!

তোর নিশাসের মুসব্বরে
মুসাফিরের মগজ ভরে,
ফুটায় মনে কি মন্তরে
খুশীর শতদল!

অধরে তোর কোন্ রূপসীর
হাসির পরিমল!
চামেলি তুই বল্!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চজনাঃ

'পঞ্চজনাঃ' এই কথাটি বৈদিক সাহিত্যে অনেকবার পাওয়া যায়। পাঁচ জাতি এই অর্থে পঞ্চজনাঃ, পঞ্চমানুষাঃ, পঞ্চমানবাঃ, পঞ্চচর্ষণাঃ ও পঞ্চকৃষ্টয়ঃ এই-সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই শব্দগুলি ঋগ্‌বেদে বাইশবার পাওয়া যায়,—তাহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে একবার, দ্বিতীয় মণ্ডলে একবার, তৃতীয় মণ্ডলে তিনবার, চতুর্থ মণ্ডলে একবার, পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম মণ্ডলে দুইবার করিয়া, নবম মণ্ডলে তিনবার এবং দশম মণ্ডলে চারিবার। অথর্ব্ববেদেও পাঁচের বেশীবার পাওয়া যায়। শব্দটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪-২-৯) পঞ্চজনাঃ সমাসঘটিত পদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন (৩-৩১) যে ইহা দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরস্, নাগ ও পিতৃ এই পাঁচকে বুঝাইতেছে। যাস্কের নিরুক্ত হইতে (৩-৮) জানা যায় যে বৈদিক শব্দবিৎ ঔপমন্যবের মতে পঞ্চজনাঃ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও নিষাদ জাতিকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণও নিজের টীকায় সর্ব্বত্র এই মত অনুসরণ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে আমরা পাই অনু, পুরু ইত্যাদিরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। উহাদের মধ্যে চার বংশ ত্রিৎসুদের রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩-৫ ৪-১৪) বলা হইয়াছে যে পাঁচ জাতি ভরিতদিগের প্রতিপক্ষ।

ওয়েবার (Weber) অনুমান করেন যে এই পাঁচ জাতিই ব্রাহ্মণ রচনার যুগে 'পঞ্চাল' নামে কথিত হয় এবং তাহারাই শতপথ ব্রাহ্মণের (১৩-৫-৪-২৩) কথিত সাত জাতি। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। ঋগ্বেদে পঞ্চালেরা পঞ্চজনাঃ নহে, তাহারা ঋগ্বেদে 'কৃবি' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শ্রীসুকুমার সেন।

ইচ্ছামুক্তি

কে তাহারে বন্দী করে? ফন্দী এঁটে বাঁধ্‌বে কে সিন্ধুকে?
মুক্ত-পুরুষ,—মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তা হ'য়ে আছে;
'মুক্ত হবই!'—একথা যে বল্‌তে পারে
জোর ক'রে বুক ঠুকে—
পাষাণ-কারা তাসের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে

মরণকে যে তুচ্ছ মানে, ভীষ্ম সমান যেজন প্রতিজ্ঞাতে,—
ইচ্ছামৃত্যু, ইচ্ছামুক্তি,—অপূর্ব্ব সে আত্মারি গৌরবে;
চুয়াত্তরী লঙ্ঘনে যার চিত্ত অটল নিত্য-যন্ত্রণাতে
বীর সে ঋষি, পূর্ণ দিশি তার মরণের নীরব মাভৈঃ রবে।

অটুট কভু রয় না কারো অনন্ত-কাল হুকুম-মহকুমা,
আগ্‌লে ঘাঁটি আঁক্‌ড়ে মাটি মিছেমিছি মন্ত্রণা, হায়, আঁটা,
সুমতি যে সুনাম সে চায়, ভূমির আগে আকাঙ্ক্ষা তার ভূমা,
চাণক্য তায় দ্যায় না আমল, অর্থশাস্ত্রে নেহাৎ সে নামকাটা।

মানুষ তারে কর্‌বে পূজা, ঠাট্টা তারে কর্‌বে অমানুষে,
জাতীয়তার খ্রীষ্ট সে, তার শরীর-পতন স্বাধীনতার ক্রুশে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(৫১)

যখন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব ঐ সভার সম্পাদক ছিলেন। কত দিন উঁহারা ঐ পদে ছিলেন ও তাহার পর কাঁহারা হইয়াছিলেন? শাস্ত্রী-মহাশয়ের রামতনু লাহিড়ীর জীবনীতে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তদ্‌ব্যতীত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অপর কোনও জীবনী কিম্বা কোনও মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ আছে কি? তাঁর মৃত্যু কোন্ বৎসরে হইয়াছিল?

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৫২)

হাবড়া ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে (ই, আই, রেল, মেন-লাইন) হুগলী জেলার অন্তর্গত "পাণ্ডুয়া" নামক একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান আছে। পার্শী, ইংরেজী অথবা বাংলা ভাষায় লিখিত উক্ত স্থানের অথবা উক্ত স্থান সম্বন্ধীয় ইতিহাসের নাম কেহ উল্লেখ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

মোহাম্মদ লুৎফে খোদা।

(৫৩)

বাঙ্গালা ও ইংরেজি ভাষায় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যায়াম সম্বন্ধে কি কি বই আছে? থাকিলে ঐগুলির প্রাপ্তিস্থান কোথায়?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র বিশ্বাস।

(৫৪)

কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইবার জন্য কোনও প্রকার কল কোথাও পাওয়া যায় কি না, পাওয়া যাইলে তাহার কত দাম, ও কোথায় পাওয়া যায়, যদি জানাইতে পারেন ত বড় অনুগৃহীত হই।

শ্রীরমা দেবী।

(৫৫)

মোজার কল এবং জুতার ফিতার কল কোথায় পাওয়া যায়? মূল্যাদি এবং ব্যবহারোপযোগী সূতা কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইলে উপকৃত হইব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সাহা।

(৫৬)

ক। কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের লর্ড বিশপগণের বেতনাদি ভারত-সরকার হইতে দেওয়া হয় কি? হইলে, বার্ষিক কত টাকা খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্য সরকার ব্যয় করেন?

খ। এমেরিকার কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে Journalism শিক্ষা দেওয়া হয়? এদেশের কি কি পরীক্ষায় পাস হইলে তাহা পড়িবার যোগ্যতা জন্মে?

গ। "বাঙ্গালী" শব্দের উৎপত্তি কিরূপে হইল?

অন্নদাশঙ্কর রায়।

(৫৭)

'হরতাল' শব্দের অর্থ কি? কোথায় কি উদ্দেশ্যে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল?

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

(৫৮)

পূর্ব্ববঙ্গে আমের মধ্যে নানা রকমের পোকা জন্মে। পোকার জন্ম ভাল ভাল মিষ্টি আম অখাদ্য হইয়া যায়। এই পোকার কোন প্রতিকারের উপায় কেহ জানাইলে উপকৃত হইব।

শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫৯)

মুসলমান বলিলে আমরা যেমন মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথের পথিকদিগকে বুঝিয়া থাকি, খৃষ্টান বলিলে যেমন খ্রীষ্টের 'শিষ্যদিগকে' বুঝিয়া থাকি, তেমনি হিন্দু বলিলে আমরা কাহাদিগকে বুঝিব?

"যোগী"।

(৬০)

উদ্ধৃত ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ কি হইবে?

Ligaments, Tissue, Adipose Tissue, Nervous Tissue, Bone Tissue, Cartilage Tissue, Epithelial Cells.

শ্রীঅরবিন্দু দত্ত।

(৬১)

আমাদের এ অঞ্চলে যথেষ্ট শটী পাওয়া যায়। এই শটী ছেলেদের খাদ্যোপযোগী করিবার জন্য যদি কোন কারখানা আমাদের কাছ হইতে কাঁচা শটী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে আমা জানাইলে বাধিত হইব।

সুখানপুকুর, বগুড়া। শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

(৬২)

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত "আমার দেশ" নামক সঙ্গীতে আছে—"সন্তান যার তিব্বতে-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ।" ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি কি?

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মজুমদার।

(৬৩)

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পিতার ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের জন্মনিবাস কোন্ কোন্ গ্রামে? এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা একমত কি না?

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ পালিত।

(৬৪)

মনুসংহিতায় আছে,

"আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ।"

২য় অধ্যায়ঃ ৫২ শ্লোকঃ।

তবে, পিতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণ মুখ হইয়া ভোজন নিষিদ্ধ কেন?

শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়।
ও শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

(৬৫)

কোন দ্রব্য হারাইলে "বাটি চালান" দেওয়া হয়। এই বাটি চালানের ভিতর কোন সভ্যতা আছে কি?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

(৬৬)

বাঙ্‌লায় শ, ষ, স এই তিনপ্রকার 'শ'-র কি প্রয়োজন? উচ্চারণে ত তফাৎ দেখা যায় না। হসন্ত স্-এ ত-ফলা যোগ হইলে স অনেকটা ইংরেজী s-এর মত উচ্চারিত হয়, শ্-এ র-ফলা যোগ হইলেও কতকটা এই-রকম উচ্চারণ পায়। কিন্তু অন্য সময় শ, ষ, স উচ্চারিত হয় ঠিক এক রকম। হিন্দীতে সভা, সমান প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ sভা, sমান। বাঙ্‌লায় সেরূপ নহে। অথচ ইংরেজী sons বাঙ্‌লায় লেখা হয় 'সন্‌স্', sentiment, সেন্টিমেণ্ট্। বাঙলার রীত্যনুযায়ী ইংরেজী না-জানা লোকে এই দুইটি শব্দ পড়িবেন—'শন্‌শ্' এবং 'শেণ্টিমেণ্ট্'। এর প্রতিকার কি? আরবীর sিন অক্ষরটিও বাঙ্‌লায় স দিয়া লেখা হয়। হিন্দীতে স দিয়া লিখিলে দোষ হইত না। বাঙলায় স, ষ-র উচ্চারণ শ-র মত। এইজন্য বাঙ্‌লায় 'মুসলমান' শব্দটি সাধারণতঃ উচ্চারিত হয় 'মুশলমান', 'মোস্‌লেম' শব্দটি উচ্চারিত হয় এমন কি লিখিত হয়—'মোশ্লেম'; হওয়া উচিত, 'মুsলমান' ও 'মোsলেম'। s এবং sিন অক্ষর বাঙ্‌লায় ছ দিয়া লিখিলে ঠিক হইবে কি? অসমীয়া ভাষায় ছ দিয়া লেখা হয় দেখিয়াছি। হসন্ত চ্ এবং হ একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে ছ-র উচ্চারণ পাওয়া যাইবে। তাহা s বা sিন-এর ন্যায় নহে। এ সমস্যার সমাধান কি?

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী।

(৬৭)

পুরাণাদি গ্রন্থে উনপঞ্চাশদ্ বায়ুর সংখ্যা শোনা যায়। সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনে "প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান" এই পাঁচপ্রকার বায়ুর উল্লেখ আছে। হিন্দুদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই-সমস্ত বায়ুর শ্রেণীভেদ, স্থানভেদ ও কার্য্যভেদ পরিদৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য ডাক্তারী বিদ্যায় বা রসায়ন শাস্ত্রে, অথবা পদার্থবিজ্ঞানে বায়ুর সংজ্ঞা কতপ্রকার? বায়ুকে 'গ্যাস' নামক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় কি না? পার্থিব বাহ্য বায়ুর গাঢ়ত্ব গুরুত্ব ও চাপ অনুসারে জীব সাধারণের অন্তরস্থ বায়ু কখন কখন সমীকৃত ও লঘুকৃত হইতে পারে কি না? আর্য্যঋষিদের দর্শনে উক্ত আছে "উদান-বায়ুকে সংযমপ্রয়োগ দ্বারা জয় করিতে পারিলে অন্যান্য বায়ুর এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার অবরোধ-হেতু উদ্গতিস্বভাব উদানবায়ু অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে; যোগী তখন তৎপ্রভাবে জলে ভাসিতে পারে, পঙ্কে নিমজ্জিত হয় না বা কণ্টকশয্যায় (শরশয্যায়?) আসক্ত বা বিদ্ধ হয় না।" "সমান বায়ুর জয় হইলে অর্থাৎ যোগের প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সমান-নামক বায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলে যোগীর শরীরে অগ্নিতুল্য জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হয়।" "নিজের দেহের চাপ ও গুরুত্বের সঙ্গে বাহ্য আকাশ-বায়ুর চাপ ও গুরুত্বে সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগী তুলা অপেক্ষা লঘুতর হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়।" এই-সমস্ত উক্তি বিশ্বাসযোগ্য কি না অথবা পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অনুমোদিত কি না?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

(৬৮)

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক গ্রামে যে ভগ্নপ্রায় আকাশচুম্বী প্রাচীন "দেউল" আছে, তাহার প্রতিষ্ঠাতা কে? এবং কোন্ সময়ে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা।

(৬৯)

আরতির সময় "ঘণ্টা বাজান" হয় কেন? লক্ষ্মী-প্রতিমা পূজার সময় তাহা কেন বাজান হয় না?

শ্রীইন্দুভূষণ বসু।

(৭০)

Biology (উদ্ভিদবিজ্ঞান) সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ কি?

1. Amœba. 2. Moneron. 3. Monad. 4. Sphex.

5. Skull. 6. Cranium. বিজ্ঞানসম্বন্ধী "Undulatory-theory-of-Light" শব্দের বাংলা অনুবাদ কি ?

শ্রীরামাজ্ঞা দ্বিবেদী।

(৭০)

চবুথায় সুতাকাটায় দক্ষ স্ত্রীলোক পাওয়া যায় কি না, যাঁহারা পল্লীবালিকাদিগকে চবুথায় সুতাকাটা শিখাইতে পারেন ? মাসিক কত বেতন চান ?

কিরণ মুখোপাধ্যায়।

(৭১)

দাবা খেলা কখন্ কোন্ দেশে কাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ?

মহিদীন আহম্মদ সিল্‌হেটী।
ও শ্রীঅমৃত পালিত।

(৭২)

১০ই পৌষ ২৫শে ডিসেম্বর তারিখকে বড় দিন ও X'mas day বলিবার কারণ কি ?

শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম।

(৭৩)

কাককে যমদূত বলে ধারণা হবার মূল কি ? শাস্ত্রে কি এর কোন প্রমাণ আছে। কাকের পুনঃপুনঃ রব মানবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই লোক 'দূর দূর' করে এবং অমঙ্গল আশঙ্কা করে, কেন ?

শ্রীরাধাচরণ দাস।

(৭৪)

লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে কেন ?

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা।

(৭৫)

ঘরে ঝুল্ হয় কেন ? ধারণা ছিল যে কেরোসিনের আলো ঘরে থাকিলে ধোঁয়াতে ঝুল্ জন্মায় ; কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো থাকিলেও ঘরের খিলানে বা দেওয়ালের গায়ে ঝুল্ আরও তাড়াতাড়ি ও অধিক পরিমাণে জন্মায়। বাস্তবিকই, ঝুল কি ধোঁয়ার জন্য জন্মায়, না অন্য কোনও কিছুর জন্য ?

শ্রীমৈত্রেয়ী গুহ।

মীমাংসা

(১৭)

জিয় পোকাই (Heliothes armigera) কলাগাছের প্রধান শত্রু। দেশভেদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। উত্তরবঙ্গে 'ভিন্যায়,' পূর্ব্ববঙ্গে 'কেউচা,' পশ্চিমবঙ্গে 'কাটরি বা 'জাব' নামে ইহা পরিচিত। বঙ্গের কোন কোন স্থানে জিয় পোকাও বলে। ইহার রং লাল ; দেখিতে কেঁচোর মতন। তবে অত লম্বা নহে। ইহা বড় দ্রুত সংক্রামক। এক কাঁড়ে লাগিলে, উহারা ক্রমে সকল গাছেরই ক্ষতি করিয়া থাকে। অনেক সময়ে ইহারা গাছের শিকড় কাটিয়া ফেলে ও গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়। আবার সময় সময় ইহারা গাছের মূল ও খোলের সমস্ত অংশ অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। ঐ সময় গাছের মধ্য হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া গাছ নিস্তেজ হয়। শীতকালেই এই রোগ বেশী দেখা যায়।

ছায়াতে রোপিত গাছেই এই রোগ প্রায় দৃষ্ট হয়। গাছের গোড়া পরিষ্কার থাকিলে এবং আলোক পতিত হইলে বড় বেশী উপদ্রব করিতে পারে না। চুন (unslaked lime) ও তামাক-পাতার জল একত্র করিয়া পিচকারি (spraying machine বা vaporiser) দ্বারা গাছে প্রয়োগ করিতে হয়। ১ পাউণ্ড সাল্‌ফেট অব পটাশ (sulphate of potash), ১½ পাউণ্ড সাল্‌ফেট অব এমোনিয়া (sulphate of ammonia) এবং ২½ পাউণ্ড সুপার-ফস্ফেট (super-phosphate) মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যেক গাছের গোড়ায় তিন ইঞ্চি মাটির নীচে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গাছের শুষ্কপাতা কাটিয়া গোড়ার মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ (pulverised) ও পরিষ্কার করিয়া দিয়া, তদুপরি সূর্য্যরশ্মির প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া দরকার। নতুবা শুধু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পোকা নষ্ট করা দুষ্কর।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(১৮)

আমি অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে দেশী সুতার কাপড়ের হ্যাণ্ড মেড পাইবার ঠিকানা দিয়াছিলাম এবং তৎসঙ্গে হ্যাণ্ডলুমের মূল্যও দিয়াছি। কিন্তু ছাপাইবার পর দেখিলাম শ্রীরামপুরের হ্যাণ্ড মেড প্রত্যেকটির মূল্য ৪ টাকা ছাপা হইয়াছে। ইহা অসম্ভব, প্রত্যেক চরকার দাম ৪ টাকা এবং হ্যাণ্ডলুমের দাম ১৬ হইতে ২৪ টাকা।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৩২)

মহাভারত রচনার কালনির্ণয় ভীষ্মের প্রাণত্যাগের পূর্ব্বের উক্তি হইতে সম্ভব। ভীষ্ম বলিতেছেন—"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।" বঙ্কিম-বাবু এখানে মাঘ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বে কোন দিন প্রাণত্যাগের সময় ধরিয়াছেন। কিন্তু "সমনুপ্রাপ্তো"তে বুঝিতে হইবে মাঘ মাস ভাল করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ মাঘের ১লা বরা নহে, আরও পরে, কিন্তু মাঘের অনেক দিন গত হয় নাই। অতএব "মাঘ মাসের এক সপ্তাহ গত হইয়াছে" ধরিলে অন্যায় হইবে না। গত ৭ই পৌষ ২২ ডিসেম্বর ১৯২০ সায়ন মকর-সংক্রান্তি অর্থাৎ উত্তরায়ণ আরম্ভ গিয়াছে। যে কালের উক্তি অর্থাৎ মহাভারত রচনায় বা লে ৭ই মাঘ সায়ন মকর সংক্রান্তি ধরিলে অন্যায় হইবে না। অর্থাৎ অয়ন বিন্দু মহাভারত-রচনা-কাল হইতে ৩০ দিন বা ৩০ অংশ পশ্চাদ্গমন করিয়াছে। হিন্দুমতে অয়ন-বিন্দু প্রতিবৎসর ৫৪ বিকলা পশ্চাদ্গমন করে ; কিন্তু ইউরোপীয় মতে ৫০·২ বিকলা তাহার গতি। হিন্দুমতে ৩০ অংশ গমন করিতে ২০০০ বৎসর লাগে ; ইউরোপীয় মতে ২১৫১ বৎসর লাগে।

$$\frac{৩০^\circ}{\frac{১}{৫০.২}} = \frac{৩০ \times ৬০ \times ৬০}{৫০·২} = \frac{১০৮০০০০}{৫০২} = ২১৫১ \text{ বৎসর।}$$

$$\frac{৩০^\circ}{৫৪'} = \frac{৩০ \times ৬০ \times ৬০}{৫৪} = ২০০০ \text{ বৎসর।}$$

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ২১৫১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ৭ই মাঘ উত্তরায়ণ হইয়াছিল। এই খৃঃ পূঃ ২৩০ বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে। সমস্ত গ্রন্থ না হউক ভীষ্মের উক্তি ও এই অংশ ২০০ হইতে ২৫০ খৃঃ পূঃ মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে।

মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিম-বাবু যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার "সত্যার্থ-প্রকাশ" নামক গ্রন্থে (১১ অধ্যায় * ২৭ প্যারা) লিখিয়াছেন যে মালবাধিপতি ভোজরাজ (৪৫০খৃঃ) একখানি গ্রন্থ আপনার সময়ের

* হিন্দী পুস্তকে ৩১৫।৩১৬ পৃষ্ঠা। হিন্দীতে প্যারা নং নাই, উর্দু পুস্তকে ৩৯২।৩৯৩ পৃষ্ঠা ২৭ প্যারা।

ইতিহাসের মত (memoirs) লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "সঞ্জীবনী"। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে ব্যাসদেব ৪৪০০ শ্লোকাত্মক মহাভারত লিখিয়াছিলেন, পরে তাঁহার শিষ্যেরা ৫৬০০ শ্লোক লেখেন। এইরূপে ১০০০০ শ্লোকের মহাভারত ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ২০০০০ হইয়াছে, আমার (ভোজের) পিতার সময়ে ২৫০০০। এখন আমার সময়ে যে মহাভারত পাওয়া যায় তাহাতে ৩০০০০ শ্লোক আছে। এইরূপে মহাভারতের কলেবর বাড়িলে কিছুকাল পরে একটি উটের বোঝা হইবে।" ভোজরাজ ঐ পুস্তকে অন্যস্থানে লিখিয়াছেন—"আমি সংবাদ পাইলাম যে আমার রাজ্যকালে কতকগুলি পণ্ডিত মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও শিবপুরাণ নামক পুস্তক লিখিয়া ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত করিয়াছে। আমি ঐ পণ্ডিতদের হাত কাটিয়া দিয়াছি ও আজ্ঞা করিয়াছি যে যদি কেহ কোন গ্রন্থ লিখিতে চাহে বা লেখে তবে আপন নামে লিখুক, মুনিঋষিদের নামে লিখিলে ঐ রূপ শাস্তি পাইবে।"

সম্ভবতঃ ভোজরাজের জীবিতাবস্থায় আর কেহ পুরাণাদি লেখে নাই বা লিখিতে সাহস করে নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহ গ্রন্থকর্ত্তাদের হাত কাটে নাই। অতএব এখন যত আষাঢে গল্প বেদব্যাসের লেখা বলিয়া পরিচিত, সেগুলি ভোজরাজার মৃত্যুর পর লেখা হইয়া থাকিবে। ভোজরাজ ৫০০ সম্বৎ (৪৪৩ খৃঃ) জীবিত ছিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

(৩৪)

কোন্ দেশ হইতে ও কোন্ সময়ে প্রথমে তাসের উৎপত্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। Encyclopædia Britannica বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোষ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক ঐ সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পারেন। তবে আমি একটি নূতন কথা প্রবাসীর পাঠককে শুনাইতে চাই। সমস্ত ভারতবর্ষে না হউক অন্ততঃ পক্ষে বাঙ্গালাদেশে তাস খেলা মোগলদিগের আমলে ওলন্দাজদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। ভাষাই ইহার সাক্ষী।

হরতন ওলন্দাজী (Dutch) harten, উচ্চারণ হর্‌তন, অর্থ হৃদয়-সকল বা হৃদয়-সকলের (hearts of hearts).

রুইতন ওলন্দাজী ruiten, উচ্চারণ রুইতন্, অর্থ হীরকের বা আয়তাকার ক্ষেত্রের বা হীরক সকল বা আয়তাকার ক্ষেত্রসকলের (of diamonds, diamonds).

ইস্কাপন ওলন্দাজী Schoppen, উচ্চারণ স্কাপন, অর্থ কোদাল-সকল বা কোদাল-সকলের (spades of spades).

আমরা যে-সকল রংকে হরতন, রুইতন, ইস্কাপন বলি, ওলন্দাজেরা সেইগুলিকেই harten, raiten, schoppen বলিয়া থাকে। চিড়িতন নামটি আমাদের তৈরী; ওলন্দাজী ভাষায় klaveren.

আমাদের সাহেব, বিবি, ওলন্দাজী heer ও riouw, উহার অর্থ gentleman, lady, মোগলযুগের ভাষায় সাহেব, বিবি।

তুরুপ, ওলন্দাজী troef, উচ্চারণ ত্রুফ। ইহা পর্ত্তুগীজ triunfo অপেক্ষা বাঙ্গালা উচ্চারণের বেশী নিকটবর্ত্তী।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

(৩৭)

উইপোকা নিবারণের উপায়।

(ক) যখন দেখা যাইবে যে, ক্ষেত্রাদিতে, জমিতে উইঢিবি আরম্ভ হইয়াছে, তখন তথায় সারি সারি দুই-তিনটি ঢালু ভাবের গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে বড় বড় কয়েকটি কলসী হেলাইয়া পুতিয়া দিতে হইবে, এবং ঐ কলসীর মধ্যে, কয়েকখানি করিয়া শুষ্ক ঘুঁটের সহিত খানিকটা পুরাতন বোরা ছেঁড়া মিশাইয়া দিয়া রাত্রিতে পাতিয়া রাখিবে। প্রাতে দেখা যাইবে যে, ঐ কলসী পরিপূর্ণ হইয়া উই ধরিয়া রহিয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই যে পুরাতন বোরা ও ঘুঁটেতে অধিকপরিমাণে নাইট্রোজেন জমায়; সুতরাং উহারা ঐ নাইট্রোজেন গ্যাসের গন্ধে, ঐ কলসীর মধ্যে আসিয়া জমা হয়। অতএব তিন চারি দিন পর্য্যন্ত এই কলসী পাতিয়া উই মারিলে, আর তথায় উই থাকে না। বিলাতী নিয়মে বাইসাল্‌ফাইড অব কার্ব্বন, কীটাংসের পাউডার দিলেও নিবারণ হয়।

(খ) সর্ষপ বা রেড়ির খইলচূর্ণ দুই ভাগ, ফিট্‌কারী এক অষ্টমাংশ, উহার আটগুণ জল মিশ্রিত করিয়া উইর বাসার চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া দিলে, ত্বরায় উই দূর হয়। হসুদ-গোলা জল প্রয়োগ করিলেও উই নিবারণ হয়।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৩৯)

এই দেশ হইতে পাট ও পাট জাতীয় দ্রব্য প্রতি বৎসর (আজ-কাল) ১৮ হইতে ২০ কোটি টাকায় বিদেশে যায়। বাঙ্গালীর হাত হইতে উপরে লিখিত টাকার দুই অংশের বেশী বিদেশে যায় না।

শ্রীমহিতমোহন রায় চৌধুরী।

(৪১ খ)

পৌষের প্রবাসী এই সমস্যায় যে দুটি উত্তর ছাপিয়াছে তাহার একটিও সুসঙ্গত ও সুচিন্তিত নহে। শ্লোকটি এই,—

"শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে
বাম হল্য বিধি কান্ত পড়িল অনলে।
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।"

এই শ্লোকের বিচারে সুরেন্দ্র-বাবু—"কান্ত পড়িল অনলে" এই অংশের বিচারই করেন নাই, একদম বাদ দিয়াছেন, অবিনাশ-বাবু তথা।

দেখা যাইতেছে, গ্রন্থকার শিবের গীত কোন্ সময়ে সারা হইল তাহা শক সুদ্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন্ শকে, কোন্ মাসে, কত তারিখে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা" এই পদে পরিষ্কার বুঝা যায় যে কেবল শকাব্দা নহে, গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখও এই সাঙ্কেতিক বাক্যে আছে। শকাব্দাটি এইরূপে পাওয়া যায়—

চন্দ্রকলা=১৬
রাম=৩—"রাম রামশ্চ রামশ্চ।"

চন্দ্রকলাকে রাম কোলে করিলেন। হইল ৩১৬। ইহার পরে বিধি=১ বাম হইলেন অর্থাৎ বামে গেলেন, হইল ১৩১৬। গ্রন্থ-রচনার এই শকাব্দা, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তার পরে কাল নির্ণয়। কান্ত=ক-অন্ত মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস। কান্ত অনলে পড়িল। অনল=৩। কার্ত্তিক মাসের তিন তারিখ হইল।

কাজেই এই পুস্তকখানির রচনা ১৩১৬ শকের ৩রা কার্ত্তিক তারিখে সমাপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপ সঠিক রচনার কাল দেওয়া পুস্তক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশী নাই। কোন্ গ্রন্থকারের শিবের গীতে মহেন্দ্র-বাবু এই শ্লোক-গুলি পাইয়াছেন জানাইলে ভাল হয়।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকা মিউজিয়ম।

(৪১ খ)

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধি কান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য, পৌষ সংখ্যার "প্রবাসীতে" দুইপ্রকার বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়; কেননা তিনি লিখেন নাই—"বিধি হল্য বাম" এই অংশের তাৎপর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ "কান্ত পড়িল অনলে" এ অংশটুকুও পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর এক কথা, তিনি রাম শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ ১ ধরিয়াছেন। ১ সংখ্যার পরিবর্ত্তে রাম শব্দের ব্যবহার হইয়াছে এরূপ শ্লোকাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রাম শব্দে ৩ সংখ্যাকেই বুঝায়। তাহার প্রমাণ "সংখ্যাকোষ" নামক প্রাচীন কোষগ্রন্থেই রহিয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"ত্রীণি কালাগ্নিভুবন গঙ্গামার্গেশদৃক্‌গুণাঃ।
গ্রীবারেখা কালিদাসকাব্যং শূলশিখাবলিঃ।
সন্ধ্যাঃ পুরঃ পুষ্করাণি রামবিষ্ণুস্মরাভ্রুয়ঃ।"

অর্থাৎ—কাল, অগ্নি, ভুবন, গঙ্গামার্গ, হরচক্ষু, গুণ, গ্রীবারেখা, কালিদাসকাব্য, শূলশিখা, বলি, সন্ধ্যা, পুর, পুষ্কর, রাম, বিষ্ণুস্মর-চরণ ইত্যাদি শব্দে ৩ সংখ্যাকে বুঝায়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন তাহাও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কেননা—তিনি আবার চন্দ্রকলা শব্দে ১ এক সংখ্যাকে বুঝিয়াছেন। শুধু চন্দ্র বলিতে ১ সংখ্যা বুঝায় বটে, 'চন্দ্রকলা' শব্দে ১৬ সংখ্যাই ঠিক। কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে আছে—

"চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।"

সাধারণ কথাতেও লোকে বলে "ষোলকলায় চাঁদ পরিপূর্ণ"। সুতরাং চন্দ্রকলা বলিতে ১৬ সংখ্যাই ধরিতে হইবে। কাব্যতীর্থ মহাশয় বিধি শব্দে ৪ চারি সংখ্যা ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বলিখিত কোষগ্রন্থে বিধি শব্দে চারি সংখ্যা দেখিলাম না। বরং উহাতে 'বিধিমুখ' শব্দে চারি সংখ্যা বুঝায় এইরূপ আছে। মূল শ্লোকটা এই—

"চত্বারি বেদ ব্রহ্মাস্য.....ইত্যাদি।"

"কান্ত পড়িল অনলে" এই অংশের অর্থ কাব্যতীর্থ মহাশয়ও ত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে তাহাই এক্ষণে লিখিতেছি। সঙ্গত হইল কি না তাহা সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন।

চন্দ্রকলা=১৬; রাম=৩। চন্দ্রকলা রামকে কোলে করিতেছে অর্থাৎ ১৬৩ সংখ্যা পাইলাম। "অস্তস্থ বামাগতিঃ" এই সাধারণ বিধিকে প্রতিহত করিবার জন্য কবি বিশেষ বিধি করিলেন এই যে, "বিধি হল্য বাম" অর্থাৎ ঐ ১৬৩ যেন বাম (গতি) বিধি অনুসারেই হইল। সুতরাং পুনর্ব্বার ঐ সংখ্যার বামাবর্ত্তন ঘটিবে না। তৎপরেই কবি বলিতেছেন যে "কান্ত পড়িল অনলে"; কান্ত=স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর ইত্যাদি; সুতরাং কান্ত শব্দের অর্থ ১ এবং অনল শব্দে ৩। কান্ত অর্থাৎ ১ অনলে অর্থাৎ ৩এর মধ্যে গিয়া পড়িল=১+৩=৪। পূর্ব্বে পাইয়াছি ১৬৩ এক্ষণে পাইলাম ৪; অতএব শিবের সঙ্গীত সারা হইবার কাল ১৬৩৪ শক বলিয়াই অনুমিত হয়।

শ্রীটেকিরাম শর্ম্মা।

(৪২)

ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার J. C. Coyajeeর সঙ্গে পরামর্শ করিলে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। বিলাতের "Indian Students' Hostel and Centre"এর খবর লইতে হইলে নিম্নোক্ত ভদ্রলোকের নিকট পত্র লিখিবেন—

K. T. Paul, Esq., O. B. E., Nat'l. Secy., Y. M. C. A.,
5, Russell Street, Calcutta.

আমেরিকা-যাত্রী ছাত্রেরা "Secy. of the Committee on Friendly Relations with Foreign Students"এর কাছে 347, Madison Avenue, New York Cityতে লিখিলেও সুবিধা হইবে।

মহী-দীন-আহম্মদ সিল্‌হেটী ও শ্রীহট্ট শ্রীঅমৃত পালিত।

(৪৮)

হরিশ্চন্দ্র নামক এক রাজা সাভারে (ঢাকা জেলার অন্তর্গত) রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। স্থানীয় মাহিষ্য জাতীয় কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া দাবী করেন।

হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে গুপ্ত রাজাদের মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত স্বর্ণমুদ্রা অনবরত পাওয়া যাইতেছে। এই-সকল মুদ্রার কাল খুব সম্ভবতঃ ৬০০—৮০০ খৃষ্টাব্দ; এই বিষয়ে "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় "মে-আগাষ্ট" ১৯২০ সনের সংখ্যায় আমার বিস্তৃত প্রবন্ধ দেখুন।

সম্প্রতি অতি আশ্চর্য্যজনক উপায়ে সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র নির্ম্মিত এক মঠলিপির শ্লোকাবলির উদ্ধার সাধন হইয়াছে। এই মঠলিপির পাঠ ও অনুবাদ এবং অন্যান্য বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ "ঢাকা রিভিউ"র "সেপ্টেম্বর-অক্টোবর" ১৯২০ সালের সংখ্যায় দেখুন।

এই লিপিতে দেখা যায় হরিশ্চন্দ্র ক্ষিয়ক্-কুল-জাত। বংশধারা—ভীমসেন, তৎপুত্র ধীমন্তসেন, তৎপুত্র রণধীর সেন, তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র মহেন্দ্র। মহেন্দ্র মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতৌ—অর্থাৎ (আমার মতে) মীন=১, অঙ্ক=৯, অদ্রি=৭,—৭৯১ শকাব্দে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মঠলিপির পাঠ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা যদি ঠাল না হয় তবে বলিতে হইবে যে সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্র বৈদ্যবংশীয় ছিলেন।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

(৪৮)

সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পাল (রায়) মাহিষ্য জাতীয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের বর্ত্তমান বংশধর ভরতচন্দ্র রায় সাভারের নিকটবর্ত্তী কোণা গ্রামে বাস করিতেছেন, সুতরাং এ-সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার।

(৫০)

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ সর্‌ফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার মস্‌নদ্ অধিকার করেন। তিনি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত হওয়ার পর কতিপয় আত্মীয়কে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা (হাজি আহম্মদের পুত্র) মোহাম্মদ রেজা খাঁকে নাস্‌রেল মোল্‌ক্ এতেসামদ্দৌলা নোয়াজেস মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুর সেহামত জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করিয়া বাংলা সুবার দেওয়ান এবং চট্টগ্রাম, রৌশনাবাদ এবং শ্রীহট্ট চাকলা সহ জাহাঙ্গীরনগরের নায়েবের পদে নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য যে উল্লিখিত সেহামত জঙ্গ উপাধিটিই বিকৃত হইয়া সমতজানিতে পরিণত হইয়াছে।

রিয়াজ উস-সালাতিন প্রণেতা, মোহাম্মদ রেজা খাঁর উল্লিখিত অতি [illegible] নামটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ড সাহেব [illegible]

The History of Bengal নামক পুস্তকে আলীবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতার নাম কেবল Nuazish Mohammud এবং উপাধি Shehamut Jung লিখিত আছে। উভয় গ্রন্থেই উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনার সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

(৫৮)

"পূর্ব্বমুখো ধর্ম্মকামঃ লোকস্থানিশ্চ দক্ষিণে।"—মৎস্যসূক্তস্তম্ভ ৪২ পটল। "জীবৎপিতৃমাতৃকেতরো দক্ষিণমুখো" ইত্যাদি।—স্মৃতি।

উত্তরমুখে পুত্রবানের আহার নিষেধ বোধহয় জীবৎপিতৃমাতৃক ব্যক্তির আহারবিধির উল্টা ব্যবস্থায় লোকাচারে হইয়াছে। শাস্ত্রে নিষেধ দেখিতে পাইলাম না।

(৬৩)

"সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা, বাদ্যাভাবে নিয়োজয়েৎ।"—স্মৃতি-বচন অনুসারে সকল পূজাতে ঘণ্টা বাজানো হয়; সকল বাদ্যের অভাব ও ত্রুটি এক ঘণ্টা নাড়ায় মোচন হয়। লক্ষ্মীপূজার বিধিনিষেধ মধ্যে দেখা যায়—"ন ঘণ্টাং বাদয়েৎ তত্র, নৈব স্তিষ্টীং প্রদাপয়েৎ।"—তিথিতত্ত্ব। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে, স্কন্দপুরাণে, হরিভক্তিবিলাসে ঘণ্টামাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

(৬৬)

দাবাখেলার ইতিহাস একত্র আমার লেখা "দাবার জন্মকথা" নামক প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ সালের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল। কিম্বদন্তী—যুদ্ধপ্রিয় রাবণকে ক্রীড়া-যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য মন্দোদরী এই খেলা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা গল্প মাত্র। ভবিষ্যপুরাণে চতুরঙ্গ খেলার বিবরণ আছে। এই চতুরঙ্গ নাম কার্সীতে শতরঞ্জ হয়। চতুরঙ্গ খেলা যে ভারতেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একমত। এবং খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে ইহা প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা ইহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবন—প্রাণীহত্যাহীন অহিংসার যুদ্ধ। চীনারা এই খেলার প্রবর্ত্তক বলিয়া দাবী করে। এবং তারা এর উদ্ভাবনের সময় ধ্যায় ১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় চেস্ (chess) শব্দ দ্রষ্টব্য।

(৬৭)

খৃষ্টমাস মানে খৃষ্টজন্মের উৎসব। কিন্তু প্রাচীন প্রমাণ হইতে জানা যায়, এই উৎসব আগে খৃষ্টের দীক্ষা (Baptism) উপলক্ষ্য করিয়া হইত। পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত স্থির ছিল না এই উৎসব কোন্ সময়ে করা হইবে,—কেউ করিত ২৫ ডিসেম্বর, কেউ ৬ই জানুয়ারী, কেউ ২৫এ মার্চ। পরে সকলে স্থির করিয়া লয় যে ২৫ ডিসেম্বরই খৃষ্টদেবের জন্মদিন। কিন্তু এই জন্মদিন সম্বন্ধেও প্রবল মতভেদ প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়—১৯ বা ২০ এপ্রিল, ২০ মে, ১৭ নভেম্বর প্রভৃতি বহু তারিখই খৃষ্টের জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে ২৫এ ডিসেম্বর অখৃষ্টিয়ান পৌত্তলিক ব্রিটনদের এক উৎসব হইত; সেই পৌত্তলিক অখৃষ্টিয়ান উৎসব এখন খৃষ্টিয়ান উৎসবে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্মকে যখন বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টায় রত ছিল, তখন ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তারা পার্লামেণ্টের আইন করিয়া ২৫এ ডিসেম্বর খৃষ্টিয়ানদের উৎসব করা নিষেধ করে। চার্ল্‌স্ দ্বিতীয় এই উৎসব পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু স্কটরা পিউরিটান মত বহুকাল পালন করিয়াছিল।

খৃষ্টদেব ক্রস কাঠে শূলবিদ্ধ হইয়া নিহত হন বা চেরা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের ও খৃষ্টদেবের প্রতীক হইয়া উঠে। ইংরেজী X অক্ষরটি চেরা বা ক্রসের মতন; এইজন্য Christmas শব্দকে সংক্ষিপ্ত করিয়া X'mas করা হইয়াছে।

২৫এ ডিসেম্বর সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত; শীতকালে দিন ছোট হইতে হইতে ২৪এ ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিন হয়, তারপর থেকে দিনমান বড় হইতে থাকে। তাই কলিকাতায় Christmas Eve বা ২৪এ ডিসেম্বর ছোটদিন ও Christmas Day বড়দিন নামে পরিচিত হয়। এখন বড়দিন নাম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে; ছোটদিন তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

(৬৮)

কাক যমদূত প্রাচীন প্রচলিত বিশ্বাস। আহ্নিকাচারতত্ত্বে ও বায়ুপুরাণে কাককে যমদূত মনে করিয়া পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।—

ওঁ কাক ত্বং যমদূতোঽসি, গৃহাণ বলিমুত্তমম্।—হলায়ুধ। শাকুনিকশাস্ত্রে কাকের স্বর শুভ বা অশুভ নিমিত্ত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। বসন্তরাজশকুন নামক শাকুনশাস্ত্রে কাকচরিত্র বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। "করত্যসৌ চৌরভয়ং কুশব্দঃ।" "চৌরাদ্ ভয়ং ব্যাকুলতা চ বহ্বী জায়েত কাচিন্ মহতী চ শঙ্কা।" ইত্যাদি বচনের ভয়েই লোকে কাকের কলরবকে দূর দূর করে।

(৬৯)

লজ্জাবতী-লতার স্নায়ু স্পর্শে সাড়া ভায়; তেঁতুল জাতীয় পাতার গাছ মাত্রই আলোকের অভাবে পত্রদল মুদ্রিত করে। এইসব পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু দেখাইয়াছেন যে লজ্জাবতী প্রভৃতি উদ্ভিদেরও স্নায়ু শিরা পেশী আছে এবং তাদের গঠনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের জন্য কোনো গাছ অল্পে ও কোনো গাছ অধিক উত্তেজনায় সাড়া দিয়া থাকে। এর বিশদ বিবরণ ১৩২০ আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে ৬২৩ পৃষ্ঠায় "উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ" প্রবন্ধে ও ১৩২২ আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে ৭৮২ পৃষ্ঠায় "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" প্রবন্ধে এবং আচার্য্য জগদীশের Living and Non-Living, Plant Response, Comparative Electro-physiology, Researches on Irritability of Plants প্রভৃতি জগদ্‌বিখ্যাত পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

(৭০)

ঘরে ঝুল হয় মাকড়্‌সার জালে ধূলা ও কালির ভুসা পড়িয়া। যে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলে সে ঘরেও মাকড়্‌সা বাস করে ও তাদের ছেঁড়া জালে ধূলা জমে; উনানের ধোঁয়া আসিয়া সেই জালে কয়লার কুচি কালির ভুসা জমায়; তাতে মাকড়্‌সার জাল ক্রমে কালো ঝুল হইয়া উঠে। বহু বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের সাধনা মাসিকপত্রে এ-বিষয়ের আলোচনা হইয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্নি সংস্কার

স্বর্ণ খণ্ড ভস্মিবারে জ্বলন্ত অনল
নাহি পারে, করে তারে নিখাদ উজ্জ্বল।
বিস্মৃত জাতির পরে রূঢ় অত্যাচার
জীবন্ত করিয়া তুলে স্বরূপ তাহার।

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।

দেশের কথা

বাংলা দেশের সবচেয়ে হতভাগ্য জেলা—বাঁকুড়া। দুর্ভিক্ষ এবং অভাবে এ জেলা জর্জ্জরিত। কিন্তু এই বাঁকুড়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি আনন্দের কথা—

বাঁকুড়ায় চাউলের বাজার একটু নরম হইয়াছে। মোটা রাশি নূতন চাউলের মণ ৫।০ টাকা আর নূতন কমলকাটী চাউলের মণ ৬।০ টাকা।
—বাঁকুড়া-দর্পণ।

এ আনন্দ—মেঘে বিজলীর আলোর মত। দেশের খাদ্য-দ্রব্য, প্রয়োজনীয় জিনিস প্রচুরপরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তার একটি নমুনা এই—

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে ভারত হইতে তুলা রপ্তানী হইয়াছে ২১,৬৩০ টন। ঐ সময়ে পূর্ব্ব বৎসরে রপ্তানী হইয়াছিল ৩১,৫৪০ টন।
—বীরভূমবাসী।

তারপর দেশব্যাপী অভাব ও তজ্জনিত রোগ ও লোকক্ষয়ের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। সব সংবাদ আমরা পাই না। তথাপি যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভীতিকর। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে কলিকাতা গেজেটে ১৯২০ সালের জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস অবধি একমাত্র ঢাকা [illegible]য় কতগুলি লোকের অনশনে মৃত্যু হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বাংলার জেলায়-জেলায় গ্রামে-গ্রামে এই দশা। তালিকাটি দেখিলে সব আনন্দ উবিয়া যায়।

জেবা শেখ—বয়স ৮ বৎসর—গ্রাম রাজনগর, ফতুল্লা থানা—কারণ, পিতামাতার রোগহেতু অর্থাভাব ও অনশন। কৈতু শেখ—বয়স ৫ বৎসর—গ্রাম ঐ—কারণ, ঐ। খাশা বিবি—বয়স ৮২ হইতে ৮৫—টাঙ্গিবাড়ী থানা—দারিদ্র্য হেতু আত্মহত্যা। আস্‌মৎ বিবি—বয়স ২৩ বৎসর—গ্রাম কেবার, থানা মুন্সিগঞ্জ—কারণ, দারিদ্র্য এবং রোগ। কিয়ামউদ্দিন কারিকর—৪০ বৎসর—গ্রাম সোয়াদা, থানা শ্রীনগর—কারণ, ঐ। ফুলকুমারী রিশিনি—৫০ বৎসর—কারণ, ঐ। সোনাউল্লা—৩৮ বৎসর—গ্রাম পাড়িল, থানা শ্রীনগর—কারণ, দারিদ্র্যহেতু রোগ। অধর রিশি—৪৫ বৎসর—গ্রাম বগরা, শ্রীনগর থানা—কারণ, অভাবে আত্মহত্যা। পূর্ণ রাজবংশী—৪৫ বৎসর—গ্রাম রায়পুর, থানা টাঙ্গিবাড়ী—কারণ, ঐ।

এই তালিকাই শেষ নয়। দারিদ্র্যে রোগে বাংলার কত সন্তান অকালে মানবলীলা শেষ করিতেছে। আমাদের পল্লীর এই দুর্দ্দশা মোচন করিবে কে?—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মিউনিসিপাল বিভাগ হইতে গত ১৯১৯ সালের জন্ম মৃত্যুর এক তালিকা বাহির হইয়াছে। এই তালিকায় প্রকাশ, গত বৎসরের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা ৩৯৬০০০ বেশী, বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা হাওড়া ও বরাহনগরের মৃত্যুহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে সুখের বিষয় এ বৎসর শিশুমৃত্যুর হার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫৫০০০ কম। কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা ১২৫০০০, বসন্তে ৩৭০০০, আর জ্বরে ১২২৯০০০, সুতরাং জ্বরে মৃত্যুহারই অধিক।
—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

সব দিকেই কষ্ট, সব দিকেই অভাব। বস্ত্র-কষ্টের এখনও উপশম হয় নাই। বিদেশী কাপড়ের একটু দর কমিয়াছে বটে, কিন্তু টাকার মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।—

বোম্বের কাপড়-ব্যবসায়ীগণ গত ১৬ই তারিখে এক সভায় স্থির করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যফলে দেশে অশান্তির উদ্ভব হওয়ার এবং যখন-তখন মুদ্রার মূল্য হ্রাস ও বৃদ্ধি হওয়ায় সহযোগী ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। সুতরাং যতদিন যাবৎ গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার না করেন ততদিন যাবৎ কাপড়-ব্যবসায়ীগণ বিলাতী কিংবা অন্য বিদেশী কাপড় ক্রয় করিবেন না, এবং যাঁহারা ইহা আমদানি করিয়া বিদেশী কাপড় ক্রয় করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন ব্যবসায়ী ভবিষ্যতে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না। দেখা যাউক বোম্বের ব্যবসায়ীগণ ইহার কতটা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।—যশোহর।

এইরূপে সকলদিকে অভাব ও অভিযোগের কথা ছাড়া আমাদের দেশের কথা আর কিছু নাই। শহরে বসিয়া বক্তৃতা ও সভাসমিতি করিয়া দেশের তত উপকার হইবে না যত হইবে দারিদ্র্য-পিষ্ট রোগ-ক্লিষ্ট পল্লীর বুকে গিয়া তার সংস্কার সাধন ও তার মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে। যে পল্লী লইয়া দেশ, সে পল্লীকে না উন্নত করিলে দেশের উন্নতি নাই। পল্লীর অভাব ও বেদনা বুঝিতে হইবে। এজন্য নানা সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন। কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাইয়াছি—

শিক্ষালয়-স্থাপন।—বাংলার একটি পল্লীতে আমরা এক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য শ্মশানতুল্য পল্লীর সংস্কার এবং তথাকার কৃষক, শ্রমজীবী ও শিল্পী সকল সম্প্রদায়ের বালক-গণকে ভারতীয় আদর্শে বিনা আড়ম্বরে আনন্দের সহিত মনুষ্যত্ব-বর্দ্ধক শিক্ষা দেওয়া। এখানে সেবার মধ্য দিয়া শিক্ষাকে সজীব করিবার সাধনা হইবে।

দেশবাসীর নিকট সানুনয় প্রার্থনা সকলে সাহায্যের দ্বারা আমাদের ব্রত সিদ্ধির সহায় হউন।

প্রতিষ্ঠা, ২৪ পরগণা।　　সেবকবৃন্দ।

হিতসাধনমণ্ডলী—রাজনগর পোষ্টাফিসের অধীনে ছোট ছোট ২৪টি গ্রাম নিয়া পাঁচগাঁও পল্লীসমিতি নামে একটি হিতসাধনমণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ জনহিতকর কার্য্যই ইহার উদ্দেশ্য। গ্রামে গ্রামে চরকা বিতরণ, তাঁত স্থাপন ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্মের উৎসাহ সাধন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত পল্লীসমিতিকে ৮টি শাখা সমিতিতে বিভক্ত করিয়া কার্য্যারম্ভ করা গিয়াছে। ইতিমধ্যে ১৫—

২০ দিনের ভিতরে ৭।৮টি জটিল মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে। কয়েকজন উদ্যমশীল যুবক ৪।৫ হাজার টাকা মূলধনে একটি চরকা ও তাঁতের কারবার আরম্ভ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইতিমধ্যে একটি ছেলে এই উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর প্রেরিত হইয়াছে।—জনশক্তি।

এখন বঙ্গদেশে সর্ব্বসুদ্ধ ৫৯৩৭টি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী আছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে দিনদিনই সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক কো-অপারেটিভ সোসাইটীর উন্নতির ফলে দরিদ্র কৃষকগণ অনেকাংশে সুদখোর মহাজনগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।—যশোহর।

আমাদের দেশে যাঁদের টাকা আছে তাঁরা তাঁদের অর্থের যথাযোগ্য সদ্ব্যয় করিলেও দেশের কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু ধনীরা তা করেন না। বিদেশী দানবীরদের কাজ তাঁদের আদর্শ হউক—

দান।—মার্কিণ দেশের ধনকুবের মিঃ জন ডি রকফেলার আজ পর্য্যন্ত যত টাকা দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ প্রায় দেড়লাখ কোটি টাকা। এ বিষয়ে তিনি বিখ্যাত দানবীর কার্ণেজীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত অর্থ দান ব্যাপারে মিঃ রকফেলারকে ছাড়াইয়া উঠিতে আর কোনও ধনী পারেন নাই। শুনা যায় যে তাঁহার মত মিতব্যয়ী লোক নাকি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

—বীরভূমবার্ত্তা।

দেশের অজ্ঞতা দূর করিতে পারিলে দেশের লোক অভাব নিবারণে সক্ষম হইবে। সেইজন্য এখন সবচেয়ে প্রয়োজন হইয়াছে শিক্ষার।

শিক্ষা-বিস্তারের জন্য এবং অভাব মোচনের জন্য যাঁরা নানা সদনুষ্ঠান করিতেছেন তাঁরা দেশের ধন্যবাদের পাত্র—

জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

গণ্টুরে জাতীয় বিদ্যালয়।—গণ্টুর জেলার তেনালী নামক স্থানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত হনুমন্ত রায় নামক জনৈক দাতা ঐ বিদ্যালয়ে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং মাসিক ১০০ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

জাঠ জাতীয় বিদ্যালয়।—রোটারে জাঠ হাই স্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত বালদেও সিং পণ করেন যে, ঐ স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত না করিলে তিনি অন্ন গ্রহণ করিবেন না। তারপর এক সভা করিয়া ঐ বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

নূতন বিদ্যালয়—লাহোরে লালা লাজপত রায় ভারতবাসীদিগকে সম্পাদকের কার্য্য, অর্থনীতি এবং রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য তিলক মহারাজের নামে একটি স্কুল স্থাপন করিতেছেন।—জনশক্তি।

তিলকের স্মৃতি নিদর্শন। স্বর্গীয় বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাজের স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ বোম্বাইয়ের পুণা নগরে "তিলক মহাবিদ্যালয়" নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় তজ্জন্য এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহার শিক্ষাপদ্ধতি স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হইবে, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত ইহার কোনরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিবে না।—প্রতিকার।

তিলক বিদ্যালয়—বিগত ১লা ডিসেম্বর প্রয়াগ এলাহাবাদে সেখানকার নেতৃবর্গের উদ্যোগে তিলক বিদ্যালয় নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী ঐ বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। কাপড়বুনা, সুতাকাটা ইত্যাদি ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।—জনশক্তি।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি-এল, এম-এল-সি, 'ভবানীপুর কটেজ লাইব্রেরীতে' এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—ঢাকা-প্রকাশ।

দান।—হিন্দু সভ্যতার উন্নতিসাধন করিবার অভিপ্রায়ে পদ্মপুকুর নিবাসী ৺মাধবচন্দ্র সিংহের পুত্র বাবু গোপালচন্দ্র সিংহ কৃষি ও ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতার নামে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাসমিতিকে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দান প্রশংসনীয়। অর্থের সদ্ব্যবহার এইরূপ ভাবেই হওয়া উচিত।—বীরভূমবাসী, যশোহর।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত চুনিলাল মল্লিক মহাশয় ২৯নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেছেন। দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এই প্রকার সাহায্য করিলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে।—সম্মিলনী। ঢাকা প্রকাশ।

নৈশ বিদ্যালয়—ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী বাতিসা গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা ৪০ জনেরও অধিক।—ঢাকা-গেজেট।

নৈশ বিদ্যালয়ে দান।—রাজসাহী "সামাজিক সঙ্ঘের" সভ্য নৈশবিদ্যালয়ের আর্থিক অভাবের বিষয় রয়েল বায়স্কোপ'এর কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করায় এই কোম্পানী একরাত্রি বেনিফিট নাইটের লভ্যের অর্দ্ধাংশ সবলগে ৬৪৷৵০ আনা নৈশবিদ্যালয়ের পরিচালক-বর্গের হস্তে ন্যস্ত করিয়া মহানুভবতার পরিচয় প্রদানে উদ্যোক্তৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বায়স্কোপ কোম্পানী এজন্য ধন্যবাদার্হ।

—হিন্দুরঞ্জিকা।

নারী-শিক্ষায় দান—রায় বাহাদুর লালা গঙ্গারাম লাহোরে একখানি প্রকাণ্ড বাটী এবং তৎসংলগ্ন ভূ-সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়াছেন। এই দানের সর্ত্ত হইতেছে এখানে হিন্দু বিধবাদের অবস্থানের জন্য একটি আশ্রম এবং শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রমণী-দিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কুলও থাকা চাই। ইহার সম্পূর্ণ ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে। কেবল মাত্র বিধবাদের আশ্রম এবং বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিদর্শন করিবার জন্য একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত হইবে। শিল্পবিদ্যালয়টিতে হিন্দু এবং শিখ বিধবা ছাড়া আর কাহারও প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। সম্প্রতি আশ্রমে ৮০ জন বিধবার স্থান হইবে এরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। স্কুলে বিধবা ছাড়া সমস্ত জাতির হিন্দু এবং শিখদের বালিকারাও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য প্রবেশ করিতে পারিবে। ধন্য লালা গঙ্গারাম।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

ষাট হাজার টাকা দান। বোম্বাইয়ের "ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউট" সভা মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এজন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৬০ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টও এজন্য বৎসর বৎসর ৫ শত টাকা করিয়া

৮ বৎসরে ৪০০০০ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।—প্রতীকার।

ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন হরিশঙ্করপুরে জগৎচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন্ নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে অত্যল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয়ের হিন্দু এবং মুসলমান বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরীক্ষাদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পুর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ উকিল এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুত বাবু জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই বিদ্যালয়ে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন। সেজন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

—যশোহর।

মাতৃজাতি-সেবক সমিতি—কলিকাতা সহরে কতিপয় সম্ভ্রান্ত বিদুষী মহিলা ও শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন স্বদেশ-সেবকের চেষ্টায় একটি নারী-সমিতি গঠিত হইয়াছে, উদ্দেশ্য মাতৃজাতির ভিতর দেশ সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়া এবং শিল্প ইত্যাদি সকল কার্য্যেরই বিকাশ সাধন করা।—জনশক্তি ও বিজলী।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বিরলা কোম্পানী তাঁহাদের দিল্লীর কাপড়ের কলের লাভের দশমাংশ কলের লোকজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। বঙ্গ দেশে অনেক পাটের কল আছে। তাহাদের লাভও যথেষ্ট। তাহারা বিরলা কোম্পানীর পন্থা অনুসরণ করিতে পারেন না কি?—যশোহর।

বস্ত্র বিতরণ। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য ফরিদপুর জেলা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় কোন কোন কাপড়ের কলের কর্তৃপক্ষের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া উক্ত বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এ ব্যবস্থা অতি উত্তম।

—বীরভূমবার্ত্তা।

সদনুষ্ঠান—ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ময়মনসিংহ হিন্দু হিতৈষিণী সভার সাহায্যার্থ মাসিক ১৫৲ পনর টাকা এবং এককালীন ৫০০ পাঁচশত টাকা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম।—ঢাকা-গেজেট।

বর্ত্তমান শিক্ষা হওয়া চাই বিশেষভাবে কার্য্যকরী। কৃষি, বয়ন এ-সব বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যে-শিক্ষা আমাদের অন্নবস্ত্র দিয়া বাঁচাইতে পারিবে সেই শিক্ষাই এখন আমাদের আগে দরকার।—

কৃষিবিদ্যালয়।—কৃষকসন্তানদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য সরকার চুঁচুড়ায় একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই কৃষিবিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কৃষকসন্তান-দিগকেই শিক্ষা প্রদান করা হইবে। তাহাদিগকে তথায় দুই বৎসর-কাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মান পরীক্ষার জন্য যেরূপ পাঠ্যের ব্যবস্থা আছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেইসকল পুস্তক পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্ত্তমান কালের উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে। ভূমি কর্ষণ, ভূমিতে সার প্রদান, বীজ বপন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহা মেরামত করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু দুই বৎসর কালের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কতটুকু কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহাই ভাবিবার বিষয়।—[illegible]

চরকায় সুতাকাটা।—বালীগঞ্জ ৪৬নং ঝাউতলা রোডের ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল মহিলাদিগকে বিনাব্যয়ে চরকায় সুতাকাটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫ই ডিসেম্বর হইতে শিক্ষাদানকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন তাঁহারা সেক্রেটরীকে পত্র লিখিবেন। —সম্মিলনী।

স্কুলে সুতাকাটা শিক্ষা।—চাঁদপুর ন্যাশনাল স্কুলের কর্তৃপক্ষ সুতা কাটা শিক্ষা দিবার জন্য একটি শ্রেণী খুলিয়াছেন।—সম্মিলনী।

পক্ষী চাষ বা পোল্‌ট্রি ফার্ম্মিং।—পাশ্চাত্য দেশে পক্ষীচাষ সচরাচর কৃষক বালক ও কৃষক-পত্নী দ্বারা পরিচালিত হয় এই বিষয় শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের একটু শিক্ষিত ইংরেজী-পড়া বালকগণ আইসা টুইল্ড, লুইস্, হাম্‌থে, ল্যাঙ্গ, সার্টক্লীফ ওয়েল পাওলেস, এডোয়ার্ড ব্রাউন, লিউয়ার, প্রাইস, রাইস, পেণ্টার, মীচ, কুর্শী, লোয়েস ষ্টনটান, ত্রমহেড, গেট, স্মিথ, প্রভৃতি বিলাতী ও আমেরিকান অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের কৃত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে কোন বিশেষজ্ঞের অধীনে কাজ শিখিলেই ভাল হয়। ৩।৪ হাজার চুনা মুর্গী এক একার জমীতে বেশ রাখা ও উৎপাদন করা যাইতে পারে। বেলে হাল্কা ও শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে পোল্‌ট্রি ফার্ম্ করা কর্ত্তব্য প্রথম শিক্ষানবীশ ১২।১৪টা মুর্গী ও ১টা বা ২টা ভাল তেজস্কর মোরগ লইয়া কাজ আরম্ভ করিবে। "ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের" বিজ্ঞাপনীতে বিলাতী মুর্গী বা "ফাউল কলমে" দেখিলে এ সম্বন্ধে যে আমাদের দেশে একটা বেশ দামী কারবার পরিচালিত হইতেছে তাহা বেশ জানা যায়। যখন আমাদের দেশের মুসলমান ভাইগণ এইসকল বিলাতী মুর্গী দেশী মুর্গীর মত হাটে বাজারে বিক্রয় করিবেন, তখনই বুঝিব যে কুড়ে 'ইন্‌ডোলেণ্ট' 'লেজী' বঙ্গবাসী কিছু কাজের কাজ করিল। এক একার জমীতে এক বৎসর চারিশত মুর্গী স্বচ্ছন্দে রাখা যাইতে পারে, তাহাতে জমি কলুষিত হইয়া সংক্রামক রোগ আনয়নের ভয় থাকে না। এই ব্যবসায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই লাভ ও কৃতকার্য্যতার মূলমন্ত্র বলিয়া জানিবে। এই শিক্ষা দেশে প্রচার করা আমার মুসলমান ভায়েদের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য এবং স্বল্প ব্যয়েই ইহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। আমি আশা করি যে মোস্‌লেম নেতাগণ এদিকে শীঘ্রই দৃষ্টিপাত করিবেন এবং এ-বিষয়ে সুলভ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিবেন। এইরূপ রোজগারের নবপথ উদ্ঘাটিত হইলে আমার মনে হয় যে নিঃস্ব মুসলমান বালক ও বালিকাগণ স্বভাব চরিত্র কলুষিত না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে এবং পিতামাতার গলগ্রহ হইবার শঙ্কা থাকে না। উপরোক্ত চুলাগুলি কিঞ্চিত বড় হইলে একার পিছু ৫০টা করিয়া পৃথক গৃহে রাখাই বিধি। মোরগ ও মুর্গী-গুলিকে লড়াক বা ব্রয়লার broiler হইলেই এবং স্ত্রী ও পুরুষ চিনা যাইলে পৃথক করিবে জনন করাইবে, তাহাতে উর্ব্বর ডিম হইবে। ছানা বা লড়াকগুলিকে বড় বা বুড় পাখীগুলা হইতে স্বতন্ত্র রাখিবে। গৃহ ও বসার স্থান, দাঁড়গুলি পুতিমুক্ত করিবে; পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল প্রত্যহ দিবে, অপরিষ্কার হইলে জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে এবং জলে সামান্য গন্ধক দিবে। ডিমগুলি রোজ তুলিয়া ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবে এবং লোটন ধূলা ও গন্ধী তৈয়ার করিয়া দিবে, মধ্যে মধ্যে পাখীগুলির গায়ে কীটনাশক গুঁড়া মাখাইবে, লিটারগুলা প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে এবং বাসগৃহ হইতে দূরে গর্ত্তে একত্রিত করিবে। এইগুলি খুব ভাল সার। ডেয়ারি ফার্ম্মের সঙ্গে মুর্গীচাষ অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য। মুর্গীগুলি ২ বৎসরের পুরাতন হইলেই বাজারে বা হাটে পাঠাইবে

পাখীদের আবশ্যকমত খাওয়াইবে যাহাতে খাদ্য নষ্ট বা অপচয় না হয়। চকরা বা গম গুঁড়া, মড়ুয়া, কাঙ্গনী ভাত, ডালের খুদ এবং মাছের নাড়ীভুড়ী বা মাংসের বাদরা পরিত্যক্ত অংশগুলি, শুদ্ধ রক্ত, হাড়গুঁড়া, শামুক, গুগলী বা গেঁড়ী, পোকামাকড় প্রচুর খাইতে দিবে। বন্ধ করিয়া পোষা অপেক্ষা অবাধ (Free range) ছাড়া ভাবেই পক্ষী পালন করাই সমীচীন। ডিমগুলি প্রত্যহ সংগ্রহ করিয়া একটি টেষ্টার যন্ত্রের সাহায্যে বাছাই করিবে। উর্ব্বর ডিমগুলি বসাইবার হইলে উত্তম গোল গোল পুষ্টগুলিকে মুর্গীর নীচে বা ইন্‌কুবেটারে বসাইবে। অনুর্ব্বরগুলি হয় রন্ধনশালায় বা হাটে পাঠাইবে। পোল্‌ট্রি ফার্‌মে পাতীহাঁস, রাজহাঁস, খর্‌গোশ, গিনিফাউল, পেরুও রাখা দর্‌কার। সকল পক্ষীগুলিকে স্বতন্ত্র ও পৃথক ঘরে রাখিবে অর্থাৎ এক এক জাতীয় পক্ষী পৃথক পৃথক রাখিবে এবং পাখীগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষী করিয়া কদাচ রাখিবে না। তাহাতে সংক্রামক রোগ আনয়ন করিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। শিক্ষানবীশ "জেনারেল পর্‌পস" (general purpose) জাতীয় পাখী লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ প্লিমকরক্, ওয়ালডোট রেড, আইরল্যাণ্ড রেড এবং অর্পিঙ্গটন জাতীয় মুর্গী লইয়া কাজ করিবে। প্রত্যেক জাতি পৃথক করিয়া রাখিবে যাহাতে সঙ্কট উৎপন্ন না হয়। শিক্ষানবীশ যদি ২।৩টা জাতি একসঙ্গে লইয়া না সাম্‌লাইতে পারে তবে একজাতীয় পক্ষী লইয়া অল্পে অল্পে কাজ আরম্ভ করিবে। এ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে পরিশ্রমী, ধীর, সদাহাসিমুখ, চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান হওয়া চাই এবং সর্ব্বাপেক্ষা "এমানদার" হওয়া দর্‌কার।

অধ্যাপক—প্রকাশচন্দ্র সরকার।
৩১ নং এল্‌গীন রোড, কলিকাতা।
—নবযুগ।

শিক্ষায় উৎসাহ সম্বন্ধে একটি আনন্দপূর্ণ সংবাদ আছে।—

রাজগঞ্জ লাইব্রেরী।—রাজগঞ্জ লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক প্রদত্ত হইবে।

১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ পদক।
বিষয়—হাস্যরসে দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল।

২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পদক।
বিষয়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিরাজবৌ"এর চরিত্র সমালোচনা।

৩। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদক।
বিষয়—পল্লীগ্রামের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।
(কেবল ম্যাট্রিকিউলেসন্ ছাত্রদিগের জন্য)

আগামী ২৯শে ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

—শ্রীবগলাপ্রসন্ন মল্লিক, শ্রীচারুচন্দ্র পাল।
রাজগঞ্জ, শাঁখরাইল পোষ, হাওড়া।

যাঁরা দেশের হিতকামী, শিক্ষাবিস্তার যেমন তাঁদের জীবনের ব্রত হইবে তেমনি তাঁদের আত্মোৎসর্গের ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। এ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি কম প্রাণস্পর্শী নয়। ভারতের রমণীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সমগ্রভাবে জাগিলে ভারতের উন্নতির দিন নিকট হইবে।—

মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিবার জন্য অনেক ভদ্রমহিলা ঢাকা বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিলে ভদ্রমহিলাগণ উৎসাহিত হইয়া জাতীয় ভাণ্ডারে স্বীয় স্বীয় মূল্যবান অলঙ্কার দান করেন। একজন বিধবা মহিলার দিবার কিছুই ছিল না। উক্ত মহিলা মহাত্মাজীকে লক্ষ্য করিয়া খুব স্পষ্টভাবে বলেন, "আমি দরিদ্র বিধবা, আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ ধন যাহারা দেশের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সেইরূপ তিন ছেলেকে দেশের কার্য্যে দান করিয়াছি।" বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া মহাত্মাজী বিচলিত হইয়াছিলেন। এই বিধবা রমণী রাজদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জননী। কবি ঠিকই গাহিয়াছেন, "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" স্বদেশীর যখন প্রথম যুগ, তখন স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের মাতৃদেবীর মুখ হইতে এইরূপ বাণীই উচ্চারিত হইয়াছিল।

—যশোহর।

কিন্তু আমাদের উন্নতির পথে এখনও বাধা বিস্তর। দক্ষিণ ভারতে উন্নতির অন্তরায় অনেক। নিম্নলিখিত সংবাদে কে না মর্ম্মাহত হইবেন?—

মাদ্রাজে জাতিভেদ।—জাতিভেদ ব্যাধি অল্পবিস্তর ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। এই পীড়া কোথাও প্রতি অস্থিতে বর্ত্তমান। এই বিংশ শতাব্দীতেও ভেদজ্ঞানের মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। "সঞ্জীবনীতে" তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা জাতিভেদের নির্ম্মমতার কয়েকটি উদাহরণ "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

১। একজন নীচ জাতীয় ডাক্তার একটা পুকুরের পঞ্চাশ হাত দূরের রাস্তা দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ রোগীকে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন —এতে সেই পুকুরের জল অশুদ্ধ হয়ে গেছে বলে সেই ডাক্তারের নামে নালিশ হয়েছে। তাতে সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা সাক্ষ্য দেবার সময়ে কত রকম মূঢ়তার যে পরিচয় দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই। যেমন, একজন বলেছেন কোন নীচ জাতীয় লোক যদি ধান বপন করে ত তার খড়ে ব্রাহ্মণের ঘরের চাল ছাওয়া হতে পারে না।

২। আমি মাদুরাতে অগ্রহার নামে এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে ছিলুম; সেখানে আমাদের এন্‌ড্রুজ সাহেবের নিজের সমস্ত আচার আচরণ নিয়ে থাকার কোন বাধা হয়নি, কিন্তু নীচ জাতীয় লোকের সেখানে প্রবেশেরও অধিকার নেই। একদিন এন্‌ড্রুজের পরিচিত ওখানকার একটি ভদ্রলোক এন্‌ড্রুজের সঙ্গে আসতে আসতে হঠাৎ ব্রাহ্মণ-পল্লীর কাছাকাছি একটি রাস্তার পিছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল তাঁর ও-পাড়ায় ঢোক্‌বার জো নেই, অথচ কুকুর, বিড়াল, পোকা, মাকড় সর্ব্বদা সেখানে যাতায়াত কর্‌চে, তাতে ব্রাহ্মণ-পল্লীর পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে না।

৩। শুন্‌লুম একদিন এক সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে একজন নীচজাতীয় লোক যাচ্ছিল, এমন সময়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণ-দেবতার অভ্যুদয় ঘটে —আগন্তুকের চেয়ে যতটা তফাতে থাকা উচিত তা আর কোন রকমে ঘটে ওঠে না দেখে অব্রাহ্মণটি পাশের এক ডোবার ভিতরে লাফিয়ে পড়্‌ল। সেখানে কাঁটায় তার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল।

এই দৃষ্টান্তত্রয় হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন মাদ্রাজ অঞ্চলে জাতিভেদের শিকড় কি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে; ভগবানের সৃষ্ট এক সন্তান অন্য সন্তানকে কি কঠোর ভাবে নির্যাতন করিতেছে। কি

ভীষণ কথা! জানিনা ভগবান এত অবিচার অত্যাচার সহিবেন কতদিন। —নমঃশূদ্রসখা।

নিজেদের নানা কুপ্রথায় আমরা নিজেদের পায়ে শিকল বাঁধিয়াছি, আর সেইজন্য সর্ব্বক্ষেত্রে পরাধীনতা আমাদের মাথায় পাহাড়ের মত চাপিয়া আছে। আমাদের মত মূঢ় হতভাগ্য জাতি আর জগতে কোথায় আছে? সুশিক্ষা ও সদ্বিবেচনার দ্বারা আমাদিগকে এইসব সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে। নিজেদের কুপ্রথাসকল ত্যাগ করিয়া মনকে মুক্ত স্বাধীন করিতে পারিলে তবে ত আমরা বাহিরের নির্য্যাতন দূর করিতে সক্ষম হইব। যাহা হউক আমাদের মত অধম জাতির দুই একজনের বীরত্বের কথাও আমাদের কাছে গৌরবের সংবাদ—

পালোয়ানী লড়াই।—জঙ্গীপুর-হিতৈষীতে প্রকাশ গত ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি ৭টার সময় লালগোলায় একটি পালোয়ানী লড়াই হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরের বাঙ্গালী বীর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার মহাশয় পশ্চিম দেশীয় জনৈক বিখ্যাত পালোয়ানকে কুস্তিতে পরাজিত করিয়া লালগোলা কৃষ্ণপুরের বিখ্যাত কুস্তিগীর শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় মহাশয় কর্ত্তৃক ২০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী বীর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মজুমদার বাঙ্গালীর মান রক্ষা করিয়াছেন। —বীরভূমবার্ত্তা।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের প্রবাসীতে ২৬২ পৃষ্ঠায় "দেশের কথা"য় "এছলাম গ্রহণ" বিষয়ে ফরিদপুর জেলার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দত্তের স্ত্রীর সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ ছাপিয়াছিলাম, পরে জানিতে পারিলাম যে তাহা ভুল। এই ভুল প্রচারের জন্য আমরা দুঃখিত। তবে এজন্য আমরা অপেক্ষা যে কাগজ হইতে আমরা সংবাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম সেই কাগজ বিশেষ ভাবে দায়ী।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

ন্যায়ের আসন

হোক্ অত্যাচার যত প্রবল ভীষণ
কাড়িতে নাহিক শক্তি ন্যায়ের আসন।
আবর্জ্জনা গিরি সম হয়ে স্তূপাকার
ঢাকিবে সূর্য্যের রশ্মি কি শক্তি তাহার!

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

ওয়ারেন্ হার্ডিং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সংবাদপত্র সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অধীনে ছোক্‌রা রিপোর্টারেরা কাজ করিতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে বলিতেন। তার মধ্যে দুটি নিয়ম এই—(১) Remember there are two sides to every question. Get them both. (মনে রাখিও প্রত্যেক প্রশ্নের দুটা দিক্ আছে; দুটাই নির্ণয় করিও।) (২) Mistakes are inevitable, but strive for accuracy. (ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভ্রমহীনতার জন্য চেষ্টা করিও।) সংবাদপত্র পরিচালনের এই আদর্শ শ্রেষ্ঠ। আমরা যথাসাধ্য এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করি।

অনেক বৎসর ধরিয়া মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের সমালোচনা করিতেছি। ইহার যাহা ভাল তাহা লিখি, মনেও লিখি। আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও দোষ দেখাইতে গিয়া আমাদের মধ্যে মধ্যে ভুল হয়; তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু যে সব দোষ দেখাইয়াছি, তাহার অধিকাংশেই আমাদের কোন ভুল কেহ দেখাইতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে ভুল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পুনঃপুনঃ এই সমালোচনার কাজে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়টির সংস্কার আবশ্যক, এবং তাহার নিমিত্ত উহার দোষ ত্রুটি দেখান আবশ্যক। আমরা যাহা করি, তাহাতে আরও একটি সুফল এই হয়, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব নিন্দা মুখে মুখে ছড়াইতে থাকে, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট আকারে ছাপিয়া দিয়া আমরা কর্ত্তৃপক্ষদের সুযোগ দিয়া থাকি, এবং তাহার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসম্পৃক্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বসাধারণের নিকট দোষমুক্ত হইবার সুযোগ পান। আমরা সর্ব্বদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত, আমাদের এই অপবাদ কোন কোন লোক দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের এই অপবাদ রটনা হইয়াও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং উহার কর্ম্মীদের কাহারো কাহারো অপবাদক্ষালনের সুবিধা হয়, তাহা বাঞ্ছনীয়। আমরা যাহা লিখি, তাহার তথ্যে (factsএ) ভুল থাকিলে, তাহা সংক্ষেপে দেখাইয়া দিলে আমরা তাহা সকল স্থলেই ছাপিতে চেষ্টা করি; কিন্তু আমাদের মতের দীর্ঘ সমালোচনা (এমন কি সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও) সকল সময় ছাপিবার স্থান ও প্রয়োজন না থাকিতে পারে।

(১)

আমরা নিম্নমুদ্রিত প্রতিবাদটি পাইয়াছি। প্রতিবাদটির নামও প্রতিবাদকারীর প্রদত্ত।

about to unfold the narrative? And yet not a mere conglomeration;—for, as enquiry proceeds, order is educed out of this seeming confusion. This meeting of all religions on the neutral ground of India was not fortuitous, but the result, as we shall see presently, of regular and intelligible mutations in systems, governments, and races.

From this digression, we must revert to the advancing course of discovery. We have seen how General Ventura and Mr. Masson discovered Indo-Scythic coins, under circumstances, which materially aided the progress of research. We have yet to see how Mr. Masson disinterred a series of coins, which illustrated the history of the Graeco-Bactrians, the predecessors of the Indo-Scythians.

About twenty miles east of the modern city of Kabul, there is a level piece of table land, extending over six square miles, called the plain of Beghram. The surface was strewed with fragments of pottery, metals, and sculpture. Here and there arose solitary mounds of stone and brick, which seemed to indicate the remains of human habitations. The happy situation of this plain at a spot where rivers meet, and where the main roads and mountain passes converge from all the four quarters, and the interesting vestiges visible on the surface of the ground—all this would soon shew, even to the casual observer, that here had once existed a great capital. In modern times the plain had become a sheep pasture. A vague avarice induced the shepherds to scratch up the soil in search of treasure. Soon they found seals, rings, bits of metal, and coins in vast quantities. The coins, which were principally copper, they would hawk about the city of Kabul. As these "treasure troves" became frequent, the trade began to thrive. And soon the mint-masters and copper-smiths of the city would repair to the great plain, visit the tents of the shepherds, and purchase the coins by weight. It was estimated, that about thirty thousand coins a year used to be procured in this manner, and melted down. And thus were consigned to indiscriminate destruction, myriads of coins, which the greatest academicians in Europe would have honoured with a place in their cabinets, and which might have told us more about Central Asia than all the histories that ever were written! At last, in July 1833, Mr. Masson, being engaged in searching for the site of one, among the many Alexandrias founded by Alexander the Great, happened to visit this plain. He first met with eighty coins. These specimens appearing to be valuable, he prosecuted the search, until he had amassed upwards of thirty thousand coins, of which the greater part were copper,

কলিকাতা রিভিউর একটি পৃষ্ঠা।

ডাক্তার গৌরাঙ্গনাথের গ্রন্থের অন্যায় সমালোচনা।

গত পৌষের প্রবাসীতে সুশীল-বাবুর গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"কিন্তু অন্য যোগ্য লোকের সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় অক্সফর্ডের অধ্যাপকদের বহিগুলির চেয়ে বেশী পরিমাণে মেকি আমাদের কোন কোন অধ্যাপক চালাইতেছেন। আমরা নাম না করিয়া একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রন্থকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি ও পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক। বিলাতের বিখ্যাত সাপ্তাহিক স্পেক্টেটরের তাঁহার বহির সমালোচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।" ইত্যাদি।

যাঁহার নাম না করিয়া, স্পেক্টেটরে প্রকাশিত তদীয় গ্রন্থের সমা-

CHAPTER IV

COINAGE

SECTION I

First discovery of Greek Coins in Beghram.

ABOUT twenty miles east of the modern city of Kabul, there is a level piece of tableland extending over six square miles, called the plain of Beghram. The surface was strewn over with fragments of pottery, metals and sculptures. Here and there arose solitary mounds of stone and brick, which seemed to indicate the remains of human habitations. The happy situation of this plain at a spot where rivers meet and where the main-roads and mountain passes converge from all the four quarters and the interesting vestiges visible on the surface of the ground—all this would unmistakably show that here had once existed a great capital. In modern times, the plain had become a sheep pasture. A vague avarice prompted the shepherds to scratch up the soil in search of treasure. Soon they found seals, rings, bits of metals and coins in vast quantities. The coins which were principally copper, they would hawk about the city of Kabul. As these "treasure-troves" became frequent, the trade began to thrive. And soon the mint-masters and the copper-smiths of the city repaired to the great plain, visited the tents of the shepherds and purchased the coins by weight. It was estimated that 30,000 coins a year, used to be procured in this manner and melted down. And thus were consigned to indiscriminate destruction,

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির একটি পৃষ্ঠা।

লোচনার প্রশংসাসূচক অংশগুলি বাদ দিয়া কেবল নিন্দাটুকু প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে তাঁহার নাম ও গ্রন্থের নাম প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কারণ, যেমন দুইটি মাত্র কাগজে তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা হইয়াছে, তেমনি তিনি প্রশংসাও পাইয়াছেন প্রচুর এবং ডাক্তার গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Hellenism in Ancient India র অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

বেনামী সমালোচনার মূল্য কতটুকু তাহা পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর মত পণ্ডিতসমাজের পত্রিকায় এইজন্য বেনামী সমালোচনা বাহির হয় না। স্পেক্টেটরের সমালোচক তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্যের এবং যোগ্যতার পরিমাণই বা কি তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই। প্রবাসী-সম্পাদক এই সংবাদটি জানেন কি না জানি না। একখানি কাগজে কোন পুস্তকের নিন্দা হইলেই সেই পুস্তকখানি একেবারে অসার ইহা স্থির করিবার কারণ নাই। যাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না এমন কয়েক ব্যক্তি গৌরাঙ্গ-বাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

অধ্যাপক ফুসে লিখিয়াছেন।—I should congratulate you on the way in which you have considered successively all the possible aspects of your work, on the extent of your researches and of your information in each of your chapters and at length above all on the part of im-

and the remainder silver and gold. From this collection were evolved the annals of Indo-Bactria, and the history of Greek connection with the East.

The Asiatic Society's Journal was the organ through which these results were announced to the public. Mr. Masson himself contributed a great many papers. But the most elaborate analysis was made by James Prinsep.* A great difficulty arose at the outset. The inscriptions on the obverse of the medal were Greek; but, on the reverse, an unknown character presented itself. The first object then was to decypher this character. Mr. Masson had pointed out some Pehlevi signs, which had been found to stand for certain Greek names. "It struck me," writes Mr. Prinsep, "that if the genuine Greek "names were faithfully expressed in the unknown character, a "clue through them might be formed to unravel the value of a "portion of the alphabet, which might, in its turn, be applied to "the translated epithets, and thus lead to a knowledge of the lan"guage employed." This plan was followed out with infinite labour and skill, and met with complete success. This most arduous and valuable service to science was the last, which he lived to perform.† The interest, attaching to these discoveries, was not confined to India. The news spread to Europe, and raised a sensation in the academic circles of London, Paris, Vienna, Gottingen and Bonn. The first great scholar, who took up the subject, was M. Raoul Rochette. He was followed in his own country by M. Jacquet, and in Germany by the Grotefends, Müller, and Arseth. The *Journal des Savans*, the *Journal Asiatique*, the Vienna *Jahi-bucher*, the Gottingen *Anzeigen*, and the Numismatic Journal of London, all vied with the Calcutta Journal in disseminating the results of Mr. Masson's discoveries and Mr. Prinsep's interpretations. For some time, England did less than the other two great European nations, to blazon abroad the exploits of her gifted sons in the East. But at length, in 1841, the appearance of the handsome work, of which the title is prefixed to this article, redeemed the character of the mother country. The celebrity of Professor Wilson's name in the world of Eastern literature, and his long and intimate association with Mr. James Prinsep in the Asiatic Society, give this work a peculiar value. And the Court of Directors have evinced the interest they take in this subject, by bestowing on the publication their pecuniary aid and their influential

* *Vide* Journal of Asiatic Society, Vols I.—VII, *passim.*

† The Arianic alphabet is given in Professor Wilson's work.

কলিকাতা রিভিউর একটি পৃষ্ঠা।

partiality truly scientific with which you have tried to weigh the arguments for and against the Greek influence.

লর্ড হেডেন—Your investigation is both unbiassed and instructive. Your researches afford light on what is an obscure phase in the history of thought.

লীড্‌স্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার—You have taken a wide view of the subject, and your book, apart from its own specific contributions and suggestions directs the students to a large number of valuable authorities.

অক্‌স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ডাক্তার ফার্‌নেল্‌—I have read it with pleasure and profit and deals with questions that I am very interested in ..... It appears to me you have viewed and exposed the facts well and with critical fairness.

HELLENISM IN ANCIENT INDIA

myriads of coins, which the greatest academicians in Europe would have honoured with a place in their cabinets and which might have told us more about Central Asia, than all the histories that ever were written. At last in July 1833, Mr. Masson being engaged in searching for the site of one, among the many "Alexandrias" founded by Alexander the Great, happened to visit this plain. He first met with eighty coins. These specimens appearing to be valuable, he prosecuted the search, until he had got together upwards of 30,000 coins of which the greater part was copper and the remainder silver and gold. From this collection, were evolved the annals of Indo-Bactria and the history of Greek connection with the East. The Asiatic Society's Journal was the organ through which these results were announced to the public. Mr. Masson himself contributed a great many papers. But the most elaborate analysis was made by James Prinsep (vide Journal of the Royal Asiatic Society, vols. I-VII *passim*). A great discrepancy arose at the outset. The inscriptions on the obverse of the medal were Greek, but on the reverse, an unknown character presented itself. The first object was to decipher this character. Mr. Masson had pointed out some Pehlvi signs, which had been found to stand for certain Greek names. "It struck me," wrote Mr. Prinsep, "that if the genuine Greek names were faithfully expressed in unknown character, a clue through them might be formed to unravel the value of a portion of the alphabet, which might in its turn be applied to the translated epithets and thus lead to a knowledge of the language employed." This plan was followed out with infinite labour and skill and met with complete success. The interest attaching to these discoveries was not confined to India. The news spread to Europe and created a sensation in the academic circles of London, Paris, Vienna, Berlin, Gottingen and Bonn. The first great scholar who took up the

122

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির একটি পৃষ্ঠা।

বাহুল্যভয়ে অন্যান্য পণ্ডিতের অভিমত দিলাম না।' আশা করা যাইতে পারে ইঁহারা সকলেই ফরাসী ভাষা জানেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই ডাক্তার গৌরাঙ্গনাথের প্রতি ঐ ভাষায় অজ্ঞ হইয়াও বিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া সাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার অভিযোগ করেন নাই। ইহা প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের নিজের কল্পনা, কারণ স্পেক্টেটরেও এরূপ ইঙ্গিত নাই। স্পেক্টেটরের সমালোচক শেষ প্যারায় যাহা লিখিয়াছেন প্রমাণার্থ উদ্ধৃত করিতেছি। It is the more disagreeable to make such comments on a painstaking little manual because it is evident that its author has not only read all the authorities to which he has had access with industry, but had devoted to his subject much careful thought. He has yet to learn that when an author sends his book to the printer his labour is not accomplished, least of all when he is at the mercy of Indian compositors dealing with languages unkrown to them. ইহা হইতেই প্রতীয়মান

COINAGE.

subject was M. Raol Rochette. He was followed in his own country, by M. Jacquet and in Germany by the Grotefends, Muller and Arseth. The Journal des Savans, the Journal Asiatique, the Vienna Jahr-Bucher, the Vienna Oriental Journal, the Gottingen Anzeigen, and the Numismatic Journal of London, all vied with the Calcutta Journal in disseminating the results of Mr. Masson's discoveries and Mr. Prinsep's interpretations. Prof. Wilson's Ariana Antiqua, and Prof. Von Lassen's Geschichte der Griechischen Konige in Baktrien, Kabul und Indien, gave us learned dissertations on Bactrian and Scythian coinage and thus our knowledge of the early Indian Coinage was first gained.

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির আধটি পৃষ্ঠা।

হইবে যে সমালোচক ফরাসী ভাষায় ভুলগুলি মুদ্রাকরপ্রমাদ বলিয়া মনে করেন। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় এই অংশ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বইখানিকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের সার সংগ্রহ প্রমাণিত করিবার জন্য স্পেক্টেটরের সমালোচনার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার পূর্ব্বে মূল সমালোচনায় ছিল—Mr. Banerjee has read wisely and widely—কিন্তু এই অংশটুকুও প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন যে কোন পণ্ডিত গৌরাঙ্গ-বাবুর নিকট কি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার জানিবার উপায় নাই। সংবাদপত্রে যাহা বাহির হইয়াছে তিনি তাহাই পড়িয়াছেন। অতএব কয়েকটি সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল। বিলাতের টাইম্‌স—An extensive essay embodying considerable learning and research on a subject on which students have held very diverse opinions.—এথিনিয়ম Mr. Banerjee in his excellent book goes carefully into the question.....He does not indulge in rhetoric or generalities, the verdict is built up from considered cases and we feel at the end that he has the true Historical spirit.

ডেলি টেলিগ্রাফ—This is a book of rare quality and distinction a shining credit to the scolarship of the great University from which it is sent out.

আরও অনেক দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রের অভিমত তুলিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জি সম্পাদিত মডার্ণ রিভিউ পত্রেও এই গ্রন্থের সমালোচনা হইয়াছিল—(Modern Review, November, 1919, pp. 516—519)। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়কে তাহাও একবার পড়িয়া দেখিতে বলি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

আমরা পৌষমাসের প্রবাসীতে গৌরাঙ্গ-বাবুর নাম, তাঁহার পুস্তকের নাম, তাঁহার প্রকাশকের নাম, কিম্বা পুস্তকের আলোচ্য বিষয়, কিছুরই উল্লেখ করি নাই। কারণ তাঁহাকে অপদস্থ করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। সুরেন্দ্র-বাবু প্রতিবাদ না করিলে তাঁহার পুস্তকের বিষয়ে সম্ভবতঃ আর কিছু প্রবাসীতে লিখিতাম না। তাঁহার নাম উল্লেখের জন্য তাঁহার পক্ষসমর্থক ও তিনি দায়ী, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

আমরা পৌষ মাসে যাহা লিখিয়াছিলাম, প্রতিবাদকারী তাহাকে "সমালোচনা" বলিয়া ভুল করিয়াছেন। সমালোচনায় দোষগুণ উভয়ই দেখান হয়। কিন্তু সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

কেহ যদি একটা টাকাকে মেকি বলে, তাহা হইলে উহার মধ্যে কিছু দস্তা বা সীসা আছে দেখাইয়া দিলেই তাহার কথা প্রমাণিত হইয়া যায়; ঐ টাকাটাতে রূপা কতটুকু আছে তাহা উহার মেকিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অনাবশ্যক। আমরা বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের কোন কোন অধ্যাপক মেকি চালাইতেছেন। তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা একখানি বহির দোষ ত্রুটিই দেখাইয়াছিলাম, উহার প্রশংসার উল্লেখ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনাবশ্যক বলিয়া প্রশংসার উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু আমরা যে কিছু কিছু বাদ দিয়াছি, তাহার চিহ্নও জায়গায় জায়গায় দিয়াছিলাম। গৌরাঙ্গ-বাবুর প্রতি আমাদের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাবের জন্য কিছু বাদ দি নাই। তাঁহার বহির ভাল সমালোচনা আমাদের ইংরেজী মাসিকে বাহির হইয়াছিল, তাহা সুরেন্দ্র-বাবু নিজেই বলিয়াছেন। ঐ সমালোচনায় আমরা সমালোচক মহাশয়ের মতে কোন

প্রকারে হস্তক্ষেপ করি নাই; তিনি যেমন লিখিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ছাপাইয়াছিলাম।

কোন কোন কাগজ ও ব্যক্তি যে গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার কতটুকু তাঁহার প্রাপ্য ও কতটুকু তাঁহার উত্তমর্ণ লেখকদের প্রাপ্য, পাঠকেরা এই আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া স্থির করিতে পারিবেন।

যে-সব গ্রন্থ ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া থাকে। প্রথম সংস্করণে যদি অপেক্ষাকৃত অল্প বহি ছাপা হয় তাহা হইলেও দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র হয়। তদ্ভিন্ন, প্রথম সংস্করণের দোষ ত্রুটি শীঘ্র সারিয়া লইবার জন্যও দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র বাহির করা দরকার হইতে পারে। গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির কি কি কারণে ২য় সংস্করণ হইয়াছে, জানি না।

সমালোচনা স্বাক্ষরবিহীন বা বেনামী হইলে তাহা মূল্যহীন হয়, এ সংবাদটি আমরা জানি না বটে; কারণ আমরা "পণ্ডিত ব্যক্তি" নহি। তবে ইহা জানি যে, এথীনিয়মের যে সমালোচনা হইতে সুরেন্দ্র-বাবু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার নীচে স্বাক্ষর নাই, কেবল E. M. F. আছে; উহা কি মূল্যহীন? তাহা হইলে উহা হইতে সুরেন্দ্র-বাবু উদ্ধৃত করিলেন কেন? এথীনিয়মের ঐ সংখ্যায় বিস্তর বহির সমালোচনা আছে। একটি ছাড়া কোনটিতেই লেখকের নাম নাই। টাইম্‌সের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রের ১৯২০ সালের ৪ঠা মার্চের সংখ্যায় গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। ঐ সমালোচনায় কাহারও স্বাক্ষর বা নামের আদ্য অক্ষর নাই। বস্তুতঃ ঐ সংখ্যার ১৬টি পৃষ্ঠায় যে বহুসংখ্যক সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার কোনটিই স্বাক্ষরিত নহে। অন্যান্য সংখ্যাতেও এইরূপ স্বাক্ষরবিহীন সমালোচনা থাকে। অথচ টাইম্‌সের সমালোচনা সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকে এবং দেখিতেছি সুরেন্দ্র-বাবুও টাইম্‌সের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির নিন্দা একখানি কাগজে নয়, একাধিক কাগজে হইয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবু অনেক বিদ্বানের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা নানা কারণে উহার প্রশংসা করিয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ, কোন ভদ্রলোককে বহি উপহার দিলে তাহাতে প্রশংসার যোগ্য কিছু থাকিলে তাহারই উল্লেখ করা শিষ্টাচারসম্মত। উপহার যাঁহারা পান, তাঁহারা দোষগুণ সমুদয় দেখান কর্ত্তব্য মনে করেন না। দ্বিতীয়তঃ, গৌরাঙ্গ-বাবুর বহিতে নানা পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে অনেক জিনিষ আহৃত হইয়াছে। এই জিনিষগুলি প্রশংসার যোগ্য। ধার-করা অলঙ্কারের শোভাতেও লোকে মুগ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ, ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ মনে করে, যে, ভারতীয় সভ্যতা খুব বেশী পরিমাণে বিদেশীর কাছে ঋণী। এইরূপ মত কোন ভারতবাসী দ্বারা আংশিক ভাবেও সমর্থিত হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রশংসা স্বভাবতঃই করেন। চতুর্থতঃ, প্রশংসাকারীরা এরূপ সন্দেহ করেন নাই, যে, গৌরাঙ্গ-বাবু কি প্রকারের সাহিত্যিক অধমর্ণ।

আশা করি, সুরেন্দ্র-বাবু সাক্ষাৎভাবে মূল চিঠিগুলি হইতে প্রশংসা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ-বাবু ফ্রেঞ্চ, জার্মেন, গ্রীক ও লাটিন জানেন কি না, জানি না। আমাদের যাহা সন্দেহ হইয়াছিল, আমরা তাহাই লিখিয়াছিলাম। এই সন্দেহ টাইম্‌সেরও হইয়াছে। উহা হইতে গৃহীত নীচের বাক্যগুলি হইতে তাহা দেখা যাইবে।

"One is left, too, with the doubt how far Mr Banerjee himself knows these languages, since the French and German extracts are so full of grotesque misprints and mis-spellings as sometimes to be almost unintelligible ..... There are the same continual mis-spellings of classical names, which throw a doubt on the author's knowledge of Latin or Greek."

যৌবনকাল হইতে আমাদের ছাপাখানার সহিত সম্পর্ক আছে। ছাপাখানার দোষে কোন কোন রকমের বানান ভুল হয় স্বীকার করি; একই রকমের ভুল ক্রমাগত হইলে তাহা লেখকের বলিয়া অনুমান করিবার কারণ হয়। কিন্তু বিস্তর ব্যাকরণের ভুল এবং ঔচিত্যের ভুলও যে ছাপাখানার দোষে হয়, ইহা নূতন শুনিতেছি। গৌরাঙ্গ-বাবুর বহিতে যতরকমের ভুল আছে, তাহা পৌষের প্রবাসীতে উদ্ধৃত স্পেক্টেটরের সমালোচনাংশে পাঠকেরা দেখিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান সংখ্যায় উদ্ধৃত টাইম্‌সের সমালোচনায় আরো বিস্তৃত ও বিশদভাবে লেখা হইয়াছে, পাঠকেরা দেখিবেন।

বহিখানি যে সারসংগ্রহের বেশী কিছু নহে, তাহা টাইম্‌সেও আছে; যথা—

"The book, indeed, so far as we see, does not contain any new and original contribution to the question discussed, any sign of independent research. But although a book which merely sums up and pronounces on the researches and theories of others attempts a humbler task than that of the original researcher," &c.

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ১৯২০ সালের ৪ঠা মার্চের টাইম্‌সের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে (১৫১ পৃষ্ঠায়) গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির সমালোচনা আছে। সুরেন্দ্র-বাবু টাইম্‌সের মত বলিয়া যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঐ সমালোচনায় নাই। উহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণও খুঁজিয়া দেখিবেন, সুরেন্দ্র-বাবুর উদ্ধৃত বাক্যগুলি উহাতে নাই। কোন্ তারিখের টাইম্‌সের কোন্ পৃষ্ঠা হইতে সুরেন্দ্র-বাবু ঐ বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, জানাইলে এবং কাগজখানি আমাদিগকে একবার দেখিতে দিলে বাধিত হইব। টাইম্‌সের সমালোচনা সমগ্র তুলিয়া দিতেছি। প্রশংসা অংশ [redacted] নিন্দাতেই উহার অধিকাংশ পূর্ণ।

an astronomical dissertation treating of five different works known to him on the science of astronomy. He says:—

"There are the following Siddhântas: The Pauliśa, the Romaka, the Vâsiṣṭha, the Saura, and the Paitámaha. Out of these five, the first two (the Pauliśa and Romaka, which appear to have been European treatises) have been explained by Lâṭadeva. The Siddhânta made by Pauliśa is accurate, near to it stands the Siddhánta proclaimed by Romaka; more accurate is the Sávitra (Saura)[1] (*Sūrya Siddhānta*, the *Hindu* standard work); the two remaining ones are far from the truth."[2]

This moderate, and, as it reads, judicial opinion of Varāhamihira, touching the superiority of the native *Sūrya Siddhānta* over the Paulisa and Romaka Siddhāntas, may be appealed to as not

[1] This opinion of Varāha has been confirmed by modern European scholars. Burgess (from whose translations of the *Sūrya Siddhānta* we have already quoted) remarks, "in regard to ... the amount of the annual precession of the equinoxes, the relative size of the sun and moon as compared with the earth, the greatest equation of the centre of the sun, the Hindus are more nearly correct than the Greeks." (*Journal of the American Oriental Society*, vol. vi. p. 480.)

[2] *The Pañchasiddhántiká*. Edited by G. Thibaut, ch. i. § 3.

স্যাকেট সাহেবের বহির একটি পৃষ্ঠা।

HELLENISM AND THE EAST.

Hellenism in Ancient India. By G. N. Banerjee. (Butterworth. 10s. net.)

Defective as has hitherto been the system of education developed under British direction in India, a certain number of Indian scholars have already been produced by the centres of modern learning in that country whose work heralds, one may hope, the day when India will take in the system of international scholarship and research a distinguished part alongside of the great countries of the West. The author of the little book before us is a Lecturer on Ancient History in the University of Calcutta. It is impossible to say that it is a good book as judged by the standard of scholarship in Europe and America [redacted] an interesting product as marking [redacted] teacher to-day has got in the scientific treatment of history. Its faults are faults incidental to youth—whether it be in this case the youth of the author himself or the immaturity of Indian scholarship as a whole.

The question which it treats is one of extreme interest and one which has been the subject of a great deal of controversy—whether Ancient India was influenced in any way by that Greco-Roman world with which it came into contact during the centuries following Alexander the Great, and, if so, in what ways. There are three things which may at once be said in commendation of the book. First, the author seems really to have a considerable acquaintance with what has been written on the subject by Europeans and Indians, and furnishes from those writings data for a

HELLENISM IN ANCIENT INDIA

This high opinion held by the Greeks in regard to Indian Astronomy may be contrasted with the very moderate praise bestowed on the European science by Varâhamihira, the Hindu astronomer. He says: "There are the following Siddhântas, the Paulisa, the Romaka, the Surya and the Paitâmaha, out of these four, the first two, the Paulisa and the Romaka which appear to have been European treatises have been explained by Lâtaveda. The Siddhânta made by Paulisa is accurate, next to it stands the Siddhânta proclaimed by Romaka, more accurate is the Savitra (Surya-Siddhânta, the Hindu standard work) while the remaining two are far from the truth." This moderate but reads, judicious estimate of Varâhamihira, touching the superiority of the native Surya-Siddhânta over the Paulisa and the Romaka Siddhântas—which has been confirmed by modern European scholars—may be appealed to as conveying the impression that when Varâha wrote, his co-religionists and scientists were not accepting wholesale and with avidity, Grecian astronomical methods in place of their own native science. It is true however, that in Varâha's work, many words evidently of Grecian origin are to be met with and some scholars have claimed that "these Greek terms occurring in Varâhamihira's writings are conclusive proofs of the Greek origin of the Hindu Astronomy." That such terms should occur in a work professedly a resumé of five astronomical treatises—some of them Indian and some, European—can scarcely be considered as conclusive proof that in the writer's time no purely Indian astronomical science existed. Varâhamihira's writings suggest an author interested in comparing the points of resemblance and difference to be met with in home and foreign methods rather than one introducing for the first time important astronomical truths to the notice of his readers.

It may further be urged, that the claims to antiquity of

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির একটি পৃষ্ঠা।

well-informed judgment. Secondly, he writes an English almost completely free from the rhetorical floweriness and literary tags which vitiated so much of the English writing of an earlier generation in India. As a trace of the old fault we have only marked the Miltonic tag "the great Emathian conqueror," used twice to denote Alexander. Possibly this might, at a stretch, have been pardonable once, but used twice (p. 3 and p. 27) it is not tolerable. Occasionally he uses phrases which are not English.

Thirdly, on the debatable questions Mr. Banerjee seems to take a very just and reasonable line between the two extremes, that which exaggerates the influence of Hellenism upon India and that which allows practically no influence at all. The motive of the latter view is understandable. At a time when Indians are

conveying the impression that when Varāha wrote his co-religionists and scientists were accepting, wholesale and with avidity, Grecian astronomic methods in place of their own already well-established native science. It is true that in Varāha's work many words evidently of Grecian origin are to be met with; and some scholars have claimed that these "Greek terms occurring in Varāhamihira's writings are conclusive proofs of the Greek origin of Hindu astronomy." That such terms should occur in a work professedly a *resumé* of five astronomic treatises—some of them Indian, and some European—can scarcely be considered as conclusive proof that in the writer's time no purely Indian astronomic science existed. Varāha's writings suggest an author interested in comparing the resemblances and the differences to be met with in home and foreign methods, rather than one introducing for the first time important astronomic truths to the notice of his readers.

It may be further urged that the claims to antiquity in Sanscrit astronomical works are so well known, that those who adopt the Grecian theory must necessarily throw discredit in a very wholesale

হ্যাকেট সাহেবের বহির একটি পৃষ্ঠা।

painfully conscious that their country is in a position of political dependence upon the West they are anxious to make the most of its independence in the sphere of culture. It is, however, no dishonour to any people to borrow in the sphere of culture from another, so long as it makes what it borrows really its own. Many great creative movements in literature and art have owed much at their outset to foreign suggestion—the painting of Italy in the thirteenth century to the Byzantine tradition, English Elizabethan literature to Italian and French models. The broadly human view which sees mankind as one family whose various members communicate their thoughts and discoveries is certainly preferable to the jealous nationalism which treats any idea of a debt owed to another nation as a derogation. What Mr. Banerjee says in criticism of certain of the theories of Mr. Havell and Dr. Coomaraswamy is thoroughly sensible.

The world of classical (Greco-Roman) culture and India touched each other only at their outer fringes and the influence of either upon the other could not in the circumstances of the time have been anything but slight. The invasion of Alexander was too brief an episode to affect by itself the mind of India. By breaking up the smaller principalities in the North-West and substituting for a few years the Macedonian Raj, it did indeed clear the ground for the Mauryan dynasty, and in that way indirectly affected the subsequent course of Indian history. Perhaps the phrase of Niese, which Mr. Banerjee quotes from Mr. Vincent Smith, need mean no more than that. But India continued after Alexander in contact with the

ASTRONOMY

Sanskrit astronomical works are so well-known that those who claim the Grecian origin, must necessarily throw discredit on all ancient authors in general. Bentley's furious diatribes against the credibility of Indian antiquity, cannot, however, be looked upon as convincing argument.

The recent researches of archæologists in Western Asia, have brought to light vast amount of information, concerning the knowledge of astronomy possessed by the inhabitants of Babylonia and Chaldæa in ancient times. In 1874, a paper, entitled "The Astronomy and Astrology of the Babylonians", was read by Professor Sayce before the "Society of Biblical Archæology", and since that date, other papers by various authors dealing with the subject have appeared in the same Society's proceedings. Also in the "Zeitschrift für Assyriologie" articles have been contributed by such eminent writers as Epping, Strassmaier, Oppert, Meyer, Mähler, Jensen, Lehmann and others, in which the calendars and astronomical methods in use in Mesopotamia are discussed. All the informations gained from the cuneiform tablets, concerning the science of Astronomy in Western Asia must undoubtedly influence the judgment of inquirers as to the antiquity of the same science in India.

We will not further pursue the pros and cons of what has hitherto been said on the vexed question, of the originality and antiquity of Astronomy in India. Suffice it to say, that the Hindus did evolve the Science independently, but the 'Scientific' Astronomy of the Indians is partly due to the contact with the Greeks.

This intricate question about the Greek influence on Indian Astronomy has been finally set at rest by the most learned and weighty opinions of Dr. G. Thibaut, the greatest authority on Ancient Indian Astronomy etc., in his "Astronomie, Astrologie und Mathematik", in Bühler-Kielhorn's

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির একটি পৃষ্ঠা।

Greek dynasties established in Afghanistan and suffered occasional inroads by Greek or semi-Hellenized Parthian kings. India was also for the first centuries of the Christian era in commercial contact with the Roman Empire, whose culture was, of course, largely Hellenistic, almost entirely so in its Eastern provinces. There are, however, only two spheres in which modern research has discovered certain evidence of Greek influence in India—in the plastic arts (architecture, sculpture, and coinage) and in the ancient star-lore which combined in one the rudiments of genuine astronomical science and the sham science of astrology. Here there can be no question about the entry of Greek influences into the Indian stream of tradition. On the other hand, the attempt of some nineteenth-century scholars to prov-

no punishment, even if detected in the most flagrant literary impositions." [1]

It is unnecessary now to further pursue the pros and cons of what has hitherto been said and written on the vexed questions as to the originality and antiquity of astronomy in India, and especially as to the Indian acquaintance with the twelve-fold divisions of the Zodiac, and the date of the fixation of the initial point in their Zodiac. We have seen that by the majority the Grecian and modern theory is the favoured one.

Within the last quarter of a century, however, an unexpected reinforcement has come into the field, in aid of the disheartened and nearly silenced minority, who still believe in a great antiquity for the science of astronomy in India.

The researches of archæologists in Western Asia have of late brought to our knowledge vast hoards of information concerning the ancient inhabitants of Babylonia and Assyria, and the surrounding highlands and plains; amongst other matters, concerning the science of astronomy possessed by these peoples.

[1] *A Historical View of the Hindu Astronomy*, etc., p. 181.

H

প্রাপ্তেট সাহেবের বহির একটি পৃষ্ঠা।

that Indian epic poetry was influenced by the Greek epics, or that the Indian drama of the 5th century A. D. was influenced by the Attic comedy of the fourth century B. C., seems to have very little to be said for it and to be generally discredited to-day.

Mr. Banerjee, as has been said, puts forward very sober views on these matters. He has the merit that having stated the various views of a number of former writers, he is himself able to pick up from amongst them the most reasonable view. The book, indeed, so far as we see, does not contain any new and original contribution to the questions discussed, any sign of independent research. But although a book which merely sums up and pronounces on the researches and the theories of others attempts a humbler task than that of the original researcher, it may in its way be good if it is put together by some one with a measure of skill in putting together a book. This art, unhappily, Mr. Banerjee does not seem to possess. The conduct of the argument is muddled and obscure; it is frequently overweighted with irrelevant matter, which seems to have no purpose except to give an impression of the author's learning. Long passages of other writers are thrust bodily into the text in their original languages, French or German. In a work of original research intended for scholars, this might be desirable, but in a book which hardly aims at being more than a popular text book for Indian students few of whom know French or German, it seems an idle parade. One is left, too, with the doubt how far Mr.

102 ASTRONOMY IN THE RIG VEDA [PART I.

In 1874, a Paper entitled *The Astronomy and Astrology of the Babylonians* was read by Professor Sayce before the "Society of Biblical Archæology,' and since that date other Papers, by various authors, dealing with the subject have appeared in the same Society's *Proceedings*. Also in the *Zeitschrift fiir Assyriologie*, articles have been contributed by such writers as Epping and Strassmaier, Oppert, Mayer, Mahler, Jensen, Lehmann, and others, in which the calendars and astronomical methods in use in Mesopotamia are discussed.

প্রাক্কেট সাহেবের বহির আধটি পৃষ্ঠা।

Banerjee himself knows these languages, since the French and German extracts are so full of grotesque mis-prints and mis-spellings as sometimes to be almost unintelligible. The German historian Niese is habitually referred to as Neise. There are the same continual mis-spellings of classical names which throw a doubt on the author's knowledge of Latin or Greek. Dionysius is confused with Dionysus and some mis-spellings like Errythrean Sea and Alexandroy for Alexandrou, occur more than once. Some of the author's allusions to other fields of ancient history seem to indicate that his display of knowledge has inadequate substance behind it. On page 166 he apparently confuses Mithridates the Great of Parthia with the Mithridates who figures prominently in Roman history, and he describes the Sasanian Ardeshir as the renovator of "the Mithraic and Sabean religions"! The Mithraism which flourished in the Roman Empire had very slight connection with Zoroastrianism, and the star-worship of Harran, which later on in the Mahomedan period claimed the name of Sabian (not Sabaean), was something wholly distinct.

The trouble is that while Mr. Banerjee was apparently anxious to fill his pages with as many quotations as possible from works of European scholarship, he suffered, as many of his countrymen do when they refer to European authorities, from a want of perspective. They do not realise that in the field of scholarship, wherever the discussion of a subject and the accumulation of data are progressive, authority belongs only to the most recent investigators. European scholars are not like pundits or rabbis whose dicta have a worth unimpaired by time. No doubt a great deal said by former scholars remains permanently true; but their statements on a particular subject can no longer be taken on trust by the layman, when the knowledge of that subject has been carried further by their successors, they lose their rank as authorities. To Mr. Banerjee apparently all European scholars are on the same plane, any of them may be cited in the present tense: "Colebrooke says," "remarks Professor Max Muller,"[8] etc. Even an argument with regard to the parallel between the Gothic and Hindu days of the week is snipped by Mr. Banerjee's scissors from the pages apparently of Sir William Jones ("the same author points out") and pasted into his book, although the argument is now merely absurd, in view of what is known about the days of the week and their origin. No doubt this want of perspective is largely due to a great disadvantage under which Indian scholarship suffers—its remoteness from European academic society. When the fine brains of India have been directed in larger numbers to scientific scholarship, Indian Universities may have themselves as high a standard of achievement as the great Universities of Europe. But a book like Mr. Banerjee's is even to-day not without its merits and its utility.—*The Times Literary Supplement*, March 4, 1920.

সুরেন্দ্র-বাবু এথীনিয়মের সমালোচনা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও ঠিক্ উদ্ধৃত করেন নাই। ১৯২০ সালের ৪ঠা জুনের এথীনিয়মের সমালোচনায় (৭৩১ পৃঃ) আছে,

".....we feel at the end that though he has not the mental push of Mr. Bentwich, he has more of the historical spirit."

গৌরাঙ্গ-বাবুর mental pushএর অভাবসূচক বাক্যগুলি সুরেন্দ্র-বাবু বেমালুম বাদ দিয়াছেন, এবং "more of the Historical spirit"এর জায়গায় বদ্‌লাইয়া "the true Historical spirit" করিয়াছেন!

ডেলী টেলিগ্রাফের সমালোচনা আমরা দেখি নাই, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, গৌরাঙ্গ-বাবুর গ্রন্থ হইতে অনেক জিনিষ আহৃত হইয়াছে অনেক স্থানে ঋণ স্বীকার করিয়া

করেন নাই, এবং ঋণের চিহ্নমাত্রও রাখেন নাই। সমুদয় ঋণ-অস্বীকার ধরিয়া দিতে হইলে অনেক "গবেষণা" ও প্রবাসীর অনেক পাতা জায়গার দরকার। আমরা কেবল ছটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গৌরাঙ্গ-বাবু যে অধ্যায়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন মুদ্রার কথা লিখিয়াছেন, তাহার প্রথম পরিচ্ছেদটির (section I) সমস্তটি (শেষের কয়েকটি শব্দ ছাড়া) ১৮৫১ সালের Calcutta Review (Vol, XVI)র Indo-Bactrian Numismatics and Greak Connection with the East নামক প্রবন্ধ হইতে ঋণ স্বীকার না করিয়া গৃহীত। তিনি যে অধ্যায়ে ভারতীয় জ্যোতিষের বিষয় লিখিয়াছেন, তাহার নানা অংশ ঈ, এম্. প্লাস্কেট প্রণীত Ancient Calendars and Constellations নামক গ্রন্থ হইতে বিনা স্বীকারে গৃহীত। ঐ পুস্তক দুটির কয়েকটি পাতার এবং গৌরাঙ্গ-বাবুর পুস্তকের কয়েকটি পাতার, ফোটো-গ্রাফিক প্রক্রিয়া দ্বারা, নকল প্রস্তুত করাইয়া ছাপিতেছি। পাঠকগণ মিলাইয়া লইবেন। দেখিতে পাইবেন গৌরাঙ্গ-বাবু নকল করিতেও ভুল করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের অনেক খরচ হইল। সময়, ছাপিবার জায়গা, এবং যথেষ্ট টাকা থাকিলে আরও ঋণ অস্বীকারের সন্ধান ফোটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া দ্বারা দিতে পারিতাম। গৌরাঙ্গ-বাবুর বহিখানির পাতার নকল দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে করাইয়াছি। কারণ, প্রথম প্রথম লোকের দোষত্রুটি হইলেও কালক্রমে অনেকে সুধরাইয়া লয়। কিন্তু গৌরাঙ্গ-বাবু দ্বিতীয় সংস্করণেও পরের দ্রব্য নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। তা ছাড়া, হঠাৎ চোখে পড়িল, যে, ১ম সংস্করণের ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪র্থ ছত্রে ছিল "says Professor Weber"; ইহা দ্বিতীয় সংস্করণে (১৫৯ পৃঃ) নাই। ইহার কারণ কি?

গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধীত বা অধীতব্য পুস্তক, সাময়িক পত্র, প্রভৃতির দীর্ঘ তালিকা আছে। মুদ্রার অধ্যায়ের তালিকায় Calcutta Review-এর নাম নাই। তিনি, পাছে কেহ ঋণ ধরিয়া ফেলে, এই ভয়ে কি উহার উল্লেখ করেন নাই? জ্যোতিষের অধ্যায়ের তালিকায় প্লাস্কেটের Ancient Calendars and Constellationsএর নাম নাই। এখানেও কি ঋণ ধরা পড়িবার ভয়ে এইরূপ করা হইয়াছে?

(২)

গত ১লা পৌষের "হিন্দুস্থানে" বাহির হয়—

ধরা পড়েছে রামদাস।

গুরুতর অভিযোগ

[redacted]বিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-আয়তন হইতে [redacted]য়াছে। খবরটি আমরা যেমন শুনিয়াছি তেমনই

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-আয়তনের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর রামদাস খাঁ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ তিনি অপর গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে চুরি করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সে চুরি এতদিন ধরা পড়ে নাই, আজ ধরা পড়াতেই তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে।

* * * *

অধ্যাপক রামদাস খাঁর পদত্যাগের সংবাদ ছাত্রেরা জানিতে পারিয়া পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের অপর একজন অধ্যাপকের নিকট গিয়া বলে, এ সংবাদ সত্য কি না। তাহাতে অধ্যাপক মহাশয় বলেন,—চুরি করে বই লিখেছে সবাই, ধরা পড়্‌ল রামদাস।

আমরাও এই সংবাদটি শুনিয়াছি, এবং শুনিয়াছি যে ইহা সত্য। হিন্দুস্থানে প্রকাশের পর ইহার কোন প্রতি-বাদ আমাদের চোখে না পড়ায় আমরা ইহা ছাপিলাম। আরও শুনিয়াছি যে রামদাস-বাবুর যে বহি বিশ্ববিদ্যালয় তিন হাজার কপি ছাপিয়াছিলেন তাহার নাম Society in Evolution, vol. I, এবং যে বহিটি হইতে প্রায় অপরিবর্ত্তিত আকারে ঋণ স্বীকার সংগ্রহ করিয়া তিনি উহা লিখিয়াছিলেন তাহার নাম Outlines of Sociology। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, যে, যে-প্রবন্ধটি দেখাইয়া রামদাস-বাবু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পীএইচ্-ডী উপাধি পান তাহা পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগেকার মাইণ্ড (Mind) নামক দার্শনিক পত্রিকা হইতে না বলিয়া গৃহীত। তাঁহার প্রবন্ধটির একখণ্ড যদি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে কয়েক দিনের জন্য দেন, তাহা হইলে কোন্ প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ, তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি। আমরা যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইলে কেহ যেন রামদাস-বাবুর উক্ত বহি একখানা ও প্রবন্ধটি সহ আমাদের ভ্রম দেখাইয়া অনুগৃহীত করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্সের চৌত্রিশ অধ্যায়ে আছে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় ১ম বা ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ যে-কোন গ্রাজুয়েট এম্-এ হইবার অন্যূন তিন বৎসর পরে পীএইচ্-ডী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। রামদাস-বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ নহেন। অথচ তিনি উহার পী-এইচ্-ডী হইয়াছিলেন। ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হইয়াছিল? ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি? অথবা আইনের এরূপ কোন কূট তর্কের প্রসাদে ব্যতিক্রম হইয়াছিল কি, যে, কলিকাতার এম্-এরা হইতে পারে, অন্যেরা যে পারে না, তাহা ত লেখা নাই? যাহাই হউক, ব্যাপারখানা কি, জানিতে কৌতূহল হয়।

(৩)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বাইবেল হইতে চারি-খণ্ড চয়নিকা বাহির করিয়াছেন। প্রবেশিকা হইতে বি[redacted]

পর্য্যন্ত পরীক্ষার জন্য উহার কোন না কোন অংশ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার দুটি অবতরণিকা লিখিয়াছেন পাদ্রি হাউয়েল্‌স্ সাহেব। অমৃতবাজার পত্রিকায় একজন লেখক দেখাইয়াছেন যে পাদ্রি সাহেব তাঁহার অবতরণিকায় অন্য গ্রন্থ হইতে অনেক জিনিষ লইয়াছেন, অথচ ঋণ স্বীকার করেন নাই। ইহার কোন প্রতিবাদ আমাদের চোখে না পড়ায় খবরটি ছাপিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় এই অভিযোগের তদন্ত করিয়া ইহা সত্য না হইলে অমৃতবাজার পত্রিকায় ইহার প্রতিবাদ করুন। অভিযোগ ও প্রমাণ অনেক দিন হইল উক্ত পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

(৪)

কিছুদিন পূর্ব্বে অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্য কয়েকটি কাগজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সী-ভী রামনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত লেখা বাহির হয়। তাহাতে লেখা ছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন ও তাহাতে উক্ত অধ্যাপকের নিয়োগের পূর্ব্বে কলিকাতায় পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণা অজ্ঞাত ছিল। যাঁহারা এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, ঐ কথা মিথ্যা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বহুবৎসর পূর্ব্বে তাড়িত ও আলোক বিজ্ঞানে অনেক আবিষ্কার করেন। প্রমাণার্থ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা এবং অধ্যাপক প্যাট্রিক্ গেডিস্ লিখিত আচার্য্য বসুর জীবনী দেখুন। অধ্যাপক রামনের পক্ষ হইতে মিথ্যা দাবীর প্রচার তিনি কিম্বা তাঁহার কোন বন্ধু বা অনুচর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাঁই ভিন্ন আর কাহারও করিবার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে তদন্ত করিয়া অধ্যাপক রামনের দ্বারা বা অন্য উপায়ে ঐ মিথ্যা সংবাদটির প্রতিবাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ?

(৫)

নৃতত্ত্বে অনভিজ্ঞ নূতন পাশ-করা ডাক্তার অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নৃতত্ত্ব অধ্যাপনার জন্য কেন নিযুক্ত করা হইয়াছিল, আমরা এইরূপ প্রশ্ন করায় একজন প্রতিবাদকারী লিখিয়াছিলেন যে নৃতত্ত্বের ছাত্রদিগকে শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শবব্যবচ্ছেদাগার কোথায়, শব কোথা হইতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। তাহার উত্তর পাওয়া যায় নাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে ও আমেরিকায় চিঠিও লিখিয়াছিলাম, যে, তথায় নৃতত্ত্বের ছাত্রদের জন্যই বিশেষ করিয়া শবব্যবচ্ছেদ শিখাইবার ব্যবস্থা আছে কি না, কিম্বা কেবল এরূপ ছাত্রেরাই নৃতত্ত্ব পড়িতে যায় যাহারা মেডিক্যাল ছাত্ররূপে বা অন্য উপায়ে আগে হইতেই জীবদেহ ও নরদেহ সম্বন্ধে দৈহিক নৃতত্ত্ব শিখিবার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছে; কারণ যাহারা দৈহিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) শিখিতে চায়, ঐ বিষয়গুলির কিছু কিছু তাহাদের অবশ্যজ্ঞাতব্য। বিলাত হইতে আমরা জবাব পাই, যে, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফর্ডে নৃতত্ত্বের ছাত্রদিগকে শবব্যবচ্ছেদ করিতে হয় না; অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সম্ভবতঃ তাই। তবে শরীরের অস্থিগুলির কিছু জ্ঞান থাকা দরকার বলিয়া হাড় লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতে হয়। আমেরিকায় যে বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তিনি তিনজন বিখ্যাত নৃতত্ত্ব-অধ্যাপকের মূল চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক হ্রেলিচ্কা স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশনের দৈহিক নৃতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধায়ক (Curator, Division of Physical Anthropology, Smythsonion Institution, United States National Museum) এবং আমেরিকান্ দৈহিক নৃতত্ত্বপত্রিকার সম্পাদক (Editor of the American Journal of Physical Anthropology), (Prof. A. Hrdlicka) লিখিয়াছেন :—

"The question you ask me in to-day's letter is easily answered—it is not required that students in physical anthropology in our universities do any dissection. But the students should be graduates of medicine or at least advanced students in that branch, so as to be well acquainted with anatomy, physiology and pathology. It would be quite useless for anyone not so prepared to think of becoming efficient in physical anthropology, which is merely an extension of the three branches named above."

আমেরিকার এই আদর্শ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে-সব ছাত্রকে দৈহিক নৃতত্ত্ব শিখাইতে চান, তাঁহাদের ঐ শিক্ষা লাভ করিবার মত প্রারম্ভিক জ্ঞান নাই; আবার, অধ্যাপকও শিক্ষানবীস্। চমৎকার বন্দোবস্ত!

কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপ্রসিদ্ধ জার্মেন নৃতত্ত্ব-অধ্যাপক ফ্রান্‌জ্ বোআস্ (Franz Boas) লিখিয়াছেন :—

"There are very few students of physical anthropology in American Universities. It is, of course, quite necessary that a thorough student of physical anthropology ought to know human anatomy, and that knowledge cannot be attained without practice in anatomical work. There are, however, other aspects of physical anthropology which may be taken hold by people with less anatomical knowledge. It is, however, only too likely that in these cases the biological important points of view may not receive proper attention."

দেখা যাইতেছে, যে, দৈহিক নৃতত্ত্ব শিখাইবার জন্য এরূপ অধ্যাপক চাই যিনি স্বয়ং নৃতত্ত্বেরও শিক্ষা পাইয়াছেন এবং এনাটমী, ফিজিয়লজী এবং প্যাথলজীতেও শিক্ষা

পাইয়াছেন। এরূপ অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়জন আছেন? একজনও আছেন কি? ছাত্রদেরও শিখিবার যোগ্যতা যে নাই, তাহা আগেই দেখাইয়াছি।

কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও এক্ষণে সামাজিক গবেষণার নূতন বিদ্যালয়ের (The New School for Social Researchএর) অধ্যাপক, এবং "সভ্যতার ভিত্তি" ("The Groundwork of Civilisation") নামক গ্রন্থের লেখক এ,এ, গোল্ডেন্‌ভাইসেন্ (A. A. Goldenweisen) লিখিয়াছেন :—

"Physical Anthropology is taught very little in this country, and where it is, as at Harvard, a little at California, &c.—there is no requirement of dissection. You see there is really no systematic training in physical anthropology anywhere in this country. This, of course, would really require the training of a biologist, including dissection, microscopic work, etc. On the other hand, some of our physical anthropologists are really physicians by early training or at least biologists, such as Hrdlicka or Sullivan."

(৬)

স্বর্গীয় অধ্যাপক বিপিনবিহারী সেন যেমন পণ্ডিত ছিলেন, ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া পড়াইবার ক্ষমতাও তাঁহার তেমনি ছিল। ছাত্রদিগকে সুপরামর্শ দিয়া, বহি দিয়া ও অর্থ দিয়া তিনি সাহায্য করিতেন। এই জন্য ছাত্রেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত ও ভাল বাসিত। অল্প দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার জায়গায় একজন মান্দ্রাজী ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা জানিতে চাই, যে, কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কি না; হইয়া থাকিলে অন্যান্য পদপ্রার্থী কাঁহারা ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতর বাঙালী ছিলেন কি না; এবং যদি কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া না হইয়া থাকে, ত, কেন হয় নাই।

যোগ্য বাঙালীকে নিযুক্ত করিতে বলিবার কারণ, এই যে, ছাত্রেরা সব বা প্রায় সব বাঙালী, সুতরাং যে-সব অধ্যাপকের মাতৃভাষা বাংলা তাঁহাদের নিকট হইতে বাঙালী ছাত্রদের এবং বাংলা সাহিত্যের বেশী উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ঐতিহাসিক গবেষণায় বাঙালীদের কৃতিত্ব অন্য কোন প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম নয়। অধ্যাপকেরা কেবল যে ক্লাসে পড়াইয়াই কাজ করেন, তাহা নয়; বাড়ীতেও ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়া এবং শিক্ষিত-সাধারণের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করেন। তখন জ্ঞান, চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান অনেকটা মাতৃভাষার সাহায্যে হয়। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে বাঙালীর মানসিক জীবন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট হয়। যাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাঁহাদের দ্বারা এই কাজ হইতে পারে না। পরে বাংলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন হইবার সম্ভাবনা আছে। তখন বাঙালী অধ্যাপকের প্রয়োজন ও উপযোগিতা অধিক উপলব্ধ হইবে। এই জন্য আমরা যোগ্য বাঙালীকে নিযুক্ত করিতে বলি, অযোগ্যকে নহে। তবে যদি বাঙালীর মধ্যে যোগ্য কেহ না থাকেন, কিম্বা অবাঙালী কেহ নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে এবং মৌলিক গবেষণা দ্বারা অতিযোগ্য ও যোগ্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিযুক্ত করা উচিত। ইতিহাসের অধ্যাপক নিয়োগ এই নিয়ম অনুসারে হইয়াছে কি?

দর্শন-অধ্যাপকের পদে অপর একজন মান্দ্রাজীর নিয়োগের কথা পৌষের কাগজে লিখিয়াছি। তদ্বিষয়ে আলোচনা পরে করিব।

(৭)

যে ইংরেজী বাইবেলের চলন খুব বেশী এবং ইংরেজরা যাহার ইংরেজীর খুব প্রশংসা করেন, তাহা তিনশত বৎসরেরও পূর্ব্বে হিব্রু ও গ্রীকভাষা হইতে অনুবাদিত হয়। তাহার ইংরেজী সেই জন্য ঠিক চলিত ইংরেজীর মত নহে। অনেক শিক্ষিত ইংরেজ বলেন, যে, আমাদের ছেলেরা যে আজকালকার ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে ভাল করিয়া শিখে না, তাহার একটা কারণ এই, যে, তাহারা প্রধানতঃ আগেকার লেখকদের বহি হইতে কেতাবী ইংরেজী শিখে, প্রধানতঃ বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা পড়ে না। এইজন্য তাঁহারা, প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার্থীদিগকে, এমন কি বি-এ পরীক্ষার্থীদিগকেও পুরাতন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পড়িতে দিতে নারাজ। বি-এতেও তাঁহারা মিল্টন্, শেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, বেকন, প্রভৃতি পড়াইতে দিতে চান না। অবশ্য তাঁহাদের অন্য মতলবও থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট এবং পাস্ বি-এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত একমত। ইংরেজীতে কতকটা দখল জন্মিলে তবে এইসব ক্লাসের ছেলেদিগকে পুরাতন ইংরেজী পড়ান উচিত। এই হেতু ইংরেজী শিখাইবার জন্য এইসব ছেলেকে বাইবেল পড়ান উচিত নয়; কারণ উহা তিনশত বৎসরেরও আগেকার ইংরেজী। তজ্জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই পরীক্ষায় এবং পাস্ বি-এ জন্য বাইবেল পড়াইবার বিরোধী।

ধর্ম্মনীতি শিখাইবার জন্য হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ছেলে-দিগকে বাইবেলের কোন কোন অংশ পড়াইবার বিরোধী আমরা নহি। কিন্তু যাহাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের নিজের নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে বাধ্য করেন না, তাহাদিগকে প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্য্যন্ত বাইবেল পড়িতে বাধ্য করেন, ইহা বড় অদ্ভুত ও অসঙ্গত ব্যবস্থা। ধর্ম্মনীতি শিখাইতে হইলে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে

নির্ব্বাচিত চারিত্রিক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে বরং তাহা সমর্থনযোগ্য হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বাইবেলের যে চয়নিকা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে কেবল যে ধর্ম্মনীতির উপদেশ আছে তাহা নয়, এমন সব ধর্ম্মমত নিহিত আছে যাহা হিন্দু বা মুসলমান বা বৌদ্ধ বা ব্রাহ্ম, কোন না কোন সম্প্রদায় বা সকলেই ভ্রান্ত মনে করেন। সুতরাং এরূপ বহি ঐসব ধর্ম্মাবলম্বী ছেলেদিগকে কিনিতে ও পড়িতে বাধ্য করা অনুচিত। দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই, প্রয়োজনও হয় ত নাই। প্রয়োজন হইলে পরে দিব।

ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেলে লিখিত বিষয়ের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ উল্লেখ (allusions) অনেক আছে। তজ্জন্য বাইবেল জানা থাকিলে ইংরেজী সাহিত্য পড়িবার সুবিধা হয়। কিন্তু তাহার নিমিত্ত সমগ্র বাইবেল পড়া দরকার। উহা অগ্রসর ছাত্রেরা স্বয়ং পড়িবে। তা ছাড়া, ইংরেজী সাহিত্যে গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক বিষয়ের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ উল্লেখও বিস্তর আছে। এইরূপ উল্লেখ বুঝিবার জন্য যদি বাইবেলকে পাঠ্য করিতে হয়, তাহা হইলে গ্রীক ও রোমান পুরাণাবলীকেও পাঠ্য করিতে হয়।

ইহাও ঠিক্ যে ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্য যে-দুটি প্রভাব দ্বারা অনেকটা গঠিত হইয়াছে তাহা গ্রীস ও ইটালী এবং জুডিয়ার সাহিত্য ও সভ্যতা হইতে আগত। সুতরাং ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যকে মর্ম্মজ্ঞের মত করিয়া দার্শনিক ভাবে বুঝিতে হইলে গ্রীক ও রোমান পুরাণাদি এবং বাইবেলের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কিন্তু এরূপ বুঝা ত স্কুলকলেজের ছেলেদের কর্ম্ম নয়; গ্রাজুয়েট হইয়া বরং তাহারা বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে। এবং হইলে শুধু বাইবেল নয়, গ্রীক্ রোমান পুরাণও অধীতব্য।

তারপর একটা প্রধান কথা এই, যে, ছেলেদের কোন্ দেশের সভ্যতাকে আগে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত? নিশ্চয়ই নিজের দেশের। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় মিশ্র-সভ্যতার উৎস হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ ও মত, এবং তাহাদের ইতিহাস পড়াইবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া বাইবেলটিই পড়াইবার ব্যবস্থা কেন করিলেন? ইহা কিরূপ অসাম্প্রদায়িকতা?

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাইবেল পড়াইয়া সন্তুষ্ট নহেন। বাইবেল খুব সস্তায় পাওয়া যায়, ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট অংশগুলি তাহা হইতে পড়িতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হাউয়েল্ সাহেবের লেখা অবতরণিকা দুইটিও ছাত্রদিগকে পড়িতে বাধ্য করিয়াছেন ও তজ্জন্য গত ২২শে ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে নোটিস্‌ও বাহির হইয়াছে। সুতরাং এখন বাইবেল-চয়নিকা না কিনিয়া আর উপায় নাই। হাউয়েল সাহেবের অবতরণিকা গোঁড়া খৃষ্টিয়ানের মতের অবিরোধী ভাবে লেখা; অথচ এখন ইউরোপ-আমেরিকার সব অখৃষ্টিয়ান্ নয়, অনেক উদারমতাবলম্বী খৃষ্টিয়ানও বাইবেল সম্বন্ধে "উচ্চতর সমালোচনা" (Higher criticism) সম্বন্ধে মতের সমর্থন করেন। এস্থলে ওরূপ অবতরণিকা ছেলেদিগকে পড়িতে বাধ্য করা কি উচিত?

বিস্তৃততম জ্ঞানের আদর্শ সম্মুখে রাখিলে সব জ্ঞানই দরকার; কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে জ্ঞানের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্রয়োজন আছে। এই-কথা মনে রাখিয়া শিক্ষিত লোকেরা বলুন হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মুসলমান ইণ্টারমীডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা কি একান্ত দরকার?

I. A. & I. Sc. Examinations.

(*a*) General Outline of Bible History.

(*b*) Descriptions and Explanations of the books from which the prescribed extracts are taken.

(*c*) History of the English Bible.

B. A. Examination.

Candidates for the B.A. Examination in English will be expected to possess a general knowledge of the literature of the Old Testament (or the New Testament as the case may be) with special reference to the books from which the prescribed texts are taken.

এইসব জিনিষ হাউএল্সের অবতরণিকাদ্বয়ে আছে।

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান ছাত্রেরা নিজের নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের বিবরণ ও ইতিহাস জানে কি না, সে দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু পুরাতন ও নূতন বাইবেলের সব খুঁটিনাটি তাদের জানা চাই! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার দরকার খুব আছে জানি। কিন্তু হিন্দুমুসলমানাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধে বহি লিখাইয়া ও উহা হিন্দুমুসলমানাদি ছাত্রদিগকে পড়িতে বাধ্য করিয়া, এবং তদনন্তর না হয় তাহাদিগকে অধিকন্তু বাইবেলের ইতিহাস পড়াইলেও, ঢের টাকা পাওয়া যাইতে পারিত।

(৮)

গরীবের কথা যদিও সব সময় মিষ্টি লাগে না, কিন্তু বাসি হ'লে কাজে লাগে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হওয়া উচিত। যখন গত এপ্রিল মাসে উহার রেজিষ্ট্রারকে মিনিট্‌সের জন্য চিঠি লিখিয়া জবাব পাই, যে, মিনিট্‌স্ ফেলোদের জন্য, সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে, তখন আমরা মডার্ণরিভিউয়ে লিখিয়াছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের একটা সংবাদপত্র বাহির করুন না? "Why cannot a Calcutta University Bulletin or a Calcutta University Gazette be published, containing the Minutes and other information and sold for a price?" (*The Modern Review*, May 1920, p. 590.) এত দিনে

ঐরূপ কিছু করা স্থির হইয়াছে। আশু-বাবু কিন্তু এমনি চাতুরীর সহিত কথা বলিয়াছেন যেন কাজটা বিশ্ববিদ্যালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিতেছেন। অথচ গত শনিবারের সেনেট সভায় এ-বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি অপরকে গালাগালি দিতেও ছাড়েন নাই। তাহার একটা নমুনা দিতেছি।

"Indeed one might imagine this was an age in which some people made their living by the manufacture of untruths and half-truths."

তথ্য-ও-যুক্তি-মূলক কোন উত্তর না থাকিলে গালাগালি দিবার একটা অশিষ্ট রীতি প্রচলিত আছে বটে। কিন্তু এই রীতির অনুসরণ যাহারা করে, তাহারা নিতান্তই কৃপাপাত্র। যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যিক অসাধুতার প্রশ্রয়দাতা হইবেন কি না, আশা করি তাহার পূরা সত্য সংবাদ "University Notes and News"এ পাওয়া যাইবে।

(৯)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার অঙ্গীভূত ইস্কুলগুলির নিকট হইতে যে একশত টাকা করিয়া বার্ষিক ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন, আমরা অবগত হইলাম, যে, অনেক ভাল আইনজ্ঞের মতে তাহা আইনসঙ্গত নহে। দুই চারিটি ইস্কুল ইহা দিতে অস্বীকার করিয়া, তাহার পর আবশ্যকমত আদালতে গেলে ভাল হয়।

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যায়

উষার চেতনা মরে নাই,—
ছোটে সন্ধ্যাবেলার বাতাসে ;
দিনের বেদনা ঝরে নাই,—
ফোটে রক্তের দাগে আকাশে।

বিনাশে বিকাশ হরে নাই,—
আছে তৃষিত নদীর তীরে সে ;
জীবন-ঝঞ্ঝা জরে নাই,—
সাজে জরার শুভ্র শিরে সে।

কণ্ঠ যে রসে ভরে নাই—
বহে আজিও দুকূল ভাঙ্গিয়া ;
বুকে যে বাসনা ধরে নাই—
রহে সাঁঝে সে আকাশ রাঙ্গিয়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কষ্টিপাথর

বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ জিনিষটা দোষের নহে। এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়াই সকল রকমের মঙ্গল সাধিত হয়। জাতি যখন অন্যায় ও মূর্খতার বিরুদ্ধে কথা কহিতে ভুলিয়া যায়, তখনই তাহার পতন আরম্ভ হয়।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে যে অন্যায় দেখিয়াছিলেন, তাহা যদি ভালমানুষের মত তিনি মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের কোন সার্থকতা রহিত না।

স্বাধীনতার অর্থ কি ?—অন্যায় ও অসত্য দেখিয়া কথা বলিবার অধিকারের নাম স্বাধীনতা।

যে বিদ্রোহী হয়, তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইও না।—তাহার মধ্যে কোন সত্য আছে কি না, চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

পিতার অসত্যকে সমর্থন করাই যদি পিতৃভক্তির নিদর্শন হয়, তবে সে পিতৃভক্তিতে কেহ বেহেশ্‌তে যাইবে না।

জগতে যে-সমস্ত বড় কাজ হইয়াছে, তাহা প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে একটা কঠিন বিদ্রোহের ফল।

সমাজের অন্যায় ও ভুলকে ভালমানুষের মত মাথা পাতিয়া লও, প্রভু যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার কর,—তোমার প্রশংসা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এই প্রশংসার লোভ করিয়া তোমার জীবনকে মিথ্যা করিয়া দিও না,—সমাজ ও জাতির ক্রোধ-ভয়ে মৌন রহিয়া তাহাদের অকল্যাণ করিও না।

তোমার পাপ ও ভুলকে সর্ব্বদা স্তাবকের নম্রতায় সুন্দর বলিয়া ঘোষণা করিলাম, ইহাতে কি তোমার প্রকৃত কল্যাণ করা হইল ? আমাকে দুষ্ট জানিয়াও তুমি আমার পদধূলি মাথায় লইয়া নিজেকে কৃতার্থ করিলে—ইহাতে কি লাভ হইল ?—তোমার আমার উভয়েরই ইহাতে ক্ষতি।

অতিরিক্ত শিষ্টাচারের ফলে সমাজের অধঃপতন ঘটে। নামের সহিত বৃথা বহু বিশেষণ, অতিরিক্ত বিনয় নম্র ব্যবহার, পরস্পরকে মহারাজ আখ্যা প্রদান করায় জাতির চৈতন্য লোপ হয়। সে নেশাখোরের মত মনের ভুল বুঝিতে পারে না।

সামাজিক জীবনে সর্ব্বত্রই একটা দারুণ বিদ্রোহের আবশ্যক। বিদ্রোহের অর্থ সব সময়ে অস্বীকার, নিষ্ঠুরতা, বা অবজ্ঞা নহে।

সত্য ও ভালোর জন্য যে বিদ্রোহ, তাহা মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ দান।

বিদ্রোহী অবুঝ মানুষের কঠিন আঘাত বুক পাতিয়া লয়, তবুও অসত্যকে অবলম্বন করে না। সত্যকে বরণ করিতে যাইয়া কত মহামানুষ বেদনা ভোগ করিয়াছেন।

সুখ ও শান্তি কোথায় ? অসত্য ও পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া।

(সওগাত, কার্ত্তিক) মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান।

আলোচনা

হাতল কাঁকড়া

গত পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে "কাঁকড়া" প্রবন্ধে লেখক যেরূপ কাঁকড়াকে 'হাতল কাঁকড়া' বলিয়াছেন, সেইরূপ কাঁকড়া সুন্দরবনে সমুদ্রতীরে প্রচুর দেখা যায় এবং সুন্দরবনের আবাদে উহারা 'ঘোঘ' নামে পরিচিত। সুন্দরবনের চাষীরা ঘোঘ বাতের ঔষধ বলিয়া খায়।

শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।

"ভূতের থুথু"।

এই লালা শুধু এক speciesর পোকা হইতে নির্গত হয় না। সমগ্র পৃথিবীতে, এ পর্য্যন্ত ৩৫৯ speciesর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যারা ওইরূপ লালা নিঃসৃত করে। ইহারা ৫০টি Generaর বিভক্ত। ভারতবর্ষে, তন্মধ্যে কেবল মাত্র ১১টি Generaর, ও ৪০টি speciesর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের বংশের (Family) বৈজ্ঞানিক নাম—CERCOPIDAE, SUB-FAM.—APHROPHORINAE ; ORDER—RHYNCHOTA.

David Sharpর পুস্তকে এই জাতীয় কীটের আরও অদ্ভুত আচরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

" * * * Some of the Insects do not use their fluid in this manner, but eject it in the form of drops, and sometimes cast them to a considerable distance. The phenomena known as weeping-trees are due to Cercopidae ; some of the species make such exudations of this kind that the drops have been compared to a shower of rain. In Madagascar it is said that *Ptyelus goudoti* exudes so much fluid that five or six dozen larvae would about fill quart vessel in an hour and a half. * * * * * In Ceylon the larva of *Machaerota guttigera* constructs tubes fixed to the twigs of the tulip-tree, and from the tube water is exuded drop by drop.

* * *

শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নরবলি।

শ্রীযুক্ত খাদেমল-এছ্লাম সুন্নত প্রথার মূলে যে নরবলির ধারণা বর্ত্তমান তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সুন্নত-প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এখনও একমত হইতে পারেন নাই। হওয়া সম্ভবও নহে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে, কালে, ও সমাজে ইহার উৎপত্তি ও প্রচলন একই ভাবে হয় নাই ইহা নিশ্চিত। আমার বিবেচনায় ফরাসী পণ্ডিত Lagrange তাঁহার Etudes sur les religions Semitiques নামক গ্রন্থে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই অপেক্ষাকৃত সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং উক্ত প্রবন্ধে তাহাই লিখিয়াছিলাম। এ সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত অমূলক নহে তাহা Hastings কৃত Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. III, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, এবং Westermarck প্রণীত Origin and Developement of Moral Ideas নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। তুলনামূলক নৃতত্ত্ব আলোচনায় সকল সময়ে ধর্ম্মপুস্তকের মত শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা মাসিক পত্রের স্তম্ভে হওয়া সমীচীন নহে। মৌলবি সাহেব যদি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিলে বাধিত হইব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যার ২৪৪ পৃঃ ৪র্থ লাইন 'তারপর তাতে ফুঁ দিয়া দিয়া' স্থলে 'তারপর গুহদ্বার সিঁদাই' হইবে।

বুদ্ধ-বরণ

(কলিকাতা-নগরে শ্রীধর্ম্মরাজিক-চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-স্থাপন উপলক্ষে রচিত।)

দাও ধুয়ে পথ নগর-বাসী আনন্দাশ্রু-ধারে,
বুদ্ধদেবের বিভূতি আজ এই নগরের দ্বারে!
আড়াই হাজার বছর আগে সেই যে রাজার ছেলে—
বিশ্ব-জীবের ব্যথার ব্যথী—সোনার রাজ্য ফেলে
বেরিয়ে গেছে ফকীর-বেশে ছাই দিয়ে সংসারে
চিন্তা-মণির অন্বেষণে ; কৃচ্ছ্র তপের পারে—
পেয়েছে যে পরম-নিধি, শান্তি-সুধা-বারি,
রিক্ত হ'য়ে পূর্ণ হ'ল যার হৃদয়ের ঝারি,
সম্বোধি যার পরশ-পাথর কাঁচকে করে সোনা,
যার আঁখি-ছায় নিখিল হিয়ার নিত্য আনাগোনা,
মৈত্রী-মধুর করুণা যার জুড়ায় হাহাকারে,—
জগৎ ঘুরে সেই এসেছে এই নগরের দ্বারে!

শুদ্ধোদনের শুদ্ধ কুলে মায়াদেবীর কোলে
জন্মেছে যে জম্বুদ্বীপে আনন্দ-হিন্দোলে,
কীর্ত্তি যাহার গগন ছাপায় নিখিল-ভুবন ভরি,
সৈন্য বিনা জয় করে যে, শাক্য-কুলের হরি,
মহাপ্রজাবতীর দুলাল সেই যে মহাপ্রজা
ছয় রিপুরে জয় ক'রে যে উড়ায় কাষায় ধ্বজা,
যজ্ঞশালার বিড়ম্বনায় বলিপশুর হাটে
কুণ্ঠিত প্রাণ সহজ হ'ল যাহার শান্তি পাঠে,
বারাণসীর শ্রুতির টোলে উদাত্ত যার স্বরে
'ধর্ম্ম' হ'ল উদ্বোধিত যজ্ঞ-বেদীর পরে,
নগ্ন শ্রমণকের মেলায় ভব্য ছবি যার
দিগম্বরে শ্বেতাম্বরী ফরুলে বারম্বার,
মগধ-পতি নমে যারে তাপন-গেহ থেকে,
কোশল-পতি চরণ চুমে ছত্র চামর রেখে,
সেই এসেছে দ্বারে তোমার আজ বিভূতির বেশে,
বরণ ক'রে নাও গো তারে পর্য্যটনের শেষে।

উদ্ভবে যার লুম্বিনী বন মর্ত্ত্যে স্বতন্তরা
—জেরুজালেম্-বেথ্‌লেহেমের অগ্র-সহোদরা,—

অক্রোধে ক্রোধ জিন্‌লে যেজন বিজন মৃগদাবে,
ভারত হ'ল কেন্দ্র ধরার যাহার আবির্ভাবে,
মুকুট ছেড়ে যে জন নিলে কাষায় উত্তরীয়,
বৈশ্বানরের বন্দনীয় বিশ্ব-নরের প্রিয়,
যে সন্ন্যাসীর পুণ্যহাসির পবিত্র মহিমা
ছাপিয়ে চলে ভূভারতের বিপুল চতুঃসীমা,
চারিত্রে যে পূজ্য হ'ল বাহ্লীকে গান্ধারে
শোণ-কাবেরী-সরযূদরিয়া-কাঞ্জিল্ নদীর ধারে,
লঙ্কা-শ্যাম্-চীন-জাপানে লাল-মানুষের দেশে
পৌঁছাল যার পরমবাণী পাখীর মুখে ভেসে,
তাতার ইরাণ একদা যার পূজ্‌ত সৌম্যছবি,
চার যুগে যার বন্দনা গায় নিখিল ধরার কবি,
শক-হূনে আর গ্রীক-রোমকে রাজায় প্রজায় মিলে
পুলকে যার চলন্-পথের ধূলি মাথায় নিলে,
কণিষ্ক যার চিতার ভস্ম কিন্‌লে নিষ্ক দিয়ে,
চণ্ড-অশোক ধর্ম্মী হ'ল যার করুণা পিয়ে,
নিখিল নরের ঐক্য প্রথম দেখ্‌লে যে-জন ধ্যানে
সেই এসেছে বাংলা দেশের ঐ নগরোদ্যানে!

ভক্তেরা যার পশুর তরেও গড়্‌লে সেবা-গেহ,
বিশ্বজনের কল্যাণে যার অর্পিত মন দেহ,
সত্তা যাহার করুণাতে, সত্যে যাহার স্থিতি,
সঙ্ঘ যাহার নূতন সৃষ্টি, সংবোধি যার প্রীতি,
সংযমে যার পরম শৌর্য্য, বীর্য্য মোহের নাশে,
'ধর্ম্ম' চরম প্রতিষ্ঠা যার সোমপায়ীদের পাশে,
শীল সে যাহার অঙ্গভূষণ, অনঙ্গ যার বশে,
যার নয়নের বিমল বিভায় মনের বন্ধ খসে,
সুপ্ত ধরায় প্রবুদ্ধ যে অতুল মর্ত্ত্যধামে,
চায় না অকাজ বাড়ানো যে কিছু-করার নামে।
নিষ্ক্রিয় যার বরং প্রিয় দুষ্ক্রিয় জন হ'তে,
নির্ব্বাণই যার অ-লোভ স্বর্গ জন্ম-মরণ-স্রোতে,
কর্ম্ম-শেষে শালের বনে বন-তরুর মূলে
চিতায় শুয়ে ঘুমিয়েছে যে নিরঞ্জনার কূলে,
সেই সে অকূল কাল-সাগরে জমিয়ে খেয়ার পাড়ি
এসেছে আজ এই নগরে চৈত্য-শয়ন ছাড়ি।

ছিল যে তার আসার কথা অনেক বছর থেকে,
শ্রীমান সার্থপতির বধূ রেখেছে তায় ডেকে!
ভক্ত অনাথপিণ্ডদেরি কন্যা যে সেই নারী,
বঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে পতির গেহ তারি,
সে ডেকেছে আস্‌তে হবে,...তাই বুঝি আজ আসা;...
মনে আছে নিমন্ত্রণ!...পূরাতে তার আশা—
শতাব্দী সব ঠেলে ঠেলে এল নীরব পায়ে,...
নাইক খেয়াল রাজ্য নগর ভাঙ্‌ছে ডাহিন বাঁয়ে!
বঙ্গে এল বুদ্ধবিভা, কিন্তু সে নাই বেঁচে,
নগর পুণ্ড্রবর্দ্ধনও নেই—স্বপ্ন হ'য়ে গেছে!
নেই বালিকা উপাসিকা; আমরা তারি হ'য়ে
বরণ করি বুদ্ধ-বিভা চিত্ত-প্রদীপ লয়ে;
চৈত্য দিয়ে যত্নে ঘিরি বুদ্ধ-বিভূতিরে,
নিরঞ্জনা-তীরের স্মৃতি ভাগীরথীর তীরে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্যঙ্গ-চিত্র-পরিচয়

"জন্-বুলে"র পায়ে বোমা! ফাটে বুঝি!!

ইংরেজ জাতি সাধারণতঃ "জন্-বুল" বা "ব্রিটিশ বৃষ" নামে অভিহিত হয়।

জুলুমবাজির শাস্তি বটে!

ইংরেজ আপনার দলের জুলুমবাজদের কিরূপ শাস্তি দিয়াছে তাহাই দেখান হইতেছে। পাঞ্জাবের অত্যাচার শেষ করিয়া জুলুম-বাজরা ইংলণ্ডে হাজির হইলে প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ রক্ত-চক্ষে কলমের আঘাতে তাহাদের শাস্তি দিয়া বলিতেছেন—'সাবধান! মনে রেখো ব্রিটিশ রাজত্ব অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যাহোক্ ভারতের কাজ ত শেষ হল, এখন আয়ার্ল্যাণ্ডে যাও।' শাস্তির এমনি গুরুত্ব যে অত্যাচারীর এক চোখে লোক-দেখানো জল, আর-এক চোখে হাসি।

শান্তি-দূত।

জল-প্রলয়ের সময় নোয়া ঘুঘু ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছিলেন যে জল-প্লাবন কমিয়াছে কি না। তাঁর প্রেরিত ঘুঘু মুখে একটি অলিভ-শাখা লইয়া ফিরিয়া আসে। তাতে নোয়া বুঝিতে পারেন যে জল-প্রলয় নিরস্ত হইয়াছে। সেই সময় হইতে খ্রীষ্ট-জগতে ঘুঘু শান্তির প্রতিনিধি ও অলিভ-শাখা শান্তির প্রতীক রূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

তুরস্কের আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

যুদ্ধের পর তুরস্কের যা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ইতালি তারই এইরূপ ছবি দিয়াছে। সকল জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার" ধুয়া তুলিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল; যুদ্ধ জয় করিয়া জেতা জাতিরা ধুয়া হইতে "সকল জাতির" কথা দুটা ধোঁয়ার মতন বাপ্‌সা করিয়া এখন কেবল "আত্ম-প্রতিষ্ঠা"ই করিতেছে। সত্য রক্ষা ত করিতে হইবে!

১৯২০ সালের আয়ার্ল্যাণ্ড।

দুজনেই ন্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে, অথচ দুয়ের হাতেই কিন্তু বধের অস্ত্র!

বড়দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় করছে অখৃষ্টান্,
ভগবানের ভক্ত ছেলে ! ঋষির ঋষি ! খৃষ্ট মহাপ্রাণ !
সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল ! ওগো দীনের দীন !
জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ।
হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্‌লে বিধাতারে,
পিতা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে।
চম্‌কে যেন উঠ্‌ল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে ;
শাস্ত্রপাঠী উঠ্‌ল রুষে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে ;
টিট্‌কারী দ্যায় সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন কর্‌লে দলীল পাকা।
মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুট্‌ল আলো, উঠ্‌ল যে জয়গান,
আপ্‌নি ম'রে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান।
স্বর্গে মর্ত্তে বাঁধ্‌লে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে।
মরণ-জয়ী দীক্ষা তোমার জয়াঞ্জয়ে অটল লাভালাভে।

* * * *

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান চিত্ত স্বার্থলীন ;
আমরা তোমায় ভালোবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে নাড়ীর টান,
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক হ'য়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারাজীবন স'য়ে।
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে !
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠ্‌ছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবর্‌দস্তি ফেল্‌ছে চ'ষে জগৎটা শিং নেড়ে !
নৃশংসতায় হূণ অতিহূণ টেক্কা দিয়ে চল্‌ছে পরস্পরে,
শয়তানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে !
গির্জ্জা-ভাঙা হাউইট্‌জারের গর্জ্জনে হায় ধর্ম্ম গেল তল,
ম্লান হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল।
নিরীহ জন লাঞ্ছনা সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঠে তোমায় ওরা বিঁধ্‌ছে পেরেক ঠুকে।

* * * *

তোমার পরে জুলুম্ ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্বধারা
রোমের হুকুম-মহকুমা ওঁড়িয়ে গেল, ধূলায় হ'ল হারা।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুল্‌ছে মানুষ ভুল্‌ছে কালের বাণী,—
তাসের পরে তাস সাজিয়ে ভাব্‌ছে হ'ল অটল বা রাজধানী।
মাড়িয়ে মানুষ উড়িয়ে ধূলো অন্ধ বেগে কবন্ধ-রথ চলে,
ওষ্ঠ-বাসী খৃষ্ট-ভক্তি ডুব্‌ছে নিতি নীট্‌শেবাদের তলে !
তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে,
ভব্যতা সে ভির্ম্মি গেছে ভেপ্‌সে-ওঠা টাকার গেঁজেয় থেকে,
উবে গেছে ভক্তিশ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,
জড়বাদের স্কন্ধে চ'ড়ে ধিঙ্গি-পারা জিঙ্গো-জুজু নাচে !
তিন ডাকিনী নৃত্য করে ইয়োরোপের শ্মশান-পারা বুকে—
লড়াই-লালচ্, বড়াই-লালচ্, কড়ির লালচ্ নাচ্‌ছে
বিষম রণে !

* * * *

ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ায় দাঁড়াও স'রে এসে—
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে ;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্তমালে নূতন মণি হ'য়ে ;
ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক ব্যথা ভুল্‌বে তোমায় হেরি ;
সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী ;
ধৈর্য্যগূঢ় বীর্য্য তোমার জাগুক, প্রাণের সব ভীরুতা দহি,
সহিষ্ণুতায় জিষ্ণু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী !
নিগ্রহে কি নির্য্যাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল।
নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগুক তোমার মূর্ত্তি অচঞ্চল।
পরের মরম বুঝ্‌তে শিখাও, হে প্রেমগুরু চিত্তে এস নেমে,
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্ব্বসহা প্রেমে ;
মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই,
হাত ধরে নাও তুমি,
ম'রে অমর হবার মতন দাও শকতি, দীনের শরণভূমি !
সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
হাত ধ'রে নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে।
বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
অভয়-দাতা ! পৌঁছিয়ে দাও পরম-অন্নদাতার চরণ-মূলে !
ব্যথার বিষে মন ঝিমালে স্মরি যেন তোমার মশান-গীতা—
"না গো আমায় ত্যাগ কোরো না, ত্যাগ কোরো না,
পিতা ! আমার পিতা !"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ

আমরা পৌষের প্রবাসীতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথ আপনাকে ব্রাহ্মসমাজ বা উহার কোন শাখার প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার একটি প্রস্তাব কিছুকাল হইতে ঐ সমাজের সভ্যগণের বিবেচনাধীন আছে। শুনিলাম, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের কথাগুলির এইরূপ অর্থ করিয়া নিজেদের দল পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যে, প্রবাসীর মতে রবি-বাবু ব্রাহ্ম নহেন। এই কারণে, প্রবাসী ব্রাহ্মসমাজের বা উহার কোন অংশের মুখপত্র না হইলেও, এই বিষয়ে কিছু লিখিতে হইতেছে।

পৌষে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা, আমাদের বিবেচনায়, ঠিকই লিখিয়াছি। কিন্তু তাহার মানে এ নয়, যে, রবি-বাবু ব্রাহ্ম নহেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "He who is not against us is with us", "যিনি আমাদের বিপক্ষে নহেন, তিনি আমাদের পক্ষে"। অন্ততঃ এই অর্থে রবি-বাবুকে অ-ব্রাহ্ম বলিতে পারি না। তবে, প্রতিনিধিস্থানীয় না বলিবার কারণ আছে; এবং বাস্তবিক, বিশেষ কাজের জন্য ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যাঁহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা যায়, তিনি ছাড়া আর কেহই প্রতিনিধি নহেন।

মানব-আত্মাকে চিন্তায় ও ভাবে এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও চির-উন্নতিশীল করা ও রাখা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ। এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও আছে, জগতের নানা দেশে আছে। যাঁহারা ব্রাহ্মনামধারী না হইয়াও এই আদর্শের অনুরাগী এবং যাঁহাদের জীবন এই আদর্শের অনুসরণ করিবার অকপট চেষ্টার পরিচয় দেয়, তাঁহাদের কাহাকেও যেমন অ-ব্রাহ্ম মনে করি না, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিও মনে করি না, জগতের সর্ব্বত্র যাঁহারা এই আদর্শের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ সেই সর্ব্বজাতীয়সংঘভুক্ত। এই সংঘের কোন সাম্প্রদায়িক নাম নাই। ব্রাহ্ম বলিতে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বুঝায়। কেহ যদি উক্ত বৃহত্তরসংঘভুক্ত বলিয়া নিজেকে কেবল মাত্র ক্ষুদ্রতর ব্রাহ্ম সমাজেরই, কিম্বা এমন কি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই, প্রতিনিধি মনে না করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তিনি অ-ব্রাহ্ম বা অভারতীয় হইয়া যান না। কেহ যদি বলেন, আমি শুধু মানুষ,—তাহাতে প্রমাণ হয় না, যে, তিনি ব্রাহ্ম নহেন। ক্ষুদ্রতর বৃহত্তরের অন্তর্ভূত।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজ নিজের লোক বলিয়া সম্মান করিতে পারেন কি না, এরূপ তর্ক কেন উঠিয়াছে, বুঝিতে পারি না। আমি দীর্ঘকাল তাঁহার প্রতিবেশী-রূপে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দেখিয়াছি, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি, বুধবারে ছাত্র অধ্যাপক ও সমাগত অন্য বহু ব্যক্তির সহিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়াছি, তাঁহার বহিও পড়িয়াছি, স্বদেশে বিদেশে তাঁহার জীবনের কথাও জানি; যেমন এ পর্য্যন্ত নিখুঁত কোন মানুষ জন্মেন নাই, তিনিও তেমনি নিখুঁত নহেন, কিন্তু আমি তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কিছু দেখি নাই। আমার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। ব্রাহ্মদিগের একেশ্বরবাদী কন্‌ফারেন্সে রবি-বাবুকে সভাপতি করিবার চেষ্টা ও অনুরোধ ব্রাহ্মসমাজের সব দলের লোক মিলিয়া একাধিক বার করিয়াছেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে পর ভাবেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের বহির ১৫০০ গানের মধ্যে ৩২৯টি তাঁহার। এ স্থলেও তাঁহাকে পর ভাবা হয় নাই। প্রতি রবিবার সামাজিক উপাসনায় অধিকাংশ সময় তাঁহারই গান গাওয়া হয়; তখন তাঁহাকে পর ভাবা হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাধিক প্রচারক তাঁহাকে নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া প্রচারক্ষেত্রে দাবী করিয়া আসিতেছেন। তখন তাঁহাকে পর ভাবা হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন আচার্য্যের উপদেশে তাঁহার গান উদ্ধৃত হয়। তখন তাঁহাকে পর ভাবা হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ান ও উপাসনা করানও হইয়াছে। এ-সকল সত্ত্বেও অবশ্য তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত না-করিবার স্বাধীনতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে-কোন সভ্যের আছে। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন, কিম্বা না বলেন, যে, প্রবাসী-সম্পাদকের মতে রবি-বাবু ব্রাহ্ম নহেন। আমার মতে রবি বাবু ব্রাহ্ম এবং আরো কিছু যাহা ব্রাহ্মত্বের অবিরোধী, এবং আমি যতটুকু খবর রাখি তাহাতে রবি-বাবু অপেক্ষা অধিক নানাদেশব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রভাব জীবিত অন্য কোন মানুষের নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপাধি গ্রহণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "স্যার" উপাধি গ্রহণ করায়, উহা প্রত্যাখ্যান না করায়, শুধু "চরমপন্থী"রা নহে, তাঁহার নিজের দলের প্রধান প্রধান লোকেরাও

অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা জানি, যাঁহারা তাঁহাকে মুখে কিছু বলিতে পারেন নাই, এমন কি যাঁহারা তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। "সঞ্জীবনী", খুব সাবধান ভাষায় হইলেও, স্পষ্টভাবে অসন্তোষ জানাইয়াছেন, এবং ইহাও শুনিয়াছি, যে, উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মুখেও সুরেন্দ্র-বাবুকে কিছু বলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সুরেন্দ্র-বাবু আত্মপক্ষসমর্থনার্থ অনেক বাজে কথা বলিয়াছেন। অনেকদিন হইতে তাঁহার রাজনৈতিক মতের সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও তাঁহার দ্বারা দেশের যে উপকার হইয়াছে তাহা আমরা কখনও অস্বীকার করি নাই। এইজন্য তাঁহার উপাধিগ্রহণে আমরাও দুঃখিত।

তাঁহার মত দেশের অন্যতম নেতার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপাধিগ্রহণ উচিত হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, উহা অযাচিতভাবে আসিয়াছে। কিন্তু, উপাধিকাঙাল রাজা মহারাজা ও অন্য ধনী লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করি, দেশের কোন্ কর্ম্মী উপাধি ভিক্ষা করিয়া তবে উপাধি পাইয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছেন, রাজার প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে স্নাউট্ করা অর্থাৎ অবজ্ঞা ও অপমান করা হয়। কিন্তু তিনি বেশ জানেন, রাজা সাক্ষীগোপাল মাত্র, উপাধি দেয় রাজ-ভৃত্যেরা। তাঁহার কাগজে লেখা হইয়াছে, অমুক, অমুক, অমুক যখন স্যার উপাধি লইয়াছিলেন, তখন ত তোমরা কিছু বল নাই। আমাদের উত্তর এই, যে, প্রবাসী কখন কোন উপাধিগ্রাহী লোককে উপাধিগ্রহণজন্য অভিনন্দন করে নাই। তা-ছাড়া, একটা কথা সুরেন্দ্র-বাবু ও তাঁহার স্তাবকেরা ভুলিয়া যাইতেছেন। সেকালে যদি বা কেহ উপাধিধারীদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে, একালে আর তাহা করা যায় না। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, সামরিক আইনের আমলে পঞ্জাবের ঘোরতর নির্য্যাতন ও অবমাননা, এবং অমৃতসরের সেই গলিতে ভারতবাসী-দিগকে কেঁচোর মত বুকে হাঁটান, তখন ঘটে নাই। যে-গবর্ণমেণ্ট ইহা ঘটাইয়া বা ঘটিতে দিয়া প্রকাশ্যভাবে অনুতাপ প্রকাশ করে নাই, দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ঐ অনুতাপের অকপটতার প্রমাণ দেয় নাই, তাহার হাত হইতে যে-কেহ উপাধি গ্রহণ করেন, তিনিই নিজের মাতৃভূমির, তিনিই নিজের পিতৃমাতৃজাতির অপমান করেন। গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে উপাধি গ্রহণ এইজন্য বলিতেছি, যে, উপাধিগুলা নামে মাত্র রাজার প্রদত্ত, বস্তুতঃ ওগুলা রাজভৃত্য আমলারাই দিয়া থাকে। তা-ছাড়া, রাজা দিলেই বা তাহা কেন লইতেই হইবে? রাজাও ত আমাদিগকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং নিষ্ঠুরতর অপমান হইতে বাঁচাইতে পারেন নাই, এবং অত্যাচারী ভৃত্যদিগ শাস্তি দিতে পারেন নাই।

—

রাজখুল্লতাতের আগমন।

রাজা পঞ্চমজর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভারতে আসিয়া নূ ভারতশাসন-আইনের অনুযায়ী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ছিল। তাঁহার শারীরিক অসুস্থত ব্যপদেশে তাঁহাকে না পাঠাইয়া রাজা নিজের বৃদ্ধ খুল্লত ডিউক্ অব্ কনটকে পাঠাইয়াছেন। ইহাঁর উ আমাদের রাগও নাই, শত্রুতাও নাই। কিন্তু ইহ আগমন উপলক্ষ্যে নানা প্রকার ঘটা করাইয়া ও ভাম দেখাইয়া ইংরেজ আমলাবর্গ দেশের লোকের "রাজভ অর্থাৎ উক্ত আমলাদের আমলাতন্ত্রের প্রতি ভক্তির উ করিয়া এবং দেশবাসীকে অত্যাচার ও অপমান ভুলা স্বকার্য্যসাধন করিতে চায়; এইজন্য আমরা মনে ক কোনও ভারতবাসীর তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় যোগ দে অনুচিত। আমরা জানি, সবদেশেই এমন কতক চিন্তাহীন লোক আছে যাহারা তামাসা দেখিতে পাইলে সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষেও এরূপ লোক বহুৎ আছে। ত রাজার খুড়ার সম্মানার্থ আয়োজিত তামাসা দেখি রাস্তায় ঘাটে ময়দানে ভীড় করিবে; এবং ফলে, ইং আমলাতন্ত্র দেশবিদেশে প্রচার করিবে, যে, ভারতবর্ষ খুব অল্পসংখ্যক লোক দুষ্ট আন্দোলনকারী রাজদ্রো হইলেও অধিকাংশ "রাজভক্ত" এবং ইংরেজ-শাসনে সুখী ও খুসী। সে যাহাই হউক, হিমালয় হইতে কুমারি পর্য্যন্ত আমাদের জা'তভাইয়ের যে-কেহ জালিয়ানওয়া বাগের শবস্তূপ এবং অমৃতসরের গলির মানুষ-কেঁচে কথা শুনিয়াছেন, অথচ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রা খুল্লতাতের অভ্যর্থনায় যোগ দিবেন, তাঁহার নিশ্চ হৃদয় নাই, লজ্জা সরম নাই, চিন্তা করিবার ক্ষমতা না আমাদের জাতীয় শোকের দিনে বৎসরে যুগে আমো আহ্লাদের উপযোগিতা নাই। আগামী ৯ই ফেব্রুয়া দিল্লীতে ডিউক্ অব্ কনট্ ভারতীয় ব্যবস্থাপক স খুলিবেন, এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে ঐ শহর দীপমাল আলোকিত হইবে। তদুপলক্ষে দিল্লীর প্রাদেশি কংগ্রেস্ কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, দিল্লীশহরবা সকলকে ৯ই সমস্ত দিন দোকানপাট বন্ধ রাখিয়া এবং ১ সূর্য্যাস্তের সময় হইতে দোকানপাট বন্ধ রাখিয়া হরত করিতে অনুরোধ করিবেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ প্রশংসনী মান্দ্রাজেই রাজার খুড়া জাহাজ হইতে নামিয়া ভার ভূমিতে প্রথম পদার্পণ করেন। সেখানে তাঁহার অভিনন্দনে

বিরোধী বৃহৎ মিছিল বাহির হইয়াছিল, এবং ট্রামওয়ের চালক ও কণ্ডাক্টারেরা ধর্ম্মঘট করায় ট্রাম চলা বন্ধ হইয়াছে। তবে, অল্পবিধ লোকের ভীড়ও খুব বেশী হইয়াছিল। যাহা হউক, কতকগুলি লোকেরও যে প্রাণ আছে, ইহা আশার কথা।

মন্ত্রীদের বেতন।

পাশ্চাত্য কোন কোন দেশের এবং জাপানের বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক কম বেতনে কাজ করেন, তাহা আমরা মডার্ণরিভিউ ও প্রবাসীতে একাধিকবার দেখাইয়াছি। আমাদের আগেকার ও বর্ত্তমান আমলের কংগ্রেসের নেতারা ভারতশাসনের ব্যয়বাহুল্যের প্রতিবাদ বহুবার করিয়াছেন। এখন মডারেট অনেক নেতা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করায় তাই দেশের লোকের পক্ষ হইতে দাবী হইয়াছে, যে, তাঁহারা বৎসরে চৌষট্টি হাজার টাকা বেতন না লইয়া কম লউন। এ বিষয়ে বাংলা দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পুনঃপুনঃ নানা রকমে লিখিয়া খুব কাজ করিয়াছেন;—আন্দোলনের মূলমন্ত্রই হইতেছে একই কথা বার বার নানা রকমে বলা। ইহা দৈনিক দ্বারাই ভাল করিয়া হয়।

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালী মন্ত্রীদের নিজেদের তরফ হইতেই বেতন হ্রাসের প্রস্তাব হইবে। তাহা হইলে খুব ভাল হয়। কিন্তু মন্ত্রীদের ইহা জানা উচিত, অল্প হ্রাসে কোন ফল হইবে না, এবং দেশের লোকেও সন্তুষ্ট হইবে না। আমরা মনে করি, মাসিক হাজার টাকায় এক এক জন মন্ত্রীরও খরচ বেশ চলিতে পারে,—বিশেষতঃ যখন বাঙালী তিনজনের প্রত্যেকেই সচ্ছল অবস্থার লোক। কেহ কেহ মানসম্ভ্রমের, ঠাট্ বজায় রাখার কথা তোলেন। কিন্তু যাঁহারা স্বেচ্ছায় বেশী আয় ত্যাগ করেন, তাঁহাদের উহাতেই সম্মান এত বাড়ে যে ঠাট্ বজায় রাখিবার দিকে নজর দিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

এতদূর লিখিবার পর দৈনিক কাগজে দেখিলাম, পণ্ডিত রাধাকান্ত মালবীয় আগ্রা অযোধ্যা কৌন্সিলে প্রস্তাব করিবেন, যে, মন্ত্রীদের বেতন তিন হাজার টাকার অনধিক হউক। তিন হাজারের কর্ম্ম নয়, এক হাজার যথেষ্ট। লোকের এ ধারণা যেন না হয় যে মন্ত্রীরা টাকার লোভে "সহযোগিতা" করিতেছেন।

—

কংগ্রেস ও অন্যান্য সভার অধিবেশন।

প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ কয়দিন যেমন নানা সভার অধিবেশন হয়, এবারও তাহা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মাবলম্বী, নানা ভাষাভাষী, নানা জাতীয় লোক বাস করে। তাহাদের পেশাও নানা রকমের। কিন্তু এক বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—তাহারা সবাই পরাধীন, ইংরেজের অধীন। যাহারা দেশী রাজ্যে বাস করে, তাহারাও পরাধীন—তাহাদের রাজারা ইংরেজের অধীন। রাষ্ট্রীয় কোন বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ভারতবাসীদের নাই। তাহাদের দারিদ্র্যের, অজ্ঞতার, রোগ জীর্ণতার, দুর্ব্বলতার, অল্পায়ুতার ইহা একটি প্রধান কারণ। জাতীয় পরাধীনতা অপেক্ষা ঘোরতর জাতীয় কলঙ্ক আর নাই, ইহা অপেক্ষা দুর্গতি আর নাই। এই কলঙ্ক মোচনের জন্য, এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, যদি জাতির সমুদয় বা বহুসংখ্যক লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্য যে সভা হইবে, তাহা অন্য কোন প্রকারের সভা হইতে বৃহৎ হইবারই কথা। এইজন্য কংগ্রেসে বরাবরই যত লোকসমাগম হয়, অন্য কোন সর্ব্বজাতীয় সভায় তত হয় না। এবারে পূর্ব্বপূর্ব্ব বার অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারিয়র্ মহাশয়ের বক্তৃতা ইংরেজী দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে, বাংলা খবরের কাগজেও উহার প্রধান প্রধান অংশের অনুবাদ বাহির হইয়াছে। আমরা দুএক কথায় উহাকে ভাল বা মন্দ বলিলে উহার প্রতি অবিচার করা হইবে। অথচ বিস্তারিত আলোচনারও স্থান নাই। মস্‌লেম লীগের সভাপতি ডাক্তার আন্‌সারীর অভিভাষণ বা অন্য কোন অভিভাষণেরও বিস্তারিত সমালোচনার স্থান নাই। এখানে কেবল কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণের একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি বলিয়াছেন, যে, প্রত্যেক লোকের নিজে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার আছে। এই অধিকারের ব্যবহার যদি কোন জাতি না করে, তাহা হইলে তাহা স্বাধীন হইতে পারে না, স্বাধীন থাকিলেও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। সভাপতি মহাশয় ইতিহাস হইতে এই কথার অকাট্য প্রমাণও দিয়াছেন। আমাদের দেশে এ-কথা স্মরণ রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা ইংরেজ জাতির বা ইংরেজ আমলাতন্ত্রের অধীন আর থাকিতে চাই না। কিন্তু সাবধান থাকিতে হইবে, যেন এক প্রকার অধীনতা হইতে আর-এক প্রকার অধীনতায় গিয়া না পড়ি। মহাত্মা গান্ধী একাধিকবার বলিয়াছেন, কংগ্রেস্ যদি সহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ নাও করেন, তথাপি আমি সহযোগিতাবর্জ্জনের কর্ত্তব্যতা দেশময় প্রচার করিব। ইহা বলিয়া তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিচারের অধিকারের মহিমাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা স্বাধীনতার মর্ম্ম এত অল্প বুঝেন, যে, কেহ তাঁহাকে মহাত্মা না বলিলে তাঁহারা জুলুম করিয়া মহাত্মা বলাইবেন। তদ্রূপ আবার

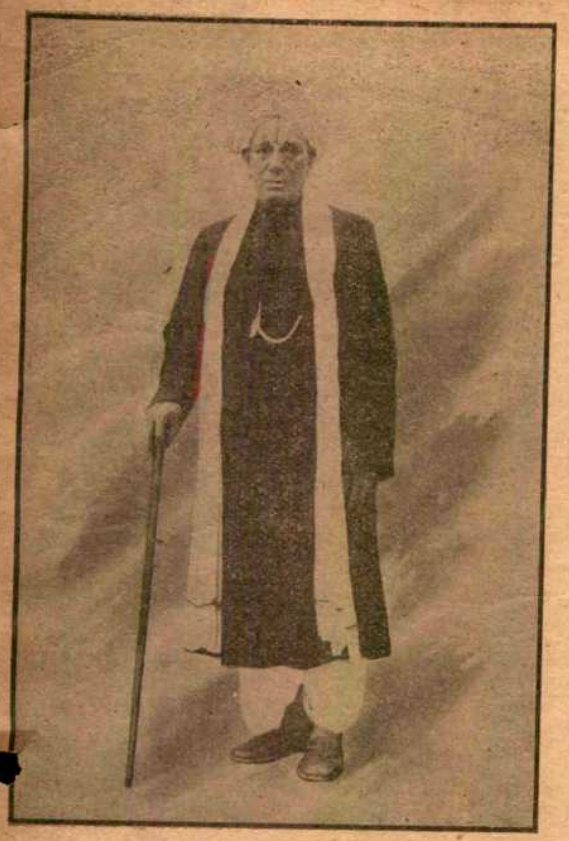

শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচার্য্য।
গত ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলিকেও মৌলানা বলিতেই হইবে! জুলুম দ্বারা যে ভক্তি ও সম্মান আদায় করা হয়, তাহার মূল্য কতটুকু? বুদ্ধকে শুধু বুদ্ধ, মহাবীরকে শুধু মহাবীর, যীশুখৃষ্টকে শুধু যীশুখৃষ্ট, মহম্মদকে শুধু মহম্মদ, নানক কবীর চৈতন্যকে শুধু নানক কবীর চৈতন্য ত সচরাচরই লোকে বলিয়া থাকে। তাহাতে ভক্তির অভাব প্রকাশ পায় না। আর বাস্তবিকই যদি গান্ধী বা মহম্মদ আলির অনুচরদের তাঁহাদের প্রতি যতটা ভক্তি আছে, অন্য কোন ব্যক্তির ততটা না থাকে, তাহা হইলে তাহার বক্তৃতা করিবার বা লিখিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে না, "স্বরাজে"র ইহা কি প্রকার যদি বাস্তবিক "স্ব-অধীন" হইতে চাও, তাহা "স্ব-অধীনতা"কে সম্মান করিতে শিক্ষা কথা দূরে থাক্, ঈশ্বরেরও রাজশক্তি আমরা মানি এইজন্য যে আমরা তাঁহার রাজ্যে অকপটচিত্তে বলিতে পারি, "আমরা সবাই রাজা"। ঈশ্বর জোর করিয়া ভক্তি আদায় করেন না। তিনি আমাদিগকে তাঁহার জ্ঞানের অংশী করিয়া, তাঁহার সহকর্ম্মী সহমর্ম্মী করিয়া, তাঁহার প্রেম ও আনন্দের অধিকারী করিয়া, তাঁহার সহিত যোগস্থাপনের অধিকার দিয়াছেন বলিয়াই তিনি ভক্তের হৃদয়সিংহাসনে বিরাজ করেন। কেহ যদি ভক্ত বা সাধক না হন, এবং যদি কেহ জোর করিয়া তাঁহাকে বলেন, "তোমাকে ঈশ্বরের উদ্দেশে মাথা নোয়াইতেই হইবে," তাহা হইলে এমন স্থলেও তাঁহার অবশ্যই ইহা বলিবার অধিকার আছে, মাথা "নোয়াইব না।" সুতরাং বলা বাহুল্য কাহারও আদেশে বা কোন জনতার জুলুমে কেহ বিশেষ কোন শব্দ ব্যবহার করিয়া কোনো মানুষকে সম্মান দেখাইতে বাধ্য নহেন। আমাদের হৃদয়ে

ডাক্তার আন্‌সারী।
গত সর্ব্বভারতীয় মুস্‌লেম লীগের সভাপতি।

যে শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তাহাও প্রকাশ করা বা না করা আমাদের স্বেচ্ছাধীন। হৃদয়ে যাহা নাই, তাহা বাহিরে দেখাইবার কপটতা ও ভীরুতা আমাদের কাহারও না হউক। তা বলিয়া কাহারও প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতেও বলিতেছি না।

বস্তুতঃ অবিচারিত চিত্তে কেবল হুজুকের কিংবা অন্ধ অনুরাগ বা ভক্তির অধীন হইয়া চলিলে একশ্রেণীর লোকের অধীনতার পরিবর্ত্তে অন্য এক রকম লোকদের অধীন হইতে হয়, প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা রাণী আর থাকিল না বলিয়া তৎপরে

এই দেশের লোকেরা স্বাধীন হইয়া গেল না। তাহার পর রোবেস্‌পীয়ার্, মারা, ডাংটং, প্রভৃতির রক্তাক্ত ও অল্পকালস্থায়ী একনায়কত্ব, এবং শেষে নেপোলিয়নের একছত্র সাম্রাজ্য আসিয়াছিল। পরে উপর্য্যুপরি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে প্রকৃত স্বাধীনতার আবির্ভাব হয়। অতএব আমরাও যেন স্ব-অধীনতা লাভের জন্য "স্ব"কেই সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করি। নতুবা স্বাধীনতার নামে অধীনতারই রূপান্তর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে; বিশেষতঃ যদি মনুষ্যবিশেষের পায়ে ফুল দিয়া তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হই।

—

সামাজিক সংস্কার কন্‌ফারেন্স্।

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও সামাজিক সংস্কার কন্‌ফারেন্স্ কংগ্রেসের পর বসিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্রতায় এবার উহা এত বেশী কোণঠাসা হইয়াছিল (কিছু কোণঠাসা বরাবরই হয়), যে, উহার সভাপতি বিঠলভাই ঝাভেরভাই পটেলের অভিভাষণ পর্য্যন্ত কোন কাগজে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই; অতি সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েক পংক্তির মধ্যে উহার চুম্বক বাহির হইয়াছে। কন্‌ফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবগুলির কোন উল্লেখও এ পর্য্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। [ইহা কম্পোজ হইয়া যাইবার পর ১০ই জানুয়ারীর বম্বে ক্রনিক্‌লে অভিভাষণ ও প্রস্তাব সমূহ দেখিয়াছি।]

অথচ ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় অধীনতায় বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, না, সামাজিক অধীনতায় বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা বলা খুব সোজা নয়। এরূপ তুলনা না করিয়াও বেশ স্পষ্টভাষায় বলা যায়, যে, সামাজিক অধীনতার জন্য নানাজাতির বহুকোটি লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং অনেক স্থলে নারীও যে মানুষ তাহা পুরুষেরা, এবং নারীরা নিজেও, বিস্মৃত হইয়াছে। সামাজিক অধীনতা ও অত্যাচার যে আমাদের রাষ্ট্রীয় অধীনতারও অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষের আত্মা কতকগুলা ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ভাগ-করা নয়। এমন নয়, যে, সামাজিক ভাবে যে মানুষের আত্মা হেঁট হইয়া আছে, সে মানুষ সামাজিক ভাবে "ভয়ে ভয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে চায়, ব্রাহ্মণ দেখিলে সভয়ে পলায়" (যেমন মান্দ্রাজ অঞ্চলে), সেই মানুষ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অনায়াসে মাথা উঁচু করিয়া অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। এমনটি হইবার যো নাই। সমাজ যাহাকে পিশিল, অবনত করিল, পশুর অধম করিল, সে রাষ্ট্রীয় হিসাবেও অমানুষ হইল। অতি সত্য এবং সোজা কথাও লোকে

তাই বলি, এই সে দিনও গান্ধী মহাশয় বলিয়াছেন, হিন্দুসমাজ যদি "অস্পৃশ্য" জাতিদের অস্পৃশ্যতা দূর করিতে না পারেন, তাহা হইলে, নয় মাস কেন, একশত বৎসরেও স্বরাজ্য লাভ ঘটিবে না। এইজন্য সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহারও একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি একটি "অস্পৃশ্য" জাতীয়া বালিকাকে পোষ্যকন্যা লইয়া ঠিক্ নিজের কন্যার মত আদরে মানুষ করিতেছেন।

সামাজিক অধীনতা ও অত্যাচার কেবল যে কতকগুলি লোককে মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে তাহা নহে, তাহাদিগকে এরূপ বৃত্তিবিশেষে আবদ্ধ রাখিয়াছে, যে, তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার সাংসারিক উন্নতি অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের বিবেচনায় অতি হীন জাতির অন্তর্ভূত দুচার জন লোকের সাংসারিক সচ্ছলতা দেখিয়া আমরা মনে করিতে পারি, যে, জাতিভেদ ত কাহারও সাংসারিক উন্নতির অন্তরায় নহে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, এখন এমন এক দেশের লোকের রাজত্ব যাহারা আমাদের মত জা'ত (caste) মানে না, এবং তাহার পূর্ব্বে ছিল মুসলমানের রাজত্ব, তাহাদেরও শাস্ত্রে জা'তমানা বলিয়া কিছু নাই।

সামাজিক কুপ্রথাবশতঃ আমাদের দেশের মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে বলবান্, তেজস্বী ও স্বাবলম্বী হইতে পায় না। সব দোষটা সমাজের নয়; কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও পরমুখাপেক্ষিতার জন্য সমাজ যে অনেকটা দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে নারীরও বড় দুরবস্থা। কয়েকটি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়া বিদেশীকে বুঝান যায় যে আমরা নারীকে দেবী মনে করি। কিন্তু এখনও বাঙ্গালীর মেয়ে কেরোসীনের সাহায্যে আত্মহত্যা করিতেছে; এই সেদিনও, এক বালিকাবধূকে কেমন করিয়া তাহার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর অন্য লোকেরা কামার ডাকিয়া পায়ে বেড়ী ও শিকল দিয়াছিল ও প্রহারাদি করিত, তাহার কাহিনী আদালতে বিবৃত হয়; এই সেদিনও বাঁকুড়া জেলার তিনটি বালিকা কুষ্ঠরোগীর সহিত বিবাহ হওয়ায় আত্মহত্যা করিয়াছে। বলিও না, যে, অন্যদেশেও নারীর দুর্দ্দশা আছে। তাহার প্রতীকার সেই লোকেরা করিবে। অন্যের অত্যাচার অন বলিয়া আমাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যব বলিতে পারি না। নারীর অজ্ঞতা দূর করিয়া তাহার মোচন করিতে হইবে। যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা জানেন, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে বাংলা দেশ অপেক্ষা নারীর বেশী স্বাধীনতা থাকায় তাহারা

ও সমাজসেবায় বাঙালীর মেয়েদের চেয়ে ইতিমধ্যেই অধিক অগ্রসর হইয়াছেন।

কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত সব দেশেই সাধারণতঃ নারীকে মানুষরূপেও না দেখিয়া কেবল স্ত্রীজাতীয় জীব বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচার করা হইত। একটু খুলিয়া বলা দরকার। পুরুষের কাজের ব্যবস্থা ও বিচার কেবল পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ও স্বামী বলিয়া হয় না, সে কত জ্ঞান অর্জ্জন ও দান করিয়াছে, জগতের লোককে কত ভাল বাসিয়াছে ও তাহাদের জন্য কি করিয়াছে, ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহার জীবনের মূল্য নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ পুরুষ শুধু পরিবারের একজন নহে, সমাজের, দেশের, জগতেব একজন। নারীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচার অন্যবিধ। অর্থাৎ তিনি কেমন মা, কেমন কন্যা, কেমন পত্নী ও কেমন ভগিনী, ইহার দ্বারাই তাঁহার জীবনের সার্থকতা নিরূপিত হয়। এইজন্য জগতের সব দেশের অতীত ইতিহাসে, অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমস্থল থাকিলেও, সাধারণতঃ যে-সকল নারী নিজ নিজ জীবনে উচ্চতম আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন—যেমন আমাদের দেশের সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, প্রভৃতি—তাঁহারা পুরুষের সহিত যে-সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিলেন, তদনুযায়ী আচরণ কেমন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের পূজা করিয়াছে। তাঁহারা এই ভক্তির যথার্থই অধিকারী। কিন্তু কোন পুরুষমানুষ শুধু ভাল স্বামী ছিলেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন দেশে সকল লোকের ভক্তি পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই; ভক্তিশ্রদ্ধা পাইবার জন্য পুরুষকে পরিবারের বাহিরে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের পরিচয় দিতে হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, নারীরও পরিবারের বাহিরে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের পরিচয় দিবার ক্ষমতা আছে, অধিকার আছে। তাঁহাকে জ্ঞানলাভের ও জ্ঞানদানের, ভগবদ্ভক্তি ও মানবপ্রীতি অর্জ্জনের এবং জীবের সেবা করিবার, নানাবিধ কর্ম্ম সম্পাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র দিতে হইবে, এবং সেই ক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে। যে-সব দেশের লোক এই ডাক শুনিয়াছে, তাহারা অগ্রসর হইতেছে; আমাদিগকেও অগ্রসর হইতে হইবে। নারীকে ছাড়িয়া স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। নারীকে ছাড়িয়া যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা স্বরাজ নহে।

নারীর পারিবারিক আদর্শ ব্যতীত অন্য উচ্চ আদর্শ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও পাওয়া যায়। যেমন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন, "যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্, তেনাহম্ কিম্ কুর্য্যাম্," "যাহাদ্বারা আমি অমৃত হইব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" তিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞান চাহিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে।

সমাজসংস্কারের মূলমন্ত্র দুটি; (১) জন্ম, বংশ, জাতি নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের ভাল হইবার, মহৎ হইবার, সব রকম জ্ঞানলাভ করিবার ও কর্ম্ম করিবার সমান সুযোগ ও সমান অধিকার থাকা চাই, এবং (২) নারী ও পুরুষ উভয়েরই বিচার এক চারিত্রিক মাপকাঠি দ্বারা হওয়া চাই, যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিন্দনীয় তাহা পুরুষের পক্ষেও নিন্দনীয় বিবেচিত হওয়া চাই, স্ত্রী ও পুরুষের জ্ঞানে কর্ম্মে সেবায় সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থাকা চাই।

—

কংগ্রেসের সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব।

অনেক বাঙালী মডারেট নিজের দলের পূর্ব্ব কীর্ত্তি এমন ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতিকে যেন তাঁহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন। তাঁদের দলের অনেকে যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-কালে সহযোগিতা বর্জ্জন কথায় ও কাজে করিয়াছিলেন, তাহা কি মনে নাই? তাঁহারা যাহাই মনে করুন, আমরা উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা অন্যায় মনে করি না। যাহাদের সহিত আমাদের লক্ষ্য এক, তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা চলে ও সহযোগিতা করিব; যাহাদের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যের প্রভেদ আছে, তাহাদের সহিত সহযোগিতা সম্ভবে না। ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় আমাদের স্বাধীন হওয়ার পক্ষপাতী, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে আবার সহযোগিতা কি? অধিকন্তু ঐ শাসকসম্প্রদায় পঞ্জাবে অত্যাচার করিয়া আমাদের সমুদয় জাতিকে অপমান করিয়াছে, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চায় নাই, এবং দুর্বৃত্তদের সমুচিত দণ্ড দেয় নাই। সুতরাং তাহাদের সহিত কাজ করিতে আমাদের অপমান বোধ হয়। ইহা জানি, যে, মান অপমান ভুলিয়া এবং অপমানিত হইয়াও, যদি বাস্তবিক দেশের সেবার মত সেবা করা যায়, তাহা হইলে মান-অপমানের কথা না তোলাই উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রকারের গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়া দেশকে আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া যাইবে, ভবিষ্যতে পঞ্জাবের মত নির্য্যাতন ও অপমান অসম্ভব করা যাইবে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই, সুতরাং অপমানের কথা ভুলিয়া শাসকদের সহযোগিতা করিতে রাজী নহি। আমাদের যেরূপ বিশ্বাস নাই, সেরূপ বিশ্বাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সহযোগিতা করিতে চান করুন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের কাজের সমর্থন করিব না।

অনেকে মনে করেন, গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন অসাধ্য। আমরা তাহা মনে করি না। বহুবৎসর পূর্ব্বে [redacted]রীর লোকেরা ইহা করিতে পারিয়াছিল; সম্প্রতি

মিশরের লোকেরাও ইহা করিয়াছে। আরো দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অপরে যাহা করিয়াছে, তাহা আমরাও এখনই পারিব, ইহা সব স্থলে ঠিক্ না হইতে পারে। কারণ, দেশকাল-পাত্রের প্রভেদে অবস্থা ও কার্য্যের প্রভেদ ঘটে। কিন্তু ভারতবর্ষেও যে সহযোগিতা-বর্জ্জন অসম্ভব নহে, তাহা বহু বৎসর পূর্ব্বে, যে ইংরেজজাতি কেজো (practical) জাতি বলিয়া অহঙ্কার করেন, সেই জাতির দুজন গ্রন্থকারের মাথায় ঢুকিয়াছিল। মেরিডিথ্ টাউন্‌শেণ্ড্ লিখিয়া গিয়াছেন—

"There are [in India] no white servants, nor even grooms, no white policemen, no white postmen, no white anything. If the brown men struck for a week, the Empire would collapse like a house of cards, and every ruling man would be a starving prisoner in his own house. He could not even feed himself or get water."

অধ্যাপক সীলী লিখিয়া গিয়াছেন—

"Now if the feeling of a common nationality began to exist there only feebly, if, without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was shameful to assist him in maintaining his dominion, from that day almost our Empire would cease to exist."

এইরূপ আরও অনেক কথা তিনি তাঁহার "The Expansion of England" নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার কিছু কিছু জানুয়ারী মাসের মডার্ণরিভিউ কাগজে ৬৮—৬৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই দুজন ইংরেজ গ্রন্থকারেরও অনেক পূর্ব্বে একজন ভারতীয় পুরুষপ্রবরের মাথায় অন্য একপ্রকার সহযোগিতা-বর্জ্জনের সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। তিনি রামমোহন রায়। তাঁহার ইংলণ্ডপ্রবাসকালে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সংস্কার আইন (Reform Act) বিধিবদ্ধ হওয়া উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার বন্ধু উইলিয়ম্ রাথ্‌বোন্‌কে ৩১শে জুলাই লিখিয়াছিলেন—

"I am *now* happy to find myself fully justified in congratulating you and my other friends at Liverpool on the *complete* success of the Reform Bill, notwithstanding the violent opposition and want of political principle on the part of the aristocrats. The nation can no longer be a prey of the few who used to fill their purses at the expense, nay, to the ruin of the people, for a period of upwards of fifty years.....

"As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country [England], I refrained from writing to you or any other friend in Liverpool until I knew the result....."

বিলাতী সংস্কার আইন পাস্ না হইলে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সমুদয় সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজাও তিনি থাকিবেন না, কোন স্বাধীন দেশে চলিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কারণ তিনি ঐ চিঠিতে [redacted] লিখিতেছেন—"thank Heaven, I can now feel proud of being one of your fellow subjects," ইত্যাদি। আমাদের দেশের সংস্কার আইন "*Complete* success" হয় নাই, উহা মডারেট্‌দেরও পছন্দসই হয় নাই। সুতরাং তাঁহার মতানুবর্ত্তী কেহ যদি তাঁহার মত ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য ছাড়িয়া গিয়া তাহার সহিত সমুদয় সম্পর্ক ত্যাগ না করেন, তদপেক্ষা অল্পমাত্রায় সহযোগিতা বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে আশা করি উহা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইবে না।

আমরা সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতির বিরোধী না হইলেও, উহাকেই জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র উপায় মনে করি না। আমাদের বিরোধী, উৎপীড়ক ও অপমানকারী যাহারা তাহাদের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। যেমন তাহাদের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, তেমনি নরনারী নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম-জাতি-জা'ত-বংশ-শ্রেণী নির্ব্বিশেষে দেশের সমুদয় লোকের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। যাহাতে সকলেরই কল্যাণ হয় তাহা করিতে হইবে, যাহাতে সকলেই নিজনিজ কল্যাণ সাধনের পূর্ণ সুযোগ পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বরাজের মানেই এই, যে, রাজার ও "রাজের" কাজ যাহা, "স্ব" তাহা করিবে। এখন ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের হাতে যে-কাজের ভার আছে এবং যাহা তাহারা নিজেদের স্বার্থের অবিরোধী যতদূর ও যতটুকু বুঝিতেছে তাহাই করিতেছে, তাহা ভাল করিয়া আমাদিগকে করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত হইতে হইলে দেশের সব লোককে জাগ্রত হইয়া সুস্থ সবল দেহ, জ্ঞানসম্পন্ন দৃঢ় মন এবং প্রীতি ও মৈত্রীতে পূর্ণ উদার হৃদয় লাভ করিতে হইবে। এইজন্য সকলের সহিত সহযোগিতার প্রয়োজন।

কংগ্রেসে সহযোগিতা-বর্জ্জনের যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা আমরা করিতে পারিব না, তাহার স্থান নাই। প্রস্তাবটি একটি ছোট প্রবন্ধের মত লম্বা। আমরা মোটামুটি আমাদের মত বলি। গান্ধী মহাশয় তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া (paralysing the Government) তিনি স্বরাজ লাভ করিবার আশা করেন। অতএব তাঁহার মত ও চেষ্টা যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে কি কি প্রকার সহযোগিতা বর্জ্জন দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে অচল করা যায়।

এক উপায় হইতেছে, দেশের লোকের পক্ষে সৈনিক ও অসৈনিক কোন প্রকার সরকারী চাকরী না করা। কারণ, আমরা যতকম টাকায় গবর্ণমেণ্টের যেরূপ কাজ

করিয়া দি, সেই মাহিনায় বিদেশ হইতে যোগ্যতাবিশিষ্ট লোক কখনও পাওয়া যাইবে না। দেশের সমগ্র লোক-সমষ্টির খুব সামান্য অংশ সর্‌কারী চাকরী করিয়া খায়। সুতরাং সর্‌কারী চাকরী বর্জ্জন অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃসাধ্য বটে। প্রথমতঃ, এতগুলি লোকের অন্নের সংস্থান যেসব অন্য উপায়ে হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া তদনুরূপ সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের জায়গায় অন্নের কাঙাল অন্য লোক যাহাতে না জুটে, তাহারও উপায় করিতে হইবে। অর্থাৎ দেশ হইতে দারিদ্র্য ও বেকার-অবস্থা (unemployment) দূর করিতে হইবে। ইহা বৃহৎ ও কঠিন সমস্যা। ইহার পূর্ণ সমাধান না হইলে যে আমাদের উদ্দেশ্য একটুও সিদ্ধ হইবে না, তাহা নয়; সমাধানের দিকে কতকটা অগ্রসর হইলেও কতক ফল পাওয়া যাইবে। বাহিরের দিকে যাহা করিতে হইবে, তাহা উপরে বলিয়াছি। ভিতরের দিকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আরও দরকারী। যে-গবর্ণমেণ্ট আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চলে না, যাহা আমাদের নির্য্যাতন ও অবমাননার প্রশ্রয় দেয়, যাহা আমাদের কল্যাণের আগে স্বদেশবাসীর স্বার্থ ও প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চায়, সেরূপ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকারে সেবা বা সাহায্য করা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়, এই বিশ্বাস দেশবাসী সকলের মনে উৎপাদন হইতেছে সেই অন্তরের দিকের কাজ। কিন্তু জানিয়া রাখা চাই, যে, যেমন বিজেতারা বন্দীদের দ্বারা কাজ করায়, তেমনি যতদিন গবর্ণমেণ্টের অস্ত্রবল আছে, ততদিন গুলি ও বোমার প্রভাবে বন্দীর মত কাজ করিবার লোক সর্‌কারের জুটিবে। সুতরাং অনেক জালিয়ানওয়ালা বাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় উপায় হইতেছে, গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স্ না দেওয়া। গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধনে ধনী হইয়া, সেই ধনের লোভ দেখাইয়া ও সেই ধন দিয়া, নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তী চাকর পাইয়া থাকেন। এই ধনের উৎস বন্ধ করিয়া দিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষমতা লুপ্ত হইবে। কিন্তু ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ যাই করা যাইবে, অমনি গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া তাহা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; কারণ গবর্ণমেণ্টের হাতে এখন দলবদ্ধ-লোকবল ও অস্ত্রবল আছে, যাহা আমাদের নাই। গবর্ণমেণ্টের চাকরেরা শুধু ট্যাক্স্ আদায়ের জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ দরকার, তাহা করিয়াই নিবৃত্ত থাকিবে মনে হয় না। তদুপলক্ষে লুট, অত্যাচার, এবং হত্যাকাণ্ডও হইবার সম্ভাবনা। বল জিনিষটাই এমনি, যে, উহা যাহার উপর প্রযুক্ত হয়, তাহাকেও উত্তেজিত করে। সর্‌কারী চাকরদের দ্বারা বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও শান্তভাবে দরিদ্রীকৃত ও উৎপীড়িত হইবার মত আত্মসংযম যদি, সকল ট্যাক্স্দাতার না হউক, বহুসংখ্যক ট্যাক্সদাতার থাকে, তাহা হইলেও কালক্রমে সিদ্ধিলাভ হইবে। আর যদি পূর্ব্বোল্লিখিত আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃ সর্‌কারী ভারতজাত চাকরেরা স্বদেশী লোকদের উপর উৎপীড়ন করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ত সিদ্ধিলাভ আরও সোজা ও শীঘ্র হইবে।

এই দুটি উপায় অবলম্বনের জন্য মন্ত্রপ্রচার, শিক্ষা, মন্ত্রে দীক্ষা, সাধনা, ও সংযমের প্রয়োজন। নেতারা ভাবিয়া দেখুন, তাহার কি ব্যবস্থা হইয়াছে।

আর একটি উপায়, সাক্ষাৎভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে খুব কার্য্যকর হইতে পারে। বিদেশী জিনিষ যদি আমরা যথাসাধ্য ব্যবহার না করি, তাহা হইলে ইংলণ্ডের লোক বুঝিবে, যে, ভারতের আত্মকর্তৃত্ব না থাকায় লোকেরা ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিতে চায় না। এইজন্য তাহারা এখনকার মত আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভের এরূপ বিরোধী না থাকিতে পারে। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ বণিকেরাও এই কারণে ভারতবর্ষের আত্মকর্তৃত্বের বিরোধী না হইতে পারে। বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনের সদৃশ আর-একটি উপায়, ভারতবর্ষে বিদেশীদের যত কারখানা আছে, তাহাতে ভারতীয় মজুরেরা যাহাতে কাজ না করে, তাহার চেষ্টা করা, এবং ঐসব কারখানায় উৎপন্ন মালের কাটতি যাহাতে ভারতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা। কিন্তু এইরূপ নিবৃত্তি ও নিষেধ-আত্মক চেষ্টার সফলতা শুধু নিবৃত্তি ও নিষেধ দ্বারা হইতে পারে না। যে-সব বিদেশী জিনিষ বা ভারতে বিদেশীর কারখানায় উৎপন্ন যে-সব জিনিষ আমরা ব্যবহার করিব না বলিতেছি, সেইসব জিনিষ ভারতবর্ষে ভারতীয়দের কারখানায় উৎপাদন করিতে হইবে, এবং একদিকে যেমন মজুরদিগকে বিদেশীদের কারখানায় কাজ করিতে নিষেধ করা হইবে, তেমনি স্বদেশীদের কারখানা খুলিয়া তাহাদের কাজ জুটাইয়া দিতে হইবে; কেননা, মানুষ ত না খাইয়া থাকিতে পারে না।

বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন এবং ভারতবর্ষে বিদেশীদের কারখানায় আমাদের শ্রমজীবীদের কাজ না-করা, এই দুটি বিষয়ের আলোচনা কংগ্রেসের সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বিশদভাবে করিয়াছেন।

উপরে যে-সব উপায়ের কথা বলা হইল, তা ছাড়া আর কোন উপায়েই বিশেষ কোন ফল হইবে না; ছেলেরা ইস্কুল কলেজ ছাড়িলেও হইবে না, আইনব্যবসায়ীরা সর্‌কারী আদালতে কাজ করিতে বিরত হইলেও হইবে না।

হাইকোর্ট, চীফকোর্ট প্রভৃতি যে-সব আদালতে দেশী ব্যারিষ্টারেরা ও উকীলেরা কাজ করেন, তথায় তাঁহারা কাজ না করিলে তাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কাজ চলা হইবে না; তাঁহাদের স্থানে যথেষ্টসংখ্যক ইংরেজ আইন-ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হইবে। সালিসী আদালত দ্বারা ঐসব

সরকারী আদালতের স্থান পূরণ ও কার্য্য নির্ব্বাহ, আমাদের বিবেচনায়, হইবে না; এ বিষয়ে আগে কিছু লিখিয়াছি। তবে, আমাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, কখন উকীলও হই নাই, মক্কেলও হই নাই; যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের কথার মূল্য বেশী। নিম্ন আদালত-সকলে অধিকাংশ উকীল-মোক্তারেরা ব্যবসা ছাড়িবেন কি না, এবং ঐসব আদালতের স্থান সালিসী আদালতের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে কি না, সে বিষয়েও আমরা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিতে পারি না। তবে, এ পর্য্যন্ত দেশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের উত্তর "না" ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেশের সেবা করিবার জন্য বিস্তর লোকের প্রয়োজন। এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া যদি আইনব্যবসায়ীরা আদালতের কাজ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সমর্থন ও প্রশংসা করি। কিন্তু কেহ যদি এই মনে করিয়া আইনের ব্যবসা ছাড়েন, যে, তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত বা অচল করা হইবে, তাহা হইলে আমরা আইনব্যবসা ত্যাগ দ্বারা এইরূপ ক্ষতি স্বীকারকে অনাবশ্যক ও ব্যর্থ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমাদের যাহা ধারণা তাহা বলিলাম। অভিজ্ঞতর লোকের কথায় অবশ্য দেশের লোকে অধিক আস্থা স্থাপন করিতে পারেন।

ইহার পর ছাত্রদের স্কুল কলেজ ত্যাগের বিষয়েও কিছু বলিতে চাই। এই সমস্ত বিষয়েই আগে আগে কিছু লিখিয়াছি। ছাত্রদের প্রকৃত কাজ শিক্ষালাভ করা। কিন্তু দেশের বিপদ্ হইলে, সঙ্কট অবস্থা হইলে, অন্য অনেক শ্রেণীর লোককে যেমন নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া দেশের সেবায় লাগিতে হয়, সমর্থ বয়সের ছাত্রদিগকেও তেমনি লাগিতে হয়। এবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। আমাদেরই দেশে দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন ভূমিকম্প ঝড় প্রভৃতিতে যখন বহুসংখ্যক লোক বিপন্ন হয়, তখন রাজনৈতিক সব দলের লোকই কিছু কালের জন্য ছাত্রদিগকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দেশের সেবায় লাগিতে বলেন এবং লাগাইয়া থাকেন। গত মহাযুদ্ধে যখন ইংলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন হাজার হাজার ইংরেজ ছাত্র পড়াশুনা ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল, এবং তন্মধ্যে অনেকে আহত ও হত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও যদি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় মনে হইত, তাহা হইলে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের অন্য আপত্তি যাই থাক্, এ আপত্তি আমরা করিতাম না, যে, যুদ্ধে গেলে ছেলেদের লেখাপড়ার ক্ষতি হইবে।

এখন দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের ছাত্রদের কর্ত্তব্য কি? দেশ যে বিপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়িলেই সত্য সত্য গবর্ণমেণ্টের অচল হইবার কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। "গবর্ণমেণ্ট খুব অত্যাচারী, গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের বিশ্বাসভাজন নহেন," অতএব এরূপ গবর্ণমেণ্টের স্কুলকলেজে বা উহার সাহায্যপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত স্কুলকলেজে পড়া অত্যন্ত অপমানের বিষয়. ইহাতে জাতীয় আত্মসম্মান বজায় থাকে না,—এবম্বিধ যুক্তি অনেকবার শুনিয়াছি। সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্যও নানাপ্রকারে বলিয়াছি। আবার বলি। বিদেশীর অধীনতা অপেক্ষা জাতীয় কলঙ্ক ও জাতীয় অপমান আর নাই। ছেলেরা ইস্কুল-কলেজে থাকিলেও যেমন, বাহিরে আসিলেও তদ্রূপ, এই কলঙ্কের ছাপ আমাদের সকলের ন্যায় তাহাদের কপালে মারা থাকিবে। বাহিরে আসিলেই জাতীয় স্বাধীনতা মিলিবে না। বলিতে পারেন, ইস্কুলকলেজে জাতীয় অপমানজনক কোন কোন নিষেধবিধি মানিতে হয়। তাহা বোঝার উপর শাক-আঁটি মাত্র। ইংরেজীতে বলে, উট গিলিয়া মশা গিলিতে ইতস্ততঃ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অন্যদিকে বিবেচ্য, ইস্কুল-কলেজে পড়িয়া ছেলেরা এরূপ মানসিক অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারেন (যেমন অনেক নেতা করিয়াছেন), যাহা অস্ত্রব্যবহারবর্জ্জিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে কাজে লাগে ও লাগিতে পারে। বলিতে পারেন, জাতীয় ইস্কুল-কলেজে (National schools and colleges এ) এই অস্ত্রসংগ্রহ আরো ভাল করিয়া হইবে। অতি ঠিক্ কথা। জাতীয় ইস্কুল-কলেজ যত খোলা হইবে, সমস্ত পূর্ণ হইয়া যাক্; তাহাতে আমাদের আপত্তি হওয়া দূরে থাক, আমরা তাহাতে আহ্লাদিতই হইব। কিন্তু ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার আমরা বিরোধী। জাতীয় ইস্কুল কলেজ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ছেলেরা বর্ত্তমান ইস্কুল কলেজ সব ছাড়ুক, তাহার আগে নয়, আমরা এই চাই।

বলিবেন, বর্ত্তমান ইস্কুল-কলেজগুলিতে ভাল শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাহা স্বীকার্য্য। এইজন্য, হয় তদপেক্ষা ভাল শিক্ষালয় স্থাপন করুন, নতুবা বর্ত্তমান শিক্ষায়তনগুলির সংস্কার-চেষ্টা করুন; শুধু শুধু ভাঙ্গিয়া কি হইবে? যিনি যাহাই বলুন, আমরা এগুলির ছাত্রও ছিলাম, শিক্ষকও ছিলাম, সুতরাং নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এগুলির দ্বারা ভালও হইয়াছে এবং হইবে, অবিমিশ্র অনিষ্ট হয় নাই ও হইবে না।

সুতরাং যদি ছাত্রদিগকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা দেওয়াই সহযোগিতাবর্জ্জন-প্রচেষ্টার নেতাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, আবার বলি, তাঁহারা উৎকৃষ্টতর শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া ও চালাইয়া নমুনা দেখান্, তাহা হইলে কোন তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হইবে না।

এরূপ তর্কও হইয়াছে, যে, বর্ত্তমান ইস্কুলকলেজগুলি

না ভাঙ্গিলে লোকের সরকারী চাকরী গ্রহণের প্রবৃত্তি যাইবে না। আমরা সরকারী চাকরী গ্রহণের পক্ষে কোন কালে ওকালতী করি নাই। আমরা বলি, মানুষের ত কিছু করিয়া খাওয়া চাই, যদি সরকারী চাকরীর লালসা ঘুচাইতে চান, এরূপ শিক্ষালয়ে এরূপ শিক্ষা দেন, যাহাতে স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহা হইলে আরও এই এক সুফল হইবে যে কালক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে চাকর পাওয়া কঠিন হইবে—যাহা সহযোগিতা-বর্জ্জনের নেতারা চান।

ছাত্রদিগকে জাতীয় শিক্ষা, উৎকৃষ্ট শিক্ষা, দেওয়া যদি নেতাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যাহা করিতে হইবে, বলিলাম। তাঁহারা "করিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেই লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবেন না। কারণ, সম্পূর্ণ স্বাধীন শিক্ষায়তন স্থাপনে, বলিতে গেলে, এক হরিদ্বারে শ্রদ্ধানন্দ, মহারাষ্ট্রে অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্‌বে মহাশয় এবং মাদ্রাজ প্রদেশে মিসেস্ বেসাণ্ট কতকটা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টার মধ্যে বা ইস্কুলকলেজ ভাঙার মধ্যে নাই। কলিকাতার জাতীয় শিক্ষাপরিষদও কিছু করিয়াছেন। তাহারও নেতারা বোধ হয় সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টার রাজনৈতিক দিকটার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহেন।

কোন কোন নেতা বলিয়াছেন, এটা যুদ্ধ—অবশ্য অস্ত্রব্যবহারবর্জ্জিত। মানিলাম। তাঁহারা গত মহাযুদ্ধে ইউরোপীয় ছাত্রদের কাজের উল্লেখও করিয়াছেন। তাহাও বুঝি। ঐ যুদ্ধে ইউরোপীয় ছাত্রদিগকে কি করিতে হইয়াছিল? প্রথমে তাহারা শিক্ষায়তন ছাড়িল, তাহার পর যুদ্ধ শিথিল, তাহার পর যুদ্ধ করিতে গেল। সবই নির্দ্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ। আমাদের ছাত্রদিগকে যদি অস্ত্রব্যবহার-বর্জ্জিত সংগ্রামে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য শিক্ষায়তন চাই, শিক্ষা চাই, এবং কোথায় কি কাজ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা তাহাদের জানা চাই। ইহার সুবন্দোবস্ত নেতারা করুন। ইউরোপে যে-সব ছাত্র যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ দেশের সরকারী রাজস্ব হইতে হইয়াছিল। আমাদের নিরস্ত্র যোদ্ধাদের ব্যয় আমাদের সরকারী তহবিল হইতে পাওয়া যাইবে না। কোন্ তহবিল হইতে পাওয়া যাইবে, তাহা নেতাদিগকে স্থির করিতে হইবে। একজন নেতা কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা বাহির হইয়া আইস, এক কোটি টাকা দিয়া জাতীয় বিদ্যালয় গড়িয়া দিব। অপর একজন আলিগড়েও ঠিক্ অত টাকা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কথা রাখিতে পারিয়াছেন কি না, এখনও তাহা খবরের কাগজে বাহির হয় নাই।

কংগ্রেসে যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহাতে যথেষ্ট মুন্‌শিয়ানা আছে। কিন্তু নেতারা যদি গোস্তাকী মাফ্ করেন, তাহা হইলে বলি, যে, উহাতে একটু কূট-নীতির, একটু চাতুরীর ছাপ আছে। একমাত্র (১৬ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের) ছাত্রদিগকেই অবিলম্বে ("without delay") ("irrespective of consequences") ফল চিন্তা না করিয়া, বর্ত্তমান ইস্কুল-কলেজগুলি ছাড়িতে বলা হইয়াছে—অবশ্য যদি তথায় থাকা তাহাদের বিবেকে বাজে। আইনজীবীদিগকে প্রাক্‌টিস্ "স্থগিত" রাখিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে; "অবিলম্বে", "ফলচিন্তা না করিয়া" প্রাক্‌টিস্ "ছাড়িতে" অনুরোধ করা হয় নাই। "যদি তাঁহাদের বিবেকে বাজে," তাহা হইলে "অবিলম্বে" প্রাক্টিস্ "ছাড়িতে" কেন বলা হয় নাই? অগ্রে আরো কিছু টাকা পুঁজি করিবার জন্য ও পরিবার প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য? সরকারী আদালতে প্রাক্টিস্ করা, যদি দেশের কল্যাণের অবিরোধী না হয়, যদি তদ্দ্বারা দেশের অমঙ্গল হয়, কিম্বা যদি উহা দেশের মঙ্গল সাধনের অন্তরায় হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আইনব্যবসায়ীদের বিবেকে বাজিবে। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিও কংগ্রেসের অনুরোধ ঠিক্ ছাত্রদের প্রতি অনুরোধের ভাষায় হওয়া উচিত ছিল। বিদেশী জিনিষের বণিক্‌দের প্রতি অনুরোধেও "অবিলম্বে," "ফলচিন্তা না করিয়া," "যদি বিবেকে বাজে," শব্দগুলি প্রযুক্ত হয় নাই। যেরকম জিনিষ দেশে হয়, বিদেশী সেরকম জিনিষ বিক্রী করা দেশের অনিষ্টকর, সুতরাং তাহা বিবেকে নিশ্চয়ই বাজা উচিত বলিয়া, না হয় ঐ কথাগুলি প্রযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অন্য কথাগুলি কেন ব্যবহৃত হইল না? জানি, তাহাতে আইনজীবীদের ও উক্ত বণিক্‌দের খুব লোক্‌সান হইতে পারে। কিন্তু এত ফলাফলচিন্তাহীন স্বার্থত্যাগের বোঝাটা ছাত্রদের ঘাড়ে চাপান ভাল হয় নাই। কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাটির প্রস্তাবক, সমর্থক, পোষক এবং তৎপক্ষে ভোটদাতাদের মধ্যে বিস্তর আইনব্যবসায়ী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহারা অগ্রে নিজ নিজ স্বার্থনাশ করিয়া ঐ প্রতিজ্ঞার পক্ষ অবলম্বন করিলে সুশোভন হইত, এবং বেশী ফল হইত।

যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া নিজের প্রণালী অনুসারে দেশের কাজ করিতে চান, তিনি অবশ্যই করিবেন। তাঁহার পক্ষে কাহারও অনুরোধের দরকার নাই, কাহারও নিষেধও তিনি শুনিবেন না। তবে, তাঁহাকেও ভাবিতে হইবে আরো জ্ঞানলাভ করিলে ভাল হয় কি না।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশ্যন্।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড পঞ্জাবের বিভ্রাটের জন্য কি পরিমাণ দায়ী তাহা সকলেই জানে। তাঁহাকে চাকরী ছাড়াইয়া বিলাতে লইয়া যাবার জন্য বিলাতী মন্ত্রীসভাকে অনুরোধ চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয়দলেরই কোন কোন নেতা ও সভা করিয়াছিলেন। তিনি যদি এবার কলিকাতার কনভোকেশ্যনে উপাধি-পত্র বিতরণ করেন ও ছাত্রেরা তাঁহার মত লোকের নিকট হইতে উহা লইতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইবে না।

সাহিত্যাচার্য্য জেম্‌স্ ড্রামণ্ড্ এণ্ডার্সন।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে যে চিঠি লিখিয়াছেন, নীচে তাহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইল।

"পরিষদের পক্ষে একটি শোকের সংবাদ আছে। গত ২৪শে নভেম্বর, জেম্‌স্ ড্রামণ্ড্ এণ্ডার্সন্ ডি,-লিট্, মহোদয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কেম্ব্রিজে বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এরূপ অকৃত্রিম সুহৃৎ আর কেহই দৃষ্টিগোচর হন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি এখানকার লেখকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট প্রচার করিতে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। টাইম্‌স্ পত্রিকার জন্য ইনি বহু বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করেন,—বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে পূর্ণ ইহাঁর সমালোচনাগুলি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি ইনি বাঙ্গালা ভাষার একখানি ছোট ব্যাকরণ ও পাঠমালা ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় A Manual of the Bengali Language নাম দিয়া Cambridge Guides to Modern Languages গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বইয়ে ও তাঁহার Peoples of India নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় (কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকাশিত) তিনি আমাদের পরিষদের নাম উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ প্রশংসার সহিত ইহার কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে, ইহা প্রাচ্যভাষার মধ্যে অন্যতম মাত্র, ইহাতে আধুনিকত্ব, জীবন ও গতি বিশেষ কিছুই নাই, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশে পড়িয়া ইউরোপে জনসমাজের কাছে অজ্ঞাত অনাদৃত না হয়, যাহাতে খালি Oriental language নহে, Modern language হিসাবেও সমাদৃত হয়, তজ্জন্য তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি ছিল বাঙ্গালা দেশ; এই সূত্রে তিনি আপনাকে 'বাঙ্গালী' বলিয়া দাবী করিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্য-চেষ্টার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি স্থাপন করিয়া আনন্দ পাইতেন। বাঙ্গালায় ইঁহা সাহিত্যবন্ধু অনেক আছেন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণে মধ্যে বোধ হয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইহাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। রাজকর্ম্ম উপলক্ষে আসাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইনি বঙ ভাষার ব্যাকরণ ও বঙ-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া সরকারের তরফ হইতে প্রকাশিত করেন। জার্ণাল অভ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে বাঙ্গালা-উচ্চারণ-রীতি বাঙ্গালার কর্ম্মবাচ্য ও বাঙ্গালা ভাষায় ভোট-বঙ্গ (বড প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। পরি ষদের সহিত সম্পর্ক ইনি অতি গৌরবের সহিত প্রকা করিতেন। ইহাঁর হাতের বাঙ্গালা অক্ষর সুন্দর। অনেক সম তাঁহার পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে বাঙ্গালাতেই পত্রব্যবহা করিতেন। ইহাঁর পরলোকগমনে পরিষদের এক আন্তরিক হিতৈষীর অভাব ঘটিল, সন্দেহ নাই। ইহাঁর মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিয়া ইহাঁর পরিবার বর্গকে সমবেদনা জানান কর্ত্তব্য। আমার প্রতি ইহাঁ বিশেষ স্নেহ ছিল। ইহাঁর সমাধির উপর অর্পণ করিবা জন্য কিছু ফুল পাঠাইয়া ইহাঁর দেহত্যাগে ব্যক্তিগতভাবে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ অর্ঘ্য প্রদানের চেষ্ট করিয়াছি। যুদ্ধে ইহাঁর এক পুত্র নিহত হন। ইনি সদানন্দ, মিষ্টালাপী, কোমলপ্রকৃতির লোক ছিলেন, এব ইহাঁর সারল্য ও বিনয় ইহাঁর কথাবার্ত্তায় ও পত্রাদিতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিত।"

পুষ্প-সুরভি

অর্থ বরং কতক বলে বিহগগণের কাকলী,—
ফুলের সুবাস কেবল আভাস, পরাণ যে দেয় আকুলি।
জাগরণেই স্বপ্ন আনে, রাজ্য বসায় রেখাতে,
অমৃতেরি খবর আনে, চন্দ্রকরের লেখাতে।
জাগায় সে যে খেলার তরে জলদজালের দামিনী,
দেখায় চিকের আড়াল দিয়ে মধুর দোলের যামিনী।
ক্ষুদ্রে রাখে ক্ষুদ্র করে, গৌরবের এই ধরমই,
ইঙ্গিতেরি সঙ্গীত ও বুঝে কেবল মরমই।
ক্ষুদ্র সূচীর ছিদ্র দিয়ে আকাশ দেখায় আভাসে,
একতারাতে ধ্রুপদ বাজায় নিপুণ বাদক কেবা সে!
মস্ত ও যে পুস্তকালয়, বৃথায় পুঁথি উথারি,
বর্ণপরিচয়ের পাঠক নিত্যই ফিরি দুখারী।
উহার বাণী বিরাম জানি পাইনে সাড়া কানেতে,
অর্থ উহার সার্থক হায় বুকের অভিধানেতে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিদ্রুম

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।
চিত্রাধিকারিণী মহামহিমাময়ী শ্রীমতী মহারাণী মেরী।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৭

৫ম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

বৌদ্ধদিগের জাতকগ্রন্থ পাঠে প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়। বিবরণগুলি যদিও সামান্য, কিন্তু সে-সমুদয় একত্রিত করিলে খৃষ্টজন্মের অন্যূন ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল আমরা তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর আভাস প্রাপ্ত হই।

সেকালে যে-সকল স্থানে উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল তন্মধ্যে গান্ধার প্রদেশের রাজধানী তক্ষশিলা নগরীই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানের দূরত্ব ও পর্য্যটনে বহু ক্লেশ ও বিপদ থাকা সত্ত্বেও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নানা শ্রেণীর ছাত্রগণ জগদ্বিখ্যাত আচার্য্যগণের পদতলে সমাসীন হইয়া শিক্ষা লাভের জন্য তথায় একত্রিত হইতেন। তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে কোন শিক্ষাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইত না। তিল-মুট্ঠি (তিল-মুষ্টি) জাতকে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে স্বনামখ্যাত অধ্যাপকগণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাসমাপ্তির উদ্দেশ্যে নৃপতিগণ নিজ নিজ পুত্র-দিগকে বহু দূরবর্ত্তী সেই তক্ষশিলায় প্রেরণ করিতেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষত্ব ছিল ইহার ছাত্রাবাস। তথায় বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীয় ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইত। তিলমুট্ঠি জাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে [illegible] বাসের ছাত্রগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যাঁহারা শিক্ষকের বেতন দিতেন এবং যাঁহারা উহা দিতে অসমর্থ ছিলেন। যখন কোন ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভার্থ আগমন করিতেন তখন তিনি এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, আচার্য্যকে তাহা জ্ঞাপন করিতে হইত। ব্রহ্মদত্ত কুমার বিদ্যালাভার্থ গমন করিলে আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল কথা—তুমি কি বেতন আনিয়াছ? না, শিক্ষাদানের বিনিময়ে গুরুশুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা কর?" যে-সকল ছাত্র শিক্ষকের পারিশ্রমিক দিতে সমর্থ হইতেন তাহারা গুরু-গৃহে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের ন্যায় সমাদরে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিতেন; কিন্তু যাঁহারা বেতন দিতে অপারগ ছিলেন তাঁহারা সমস্ত দিন কূপোদক উত্তোলন, [illegible] প্রভৃতি ভৃত্যকার্য্য করিয়া রাত্রিকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন।

উচ্চশিক্ষার্থ যে-সকল ছাত্র তক্ষশিলায় গমন করিতেন তাঁহারা সাধারণতঃ গুরুদক্ষিণা বাবদ সহস্র কাহণ (কার্ষাপণ) সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই অর্থ লইয়াই সম্ভবতঃ তথায় অবস্থানকালীন ছাত্রদের খাদ্য-ও পরিধেয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু উচ্চশিক্ষার দ্বার যে শুধু অর্থশালী ব্যক্তিদিগের জন্যই উন্মুক্ত ছিল, তাহা নহে; পরন্তু দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন

সেইজন্যও স্থানে স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। লোসক (রোষক) জাতকে বর্ণিত আছে যে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে স্বনামখ্যাত শিক্ষক হইয়া পাঁচশত ছাত্রকে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তৎকালে বারাণসীর অধিবাসীগণ দরিদ্র ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যয়ভার বহন করিয়া তাঁহাদিগকে অবৈতনিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতেন।

ছাত্রজীবনের বিবরণ বিশদরূপে জাতকগ্রন্থের কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। তবে যৎসামান্য যাহা স্থানে স্থানে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ছাত্রগণ গুরুগৃহে অপত্যনির্ব্বিশেষে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন। পাদুকাদ্বয় ও একটি পর্ণছত্র মাত্র সহায় করিয়া, বিদ্যার্থী রাজপুত্রগণকেও তক্ষশিলায় গমন করিতে হইত। যে সহস্র কাহপন (কার্ষাপণ) ছাত্রগণ সঙ্গে লইয়া যাইতেন তাহা শিক্ষার প্রারম্ভেই আচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হইত। আমোদ-প্রমোদের জন্য নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহাদের হস্তে রক্ষিত হইত না। জুণ্হ (জ্যোৎস্ন) জাতকে বর্ণিত ঘটনা হইতে অনুমান হয় যে, রাজকুমারগণেরও হাতখরচার জন্য নিজের নিকটে এক কপর্দ্দকও রাখিবার অনুমতি ছিল না। কাশীরাজপুত্র জুণ্হ-কুমার একদা রজনীকালে আচার্য্যের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে ঘনান্ধকারে জনৈক ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হয়েন এবং তাহাতে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভগ্ন হয়। তখন ব্রাহ্মণ তণ্ডুলের মূল্য প্রার্থনা করিলে রাজকুমার বলিলেন—"আমি এক্ষণে তণ্ডুলের মূল্য প্রদানে অসমর্থ; কিন্তু আমি কাশীরাজের পুত্র জুণ্হ-কুমার। আমি রাজ্য প্রাপ্ত হইলে আমার নিকট গমন করিয়া মূল্য প্রার্থনা করিও।" ছাত্রদের যে কিরূপ কঠোর শাসনে জীবনাতিপাত করিতে হইত তাহা উল্লিখিত ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়। নদীতীরে যাইয়া স্নান করিবার স্বাধীনতা পর্য্যন্তও তাঁহাদের ছিল না। স্নানের সময়ে শিক্ষকগণ সুশাসন রক্ষার্থ ছাত্রদিগের সমভিব্যাহারে স্বয়ং গমন করিতেন এবং কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন। তিলমুট্ঠি জাতকে লিখিত আছে যে একদা একটি ছাত্র শিক্ষকের সহিত স্নানে যাইবার সময়ে বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত কয়েকটি মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। অপরাধের বিষয় শিক্ষকের কর্ণগোচর হইলে তিনি দুইটি ছাত্রের সাহায্যে দোষীর হস্ত-যুগল আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং বংশদণ্ড দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে প্রহার করিলেন।

কুক্কুটের রবে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ছাত্রেরা অতি প্রত্যুষে পাঠাভ্যাসে রত হইতেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই সম্ভবতঃ কুক্কুট পালন করা হইত এবং ইহাদের দ্বারা ঘটিকার কার্য্য সর্ব্বত্র সম্পাদিত হইত। অসময়ে কুক্কুটের রবে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ছাত্রেরা কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইতেন তাহা অকালরাবি (অকালরাবী) জাতকে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য রাত্রিতে কুক্কুটের রব শ্রবণ করিয়া যখন ছাত্রদের নিদ্রাভঙ্গ হইত তখন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া তাঁহারা পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন না; কারণ পুস্তকের যে অংশে পাঠলাভ করিতেন তাহা তন্দ্রাবশে দৃষ্টিগোচর হইত না। যখন সূর্য্যোদয়ে কুক্কুটের রব শ্রবণ করিয়া পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তাঁহাদের পাঠিত স্থানগুলি আবৃত্তি করিবার অবকাশ থাকিত না। এই ব্যাপার হইতে অনুমান হয় যে, গৃহে পাঠাভ্যাসের জন্য ছাত্রদের দুইটি সময় নির্দ্ধারিত ছিল। প্রথমভাগ, পুস্তক সাহায্যে শিক্ষালাভে; এবং দ্বিতীয় ভাগ, অধীত বিষয়ের পুনরালোচনায় ব্যয়িত হইত। এই দুইটি কার্য্যই সম্ভবতঃ দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইত।

জাতকে বর্ণিত হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যগণ সকলেই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা রাজাপ্রজা সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। এই আচার্য্যগণ যে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা নহে, কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ও ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সরভঙ্গ (শরভঙ্গ) জাতকে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাজকুমার জ্যোতিপাল শিক্ষা বিষয়ে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করায়, আচার্য্য পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় বর্ম্ম তরবারি ও তীরধনুক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এই আচার্য্য ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন—যিনি কলাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা উভয়বিধ বিদ্যাই শিক্ষা দিতেন। একজন আচার্য্যের অধীনে ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচশত ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। ইহাঁদের অধ্যাপনা-কার্য্যে আচার্য্য অন্যান্য শিক্ষকগণেরও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। জাতকগ্রন্থে তাঁহারা পিট্ঠিয়াচরিয়ো

(পৃষ্ঠ্যাচার্য্য বা পৃষ্ঠাচার্য্য) অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষক বা সহায়ক বা সহকারী আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্রধান প্রধান শিষ্যগণও (জেট্ঠন্তেবাসিকো অর্থাৎ জ্যেষ্ঠান্তবাসিকঃ) আচার্য্যের অধ্যাপনা-কার্য্যে অনেক সহায়তা করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋক সাম যজু এই তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত। এই অষ্টাদশ শিল্প কি কি তাহা জাতকগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই, তবে স্থানে স্থানে দুই একটি নাম—যথা, ধনুর্ব্বিদ্যা, হস্তিবিদ্যা—প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিনয়পিটকে বর্ণিত জীবকের উপাখ্যান হইতে অবগত হওয়া যায় যে আয়ুর্ব্বেদ ও শল্যবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। সাধারণ শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছাত্র কোন একটি শিল্প বা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের প্রয়াস পাইতেন। অসদিস (অসদৃশ) জাতকে কথিত আছে যে বোধিসত্ত্ব অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তক্ষশিলায় গমন করিয়া জনৈক প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্প শিক্ষা করেন এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপ আর-একটি বিবরণের উল্লেখ জাতকে (Vol. III, 374) প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলায় গমন করিয়া সমস্ত শিল্পবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ যোগ্যতা লাভ করায় তিনি ক্ষুদ্রধানুষ্ক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত জাতকের অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে ছাত্রগণ অনেক সময়ে শুধু একটিমাত্র বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তক্ষশিলায় গমন করিতেন। সুসীম জাতকে বর্ণিত আছে যে রাজপুরোহিতের পুত্র কেবলমাত্র হস্তিচালনাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গমন করেন। অনভিরতি জাতকে লিখিত আছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ শুধু মন্ত্র শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন। বিনয়পিটক হইতে অবগত হওয়া যায় যে জীবক কেবল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় গিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সমস্ত শিল্প বা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা শুধু পুস্তকস্থ বিদ্যা ছিল না; তাহাদের ব্যবহার-প্রণালীও ছাত্রদের আয়ত্ত করিতে হইত। তিলমুট্ঠি জাতকে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মদত্তকুমার তক্ষশিলায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে পিতা-মাতার সমক্ষে অধীত শিল্পসমূহের ব্যবহার প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। জীবক যখন তক্ষশিলায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন তখন ৩।৭ মাইলের মধ্যে যত বৃক্ষলতা ছিল তাহার ব্যবহার-প্রণালী তাঁহাকে শিখিতে করিতে হইয়াছিল। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি যে কয়েকটি গুরুতর অস্ত্রচিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা হইতে অনুমান হয় যে তক্ষশিলায় ব্যবহারিক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত।

শিক্ষা-সমাপ্তির পর ছাত্রগণ লোকচরিত্র ও নানা দেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আশায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এই দেশপর্য্যটন শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেতকেতু (শ্বেতকেতু) জাতকে বর্ণিত আছে যে শ্বেতকেতু তক্ষশিলায় বিদ্যালাভ করিয়া তৎকালের শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। দরীমুখ জাতকে লিখিত আছে যে দুই বন্ধু তক্ষশিলায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নানা দেশের আচার ব্যবহার ও শিল্পকলা শিক্ষা করিবার জন্য বহু নগর ও জনপদ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিকদার।

কার তরে ?

কার তরে ফুল ফোটে ?
　　বায়ু কয় "আমার লাগিয়া।"
"মোর তরে" তুলিয়া গুঞ্জন
　　অলি কয় ভীষণ রাগিয়া।
"ফুল ফোটে" ফুলদানী কহে
　　বাড়াইতে আমার শোভারে।
"ফোটার লাগিয়া ফুটি আমি"
　　কহে ফুল ডাকিয়া সবারে!

"বনফুল"

জন্ম-জন্মান্তর

(১) তরুণের সন্ধান।

একুশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ একুশ বছর ধরিয়া তরুণ পৃথিবীর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নারীর বিশ্বরূপ দেখিবার জন্ত উল্লসিত হইয়া ঘুরিয়াছে। জাহাজের কেবিনে ঢুকিয়া খোলা জানালার পাশে সোফায় সে শুইয়া পড়িল;—নীচে সাগরের অবিশ্রাম কল্লোলধ্বনি, উপরে তারাভরা আকাশের প্রশান্তি। অন্ধকার-অবগুণ্ঠিতা রাত্রির মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল—এ দীর্ঘ-জীবন ধরিয়া কোন্ রহস্যময়ীর সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, কত বর্ণের কত সমাজের কত নারীর পরিচয় লাভ করিয়াছে, কোন্ চিরচঞ্চলা সৌন্দর্য্যময়ীর অঞ্চলের পিছন পিছন ছুটিয়াছে; সে দেখা দেয়, ধরা দেয় না, ঘাটের পর ঘাট তরী লইয়া ঘুরিল, কোনো সোনার পায়ের স্পর্শ এখনও কি পৌঁছাইল না।

তাহার এ জগৎভ্রমণ ব্যর্থ হয় নাই। ধ্যানরত সাধক যেমন ক্ষণিকের জন্তও আপন আপন আত্মায় অনন্তের উপলব্ধি করিয়া আনন্দে অধীর হন্, তেম্নি সেও মাঝে মাঝে নারীর মধ্যে বিশ্বের চিরসৌন্দর্য্যকে, চিরবহমান বিশ্বের সৌন্দর্য্যধারার মধ্যে কোন্ অচঞ্চলা অনন্ত-যৌবনা পূর্ণ-সৌন্দর্য্যময়ীকে দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছে।

তাহার সারাজীবনের সন্ধানযাত্রার কথা সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

প্রথমে মনে পড়িল পারস্যের নর্ত্তকী সেলিমা। সূর্য্যের আলোভরা অলসমধুর মধ্যাহ্নে দ্রাক্ষাবনাচ্ছন্ন এক গিরি-শিখরে গোলাপকুঞ্জের মধ্যে সে বসিয়া ছিল; মাথার উপর শুভ্র লঘু মেঘ উড়িয়া যাইতেছে, দূরে একদিকে নগরের গম্বুজমীনারগুলি স্বপ্নছবির মত, অপরদিকে শান্ত সাগর পৃথিবীর সবুজশাড়ীর নীলপাড়ের মত জড়ানো। এই দীপ্ত স্নিগ্ধ দিনটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল তাহার অন্তর কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে।

এক মধুর ধ্বনি কানে আসিল। মুখ ঘুরাইয়া দেখিল অদূরে আলোছায়াময় বনপথে এক নারী নৃত্য করিতেছে। সমুদ্রের ন্তায় নীলরেশমের ওড়্না রসতারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলের মত অরুণ যুবতী-তনু জড়াইয়া, জলেভেজা কালোচুলে মধ্যাহ্নরৌদ্র ঝলক দিতেছে, ললাটে অধরে কটিতটে স্নাততনুর রেখায়-রেখায় রবির আলো বিদ্যুতের মত লীলা করিতেছে। পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠিল, লাবণ্যের উজ্জ্বল তরঙ্গ অঙ্গে-অঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তরুণ মুগ্ধনেত্রে সে নৃত্য-লীলা দেখিতে লাগিল।

প্রথমে আরম্ভ হইল জলের নৃত্য। কেমন করিয়া ছোট গিরিনদী রিনিকি-ঝিনিকি হুড়ির মল বাজাইয়া গিরি-গুহা হইতে বাহির হইয়া আসে, ধীরে-ধীরে কেমন করিয়া তাহার চরণের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হয়, কল্লোলধ্বনি পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠে, পৃথিবী জুড়িয়া নদী সমুদ্র কি ছন্দে চলে,—চরণের ভঙ্গিমায় সুন্দরী তাহা দেখাইতে লাগিল।

আপন অন্তরের উল্লসিত আনন্দে সে নাচিতে লাগিল। বাতাসের নৃত্য আরম্ভ হইল। ঘাস হেলাইয়া ফুল দোলাইয়া পাতা কাঁপাইয়া অঞ্চল উড়াইয়া বাতাস কেমন চলে, আপন অঙ্গ হেলাইয়া কটি দোলাইয়া বাহু কাঁপাইয়া অঙ্গবাস উড়াইয়া সুন্দরী বাতাসের সেই নর্ত্তনলীলা দেখাইল।

তারপর অগ্নির নটন। লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা, সমস্ত দেহ অগ্নিশিখার মত কাঁপিয়া উঠিল, পৃথিবী যে ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আকাশের রবি শশাঙ্ক গ্রহ-তারকা যে ছন্দের তালে যুগযুগান্তর ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার চরণপদ্ম সেই ছন্দে তালে-তালে নাচিয়া উঠিল।

শেষে প্রলয়-নৃত্য। বন্যা ঝঞ্ঝা দাবানল যে প্রচণ্ড তীব্র আনন্দে কত বন-উপবন নগর-গ্রাম প্রাসাদ-কুটীর ধ্বংস করে, বিশ্ব জুড়িয়া জন্ম মৃত্যু হাত ধরাধরি করিয়া যে আনন্দে নৃত্য করে, মহাদেব যে সৃষ্টি-স্থিতি-অতীত আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করেন, সেই আনন্দে নটীর দেহ কম্পিত স্খলিত শিহরিত হইয়া নাচিয়া উঠিল; সেই মত্ত আনন্দের উদ্দাম শক্তিতে উদ্বেলিত সিন্ধুর মধ্যে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তরুণের মনেও সেই আনন্দের বন্যা লাগিয়াছিল, সেও সাগরে ঝাঁপ দিয়া মূর্চ্ছিতার দেহ তুলিয়া আনিল।

সে ভাবিয়াছিল একপাশে দ্রাক্ষারসভরা পাত্র আর একপাশে এই নটী সাকী, আর কালিদাস হাফেজ বিদ্যাপতি

শেলি—জগতের যত কবিগণের কাব্যগ্রন্থ লইয়া এই সমুদ্র-তীরে গোলাপকুঞ্জে সমস্ত জীবন কাটানো যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না, সেলিমা এক আমিরের নিকট চলিয়া গেল।

দুর্দ্দম স্বাধীন নগ্ন বর্ব্বর জীবন তাহাকে ডাক দিল। মখ্‌মলের সাজ ও জরির তাজ ছাড়িয়া সে আরব বেদুইনের দলে যাইয়া মিশিল। এই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের সঙ্গে সে পথ-শূন্য তরুশূন্য জলন্ত বালুকা-রাশির উপর দিয়া মরুভূমির পর মরুভূমি তপ্তদেহে শুষ্ককণ্ঠে উষ্ট্রপৃষ্ঠে ঘুরিয়াছে। এই মরুভূমিভ্রমণ তাহার ব্যর্থ হয় নাই। সে বেদুইন-দুহিতা সাদিলাকে পাইয়াছিল। মরুভূমির অগ্নিদীপ্তির সহিত ওয়েসিসের স্নিগ্ধতা মিশাইয়া তাহার সৃষ্টি। সারাদিন যাত্রার পর সন্ধ্যায় অসীম বালুকা-সমুদ্রের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়া গল্প হইত, সে তরুণের কাছে আসিয়া বসিত। আশ্চর্য্য ছিল তাহার চোখ দুটি। খর্জ্জুরবৃক্ষঘেরা ওয়েসিসের জলের মত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কতবার রৌদ্রদীপ্ত মরুভূমির মধ্যে তৃষিত কণ্ঠে সে সেই চোখ দুইটির দিকে চাহিয়াছে, তাহার তৃষ্ণা যেন মিটিয়া গিয়াছে। তরুণের মনে পড়িল সেই ঝড়ের রাত্রি। সেইদিন সন্ধ্যায় এক [redacted]মিক তাহার উপর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন [redacted]ত্রি, রক্তমাখা ছোরা হাতে সাদিলা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিল,—সম্মুখে আসাদের রক্তাক্ত দেহ লুটাইয়া, চাঁদের আলোয় রক্তবিন্দুগুলি উপলমণির মত ঝকঝক করিতেছে, বোঝা গেল আসাদ তাহাকে খুন করিতে আসিলে সাদিলা আসাদকে মারিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সাদিলার অঙ্গুলি-[redacted]া বাহির হইয়া আসিল, দুইজনে দুই ঘোড়া [redacted] তাঁবু ছাড়িয়া পলাইল। সকলে নিদ্রিত, চারিদিক স্তব্ধ, আকাশের তারাগুলি মল্লিকা-ফুলের ঝাড়ের মত তাহাদের মাথার উপর হেলিয়া পড়িয়াছে।

কিছুদূর গিয়াছে, সহসা দূরে যেন সমুদ্রগর্জ্জন হইল। ঝড় আসিতেছে। তাম্বুর লোকেরা নিশ্চিন্ত ঘুমাইতেছে, [redacted]দি তাঁবুতে না ফেরে তবে সকলের জীবন্ত সমাধি [redacted] সাদিলা তরুণকে বলিল, "তুমি একা পালাও; [redacted]াঁবুতে ফিরে যাই।"

"কিন্তু ঝড় হতে সকলকে বাঁচালেও জেনো তোমাকে ওরা মারবে।"

"জানি, দলপতির দুহিতা হলেও আমার শাস্তি মৃত্যু।"

তরুণ বলিল, "তবে চলো, আমরা একসঙ্গে মরবো।"

"না, তা হবে না, তুমি ঠিক এই দক্ষিণে যাও, ঝড় পূর্ব্ব থেকে আসছে, ওই ওয়েসিসে যদি পৌঁছতে পারো বেঁচে যাবে, ঝড়ের পথ অতদূর বোধ হয় নয়।"

"ও হবে না, তুমিও আমার সঙ্গে এসো, আমরা না হয় একসঙ্গে মরবো।"

ততক্ষণে ঝড় নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাঁবুগুলিকে ঝরা পাতার মত উড়াইয়া নৃত্য করিতেছে।

সাদিলা কাতরকণ্ঠে বলিল, "না, ওদের আর বাঁচানো গেল না; তুমি কেন মরবে, চলো তোমাকে বাঁচাই, খুব জোরে যেতে হবে, তুমি ঘোড়া চালাতে পারবে না; এসো আমার ঘোড়ায়।"

সাদিলা তরুণকে আপন অশ্বে তুলিয়া লইল, তাহার ওড়্‌নার সহিত অরুণের কটি বাঁধিল, বাহুতে বাহুতে জড়াইয়া ঝড়ের আগে ঘোড়া ছুটাইল।

ওয়েসিসে আসিয়া পৌঁছিতেই সব বন্ধন খুলিয়া তরুণকে বলিল, "না—মো।" তরুণ নামিতেই সে একবার তরুণের দিকে দীপ্তনেত্রে চাহিয়া ঝড়ের দিকে ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। মরুসমুদ্রের ধূসর বালুতরঙ্গের মধ্যে নিমিষের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। তরুণ বুঝিল, যে ঝড়ে তাহার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী মরিয়াছে, তারি মধ্যে সে মরিতে ছুটিল।

তারপর তাহার মনে পড়িল,—রুসতরুণী অল্‌গার হোমানলশিখার মত শুভ্র পবিত্র মুখ। ভল্গা-নদীর তীরে এক গ্রামের ধারে অল্‌গার সহিত দেখা হয়। অল্‌গা নারীর অধিকার, দরিদ্রের শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিল। রুস কৃষকের বেশ পরিয়া তরুণ তাহার সহিত গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; কত রাত্রি জাগিয়া সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। তাহাদের সহিত ফ্রেড্‌রিক বলিয়া একটি নরওয়ের যুবক ঘুরিত; সে অল্‌গার প্রেমিক। তরুণ একদিন অল্‌গাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি কি বিবাহ করিবে না?" অল্‌গা উত্তর দিয়াছিল, "না, দেশই আমার স্বামী।" কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ওলটপালট হইয়া গেল।

খুব ভোরবেলা একদিন অল্‌গা তাহাকে ঘুম ভাঙাইয়া

তুলিল। তরুণ তাহার সারারাতজাগা মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে অল্‌গা?"

"ফ্রেড্‌রিক্ আত্মহত্যা কোরেছে, তুমি জান্‌তে না, সে এক নিহিলিষ্ট ছিল,—কাউণ্টকে মার্‌তে গিয়ে পারেনি, পুলিস ধর্‌তে এলে আত্মহত্যা করেছে।"

অল্‌গার জ্ঞানোজ্জ্বল মুখখানি বেদনার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে বড় করুণ সুন্দর দেখাইতেছিল। তরুণ তাহার সোনার সুতার মত রাঙা চূর্ণকুন্তলে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "দুঃখ কি অল্‌গা, দেশের জন্য মরেছে।"

অল্‌গা জানাইল, সে রোমান্-ক্যাথলিক নান্ হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তরুণ জানাইল, সে অল্‌গার সহিত সারাজীবন থাকিয়া ফ্রেড্‌রিকের মত কাজ করিতে রাজী আছে। অল্‌গা কান্নার সুরে উত্তর দিল, "না তরুণ, তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও; আমার আর কোনো উৎসাহ নেই।" কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিল, "তোমায় আমি সত্যি ভালোবেসেছিলুম, আজ যাবার দিন বলে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়ত ফ্রেড্‌রিকের চেয়েও বেশী,—তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার যোগ চিরকাল অবিচ্ছিন্ন থাক্‌বে—আমরা শুধু সভ্যতার এক আইডিয়ালে অনুপ্রাণিত হয়ে মিলিনি, আমরা আত্মাতে মিলেছি, সে যোগ ছিন্ন হবে না। কিন্তু এই আইডিয়ালটার সাধনায় শক্তি পাচ্ছি না—।" তরুণ সারাদিন তাহাকে কত বুঝাইল। সন্ধ্যার সময় সেই তপস্বিনীর অম্লান আত্মার শিখার মত দীপ্ত আননের কপোলে চুম্বন-পুষ্প নিবেদন করিয়া বিদায় সে লইল।

তারপর সে ইয়োরোপের ভোগসুখলালসাময় জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নারীকে সকল রূপে জানিবার অদম্য-ঔৎসুক্যে সে পশ্চিমের অভিজাতবর্গের পঙ্কিল জীবনের মধ্যে নামিয়া গেল, সে পঙ্কে কোনো পদ্ম ফুটিয়া আছে কি? ভিয়েনা, ভেনিস্, প্যারিস্,—ইয়োরোপের নগরে নগরে থিয়েটারে বল্‌রুমে ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়ার আড্ডায় সাঁঝোতে—সব স্থানে সে ঘুরিয়াছে। রূপের মদ্যপান করিয়া মাঝে মাঝে তাহারও নেশা লাগিয়াছে, কিন্তু সে তৃপ্তি পায় নাই। নৃত্য-গৃহে নাচিতে নাচিতে তাহারও দেহের শিরায় শিরায় অগ্নি-স্রোত বহিয়াছে, কিন্তু নৃত্যশেষে যখন বাগানে বাহির হইয়া আকাশের শুভ্র ছায়াপথ দেখিয়াছে, তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছে। কত রাত্রি সাঁঝোতে সুন্দরীর লালসাদীপ্ত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া জ্বলিয়াছে। ভিয়েনায় যাহার নাম প্রসিদ্ধ ছিল, সেই গ্রীক্ সুন্দরীর জন্য তাহার প্রেম দেখিয়া সকলে বলিত এই ভারতীয় যুবক প্রেমিকের আদর্শ।

আর স্পেনিস্ অভিনেত্রী ওলালার জন্য সে কি ক্ষেপিয়াছিল! রাতের পর রাত থিয়েটারে গিয়াছে, দিনের পর দিন অভিনেত্রীর বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। একবার পুলিশ তাহাকে ধরিয়া ওলালার নিকট লইয়া গেলে অভিনেত্রী বলিল, "ওকে ছেড়ে দাও, ও পাগল।"

হঠাৎ একদিন মোহ ভাঙ্গিল। সেদিন প্রভাতে তরুণ এক পাহাড়ের গায়ে বসিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছিল। সম্মুখের পথ দিয়া ওলালা চলিয়া গেল, ক্ষণিকের জন্য চোখোচোখি হইলে ওলালা হাসিল, সে হাসিল, আকাশ ভরিয়া সূর্য্যের আলো হাসিয়া উঠিল। সেই প্রভাত-আলোকে তরুণ সেই অভিনেত্রীকে বিশ্বের চিরসৌন্দর্য্যালোকে পাইল। যে রসস্বরূপ আপন সৃষ্টির রূপে মত্ত হইয়া উষার আ[redacted] স্বর্ণকিরণ-ধারায় ধুইয়া দিল, সেই ত সোনার সুতা[redacted] ওলালার কেশ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই ত অনন্ত-সাগরের নীল[redacted] তাহার দুই চোখে ঢালিয়া দিয়াছে, রক্ত-গোলাপের পাতা লইয়া দেহের চর্ম্ম গড়িয়াছে; যে বিশ্বকবি সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে বরণোৎসবে আনন্দিত, সে-ই নারীর দেহকে আপন আনন্দ দিয়া মাধুর্য্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। জীবন-সমুদ্র মন্থনে যে সুধা উঠিয়াছে তাহা ওই মোহিনীর ভাণ্ডেই আছে; যে দেবতা, তাহার পাত্রে অমৃত ঠিক পড়িবে, কিন্তু অসুরের পাত্র শূন্যই থাকিবে।

আবার হিংস্র নগ্ন বর্ব্বর জীবন তাহাকে ডাক দিল। সেই বাধাবন্ধশূন্য চিন্তাজ্বরদ্বিধাদ্বন্দ্বহীন অসভ্যজীবন যাপনের জন্য সে ইয়োরোপ ছাড়িল। আফ্রিকার [redacted] জঙ্গলে কাফ্রিদের উন্মুক্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে উল্লাস[redacted] হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। এই একবৎসর আফ্রিকার জঙ্গলে সে যেন এক বিচিত্র জগতে বাস করিয়াছিল, আদিম যুগের তরুণী পৃথিবীর কোলে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

চারিদিকে সিংহ গর্জ্জন করে, বাঘ হাঁকিয়া বেড়ায়; কালো হাতীর দল ঘোরে, ইন্দ্রধনুর মত রং-বেরংএর সাপেরা খেলা করিয়া বেড়ায়,—কোথাও অদ্ভুত অপরূপ ফুলের গন্ধ, কোথাও ঘন-প্রকাণ্ড বনের নিবিড়-ছায়া, নির্ঝরের ঝরঝর, নদীর কলকল। সেই বনে-বনে কুমীরের মত কালো, বাঘের মত জোরালো, লোহার মত দৃঢ়, হরিণের মত ক্ষিপ্রগতি, বন্যজন্তুদের দোসর, অসভ্য-মানুষদের বাসা—তাহারা সিংহের মত তেজস্বী, শিশুর মত সরল। তাহাদের সঙ্গে দিনে বাঘ শিকার করা, রাতে বনফুলের মালা পরিয়া বন্যপাখীর পালকে দেহ সাজাইয়া নিকষমণির মত কালো কাফ্রি-তরুণী-দের সঙ্গে নৃত্য করা— সে কি আনন্দ!

একবার এক কাফ্রী-সুন্দরীকে লইয়া দুইদলে বিরোধ বাধিল; শ্যামাঙ্গী ধরণী রক্তাম্বরা হইল; যখন একদল নির্ম্মূল হইয়া গেল, সেই কাফ্রি-সুন্দরী উন্মত্তার মত রণক্ষেত্রে আসিয়া ঘুরিতে লাগিল। তরুণ ভাবিয়াছিল, এম্নি কোনো আনার্য্য নারী দেখিয়া ভারতীয় সাধক কালীরূপের কল্পনা করিয়াছিলেন। নিবিড় তিমিরঘন কেশরাশি চারিদিক ছাইয়া রহিয়াছে, নয়নে রক্তাক্ত খড়্গের আভা জ্বলিতেছে, [illegible] শুনিলে মনে হয় এ-প্রচণ্ড হাস্যে বিশ্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ [illegible]।

এই অনার্য্য উলঙ্গ প্রাকৃতিক জীবনে মত্ত হইয়া তরুণ দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপগুলোয় ঘুরিয়াছিল।

টাহিটি-দ্বীপবাসীদের সঙ্গে নৌকা গড়িতে গিয়া সে কি আনন্দ পাইয়াছিল! সকলে ফুলের মালা মাথায় জড়াইয়া এক এক কুড়াল লইয়া একসঙ্গে মদ্যপান করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বনে চলিল; এক বড় গাছের চারিদিক ঘেরিয়া বসিল; কয়েকজন বলিষ্ঠ দলপতি গাছের গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিল, আর সকলে করতালি দিতে দিতে কুড়ালের আঘাতের ছন্দে আনন্দে গাহিতে লাগিল, "গাছ গো গাছ, তোমায় কাটি, নৌকা হবে পরিপাটি।" এক দল গাছ কাটিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অপর দল তাহার স্থান লইল। এম্নি সকলে মিলিয়া মনের আনন্দে গান গাহিয়া গাছ কাটা, নৌকা করা, তারপর গান গাহিতে-গাহিতে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরা; তারপর মধ্যরাত পর্য্যন্ত টাহিটি-সুন্দরীর সঙ্গে নাচ আর গান। এ অসভ্য জীবনের সঙ্গে সভ্য-জগতের লোহার কলের আর্ত্তনাদ-মুখরিত কারখানায় আনন্দহীন মজুরদের কাজ তুলনা করিয়া তরুণ অবাক হইত।

নারিকেল-পাতার মত স্নিগ্ধ-শ্যামল মামুয়ার মুখ তাহার মনে পড়িল; মামুয়া তাহার চেয়ে বছর দশেকের ছোট ছিল; তাহারা দুইজনে ভাই-ভগিনীর সম্পর্ক পাতাইয়া-ছিল। সেই কালো-বরণ মামুয়াকে লইয়া কত অরুণবরণ প্রভাতে সোনার সাগরে তাহারা দুইটি রাঙা মাছের মত স্নানলীলা করিয়াছে, কত দ্বিপ্রহরে সূর্য্যহসিত সিন্ধুর উপর ছোট নৌকা ভাসাইয়া সবুজ রাঙা প্রবালদ্বীপে ঘুরিয়াছে, দ্বীপের বনে বনে লুকোচুরি খেলিয়াছে; কত রাত জ্যোৎস্নার আলোয় মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে; সমুদ্রতীরে সকলের সঙ্গে নাচিয়াছে,—তাহাদের নৃত্যে বল্‌রুমের মাদকতা তীব্রতা জ্বালা ছিল না, তাহা সমুদ্রের তরঙ্গের নৃত্যের মত সহজ সুন্দর আনন্দকর।

সবশেষে মনে পড়িল, ইয়াংইংএর করুণক্লান্ত চাহনি। সেই জাপ-মহিলা সত্যই তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল। তরুণ তাহাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিল; ছোট পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের ধারে ছবির মত সুন্দর তাহাদের বাড়ীখানি। গৃহ-স্বামী এক ব্যবসাদার, আপন কাজে মগ্ন থাকেন, স্ত্রীর সহিত গল্প করিতেও একটু সময় পান না। কত অলস মধ্যাহ্ন বাগানে উইলোগাছের তলে বসিয়া ইয়াংইং ও তরুণ গল্পে হাস্যে কাটাইয়াছে, কত সন্ধ্যা পাশাপাশি সাগরের তীরে বেড়াইয়াছে। এম্নি তিনমাস কাটিল।

সে রাত্রে রূপার থালার মত পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে; সম্মুখে স্থির সাগরজলে জ্যোৎস্নার বিস্তীর্ণ শুভ্রতা, দূরে একটি নৌকা কালো রেখার ন্যায় আঁকা, শাদাফুলেভরা প্লামগাছ-গুলি শুভ্র স্বপ্নের মত দাঁড়াইয়া; পাইন-গাছের তলায় জ্যোৎস্না রাত্রির নিঃশব্দতায় তাহারা দুইজন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। তরুণ ভাঙাগলায় বলিল, "কালই যাওয়া ঠিক করলুম, জাপানটা একরকম দেখা হল।"

"সেই ভালো, দেখুন,—"

"আমি বুঝেছি আমার যাওয়াই উচিত, আপনাদের সুখের ঘর আমি ভাঙ্‌তে চাই না।"

ইয়াংইং ভাবে নাই তাহাদের জীবন এমন করিয়া জড়াইবে, কিন্তু সত্যই ছাড়াইবার সময় আসিয়াছে।

"দেখুন এখান ছেড়ে আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে,—আপনাদের সঙ্গে একবার ভারতটা দেখে আসি, কিন্তু দেখুন,—" সে তাহার কোলে ঘুমন্ত ছোট মেয়ের দিকে চাহিল।

তরুণ হানার নবনীকোমল অধরে ধীরে চুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইয়াংইং বলিল, "কিন্তু দেখুন, আরও কিছু দিন ত থেকে যেতে পারেন।"

তরুণ আবার বসিল। রাত্রির অতলস্পর্শ নিঃশব্দতায় তাহারা দুইজনে বাক্‌হীন হইয়া জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকির দিকে চাহিয়া রহিল।

একমাস হইল সে ইয়াংইংকে ছাড়িয়া জাপান হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

অন্ধকার কেবিনে বসিয়া এমি করিয়া ধীরে ধীরে তাহার দীর্ঘ-যাত্রার কাহিনী মনে পড়িল। এই প্রাণের বেগে উল্লসিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জগৎভ্রমণ ব্যর্থ হয় নাই। পৃথিবীর পাত্র ভরিয়া সে নব নব আনন্দমদিরা-ধারা পান করিয়াছে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নারীর নব নব রূপ দেখিয়া ধন্য হইয়াছে। কাহারো নয়নের দীপ্তি, কাহারো আননের দ্যুতি, কাহারো কেশের রং, কাহারো দেহের গঠন, কাহারো কণ্ঠের সুর, কাহারো চরণের নৃত্য—কতজন কতরূপে তাহাকে আনন্দিত করিয়াছে,—কেহ শরতের প্রাতে শেফালীমালা হাতে আসিয়াছে, কেহ বসন্ত-নিশায় বীণার ঝঙ্কার তুলিয়াছে, শ্রাবণ-রাত্রে কেহ অঞ্চলে কম্পিত দীপশিখা ঢাকা দিয়া অভিসারিকা-বেশে ঘরে ঢুকিয়াছে, কেহ দুরন্ত ঝটিকার মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি অন্তহীন আনন্দে বিশ্বশিল্পী নারীর অঙ্গ গড়িয়াছে তাহা সে বুঝিল। চরণে তাহার বাতাসের নৃত্য, চরণে তাহার ধরণীর স্থিরতা; নয়নে তাহার অগ্নির দীপ্তি, নয়নে তাহার সলিলের স্নিগ্ধতা; আননে তাহার অরুণের দ্যুতি, আননে তাহার অমানিশার তিমির; হস্তে তাহার সুধাভাণ্ড, হস্তে তাহার রক্তস্নাত খড়্গ; কণ্ঠে তাহার শুভ্র মিলনমাল্য, কণ্ঠে তাহার নরমুণ্ডমালা; কেশ তাহার অরুণ-কিরণ-ধারা, কেশ তাহার শ্রাবণ-মেঘঘন; বক্ষ তাহার স্নিগ্ধ যমুনাজল, বক্ষ তাহার অগ্নিকুণ্ড। নদীর গতি দিয়া ঢেউয়ের ছন্দ দিয়া ফুলের গন্ধ দিয়া বসন্তের আনন্দ দিয়া তাহার তনুর সৃষ্টি; রঙের রসধারায় ঊষার স্বপ্ন দিয়া মানব-অন্তরে প্রেমপদ্ম ফুটিয়াছে; ধূলি মাটি জল হাওয়া অগ্নি তরু তৃণের সহিত মিলাইয়া ফুলের সহিত তারার সহিত গাঁথিয়া মানব-আত্মার আনন্দ দিয়া বিশ্বকবি নারীর অন্তর গড়িয়াছে—এ প্রেমের পুণ্যতীর্থ, প্রাণের চিরলীলাভবন, নব নব জীবনের জন্মনিকেতন, অগণিত মানবযাত্রীর সঙ্গীতমুখরিত আনন্দপথ।

তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে, রাত্রির আঁধার কাটিয়া যাইতেছে। তরুণ ডেকে আসিল। পূর্ব্বতোরণ-দ্বারে ঊষাদেবী আবির্ভূতা। ভারত-মহাসমুদ্রের এই প্রভাতখানি তাহার বড় সুন্দর লাগিল। বাংলার আশ্বিন-মাসের সোনালি প্রভাতগুলির মত বড় শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র মনে হইল।

পৃথিবীর যে তরুণীরা তাহার জীবনে রতির ললিত লাস্যে আসিয়াছিল তাহারা পার্ব্বতীর পূতপদচিহ্ন রাখিয়া গেছে;—বেলা সেলিমা সাদিলা ওলালা অল্‌গা মামুয়া ইয়াংইং,—সে তাহাদের প্রণাম করিল।

রমণীয় বরণীয় সবিতা হইতে হোমানলশিখা জ্বলিল, ডেক খালাসীদের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

* * *

(২) অরুণের স্বপ্ন।

আরও তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। সে রাতে তরুণ স্বপ্ন দেখিল। সে বাংলায় ফিরিয়া গিয়াছে, নানা জায়গায় খুঁজিয়া জানিল বেলা এক ব্যারিষ্টারকে বিবাহ করিয়া বালীগঞ্জে আছে। সন্ধ্যার রাঙা আলো বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের শ্যামলতরুশ্রেণীর শিরে ঝলমল করিতেছে, ট্যাক্সি পথের ধূলি স্বর্ণরেণুর মত উড়াইয়া এক বড় লাল বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। হাঁ, এই ত—নম্বর বাড়ী। ধীরে সে নামিল, সন্ধ্যার আলোয় বাড়ীর লাল ইটগুলি অঙ্গারের মত জ্বলিতেছে, গেটের দুইপাশে হাস্নুহানার ঝাড়ে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। ক্রোটনের সারির মধ্যে লাল পথ দিয়া বাড়ীর সিঁড়ির নীচে পৌঁছিতেই এক এগারো বছরের

বালিকা কালো চুল দুলাইয়া হেলিয়া দুলিয়া ঘুরাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

এই ত বেলা। তরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। একত্রিশ বছর আগে এক শরৎ-সন্ধ্যায় বেলা তাহার জীবনে ঠিক্ এম্নি করিয়াই আসিয়াছিল। হাঁ, এম্নি করিয়াই ত বেলা চাহিত; এম্নি হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া কথা বলিত।

না, সে বেলা নয়, তাহার মেজ মেয়ে মীনা। মীনা সাদরে নবাগতকে ড্রইংরুমে লইয়া বসাইয়া জানাইল, তাহার মা বাড়ীতে নাই; শীঘ্রই আসিবেন। তারপর দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া অতি পরিচিতের মত গল্প জুড়িয়া দিল। মীনারা কয় ভাই বোন, কার কত বয়স, কে কি পড়ে, কি বই প্রাইজ পাইয়াছে, কে কে বন্ধু আছে, তারপর তাহার বাবার গল্প মায়ের গল্প কত গল্প চলিতে লাগিল। যেন তাহাদের দুইজনের জন্ম হইতে আলাপ। গল্প শেষ হইলে মীনা আগন্তুকের স্নেহস্পর্শময় হাত হইতে আপন কোমল হাত ছাড়াইয়া লইয়া চা আনিতে ছুটিল, ইয়ং লেডি নবাগতের কোনো আপত্তি শুনিল না। চা শেষ হইল, মীনার মা আসিলেন না। তাহার দুই ছোট ভাই ও এক ছোট বোন নাচিতে নাচিতে ঘরে ঢুকিয়া তরুণকে ঘিরিয়া বসিল, সে যেন তাহাদের কতদিনের পরিচিত। খোলা জানালা দিয়া সন্ধ্যার রাঙা আলো ঘরটিকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে, কোণে কোণে অন্ধকার জমাট হইয়া আছে। ছোট ছেলে দুইটি তাহার কোল ঠেসিয়া বসিয়া আব্দার জুড়িল, একটা গল্প বলুন।

তরুণ রূপকথা আরম্ভ করিল।

এক যে ছিল রাজকন্যা পদ্মাবতী। রক্তপদ্মের মত সুন্দর তাহার দু'খানি রাঙা পা, পদ্মের মৃণালের মত কোমল তাহার হাত, পদ্মের সুগন্ধের মত সৌরভ তাহার দেহভরা। একদিন সেই রাজকন্যা সন্ধ্যাবেলায় আপন ঘরের জানালার পাশে বসে আপন মনে সেতার বাজাচ্ছিলেন, এমন সময়ে এক দূরদেশের রাজপুত্র সেই পাহাড়পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেতারের ঝঙ্কার শুনে রাজপুত্রের কালো ঘোড়া থম্‌কে দাঁড়ালে রাজপুত্র দেখ্‌লেন, পদ্মের মত সুন্দরী রাজকন্যা সাগরের মত নীল শাড়ীর উপর গোলাপের মত রাঙা ওড়্‌না জড়িয়ে চাঁপার কলির মত মোহন আঙুলে সোনার সুতার মত সেতারের তারগুলিতে ঝঙ্কার তুল্‌ছেন, হাতে পান্নার চুড়ি নীলার আংটি ঝিক্‌মিক করছে। গাছে গাছে পাখীরা চুপ কোরে তাই শুন্‌ছে, পথের ধারে ভেড়া হরিণীরা ভিড় কোরে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপুত্রের সোনার সাজওয়ালা কালো ঘোড়া আর নড়্‌তে চাইল না, জান্‌লার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

রাজকন্যা গাইলেন, পদ্ম কোথায়; সেই পদ্ম! দিবস যায় বিফলে, সন্ধ্যা হয়ে আসে, আন্‌লো না কেউ সে জ্যোৎস্না আসে, আমার চোখে জল ভরে; বাতাস বয় আমার প্রাণ কেঁদে মরে; দিবস রজনী সুদূরে চেয়ে আমি বসে আছি,—কেউ এলো না, কেউ এলো না সে প্রেমপদ্ম!

রাজপুত্র বোলে উঠ্‌লেন, "রাজকন্যে, আমি সেই পদ্ম নিয়ে আস্‌ব।"

চকিতে সেতারের ঝঙ্কার থামিয়ে মেঘের মত কালো কাজল পরা তারার মত উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে তাঁরের কণ্ঠী দুলিয়ে পদ্মাবতী সাম্‌নে চাইলেন, দেখ্‌লেন, এক রাজপুত্র অবাক হয়ে তাঁর গান শুন্‌ছে, কিংখাবের জামাজোড়া, গলায় মোতির মালা, হীরেপান্নার শিরপেঁচ, কালো ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে বোসে, কটিতে রূপার খাপে তলোয়ার ঝুল্‌ছে, নিকষমণির মত কালো বল্লম পাশে গোঁজা; সন্ধ্যার রাঙা আলোয় সমস্ত দেহ পদ্মমণির মত ঝলমল করছে।

রাজপুত্র আবার বল্‌লেন, "রাজকন্যে, আমি এনে দেব সেই পদ্ম।"

রাজকন্যা আবার সেতারের ঝঙ্কার দিয়ে গাইলেন, "রাজপুত্র আন্‌বে সেই পদ্ম, লালমণি রাজপুত্র আন্‌বে সেই পদ্ম! সেই পদ্মের মালা পর্‌লে তরুণী চির-যৌবনা থাকে, সেই পদ্ম গলে ধর্‌লে দেহের সৌন্দর্য্য ক্ষয় হয়ে ঝরে না, অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী সেই পদ্মের এক পাপড়ি বুকে ধোরে আছে, লালমণি রাজপুত্র আমায় এনে দেবে সেই পদ্ম!"

রাজপুত্র জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "রাজকন্যা, সেই পদ্ম কোথায় আছে?"

রাজকন্যা গাইতে লাগ্‌লেন, "কোথায় ফোটে সেই পদ্ম? অমৃতসাগরে আছে সেই পদ্ম,—নীল সাগর, লাল সাগর, কালো সাগর, হল্‌দে সাগর, সব সাগর পেরিয়ে অমৃতসাগরে আনন্দবৃন্তের ওপর ফুটে আছে প্রেমপদ্ম,—লালমণি রাজপুত্র আন্‌তে চল্‌লো সেই পদ্ম।"

রাজপুত্র বল্‌লেন, "রাজকন্যা, আমি চল্লুম, সমস্ত পৃথিবী ঘুরে অমৃতসাগর খুঁজে আমি সেই পদ্ম আন্‌ব, তুমি ততদিন আমার জন্যে প্রতীক্ষা কোরো।"

রাজকন্যা আবার গেয়ে উঠ্‌লেন, "পদ্ম, কোথায় সেই পদ্ম! রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে, বিজনপথে লালমণি রাজপুত্র গেল আন্‌তে সেই পদ্ম।"

রাজপুত্র আর-একবার রাজকন্যার দিকে ভালো কোরে দেখে নিলেন, পদ্মাবতীর রূপটা আপনার বুকে বল্লমের ফলা দিয়ে এঁকে নিলেন, তারপর কালো ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়পথে আগুনের ফুল্‌কি তুলে চোলে গেলেন।

মীনা ঠিক মায়ের মত চোখের চাহনিতে তরুণের দিকে চাহিল, তাহার ছোট ভাইবোনগুলি বেলার মত অকারণে হাসিয়া বেলার কণ্ঠে বলিল, "তারপর?"

পাঁচ বছর, দশ বছর গেল, রাজপুত্র আর আসেন না। রাজকন্যা রোজ সেই পথের ধারের জান্‌লায় সন্ধ্যায় বোসে সেতার বাজান আর রাজপুত্রের প্রতীক্ষা করেন। গাছের পাতা কেঁপে উঠ্‌লে সেতার ফেলে চেয়ে দেখেন, কই রাজপুত্র? পথের পাথরের উপর একটু শব্দ হলে ভাবেন, ওই বুঝি রাজপুত্রের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

পনেরো বছর গেল, কুড়ি বছর গেল; রাজারাণা রাজকন্যাকে কত বোঝালেন, বক্‌লেন, বল্‌লেন, সে রাজপুত্র নিশ্চয় মোরে গেছে। রাজকন্যা কিন্তু কাউকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হলেন না, তিনি লালমণি রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় বোসে রইলেন। রোজ সন্ধ্যাবেলায় গাছের পাখীরা সেই পথের ধারের জান্‌লায় ভিড় কর্‌ত, গরু, বাছুর, হরিণ, মেষ জমা হত, রাজকন্যা আপন মনে সেতার বাজাতেন, বাজানো শেষ হলে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তেন—লাল পথ যেখানে দূরে বনের অন্ধকারে মিশে

এ দিকে রাজপুত্র কত গ্রাম নগর পাহাড় বন নদী প্রান্তর মরুভূমি পেরিয়ে চলেছেন; কত রাজ্য মহারাজ্য ঘুর্‌ছেন; রাজার প্রাসাদে ধনীর গৃহে কৃষকের কুটীরে মজুরের ঘরে সব তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কে সেই পদ্মের সন্ধান দেবে, কোথায় সেই অমৃতসাগরের পদ্ম,—মানুষদের দেশ শেষ হল, তার পর দৈত্যদানাদের দেশ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রাক্ষসদের কত রকমের দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

মীনার ছোট বোন দুটি তরুণের আরো কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

তারপর কত ঝড়ে জলে নীল সমুদ্র লাল সমুদ্র পীত সমুদ্র কালো সমুদ্র দধিসমুদ্র ক্ষীরসমুদ্র পেরিয়ে অবশেষে অমৃতসমুদ্রে তাঁর তরী এসে পৌঁছালো। আলোর মত শুভ্র সেই অমৃতসমুদ্রের মধ্যে রক্তের মত রাঙা এক পদ্ম ফুটে আছে। পদ্মটি তুল্‌তে যাবেন, পদ্মের মধ্য থেকে এক অপরূপা নারী বেরিয়ে এল।

"রাজপুত্র, তোমার কি চাই?"

"আমি পদ্ম নিতে এসেছি।"

"যে পদ্মের জন্য তুমি সমস্ত জগৎ ঘুরে বেড়ালে, সে পদ্ম দেখ তোমার বুকেই ফুটে রয়েছে।"

রাজপুত্র হীরাবসানো জামা খুলে দেখ্‌লেন, তাইত, বুকে যে পদ্মাবতীর ছবি এঁকেছিলেন তার ওপর এক পদ্ম ফুটে রয়েছে, তার সৌরভ তাঁকে আকুল কোরে দিল।

এদিকে কত বছর কেটে গেল, রাজকন্যা বোসে আছেন, রাজপুত্র আর আসেন না।

সে সন্ধ্যায় বোসে একা পদ্মাবতী বড় করুণসুরে গাইছিলেন, দিনের পর দিন গেল, আমার জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, লালমণি রাজপুত্র আন্‌ল কৈ পদ্ম? ভ্রমরের মত কালো কেশ আমার ছিল, আজ হল শণের মত শাদা; গোলাপ-পাপ্‌ড়ির মত ঠোঁটগুলি হায় ঝরা পাতার মত কালো; দ্রাক্ষাফলের মত অধর আমার, শুক্‌নো আঙুরের মত চুপ্‌সে গেছে, চাঁপাকলির মত আঙুলগুলো পোড়া ঘাসের মত নীরস বর্ণহীন; পদ্মবৃন্তের মত পা দু'খানি বজ্রদীর্ণ তরুর মত প্রাণহীন,—ঝরে গেছে সব চলে গেছে—বসন্ত-শেষে

গাছ থেকে ফুল যেমন ঝোরে যায়, উৎসব-শেষে ফুল থেকে পাতা যেমন ঝোরে যায়,—আমার দেহ হতে সব সৌন্দর্য্য সব সুষমা ঝোরে গেছে,—সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে; এখনও রাজপুত্র এলো না, পদ্ম কই, পদ্ম এলো না।

মুমূর্ষুর মত ক্লান্ত করুণ নয়নে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত পথের দিকে চেয়ে শ্রান্ত হয়ে পদ্মাবতী সেতারের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্লেন। হঠাৎ অর্দ্ধরাতে ঘোড়ার খুরের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-আলোয় অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্মের মত চেয়ে রাজকন্যা দেখ্লেন, শিয়রে জান্লায় রাজপুত্র!

রাজকন্যা আনন্দের আতিশয্যে কোনো কথা বল্তে পার্লেন না। রাজপুত্র বল্লেন, "তুমি যে পদ্ম চেয়েছিলে রাজকন্যা সে পদ্ম আমার বুকেই ফুটে আছে, আমি সমস্ত জগৎ ঘুরে তবে তার সন্ধান পেলুম।"

রাজকন্যা বল্লেন, "কিন্তু রাজপুত্র, আমার যৌবন যে চোলে গেছে, ঝরা পাতার মত পথে পোড়ে আছি, সে পদ্মের স্পর্শে আবার কি নবজীবন নবসৌন্দর্য্য ফিরে আস্বে?"

"আস্বে, আস্বে—"

তারপর রাজপুত্র আপন প্রেমহীরায় আংটি রাজকন্যার অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিলেন, আপন আনন্দমোতির মালা রাজকন্যার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, রাজকন্যা আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্লেন, জীর্ণদেহ বর্ষার নদীর মত ভোরে উঠ্ল, শাদা চুল কালো হলো, দেহের ঝরা পাতার পীত রং কৃষ্ণচূড়ার মত আগুনে লাল হয়ে গেল, অবশ দেহে বসন্তের হর্ষ ফিরে এলো।

রাজপুত্র আপন বক্ষে আঁকা রাজকন্যার আলেখ্য মিলিয়ে দেখ্লেন, রাজকন্যা আগেকার মত সুন্দরী।

তখন চন্দ্র তারা গাছ পাহাড় ঘরের প্রদীপ সেতার সাক্ষী কোরে রাজকন্যা রাজপুত্রের গলায় আপন হীরার কণ্ঠী পরিয়ে দিলেন।

গল্প শেষ করিয়া তরুণ চাহিয়া দেখিল, মীনার ছোট ভাইবোনগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর মীনা বেলার মত চাহিয়া বলিল, "তারপর?"

দরজার কাছে একটু খস্‌খস্ টুংটুং শব্দ হইল।

"ওই মা এসেছেন।"

তরুণ দেখিল, দরজার গোড়ায় বেলা দাঁড়াইয়া। বেলা হাসিয়া আঙ্গুলের ইসারা করিয়া ডাকিল, তরুণ উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাগানে চলিল।

তরুণ অবাক্ হইল, এ ত সেই তরুণী বেলা, দেহের দীপ্তি আননের দ্যুতি ঠিক তেমনি আছে, সেই অতলস্পর্শ গভীর দৃষ্টি; বেলার হাত ধরিতেই তাহারও প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন সব ঝরিয়া পড়িল; দেহে আনন্দের বান আসিল, হারানো যৌবনকে সে ফিরিয়া পাইল।

রাত্রির অন্ধকারে তারাভরা আকাশের নীচে হাস্নাহানা-কুঞ্জে সবুজ ঘাসের উপর বেলা ও সে পাশাপাশি বসিল। তাহাদের সম্মুখে উজ্জ্বলমণিখচিত সোনার মত লাল পাথরের অতি বৃহৎ পেয়ালা, তাহাতে হীরার মত শাদা জল টলমল করিতেছে।

বেলা বলিল, "এসো আমাদের অতীত জীবনগুলো দেখা যাক্, জন্মে জন্মে আমরা কি ছিলুম।"

* * * * *

জলের রং নীল হইয়া গেল। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ, ভরা নদীর দুই তীরে সোনার ধান্য-ক্ষেত্রের উপর আলো-ছায়ার খেলা। একটি চাষী মনের আনন্দে দোয়েল-কোকিলের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে ধান কাটিতেছে। মধ্যাহ্ন হইয়া আসিল, অদূরে কৃষকের বাড়ী হইতে কৃষকবধূ বাহির হইয়া ডাকিল, নদীতীরে বটগাছের ছায়ায় ভাত আনিল, পিছন পিছন একটি কাদামাখা উলঙ্গ শিশু মাতালের মত অসমভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিল। কৃষক আদর করিয়া ছেলেটির দুইকানে শেফালী ফুল গুঁজিয়া, কৃষাণীর মাথায় সোনার বরণ ধান্যশীষের মুকুট ও গলায় কাশফুলের মালা পরাইয়া দিল।

বেলা বলিল, "এ জন্মে আমরা শ্যামল বাংলার গঙ্গাতীরে কৃষককৃষাণী হয়ে জন্মেছিলুম।"

* * * *

জলের রং লাল হইয়া গেল। আকাশে যেন রক্তের খেলা চলিতেছে। এক প্রান্তরের মধ্যে রক্তে-রাঙা ফাঁশিকাষ্ঠ, তাহার চারিদিকে ক্ষিপ্ত জলসমুদ্র তরঙ্গায়িত ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। একটি যুবক [illegible]

ঊর্দ্ধে মুখ করিয়া ধীরপদে ফাঁশিকাষ্ঠে উঠিল; তাহার কোঁকড়ানো চুল শান্তজ্যোতিময় মুখের উপর পড়িয়াছে, যেন কালো মেঘের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। একবার সে মুখ একটু নত করিয়া পাশের এক নারীর দিকে চাহিল, তারপরে চক্ষু বুজিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মাথা খসিয়া গেল, এক নারীর আর্ত্তনাদ জনসমুদ্রের গর্জ্জনের উপরও উঠিল, তাহার কোলে এক শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া ছিল, সে জাগিয়া চারিদিক চাহিয়া একবার হাসিয়া উঠিল, তারপর মাতার ক্রন্দনের সহিত যোগ দিল। মাতা ফাঁশিকাষ্ঠের উপর একবার আছাড় খাইয়া পড়িলেন, তারপর আপনাকে জোরের সহিত তুলিয়া আপন মলিন বসন দিয়া শিশুর চোখ মুছাইয়া তাহাকে বুকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ফাঁশিকাষ্ঠের পাশে স্থির হইয়া বসিলেন।

বেলা বলিল, "এ জন্মে তুমি ও আমি পঞ্চনদের তীরে গুরুগোবিন্দের শিষ্য হইয়াছিলাম, তোমাকে দিল্লীর বাদ্‌শাহ ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলাইল, তারি প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি আমার শিশুকে সিংহের মত তেজস্বী করিয়া পালন করিয়াছিলাম।"

* * * *

চন্দ্র নাই, তারা নাই, সমস্ত আকাশ নিকষমণির মত কালো। নগরের শেষে বিজন পথের ধারে বেণুবনের নিবিড় অন্ধকারে এক সুপুরুষ সৈনিক কালো ঘোড়ায় চড়িয়া নিঃশব্দে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কালো ঘোড়ার নীলাখচিত রূপার সাজ অন্ধকারে ঝিকিমিকি করিতেছে, রেকাবের উপর বসোরার চিত্রময় কার্পেটের অতি কোমল গদি। ঘোড়াটা একবার নড়িয়া উঠিল, এক সুন্দরীর চঞ্চল পদশব্দ শোনা গেল, সৈনিকটি নিমেষের মধ্যে নামিয়া সুন্দরীকে ফুলের মত সহজে তুলিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। সৈনিকের তাজের হীরকখণ্ডগুলি, সাঁচ্চা কাজকরা কাশ্মীরী শালের জামা, তরবারির সোনার খাপ, জরিবসানো লপেটা, সব ঝকমক করিয়া উঠিল। সুন্দরীর চিকণের কাজকরা মোতিবসানো ফিরোজি ওড়্‌না বাতাসে উড়িয়া কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত খেলিতে লাগিল। সৈনিকের বজ্রকঠিন অঙ্গে তাহার পুষ্পকোমল অঙ্গ ঢলিয়া পড়িল, সৈনিক অতি দ্রুত ঘোড়া ছুটাইল। ভারতের সকল গ্রাম নগর গিরি প্রান্তর নদী বনানী পার হইয়া সকল রাজ্য রাজধানী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কোথায়? পৃথিবীতে শত শত দেশ আছে, বিচিত্র জাতি আছে, অফুরন্ত পথ আছে। আরবের মরুভূমে খর্জ্জুরবৃক্ষ-ছায়ায় এই সুন্দরী জন্মিয়াছিল, পারস্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে ইহার শৈশব মুকুলিত হইয়াছে, আকবর শার দিল্লীর প্রাসাদে ইহার যৌবন উদ্বেলিত।

ঊর্দ্ধশ্বাসে কালো ঘোড়া পথে আগুনের চুম্‌কি তুলিয়া ছুটিয়া চলিল, দূরে নগরের সকল আলো মিলাইয়া গেল, প্রাসাদশ্রেণী গম্বুজ মীনার মন্দিরের চূড়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল, সুন্দরীর বেণী মুক্ত হইয়া বাতাসে উড়িতে লাগিল, গলায় গোলাপ ও চামেলির মালা হইতে পাতা খসিয়া খসিয়া পড়িল। কখনো বনের ছায়ায় অন্ধকার নিবিড়তর হয়, কখনো নদীর জল শাণিত খড়্গের মত ঝক্‌মক্ করে, বাহুতে বাহুতে জড়াইয়া বুকে বুকে চাপিয়া দুইজন অবিরাম আলোছায়াময় বিজনপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

বেলা বলিল, "এ জন্মে তুমি ছিলে আকবর শার হিন্দু সেনাপতি, আমাকে রঙ্গমহাল হইতে লইয়া পলাইয়াছিলে।"

* * * *

বায়োস্কোপের মত পেয়ালার জলে নূতন ছবির পর নূতন ছবি ভাসিয়া চলিল।

ধূসর বালুসমুদ্রের মধ্যে গিরিনগর রাত্রির অন্ধকারে দিগন্তে কালো মেঘের মত দেখাইতেছে। গিরিদুর্গ ঘেরিয়া মরুভূমি জুড়িয়া মুসলমান বাদ্‌শার শিবিরশ্রেণী; সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত তাঁবুর গায়ে তাঁবু, তাহাতে সাগরগর্জ্জনের মত সৈনিকদের কোলাহল।

গিরিনগর ও নিদ্রাহীন রাত্রির অন্ধকার টলমল করিয়া মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখা উন্মত্তের মত নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনা, কিঙ্কিনীর রিণিরিণি, মধ্যে মধ্যে কোনো নারীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি। দুর্গপ্রাচীরের নিকট দুধের মত শাদা পাথরে তৈরী এক ঘরে জালি পাথরের মেঝেয় ফুল ছড়ানো। দেওয়ালে কত ছবি আঁকা, শিলাদিত্যের রাজসভা, বাপ্পারাওয়ের বিজয়যাত্রা। মধ্যে গজদন্তনির্ম্মিত পালঙ্কের নিকট এক রাজপুত সর্দ্দার আপন প্রিয়ার নিকট বিদায় লইতেছে। শত হেমদীপের আলোকে

সর্দ্দারের সোনার পাতা জড়ানো শিরস্ত্রাণ, উপলমণিভরা লোহার বর্ম্ম, রাজপুতবালার মোতির মালা হীরার দুল সোনার চেলি ঝলমল করিয়া উঠিল। সর্দ্দার আপন অঙ্গুলী একটু কাটিয়া এক সোনার পাত্রে কয়েক বিন্দু রক্ত ফেলিল, বীরসুন্দরী সেই রক্তের সহিত অগুরু চন্দন মিশাইয়া আপন কোমল হস্ত রাঙাইয়া প্রাচীরের গায়ে পঞ্চ অঙ্গুলির চিহ্ন আঁকিয়া দিল। তারপর দুইজনে নিঃশব্দে পুরীর মন্দিরের দিকে চলিল।

সূর্য্যের প্রথম স্বর্ণরেখা পাহাড়ের চূড়ায় পড়িয়াছে। নগরের মধ্যে যেন নবসূর্য্যোদয় হইল, প্রভাতের আলো মলিন করিয়া ভিতরে আগুনের দীপ্তিতে গিরিনগর হেমকান্ত হইল। গিরিদুর্গের সকল দ্বার খুলিয়া বর্ষার গিরিনদীর ভয়ঙ্কর স্রোতের মত রাজপুত সেনা "হর হর" শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া মুসলমান সেনার উপর আসিয়া পড়িল, মুহূর্ত্তমধ্যে সকল তরবারি বল্লম শূল কুঠার রক্তস্নাত হইয়া গেল। এদিকে পুরীর মধ্যে সুন্দরী, কুমারী, বিধবা, সধবা, তরুণী, বালিকা, শতশত রাজপুতবালা অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া বিজয়-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চিতায় ঝাঁপ দিতে লাগিল। অনলের অরুণ আভায় বীরসুন্দরীদের হীরামণিমাণিক্য-জড়িত সালঙ্কৃত দেহ ইন্দ্রধনুর মত, কণ্ঠীকঙ্কণনূপুর-ঝঙ্কারের তালে তালে কণ্ঠ হইতে অগ্নি-বন্দনা উঠিল। লজ্জানিবারণে অগ্নি যখন চিতোরের শেষ সুন্দরীকে ছাই করিয়া মহামুক্তি দিল তখন মরুভূমির ধূসর বালু রক্তের স্রোতে রাঙা হইয়া গিয়াছে; রাজপুত দল নির্ম্মূল।

বেলা বলিল, "এ জন্মে আমরা রাজপুতানায় চিতোরে জন্মিয়াছিলাম; তুমি মরিলে যুদ্ধে, আমি পদ্মিনীর সহিত চিতায়।"

* * * * *

পলাশপুষ্পসজ্জিতা ধরণী রক্তবস্ত্র-পরিহিতা বনবধূর মত শোভা পাইতেছে, রমণীয় উদ্যানের মধ্যে কমনীয় দীর্ঘিকা। বৈদূর্য্যমাল-সম্বলিত স্বর্ণপদ্মদলের মধ্যে শুভ্র রাজহংসহংসী সমস্ত রাত্রি খেলা করিয়া শ্রান্ত হইয়া শুইয়া আছে। সরোবরতীরে ক্রীড়াপর্ব্বত ইন্দ্রনীলমণি দিয়া খচিত। কুরুবকঘেরা মাধবীমণ্ডপের মধ্যে ময়ূর ময়ূরী নিদ্রিত। কিশলয়ভরা রক্তাশোক ও বকুলতরুর মধ্যে স্ফটিকপীঠসম্পন্ন মণিময় বেদিকায় গত যামিনীর ছিন্ন-কুসুমমালা পুষ্পপরাগ লুটাইতেছে। মাধবী রাত্রির বসন্ত-বিহার শেষে অভিসারিকা কুসুমশয্যা ছাড়িয়া উঠিল, নয়ন অলস, বদন পাণ্ডুর, দৃষ্টি কুটিল। বিলাসিনী চঞ্চলপদে উঠিতেই পায়ের নূপুর বাজিয়া উঠিল। কুসুম্ভপুষ্পরঞ্জিত অঙ্গবাস পরিয়া, কুঙ্কুমপুষ্পরঞ্জিত বস্ত্রে শ্বেতচন্দনলিপ্ত বক্ষ ঢাকিয়া, মৃগনাভিময় চন্দনার্দ্র কণ্ঠে মণিহার মণ্ডিত করিল; স্বর্ণকমলের মত মুখমণ্ডল লোধ্ররেণুময়, কর্ণের নবকর্ণিকাপুষ্প ফেলিয়া বেণীর নবমল্লিকামালা খুলিয়া কৃষ্ণাগুরুসুরভিকৃত উত্তরীয়ের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তখনও পদ্মবনে মাধবীকুঞ্জে ভৃঙ্গের ঝঙ্কার উঠে নাই, অশোকতরুর শাখে শাখে কেকারব হয় নাই, উষার অন্ধ-কার ছায়া লজ্জাবস্ত্রসম জড়াইয়া অভিসারিকা উদ্যানদ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। দুয়ার-তোরণ ইন্দ্রধনুর মত মনোহর, দুইপার্শ্বে শঙ্খ ও পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত, মরকতমণিখচিত সোপান দিয়া নামিয়া পার্শ্বের সুকুমার মন্দারতরুর নীচে আসিতেই সুন্দরী দেখিল সম্মুখে তেজঃপুঞ্জকান্তি হরিৎবস্ত্রপরিহিত শালপ্রাংশু এক বৌদ্ধ ভিক্ষু দাঁড়াইয়া—আননে প্রশান্তি, নয়নে আনন্দের অমৃত, সমস্ত দেহ হইতে যেন ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে, একহাতে যষ্টি অপর হাতে ভিক্ষাপাত্র। ভিক্ষু দীনভাবে এই বিলাসিনীর নিকট দিবসের প্রথম ভিক্ষা চাহিল। অভিসারিকা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কর্ণ হইতে হীরককুণ্ডল খুলিল, কণ্ঠ হইতে মোতির হার, কটি হইতে স্বর্ণকাঞ্চি, পদ হইতে মণির নূপুর—সব খুলিয়া আপন স্বর্ণসূতার উত্তরীয় জড়াইয়া ভিক্ষুর পাত্র ভরিয়া দিতে গেল, ভিক্ষু গ্রহণ করিল না। তখন সে স্বপ্নাবিষ্টের মত ভিক্ষুর হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র চাহিয়া লইল, তাহাকে সেই তরুমূলে বিশ্রাম করিতে বলিল।

সমস্ত দিনের শেষে সূর্য্য যখন রক্ত-মেঘের আড়ালে অস্ত গেল, সেই অভিসারিকা সারাদিন নগরের পথে-পথে ঘুরিয়া ধনী-দরিদ্র-চাষী-মজুরের দ্বারে-দ্বারে যে মুষ্টি মুষ্টি ভিক্ষা পাইয়াছিল তাহা আনিয়া দিল। ভিক্ষু নতশিরে তাহা গ্রহণ করিল। সেই রাত্রে সেই শ্রেষ্ঠিনী বিলাসিনী সকল অর্থ মণিমাণিক্য ভগবান্ বুদ্ধের নামে সমর্পণ করিয়া থেরী হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

বেলা বলিল, "এ জন্মে আমি ছিলাম উজ্জয়িনীর অভিসারিকা, তুমি বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া আমাকে বাঁচাইয়াছিলে।"

* * * *

বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র। কাতারে-কাতারে কোটি-কোটি সৈন্য সাজানো; অগণিত রথচূড়া হইতে সহস্র-সহস্র পতাকা উড়িতেছে; শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য বাজিয়া রণস্থল উচ্চশব্দসঙ্কুল হইল। শ্বেতাশ্বযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান মাধব ও কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। তারপর হস্তী-বৃংহিতে অশ্বের হ্রেষায় রথের ঘর্ঘরে ধনুকের টঙ্কারে বীরগণের সিংহনাদে সমস্ত ধরণী মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল; রথাতে-রথীতে পদাতিকে-পদাতিকে গজে-গজে অশ্বে-অশ্বে মহাযুদ্ধ লাগিয়া গেল; কোথাও শরজালের বর্ষণে সূর্য্য ঢাকা পড়িল, কোথাও মণিমাণিক্যখচিত হস্তীর দল আহত হইয়া পর্ব্বতমালার মত পড়িয়া রহিল, রক্তাক্ত খড়্গ-তরবারির খেলায় ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর সবুজ রং লালে-লাল হইয়া গেল।

বেলা বলিল, "এ-জন্মে আমরা মহাভারতের যুগে হস্তিনাপুরে জন্মিয়াছিলাম, তুমি কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের বাণে মরিয়াছিলে।"

* * * *

নবকিশলয়ময় তমালবনের ঘনছায়া, পাশে নীল-যমুনা-জল রাধিকার অন্তরের অনন্ত তৃষ্ণার মত বহিয়া যাইতেছে। কিংশুক শিলীমুখ ফুল্ল নাগকেশরে সমস্ত বন রংএ ভরা। কদম্ববনতলে চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন কৃষ্ণ দোলায় বিহার করিতেছেন, শিরে শিখীপুচ্ছের চূড়া, হাতে মোহন মুরলী, পার্শ্বে নীলাম্বরা রাধা, বন্ধুজীবের মত অরুণ অধরে মনভোলানো হাসি, সারঙ্গ নয়ন, সারঙ্গ কণ্ঠ, সারঙ্গ কুন্তল, চাঁদের সার দিয়া অমৃতে ধুইয়া বদন গড়া।

রাখালদের বেণু বাজিয়া উঠিল, গোপাঙ্গনাদের হোলি-খেলা আরম্ভ হইল, নীপের বন নীলযমুনাজল রাঙায়-রাঙা হইল। সকলে যখন খেলায় মত্ত, এক খঞ্জন-নয়না গোপবালা আর এক তরুণ রাখাল বালক দল ছাড়িয়া অদূরে বেতস-কুঞ্জের মধ্যে হোলিখেলা আরম্ভ করিয়া দিল—লাল নীল সবুজ হলদে কত রংএর ছড়াছড়ি।

তরুণ আশ্চর্য্য হইয়া বেলার চোখ দুটির দিকে চাহিল, যুগযুগ গিয়াছে সেই খঞ্জনা-নয়না গোপবালার চোখের চাহনি তেম্নি রহস্যময় অতলস্পর্শ তেম্নি আনন্দকর রহিয়াছে।

বেলা বলিল, "আমরা কত যুগ আগে বৃন্দাবনের প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝেও খেলিয়া আসিয়াছি।"

* * * *

ফাগের রঙে রাঙা তমালবন কোথায় মিলাইয়া গেল। আরও অতীতে।

গহন নিবিড় বন, চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ উঠিয়াছে। জঙ্গলে সিংহ সিংহী বাঘ বাঘিনী হস্তী গণ্ডার নির্ভয়ে আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক পাথরের গহ্বরের মুখে সেই বন্যজন্তুদের দোসরের মত এক দৈত্যসমান মানুষ বসিয়া—লোহার মত দৃঢ়, অগ্নির মত উজ্জ্বল, শালবৃক্ষের মত দীর্ঘ—সম্মুখে তীর ধনুক, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও স্তূপাকার শীকার-করা জানোয়ার পড়িয়া রহিয়াছে। বন্য মানুষটি বসিয়া তাহার গুহাজীবনের সঙ্গিনীর মাথায় লালনীল কত রংএর পাখীর পালক গুঁজিয়া দিতেছে।

বেলা বলিল, "এ জন্মে আমরা পৃথিবীর আদিম যুগে অসভ্য মানুষ হইয়া এক গুহায় এক সাথে বাস করিয়াছিলাম।"

* * * *

আরও অতীতে, আরও অতীতে। যখন মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। ছবির পর ছবি জলের উপর ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহারা দুইটি হরিণ হরিণী হইয়া বনে-বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। আপন কস্তুরী-গন্ধে মত্ত হইয়া জ্যোৎস্না-লোকে নদীতীরে কত ছুটাছুটি করিয়াছে। একরাতে নদীতীরে জল খাইতে গিয়াছে, এক বাঘ আসিয়া হরিণীকে লইয়া গেল; সারারাত হরিণটি বাঘের গুহার চারিপাশে ঘুরিয়া সকালবেলায় সেই গুহার ভিতর মৃত হরিণীর বুকের উপর গিয়া পড়িল, বাঘের হাতে আত্মসমর্পণ করিল।

তাহারা দুইটি পাখী হইয়া বনে সাগরে উড়িয়া বেড়াইয়াছে। পক্ষিণীর ঠোঁট ছিল লাল, পাখীটির নীল; পক্ষিণীর কণ্ঠ ছিল ইন্দ্রধনুবর্ণের, পাখীর সবুজ; দেশে-দেশে তাহারা বসন্তের আগমনী গান গাহিত, শরতের আবাহন

করিত; শীতের হিমবাতাস বহিলেই সেই দেশ ছাড়িয়া বসন্তরাজের অগ্রদূত হইয়া নূতন দেশে চলিয়া যাইত।

তাহারা দুইটি রঙিন্ মাছ ছিল। সমুদ্রকল্লোল-সঙ্গীতে তরঙ্গদোলায় এক সঙ্গে নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, মাণিক মুকুতা লইয়া খেলা করিত, কখনও প্রবালের পালঙ্কে ঘুমাইত, কখনও চাঁদের আলোয় সোনার ধূলিময় সমুদ্রতীরে রাত্রি জাগিত।

আরও অতীতে। যখন জীবজগৎ সৃষ্টি হয় নাই।

তাহারা দুইটি নারিকেল বৃক্ষ ছিল। অসীম আকাশের নীচে অনন্ত সাগরের তীরে দুইজন পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে তাহারা দুলিয়া উঠিত, একের শাখা অপরের গায়ে গিয়া পড়িত, একের শিকড় মাটির তলে অপরের শিকড় জড়াইত,—বৎসরের পর বৎসর তাহাদের উপর বাতাসের মর্ম্মর, সূর্য্যচন্দ্রের ঝিকিমিকি, ঝড়ের নৃত্য, বর্ষার ধারা।

তাহারা দুইজন দুইটি ফুল হইয়া এক বনে ফুটিয়াছিল। এক বসন্তের দিনে কোনো মক্ষিকা একজনের পরাগে আর-একজনের অঙ্গ রাঙাইয়া দিয়া গেল, এক জনের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া অপরকে উতলা করিত।

তাহারা দুইটি প্রবাল হইয়া সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে একবার ছাড়াছাড়ি হইয়া তারপর সাগরের স্রোতে দুইজন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া এক প্রবালদ্বীপের তীরে আসিয়া মিলিল।

আরও পূর্ব্বে, পৃথিবীর তরুণী-বয়সে তাহারা দুই জলের বিন্দু দুই মাটির ধূলিকণা হইয়া পরস্পর পরস্পরকে টানিয়াছে।

আরও অতীতে। সৃষ্টির উষাকালে সূর্য্যের বক্ষ হইতে কন্যা পৃথিবী যখন অগ্নিপিণ্ডের মত বাহির হইয়া আসিল, তাহারা দুইজন দুইটি আগুনের স্ফুলিঙ্গে পাশাপাশি জ্বলিয়াছিল।

এম্নি করিয়া জন্মে জন্মে যুগে যুগে তাহারা দুইজনে ভালোবাসিয়া আসিয়াছে, জগতের কোটি কোটি প্রেমিকদের মধ্যে তাহাদের অনন্ত প্রেমের লীলা কি অপরূপ কি অনির্ব্বচনীয়! অনন্ত জন্ম ধরিয়া তরুণ বেলার রূপ দেখিয়া আসিয়াছে তবু তাহার আঁখি তৃপ্ত হইল না, লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়ায় রহিল তবু হিয়া জুড়ানো না গেল।

লাল পাথরের পেয়ালার জল আবার শাদা হইল। হাস্নাহানার ঝাড়ের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো তাহার উপর পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতে লাগিল।

তরুণ বেলার হাত নিবিড়ভাবে ধরিয়া তাহার খঞ্জনের মত চোখ দুটিতে চাহিল।

কে তাহারা পাশাপাশি বসিয়া? অতীত অনন্তকাল ধরিয়া একজন অপরকে পাইয়াছে আর হারাইয়াছে, অনাগত অনন্ত যুগ ধরিয়া একজন অপরকে হারাইবে আর পাইবে।

কে? বেলা? না—না, বাংলা বলিয়া কোনো দেশ নাই, সেখানে হিন্দুসমাজ বলিয়া কোনো কারাগার নাই; তার মধ্যে বেলা বলিয়া কোনো ধনীগৃহের বন্দিনী নাই।

কে? তরুণ? না—না,—না; পৃথিবী বলিয়া কোনো গ্রহ নাই; সেখানে ভারত বলিয়া কোনো বন্দীশালা নাই, সেখানে তরুণ বলিয়া কোনো সুদূরপিপাসী যুবক জন্মায় নাই।

আছে কেবল চিরকালের মাধবীরাত্রি, অনন্তযুগের দুইটি প্রেমিক প্রেমিকা, অসীমক্ষণের নিবিড় মিলন।

* * * ০

তরুণের যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সমুদ্রের উপর চাঁদের আলোর বন্যা নামিয়াছে। সাগরের জলের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। সারাজীবন সে এ কি করিয়া ঘুরিল, তাহার জীবনের পথ একি একা চলার পথ, পৃথিবীর পথচলার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত কি এম্নি নিঃসঙ্গ যাইতে হইবে, সঙ্গিনী কি মিলিবে না? অনন্তকালের বিরহী যক্ষের কান্নার মত জগতের চির-যুগের তরুণ-যুবাদের বেদনায় তাহার বক্ষ ভরিয়া গেল।

তরুণের মিলন

(৩)

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের এক দোকান থেকে কি একটা জিনিষ কিনিয়া একটি বর্ষীয়সী নারী বাহির হইতেছে। একটি কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত প্রৌঢ় বাঙ্গালী

তাঁহার পথরোধ করিয়া অভদ্রের মত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মহিলাটি ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটির প্রতি চাহিয়া একটু ভীত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোকটি ভাঙ্গা গলায় বলিল, "আপনি কি ললিতা সেন?" মহিলা কিছুই যেন শুনিতে পান নাই এমি ভান করিয়া আগাইয়া চলিলেন; ভদ্রলোকটি খুব জোরের সহিত মহিলার পিছন পিছন আসিয়া আবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ করিলেন। দুই পাশের দোকানদারগুলি সাহেব মেম পাকড়ানো ছাড়িয়া এই বাঙ্গালী সাহেবের কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

ভদ্রমহিলা রাগে চোখ লাল করিয়া কি বলিতে যাইতেছেন, কিন্তু ভদ্রলোকটির সাজ দেখিয়া তাঁহার এমন অদ্ভুত ঠেকিল যে হাসিয়া ফেলিলেন। পরমুহূর্ত্তেই ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার অন্তর করুণায় ভরিয়া গেল।

তাঁহার মনে হইল যেন এই লোকটি কি একটা কঠিন ব্যারামে অনেকদিন ভুগিয়া ভুগিয়া রোগশয্যা হইতে এই মাত্র উঠিয়া আসিয়াছে, অথবা এ যেন কত দিগদিগন্তে ঘুরিয়া অতি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তবু ঘুরিবার সখ মেটে নাই, দেহের কতদিন যত্ন হয় নাই; বেশভূষার প্রতি ফিরিয়াও তাকায় নাই। টাইটা কুণ্ডলী পাকানো, জামায় ধূলা জমিয়াছে, জুতায় কাদা।

তরুণ কাতরকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ললিতা সেন?" সে যে এক বাজারের মধ্যে এক অপরিচিতা নারীকে প্রশ্ন করিতেছে তাহার জন্য সে কোনো লজ্জাও প্রকাশ করিল না।

ভদ্রমহিলাটি মিষ্টি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার নাম ললিতা বটে, তবে সেন নয় চাটার্জ্জি, বিশ বছর আগে আমি ললিতা-সেন ছিলাম।" তারপর তরুণের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে কোথায় দেখেছি, যেন অনেক দিন আগে।"

উত্তর শুনিয়া তরুণের চোখ দুটি আনন্দে জলজল করিয়া উঠিল, সে আবেগভরে ললিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, সে যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে রহিয়াছে তাহা তাহার বোধই রহিল না।

তরুণ বলিল, "চলুন, আপনার সঙ্গে আমার বড় দরকার আছে, একুশ বছর আগে আমায় দেখেছিলেন সেই বোর্ডিংএ, আমার নাম তরুণ।"

আনন্দব্যথিত সুরে ললিতা বলিল, "ও! আপনি তরুণ-বাবু!" তাহার চোখে জল আসিল, ঠোঁটে হাসিও দেখা দিল।

"আমি এই একমাস হ'ল কলকেতার চারিদিক খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি, কোন একটা পুরাণো চেনা লোক খুঁজে পাইনি, আপনাকে আজ যে কি আশ্চর্য্যরকম কোরে পেলুম —আচ্ছা বেলা বেঁচে আছেন কি না জানেন? বেলা আপনাদের সঙ্গে পড়্‌তো।"

"হাঁ, সে এই কলকেতায় আছে। আহা বেচারী!"

দুইজনেই কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া চলিল। দুইজনে ট্যাক্সিতে উঠিলে তরুণ বলিল, "ড্রাইভারকে তাহলে বেলার ঠিকানাটা বোলে দিন।" ললিতা ঠিকানা বলিতে সোফার সেই দিকে মোটর ছুটাইল।

কিছুদূর যাইতে তরুণ স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখন গ্রাণ্ড হোটেলে আমার ঘরে চলুন না কিম্বা আপনার বাড়ীতে—আপনার কাছে কতকগুলো কথা জান্‌বার আছে।"

ললিতা অবাক হইয়া তরুণের মলিন মুখে তাকাইল। তরুণ বলিল, "আচ্ছা, বেলা বিয়ে কোরেছে কি,—কেমন আছে?"

ললিতা মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "না, সেও বিয়ে করেনি, এক মেয়েদের স্কুল খুলে চালাচ্ছে, দেখ্‌বেন 'খন সে এখনও ঠিক সেই ছোট মেয়েটিই আছে।" তরুণের ফ্যাকাসে মুখের উপর বুকের সমস্ত রক্ত ঝলসিয়া উঠিয়া রাঙা করিয়া দিল। উৎসাহের সহিত ড্রাইভারকে বলিল, "আচ্ছা চলো, ওই ঠিকানায়ই চলো।"

ললিতা বলিতে লাগিল, "আপনি হঠাৎ কোথায় চোলে গেলেন, বেলা পড়াশুনা ছেড়ে দিলে, কলেজে কি ঝগড়া কোরে চলে গেল, বছরখানেক দার্জ্জিলিং শিলং নানা জায়গায় ঘুরেই কাটালে, বিয়ে কর্‌তে কিছুতেই রাজি হল না। তারপর হঠাৎ এত উৎসাহের সহিত বি-টি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে যে আমরা অবাক হয়ে গেলুম।

নিজেই বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলে এই মেয়ে-স্কুলটা করেছে—ষোলবছর হল। কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টিসেরী, ফ্রোবেল,—কত সিষ্টেম্ হল, শেষে নিজে এক শিক্ষাপদ্ধতি বের কোরে তারি অনুসারে মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছে।"

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ধারে এক সবুজ মাঠের মধ্যে পাম-গাছ ঝাউ-গাছ কদম-গাছে ঘেরা এক লালবাড়ীর সাম্‌নে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। স্কুল হইতে জানা গেল বেলা নাই, একদল মেয়ে লইয়া বোটানিকেল গার্ডেনে বেড়াইতে গেছে।

ললিতা হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌ছেন এ স্কুলে খালি ফাঁকি, সপ্তাহে হয়ত একদিন ক্লাস হয়, বাকী ক'দিন বাইরে বাইরে হয় টোটো ঘোরা—আজ আলিপুর, কাল বোটানিকেল গার্ডেন, তারপর দিন অমুকের বাগান।"

ললিতার কথা তরুণের কানে যাইতেছিল না। সে বলিল, "বোটানিকেল গার্ডেনেই যাওয়া যাক চলুন, কতক্ষণ আর লাগ্‌বে।"

ললিতা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল, তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, তাহার স্নানাহার হয় নাই, তরুণও অভুক্ত। কিন্তু তরুণের সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান যে আছে তাহার চিহ্ন দেখা গেল না। সে তরুণের শীর্ণ ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া অতি মিষ্টি হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা চলুন।"

মোটর যখন গার্ডেনের গেটে ঢুকিয়াছে, তরুণ বলিল, "আমাদের আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি, এখানে ও মেয়েদের কিছু শেখাতে এনেছে, আমরা গিয়ে তার কাজের ক্ষতি কর্‌ব, আর এ বাগানে কাউকে খুঁজে পাওয়াও ত মুস্কিল, চলুন ফিরে যাওয়া যাক্।"

এই অদ্ভুত রহস্যময় মানুষটিকে ললিতার বড় মিষ্টি লাগিল। সে বলিল, "চলুন, দেখাই যাক্ না।"

মোটর যখন বৃহৎ বটগাছের কাছে আসিয়াছে বেলার মেয়েদের দল দেখা গেল। ফুটন্ত ফুলের মত বড় ছোট মেয়েরা হাসিতেছে, লাফাইতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে। কোথাও একদল ছোট মেয়ে লইয়া একটি বড় মেয়ে গাছ পাতা না পতঙ্গ সম্বন্ধে কি বুঝাইয়া দিতেছে, কোথাও একদল ছোটমেয়ে ঝাঁকড়া চুল দুলাইয়া এক ফড়িংনা প্রজাপতির পিছনে ছুটিতেছে; বটগাছের ছায়াতলে এক কোণে হাসিমুখে বেলা দাঁড়াইয়া, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটি অতি ছোট মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া গোল হইয়া ঘুরিতেছিল। মোটর আসিয়া তাহাদের সাম্‌নে থামিতেই তাহাদের নৃত্য থামিল। ললিতা গাড়ী হইতে নামিতেই তাহার দিকে আগাইয়া হাসিয়া বেলা অপাঙ্গে তরুণের দিকে নিমেষের জন্য চাহিল তার পরে হাসিয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য আমাদের, তোমাকে পাওয়া গেল!" কতকগুলি ছোট মেয়ে "ললিতা দিদি আমাদের মোটর চড়াও" বলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

তরুণ এতক্ষণে ধীরে মটর হইতে নামিয়া বেলার মুখের দিকে দেখিল। এ ত সেই তরুণী বেলা নয়—এ প্রৌঢ়া, কপালে দু-একটি রেখা পড়িয়াছে, কালো চুলের মাঝে কয়েকটি চুল সাদা, চোখের কোণে কালো ছায়া, কিন্তু যৌবনের রূপের চেয়ে প্রৌঢ়ের লাবণ্য সুন্দরতর, সে যে ভোগবতী পার হইয়া অমরাবতীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ললিতা মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার এই বন্ধু পুরাতন বন্ধুকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আন্‌লুম; একুশ বছর আগে ইনি কোথায় হঠাৎ হারিয়ে গেছ্‌লেন, আজ মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের পথে কুড়িয়ে পেলুম। ইনি হচ্ছেন মিষ্টার তরুণকুমার—আর ইনি মিস্ বেলা।"

বেলা কহিল, একি পরিহাস! সে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর মুখ তুলিয়া তরুণের মুখের দিকে চাহিতেই মনে হইল, তাহার সম্মুখে অতিবৃদ্ধ বটগাছটা নড়িয়া উঠিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছে। বটগাছের একটা জটা ধরিয়া কোনোরকমে সে দাঁড়াইয়া রহিল। ললিতা স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া হাসিমাখা সুরে বলিল, "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এই একুশ বছর হারাইয়া-যাওয়া লোকটির সম্মানের জন্য আজ আপনার বিদ্যালয়ের ছুটি দেওয়া হোক্।"

বেলা হাসিয়া বলিল, "ছুটিতে এদের বড় লোভ নেই; তাতে ওদের আনন্দ বাড়ে না, ওদের খেলাটাই পড়া, পড়াটাই খেলা।"

তরুণ কোনমতে গলার স্বর বাহির করিয়া বলিল,

"আমি প্রস্তাব করিতেছি এই মোটরে মেয়েদের বাগানটা ঘোরানো হোক্।"

বেলা হাসিয়া বলিল, "তাতে আমার আপত্তি নেই।"

ললিতা বলিল, "আর এই স্কুলের হেড্‌মিষ্ট্রেস্‌কে আজিকার মত ছুটি দেওয়া হইল, তাঁহার স্থানে আমি কাজ করিব। অর্থাৎ কিনা মেয়েদের ছোট ছোট দল বাঁধিয়া মোটর বেড়ানোর ব্যবস্থা আমার উপর, হেড্‌ মিষ্ট্রেস্ এখন নূতন অতিথিকে অভ্যর্থনা আদর করিতে যাইতে পারেন।"

ছোট মেয়েদের দল আনন্দে নাচিয়া চেঁচাইয়া ললিতাকে ঘিরিয়া ধরিল, তরুণ ও বেলা তাহাদের ছাড়িয়া ধীরপদে গঙ্গার দিকে চলিল। কাহারও মুখে কথা ফুটিল না, যেন তাহারা মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে।

গঙ্গার তীরে বটের গাছের ছায়ায় দুইজনে আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বেলা প্রথম কথা বলিল, "তোমার কথা আজ সকালেই ভাব্‌ছিলুম—" বলিয়াই তাহার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া গেল, কিন্তু কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে কি করা যায়। "ভাব্‌ছিলুম এই মেয়েদের স্কুলের সঙ্গে একটা ছেলেদের স্কুল আরম্ভ কর্‌লে ভাল হয়, তারপর বছর দশেক পরে তার সঙ্গে একটা কলেজও জোড়া যেতে পারে। ভাব্‌ছিলুম তুমি যদি থাক্‌তে ত ঠিক কর্‌তে; আর আমার শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তোমার শিক্ষাপদ্ধতি, আমার মতের সঙ্গে তোমার মত মিল্‌ত;—ভাব্‌ছিলুম একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা কর্‌বার মত শক্তি বা যোগ্যতা আমার নেই, তুমি থাক্‌লে পার্‌তে—।"

বেলা চুপ করিল, তরুণ তাহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল; সে কি বলিতেছিল, তাহার কি মানে, তাহা তাহার মাথায় ঠিক ঢুকিতেছিল না; কথা যে এত মিষ্টি হইতে পারে, কণ্ঠের সুর যে এত সুধাভরা হইতে পারে তাহা ভাবিয়াই সে অবাক্ হইতেছিল।

ধীরে ধীরে বেলার হাতখানি টানিয়া তরুণ নিজের হাতে নিবিড় করিয়া ধরিল। তাহার মনে হইল, সমস্ত জগৎ কি সুন্দর, এই মধ্যাহ্নসূর্য্যদীপ্ত গঙ্গা কি সুন্দর, তাহার দুই ধারের জাহাজ নৌকা ষ্টীমার লাঞ্চ কি অপরূপ, তাহার দুই তীরের ঘাট সেটি গুদাম কাঠের গোলা কি মনোহর, তাহার দুই পাশে কলকারখানা বাগানবাড়ী চিম্‌নি ধোঁওয়া সব কি অনির্ব্বচনীয়! বেলার মুখের দিকে সে চাহিল, এ কোন্ খঞ্জননয়না তাপসী নারী!

বেলা বলিল, "তোমার চেহারা কি খারাপ হয়ে গেছে! এতদিন কোথায় ছিলে?"

"একদিন সব বল্‌ব, আজ থাক—"

হাতে হাত দিয়া কতক্ষণ দুজনে বসিয়া রহিল। গাছ হইতে কয়েকটি পাতা খসিয়া তাহাদের গায়ে পড়িল; পতঙ্গের দল তাহাদের ঘিরিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিল; নীচে গঙ্গায় জোয়ারের জল মহা কল্লোলে তটভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

"চলো, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে এমন কোরে বোসে আছি, মেয়েরা কি ভাব্‌বে,—ওই ষ্টীমার আস্‌ছে ওটায় আমায় যেতে হবে।"

"আচ্ছা চলো।"

"তুমি না হয় মোটরে কোরে চোলে যাও।"

"না, আমিও ষ্টীমারে যাব, আজ থেকেই তোমার স্কুলের ভার আমি তুলে নিলুম।"

হাত ছাড়াছাড়ি করিয়া তাহারা মেয়েদের সন্ধানে চলিল।

তরুণ বলিল, "এ জন্মে আমরা বাংলার ছেলে-মেয়েদের নূতন কোরে গোড়ে তুল্‌বার জন্য জন্মেছি।"

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু।

দারিদ্র্য-মাহাত্ম্য

(সাদী হইতে)

এক খণ্ড রুটি যদি পায় দীন জন
অর্দ্ধ খণ্ড দিয়ে তোষে অতিথির মন।
বিশাল সাম্রাজ্য হতে দিতে অণু ভাগ
উপজে ভূপের মনে নিদারুণ রাগ।
বসে সুখে একাসনে দীন দশ জন;
এক রাজ্যে দুই ভূপ—করি মরে রণ।

শ্রীজ্ঞানকীনাথ দত্ত।

সূর্য্যপুত্র রেবন্ত

রেবন্ত সূর্য্যের পুত্র, রেবন্ত মৃগয়ার দেবতা, রেবন্ত প্রাচীন ভারতের রণযাত্রার দেবতা। এক সময় রেবন্তপূজা না হইলে হিন্দু-নৃপতিগণের দিগ্বিজয়-যাত্রা সিদ্ধ হইত না। আজ আমরা রেবন্তের মূর্ত্তিটি পর্য্যন্ত চিনি না। মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সময়ে সময়ে প্রাচীন ভারতের এই রণদেবতার মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। এই অশ্বারোহী বীরমূর্ত্তিকে তখন কেহ বলেন কল্কী অবতারের মূর্ত্তি; কেহ বলেন তাহা নহে, বুদ্ধদেব অশ্বপৃষ্ঠে নির্ব্বাণ অন্বেষণে বাহির হইতেছেন, ইহা তাহারই মূর্ত্তি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়, ১৯০৯ খৃঃ অব্দের কাগজের ৩৯১ পৃষ্ঠায় প্রথম বৃহৎসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দেন যে এই ঘোড়ায়-চড়া মূর্ত্তিগুলি রেবন্তের। তাহার পর হইতেই এই মূর্ত্তিগুলির সঠিক পরিচয় প্রচারিত হইয়াছে।

ঢাকা মিউজিয়মে একখানা মাত্র রেবন্তের মূর্ত্তি আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে কয়েকখানা আছে, কিন্তু তাহাদের সবগুলিই বিহারে পাওয়া। ঢাকা মিউজিয়মের খানি ভিন্ন বাঙ্গলা দেশে রেবন্তের দ্বিতীয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। কেহ জানিলে দয়া করিয়া জানাইবেন। রাজসাহী মিউজিয়মের ক্যাটালগে রেবন্ত বলিয়া একখানি মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় উহা বটুকভৈরবের মূর্ত্তি, রেবন্তের নহে।

ঢাকা মিউজিয়মের মূর্ত্তিখানা ত্রিপুরা জেলায় বড়কামতা নামক স্থানে এক পুকুর হইতে পাওয়া গিয়াছিল। বড়কামতা কুমিল্লা সহরের প্রায় বার মাইল পশ্চিমে। বড়কামতায় কয়েকটি বেশ বড় রকমের পুকুর ও কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এক শুষ্ক গড়খাই দ্বারা বেষ্টিত আছে, দেখা যায়। দেখিয়া মনে হয়, এই স্থানে ছোটখাট একটি রাজবংশের রাজধানী ছিল যেন। পত্রান্তরে (এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা, মার্চ্চ, ১৯২৪ ও জানুয়ারী, ১৯১৫) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে এই বড়কামতায় সমতটরাজ্যের রাজধানী ছিল এবং এখানে খড়্গ-বংশের রাজারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। [illegible] সাধারণতঃ রাজপূজ্য। বড়কামতায় পুকুর হইতে আবিষ্কৃত রেবন্তও যে কোন রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই তাহা কে বলিবে? দুর্ভাগ্যক্রমে মূর্ত্তিটির অনেক অংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীচে হয়ত খোদিত লিপি ছিল, তাহা পাঠে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাতা কে তাহা জানা যাইত। কিন্তু এই অংশ একেবারেই ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

রেবন্তর উৎপত্তির গল্প ভবিষ্য ও অন্যান্য পুরাণে আছে। বিশ্বকর্ম্মার মেয়ে শরণ্যুর বিবাহ হইয়াছিল সূর্য্যের সহিত। শরণ্যু স্বামীর ঘর করিতে গেলেন। ক্রমে তাঁহার বৈবস্বতমনু ও যম নামে দুই পুত্র এবং যমী বা যমুনা নামে এক কন্যাও হইল। কিন্তু প্রথম প্রেমের জোয়ারে ভাটা লাগিয়া আসিলে শরণ্যু দেখিলেন যে সূর্য্যের প্রখর তেজ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তখন তিনি মাটি দিয়া নিজের অনুরূপ এক মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা সূর্য্যের নিকট রাখিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই "মহীময়ী" কন্যার নাম হইল ছায়া। সূর্য্য ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না এবং ভাবিলেন শরণ্যুই তাঁহার কাছে রহিয়াছে। ক্রমে ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দুই পুত্র ও তপতি নামে এক কন্যা হইল।

সূর্য্যের প্রথম পক্ষের পুত্রকন্যাগণও তাহাদের মা যে বদল হইয়া গিয়াছে তাহার কিছুই জানিত না। কিন্তু দৈবের চক্রে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। সূর্য্যের প্রথম পক্ষের ছেলে যমটি ছিলেন কিছু গোঁয়ারগোবিন্দ তিনি একদিন মায়ের উপর রাগিয়া মাকে লাথি দেখাইয়া বসিলেন। ছায়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন—তোর পায়ে গলিত গোদ হউক। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যমকে যে 'গোদা যম' বলিয়া পরিচিত দেখা যায়, ইহাই তাহার মূল।

মায়ের শাপ ব্যর্থ হইবার নহে। যমের পায়ে গোদ হইল, তাহা গলিত হইয়া তাহাতে পোকা পড়িয়া গেল। যম গিয়া কাঁদিয়া বাপের নিকট পড়িল। বলিল,—দেখ, মা আমাকে সামান্য অপরাধে কি দারুণ অভিশাপ দিয়াছে। এ নিশ্চয়ই আমার মা নহে, মা হইলে কি এত সামান্য

অপরাধে এমন শাপ দেয়? সূর্য্যের বড় দুঃখ হইল, তিনি তো শাপ নাকচ করিতে পারেন না, তিনি যমকে একটা পাখী দিলেন। সে সর্ব্বদা তাহার সহিত থাকিয়া তাহার ঘায়ের পোকা বাছিয়া দিবে। তারপরে ছায়ার নিকট গিয়া অত্যন্ত রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে? তুই নিশ্চয় শরণ্যু নহিস্। তখন ছায়া কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। সূর্য্য তৎক্ষণাৎ পত্নীকে ফিরাইয়া আনিতে শ্বশুরবাড়ী চলিলেন।

শ্বশুরবাড়ী গিয়া শুনিলেন, বিশ্বকর্ম্মা স্বামীপরিত্যাগিনী

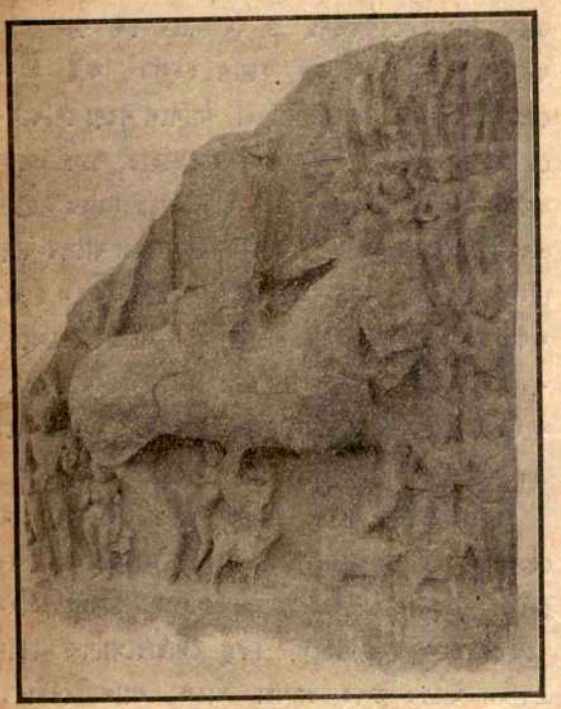

সূর্য্যপুত্র রেবন্ত।

কন্যাকে ঘরে স্থান দেন নাই; শরণ্যু মনের দুঃখে উত্তর-মেরুতে গিয়া অশ্বীরূপ ধরিয়া চরিয়া বেড়াইতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা জামাতাকে বলিলেন—'বাপু হে, তোমার যে বীভৎস অগ্নিপিণ্ডের আকৃতি, আর যে তেজ, তাহাতে কোন ভদ্রলোকের কন্যাই তোমার সাহচর্য্যে স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি শরণ্যুকে ফিরিয়া আনিতে চাও তো চেহারাখানার একটু উন্নতি কর, তেজ একটু কমাও। তোমার আপত্তি না থাকিলে আমি আমার কারখানার ভ্রমী যন্ত্রে চাঁচিয়া তোমাকে ভদ্রলোকের মত করিয়া দিতে পারি।

বিরহবিধুর সূর্য্য আর কি করেন, শ্বশুরের দারুণ প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। বিশ্বকর্ম্মা তখন ভ্রমীযন্ত্রে বসাইয়া আচ্ছা করিয়া চাঁচিয়া দুর্দ্দর্শন সূর্য্যকে সুদর্শন করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার পা দুটি যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। তাই শাস্ত্রে সূর্য্যের পদ কল্পনা করায় নিষেধ আছে। ভাস্করগণ সূর্য্যমূর্ত্তি তৈয়ার করিতে গিয়া হয় পা একেবারে বানায়ই না, অথবা বুট জুতা দিয়া ঢাকিয়া দেয়।

এইরূপে চেহারার উন্নতি হইলে পর সূর্য্য শরণ্যুর খোঁজে উত্তর-মেরুতে চলিলেন। দূর হইতে অশ্বারূপিনী শরণ্যুকে দেখিয়া সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইলেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলন হইল।

অশ্বারূপিণী শরণ্যুতে সূর্য্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামক যুগল দেবতা এবং অবশেষে রেবন্তকে উৎপন্ন করিলেন। এইরূপে রেবন্তের জন্ম হইল।

পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ বৃহৎসংহিতার শ্লোকার্দ্ধ (বঙ্গবাসী-সং ৫৮।৫৬, যথাঃ—রেবন্তো অশ্বারূঢ়ঃ মৃগয়া ক্রীড়াদি পরিকরঃ) মাত্র অবলম্বন করিয়া রেবন্তের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্যে রেবন্তের বিস্তৃততর পরিচয়েরও অভাব নাই। শব্দকল্পদ্রুমের সূর্য্য শব্দে মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া রেবন্তের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। (শব্দকল্পদ্রুম, ২য় সংস্করণ, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

সূর্য্য-তেজের অবশিষ্টাংশ তেজের অন্ত হইতে রেবন্ত জন্মিলেন। তিনি অশ্বারূঢ়, তাঁহার শরীর বর্ম্মে আবৃত, তাঁহার হাতে ধনু ও তরবারি এবং (পৃষ্ঠে) বাণ-সমন্বিত তূণ। তিনি গুহ্যকগণের আধিপত্যে নিয়োজিত হইলেন। তৎপরে লোকভাবন সূর্য্যদেব রেবন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পুত্র, তুমি বহু লোকের পূজ্য হইবে। দাবদাহ, অগ্ন্যুৎপাত, বৈরিভয় ও দস্যুভয়ে যাঁহারা তোমার পূজা করিবেন, তাঁহারা মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন। তোমার পূজায় জনসমূহ মঙ্গল ঐশ্বর্য্য সুখ রাজ্য স্বাস্থ্য যশ ও উন্নতি লাভ করিবে।"

অগ্নিপুরাণেও রেবন্ত 'অশ্বপ্রবাহক' বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু কলিকা-পুরাণেই (বঙ্গবাসী সং, ৪৫ অধ্যায়) রেবন্ত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

কালিকা-পুরাণে রেবন্তের পূজা নিরাজনা নামক রাজানুষ্ঠেয় পদ্ধতির সমাপ্তি-সূচক অঙ্গ। নিরাজনা অনুষ্ঠান কতকটা সামরিক অনুষ্ঠান। রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত, রাজার সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রাদি নিরাজনায় পবিত্রীকৃত হইত। সঙ্গে সঙ্গে কুচ-কাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধানুষ্ঠানও হইত। ছয় দিন নানা দেব-দেবীর পূজা ও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানাদির পর সপ্তম দিনে রেবন্তের পূজা হইত। রাজধানীর সিংহ-দরজার বাহিরে রেবন্তের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। এখানে রেবন্ত সুদৃঢ়-ভুজদ্বয়-বিশিষ্ট ও বর্ম্মোজ্জ্বলদেহ বলিয়া বর্ণিত। তাঁহার কেশরাশি বস্ত্রে সংযত; তাঁহার বাম হাতে এক কশা ও দক্ষিণ হাতে তরবারি, তাঁহাকে তেজস্বী শ্বেত অশ্বে সংস্থিত করিয়া সূর্য্যপূজা বিধানে পূজা করিতে হইত।

রেবন্ত পূজা সমাপ্ত হইলে সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্রাদির পবিত্রীকরণ হইত। ইহার পরে কৃত্রিম যুদ্ধ। মাটি দিয়া শত্রুর দুর্গ, সৈন্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া সমারোহের সহিত তাহার ধ্বংস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। অবশেষে মন্ত্রী ইত্যাদিকে সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গ সেনা সহকারে রাজা বিজয়যাত্রা করিতেন এবং ক্রোশেক গিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

তিথ্যাদিতত্ত্ব শব্দে শব্দকল্পদ্রুমে নিম্নলিখিত বচন ধৃত আছে,—পূজ্যঃ সাশ্বৈশ্চ রেবন্তো যথা বিভববিস্তরৈঃ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে রেবন্ত-পূজা যে শুধু রাজারাই করিতেন তাহা নহে। দেশের অশ্বশালী ও ধনশালী ব্যক্তিগণেরও রেবন্ত-পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের "ওড়িষ্যা ও তাহার ওয়াবশেষ" নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় একটি অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি সূর্য্যমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ণনা পড়িলেই বুঝা যায় যে মূর্ত্তিখানি সূর্য্যের নহে, রেবন্তের। কণারকের বিশ্ববিশ্রুত সূর্য্যমন্দিরে যে সূর্য্যপুত্র রেবন্ত বিশেষ সম্মানের স্থান পাইবেন, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

মার্টিন সাহেবের সম্পাদিত Eastern India নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় একটি রেবন্তের মূর্ত্তি বর্ণিত আছে। বর্ণনা পড়িয়াই মূর্ত্তিখানা চেনা যায়, এবং গ্রন্থকর্ত্তা বুকানন্ হেমিল্টন সাহেবের সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। ১৬ নং চিত্রলিপির ৭ নং চিত্ররূপে মূর্ত্তিখানার রেখাচিত্রও দেওয়া আছে। তাহা দেখিলে তো আর কোন সন্দেহই থাকে না যে মূর্ত্তিখানা রেবন্তেরই। বর্ণনাটি নিম্নরূপ—

মর্ম্মানুবাদ :—"দরজার বাহিরে একখানা আশ্চর্য্যজনক পাথরের মূর্ত্তি আছে। (স্থানীয় লোকে) ইহাকে বলে ভৈরব। কিন্তু আমার বোধ হয় ইহা মৃগয়া-যাত্রায় বহির্গত কোন রাজকুমারের মূর্ত্তি। তাঁহার সঙ্গে অনেক অনুচর, কাহারো হাতে ধনুক, কেহ সঙ্গীতে রত, কেহ লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। সঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং কুকুরও আছে। কুমারের বাহন পশুটিকে স্থানীয় লোকে বলে ভেড়া, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা ঘোড়ারই প্রতিকৃতি।"

এই মূর্ত্তিটি বুকানন হেমিল্টন সাহেব বিহারে বাদশার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ঢাকা মিউজিয়মে রেবন্তের যে মূর্ত্তিখানা আছে তাহা কষ্টিপাথরেরও প্রায় ৪ ফুট উচ্চ। তরুণ শিকারীর বেশে লম্বা বুট পায়ে দিয়া তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে রেবন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দেখিতে যেরূপ দেখা যায়, রেবন্তের মূর্ত্তি তেমনি খোদিত, কারুকার্য্য-শোভিত আস্তরণে অশ্বপৃষ্ঠ আবৃত, তাহার উপরে দৃঢ়রূপে জিন নিবদ্ধ। জিনের পশ্চাৎ ও সম্মুখ ভাগ বেশ খাড়া, তাহাদের মধ্যে রেবন্ত বসিয়া আছেন। বাম হাতে তাঁহার অশ্বরজ্জু, কিন্তু দক্ষিণ হাতে কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। মূর্ত্তির দক্ষিণ অংশ যেন কেহ হাতুড়ী দিয়া পিটিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ঘোড়ারও দুটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সম্মুখের পা'টিতে খুরের একটু উপরে এক গুচ্ছ ঘুঙ্গুর বাঁধা।

রেবন্তের পশ্চাতে এক ছত্রধারীর মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার মাথার দিকটা নাই। তাঁহার নীচে খড়্গধারী এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া। তাহার বাম পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক, বোধ হয় তাহার স্ত্রী। স্ত্রীলোকটির জানু ধরিয়া একটি শিশু দাঁড়াইয়া আছে। ঘোড়ার পেটের নীচ দিয়া দেখা যায়, রেবন্তের

বামে একজন ধনুর্দ্ধারী একটি বাণ ছুড়িয়াছে, সাম্‌নের একটি শূকরের গায়ে তাহা বিঁধিয়া গিয়াছে। আরও সাম্‌নে একটি বাচ্চা শূয়ার প্রাণের ভয়ে পলাইতেছে। ঘোড়ার সম্মুখের পা'টি কদমভঙ্গীতে বক্র, আহত শূকরটি যেন এই পায়ের নীচেই পড়িবে!

রেবন্তের সম্মুখে সাতজন মহিলা দণ্ডায়মানা। কাহারও হাতে ঝুড়িতে ফল, কাহারও সাজিতে ফুল, কাহারও হাতে বা বিচিত্র জলের-কলসী। তাহাদের নীচে আবার চারিজন অনুচর। দুজনের হাতে তরোয়াল, একজনের হাতে একটি দণ্ড ও অবশিষ্ট জনের হাতে একটি শিকারী বাজ! প্রাচীনকালের মৃগয়া-যাত্রার একটি সম্পূর্ণাঙ্গ চিত্র!

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

ব্রহ্মদেশের আশ্চর্য্য বুদ্ধ-মূর্ত্তি

ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত হাঞ্জেদা নগরের অন্তঃপাতী "থারোয়া" (Tharrawaw) নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক অদ্ভুত বুদ্ধমূর্ত্তি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবাসীরা উক্ত মূর্ত্তিকে "উটেজাঁওয়েণ্টা" নামে অভিহিত করে।

উটেজাঁওয়েণ্টা ফাঁয়া বা বুদ্ধমূর্ত্তি।

ব্রহ্মদেশী মহিলা।

মূর্ত্তিটি সাদা মার্ব্বেল পাথরে খোদিত; বেদীর উপর পদ্মাসনে যোগনিমগ্নভাবে উপবিষ্ট। ইহা উচ্চে ৫ হাত ৪ অঙ্গুলী, ওজন আনুমানিক ১৫ মণ হইবে।

উক্ত মূর্ত্তিটিতে বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মূর্ত্তিটির গাত্র হইতে মনুষ্যের গাত্রের ন্যায় ঘাম অনর্গল নির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৭টা হইতে প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত ইহা নির্গত হয়, পরে আর দেখা যায় না। কখন কখন আবার এমন ভাবে ইঁহার গাত্র হইতে ঘাম নির্গত হয় যে বেদীর নিম্নের ভূমি সিক্ত হইয়া যায়। মূর্ত্তিটির সন্নিকটে এক বৌদ্ধ চঙ্ বা মঠ (এই চঙে বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা বাস করেন) বর্ত্তমান। এই মঠের ধর্ম্মযাজকদের নিকট শুনিয়াছি ১৯২০ সালের ২৭ জুন রবিবার প্রাতঃকালে ৮টা হইতে ১০টা, ১৪ই জুলাই বৃহস্পতিবার ৯টা হইতে ১১টা, ১৭ই জুলাই ১১টা

ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা বা মন্দির।
(আরোয়া পল্লীর নিকটবর্ত্তী। এই মন্দিরটির আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া।)

হইতে ১২টা, ২০শে সেপ্টেম্বর সোমবার ৪টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত এমনভাবে মূর্ত্তিটির গাত্র হইতে ঘাম নির্গত হইয়াছিল যে বেদীর নিম্নের ভূমি পর্য্যন্ত কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত ফুঙ্গিরা ঐ ঘটনার তারিখ প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা উহা সংগ্রহ করিয়াছি।

১৯২০ সালের ৫ই জুন এই মূর্ত্তিটিতে আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। মূর্ত্তিটি বাম হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ হইতে বাম দিকে ক্রমাগত একঘণ্টা কাল দুলিয়াছিল। এ ঘটনা উপরোক্ত ধর্ম্মযাজকেরা ও থারোয়া পল্লীর অধিবাসীগণ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবার পরেই এই বিবরণ স্থানীয় Rangoon Gazette নামক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। লোকে এ ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত মনে করিয়া উক্ত মূর্ত্তিকে অতি ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক্ষণ এ মূর্ত্তিটিকে দেখিবার জন্য ব্রহ্মদেশের নানা স্থান হইতে প্রত্যহ বহু দর্শক আসিয়া থাকে। এই স্থান ব্রহ্মবাসী-দিগের নিকট এক্ষণ অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। উপরোক্ত মঠের এক ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিলেন যে নাকি ২।৩ দিবস সূর্য্যোদয়কালে উক্ত মূর্ত্তি হইতে সুমিষ্ট শব্দ উত্থিত হইতে শুনিতে পাইয়াছেন।

এইরূপ ঘটনা আরও অনেক স্থলে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণনা আছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিশরের তৃতীয় আমেন-হোটেপের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি (যাহা স্বরযুক্ত মেম্নন—The Vocal Memnon) নামে খ্যাত, উহা হইতেও নাকি বাদ্যধ্বনির ন্যায় শব্দ উত্থিত হইত। প্লিনি, ষ্ট্রাবো, লুসিয়ান প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে এ বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক অবস্থায় স্তূপীকৃত মার্ব্বেল প্রস্তর হইতে ও উহা খোদিত হইয়া গাঁথা হইবার পরেও উহা হইতে সূর্য্যোদয়কালে নানারূপ অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রানাইট পাথরের পাহাড়েও সূর্য্যোদয়কালে বাদ্যধ্বনির ন্যায় শব্দ অনেকে শুনিতে পাইয়াছেন। মিশরের বিখ্যাত কার্ণাকের মার্ব্বেল-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদ-মন্দিরেও সূর্য্যোদয়-

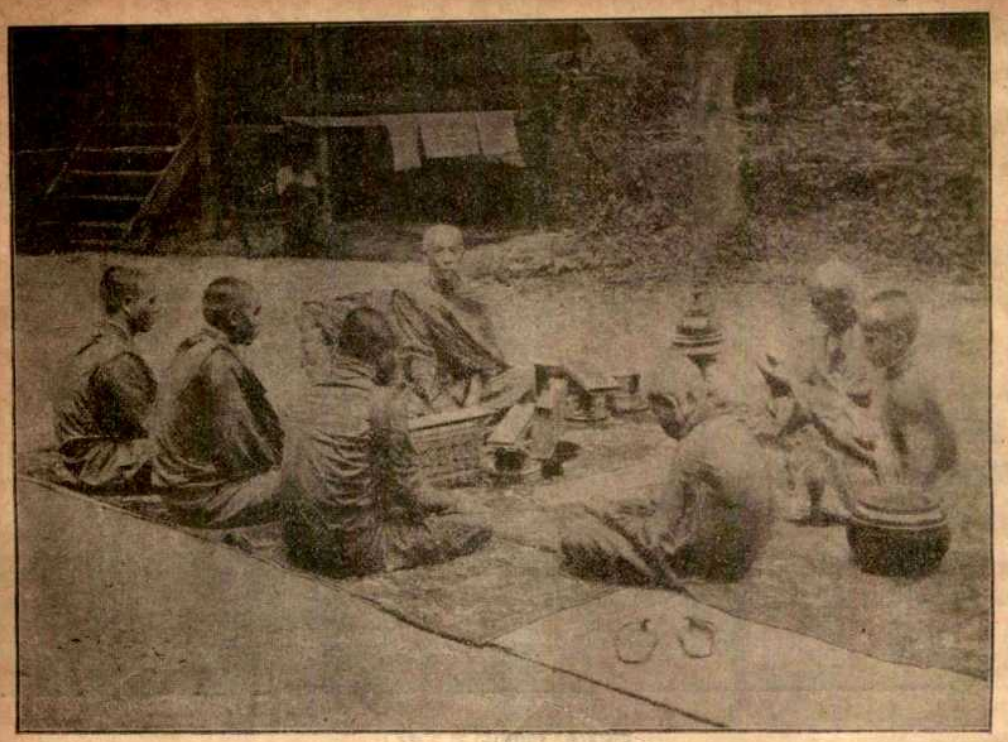

ফুঙ্গি বা ব্রহ্মদেশী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।
প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।

কালে ছিন্নতন্ত্রী-বীণার ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে শুনা গিয়াছে। এ ঘটনা স্বকর্ণে শুনিয়া বহু পর্য্যটক তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোক্ত মূর্ত্তিটিও মার্ব্বেল প্রস্তর খোদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। জানি না এ ঘটনাতে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত আছে কি না। সাধারণ লোক ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ জানেন না বলিয়াই ইহাকে আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক বলিয়া মনে করেন।

উপরোক্ত চঙ্গের ফুঙ্গিরা আরও বলিয়াছেন যে এই মূর্ত্তিটি ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মন্দালয় নগরে ছিল। ইহা তথা হইতে এই স্থানে আনীত হইয়াছে। মন্দালয় নগরে এই মূর্ত্তি যতদিন ছিল ততদিন নাকি ইহার নীচে এক প্রকাণ্ড কচ্ছপ বাস করিত। আবার এইস্থানে আনীত হওয়ার পর ইহার নীচে একটি বৃহৎ গোধিকা বা গোসাপ কয়েক মাস পর্য্যন্ত বাস করিতে দেখা গিয়াছিল।

উক্ত গোসাপটি ধর্ম্মকামী বৌদ্ধগণ এখন সযত্নে উপরোক্ত চঙ্গের এক চৌবাচ্চাতে রাখিয়া দিয়াছেন।

লেট্‌পাডান, ব্রহ্মদেশ। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

সহানুভূতি

(Olive Schreiner হইতে)

সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্র-সৈকতে সে সারাদিন যেন কাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। রৌদ্রতাপে মলিন তাহার তরুণ সুন্দর মুখখানি একান্ত আগ্রহে সুদূরবিস্তৃত নীল জলরাশির পরপারে কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। ঢেউগুলি এক-একবার তাহার পায়ের কাছে আসিয়া আবার সরিয়া যাইতেছিল। সে সারাদিন অমনি বসিয়াই রহিল; শেষে তার চোখদুটি ক্লান্তিভরে যখন আপনি মুদিয়া আসিল, দেহখানি বালুকার উপরে যখন এলাইয়া পড়িল, তখন ঐ যে, ঐ যেন কাহার পদশব্দ;—কাহার কোমল হাত-

খানির সুমোহন স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে তাহার শিহরণ বহিয়া গেল। সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—এই যে "প্রেম" প্রশান্ত নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছে! এখন বুঝিল, কাহার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়া সে বসিয়া ছিল।

দুজনে দুজনকে আকুল আবেগে কাছে টানিয়া লইল।

নিঃসঙ্গী জীবনে এখন প্রেম আসিয়া মিলিত হইল।

তাহাদের এই মিলন হইতে আসিল একটি শিশু—"আনন্দ,"—সেই অপূর্ব্ব, দুর্লভ আনন্দ, যার মধুর স্পর্শ প্রেমের প্রথম বিকাশে জীবনে কেবল একবার আসে। প্রভাতের সোনালী আলো জলের উপর যখন ঝিলিক হানে, ইহার হাসি বা বুঝি তাহা অপেক্ষাও সুন্দর সমুজ্জ্বল। স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ-কোরকটি তরুণ রবির চুম্বন-প্রত্যাশায় যে শিশিরধৌত কচি মুখখানি বাড়াইয়া দেয়, ইহার মুখখানি বুঝি তাহা অপেক্ষাও মধুরিমায় পূর্ণ। এ সেই বাক্যহীন মৌন উচ্ছ্বাস, দুইটি হৃদয়কে যাহা কানায় কানায় ভরিয়া রাখে। দুজনেই ভাবিল, এ আনন্দ বুঝি চিরদিনই তাহাদের এমনি থাকিবে।

কিন্তু, তারপর, কিছুদিন পরে, এমন এক সময় আসিল, যখন তাহারা সহসা দেখিল এই অপূর্ব্ব শিশুটি আগে যেমনটি ছিল এখন আর তেমনটি নাই। এখনও সে হাসে, এখনও সে খেলে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার হাত দুখানি যেন ক্লান্ত শিথিল হইয়া পড়ে, চোখদুটি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে জলরাশির পরপারে চাহিয়া থাকে।

একদিন তাহারা জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সে শিশুটি আর নাই; তাহার পরিবর্ত্তে আর-একটি কে আগন্তুক শিশু তাহাদের নিকটে বসিয়া আছে। তাহার বিশাল চোখদুটি বড় করুণ, বড় বিষাদমাখা। প্রথমে কেহ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া দুজনেই কাঁদিয়া বলিল, "কোথায় গেল আমাদের সে আনন্দ? চিরদিনের মতই কি তাহাকে হারাইলাম? আর কি কখনও তাহার দেখা পাইব না?"

আগন্তুক শিশুটি তখন তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া তাহাদের চোখের জল মুছাইয়া দিল। তার পরে দুজনের দুটি হাত ধরিয়া, সকল সুখ-দুঃখের সাথী হইয়া সংসার-পথে তাহাদের লইয়া চলিল। প্রেম যখন বেদনায় ক্লিষ্ট হইত, শিশুটির করুণ চোখে তখন সান্ত্বনা ফুটিয়া উঠিত। জীবন যখন নিরাশায় কাতর হইয়া বলিত, "আমি যে বড় ক্লান্ত, আর তো চলিতে পারি না। আলো যে পশ্চাতে রহিয়া গেল, এখন সম্মুখে যে কেবলই অন্ধকার"—শিশুটি তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিত, ঐ যে, পাহাড়ের বুকে আলোর রেখা। বন্ধুর পথে চলিতে জীবন যদি আহত হইত, শিশুটির কোমল হাতে স্পর্শে ক্ষতগুলি তাহার সারিয়া যাইত। সংসারের প্রখর তাপে প্রেম যদি কখনও অবসন্ন হইয়া পড়িত, শিশুটি শীতলবারি আনিয়া আবার তাহাকে সঞ্জীবিত করিত। তুষারাবৃত গিরিসঙ্কটে চলিবার সময়ে তাহার হিমশীতল হাতদুখানি শিশুটি নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া উষ্ণ করিয়া দিত।

আবার যখন তাহারা আলোর রাজ্যে, ফুলের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল, শিশুটির করুণ চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বিষাদমাখা মুখখানিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আনন্দে হাসিয়া নাচিয়া সে তাহাদের ফুল কুড়াইয়া দিল, মালা গাঁথিয়া সাজাইয়া দিল।

এইরূপে কখনও আলোর পথে, কখনও-বা অন্ধকার পথে, কত অজানা পথে প্রেম ও জীবন অগ্রসর হইয়া চলিল; আর সকল পথেই শিশুটি ছিল তাদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে সেই আনন্দ-শিশুটির কথা যখন মনে পড়িত, তখন তাহারা ভাবিত, "আহা সেও যদি এখন থাকিত!"

একদিন তাহারা পথের ধারে গভীর চিন্তায় মগ্ন একটি বৃদ্ধকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "আপনি কি বলিতে পারেন কোথায় হারাইয়াছি ও মরা সে অমল শুভ্র আনন্দ, আমাদের জীবনের প্রথম কোরক-গুলি যাহার অরুণ আলোয় রঙীন হইয়া থাকে? কি করিলে আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইব বলিয়া দিন্।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহাকে ফিরিয়া পাইলে কি তখন তোমরা তোমাদের এই সাথীটিকে হারাইতে স্বীকৃত আছ?"

তাহারা দুজনেই ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "তাহাকে হারাইব? ইহাকে হারাইলে কে আমাদের কর্ণধার হইয়া অরণ্য-পথে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবে? কে বাধা আসিলে কে আমাদের সান্ত্বনা দিবে? শোকে অধীর হইলে কে আমাদের চোখের জল মুছাইয়া দিবে?"

অতীত ভবিষ্যৎ যাঁহার দৃষ্টিপথে ছবির মত ফুটিয়া উঠে, সেই জ্ঞান-বৃদ্ধটি তখন উত্তর করিলেন, "তোমরা যে অন্ধ, নির্ব্বোধ; তোমরা জান না, ইহাকেই আগে পাইয়াছিলে, কিন্তু অন্যরূপে। দায়িত্বহীন তরুণ জীবনে, প্রেমের প্রথম উন্মেষে, যে বাধাহীন নির্ম্মল আনন্দোচ্ছ্বাস প্রাণ মন ভরিয়া রাখে, চিরদিন কি তাহা এক ভাবে থাকিতে পারে? কণ্টকসঙ্কুল অরণ্যপথে, রৌদ্রতাপিত মরুভূমিতে, তুষার-মণ্ডিত গিরিপথে তোমাদের সহায়, তোমাদের সেই আনন্দেরই রূপান্তরমাত্র এ যে 'সহানুভূতি,' আর এই তো পরিপূর্ণ ও সার্থক প্রেম।"—

শ্রীলীলা দেবী।

চিরন্তনী

(১৯)

বিদেশে এতদিন ধরিয়া পরের বেগার খাটিয়া সুপ্রকাশ নিজের পাওনাটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়াই গিয়াছিল। যাহাদের জন্য খাটিয়া মরিত তাহারা যদি দয়া করিয়া দুটি খাইতে দিত ত ভাল, না হয়ত কখনও অনাহারে কখনও অর্দ্ধাহারেই দিন কাটিয়া যাইত। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ানোও তাহাকে কম করিতে হয় নাই। তাই এতদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে যেন সুদসুদ্ধ পাওনা আদায় করিতে বসিয়াছিল। যাহাদের কাছে হৃদয়ের দাবী ছিল না, তাহাদের কাছে যে ন্যায্য পাওনা চাহিতে পারে নাই, সেই আজ স্নেহের দাবীতে অযথা অত্যাচার করিতেও ছাড়িতেছিল না।

সুপ্রকাশ বাড়ী আসিয়া পর্য্যন্ত শতদলের ত বিশ্রাম ঘুচিয়াই গিয়াছিল। এই তাহার পান চাই, এই তাহার মশলা চাই, এই পোড়া আমের সরবত, এই মিছরির পানা। ফরমাসের আর অন্ত নাই। বেহারা আনিলে হাতের তামাকের গন্ধে সব অখাদ্য হইয়া যায়; অগত্যা শতদলকেই আনিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, ও-সব জিনিষ কি একলা খাইলে স্বাদ পাওয়া যায়? দুজনেরই খাওয়া চাই। শতদলের কি পুরুষমানুষের মত যখন-তখন খাওয়া চলে? বলিলে কি হয়? সুপ্রকাশের অফুরন্ত শাস্ত্র আর অসংখ্য উদাহরণের জ্বালায় বেচারাকে হার মানিতে হয়। তাহার উপর তাহার এতদিনের সঞ্চিত গল্পই বা শোনে কে? শতদলই সে ভারটাও লইতে বাধ্য।

বাড়ীতে যে আর-একটি প্রাণী এতদিন চারিদিকের সসম্ভ্রম সেবা-অর্ঘ্যটুকু লইয়া সগর্ব্বে দূরে সরিয়া থাকিতেন, অত্যাচারের হাত হইতে এবার তাঁহারও নিষ্কৃতি রহিল না।

বিকালে কোনো ধনী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবার কথা, সাজ-সজ্জা করিতে আসিয়া অবিনাশ দেখিল তাহার নূতন সৌখীন চাদরখানার কোনো চিহ্নই নাই। সশব্দে দেরাজ আল্না মেঝেয় পড়িল, বেহারা নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া মনিবের সরোষ অভিনন্দন গ্রহণ করিল, কিন্তু চাদর মিলিল না। পরদিন সুপ্রকাশের আল্নায় তাহার দর্শন পাইয়া বেহারা সভয়ে বলিল, "ছোটবাবু, এই চাদরখানা কাল সাহেব খুঁজ্‌ছিলেন।"

ছোটবাবু ময়লা চাদরখানা হাতে করিয়া অম্লান বদনে সাহেবের দরবারে হাজির। অবিনাশের রাগ তখন পড়িয়া গিয়াছিল। সুপ্রকাশ বলিল, "দাদা, চাদরখানা খুঁজ্‌ছিলে?"

অবিনাশ তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তাই বুঝি খানিকটা হাঁড়ির কালী মাখিয়ে আমায় আপ্যায়িত করে দিতে এলে? কে—ন—তুমি আমার জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড কর, খোকা? আমি এ-সমস্ত মোটে পছন্দ করি না।"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "আমার যে কিছু নেই দাদা।"

অবিনাশ চটিয়া বলিল, "দাতাকর্ণ হবার সখ হয়ে থাকে ত গেরুয়া পর্‌লেই ত চলে। এসমস্ত আমি মোটে পছন্দ করি না।"

সুপ্রকাশ চাদর ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অবিনাশ দেরাজ খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া তাহার সাম্‌নে গোটা পঞ্চাশ টাকা ফেলিয়া বলিল, "আর কত দর্‌কার আমায় লিষ্ট করে দিয়ে যাবে।"

টাকা লইয়া সুপ্রকাশ চলিয়া গেল; চাদর কাপড় কেনার কিন্তু তাহার অবসর হইয়া উঠিল না। অবিনাশের ভাণ্ডারে প্রায়ই টান পড়িতে লাগিল। শেষে একদিন সুপ্রকাশের বিছানায় একবোঝা কাপড়-চোপড়ের স্তূপ অনাহূতভাবে আসিয়া তাহার লুণ্ঠনের প্রয়োজন দূর করিল।

কয়দিন ধরিয়াই সুপ্রকাশের ইচ্ছা করিতেছিল রাজগঞ্জে একখানা চিঠি লেখে। চিঠি লিখিবার লোক সেখানে যথেষ্টই ছিল এবং তাহাদের লেখাও কিছু শক্ত ছিল না। কিন্তু প্রতিদিনই সে একজনেরই নামে একখানা চিঠি বার-বার আরম্ভ করিয়া সেখানাকে ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। অন্য কাহাকেও লেখাও আর হইত না।

দুপুরবেলার ঝাঁঝাঁ রৌদ্রে খাটের উপর পড়িয়া কয়েক-খানা চিঠি শেষ করিয়া খামে পুরিয়া তাহারই মধ্যে একখানা তুলিয়া খুসী হইয়া সুপ্রকাশ নিজের হস্তাক্ষরে শোভিত শিরোনামাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিল। নূতন বেহারাটা দরজার কাছে বসিয়া "রামচন্দ্র কৃপালুর" গুণগানে মগ্ন ছিল। খামখানা অনেকক্ষণ দেখার পর সুপ্রকাশ বেহারার রামনামগানে বাধা দিয়া তাহাকে ভিতরে ডাক দিল। তুলসীদাসের বইখানা সশব্দে বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া আসিতেই সুপ্রকাশ তাহার হাতে চিঠিগুলা দিয়া বলিল, "ডাক-বাক্সে ছেড়ে দিয়ে আয়।" বেহারা "বহুত আচ্ছা" বলিয়া প্রস্থান করিল। সুপ্রকাশ উঠিয়া শতদলের ঘরে চলিল। তাহার খেয়াল হইয়াছিল শতদল কে গান শিখাইবে। ছাত্রী তখন পিঠে ভিজা চুল এলাইয়া রৌদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া মস্ত একটা বঁটি লইয়া এক রাশ কাঁচা আম চিরিয়া চিরিয়া শুকাইতে দিতেছিল। সুপ্রকাশ ঘরে ঢুকিয়াই হাসিয়া উঠিল, "তোমাদের যদি কোনো কালে কিছু হয়। এতগুলো পয়সা খরচ করে আমি গরীব মানুষ স্বরলিপির বই এনে দিলাম, না তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে কাঁচা আমের ঝুড়ি নিয়ে বসে গিয়েছ। কাঁচা আমের রসটাই কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রস হল?"

শতদল বলিল, "না হলে ত আবার কাব্যরসিকদের রুদ্ররসের ঘটায় আমরা মারা যাই।"

সুপ্রকাশ বলিল, "আচ্ছা, সে যখন যাবে, তখন যাবে, এখন খাতাপত্র নিয়ে এস দেখি লক্ষ্মী মেয়ের মত।"

নীচের ঘরে বসিয়া অবিনাশ কি কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া নবাগত ভৃত্যকে ডাকবাক্স লইয়া অত্যন্ত বিব্রত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া লাফ দিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার পাগ্‌ড়ীর উপর একটা থাবড়া দিয়া বলিল, "হতভাগা কোথাকার! এর মধ্যে চিঠি ফেল্‌তে তোকে কে বল্‌লে?"

বেহারা সযত্নে বাঁধা পাগ্‌ড়ীটা তাড়াতাড়ি এক হাতে টিপিয়া দেখিয়া ভীত মুখে বলিল, "জি হুজুর, ডাঁকমে চিঠি ছোড়নে—"

অবিনাশ মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "ডাঁকমে না তোমার মুণ্ডুমে—যত কি গোমুখ্‌খু এসে এইখানে জুটেছে!"

বেহারা সভয়ে মনিবের আর কিছু প্রসাদলাভের আশায় তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ ডাকবাক্সটা খুলিয়া দেখিল সুপ্রকাশের হাতের লেখা এক তাড়া চিঠি। চিঠি-গুলা হাতে করিয়াই সে ডাক দিল, "এই শিউনন্দন, জল্‌দি ইধর আও।"

শিউনন্দন দুই হাতে চাপাটি গড়িতে ব্যস্ত ছিল, মনিবের ডাক শুনিয়াই মাথা আটার উপর পরাত চাপা দিয়া ছুটিয়া আসিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইল। অবিনাশ চিঠিগুলা উল্টাইয়া দেখিতেছিল। অকস্মাৎ একখানা চিঠির উপর দৃষ্টি পড়িতেই তাহার দৃষ্টি যেন সেইখানেই আট্‌কাইয়া গেল। অবিনাশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিঠিখানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। পাঁচ দশ মিনিট কাটিয়া গেল তবু অবিনাশের মুখে কথা নাই। শিউনন্দনের হাতের আটা শুখাইয়া উঠিতেছিল, উনানের কয়লা অকারণে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, কাজেই সে অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া শেষে ভয়ে ভয়ে একবার ডাকিল, "হুজুর।"

"আভি যাও," বলিয়া হাত নাড়িয়া তাহাদের দুই জনকেই বিদায় করিয়া দিয়া অবিনাশ চিঠির তাড়াটা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। এত সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া নবাগত ভৃত্য বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া রামচন্দ্রের ভজনা করিতে পলায়ন করিল। শিউনন্দনের চাপাটিও চট্‌পট্ হাতে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অবিনাশ কেবলি পাইচারি করিতে লাগিল। একবার সুপ্রকাশের ঘরের দিকে কয়েক পা গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পর চিঠি কয়খানা দেরাজে পুরিয়া সজোরে বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিল। একতাড়া কাগজপত্র লইয়া কাজ করিতে বসিয়া বার দশ সেগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অবশেষে বাঁ হাত দিয়া মাথা চুলে

ঠেলিয়া দিয়া আবার সে দেরাজ খুলিয়া চিঠিগুলা টানিয়া বাহির করিল। চিঠি কখানা হাতে করিতে তাহার কেমন একটা অস্বস্তি ও অপরাধ বোধ হইতেছিল। কিসের যেন একটা আকর্ষণে সে ফিরিয়া ফিরিয়া সেই চিঠিকেই উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতেছিল। দূরে কাহার যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল, কিন্তু রুদ্ধ দরজার গোপনতা তাহাকে নিজের কাছেই এতখানি হীন করিয়া দাঁড় করাইল যে তাহার লজ্জায় অবিনাশের তখনি ইচ্ছা হইতে লাগিল ঘোড়ার চাবুক আনিয়া নিজের মুখেই কয়েক ঘা লাগাইয়া দেয়। চিঠিগুলা পকেটে পুরিয়া দরজা খুলিয়া তখনই সেই দুপুর রৌদ্রে খালি মাথায় সে ছুটিল ডাকঘরের দিকে। সব-কখানা চিঠি একসঙ্গে গোছা করিয়া সে লইয়াছিল, ডাকঘরে গিয়া কোনো দিকে না তাকাইয়া একসঙ্গেই সব-কটা ডাকে দিয়া দিবে মনে করিয়া। ডাকঘরের সাম্‌নে গিয়া কিন্তু আবার একবার চিঠি-কখানার ঠিকানা না পড়িয়া সে পারিল না। শ্রীমতী করুণার নামাঙ্কিত চিঠিখানা বারকয়েক সে দেখিল, যেন ঠিকানাটা মুখস্থ করিয়া লইতে চাহিতেছে। কাগজ-কলমের জন্য একবার পকেট হাতড়াইল; পকেটে কাগজ কলম না পাইয়া যেন খুসী হইয়াই সেই চিঠি-খানা পকেটে ফেলিয়া আর বাকি কখানা ডাকে ছাড়িয়া দিল। ডাকঘরের কেরাণীবাবু অবিনাশকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল, "ডাক্তার সাহেব, আপনার কিছু চাই কি? আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

"না, না, কিছু চাই না।" বলিয়া অবিনাশ তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিয়া গেল।

উপরে শতদলের ঘরে তখন গীতচর্চ্চা চলিতেছিল। অবিনাশ নিজের ঘরে ঢুকিয়াই খামখানা বাহির করিয়া একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখিয়া রাখিল। আবার শিউনন্দনের ডাক পড়িল, "ছোটবাবুকে ডাক।" শিউ-নন্দন ছুটিল। সুপ্রকাশের গানের ক্লাশ ভাঙ্গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তারিণীবাবুদের সে চেনে কি না হঠাৎ এ প্রশ্নটা করায় নিজের কি একটা মনের খবর যেন সুপ্রকাশের কাছে খুলিয়া ধরা হইবে এই সন্দেহে অবিনাশের মনটা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। সুপ্রকাশকে অবিনাশ এসব বিষয়ে খুব বাঁচাইয়া চলিত। সে তাহার এতটুকু ছোট ভাই, যদিই সে কোনো কথা শুনিয়া থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন শুনিয়া দাদাকে না জানি সে কি মনে করিবে? নিজেকে ছোটভাইয়ের কাছে এতখানি খেলো করিতে সে কোনোমতেই পারিবে না। যদি বা সব কটা চিঠি থাকিত তাহা হইলেও বা নূতন বেহারাটার কীর্ত্তির পরিচয় দিয়া সেগুলা ফিরাইয়া দিবার ছলে কিছু জানা যাইত। কিন্তু এখন কেবল করুণার নামের চিঠিখানা যদি সে সুপ্রকাশকে দিতে যায় তাহা হইলেও ত তাহার একটা কৈফিয়ৎ চাই। থাক, কাজ নাই; এখানাও ডাকে দিয়া পরে কোনো কথায় জানা যাইবে এখন। শিউনন্দন সিঁড়ি দিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিতেছিল; আবার তাহার ডাক পড়িল, "ছোট বাবুকে ডাক্‌বার দর্‌কার নেই।" বেচারা দ্বিতীয়বার হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া গেল। চিঠিখানা হাতে করিয়াই অবিনাশ বসিয়া ছিল। তাহার হাতের ঘামে করুণার নামটা কালীমাখা হইয়া উঠিল। অবিনাশ লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সেখানা উল্‌টাইয়া ব্লটিং কাগজের উপর চাপিয়া ধরিতেই দেখিল খামের মুখটা ভিজিয়া আল্‌গা হইয়া আসিয়াছে। দুরন্ত একটা লোভে অবিনাশের মনটা ভরিয়া উঠিল। সুপ্রকাশের কথাটা তখনকার মত সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। মনে ছিল শুধু 'এখানা করুণার চিঠি।' যদি বা সুপ্রকাশকে মনে পড়িত তবু অবিনাশ তাহার মধ্যে ততখানি লজ্জার কোনো কারণ পাইত না, যতখানি পাইত মেয়েটি করুণা ছাড়া আর কেহ হইলে। আপনার জালেই সে করুণাকে এমন করিয়া জড়াইয়াছিল যে নিজের অত ছোট ভাই সুপ্রকাশের সম্বন্ধে করুণাকে কেবল একটি তরুণী নারী হিসাবে দেখিবার কথা অবিনাশের মাথায় একেবারে ঢোকেই নাই। সুপ্রকাশের কাছে সে শুনিয়াছিল রাজগঞ্জ হইতে সে কলিকাতায় আসিতেছে। করুণার ঠিকানাও রাজগঞ্জই দেখিল। সুতরাং পরিচয়ের সম্ভাবনা ত আছেই। এ কথা যদিও অবিনাশ তখন ভাবিয়া দেখে নাই, তবু তাহার সুপ্তচৈতন্যের

ভিতর দিয়া এমনি একটা যুক্তির ধারা তাহাকে ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আধখোলা খামখানা অতি সামান্য চেষ্টাতেই তাহার অন্তরের খবর অবিনাশের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে পারে, এই সম্ভাবনাটাই অবিনাশকে কেবলি খামখানা খুলিয়া দেখিবার জন্য উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। যাহার চিঠি সে বন্ধ করিয়া ডাকে দিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত; অথচ তাহার আড়ালে লুকাইয়া তাহার চিঠি চুরি করার একটা হীনতা কাঁটার মত অবিনাশের বুকের কাছে খচ্‌খচ্‌ করিতেছিল। কিন্তু সেই হীনতার বেদনাকে ছাপাইয়া উঠিতেছিল অবিনাশের ক্ষুধাতুর কৌতূহল আর ভ্রান্ত অধিকারবোধ। কতদিন সে করুণার কোনো খবরটুকু পর্য্যন্ত পায় নাই, সন্ধান পর্য্যন্ত জানে নাই, আর আজ হাতের কাছে পাইয়া কি করিয়া সে তাহার টাট্‌কা খবরটা এমন করিয়া দূরে চলিয়া যাইতে দেয়? অবিনাশের রাগও হইতেছিল, চিঠি লিখিবার অধিকার তাহারই ত সকলের চেয়ে বেশী; তাহার মত কে এমন করিয়া করুণার জন্য পাগল? অথচ ক[illegible] কি না তাহার ন্যায্য অধিকারকে চিরদিনের মত আ[illegible] করিয়া এতকাল লুকাইয়া থাকিয়া[illegible] করিয়া দিল তাহারই [illegible]

কেবলি মনে হচ্ছে। সে পথ থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছি, কিন্তু দূরে আসার পরিণামটাকে মন বিন্দুতেই খুসী হয়ে নিতে পারছে না। সবই তেম্‌নি চল্‌ছে, হয়ত আরো ভাল করেই চল্‌ছে, কারণ পৃথিবীর গতি যখন ভালোর দিকে বলেই আমরা মানি, তখন আমাদের ছোট মেয়ে-ইস্কুলটাই বা কেন ক্রমোন্নতির উল্টো দিকে চল্‌বে? তবু মানুষের লোভের ত সীমা নেই। সে চিরকালই নিজেকে অমূল্য মনে কর্‌তে চায়। আমি ত সামান্য মানুষ, আমি কোন্ স্পর্দ্ধায় বল্‌ব যে আমার সে লোভ নেই। এ কথা স্বীকার কর্‌তে আমার একটুও লজ্জা নেই। ভাঙা দালানের কোণে একটা মানুষ যে এই কটাদিন ধরে খুঁটি-নাটি কাজের মধ্যে কেবলি নিজেকে প্রচার কর্‌তে চেয়েছিল, সে মানুষটা আজ সেখান থেকে সরে এসেছে, তার কাজগুলো নিশ্চয়ই পড়ে নেই, কিন্তু তবু তার যদি ইচ্ছা করে আমার ওই কোণটুকু সেখানকার মানুষের চোখে [illegible] দিনকতক অন্তত শূন্য পড়ে থাক, সেখানকার [illegible] আনন্দের পসরায় এই মানুষটা যেটুকু দিয়ে [illegible] সেটুকুর অভাব অ[illegible] ঠিক, তবে [illegible]

সে কল্পনাও করে নাই, আশা ত করেই নাই। কেবলমাত্র করুণাকে মনে করিয়াই চিঠি পড়িতে সে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু বার দুই শেষ করিয়া সেখানা হাতে করিয়া যখন সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিল, তখন করুণার কথা সে কিছুক্ষণের মত একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। অবিনাশ ভাবিতেছিল, এতটুকু হইতে হাতে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে সে যাহাকে এই কি সেই সুপ্রকাশ? হাতের এই কাগজখানার মত মানুষ-করা [illegible]লের এপিঠ ওপিঠ অন্তর বাহির সমস্তই ত তাহার চোখের উপর বলিয়া সে জানিত। মানুষ যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে সকলের চেয়ে বেশী জানে, এ তাহার চিরদিনের গর্ব্ব, কিন্তু আজ যে দেখি সে-ই সকলের চেয়ে বড় হেঁয়ালি হইয়া উঠিল। বিদেশে থাকিতে নিত্য যে চিঠি লিখিত একছত্র, "এখানে লেখ্‌বার কোনো খবর নেই," আজ সেই আবোল-তাবোল অকারণ এ কি আট পৃষ্ঠা ধরিয়া বকিয়া চলিয়াছে। মাথার চুল আর [illegible] জুতা আয়নার মত পালিশ করিয়া তোলা, [illegible]ার দেওয়া আর মা[illegible] করিয়া গা[illegible]

দেরাজের ভিতর বন্ধ করিয়া দিয়া অবিনাশ আজ অনেক-দিন পরে সুপ্রকাশকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল। অবিনাশের ভ্রাতৃবৎসলতার এ-রকম প্রকাশে সুপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রুক্ষমূর্ত্তি-অগ্রজের কোমলতর একটা সংস্করণ কল্পনা করিতে করিতে সে আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহাকে রুক্ষতর দেখিয়া সে কি করিবে কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

অবিনাশ বলিল, "চল, আজ তোমাকে মিঃ দত্তর ওখানে নিয়ে যাই। পড়াশুনা শেষ হয়ে এল, এর পর সকলের সঙ্গে মেলামেশা দরকার। তুমি ত কলেজের ছেলে কটাকে ছাড়া কাউকেই বোধ হয় চেন না।"

সাজসজ্জা করিয়া দুই ভাই মুরলা সুন্দরীর পিতৃসদনে যাত্রা করিল।

(২০)

[illegible]রাজগঞ্জে আসিয়া পর্য্যন্ত ডাকহরকরার সঙ্গে করুণার [illegible]া সম্পর্ক ছিল না। বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার [illegible] যে যোগ ছিল, তাহার সূত্রটাকে সে দিন-[illegible]লিয়াছিল; তাহার পর কোন্ [illegible] আয়োজন লাগিয়া

কিন্তু আর আসে না। অকারণেই করুণা উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল। দরকার বলিতে যে জাতীয় কারণ বোঝায় করুণাকে চিঠি লিখিবার সে-রকম কোনো কারণ কাহারো ছিল বলিয়া করুণার নিজের অন্তত জানা ছিল না। তবু সে সকাল না হইতেই ব্যস্ত হইয়া উঠিত, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার ব্যস্ততার আর বিরাম ছিল না। তাহাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া তাহাকে নিরাশ করিয়া পিয়ন প্রতিদিন চলিয়া যাইত, তবু দিন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত করুণার মনের আন্দোলন থামিত না, হয়ত বা ঝুলির ভিতর চিঠিখানা পড়িয়া আছে, অসময়ে দেখিয়া সে দিয়া যাইতেও পারে। দিনের মধ্যে দশবার সে দরজার কাছে ঘুরিয়া যাইত যেন চিঠিখানা সবার আগে তাহারই হাতে পড়ে এই আশায়। আশা করিবার অধিকার তাহাকে কেহ দিয়া যায় নাই, প্রতিশ্রুতিও ত কেহ করে নাই, তবু তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া ওই আশাটুকুই যে বাসা বাঁধিতেছিল। এই নিতান্ত অসাংসারিক অধিকারের লাঞ্ছনায় সন্ধ্যা হইতেই করুণার চোখ দুঃখে জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত। এ[illegible] তাহার সকল সুখ দুঃখ বাস[illegible]

ছিল না, তাই সে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পুকুর-ঘাটের এই ছেলেখেলার দিকে চাহিয়া ছিল। অরুণা মাথার উপর একটা চূড়া খোঁপা বাঁধিয়া হাত দোলাইতে দোলাইতে সেখানে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই দিদি, মেয়েমানুষের ঘাড়ে দোষ চাপাতে হবে বলে কি তাদের সবই দোষ? লোকে বলে মেয়েরা ন্যাকা! বাবা, ন্যাকা যদি কেউ বিশ্বসংসারে থাকে ত ওই ছেলেরা! এত চতুরও জানে! সুপ্রকাশ-বাবু এখানে থাকতে কি ভাবের ঘটা! [illegible] চোখে কানে আর কিছু দেখ্‌তে পান না। আর এখন কল্‌কাতায় গিয়ে এক লাইন খবর দেবারও অবসর হয় না।"

অরুণা আশা করিয়াছিল তাহার কথার একটা ভাল রকম সায় দিদির কাছে পাইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় দিদি তাহার কথার উত্তর না দিয়া শুধু একটুখানি হাসিল। অরুণা বলিল, "সবাই কি এক গোয়ালের গরু হয়ে দাঁড়িয়েছে! অবিনাশ বাবু ত তোমার জন্যে [illegible] মাথায় টাক পড়িয়ে ফেলেছিলেন, তাঁর ও ত [illegible] খবর নেই। তোমারও কিন্তু ভাই [illegible] আচ্ছা, রাজগঞ্জে এসে পর্য্যন্ত তুমি ত [illegible] খলে না। শতদলদিকেও [illegible] মত সাতশ

অরুণা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কে ভাই, দেখি না কার লেখা?"

করুণা চিঠিখানা চাপিয়া রাখিয়া মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "কিছু না, ও একখানা দর্‌কারী চিঠি, তোরা ছেলেমানুষ কি দেখ্‌বি?"

চিঠিখানা হাতে করিয়া করুণা পাশের ঘরে চলিয়া গেল। অরুণা অবজ্ঞাভরে ঠোঁটটা অনেকখানি উল্টাইয়া সেখান হইতে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

যাহার চিঠির আশায় এতদিন সে দিন গণিয়া আসিয়াছে এ যে তাহার চিঠি নয় তাহা বুঝিতে করুণার এক পলকের দৃষ্টির বেশী খরচ করিতে হয় নাই। কিন্তু এতদিনও ত সে চিঠি না পাইয়া তাহার দিনগুলা যেমন করিয়া হউক কাটিয়া গিয়াছে, আজও তাহার দিন বসিয়া থাকিত না, তবে কেন তাহার উন্মুখ হৃদয়ের একাগ্র আশার মধ্যে পুরাতন সে ঝড় আবার নামিয়া আসিল? একদিন ছিল যখন সে ঝড় দুঃখ-সুখে মা[illegible] গিল। একি চিঠি, হা ভগবান। এর চেয়ে তাহার সে তাই তাহার কতখানি দুঃখ আর কত[illegible] যে শতগুণে ছিল ভাল। কেন সে তাহার দেখিবার লোভে সে আপনাকে[illegible] ভাষায় তাহাকে তিরস্কার ফেলিতে পারে নাই, চা[illegible]

সে মাথা[illegible]

পরের মুখে তোমার খবর আমায় পেতে হবে। আমার এতদিনের সাধনায় তোমার খোঁজটুকু আপনি পাবার মত দাবীও কি আমার জন্মায়নি? একটা মানুষকে এমন করে যে দিশাহারা করে ফেলে গেলে একটু নিশানাও দিয়ে গেলে না যাতে করে সে পথ খুঁজে নিতে পারে। কতদিন আর আমায় এমন ত্রিশঙ্কুর মতন মাঝপথে ঝুলিয়ে রাখ্‌বে বল। তোমায় নূতন করে আর কি বল্‌ব, তুমি ত জানই যে আমার কথা গুছিয়ে কবিতা সাজিয়ে মনের কথা বল্‌বার ক্ষমতা কোনোদিনই নেই। কিন্তু আমার মনের কথা যা তা আমার কেঠো রকম কথায় কাজে তোমায় ত আমি অহর্নিশিই এতদিন ধরে জানিয়ে আস্‌ছি। আমার সেই কথার এতদিনের চাওয়া উত্তরটা দশ কথায় না পার অন্তত একটি কথায় জানিয়ে আমায় ধন্য করে দাও তোমার কাছে আমার এই কেবল প্রার্থনা।"

চিঠি পড়িয়া করুণার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে

[illegible]তদিন সে
[illegible]না কামনার মূল চুল চিরিয়া
[illegible]ন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিত, কোথায় তাহার অধিকার
[illegible]ছে কি নাই, কোথায় তাহার মন ভ্রান্তির পথে ছুটিয়াছে
কিনা; আজ কিন্তু সেসব বিচারবুদ্ধিকে অনায়াসে সে
দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, মূঢ়ার ব্যর্থ অশ্রুজল আর
অভিমান হইয়াছিল তাহার সম্বল। যাহার উপর অভিমান
তাহার হইত সে যে তাহাকে অভিমান করিবার অধিকার-
টুকুও দিয়া যায় নাই এই দুঃখেই করুণার চোখের জল
আরও উচ্ছল হইয়া উঠিত।

সেদিন দুপুরে ছুটি ছিল। অনেক বেলায় পুকুর-ঘাটে
লোক বিরল হইয়া আসিয়াছিল। দুই-একজন বিধবা
গৃহিণী বোধ হয় কি কারণে দ্বিতীয় বার জলে ডুব দিয়া
দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ছোট ছোট দুটি
মেয়ে ছুটির দিনটা এমন আরামে কাটাইবার আর কোনো
উপায় না খুঁজিয়া পাইয়া ডুব-সাঁতারে পরস্পরের দক্ষতা
পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল। পদ্মফুলের মত তাহাদের কচি মুখ
দুটি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া জলের উপর ভাসিতেছিল, আবার
তখনই ডুবিয়া যাইতেছিল। করুণার কাজে মন লাগিতে-

[illegible]
আর কোনো [illegible]
বেশ দোষ আছে। আ[illegible]
কই কাউকে একখানা চিঠিও লি[illegible]
বুঝি লেখনি? আমার না হয় তোমার
পঁয়তাল্লিশ জন ভক্ত নেই, নইলে আমি ত এতদিন চিঠি
লিখে ডাকঘর ভরিয়ে দিতাম।"

করুণা বলিল, "এই দাঁড়ানা, ইস্কুলটা একটু গুছিয়ে
গাছিয়ে নি, তারপর চিঠিপত্র লেখা যাবে সবাইকে।
অন্য লোকের দোষ কি, তারা ত কেউ আমার ঠিকানাই
জানে না ত চিঠি লিখবে কি?"

একখানা চিঠি হাতে করিয়া রণু ঘরে ঢুকিল। দিদির
কথা শুনিয়া সে বলিল, "নিশ্চয় একজন কেউ তোমার
ঠিকানা জানে, এই দেখ তোমার নামে একখানা চিঠি
এসেছে।"

খামখানা দেখিয়াই করুণার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া
উঠিল। কিন্তু হাতের লেখা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে
তাহার মুখের সমস্ত রক্তোচ্ছ্বাসটা কে যেন নিঃশেষে মুছিয়া
লইয়া গেল। করুণা খামখানা হাতে করিল, কিন্তু খুলিল
না।

[redacted] খানি সুখ বাছিয়া
[redacted] সম্পূর্ণ আড়ালে লুকাইয়া
[redacted] হেও নাই। কিন্তু আজ যে তাহার
[redacted] পকাঠ কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। তাহার ঠিক
ঠিকানাও নাই।

কি যেন একটা রোষের আগুন তাহার শান্ত বেদনার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার ভয়ে করুণা চিঠিখানা খুলিতে পারিতেছিল না। ছোট ছেলেরা যেমন চোখ বুজিয়া আগত বিপদকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়, হাতে পাওয়া চিঠিখানা না খুলিয়া করুণা তেমনি করিয়া তাহার মনের চাপা দেওয়া ঝড়টাকে থামাইয়া রাখিতে চাহিতেছিল। কিন্তু সত্যই ত আর তাহা সম্ভব নয়। করুণাকে চিঠি খুলিয়া পড়িতে বসিতে হইল। কেন জানি না অবিনাশের রুক্ষমূর্ত্তির সঙ্গে তাহার ভাষার মিলটা আজ আর তত পরিষ্কার দেখা গেল না। এই ভাষা আর-একদিন দেখিলে করুণার মনে হাসির একটু আমেজ হয়ত লাগিত, কিন্তু আজ তাহার চোখে জল আসিতেছিল। অবিনাশ লিখিয়াছে—

"অভাজনের উপর করুণার করুণা কি আর হবে না? সত্যি, আমি এমন কি অপরাধ করেছি জানি না, যার জন্যে [redacted] রুদ্ররূপী আপনা[redacted] লুকাইয়া ফিরার জন্য বজ্রকঠোর[redacted] করিল না, কেন সে মহাজনের মত তাহার সর্ব্বস্ব লুঠি[redacted] ভাঙিয়া চুরিয়া ছারখার করিয়া দিতে চাহিল না! করুণা ত তাহারই কৃপায় সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন রাত্রে আলোর রশ্মিটুকু দেখিয়াছিল, আজ তাহার পর সেই কৃপালুর কাছে তাহার এই নিদারুণ অকৃতজ্ঞতার জন্য সে ত তাহাকে কঠিন হাতে সচেতন করিয়া আপনার দাবী দাওয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিত। কেন সে তাহা করিল না, কেন দাতা হইয়া আজ এতদিন পরে সে ভিক্ষু সাজিয়া বসিল? করুণার চোখের জল আর থামিতে চাহিতেছিল না। তাহার পাওয়ার দুঃখ না-পাওয়ার দুঃখ সব আজ একাকার হইয়া কেবল অশ্রুরূপেই ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু এ চিঠির সে কি উত্তর দিবে? দিন কাটিতে লাগিল; দিনের আলোয় কাজের চাপে আপনাকে চাপিয়া সে তাহার দুঃখের জালটাকে দূরে সরাইয়া রাখিত, কি[redacted] রাত্রের অন্ধকারে সে যেন তাহাকে সহস্রপাকে জড়[redacted] ফেলিত। স্বপ্নেও তাহার যেন সব জট পাকাইয়া যাইত. জাগিয়া ঘুমাইয়া সারা রাত তাহার চোখের জলেই কাটিয়া

যাইত। শুধু চাওয়ার যে রসে সে ভরপুর হইয়া উঠিতেছিল, কি একটা ভয়ের শিহরণে তাহাও আজ তাহার কাছে অমিশ্র মধুর আর ছিল না।

দিন পাঁচ সাত আবার কাটিয়া গেল। যে চিঠিখানার আশায় করুণা প্রথম প্রথম দিন গোনাই সকলের চেয়ে বড় কাজ করিয়া তুলিয়াছিল অপ্রত্যাশিত আর-একখানা চিঠির ধাক্কায় পড়িয়া যেন সাম্‌লাইয়া লইবার ইচ্ছাতেই সে তাহার সেই প্রার্থিত চিঠির আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। আজ যাহা সে একেবারেই চায় না তাহাই পাইয়া যাহা চায় তাহাকেই সে কিসের যেন ভয়ে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছিল। যখনই মনটা তাহার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তখনই ভয়ে কাতর হইয়া সে কামনা করিত, "না আসুক, না আসুক।" কিন্তু তবু তাহার মন বুঝিত ঠেকাইয়া রাখিতে সে পারিবে না; এতদিন সাধিয়া যাহা ভাগ্যের কাছে মিলে নাই, আজ তাহা আর দূরে থাকিবে না।

স্কুলের কাজ সারিয়া করুণা ঘরে ফিরিতেছিল, এমন সময় ঘরের উঠানে ডাক-হরকরার আবির্ভাব দেখিয়াই তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। আগাইয়া গিয়া চিঠিখানা লইতে সে পারিল না। যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এ-রকম উদাসীন ভাবে পাড়া-গাঁয়ের পিওন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া নিজেই চিঠিখানা প্রায় তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কাহার চিঠি বুঝিবার জন্য আজও তাহার চিঠি খোলার দরকার হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চিঠিখানা জামার বুকের ভিতর গুঁজিয়া ফেলিয়া সে স্কুলের নির্জ্জন ঘরেই আবার ফিরিয়া গেল। নিজের ঘরে যাইতে তাহার সাহস হইল না। লালরুলটানা একখানা খাতা খুলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া সে চিঠিখানা পড়িতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও কি কথাটা যে চিঠিতে পরিষ্কার বলা হয় নাই, নারীর চোখ তাহা এড়াইল না। সে কি করিয়া ভুল করিবে? না-কওয়া কথার মর্ম্ম বুঝিবার জন্যই যে তাহার সমস্ত মনটা এতদিন ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া ছিল। বুঝিয়া আনন্দে গর্ব্বে করুণার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কাঁটার মত যে গোপন ব্যথাটা তাহার বুকে বিঁধিয়া ছিল তাহা তাহার চোখের জলে আজ আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পাওয়ার আনন্দে আজ তাহার অভিমানের অধিকার প্রবল হইয়া উঠিল। নিজেকে মনে পড়াইবার যাহার এত সাধ সে এতদিন ছিল কোথায় যখন তাহাকেই মনে করিয়া দুই বেলা করুণা পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল? তাহার হাতের এই লেখাটুকুর জন্য যেদিন তাহার প্রার্থনার শেষ ছিল না, সে-দিন যদি এইটুকু সে পাইত, তাহা হইলে নিছক আনন্দের স্পর্শটা দুচার দিন না হোক একদিনের জন্যও সে পাইত; কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষ, সেটুকু তাহার ভাগ্যে ঘটিতে দিল না।

দুই-চারবার চিঠিখানা পড়িয়া করুণার হঠাৎ তারিখটার দিকে দৃষ্টি পড়িল। ঠিক বার দিন আগে চিঠিখানা লেখা। করুণা অবাক হইয়া গেল। ভাবিয়া দেখিল অবিনাশের চিঠির অন্তত চার পাঁচ দিন আগে চিঠিখানা লেখা হইয়াছে। আজ তাহার মনে হইল জগতে দৈব বিড়ম্বনা সত্যই আছে। কতবার চিঠিখানা পড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া সন্ধ্যা করিয়া করুণা ঘরে ফিরিল।

অরুণা আসিয়া বলিল, "দিদি, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ওখানে বসে তুমি কি কর্‌ছিলে? গরমে যে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। অসুখ করেনি ত?"

"হ্যাঁ, বড্ড মাথা ধরেছে," বলিয়া করুণা উপরে চলিয়া গেল।

"তাই বুঝি ঘুপ্‌সিতে আজকের দিনটাই না বসে থেকে পার্‌লে না?" বলিয়া অরুণা অপ্রসন্ন মুখে একা সংসারের কাজ সারিতে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

করুণা অনেক ভাবিল, কিন্তু সুপ্রকাশের [illegible] উত্তর এখন সে কিছুতেই দিয়া উঠিতে পারিল না কি ভাবিয়া শতদলকে একখানা নিতান্ত মামুলি রকমের চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। তাহার যে অত্যন্ত বেশী লাজ এবং সেইজন্য যে সে কাহাকেও চিঠি লিখিতে পারে না এই কথাটাই তাহাকে কেবল সে ভাল করিয়া বুঝাইল। তাহার কাছে তাহার আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত সকলের খবরটাও চাহিতে ভুলিল না।

এ চিঠির উত্তর আসিতে বেশী দেরী হইল না। কি খবর যে এই ঘরের কোণের একলা মানুষটির কাছে করুণা আশা করিয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কিন্তু তবু যে

জাল সে আপনি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহারই জটের মাঝে একটুখানি পথ পাইবার আশা যে সে শতদলের অজ্ঞাতে শতদলের কাছেই করিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ভাগ্যে তাহার তাহা ছিল না। চিঠি খুলিয়া করুণা যাহা দেখিল, স্বপ্নেও সে তেমন কিছুর কল্পনা করে নাই। শতদল লিখিয়াছে, "তোমাকে ভাই, বন্ধু ভেবে একটা কথা লিখ্‌ছি, তুমি কিন্তু কাউকে এখনও এসব ঘুণাক্ষরেও জানিও না। সেই যে মুরলা দত্ত বলে সুন্দর মত মেয়েটি, খুব ফিরিঙ্গিদের মত কথা কয়, সবুজ বেনারসী শাড়ী পরে, সেই প্রথম নেমন্তন্নের দিনে আমাদের বাড়ী এসেছিল, তাকে তোমার মনে পড়ে কি? বেশ গানও করে সে। তারই সঙ্গে ভাই, ছোট মামার বিয়ের কথা উঠেছে। কি রকম যেন অদ্ভুত ঠেক্‌ছে, না? তুমি ত ভাই ছোট মামাকে দেখেছ, তার কি অমন মেম-সাহেবী চঙের মেয়ের সঙ্গে মানাবে মনে হয়? পৃথিবীতে আর কি মেয়ে ছিল না! বরং বড় মামার সঙ্গে হলে তবু কথা ছিল, এ কিন্তু একেবারেই বেমানান হবে। তবে ছোট মামার মত ছেলের তুলনা মেলে না, মেয়ের মন যদি ভাল হয়, তবে সে তার মনের মত হতে চেষ্টা কর্‌বেই। প্রায়ই ভাবি ছোট মামাকে বিয়ের কথা জিগ্‌গেষ কর্‌ব, কিন্তু কেন জানি না, সে কদিন থেকে এমন মনমরা হয়ে আছে যে হাসিঠাট্টা করা ত দূরে থাক্, তার সঙ্গে কথা [illegible]তেও ভরসা হয় না। সারা দিনই বাড়ী থেকে বাইরে [illegible] আসে, গল্প কর্‌তে গেলে মাথা ধরেছে, কি "কাজ [illegible]লে উঠে চলে যায়। কি যে হয়েছে ভাই কিছু বুঝি না। বিয়ের নামে কোথায় ফুর্ত্তি বাড়্‌বে, না সব উল্টে গেছে। আমি ত কথাটা একবার পাড়্‌তেও পারিনি। পছন্দ হয় নি না কি কে জানে? তা মুখ ফুটে তাই বল্লেও ত হয়। কেউ নিশ্চয় মাথার দিব্যি দেয় নি। বড় মামার মেজাজ ত আরোই তিরিক্ষে হয়ে উঠেছে, তাঁকে একটা কথাও বল্‌তে সাহস হয় না। এটুকু নিজে বলেছেন তাই। যে বৌ আস্‌বার নামেই বাড়ি সুদ্ধর হাঁড়িমুখ, সে বৌ এলে যে কি হবে তাই ভাব্‌ছি। যাক্, ভাই, এসব কথা তুমি যেন কাউকে বোলো না। আপনার মনে করেই মনের কথা সব তো[illegible]"

এরকম খবর করুণার কাছে যে কেমন শোনাইল, তাহা বলিয়া বুঝান শক্ত। বুকের স্পন্দন তাহার হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মেঘের আড়াল হইতে মেঘনাদের বাণের মত তাহার বুকে এ যে কি আঘাত আসিয়া পড়িল, তাহা সে ভাবিয়াও উঠিতে পারিতেছিল না। পৃথিবীটা যে পৃথিবী ছিল এখনও সেই পৃথিবীই আছে কি না তাহার সন্দেহ হইতেছিল। তাহার বোধশক্তি যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ এমন বিমূঢ়ের মত সে বসিয়া ছিল না। বিশ্বনাট্যে আজ তাহার ভাগ্যে কি নাট্যলীলা লেখা আছে, তাহা যেন চোখ মেলিয়া দেখিয়া লইবার জন্যই সে উঠিয়া বসিল। এত দুঃখেও তাহার আজ হাসি আসিতেছিল মনে করিয়া, "একি কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকময়ি!" মনে হইল সেই তাহার এক-দিনকার দুঃখের কথা, যেদিন সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা পৌনঃপুনিক দশমিকের মত ভাঙাঘরের কোণের রাতের পর দিন আর দিনের পর রাতের কথা কল্পনা করিয়া তাহার তৃষিত যৌবন বেদনায় কাতর হইয়া উঠিত। সেই তাহার বৈচিত্র্যবিহীন জীবনে আজ বিচিত্রতা কি এই রূপ ধরিয়া আসিতে সুরু হইল? হউক; সকল নাট্যেরই শেষ আছে, ইহারও শেষ একদিন সে দেখিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তা দেবী।

সিন্ধু-শকুন

১

প্রভাতে এই সাগর-জলে
দেখ্‌নু তোদের সাজ।
মন থেকে মোর মুছ্‌ল মলা
ঘুচ্‌ল রে সব লাজ।
রজত-বরণ তপন-করে
রূপ কি এত ছড়িয়ে পড়ে?
দেখ্‌নু সাগরস্রোতশিখরে
ফুলের-তবক আজ।

সিন্ধু-শকুন! আমার গলায়
বাজ্‌চে তোদের গান,—
তোরাই বুঝি এলোমেলো
ঢেউএরি সন্তান!

২

দুপুরে ঐ শৈল-চূড়ে
দেখ্‌নু তোদের নীড়,
একটি 'পরে একটি এসে
লাগিয়েছিলি ভীড়;
শিলায়-শিলায় আসন নিয়ে
জুড়িয়েছিলি আমার হিয়ে,
মূর্চ্ছনাতে মাতিয়ে দিয়ে
দিছলি গীতের মীড়!
সিন্ধু-শকুন! আমার গলায়
বাজ্‌চে তোদের গান,—
তোরাই বুঝি এলোমেলো
শৈলেরি সন্তান!

৩

সন্ধ্যাতে এই ঝঞ্ঝামুখে
দিস্‌ রে তোরা হানা,
কোন্‌ সে অগাধ সুখের ভরে
মেলিয়ে দিছিস্‌ ডানা?
কভু দূরে নীল-নীলিমায়
মেঘের পাশে লুকাচ্চে কায়,
কভু লঘু পক্ষেতে ঠায়!—
যায় না ত কই জানা।
সিন্ধু-শকুন! আমার গলায়
বাজ্‌চে তোদের গান,—
তোরাই বুঝি এলোমেলো
ঝঞ্ঝারি সন্তান!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

মানবের রাজনৈতিক জীবনের শৈশবকাল

পৃথিবীর সুদূর দেশসমূহের মধ্যে অবিরত বর্দ্ধনশীল আদান-প্রদান ও বাণিজ্যের সহিত সভ্যতা বিস্তারের প্রভাব সত্ত্বেও স্থানে স্থানে এমন অনেক জাতি দেখা যায়, যাহারা এখনও তাহাদের পুরাতন জীবনের ধারা বজায় রাখিয়াছে। আন্দামানী ও সিংহলের বেদ্দা প্রভৃতি আজকালকার অবিমিশ্র অসভ্যজাতির আদর্শ।

আদিম মানবের যে চিত্র আমরা আঁকিতে যাইতেছি, তাহা কিঞ্চিৎ অন্ধকারময়। আদিম মানবের জীবনের ইতিপূর্ব্বে আমরা সুখময় ভিন্ন অন্যরূপ কিছু কল্পনা করিতে পারিতাম না। অনৈতিহাসিক যুগে মানুষ তাহার অতীতকে মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া আনন্দ পাইত। এখন ঐতিহাসিক যুগের গবেষণার ফলে ঐ-সকল পুরাতন স্বপ্নময় ধারণা পোষণ করা যায় না। গবেষণার দ্বারা পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন যে প্রকৃত আদি মানুষ সাধারণতঃ দুঃস্থ, প্রায় উপবাসী, খর্ব্বাকৃতি, নগ্ন, শীতক্লিষ্ট, নিরাশ্রয় এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বহুবিধ আপদবিপদে শঙ্কিত ছিল। তাহার কোনরূপ পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল না। তাহার ভোজন ও বাসস্থান সম্বন্ধেও কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তাহার কোন কোন বিষয় এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় যাহা তাহার সভ্য ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে ঘটে নাই।

আদিম মনুষ্য-সমাজের যে-সকল অবশেষ-চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধানের জটিলতা তাহাদের বিশেষ প্রাচীনত্ব জ্ঞাপন করে। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা আছে যে, একটি সভ্য জাতি বা সমাজ একজন আদিপুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে একথা মানবের সমাজগঠনের ইতিহাসে সকল সময়ে সমান প্রযোজ্য নয়। সমাজবন্ধনের একটি বিশেষ স্তরে একজন সাধারণ আদিপুরুষ ধরিয়া বংশধারা গণনা করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক জেন্‌ক্‌স্‌ বলেন যে গোত্রমূলক (patriarchal)

সমাজবন্ধন-প্রণালী পূর্ব্বে সমাজের মধ্যে ছিল না। সমাজ তখন সমবায়-ভাণ্ডারের ন্যায় খাবার জিনিস সংগ্রহের সুবিধার জন্য কয়েকজন লোকের সমবায় মাত্র ছিল। ইহাকে দল বা pack আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহাকে খাদ্য-সম্বরাহ-সমিতির বেশী আর কিছু বলা যায় না। ইহা সমাজ নামের যোগ্য নয়। ইহার সকল সভ্যই দিনান্তে শিকারের অংশ গ্রহণ করে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এ ক্ষেত্রে তাহাদের দলগুলি একত্রে বসবাস করে। নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দলের সহিত তাহাদের গুরুতর পার্থক্য নাই; বস্তুতঃ তাহারা পরস্পর মেশামিশি করে। এই দল বা packকে টোটেম (Totem) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব প্রায় সমস্ত অসভ্য সমাজেই আছে। প্রত্যেক টোটেমের এক-একটি চিহ্ন আছে। বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তু, বৃক্ষ, লতা, সর্প ইত্যাদি চিহ্নজ্ঞাপক। অপেক্ষাকৃত নব টোটেম একই মায়ের সন্তানগণ কর্ত্তৃক গঠিত হয়।

এক টোটেম ও আর-এক টোটেমের মধ্যে বিবাহ করার রীতি আছে। এক টোটেমের প্রত্যেক পুরুষকে অন্য টোটেমের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের স্বামী বলিয়া ধরা হইত। অবশ্য এই রীতিতে বংশ নির্ণয়ের কিছু অসুবিধা হইত।

যে টোটেম বা শিকার-সমবায়-জীবনের কথা বলিলাম উহাতে স্ত্রীসম্বন্ধ (Female kinship) স্থানে স্থানে বর্ত্তমান ছিল—অর্থাৎ স্ত্রীলোক হইতেই বংশধারা গণনা করা হইত। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ ছিল না। Female kinshipএর পর Male kinship অর্থাৎ পুরুষের নামানুসারে বংশের নামকরণ আরম্ভ হয়। এই নিয়ম পরবর্ত্তী সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। তখনই পিতৃ-প্রধান (patriarchal) সমাজের সৃষ্টি হইল। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস আছে যে পিতৃ-প্রধানতাতেই সমাজে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। কিন্তু তাহা নহে। খাদ্যসংগ্রহরূপ ব্যবসাগত বন্ধনই আদিম সমাজের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ রাখিয়াছিল। রক্তের সম্বন্ধ বড় একটা ছিল না। যদিই বা ছিল, তথাপি স্ত্রীলোক হইতেই বংশধারা গণনা করার রীতি ছিল। যখন পিতৃ-অনুক্রমেই সমাজের পত্তন হইল, তখন সমাজবন্ধনে রক্তের সম্পর্ক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে লাগিল। সে সময়ে পুরুষের নামানুসারে বংশের নামকরণ আরম্ভ হয়। একই পুরুষের সন্তানসন্ততিগণ প্রথমে একবংশ ও শেষে একজাতি গঠন করে। এ কথা সত্য নয় যে প্রথমে আদিপুরুষ হইতে গৃহস্থ পরিবার ও ঐরূপ পরিবার হইতে গোত্র (clan) গ্রাম ও পরিশেষে জাতি গঠিত হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতৃপ্রধান সমাজগঠনের পক্ষে একজন স্ত্রীলোকের একজন পুরুষের সহিত বিবাহিত থাকার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শিকার-জীবনে (Totem life) এবং পরিবর্ত্তন-স্তরে মাতৃতন্ত্র সমাজে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহসম্বন্ধ ছিল না। পিতৃতন্ত্র সমাজের প্রথম অবস্থায় একজন পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারিতেন; পিতৃপ্রধান সম্বন্ধ নিরূপণে এ পদ্ধতি পরিপন্থী নহে। এ সমাজে একজন পুরুষ স্বীয় দলের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনাদির ভার গ্রহণ করেন। ইনি ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। আমাদের গোত্র বোধ হয় পিতৃতন্ত্র রীতিমূলক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিকার সংগ্রহের সমবায়-জীবনে (Totem life) আধুনিক বিবাহের মত কোন বন্ধন ছিল না। অতএব কোন পরিবার গঠনের সম্ভাবনা অতি অল্প ছিল। সামাজিক বন্ধন ব্যবসাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পিতৃতন্ত্র সমাজবন্ধন ব্যক্তিগত; প্রদেশগত নয়। বর্ত্তমান সমাজগুলির বন্ধন প্রদেশগত, সামন্ত-বাধ্যতা-মূলক। বর্ত্তমান সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি রাজ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধবিজড়িত। কিন্তু পিতৃতন্ত্র সমাজে সেরূপ ছিল না; ইহা কতকগুলি পল্লীতে গঠিত ছিল; সমবায় সম্পর্ক (communal tie) এখানে প্রধান ছিল। বর্ত্তমান সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঐ সমাজে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সর্ব্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) ও মায়াবাদ (Mysticism)—স্পিনোজা ও শঙ্কর

স্পিনোজার ব্রহ্ম (Substance) শঙ্কর যাঁহাকে বলিয়াছেন 'সত্যম্' ঠিক তাঁহারই অনুরূপ। এই বস্তুতে স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, বহুত্ব—কোন ভেদ আরোপিত হইতে পারে না। যাহা কিছু সান্ত সসীম আকারবিশিষ্ট তাহার পরিবর্জ্জনের দ্বারা ইহাঁর একত্ব ও অনন্তত্বে উপনীত হইতে হইবে। যাহা বুঝিতে গেলে আর-কিছুর প্রয়োজন, ঐ 'আর-কিছু'র দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত (determined); সুতরাং উহা সান্ত। এই সান্তকে পরিহার করিতে পারিলেই অনন্ত বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। সুতরাং স্পিনোজার কাছেও 'নেতি'র দ্বার দিয়াই ব্রহ্মবস্তুতে উপনীত হইতে হইবে। আমরা যে এই-সব পরিমিত বস্তুজাত দেখিতেছি ইহাদের সীমা তো কল্পনাপ্রসূত (আমরা প্রায় শঙ্করের মায়াবাদের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলাম)! এই মহাদেশের (Space) কথা ভাব না কেন, ইহা এক অখণ্ড বস্তু। ইহার মধ্যে যে তোমরা অসংখ্য ঘট পট দেখিতেছ, যাহা এক আরকে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তাহা তো তোমার কল্পনা (abstraction); এক দেশখণ্ড বাস্তবিক আর দেশখণ্ড হইতে কখনও পৃথক্ নহে, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সুতরাং ঘটপটাদি সসীম বস্তুসকল সব মিথ্যা। এই মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া ধরিতে পারিলেই সব ভেদ বিলুপ্ত হইবে, অভেদাত্মক সত্য-বস্তুতে যাইয়া পৌঁছিবে। এবং সসীমের সীমা সরাইয়া দিলেই তো উহা অসীম হইল। স্পিনোজা এইরূপে পরিমিত যাহা কিছু লইয়া এই বিশ্বসংসার সকলই ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্‌এ পৌঁছিলেন। এই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত যদিও অন্য কিছু দ্বারা বিশিষ্ট নহেন, কিন্তু সকল বিশেষত্বকে ইনিই জন্ম দিয়াছেন। সকল বিশেষত্বকে একে একে নির্ম্মূল করিয়া যে ভাবে তিনি নির্ব্বিশেষে উঠিয়া গিয়াছেন সেখান হইতে বিশেষত্বের নিদানরূপে এই নির্ব্বিশেষে আবার এই বিশিষ্ট জগতে অবতরণ করিতে পারেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্পিনোজার ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপে (attributes) প্রকাশিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের আবার অনন্ত প্রকার (modes) ভেদ। আমরা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা যাহা ব্রহ্ম-বস্তুর বস্তুত্ব (Essence) বলিয়া গ্রহণ করি তাহাই স্বরূপ। আমাদের কাছে তাঁর মাত্র দুইটি স্বরূপ—জীব (Thought) ও জগৎ (Extension) ধরা পড়িয়াছে। আর কত জগতে কত জীবের কাছে কত স্বরূপ অভিব্যক্ত তাহা কে জানে। ব্রহ্ম এই স্বরূপগুলির সমষ্টি নহেন—কেন না, তাহা হইলে তো ব্রহ্মের মধ্যে অন্ততঃ স্বগতভেদই আসিয়া গেল। শঙ্করের ন্যায় স্পিনোজাও স্বগতভেদ মানেন না। প্রত্যেক স্বরূপই সমগ্র বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানজগৎ গুণে ও পরিমাণে যাহা প্রকাশ করে, বিষয়জগৎও তাই। উহারা একই বস্তুকে দুই দিক হইতে দেখার ফল। সুতরাং যদি কিছু ভেদ ঘটে তাহা বস্তুর নয়, দ্রষ্টার দৃষ্টিভেদ। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টি দিয়া দেখি তাহা তো জ্ঞানস্বরূপেরই একটি প্রকার মাত্র। সুতরাং স্বরূপ যদি আমাদের দৃষ্টি-জনিত ভেদ হয়, তাহা হইলে এখানে অন্যোন্যাশ্রয় (petitio principii) হেত্বাভাস হইল না কি? স্পিনোজাকেও চাপিয়া ধরিলে তাঁহার চিন্তাধারার বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য তাঁহাকেও শঙ্করেরই ন্যায় এক 'মায়া'র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চাপিয়া ধরে নাই, তিনিও এতদূর উঠিয়া বা তলাইয়া দেখেন নাই। তাই তাঁর দর্শন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"বাদে পৌঁছিয়াছে এবং তাহার অদ্বৈতত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যে পরিমিত বিষয়-সকলের আপনার দিক্ হইতে কোন বাস্তব সত্তা নাই তাহারা স্বয়ম্ভু স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই মত অনশ্বর হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহাদের মধ্যেই তাঁহার স্থান। একদিকে সকলই ব্রহ্মে বিলীন, অন্য দিকে ব্রহ্ম সকলে প্রকাশিত; ব্রহ্ম এই বিশ্বে অন্তর্নিবিষ্ট (Immanent), আবার এই বিশ্ব-চরাচর এই ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্", কিন্তু ব্রহ্মও আবার বিশ্বের মন্দির—এ বিশ্ব তাঁর বাহিরে নয়। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তার অস্তিত্ব থাকে না সত্য; এই জগতে আপনাকে না রাখিলে ব্রহ্মও থাকেন না, এ কথাও তেমনই সত্য। যে

চিন্তা পরম্পরার সাহায্যে স্পিনোজা পরিমিত জগৎ ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দিয়াছেন এবং যাহার সাহায্যে জগৎকে তিনি ব্রহ্ম হইতে পুনরায় বাহির করিয়াছেন, এ দুই ধারাই তাঁহার তত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু শঙ্করের তত্ত্বের দিক্ হইতে জগৎসমস্যার এই মীমাংসা সম্ভব ছিল না। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তিন রকমে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ১) ঘটের সঙ্গে মৃত্তিকার, (২) দধির সঙ্গে দুগ্ধের, ও ৩) সর্পভ্রমের সঙ্গে রজ্জুর। মায়াবাদীগণ এই তৃতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। রজ্জু যেমন ভ্রমবশতঃ সর্প বলিয়া মনে হয়, মায়া-প্রভাবে ব্রহ্মকেই জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে। এই মায়া কি পদার্থ তার ব্যাখ্যা নাই এবং ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া এই মায়া বা অবিদ্যাস্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইয়াছে। এক দিকে জগৎ ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হইতেছে, অন্য দিকে এই 'কিছু' অবোধ্য (Irrational); সুতরাং জগৎ-কারণের একত্ব, অনন্তত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে। অবশ্য প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ প্লেটো, এরিষ্টটল্‌ও এই খুঁৎ-বিরহিত হইয়া জগৎ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাতে শঙ্করের দোষ স্খালিত হইতেছে না। যাহা হউক, শঙ্কর এমন নির্ম্মমভাবে তাঁহার ব্রহ্মবস্তু হইতে সসীম ও পরিমিতকে বর্জ্জন করিয়াছেন যে আর কোনরূপেই অসীমের মধ্যে সসীমের স্থান হইতে পারে না। তাঁহার 'এক' বহুর স্পর্শে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মে ভেদ বা বহুত্বের স্থান নাই। ব্রহ্মই বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন—কোন অর্থেই শঙ্করের তত্ত্বে ইহার স্থান নাই। সুতরাং এ-একত্ব বহুর অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুকে এক করিবার একত্ব নহে, মণির মধ্যস্থিত সূত্রের একত্বও নহে, ইহা বহুকে অস্বীকার করিয়া বহুর বাহিরের এক কল্পিত (abstract) একত্ব। যদিও কোনওরূপে ইঁহাকে জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়, তবে তাহা বাহিরের নিদানরূপে—যেমন রজ্জু সর্পের নিদান—কিন্তু অন্তর্নিহিত বীজশক্তি বা কর্ত্তৃশক্তিরূপে নহে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম যে জগতের কারণ তাহা কেবল একটা নিতান্ত বাহিরের সম্বন্ধ। ব্রহ্ম হইতেই এক অর্থে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে বটে, জগতের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মকে উল্লেখ করিতে হইবেই, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে জগতের স্থান নাই। কোনও অর্থেই তিনি জগৎকে আপনার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে পারেন না। কি জীব কি জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি (attribute) নহে। সসীম যাহা-কিছুর ব্রহ্মাতিরিক্ত অস্তিত্ব অবাস্তব, অথচ তাহা ব্রহ্মের অন্তর্ভূতও হইবে না। যাহা কিছু সত্তাবান্ তাহা ব্রহ্মের বাহিরে থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপী হইয়াও তিনি সসীম বিশিষ্ট জগতের বাহিরে; সুতরাং এই জগৎ একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছে, সে স্বাতন্ত্র্যটা যতই অকেজো হউক না কেন। শাঙ্কর দর্শনের এই অসামঞ্জস্য হইতে নিষ্কৃতি নাই। আর জীব! সে তো ব্রহ্মই তবে যে পরিমাণে সে আপনার 'আমি-ব্রহ্মত্ব' প্রমাণ করিবার জন্য সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে, সেই পরিমাণেই প্রমাণ হইতেছে সে ব্রহ্ম নহে। একদিকে দেখিতেছি 'জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্', অথচ ব্রহ্মের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নাই—সম্বন্ধ হইবে ঠিক যখন তার জীবত্ব নষ্ট হইবে অর্থাৎ যখন সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা থাকিবে না। আর ব্রহ্ম! যে জীব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে সেই জীবের মধ্যে তাঁর স্থান নাই, তাহা হইতে তিনি চিরবিচ্ছিন্ন। জীবত্ব যখন কাটিল তখন তো কেবল ব্রহ্ম। আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম—মধ্যখানে একটা বিকট স্বপ্ন। স্বপ্নের কারণ মায়াফলভক্ষণজনিত বদ্‌হজ্‌মি। মায়া কি?.....চুপ্!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

খোসা ও শাঁস

(জালালউদ্দীন রুমী)

কঠিন বহিরাবরণ মাঝে
কোমলতা করে বাস,—
দয়ার বসতি বেদনায় আছে—
খোসারি ভিতরে শাঁস।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

অজৈব অভিব্যক্তি

(Inorganic Evolution)

সৃষ্টির কলা-কৌশল দর্শন করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে সৃষ্ট পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে যেমন একটা বাহ্যিক ভেদ আছে তেমনই একটা একত্বও অনুস্যূত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ পর্য্যন্ত এই জাগতিক পদার্থরাজী স্রষ্টার বিশেষ-বিশেষ সৃষ্টিবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছিল। "Omne vivum e vivs" প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, inorganic অর্থাৎ নির্জ্জীব বা অজৈব পদার্থ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় না, প্রাণের উৎপত্তি নির্ণয় বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা নহে, এই কথাই প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। মহাত্মা ডারউইনের জীবাভিব্যক্তিবাদের প্রচার বৈজ্ঞানিক চিন্তায় নব-জীবন সঞ্চার করিয়া সমগ্র জড়বিজ্ঞানে একটি নব এষণা প্রদান করিল। অধুনাতম বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইতেছেন যে জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে যে জাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ আপাতদৃষ্টিতে অনুভূত হয় সেইরূপ কোন বাস্তবিক পার্থক্য নাই—বায়ু, অঙ্গার, খনিজ পদার্থ ও জীব প্রভৃতি বস্তুর অভ্যন্তরে আত্যন্তিক-স্বগত বিভিন্নতা নাই।

আমরা অদ্য অজৈব পদার্থের অভিব্যক্তি (Inorganic Evolution) সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের স্থূল মীমাংসাগুলি বলিতে প্রয়াস পাইব। এই বিষয়টি এত জটিল ও দুরূহ যে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ না হইলে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের পরিভাষা না থাকায় অধিকাংশস্থলেই ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের দ্বারা এই নব্য বৈজ্ঞানিক চিন্তার একদেশের কিছু বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া আসিতেছিলেন যে জড়বস্তুর সমষ্টি-পরিমাণের (sumtotal) হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহার রূপান্তর হয় মাত্র এবং এই জড়ের অন্তর্নিবিষ্ট-শক্তিরও (energy) অপচয় বা উপচয় হয় না, শক্তির আকারের রূপান্তর হয়, তাহার সমষ্টিগত পরিমাণের সমতার বৈলক্ষণ্য হয় না। স্থূল জড়ের অনভিব্যক্ত অবস্থা কতকগুলি মৌলিক পদার্থের পরমাণু।—এই পরমাণু নিত্য পদার্থ (indestructible)। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এইসব theory বা সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নব্য মত বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বে পরমাণুবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

পরমাণুবাদ।

প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে এই ভৌতিক জগৎ প্রায় আশীপ্রকার মৌলিক দ্রব্যের (elements) রাসায়নিক সংমিশ্রণ ও সন্নিবেশ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই মৌলিক পদার্থের সমষ্টির পরিমাণ অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া কোন কালেই হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। নিউটন বলিতেন ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে এইসব জাগতিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ১৮০৮ খৃঃ অঃ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ড্যাল্‌টন আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে এই জাগতিক সমঘন (homogeneous) মৌলিক পদার্থ-রাজী বিভাজ্য। ইহাদের অবিভাজ্য (indivisible) অবয়ব-কণিকা বা ক্ষুদ্রতম অংশের নাম পরমাণু (atom)। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের (element) পরমাণুর পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) আছে। এবং এই বিভিন্ন পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার পরস্পরে মিলনে ও সংস্থানে রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের (compound) উদ্ভব হইয়াছে। পরমাণুপুঞ্জের রাসায়নিক সংযোগেই পৃথিবী গঠিত।

মহাপ্রাণ ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের নব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া বিজ্ঞান উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অবসান-সময়ে বর্ত্তমান নব-কলেবর ধারণ করিয়া ঘোষণা করিল যে পরমাণুই জড়ের প্রাথমিক অবস্থা (primal matter) নহে, পরমাণু হইতেও অতীব সূক্ষ্ম পদার্থ আছে যাহা দ্বারা পরমাণুপুঞ্জ গঠিত।

রেডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটী।

ম্যাসিয় কুরি ও মাদাম্ কুরি রেডিয়াম-নামক ধাতু আবিষ্কার-কালে দেখিয়াছিলেন যে এই ধাতু হইতে এক-প্রকার তেজ বা রশ্মি নির্গত হয়, ইহা কতকগুলি অতি-সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট। এই সূক্ষ্মকণিকারাজির মধ্যে হিলিয়াম্ নামক একটি মৌলিক দ্রব্য (element) দেখা যায়। এই রেডিয়াম্ আপন শক্তি বিকিরণ করিয়া কালক্রমে

অপর একটি ধাতু ইউরেনিয়ম্‌এ পরিণত হয়। এবং এই ইউরেনিয়ম্ পদার্থটি আবার স্বতঃই অপর একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এইপ্রকার ধাতুনিচয়ের যে স্বতঃই শক্তিক্ষরণ হয় এবং তড়িৎপ্রবাহের বিশিষ্ট অবস্থাতে যে একপ্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায় এই শক্তিকে রেডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটী (radio-activity) বলে। রেডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটী রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও উৎপন্ন করা যায়। রেডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটী-যুক্ত মৌলিক দ্রব্যের রূপান্তর-কালে এই শক্তি বিশ্লিষ্ট হইয়া উপচিত হয়। এবং বৈজ্ঞানিকেরা আরও একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে রেডিয়াম্ ইউরেনিয়াম প্লাম্বাম (সীসক) মৌলিক দ্রব্যগুলি (elements) এক পর্য্যায় (family) ভুক্ত এবং Periodic Law অনুসারে ইউরেনিয়াম হইতে সীসক পর্য্যন্ত পদার্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী আরও অনেক অনাবিষ্কৃত ধাতু আছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা যাহাকে (chemical element) রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ বলি তাহা আর এখন বৈজ্ঞানিকের চোখে মৌলিক বলিয়া গণ্য নহে। এইরূপ পরমাণুও চরম সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ (matter) নহে। বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্‌বাণী এই যে—হয়ত কোন একদিন বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রাগারে পরমাণুগুলিকে শক্তিপুঞ্জে পরিণত করা যাইতে পারে এবং শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই শক্তি সংযোজন দ্বারা proto-matter (জড়ের প্রাক্ অবস্থা) হইতে জড় সৃষ্ট হইতে পারে।

শক্তি, অনুস্যূতবৃত্তি ও প্রৈতি শক্তি
(Potentia and Energia)।

এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একটু ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে Energy বা ক্রিয়াশক্তির সম্বন্ধে কিছু বোঝা প্রয়োজন। Energy (ক্রিয়াশক্তির) দুইটি অবস্থা,—একটি Energia (অন্তর্ব্বল বা প্রৈতিশক্তি), অপরটি Potentia (বিভব, অনুস্যূত বৃত্তিশক্তি বা প্রচ্ছন্নশক্তি)। বিভিন্ন স্থূল-জড়-পদার্থ এই Potentia বা অনুস্যূত বৃত্তিশক্তির বিভিন্ন আকার এবং এই জড়ের যখন বিপ্রকীর্ণ অবস্থা হয় যাহাকে বৈশেষিক দর্শন বিকুর্ব্বাণ (dis-integrating process) বলে (যেমন রেডিয়মের radio-activity অথবা তড়িৎ-প্রবাহের ইলেক্‌ট্রন বা তড়িৎ-বাহী কণা), তখন আবার Energia (প্রৈতি শক্তির) আবির্ভাব হয়। সুতরাং জড় ও শক্তি পরিমাণতঃ অক্ষুণ্ণ থাকে বলা চলে না, এবং স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে Potentia বা অনুস্যূত বৃত্তিশক্তি এবং Energia বা প্রৈতিশক্তির সমষ্টির পরিমাণ সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি-হীন হইয়া থাকে। Energia প্রৈতি-শক্তিকে Kinetic Energy বা কার্য্যকরী শক্তি এবং Potentia বা বিভবকে Potential Energy (অন্তর্নিগূঢ় শক্তি) বলা হয়। আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, বেগ, কর্ম্ম প্রভৃতি Kinetic Energy এবং বহিঃস্পন্দহীন অতীন্দ্রিয় অবস্থায় জড়শক্তিকে Potential Energy বা অন্তর্নিগূঢ় শক্তি বলা হয়। বায়ুশূন্য প্রদেশে (Vacuum) বা সূর্য্য বা গ্রহ-গ্রহান্তর হইতে শূন্য দেশে (Inter-stellar space) তড়িৎ বা আলোক প্রভৃতির প্রকাশরূপ Kinetic Energyর (প্রৈতি-শক্তির) চালনের আধারের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা এই শক্তিবহ আধারকে ঈথার বলেন এবং অনুমান করেন ঈথারই জড়ের সর্ব্বপ্রাথমিক অবস্থা (primordial matter) অথবা ইহা হইতে সঞ্জাত; এবং ইহা হয়ত সর্ব্বব্যাপী-সমঘন-গুরুত্ববিহীন-সামগ্রী, পরিমাণ অথবা অতীব সূক্ষ্মতম অবয়ব (particles) সমবায়ে সংগঠিত। ঈথারকে হিন্দু-দর্শনে 'আকাশ' পদার্থ বলা হয়। শক্তি দ্বারা ঈথার-স্পন্দনে যে তরঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাতেই আলোক-তাপ-তড়িৎ প্রভৃতি রূপে Energy বা ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ হয়। ঈথারেতেই Energia এবং Potentiaর সাম্যাবস্থা। এই ঈথার অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ।

X-ray bulb বা নালিকাতে দেখা যায় যে ক্যাথোড্ বা তড়িৎপ্রবাহের negative pole হইতে একপ্রকার অতীব সূক্ষ্ম কণিকা নির্গত হয়, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকেরা ইলেক্‌ট্রন্ বলেন। এই ইলেক্‌ট্রন্ অথবা রেডিয়ম্ হইতে তড়িৎবাহী কণার ন্যায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকারাজী নির্গত হয় সেইসব কণিকা হাইড্রোজেন পরমাণুর (hydrogen atom) সহস্রাংশের একাংশের অধিক নয়। এই ইলেক্‌ট্রন বা তড়িৎবাহী কণার সমবায়ে হাইড্রোজেন

প্রভৃতির পরমাণু গঠিত হইয়াছে, এবং এই ইলেক্‌ট্রন বা তড়িৎবাহী কণাই Energia অবস্থায় স্থূল matter বা জড়ের উৎপত্তির প্রথম স্তর এবং Potentia অবস্থায় ঈথাররূপে থাকে। এই hypothesis বা কল্পনা মানিয়া লইলে অজৈব ও জৈব পদার্থের মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধানের সমস্যার সমাধান হয়। এই মতবাদের দ্বারা ক্রমবিকাশের বা অভিব্যক্তির একটি ধারাবাহিক স্তর নির্ণয় করা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা অনুমান করা হয় যে Energy বা ক্রিয়াশক্তি কোন পদার্থে বিশেষরূপে কেন্দ্রীভূত থাকিলে ঐ শক্তি যখন Kinetic Energy অর্থাৎ প্রৈতি বা কার্য্যকরী শক্তিরূপে ঐ পদার্থ হইতে বিকিরণ হইতে থাকে তখন ঐ শক্তি সর্ব্বনিম্ন ক্রমের পরমাণু উৎপন্ন করিয়া Potentia বা অন্তর্নিগূঢ় শক্তিরূপে অবস্থান্তরিত হয়। অর্থাৎ Kinetic Energyই atom রূপ ধারণ করিয়া Potentia অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। Physico-Astronomy অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয় পদার্থতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায় যে অনন্ত আকাশে প্রচণ্ড-উত্তাপ-বিশিষ্ট নক্ষত্র অর্থাৎ সূর্য্যসমূহের এবং নীহারিকা (nebulae) স্থিত Energia এই প্রকারেই জড়রূপে পরিণত হইয়া Potentia বা অনুভূত বৃত্তিশক্তিরূপে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক ক্রিয়াকালে দ্ব্যণুককেই (Chemical molecules) স্থির পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়া রাসায়নিক কার্য্য চলিতে থাকে, অণুর যেমন কেবলমাত্র আপেক্ষিক স্থিরত্বই আছে। ড্যাল্‌টনের আবিষ্কৃত atomএরও তদ্রূপ ক্রিয়াশক্তির (Energy) Energia হইতে Potentia রূপে অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতে ঐ Energy বা ক্রিয়াশক্তি উপষ্টম্ভ হইয়া থাকে। অণুসংগঠনে যেমন রাসায়নিক পরমাণুর বিশ্রান্তি, সেইরূপ Energiaর (প্রৈতি-শক্তিরও) atom বা পরমাণুতে Potentia রূপে বিশ্রান্তি। এই Energiaই (প্রৈতিশক্তি) যত পরিমাণে সংরুদ্ধ হইয়া Potentia (অনুদ্‌ভূত-বৃত্তি-শক্তি) রূপ ধারণ করে, সেই পরিমাণে বিভিন্ন-প্রকারের atom বা পরমাণুর উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের element বা মৌলিক দ্রব্যনিচয় এক Energiaর সংরোধের অনুপাতে বিভিন্ন Potentiaর সুতরাং বিভিন্ন-প্রকারের জড়ের আকার ধারণ করে। যে মৌলিক পদার্থের যত বেশী পরিমাণে (atomic weight) পারমাণবিক গুরুত্ব হয়, সেই পদার্থের মধ্যে তত পরিমাণে Energia সংহত হইয়া Potentia রূপে থাকে। অরাব রেডিয়াম্ ও ইউরেনিয়াম্ প্রভৃতি পদার্থের স্বতঃই যে ক্ষরণ হইয়া পদার্থান্তররূপে পরিণত হয় তাহা হইতে বোঝা যায় যে যাহার পারমাণবিক গুরুত্ব যত বেশী অর্থাৎ যত বেশী পরিমাণে Potentia থাকে, তাহারা ততই স্বতঃবিশ্লিষ্ট হইয়া Kinetic energy উৎপাদন করিয়া লঘুতর-পরমা বিশিষ্ট পদার্থের উদ্‌ভব করে। তাহা হইলে, রেডিয়, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণবিশিষ্ট Potentia (অনুদ্‌ভূত বৃত্তি-শক্তি)=অবস্থান্তরিত বা রূপান্তরিত বা পরিণামগ্রস্ত পদার্থ +তৎদ্রব্যবিশ্লিষ্ট—Kinetic energy (প্রৈতিশক্তি)। আবার, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের (Stellar system) বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণে (spectrum analysis) দ্বারা দেখা যায় যে মহাব্যোমস্থিত প্রচণ্ড তাপ-বিশিষ্ট-সূর্য্যসমূহে বহুল পরিমাণে হাইড্রোজেন্ ও হিলিয়াম্ নামক গ্যাস উহাদের বাষ্পাবরণের (Photosphere) মধ্যে আছে, এবং ঐসমুদায় গ্যাসের পরমাণু সূর্য্যের energia বা প্রৈতিশক্তি হইতে সঞ্জাত। সুতরাং Kinetic energy বা প্রৈতিশক্তি সংহত হইয়া পরমাণুর আকার ধারণ করে বেশ প্রতীয়মান হয়।

রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা হাইড্রোজেন-পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, পরীক্ষা-দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরমাণুতে প্রৈতি-শক্তির (kinetic energy) ও অনুভূত বৃত্তিশক্তির (Potentia) উভয়েরই ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। যে পরিমাণে Potentia বাড়ে সেই পরিমাণে পরমাণুর গুরুত্ব (atomic weight) বাড়ে এবং যতই atomic weight অর্থাৎ পারমাণবিক গুরুত্ব বাড়িবে সেই পরমাণুর ও তদ্‌গঠিত পদার্থের ততই stability অর্থাৎ স্থিরত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। হাইড্রোজেন্-পরমাণু=নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের potentia+নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ-বিশিষ্ট Energia। এই Potentia যত বাড়িতে থাকিবে Energia ততই কমিতে থাকিবে এবং এই Potentia ও Energiaর সংঘর্ষের বিভিন্ন stage বা অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক মৌলিক-দ্রব্যের (elementএর) পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই প্রকার Potentia ও Energiaর

(অনুভূত-বৃত্তিশক্তি ও প্রৈতিশক্তির) সংঘাত একটি ধারাবাহিক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রকাশ হইয়া এক এক পর্য্যায়ের (group or period) রাসায়নিক মৌলিক-দ্রব্য (Chemical elements) উৎপন্ন করে। এই পারমাণবিক গুরুত্ব অনুযায়ী মূল পদার্থসমূহের সম্বন্ধকে বিজ্ঞান শাস্ত্রে Periodic Law বলে। রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ্ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত মৌলিক পদার্থই এই Periodic Law অনুসারে নানা পর্য্যায়ে (group) ভুক্ত হয়। ভবিষ্যতে যদি কোন নূতন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার হয় তাহাও এই নিয়ম অনুসারে কোন এক group বা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবং এই Law বা নিয়মের আর-একটি আবিষ্কার এই যে যেমন হার্‌মোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রের কতকগুলি পর্দ্দায় এক-একটি octave হয়, সেইরূপ কতকগুলি রাসায়নিক-মৌলিক-দ্রব্য মিলিয়া সামান্য গুণ বা ধর্ম্ম-সমবায়ে তত্তৎ পদার্থের বিশিষ্ট-ধর্ম্মের দ্বারা এক-একটি পর্য্যায় বা group হয়, এবং এই পদার্থনিচয়ের মধ্যে atomic weight বা পারমাণবিক্ গুরুত্ব একটি নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ কতকগুলি মৌলিক-দ্রব্য দ্বারা তাহাদের সামান্য ধর্ম্ম এবং পারমাণবিক গুরুত্ব অনুপাতে এক-একটি চক্র বা মণ্ডলী (circle) হইলে আর-একটি উচ্চ ক্রমের মৌলিক পদার্থের চক্রের উদ্ভব হয়। এই পর্য্যায়ের (group) পারমাণবিক গুরুত্ব আরো উচ্চতর।

পরমাণুর সদৃশ-পরিণামে (atomic evolution) দেখা যায় যে যে-সমস্ত সদৃশধর্ম্মবিশিষ্ট মৌলিক দ্রব্য লইয়া এক একটি group বা পর্য্যায় হয়, তাহা যতই উচ্চস্তরে আরোহণ করিবে ততই তাহার দৃঢ়তা বা স্থিরত্ব (stability) কমিবে ও ক্রিয়াশীলতা বাড়িবে। এইরূপ পারমাণবিক বিকাশ চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরমাণুর ক্রিয়াশীলতা-ধর্ম্মবশতঃ রাসায়ন-ক্রিয়ার সূচনা হইয়া মিশ্র দ্রব্যের (chemical compound) উদ্ভব হয়। আবার এই অজৈব মিশ্র দ্রব্যের সজাতীয় পরিণতির এমন এক অবস্থা আসে যে তার পরের স্তরেই জৈব পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। এই অজৈব ও জৈব পদার্থের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া স্বরূপতঃ ভিন্ন অজৈব পদার্থ হইতে জৈব পদার্থের বিকাশের কাহিনী বলিয়া দেয় colloid নামে একটি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। ইহা নব্য বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠতম জয়স্তম্ভ। আমরা এক্ষণে অজৈব পদার্থের পরিণাম (Evolution) সম্বন্ধে বলিতেছি; সুতরাং এক্ষণে কলয়ডের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব না। প্রসঙ্গক্রমে আর-একটি কথা এই সম্বন্ধে বলিয়া রাখিব। যেমন পারমাণবিক বিকাশের Periodic Lawএ দেখা যায় যে এই group বা পর্য্যায়গুলি তালে তালে (rhythmically) উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে বিকশিত হয়, এবং যতই উচ্চে উঠে ততই Energia বা প্রৈতিশক্তি সংহত হয় এবং Potentia বাড়িতে থাকে, এবং ততই তাহার Stability অর্থাৎ স্থিরত্ব কমে, সেইরূপ জীবকোষে মিশ্রদ্রব্যের অণুসামগ্রী এরূপ সূক্ষ্মভাবে যন্ত্রিত যে পারিপার্শ্বিক বিশেষ বিশেষ উত্তেজক ক্রিয়ায় ঐ কোষগুলির গঠন ও বিভাগ একটি তালের সহিত মিল রাখিয়া চলে। পারিপার্শ্বিক Energy বা ক্রিয়ার প্রেরণায় জীবকোষগুলির ক্রিয়াশীলতা বাড়ে ও আত্মবিকাশ হইতে থাকে, এবং আত্মগত-সক্রিয়তার ফলে স্বতঃই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এ স্থলেও দেখা যায় Energia বা প্রৈতিশক্তি একই প্রণালীতে ও rhythmএ (তালে) Potentia হইতেছে। আবার Potentia যখন খুব বাড়ে তখন Energia পুনরায় বিশ্লেষিত হইয়া অন্য আকারে প্রকাশ হইয়া ঐ জীবকোষ (cell) খণ্ডিত হইয়া যায়। তাহা হইলেই দেখা যায় জীব-কোষের উপাদান-সামগ্রীরও ক্রিয়া ঠিক পরমাণুর বিকাশেরই অনুরূপ তালে-তালে (rhythmically) হইতে থাকে। এক Energy বা ক্রিয়াশক্তির প্রবাহ পরমাণুতে যেমন সক্রিয়, জীবকোষ-সৃজনকারী chemical moleculesএ (মিশ্র অণুতেও) সেইরূপ একই তালে ক্রিয়মান—ইহাই হিন্দুর নটরাজ শিবের তালে-তালে নর্ত্তন। এই তালফের্‌তা অণুপরমাণু হইতে মানবাভিব্যক্তি পর্য্যন্ত cosmic wonএর (ব্রহ্মাণ্ডের) সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান দেখিতেছেন।

পূর্ব্বে ঈথার হইতে জড়-পরমাণুর উৎপত্তির hypothesis উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

দ্বারা কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্বপদার্থশূন্য-দেশ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নাই। Vacuum বা নির্ব্বাত স্থানে এবং সর্ব্বদেশাবচ্ছেদে একপ্রকার গুরুত্ব-বিহীন তেজবাহী, অতীন্দ্রিয়, বিভু অর্থাৎ সর্ব্ব-গত পদার্থ এই বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। এই পদার্থই ঈথার। জলে যেরূপ লবণ প্রভৃতি বা অঙ্গারচূর্ণ থাকে সেইরূপ গুরুত্ব-যুক্ত-জড়-পদার্থ-নিচয় ঈথারের মধ্যেই অবস্থিতি করে। বস্তুতঃ ঈথার হইতেই এই জড়-কণার উদ্ভব হয়। রেডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটী নামক একপ্রকার Energyর কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অতীব আশ্চর্য্যজনক ঈথার-রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

X-ray-tubeএ অথবা ইউরেনিয়ম্ অথবা রেডিয়ম্ ধাতুর saltএর রেডিয়ো-অ্যাক্‌টিভিটীর কার্য্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় এই activity বা ক্রিয়াকে তিনটি typeএ বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেকটিকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার জন্য ইহাদিগকে আল্‌ফা (α) বীটা (β) এবং গামা (γ) রশ্মি (radiation) নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই রশ্মি-নিচয় (radiations) পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট। ধাতু-পদার্থের আবরণ ভেদ করিবার শক্তি দ্বারা ইহাদিগের স্বতন্ত্রতা নির্ব্বাচিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম্ নামক ধাতু-আবরণই ইহার ক্রিয়া-পরীক্ষার আদর্শস্বরূপ (standard)। আল্‌ফা-রশ্মি $\frac{১}{১০০০}$ ইঞ্চি পুরু একখানি অ্যালুমিনিয়াম্-পাত ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু বীটা-রশ্মির গতি রোধ করিতে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি বেধের অ্যালুমিনিয়াম্-পাতের প্রয়োজন এবং গামা-রশ্মির জন্য ২০ ইঞ্চি পাতের আবশ্যক। তাহা হইলে এই রশ্মিমালার আবরণ ভেদ করিবার শক্তির অনুপাত ১: ১০০: ১০,০০০। আল্‌ফা এবং বীটা রশ্মি অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা গঠিত। এই কণিকার আকার, আয়তন ও ক্রিয়া-শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এই গামা-রশ্মি ঈথার-সমুদ্রের তরঙ্গবিশেষ, আলোর রশ্মিমালার ন্যায় গতিবিশিষ্ট।

এই আল্‌ফা এবং বীটা কণাসমূহই জড়োৎপত্তির বা বিকাশের প্রথম স্তর এবং matter ও energy (জড় ও শক্তির) মধ্যবর্ত্তী সেতু। আল্‌ফা-কণা হইতে বীটা-কণাসমূহ অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্রতর। বীটা-কণাসমূহের পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় ইহারা ইলেক্‌ট্রন্। বিদ্যুৎ-প্রবাহ এক প্রকার গতি বা প্রৈতিশক্তি (Energia) এবং এই শক্তির বহনকারী আধারের নামই ইলেক্‌ট্রন। প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি ইলেক্‌ট্রন্ ধাতব তারের মধ্য দিয়া যখন ধাবিত হয় তখনই ঐ তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের উৎপত্তি হয়। এই তড়িৎপ্রবাহবহনকারী সূক্ষ্ম কণাগুলির তির্য্যক গতি উৎপাদন (deflection) করান যাইতে পারে। যদি একটি তড়িৎপ্রবাহের সমান্তরাল করিয়া আর-একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ অথবা চুম্বক রাখা যায় তবে ইলেক্‌ট্রন্ বা বিদ্যুৎ-বাহী কণাগুলি বাধা প্রাপ্ত লোষ্ট্র বা বন্দুকের গুলির ন্যায় আবর্ত্তিত বা তির্য্যক্ গতি প্রাপ্ত হয়। এই কণাসমূহের আবর্ত্তন ও গতির পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের আয়তন নির্ণীত হইয়াছে। একটি ইলেক্‌ট্রনের আয়তন হাইড্রোজেন-পরমাণুর প্রায় $\frac{১}{১০০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০০০}$ অংশ। এই ইলেক্‌ট্রন্‌নিচয় রেডিয়ো-অ্যাক্টিভিটী-যুক্ত পদার্থের স্বতঃবিকিরণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপত্তিকালীন স্থূল জড় পদার্থ হইতেও আবির্ভূত হয়। জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই তড়িৎশক্তিরূপ Energia উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই বিদ্যুৎশক্তির বাহক ইলেক্‌ট্রন্ তাহা হইলে ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ইলেক্‌ট্রন্-সমূহ স্থূল জড় পদার্থের পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইলেক্‌ট্রনের সমবায়ে পরমাণু গঠিত হইয়াছে, এই hypothesisএ (কল্পনাতে) উপনীত হওয়া যায়।

আর, আল্‌ফা-কণাসমূহ positive ইলেক্‌ট্রিসিটি (বিদ্যুৎ) বহন করে এবং আয়তনে বীটা-কণা হইতে বহুগুণে বৃহত্তর। আল্‌ফা-কণা হাইড্রোজেন-পরমাণুর দ্বিগুণ আয়তন-বিশিষ্ট। এই আল্‌ফা-কণার আর-একটি বিচিত্র কার্য্য এই যে যদি ইহা কোন কঠিন পদার্থের উপর নিপতিত হয় তবে ইহা ঐ কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইতেই ইহার তড়িৎ-প্রভাব লুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ কণাসমূহ হিলিয়ম্ নামক এক-প্রকার গ্যাসের পরমাণুতে পরিণত হয়। এই হিলিয়ম্ একটি মৌলিক পদার্থ এবং আর্গন প্রভৃতি মৌলিক দ্রব্য (elements) এই পর্য্যায়ভুক্ত

এবং এই পর্য্যায়ের লঘুতম পদার্থ। এই হিলিয়ম্‌ই ইলেক্ট্রনের সহিত ব্যক্ত স্থূল জড়ের সম্বন্ধ নির্ণায়ক পদার্থ। বিজ্ঞান হয়ত কালে এই হিলিয়ম্-পরমাণুর সহিত ইলেক্‌ট্রন যুক্ত করিয়া অথবা এই নিষ্ক্রিয় হিলিয়ম্‌কে ক্রিয়াশীল করিয়া laboratoryতেই (পরীক্ষাগারে) অন্যপ্রকার মৌলিক-দ্রব্যের পরমাণু (atom) উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক-পণ্ডিত রাম্‌জে atmosphereএর মধ্যে হিলিয়াম্, আর্গন, নিওন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি অবিকৃত বা বিযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে দেখিয়াছেন, এবং এই গ্যাস্‌সমূহ আমাদের সবিতৃ-মণ্ডলে এবং মহাব্যোমস্থিত অসংখ্য সূর্য্যসমূহের মধ্যেও আছে বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা যায়।

একই প্রক্রিয়াতেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে জড়ের বিকাশ হইতেছে, এবং প্রৈতি-শক্তি বা Kinetic Energy'র ক্রীড়াক্ষেত্রস্বরূপ গগন-মণ্ডলস্থ-অসংখ্য-সূর্য্য-পুঞ্জ ও nebulae (নীহারিকা) এবং আমাদের ভূমণ্ডল একই জড় উপাদানে গঠিত। এই-সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পার্থিব উপাদানসমূহের সজাতীয় বস্তুনিচয়ের বিকাশ বা রূপান্তর হইতেছে। Astronomical physics বা জ্যোতিষ্কপদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া দেয় যে আকাশস্থ মহাজ্যোতির্ম্ময় গোলক-মণ্ডলীর অভ্যন্তরে মহাশক্তির অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের দ্বারা মৌলিক পদার্থের কিরূপে রূপান্তর হয় এবং সমপর্য্যায়ভুক্ত proto-elements (অপরিণত মূলপদার্থরাজী) elementsএ (মৌলিক দ্রব্যে) পরিণত হয়। Spectroscopic Investigation অর্থাৎ বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষক-যন্ত্রের অনুসন্ধান দ্বারা কিরূপে রাসায়নিক পদার্থ-সমূহ নক্ষত্র বা সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কোন উত্তপ্ত মৌলিক দ্রব্যের (element) ধবল উজ্জ্বল (incandescent) রশ্মির এবং আকাশস্থ সূর্য্যগণের ও নীহারিকার রশ্মির বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ দ্বারা তাহারাও যে একই উপাদানে সংগঠিত জানা যায়। আলোক ঈথারসমুদ্রের একপ্রকার তরঙ্গ। পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য উত্তপ্ত হইয়া উজ্জ্বল-ধবল-বর্ণে উদ্দীপিত (incandescent) হইলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ আণবিক স্পন্দনে (vibration) বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ ঈথারের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই বিভিন্ন রশ্মি নির্গত হইয়া থাকে। কোন অজ্ঞাত পদার্থের বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ দ্বারা সেই পদার্থটি কী জানিতে পারা যায়। রশ্মি-বিশ্লেষণ-দ্বারা কোনও পদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম এই—কোনও একটি মৌলিক দ্রব্যকে (Element) উত্তপ্ত করিয়া যখন উজ্জ্বল-ধবলবর্ণযুক্ত আলোকরশ্মি তাহা হইতে বহির্গত হয় অথবা যখন কোনও বায়ুশূন্য কাচের নালিকা মধ্যে ঐ পদার্থ রাখিয়া তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিলে ঐ বস্তু অতিশয় উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি প্রদান করিতে থাকে, তখন ঐ রশ্মিগুলি একটি তেশিরা কাঁচ অথবা বর্ণ-বিশ্লেষক যন্ত্রের (spectroscope) মধ্য দিয়া বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা দৃষ্ট হয়। তাহা হইতেই একজন বিশেষজ্ঞ জানিতে পারেন যে ঐ পদার্থে কোন্ মৌলিক দ্রব্য (Element) আছে। স্পিরীট-ল্যাম্প অথবা বুন্‌সেন্ বার্ণারের অগ্নিশিখার মধ্যে যদি একটু সোডিয়াম ক্লোরাইড্ দগ্ধ বা বাষ্পাকারে পরিণত করা যায় তবে ঐ শিখা পীতবর্ণ ধারণ করে। ঐ মিশ্রদ্রব্যের একটি উপাদান সোডিয়াম্, তাহারই পরমাণুর স্পন্দনেই আলোকের ঐপ্রকার রূপ হয়। এই আলোকরশ্মি বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষক-যন্ত্রের (spectroscope) মধ্য দিয়া দেখিলে পাশাপাশি দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা দৃষ্ট হয়। সোডিয়াম্ ও সোডিয়াম্ সল্টের আলোকের এই দুইটি পীত রেখাই বিশেষত্ব। এই রেখাদ্বয়কে সোডিয়ামের বর্ণচ্ছত্র (spectrum) বলে। সূর্য্যরশ্মির বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষণে লাল হইতে ভায়লেট্ পর্য্যন্ত সাতটি বর্ণ পাওয়া যায়। এই বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণ রেখা দেখা যায়। এই কৃষ্ণ রেখা সংস্থানের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে সোডিয়ামপ্রজ্বলিত শিখাতে যে স্থানে সোডিয়াম্-রেখা থাকে সূক্ষ্মরশ্মির বর্ণচ্ছত্রের অন্তর্গত পীত বর্ণের মধ্যে ঠিক্ সেই স্থানেই ঐ দুইটি কৃষ্ণ রেখার সন্নিবেশ থাকে। সোডিয়াম্-বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া যখন কোন গ্যাসের আলোক-রেখা নির্গত হয় তখন ঐ রশ্মির বর্ণচ্ছত্র লইলে উহার মধ্যে সূর্য্যরশ্মির (spectrum) বর্ণচ্ছত্র-নির্ণীত কৃষ্ণরেখার ন্যায় সোডিয়ামের পীতরেখার পরিবর্ত্তে দুইটি কৃষ্ণরেখা দৃষ্ট হয়; ইহাতে সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণে কৃষ্ণরেখা দেখার কারণ আমরা বেশ বুঝিতে পারি। সূর্য্যের কেন্দ্রীভূত

সমষ্টির নাম Chemical molecule। কিন্তু কোন এক মৌলিক-দ্রব্যের atom (পরমাণু) যতক্ষণ মিলন-উপযোগী অপর একটি elementএর পরমাণু খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ একই জাতীয় দুইটি করিয়া পরমাণু যুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক (molecule) রূপে থাকে। Affinityর প্রভাবে বিজাতীয় মৌলিক দ্রব্যের moleculeএর সহিত মিলিত হইবার সময় প্রত্যেকটি molecule বা দ্ব্যণুক ভগ্ন হইয়া যায় এবং নির্দ্ধারিত সংখ্যানুসারে বিজাতীয় atom-সমূহ মিলিত হইয়া মিশ্র molecule উৎপন্ন করে। পরমাণুর dynamical power বা গত্যাত্মক-শক্তি বশতঃই এই রাসায়ন-ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া মিশ্র বা মিলিত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। বিজাতীয় পরমাণুর মিলনের affinityর একটি নিয়ম (law) আছে। ইহা atom বা পরমাণুর valency বা সংযোগ-শক্তি। সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় atomই সংমিলিত হইতে পারে না। Valency অনুসারেই বিভিন্ন বা বিজাতীয় পরমাণুসমূহ মিলিত হয়। পরমাণুর valency-বলেই ছয়-সাত-প্রকার এমন কি আট-প্রকার বিজাতীয় atoms কোন একটি নির্দ্দিষ্ট elementএর atomএর সহিত সংমিলিত হইয়া উচ্চ-ক্রমের মিশ্র দ্রব্যের (chemical compoundএর) উৎপত্তি করে। Affinityর প্রভাবেই রাসায়নিক সংঘটন বিঘটন অনুক্ষণ চলিতেছে এবং এই-রূপেই পার্থিব পদার্থনিচয়ের বিকাশ হইতেছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের রহস্য যদি কোন অবৈজ্ঞানিক জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি Prof. Soddy কৃত Matter and Energy এবং R. Meldola কৃত Chemistry গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতে পারেন।

যে কারুর এই জগৎ-শিল্প, তাঁহার কথা যাঁহারা ভাবেন তাঁহারাও তন্ময় হইয়া যান, আর যাঁহারা তাঁহার এই শিল্পের আলোচনা করেন তাঁহারা বিমুগ্ধ হইয়া যান। প্রাচীন ভারতের ঋষি সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ধ্বনিত করিয়াছেন—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরা দ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥"

যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে তৎসম-রূপ-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, হে সৌম্য, সেইরূপ অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ জাত হয়, এবং তাহাতেই বিলীন হয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

পাতার নীচের ফুল

পাতার নীচের ফুল—
চুলের রাশে ঢাক্‌না-দেওয়া
কানের মোতি-দুল!
উষার-হাসি রাঙা-মেঘে,
কুয়াসা তায় ফেল্‌ছে ঢেকে!
মূক-পরাণের গীতি এ যে,—
কি দিব তার তুল?
পাতার নীচের ফুল—
ভিতরে তার রূপ ফুটেছে
বাইরে বেজায় ভুল।
কনে বৌএর ঘোম্‌টা-তলে,
রাঙা-মুখের রূপটি জ্বলে!
চাঁদের-হাসি রাখ্‌ছে ঢেকে—
কালো-মেঘের-চুল!
পাতার নীচের ফুল—
দাতার প্রাণে বিঁধ্‌ছে যেন
দরিদ্রতার শূল।
ষোড়শীটির রূপের মাঝে
বিধবার কী কান্না বাজে!
অভিসারের পথটি জুড়ে
লজ্জা-নদীর কূল!
পাতার নীচের ফুল—
কবি-প্রাণের ভাবকে দমে
রাখ্‌ছে ভাষার বুল!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

পথের কথা

মানুষের চিন্তাশক্তি বিচারবুদ্ধি আর সৃজনশক্তি না থাকলে তার মধ্যে আর ইতর প্রাণীর মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকতো না। অতি আদিম বর্ব্বর মানুষের মধ্যেও এই তিনটি গুণ, যতই অল্প পরিমাণে হোক, বর্ত্তমান ছিল। এই ত্রিগুণের উত্তরোত্তর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশ সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে। ভারতবর্ষেও এ-ধারার ব্যতিক্রম হয়নি। একদিন আমাদের দেশেও এই তিনটি গুণের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষ হতে পেরেছিল মহাভারত। তার গভীর জ্ঞান এবং বৃহৎ কর্ম্মপ্রচেষ্টা তখন বর্ব্বর জগতের আঁধার আকাশে রশ্মিরেখাপাত কোরেছিল।

তারপর ভারতে এল রাত্রি। বহুবিধ মূঢ়তা কুসংস্কার এবং ভয় এদেশে আস্তানা নিলে। চিন্তার ভার, বিচারের ভার পাঁজিপুঁথির হাতে অর্পণ কোরে পরম নিশ্চিন্ত মনে আমরা ঘুমের আয়োজন কর্‌লুম। চিন্তার বালাই যখন রইলো না তখন কর্ম্মও বিদায় নিলে। সমস্ত দেশটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অভিভূতের মত পোড়ে রইলো, যেন গুরু-ভোজনের পর বৃহৎ এক অজগর। এম্‌নি কোরে বহুদিন বহু বৎসর কেটে গেল। তারপর একদিন বাহিরের কঠিন সংঘাতে ঘুম ভাঙ্‌লো বটে, কিন্তু ঘুমের জড়তা এখনো কাটেনি। এখনো মনে ভয় ভাবনা অবিশ্বাসের অন্ত নেই। কাজ কর্‌তে ভয়, এমন কি চিন্তা কর্‌তেও ভয়। দেহ ত সঙ্কুচিত হয়েইছে, এমন কি আত্মায় পর্য্যন্ত সঙ্কোচ আর অবসাদ। শেষেরটিই বিশেষ আশঙ্কার কথা; কারণ, আত্মা যদি অটুট থাকে তবে দেহ ভাঙ্‌লেও ক্ষতি নেই।

তাই আজ জগতের দিকে-দিকে যখন মানুষ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবার জন্যে মেতে উঠ্‌লো তখন আমাদের স্বদেশের নমস্য ত্যাগী বীরশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীকেও দ্বারে-দ্বারে গিয়ে করাতে হচ্ছে—পরনির্ভরতায় শ্রেয়ও নাই, সম্মানও নাই! পরাধীনতায় গভীর গ্লানি, বড়ই অগৌরব! আত্মা অজেয়, আত্মা অমর! আত্মার অজেয়তা, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষের লোককে জনে-জনে বোঝাতে হচ্ছে বারম্বার, যেখানে নিয়ত চাষাভুষোর মুখ থেকেও আধ্যাত্মিক লেক্‌চার শুন্‌তে-শুন্‌তে বিব্রত হতে হয়।—কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্!

এই-সেদিন বাংলার যে তরুণের দল আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত মহিমা দেশের সম্মুখে স্থাপন কোরেছিলেন আজ তাঁরা অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেছেন। বল্‌ছেন, ভারতবর্ষ আজ যা কর্‌তে চাইছে বাংলা দেশ অনেকদিন আগেই তা কর্‌তে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল কে বল্লে? বাংলার মন্ত্র আজ কি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায়নি? পরাধীনতার নাগপাশ মোচনের ইচ্ছা কি ভারতের আকাশে আজ ইন্দ্রধনু রচনা করেনি? কে বলে সাধু চেষ্টা কখনো ব্যর্থ হয়? আর যদি ব্যর্থ হয়েই থাকে, দুঃখ কেন? ভুল যদি ঘটেই থাকে লজ্জা কিসের? চেষ্টা যেখানে সেখানেই ব্যর্থতা, সেখানেই ভ্রান্তি। ব্যর্থতা সেইখানেই নেই চেষ্টার অভাব যেখানে। পণ করো—বারম্বার ব্যর্থ হবো, ভুল কর্‌বো, তবু মৃত্যুর নিশ্চেষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তা গ্রহণ কর্‌বো না। স্বাধীনতার জন্মভূমি বিপ্লবের মন্ত্রদাতা ফ্রান্সের মনীষীর কথায়—

Only those who attempt nothing never make mistakes. But error struggling on towards the living truth is more fruitful and more blessed than dead truth.

Every honest idea even when it is mistaken is sacred and divine.

No enduring edifice can be built except it be welded together with tears and blood.

যারা কোনো চেষ্টাই করে না কেবল তারাই কখনো ভুল করে না। সুপ্ত প্রাণহীন সত্যের চেয়েও, যে-ভুল পদে পদে নিষ্ফল হয়েও জীবন্ত জাগ্রত সত্যের পানে চলেছে, তাহা সার্থক ও বরণীয়।

সাধু উদ্দেশ্য, ভ্রান্ত হলেও পবিত্র এবং স্বর্গীয়।

অশ্রুজলে বা হৃদয়রক্তে যে-আয়তনের প্রতিষ্ঠা হয়নি তা টেঁকবে কেমন কোরে?

বাংলার এবং ভারতবর্ষের প্রবীণের দল বলছেন কথাটা ভালো বটে কিন্তু সময় এখনো আসেনি। সময়ের কি হাত পা আছে যে সে আস্‌বে? আমরাই তো সময়কে আন্‌বো। যা ঘট্‌তে পারে তা তো আমরাই ঘটাবো।

এই সময়-আসেনির অজুহাত অনেক দিনের পুরোনো—একেবারে মান্ধাতার আমলের। জগতের দেশে দেশে সকল বৃহৎ চেষ্টার প্রারম্ভে শান্তিপ্রিয় আরামপ্রিয় ভীরুর দল বারম্বার এই অজুহাতই দেখিয়েছে—সময় আসেনি! দাঁড়াও অত তাড়া কেন? ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে পা ফেল। লাভ-ক্ষতির একটা খতিয়ান করো। দ্যাখো! কতটাই বা সুখ, কতটাই বা দুঃখ। বিপদ আপদই বা কতটা।

মার্কিনের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে কংগ্রেসে সম্মিলিত হয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে বস্‌লেন। অনেকে অনেক কথা বল্লেন। অনেকে আশঙ্কা কর্‌লেন দেশ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে মোটেই প্রস্তুত নয়। সশস্ত্র শিক্ষিত সুপরিচালিত ইংরেজের সঙ্গে অস্ত্রহীন বস্ত্রহীন আনাড়ির দল কেমন কোরে যুদ্ধ কর্‌তে পারে? এমনি নানা আলোচনা শুনে শুনে কংগ্রেসে সকলে যখন হতাশার বিষে জর্জ্জরিত তখন জনতার মাঝ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। তিনি তর্ক কর্‌লেন না, দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন না, কয়েকটি সোজা কথায় মনের ভাব ব্যক্ত কর্‌লেন। তিনি বল্লেন—সময় আসেনি বল্‌ছো, কিন্তু দিন যতই যাবে দাসত্বের শৃঙ্খল কি ততই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠ্‌বে না? আমি অতশত বুঝি না, As for me give me liberty or give me death! হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু! তারপর? তারপর আমেরিকা যুদ্ধে সশস্ত্র শিক্ষিত সুপরিচালিত ইংরেজকে পরাজিত কোরে স্বাধীন হল। মার্কিণকে স্বাধীনতার এই বিরাট মন্ত্র যিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর নাম প্যাট্রিক্ হেন্‌রী।

আমরাও যদি অমনি কায়মনোবাক্যে স্বরাজ চাই, আমরাও পাবো আর ন'মাসের মধ্যেই। মহাত্মা গান্ধী সত্যই বলেন, কারণ তাঁর আত্মার যে আগুন সে যে চিরন্তন। সেই আগুন ছিল প্যাট্রিক্ হেন্‌রীর অন্তরে; তাই ছিল মেয়র ম্যাক্‌সুইনীর অন্তরে। আমাদের সকলের মন্ত্র হওয়া উচিত—

Not to live as long as possible but as mightily as possible.

সুদীর্ঘকাল প্রাণ ধারণে গৌরব নেই, গৌরব আছে বীরের মত প্রাণধারণে।

কোনো রকমে কটা দিন কাটিয়ে দিতে পার্‌লে বাঁচি, এই যে মনোভাব—এটি অপৌরুষেয় এবং অনার্জ্জনীয়।

সম্প্রতি নন্-কো-অপারেশান কথাটার নানা মুনি নানা অর্থ কর্‌চেন—কেউ এমনো বল্‌ছেন যা-কিছু বিদেশী, মায় বিদেশ পর্য্যন্ত, ত্যাগ করার নামই নন্-কো-অপারেশান। এর চেয়ে অদ্ভুত কথা আর কিছু হতে পারে না। এ তেমনি মূঢ়তা যে-মূঢ়তা প্রকাশ পায়—পুরাণ-বর্ণিত পুষ্পকরথের উল্লেখ কোরে যদি বিদেশের এয়ারোপ্লেনকে তুচ্ছ করি। ইংরেজের ওপর রাগ হয়েছে, অতএব জগতের সঙ্গে আড়ি কোরে দিলুম বোলে অজ্ঞতার অন্ধকারে বোসে থাকার ন্যায় মূঢ়তা আর কি হোতে পারে? যার কাছে কিছু শেখা যায় তার কাছেই শিখ্‌তে হবে, তা সে যেই হোক না কেন! জ্ঞানে বিদ্যায় চরিত্রের দৃঢ়তায় আমাদের জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতির সমকক্ষ হোতে হবে। জীবনযাত্রাকে সহজ আর সরল কর্‌তে হবে। মিথ্যার জাল ছিন্ন কোরে সত্যের আলোয় দাঁড়াতে হবে, তা সে মিথ্যার জাল গৃহেই থাকুক, সমাজেই থাকুক, আর রাষ্ট্রেই থাকুক।

সব চেয়ে বড় কথা এই, ত্যাগ অভ্যাস কর্‌তে হবে। ত্যাগ বিনা কোনো বড় জিনিস লাভ করা যায় না। সকলেই আমরা ত্যাগ কর্‌তে পারি, কোনো না কোনো প্রকারে,—কেহ কম কেহ বা একটু বেশী। একটা উদাহরণ দিই। জাতীয় শিক্ষার জন্যে দেশে আন্দোলন হচ্ছে। একদল ধুয়ো তুলেছেন, টাকা কোথায়? আমরা সকলেই যদি জীবনের প্রতিদিন একটা কোরে পয়সা একটা বাক্সে ফেলে রাখি এবং মাসান্তে সেইটি জাতীয়-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিই তা হলে কি টাকা ওঠে না? ভারতবর্ষ তো বিপুল দেশ, তেত্রিশ কোটি লোকের বাস। তার মধ্যে এক কোটি লোক দিন একটা কোরে পয়সা দিলে অর্থ ওঠে না? একটু ত্যাগ স্বীকার করা কি এতই কঠিন? আমরা, যারা লেখাপড়া শিখেছি, আমরা কি দেশের একটি নিরক্ষর লোককে একটু শিক্ষার আলোক দিতে পারি না? তাতেও কি গুরুজনেরা অসন্তুষ্ট হন, না তাতেও কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে? কারাগারের ভয় নেই, উপবাসের নেই, গুরুজনের অবাধ্যতারূপ পাপেরও ভয় নেই, তবে কেন আমরা এমন একটা ছোটখাটো ব্রত গ্রহণ করি না?

বিলিতি সুগন্ধি না মাখ্‌লে কি শরীর অসুস্থ হয়? সাহেব-বাড়ীর পোষাক না পর্‌লে কি ভদ্রআনা রক্ষা হয় না? কোনো সাহেব হাড়ু-ডু বোলে হাতখানা নেড়ে না দিলে কি পরিতাপের কিছু আছে? আসল কথা—এসব কথায় বোঝ্‌বার কিছু নেই, নিতান্ত সোজা কথা। তবে কেন বোঝাতে হয়? আমাদের মন জাগে না বোলে। মন যেদিন জাগ্‌বে, নেশায় অচেতন আত্মার যেদিন নেশা ছুটবে, সেদিন সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌বো। তখন আর মেকিতে ভুল্‌বো না।

বিপদ হয়েছে কি—আমাদের জাতিটা অতি প্রবীণ এবং ততোধিক সনাতন। আমরা অনেক ঘা খেয়েছি, অনেক ব্যথা সয়েছি, আশাভঙ্গ বহুবার হয়েছে। তাই আমরা হুট কোরে একটা কিছু কর্‌তে পারি না। রোয়ে বোসে পা টিপে টিপে পাঁজি পুঁথি দেখে শুনে চলি। এটি বিজ্ঞতার লক্ষণ হলেও হতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ আদৌ নয়।

It is a costly privilege to be a member of a race which is exceeding old. It means the bearing of a frightful burden of the past, trials and tribulations, weary experience, disillusion of mind and heart,—all the ferment of immemorial life, at the bottom of which is a bitter deposit of irony and boredom.

অতি প্রাচীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করা সোজা কথা নয়। কারণ তাকে অতীতের যে গুরুভার বহন কর্‌তে হয় তা ভয়ানক—কত শোক-তাপ, দুঃসহ পরীক্ষা, কত নিদারুণ অভিজ্ঞতা, হৃদয়মনের কত স্বপ্নভঙ্গ! যুগযুগান্তের কত বিক্ষোভ তার মনকে নিয়ত আলোড়িত করে! তার মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে কতকালের কত ব্যর্থতা, কত সুগভীর অবসাদ!

জীর্ণ পুরানো ইমারতের ওপর নতুন বাড়ী নির্ম্মাণ করা যায় না, এ কথাটি বুঝ্‌তে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। পুরাতন ইমারতকে ভিত থেকে উপ্‌ড়ে যখন ফেলি নতুন গৃহ স্থাপনার জন্য তখন কি সেটাকে আমরা একটা দারুণ দুর্ঘটনা মনে কোরে অশ্রুবর্ষণ করি? তা করি না। তেমনি মানবজাতির জীবনে যখনি কোনো System বা প্রথা অথবা institution বা প্রতিষ্ঠান অকেজো অচল হয়ে ওঠে তখনি সেটাকে সমূলে উৎপাটন কোরে ফেলে নতুন institution বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা কর্‌তে হয়। বাড়ীর বেলা যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি জোড়াতাড়ায় কাজ চলে না। অথচ এই কথাটা যেই ওঠে অমনি একদল লোক বিলাপ সুরু করেন, আমাদের এতদিনকার মান্ধাতার আমলের এমন এক উচ্চাঙ্গের প্রথা উল্টে দিচ্ছে। ধ্বংসের পরই আসে সৃষ্টি—এই জলজ্যান্তো স্বাভাবিক সত্যটা তাঁরা ভুলে বোসে থাকেন। ফ্রান্স এই সত্যের উপাসক, তাই সে জগৎকে এই অক্ষয় মন্ত্র শোনাতে পেরেছে—Liberty, Equality, Fraternity—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। তাই তার পক্ষে হওয়া সম্ভব হয়েছে

.....the greatest destructive and constructive people of the Western world, the people who destroy to construct and construct to destroy, the people who play with ideas and life, and are for ever making a clean sweep so as to make a new and better beginning, and shed their blood in pledge.

... পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধ্বংসপ্রিয় এবং সৃজনপ্রিয় জাতি। যারা ভাঙে গড়্‌বার জন্যে এবং গড়ে ভাঙ্‌বার জন্যে। চিন্তা এবং জীবন নিয়ে অহরহ যাদের খেলা নিয়ত যারা তালো কোরে নতুন কোরে জীবন আরম্ভ কর্‌বার জন্যে পুরানোকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছে। দেহের রক্তপাত কোরে যারা আত্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কর্‌ছে।

আমাদেরও এম্‌নি হতে হবে—এবং অবিলম্বে—আজ থেকেই।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

চীনের বর্ণমালা—

চীনের নব অভ্যুত্থানের যুগে চীন গবর্ণমেণ্ট চীনের নতুন বর্ণমালার প্রচলন মঞ্জুর করে, চীনভাষা শিক্ষার ভয় দূর করেছেন। পুরোনো ধারা অনুসারে চীন ভাষার ৩০,০০০ তিরিশ হাজার অক্ষর ছিল—তার এক একটা কথা। প্রায় ১১০০ কথা মুখস্থ কর্‌লে তখন একরকম কাজ চলে যেত। এখন এই নতুন প্রথায় মাত্র উনচল্লিশটা অক্ষর আছে। চীনভাষা শিখ্‌তে এখন আর জীবনব্যাপী পরিশ্রমের দরকার নেই। এ পর্য্যন্ত চীনদেশের অধিকাংশ অধিবাসীর পক্ষেই ভাষা-সমুদ্র লঙ্ঘন করা ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। এখন এই সহজ সরল প্রথায় কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র চীনকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হবে। তখন থেকে চীনের বাস্তব জাগরণ আরম্ভ হবে।

এই প্রথার আবিষ্কারক একজন চীনেম্যান।

—

পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাত—

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রপাত কোন্‌টা জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই নায়েগ্রার কথা বলবেন। লর্ড ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন তাঁর The Days Before Yesterday নামক বইতে আর্জেন্‌টাইন্ রিপাব্‌লিকের ইণ্ডয়াজা প্রপাত সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তা পড়ে নায়েগ্রাকে সবচেয়ে বড় বলা যায় না।

নায়েগ্রার উচ্চতা ১৬০ ফুট, লম্বা প্রায় এক মাইল। আর ইণ্ডয়াজার উচ্চতা ২১০ ফুট, লম্বা নায়েগ্রার প্রায় সমান।

এ-পর্য্যন্ত এই বৃহত্তম জলপ্রপাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুধু ইণ্ডিয়ানদের আর একজন জেসুইট মিশনারীর কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু এখন পারাগুয়ে পর্য্যন্ত রেললাইন শেষ হয়ে যাওয়াতে সকলের পক্ষেই এই জলপ্রপাত চোখে দেখে আস্‌বার সুযোগ হয়েছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

—

মাংস-বৃক্ষ—

আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে এক রকম বৃক্ষ জন্মে। সচরাচর পশুমাংসে যে-সকল উপাদান দৃষ্ট হয়, ঐ বৃক্ষের ফলেও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ঐ বৃক্ষ বিনা চাষেই যেখানে-সেখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উহা চাষের বড় অপেক্ষা রাখে না, অযত্ন-সম্ভূত। যদি খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয়, তবে তদ্দেশবাসিগণ ঐ ফল খাইয়া প্রাণধারণ করে। এমন কি সেখানের কুকুর বিড়াল প্রভৃতি মাংসাশী পশুগণ সেই ফল আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তবে ঐ মাংসবৃক্ষ অন্যত্র ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্র যাহাতে এ বৃক্ষ প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। কালিফর্ণিয়ার বর্ত্তমানে ইহার চাষ প্রসারতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর যথায়-তথায় যদি এই বৃক্ষের ফলনবাহুল্য হয়, তাহা হইলে হঠাৎ-দুর্ভিক্ষে কিছু বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এবং আমিষাশীদিগের ভোজনস্পৃহা সম্যক রূপে তৃপ্তিলাভ না করিলেও, প্রাণহত্যা না করিয়াও কিয়ৎ পরিমাণে যে পূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদুর্ভিক্ষক্লিষ্টভারতের গবর্ণমেণ্ট ভারতের উদ্যানে ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন।

—

রেডিয়ামের গুণ—

পূর্ব্ব সংখ্যায় রেডিয়ামের শক্তির কথার একটু আভাস দিয়াছি। এইবারে ইহার গুণ কত আশ্চর্য্য দেখুন। আমেরিকার অন্তর্গত আলাবামা প্রদেশের জন্ চিল্‌ডার্স্ নামক জনৈক কৃষক কলরাডা হইতে কতকগুলি পাথর কুড়াইয়া আনিয়াছিল। তাহার ছেলে-মেয়েরা সেই পাথর নিয়া খেলা করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে তাহারা পাথরগুলিকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। বাড়ীর মুরগীগুলি প্রতিদিন সেই জল খাইত। পাথর ফেলিবার পর হইতে মুরগীগুলি প্রত্যহ দুটা করিয়া ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিল। সেই ডিম খাইয়া বাড়ীর সকলে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই রকম আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের হেতু কি কেহই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পাথরগুলির মধ্যে রেডিয়াম মিশ্রিত ছিল। শুধু রেডিয়ামের গুণে জলের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল!

—

কাঁচ কাটার সহজ উপায়—

অনেকেরই ধারণা, কাঁচ হীরক ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা সহজে সমানভাবে কাটা অসম্ভব। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অতি সহজে হীরকের সাহায্য না লইয়াও সামান্য এক টুক্‌রা শক্ত দড়ি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কাঁচ কাটা যায়। প্রথমে দড়িগাছি খাঁটি এল্‌কোহলে (Alcohol) কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখুন। পরে উঠাইয়া বেশ করিয়া নিঙ্ড়াইয়া লউন এবং যেরূপভাবে কাঁচ কাটিতে হইবে সেইপ্রকারে ঠিক ইহার উপর রাখিয়া দড়িতে আগুন ধরাইয়া দিন। দড়ি পুড়িয়া শেষ হইয়া গেলে কাঁচখানি এক হস্ত পরিমাণ জলের নীচে ডুবাইয়া রাখুন। কয়েক মিনিট পরে তুলিয়া কিছু দ্বারা সামান্য আঘাত করিলেই ঠিক হীরকের কাটার ন্যায় কাটিয়া যাইবে। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

—

ছেলেদের ও মেয়েদের প্রকৃতি—

বিলাতের একজন বিচক্ষণ ডাক্তার ছেলেদের ও মেয়েদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর মতামতগুলি অনেক জায়গায় ভালো বলিয়াই বোধ হয় এবং তাতে বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। মেয়েদের পালন করিতে যে যত্ন ও আয়াসের দরকার, ছেলেদের পালন করিতে তার চেয়েও বেশী আয়াসের দরকার। বিলাতে দেখা গিয়াছে ছেলেদের বাৎসরিক জন্ম-সংখ্যা মেয়েদের জন্ম-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী থাকিলেও মেয়েরাই বছরে বছরে সংখ্যায় বেশী থাকিয়া যায়। অর্থাৎ সু পালনের অভাবে মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেরাই বেশী মারা যায়,—আর ছেলেদের পক্ষেই সু-পালনের অধিক প্রয়োজন।

ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে প্রকৃতি-গত এই বৈষম্যের মূল কারণ জানা শক্ত। ছেলেমেয়েদের পালন করিতে হইলে তাদের মেজাজ ও প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানা দরকার। তাদের মনোভাবের অনুবর্ত্তী পথে যদি তাদের পালন করা যায়, তাদের প্রকৃতিতে এমন কোন শিক্ষা বা শাসন না-চাপান হয় যাতে তাদের ভিতরটা পীড়িত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাদের জীবনকে দীর্ঘ করা যাইতে পারে। অস্বাভাবিক কোন-কিছুর চাপ না দিলে তারা দীর্ঘায়ু হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী ভয়-কাতুরে হয়। মেয়েরাও যে ভয় পায় না এমন নয়, তারা ভয়ের কারণ দেখিলে চম্‌কাইয়া উঠে ও অল্প কারণেও ভয় পায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ছেলেরা আকস্মিক তর্জ্জন-গর্জ্জন বা অবিশ্রান্ত চীৎকারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া মারা পড়িতে পারে, মেয়েরা কিন্তু তা যায় না। রোগে বা যন্ত্রণায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম কাতর হয়। অসুখের সময় মা কাছে থাকিয়া দোল দিলে বা শুশ্রূষা করিলে মেয়েরা শান্ত থাকে, ছেলেরা কিন্তু এ-রকম সেবা সত্ত্বেও কাতর হয় ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। এইজন্য অসুখের সময় মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ঠাণ্ডা রাখা শক্ত।

গুপ্ত।

—

কোন্ কাতে শোওয়া উচিত—

মানুষ কোন্ কাতে শোয়—তার ঘুমের উপর সে-কথাটার অনেকখানি প্রভাব আছে। ঘুম সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে ইহা বলিয়া রাখা ভালো যে নিয়মকানুন বাঁধিয়া আর যাই হোক, ঘুম হয় না। সমস্ত নিয়মকানুনের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিলে তবেই ঘুমের আসা সহজ হয়। তাছাড়া একই নিয়ম সুরকম স্বভাবের মানুষের পক্ষে

যে খাটিবে তাও জোর করিয়া বলা যায় না। কেননা দেখা গিয়াছে যাদের ডানহাতটা বেশী কাজের তাদের শতকরা ৮০ জন ডানকাতে শোয়, আর যারা বাঁহাত দিয়া কাজকর্ম্ম বেশী করে তারা প্রায়ই বাঁ কাতে শোয়।—মোদ্দা কথা, নিয়মকানুনের বাঁধাবাঁধিতে গিয়া ঘুমের নিশ্চিন্ততাকে নিরুদ্বেগকে উদ্বেগে ভরিয়া তোলাটা কিছু নয়। যার যেদিকে পাশ ফিরিয়া শুইলে আরাম বোধ হয় সে সেইদিকে পাশ ফিরিয়াই শুইবে। তবু জানিয়া রাখা ভালো যে বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে ডানকাতে শোওয়াটাই ঘুম আসিবার পক্ষে তত না হোক্ স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ একটুখানি উপকারী। প্রথমতঃ পাকস্থলী হইতে বাহিরের দিকের রাস্তাটা ডানদিকে বলিয়া ডানকাতে শুইলে ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণাবশেষ তুলনায় পাকস্থলীকে খালি করিয়া দিয়া একটু সহজে অন্ত্রোদরে নির্গত হইয়া আসিতে পারে। তারপর হৃদ্‌যন্ত্র একটুখানি বাঁদিক ঘ্যাঁসা বলিয়া ডানকাতে শুইলে তার ওপর চাপ কম পড়াতে তার কাজ সহজ হয়। ডানকাতে শুইলে আরো একটা সুবিধার কথা এই হয় যে যকৃতের মস্ত বোঝাটা শূন্যে নিরবলম্ব হইয়া ঝুলিয়া না থাকিয়া সেটা তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। পাঠকেরা বলিতে পারেন, সবই বুঝিলাম। ধর যেন তোমার কথানুযায়ী ডানকাতেই শোওয়া গেল। কিন্তু একবার ঘুমের পরোয়ানা লইয়া যখন স্বপ্নের দেশে ঢুকিয়া পড়িবে তখন তোমার এই হিতবাক্যগুলি ত আর কিছু সেইসঙ্গে ছাড়া পাইবে না। তখন কতজনের বিছানার চৌহদ্দির ভিতরে লঙ্কাকাণ্ডের তুমুল অভিনয় বাধিয়া যাইবে সেখানে তোমার ও-সমস্ত আইনকানুনের জোর কি খাটিবে? একথার আর কি জবাব আছে! সু।

—

নানান দেশের তামাক খাওয়া—

ভারতবর্ষ—আমাদের দেশে লোকে তামাক খায় হুঁকায়, গড়গড়ায় এবং ফর্সিতে। হুঁকায় বা গড়গড়ায় তামাক খাওয়ার গুণ এই যে ধোঁয়া জলের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ হইয়া মুখে আসে, এবং তাতে তামাকের উগ্রতা অনেকটা দূর হয় ও ইহাতে স্বাস্থ্যের অল্প ক্ষতি হয়।

বেলজিয়মের মেয়ের তামাক খাওয়া।

কোরিয়ার তামাক খাওয়া।

বর্ম্মা—বর্ম্মায় মেয়ে পুরুষে খায় বড় বড় চুরুট এক একটি প্রায় আধ হাত লম্বা। আমাদের মধ্যে অনেকে বর্ম্মার চুরুটকে বেশ উপাদেয় নেশা বলিয়া মনে করেন।

প্যালেস্টাইন—এখানে মেয়েরা সকালে বিকালে কফি খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক খায়। আমাদের দেশের মত গড়গড়ায় করিয়া ইহারা তামাক খায়।

কোরিয়া—কোরিয়ায় লোকেরা লম্বা লম্বা নল মাটিতে বসাইয়া তাদের ফাঁদাল মুখে দোক্তা দিয়া ধূম পান করে। এখানকার দোকানদাররা প্রায় এইভাবে তামাক খায়।

আফ্রিকার কাফ্রিদের তামাক খাওয়া।

ফ্রান্স—এখানকার পাইপে করিয়া তামাক খাওয়ার প্রথা আমাদের নিকট পরিচিত, কেননা ইংরেজদের মুখে এ-রকম পাইপ আমরা প্রায়ই দেখিতেছি।

প্যালেষ্টাইনের মেয়েদের তামাক আর কফি খাওয়ার আড্ডা।

আফ্রিকা—চেয়ারে হেলান দিয়া তিনটি লোকে প্রকাণ্ড লম্বা তিনটি নল মুখে দিয়া তামাক টানিতেছে। নলগুলি এক-একটি বংশখণ্ড। ইহাদের তামাক খাওয়ার রীতি দেখিবার বটে। ইহারা বেলজিয়ামের অধিকৃত কঙ্গো প্রদেশের গ্রাম্য অসভ্য অধিবাসী। এ-রকম তামাক খাওয়ায় নাকি আরাম আছে।

সব চেয়ে বেশী আরাম পাওয়া যায় গড়গড়ায় তামাক খাইয়া। তাকিয়া হেলান দিয়া পূর্ণ আরামে এ কাজ করা চলে।

আমাদের দেশে গাঢ়োয়ালের পাহাড়ী জাতির তামাক খাওয়া বা নেশা করা বেশ মজার। একটি তামাক রাখার কৌটায় চাকনিতে ছেঁদা করিয়া দড়ি লাগাইয়া তাতে তারা চকমকি বাঁধিয়া রাখে। নেশা করিবার ইচ্ছা হইলে তারা মাটিতে পাশাপাশি দুটি সরু ছোট গর্ত্ত করে এবং মাটির ভিতর আড়াআড়ি আর-একটি সুড়ঙ্গ করে যাতে ঐ দুটি গর্ত্তের সঙ্গে একটির যোগ হয়। তারপর একটি গর্ত্তের উপর কিছু দোক্তা দিয়া তাতে চকমকির সাহায্যে আগুন লাগাইয়া দ্যায় এবং হাত মুঠো করিয়া অন্য গর্ত্তটির উপর দিয়া তাতে মুখ লাগাইয়া ধোঁয়া টানিতে থাকে। ধোঁয়া টানিবার সময় তারা মাটিতে উপুড় হইয়া পড়ে। এ-রকম নেশার জোগাড় ও আয়োজনই ত শ্রমসাধ্য, আরাম ত পরের কথা! তবু তামাক খাওয়া চাই! নেশা এমনি খারাপ জিনিস; নেশা মানুষকে পরবশ করিয়া ফেলে।

—

মজার খেলা—

বাতির দোল—কলিকাতায় দুই-একটি বেড়াইবার বাগানে ছেলেদের খেলা করিবার এক রকম কাঠের দোল না দেখা যায়,—তার মাঝখানে একটা লম্বা লোহার ডাণ্ডা আঁটা এবং সে ডাণ্ডাটা দুদিকে দুটা খুঁটির উপরে লাগানো। তক্তার একদিকে কতকগুলি ছেলে বসে এবং আর-একদিকে কতকগুলি। একদল চাপ দিলে তক্তার এক দিক উঠিয়া পড়ে এবং আর-এক দল চাপ দিলে আর-এক দিক উঠিয়া পড়ে। একটা বাতিকেও কৌশল করিয়া আপনা-আপনি এই রকমে নামানো ও ওঠানো যায়। বাতিটার দুই মুখে পল্‌তে বাহির করিয়া দিতে হয়। তারপরে একটা লম্বা পিন বাতিটার ঠিক মাঝখানে ফুঁড়িয়া দুইটা কাচের গ্লাসের কানার উপর পিনটার দুই দিক রাখিয়া বাতিটা ঝুলাইয়া দিতে হয়। তারপর একে একে বাতির দুইটা মুখ জ্বালিয়া দিতে হয়। যেমনি বাতিটা গলিতে থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা দুলিতেও থাকিবে।

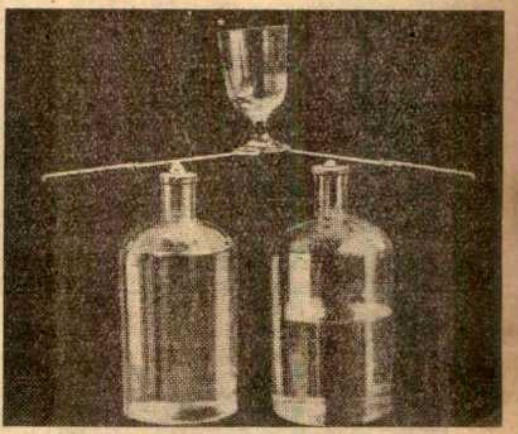

গেলাসের থির থাকা।

ডিমের থির থাকা।

পুতুল-নাচ—কাগজের কতকগুলি মানুষ ও জন্তু কাটিয়া টেবিলের উপর রাখুন। সেগুলির দুদিকে দুখানি মোটা বই রাখিয়া বই দুটির উপরে একখানি মোটা কাচ পাতিয়া রাখুন। তারপর কাচটির উপর খানিকক্ষণ হাত অথবা ফ্লানেল বা রেশমী কাপড় ঘসিতে থাকিলে তলাকার কাগজের মূর্ত্তিগুলি আপনা-আপনি নাচিতে থাকিবে। ইহা বৈদ্যুতিক শক্তিরই খেলা।

গেলাসের থির থাকা—দুইটি বোতল পাশাপাশি একটু তফাতে

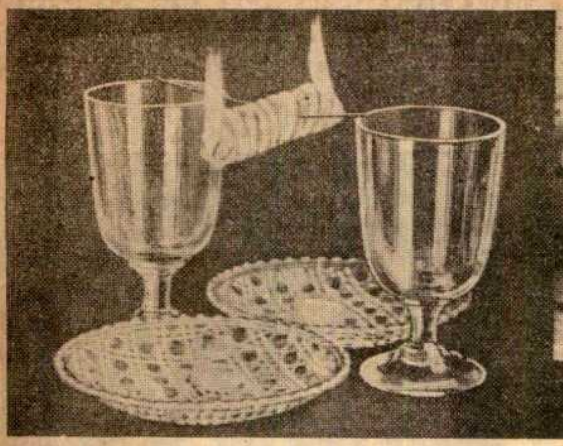

বাতির নাগর-দোলা।

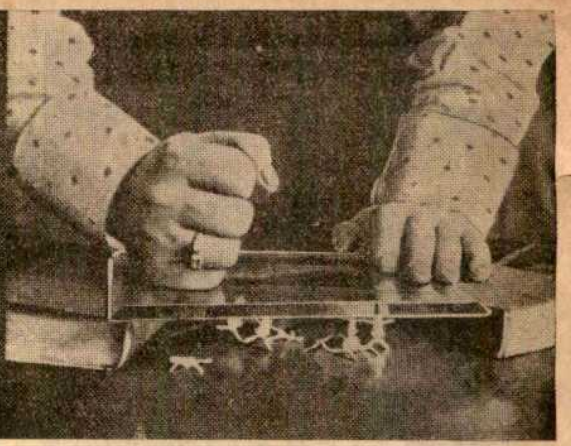

পুতুল-বাজি।

জলের সমান থাকা।

বসাইয়া তাদের ছিপির উপর দুইটি বড় বড় টেবিল-ছুরি শোওয়াইয়া রাখুন। ছুরি দুটি এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে, তাদের বাঁট যেন বাহিরের দিকে ঝুলিতে থাকে। ছুরি দুটির এই অবস্থায় ইহাদের ফলার ডগে একটি কাচের গেলাস ধীরে ধীরে সাবধানে বসাইয়া দিলে তাহা ঠিক বসিয়া থাকিবে!

জলের তলা সমান থাকা—একটি বোতল ও একটি কাচের চোঙা লউন। তাদের দুটিরই মুখে যেন ছিপি আঁটা থাকে। দুইটির ছিপি ছেঁদা করিয়া তাদের মধ্যে একটা ফাঁপা খড় বা নল চালাইয়া দিন। তারপর বোতল ও চোঙাটিকে উপুড় করিয়া ধরুন ও চোঙাটির মধ্যে জল ঢালিতে থাকুন। দেখিবেন চোঙা হইতে জল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বোতলের মধ্যে উঠিতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে দুইটি জায়গার জল এক সমতলে দাঁড়াইবে। বোতলটি মোটা ও চোঙাটি সরু হওয়া সত্ত্বেও দুই পাতের জলের তলা ঠিক এক সমান থাকিবে।

ডিমের থির থাকা—একটি ডিম লইয়া আল্‌পিন দিয়া তার দুদিকে ছোট ছোট দুটি ছেঁদা করুন এবং ফুঁ দিয়া ডিমের ভিতরের জিনিষটি বাহির করিয়া দিন। তারপর ডিমের মধ্যে একটু বালি ফেলিয়া দিন। এই অবস্থায় ডিমটিকে যে-কোন জিনিষের উপর যে-কোন-রকম ভাবেই রাখুন না কেন সেটা ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিবে, পড়িবে না। ইহার মধ্যকার বালি সব সময়েই তলার দিকে নামিয়া আসিয়া ইহাকে সমভাবে ভারযুক্ত করিবে।

—

জলে-চলা বাইসাইকেল ও মোটরগাড়ী—

জগতের অনেক-কিছু আশ্চর্য্য জিনিষ ফ্রান্স আবিষ্কার করিয়াছে। চলন্ত বা উড়ন্ত গাড়ী ও জাহাজের আবিষ্কার অধিকাংশস্থলে ফ্রান্সের দ্বারাই হইয়াছে। উড়ো জাহাজের উদ্ভাবনকর্ত্তা হইতেছে ফ্রান্স; পরে জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে ইহা দ্রুত প্রসারতা লাভ করে। এইরূপে অনেক নূতন নূতন সখ বা ফ্যাশান ফ্রান্সই প্রথমে তোলে, পরে তাহা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যাহা হউক সম্প্রতি ফ্রান্সে জলে-চলা বাইসাইকেলের উদ্ভাবন হইয়াছে।

এই বাইসাইকেলের ছবি আমরা এখানে দিলাম। সম্প্রতি আবার ফ্রান্সে ইহার হার-জিতের দৌড়-খেলা হইয়া গিয়াছে। ছবিতে দেখিতে পাইবেন যে, টর্‌পেডো বোটের মত দুইটি লম্বা লম্বা ছোট ছোট বোট সাইকেলটির দুই দিকে ভাসিতেছে, তাদের উপর দুইটি ডাণ্ডা আড়াআড়ি পাতিয়া তাহার উপর সাইকেলটি লাগান রহিয়াছে। চালক পা ঘুরাইতে থাকিলে চাকা দাঁড় জল টানে আর এই বোটদুটি নৌকার মত দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। আর ইহাদের মুখ সরু বলিয়া ইহারা জলও খুব কাটিতে থাকে।

মাটির বাইসাইকেল ছিল, উড়ো ও জলো বাইসাইকেলও হইল।

কিন্তু কেবল জলের সাইকেল হইলেই বা চলে কি করিয়া? জলের মোটর-গাড়ীও সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। মানুষ মাটিতে বসিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে যে-সব সুখ-বিলাস উপভোগ করিতেছিল সেই-সব সুখ-বিলাস আকাশে ও জলে সে উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

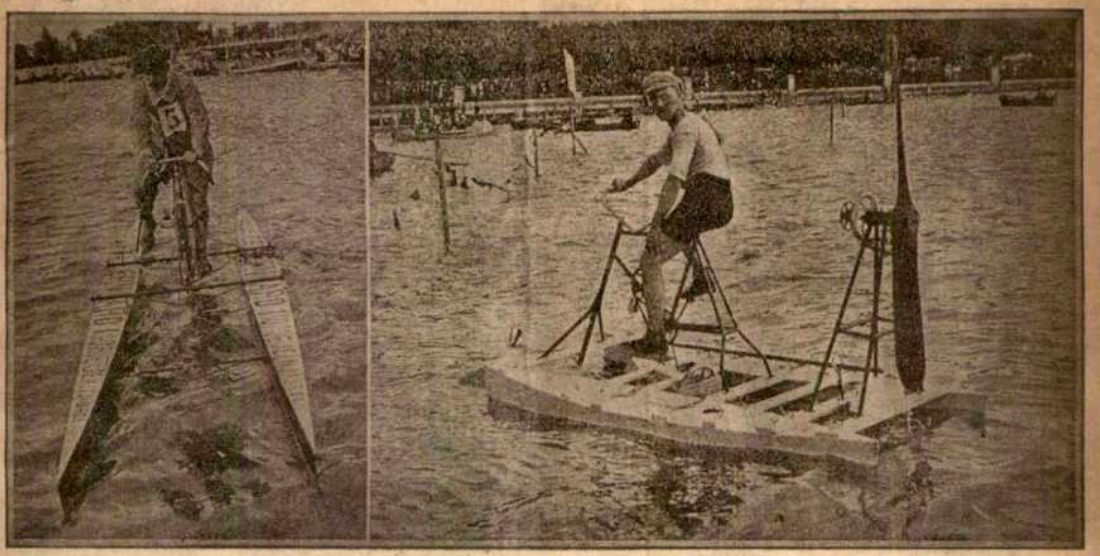

জলপথের বাইসাইকেল।
বাঁয়ে—জলপথে বাইসাইকেল দৌড়ে জয়ী।
ডাইনে—এরোপ্লেনের পাখা, ষ্টিমারের স্ক্রু-দাঁড় আর পায়ে ঠেলা চাকা জোড়া জলযান।

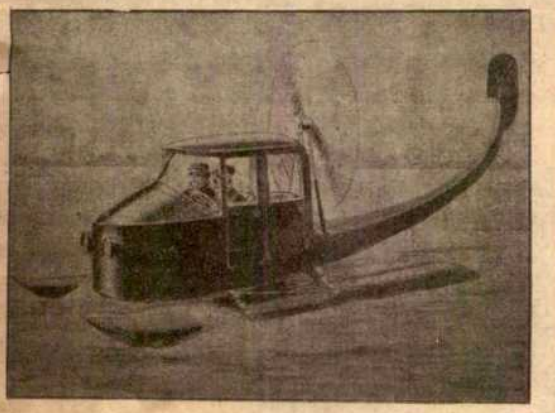

জলপথের মোটর-গাড়ী।

আকাশ ও জল যে আর সুখভোগে বাধা দিতে পারে না তাহাই সে দেখাইতেছে।

এই জলো মোটরগাড়ীর ছবি আমরা এখানে দিলাম। ইহা দেখিতে লেজ-তোলা পেটমোটা ফড়িঙের মত, সাম্‌নের আলো দুটি ঠিক যেন ফড়িঙের লম্বা লম্বা চোখ। এই গাড়ীর আগাগোড়া কাচ দিয়া ঢাকা। ইহার ভিতরের বসিবার জায়গা সাধারণ মোটর-গাড়ীর জায়গার মত উঁচু স্প্রিং দেওয়া। গাড়ীর সম্মুখ দিকে ইঞ্জিন বসানো আর পিছনে গাড়ীর ছাদের পাশে একটি লম্বা গোল হাওয়া কাটাইবার চাকৃতি।

রাত্রিবেলা আলো সমেত এই গাড়ী জলে ছুটিতে দেখিলে ইহাকে একটি অদ্ভুত জন্তু ছাড়া আর কিছুই বোধ হইবে না।

সহজ ব্যায়াম—

কুস্তি, মুগুর, বৈঠক, ডন, বার, ডাম্বেল প্রভৃতি নানারকম শারীরিক ব্যায়ামের পদ্ধতি আছে। কিন্তু এসমস্ত ছাড়া শারীরিক ব্যায়ামের একটি খুব সহজ উপায় আছে। একজন ফরাসী ডাক্তার ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা হইতেছে পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়া খানিক দূর চলিতে অভ্যাস করা। প্রতিদিন এইরূপ করিতে থাকিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ খুব সরল হয় এবং রক্তের চলাচল সহজ হয়। অন্যান্য ব্যায়ামের মত ইহাতেও শরীর বেশ পুষ্ট ও সবল হয়। অনেকে প্রতিদিন কয়েক মিনিট ধরিয়া এই ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারেন।

গুপ্ত।

—

পেঁপের ভিতর পেঁপে—

প্রকৃতির রাজ্যে নানা রকম বৈচিত্র্য ও খেয়াল দেখিতে পাওয়া যায়। আমি সম্প্রতি এরূপ একটি বৈচিত্র্যের সন্ধান পাইয়াছি। আগে প্রবাসীতে এ-সম্বন্ধে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। তাই আমার আবিষ্কৃত জিনিষটিও প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি।

একটি ধান্যে দুইটি চাউল

ওড়িয়্যায় সোণপুর একটি ফিউডেটরি ষ্টেট। এই স্থানে অনেক প্রকার ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে ক্ষুদ্র মৌরীর ন্যায় হইতে বৃহৎ শশার বীজের ন্যায়

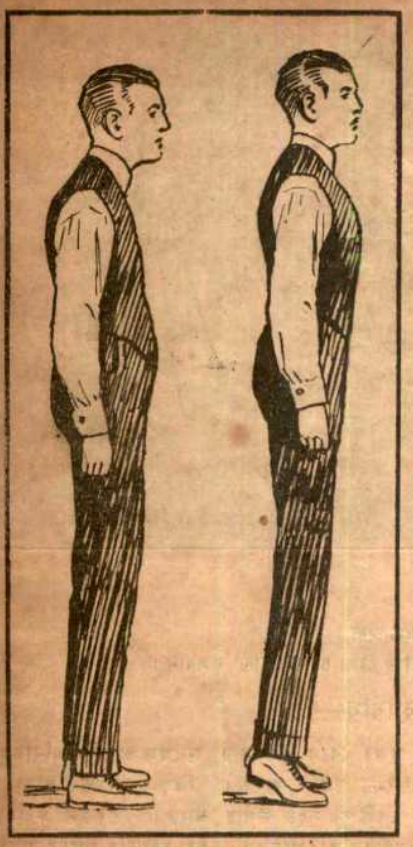

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ওঠা নামা ও হাঁটার ব্যায়াম।

পেঁপের ভিতর পেঁপে।

পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত প্রকার ধান্য আমার পিতৃদেব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে পক্ষীরাজ, গজদন্ত, সমুদ্রবালি, কর্পূরকান্তি, এবং একটি ধান্যে দুইটি চাউল, এই ধান্যগুলি উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রবালি এবং কর্পূরকান্তি অতীব সরু এবং ইহার চাউল সুগন্ধযুক্ত। গজদন্ত ধান্য বৃহৎ শশার বীজের ন্যায়। ইহার ভাত অপেক্ষা খই মুড়ি ভাল হয়। পক্ষীরাজ ধান্য মধ্যমাকার, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার বর্ণ কাল এবং দুই পার্শ্বে শ্বেত বর্ণের পক্ষ আছে, সেইজন্যই ইহার নাম পক্ষীরাজ। একটি ধান্যে দুইটি চাউল, ইহার ধানগুলি সরু এবং একটি ধান্য ভাঙ্গিলে খুব সরু সরু দুইটি চাউল বাহির হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে কৃষিকার্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি নাই। সেজন্য ঐ-সকল উৎকৃষ্ট ধান্যের চাষ খুব কম হইয়া থাকে।

কেহ যদি এই সমস্ত চাউলের ধান্যের চাষ করেন, তাহা হইলে এক বিঘা জমি হইতে দুই বিঘার ফসল পাইতে পারেন। উদ্যোগী শিক্ষিত চাষারা এদিকে চেষ্টা করিলে ভালো হয়।

শ্রীইন্দুমোহন ভট্টাচার্য্য।

জীবন-লীলা

মহান বিরাট বিশ্ব-দ্বারে একটি অতিথি,
বুকের মাঝে বিশ্ব-পরাণ বইছে ঝটিতি,
দাঁড়িয়ে আছি ক্ষুদ্র একা,
যতদূর এ যাচ্ছে দেখা—
কলকোলাহলের ধ্বনি বিশ্ব-দেউলে,
লক্ষ প্রাণের লক্ষ তানের হরষ উথুলে!

এ মোর জীবন রহস্যময়—এ মোর বুকেতে
বিশ্ব-লীলার দুয়ার পাশে জাগ্‌ছে সুখেতে,
দিনে দিনে দেখ্‌ছি চেয়ে—
জগৎ চলে অবাধ বেয়ে,
শব্দ গন্ধ গানের রাশি, আলোর মহিমা
পরশ দিয়ে রাঙিয়ে তোলে জীবন-গরিমা।

এম্‌নি নবীন কঠোর তেজে বিশ্ব-দুয়ারে
থাক্‌বো কত দিনের তরে বুকের আগারে?
জগৎ পানে তাকিয়ে দেখি—
ভাঙ্‌ছে কত পড়্‌ছে একি,
ভ্রষ্ট কত শতই পরাণ পথের ধূলিতে;—
এম্‌নি মোরে ক্ষণিক জীবন হইবে বহিতে।

লক্ষ-জীবন-সমুদ্র সে বল্‌ছে হাঁকিয়া—
'ভাঙা, পড়া নয়রে, কথা, চল্‌রে চলিয়া;'
চল্‌ছি ত তাই ছুটে ছুটে
বন্ধ বাধা সকল টুটে,
বুঝ্‌ছি আমার বুকের মাঝে যে জন বসিয়া
নয়ক সে রে জীর্ণ মলিন,—নবীন মরিয়া!

বিশ্ব তুমি ছুটেই চল, থাম্‌বে নাক কোথা,
আমি তোমার লীলায় জিয়ে নাচ্‌বো হেথা হোথা,
ভগ্ন-পরাণ কাঁদ্‌বে যেথা
জীবন-ভেরী তুল্‌বো সেথা,
নাইক রে দুখ, মৃত্যু, জরা—এসব যাবে ঝরে',
বিশ্ব-দ্বারে পরাণ আমার নাচ্‌বে তেজে ভরে'।

কে বলেরে পরাণ বৃথা, দুদিন যাওয়া আসা?—
পরাণ যেরে দৃপ্ত রবি, হর্ষ-ভরা আশা।
ক্ষুদ্র-মানব-প্রাণের পাশে
প্রাণ আনিয়ে বিশ্ব হাসে,
বিশ্ব-লীলার সাথে সাথে আমার এ-প্রাণ নাচে,
আমি রে ঢেউ বিশ্ব-প্রাণের পারাবারের মাঝে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বেতালের বৈঠক

[বেতালের বৈঠকের জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা যথাসম্ভব অল্প কথায় সংক্ষিপ্ত করিয়া না লিখিলে ছাপিতে পারা যায় না—লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটি মনে রাখিবেন। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদপ্রতিবাদ ছাপিবার স্থানও আমাদের নাই। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাতে সাধারণের সন্দেহ নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাহা মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক নিবৃত্তি বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত নয়। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না।—প্রবাসীর সম্পাদক]

জিজ্ঞাসা

(৭৬)

অঙ্কবিষয়ক পদাবলী রচয়িতা—শুভঙ্কর ভৃগুরাম দাসের জন্মস্থান কোথায় ছিল এবং তিনি কোন্ জাতীয় ও কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন?

শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল।

(৭৭)

শ্রীহট্ট জিলায়—"দেশে আইলা সার্ব্বভৌম, বিদ্যারম্ভে নিলা ওম্" এই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি?

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য।

(৭৮)

ইন্দুরের উপদ্রব নিবারণের কোন ভাল উপায় আছে কি?

শ্রীধীরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

(৭৯)

সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল কোন্ জাতীয় লোক ছিল এবং তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল?

শ্রীশশীভূষণ মাইতি।

(৮০)

বেদে বস্ত্রশিল্পের, বস্ত্রবয়নযন্ত্র তাঁতের এবং তন্তুবায় জাতির উল্লেখ আছে কি না?

শ্রীঢেঁকীরাম বর্ম্মা।

(৮১)

নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জিলায় গীত হইতে শুনা যায়। ইহা কাহার দ্বারা রচিত এবং সেই ব্যক্তির রচিত অন্য গান আছে কি না?

শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস।

গুরো, তোমার চরণ 'পাইমু' বৈলা রে
বড় আশা ছিল।
ঐ আশা-নদীর পারে বৈসে
ঐ আমার আশায় জনম গেল।
বড় আশা ছিল।
আশা-বৃক্ষ রোপণ কৈরা
চেষে রৈলাম আশা-পথে
সে ফল ফল্‌বে বৈলে।
ফল না ধরিতে বৃক্ষে
বৃক্ষের মূল ভাঙ্গিয়া পৈ[illegible]
আ-বড় আশা ছিল।
চাতক রৈল মেঘের আশে
মেঘ পৈরে যায় অন্য দেশে
চাতক বাঁচে কিসে?
বিনা মেঘ বরিষণে
মীমার চাতকিনী মৈল।
আ-বড় আশা ছিল।
বাহাত্তর বছরের পারী
বেলা আছে দণ্ড চারি
পারী কিসে সারি।
পারী না সারিতে তরী—
আ-তরী কিনারে ডুবিল।
আ-বড় আশা ছিল॥

(৮২)

তৈমুরলঙ্গের বিষয়ে কোনও ভাল ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে কি না?

শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়।

(৮৩)

কৃষিকার্য্য শিখিতে হইলে আমেরিকার কোন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে যাওয়া আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক?

সেখানের কৃষি-কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে কি জ্ঞান থাকা চাই?

উপেন্দ্রকুমার দাস।

(৮৪)

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুস্তকের এবং গ্রন্থকারের নাম কি?

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

(৮৫)

গোবসন্ত হইতে গোরু রক্ষা করিবার উপায় ও চিকিৎসা কি?

বান্ধবসমিতি, রায় রামচন্দ্রপুর।

(৮৬)

চরকায় কাটা ভাল সুতা কোথায় বিক্রয় হইতে পারে?

শ্রীরামসর্ব্বস্ব নন্দী।

মীমাংসা

(২৪)

ব্রিটিশ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই দেশী কাপড়ের কল আছে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা দেওয়া গেল না। যিনি সবিশেষ জানিতে চাহেন, তিনি Thacker, Spink & Co.র Industrial Directory দেখুন, ৮ হইতে ৩৮ পৃঃ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(২৬)

আমার নিজ গ্রামে বিপিনবিহারী সরকার নামে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পরলোকগত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বন্ধু ও সমসাময়িক লোক ছিলেন। বিপিন-বাবু কুচবিহারের রাজার দেওয়ান ছিলেন। এবং ভোটানের সঙ্গে কুচবিহারের যখন এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে নাকি ইনি যোগ দিয়াছিলেন। বিপিন-বাবু পরে শেষ জীবনে কটকে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরি করিতেন। তিনি এদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয় তাহার একজন নেতা ছিলেন এবং নীলদর্পণ নাটক লিখিতে যে-সকল মালমসলার প্রয়োজন হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু-বাবুকে দিয়াছিলেন।

এই বিপিন-বাবু "কুমারী কুমার" নামক একখানি পদ্য কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে আত্মপরিচয়ে তিনি এই কথা লেখেন যে আত্মারাম সরকার তাঁহার বৃদ্ধমাতামহ ছিলেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘোপঘাট গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি ভোজবাজীতে এত দক্ষ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন যে বাজিকরগণ তাঁহার সমক্ষে বাজী বা ভেল্‌কী দেখাইতে সমর্থ হইত না। সেইজন্য বাজীকরগণ তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিত এবং খেলার আরম্ভেই আত্মারাম সরকারের দোহাই দিয়া খেলা আরম্ভ করিত।

ব্যাসদী-গাজনা; ফরিদপুর। শ্রীরামলাল সরকার।

(২৯)

রঙ্গপুর যে সতরঞ্চের নিমিত্ত বিখ্যাত, রঙ্গপুর বি, জি, টেক্‌নীকেল স্কুলের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ড মহাশয় সেই সতরঞ্চ বয়ন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার কাছে লিখিলেই নিয়মাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

সতরঞ্চ-বয়ন-শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত কোম্পানিতে খোঁজ করিলে বিস্তারিত জ্ঞাত হইবেন।

(১) স্বদেশী উইভিং কোং, চক যরিদ (অমৃতসর)।
(২) লালাপ্রসাদ ব্রাদার্স কোং, মিরজাপুর (ইউ-পি)।
(৩) আগ্রা কার্পেট ফেক্টরি, (আগ্রা)।
(৪) কানপুর উলেন মিলস্, কানপুর।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৩০)

উইবা বা ঘেঁসে ধানগাছের এক-প্রকার কৃমি-রোগ। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস ইহা ধানেরই রোগ, কিন্তু ইহা ভুল। একপ্রকার অতি-সূক্ষ্ম সূত্রবৎ কৃমির (Eelworm) আক্রমণেই এই রোগ হইয়া থাকে। কীটগুলি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেক বছরই পূর্ব্ববঙ্গের নানা জিলায় ইহার কিছু না কিছু উপদ্রব শুনা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে এই রোগ পরিচিত। উইরা, ডাক, জালা, থোড়মরা, বাণ, ডাকমরা প্রভৃতি অনেক নাম আছে।

অন্য পোকার ন্যায় ইহারা গাছের পাতা বা শীষ কাটিয়া খায় না। ইহারা শুধু কোমল পাতা বা শীষের রসটুকু চুষিয়া নেয়। ইহাতে ধানের পাতার আগা শুকাইয়া যায় এবং গাছ নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইতে থাকে।

শেষে ধান-গাছের অগ্রভাগ অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া যায়। ইহাতে ছড়াগুলি গাছের মধ্যে আট্‌কিয়া যায়। ধানের থোড় আট্‌কিয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে 'থোড়মরা' কহে। প্রথমে ইহা অল্প জায়গায় থাকে, পরে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে।

প্রতিকারের উপায় উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববীদ্ ডাঃ বাট্‌লারের মতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

এ মোর জীবন রহস্যময়—এ মোর বুকেতে
বিশ্ব-লীলার দুয়ার পাশে জাগ্‌ছে সুখেতে,
দিনে দিনে দেখ্‌ছি চেয়ে—
জগৎ চলে অবাধ বেয়ে,
শব্দ গন্ধ গানের রাশি, আলোর মহিমা
পরশ দিয়ে রাঙিয়ে তোলে জীবন-গরিমা।

এম্‌নি নবীন কঠোর তেজে বিশ্ব-দুয়ারে
থাক্‌বো কত দিনের তরে বুকের আগারে?
জগৎ পানে তাকিয়ে দেখি—
ভাঙ্‌ছে কত পড়্‌ছে একি,
ভ্রষ্ট কত শতই পরাণ পথের ধূলিতে;—
এম্‌নি মোরে ক্ষণিক জীবন হইবে বহিতে!

লক্ষ-জীবন-সমুদ্র সে বল্‌ছে হাঁকিয়া—
'ভাঙা, পড়া নয়রে, কথা, চল্‌রে চলিয়া;'
চল্‌ছি ত তাই ছুটে ছুটে
বন্ধ বাধা সকল টুটে,
বুঝ্‌ছি আমার বুকের মাঝে যে জন বসিয়া
নয়ক সে রে জীর্ণ মলিন,—নবীন মরিয়া!

বিশ্ব তুমি ছুটেই চল, থাম্‌বে নাক কোথা,
আমি তোমার লীলায় জিয়ে নাচ্‌বো হেথা হোথা,
ভগ্ন-পরাণ কাঁদ্‌বে যেথা
জীবন-ভেরী তুল্‌বো সেথা,
নাইক রে দুখ, মৃত্যু, জরা—এসব যাবে ঝরে',
বিশ্ব-দ্বারে পরাণ আমার নাচ্‌বে তেজে ভরে'।

কে বলেরে পরাণ বৃথা, দুদিন যাওয়া আসা?—
পরাণ যেরে দৃপ্ত রবি, হর্ষ-ভরা আশা।
ক্ষুদ্র-মানব-প্রাণের পাশে
প্রাণ আনিয়ে বিশ্ব হাসে,
বিশ্ব-লীলার সাথে সাথে আমার এ-প্রাণ নাচে,
আমি রে ঢেউ বিশ্ব-প্রাণের পারাবারের মাঝে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

[redacted]

অল্প কথায়
না—লেখকগণ
কোনো বিশেষ বিষ
স্থানও আমাদের নাই
সময় স্মরণ রাখিতে হইবে
ডিয়ার অভাব পূরণ করা সাম
যাতে সাধারণের সন্দেহ নিরস
উদ্দেশ্য লইয়াই এই বিভাগের প্রবর্ত
জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাহা মীমাংসায়
উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক
বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত নয়। কোনো
জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের
স্বেচ্ছাধীন—তার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনো
কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না;—প্রবাসীর সম্পাদক।

জিজ্ঞাসা

(৭৬)

অঙ্কবিষয়ক পদাবলী রচয়িতা—শুভঙ্কর ভৃগুরাম দাসের
কোথায় ছিল এবং তিনি কোন্ জাতীয় ও কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন

শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল

(৭৭)

শ্রীহট্ট জিলায়—"দেশে আইলা সার্ব্বভৌম, বিদ্যারত্নে দিলা ঘুম"
একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি
কি?

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য

(৭৮)

ইন্দুরের উপদ্রব নিবারণের কোন ভাল উপায় আছে কি?

শ্রীধীরেশচন্দ্র চৌধুরী

(৭৯)

সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলাল কোন্ জাতীয় লোক
তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল?

শ্রীশশীভূষণ মাইতি

(৮০)

বেদে বস্ত্রশিল্পের, বস্ত্রবয়নযন্ত্র তাঁতের এবং তন্তুবায় জাতির উ
আছে কি না?

শ্রীঢেঁকীরাম শর্ম্মা

(৮১)

নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জিলায় গীত হইতে শুনা
যায়। ইহা কাহার দ্বারা রচিত এবং সেই ব্যক্তির রচিত আরো গা
আছে কি না?

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

;
আ-বড় আশা ছিল।
র আশে
অন্য দেশে
চে কিসে ?
মেঘ বরিষণে
আমার চাতকিনী মৈল।
আ-বড় আশা ছিল।
বাহাত্তর বছরের পারী
বেলা আছে দণ্ড চারি
পারী কিসে সারি।
পারী না সারিতে তরী—
আ-তরী কিনারে ডুবিল।
আ-বড় আশা ছিল॥

(৮২)

তৈমুরলঙ্গের বিষয়ে কোনও ভাল ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে কি না ?

শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়।

(৮৩)

কৃষিকার্য্য শিখিতে হইলে আমেরিকার কোন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে যাওয়া আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক ?

সেখানের কৃষি-কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে কি জ্ঞান থাকা চাই ?

উপেন্দ্রকুমার দাস।

(৮৪)

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুস্তকের এবং গ্রন্থকারের নাম কি ?

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

(৮৫)

গোবসন্ত হইতে গোরু রক্ষা করিবার উপায় ও চিকিৎসা কি ?

বান্ধবসমিতি, রায় রামচন্দ্রপুর।

(৮৬)

চরকায় কাটা ভাল সূতা কোথায় বিক্রয় হইতে পারে ?

শ্রীরামসর্ব্বস্ব নন্দী।

মীমাংসা

(২৪)

ব্রিটিশ ভারতের প্রায়-সমস্ত প্রদেশেই দেশী কাপড়ের কল আছে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা দেওয়া গেল না। যিনি সবিশেষ জানিতে চাহেন, তিনি Thacker, Spink & Co.র Industrial Directory দেখুন, ৮ হইতে ৩৮ পৃঃ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(২৬)

আমার নিজ গ্রামে বিপিনবিহারী সরকার নামে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পরলোকগত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বন্ধু ও সমসাময়িক লোক ছিলেন। বিপিন-বাবু কুচবিহারের রাজার দেওয়ান ছিলেন। এবং ভোটানের সঙ্গে কুচবিহারের যখন এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে নাকি ইনি যোগ দিয়াছিলেন। বিপিন-বাবু পরে শেষ জীবনে কটকে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরি করিতেন। তিনি এদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয় তাহার একজন নেতা ছিলেন এবং নীলদর্পণ নাটক লিখিতে যে-সকল মালমসলার প্রয়োজন হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু-বাবুকে দিয়াছিলেন।

এই বিপিন-বাবু "কুমারী কুমার" নামক একখানি পদ্য কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে আত্মপরিচয়ে তিনি এই কথা লেখেন যে আত্মারাম সরকার তাঁহার বৃদ্ধমাতামহ ছিলেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঘোপঘাট গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি ভোজবাজীতে এত দক্ষ ও শিপ্রহস্ত ছিলেন যে বাজিকরগণ তাঁহার সমক্ষে বাজী বা ভেল্‌কী দেখাইতে সমর্থ হইত না। সেইজন্য বাজীকরগণ তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিত এবং খেলার আরম্ভেই আত্মারাম সরকারের দোহাই দিয়া খেলা আরম্ভ করিত।

ব্যাসদী-গাজনা ; ফরিদপুর। শ্রীরামলাল সরকার।

(২৯)

রঙ্গপুর যে সতরঞ্চের নিমিত্ত বিখ্যাত, রঙ্গপুর বি, জি, টেক্‌নীকেল স্কুলের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সেই সতরঞ্চ বয়ন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার কাছে লিখিলেই নিয়মাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

সতরঞ্চ-বয়ন-শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত কোম্পানিতে চাকরি করিলে বিস্তারিত জ্ঞাত হইবেন।

(১) স্বদেশী উইভিং কোং, চক ফরিদ (অমৃতসর)।
(২) লালাপ্রসাদ ব্রাদার্স কোং, মিরজাপুর (ইউ-পি)।
(৩) আগ্রা কার্পেট ফেক্টরি, (আগ্রা)।
(৪) কানপুর উলেন মিলস্, কানপুর।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৩০)

উফ্‌রা বা ঘেঁসে ধানগাছের এক-প্রকার কৃমি-রোগ। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস ইহা ধানেরই রোগ, কিন্তু ইহা ভুল। একপ্রকার অতি-সূক্ষ্ম সূত্রবৎ কৃমির (Eelworm) আক্রমণেই এই রোগ হইয়া থাকে। কীটগুলি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। প্রায় প্রত্যেক বছরই পূর্ব্ববঙ্গের নানা জিলায় ইহার কিছু না কিছু উপদ্রব শুনা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে এই রোগ পরিচিত। উফ্‌রা, ডাক, জালা, খোড়মরা, বাণ, ডাকমরা প্রভৃতি অনেক নাম আছে।

অন্য পোকার ন্যায় ইহারা গাছের পাতা বা শীষ কাটিয়া খায় না। ইহারা শুধু কোমল পাতা বা শীষের রসটুকু চুষিয়া নেয়। ইহাতে ধানের পাতার আগা শুকাইয়া যায় এবং গাছ নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইতে থাকে।

শেষে ধান-গাছের অগ্রভাগ অস্বাভাবিকরূপে ফুলিয়া যায়। ইহাতে ছড়াগুলি গাছের মধ্যে আট্‌কিয়া যায়। ধানের থোড় আট্‌কিয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে 'খোড়মরা' কহে। প্রথমে ইহা অল্প জায়গায় থাকে, পরে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে।

প্রতিকারের উপায় উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববীদ্ ডাঃ বাট্‌লারের মতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

[illegible] কাটা হইলে সেইখে[illegible] তথা ও[illegible] হবে ও [illegible] বার চষ দিবে। চষের পর গাছের গোড়াগুলি পোড়াইয়া দিবে। যে স্থানে ঐ রোগ নাই, সেই স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। যখনই ক্ষেতে ঐ রোগ দেখা দিবে, তখনই রোগাক্রান্ত গাছগুলিকে উঠাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। নতুবা উহা সমস্ত ক্ষেতে সংক্রামিত হইতে পারে

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৩২)

মাঘের প্রবাসীতে প্রযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো' ভাবের এই উক্তি হতে মহাভারতের যে কাল নির্ণয় করেছেন তাতে আমার একটু খট্‌কা লেগেছে। উত্তরায়ণ আরম্ভ, আর মাঘ মাস আরম্ভ, আর মকর সংক্রান্তি তো একই জিনিষ। ইংরেজীতে বলে Winter Solstice। তাতে আবার মাঘ নামটা চান্দ্র মাসের, সৌর মাসের নয়। মাঘ মাসের সৌর নাম মকর মাস। সুতরাং মাসের নাম দিয়া কোন প্রাচীন জ্যোতিষিক তথ্য আবিষ্কার হয় কি না, সেইটাই আমার কাছে সমস্যা। যখন উত্তরায়ণ বা মকর সংক্রান্তি (Winter Solstice) হয়ে গেছে তখন তো সৌর মাঘ 'সমনুপ্রাপ্তঃ' তাতে সন্দেহ নাই। আমাদেরও তাই হতো, কিন্তু পঞ্জিকার সংস্কার আমাদের ষোল শ বছর বাকি পড়ে আছে, সংস্কারে আমাদের এতই অনাস্থা, যে, চন্দ্রার্ক সাক্ষীধরূপ উপস্থিত, তবুও তাদের কথা শুনবো না। প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেও সংস্কারে প্রবৃত্ত হব না, এতই আলস্য। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি ৭ই পৌষ মকর সংক্রান্তি, আমরা সংক্রান্তি কর্‌ব ৩০শে পৌষ। অয়নবিন্দু ২৩ দিন পশ্চাৎ গমন করেছে মিহিরের সংশোধনের পরে। সুতরাং ভাস্করের মৃত্যু হতে মিহির পর্য্যন্ত অয়নাংশ আর কতবার সংশোধিত হয়েছে না হয়েছে তা কে নির্ণয় কর্‌বে? আজ যদি পঞ্জিকা সংশোধিত হয় তবে এই আমাদের ৭ই পৌষটাই হবে মকর সংক্রান্তি, আর পর দিন হতেই বাংলায় (ভুয়া) গণনা আরম্ভ হবে ১লা মাঘ ২রা মাঘ। সুতরাং অমৃত বাবুর গণনার হিসাবে আমাদের বর্ত্তমান ১৪ই পৌষ এবং সংশোধিত ৩০ মাঘকে বলা যেতে পারবে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ"; তখন আর তো ভীষ্মের উক্তি হতে কোন ঠিকানাই পাওয়া যাবে না। অয়নবিন্দুর পশ্চাৎ-গমন হতে অতি সুন্দর গণনা হয়, যদিও মাসের নয় কিন্তু নক্ষত্রের ঠিকানা পাওয়া যায়। স্বর্গীয় তিলক মহাশয় তার Orion গ্রন্থে "সব নক্ষত্র নড়ে, কৃত্তিকা নড়ে না" শতপথ-ব্রাহ্মণের এই উক্তি হতে দেখিয়াছেন যে ঐ উক্তিটি কত প্রাচীন। তিনি বলেছেন 'কৃত্তিকা নড়ে না' এর অর্থ—বিষুবণ (Vernal Equinox) কৃত্তিকায় অবস্থিত। এখন বিষুবণ কোথায় তা দেখে অমৃত-বাবু যে গণনার প্রণালী দিয়েছেন তা দিয়ে যদি নির্ণয় অতি সহজ। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন দিনরাত্রি সমান। আজকাল এ সংক্রান্তি কোন্ নক্ষত্রে তা জান্‌লেই বুঝা যাবে বিষুবণ কত নক্ষত্র পশ্চাদ্‌গমন করেছে। আমাদের শেষ পঞ্জিকা-সংস্কারের সময় বিষুবণ ছিল অশ্বিনী নক্ষত্রে, এখন উত্তরভাদ্রপদে পশ্চাদ্‌গমন করেছে। এখন অতি সহজেই গণনা করা যায়। বাপ পিতামহের দোহাই দিয়ে চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সত্ত্বেও আমরা কত শত বৎসর কেবলই ঘুমিয়েছি। চন্দ্রসূর্য্য প্রতিদিনই সাক্ষ্য দেয় যে আমরা পনর দে শ বছর পেছনের দিকে এগিয়ে গেছি। আমরা যে ঋষিদের সন্তান।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

[illegible] বৎসর পূর্বে মহাভারত [illegible] হয় নাই। [illegible] আরও [illegible]

মহাভারতে যুদ্ধের সময় নির্ণয় করিবার [illegible] আছে। ভীষ্মদেব উত্তরায়ণারম্ভে দেহত্যাগ করিবেন [illegible] শর-শয্যায় ছিলেন। অমাবস্যা তিথিতে ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। উদ্যোগ পর্ব্বে লিখিত আছে—

সপ্তমাচ্চৈব দিবসাদমাবস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুধ্যতাং তস্যাং তামাহুঃ শরদেবতাম্॥

অর্থাৎ অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে। [illegible] অমাবস্যা উক্ত দিবস সংগ্রামের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেদিন একাদশী তিথি হয়। এই দিন হইতে শুক্লপক্ষের [illegible] + কৃষ্ণ পক্ষের ১৫ + শুক্ল পক্ষের ১৫ + কৃষ্ণ পক্ষের ১৫ + শু[illegible] ৫৯ দিন হয়। তন্মধ্যে ত্র্যহস্পর্শের এক দিন বাদ [illegible] পাওয়া যায়।

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠিরঃ
ত্রিভাগশেষ পক্ষোঽয়ং শুক্লোভবিতুমর্হতি॥

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৭।২৮

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! এই মনোহর মাঘ মাস উপস্থিত হইয়াছে। মাসের ত্রিভাগ শেষ হইয়াছে এবং শুক্ল পক্ষ বোধ হইতেছে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সৌর মাঘ মাস চান্দ্র মাস প্রাপ্ত হইলে যে দিন সৌর মাঘ মাসের তিন ভাগ (৩০ + ৭৯ + ৩০ = [illegible]) শেষ হইয়াছিল এবং চান্দ্র মাঘের তিন ভাগ (শেষ অর্ধ অবশিষ্ট [illegible] অবশিষ্ট ছিল, সেই-দিন অর্থাৎ ২৩ মাঘ শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করেন। এই দিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। এখন স্থূল গণনায় ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

মহাভারতের সময় অমাবস্যাতে মাস শেষ ধরা হইত।

আর্য্য-মতে ৩ পৌষ হইতে ২৯শে পৌষ পর্য্যন্ত [illegible] এবং মাঘের এক হইতে ২৭ পর্য্যন্ত ২৭ দিন—এই ৫৪ দিনে [illegible] অংশ, আবার ২৭শে মাঘ হইতে ১লা মাঘ পর্য্যন্ত [illegible] এবং ২৯ পৌষ হইতে ৩রা পৌষ পর্য্যন্ত ২৭ দিন—এই ৫৪ দিনে [illegible] অংশ মোট ১০৮ দিনে ১০৮ অংশ যদ্যে ক্রান্তিপাত-বিন্দু অনুলোম [illegible] ভাবে বিষুব-রেখার উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত করে। [illegible] দ্বারা বৎসর গণনায় প্রতি অংশে ৭১ বৎসর ৮ মাস গণনা করা [illegible]

এখানে ২৩শে মাঘ হইতে ২৭শে মাঘ পর্য্যন্ত অনুলোম [illegible] অংশ + মাঘ মাসে প্রতিলোমভাবে ২৭ অংশ + বর্ত্তমান [illegible] পর্য্যন্ত প্রতিলোমভাবে ২২ অংশ ৪৯ কলা—মোট (৪ + [illegible] ৫৩ অংশ ৪৯ কলা অধন-গতি হইয়াছে। অতএব ৭১ বৎসর [illegible] দ্বারা গুণ করিলে ৩৭৯৮ বৎসর ৪ মাস এবং ৪৯ কলায় [illegible] বৎসর ১০ মাস—মোট ৩৮৫৩ বৎসর ২ মাস পাওয়া [illegible] গত বৃষ্টাব্দ ১৯২০ বৎসর বাদ দিলে ১৯৩৩ বৎসর ২ মাস [illegible] পূঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পাওয়া যাইতেছে। [illegible] পূঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৩ মাঘ তারিখে ভীষ্মের মৃত্যু [illegible] পাওয়া যাইতেছে।

এই সময় মহর্ষি বেদব্যাস জীবিত ছিলেন এবং [illegible] রচনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই মহাভারতে এই সময়ের [illegible] সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানা যায়। সেই সমস্ত তত্ত্ব [illegible] সংস্করণের প্রাচীনত্বের প্রমাণ। এখন [illegible] পাই তাহা অনেক পরবর্ত্তী সংস্করণ।

[illegible] রামায়ণ হইতে ৩১ পূর্ব্ব [illegible] নির্ণয় করা [illegible] পূর্ব্বে [illegible]

অব্দ পাওয়া যায়। অতএব অনুমান ২ঃ পুঃ উনত্রিংশ শতাব্দীতে বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তজ্জন্যই ইহাতে সেই সময়ের ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব পাওয়া যায়। সেই-সমস্ত তত্ত্বই ইহার প্রাচীনতার প্রমাণ। এখন আমরা যে রামায়ণ পাই তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

মহাভারত এক সময়ের রচনা নহে। ইহাতে অন্ততঃ চারি সংস্করণের নিদর্শন দেখা যায়—ব্যাসদেবের ভারত, বৈশম্পায়নের মহাভারত, রোমহর্ষণ ও সৌতির মহাভারত এবং সৌনকের মহাভারত। আবার মহাভারতের মধ্যে অনেক জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বর্ণনও বিবৃত আছে, উহার দ্বারাও মহাভারতের বিভিন্ন সময়ে রচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিরাটপর্ব্বে ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের দুর্নিমিত্তসন্ধি প্রশমিত করিতে জ্যোতিষচক্রের রূপ বর্ণন করিয়াছেন। ইহা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ভাবের অনুরূপ। অতএব এ অংশ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনার সমকালে যে রচিত হইয়াছিল তাহা আভাসে বোধ হয়। মার্কণ্ডেয় সমস্যা অধ্যায়ে জ্যোতিষের কথা আছে; তাহার দ্বারা বুঝা যায় প্রথমে নক্ষত্রচক্রে অভিজিতের বর্ণনা হইত, তখন রোহিণীতে বাসন্তিক বিষুবণ সংঘটিত হইত। মার্কণ্ডেয়ের সময় উহা কৃত্তিকা নক্ষত্রে সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয় এবং নক্ষত্রচক্র ২৭ সমান অংশে বিভক্ত হয়। সুতরাং মার্কণ্ডেয় বেদাঙ্গজ্যোতিষ রচনার অল্পকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন এবং তাঁহার পূর্ব্বে যে কৃত্তিকা নক্ষত্রেই বিষুবণ সংঘটিত হইত তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের শতপথ-ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে। তিনি বৈশম্পায়নের ভাগিনেয় ছিলেন, সুতরাং বৈশম্পায়নের সময়ও কৃত্তিকা নক্ষত্রেই বিষুবণ সংঘটিত হইত।

মহাভারতের অনেক স্থলে মধু মাধব তপ তপস্য শুচির শুক্র প্রভৃতি ঋতুসম্বন্ধীয় প্রাচীন মাসের উল্লেখ আছে। ভগবান ব্যাসদেবের সময় এই প্রাচীন মাস-নামই ব্যবহৃত হইত। * তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রথমে প্রাচীন মাসের সহিত নক্ষত্রনামঘটিত মাসের সামঞ্জস্য বিধান হয়। তদবধিই মধু মাধব প্রভৃতি চৈত্র বৈশাখ প্রভৃতির বোধকরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা যে মুনি ঋষিগণ দৃক্‌গণিতের ঐক্য দেখিয়াই প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাতে ভুল নাই। মহাভারতে লিখিত আছে তিত্তিরী বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ সহোদর। সুতরাং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি নক্ষত্র-মাসগুলি বৈশম্পায়নের সময় প্রচলিত হইয়াছিল।

অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৭ অধ্যায়ে ভীষ্মদেবের মৃত্যু-সময়ের ঋতু-মাসের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। উহার দুই অর্থ হইতে পারে এবং সেই অর্থের বিভিন্নতায় সময়ের প্রায় এক সহস্র বৎসরের অন্তর দাঁড়াইয়া যায়। ঐ বচনের "ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লোভবিতুমর্হতি" "ত্রিভাগশেষঃ" পদের অর্থ যে মাঘ মাসের ত্রিভাগ শেষ হইয়াছে এ অর্থও হইতে পারে, আবার যে মাঘমাসের ত্রিভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে ইহাও অর্থ হইতে পারে। এই দুই অর্থ দ্বারা মাসের দুই প্রকার আকারের সম্ভাব দাঁড়াইতেছে। ১ম পূর্ণিমান্ত মাস, দ্বিতীয় অমাবস্যান্ত মাস। পূর্ণিমান্তমাস কৃষ্ণপ্রতিপদে এবং আমাবস্যান্তমাস শুক্লপ্রতিপদে আরম্ভ হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতা রচনাকালে এবং তাহার পূর্ব্বে পূর্ণিমান্তমাসের গণনা প্রচলিত ছিল—পূর্ণিম শব্দের অর্থ পূর্ণচন্দ্র তাহাতেই ইহার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। এই গণনা-মতেই আমাবস্যা অর্দ্ধমাস বলিয়া কথিত হইত—মনুসংহিতায় তাহার প্রমাণ আছে। এই পূর্ণিমান্ত মাস দৃক্‌গণিত ঐক্য করিয়া লগধ মুনি বেদাঙ্গজ্যোতিষে নিরূপিত করিয়া যান্। জ্যোতির্ষী ডেভিস সাহেবের মতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের ঋতুনির্দ্দেশ-কাল খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসর নিরূপিত হইয়াছে। ঋতুতে এক পক্ষের অন্তর হইতে প্রায় এক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ বেদাঙ্গজ্যোতিষ রচনার প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব প্রায় ২৪০০ বৎসরে রচিত হইতে আরম্ভ হয়। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতাতে যে যুধিষ্ঠিরের সময় শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন উহা ভীষ্মদেবের মৃত্যুনির্দ্দেশের প্রথম অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। বরাহ তাঁহার সূর্য্যসিদ্ধান্ত-লিখিত বাৎসরিক অয়ন-গতি ৫৪″ বিকলা ধরিয়াই ঐ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান ব্যাসদেব সম্ভবতঃ ভীষ্মদেবের মাস নির্দ্দেশে "তপঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাহাই পরবর্ত্তীকালে মাঘরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ভগবান ব্যাসদেবের এবং বৈশম্পায়ন লোমহর্ষণ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ ঐষিক পর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাভারতই প্রচার করিয়াছিলেন। শেষ অংশগুলি তাঁহাদের বহু বহু কাল পরে কোন বিধর্ম্মীগণ দ্বারা সংযোজিত হইয়াছিল। অশ্বমেধ পর্ব্বে একটি ঋতু নির্দ্দেশ আছে, তাহার দ্বারা বুঝা যায় শ্রবণা নক্ষত্রে লেখকের সময় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ইহা দ্বারা মোটামুটি জানা যায় যে ঐ অংশ খৃষ্টাব্দপূর্ব্বে ৪০০-৩০০ বৎসর মধ্যে রচিত হয়। দ্রোণপর্ব্বের সঙ্কুল যুদ্ধের যে পক্ষ নির্দ্দেশ আছে তাহার দ্বারাও অশ্বমেধের কালের অনুরূপ সময় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" পদে—অমৃত-বাবু 'সমনুপ্রাপ্তো' শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে। লেখক যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা 'সম্প্রাপ্ত' শব্দের পক্ষে খাটে; 'সমনুপ্রাপ্ত' সম্বন্ধে খাটিতে পারে না। অনু উপসর্গ 'পশ্চাৎ' অর্থ বোঝায়; এই নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং 'সমনুপ্রাপ্ত' অর্থে সমনুগত (প্রাপ্তি ও গতি একার্থবোধক) অর্থাৎ যাহা সম্যকরূপে চলিয়া গিয়াছে। এজন্য ভীষ্মের উল্লিখিত উক্তি ১লা ফাল্গুনের পূর্ব্বের নহে। বর্ত্তমান বর্ষে ৭ই পৌষ, সায়ন মকর সংক্রান্তি হইয়াছে। ৭ই পৌষ হইতে ১লা ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৫৪ দিন। সুতরাং অয়নবিন্দু মহাভারতের রচনা-কাল হইতে ৫৪ অংশ পিছাইয়া গিয়াছে। অতএব নির্ণেয় বৎসর সংখ্যা ৫৪×৬০০ অর্থাৎ ৩৮৮৮ বৎসর হয়। এই প্রকার গণনায় মহাভারতের রচনা-কাল খ্রীঃ পূঃ (৩৮৮৮—১৯২০) অর্থাৎ ১৯৬৮ অব্দ দাঁড়ায়।

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ, এম-এ।

(৩৭)

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম উইপোকা নিবারণের জন্য শুষ্ক ঘুঁটে ও পুরাতন বোরা ছেঁড়া মিশাইয়া ক্ষেত্রে কলসের মধ্যে পুতিয়া রাখিতে বলিয়াছেন। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। প্রথমতঃ পুরাতন বোরায় নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব নাই। Cellulose বা Ligno-Cellulose প্রভৃতিতে নাইট্রোজেন থাকিলেও তাহা নাইট্রোজেনের গ্যাসরূপে কখনও উক্ত প্রক্রিয়ায় বাহির হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রতি উইপোকার কোনোরূপ আকর্ষণ আছে বলিয়া জানা নাই, থাকা সম্ভবও নহে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এস্‌সি,
অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

* ব্যাসদেবের পূর্ব্বে মৃগশিরা পূর্ণিমায় বাসন্তিক বিষুবণ আরম্ভ হইত। এই কারণে ঐ মাস মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ বলিয়া কথিত হইত। গীতা ১০ম বিভূতি-অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ আছে—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ"। মৃগশিরা নক্ষত্রের অপর নাম অগ্রহায়ণী "মৃগশিরা মৃগশিরস তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী" অমর। এই অগ্রহায়ণী শব্দ অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক বেদের প্রাচীনতা-প্রতিপাদক তাঁহার Orion গ্রন্থের অয়িয়ন শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

(৩৮)

বালীগঞ্জ ৪৬ নং ঝাউতলা রোডের "ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল" সমিতি মহিলাদিগকে বিনাব্যয়ে চর্কায় সূতাকাটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা এ-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা অধ্যক্ষকে পত্র লিখিবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৪১ খ)

চন্দ্রকলা—চন্দ্রের ষোড়শভাগ বলিয়া ১৬ রামকে বাম, পরশুরাম ও বলরাম তিন বলিয়া ৩কে কোলে করিল। তাহাতে হইল ১৬৩। "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" সূতরাং-পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইল ৩৬১। তাহারও বামে বিধি=বিধানকর্ত্তা ১ বলিয়া ১ হইল। অতএব পাওয়া যাইতেছে ১৩৬১ শকে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। এখন বাকি থাকিল—"কান্ত পড়িল অনলে।" আমার মনে হয়—ইহাতে মাস ও তারিখের ইঙ্গিত আছে। কান্ত=ককারান্ত মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস, অনলে অগ্নিতে পড়িল। অনল=গার্হপত্য, আহবনীয়, ও দক্ষিণা ভেদে ৩ প্রকার। এখন অনুমান করা যাইতে পারে বহিখানি ১৩৬১ শকের ৩রা কার্ত্তিক সমাপ্ত হইয়াছে। আমি ঐতিহাসিক নই। এখন ইহার সহিত ইতিহাসের মিল হয় কি না—সে বিচার ইতিহাসশাস্ত্রাভিজ্ঞগণ করুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

(৪৪)

বাত, সবিরাম জ্বর ইত্যাদি পীড়ায় কতকগুলি উপসর্গ কোনও কোনও তিথিতে বেশী বা কম হয়, ইহা অনেকেরই অভিজ্ঞাত সত্য। ডারউইনের Origin of Species নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে যে অনুমান আছে তাহা এই—কোনও আদিম কালে, মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ জলচর ছিল ইহা অনুমান করিবার হেতু আছে। কারণ মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবগণের মধ্যে মৎস্য জাতীয় জীবেরই পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হয়। সেই জলচর অবস্থায় মানুষের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন সমুদ্রে বাস করিতেন, তখন, বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন সময়ে জোয়ার ভাটা হওয়ায়, তাঁহাদের শরীরের উপর বিভিন্ন তিথির প্রভাব অনুমান করা কঠিন নয়। আমাদের জলচর অবস্থা যদিও বহুকাল ঘুচিয়াছে, তথাপি সেই প্রভাব এখনও কিছু কিছু আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু, এম্-এম্‌সি।

(৪৭)

পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রে শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রানুমত হয় নাই। তাঁহার মীমাংসাতে দেখা যায় তিন প্রকারে বৈদ্যের উৎপত্তি। (১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদ্য; (২) ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত অম্বষ্ঠ বৈদ্য, এবং (৩) গালব ঋষি হইতে বৈশ্যা বীরভদ্রার গর্ভজাত অমৃতাচার্য্যের আট কন্যা হইতে আট প্রকার উপাধিক বৈদ্য। এই অমৃতাচার্য্য ব্রাহ্মণ গালব ঋষি হইতে বৈশ্যা বীরভদ্রার গর্ভজাত, সূতরাং ইনিও অম্বষ্ঠ বৈদ্য। মহর্ষি মনু এবং মহর্ষি ব্যাসের বিধান মতে অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, প্রভৃতি স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার মাতৃবর্ণানুসারে হইত (মনু ১০ম অধ্যায় ৫।৬।১৪ শ্লোক, এবং ব্যাস ১ম অধ্যায় ৮ম শ্লোক)। বিষ্ণু বলিয়াছেন "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" (১৬ অধ্যায় ২য় শ্লোক)। প্রথমোক্ত বৈদ্য ব্রাহ্মণমাতৃক বিধায় এই বিধান অনুসারে এই বৈদ্যের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের ন্যায় হইত, সূতরাং ইঁহারা ব্রাহ্মণ এবং শর্ম্মা উপাধি ব্যবহারের অধিকারী। কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তিক বলিয়া পাতিত্যদোষদুষ্ট বিধায় ব্রাহ্মণ হইতে অবরজ। ইঁহারাই জ্ঞাত বৈদ্য। এই বৈদ্য বাংলাদেশে নাই। ইঁহাদের অপেক্ষা বৈশ্যমাতৃক অম্বষ্ঠ বৈদ্য অবরজ। অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা (মনু ১০ম অধ্যায় ৪৭ শ্লোক)। দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার দেবতাদিগের চিকিৎসা করেন বলিয়া যেমন দেব-বৈদ্য, বিষ-চিকিৎসক যেমন বিষবৈদ্য, অম্বষ্ঠেরও বৃত্তি চিকিৎসা বলিয়া তাঁহাদের উপাধি বৈদ্য। অম্বষ্ঠ চিকিৎসা-বৃত্তিক বলিয়াই বৈদ্য, সূতরাং বৈদ্য উপাধি অম্বষ্ঠের বৃত্তিগত উপাধি। বেদ পঠনে অধিকারী বলিয়া বৈদ্য নহেন, বৈদ্য উপাধিও তজ্জন্য নয়, এবং অম্বষ্ঠ বলিয়াও বৈদ্য নহেন।

মহর্ষি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া অধ্যাপনা যাজন এবং প্রতিগ্রহ একমাত্র ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য বিধান করিয়া ক্ষত্রিয় বৈদ্যের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। (মনু ১০ম অধ্যায় ৭৫।৭৭।৭৮ এবং যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় ১১৮ এবং বিষ্ণু ২য় অধ্যায় ৪।৫ শ্লোক)। এবং সর্ব্ববর্ণাগ্রজ ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারের বিশিষ্টতা প্রযুক্ত বেদের অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যান বিষয়ে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধায় বেদ শিক্ষা দিতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ক্ষত্রিয় বৈদ্যের সে অধিকার ছিল না। সূতরাং বৈশ্যমাতৃক ও বৈশ্যবর্ণানুযায়ী সংস্কার প্রাপ্ত বৈশ্যবর্ণান্তর্গত অম্বষ্ঠের সে অধিকার থাকিতে পারে না, ছিলও না (মনু ১০ম অধ্যায় ১-৩ শ্লোক)। আপৎ-কালেও অর্থাৎ জীবনোপায় অভাবেও বৈশ্যের ব্রাহ্মণের করণীয় বেদাধ্যাপনা, যাজন এবং প্রতিগ্রহ করিলে নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে (মনু ১০ম অধ্যায় ৯৫।৯৬ শ্লোক)। ব্রাহ্মণমাতৃক বৈদ্যের যখন বেদ পাঠনে অর্থাৎ বৈদ্যাধ্যাপনার (বেদশিক্ষা দিবার) অধিকার ছিল না তখন তাঁহাদিগের হইতে অবরজ বৈশ্যমাতৃক অম্বষ্ঠ বৈদ্যের সেই অধিকার যে থাকিতে পারে না এবং ছিল না বলাই বাহুল্য।

মহর্ষি মনু অম্বষ্ঠকে বলিয়াছেন অপসদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা হইতে অপকৃষ্ট (১০ম অধ্যায় ৪৬ শ্লোক); পরাশর বলিয়াছেন অর্দ্ধসিরি অর্থাৎ পিতৃবর্ণের অর্দ্ধেক (১১ অধ্যায় ২৩ শ্লোক)। অতএব অপসদ এবং আর্দ্ধিক অম্বষ্ঠ বৈদ্য পিতৃবর্ণও প্রাপ্ত হইত না, ব্রাহ্মণ বলিয়াও সমাজে গণ্য হইত না, এবং ব্রাহ্মণত্ববাচক শর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকারও ছিল না। সূতরাং অম্বষ্ঠ বৈদ্যের বেদাধ্যাপনার (বেদ শিক্ষা দিবার) অধিকার ছিল না।

বীরভদ্রার নাম অম্বা নহে (অম্বা অর্থ মাতা, তিনি অমৃতাচার্য্যের মাতা বলিয়াই অম্বা) অম্বা অর্থাৎ মাতা—ষ্ঠ (স্থা ধাকা + অ (ড)—ক সংজ্ঞাবাচক) এইরূপে আভিধানিক অম্বা শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অমৃতাচার্য্য মাতৃবর্ণের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া মাতৃকুলেই ছিলেন, তজ্জন্য তিনি অম্বষ্ঠ। ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানও একারণে অম্বষ্ঠ। অমৃতাচার্য্য তাঁহার কন্যাদিগকে বৈশ্যত্ববাচক উপাধিকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, তদ্ধেতু তাঁহার দৌহিত্রগণও বৈশ্যত্ববাচক গুপ্ত, সেন, দত্ত, দেব, দাস (অধুনা দাশ), কুণ্ড, নন্দী এবং সোম উপাধিক, এবং ইঁহাদিগের বংশধর অম্বষ্ঠ বৈদ্যরাও এই উপাধি ব্যবহার করেন। অমৃতাচার্য্যকে বৈদ্যের আদি পিতা বলা যায় না, তিনি মাতামহ; তাঁহার দৌহিত্রগণ অম্বষ্ঠ বৈদ্যের আদি পিতা। পিতৃকুল ধরিয়াই বংশপরিচয়, সেই জন্যই অম্বষ্ঠ বৈদ্যরা ঐ-সকল উপাধি ব্যবহার করেন। এই-সকল উপাধি ব্যতীত অম্বষ্ঠ বৈদ্যের মধ্যে যে ধর, কর, নাগাদি আরও উপাধি দেখা যায় তাঁহারা বোধ হয় দ্বিতীয় প্রকারে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ বৈদ্য। ঐ-সকল উপাধি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নাই, আছে কেবল বৈশ্যদিগের আর কায়স্থই বলুন আর শূদ্রই বলুন আছে তাহাদের মধ্যে। অম্বষ্ঠ, বৈশ্য এবং কায়স্থের উপাধি যখন এক, তখন ইহাদের আদিপুরুষ এক বলিয়াই মনে হয়, বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে। শম্বষ্ঠ

বৈদ্যরা মাতৃকুলে থাকিয়া মাতৃকুলের উপাধিই ব্যবহার করিতেন, তাই তাঁহারা বৈশ্যের "গুপ্ত" উপাধি সাধারণতঃ বৈদ্যবাচক স্বরূপে নামের শেষে ব্যবহার করেন।

বাংলা দেশের অম্বষ্ঠ বৈদ্যদিগের দস্ত্য স বর্জ্জন এবং তালব্য শএর শরণাপন্ন হওয়া এবং ব্রাহ্মণত্ববাচক শর্ম্মা উপাধি ১০।১১ বৎসরের বেশী পুরাতন নয়। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুবাবু বিস্তৃত উত্তর দিয়াছেন। তার উক্তির সমর্থনের একটি দৃষ্টান্ত আমি জানি। দাশ দাসে। দাশধাতু-নিষ্পন্ন দাশ শব্দ মেদিনীপুর-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের উপাধি। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাশ কাব্যতীর্থ B.A. আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তিনি বলিতেন—উহা তাঁহাদেরই একচেটিয়া। তবে অধুনা অন্যান্য জাতীয়েরা নিজেদের ছোট মনে করিতে পারেন না বলিয়া ঐ দাশ উপাধিই ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন। শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

১। গৌতম-সংহিতা বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং" বৈদ্যের জন্ম।

২। মেধাতিথি বলেন—ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যকন্যা তত্র জাতো অম্বষ্ঠঃ (বৈদ্যঃ)।

৩। মহাভারত—অনুশাসনিক পর্ব্বে আছে—ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়ামেব বৈদ্যঃ।

৪। মনু—দশম অধ্যায়—ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং বিন্নায়াং অম্বষ্ঠো নাম পুত্রো ভবতি।

৫। উশনা সংহিতা—বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।

৬। পরশুরাম-সংহিতা—বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতো অম্বষ্ঠঃ।

৭। হারিত-সংহিতা—বৈশ্যায়াস্তু তথাম্বোষ্ঠঃ।

৮। মেদিনীকোষ—বিপ্রাৎ বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ।

৯। ব্যাস-সংহিতা—বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতোঽম্বষ্ঠঃ।

১০। অগ্নিপুরাণ—গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।

১১। অগ্নিবেশ বলেন—বৈদ্যজাতি বৈশ্য।

১২। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-মতে—ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি।

১৩। রাজসাহী জেলার পুঠিয়া একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে অনেকগুলি রাজা রাণী এখনও বর্ত্তমান আছেন। এইস্থানে অনেক দিন পূর্ব্বে বৈদ্যের বর্ণ-বিচার করিবার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হয় ও বঙ্গের বহুস্থানের পণ্ডিতপ্রধানগণ আমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করেন। এই সভায় তাৎকালীন সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাদাতা নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়াছেন।

১৪। বগুড়া, সেরপুর, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের জাতিনির্ণায়ক সভায় বৈদ্যগণ বৈশ্যবর্ণভুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

১৫। বৈদ্যের বর্ণনিশ্চয় করিবার জন্য রাজা রাজবল্লভ যে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন ঐ ব্যবস্থাপত্রেও বৈদ্যগণ বৈশ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

১৬। ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে "বৈদ্য বড়, না কায়স্থ বড়" ইহা স্থিরীকৃত করিবার জন্য প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক সভা হয়। ঐ সভায় "ইণ্ডিয়ান মিরর" সম্পাদক সুবিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৭। তেওতার প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপত্রে বৈদ্যগণ বৈশ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

১৮। কাশিমবাজারের রাজা স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ রায় মহাশয় বৈদ্য জাতির বর্ণনির্ণায়ক এক সভার অধিবেশন করেন। বিভিন্ন স্থানের ১০৮ জন পণ্ডিত-শিরোমণিকে আহ্বান করায়, তাঁহারা সকলেই বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়া পাঁতি দিয়াছেন।

১৯। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অষ্টম সংস্করণে বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়াছেন।

২০। বিশ্বকোষের মতে বৈদ্যগণ বৈশ্যবর্ণভুক্ত।

২১। প্রকৃতিবাদ অভিধানে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বৈদ্যের উৎপত্তি লিখিত আছে।

২২। শব্দসার অভিধান বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়াছেন।

২৩। পণ্ডিত গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়াছেন

২৪। সম্বন্ধনির্ণয়কার বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়াছেন।

২৫। জাতিনির্ণয় পুস্তকে বৈদ্যগণ বৈশ্য স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

২৬। ডাক্তার রামদাস সেন বৈদ্যকে বৈশ্য বলিয়াছেন।

২৭। রাজা মদনরঞ্জনের সভায় বৈদ্যগণ বৈশ্য স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বৈদ্যের বৈশ্যত্বের প্রমাণ জন্য আবশ্যক বাপদেশে আরও বহুতর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে; আমরা আপাততঃ প্রমাণের উপসংহার করিয়া বৈদ্যের জাতি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈশ্য তিনপ্রকার—১ম—বৈশ্যপিতা ও বৈশ্যমাতা সহযোগে উত্তম বৈশ্যের জন্ম। ২য়—ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্যামাতার গর্ভজাত সন্তান মধ্যম বৈশ্য। ৩য়—ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যামাতার গর্ভের সন্তান অধম বা অম্বষ্ঠ বৈশ্য। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যানীর গর্ভজ সন্তান, সুতরাং অধম বৈশ্য। কারণ—স্বজাতীয় পুরুষের সহিত স্বজাতীয় কন্যার বিবাহই শাস্ত্রমতে প্রশস্ত এবং তদ্‌জাত সন্তান উত্তম। অন্যথায় এক বর্ণীয় পুরুষ তাঁহার পরবর্ণীয়া পত্নীজাত সন্তান মধ্যম। এবং এক বর্ণীয় পুরুষ তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণীয়াকে বিবাহ না করিয়া তৎপরবর্ত্তী বর্ণীয়াকে বিবাহ করিলে তজ্জাত সন্তান অধম। কাজেই বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভজাত বলিয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রে "অন্তরজঃ" ও "একান্তরজঃ" বলিয়া দুইটি শব্দ আছে। অন্তরজঃজাত যাঁহারা পিতৃধর্ম্মী এবং একান্তরজঃজাত যাহারা তাঁহারা মাতৃধর্ম্মী। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়া অন্তরজঃ, ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাএকান্তরজঃ; ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা অন্তরজঃ, ক্ষত্রিয়-শূদ্রা একান্তরজঃ। এক বর্ণীয় পুরুষের সহযোগে তাহার অব্যবহিত পরবর্ণীয়ার গর্ভজাত সন্তান পিতৃধর্ম্মী অর্থাৎ অন্তরজঃ বিধায় পিতৃধর্ম্মী; কিন্তু এক বর্ণীয় পুরুষ তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণীয়া না হইয়া তৎপরবর্ত্তী বর্ণীয়া জাত সন্তান মাতৃধর্ম্মী অর্থাৎ একান্তরজঃ বিধায় মাতৃধর্ম্মী। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যানীর গর্ভজাত বলিয়া একান্তরজঃ, সুতরাং মাতৃধর্ম্মী। ইহার অন্যথা করিবার উপায় নাই।

পুরাকালে সকলেই চিকিৎসক হইতে পারিতেন ও হইতেন। কিন্তু:—

১। ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকান্নং তদন্নস্তু পুরীষবৎ,

২। পূয়ং ব্রাহ্মণ চিকিৎসকান্নং,

৩। চিকিৎসাতুর ক্রুদ্ধ পুংশ্চলীমস্ত বিদ্বিষাং,

প্রভৃতি শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা শাসিত হইয়া যখন ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করেন তৎসময়ে বৈশ্য ও শূদ্রগণ এই ব্যবসা অবলম্বন করেন। কালক্রমে এই চিকিৎসক বৈদ্য সম্প্রদায় "বৈদ্য" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

মনু বলিয়াছেন—সুতানামাশ্চ সারূপ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং। মনু মহাশয় অম্বষ্ঠকে গোপালন, গোরক্ষা, কৃষিকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বৈশ্য বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্রেয় বলেন—অম্বষ্ঠ চিকিৎসা শাস্ত্র

বৃত্তয়ঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে—পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পঠযামাস যত্নতঃ। সুতরাং চিকিৎসাই বৈদ্যজাতির প্রধানতম ও শাস্ত্রীয় অবলম্বন।

বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, তদ্‌যথা—

মনু বলেন—অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
কুল্লুক বলেন—অম্বষ্ঠানাং রোগশান্ত্যাদি চিকিৎসা।
টীকাকার রামচন্দ্র বলেন—চিকিৎসকং শাস্ত্রং বৈদ্যকম্।
গোবিন্দরাজ বলেন—চিকিৎসকং শাস্ত্রং বৈদ্যকম্।
অমরকোষ বলেন—রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্ বৈদ্যোচঃ চিকিৎসকঃ।
ব্যাস বলেন—বৈদ্যবৃত্ত্যা ভেষজানি।
মহাভারত বলেন—বৈদ্যা চিকিৎসা-কুশলাঃ।
উশনা বলেন—বৈদ্যঃ (অম্বষ্ঠঃ) চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।

সুতরাং শাস্ত্রে অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইযাছে তাহাতে বৈদ্যকেই বুঝায, অন্যকে নহে। বিষ্ণুপুরাণ-মতে গুপ্ত উপাধি বৈদ্যের পক্ষে প্রশস্ত।

বৈদ্য বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিতে অধিকারী নহেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অঃ এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডস্থ ৪র্থ অঃ পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায়। আযুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের শাখা, অথর্ব্ববেদ, "বেদ" নহে। সুতরাং আযুর্ব্বেদও বেদ নহে। অথর্ব্ব বেদ, ব্রাত্য বেদ। শাস্ত্রে লিখিত আছে—আযুর্ব্বেদস্তু যো দত্তস্তস্যাম্বষ্ঠ ভূমুর্বৈঃ তেন প্রসক্তো নৈবান্যৎ পুরাণাদি বদিষ্যসি আযুর্ব্বেদাৎ পরং নান্যদযুক্তাং বাক্যমর্হতি। অর্থাৎ তোমাদিগকে (বৈদ্যগণকে) ব্রাহ্মণগণ যে আযুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই তোমরা (বৈদ্যগণ) আসক্ত ও সন্তুষ্ট থাকিও, অন্য পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিও না। আযুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য পুরাণাদি শাস্ত্র তোমাদের উচ্চার্য্য নহে।

বৈদ্যগণের পৈতা গ্রহণ প্রথাও পূর্ব্বে ছিল না। রাজা রাজবল্লভই প্রথমে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন—Rajballav, a person of the Baidya class, steward to the Nawab of Murshidabad, about a hundred years ago first procured for Baidyas the honor of wearing the Paita He invited the Brahmins to a feast, and persuaded them to invest his son, from which time many Baidyas wear the badge of distinction.

Tribes and Castes of Bengal, Vol I., Page 48.

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

(৫৩)

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যায়াম সম্বন্ধে ইংরেজিতে একখানি বই দেখিয়াছি, তাহার নাম হঠযোগ Hatha Yoga। যোগী রামচরক প্রণীত। পুস্তকখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যোগী পাব্‌লিশিং সোসাইটি ম্যাসনিক টেম্পল শিকাগো হইতে প্রকাশিত। এই সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত আরও অনেক পুস্তক আছে।

Hatha Yoga by Yogi Rama Charaka, Published by Yogi Publishig Society, Masonic Temple, Chicago, Ill., U. S. A.

(৫৪)

কাপাশ-বীজ ছাড়াইবার জন্য হাতের কল অর্থাৎ কলু আছে। প্রত্যেকটির মূল্য এক টাকা এবং ডাকমাশুল দিলে যতটির দরকার হয আমি দিতে পারি। শ্রীনবকুমার সিংহ।

তিলকপুর, কমলগঞ্জ পোষ্টাপিস, জেলা সিলেট।

আমি জনৈক সূত্রধর দ্বারা কতিপয চর্‌কা ও কার্পাশ হইতে বীজ ছাড়াইবার কল (চর্‌কা) প্রস্তুত করাইয়াছি। কাঠের প্রকার-ভেদে চর্‌কার মূল্য দেড় টাকা হইতে চারি টাকা এবং চর্‌কা অর্থাৎ কার্পাশ হইতে বীজ ছাড়াইবার কলের মূল্য এক টাকা হইতে আড়াই টাকা পর্য্যন্ত। কাহারও আবশ্যক হইলে সত্বরাহ করা যাইতে পারে।

মৌলবী আক্‌ছার উদ্দিন আহম্মদ,
হেড্ মৌলবী হরেন্দ্রলাল হাইস্কুল, ভাগ্যকুল, ঢাকা।

কার্পাশ তুলা হইতে বিচি ছাড়াইবার জন্য এক-প্রকার কল আমাদের বাগের অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে সূত্রধর মিস্ত্রিদের নিকট পাওযা যায়। অর্ডার দিলে তাহারা প্রস্তুত করিয়া দেয়। ইহা হাতে চর্‌কার মত চালাইতে হয। উক্ত দেশে উহাকে খাউই বলে। দাম ৩৷৪৲ টাকার অধিক নহে।

শ্রীসত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইবার কল ভাগলপুর এবং সুপ্‌পলনামক ভাগলপুরের অন্তর্গত স্থানে পাওযা যায। তাহাতে তুলা হইতে বীজ সুন্দররূপে ছাড়ান যায। আমি একটি আনাইযা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। মূল্য দুই টাকার মধ্যেই।

শ্রীসুবোধবালা নারাযণ,
ট্রেনিং স্কুল, ভাগলপুর।

কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইবার কল চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে পাওয়া যায। ইহার নাম "কেড়কী"। প্রত্যেকটির দাম আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত। গ্রামে মেলা উপলক্ষে যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। ফর্‌মাস্ দিযা তৈযারী করিতে হইলে দাম কিছু বেশী পড়ে।

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরভূম-সিউড়ি পোষ্ট-আফিসের অধীন শঙ্করপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ইসাহাক মোল্লার কার্‌খানায় কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইবার কল প্রস্তুত হয়। কলটি ক্ষুদ্র আকারের; হস্তদ্বারা সহজে চালিত হয। মূল্য প্রত্যেকটি ১৷৷০। হবিবুল হক।

কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইবার কল এখানে দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি একটা ১৲ টাকা দিয়া কিনিয়াছিলাম। এখনও ঐ কল এখানে পাওয়া যায, তবে তাহা পাঠাইবার সুবিধা আমি কবিতে পারিব না। মোটামুটি একটা নমুনা ও পরিচয এই সঙ্গে পাঠাইতেছি, যে কেহ ঐ নমুনা দেখিয়া মিস্ত্রী দ্বারা তৈযার করাইয়া লইতে পারিবেন আশা করি।

১ চিহ্নিত তক্তায পা দিয়া চাপিয়া বসিয়া ২ চিহ্নিত হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে ৪ ও ৫ চিহ্নিত গোল ডাণ্ডা দুইটি ঘুরিবে। সেই সময়ে × × × চিহ্নের স্থানে বাঁ হাতে তুলা ধরিয়া রাখিলে বীচিগুলি সামনের দিকে পড়িয়া যাইবে ও তুলাটা ডাণ্ডার পেষণে চ্যাপ্‌টা হইয়া পিষা পিছনে পড়িবে। তুলাগুলি প্রথমে বোদ দিয়া লইতে হয, নতুবা সহজে বীচি ছাড়ে না। গোল ডাণ্ডা দুইটির + চিহ্নিত স্থান ক্রুযের মত খাঁজ-কাটা হইবে। ডাণ্ডা দুইটির নীচেই ইহা একটি কাঠের খিল, ইহার মুখ একটু চ্যাপ্‌টা, সেই দিকটাই ৩ ও ৪এর ফাঁকে ঢোকান থাকে। গোল ডাণ্ডা দুটিকে আঁটিয়া রাখাই ইহার উদ্দেশ্য। এই খিলটি খুলিয়া ফেলিলেই ৩, ৪, ৫ চিহ্নিত কাঠগুলি ৬ ও ৭ চিহ্নিত খুঁটি হইতে বাহির করা ও লাগান যায়। ০ + এই দুই স্থানে সর্ষের তেল দিলে ঘুরাইবার সময় শব্দ কম হয ও আট্‌কায় না। বলা বাহুল্য ৬ ও ৭ খুঁটির ততখানি জায়গাই কাটা হইবে যতখানি ৩, ৪, ৫এ জুড়িয়া আছে। ৮ চিহ্নিত কাঠখানি ইহার ভিত্তি, ইহা যতখানি পুরু ততখানি চওড়া। ১, ৬, ৭কে খুব মজবুত করিয়া ৮এর সঙ্গে না জুড়িলে ঘুরাইবার সময় খট্‌খট্ করে এবং তাহাতে বড় অসুবিধা হয়।

প্রীতিলতা ঘোষ।

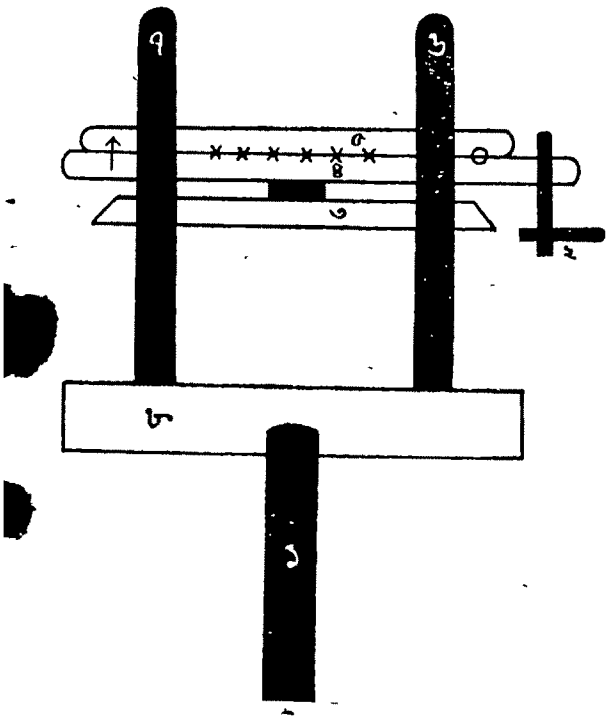

তুলার বিচি ছাড়াইবার কল।

কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইবার কল কাষ্ঠনির্ম্মিত, হাতে বানাইতে হয়, মূল্য ৩।৪ টাকার বেশী নহে। রংপুর জেলায় উহাকে "কেরকা" বলে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী জমিদার পোঃ আঃ ঘড়িযালডাঙ্গা (রংপুর) এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে উক্ত জমিদার মহোদয় যথেষ্ট কল জোগাড় করিয়া দিবেন। তাছাড়া ইনি নিজে হাত ও পায়ে চালিত তাঁত ও চর্‌কা প্রস্তুত করিতেছেন। কাহারও তাঁত বা চর্‌কার দর্‌কার হইলে শরৎ-বাবুকে লিখিতে পারেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৫৫)

মোজার কল ক্রয়ার্থী পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে লিখিয়া কোথায় পাওয়া যায় এবং কোনটার কত মূল্য, জানিতে পারেন। শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম।

(৫৬ খ)

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রায় সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Journalism শিক্ষা দেওয়া হয়; বিশেষতঃ উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খুব যত্ন নেওয়া হয়; যথা,—হার্ভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া, চিকাগো, ইলিনয়, ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং নিউইয়র্ক কলেজ। আমাদের দেশের কতকগুলি পাশ দেখিয়া তথায় ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা ঠিক হয় না; বিনা পাশেও যে-কেহ ভর্ত্তি হইতে পারে যদি তাহার কয়েকটি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকে। প্রত্যেকেরই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ও শাসনপদ্ধতি, বিভিন্ন দেশের ভূবৃত্তান্ত, অর্থশাস্ত্র এবং এদেশের পত্রিকা-পরিচালনের জ্ঞান নিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত যুক্তপ্রদেশেই এই শিক্ষা সবচেয়ে ভাল হয় এবং সবিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। এই নূতন পথে আমাদের দেশের ছাত্রগণ যতই ঝুঁকিবে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। সম্প্রতি লালা লাজপৎ রায়ও তাঁহার কয়েক বৎসরের আমেরিকা-প্রবাসের অভিজ্ঞতা নিয়া লাহোর নগরে ঐ বিষয়ে একটি শাখা খুলিয়াছেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র গুহ।

[১৯২১ মার্চ মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Journalism শিক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। অনুসন্ধিৎসুরা তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। —প্রবাসীর সম্পাদক]

(৫৭)

প্রাচীন সময়ে গাঁয়ের বাজারে কর (tax) দিবার রীতি ছিল। এখনও এই রীতি কোনও কোনও জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারের মধ্যে এই-রকম কর ওসুল করিবার জন্য আধুনিক সহরের অক্‌ট্রায় পোষ্টের (Octroi Post) মত একটা স্থান থাকিত। মধ্যপ্রদেশে আজকালও বাজারগুলির মধ্যে এই স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সে দেশে তাহাকে লোকে বলে "চবুতরা"। যখন কোন উৎসবের উপলক্ষ্যে কিম্বা অন্য কারণে বাজার বন্ধ করিতে হয়, তখন এই বিষয়ের জ্ঞাপনের জন্য "হরতাল" (হরিতাল) নামে একটি পীত ধাতুর দ্বারা চবুতরার দেওয়ালে দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ ছুটির চিহ্ন। যাহারা চবুতরার বন্ধ হইবার পর আসে, তাহারা এই দাগ দেখিয়া ফিরিয়া যায়। সুতরাং যখনই চবুতরা বন্ধ থাকে তখনই লোকে বলে "আজ হরতাল"।

এই হইতেছে 'হরতাল' কথার ইতিবৃত্ত। কালক্রমে বাজার বন্ধ করা হইতে, 'হরতাল' প্রত্যেক কাজ ছাড়ার বোধক হইয়া গিয়াছে। এইরূপে যাকে ইংরেজিতে "strike" বলে, 'হরতাল' শব্দটা তারই স্থানে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। কোন্ সময় থেকে এই প্রণালী প্রচলিত, তাহা ঠিক জানা যায় না।

কামাক্ষ্যা, কাশীধাম। শ্রীরামাজ্ঞা দ্বিবেদী।

(৬০)

Ligaments—বন্ধনী।	Nervous tissue—স্নায়ুতন্ত্র।
Tissue—তন্ত্র।	Bone tissue—অস্থিতন্ত্র।
Adipose tissue—মেদতন্ত্র।	Cartilage tissue—উপাস্থি তন্ত্র।

Epithelial cells—শ্লৈষ্মিক কোষ।

শ্রীরমেশচন্দ্র তালুকদার।

1. Ligaments বন্ধনী বা অস্থিবন্ধন; 2. Tissue কলা; 3. Nervous Tissue বাতকলা বা তন্ত্রকলা; 4. Bone Tissue অস্থিকলা; 5. Cartilage Tissue উপাস্থিকলা বা তরুণাস্থিকলা; 6. Epithelial cells অন্তস্ত্বক্‌কোষ। শ্রীরামাজ্ঞা দ্বিবেদী।

Ligaments বন্ধকী।	Nervous tissue স্নায়ুবিধান তন্ত্র।
Tissue বিধান তন্ত্র।	Bone tissue অস্থি বিধান তন্ত্র।
Adipose tissue চর্ব্বি জাতীয় তন্ত্র।	Cartilage tissue উপাস্থি তন্ত্র।

Epitheleum cell উপত্বক সম্বন্ধীয় কোষ।

ডাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

(৬৩)

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান জিলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণগ্রামে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়।

[রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকাল, এবং বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এর পর আর কোনো আলোচনা ছাপা হইবে না।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

কোনো ধর্ম্মধ্বজের প্রতি

প্রেমের ধর্ম্ম কর্‌ছ প্রচার কে গো তুমি সবুট লাথি দিয়ে,—
ডায়ার-মার্কা শিষ্টাচারের লাল-পেয়ালার শেষ-তলানি পিয়ে!
কুশলে তো চল্‌ছে তোমার অর্দ্ধঘণ্টা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া,—
টিফিন্ এবং টি-এর ফাঁকে?—জম্‌ছে ভালো খৃষ্ট-কথার খেয়া?
মুখোস্ খোলো, মুখস্থ বোল বোলো না আর টিয়াপাখীর মত
মোটা মাসহারার মোহে,—দোরোখা চং চালাবে আর কত?
বয়স গত; ক্ষ্যাপার মত কামড় দিতে এলে নকল দাঁতে?
বাঁধানো দাঁত উল্টে গিয়ে, আহা, শেষে লাগ্‌বে যে টাক্‌রাতে!
নিরীহ যে সত্যাগ্রহী—কি লাভ হ'ল তারে লাথি মেরে?
সে করেছে তোমায় ক্ষমা;
তার চোখে আজ নাও দেখে খৃষ্টেরে।

* * * *

"অক্রোধে ক্রোধ জিন্‌তে হবে,"—
সে শিক্ষা কি রইল শিকেয় তোলা,
ডিগ্রি নিয়েই ফুরিয়ে গেছে ডাগর-বুলির যা কিছু বোল্‌বোলা?
উদর-তন্ত্র উদারতা? ধর্ম্ম কেবল কথারই কাপ্তেনী?
ডঙ্কা-নাদের পিছন পিছন সভ্য নিয়ে খেল্‌ছ ছেনিমেনি?
চেয়ে দ্যাখো ক্রুশের পরে ক্ষুব্ধ কে ওই তোমার ব্যবহারে।
জীবন্তবৎ পাষাণ-মূরৎ!—হেঁটমাথা তাঁর লজ্জাতে ধিক্কারে!
কুড়ি শ' বৎসরের ক্ষত লাল হ'য়ে তাঁর উঠ্‌ছে নতুন ক'রে!
দেখ্‌ছে জগৎ—
পাথর ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়্‌ছে শোণিত ঝ'রে!
দাও ক্ষমা দাও, চোখ মেলে চাও,—
কি কাণ্ড হায় কর্‌ছ গজাল ঠুকে?
নিরীহদের নির্য্যাতনের সব ব্যথা কার বাজ্‌ছে দ্যাখো বুকে!

* * * *

কিম্বা দ্যাখার নাই প্রয়োজন, তোমরা এখন সবাই বিজিগীষু,
'জিঞ্জো' আসল ইষ্ট সবার, তার আবরণ-দেবতা মাত্র যীশু!
ডায়ার-ডোল্ জবরদস্তি,—
তাতেই দেখি আজ তোমাদের রুচি!
গোবর দম্ভ আইন গ'ড়ে নিষ্ঠুরতায় নিচ্ছ করে শুচি!
বারম্বেরই বিজয়-মালা বর্ব্বরতার দিচ্ছ গলায় তুলে!
অমানুষের কর্‌ছ পূজা, সের-মানুষ খৃষ্টদেবে ভুলে!
মরদ-মেয়ে ভুগ্‌ছ সমান হূণ-বিজয়ের বড়াই আলস্য-রোগে,
মানুষকে আর মানুষ ব'লেই চিন্‌তে যেন চাইছে না, হায়,
চোখে।
ঢাকের পিছে ট্যাম্‌টেমি প্রায় টমির ধাঁচায় ট্যাম্‌টোমিরা
আজ ঘোরে!
শয়তানেই যে হাওয়ায় হাঁটায় শূন্যে ঠোয় সে হুঁশ্ রাখে না!
নেইক খেয়াল, আত্মা বেচে জগৎ-জোড়া কিন্‌ছে সওদাগরা!
কে জানে ক'দিনের ঠিকা, ঠিকাদারের ঠ্যাকার কিন্তু ভারি!
ধিন্ধি চলে জঙ্গী চালে, কুচ ক'রে লাল কাগজ-ওলা চলে,
নাক তুলে যায় দালাল-ফোড়ে,
আজ দেখি হায় পাদ্‌রীও সেই দলে!

* * * *

যাও দলে যাও, ডঙ্কা বাজাও, অহঙ্কারের ছায়া ঘনাও,
মিছাই ব্রতের বিঘ্ন ঘটাও অন্ধকারের হুম্‌কি-ব্যবসায়ী!
আমরা তোমার চাই না শিক্ষা,
চাই না বিদ্যা হে বিদ্যা-বিক্রয়ী।
ধর্ম্ম-কথাও পণ্য যাদের তাদের পণ্য কিন্‌তে ব্যগ্র নহি
মানুষ খুঁজে ফির্‌ছি মোরা,—মানুষ হবার রাস্তা যে যাচ্ছে বেঁকে,
তিক্ত হয়ে গেছে জীবন ঘরের পরের অমানুষের তাঁবে।
ফলিয়ে দেবে মর্ত্ত্যে যেজন বুদ্ধ যীশুর স্বর্গ-সূচন বাণী,
শহীদ্-কুলের হৃদ্য-শৌর্য্য হৃদয়ে যার পেতেছে রাজাসন।
জাতিভেদের টিট্‌কারী যে পরকে শুধুই দ্যায় না নামিয়ে ছলে
জমিয়ে বুকে জিদোয়ানীয় অবর জাতিভেদের হলাহলে,—
ষোলো-আনা মানুষ হবার নিমন্ত্রণ দেবে যে সব ভুলে,—
সেই মানুষে খুঁজ্‌ছি মোরা, অহর্নিশি খুঁজ্‌ছি ব্যাকুল মনে।
নিক্তি ধ'রে কর্‌লে তোল্ ওজন সে যার ভব্‌বে পূর্ণ পাত্র
লোভের মোহের মন্ত্রণাতে ভাবের ঘরে কর্‌বে না যে চুরি
পথ চেয়ে তার সই অনাচার দুঃখ অপার অনন্ত যাতনা,
বেশ জানি,
"আজ সে যারা ক্লেশ তাদের তরেই স্বর্গীয় রাজ্য"
নিরীহ যেই ধন্য যে সেই ধৃত-ব্রত দৈবী-মশাল-ধারী,
নিঃস্ব যারা তারাই হবে বিপুল ভবে রাজ্য-অধিকারী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেশের কথা

অভাব ও রোগ—ইহা ছাড়া আমাদের দেশের কথা বড় বেশী নাই। এ-দুটি যে একদিনে দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে এমন আশা করা যায় না। তবে ইহাদের প্রতিকারে চেতন ও সচেষ্ট না হইলে আমাদের বাঁচিবার আশা ক্রমেই লোপ পাইবে। নিজেদের চেষ্টায় এবং নিজেদের ক্রমাগত আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টকে চেতন করিয়া আমাদিগকে বাঁচিবার পথ সুগম করিয়া লইতে হইবে। এখন আমাদের চাই দেশব্যাপী শিক্ষা। শিক্ষার গুণেই আমরা অভাব ও রোগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইব। প্রায় দুইশত বৎসর হইল আমরা ইংরেজের অধীন রহিয়াছি। আমাদের অর্থ তাঁদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আজ অবধি আমাদের শিক্ষার জন্য সে অর্থ যথেষ্ট ব্যয়িত হয় নাই। অথচ আর-এক সভ্য জাতির অধীনে থাকিয়া অপর দেশ শিক্ষায় কত অগ্রসর তার দৃষ্টান্ত এই—

ফিলিপাইন ও ভারতবর্ষ—লেখাপড়ার তুলনা—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হইয়াছে বিশ বছরের বেশী। কিন্তু ইহার মধ্যে ফিলিপাইনের ১০০ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৭০ জন লেখাপড়া জানে। ইংরেজ ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছেন আজ ১৩০ বৎসরের অধিক। অথচ ভারতবর্ষে ১০০ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১১ জনমাত্র লেখাপড়া জানে। ভারতে প্রতি এক হাজার নারীর মধ্যে দশজন লিখিতে পারে। অথচ ভারতবাসীরা ফিলিপাইনের লোকদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান এবং ভারতবাসীদের সভ্যতা ফিলিপাইনের অধিবাসীদের সভ্যতার চেয়ে ১০০০ বৎসরের অধিক পুরাতন।—হিন্দুস্থান।

এতদিন বেদখলকার প্রভু জাতির কাছে অভিমান অভিযোগ আবেদন নিবেদন করিয়াও আমরা বিশেষ ফল লাভ করি নাই। সে-সব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ জোরের সহিত আমাদের অর্থ আমাদের শিক্ষার জন্য এখন দাবী করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের হাতে টাকা থাকিলেও শিক্ষা-কার্য্যে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই ঘরের অর্থ বেশী খরচ করিয়া আসিতেছি—

শিক্ষার ব্যয়—"ইয়ংইণ্ডিয়া" পত্রিকায় শিক্ষার ব্যয়ের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, তাহার বহুগুণ অর্থ দেশের জনসাধারণ কর্তৃক ব্যয়িত হয়। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চশিক্ষার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ১১ শত ২৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহা নিম্নোক্ত স্থানসমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ—	৩৯২ লক্ষ
স্থানীয় ফণ্ড—	১৭৪ ,,
মিউনিসিপাল ফণ্ড—	৪৯ ,,
বেতন প্রভৃতি—	৩১৯ ,,
সাধারণ ফণ্ড—	১৯৬ ,,
মোট—	১১৩৯ লক্ষ

গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ মঞ্জুর করেন, তাহার অধিকাংশই উচ্চ বেতনে শিক্ষকদিগের বেতন বাবত খরচ হইয়া যায়।

শুধু মধ্য-শিক্ষার খরচ দেখিলে আমরা এ বিষয়টি বেশ করিয়া বুঝিতে পারিব। মধ্য-শিক্ষার জন্য মোট ৩৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহা নিম্নোক্ত উপায়ে পাওয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট কোষাগার	৯৫ লক্ষ
মিউনিসিপ্যাল লোকাল বোর্ড	২৬ ,,
বেতন প্রভৃতি	১৬৬ ,,
সাধারণ ও দাতব্য ফণ্ড	৮০ ,,
মোট	৩৬৭ লক্ষ

ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে শিক্ষা-বিভাগের অধিকাংশ ব্যয়ই জন-সাধারণ প্রত্যক্ষ ভাবেই বহন করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টও যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা আমাদেরই অর্থ। তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে আমরাই শিক্ষাবিভাগে প্রায় সমুদয় অর্থ যোগাইয়া থাকি। গবর্ণমেণ্ট যাহা সাহায্য করেন তাহা না হইলেও আমাদের শিক্ষা-বিভাগে অর্থের অনটন হয় না। আমাদের হস্তে সমগ্র দায়িত্বভার অর্পিত হইলে তখন আমাদের রুচিমত শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

—জ্যোতিঃ।

ইহা আমাদের সুমতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অর্থ মাত্র সৈনিক বিভাগে বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৫৯ ভাগ অযথা ব্যয়িত না হইয়া আমাদের শিক্ষার জন্য যাতে সু-ব্যয়িত হয় তার প্রতি আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য আমাদের পক্ষে দিন দিন যে মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। এ-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে চেতন করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আমাদের সামর্থ্য অনুসারে দেশে শিক্ষা বিস্তার ও সকল অভাব মোচন করা। যাঁরা এমনি দেশ হিতৈষী তাঁদের কাছে দেশ কৃতজ্ঞ।—

বিদ্যালয়ে দান—সৌরভ-সম্পাদক-বাবু কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক। কয়েক বৎসর হইল, তিনি স্বকীয় জননীর স্মৃতিরক্ষার্থ "ভয়দুর্গা ইনষ্টিটিউসন" নামে এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে কেদারবাবু চৌদ্দ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া বিশেষ শিক্ষানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। কেদারবাবুর আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে; প্রথম জীবনে তিনি অর্থাভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভেও সমর্থ হ'ন নাই। সুতরাং শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার এই দান যে মহানুভবতা-জ্ঞাপক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

—ঢাকাপ্রকাশ।

বিনামূল্যে চরখাদান—রাণীগঞ্জের মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা বিনামূল্যে কৃষকদিগকে চরখা ও তুলার চারা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—সম্মিলনী।

সৎকার্য্যে দান—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু ঢাকায় ওকালতী করিতেন। সম্প্রতি তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যবাবু তাঁহার পিতা রামনাথ বসুর স্মৃতিরক্ষার জন্য চব্বিশ-পরগণা জেলা-বোর্ডের হাতে পনেরো হাজার টাকা দিয়াছেন। ঐ টাকা দিয়া তাঁহার পিতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইবে।—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

হুরাতের একজন পার্সী বণিক গুজরাতে জাতীয় বিদ্যালয় খুলবার জন্য ৪০,০০০ টাকা দান করেছেন।—বিজলী।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ ছেলেদের শিক্ষার জন্য বৎসরে ১০,০০০ টাকা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের হাতে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। পূর্ব্বে তিনি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে একলাখ টাকা দিয়েছিলেন।

—বিজলী।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জনৈক মেম্বার বাবু পুলীনবিহারী দত্ত দরিদ্র বঙ্গসাহিত্যিকদিগের উন্নতির জন্য উক্ত পরিষদের হস্তে ১৫০০৲ টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

কাঙ্গালীভোজন—সিউড়ি সহরের ধনী দোকানদার শ্রীমান বসন্তকুমার দাস তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গত ১১ই মাঘ তারিখ ন্যূনাধিক তিন সহস্র কাঙ্গালীকে প্রচুর অন্ন ভোজন করাইয়াছেন ও প্রত্যেক পুরুষ কাঙ্গালীকে এক আনা ও স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাকে দুই পয়সা নগদ দিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া অন্ধ খঞ্জ এবং যাহারা পরিশ্রম করিতে অক্ষম এরূপ বিস্তর কাঙ্গালীর প্রত্যেককে একখানি করিয়া বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।—বীরভূমবাণী।

অনাথ-আশ্রমে দান—ভবানীপুর ৩১ নং কালীঘাট রোডস্থ নিখিল ভারত অনাথ আশ্রমে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমল পাঁড়ে নামক জনৈক সহৃদয় দাতা সম্প্রতি দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমলের উদ্যোগে "কটন ও বুলেন" এসোসিয়সেনের সদস্যগণের নিকট হইতেও উক্ত আশ্রমের জন্য দুই সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

কম্বল বিতরণ—স্থানীয় মুক্তার বাবু উমেশচন্দ্র বেরা অতি দরিদ্রগণে এই দারুণশীতপরিত্রাণের জন্য প্রায় ১৩০।১৩৫টি কম্বল দান করিয়াছেন।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

লর্ড সিংহের বদান্যতা।—রায়পুরের লর্ড সিংহ বেহারের গবর্ণরের গদিতে আরোহণ করিয়াই তাঁহার জন্মভূমি রায়পুরের দরিদ্র নরনারায়ণের শীতকষ্টপ্রশমনকল্পে ২০০ শত কম্বল বিতরণ করিয়াছেন। রায়পুরের দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা এবং হাইস্কুল স্থাপনের জন্য ১৫ হাজার টাকা দান ইত্যাদি অনেক সৎকার্য্যই তাঁহার জন্মভূমির প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক।—রাঢ়দীপিকা।

লক্ষ টাকা দান—বিগত কংগ্রেসের শেষ দিন মহাত্মা গান্ধী "তিলক স্বরাজ" স্মৃতিরক্ষার জন্য জনসাধারণকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান শেঠ যমুনালাল যে-সমস্ত আইন-ব্যবসায়ী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাঁহাদের সাহায্যের জন্য একলক্ষ টাকা, প্রোফেসর রামমূর্ত্তি এক হাজার টাকা এবং আরও অনেকে অনেক টাকা দান করিয়াছেন।—খুলনাবাসী।

সৎকার্য্য—বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি ই, ল্যাম্বোর্ণ আই, সি, এস্ মহোদয় রামপুরহাট নেশনাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আলোর কষ্ট দেখিয়া সেই অভাব পূরণ কল্পে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তদ্বারা দুইটি আলো খরিদ হইয়াছে। দাতা শতং জীবতু।

উক্ত নাইটস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ সাহায্য ভাণ্ডারে ও [illegible] দাতব্য ঔষধালয়ের সাহায্য কল্পে মুর্শিদাবাদ [illegible] ভগবান দাস ৫০৲ টাকা করিয়া ১০০৲ টাকা দান [illegible]। ইনি ইতিপূর্ব্বে রামপুরহাট টাউন হল স্কীমের ভাণ্ডারে [illegible] হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—রাঢ়দীপিকা।

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত মিঃ এস আর [illegible] প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

—চট্টগ্রাম দর্পণ।

সৎ অনুষ্ঠান—পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক কয়েকটি মেধাবী বালকের সমগ্র শিক্ষার ভার বহন করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে সকল ছাত্র এইরূপ সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছুক তাহারা গত বার্ষিক পরীক্ষায় কোন শ্রেণীতে কত নম্বর পাইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া কান্দি রাজ-স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট যেন আবেদন করেন।—প্রতিকার।

চরকা বিতরণ—ত্রিহুত মজঃফরপুর সাহথা গ্রামের [illegible] বাবু আউরঙ্গ বিহারী সহায়ের শ্রাদ্ধ দিনে ৫০টী দরিদ্র বিধবা [illegible] সূতা কাটিবার চরকা দান করা হইয়াছে। কার্য্যটী সমাধা হইয়াছে।

—[illegible]।

কিন্তু কেবল দানে এবং সাময়িক সৎকার্য্যে সমগ্র দেশকে জীবিত ও কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলা সম্ভব। অর্থকরী স্বাধীন শিক্ষায় আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন। ইহাতে নিজেদের বস্ত্র আমরা নিজেরা জোগাইয়া যেমন স্বাবলম্বী হইতে থাকিব, তেমনি দেশের কোটি কোটি টাকা দেশে রক্ষা করিতে সক্ষম হইব। চরকার প্রসার কার্য্যে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। চরকা এবং সূতা বয়ন কার্য্যের দ্বারা আমরা স্বাধীন উপজীবিকার উপায়ও লাভ করিব। দেশের নানা জায়গায় এ-বিষয়ে কাজ আরম্ভ হইয়াছে—

হাত-চরকা।—শ্রীযুক্ত দাশরথি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক প্রকার হাত-চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে এমন কি ১০।১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা অনায়াসে ৪০।৫০ নম্বরের সূতা তৈয়ারী করিতে পারিবে। কলটির মূল্য কেবল মাত্র আট আনা। যাঁহারা এই কল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাহা দাশরথি-বাবুর নিকট পাইবেন। হাবড়া, পোঃ মাজুয়া, রণমহল গ্রাম এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে ক্রেতাগণ এই হাত-চরকা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

—[illegible]।

শ্রীহট্টে জাতীয় বয়ন বিদ্যালয়—"শ্রীহট্টবাসী [illegible] নামে শ্রীহট্টে একটি উচ্চাঙ্গের বস্ত্রবয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত [illegible]। বিদ্যালয়ের জন্য মনোরম সুদীর্ঘ গৃহ নির্ম্মিত হইয়া [illegible]

বিক্রমপুরান্তর্গত পয়সাগাঁও একটি গণ্ডগ্রাম, [illegible]

ভদ্রলোকের উৎসাহে ও উদ্যোগে এক মাসের অধিককাল যাবৎ তথায় দুইখানি নূতন ধরণের কাপড়ের তাঁত বা কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্য চলিতেছে। ভদ্রলোকের ছেলেরাই এই কলের কর্ম্মকর্ত্তা; ইতিমধ্যেই তাঁহারা কয়েক জোড়া জাম-শাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক তাঁতে ১০ ঘণ্টাকাল বয়নকার্য্য চলিলে ১খানা ৪৪ ইঞ্চি ১০ হাত কাপড় প্রস্তুত হয়; কাপড়ের মূল্যও বাজার-দর অপেক্ষা কম পড়ে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে যদি এইরূপ তাঁতের প্রচলন হয়, তবে বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটকালে অনেক উপকার হইতে পারে।—ঢাকা-প্রকাশ।

কলিকাতা বাদুড়বাগান "বিদ্যাসাগর-বাটী"তে একটি চরকার সুতো কাটবার অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।—বিজলী।

স্কুলে সুতাকাটা শিক্ষা।—চাঁদপুর স্যাশন্যাল স্কুল সুতাকাটা শিক্ষা দিবার জন্য একটি শ্রেণী খুলিয়াছেন।—বরিশাল-হিতৈষী।

এইরূপে স্বাধীন উপজীবিকার পথ অবলম্বন করিয়া দেশের নানাবিধ মৃত শিল্পকে যাঁরা পুনরুজ্জীবিত করিতে চান তাঁদের কাছে একটি সংবাদ আছে—

পাট বঙ্গদেশের একচেটে কৃষি-সম্পদ। পৃথিবীর আর কোন দেশেই পাট উৎপন্ন হয় না। অথচ পাটের থলিয়া প্রভৃতি দ্রব্যের সকল দেশেই আবশ্যক হয়। কিন্তু এই থলিয়া প্রস্তুত করিবার মিলগুলি সমস্তই বিদেশী লোকের হাতে থাকায় কৃষকগণ পাটের উপযুক্ত মূল্য পায় না, অথচ মিলগুলি প্রতি বৎসরই মূলধনেরও দ্বিগুণ লাভ করিয়া লইতেছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশেও কৃষকগণ দীর্ঘকালস্থায়ী শুণ-চট ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। কিন্তু কলে বুনা থলিয়ার প্রচলন হওয়ায় সেরূপ হস্তশিল্প একরূপ লোপই পাইয়াছে। আমার মনে হয় ঢেঁরা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করিয়া থলিয়া প্রস্তুত করিয়া কলের সহিত প্রতিযোগিতা করা যায় না বলিয়াই দেশের একটা লাভের শিল্প লোপ পাইতেছে; নচেৎ বাস্তবিক পক্ষে হাতে থলিয়া বয়ন বিশেষ কষ্টকর শিল্প নহে এবং তজ্জন্য বিশেষ দক্ষতাও আবশ্যক করে না। একখানি কলে বুনা থলিয়া কম পক্ষে ছয় আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। প্রতি থলিয়ায় প্রায় একসের মাত্র পাট থাকে, তাহার মূল্য দুই আনা বাদ দিলেও পারিশ্রমিক স্বরূপ চারি আনা থাকে। চেষ্টা করিলে দৈনিক চারি পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া অন্ততঃ দশখানি থলিয়া একজন লোকেই বুনিতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বদেশভক্ত মহাত্মাগণ যদি পাটের দড়ি কাটার কোন হস্তচালিত যন্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রচলনের চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেশের একটি লাভজনক ও অতি সহজ-সাধ্য কুটির-শিল্প রক্ষা পায় ও দুঃস্থ কৃষক-শ্রেণীর অনেকের অন্নসংস্থান হয়।

শ্রীহরিচরণ বন্ধু।

এ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রখানির প্রতিও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—

যাঁহারা স্বাধীন ভাবে উপজীবিকার উপায় করিতে চাহেন, এবং যেরূপ যোগাযোগে তাহা কতকটুকুও সম্ভব হইতে পারে অনুসন্ধান করিতে চাহেন আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে বিশিষ্টরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বাংলা ও বাংলার বাহিরে যাঁহারা কারু-কারবার করিতে চাহেন, দেশীয় কারবারে শিক্ষার্থীরূপে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, শিল্পাদি শিক্ষা করিতে চাহেন, শিল্পী, কারিকর ইত্যাদি চাহেন, আমার সহিত পত্রব্যবহার ও সাক্ষাৎ করিলে আশা করি আমি কতকটুকু তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিব।

হরিপ্রসাদ মল্লিক।—বোলপুর, বীরভূম।

স্বাধীন উপজীবিকার ক্ষেত্রে নামিবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। এ-বিষয়ে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। গত বৎসরে বাংলা দেশে অনেক-গুলি যৌথ কোম্পানী খোলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সবগুলি বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিদেশী কোম্পানীদের একাধিপত্য দূর করিয়া নিজেদের চেষ্টায় নানা কারবারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যৌথ কোম্পানী।—গতবৎসর বঙ্গদেশে অনেকগুলি যৌথ কোম্পানী খোলা হইয়াছে। ১৯১৯ ইংরেজী সনের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১২৬৭টি যৌথ কোম্পানী চলিতেছিল, কিন্তু তৎপর একই বৎসরের মধ্যে তাহার সংখ্যা ১৭৭৪এ উঠে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন, ইহার কয়েকটি খুব লাভজনক কাজ চালাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশই ফেইল হইবে। ঐ বৎসরে এতগুলি নূতন কোম্পানী খোলার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম, ইউরোপীয় মহাসমরের ফলে কতকগুলি ব্যবসায়ীর হাতে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত খাটাইবার জন্য এইরূপ নূতন কোম্পানী খোলার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়, যুদ্ধের ফলে ব্যবসায়ীদের সম্মুখে নূতন নূতন পথ খুলিয়াছে। ঐ এক বৎসরে ২৫টি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী খুলিয়াছে। এই-সমস্ত যদি একটু বুদ্ধিমত্তার ও সাবধানতার সহিত পরিচালন করা যায় তবে নিশ্চয়ই লাভবান হইবে। ৫টি ষ্টীমার কোম্পানী খোলা হইয়াছে। এগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত এড়াইয়া যতদিন সুপ্রতিষ্ঠ না হইবে ততদিন ইহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।—জ্যোতিঃ।

স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের আরো অনেক পথ আছে। আমরা কয়েকটির উল্লেখ করিলাম। যে-সব যুবক পল্লীতে গিয়া দেশের হিতসাধন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাঁদের কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগ দিতে হইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর স্বাধীন পথ তাঁদের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

হলুদ চাষ—হলুদের চাষ এক লাভজনক কাজ। ভারতবর্ষের সকল গৃহস্থেরই ইহার আবশ্যক এবং ইহা বিদেশেও বিস্তর চালান হইয়া থাকে। হলুদ চাষের জন্য—দো আঁশ মাটী এবং ২।৩ বৎসরের পতিত জমীই ভাল। নদীর ধারে বন্যার জলে পলি-পড়া মাটীতেও হলুদের খুব ভাল চাষ হইতে পারে।

কার্ত্তিক মাসে জমীতে প্রায় ১ হাত গভীর করিয়া কোপাইয়া রাখিতে হয়। ফাল্গুন মাসে যখন বৃষ্টি হয়, তখন ঐ মাটীর বড় বড় চাঙড়গুলি গলিয়া চাপ হইয়া থাকে। তখন কোদাল বা টাংনা দ্বারা কোপাইয়া ছোট ছোট ঢিলের মত করিয়া ফেলিতে হয়, এবং এই জমীতে পচা গোবরের সার দিতে হয়। খোল এবং হাড়ের গুঁড়াও ভাল। বৈশাখ মাসে আবার কোপাইয়া দিতে হয় এবং মাটী বেশ ধূলার মত করিতে পারিলেই চাষের উপযুক্ত হয়। তাহার পর পূর্ব্ব

পশ্চিম দিকে লম্বা এবং দুই হাত ব্যবধানে এক-একটি সারি বড় ভেলি বান্ধিয়া দিতে হয়। ভেলিগুলি উচ্চতায় এক হাত বা তিন পোয়া আন্দাজ হইবে এবং আধ হাত বা তিন পোয়া ব্যবধানে বীজগুলি [illegible]তিয়া দিতে হইবে।

[illegible]হলুদের বীজ হয় না, হলুদকে দুই ভাগে চিরিলে দুই দিকেই যেন [illegible] থাকিতে পারে, এইরূপ হিসাব করিয়া চিরিয়া পূর্ব্বকথিত সারের [illegible] দিয়া বা কোন কাঠের ফোঁড় দ্বারা খুঁড়িয়া চোকগুলি [illegible]রাখিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। গর্ত্তগুলি যেন ৩।৪ আঙ্গুলের [illegible]া হয়।

[illegible]হলুদের গাছ বাহির হওয়ার পর হইতে নিড়াইতে আরম্ভ করিবে, যেন ঘাস না জন্মে। বৃষ্টি হইয়া গেলে কদাচ হলুদ-ক্ষেতে নামিবে না। পায়ের চাপে মাটী শক্ত হইয়া যাইবে—হলুদ ভাল হইবে না। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জল সেচন করিলে, আর কিছুই করিতে হইবে না। মাঘ মাসে হলুদ উপ্‌ড়াইবার সময়। যখন ভিতরে হলুদ থাকিবে তখন গাছগুলির পাতাও পাকিয়া শুকাইতে থাকিবে। তখন কেহ কেহ বলেন, আগুন ধরাইয়া দিয়া গাছ পুড়াইয়া ফেলিবে এবং ইহা দ্বারা জমীর সার হইবে। হলুদ তুলিয়া লইয়া সেই জমিতে ধান বুনিলে প্রায় দ্বিগুণ ধান হইতে দেখা যায়।

হলুদ ক্ষেত হইতে আনিয়া সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। শুকাইবার সময় প্রত্যহ মাটীতে ফেলিয়া দলিতে হয়। ইহাতে হলুদ সুশ্রী এবং দানাদার হয়।

কোন কোন জেলায় জমিতে হলুদ-গাছ পোড়ায় না—গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া ঘরে সিদ্ধ করে। ছাইগুলিতে ক্ষার হয়, তাহা দ্বারা কাপড় কাচে। এই পদ্ধতিই ভাল, জমিতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইলে মাটী উত্তপ্ত হইয়া ভিতরের হলুদ সিদ্ধ হইয়া হলুদের রং খারাপ হইয়া যাইতে পারে।

অনেক স্থলে কৃষকেরা ইক্ষুক্ষেত্রে ইক্ষুর সঙ্গেই হলুদ চাষ করিয়া থাকে। সুতরাং হলুদ চাষের জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় হয় না।

বৈশাখে জ্যৈষ্ঠিতে হলুদ রোও।
দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি
ভাদ্দরে নিড়ায়ে করিবে বাঁটী।
অন্যথা নিয়মে পুতিলে হল্‌দী,
পৃথিবী বলেন তাতে কি আর ফল্‌দি॥

বাস্তবিক হলুদ চাষের ইহাই মূলসূত্র।

লাভালাভের হিসাব—

প্রতি বিঘার হলুদের বীজ খরিদ ২৷৷০ টাকা হিসাবে প্রায় ৮ মণ বীজ	২০৲
এক বিঘা জমির খাজনা	২৲
জমির খরচা খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ২৲ হিঃ ৫ বারে	১০৲
মাটী তোলা দুই বারে	২৲
হলুদ তোলাই খরচ	২৲
জল সেচনের খরচ	৪৲
মোট—	৪০৲

প্রত্যেক বিঘায় খুব কম ধরিলেও ১০০/ মণ হলুদ জন্মে, প্রতি মণ ৫৲ হিঃ ৫০০৲

বাদ খরচ—	৪০৲
	৪৬০৲

আরও যদি এই ৬০৲ টাকাও বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে বিঘা প্রতি ৪০০৲ টাকা লাভ হয়। ইহা অপেক্ষা লাভের ব্যবসা আর কি আছে?

আদার চাষ—আদার চাষ ঠিক হলুদ চাষের ন্যায়, বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। কেবল জমী দো-আঁশ হওয়া আবশ্যক, যে জমীতে বর্ষার জল জমে, সে জমীতে আদার চাষ হয় না, কারণ আদা পচিয়া যায়। মাটীর পাট ঠিক হলুদ চাষের মত; বিশেষ কথা, আষাঢ় মাসে যখন আদার গাছগুলি একটু শক্ত হয়, সেই সময় ঐ গাছের গোড়া হইতে কৌশলে বীজ আদাটি ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়া মাটী চাপা দিতে হয়; আশ্বিন মাসে পুনরায় আর-একবার গোড়ায় মাটী দিবে, নচেৎ আদা বাহির হইয়া পড়ে। পৌষ মাসে যদি বৃষ্টি না হয়, তখন জমীতে একবার জলসেচন আবশ্যক। ফাল্গুন মাসে আদা তুলিবার সময়। সেই সময় গাছগুলিও শুকাইয়া যায়। হলুদের মত রৌদ্রে দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহা শুকাইয়া বা পচিয়া যায়। সেই জন্য আদা তুলিয়া উচ্চ স্থানে রাখিয়া দিবে। প্রতি বিঘায় আদা ১০০ মণ জন্মে, বরং বেশীও হইতে দেখা যায়। ইহার শুক্‌তি বাদ নাই। আদা শুকাইলে শুঁঠ হয়, তাহার দাম বেশী।

আদা চাষের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দিয়া দেখাইতেছি—ইহা একটি লাভজনক চাষ।

প্রতি বিঘা জমীর খাজনা ২৲ হিঃ ২৲	
জমীর খোঁড়াই ও পাট করিতে ৫ বারে ২৲ হিঃ	১০৲
বীজ খরিদ, ৮ মণ বীজ ২৷৷০ হিঃ	২০৲
মাটি তোলা দুই বারে ২৲ হিঃ	৪৲
আদা তোলাই খরচ ২৲ হিঃ	২৲
জল সেচাই ২৲ হিঃ	২৲
আদা ভাঙ্গিয়া লইবার খরচ ২৲ হিঃ	২৲
মোট	৪০৲
১০০ মণ আদা, মণ ৫৲ হিঃ	৫০০৲
বাদ খরচ	৭০৲

সকলেই জানেন কলিকাতার বাজারে প্রতি সের আদ ৶০ হইতে ।০ সের বিক্রয় হয়, সে হিসাবে ৭৷৷০ টাকা হইতে ১০৲ মণ হয়।

যদি ১০০ মণ আদা ৬৲ হিসাবেও খুচরা বিক্রয় হয় তাহা হইলে ৬০০৲ টাকার আদায় পাওয়া যায়; খরচ ১০০৲ টাকা ধরিলেও ৫০০৲ টাকা লাভ হয়। দুই বিঘা জমি আদার চাষ করিলে আর অপরের গোলামী করার আবশ্যক হয় না।

পেঁয়াজ চাষ—পেঁয়াজের চাষ একটা লাভজনক ব্যবসায়। পেঁয়াজ আবার বৎসরে দুইবার জন্মে। পেঁয়াজের দুই প্রকার নামও সেই জন্য আছে। ১ম ভাতি পেঁয়াজ, ২য় কালী পেঁয়াজ। বৈশাখ মাসে ইহার চাষ আরম্ভ। জমীটিকে বেশ চাষ দিয়া ইহাতে ছাইয়ের ও গোবরের সার দিতে হয়। এই জমীর পাশে পাশে জোয়ান মউরি খুপি দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাতি পেঁয়াজের চাষ করিতে হয়। ভাদ্র মাসে এই পেঁয়াজ পাকিয়া থাকে, তখন উপ্‌ড়াইয়া লইতে হয়। কালী পেঁয়াজ ভাদ্র মাসে বসাইতে হয়, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে গাছের উপর শীষ হইয়া ফুল হইতে থাকে। উহাই পেঁয়াজ-কলি নামে বিখ্যাত। গাছ পাকিয়া নতপ্রায় হইলেই বুঝিতে হইবে যে পেঁয়াজ পাকিয়াছে, তখন তুলিতে হয়।

ইহার আয় ব্যয়—

এক বিঘা জমীর খাজনা ২৲ হিঃ	২৲
৫ বার চাষে ২৲ হিঃ	১০৲
সার প্রভৃতির খরচ মায় বহনের জল সেচন,	
পেঁয়াজ তোলাই ৫৲ ৷৷০ টাকা হিঃ	২৷৷০
অন্যান্য খরচ বাবদ	২৷৷০
মোট খরচ	২০৲
শাক বিক্রয়ের আয়	৫৲
বিঘায় প্রায় ৫০ মণ পেঁয়াজ হয় তাহার প্রতি মণ ৩৲ হিঃ	১৫০৲
মোট	১৭৫৲
বাদ খরচ	২০৲
লাভ	১৫৫৲

বৎসরে দুইবারে ১৩৫×২=২৭০৲ টাকা বা প্রায় ৩০০৲ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

কিন্তু কলি পেঁয়াজ-গাছ সমেত বাজারে রাশি রাশি বিক্রয় হয়, সে হিসাবে অনেক বেশী লাভ হওয়া উচিত। আমরা মোটামুটি হিসাবে দেখিলাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক লাভ হইতে দেখা গিয়াছে। পেঁয়াজ-রসুনের চাষের সমস্ত প্রক্রিয়া একই রূপে হয়, কিন্তু রসুন আরও বেশী দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং ইহা চাষ করিয়াও বেশ লাভ হয়।—সম্মিলনী।

কৃষির মত লাভবান ও অল্পব্যয়সাধ্য জীবিকার ক্ষেত্র অল্পই আছে। তাই ইহার প্রসারের জন্য আয়োজনের সংবাদে আনন্দই হইয়া থাকে।—

দুর্গাপুরে কৃষিশিক্ষা—চট্টগ্রামের ভরদ্বাজ পোষ্টাফিসের অন্তর্গত দুর্গাপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে একটি কৃষি-বিভাগ খোলা হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজী স্কুলে ২য় কিম্বা ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে। —প্রতিকার।

অর্থকরী শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন শিক্ষার উচ্চ আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি। মানব মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবল অর্থনীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতির অনুশীলনে মানুষ যথার্থ মানুষ হইয়া উঠে। এইসবের উন্নতিবিধানের জন্য আজকাল বাংলা দেশে প্রচুর চেষ্টা চলিতেছে। সাহিত্যে উৎসাহ সম্বন্ধে একটি সংবাদও আছে—

বীণাপাণি রৌপ্য পদক—আগামী ৩১শে চৈত্র পাবনা কিশোরী-মোহন ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরীতে সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে লাইব্রেরীর অন্যতম শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এ, মহাশয় বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখককে দুইটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধের বিষয় :—(ক) লাইব্রেরী ও তাহার উপকারিতা, (খ) স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা। এই দুইটি প্রবন্ধ ১৫ই চৈত্রের মধ্যে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, বি এল মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীভূধরেন্দ্রভূষণ রায়।

আবার যাঁরা প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে নিযুক্ত তাঁদের কাছে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রয়োজনীয় বলিয়াই হইবে—

মন্দির বাহির।—নবদ্বীপে কূপ খনন করিতে গিয়া মাটীর নীচে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির বাহির হইয়াছে।

—বীরভূমবাসী।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতিতে যেমন উন্নতিসাধনের চেষ্টা চলিতেছে তেমনি আবার মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষময় দেশাত্মবোধ প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। "অ-সহযোগ" আন্দোলনের ফলে আমরা দেশের সেবার ক্ষেত্রে অনেক দানবীর ও কর্ম্মবীরকে লাভ করিতেছি। তাঁদের ত্যাগে দেশ আজ গৌরবান্বিত।—

অসাধারণ স্বার্থত্যাগ। স্বদেশপ্রাণ মাননীয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় প্রায় বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারেষ্টারী ত্যাগ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য, ভোগ, বিলাস মাতৃচরণে বলি দেওয়ার পথ চিত্তরঞ্জনই প্রথম প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে।

—প্রতিকার।

চাকরী ও বৃত্তি ত্যাগ। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম, এ, পি, এইচ, ডি মহাশয় কলিকাতায় টাকশালে ধাতু পরীক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি অনুসারে তিনি তাঁহার মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনের কাজে ইস্তফা দিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অতুলচন্দ্র দে মাসিক ৩৭ টাকা বৃত্তি সহ কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন।

—প্রতিকার।

সহযোগিতা-বর্জ্জন—এলাহাবাদ হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ও এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু সহযোগিতা-বর্জ্জন জন্যই বহু লাভজনক ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাটনা হাই-কোর্টের সর্ব্বপ্রধান উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওকালতী ব্যবসা ছাড়িয়া সেখানকার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস (সি, আর, দাস) মহাশয় ব্যারিষ্টারি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই ব্যবসা দ্বারা বার্ষিক তিন লক্ষ বা ততোধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। নোয়াখালীর প্রবীণ ও যশস্বী উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা "চারুমিহির"-মুখে অবগত হইলাম, ময়মনসিংহ বারের সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী মহাশয় সহযোগিতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত প্রস্তাব অনুসারে ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছেন। —ঢাকা গেজেট।

ইঁহারা ছাড়াও দেশের আরো কত লোকে যে আর্থিক উন্নতি ও সুখ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া দেশ-সেবার জন্য ত্যাগের আদর্শ দেখাইতেছেন তার ইয়ত্তা নাই। কত শত

ছাত্র আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখোন্নতি বিসর্জ্জন দিয়া সেবার ক্ষেত্রে নামিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। সকলের নাম পাওয়া যায় না। এরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি। অজ্ঞাত এবং জ্ঞাত সকলেই দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছেন।

ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত সুধাকুমার সোম, উকিল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, উকিল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সান্যাল "অ-সহযোগ"-নীতি অনুসারে ওকালতি ত্যাগ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ওঙ্গোলের আইনব্যবসায়ীরা আইনব্যবসায় ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

"অ-সহযোগ" নীতির ফলে কেবল যে দেশাত্মবোধ ও দেশসেবার ভাব জাগিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনুপ্রেরণায় এবং সর্ব্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সাধুতার মাহাত্ম্যে দেশের নিরক্ষর অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরাও কদাচার ও কু-অভ্যাস হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতেছে। ইহা আনন্দ ও গৌরবের কথা। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণের মধ্যে মদ ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এমন কি আমেরিকায় আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা হইতেছে। প্রত্যেক সভ্য দেশের গভর্ণমেণ্টেরই উচিত যে জনসাধারণকে নেশার কু-ফল হইতে মুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা। আমাদের দেশে সাধারণ লোকেরা মদত্যাগ করায়, শুনা যাইতেছে যে, পুলিশ নাকি জায়গায় জায়গায় ঢ্যাঁড়া পিটাইয়া সাধারণকে মদ খাইতেই হইবে এইরূপ ঘোষণা করিতেছে। এ-কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা বর্ব্বরোচিত কাজ আর কিছু নাই। অর্থের লোভে লোককে নেশায় মাতাইয়া তিল তিল করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়ার মত নির্দ্দয় এবং অসভ্যোচিত কাজ আর নাই। গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে গুজবটি মিথ্যা হইলে আমরা সুখী হইব। আবগারি বিভাগ গবর্ণমেণ্টের একটি লজ্জাজনক-পাপের-প্রশ্রয় দেওয়া আয়ের ক্ষেত্র। ইহার সর্ব্বনেশে আয়ের একটু নমুনা এই—

মদের আমদানী।—বঙ্গদেশে ১৯১৮।১৯ সনে ১২৮৩০১৯ গ্যালন এবং ১৯১৯।২০ সনে ১৩৪১৬৯১ গ্যালন বিদেশী মদের আমদানী হইয়াছে, এবং ঐ-সকলের লাইসেন্স-ফী হইতে ৩০১৮৬৯ টাকা ও শুল্ক হইতে ৮৮২৪৫৬ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯১৮।১৯ সন হইতে ১৯১৯।২০ সনে মদের আমদানী প্রায় চারি লক্ষ গ্যালন অধিক; ইহা হইতেই দেশের অবস্থা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

—ঢাকাপ্রকাশ।

মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ, তাঁর প্ররোচনায় সাধারণ লোকে নেশার বিষম ব্যাধি পরিহার করিতে যত্নবান হইতেছে—

আরা জেলার ধোপা, ডোম, মেথর প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ছাড়িয়া দিয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টিটাগড় প্রভৃতি কয়েকটি কলকারখানাতে যে-সকল হিন্দুস্থানী কুলি বাস করে তাহারাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, যাহারা মদ ও তাড়ির দোকানে যাইবে তাহাদিগকে মেথরের ঝাঁটা দ্বারা প্রহার করিবে।

—বাঁকুড়া-দর্পণ ও প্রতি[illegible]

মদের ব্যবসা।—পত্রান্তরে প্রকাশ যে, কনস্তান্তিনোপলের [illegible] উল-ইসলাম ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন মুসলমান মদের ব্যবসায় করিতে পারিবে না। মুসলমান রাজ্যে মুসলমান ধর্ম্মবিধি অনুসারে যে উক্তবিধ আদেশ জারি হইয়াছে, ইহাই সুখের বিষয়।

—মোস্‌লেম্‌হিতৈষী।

মদের দোকান বন্ধ।—পত্রান্তরে প্রকাশ, ২৪ পরগণার কল অঞ্চলের অধিকাংশ এদেশীয় মদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কলের মজুরদের মদ্যপান পরিত্যাগই ইহার কারণ।

—ঢাকাপ্রকাশ

ইহা ছাড়া টিটাগড়, রিশ্‌ড়া, শ্রীরামপুর ও বরানগরে কয়েকটি পাটকলের লোকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে তারা আর মদ খাইবে না। দিনাজপুরে মিউনিসিপালিটির মেথরেরা ভগবানের ও মহাত্মা গান্ধীর নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে তারাও আর মদ ছুঁইবে না। মদ-পানের কুফল বুঝিয়া দেশের নানা শ্রেণীর লোকদের এই যে মদত্যাগ ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের কারণ।

এত কালের টেম্‌পারেন্‌স্ এসোসিয়েশনের চেষ্টায় যে কার্য্য সাধিত হয় নাই সে কার্য্য আজ যে একটি নাম লোকের চরিত্রের প্রভাবে এত শীঘ্র সম্পন্ন হইল ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"অ-সহযোগ"-নীতির আর-একটি সুফল এই যে, ইহার প্রভাবে দেশের অত্যাচরিত লোকে অত্যাচারীর কঠোর তার প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইয়া উঠিতেছে। রায়বেরিলিতে কৃষকেরা জমীদারের অত্যাচারে অসহিষ্ণু ও অতিষ্ঠ হইয়া প্রতিরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। এসব আশার কথা। কিন্তু অত্যাচারে প্রতিরোধ করিতে পারা অত্যাচার করা অত্যন্ত অন্যায়।

গ্রাম্য অসহযোগিতা।—ময়মনসিংহ জেলার ইটনা নামক গ্রামের কৃষকগণ গ্রামের সুদখোরদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা ঘোষণা করিয়াছে। কৃষকগণ চায় মহাজনদিগের নিকট কবুল করাইয়া লইতে যে তাঁহারা অতঃপর বর্ত্তমান অপেক্ষা কম হারে সুদ লইবেন এবং জমির ফসল ভোগ করিবার সর্ত্তে কোন জমি বন্ধক রাখিবেন না। তাহা না হইলে তাহারা বলিয়াছে, তাহারা আর মহাজনদের জমি ভাগে চষিবে না বা তাঁহাদের আবশ্যক-মত মজুর খাটিবে না।

—নবসঙ্ঘ ও বীরভূমবাসী।

ইহাই চাই। এ পথে বাধা বিস্তর। কিন্তু আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলে সব বাধাই বিদূরিত হইবে। অনেক ছাত্র কাগজ বিক্রয় প্রভৃতি কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অছিলায় পুলিশ তাঁদের পিছনে লাগিতেছে। তার দুই একটি দৃষ্টান্ত কাগজে বাহির হইয়াছে। এ-সব বাস্তবিকই অন্যায় ও দুঃখের কারণ। তথাপি আত্মার বলে অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিতে হইবে—কর্ত্তব্যপথ হইতে নিবৃত্ত হওয়া কিছুতেই নয়।

আবার সামাজিক অত্যাচারীর প্রতিও 'তথাকথিত' অবজ্ঞাত জাতিরা যে আজ প্রতিরোধোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে নিঃসন্দেহ শুভ লক্ষণ। সমাজের অস্পৃশ্য ও হেয় লোকদের উন্নত করিতে না পারিলে যে স্বরাজ লাভ আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত, মহাত্মা গান্ধীর এ-কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সমাজে আমাদের আগে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তবেই রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ আসা সম্ভব ও সঙ্গত হইবে। সেইজন্য অবজ্ঞাত জাতিদের উন্নতির জন্য আন্দোলন পরম আনন্দের বিষয়।—

অস্পৃশ্যের সঙ্কল্প।—কচ্ছ অস্পৃশ্যগণ সম্মিলিত হইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ তাঁহাদের স্পর্শশুদ্ধি স্বীকার না করিলে তাঁহারা উচ্চবর্ণদিগের সহিত সকলপ্রকার সহযোগিতা বর্জ্জন করিবেন। বহুদূরস্থিত কচ্ছ প্রদেশ হইতে আমরা অস্পৃশ্যদিগের সেই সঙ্কল্প দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। উচ্চবর্ণের সাধুগণ, পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হউন।

—নবসঙ্ঘ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

শিরাজ্-ই-হিন্দ্

ইরাণ দেশের শিরাজ এ নয়, হিন্দ্ মুলুকের এই শি[illegible]
শর্কী-সৈয়দ-সুল্‌তানেদের স্মরণ-সাধন জড়োয়া তাজ
অল্-গজলির মীর-জাওলির গজল্-গানের উৎস এই,
যে গান শুনে ঘুম্‌তী নদী ঘুর্‌ছে বিভোল্, বিরাম নেই!
ফির্‌ছে বিবশ স্বপ্নাবেশে স্বর খুঁজে কার ফুলবনে,
বেল-চামেলির ক্ষেতগুলিতে কড়া কেটে আন্‌মনে!
কবির মতন কৃষাণ হেথায় কেবল ফুলের চাষ করে!
ফুলের ফসল ক্ষেত-ভরা!—লোক ভোম্‌রা হয়ে বাস করে।
নিখিল কবির রাজধানী এ, এই নগরী সুন্দরী,
কাজ্‌রী সুরে গুজ্‌রী বাজে এর ছুটি পায় গুঞ্জরি'!
হাজার-গুণীর-চুনীর নূপুর টুক্‌টুকে পায় রয় মিশে,
জৌন্‌পুরী তোড়ির তোড়া বাজায় হাজার মজ্‌লিশে!
কেউ দেছে নাম 'যবনপুরী', কেউ বা 'জমদগ্নিপুর',
কয় কবি 'যৌবনপুরী' এ,—গুলাব-গজল্‌ময় মধুর!

* * * *

লাল শিরাজীর স্বপ্ন-ঘেরা শিরাজ এ হিন্দুস্থানে,
রাজসদনে কুর্শী সোনার মিল্‌ত কবির এইখানে।
গুণীর আসন কায়েম ছিল সুল্‌তানেরি সাম্‌নেতে,
কাব্যে-সরস খিল-জমী দিল্ মিল্‌ত যাদের লাল ক্ষেতে!
দর্পে যারা দিল্লী দখল কর্‌তে যেত দুই বেলা,
গুল্-চামেলির চাষ তাদেরি, পিউ-কাঁহা'দের এই মেলা
বসিয়ে তারা বিদায় নেছে জুটিয়ে কোকিল বুল্‌বুলে।
তাদের সৃজন হিন্দে শিরাজ দেউল ডাঙা এই ধূলে!
তাদের লীলা শিল্প-শিলা ছড়িয়ে সে আজ শিথিল বেশ
চেহেল্-সাতুন্ প্রাসাদ তাদের মিটটিনিতে স্বপ্নশেষ!
আজ সে ধূলায় কাল্‌কে যারে ঢক্কা তূরী জয় দিলে,
আজ্‌কে চাষা বাঁধ্‌ছে বাসা লাল দরজার মঞ্জিলে।
দিল্লীপতির খাজ্‌না যারা কর্‌ত দখল মাঝপথে,—
কোথায় তারা? সংজ্ঞাহারা পথের ধূলায় রাজপথে।

* * * *

কোথায় ফিরোজ? কোথায় জাফর? কোথায় কুমার করন্-ফুল?
মামুদ শাহের রাজিয়া কোথা? কোথায় সে তার রূপ অতুল?

কোথায় রাণী মাহা-জাহান ? কোথায় বা তার উচ্চাশা ?
লোদির লণ্ডভ হুশেন্ কোথা ? কোন্ ধূলিতে তার বাসা ?
কই সে খোজা, হাজার হাতী করলে যে বশ অঙ্কুশে,—
[redacted] চম্‌কে দেছে নপুংসকের পৌরুষে।
[redacted] ভথন ভ্রাতৃঘাতী—কোথায় হিসাব চুকিয়েছে ?
[redacted] য়ায় সে যা ছেলের তূণের তীরফলা যে লুকিয়েছে ?
[redacted] সত্ত্বেও কবিতা
[redacted] হাদের যোদ্ধারা কই ? কই বা সে-সব হিন্দু বীর,—
লর্ডি কর্ণেটের যুদ্ধে যারা লুটিয়ে দিল লক্ষ শির।
কোথায় বা সে হিন্দু দেশে আম্‌রী চেরাগ জ্বাল্‌লে যে,
কোট্-কেরলে নদীর জলে রক্তধারা ঢাল্‌লে যে ?
মৌখরি আর কনৌজিয়ার করলে কীর্ত্তি লোপ যারা,—
ভজনশালার ধাপ্ গড়েছে বিগ্রহে যে কই তারা ?
প্রতীক-পূজার সোপান বেয়ে পুজ্‌তে পরমেষ্টিরে
উঠ্‌ছে মানুষ বুক দে' হেঁটে কঠোর শিলায় বুক চিরে ;
'পায় দলে তায় ওঠ রে তোরা'—বল্‌লে যারা চাক পিটে,—
ধর্ম্মকথার মর্ম্ম গেল বুঝিয়ে দিতে মার্‌পিটে,—
কই সে গাজী কোথায় আজি ? কাফেরগুলো টল্‌ল না !
ধমক দিয়ে ধর্ম্ম প্রচার ?—গল্‌ল না মন গল্‌ল না।
অটল-দেবীর ভাঙ্‌ল দেউল পূজা অটল রইল তাঁর ;
সত্যে দিল ব্যর্থ করে প্রচারকের অহঙ্কার।

* * * *

দেউল ভেঙে লাঠির জোরে গড়্‌লে কে গো মস্‌জিদে ?
বিমুখ হ'ল বিশ্বমানব, মিশ্‌ল যে আফ্‌শোষ জিদে।
সত্য সে বীজ-শস্য ছিল, ফল্‌ত সোনার ফল তাতে,
পরশ-পাথর ব্যর্থ হল জোর-জবরীর ইস্পাতে।
কাড়াকাড়ির নাকাড়াতেই পড়্‌ল কাঠি বারম্বার,
সত্য গেল ব্যর্থ হয়ে, বিপুল হল দম্ভভার।
শড়্‌কী-খাঁড়ার ঝন্‌ঝনাতে ঝঞ্ঝা মাতে ভূত-বাতাস,
এই ইতিহাস প্রলয়-বিলাস মহাকালের অট্টহাস।
হানাহানির এই কাহিনী, এই ইতিহাস দুনিয়াটার ;—
লোহার কাঁটায় বুক বেঁধে হায় ছোটায় নাহক্ রক্তধার।
আঁতের কথা বল্‌তে গিয়েও হঠাৎ কেমন দাঁত দ্যাখায়,
ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক ক'রে ইস্পাতে ইস্পাত ঠেকায়।
নাচেন রণচণ্ডী মাথায়, মগজ-ভরা জিঘাংসা,
কামান দিয়ে মাংস থুড়ে ধর্ম্মমতের মীমাংসা।

শকুনগুলো ফুল্‌ছে ফলে তরুণ শবের বুক কুরে,
মুণ্ড-লগন মজ্জা-মেরুর কাবাব জোগায় কুক্কুরে।

* * *

ক্রোধের মদের মাতাল মানুষ শাস্ত্র শস্ত্র এক করে।
বুদ্ধিবিচার পঙ্কে পুঁতে ছয় রিপুতে জুৎ ধরে।
লোভের হানায় বান ডেকে যায়, দিগ্‌গজেদের দিক ভোলায়,
অনেক খালেদ শাস্ত্র দ্যাখান্ ঢাক্‌তে নিজের লুব্ধতায়।
সিংহাসনের সিংহ সেজে সহজ মানুষ হয় বাঁকা,
মুসলমানের মস্‌জিদে তাই মুসলমানের তোপ দাগা।

* * *

রুক্ষ হাওয়ায় কর্কশতায় উঠ্‌ল না মন উঠ্‌ল না,
গোলাপ-কাঁটার শুক্‌নো বেড়ায় গুল্‌শিরাজী ফুট্‌ল না।
বাজ্‌পাখী সে যতই চ্যাচাক আস্‌বে না কো বসন্ত,
বুল্‌বুলি সে ডাক্‌ছে কোথায়, চল্ কহি তাই তদন্ত।
বন্‌রাণীকে পুষ্পেরি তাজ পরায় যে তার তত্ত্ব নে,
তারাই পটু সত্যি-অটুট ভাবের শিরাজ-পত্তনে।
ঝড়ের ফাঁকে উজল আঁখে এই ধরাকে দেখ্‌ছে কে,
পাপিয়া ডাকে কার ফাগুনের ক্ষণন-রবে কান রেখে ?
নিমের বনে আমের বনে মন্দ মধুর বয় হাওয়া,
অমূর্ত্ত রস জাগায় হরষ মূর্ত্তি ধোরে কার গাওয়া ?
সঙ্গীতে কার ঢেউ ওঠে রে নিথর নিতল জ্যোৎস্নাতে,
পুলক মিলায় কোকিল-শামা বোস্তানী-বুল্‌বুল সাথে।
শান্ত-ছবি দীন সে কবি, সেই গরীবের ইঙ্গিতে,
সুফির শিরাজ করবে বিরাজ বেদাস্তেরি এই ভিতে।
আদর্শেরি দর্শনে যে ধন্য হল দুনিয়াতে,
স্পর্শ পেলে বুদ্ধ হ'ত বুদ্বুদেরি বুনিয়াদে ;—
ভুলিয়ে তারাই দ্যায় ব্যবধান, দ্যায় ভুলিয়ে দেশকালে,
হিন্দে শিরাজ হয়নি গড়া, গড়্‌বে তারাই শেষকালে।
আদ্‌রা শুধু আধটা দেখি ঘুম্‌তী-নদীর তীর ঘুরে,
পূর্ণ দ্যাখার পৌর্ণমাসী,—আশায় তারি মন ঝুরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

ভগবদ্গীতার সমালোচনা—৺পরমহংস সোঽহং স্বামী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁতিবাজার, ঢাকা। পৃঃ ২৯৪; মূল্য ২৲।

গ্রন্থের প্রথমেই "উপক্রম"। ইহার পর জগত্তত্ত্ব; জীবেশ্বর তত্ত্ব; তদাদেশ, অহঙ্কারাদেশ ও আত্মাদেশ বাক্য; বিশ্বরূপ নিষ্কামকর্ম্ম, কর্ম্মভক্তি যোগজ্ঞান, গুণত্রয় বিভাগ, যুগাবতার, বর্ণবিভাগ, মিথ্যাচার, মিথ্যাচার সন্ন্যাসযোগ প্রভৃতি বিষয় লইয়া গীতার সমালোচনা করা হইয়াছে। উপসংহারে (পৃঃ ২৭৩—২৯৪) গ্রন্থকার সংক্ষেপে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের মত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। এই শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী গীতাকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিলে শঙ্করের পক্ষেও গীতার মত গ্রহণ করা অসম্ভব; কারণ উভয়ের ভিত্তি এক নহে। শঙ্কর গীতার মত গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া। সোঽহং স্বামী নির্ভীক ভাবে গীতার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক যুক্তি অতি সারবতী। কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে যে ভাবে উপহাস ও আক্রমণ করিয়াছেন এবং শঙ্করপ্রমুখ ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণকে যে-প্রকার তুচ্ছভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে এ-গ্রন্থ ভদ্রসমাজে আদরণীয় হইবে কি না সন্দেহ। গম্ভীর বিষয়ে বিদ্রূপাদির অবতারণা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এইজন্য এই গ্রন্থের গৌরব অত্যন্ত অল্প হইয়াছে। লেখকের সিদ্ধান্ত এই—"ইহা (অর্থাৎ গীতা) বিবেক-বৈরাগ্য সম্পন্ন মুমুক্ষুর প্রীতিকর নহে এবং ত্রিতাপ-সন্তপ্ত জীবেরও শান্তিপ্রদ নহে। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বা অবতারত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক সর্ব্ব সম্প্রদায়ে নরপূজা প্রচলন করাই গীতা গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ বর্ণনা-কৌশলে এবং অপূর্ব্ব বাক্যচাতুর্য্যে অভিভূত অজ্ঞ সমাজে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্যক্ সংসাধিত হইয়াছে।"

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যাসংগ্রহ,—প্রথম খণ্ড। কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাসগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান পোঃ বেজগাঁও, ঢাকা গ্রন্থকারের নিকট। রয়েল ৮ পেজী ৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির যুগে আলোচনার সুবিধার জন্য মহর্ষিগণ তাহাকে ৮ ভাগে বিভক্ত করেন, এবং তখন তাহার এক এক ভাগ এক এক সম্প্রদায়ের দ্বারা আলোচিত হইত। আজকাল যেমন ডাক্তার দাস ধাত্রীবিদ্যায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত, সেইরূপ প্রাচীনকালেও কৌমারভৃত্যতন্ত্রে (Midwifery) পার্ব্বতক, জীবক, বল্লক প্রভৃতি অসাধারণ ব্যক্তির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কৃত পৃথক্ পৃথক্ তন্ত্রেরও অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। কালক্রমে, সেইসব বিশিষ্ট তন্ত্র বিলুপ্ত হইলে, সর্ব্ব তন্ত্রের সংষ্টি স্বরূপ বর্ত্তমান প্রচলিত সংহিতা কয়খানি প্রস্তুত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে উক্ত সংহিতা গ্রন্থে এক-একটি বিষয় এতই বিক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে তাহা একত্র সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আলোচ্য গ্রন্থের সংগ্রহকর্ত্তা এইরূপ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত বচনগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং প্রমাণ স্বরূপ মূল সংস্কৃতগুলি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই খণ্ডে গর্ভোৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা হইতে শিশু পালন পর্য্যন্ত স্থূল স্থূল নিয়মগুলি আনুপূর্ব্বিক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ আমাদের দেশ কাল, সত্ত্ব, সাত্ম্য, প্রকৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার যে নিয়মগুলি প্রণয়ন করেন তাহাই আমাদের উপযোগী। সুতরাং গর্ভিণী ও শিশু রক্ষায় এই গ্রন্থ বিশেষ সাহায্য করিবে। এবং প্রসবের ব্যাপত্তিতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সরল উপায়গুলির অনুবাদে প্রতি গৃহস্থ ব্যক্তিই বিশেষ উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে [illegible] নাই। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক [illegible]

দু এক স্থানে অনুবাদে একটু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল [illegible] সংস্করণে সংশোধনের আশায় তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

২৩ পৃষ্ঠা—রোমরাজ্যাঃ প্রকাশনম্—'রোমরাজি' অর্থে রোমক নহে। নাভির নিম্নে যে রোমের রেখা আছে তাহাকে রোমরাজি বা রোমাবলি বলে।

৪১ পৃষ্ঠা—বস্তিমাষাসতোঽষ্টমাৎ—অর্থ অষ্টম মাসের পূর্ব্বে নহে, অষ্টম মাস হইতে পরে বস্তি অর্থাৎ পিচকারী নিষিদ্ধ।

৪৪ পৃঃ—আমাহ=উদরাধ্মান' নহে, মলবদ্ধতা হইবে।

৪৫ পৃঃ—"পেটের মধ্যে সন্তান মরিয়া গেলে গর্ভিণীর শরীরে শোথ হয়।" ইহা ভুল। মূল বচনে যে "শূনতা" আছে তাহার অর্থ উদর-স্ফীতি। এবং এই অর্থই স্বাভাবিক।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, সাংখ্যাচার্য্য, ভিষগাচার্য্য।

নূপুর—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই। ১১২ পৃষ্ঠা। দাম পাঁচ সিকা।

একখানি কাব্য। কবিতাচ্ছলে কতকগুলি গ্রাম্য কাহিনী। কুমুদ-বাবুর 'উজানি' 'একতারা' দুখানি ভাল কাব্য। বর্ত্তমান কাব্যখানিতে বিশেষ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় নাই। কুমুদ-বাবুর বিশেষত্ব—বাংলার গ্রাম্য সুরটি বরাবর তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দিকে তাঁর শক্তির অত্যধিক ঝোঁক পড়ায় তাঁর কবিতা 'একঘেয়ে' হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান কাব্যখানিতে যতগুলি কাহিনী ছন্দে বিবৃত হইয়াছে সবগুলিই কাব্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকটি কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক এবং কবি-মনের উপযোগী, বাকী অনেকগুলি নীরস পদ্যের মত প্রাণের কোন-খানে গিয়াই বাজে না। এইজন্য কাব্যখানি বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। কুমুদ-বাবু ছোট ভাবকে দুই-চারিটি কথায় প্রকাশ করিতে দক্ষ; কিন্তু গুরু ভাবকে গুরু ভাষায় ব্যক্ত করিতে তিনি অপটু। বর্ত্তমান কাব্যেও তাঁর এই অভাব পরিস্ফুট। এই কাব্যটিতে কতকগুলি কাহিনী বাদ দিয়া মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রকৃতির কবিতা বসাইলে কাব্যটি 'একঘেয়ে' হইয়া পড়িত না।

রসাল—শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত, ৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১০৩ পৃষ্ঠা। কাপড়ে সুন্দর শক্ত বাঁধাই। দাম এক টাকা।

প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে ও লোকপ্রবাদ হইতে কতকগুলি সরস সুন্দর কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দুই একটি ছাড়া প্রায় সমস্ত কাহিনীই 'রসে' অভিষিক্ত। সেইজন্য বইটির 'রসাল' নাম উপযুক্ত হইয়াছে। যাঁদের সংস্কৃত কাব্য ও উপন্যাস পড়িবার সময় নাই, তাঁরা এই বইটি পড়িলে সংস্কৃত কাব্য ও উপন্যাসের রস একই সঙ্গে উপভোগ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের সঙ্কলন সুন্দর সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু শেষের কয়েকটি কাহিনী অল্পই হাস্যরস উৎপাদন করে। যাহা হউক দেশীয় কাহিনীগুলিকে বাংলা সাহিত্যে স্থান দিয়া গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত হইয়াও তাঁর ভাষা সংস্কৃতবহুল করেন নাই, ইহা সুখের কথা।

শীতলি—শ্রীসাহাগ্রী প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৩০ পৃষ্ঠা। দাম চারি আনা।

[redacted]কখানি পদ্য-পুস্তিকা। পদের মাঝে মাঝে পদের সংযোজন [redacted]লির অর্থ খুব স্পষ্ট হয় নাই। কবিতাগুলি মাঝামাঝি [redacted]কটি মন্দ নয়। লেখকের কবিতায় হাত আছে।

[redacted]বুবে মেওয়া ফলে"—প্রণেতা মোহাম্মদ অছিমদ্দিন, [redacted]বতুয়ান, পাবনা। ৫৬ পৃষ্ঠা। দাম আট আনা।

একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস; বড় গল্প বলিলেও চলে। প্লট নিতান্ত মামুলি ও অস্বাভাবিক। কোন চরিত্রই মনে দাঁড়ায় না। এ-যুগে এমন বই অচল।

সহচরী—শ্রীপতিমোহন ঘোষ। প্রকাশক শ্রীনটবিহারী মজুমদার, ১০৬ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ১৭৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে সুন্দর শক্ত বাঁধাই। দাম দেড় টাকা।

"মায়ার শৃঙ্খল" নামে গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-প্রকাশিত একটি গল্পের পরিপূরকরূপে এই উপন্যাসখানি লিখিত। উপন্যাসখানিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। যদিও সব চরিত্র বেশ সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই, তথাপি মায়া, মায়ার মা ও প্রিয়বালার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। মোটের উপর বইটি মন্দ নয়। তবে গ্রন্থকারের ভাষায় অনেক ত্রুটি আছে। অনেক মামুলি কথা আছে যাহা হাসির উদ্রেক করে।

প্রভাত-স্বপ্ন—শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। কাপড়ে শক্ত সুন্দর বাঁধাই। ৮৯ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

সাতটি ছোট গল্প লইয়া একখানি বই। লেখক নবীন হইলেও তাঁর গল্পে হাত আছে। "ঘড়িওয়ালা", "বন্ধু", "অন্তঃসলিলা" ও "বিবেচক"—এই চারিটি গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গল্প কয়টিতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বাকী গল্পগুলি ভাল নয়। স্থানে স্থানে চলিত বাংলার সহিত অ-কথ্য বাংলা মিশিয়াছে। গ্রন্থকারকে ভাষা সম্বন্ধে সতর্ক হইতে অনুরোধ করি।

সন্ধ্যামণি—শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত। প্রকাশক সুবোধ পাব্‌লিশিং সমিতি, ১৪ জগন্নাথ দত্তর ষ্ট্রীট, গড়পার, কলিকাতা। উক্ত প্রকাশকের ছয় আনা সিরিজের সপ্তম উপন্যাস। ৯২ পৃষ্ঠা।

একখানি ছোট গল্পের বই। লেখক নবীন, তাঁর গল্পের ভাব আছে, কিন্তু মনে মনে প্লট জমাইয়া ঘোরালো করিয়া লইয়া তিনি শৃঙ্খলার সহিত তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গল্পগুলিতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। তবে চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা গ্রন্থকার যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এরূপ আশা করিবার কারণ বইটিতে আছে। কয়েকটি গল্প ভাল। শেষের গল্পটি বেশ হাসির।

বইটির উপরে ছবি না দিলেই ভাল হইত। ইহাতে বইটি বটতলার বইর আকার ধারণ করিয়াছে।

স্বর্গীয় অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত—প্রকাশক শ্রীকুমুদলাল গুপ্ত।

"দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন" গানটি বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত ও গীত। সেই গানের রচয়িতা অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন ও এই পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে।

জর্ম্মণী এবং তুরস্কে চুয়াল্লিশ মাস—শ্রীযুক্ত হরদয়াল, এম-এ। প্রকাশক লণ্ডন হাম্‌ফ্রে মিলফোর্ড কোম্পানী। ৮৫ পৃষ্ঠা। দামের উল্লেখ নাই।

বিগত যুদ্ধের সময় জর্ম্মাণী ও তুরস্কে অবস্থান-কালে [redacted] এই দুইটি দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা ও মনোভাব যাহা [redacted] করিয়াছেন তারই বিবরণ এই পুস্তকে দিয়াছেন। বিবরণটি পত্রের [redacted] সংগ্রহ নহে, প্রত্যক্ষদৃষ্টির কথা। যুদ্ধের সময়কার জর্ম্মাণী ও তুরস্ক সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিবার পক্ষে বিবরণটি মন্দ নয়। জর্ম্মাণীর [redacted] ও মদগর্ব্বের চিত্র বেশ দেখানো হইয়াছে। বিবরণটি [redacted] ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ। অনুবাদের বাংলা সহজ ও সরল হয় নাই। আড়ষ্ট ও জটিল হইয়াছে। যিনি অনুবাদ করিয়াছেন তিনি অনুবাদে অভ্যস্ত নন। স্থানে স্থানে ইংরেজি কবিতার অনুবাদ হাস্যজনক হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি—ব'রবঙ্গ সনাতন ধর্ম্মসভায় গীত সঙ্গীত সমূহ—শ্রীমনোমোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এক শত নয়টি ভক্তিবিষয়ক গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি প্রচলিত গান ইহাতে আছে। গ্রন্থকারের গানগুলি ও তাঁর সঙ্কলন মন্দ হয় নাই।

ষড়-অবতার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। কাগজে শক্ত বাঁধাই। ৮৮ পৃষ্ঠা। দাম বারো আনা।

গল্পের বই। বইটিতে ছয়টি ছোট গল্প আছে। গল্পগুলিতে পাঠককে হাসাইবার চেষ্টা আছে। কিন্তু হাসাইবার জন্য গ্রন্থকার একান্ত সাধারণ ও মামুলি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গল্পগুলিতে প্লট নাই; এক-একটি বৈচিত্র্যহীন ছোটখাটো ঘটনা।

লেখকের ভাষা ভাল। চেষ্টা করিলে তিনি গল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

—সত্যানন্দ।

চিত্র-পরিচয়

তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিদ্রুম।

সম্রাট অশোকের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পাটরাণী অসন্দিমিত্রার মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ রাজা তরুণী তিষ্যরক্ষিতাকে বিবাহ করেন; তিষ্যরক্ষিতা চপল-চরিত্রা ও বাপিকা-প্রকৃতির ছিলেন; নিজের যৌবন ও রূপে গর্ব্বে তিনি যেমন দাম্ভিকা ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণা। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধদেবের সাধন-সাক্ষী বোধিদ্রুমকে যত্ন ও ভক্তির সহিত পরিচর্য্যা ও পূজা করিতেন; ইহাতে তিষ্যরক্ষিতা নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ মনে করিয়া ঈর্ষান্বিতা হইয়া উঠেন—সম্রাট অশোকের সমস্ত হৃদয়ের তিনিই সর্ব্বেশ্বরী সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকিবেন, সেখানে আর-কিছুর স্থান তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। এই ঈর্ষার তাড়নায় তিষ্যরক্ষিতা সপত্নীতুল্য বোধিদ্রুমকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

এই চিত্রে রাজভূষণে সজ্জিত বোধিদ্রুমের সৌভাগ্যে হিংসায় রাণী তিষ্যরক্ষিতা বোধিদ্রুমকে যেন ক্রোধদৃষ্টিতে ভস্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রাণী তিষ্যরক্ষিতার মুখশ্রীতে যৌবনের গৌরব ও মনের দৃঢ়তা ও ক্রূর হিংসা আশ্চর্য্য দক্ষতায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী মহোদয়া যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এই সুন্দর চিত্রখানি বঙ্গের চিত্রশিল্পের নমুনা স্বরূপ মহারাণীকে উপহার দেওয়া হয় ও তিনি উহা গ্রহণ করেন। এ ছবির মূল চিত্র এখন মহারাণীর সম্পত্তি।

ঃ ঃ।

ফরিয়াদ

["General Dyer is lecturing in London.....on his expedition in Persia in 1916. This is the first lecture of a series, the proceeds of which will be distributed amongst the relatives of Indians who fell at Amritsar."—Daily News.]

ধূলির অধম নালিশ জানায় তোমার পায়ে ত্রিভুবনের রাজা!
তৃণের চেয়েও নম্র যারা, কেন প্রভু এত তাদের সাজা?
কোন্ অপরাধ প্রমাদ হ'তে ধাক্কা দিয়ে অন্য প্রমাদ মাঝে
যাচ্ছে নিয়ে ত্রিশ কোটিরে ডুবিয়ে মুহু ধিক্কারে আর লাজে?
নিরেট নির্ভাজ অবজ্ঞাতে জ্যান্তে ম'রে আছি অগৌরবে;—
মড়ার 'পরে মারবে খাঁড়া—সয় ব'লে কি সত্যি সবই সবে?
আপীল-শূন্য পুলিশ-জুলুম আইন্ নামে কায়েম হ'ল দেশে,
রদ্ হ'ল না রোলট-পালট, তিরিশ কোটির আর্জ্জি গেল ভেসে!
ভুয়ো জেনেও 'ডায়ার্কি' হায় ডায়ার-কুলের চোখ্ টাটালো
ভারি,
আম্লাতন্ত্র মারণ-মন্ত্র আগেভাগেই রাখ্লে ক'রে জারি।
নিষ্কলঙ্ক স্বদেশ-নিষ্ঠ, নির্ব্বাসনে সইলে সে নিগ্রহ,
সিভিলিয়ান্ মা-শীতলার অতি-শীতল হ'ল অনুগ্রহ!
ছুট্‌ল প্রজা কর্‌তে নালিশ, ছুট্‌ল গুলি ফরিয়াদীদের 'পরে,
বিগাড়্ সব বিগুড়ে দিলে, দেখ্‌লে জুজু আঁৎকে না-হক্ ডরে!

* * * *

নালিশ যাদের বাদ্‌শাজাদাও শুন্‌ত স্বয়ং নিত্য ঘণ্টা-ঘরে,
নাহক্ তাদের মার্‌লে গুলি নিম্‌হাকিমের জবরদস্ত চরে।
মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ এলেন অমৃৎসরে মৃত্যু-মশাল জ্বেলে,
ইতিহাসের পৃষ্ঠা 'পরে ধৃষ্টতারি নিবিড় পঙ্ক ঢেলে।
চিড়িয়া-গাড়ী শাঁজোয়া-গাড়ী সাজিয়ে এলেন মার্‌তে নিরস্ত্রেরে,
'বেবি-কিলার' জাঁদ্‌রেল এলেন জালিয়াঁবাগে জবর ফৌজ
ঘেরে;
ভাঙ্‌তে সভা বল্‌লে না কো, বল্‌লে না কো "নইলে সাজা
হবে",
হঠাৎ সুরু মৃত্যুবৃষ্টি! আকাশ বধির আর্ত্ত-কলরবে!
দুষ্প্রবেশের সব অবকাশ আটক ক'রে বর্ব্বরতার গুরু,—
মানুষ নামের কলঙ্ক, হায়, করে দিলে খামকা খুন সুরু!
বিশ হাজারের নিবিড় ভিড়ে চালিয়ে গুলি ফুরিয়ে টোটার
পুঁজি
খুন-জখমের খান্‌জা-খাঁ শেষ ঘরে ফিরে গেলেন সোজাসুজি—
চলে গেলেন ফৌজ নিয়ে, খোস্‌মেজাজে বাহাল তবিয়তে,
দেখ্‌লে না কো ফিরেও বারেক মর্‌ছে কারা ধূলার পরে,

[redacted]

পেলে না জল-গণ্ডুষও হায় শুষ্কতালু জখম মানুষ
বাঁচ্‌ত যারা ওষুধ পেলে ওষুধ বিনা হ'ল পথের ধূলো
বৃদ্ধ কত নিরপরাধ পড়্‌ল মারা বাচ্ছা নিয়ে বুকে,
গুলির ঘায়েল্ জোয়ান ছেলে সারাটা রাত কাৎরে মল
ধুঁকে!
ময়দানেতে খেল্‌তে এসে ভিড় দেখে হায় গিছ্‌ল জমে যারা—
দুধের ছেলে—মায়ের দুলাল—মায়ের কোলে ফির্‌ল না
আর তারা!
অজ্ঞ কৃষাণ গ্রাম ছেড়ে যে এসেছিল বৈশাখী মেলাতে,
নাহক্ তারা প্রাণ খোয়ালে স্বেচ্ছাচারীর বীভৎস উৎপাতে!
ঘরে ঘরে পুত্রহারা ভর্ত্তৃহারা ভ্রাতৃহারা নারী
গুম্‌রে কাঁদে; পঞ্চনদে মুলুক-জোড়া ফৌজী আইন জারী!
আসামী বুক ফুলিয়ে বেড়ায়,—স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেউ দিতে নেই
সাজা,
"সিম্‌লা-ওলা সাম্‌লে নেছেন," জুলুম বলে, "বাজা রে বুক
বাজা!"

* * * *

নীরবে সব সইল ভারত; খবর কিন্তু রইল না কো চাপা;
লোক-দ্যাখানো কমিশনে চল্‌ল অনেক মুখ-থাবা বাঘ-থাবা!
বর্ব্বরতার গর্ব্ব ক'রে কাঠগড়াতে কীর্ত্তিমন্ত কত
গোঁয়ার্ত্তুমির সমর্থনে মানবতার কর্‌লে মাথা নত!
জবাবদিহির ভয় ছিল না, ডায়ার গেল খোলসা বাত কয়ে,—
স্তম্ভিতবৎ রইল ভারত, কাণ্ড কি যে, বুঝ্‌ল র'য়ে র'য়ে।
নন্-কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ উঠ্‌ল বেজে ভারত-গগন ব্যেপে,
তিরিশ কোটির নমিত শির সোজা হল দাঁতে অধর চেপে;
সত্য গ্রহণ কর্‌লে ভারত, হে বিশ্বরাজ! তোমায় প্রণাম করে;
চিত্ত দিল সকল বিত্ত; গান্ধী দিলেন পুণ্যগন্ধে ভ'রে;
নেহরু দিল নহর কেটে; ত্যাগের প্লাবন উপ্‌চে গেল
ভেসে;—
যুগল আলির দীপালীতে উজল হ'ল দেশাত্মবোধ দেশে!
চমৎকারের বন্যা এল, চামার মেথর দেশের কাজে মাতে!
শুঁড়িখানায় লোক ঢোকে না, বিলাস-ব্যসন ডুব্‌ল তপস্যাতে!

[redacted] কুড়িয়ে পকেট ভ'রে
[redacted]তে ফের বেরিয়েছে কে, মরি মরি ভারত প্রেমীই বটে!
[redacted]হের্‌বানী কর্‌বে ডায়ার! ভারত জুড়ে তাড়িৎ-বার্ত্তা রটে!
খুন করেছে কালকে যাদের, স্ত্রীপুত্রদের তাদের কিছু দেবে
বক্তৃতাতে কুড়িয়ে কড়ি,—এম্‌নি কাঙাল রেখেছে হায় ভেবে
ভারতপ্রজায়;—এম্‌নি ঘৃণ্য এমনি মনুষ্যত্ব-শূন্য তারা,—
ক্ষুধার তাড়ায় পুত্রঘাতীর 'খুন্'-মাখা হাত চাট্‌বে কুকুর-
পারা,—
তাইতে কড়ি কর্‌ছে জমা, ভিক্ষা দেবে, শুন্‌ছি ঘৃণার বাণী,
অমৃৎসরের নারী-নরে ডায়ার শেষে কর্‌বে মেহের্‌বানী!
"কে নিবি আয় শোণিতমূল্য" হাজার আত্মা বল্‌ছে আর্ত্তনাদে
জালিয়াঁবাগের রক্ত-কাদায়; শব-কোলে ওই রতন-দেবী
কাঁদে।
সে কি নেবে স্বামীর মূল্য? সে প্রথা তো নেই এদেশে,
প্রভু!—
ভারত-নারী মর্‌বে ক্ষুধায়, স্বামীর মাথার দাম নেবে না কভু,
ধৃষ্ট জনের মেহের্‌বানী হারাম ব'লে জানে মুসলমানে,
হিন্দু-শিখের গোরক্ত সে, কে ছোঁবে তায়, নেবে সে কোন্
প্রাণে?
দুর্গতি ঢের সয়েছে দেশ, অনেক হানি অনেকতর গ্লানি,
আর মাথা হেঁট কোরো না, দেব! চাইনে মোরা কারো
মেহের্‌বানী।
নানান্ মতে খাটো ক'রে নতুন বেশে আস্‌ছে দুর্নিয়তি,
তাইতো তোমায় নালিশ জানায়, তৃণের তৃণ, ত্রিভুবনের
পতি।
দণ্ড দিতে চাও যদি দেব, ভারত যদি হয় পাতকেই ভারী,
নাম মুছে দাও দণ্ডদাতা! একসাথে দাও পাঠিয়ে আকাল,
মারী।—
দয়া ক'রে কর্‌তে দয়া পাঠিয়ো না আর ডায়ার ওডোয়ারে,
এ দান প্রতিগ্রহের আগেই ভুখা ভারত মর্‌তে যেন পারে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাংলা ভাষায় জাতি কথা...

বলি—স্ত্রীজাতি, পুরুষজাতি; হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি; সাঁওতাল জাতি, নাগা জাতি; ব্রাহ্মণ জাতি, কায়স্থ জাতি; ইংরেজ জাতি, জার্ম্যান জাতি, ফরাসী জাতি; ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, জাতি কথাটি ইংরেজী sex, religious body, tribe, caste, nation, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা যখন জাতীয় শিক্ষার কথা বলি, তখন জাতি শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করি? দেশী লোকদের দ্বারা সম্পাদিত ইংরেজী কাগজ সকলে জাতীয় শিক্ষা বুঝাইবার জন্য national education ব্যবহৃত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, জাতীয় শিক্ষার কথা যখন আমরা বলি, তখন জাতি বলিতে আমরা ইংরেজী নেশুন বুঝি। নেশুনের মানে কি? এক দেশে, রাজ্যে, বা রাষ্ট্রে, এক শাসনতন্ত্রের অধীনে ভৌগোলিক সান্নিধ্যে সংহত বা জমাটভাবে যাহারা বাস করে, তাহাদের সমষ্টিকে নেশুন বলে। বিলাতে প্রটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক ও য়িহুদী, স্কচ্, ইংরেজ ও ওয়েল্‌শ্, সকলকে লইয়া ব্রিটিশ নেশুন। চীনের বৌদ্ধ, মুসলমান, কংফুচ্-শিষ্য, খৃষ্টিয়ান, চীন, মোঙ্গোল, মাঞ্চু, তাতার, সকলকে লইয়া চীন নেশুন বা জাতি। তেমনি ভারতবর্ষের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি, পঞ্জাবী হিন্দুস্থানী নেপালী বাঙালী মরাটা গুজরাতী রাজপুত অন্ধ্রদেশীয় তামিল মলয়ালী কন্নাড় সিন্ধী প্রভৃতি, সকলকে লইয়া ভারতবর্ষীয় জাতি বা নেশুন্। এই নেশুনের শিক্ষার নাম জাতীয় শিক্ষা। ইহা কেবল হিন্দুর, কেবল মুসলমানের, কেবল খৃষ্টিয়ানের শিক্ষা নহে। ইহা কেবল পুরুষের শিক্ষা নহে, নারীরও শিক্ষা ইহার অন্তর্গত। ইহা কেবল "উচ্চ"শ্রেণীর বা "ভদ্রলোক"দের শিক্ষা নহে, সংখ্যায় অধিকতর দৈহিক-শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের শিক্ষাও ইহার অন্তর্গত।

কাহাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার অন্তর্গত তাহা দেখা গেল। কি প্রকারের শিক্ষাকে ন্যাশন্যাল্ এডুকেশ্‌ন্ বা জাতীয় শিক্ষা বলা যায়, তাহাও বুঝিতে হইবে। মুসল-

যখন বলা হয়, তখন জাতি কথাটি religious body বা ধর্ম্মসম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়, নেশ্যন অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং তখন উহা ন্যাশন্যাল্ এডুকেশ্যন্ না হইয়া ডিনমি-নেশ্যান্যাল্ এডুকেশ্যন্ হয়। এইরূপ, হিন্দুগণ মনে করিতে পারেন, যে, হিন্দুর ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় আদর্শের অনুমোদিত শিক্ষাই হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা। এক অর্থে ইহা ঠিক্; অর্থাৎ, যেমন হিন্দুজাতি বলিতে জাতি কথাটি ধর্ম্মসম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা বলিতে যদি আমরা ঐ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষা বুঝি, তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার ঐ অর্থ ঠিক্। কিন্তু তাহা হইলে উহার ইংরেজী অনুবাদ ন্যাশন্যাল এডুকেশান্ হইবে না, হইবে ডিনমি-নেশ্যান্যাল্ এডুকেশ্যন্। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আদর্শ, সামাজিক আদর্শ, এবং পারিবারিক আদর্শ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক বা ডিনমিনেশ্যান্যাল শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বা ন্যাশন্যাল্ এডুকেশ্যন্ উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর বিস্তৃততর ব্যাপার; কারণ উহা দুই-একটি সম্প্রদায়ের নহে, সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষা।

জাতীয় শিক্ষা কি নহে বলিলাম, কি বটে তাহাও কিছু বলিয়াছি। এখন জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতত্ব (national solidarity) যাঁহারা স্বীকার করেন না এবং এইপ্রকার সংহতত্ব কখনও জন্মে না যাঁহাদের মনোগত ইচ্ছা সম্ভবতঃ এইরূপ, তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষে এত ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভাষা প্রচলিত, এখানে এত জাতি (race, tribe, ও caste) বাস করে, যে এখানে ঐপ্রকার সংহতি ও জমাটভাব জন্মিতে পারে না, কিম্বা উহা সুদূরপরাহত। জন্মিতে যে পারে, তাহার লক্ষণ ইংরেজ ও অন্য বিদেশী পর্য্যবেক্ষকেরা অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছেন, এখন ত বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু যে বাধাগুলি আছে, তাহা অস্বীকার করিলে বা তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেই সেগুলি লোপ পাইবে না।

[redacted] অন্ততঃ দুই এক কোটি লোকে বলে, সেগুলির [redacted] সম্ভবও বোধ হয় না, বাঞ্ছনীয়ও নহে। সমুদয় প্রাদেশিক ভাষা লুপ্ত হইয়া একটিমাত্র দেশভাষা প্রচলিত হওয়ার সপক্ষে যাহাই বলা হউক, ইহাতে কোন প্রদেশের লোকে রাজী হইবে না; অর্থাৎ নিজের মাতৃভাষার লোপে কেহ রাজী হইবে না, অপরের মাতৃভাষার লোপে রাজী হইতে পারে। সুতরাং ভারতীয়দের দ্বিভাষী হওয়া ভিন্ন গতি নাই। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন্ ভাষা শিখিলে ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা এবং ভাবচিন্তার আদান প্রদান চলিতে পারে? ইহার স্পষ্ট উত্তর, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। অবশ্য শুধু হিন্দুস্থানী জানিলে সব প্রদেশের সব লোকদের সঙ্গে যোগ রাখা সম্ভবপর হইবে না। হিন্দুস্থানী ভাষাটি সারতঃ এক, যদিও লিপিভেদে এবং সংস্কৃত বা ফারসী আরবী শব্দের বাহুল্যভেদে উহার হিন্দী ও উর্দ্দু দুটি প্রকারভেদ আছে। হিন্দুস্থানী কথা বলা ও বুঝা নাগরী বা ফারসী কোন একটি লিপি শিখিলেই চলিতে পারে; কিন্তু সকল প্রকার উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সাহিত্য পড়িতে হইলে ও সকল শ্রেণীর হিন্দুস্থানীভাষী লোকদের সঙ্গে পত্রব্যবহার করিতে হইলে, উভয় লিপিই জানা আবশ্যক।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দুস্থানী যাঁহাদের মাতৃভাষা, প্রাদেশিক ও জাতীয় (national) উভয় প্রকার প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁহাদিগকে কেবল একটি ভাষা শিখিতে হইবে; হিন্দুস্থানী যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, তাঁহাদিগকে দুটি শিখিতে হইবে। হিন্দুস্থানী-ভাষীদের পরিশ্রম অন্যদের অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু ইহাও ঠিক্ যে, যাঁহারা মাতৃভাষা ব্যতীত হিন্দুস্থানী শিখিবেন, তাঁহাদের জ্ঞান ও যোগ্যতা কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী-জানা লোকদের চেয়ে বেশী হইবে।

হিন্দুস্থানী যাঁহাদের মাতৃভাষা, ভারতবর্ষের অন্যভাষা-ভাষীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার এবং ভাব ও চিন্তার

বিনিময় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের শুধু হিন্দুস্থানী জানিলেই চলিবে না; কারণ অন্যসব প্রদেশের অধিকাংশ বা খুব [redacted]শী লোকের শীঘ্র হিন্দুস্থানীজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা বেশী। অতএব হিন্দুস্থানী যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদিগকে [redacted] ভাষা শিখিতে হইবে। তাহা কি? বাংলা [redacted]বল বাঙ্গালীর সঙ্গে, মরাঠী শিখিলে কেবল [redacted] সঙ্গে, গুজরাতী শিখিলে কেবল গুজরাতীর সঙ্গে, তেলেগু শিখিলে কেবল অন্ধ্রদেশীয়ের সঙ্গে, কথাবার্ত্তা ও ভাবচিন্তার বিনিময় চলিবে। কিন্তু ইংরেজী শিখিলে মোটের উপর সকল প্রদেশের অধিকাংশ যোগ্যতম বা শিক্ষিততম লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে পারিবে। সুতরাং ভাবিতে হইবে, যে, প্রাদেশিক কোন একটি ভাষা শিখা ভাল, না ইংরেজী শিখা ভাল।

ভারতীয় জাতির সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন কেবলমাত্র ভারতীয় লোকদের সঙ্গে নহে, এবং ভারতবর্ষেই আবদ্ধও নহে। আমরা একটা পঙ্গু অক্ষম কূপমণ্ডুক জাতি ত হইতে চাই না। সমুদয় পৃথিবীর সঙ্গে আমরা সম্পর্ক রাখিব; সকলকে দিব, সকলের নিকট হইতে লইব। সেইজন্য মানসিক কারবার এবং বাণিজ্যিক কারবার আমাদিগকে অন্যদেশের লোকদের সঙ্গেও করিতে হয়। অন্যদেশের লোকদের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইংরেজী, জার্ম্যান্, বা ফরাসী শিখিতে হয়। তাহার মধ্যে ইংরেজী শিখিবার সুবিধাই বেশী। ভারতবর্ষের বাহিরের লোকদিগকে আমরা যদি আমাদের কোন কথা জানাইতে চাই, যদি কোন জ্ঞান দিতে চাই, তাহাও বিদেশী কোন ভাষার সাহায্যে দিতে হইবে। ইংরেজীতে দেওয়ার সুবিধাই বেশী। কারণ উহা আমাদের দেশের যত লোকে যেরূপ জানেন, অন্য কোন বিদেশী ভাষা ততলোকে তেমন জানেন না। তা ছাড়া, ইংরেজী বহুবিস্তৃত ভাষা; বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এবং উহার [redacted]ত্যসম্পদের নিমিত্ত অনেক স্বাধীন জাতির লোকেও উহা শিখিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, একটি বিদেশী ভাষা আমাদের জানা দরকার, এবং ইংরেজী জানার সুযোগ ও সুবিধা সকলের চেয়ে বেশী।

ইহাও সকলেই জানেন, যে, ইংরেজী জানিলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যোগ রাখা যায় ও ব্যবসাবাণিজ্যও করা যায়।

তাহা হইলে মোট কথা এই দাঁড়াইতেছে, যে, শক্তিশালী জাতি হইবার ও থাকিবার জন্য, আমাদিগকে নিজ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য একটি ভারতীয় ভাষা এবং একটি অভারতীয় বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক জ্ঞান লাভ করিয়া যত বেশী ভাষা শিখিতে পারে, ততই ভাল, কিন্তু শুধু ভাষা শিখিবার নিমিত্ত বেশী সময় দিতে অধিকাংশ লোকেই অসমর্থ। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, আমাদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইবে; সুতরাং সময় ও শক্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে। আমাদের এই প্রতিযোগিতা ইংরেজদের সঙ্গেই বেশী। তাহারা এখন আমাদের দেশের রাজশক্তি দখল করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদিগকে বেদখল করিয়া উহাতে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এবং কলকারখানা প্রধানতঃ তাহাদের অধিকারভুক্ত। এসব ক্ষেত্রেও আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইংরেজরা শুধু নিজের মাতৃভাষা জানিয়াই যত জ্ঞান লাভ করিতে এবং স্বদেশে বিদেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যবিধ নানা কাজ পরিমাণে করিতে পারে, আমরা আমাদের মাতৃভাষা ও অন্য দু-একটি ভারতীয় ভাষা শিখিয়াও তাহা পারি না। অতএব অনেকগুলা ভাষা শিখিবার বোঝা আমরা যদি আমাদের নিজেদের ও সন্তানদের উপর চাপাই, তাহা হইলে তাহাদিগকে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে যত সময় ও শক্তির প্রয়োজন, তাহার কতকটা অপব্যয় করা হয়। এইজন্য সময় ও শক্তি সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক। মাতৃভাষা ত শিখিতেই হইবে। [redacted] ভবিষ্যতে কখনও উহা দ্বারাই যথেষ্ট জ্ঞান লাভের এবং মানুষের সঙ্গে যোগ রাখিয়া জীবনের নানাবিধ কাজ করিবার সুবিধা হয়, তাহা ত পরম সৌভাগ্য হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে, যে, জ্ঞানলাভের জন্য এবং ভারতবর্ষের ও স্বদেশের লোকদের সঙ্গে জ্ঞানের ও

বাণিজ্যাদি নানাকাজের যোগ রাখিবার জন্য, মাতৃভাষাই যথেষ্ট নহে। আরও কিছু জানা চাই। হিন্দুস্থানী শিখিলে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোকের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়, কোন কোন প্রদেশের সঙ্গে হয় না, এবং বিদেশের সঙ্গে হয়ই না; যথেষ্ট লৌকিক জ্ঞানও হিন্দুস্থানী সাহিত্য হইতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, হিন্দুস্থানী শিখিয়া, কিম্বা উহা না শিখিয়াও, ইংরেজী শিখিলে প্রভূত লৌকিক জ্ঞান লভ্য হয়, বহু বিদেশ ও বিদেশীর সহিত জ্ঞানের ও বাণিজ্যের বিনিময় সম্ভব হয়, এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ও অন্য অনেক লোকের সহিত যোগ স্থাপন হইতে পারে। এই-সকল কথা বিবেচনা করিয়া সকলে নিজ-নিজ অবসর, শক্তি, ও প্রয়োজন অনুসারে স্থির করিবেন, যে, মাতৃভাষা ছাড়া শুধু হিন্দুস্থানী শিখিবেন, না শুধু ইংরেজী শিখিবেন, না হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী দুই-ই শিখিবেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কতকগুলি লোক ইংরেজী শিখায় ও তদ্দ্বারা পরস্পরের সহিত যোগস্থাপন সহজ হওয়ায় আমাদের একজাতিত্ব-বোধ বাড়িয়াছে, এবং একজাতিত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করেন কি না, জানি না; আমরা অস্বীকার করি না। এই ফলোৎপাদন বিষয়ে হিন্দুস্থানী ইংরেজীর পদ গ্রহণের যোগ্য হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

এস্থলে আরও একটা কথা বলা দরকার। রাজনীতি-ক্ষেত্রে শক্তিশালী জাতিরা অনেকস্থলে মিথ্যা বলিয়া ও সত্য গোপন করিয়া আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও অন্য সব জাতিকে অপকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নিজ-নিজ সাহিত্যে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে চেষ্টা করে। তাহারা জ্ঞাতসারে এই চেষ্টা না করিলেও অনেক সময় তাহাদের সাহিত্য হইতে ঐরূপ ধারণা জন্মে। ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়া আমরা অনেকে ইংরেজদিগকে যতটা শ্রেষ্ঠ ও কৃতী বলিয়া মনে করি, এবং অন্য সব জাতিকে (তন্মধ্যে আমরাও আছি) যত নিকৃষ্ট মনে করি, তাহা সম্ভবতঃ সত্য নয়। এইজন্য ইংরেজী সাহিত্য হইতে যে একপেশে ধারণা হয়, তাহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত ফ্রেঞ্চ্ বা জার্ম্যান্ সাহিত্য বা উভয়ই অধ্যয়ন করা উচিত। যাঁহাদের যথেষ্ট শক্তি ও অবসর আছে, এই ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য। এস্থলে সাহিত্য কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণবৃত্তান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত।

আমরা এখন বিদেশীর অধীন, ইংরেজের [redacted] অধীনতার অনিষ্টকারিতা ও অপমানকরতা [redacted] মধ্যে অনেকের বিদেশীদের প্রতি বিরাগ জন্মিয়া [redacted] এই বিরাগবশতঃ আমরা যেন বিদেশী ভাষা ও [redacted] হইতে লভ্য জ্ঞান ও অন্যবিধ সুবিধা হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত না করি।

জাতীয় শিক্ষার একটি অর্থ—সেইরূপ শিক্ষা যাহা-দ্বারা আমাদের একজাতিত্ব রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। কোন্ কোন্ ভাষার শিক্ষা এই অর্থে জাতীয় শিক্ষার অন্তর্ভূত হওয়া উচিত, তাহার কিছু আলোচনা করিয়াছি। এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেও ইহা বলা দরকার, যে, বর্ত্তমানের মূল অতীতে প্রোথিত থাকায়, আমাদের জাতীয়তার মূলে জলসেচন করিয়া উহাকে সজীব সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত পালি ফারসী ও আরবী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইবে। সবাই যে এতগুলি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, তাহা নয়; কিন্তু অনুবাদের সাহায্যেও এগুলির সহিত আমাদের পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক।

একজাতিত্বের পথে ভাষাভেদ-রূপ অন্তরায় কিপ্রকারে যথাসম্ভব দূর করা যায়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। ধর্ম্মভেদ-রূপ বাধার হ্রাস কিরূপে হইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। যাঁহারা নিজের-নিজের ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহারা অবশ্যই স্বধর্ম্মকে ত্যাগ করিবার পরামর্শে কান দিবেন না, এবং তাহা ত্যাগ করাই একজাতিত্বের একমাত্র উপায় বলিয়া যদি প্রমাণিতও হয়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের সার্ব্বজনিক সাধারণ এক ধর্ম্ম কোন্‌টি হইবে, তাহা লইয়াও ঝগড়া হইবে। সুতরাং ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তির যে ব্যবস্থা, "আমার ধর্ম্মটি সবাই গ্রহণ কর, তাহা হইলেই সব মুস্কিল আসান হইবে," তাহার বিবেচনা আমরা করিব না। জাতীয় (national) শিক্ষার কথা আলোচনা করিবার কালে এরূপ ব্যবস্থা বিবেচিত না হইবার আরও একটি কারণ আছে। ভারতীয় জাতি (Indian nation) যাঁহাদিগকে

লইয়া গঠিত, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। খৃষ্টিয়ান্ মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মে যেমন অন্য [redacted] ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে উহাতে দীক্ষিত করিয়া লইবার [redacted] আছে, হিন্দুধর্ম্মে (অন্ততঃ আধুনিক কালে) তাহা [redacted] নি জন্মতঃ হিন্দু তিনিই হিন্দু, অন্য কাহারও হিন্দু [redacted] নাই। সুতরাং যেখানে মুসলমান খৃষ্টিয়ান [redacted] বলিতে পারিবেন, যে, "আমাদের ধর্ম্মই সাধারণ [redacted] ক," সেস্থলে হিন্দুরা তাহা বলিতে পারিবেন না। [redacted] ষ, যে দাবী বা প্রস্তাব সকলেই করিতে পারেন [redacted], তাহার বিচার উপস্থিত করিয়া ঝগ্‌ড়া বাড়ান অকর্ত্তব্য।

আমাদের সূচনা (suggestion) কিরূপ তাহা বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব যাহা তাহা বিস্মৃত না হইয়া, তাহা অবহেলা না করিয়াও, ঐ ধর্ম্মের সেই-সকল উপদেশ ও নীতির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারেন, এবং তাহাকে সাধনার বিষয় করিতে পারেন, যে-সকল উপদেশ ও নীতি সকল মানুষের ও সকল জীবের প্রতি প্রেম ও প্রতিবেশীত্বের ভাব উৎপাদন বর্দ্ধন ও সংরক্ষণ করে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই এই-প্রকার উপদেশ ও নীতি আছে। শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কার্য্যক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, সকল ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় লোকেরা নানা কাজ একযোগে করিতেছেন। এইজন্য আমরা বিস্তারিতভাবে কিছু না লিখিয়া এইমাত্র আভাস দিতেছি, যে, সকলে যখন নিজ-নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ করিবেন, এবং সন্তানদিগকে প্রদান করিবেন, তখন উক্ত জ্ঞানের সেই অংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, যাহা সকল মানবের সাধারণ মানবত্ব এবং সকল ভারতীয়ের সাধারণ একজাতিত্ব ও প্রতিবেশীত্বের সমর্থক ও প্রতি-পাদক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যাহাতে একতার ও একজাতিত্বের বোধ উজ্জ্বল ও দৃঢ় হয়, ভেদ অপেক্ষা মিলনের কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে ও মনে থাকে, জাতীয় (national) শিক্ষায় তাহাকে অন্যতম প্রধান স্থান দিতে হইবে। কেবল জ্ঞান হইলেই হইবে না, আচরণও তদনুযায়ী হওয়া চাই। এই প্রকার যুক্তির অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকদের প্রতিনিধির সমষ্টি কংগ্রেস্ একাধিক বার এই প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, যে, তথাকথিত "অস্পৃশ্য" ও অবনত জাতিদের "অস্পৃশ্যতা" দূর করিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার ও ব্যবস্থা বর্জ্জন করিতে হইবে। লোকমান্য টিলকের ইহাতে সম্মতি ছিল, তিনি "অস্পৃশ্যতার" বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধি ত ঐরূপ মত পুনঃপুনঃ প্রচার করিয়াছেন, একটি "অস্পৃশ্য" বালিকাকে পোষ্যপুত্রী গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যে, স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দুমুসলমানের সখ্য ও ঐক্য যেমন দরকার, হিন্দু-সমাজের মধ্যেও "অস্পৃশ্যতা" দূর করাও তেমনি দরকার। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, যদিও তিনি জাতি (caste) মানেন, কিন্তু এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা হীন, তাহা মানেন না।

জাতীয় শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে হইবে। মানব-শিশু বাড়ে কেমন করিয়া, তাহার শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি হয় কেমন করিয়া? শিশুটি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চুপচাপ শুইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রাতে জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মী হইয়া শয্যা ত্যাগ করিল, এমন ত হয় না। ক্রিয়াশীলতা—মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়াশীলতা—দ্বারা মানুষ বাড়ে ও পূর্ণতা লাভ করে। এই ক্রিয়াশীলতা স্বাধীনতা ও সুযোগ সাপেক্ষ। একটি শিশুকে খাঁচায় পুরিয়া বা একটি কারাগারের মত ঘরে রাখিয়া দিলে সে মানুষ হইতে পারে না। মানুষের মানবত্ব লাভ যেমন স্বাধীনতা ও সুযোগ সাপেক্ষ, জাতির জাতিত্ব (nationhood) লাভও তেমনি স্বাধীনতা ও সুযোগ সাপেক্ষ। আমাদের একজাতিত্বের (nationhoodএর) বর্ত্তমান অবস্থা কতকটা মানব-জীবনের প্রথম অংশের মত। ক্রিয়াশীলতায় স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইয়া মানুষ যেমন দেহ ও আত্মায় পরিণতিপ্রাপ্ত (mature) হয়, তেমনি আমাদের একজাতিত্ব ক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইলে পরিণতিপ্রাপ্ত (mature) হইতে পারে। অবশ্য জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লব্ধ হইবার পর স্থলবিশেষে প্রথম প্রথম অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ ও চালনার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ পরামর্শ ও চালনা দ্বারা সাহায্য করিবার নিমিত্ত একটি জাতিকে

অন্য একটি জাতির অধীন করার কোনই প্রয়োজন নাই। পারস্য দেশের লোকেরা যখন প্রথম আত্মকর্তৃত্ব লাভ করেন ও তাঁহাদের "মজ্‌লিস্" নামধেয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমেরিকার মিঃ মর্গ্যান্ শাস্‌টার তাঁহাদের আর্থিক পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যকে আমেরিকার অধীন করা হয় নাই; এইরূপ, ইংরেজ ডাক্তার মরিসন্ চীনের পরামর্শদাতা হন, কিন্তু চীনকে ইংলণ্ডের অধীন করা হয় নাই। জাপানীরা আত্মকর্তৃত্ব লাভের পর নানা পাশ্চাত্য জাতির লোকের পরামর্শ লইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও অধীন হন নাই।

ইংরেজেরা বলেন, তোমরা আগে দেখাও যে তোমরা একজাতি (one nation) হইয়াছ, দেখাও যে অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত নিজেদের সব কাজ নিজেরা করিতে পার, তাহা হইলে তোমরা একজাতিত্বের অধিকার, আত্মকর্তৃত্ব, স্বাধীনতা, পাইবে। আমরা বলি, তর্কের খাতিরে আমরা না হয় ধরিয়া লইলাম যে জাতিত্ব-বোধে আমরা শিশু; কিন্তু মানুষের শিশুকে, দেহমনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর ত ক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না ও তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত তাহাকে বন্দী-দশায় রাখা হয় না, তাহার স্বাতন্ত্র্য বহুপরিমাণে প্রথম হইতেই স্বীকৃত হয়, সে প্রথম হইতেই স্বাধীনতা ও সুযোগ পায়; তেমনি, একজাতিত্বের পরিণতি ও পূর্ণতার জন্যই আমাদের স্বাধীনতার ও সুযোগের দরকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আত্মকর্তৃত্বের প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিবার জন্যই আমরা মানবের শৈশবের সহিত একজাতিত্বের প্রথম অবস্থার তুলনা উপস্থিত করিলাম। এই সাদৃশ্যটাকে কেহ যেন সাম্য বা অভেদ সূচক মনে না করেন।

যাহা হউক, আমরা সংক্ষেপে এই বলিতে চাই, যে, যে-মানবসমষ্টি পরাধীন (যেমন আমরা), তাহার এক-জাতিত্ব কথার কথা মাত্র, উহারা নামে মাত্র জাতি। বন্দী মানুষ যেমন নামে ও বাহ্য আকারে মানুষ হইলেও বাস্তবিক মানবপদবাচ্য নহে, কেন না সে স্বাধীন মানুষের মত নিজের দেহের ও আত্মার শক্তির বিকাশ ও ব্যবহার করিয়া নিজের ও অপরের হিত ও আনন্দ বিধান পূর্ব্বক জন্ম ও জীবন সার্থক করিতে পারে না; তেমনি পরাধীন মানবসমষ্টি বাহ্য আকারে ও নামে জাতি হইলেও প্রকৃত জাতিপদবাচ্য তাহারা নহে, কেন না তাহারা নিজেদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ও ব্যবহার করিয়া আপনাদের এবং জগতের হিত ও আনন্দ বিধান পূর্ব্বক জাতিত্বের সিদ্ধি ও [illegible] লাভে অসমর্থ। অতএব জাতীয় শিক্ষার মূলতত্ত্ব কেমন করিয়া স্বাধীন হওয়া যায় ও থাকা যায় গোড়ার কথা হইতেছে, সেই "স্ব"এর আবিষ্কার যা আমাদিগকে হইতে হইবে। প্রবৃত্তির অধীনতা, দাসত্ব স্বাধীনতা নহে। আত্মাই এই "স্ব"। শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কথা, সুপ্ত স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে জাগা তোলা, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে "স্ব" ছাড়া আর সব বলি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা, এবং "স্ব"-অধীনতার প্রকৃত অর্থবোধ ও তদনুযায়ী আচরণ। জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি আত্মিক ও চারিত্রিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সহজ দার্শনিক জ্ঞান তাহার পোষক হইবে। স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাস ও জীবনচরিত অনুশীলন দ্বারা এই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে। আমরা চিরকাল পরাধীন ছিলাম, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মকর্তৃত্ব-বোধ আমাদের দেশে কখন ছিল না, ঐ বোধের অনুযায়ী কা আমরা কখন করি নাই,—ইতিহাস হইতে দেখাইতে হইবে, যে, এরূপ ধারণা ভ্রম। জোর করিয়া, কল্পনা করিয়া, প্রাচীন পুস্তক শিলালিপি আদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে হইবে, বলিতেছি না। সত্য যাহা তাহাই বলিতে হইবে। যদি ইহাই সত্য হইত, যে, আমরা চিরকালই পরাধীন, চির-কালই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আত্মকর্তৃত্ববোধহীন, তাহা হইলেও আমরা নিরাশ নিরুদ্যম হইতাম না। কারণ অতীত কাল অপেক্ষা ভবিষ্যৎ কাল দীর্ঘতর, অতীত সসীম, ভবিষ্যতের সীমা কেহ জানে না, এবং সমসাময়িক জীবনের ও ইতিহাসের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি আগে যাহা হয় নাই, এখন তাহা হইতেছে। ফলতঃ যাহা বাস্তব, যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই ধ্রুব নহে; সেগুলি ত পান্থশালার মত, মানুষ একটি ঘটনা অবস্থা ব্যবস্থা হইতে অন্যটিতে যাইতেছে। কিন্তু পান্থনিবাস ছাড়া মানুষের যেমন এক-একটি স্থায়ী বাসগৃহ থাকে, মানবজাতিরও তেমনি একটি আনন্দনিকেতন আছে। আত্মায় যাহাকে সত্য

যাহাকে শ্রেয় বলিয়া পাইয়াছি, তাহাই সেই নিকেতন, তাহাই ধ্রুব; নানা ঘটনা অবস্থা ও ব্যবস্থার পান্থশালা অতিক্রম করিয়া তাহারই দিকে জগৎ অগ্রসর হইতেছে। [redacted]ক্ষা সেই সত্য ও শ্রেয়-রূপ ধ্রুবের অভিমুখে দৃঢ় মনে ও দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে সমর্থ করুক।

কি কি বিদ্যার শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার অন্তর্গত হইবে? তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আর-একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝা দরকার। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে বিদ্যার দুটা ভাগ করা হয়, আর্ট্‌স্ (Arts) এবং বিজ্ঞান (Science), যদিও বস্তুতঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে যে অনেক স্থলে উভয়ের মধ্যে একটা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা নাই। যাহা হউক, ভাগটা মানিয়া লওয়া যাক্। আমরা আগে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই দেখা গিয়াছে, যে, সাহিত্য ইতিহাস দর্শন, আর্ট্‌সের এই তিন বিদ্যা জাতীয় শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। অন্য এক প্রকারে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মানুষের জ্ঞানের জিনিষ মোটামুটি দুটি; (১) মানুষ, (২) প্রকৃতি অর্থাৎ মানুষ ছাড়া বিশ্বের আর সব। এই বিভাগও একেবারে ঠিক্ নয়; কারণ প্রত্যেক মানুষের দেহ মন এবং অপর সব মানুষের দেহ মন প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতির সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিবদ্ধ জ্ঞানের নামান্তর বিজ্ঞান (আধুনিক ব্যবহারে, সংস্কৃতে বিজ্ঞানের মানে ঠিক্ ইহা নয়)। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাতে যে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, উহা দ্বারা অনেক স্থলে যে কাল্পনিক অনেক ধারণা ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়, উহা দ্বারা যে মানুষের সুখসম্পদশক্তি নানারূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি জানিলে সুস্থ সবল কার্য্যক্ষম শরীর মন লইয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিবার সুবিধা হয়, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু ইহাও ঠিক্, যে, নানা বিজ্ঞানের উচ্চ জ্ঞান লাভ না করিলেও অধিকাংশ মানুষের চলে। অন্য দিকে মানুষকে মানুষের সহিত ব্যবহার প্রত্যহ করিতে হয়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক ও শিক্ষকদিগকেও মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়, মানুষকেই শিখাইতে হয়। অতএব মানবচরিত্রের জ্ঞান, কি কারণে মানুষ কিরূপ ব্যবহার করে তাহার জ্ঞান, মানুষকে কেমন করিয়া প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এবং প্রভাবাধীন করা যায় তাহার জ্ঞান, মানুষের প্রীতিলাভ কেমন করিয়া করা যায় তাহার জ্ঞান, সকল মানুষের পক্ষেই দরকার। এই জ্ঞান আমরা নিজের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে পাই, সাহিত্য হইতে পাই, চিত্রাদি কলা হইতে পাই, এবং ইতিহাস জীবনচরিত দর্শন ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে পাই। এই কারণে আর্ট্‌সের, সাহিত্য-ইতিহাসাদির, অনুশীলন সকলেরই প্রয়োজন, যেমন মোটা-মুটি বিজ্ঞানের জ্ঞানও সকলেরই প্রয়োজন। শোকে শান্তি ও সান্ত্বনা, বিপদে ধৈর্য্য ও চিত্তের দৃঢ়তা, প্রলোভনের সময় তাহা পরাজয় করিবার শক্তি, সকল মানুষেরই আবশ্যক। সকল মানুষের আত্মায় উহা বীজাকারে নিহিত আছে; কিন্তু তাহার স্ফুরণ ও বৃদ্ধি হয় ধ্যানমননে, শাস্ত্রপাঠে, কাব্য দর্শন ইতিহাস চিত্রগীতাদির অনুশীলনে। ইহা দ্বারা বিদ্যার আর্ট্‌স্ দিক্‌টির প্রয়োজন অনুভূত হইবে। বিজ্ঞানের একটি প্রয়োজন এখনও উল্লিখিত হয় নাই। আধুনিক সময়ে নানা পণ্যদ্রব্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হয়। কৃষিকার্য্যও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। তা ছাড়া যুদ্ধও আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্র দ্বারা করা হয়। অতএব কৃষিশিল্পবাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় এবং অন্তর্জাতিক সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দরকার। কিন্তু এই প্রকারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সকলের আবশ্যক হয় না, কারণ যে-কোনও জাতির শস্যোৎপাদক, অস্ত্রনির্ম্মাতা, যোদ্ধা, ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদকেরা ঐ জাতির অধিকাংশ লোক নহে, কিয়দংশ মাত্র। কিন্তু এই কিয়দংশের খুব ভাল করিয়া নানাবিধ ব্যবহারিক (applied) বিজ্ঞান জানা দরকার। আমাদের বক্তব্যের সার মর্ম্ম এই, যে, সাহিত্য ভূগোল ইতিহাসাদির জ্ঞান সকলেরই থাকা উচিত, বৈজ্ঞানিক মোটামুটিজ্ঞান সকলেরই থাকা উচিত, শরীরতত্ত্ব স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও খাদ্যতত্ত্ব সকলেরই জানা উচিত, এবং শস্যপণ্যদ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করিবার জ্ঞান বহুসংখ্যক লোকের থাকা চাই। সাহিত্যাদির (Artsএর) এবং বিজ্ঞানের (Scienceএর) উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকেরই

থাকিতে পারে, উন্নততম জাতিদের মধ্যেও খুব বেশী লোকের নাই; ঐ-সকল জাতিরও অল্পসংখ্যক লোকই গবেষণা ও আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু "অল্পসংখ্যক" কথাটির মানে ভাল করিয়া বুঝা চাই। ভারতবর্ষ যত বড় দেশ, তাহাতে যে সামান্য কয়েকজন গবেষক ও আবিষ্কারক হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হাজারগুণ বাড়িলে তবে আমরা এবিষয়ে অন্য সভ্য জাতিদের সমকক্ষ বলিয়া গণিত হইবার আশা করিতে পারিব।

জাতির মধ্যে কি কি রূপ শিক্ষা কি পরিমাণে বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। কিন্তু মানুষের শৈশবেই ত বুঝা যায় না যে তাহার মনের ঝোঁক কোন্‌দিকে বেশী হইবে, তাহার মানসিক শক্তি বা হাতের দক্ষতা কোন্‌ দিকে বেশী কার্য্যকরী হইবে। সেইজন্য একটা বয়স এবং শিক্ষার একটা স্তর পর্য্যন্ত সকল রকমের সাধারণ জ্ঞান সব বালিকার ও বালকের হওয়া দরকার। সেই বয়স ও বালিকার কথা বলিলাম এইজন্য যে নারীও মানুষ, নারীরও আত্মা আছে, তাঁহারও দৈহিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ তাঁহার ও সমাজের হিতের জন্য আবশ্যক। নারী সব জাতির অর্দ্ধেক অংশ। নারীর জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম আমাদের জাতির সহায় না হইলে আমরা কেমন করিয়া সেই-সব জাতির সমকক্ষ হইব যাঁহারা জাতীয় উন্নতিসাধনে নারীকেও নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন? শিক্ষার সেই স্তর কি তাহার আলোচনা এখানে করিব না। কতকদূর পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা হইয়া গেলে পর, ছাত্রছাত্রী-দিগকে বিশেষ শিক্ষার দিকে চালিত করিতে হইবে? সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কি কি থাকা চাই? উহা চারি প্রকারের হওয়া দরকার। (১) বালিকা ও বালকদের দৈহিক শিক্ষা। নানা প্রকারের খেলা, দৌড়, সন্তরণ, ও ব্যায়াম দ্বারা শরীরের পূর্ণবিকাশ এবং সুস্থতা সম্পাদন করা দরকার। বালকদের সম্বন্ধে এ-কথা সবাই মানিবেন। বালিকাদের বেলা হয়ত অনেকে কিন্তু করিবেন। এস্থলে তর্ক করিবার সময় নাই। কেবল বলি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণীকে দৈহিক শিক্ষা দিয়াছেন। বাস্তবিক এক হিসাবে বালকদের চেয়েও বালিকাদের শরীর সুস্থ সবল পূর্ণবিকশিত হওয়া আবশ্যক; কারণ সন্তানবতী হইবার যে শারীরিক ক্ষয় তাহা তাঁহাদেরই হয়; শিশু-পালনের ধাক্কা তাঁহাদিগকেই সহিতে হয়। (২) বালিকা ও বালকদের বৃত্তি শিক্ষা, অর্থাৎ তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা শিক্ষা। বা[redacted] বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পা[redacted] করিব না। ব্রাহ্মণকন্যারাও যখন পরের বাড়ীতে [redacted] হইতে পারেন, তখন উহা অপেক্ষা সম্মানের কাজ কেন করিবেন না? তাঁহারাও চরখায় সূতা কাটেন; ঐরূপ অন্য সৎশ্রম সব জাতির নারী কেন করিবেন না? এখন আমাদের ছেলেমেয়েদের যে শিক্ষা হয়, তাহাতে তাহারা আইন-কলেজে পড়িলে আইনজীবী, মেডিক্যাল-কলেজে পড়িলে ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ারিং-কলেজে পড়িলে এঞ্জিনীয়ার হইতে পারে। কিন্তু এইসব কলেজের অল্পতা হেতু অল্প ছাত্রই এদিকে যাইতে পারে। এসব দিকে আরও অনেক ছাত্রের যাওয়া উচিত, তদুপযোগী শিক্ষালয়ের সংখ্যাও বাড়া উচিত। অনেকে বিশেষ শিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষক ও কেরানী হন, কিন্তু এই দুই বৃত্তির জন্য বিশেষ শিক্ষা আছে এবং তাহা ফলদায়ক। বাণিজ্য শিখাইবার শিক্ষালয়ও চাই। বৃত্তি আরও বহুবিধ হইতে পারে, এবং জাপান ও ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে ও পাশ্চাত্য নানা দেশে ঐসব বৃত্তি শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। অল্প বয়স হইতেই হাত ও চোখের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া চাই। মাটি, কাঠ, কাগজ, বাঁশের বাতা, খড়, বেত, প্রভৃতি দ্বারা নানা জিনিষ প্রস্তুত করিতে ছাত্রদের প্রথম হইতেই শিখান উচিত, রেখাঙ্কন প্রথম হইতেই শিখান উচিত। ইহা দ্বারা বুদ্ধির উৎকর্ষও সাধিত হয়। আসল কথা এই, মানুষের শিক্ষা এমন হওয়া চাই, যাহাতে তিনি মানুষের ব্যবহার্য্য কিছু না কিছু জিনিষ উৎপাদন করিতে পারেন; অধিকাংশ শিক্ষিত লোক কলম পিষিবেন, বা জিব্ ও ঠোঁট নাড়িবেন, ইহা শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত নয়। খাইবার জিনিষ, পরিবার জিনিষ, থাকিবার ঘর, গৃহনির্ম্মাণের জিনিষ, চাষের যন্ত্রাদি, ঘরের আস্‌বাব, তৈজসপত্র, ঘরকন্নার আরো নানা জিনিষ, ছাপিবার যন্ত্র, নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য নির্ম্মাণের কল, নানা-বিধ গাড়ী, জাহাজ, নৌকা, আকাশযান, এইরূপ কত-কি জিনিষ সভ্যভাবে জীবন যাপনের জন্য দরকার হয়, যাহার

কোন না কোনটি প্রস্তুত করিতে শিখা উচিত। কৃষি নানাবিধ আছে। ফুল ফল ও তরকারী উৎপাদনের কৃষি প্রত্যেক গৃহস্থের ছেলেমেয়ের শিখা উচিত, ইহাতে আনন্দ, [illegible]াভ আছে। খুব বড় সহর ছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থের [illegible]গোপালন শিক্ষা করা উচিত। গ্রামে ও ছোট [illegible]ারি শহরে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গাভী [illegible]ন হয়। গ্রাম্যবিদ্যালয়-সকলে নানাবিধ কৃষি অবশ্যশিক্ষণীয় করা কর্ত্তব্য। নানাপ্রকারে অল্প বয়সেই মানুষের মনে দৈহিক শ্রমের গৌরব-বোধ জন্মান উচিত। ইহা ব্যতীত, বাঙালীর যে ডবল্ পরাধীনতার কথা পরে বলিয়াছি, তাহা কখনও দূর হইবে না। (৩) কেতাবী বিদ্যা শিক্ষা (Academic education) দেওয়া যে দরকার, তাহা আর বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আদি সবই আছে। (৪) সঙ্গীত, চিত্র, প্রভৃতি কলা শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা জাতীয় শিক্ষার কথা বলি বটে, কিন্তু জাতির বিশেষত্ব ও প্রাণ যে-যে বিষয়ের মধ্যে ধরা পড়ে, তাহার সবগুলি মনে রাখি না। গণিতে ও অন্যান্য নানা বিজ্ঞানে, এবং কলকারখানায় জাতীয় বিশেষত্ব আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। (ইহা সাধারণতঃ সত্য, যদিও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনের বৈজ্ঞানিক কালে ও গবেষণায় তাঁহার ভারতীয় প্রতিভার ঐক্যানুসন্ধী ও ঐক্যবিধায়ক বিশেষত্ব ধরা পড়িয়াছে।) এক এক জাতির কাব্যে ও অন্যবিধ সাহিত্যে জাতীয়তার ছাপ আছে। এক এক জাতির দর্শনেও জাতীয় বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভে অনেকটা অগ্রসর হইয়া তবে ছাত্রেরা তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গীতে ও চিত্রে জাতীয় বিশেষত্ব সহজেই অল্পবয়স্ক লোকেই ধরিতে পারে। অথচ এদুটি জিনিষ আমাদের শিক্ষায় একেবারেই অবহেলিত হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে এদুটির একটি বিশেষ উপযোগিতা ও প্রয়োজন আছে। আমরা অতীত ভারতীয় সভ্যতার কথা বারবার বলি; কিন্তু ভুলিয়া যাই, যে, উহা শুধু হিন্দু সভ্যতা নহে, শুধু মুসলমান সভ্যতাও নহে, কিন্তু উভয়ের মিশ্রণজনিত একটি অপূর্ব্ব বস্তু। এই সত্য ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রের অনুশীলনে যেন বুঝা যায়। আমাদের সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন হিন্দুমুসলমান উভয়েই করিয়াছেন, চিত্রেরও তাই। স্থাপত্যেরও তাই। মুসলমানেরা নানা শিল্প ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কাগজ কেতাব বহি দোয়াত জরী আস্‌বাব্ পোষাক, প্রভৃতি নানা শব্দ মুসলমানের সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের একজাতিত্ব যেমন হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ভিন্ন পূর্ণবিকশিত সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তেমনি হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত আনন্দ ও চেষ্টার ফলে উদ্ভূত বিদ্যার চর্চ্চা ভিন্ন আমাদের জাতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানও ভাল করিয়া হইতে পারে না। সঙ্গীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, এবং আরও নানা কলায় ও শিল্পে হিন্দুমুসলমান একযোগে আনন্দ পাইয়া তাহাদের অনুশীলন করিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাকে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় করিতে হইলে এগুলিকে বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু জাতীয়তার কথা ছাড়িয়া দিলেও, শিক্ষায় সঙ্গীতাদির প্রয়োজন আছে। মানুষ কেবল জন্তু নয়, কেবল জিনিষ উৎপাদনের যন্ত্রও নয়, যে, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনপ্রাপ্তিতে ও জিনিষ উৎপাদনেই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা হইবে। সে জ্ঞান চায়, সে ধর্ম্ম চায়, ভক্তি চায়; তন্নিমিত্ত উপযুক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। তাহার সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ চাই, রসানুভূতির বিকাশ চাই, আনন্দ চাই; তবে সে মানুষ বলিয়া গণ্য হইবে। শব্দার্থ ও ব্যাকরণের নিয়ম শিখাইবার জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি, আমাদের স্কুল-কলেজ-সকলে যেন প্রধানতঃ এই ধারণা অনুসারেই সাহিত্য পড়ান হয়; কিন্তু বাস্তবিক উহার ভিতরের প্রাণের সন্ধান দিতে পারিলে, সৌন্দর্য্যবোধের উন্মেষ করিতে পারিলে, রসানুভূতির বিকাশ করিতে পারিলে, তবে সাহিত্যচর্চ্চা সার্থক হয়। প্রকৃত সাহিত্যচর্চ্চা হইতে এইরূপ ফললাভে সঙ্গীত ও চিত্রাদির অনুশীলন সহায়তা করে।

ছাত্রীদের জন্য গৃহস্থালীর নানা কাজ শিখিবার ব্যবস্থা সমুদয় সভ্যদেশে আছে। ইহাকে সংক্ষেপে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বা domestic science বলা হয়। ইহার কোন কোন বিষয় ছাত্রদেরও শিক্ষণীয়।

জাতীয় শিক্ষালয়-সকলের নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম

শ্রেণী পর্য্যন্ত, নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক সমাজসেবা (social service) ও রাষ্ট্র-সেবা (civic service) ছাত্রী ও ছাত্রদের জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া, বাস্তব আখ্যান, জীবনচরিত, ইতিহাস, কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রের সাহায্যে তাহাদের সম্মুখে চিত্তহারী রূপে উপস্থিত করিতে পারিলে জাতীয় শিক্ষা নামটি অন্বর্থ হইবে, সার্থক হইবে।

—

শিক্ষাগৃহ ও পরীক্ষাগৃহের পথ আগ্‌লান।

সহযোগিতা-বর্জ্জক বহু ছাত্র বি-এল্ পরীক্ষার গৃহের দ্বারে শুইয়া পড়িয়া উহা এমনভাবে

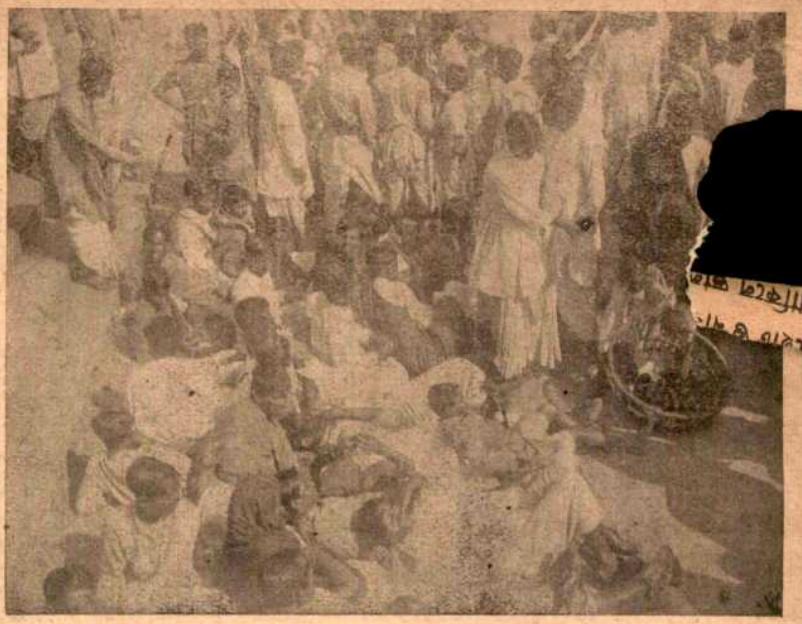

ছাত্রদের ধন্না।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্ হাউসের সিঁড়িতে ছাত্র ধর্ম্মঘটকারীরা বসিয়া ও শুইয়া রহিয়াছেন। অনশনে থাকিয়া তাঁহা অনুনয়ের সহিত বি-এল পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য লোকে কমলালেবু প্রভৃতি বিলাইতেছেন।
(শ্রীযুক্ত টি, পি, সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।)

ছাত্রদের ধন্না।
সেনেট হাউসের সিঁড়িতে ছাত্র ধর্ম্মঘটকারীরা ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।
(শ্রীযুক্ত টি, পি, সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।)

আগ্‌লাইয়াছিল, যে, তাহাদের গা মাড়াইয়া না গেলে পরীক্ষার্থীদের ভিতরে যাইবার উপায় ছিল না। এইরূপ বাধা অতিক্রম করিতে না পারায় অধিকাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারে নাই। আমরা সেই সময়েই ইহার অনৌচিত্য জানাইয়াছিলাম। এরূপ অবৈধ উপায়ে অন্যের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া এবং আর্থিক ক্ষতি করা সত্যাগ্রহের নিয়মবিরুদ্ধ। সত্যাগ্রহ বিপক্ষ ও বিরোধীকে কেবলমাত্র আত্মিক উপায়ে স্বপক্ষে আনিতে বলে, দেহের উক্ত প্রকার ব্যবহার করিতে বলে না। কলিকাতার

[redacted]হযোগিতা-বর্জ্জক ঐসব ছাত্রেরা [redacted]াহা করিয়াছিল, তাহার জন্য [redacted]ন্ধ মহাশয় দায়ী নহেন, [redacted]লিকাতার নেতাদের [redacted]। কলেজের দ্বারে [redacted] দিয়া ছাত্রদিগের ভিতরে যাওয়া নিবারণও অনেক ছাত্র করিয়াছে। একাজও ঠিক্ হয় নাই। এইসব উপায়ে ঈপ্সিত ফললাভের পর কলিকাতার নেতাদের নিষেধ-আজ্ঞা জ্ঞাপিত হয়। আমরা প্রথম হইতেই ইহার বিরোধী ছিলাম। শিক্ষালয় সম্বন্ধে সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতির প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য মডার্ন-রিভিউ কাগজে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। পুনরুক্তি করিব না।

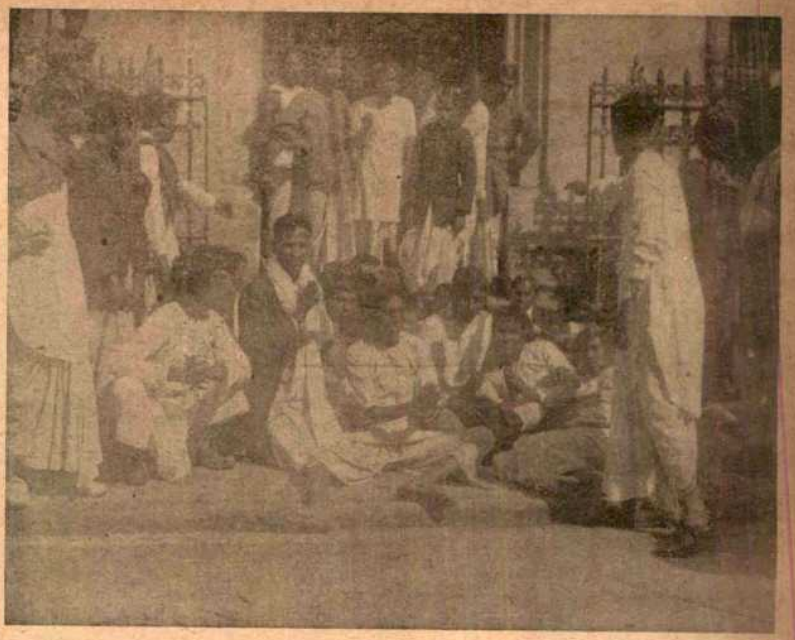

ছাত্রদের ধন্না।
বি-এল পরীক্ষা-গৃহের দ্বারে ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রেরা জোড়হাত করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।
(শ্রীযুক্ত টি, পি, সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।)

চাষী গাড়ী-চালক জেলে ও মাঝির নোবেল্-পুরস্কার প্রাপ্তি।

নরওয়ের ঔপন্যাসিক ক্নুট্ হাম্‌সন্ (Knut Hamsun) সাহিত্যের নোবেল্ পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বাঙালীজাতি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকেরাই এই পুরস্কার পান।

ক্নুট্ হাম্‌সন্ গত (ঊনবিংশ) শতাব্দীর আশীর কোটায় প্রথম যৌবনে আমেরিকার শিকাগো শহরে ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়ীর চালক (conductor) ছিলেন, তার আগে একজন কৃষকের ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া মজুরী পাইতেন। যখন কণ্ডাক্টারী করিতেন, তখন তাঁহার কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া কোটের আস্তিন্ হাতের কব্জি পর্য্যন্ত পৌঁছিত না; এত গরীব তিনি ছিলেন। অথচ কোটের পকেট বহিতে পূর্ণ থাকিত,— ইউরিপিডিস্, আরিস্‌টট্‌ল, থ্যাকারে, প্রভৃতির বহি। গাড়ী-চালকের কাজ করিবার সময়ও তাঁর দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি এমনতর ছিল যে বোধ হইত যেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! এমন ছেলের দ্বারা কণ্ডাক্টারের কাজ যে চলিতে পারে না, তাহা ত বুঝাই যাইতেছে। চলিলও না। তিনি পদচ্যুত হইলেন। তার পর তিনি একজন জেলের মাছ ধরিবার নৌকায় মজুর নিযুক্ত হন। পরে নাবিকের চাকরী লইয়া আমেরিকা হইতে স্বদেশ নরওয়েতে ফিরিয়া যান।

পাশ্চাত্য দেশ-সকলে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে গুণী ও শক্তিশালী লোকদের কাছে সাফল্য ও সম্মানের দ্বার যতটা উদ্‌ঘাটিত, আমাদের দেশে ততটা নয়; পাশ্চাত্য দেশ-সকলে দৈহিকশ্রমজীবী ও মানসিকশ্রমজীবী লোকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও পার্থক্য ততটা নাই, যত আমাদের দেশে আছে; তথায় মানুষ অপেক্ষাকৃত অল্প বাধা অতিক্রম করিয়া একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে যাইতে পারে, আমাদের দেশে পারে না; তথায় শিক্ষার বিস্তার সকল

ক্নুট হাম্‌সন্‌।

শ্রেণীর মধ্যে যতটা হইয়াছে, আমাদের দেশে ততটা হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতি-সকলের প্রগতি ও শক্তিমত্তার এবং আমাদের জাতির পশ্চাৎপদতা ও শক্তিহীনতার অন্যতম কারণ ইহা হইতে প্রতীত হয়। প্রতিকারের উপায়ও সহজবোধ্য।

—

সহযোগিতা বর্জ্জন ও বর্দ্ধন।

গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ও রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেই যে স্বরাজলাভ হইবে না, তাহা সহযোগিতা-বর্জ্জন-প্রচেষ্টার নেতারা বেশ জানেন। তাঁহারা বুঝেন, যে, এ দিকে যেমন সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে দেশের সব শ্রেণীর ও স্তরের লোকের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন ও বর্দ্ধন করিতে হইবে। সেইজন্য চরখায় সূতা কাটিয়া ও তাঁতে কাপড় বুনিয়া দেশে বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। তদ্দ্বারা বস্ত্রহীন অর্দ্ধনগ্ন কোটি কোটি লোকের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইতে পারে। এই উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার বিচার হইতে পারে; কিন্তু উ[illegible] ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের [illegible] পুরুষ ও স্ত্রীলোক "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচি[illegible] জ্ঞান মহা অধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন তাহাদের "অস্পৃশ্যতা" সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত না হইলে ভারতের এক-জাতিত্ব কোন কালেই ঘটিবে না। এইজন্য মহাত্মা গান্ধি পুনঃ পুনঃ "অস্পৃশ্যতা"-বোধকে পাপ বলিতেছেন এবং "তরুণ ভারত" (Young India) নামক সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রে স্পষ্টভাষিতা সহকারে "অস্পৃশ্যতা-পাপ" (The Sin of Untouchability) শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অবশ্য, একটি "অস্পৃশ্য" বালিকাকে পোষ্য-পুত্রী গ্রহণ ব্যতীত, তিনি এখনও "অস্পৃশ্যতা" দূর করিবার জন্য কাজে কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, মানুষের শক্তি ও সময় সীমাবদ্ধ, সব মানুষ সব কাজে হাত দিতে পারে না; এবং অধিকাংশ সমাজ-সংস্কারক "অস্পৃশ্য" জাতিদের জন্য তাঁহা অপেক্ষা বেশী কিছু করেন নাই।

দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের সহিত সহযোগিতা স্থাপন ও বর্দ্ধন করিতে হইলে আমাদের সকলকে আরও অনেক কাজ করিতে হইবে। সহযোগিতা, সহকারিতা প্রভৃতি কথার মানে এই, যে, আমাদের সকলের একটি সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা পরস্পরের সহায় হইব এবং সম্মিলিত চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্য জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। উপায়—সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, আর্থিক অবস্থার উন্নতি, নৈতিক উন্নতি ইত্যাদি। যদি সর্ব্বদা এই বিশ্বাস আমাদের মনে সজাগ থাকে এবং আমরা বিশ্বাসের অনুযায়ী কাজ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা পরস্পরের সহযোগী, সহকারী ও সহকর্ম্মী নামের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিব।

—

মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা।

সহযোগিতা-বর্জ্জকেরা মদ্যপান নিবারণের যে চেষ্টা [redacted] তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইহার সুফলও [redacted] উৎসাহের আতিশয্যবশতঃ কেহ সুরাপায়ী-[redacted] নও প্রকার শারীরিক বাধা যেন না দেন; তাহা হইলে এই চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে।

—

মিতপান এবং সুরা ক্রয় ও বিক্রয় নিষেধ।

প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে সুরাপান এবং মত্ততা কিছু ছিল, এখনও আছে। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে, যে, সুরাপান আমাদের দেশের সামাজিক প্রথা ও রীতি নহে; হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুরাপানের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধি আছে। পাশ্চাত্য দেশসকলে বহু শতাব্দী ধরিয়া সুরাপানের সামাজিক প্রচলন ছিল, এবং এখনও অনেক দেশে আছে; হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রে সুরাপান যে-ভাবে নিষিদ্ধ আছে, পাশ্চাত্য দেশ-সকলের স্বীকৃত খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রে তদ্রূপ নিষেধ নাই। তথাপি বহু পাশ্চাত্য দেশে ঔষধার্থে ব্যতীত সুরার ক্রয় ও বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ সুরাপানের দৈহিক ও নৈতিক কুফল। "মিতপান" বলিয়া কোন অভ্যাস যদি সকল বা অধিকাংশ মদ্যসেবীর পক্ষে সম্ভব হইত, এবং যদি উহা দৈহিক ও মানসিক অনিষ্টকর না হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য মদ্যপায়ী সমাজে মিতপানের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে আইন দ্বারা ঔষধরূপে ব্যতীত সুরার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ হইত না। ঔষধের জন্যও সুরার ব্যবহার অনাবশ্যক, অনেক বড় ডাক্তারের এই মত; কিন্তু অন্য অনেকের মত ইহার বিপরীত। এ বিষয়ে আমাদের মতের কোন মূল্য নাই। কিন্তু ঔষধার্থে ব্যতীত সুরার ব্যবহার (তাহার নাম "মিতপান" বা আর যাহাই দেওয়া হউক) যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, উহা যে একটা ব্যসন বিশেষ, এবং সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশ সকলের অভিজ্ঞতায় ইহা বুঝা যাইতেছে। তাহারা কেহ বা নিষেধবিধি (Prohibition) চালাইয়াছে, কেহ বা সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মাতালের ও মাতলামীর ওকালতী কোথাও কেহ করে না, কিন্তু "মিতপায়ী"র ওকালতীর কথা এখনও কখন কখন ভারতেও শুনা যায়। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, দুঃখের বিষয়। সুরাপানের ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার কারণ, কিম্বা আর কোনও কারণ আছে, জানি না।

—

সুরার বিজ্ঞাপন।

বিলাতে ও ভারতে ইংরেজদের কাগজে এখনও মদের বিজ্ঞাপন বাহির হয়; কেন না ঔষধার্থে ব্যতীত সুরার ক্রয় বিক্রয় উহাদের দেশে এবং ভারতে এখনও বেআইনি হয় নাই, এবং সুরাপান এখনও উহাদের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় নাই। কিন্তু ভারতীয়দের কোন কাগজে মদের বিজ্ঞাপন দেখিলে বড় বিসদৃশ ঠ্যাকে; কারণ সুরাপান আমাদের দেশের শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ। অথচ এমন কোন কোন ভারতীয় ইংরেজী ও বাংলা কাগজে মদের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, যাহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীরা মদ্যপায়ী নহেন এবং মদ্যপানের বিরোধী। এরূপ বিজ্ঞাপনের সপক্ষে একমাত্র সত্য যুক্তি এই আছে, যে, তাহা হইতে কিছু টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য একটা যুক্তিও পড়িয়াছি। তাহা মোটামুটি এইরূপ। অমুক অমুক বিখ্যাত লোক মদ্যপায়ী, মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিয়া অমুক বিখ্যাত লোক বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন, এবং কতকগুলা লোক ত মদ খাইবেই ও উহার চাহিদা (demand) থাকিবেই অতএব উহার বিজ্ঞাপন না ছাপিলে কিছু অর্থের অপ্রাপ্তি ছাড়া আর কি ফল হয়? আফিঙের দোকানের ও গুলির আড্ডার বিজ্ঞাপন ছাপা ঠিক্—এইরূপ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে; যদিও আমরা স্বীকার করি, যে, ভারতবর্ষের বিখ্যাত লোকদের মধ্যে সুরাপায়ী যত আছে বা ছিল, আফিংখোরের সংখ্যা সম্ভবতঃ তার চেয়ে কম এবং গুলিখোরের সংখ্যা আরও কম। কিন্তু আফিংখোর ও গুলিখোরদের মধ্যে একজনও বিখ্যাত লোক নাই বা ছিল না, এমন নয়। বিখ্যাত লোকদের মধ্যে ব্যভিচারী কদাচারী

লোক একেবারে বিরল নহে, এবং সামাজিক অপবিত্রতার সহিত সংগ্রামে এখনও কোন দেশের সংস্কারকেরা জয়ী হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি কুস্থানগুলার বিজ্ঞাপন ছাপিতে হইবে? আমরা অবশ্য সুরাপান, আফিং-সেবন, গুলিসেবন ও উল্লিখিত কুস্থানসমূহে গমন, নৈতিক-আদর্শ-অনুসারে সমশ্রেণীস্থ মনে করি না; কেবল আমাদের যুক্তিটা বিশদ করিবার জন্য সকলগুলার উল্লেখ করিলাম।

—

বিজ্ঞাপন ছাপিবার দায়িত্ব।

সাধারণতঃ বিজ্ঞাপন ছাপিবার রীতির সমর্থন দুটি যুক্তির দ্বারা করা যায়। বিক্রেতার ও ক্রেতার মধ্যে, কর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তা ও কর্ম্মপ্রার্থীর মধ্যে, যিনি যাহা চান এবং যিনি তাহা দিতে পারেন উভয়ের মধ্যে, বিজ্ঞাপন দ্বারা যোগ স্থাপিত হয়। এই যোগ স্থাপন সভ্যসমাজের কার্য্য-সৌকর্য্যের জন্য আবশ্যক। ইহা না হইলে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হয়। বিজ্ঞাপন ছাপিয়া কাগজওয়ালারা কিছু টাকা পান, এবং তজ্জন্য তাঁহারা যেরূপ কম দামে পাঠক-দিগকে কাগজ দিতে পারেন, বিজ্ঞাপনের আয় না থাকিলে তত সস্তায় দিতে পারিতেন না। এই দুটি যুক্তির কোনটিই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবার মত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যা-তা বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নয়। অশ্লীল বিজ্ঞাপন, অন্য প্রকার আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন, মাদকদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, দুর্নীতির পরিপোষক পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নয়। ইহার মধ্যে শেষোক্ত রকমের বিজ্ঞাপন বাছাই করা সুসাধ্য নহে। যে-সব বহিকে আমরা নৈতিক হিসাবে খারাপ বলিয়া মনে করি ও জানি, তাহার বিজ্ঞাপন সহজেই বাদ দিতে পারি ও দিয়া থাকি; কিন্তু বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সব বই কোন সম্পাদক বা কার্য্যাধ্যক্ষ পড়িয়া তাহার পর বিজ্ঞাপন ছাপা-না-ছাপা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন না। এত অবসর কাহারো নাই। যদি এই-জন্য বহি পড়িবার নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার বেতন বিজ্ঞাপন-বিভাগের আয় হইতে উঠিবে না; কেন না, এই কারণে বেশী হারে বিজ্ঞাপনের দাম দিতে কোন ব্যবসায়ী রাজী হইবেন না। বহি পড়িয়া তাহার পর বিজ্ঞাপন ছাপিতে গেলে বিলম্বও হইবে। অথচ নূতন বহির বিজ্ঞাপন খুব শীঘ্র বাহির হওয়া চাই। সুতরাং এই উপায়ও অবলম্বন-যোগ্য নয়।

কেহ কেহ ঔষধের ও অন্যান্য বিক্রেয় দ্রব্যে [redacted] পূর্ণ বা মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে প্রতারণা করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইয়া থাকে। ইহাদের বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নহে। কিন্তু কোন্ ঔষধে কি ফল হয় বা না হয়, কোন্ বিজ্ঞাপনদাতার কাজ কথা অনুযায়ী হইতেছে বা না হইতেছে, সকল স্থলে তাহা খবরের কাগজের কার্য্যাধ্যক্ষের পক্ষে জানা বা নির্ণয় করা অসম্ভব ও অসাধ্য। তথাপি, প্রতারণার সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে এরূপ বিজ্ঞাপন না ছাপা যে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—

বঙ্গের ডবল্ অধীনতা।

ভারতবর্ষের আর সব প্রদেশের মত বাংলা দেশ ইংরেজের অধীন। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একরকমের অধীনতা বাঙালীর আছে, যাহা ভারতবাসী অন্য অধিকাংশ জাতির নাই। যে যাহাকে ভয় করে, সে তাহার অধীন। যে যাহার দ্বারা অত্যাচারিত হইতে পারে, সে তাহার অধীন। সবাই জানেন, আমরা লাটসাহেবকে তত ভয় করি না, যত ভয় করি পুলিশ কনেষ্টবল্‌কে। লাট, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ততটা অত্যাচার হয় না, যত হয় পুলিশ কনষ্টেবল্ ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারীদের দ্বারা। বঙ্গের অধিকাংশ পুলিশ কনষ্টেবল্ অ-বাঙালী। বাঙালীর ডবল্ অধীনতা এইখানে; প্রথমতঃ সে ইংরেজের অধীন; দ্বিতীয়তঃ সে ঐ সব অ-বাঙালীর অধীন। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের পুলিশ কনষ্টেবল্ প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সেই প্রদেশেরই লোক। বঙ্গে ইহা নয় কেন? ইহার নানা কারণ থাকিতে পারে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির জন্য, খাদ্য যথেষ্ট পুষ্টিকর নয় বলিয়া, এবং কোন কোন সামাজিক কু-প্রথা বশতঃ বাঙালীর শরীর হয় ত খোট্টাদের ও অন্য কোন কোন প্রদেশবাসীদের শরীরের মত সুস্থ বলিষ্ঠ ও দৈহিক-শ্রমসহিষ্ণু নহে। এই কারণে এবং অন্য কোন অজ্ঞাত

কারণে হয় ত বাঙালীর দৈহিক সাহসও অন্য অনেক প্রদেশবাসীর চেয়ে কম। এই হেতু কাবুলীওয়ালা, পেশোয়ারী [redacted] খোট্টা সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার বঙ্গে খুব বেশী [redacted]য় কারণ, বাঙ্গালীরা একটু বেশী বাবু; [redacted]ত কম খরচে তাদের চলে না, তাহাদের মত [redacted] কায়েতেও বাঙ্গালী রাজী নয়। চতুর্থ কারণ, কন্‌ষ্টেবল্ হওয়াটা অনেক বাঙালী অপমানকর মনে করে। এই অপমানবোধ অল্পবেতনজনিত নহে। কারণ দেখা যায়, অনেক বামুনের ছেলে বরং রাঁধুনী হইবে, তবু কন্‌ষ্টেবল্ হইবে না। পুলিশের কাজের বদ্‌নাম বহু পরিমাণে এই অপমান-বোধের মূলীভূত।

এসব কারণ ছাড়া, অধিকাংশ কন্‌ষ্টেবল্ খোট্টাদের মধ্যে হইতে নিয়োগ করায় গবর্ণমেণ্টের কোন গুপ্ত নীতি আছে কি না জানি না। বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা সমুদয় কারণে নজর দিয়া যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারেন কি?

শাসনযন্ত্রসম্বন্ধীয় ডবল্ পরাধীনতা ছাড়া বাঙালীর আর এক রকমের পরাধীনতা আছে। বাংলা দেশের কলকারখানাসমূহের, রেলওয়ে ষ্টেশন-সমূহের, জাহাজঘাট-সমূহের, এবং ডকের, অধিকাংশ শ্রমজীবী অ-বাঙালী। বড় বড় সহরের কুলি মজুর, নানা প্রকারের মিস্ত্রী, ডাকের পিয়াদা, গাড়োয়ান, সইস, দারোয়ান, চাপ্‌রাসী, পানওয়ালা প্রভৃতি বহুপরিমাণে অবাঙালী। ছোট ছোট শহরের অনেক ব্যবসা পর্য্যন্ত অবাঙালীর হাতে যাইতেছে। নৌকার মাঝি, ধান কাটিবার সময়ের ক্ষেতের মজুর, প্রভৃতিদের মধ্যে অবাঙালী খুব বেশী। বাঙালীর এই যে পরাধীনতা, ইহা এখন পরাধীনতারূপে প্রতীত হইতেছে না বটে; কিন্তু অনতিবিলম্বে হইবে। পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া দেখুন, বল্‌শেভিক্ নামটা সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইলেও, দৈহিকশ্রমজীবীদের ক্ষমতা সর্ব্বত্র দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতবর্ষেও তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং পরে আরো হইবে। অধিকাংশ প্রদেশের শ্রমজীবীরা সেই সেই প্রদেশেরই লোক; সুতরাং তথায় শ্রমজীবীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে অন্ততঃ তৎতৎপ্রদেশবাসীরই প্রভুত্ব হইবে। কিন্তু বাংলা দেশে প্রভুত্ব হইবে অবাঙালীর।

এসব কথা অনেক বার বলিয়াছি। আবার বলিতেছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকিলেও আমরা বঙ্গে অন্য প্রদেশের লোকদের আগমন বন্ধ করিতাম না, কারণ প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া কাহাকেও জীবন-সংগ্রামে যোগ্য ও জয়ী রাখা যায় না; আমরা করিতাম বাঙালীকেই বঙ্গে যোগ্যতম করিবার ও রাখিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও যতটা ক্ষমতা আমাদের আছে, সর্ব্ব শ্রেণীর বাঙালীর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য তাহা আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইবে। বাংলা দেশকে স্বাস্থ্যকর করিতে হইবে, বাঙালীর মনে সর্ব্বপ্রকার সৎশ্রমের গৌরববোধ জন্মাইতে হইবে, শিক্ষাদ্বারা বাঙালীকে সকল কাজের খুব যোগ্য করিতে হইবে।

বাঙালীর আর এক রকমের ডবল্ পরাধীনতা আছে। নিজেদের অভাব যাহারা নিজেরা মোচন করিতে পারে না, নিজেদের দেশের কাঁচা মাল হইতে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে যাহারা পারে না, নিজেদের বিক্রেয় জিনিষ যাহারা স্বয়ং দেশে বিদেশে বিক্রী করিতে পারে না, তাহারা পরাধীন। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বিষয়ে বাঙালী প্রথমতঃ বিদেশী ইংরেজ জাপানী আমেরিকান্ প্রভৃতির মুখাপেক্ষী, তাহার পর মাড়োয়ারী, গুজরাতী, পঞ্জাবী, প্রভৃতির মুখাপেক্ষী। বড় বড় ব্যবসা এই সব অবাঙালীর হাতে। তাহার পর পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার বড় বড় কারখানাগুলাও বেশীর ভাগ অবাঙালীর সম্পত্তি।

—

শ্রমের গৌরব।

উপরে লিখিয়াছি, বাঙালীর মনে সর্ব্বপ্রকার সৎশ্রমের গৌরববোধ জন্মাইতে হইবে। এইজন্য যে-সব ছাত্র সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতি অনুসারে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ, মাবাপের উপর নির্ভর না করিয়া, জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য খবরের কাগজ ফেরী করিতেছে, তাহাদের শ্রমগৌরববোধকে আমরা সুলক্ষণ মনে করি। শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর বাঙ্গালীরা যে-সব কাজ হেয় মনে করিবেন না, তাহা অবিলম্বে নিম্নশ্রেণীর বাঙালীদের চক্ষেও আর হেয় বোধ হইবে না।

পুলিশ কন্‌ষ্টেবল্‌রা এইরূপ কয়েকজন শিক্ষিত ফেরী-ওয়ালাকে বাজে কারণ দেখাইয়া আদালতে উপস্থিত করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। এরূপ কুচো অত্যাচার শীঘ্র থামাইয়া দেওয়া উচিত।

কাগজ ফেরী সম্বন্ধে একটা কথা মনে হইল। অন্য ফেরীওয়ালাদিগকে যত সকালে রাস্তায় দেখিতে পাই, শিক্ষিত ফেরীওয়ালাদিগকে তত সকালে দেখিতে পাই না।

—

আত্মকর্তৃত্ব ও বেতন।

যে-সব দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব আছে, সেখানে সরকারী উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতনের মধ্যে ভারতবর্ষের মত এত বেশী তফাৎ নাই। এখানে মোটা বেতন যাঁহারা পান, তাঁহারা রাজার হালে থাকিয়াও টাকা জমাইতে পারেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীরা অনেকে এত কম বেতন পান, যে, তাহাতে, পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানদিগকে শিক্ষাদান দূরে থাক্, একজন মানুষেরও ভাল করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। এই পার্থক্য ন্যায়সঙ্গত কল্যাণকর নহে। উচ্চপদস্থ লোকদের বেতন কমাইয়া নিম্নপদস্থ লোকদের বেতন বাড়ান একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। নীচের কর্ম্মচারীদিগকে কম বেতন দিয়া কেবল যে তাহাদেরই অনিষ্ট করা হয় তাহা নয়; তাহারা অনেকে চুরি ও ঘুসের দ্বারা আয় বাড়াইতে বাধ্য হয়, এবং তাহাতে সরকারের ক্ষতি এবং দেশের লোকের উপর অত্যাচার হয়। ফলে চোর ও ঘুষখোর কর্ম্মচারীদের এবং সর্ব্বসাধারণের নৈতিক অবনতি হয়।

বেতনসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে ন্যায়নিষ্ঠ করিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া দৈনিক "হিন্দুস্থান" বেশ কাজ করিতেছেন।

—

অভাবের হ্রাস ও বৃদ্ধি।

যদি কেহ বলেন, সকল রকমের আরামের জিনিষ, সকল রকমের অভাব খুব কমাইয়া ফেল, তাহা হইলেই ব্যক্তির ও জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তবে তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারি না; কারণ অরণ্যচারী, মৃগয়া-জীবী, ফলমূলাহারী, যাযাবর, অসভ্য মানুষরা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরের লোক ইহা কেহই বলিবেন না। অন্যদিকে যদি কেহ বলেন, খুব অভাব বাড়াইয়া চল, খুব বিলাসদ্রব্য চাও ও কেন ও ভোগ কর, তাহা হইলেই ব্যক্তি ও জাতি ধনী, উন্নত ও শক্তিশালী হইবে, তাঁহার সঙ্গেও একমত হইতে পারি না। নবাব বাদশাহেরা সেকালের হিসাবে অভাব খুবই বাড়াইয়াছিলেন ও অভাব পূর্ণ করিয়া ভোগও খুব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের শক্তি বাড়ে নাই, জাতীয় শক্তি বাড়ে নাই, দেশ সমৃদ্ধ হয় নাই। পাশ্চাত্য নানা দেশের অনেক লোকের বিলাসিতা দেখিয়া অনেক ভ্রমে পড়েন। কিন্তু তাহারা ঐসব দেশের মেরুদণ্ড [redacted] ঐসব দেশের শক্তির উৎস কর্ম্মীদের বুদ্ধিমত্তায়, শ্রমে, জ্ঞানীদের তপস্যায়, জনসেবকদের প্রেমে [redacted]

যে-সব জিনিষ ব্যবহার করিলে কাজ করি[redacted] ও সুবিধা বাড়ে, সময়ের ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়, জ্ঞান বাড়ে, সৌন্দর্য্যবোধ ও রসানুভূতি বৃদ্ধি হয় অথচ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আসে না, আনন্দ পাওয়া যায় অথচ দৈহিক ও নৈতিক শিথিলতা আসেনা দেহের দৃঢ়তা কমে না মনের জোর ও সাহস কমে না, সে-সব জিনিষ অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। সে-সব স্থলে "অভাব বাড়াইও না" মানিবার মত কথা নহে। কিন্তু যেখানে উল্লিখিত প্রকারের বা তৎসদৃশ কোন লাভ নাই, সেখানে অভাব বাড়ান অকর্ত্তব্য।

—

পাটের চাষ।

বাংলাদেশে যত জমীতে আজ কাল ধানের চাষ হয়, তাহাতে সমুদয় বাঙালীর আহারের জন্য পর্য্যাপ্ত চাউল উৎপন্ন হয় না, অথচ ব্রহ্মদেশের চাউল বাঙালীর উপযোগী নহে, এবং তাহা কিনিবার মত টাকাও সকল বৎসর বাঙালী চাষার থাকে না। অন্যদিকে পাটের চাষ খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের দর কমিয়াছে, সুতরাং পাট জন্মাইয়া, অনেক টাকা লাভ পাইয়া, তাহা হইতে চাউল কিনিবার সামর্থ্যও কমিয়াছে। অতএব চাষীদের উচিত, আগে যথেষ্ট পরিমাণ জমীতে যথেষ্ট চাউল জন্মাইয়া তাহার পর অন্য চাষে মন দেওয়া। পাট, বলিতে গেলে একপ্রকার বাংলাদেশের একচেটিয়া ফসল। বাংলাদেশে উহা কম জন্মাইয়া উহার দাম বাড়াইলে ক্রেতারা উহা অন্যত্র খরিদ করিতে যাইবে, তাহার জো নাই। অতএব পাটের চাষ কমাইবার একটা যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা ভাল।

—

আচার্য্য বসুর বক্তৃতা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইউরোপ হইতে জয়-মাল্যভূষিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরে তিনি প্রথম যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন, তাহা হইতে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন, যে, তাঁহার কতকগুলি আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা মানবের কি হিত হইতে পারে। যে-সকল গবেষক কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যাপৃত

থাকেন, তাঁহারা ভাবেন না, যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য-গুলি মানুষের কি কাজে লাগিবে, তাহা দ্বারা কিরূপে মানুষের ধন বাড়িবে, কার্য্যশক্তি বাড়িবে, রোগ ও দুঃখ [redacted] এবং সুখ বাড়িবে; তাঁহারা সত্যের সন্ধানেই ব্যাপৃত [redacted] অন্যেরা সেই সকল সত্য কাজে লাগাইয়া মানুষের [redacted] বৃদ্ধি করেন; আসুরিক প্রবৃত্তি যাহাদের তাহারা আবার বৈজ্ঞানিক সত্যকে সংহার-কার্য্যেও নিযুক্ত করে। বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত নানা তত্ত্ব দ্বারা জীবনের অনেক গভীর রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। সে-সকলের কথা না বলিয়া তৎসমুদয়ের দ্বিবিধ সহজবোধ্য হিতকারিতার কথা বলি।

তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ বা বৃদ্ধিলেখক নামক যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা নানাবিধ। এই যন্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। একটি কচি বা বড় গাছের দিকে তাকাইয়া থাকিলে আমরা অনেক ঘণ্টাতেও বুঝিতে পারিব না যে উহা বাড়িতেছে। বসু মহাশয়ের যন্ত্রদ্বারা নিমেষেও বুঝা যায় যে উহা বাড়িতেছে কি না। শুধু তাহাই নহে; কোন্ অবস্থায় গাছটি কত দ্রুত বাড়িতেছে বা বাড়িতেছে না, তাহাও বুঝা যায়। একই অবস্থায় কোন্ গাছ কত দ্রুত বা আস্তে-আস্তে বাড়ে, তাহাও ইহা দ্বারা বুঝা যায়। গাছে সার দিলে, রাসায়নিক দ্রব্যবিশেষ প্রয়োগ করিলে, গাছ বাড়ে ইহা সবাই জানি। কিন্তু কোন্ সার কি পরিমাণে কোন্ গাছে দিলে উহার বৃদ্ধি খুব বেশী হয়, তাহা জানিতে হইলে এপর্য্যন্ত একমাত্র উপায় ছিল দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করা। কিন্তু বসু মহাশয়ের যন্ত্রদ্বারা দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ে ইহা নির্দ্ধারিত হয়। তাড়িত শক্তির ও আলোকের প্রয়োগে কৃষিকার্য্যের কিরূপ সুবিধা অসুবিধা হয়, তাহাও অতি অল্প সময়ে বসু মহাশয়ের যন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। তাঁহার যন্ত্র দ্বারা আরও একটি আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বিষ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উদ্ভিদে প্রযুক্ত হইলে উদ্ভিদের মৃত্যু হয়, কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে উদ্ভিদ্ খুব বাড়িতে থাকে। তাড়িত প্রবাহের কার্য্যও এইরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। উদ্ভিদে মাঝারি রকম জোরের তাড়িত প্রবাহ প্রযুক্ত হইলে উহা বৃদ্ধির সাহায্য করে, কিন্তু প্রবাহের জোর বাড়াইয়া দিলে বৃদ্ধি অগ্রসর না হইয়া স্থগিত হয় বা কমিয়া যায়।

এই সকল গবেষণা ও আবিষ্কার হইতে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উপকার হইতে পারে। কিন্তু আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ বসু মহাশয়ই করুন, এরূপ আশা ও অনুরোধ অনুচিত হইবে। শুধু তাই নয়; তাঁহার সময় ও শক্তি গবেষণায় প্রযুক্ত হইলে জগতের যে লাভ হইবে, সাক্ষাৎভাবে কৃষির উন্নতিতে তাহা প্রযুক্ত হইলে সেরূপ হইবে না। কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার গবেষণার প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোকের প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বসু মহাশয়ের পাঠকক্ষে আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি চিঠি দেখিয়াছিলাম; তাহাতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, একটি বৃদ্ধিলেখক যন্ত্র তাঁহারা পাইতে পারেন কি না। আমাদের দেশের সরকারী কৃষিবিভাগসমূহ, দেশী-রাজ্যসকলের কৃষিবিভাগসমূহ, এবং বড় বড় জমীদারেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা করিতে এরূপ উৎসুক হইয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ পাই নাই।

বসু মহাশয়ের আবিক্রিয়াসকলের হিতকারিতার আর একটি ক্ষেত্র রোগের চিকিৎসায় ও যাতনার প্রশমনে। তিনি দেখাইয়াছেন, অনেক বিষের এবং ঔষধের কাজ জীবজন্তুর দেহে যেমন হয়, উদ্ভিদের দেহেও তদ্রূপ। এইহেতু তাঁহার গবেষণাসকল চিকিৎসাক্ষেত্রেও নূতন পথ খুলিয়া দিতেছে।

মনোবিজ্ঞানবিদেরাও তাঁহার গবেষণা হইতে নূতন আলোক পাইতেছেন।

—

জাতীয় শিক্ষালয়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন আনন্দের বিষয়। এগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, ও সুপরিচালিত হয়, তাহার চেষ্টা সকলের করা কর্ত্তব্য।

এই শিক্ষাশালাগুলির মধ্যে বালিকা ও নারীদের জন্য কয়টি, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই; একটিও মনে পড়িতেছে না। আমাদের ভুল হইয়া থাকিলে পাঠক-পাঠিকারা দয়া করিয়া সংশোধন করিবেন।

—

"স্বেচ্ছাকৃত দান।"

সম্প্রতি নূতন ভারতশাসন-আইন অনুসারে আগেকার চেয়ে বড় যে-সব ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইয়াছে, দেশী মন্ত্রীদের নিয়োগ হইয়াছে, ব্যবস্থাপক সভাগুলির অধিকাংশ সভ্য দেশের কতকগুলি লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্কার হইয়াছে, এ সকলের উদ্ভব কেন কি প্রকারে হইল জানেন? নরমপন্থী বা ধীরপন্থীরা বলিবেন, আমরা বহুবৎসর ধরিয়া বক্তৃতা, খবরের কাগজের প্রবন্ধ, সভাস্থলে অবধারিত প্রস্তাব, আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ, প্রভৃতির দ্বারা যে আইনসঙ্গত আন্দোলন করিতেছিলাম, এ-সব তাহারই ফল। গরমপন্থী বা উগ্রপন্থীরা বলিবেন, আমরা চোখ রাঙাইয়া যে সব বক্তৃতা ও দাবী (demand) করিতেছিলাম, ধমক দিতেছিলাম, এ-সব তাহারই ফল। আবার বিপ্লবপ্রয়াসীরা বলিবেন, আমরা যে বোমা ছুড়িয়াছিলাম, রেলগাড়ী

উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, গুলি করিয়া পুলিশ ও অন্য দু-একজন কর্ম্মচারী বধ করিয়াছিলাম, সেই ভয়ে আমাদিগকে ছেলেভুলান এই-সব জিনিষ দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, "রাজনৈতিক মতি-বিশিষ্ট" (politically-minded) ভারতীয়েরা বলিবেন, স্বাধীনতা লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রাণের যে ব্যাকুলতা কোন না কোন প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারই ফলে নূতন ভারত-শাসন-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অথবা পৃথিবীর স্বাধীনতার সর্ব্বত্র যে ঢেউ উঠিয়াছে তাহার ধাক্কা হইতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচাইবার জন্য এই আইন-বাঁধ বাঁধা হইয়াছে।

কিন্তু সম্প্রতি এক রবিবার গির্জ্জায় উপাসনার পর কলিকাতার লর্ড বিশপ অর্থাৎ পাদ্রি লাট যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ঐ সমুদয় অনুমানের কোনটিরই সমর্থন করে না। তিনি বলিয়াছেন, নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের "স্বেচ্ছাকৃত দান" ("Spontaneous gift")। তাহা হইলে বিশপ মহাশয়ের মতে, ভারতীয়দের স্বাধীনতায় স্বাভাবিক কোন অধিকার নাই। ভিক্ষুককে লোকে দয়া করিয়া যেমন ভিক্ষা দেয়, ইংলণ্ড তেমনি আমাদিগকে কিছু দিয়াছেন। বিশপ মহাশয় আমাদিগকে অপমান করিবার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন মনে করি না। কিন্তু তাঁহার কথায় খুশি হইবার ও গৌরব বোধ করিবারও ত উপায় দেখিতেছি না।

ইংলণ্ডের লোকেরা যুদ্ধের পাঁচ বৎসর ধরিয়া, পৃথিবীর স্বাধীনতা, প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচনের অধিকার, প্রভৃতি বড় বড় কথা জোর গলায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেগুলাকে ভারতবর্ষে কি কারণে পৌঁছিতে দেওয়া হইয়াছিল ?

আর একটা কথাও লোকে বুঝিয়া রাখুন। আমরা কাঁদি, হাত জোড় করি, চোখ রাঙাই, ধমক দি, কিম্বা বোমা ও গুলি ছুড়ি—কিছুতেই ইংলণ্ডের মনকে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল করিতে পারিব না; কেন না, ইংলণ্ডের কেবল যখন মর্জ্জি হয়, তখনই তিনি আমাদিগকে কিছু "স্বেচ্ছাকৃত দান" করেন। অতএব আশা করি কেহ ইংলণ্ডের উদ্দেশে ক্রন্দন, যাচ্ঞা, রোষবশে নেত্রকষায়ন, প্রভৃতি আর যেন না করেন। বোমা ও গুলি ক্ষেপন, প্রভৃতি আসুরিক ও বেকুবী কার্য্য অহিংসাবাদী আমরা ত করিতে বলিতেই পারি না। সকলে নিষ্কামভাবে দেশ হিতকল্পে নিজের নিজের কাজ করুন।

প্রশংসায় বিপদ্।

বঙ্গের নূতন ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের খুল্লতাত ডিউক্ অব্ কনট্ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বাঙালীদের ও বঙ্গপ্রবাসী ইংরেজদের প্রশংসা করিয়া বলেন :—

In the political progress of India the Bengali race has ever been in the van; its leaders, endowed with oratory and brilliance of intellect, have inspi[redacted] cause of reform; in the sphere of literature, pl[redacted] science and art its gifts have been strikingly [redacted] in the realms of jurisprudence and public lif[redacted] have been conspicuous figures. Associated [redacted] with the leaders of Bengal will be the European fellow-citizens, official, and non-official, to whose peculiar genius India of to-day owes both its system of orderly administration and its great commercial and industrial connexions with the world at large.

প্রশংসায় বিপদ্ আছে। ইহাতে মানুষকে নিজের দোষ ত্রুটি ভুলাইয়া দিয়া আত্মবিস্মৃত ও অসাবধান করে। অতএব, বাঙালী সাবধান!

আর এক বিপদ্ এই, যে, শুধু বাঙালীর প্রশংসায়, শুধু বাঙালীকে কোন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রণী বলায়, অন্যান্য প্রদেশের লোকদিগকে ঈর্ষান্বিত করা হয়, এবং ভারতীয়দের একজাতিত্ব জন্মিবার পথে বাধা উপস্থিত হয়। অন্যবিধ ক্ষতিও আছে। বাঙালীর প্রভাবের প্রশংসা ও কতকগুলি বাঙালীর বিপ্লবপ্রয়াস (এবং তাহার বাহ্যউপসর্গ বোমা ও রিভল্‌ভার), এই উভয় কারণে, কিম্বা উহার কোন একটি কারণে, ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বাঙালীর প্রতি অন্য প্রদেশের লোকেরা ঈর্ষ্যান্বিত থাকায় দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনের অসুবিধা ও অনিষ্টকারিতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। এইজন্য বিদেশীর মুখে বাঙালীর প্রশংসাকে আমরা ডরাই।

আর একটা কথাও বলি। যে-সব প্রদেশের লোক খুব বেশী সংখ্যায় বঙ্গে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ কেহ বা বহুকোটি টাকা রোজগার করিতেছে, সেই সব প্রদেশেই কিন্তু কতকগুলি বাঙালী কেরানী, উকিল ও ডাক্তারের অপেক্ষাকৃত কম রোজগারে তত্তৎপ্রদেশবাসীর ঈর্ষ্যান্বিত ও বিদ্বেষকষায়িত চোখ পড়িতেছে। তাই, আবার নূতন করিয়া প্রশংসাকে ভয় করি।

ঐ প্রশংসার মধ্যেও বাঙালীর অকৃতিত্ব ও ত্রুটি ধরা পড়িতেছে। বাঙালী আর যাহাই হউন, ডিউক্ সত্যের খাতিরে একথা বলিতে পারেন নাই, যে, দেশশাসন-কার্য্যোপযোগী রাজনৈতিক বুদ্ধি ও শক্তি (statesmanship) বাঙালী দেখাইতে পারিয়াছে (অবশ্য আমাদের বিশ্বাস, সুযোগের ও কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে বেশী বাঙালী এদিকে নিজের যোগ্যতা দেখাইতে পারে নাই), কিম্বা পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যে বাঙালী কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছে। ডিউক ইউরোপীয়দের প্রশংসা করিয়াছেন এই বলিয়া,

যে, ভারতবর্ষ তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনপ্রণালীর জন্য এবং বাহিরের পৃথিবীর সহিত পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের সম্পর্কের জন্য ইউরোপীয়দের নিকট ঋণী। ইহা হইতেই বুঝিয়া [redacted] যে, আমরা ডিউকের মতে দেশশাসনোপযোগী [redacted]তা ও কার্য্যক্ষমতা দেখাইতে পারি নাই—তা হউক। ভারতের বর্ত্তমান শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসন-প্রণালীর সব গৌরব, ইতিহাসের বিচারে, ইংরেজেরই পাওনা কি না, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। টোডরমাল, শেরশাহ্ প্রভৃতির কোন পাওনা নাই কি?

মোট কথা এই, যে, আমাদের অন্য প্রশংসার কথা যাই থাক্ বা না-থাক্, এ-প্রশংসা আমাদের নাই, যে, আমরা বঙ্গের মুর্থ বঙ্গেই রাখিয়া নিজেদের অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর করিতে পারি, দেশকে স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে পারি, এবং সমুদয় বাঙ্গালীর সন্তানের শিক্ষার জন্য সমুদয় গ্রামে ও নগরে যথেষ্ট শিক্ষালয় খুলিতে পারি। অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য গোড়াতেই যে যে গুণ ও শক্তি থাকা দরকার, আমাদের সেইগুলির বিকাশ হয় নাই। সেইজন্য আমাদের মুখের গ্রাস অন্যের কবলিত হইতেছে।

—

মতভেদ-অসহিষ্ণুতা।

কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছে, সভাস্থলে জনতার মত যেরূপ তাহার বিপরীত মত-পোষক কেহ কোন বক্তৃতা করিতে উঠিলে নানা প্রকার গোলমাল করিয়া তাহাকে থামাইয়া দেওয়া হয়, কখন কখন তাহাকে অপমান করা হয়, দু-এক স্থলে প্রহারও হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত অভদ্রতা ও অসভ্যতা। পাশ্চাত্য "সভ্য" দেশসকলেও এইরূপ হয় বলিয়া ইহাকে সভ্যতা বলা যায় না। সভাতে বক্তৃতার উদ্দেশ্য তর্কবিতর্কের দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ। সেখানে যদি চেঁচামেচি, হাতাহাতি, লাথালাথি ও লাঠালাঠি করিতে হয়, তাহা হইলে সভা করিবার ভণ্ডামি ছাড়িয়া দিয়া প্রকাশ্য-ভাবে ঘোষণা করাই ত ভাল, যে, অমুকস্থলে অমুক সময়ে মল্লযুদ্ধ হইবে, বা লাঠি দ্বারা যুদ্ধ হইবে, কিম্বা গলার জোরের পরীক্ষা হইবে, ইত্যাদি, এবং যে-দলের জিত হইবে, তাহাদের রাজনৈতিক আদর্শ উৎকৃষ্ট ও রাজনৈতিক বুদ্ধি খুব ভাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এরূপ হাস্যকর বিজ্ঞাপন কেহ দিতে চাহিবেন না। তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, যে, সভাস্থলে কিরূপ ব্যবহার সভার উপযোগী এবং প্রকৃত সভ্যতার অনুমোদিত।

সব দলের লোকের মধ্যেই অকপট স্বদেশপ্রেমিক আছেন। কোন দলের লোকই সত্যের সব দিক্‌টা দেখিতে পান বলিয়া মনে করি না। ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়াও একই লক্ষ্যস্থলে যাওয়া যায়।

আগামী বৎসরের প্রবাসী।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রবাসীর কলেবর ও মূল্য দেড়গুণ বাড়িবে। তাহার বিশেষ বিবরণ রঙীন ছবি ও প্রথম প্রবন্ধের মধ্যের পাতায় লিখিত হইয়াছে।

—

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

আমরা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে অন্যতাবশতঃ অন্য কাগজ হইতে এই ভুল নকল করিয়াছিলাম, যে, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের কোন উল্লেখ নাই। প্রতিবাদ পাইয়া সেই ভ্রম আমরা পরে সংশোধন করিয়াছি। সুশীলবাবু ভ্রম সংশোধন করিয়া বিলাত হইতে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে আর উহা ছাপিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

—

বঙ্গের নূতন ব্যবস্থাপক সভা।

বঙ্গের নূতন ব্যবস্থাপক সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। উহাকে বেজায় গম্ভীর করিতে গিয়া উহার সভাপতি নবাব শাম্‌সুল্ হুদা সাহেব উহাকে হাস্যা করিয়া তুলিতেছেন। তিনি পাঠশালার গুরুমহাশয় নহেন এবং সভ্যেরাও পাঠ-শালার পড়ুআ নহে; অথচ তিনি ঘন-ঘন গুরুমহাশয়দের "এই! গোল করিস্‌নে বল্‌ছি," ইত্যাকার ধমকের অনু-করণ করিতেছেন। সভ্যদের চলাফেরার শব্দটিও হইবার জো নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী লইয়া প্রত্যেক সভ্যকে এক জোড়া করিয়া রবারের জুতা উপহার দিলে ভাল হয়। অথবা জুতা খুলিয়া সভাস্থলে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া, জাপানে থিয়েটারে ও অন্যান্য জনতার স্থলে যেমন দ্বারদেশে পাদুকারক্ষক থাকে, সেইরূপ কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইতে পারে, এবং সভার কার্য্য হাতমুখের ইসারায় চালাইবার জন্য সভ্যদিগকে গবর্ণমেণ্টের খরচায় বধিরমূক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীবাবুর নিকট কিছুদিনের জন্য মূকদের ইঙ্গিত শিখিতে পাঠাইয়া দিলে হয়।

মন্ত্রীদের বেতন কমাইবার জন্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে প্রস্তাব করেন, তাহার সমর্থন জন্য তিনি যখন প্রাচীন ভারতে মন্ত্রীদের বেতনের উল্লেখ করিতেছিলেন, তখন সভাপতি সাহেব তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে থামা-ইয়া দেন, অথচ কোন দেশের আধুনিক কালের মন্ত্রীদের বেতনের উল্লেখে তিনি বাধা দেন নাই। এরূপ কেন করা হইল? আমাদের মত বিস্তর লোকের ধারণা এই, যে, ভারতবর্ষের লোকদের সাংসারিক অবস্থা প্রাচীন কালে

এখনকার চেয়ে ভাল ছিল। সুতরাং কেহ যদি বলেন যে সেই সুদশার দিনেও মন্ত্রীগণ বিনা বেতনে কাজ করিয়াও সম্মানিত হইতেন, সুতরাং এখন খুব বেশী বেতন না পাইলেই যে তাঁহাদের মানসম্ভ্রম থাকিবে না, এ-যুক্তি অসার, তাহা হইলে এরূপ বক্তৃতায় বাধা কেন দেওয়া হইবে? ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইতে যাইতেছে, ইহা রাজা পঞ্চম জর্জ্জও বলিতেছেন। সুতরাং আগেকার প্রকৃত স্বরাজের দিনে মন্ত্রীদের পাওনা কি এবং বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের-স্বরাজেই বা কত বরাদ্দ হইয়াছে, উভয়ের তুলনা কেন অপ্রাসঙ্গিক হইবে?

নবাব সাহেব সভাপতি, সুতরাং তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে হইবে ইহা ঠিক্; কিন্তু বক্তার মুখ চোখ্ তাঁহারই অভিমুখে সর্ব্বদাই থাকিবে, সভ্যদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা রূপসীর মত তাঁহার এই হুকুমটা লোকে গাম্ভীর্য্যের সহিত পর্য্যালোচনা করিতে পারে কি না সন্দেহ।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত অনেকগুলি প্রস্তাব ভাল। আইন দ্বারা ডেপুটী সভাপতির বেতন বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা নির্দ্দেশ, ভাল; তথাপি উক্ত পদের জন্য নির্ব্বাচিত বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় বেতন লইতে অস্বীকার করিয়া ভালই করিয়াছেন।

শাসন-পরিষদের সভ্য (Executive Councillor) চারিজনের জায়গায় দুইজন করিবার প্রস্তাব ঠিকই হইয়াছে। মন্ত্রী তিনজন নূতন করিয়া নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চারিজন শাসন-পারিষদ রাখা বাস্তবিকই অপব্যয়।

গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক থানায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার অনুরোধ সঙ্গত হইয়াছে। হইতে পারে যে এখন প্রত্যেক থানার দাতব্যচিকিৎসালয়ে কাজ করিবার জন্য এবং পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার জন্য থানা পিছু তিনজন করিয়া ডাক্তার সদ্য সদ্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যত পাওয়া যায়, নিযুক্ত করা হউক, এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন চিকিৎসা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠাও চলিতে থাকুক। চিকিৎসকের অভাব খুব বেশী; বিনা চিকিৎসায় লোক মরে খুব বেশী।

যাহা গাঁজিয়া তাড়ি হয় নাই এরূপ টাট্‌কা খেজুর রসের উপর আব্‌গারী শুল্ক উঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ভাল করিয়াছেন।

বাবু নীরদবিহারী মল্লিক এই প্রস্তাব করিয়া পরে উহা প্রত্যাহার করেন, যে, সভ্যদিগকে মাসিক ২৫০ টাকা ভাতা, বঙ্গের সর্ব্বত্র বিনাভাড়ায় ফার্ষ্ট ক্লাসে যাতায়াতের অধিকার, এবং বিনা ডাকমাশুলে চিঠি পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হউক। এত শীঘ্র বেতন চাওয়াটা ভাল নয়। গরীব লোক, শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক, বেশী সংখ্যায় সভ্য হইলে কথা তুলা চলিবে। বিলাতে পার্লেমেণ্টের সভ্যেরা বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা পান। কিন্তু বিলাতের লোকদের আয় ও ব্যয় দুই-ই আমাদের [redacted] বেশী। ইংরেজদের ব্যয়েরও আয়ের অনুপাতে, প[redacted] সভ্যদের মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা বেশী নয় [redacted] ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে উহার সমতুল্য [redacted] হইলে মাসিক পঞ্চাশ টাকাও খুব বেশী হইবে। যাঁহারা বিনি পয়সায় ফার্ষ্ট ক্লাস রেলগাড়ীতে চড়িতে চান, তাঁহারা সচরাচর পয়সা দিয়া কোন্ ক্লাসে যাতায়াত করেন? গরীব দেশের পয়সায় নবাবী করিবার ইচ্ছাটা সঙ্গত ও শোভন নহে।

গ্রীষ্মকালে গবর্ণমেণ্টের দার্জ্জিলিং-যাত্রার বিরুদ্ধতা ত দেশের লোক বহু বৎসর ধরিয়া করিতেছে। লোকমত অনুযায়ী প্রস্তাব এবার ধার্য্য হইল, যদিও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অন্যতম শাসন-পারিষদ হুইলার সাহেব আগে হইতেই বলিয়া দিয়াছেন, যে, গবর্ণমেণ্ট ঠিক্ ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন না। বলিয়া ভালই করিয়াছেন। উহাতে লোকে ভুলিতে পাইবে না, যে, এটা রঙ্গমঞ্চের স্বরাজ, তোমরা প্রস্তাব যাহাই কর, গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন।

বঙ্গের রাজস্ব যে উহার ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে, তৎপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা উত্তম হইয়াছে। টাকা না হইলে, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি, এবং কৃষিশিল্পাদির বিস্তৃতি ও উন্নতি দ্বারা দেশের আয় ও ধন বৃদ্ধি, এই তিনটি প্রধান কাজ হইতে পারে না। অথচ অধিকতর ট্যাক্স্ দিবার ক্ষমতাও আপাততঃ দেশের লোকের নাই।

দেশের লোকদের খাদ্যের জন্য যত চাউল আবশ্যক কেবল তাহার অতিরিক্ত চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে, অতিরিক্ত না থাকিলে রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে, এরূপ অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর হইয়াছে।

মন্ত্রীদের বেতন বার্ষিক ১৫০০ পাউণ্ড হউক, এই প্রস্তাবের আলোচনা কল্য ২৮শে মাঘ হইয়াছিল, আজও ২৯শে মাঘ হইবে। ফল যাহা হয়, পাঠকেরা দৈনিক কাগজে দেখিবেন। আমাদের বিবেচনায় মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হাজার অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়। মন্ত্রীরা বিনা বেতনে যদি কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের লোকদের খুব বেশী শ্রদ্ধা পাইবেন। হাজার টাকা লইলেও পাইবেন; তাহাতে তাঁহাদের খরচ চলিয়া যাইবে, অথচ মানসম্ভ্রম পদমর্য্যাদা কিছুই কমিবে না, বরং বাড়িবে।

—

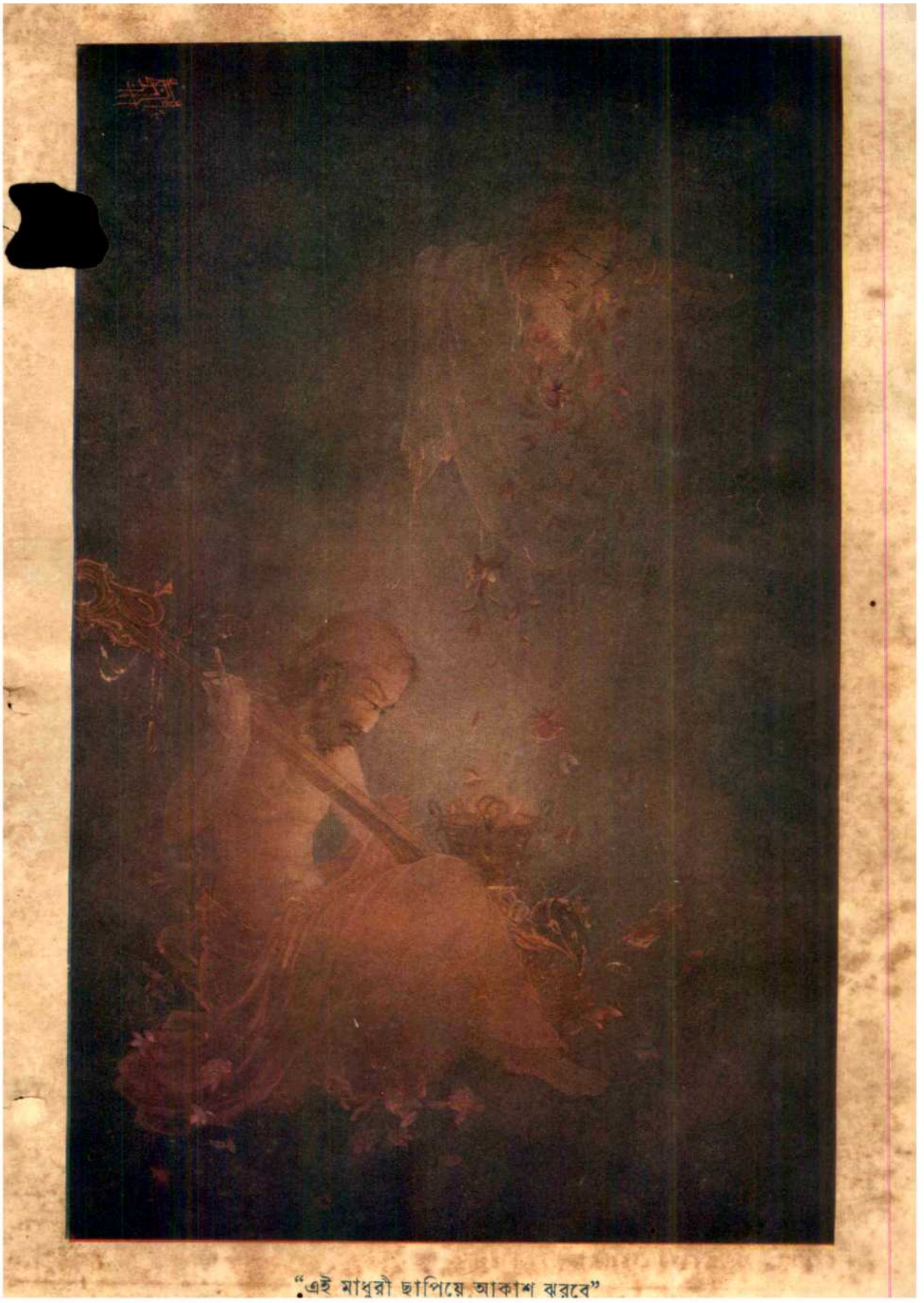

"এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে"

CALCUTTA UNIVERSITY
Sec. No.....
Book No.....
LIBRARY.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২০শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

জাতিগঠনে বাধা—ভিতরের ও বাহিরের

আজ এই নব-জাগরণের দিনে বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রী কি এক অপূর্ব্ব-সুরে বেজে উঠেছে। আশায়, আনন্দে, উৎসাহে বাঙালী এখন একটা জাতি ব'লে পরিগণিত হ'য়ে জগতের সমক্ষে দাঁড়াতে চায়। শুধু বঙ্গে নয়, একটা প্রাণ-মাতানো নতুন হাওয়া সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে। ভাবত দিনে-দিনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু এই উদ্বোধনে কি কি উপকরণ চাই? জাতিগঠনের উপাদান কি? সমষ্টির দেহে কোন্ শক্তি সঞ্চারিত হ'লে জাতি সুপুষ্ট ও মেরুদণ্ডবিশিষ্ট হ'য়ে গর্ব্বোন্নত-শিরে আপন দেশে দাঁড়াতে পার্‌বে? আমাদের এখন চাই কি? অভাব কোথায়?

আপনারা মান্দ্রাজের স্যর টি মাধব রাওএর নাম শুনেছেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বিজ্ঞ দূরদর্শী পুরুষপ্রবর স্যর সালার জঙ্গের পর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। ইনি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এঁর খেদোক্তি ভারতবাসীমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত কর্‌ছি;—

"The longer one lives, observes and thinks, the more does one feel that there is no community on the face of the earth that suffers less from political evils and more from self-inflicted or self-accepted or self-created and therefore avoidable evils than the Hindu."

'যত মানুষ বেশী দিন বাঁচে, দেখে, ভাবে, ততই সে অনুভব করে যে ধরণীপৃষ্ঠে হিন্দুজাতি ছাড়া আর এমন কোনো জাতি নেই যারা পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনীতিক দুঃখের চেয়ে আত্ম-অর্জ্জিত বা আত্ম-সৃষ্ট সুতরাং প্রতিকার্য্য সম্ভব দুঃখ বেশী ভোগ করে।'

ভারতবাসী "স্বখাদ সলিলে" ডুবে মর্‌ছে, আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মার্‌ছে। কোথায় তার অভাব, কোথায় তার দোষ, সমাজের নিষ্ঠুর মুষ্টি কোথায় তার গলা টিপে ধ'রে শ্বাসরোধ ক'রে দিচ্ছে,—এ-সকল কথা বিচার ক'রে বুঝে আপনার উদ্ধারের পথ আপনিই নির্দ্দেশ করতে হবে। অন্তরের দেবতা না জাগ্‌লে শুধু উত্তেজনার জ্বালায় এ দীর্ঘপথ অতিক্রম কর্‌তে পারা যাবে না। ছট্‌ফটানির একটা গতি আছে, কিন্তু তার দৌড় বেশীদূর নয়।

মানুষের উন্নতির পথে যে বাধা—তা হয় ভিতরের, নয় বাহিরের। আমাদের জাতীয় প্রতিভা বিকাশের পথে ভিতর ও বাহির দুই দিকের বাধাই প্রবল-শক্তিতে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্তর যার বাধানিমুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। বাহির যে অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গ'ড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই,—সে কোন বাধা মান্‌বে না। তাই আজ কঠোর আত্ম-পরীক্ষার

প্রয়োজন হয়েছে। অন্তরে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'লে বাহিরের অধীনতা ঘুচ্‌বেই।

ভারত আজ দুঃখের অতলস্পর্শ সাগরে ডুবে আছে, উঠ্‌তে পার্‌ছে না। আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বল্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছি না; নরম বা গরম কোন দলেরই আমি নই; আবার নরমই হোক্ আর গরমই হোক্ যা-কিছু আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর ক'রে দেয় তাই আমি পরম পবিত্র বস্তু ব'লে জ্ঞান করি।

১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় যাঁরা ভেসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার ভাঁটার মুখে উল্টাপথে ভেসে যাচ্ছেন। যাঁরা স্রোতের মুখে তৃণের মত, নূতনের প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য যাঁদের উৎকট পুরুষকার নেই, তাঁদের উদ্দীপনার অগ্নিশিখা শেষে গোলদীঘির ধারে বক্তৃতা ও হাঁকডাকের ধূমরাজিতে পরিণত হ'ল। ব্যবসা-নীতি ও অর্থশাস্ত্রের ক-খ-জ্ঞান নেই, তাই শুধু বক্তৃতার দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও অর্থসংস্থানের ব্যর্থ চেষ্টা আমাদের ভিতরে বাহিরে খুব একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে গেল। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্‌লার শিল্প জাগ্‌ল না—কিন্তু জাগ্‌ল—বোম্বাই শিল্প। বোম্বাই প্রদেশে কাপড়ের কলকারখানা স্বদেশীর হাওয়ায় বেশ শ্রীসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল।

বাঙ্‌লায় স্বদেশীশিল্পের যে পুনরুত্থান হয় না তার প্রধান কারণ বাঙালী উদ্যমহীন, অলস ও আরামপ্রিয়। আবেগপূর্ণ ভাবপ্রবণতা দ্বারা আমরা হনুমানের মত এক লাফে সাগর পার হতে চাই। কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাসের পশ্চাতে বিপুল কর্ম্মচেষ্টা না থাকায় আমাদের কেবল ভরাডুবি হতে হয়। আবার ভিতরের এই সাংঘাতিক বাধা-সকলকে আমরা কথার চটকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নীরব সাধনা ভিন্ন যে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব—এই খাঁটি কথাটি সত্যভাবে স্বীকার কর্‌তে আমরা কুণ্ঠিত হই; কিন্তু অকুণ্ঠিত চিত্তে কেবল গলাবাজীর দাপটে আমরা দু'বেলা দেশোদ্ধার ক'রে থাকি।

বোম্বাই ও কল্‌কাতার মধ্যে তফাৎ অনেক। বোম্বাই শহরে মালাবার পাহাড়ের রমণীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে এবং সমুদ্রসৈকতে যে-সকল সুসজ্জিত প্রাসাদ, তার প্রায় সকলগুলি আমাদের দেশবাসীর। কিন্তু কল্‌কাতার চৌরঙ্গীতে কালা আদ্‌মীর স্থান নেই—তারা থাকে [redacted] "নেটিভ" কোয়ার্টারে যেখানে আলো ও বাতাস অল্প মলিনতায় প্রায় ডুবে যায়। বোম্বাই শহরে স্যর দোরাব[redacted] স্যর বিঠলদাস ঠাকারস্যে, স্যর ফজল্‌ভাই করিমভাই প্রভৃতি—এঁরাই হচ্ছেন ঐ সকল প্রাসাদের মালিক। এঁরা মহাধনী, শিক্ষিত, কৃতবিদ্য। স্যর বিঠ্‌লদাস স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর্‌তে একদিনে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন। বাঙ্‌লায় এমন মহাপ্রাণ বণিক্‌রাজ আছে কি? স্যর ফজলভাই কয়েকটা কলের স্বত্বাধিকারী। কোন কোন কলে ১০০ টাকায় ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত মুনাফা দিয়েছে। আর আমরা ১৮ লক্ষ টাকা মূ·ধনের ভাঙা "বঙ্গলক্ষ্মী" নিয়ে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাচ্ছি।* আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও কর্ম্মকুশলতা এতই অল্প যে বাঙ্‌লায় ২।১টি ছোটখাট কল চালাবার জন্যে হয় ইংরেজ, নয় বোম্বাইবাসীকে ম্যানেজার নিয়ে আস্‌তে হচ্ছে। এই ১৪ বছর কেবল চীৎকারে কাটালাম।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার হ'তে প্রতি বৎসর ৩০০ কোটি টাকার নানাপ্রকার কাপড় বিদেশে রপ্তানি হ'ত। তার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাপড় ভারতের বাজারে আস্‌ত। এই ১০০ কোটি টাকার কাপড় যাদের দর্‌কার তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র কৃষক। কোন রকমে লজ্জা নিবারণের জন্যে আমাদের দেশে এই ১০০ কোটি টাকার কাপড়ের প্রয়োজন। তার মধ্যে কল্‌কাতা হ'তে ৪০-৫০ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় বাঙলার বিভিন্ন জেলায়, বিহার ও আসামে চালান্ হয়। এই কোটি কোটি টাকার কাপড় একদিনে গোলদীঘির আন্দোলনে উৎপন্ন হবে কি? পাঁচ-ছয়টা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কল-কারখানার সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট।* নানা-প্রকারের ব্যবহার্য্য জিনিস যাতে দেশেই উৎপন্ন হয়,

* ১। Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. ২। Calcutta Pottery Works. ৩। Calcutta Soap Works. ৪। Bengal Canning and Condiments Works. ৫। Bengal Miscellany. আরও ২।১টি আছে।

তার জন্য চেষ্টা করাই আমি জীবনের ব্রত করেছি। আমি নিজকে "স্বদেশী" ব'লে পরিচয় দিলে বোধ হয় কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। অভিজ্ঞতার ফলে এই সহজ সত্যটি আমি উপ-[redacted]বৃতে পেরেছি যে, ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান বা ব্যবসা-বাণিজ্য [redacted]ন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হলে কঠোর তপস্যা চাই। নীরব সাধনা ভিন্ন এক দিনে এক লাফে কোন কাজই হবে না।

কিন্তু আমরা লাফ দিয়েই কেল্লা মেরে ফতে করতে চাই। আমার কাছে অনেক ছাত্র—কি করবো?—এই প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁদের চাল-চলন ও কথার ভাবে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তাঁরা একটা কিছু ব্যবসা ফেঁদে একেবারে রাতারাতি বড়লোক হতে চান। স্কুল-কলেজের যুবকগণ যা গলাধঃকরণ করেন, পরীক্ষা-মন্দিরে তা উদ্গিরণ ক'রে ডিগ্রি লাভ হলেই ব্যস্ মা সরস্বতীর সঙ্গে একবারে সেলাম-আলেকম্। তারপর উদ্যম-অধ্যবসায়ের ত কোন ধারই ধারি না—শুধু ব্যবসা-মন্ত্রটা মুখে উচ্চারণ ক'রেই একেবারে লাট হবার স্বপ্ন দেখা। ব্যাপার মন্দ নয়।

সম্প্রতি দেখে এলাম বিলাতে প্রায় ২৫০০ ভারতীয় ছাত্র নানাপ্রকার বিদ্যার্জ্জন করছেন। তাঁদের অধিকাংশই তাড়াতাড়ি একটা বিলাতি ডিগ্রী নিয়ে দেশী ডিগ্রীর উপর চড়া দিয়ে মোটা মাহিনার চাকরী জুটিয়ে নিতে চান। বাণিজ্য-ব্যবসার কেন্দ্রস্থানে শিক্ষা-লাভ করতে গিয়েও তাঁদের আড়ষ্ট বুদ্ধি সাড়া দেয় না; ঐ ডিগ্রী, আর চাকরী। বুদ্ধি খাটিয়ে আপন হাতের জোরে কিছু সৃজন ক'রে তোলবার কল্পনা তাঁদের মনে কখনও জাগে না। এবার বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পথে জাহাজে দু'জন দেশীয় বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতার এক ধনী সওদাগরের পুত্র। লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তাঁদের ব্যবসার কেন্দ্র আছে। আর একজন গুজরাটী বেণিয়া—১৪ মাস বিলাতে ছিলেন—পশমী জিনিষের ব্যবসা করেন। এই দুটি যুবক শিক্ষিত, কিন্তু তাঁদের ডিগ্রী নেই, তাঁরা ডিগ্রীধারী নন। জাহাজে একজন ন্যাপ্‌সিনির জীবনচরিত পাঠ করছিলেন আর একজন প্রসন্ন মনে তার বৈয়াম্ এবং পরে Light of Asia পাঠ করতেছেন। তাই বলি ব্যবসা ও শিক্ষায় বিরোধ নেই—এ কথারই নেই। কার্ণেগী ও রকফেলারের নাম কে না জানেন? এঁদের শিক্ষা যেরূপ গভীর, ব্যবসার বিস্তার সেইরূপ অদ্ভুত। জনসাধারণের হিতার্থে কার্ণেগী ১০০ কোটি টাকা ও রকফেলার বিদ্যাশিক্ষার ও নরহিতের জন্য ১৫০ কোটি টাকা দান করেছেন। এঁদের জীবন এক দিকে, অধ্যবসায়, শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কর্ম্মণ্যতা ও মহাপ্রাণতার অপূর্ব্ব সঙ্গম। আর আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে অন্য দেশে বহু চেষ্টায় যা [redacted] হয়েছে আমরা একপ্রকার বিনা চেষ্টায় শুধু গলাবাজীর দ্বারা তা সারতে চাই। কিন্তু গলাবাজীর বক্তৃতে গলাই ভেঙে যায়, আসল কাজ এতটুকুও হয় না। তবু আমরা নিজের আলস্য ও উদ্যমহীনতার দোষ দিই না—দোষ দিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার। কেউ বলেন—উঃ বড় গরম, কাজ করতে পারি না; আবার কেউ বলেন—উঃ কি শীত, কাজে হাত পা উঠে না।

তারপর সুপ্রচলিত 'নেশন' শব্দটির (আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা ক'রে) বিচার করা যাক্। [redacted] হিন্দু-মুসলমানের দেশ—উভয়ের মাতৃভাষা এক, [redacted] হাওয়ায়, সুখদুঃখ-অন্নজলে, সুখে দুঃখে, আমরা এক বটে। কিন্তু ধর্ম্মে আমরা পরস্পর থেকে [redacted] মধ্যে আবার নানা-প্রকার উপজাতি সব [redacted] একটা ক্ষণিক আবেগের বশে আমরা হিন্দু [redacted] হয়েছি বটে, কিন্তু এই একত্ব কি দৃঢ়ভিত্তি [redacted] হয়েছে? একদিনেই বনিয়াদ পাকা হ'য়ে যাবে [redacted] আশা অবশ্য আমি করি না। তবু আপনাদের এ [redacted] সত্যবস্তু ক'রে তোলবার জন্যে আমরা বাস্তবিক [redacted] কোন সত্য চেষ্টা করছি? দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদে [redacted] সন্ন্যাসী আপন মর্ম্মকথা ব্যক্ত করেছেন। [redacted] তা হয়েছে—মহামতি তিলকের [redacted] মিলে বহন করেছে। সবচেয়ে যে [redacted] এসকলই আমার কথা। কিন্তু এ সম্মিলন [redacted] এখনও ভেদনীতির কথা অন্তর হতে [redacted] সম্মান দিচ্ছি বটে, বাস্তু পাতে [redacted]

আবার লক্ষ্ণৌ সহরে শিয়া মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়। কেন এই স্বাতন্ত্র্য? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ে এমন কি বস্তু আছে যা হিন্দু মুসলমান আপন আপন ভাইএর মত পাশাপাশি ব'সে শিখ্‌তে পারে না? হিন্দু মন্দিরে পূজা করেন, মুসলমান মস্‌জিদে উপাসনা করেন। কিন্তু শিক্ষা-মন্দিরে যদি আমরা হিন্দুমুসলমান এক আসনে বস্‌তে না পারি, তবে কি ক'রে বলি যে আমরা ভাই ভাই হয়ে মিল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। আমরা যে ইচ্ছা ক'রে বুদ্ধির দোষে পরস্পর থেকে পৃথক্ হয়ে যাচ্ছি। কোথায় সার্ব্বভৌমিকতা ও উদারতার প্রতিষ্ঠা কর্‌ব—তা না ক'রে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে আমরা নিজেকে আবদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। এই কি হিন্দুমুসলমান-সম্প্রীতির লক্ষণ? এই কি জাতি গঠনের সূচনা?

আমরা এখন "জাতীয়" শিক্ষা চাই। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কি? জাতীয় শিক্ষা অর্থে কি বটতলার বই পড়া? আর্য্যসমাজের লোকে জাতীয় শিক্ষার অর্থ কর্‌বেন বেদপাঠ করা; কেননা তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বল্‌বেন—বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা-দ্বৈত-বাদ বিচার কর। আবার কেহ বা বল্‌বেন—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ কর। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান্ প্রভৃতি নানাধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীগণ সকলে এই ব্যবস্থায় সম্মত হবেন কি? মুসলমান জাতীয় শিক্ষা অর্থে বল্‌বেন—কোরান পড়। খৃষ্টান বল্‌বেন—বাইবেল পড়। এত মতের অনৈক্য হ'লে আসল কাজে যে বাধা পড়্‌বেই।' পরম-ধার্ম্মিক হিন্দু রাজার রাজত্ব-কালে শূদ্র তপস্যা করেছে ব'লে তার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা হল; মনুমহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ-শব্দ প্রবেশ কর্‌লে উত্তপ্ত তরল সীসক সেই কর্ণে ঢেলে দিতে হয়। এই মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি? বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হ'লে বাঙ্‌লায় শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি কর্‌বে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন্ পন্থী হলে মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে? আমরা হিন্দু মুসলমান এক ব'লে আহ্লাদে নৃত্য কর্‌ছি, কিন্তু মুসলমান আমাদের জল ছুঁলেই সর্ব্বনাশ। [illegible]

হ'লে পানিপাঁড়ে, আর চা খেতে হ'লে কেল্‌নার্। কি চমৎকার! বক্তৃতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে অনেক যুবক দেশোদ্ধার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ কর্‌বেন প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু আবেগ ও উত্তেজনা কতদিন [redacted] হয়? বি-এ বা এম্-এ পাশ ক'রে যে সব যুবক দেশের কাজ কর্‌তে অগ্রসর হচ্ছেন, তাঁরা কতদূর ত্যাগস্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত আছেন জান্‌তে চাই। কল্‌কাতার অনেক ছাত্রাবাসে বামুন, কায়েত, নবশাখের আলাদা আলাদা ঘর; এদিকে বাবুর্চ্চির হাতের অমৃত আস্বাদনে কারও বাধে না। সমাজে বামুনের কাছে সব জাতিই অপাংক্তেয়। শিক্ষিত যুবক! নমঃশূদ্রকে দেশবাসী ভাই ব'লে তার সঙ্গে একসাথে খেতে দাঁড়াতে পার? বিবাহের সময় বরপণ গ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার? তোমাদের বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে হতভম্ব লেগে যায়; এত বিচিত্র কুলশীলের তালিকাও তোমাদের আছে! তোমার বিয়ের যৌতুকের চাপে কত স্নেহলতা আত্মহত্যা কর্‌ছে তার সংবাদ রাখ? না ঠিক ঐ সময়ে তোমার পিতৃভক্তির উৎস উথ্‌লে ওঠে—"কি কর্‌ব, আমার ত পণগ্রহণে অনিচ্ছা, কিন্তু বাবা বল্‌ছেন! ও বাবা! তিনি যে বুকে ধ'রে মানুষ করেছেন, সেই বুকে কি ক'রে শেলবিদ্ধ কর্‌বো?" হায়রে "বাবার" দোহাই! হে উপাধিধারী যুবক, তুমি ঘোড়া গরু ও ছাগলের মত নিজকে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রীত হতে দেও—ধিক্ তোমার শিক্ষা, ধিক্ তোমার দীক্ষা। তুমি আবার স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আগুয়ান! তুমি মানসিক-দাসত্বের নিগড় আপন চরণে এমন ক'রে পরিয়েছ, যে, এক পাও অগ্রসর হতে পার না। তুমি দেশাচার-জুজুর ভয়ে এত ব্যতিব্যস্ত যে কোনও প্রকার সমাজ-সংস্কারে হাত দিতেও ভীত হও। তুমি বারেন্দ্র হয়ে 'কাপের', বঙ্গজ হয়ে দক্ষিণরাঢ়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌তে বল্‌লে, ভয়ে আড়ষ্ট হও।*

* Wanted Rarhi Savab Brahmin bride for (1) Bharadwaj M.A, (2) Sandilya M.A. Bhanga brides for (1) Sandilya Dy. Magte. Cal. house, (2) Sandilya B.Sc.,B.E., (2) Kashyap M.A., B.L., Cal. house, (4) Bharadwaj M.A., Cal. house. Bangaj Kayestha brides for (1) Basu M.A., (2) Ghose M.A., (3) Roy, pay Rs. 750. Bangaj Baidya brides for (1) Dhanantari Dy. Magte, (2) Saktri M.Sc.

(Bengalee হইতে গৃহীত)

আর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। On national linesএর মানে কি? ইংরেজী ভাষা একেবারে বাদ দেওয়া চল্‌তে পারে কি? শিব[redacted] প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-[redacted]" পুস্তকে যাঁরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন কারও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন এদেশে হয়নি। বরং আমাদেরই একটা গর্ব্বের বিষয় এই যে রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ ঐ কলেজ স্থাপিত করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন ক'রে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখেছিলেন তা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ ক'রে দেখা উচিত। তিনিই প্রথম প্রণিধান করেছিলেন যে পদার্থবিদ্যা রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতি স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত জ্ঞানরাশি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন আয়ত্ত না করলে, দেশের চিন্তাস্রোতে জোয়ার আস্‌বে না; শুধু সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অধ্যয়ন করলে দেশকে মধ্যযুগের অন্ধকারেই প'ড়ে থাকতে হবে। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রধান উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার ফল আজ ফলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন স্থানে যথার্থই বলেছেন যে কিছুকাল আগে জন্মগ্রহণ করলে কলম ধ'রে "বঙ্গ দেশের কৃষক" বা অন্য উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ বা উপন্যাস না লিখে, তিনি পাঁজী হাতে করে নবমীতে লাউ খেতে আছে কি না তার বিচার করতেন। ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের শিক্ষা করবার অনেক জিনিষ এখনও আছে। নূতন কোন বিষয় শিখতে হ'লে পাঠাগার থেকে আপনারা ইংরেজী বা বাঙলা কোন্ পুস্তক নিয়ে আসেন সে কথা ভেবে দেখলে আমার উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি মাতৃভাষার নিন্দা করছি না। কিন্তু গায়ের জোরে ভাষার দৈন্য চাপা দিতে আমি একবারেই প্রস্তুত নই। বরং পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে সর্ব্ব বিষয়ে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধিশালিনী করবার জন্যে আমাদেরও মধুসূদনের মত বলতে হবে—

"রচিব এ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মিল্‌টন, দাঁতে, হোমার, ভার্জ্জিল প্রভৃতি নানা [illegible] মধুচক্র হতে মধুসূদন মধুসংগ্রহ করেছিলেন। একি লজ্জার কথা? ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব কি [illegible] নাথের কাব্যে দেখা যায় না? On national মানে কি নবদ্বীপের টোল বা মুসলমানদের মক্তাব? [illegible] সাহিত্যচর্চ্চার ফলে দেশে রাজনীতিচর্চ্চা আরম্ভ হ'ল। No taxation without representation সাহিত্যের কথা? মনুর মতে রাজা দেবতা; তাঁর [illegible] অভিযোগের স্থান নেই—যা বল্‌বেন তাই মান্‌তে হবে। কিন্তু আজ যে আমরা মানুষের জন্মগত অধিকার [illegible] বুঝে নেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছি, তার [illegible] কোন্ শিক্ষা হ'তে? হাম্‌ডেন, পিম্ প্রভৃতি স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোহিত জননায়ককে ভুলতে [illegible] বিষম ভুল হবে!

বর্ত্তমান সময়ে জাতিগঠনের আন্দোলনে [illegible] ও স্ত্রীশিক্ষার স্থান আমরা কোথায় দিয়েছি? [illegible] নব জাগরণের দিনে যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ [illegible] হ'ল, তখন ব্রজেন্দ্রকিশোর পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেন, [illegible] চন্দ্র এক লক্ষ টাকা দিলেন, সূর্য্যকান্ত আড়াই লক্ষ [illegible] আরও অনেকে মাসিক সাহায্য দিলেন। কিন্তু [illegible] পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি ব'লে যে কেউ আছেন এবং [illegible] একবারেই ভুলে গেলেন। মা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণীকে ক'রে রাখলে কি লাঞ্ছনা হয় তা ত আমরা প্রতি [illegible] পারছি। তবুও আমাদের চেতনা হয় না! ইংরেজ যুদ্ধে স্ত্রীলোক কত কাজ ক'রে দিয়েছেন তা আজ সকলে জানেন। আমাদের ঐ সময়ে স্ত্রীলোকের [illegible] সাহায্য পাবার আশা কতটুকু? তাঁদের গতানুগতিক [illegible] পুতুল ক'রে রেখে আমরা সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ [illegible] পক্ষাঘাতে পঙ্গু ক'রে রেখেছি। স্ত্রীশিক্ষার [illegible] কোথাও দেখছি না। আর পুরুষের যা [illegible] ডিগ্রী ও চাকরীর লোভে।

আবার লোকশিক্ষার কথা যদি ধরা যায় [illegible] বুক শুকিয়ে ওঠে। বেশের শতকরা [illegible]

আপনাদের শিক্ষার জন্য আমরা স্কুল কলেজ স্থাপন করছি; কিন্তু কোটি কোটি লোক যে অজ্ঞতার স্তূপের নীচে চাপা প'ড়ে মারা যাচ্ছে। তাদের বাঁচাবার জন্যে আমাদের ক'জনের প্রাণ কেঁদেছে? লোকশিক্ষার জন্যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা হ'তে শুনেছি, কিন্তু খুব অল্প কর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হ'তে ত দেখিনি। কিন্তু এই বিপুল জনসঙ্ঘ যদি চিরকালই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে, তবে কি আমরা আকাশ থেকে জাতিগঠনের উপকরণ সংগ্রহ করবো? জনসাধারণকে নিয়ে জাতি। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা অন্য কিছু হ'তে পারে, কিন্তু জাতি কোন কালেই নয়। জাগরণের ঢেউ জনসঙ্ঘের কাছে পৌঁছান চাই। যদি জিজ্ঞাসা করি—কলিকাতার দোকান-পাট বন্ধ হয়েছিল কেন? উত্তর হবে—মহাত্মার হুকুম। "কেন?" "তা জানি-না।"* কিন্তু জাপানে-ও ইংলণ্ডে এরকম অজ্ঞতা দেখা যায় না। শতকরা ৯৫ জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে জাতির দেহে বলসঞ্চারের সম্ভাবনা কোথায়? প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জেলে দিতে হবে। তবেই ত রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের ইচ্ছা, শক্তি, ও সহানুভূতির উপর দাঁড়াতে পারবে। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেই পুণ্যশ্লোক গোখলে জীবনের শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছিলেন!

জনসাধারণের শক্তির উপর ভিত্তি নেই ব'লে ভারতবর্ষে অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। রণজিৎ সিংহ বা হায়দার আলির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। দেখা গিয়েছে সেনাপতি যেমনই হত হলেন, অমনি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খরগোশের মত পালিয়ে গেল। তাই বলি কোন আন্দোলনই শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের নিয়ে সফল হয় না। জনসাধারণের উপর ভিত্তি না থাকলে সব ইমারত তাসের ঘরের মত ভূমিসাৎ হ'য়ে যায়। আমি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা রাজনীতিক দলের উপর কটাক্ষ করছি না। আমি দূর থেকে ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে অভিজ্ঞতার দ্বারা যেটুকু বুঝেছি তাই দেশবাসীকে জানাচ্ছি। আমাদের অনেক গলদ আছে। দেহের মধ্যে যদি দূষিত ক্ষত থাকে তবে [redacted]ৎসা চাইই চাই। পূঁজ রক্ত বাহির ক'রে দি[redacted] দিলে শুধু মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে।

আজ দেশই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাঁর পূজার নৈবেদ্য সকলকেই সাজিয়ে আনতে হবে। কারও মুখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকলে রাজার পুকুরে দুধ ঢাল্‌বার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে না,—আসবে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পূজায় সবারই সমান অধিকার। সকলকেই এ পূজার উপকরণ জোগাড় ক'রে আনতে হবে। হিন্দু মুসলমান হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে সত্যধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করবে।*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

পূজারিণী

"তুমি কি ওর স্পর্দ্ধা আরো আমায় সহ্য করতে বল, মন্ত্রী?"

"সহ্য করতে আর অনুরোধ করি না, মহারাজ; কিন্তু অমর সর্দ্দারের কাজের ভিতর যোন স্পর্দ্ধার চিহ্ন ত দেখতে পাই না।"

"স্পর্দ্ধা নয়?"

"না মহারাজ। অঙ্কুর হ'তে গাছ বেড়ে ওঠে, সেই বাড়ার ভিতর দিয়ে তার যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে তারই পরিচয় সে দেয়। বেড়ে ওঠা তার স্পর্দ্ধা নয়, মহারাজ।"

"তোমার পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ হ'লাম মন্ত্রী, কিন্তু শুনেছি কি, দক্ষিণ সীমান্তের যত পার্ব্বত্য জাতি তাকেই রাজা ব'লে মেনে নিয়েছে?"

---

* হরতাল কেন? একথার উত্তর অনেক বেহায়া ও "সাধারণ" শ্রেণীর লোক প্রকৃতই দিতে পারেনি। কেবল উত্তর পেলাম—"গান্ধী মহারাজের হুকুম।"

* বালি নিবাসী শ্রীমান রতনমণি চট্টোপাধ্যায় আমার বক্তৃতার সারাংশ বিবৃত করিয়া বক্তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"শুধু তাই নয়, মহারাজ, ওরা বলে 'অমর সর্দ্দার যে মাটির ওপর দিয়ে চলে যায় সে মাটির স্পর্শ পেলে পাপ দূর হয়।' শুধু দক্ষিণ নয় মহারাজ, তার সঙ্গে অন্য তিনটি [redacted] স্বেচ্ছায় তাদের গর্ব্বিত মাথা ঐ মাটির [redacted] দিয়েছে। আমরা আছি ঠিক মাঝখানে, মহারাজ। আমাদের ঘিরে আছে অমর সর্দ্দার আর তার প্রজা। সাগরের জল যেমন ক'রে দ্বীপকে ঘিরে থাকে।"

"সেই কথাই ত আমিও ভাবছি, মন্ত্রী, কিন্তু এবার ঐ সাগরের তর্জ্জন গর্জ্জন, তার ঢেউয়ের আস্ফালন মাটির সঙ্গে এনে মেশাতে হবে—"

"ঠিক কথা মহারাজ, জল আর মাটি যতক্ষণ আলাদা আলাদা থাকে ততক্ষণই ওদের বিরোধ, কিন্তু যেম্‌নি মিশে যায় অম্‌নি দেখি দিকে দিকে রঙ্গিন হাসির বন্যা ব'হে যাচ্ছে। এবার ঐ জলকে মাটির সঙ্গে এনে মেশাবার সময় হয়েছে, মহারাজ।"

"তবে আর দেরি নয়,—সেনাপতি!"

বাঁকা তলোয়ার কোষ হ'তে বার ক'রে রাজার পায়ের [redacted] রেখে সেনাপতি বল্‌লেন—"মহারাজ।"

"অমর সর্দ্দারকে এবার নামিয়ে আন্‌তে হবে।"

সেনাপতির সঙ্গে সহস্র বীর সেনা গর্জ্জে উঠ্‌ল—"মাটির ওপর।" তাদের অস্ত্রগুলি চঞ্চল হ'য়ে একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠ্‌ল।

মন্ত্রী হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন—"কিন্তু একি মহারাজ! এত সেনা, এত অস্ত্রের কি প্রয়োজন?"

রাজসভায় অস্ফুট হাস্য-বিদ্রূপের আভাস জেগে উঠ্‌ল। একজন বল্‌ল—"অমর সর্দ্দার যে গাছের ফল নয়, ইচ্ছা কর্‌লেই তাকে যে নামিয়ে আন্‌তে পারা যায় না তা হয়ত মন্ত্রী মহাশয়ের জানা নেই, অমর সর্দ্দারের প্রত্যেক সেনা যে তারই দেহের অংশ মাত্র ছাড়া আর কিছু নয় তার পরিচয় সেনাপতি স্বয়ং কিছু পেয়েছেন।" আর একজন বল্‌ল—"কিন্তু ভাই, একথা মন্ত্রী মহাশয়কে বোঝান একটু শক্ত হ'বে, কেন না, ওঁর আসনটি রাজসভার মধ্যেই অচল হ'য়ে থাকে, আমাদের আসনগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের নরমেধযজ্ঞের আগুনের মধ্যে সচল হয়ে বেড়ায়। সেনা আর অস্ত্রের প্রয়োজন তাই আমরাই ভাল বুঝি।"

রাজা বিরক্ত হ'য়ে মন্ত্রীকে বল্‌লেন—"এ ছাড়া তাকে নামাবার আর কি উপায় আছে?"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"আছে, মহারাজ, আছে। [redacted] নামাবার সব চেয়ে সহজ উপায় ওকে উঠ্‌তে সাহায্য করা।"

ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বল্‌লেন—"একি পরিহাস?"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"পরিহাস করিনি মহারাজ,— [redacted] ভেবেই বল্‌ছি, জয় কর্‌বার ওই ত সহজ উপায়।"

কটিবন্ধ হ'তে তরবারি খুলে নিয়ে সেটি [redacted] চেপে ধ'রে রাজা বল্‌লেন—"অর্থাৎ আমার এই মুকুট [redacted] মাথাটা ঐ সমস্ত বর্ব্বরদের সঙ্গে এক জায়গায় নিয়ে [redacted] ফেলি—তুমি এই পরামর্শ দিতে চাও? কিন্তু জান না কি আমি রাজা? যার মাথায় মুকুট আশ্রয় নেয়, সিংহ [redacted] যার আসন হয়, সাধারণের মধ্যে তার ঠাঁই নেই। [redacted] অনেক উঁচুতে—অনেক তফাতে। মুকুটপরা মাথা [redacted] দিকে নুয়ে পড়ে না। জয় করাই তার কাজ। [redacted] মানা নয়। অমরের সমস্ত তেজ, দর্প, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, [redacted] এই আসনের মাটির নীচে এনে ফেল্‌তে হ'বে, [redacted] রাজার কাজে অবহেলা করা হয়।"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"কিন্তু মহারাজ, যে আলোকশিখা [redacted] উঠেছে তাকে নিভিয়ে না দিয়ে তার তেজ, তার ঔজ্জ্বল্য [redacted] বাড়িয়ে তুল্‌লে আপনার অসম্মান ত হ'বে না। ঐ [redacted] আপনার যথার্থ কীর্ত্তি। ও কীর্ত্তির শিখা শুধু বেড়ে [redacted] ওপরের দিকেই উঠ্‌বে, আপনার মহিমা প্রচার [redacted] ওকে নিভিয়ে দিলে ত তা হবে না, যা হবে তা শুধু কা[redacted]"

রাজা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হঠাৎ সমস্ত [redacted] আস্ফালন থেমে গেল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল [redacted] সারঙ্গী বাজিয়ে গান কর্‌তে কর্‌তে সভার মধ্যে [redacted] কিন্তু সে ত যুদ্ধের গান নয়। ও গানে ত বুকের [redacted] নেচে ওঠে না। ও গানে যে বুক ভেঙ্গে পড়ে, [redacted] জল ভ'রে ওঠে। সমস্ত অভিমান ভুলে মাটির [redacted] লুটিয়ে পড়্‌বার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। যেন [redacted] অজানা ব্যথার উৎসের মুখ খুলে দিয়ে মনকে [redacted] ক'রে দিল!

অবাক হ'য়ে রাজা বল্‌লেন—'কে ও!'

রাজার কথার উত্তর কেউ দিল না। সৈন্যদের [redacted]

হাতেই রইল, তাকে কোষে রাখ্‌বার কথা যেন সবাই ভুলে গেছে। চোখের পাতা ফেল্‌বার ইচ্ছাও যেন তাদের নেই। স্তব্ধ সভা মুখরিত ক'রে গান উঠ্‌ল;—"ওগো রাজা,—আমার রাজা, মরুভূমির বুকের ওপর যদি শুধু আগুন বৃষ্টিই কর তাহ'লে তার বাঁচা যে বৃথা হ'য়ে যায়। বুক ভরা যে তার তৃষ্ণায়, সে ত আগুন দিয়ে মিট্‌বে না। ওগো রুদ্র, শেষ কর তার দহন, নেমে এস তোমার স্নেহের বর্ষণ নিয়ে। আগুনে পুড়ে তোমায় ও যে ভক্তি করে, সে ভক্তির জন্ম যে ভয় হ'তে। মরু তোমায় ত ভক্তি করতে চায় না, সে চায় ভালবাস্‌তে। রাজা তোমায় ভালবাস্‌তে না পার্‌লে তোমার সঙ্গে তার মিলন ত পূর্ণ হ'বে না।"

রাজা বল্‌লেন—"কে তুমি কুমার? পর্ব্বতের মত দৃঢ় তোমার দেহ কিন্তু কি লাবণ্যভরা! চোখে তোমার অশ্রুকণা, কিন্তু ওরই আড়ালে কি আগুন লুকান আছে! কণ্ঠে তোমার ওকি সুর!—কে তুমি কুমার?"

রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে গায়ক বল্‌ল—"আমি ভিখারী মহারাজ, অন্য কিছু পরিচয় দেবার নেই।"

"বৎস, তোমার নাম?"

"ভাই।"

বিস্মিত হ'য়ে রাজা বল্‌লেন—"সে কি! ভাই ত নাম হ'তে পারে না?"

"ঐ নামেই সবাই আমায় ডাকে, মহারাজ।"

"কিন্তু আমি ত তোমাকে ও-নামে ডাক্‌তে পার্‌ব না, কুমার। তোমার আমার মধ্যে যে একটা মস্ত বড় প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে; ওকে সরান ত যায় না।"

সারঙ্গীর তারে মৃদু একটু মীড় টেনে গায়ক বল্‌ল—"তবে আমায় দাস ব'লে ডাক্‌বেন। ও নামও আমায় বেশ মানাবে।"

এমন অদ্ভুত কথা ত কেউ কখনও শোনে নি! সেনাপতি বল্‌লেন,—তোমাকে ত কোন দিন এ-রাজ্যে দেখিনি!"

"না সেনাপতি, যদিও এ-রাজ্যে আস্‌বার সৌভাগ্য এর পূর্ব্বে আমার হয়নি, তবুও এ-রাজ্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বড় গভীর—পাতার সঙ্গে গাছের মত। এ-রাজ্যের সীমান্তে আমার বাস।"

"কোন্ সীমান্তে?"

"এ-রাজ্যের একটি মাত্র সীমাই ত আছে, দ্বিতীয় ত নেই।"

"কি রকম?"

"সীমান্তবাসীরা জানে না উত্তর আছে কি দক্ষিণ আছে, তারা তা জান্‌তেও চায় না। তারা জানে শুধু যে তারা তাদের রাজাকে ঘিরে আছে। তিনিই তাদের লক্ষ্য। রাজা ত বিশেষ কোন একটি দিকে নেই, তিনি আছেন মাঝখানে। সীমান্তবাসীরা তাই সেই মাঝখানটির দিকে তাকিয়ে আছে।"

রাজা হেসে বল্‌লেন—"বুঝেছি, তুমি বুঝি অমর সর্দ্দারের লোক?"

"হাঁ মহারাজ।"

"তাকে তুমি চেন?"

"চিনি মহারাজ, খুব চিনি। সবাই তাকে চেনে।"

"তার কিছু পরিচয় তুমি আমায় দিতে পার? আমি জান্‌তে চাই সে কি ক'রে এই বিশাল জনসমুদ্রের গতিকে আপনার ইচ্ছামত ফিরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধব্যবস্থা আমার অজানা নয়, শক্তিও আমার অল্প নয়; কিন্তু এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও ওর মত এমন ক'রে সকলকে আমার ইচ্ছার অধীন ক'রে নিতে পারিনি। তাই সময় সময় মনে হয় অমর সর্দ্দারের শাসন-দণ্ডে মন্ত্রবলও কিছু আছে।"

"আছে মহারাজ। সে মন্ত্র মুখের কথা—চোখের জলে সিক্ত করা।"

সেনাপতি বল্‌লেন—"ঐ চোখের জল দিয়েই তিনি শত্রু জয় করেন?"

"হাঁ।"

রাজা বল্‌লেন "কিন্তু এমন শত্রুও ত থাক্‌তে পারে যে চোখের জলকে মানে না।"

যুবা হেসে বল্‌ল—"একদিন তাকে মান্‌তেই হয়, মহারাজ।"

"তুমি তার কি প্রার্থনা নিয়ে এসেছ, কুমার?"

যুবা বল্‌ল—"অমর ধনের কাঙ্গাল নয়, মহারাজ। অনশনকে সে ভয় পায় না, ঝড়-ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ মনে করে। বাধা-বিপদের বুকেই তার জন্ম। সে পেতে চায় আপনাকে

—কিছুতেই সে আর আপনার কাছ থেকে দূরে থাকবে না —এই তার পণ। আপনাকে এবার নেমে আসতে হবে।"

"রাজা হেসে বল্‌লেন—"আমরাও এতক্ষণ সেই আলোচনাই করছিলাম।—কিন্তু আমি ভাবছিলাম তাকেই আমিই আনব।"

—"সে ত মাটির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে, মহারাজ, তাকে আর কোথায় নামাবেন? সে চায় আপনিই নামুন, ও-সিংহাসনের ব্যবধান তার আর সহ্য হচ্ছে না।"

"সেইজন্যেই কি তার এই বিরাট আয়োজন?"

"হাঁ মহারাজ।"

"কিন্তু আমি ত নামব না, কেন না আমি রাজা। আর যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রাজার ওপর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করছে সে মাটিও তার পায়ের তলা হ'তে সরিয়ে নেবো। তাহলেই তার সঙ্গে আমার মিলন সম্পূর্ণ হ'বে।"

"কিন্তু মহারাজ, সে ত মাটির ছেলে। তার সে অধিকার কেড়ে নিলেও ত যাবে না। আপনাকেই নামতে হ'বে।"

"আমিও তাই পরখ ক'রে দেখতে চাই। তোমার সর্দ্দার চোখের জলে অনেক জয় লাভ করেছে; এবার নিজেকে তার সাম্‌নে ধ'রে দেখব সেটা সম্ভব কি না।"

"সেই ভাল মহারাজ, আপনি পরখ ক'রেই দেখুন, কিন্তু আর অমন ক'রে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবেন না। অমর আপনার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে মেখে নেবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে।"

"এ স্পর্শ হয়ত সুখের হ'বে না কুমার।"

"এ স্পর্শ বড় দুঃখের হ'বে, মহারাজ। কিন্তু অমর ওকে ভয় করে না। সে বলে—'সুখ জিনিসটা সবচেয়ে মিথ্যা। ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখই ত আমাদের সব চেয়ে আপনার। ওরই মাঝে ত আমাদের যথার্থ রূপটিকে দেখা যায়।' অমর ঐ দুঃখকে বরণ ক'রে নিয়ে নিজেকে এবং তার রাজাকে পেতে চায়। আপনাকে সে ঐ সিংহাসন হ'তে নামাবেই।"

সেনাপতি ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"এত স্পর্দ্ধা! মহারাজ, চরকে সব সময় ক্ষমা করা উচিত নয়—রাজনীতিতে এ আদেশ আছে।—এর উপযুক্ত—"

"না সেনাপতি, ওর তুমি কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, ওকে নির্ভয়ে ফিরে যেতে দাও। দেখ বৎস, আমি তোমার সর্দ্দারকে জানিও আমি প্রস্তুত হ'য়েই তার আসনে ব'সে রইলাম।"

সারঙ্গীর তারে ঘন ঘন ঝঙ্কার বেজে উঠ্‌ল। সেনাপতি স্তম্ভিত হ'য়ে দেখ্‌ল, যুবার মুখখানি ক্রমেই আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। যেন কি গভীর বেদনার আঘাতে দীপ্তিভরা চোখ দুটি ম্লান হ'য়ে গেল। কপালের মাঝখানে তিনটি বলি-রেখা দেখা দিল। ঠোঁট-দুটি একবার ধীরে-ধীরে কেঁপে উঠে পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল। সুন্দর আঙুলগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে তারের ওপর দিয়ে নাম্‌ছে উঠ্‌ছে, যেন অবসাদে ভরা। নীরবে রাজাকে নমস্কার ক'রে যুবা সভা হ'তে বেরিয়ে গেল।

সেনাপতি বল্‌লেন "মহারাজ, তরবারিটাকে যত জোরে বুকের ওপর চেপে ধরছি, মন ততই যেন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছে! বার-বার ক'রে আপনাকে জিগ্‌গেস করছি—ওরে মূর্খ, কার বুকে ছুরি মারতে চাস?—"

রাজা তাঁকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"চুপ কর, সেনাপতি। ও-সমস্ত ভাব্‌বার সময় এ নয়। মনে রেখো তুমি সেনাপতি, আমি রাজা। আজ রাত্রে মন্ত্রণা-ঘরে তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করবার আছে, সেইখানেই আমাদের সমস্ত নিষ্পত্তি হবে।"

সেনাপতি নমস্কার ক'রে বল্‌লেন—"যে আজ্ঞা, মহারাজ।"

রাজা সিংহাসন হ'তে নেমে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করবার জন্যে বল্‌লেন—"আশীর্ব্বাদ করি—জয়ী হও বীরগণ।"

সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌ল—"মহারাজাধিরাজের জয়!" কিন্তু এ-সমস্তের ভিতর যেন আর সে তেজ নেই। আগুনের দহন করবার শক্তি যেন চলে গেছে, আছে শুধু আলো—সেও বড় ম্লান।

তখন গভীর রাত্রি। রাজা ও সেনাপতি নিঃশব্দে মন্ত্রণা-ঘরের দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। দুজনের বুক হ'তেই দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে গেল। রাজা শুষ্ক হাসি হেসে বল্‌লেন —"মন্ত্রণাগৃহ আজ মন্ত্রীশূন্য।" পিছন হ'তে কে ডেকে উঠ্‌ল—"মহারাজ।"

বিস্মিত হ'য়ে রাজা বল্‌লেন—"কে ও।"

অন্ধকার হ'তে ছায়ামূর্ত্তির মত একজন মানুষ বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম ক'রে বল্‌ল—"প্রেত মহারাজ, মন্ত্রীর প্রেত। মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব ঘুচেছে, তার সব শেষ হয়েছে। কিন্তু তার আজন্মের পরিচিত এ-সমস্ত ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে সে চায় না। আমরা যখন প্রথম এ ঘরে প্রবেশ করি তখন আমরা তরুণ যুবক—বালক বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিলে, আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি নিয়ে তোমার সেই প্রচণ্ড শক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এলাম। সেনাপতি এল তার আগুনজ্বালা তেজ নিয়ে। তীব্র প্রতিহিংসার বিষ দিয়ে তোমার সমস্ত শত্রু জুড়িয়ে তোমার আসার পথ পরিষ্কার ক'রে দিল। তারপর কত কাল কেটে গেছে। আজ আমাদের শক্তির শেষ অবস্থায় চোখের সাম্‌নে জ্বলে উঠেছে এক তীব্র আলোকশিখা, ও আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা ভাব্‌ছি,—আমাদের এত কালের পরিশ্রম বিফল কর্‌বার জন্যেই ও জ্বলেছে, তাই ঐ আলোকশিখাটিকে নিভিয়ে দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছি—কিন্তু পিছনে যে আমাদের অন্ধকার গভীর হয়ে এল। সূর্য্য যে ডুবে গেছে। ঐ জ্যোতিষ্ককে নিভিয়ে দিলে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে ঠিক পৌঁছাতে পার্‌ব কিনা কে জানে। কিন্তু ভাব্‌বারও ত আর সময় নেই—আগুন যে আমাদের বুকের ওপর এসে পড়েছে—এ দহনকে থামাবার শক্তিও ত আর নেই।"

"না নেই, এবার জ্বল্‌তে হবে। তারপর যখন জ্বালা থাম্‌বে, তখনই প্রমাণ পাবে আমরা কোথায় এসেছি। কিন্তু তুমি আর কেন এগিয়ে আস্‌ছ, মন্ত্রী?"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"মন্ত্রণা আমি অনেক দিয়েছি, কিন্তু কাজ কিছুই করিনি। এবার ঐ আগুনের মধ্যে প'ড়ে দহনের তীব্রতা বুক ভ'রে অনুভব ক'রে নিতে চাই মহারাজ।"

রাজা মন্ত্রীকে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌লেন—"সেই ভাল। আমি ভেবেছিলাম, সমস্ত জীবন আমরা একভাবে কাটালাম, কিন্তু যখন জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ এগিয়ে এল, তখন তুমি তোমার জ্ঞানের চোখ দুটি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ালে। সেই অভিমানের আঘাতেই আজ তোমাকে সভায় অপমান করেছি। অপরাধ নিওনা।" সেনাপতিকে বল্‌লেন—"আজ রাত্রেই তোমার সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করে দাও, তারা যেন যে প্রচণ্ড শত্রু তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে তার গতি রোধ কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত থাকে।"

২

দুপুর বেলাকার রোদের তাপে পৃথিবী যেন নিস্তেজ হ'য়ে আস্‌ছিল। কুঞ্জবিতানে ছায়াশীতল মর্ম্মর-বেদীর ওপর কচি পাতার শয্যা বিছিয়ে, রাজকন্যা বিদ্যুল্লেখা শুয়ে ছিলেন। চোখের পাতা রুদ্ধ। কপালের ওপরকার অল্প একটু বাঁকা রেখা হ'তে বুঝ্‌তে পারা যায় যেন তিনি কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। একখানি হাত মাথার নীচে, আর একখানি অলস ভাবে বুকের ওপর প'ড়ে ছিল। সখী মঞ্জুলিকা—কাছে ব'সে পদ্মপাতা দিয়ে তাঁকে বাতাস কর্‌ছিল। গাছের শাখায় একটি কপোত তার সঙ্গীটিকে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে। বনের ভিতর তার কান্নার প্রতিধ্বনি বেজে উঠ্‌ছে। রাজকন্যা বলে উঠ্‌লেন—তোর কথাই সত্য মঞ্জুলিকা, সবার কথাই সত্য। আমিই ছিলাম ভ্রান্তির মধ্যে।"

মঞ্জুলিকা বল্‌ল—"কিসের ভ্রান্তি রাজকুমারী?"

রাজকন্যা বল্‌লেন—"দেখিস্‌নি, মানুষ জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদের তাপে দেহের চার পাশে আগুন জ্বেলে ব'সে থাকে?—ওর নাম তপস্যা। মাথার ওপর জটার ভার যত বেড়ে চলে, বুকের ওপর পাথর যত অচল হ'য়ে বসে, ততই ওরা ভাবে ওদের সিদ্ধিলাভের পথটা সহজ হ'য়ে আস্‌ছে। দেহের কষ্টটাই যেন তাই তাদের একটা অবলম্বন হ'য়ে ওঠে। ঐ হয় তাদের গর্ব্ব—এত বড় পাথর আর কারো বুকে বসেনি, এত বড় জটা আর কারো মাথায় ঠাঁই পায়নি। মন থাকে তাদের ঐ জটা আর পাথরের সঙ্গে বাঁধা। তাই মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি সহস্র হাত বাড়িয়ে ওদের যখন বুকে নেবার জন্যে এগিয়ে আসেন, ওরা তাঁকে দেখ্‌তে পায় না। ভোরের আকাশের স্নিগ্ধ হাসি, সন্ধ্যা-তারার অশ্রুকণা ওদের কাছে অর্থহীন।—আমিও ছিলাম ঠিক এই ভ্রান্তির মধ্যে মঞ্জুলিকা। নিজের রূপের সুরা নিজে পান ক'রে বিভোর ছিলাম, তাই বনের পশু হ'তে মানুষ পর্য্যন্ত সবাইকে যখন দেখ্‌তাম এই রূপের মধ্যে

ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মর্‌বার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে তখন ওর ভিতর আশ্চর্য্যের কিছুই দেখ্‌তে পেতাম না। ওদের ঐ আত্মসমর্পণ যেন বড় স্বাভাবিক। ও যেন আমার [illegible]।—আমাকে ওরা দিয়েছে, দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি নিইনি,—অনাদরে সব পথের ধূলায় ছড়িয়ে প'ড়ে হারিয়ে গেছে।

—"পুষ্পপুরের রাজা পিতাকে দূতের মুখে যেদিন খবর পাঠালেন—রাজ্য জয় করাতে তাঁর ক্লান্তি এসেছে, ওতে তিনি নিজের যথার্থ শক্তির পরিচয় পান না, তাই এবার এমন কিছু জয় কর্‌তে চান যা জগতের চোখে সব চেয়ে দুরূহ। সকলে বুঝ্‌ল তাঁর কি অভিপ্রায়। তারপর তিনি এলেন অতুল ধন ঐশ্বর্য্য নিয়ে। পিতা তাঁকে সমাদরে রাজসভায় এনে বসালেন। আমি আড়াল হ'তে দেখ্‌লাম —যেন জ্বলন্ত উল্কা! তাই তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধটাও বাধ্‌ল বেশী ক'রে। তার পর সে উল্কা নিজের আগুনে নিজে জ্ব'লে জ্ব'লে কোন্ অন্ধকারের আবরণে গিয়ে মুখ লুকাল তা কে জানে!

—"এমনি ক'রে সিন্ধি বহুবার আমার দ্বার হ'তে ফিরে গেলেন, তাঁকে চিন্‌লাম না। কিন্তু এবার নিজেকে চিনেছি মঞ্জুলিকা। রাজকন্যার রূপরত্নেভরা দেহের আড়ালে যে ভিখারিণীটা তার অনন্ত দৈন্য নিয়ে নীরবে প'ড়ে ছিল, তার বুক এতদিনে ফেটে গেছে। চোখের জল তাই আর বারণ মানে না। কাল সন্ধ্যাবেলা পথিক যখন আমার বাতায়নের নীচে দিয়ে গান ক'রে গেল—দেবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে কিন্তু নেবার যে কেউ নেই। আমি ম'রে গিয়ে আবার এক নিমেষে যেন নূতন ক'রে জন্মালাম!"

মঞ্জুলিকা বল্‌ল—"শুধু তুমি একা নও রাজকুমারী, এ রাজ্যের সমস্ত নরনারী ঐ একটি কথাই বল্‌ছে। এক-রাত্রে এতবড় বিপর্য্যয় কি ক'রে সম্ভব হ'ল জানি না।—ভোরের বেলা রাজার যুদ্ধঘোষণা শুনে পুরবাসীরা যখন পথে বেরিয়ে এল, শত্রু তখন তাদের বুকের ওপর! লড়াই-টাও হ'ল আশ্চর্য্য রকমের। হার মেনেছে সবাই—মরেছে সবাই। কাল সন্ধ্যাবেলাকার একজন মানুষকেও আর দেখ্‌তে পাবে না। সমস্তরই বদল হ'য়ে গেছে।"

রাজকন্যা বল্‌লেন—"কিছুই আর অসম্ভব ব'লে মনে হয় না মঞ্জুলিকা। তাই বুঝি আজ সকালে গানে গানে পৃথিবী ভ'রে উঠেছিল? সে কি শত্রুর জয়গান? তবে আমরা বন্দী?"

"হাঁ রাজকুমারী, এ রাজ্যের সবাই বন্দী, শুধু তুমি ছাড়া। তিনি আছেন বড় দ্বিধার মধ্যে বহুযুগসঞ্চিত অভিমান বুকে চেপে।"

"শত্রুরা তাহলে কি কর্‌বে? তিনি যদি হার না মানেন?"

"ওরা হার মানাবে। মাথার ওপর হ'তে মুকুট সরিয়ে নিয়ে মাটির ওপর এনে দাঁড় করাবে।"

"এ রাজ্যের একজনও ওতে বাধা দেবে না?"

"না। তার কারণ, সত্যের পরিচয়টা তারা আগেই পেয়েছে, রাজার মত তারা দুর্ভাগা নয়। তাই সবাই চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে—রাজা তুমি নেমে এস। হাওয়ার আসন ছেড়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে বল—বহু-নর-রক্তপান স্ফীত রাক্ষস আর নেই,—মরেছে—মানুষের স্পর্শে সেও মানুষ হয়েছে।—অন্ধ দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু তার দৃষ্টিহীনতার বাইরে প্রকৃতির যে লীলানাট্য চল্‌ছে সে ত মিথ্যা নয়! শুধু তাকে অস্বীকার কর্‌লেই ত আর তার স্থিতিকে মেরে ফেলা যায় না, সে বেঁচেই থাকে। ঐ অস্বীকার করার ভিতর দিয়ে সে শুধু তার অন্ধত্বের পরিচয়ই দেয়।—রাজা গোপনে এক বিদেশী রাজার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

"শত্রুরা তা জানে?"

"খুব জানে, তাই যেন ওরা আরো খুসী হ'য়ে উঠেছে।"

রাজকুমারী বল্‌লেন—"মঞ্জুলিকা, এবার তুই যা। আমি এখানে একটু একা থাক্‌তে চাই। মনের মধ্যে যে প্রশ্ন-গুলো মাথা তুল্‌ছে তার একটা মীমাংসা কর্‌তে চাই।"

মঞ্জুলিকা চ'লে গেল, কিন্তু যাবার সময় রাজকুমারীর মনের ওপরকার একখানি কুয়াসার আবরণ যেন সরিয়ে নিয়ে গেল! তিনি ভাব্‌লেন—"সবাই হার মেনেছে! মানুষেই ত, অত বড় সত্য চোখের সাম্‌নে যদি এসে দাঁড়ায় তাকে ভাল লাগুক আর নাই লাগুক অস্বীকার কর্‌বার শক্তি ত থাকে না। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! একি

প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব! বন্যার মত এক নিমেষে এত কালের সঞ্চিত কলুষ মুছে নিল! হায় রাজা, হায় গো রাজকুমারী, তবু তোমরা শত বজ্রাঘাতে জীর্ণ আশাতরীটিকে আশ্রয় ক'রে ঐ মহাশক্তির স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাও? —ভেঙ্গে ফেল তোমার তরী। ওরই মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে বাঁচ।"

ঘন পাতার আড়াল ঠেলে অস্তমিত সূর্য্যের ম্লান রশ্মিরেখা বনের ভিতর এসে পড়েছে। শ্রান্ত বাতাস ধরণীর বুকের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বিষাদে গড়িয়ে গড়িয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। বকুল ফুলের রাশি শাখাচ্যুত হ'য়ে রাজকন্যার নিশ্চল মূর্ত্তিটিকে ঘিরে তাঁর পূজা করবার জন্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। বনের বুকের ভিতর হ'তে কান্না জেগে উঠ্‌ল—'ওগো পথিক, সঙ্গীহারা পথিক! দিনের আলো নিভে এল, সাম্‌নের পথ যে অন্ধকারে ঢাকা পড়্‌ছে! সবাই পথ ছেড়ে চ'লে গেল—তোরই শুধু চলার বিরাম নেই! বোঝার ভারে মাথা যে তোর নুয়ে পড়্‌ছে। মন তোর কেঁদে বল্‌ছে—পারি না আর এ ভার বইতে পারি না—ও সইবে না। কোথায় ওকে নামাবি? কোথায় পাবি ঠাঁই? কোথায় আছে ঠাঁই?"

রাজকন্যা অবাক হ'য়ে বল্‌লেন—"একি শুন্‌লাম? ও যে আমারই কান্নার প্রতিধ্বনি!" তিনি সেই সুর লক্ষ্য ক'রে বনের ভিতর এগিয়ে চল্‌লেন। চারি পাশের লতাগুল্ম তাঁর সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শ নিচ্ছে। দু-একটি শাখা তাঁর চুলের ভিতর তাদের সরু সরু আঙ্গুলগুলি দিয়ে তাঁকে যেন ধ'রে রাখ্‌তে চায়। কুন্দ-ফুলের গাছ মুকুলভরা শাখা বাড়িয়ে তাঁর ঠোঁটের স্পর্শ নিল। অপরাজিতা তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলি ছুঁয়ে আনন্দের আবেশে যেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল। অনেক দূর এসে যেন নিজেকেই খুঁজে বার করবার জন্যে সন্ধ্যামালতীর মঞ্জরীগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে দেখ্‌লেন—সেই গানের সুর রূপ ধ'রে ফুটে রয়েছে!—কিন্তু সে ত রাজকন্যারই প্রতিমূর্ত্তি নয়! মুকুরে ও-ছবি প্রতিফলিত হ'তে কোন দিন ত দেখেন নি! তবু যেন সে অপরিচিতও নয়। ভোরবেলাকার আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে স্বপ্নে দেখা মুখের মত! রাজকন্যা হাত দুটি কম্পিত বুকের ওপর চেপে নিঃশব্দে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন।

গান থাম্‌ল না—কিন্তু সুরের বদল হ'য়ে গেল। এ সুরে আর শুধু কান্না শুধু নিরাশা নেই—আনন্দে অভিমানে ভরা। বিশাল দুটি চোখের বুভুক্ষিত চাহনি, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে যেন তাদের অনন্ত ক্ষুধার শান্তি ক'রে নিচ্ছে। [redacted]-কন্যার ইচ্ছা হ'ল ঐ ক্ষুধার হুতাশনে নিজেকে উজাড় ক'রে আহুতি দিয়ে ফেল্‌তে।

গোধূলির আলো রাজকন্যার মুখের ওপর পড়্‌ল। চোখের পাতা জলে ভ'রে আস্‌ছে। বুকের কাঁপন বেড়ে চল্‌ল। ঠোঁটের ওপর রক্তরাগ ম্লান হ'য়ে গেল। তিনি অপরিচিতের মুখের ওপর মুগ্ধ দুটি চোখ তুলে যেন আপনার মনেই বল্‌লেন—"তোমায় আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু আমার সমস্ত দিয়ে তোমায় অনুভব করেছি, তোমার পরিচয় পেয়েছি, তাই এবার এসেছি হার মান্‌তে।—নাও, জয় কর। জয় ক'রে আমায় বাঁচাও।"

রাজকন্যার সুন্দর কপালের নীচে ভ্রু দুটি যেখানে পরস্পরের মিলনের সৌন্দর্য্য জগৎকে দেখাচ্ছে, সেই দিকে তাকিয়ে যুবা বল্‌ল—"জয় করাই ছিল আমার ব্রত। অনেক করেছি, আর নয়। কিন্তু এবার ভিক্ষাও আর নেব না।"

রাজকন্যা বল্‌লেন—"তবে পাওয়া কি ক'রে সম্ভব হ'বে?"

যুবা বল্‌ল—"বিনিময় ক'রে।"

রাজকন্যা বল্‌লেন—"কিসের বিনিময়?"

যুবা বল্‌ল—"ব্যথার।"

তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে নিশীথিনী তিমির-বসনাঞ্চলখানি মুখের ওপর টেনে দিল। ফুলের কুঁড়ি তাদের পাপ্‌ড়ীগুলি খুলে দিয়েছে, বাতাস সুধার গন্ধ আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যুবা স'রে এসে আপনার গলা হতে একখানি হার খুলে নিয়ে রাজকন্যার গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে বুকে চেপে মুখে চুমা দিয়ে বল্‌ল—"ওগো প্রিয়া, এত দিনে ঠাঁই পেলাম, বোঝা আমার নাম্‌ল। আমায় বাঁচালে।" যুবার দেহ আশ্রয় করে রাজকন্যা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজপ্রাসাদের নহবৎখানায় বাঁশী বেজে উঠ্‌ল।

যেন ভয়ানক একটা আঘাত পেয়ে কেঁপে উঠে

রাজকন্যা যুবার বুক হতে মাথা উঠিয়ে নিয়ে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে যুবা তাঁর মুখের দিকে তাকাল। রাজকন্যা কেঁদে বল্‌লেন—ভুল হয়ে গেছে বন্ধু সমস্ত ভুল। আমি নিজেকে তোমার হাতে বিকিয়ে দিতে এসেছি, কিন্তু আমি ত আমার নই। নিজেকে কি ক'রে তোমায় দেবো? আমি নিজেই যে বিকিয়ে আছি আমার জন্মেরও বহু পূর্ব্ব হতে! রাজপ্রাসাদের ঐ বাঁশি সেই কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিল।—বিনিময় ত হল না! দরকার নেই বিনিময়ে। তুমি লুটে নাও। দস্যুর মত সব লুটে নিয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাও। ধনীর ভাণ্ডারে সহস্র আবরণের অন্তরালে প'ড়ে মণিমুক্তা যেমন কেঁদে উঠে বলে—আমায় আলোয় এনে রাখো, খোলা বাতাসের স্পর্শ মেখে নিতে দাও। তেমনি ক'রে আমার প্রাণ কেঁদে বল্‌ছে—নিয়ে যাও, সমস্ত জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন নির্ব্বাসিত এই আভিজাত্যের গণ্ডী হতে মুক্তি দাও।"

ম্লান হেসে যুবা বল্‌ল—"কিন্তু ওতে যে আমি দস্যু হয়েই রইলাম। আমার অনন্ত দৈন্যকে ওরা দস্যুর লোভ ব'লেই জান্‌ল। তোমাকে যারা সহস্র শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রেখে ভাব্‌ছে তোমার আসনটি ঠিক জায়গায় পাতা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আমার বিরোধ তা'হলে ত মিটবে না। থাক তুমি তোমার বাঁধনের মধ্যে, আমি থাকি এই অনন্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে,—এখান হতে ওদের জানাব ও-বাঁধন মিথ্যা, আমার মধ্যেই তোমার মুক্তি, তোমার ঠাঁই।"

বনের ভিতর কাদের অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। লক্ষ মশাল যেন রক্তচক্ষুর মত এক নিমেষে জ্ব'লে উঠে ছুটে এগিয়ে আস্‌ছে ঐ দুটি প্রাণকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেল্‌বার জন্যে। যুবার গলা জড়িয়ে রাজকন্যা উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্‌লেন—"কি হবে এবার, কোথায় তোমাকে লুকাব?"

যুবা বল্‌ল—"এইবারই হবে পরীক্ষা। সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। কিন্তু আমায় লুকিয়ে রাখ্‌লে ত তা হবে না। মিথ্যাকে বাধা দিলে তার পরমায়ু বৃদ্ধি করা হয়। জ্বলুক ও আপনার আগুনে, পুড়ে ছাই হোক আপনার পাপে।"

যুবাকে বাধা দিয়ে ব্যাকুল হয়ে রাজকন্যা বল্‌লেন—"এল ওগো এল! ঐ শোন ওদের মত্ত কোলাহল?"

যুবক বল্‌ল—"আসুক না ওরা, আর ত ভয় নেই, আমি যে ঠাঁই পেয়েছি।"

রাজকন্যা চোখের কোণ হ'তে অশ্রুকণা মুছে ফেলে বল্‌লেন—"তোমায় কি নামে মনে রাখ্‌ব—কি ব'লে তোমা পূজা কর্‌ব?"

যুবা বল্‌ল—"তুমি যে-নামে আমায় ডাক্‌বে সেই হবে আমার যথার্থ নাম।"

সহস্র কণ্ঠের বজ্রনাদের অন্তরালে—একটুখানি কান্না অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাজকন্যা বল্‌লেন—"স্বামী!" যুবা বল্‌ল—"প্রিয়া।"

৩

সেনাপতি বল্‌লেন—"মহারাজ, এর কি বিধান কর্‌বেন?"

রাজা বল্‌লেন—"প্রাণদণ্ড। কাল সকাল বেলা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর মাথা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়া চাই।"

মূর্চ্ছিত রাজকন্যাকে নিয়ে রাজা এলেন অন্তঃপুরে। শিকল-বাঁধা দেহটিকে টেনে টেনে বন্দী এগিয়ে চল্‌ল কারাগারের দিকে। পৃথিবীর মানুষ ঘুমিয়ে পড়্‌ল—জেগে রইল শুধু ঐ মরণ-পথের যাত্রী কারাগারের ছোট একটু জানালার ফাঁক দিয়ে যে তারার আলো দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে তাকিয়ে। তারপর তারার আলো নিভে গেল, আকাশের গায়ে ব্যথাতুরের চোখের মত একটুখানি রাঙা আভাস দেখা গেল।

বন্দী হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌ল—"এস এস ওগো মরণ, তোমায় নমস্কার। হে আমার মুক্তি, তোমায় নমস্কার। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার....."

কারাগারের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। ঘাতক এসে বন্দীকে বল্‌ল—"সময় হয়েছে—"

পায়ের শিকলগুলি আর-একবার বেজে উঠ্‌ল। বন্দী ঘর হ'তে বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। তারপর সৈন্যদের তরবারি আর বর্শার বেড়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল। চোখে তার জল নেই, মুখে তার হাসি নেই। কোন বেদনার আভাষও ফুটে নেই! পায়ের শিকল

অবিশ্রান্ত বেজে উঠ্‌ছে ঝম-ঝম-ঝম। মুখ দিয়ে তার কথা বেরিয়ে আস্‌ছে অবিশ্রান্ত—"ওগো মাটি আমার জননী, তোমাকে চোখ ভ'রে দেখেছি, বুক ভ'রে ভালবেসেছি, প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি। তোমার ধূলা ছিল আমার দেহের ভূষণ,—আনন্দ ক'রে গর্ব্ব ক'রে মেখেছি, তৃপ্তি পেয়েছি। আর কিছু কামনার নেই। কাজ আমার সারা হয়েছে—বিদায়, মাগো বিদায়।"

পাখীদের প্রভাতী গান শোনা গেল না, কিন্তু হাজার মানুষের কান্নার সুর আকাশ ভরিয়ে তুল্‌ল—"এ কি খেলা তোমার সর্দ্দার? ভয়ে যে আমাদের বুক শুকিয়ে আস্‌ছে। বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলে এতদিন, কিন্তু তাতে সুখ ছাড়া দুঃখ পাইনি। আর আজ আমাদের এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছ যেখান থেকে তোমাকেও ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সাম্‌নের পথটাকেও অন্ধকারে ঢাকা দেখ্‌ছি! কি আছে ঐ অন্ধকারের আড়ালে? কিন্তু আর জান্‌তেও চাই না। আমাদের খেলা যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নিই চলুক। আমাদের আর বাধা দিও না, তোমাকে আমরা রাজার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাব। তোমার বারণও আর মান্‌ব না।"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা যেমন একবার পূর্ণ তেজে জ্বলে ওঠে তেমনি ক'রে সর্দ্দার তার আরক্ত চোখ দুটি সকলের মুখের ওপর তুলে বল্‌লেন, "সমস্ত জীবন ধ'রে যে মহাসত্যকে পাবার জন্যে অনন্ত দুঃখ সহ্য ক'রে এলে,-সত্য যখন স্পষ্ট হয়ে তোমাদের জীবনে দেখা দিল তখনই তোমরা স'রে গিয়ে মিথ্যাকে আসন ছেড়ে দিতে চাও—?"

—"কিন্তু সর্দ্দার, রাজা যে তোমায় বধ কর্‌তে চান?"

সর্দ্দার হেসে বল্‌লেন—"না গো না, পার্‌বে না। তোমাদের শত সহস্র রাজা এলেও আর তা পার্‌বে না। এ হবে ওদের স্বার্থের বলিদান, আমি বেঁচেই থাক্‌ব।"

তারপর বুকের ওপর হাত জুড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "হে আমার প্রাণ, তুমি রইলে এই মাটির বুকে। যাবার বেলায় তোমায় দেখ্‌লাম, তোমায় চিন্‌লাম, তোমার স্পর্শ পেলাম। এ আমার মহাসৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যের গর্ব্ব বুকে নিয়ে মরণের রাতগুলি জেগে কাটাব। বিদায় বন্ধু, বিদায় প্রিয়া..."

৪

সুপ্ত কন্যার মাথা কোলে নিয়ে রাজা ব'সে ছিলেন। যে-সমস্ত সংশয় মনে জাগ্‌ছিল সেগুলিকে নির্ম্মূল ক'রে বিনাশ কর্‌তে কর্‌তে ক্লান্তিতে বুক ভ'রে উঠ্‌ছিল। ঘরের প্রদীপ কখন নিভে গেছে, বাইরে দু-একটি পাখী ডেকে উঠ্‌ছে। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে প্রভাত-আলো ঘরের ভিতর এসে পড়্‌ল। রাজা হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—"মাগো মাগো ওকি!"

সেই শব্দে জেগে উঠে রাজকন্যা বিহ্বলের মত রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত কথা মনে প'ড়ে গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—"সকাল হ'য়ে গেছে, না মহারাজ?"

রাজা বল্‌লেন—"হাঁ মা। কিন্তু ওকি তোর গলায়? কোথা হ'তে পেলি ও তুই—দেখি দেখি।"

রাজকন্যা হারটিকে বুকের কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রেখে বল্‌লেন—"না মহারাজ, ও দেবো না।"

রাজা বল্‌লেন—"ও যে আমার! তোর মা ঐ মালা পরিয়েছিল আমায়। তারপর ওকে হারাই তুই তখন বড় ছোট; নিজের শক্তির পরিচয় নেবার জন্যে গভীর বনে সিংহ শিকার কর্‌তে এসে বুঝ্‌তে পার্‌লাম সিংহই আমায় শিকার করেছে! সে ছিল আমার বুকের ওপর। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। জেগে উঠে দেখি সিংহ আমার পাশে প'ড়ে আছে! আর তার বুকে তীর বেঁধা! আশ্চর্য্য হয়ে উঠে-দাঁড়াতে দেখ্‌তে পেলাম দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ব্যাধ বালক! তার কাছে এসে আমার গলার ঐ মণিমালা তার গলায় পরিয়ে দিলাম। তুই ও কোথা হ'তে পেলি?"

রাজকন্যা শান্ত ভাবে বল্‌লেন—"আমার স্বামী আমায় এ মালা দিয়েছেন মহারাজ, ও তোমার নয়।"

মেঘের পর্দ্দা সরিয়ে তরুণ সূর্য্যের আলো বেরিয়ে এল। রাজা ব'লে উঠ্‌লেন— "ওরে রাখ্ রাখ্—" তিনি পাগলের মত ছুটে পথে বেরিয়ে এলেন।

বন্দী তখন সেই অম্লান রবির ওপর চোখ তুলে

বল্‌ল—"তোমায় এত দেখ্‌লাম তবু তৃপ্তি হ'ল না, তোমায় নমস্কার...।" ঘাতকের তরবারি শূন্যে উঠেই বিদ্যুৎ-গতিতে আবার নেমে এল। রাজা এসে দেখ্‌লেন ঘাতকের পায়ের কাছে বন্দীর মাথাটি প'ড়ে আছে, কিন্তু তার মুখের ওপর হ'তে অভিমানের আভাসটি তখনও মিলিয়ে যায়নি।

সকলে জিগ্‌গেস কর্‌ল—"মহারাজ, মাটির ওপর আজ যে রক্তবৃষ্টি কর্‌লেন—কি দিয়ে তা মুছ্‌বেন?"

রাজা সেনাপতির মুখের দিকে তাকালেন। সেনাপতি মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"তাই ত। কি দিয়ে ও মুছ্‌ব?"

মন্ত্রী নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজকন্যা এসে বল্‌লেন—"ওগো পাহাড়ের বুকে হ'তে জেগে যে মহানদ সাগরের উদ্দেশে যাবার পথে যাদের স্নেহস্পর্শ দিয়ে গেছে, আমি তাদেরই মধ্যে একজন। আমি তার শেষ স্পর্শ পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে এক ফাঁসে সে আমাকেও বেঁধে রেখে গেছে।"

রাজা বল্‌লেন—"মাগো তুমি এখানে কেন? ফিরে চল।"

রাজকন্যা বল্‌লেন,—"কোথায় ফির্‌ব?"

রাজা বল্‌লেন—"প্রাসাদে।"

রাজকন্যা বললেন—"ও আমার নয় মহারাজ, আমার ঠাঁই আমি পেয়েছি। ভুল আমার ভেঙেছে। সমস্ত বাঁধন ভেঙ্গে বাইরে এনে সে আমায় মুক্তি দিয়ে গেছে। এত বড় জগৎ ফেলে প্রাসাদে আর মন বস্‌বে না, মহারাজ।"

"আমি যে তোর পিতা, তুই যে আমার মেয়ে।"

মৃত বন্দীর দিকে হাত বাড়িয়ে রাজকন্যা বল্‌লেন—"ওর চেয়েও এক বড় সত্যের পরিচয় পেয়েছি, মহারাজ। ওকে যেখানে নির্ব্বাসিত করেছ, সেই আমার ঠাঁই, ওকে যারা ভালবেসেছিল তারাই আমার আপনার।"

পেরিজন কেঁদে বল্‌ল—"মাগো, এখনও অমরের কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি, সে বল্‌ছিল আমার প্রাণ রইল এই মাটির ওপর, তাকে তোমরা পাবে। ধন্য হল জীবন, মাগো, পুণ্য হল।"

৫

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি আপন আপন আসনে পূর্ব্বের মতই এখনও বসে থাকেন। কিন্তু সভাসদ আর কেউ নেই। কবিরা গান করে না। পণ্ডিতদের তর্ক চলে না। মল্লদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধও আর হয় না। শুধু তিনজনে পরস্পরে মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকেন। একদিন সেনাপতি বল্‌লেন—"মহারাজ আর যে এমন ক'রে থাক্‌তে পারি না। ইচ্ছে করে ছুটে পথে বেরিয়ে গিয়ে সকলকে বুকে চেপে ধ'রে বলি ভাই। মানুষের সেবা ক'রে হাত দুটিকে সার্থক করি।"

রাজা বল্‌লেন—"সে হবে না সেনাপতি। অত সহজে নিষ্কৃতি নেব না। এখুনি যদি এই রাজাসন ছেড়ে যাই তা হলে যে মুক্তি পেলাম, শাস্তি নিলাম কই? অনেক অপরাধীর শাস্তিবিধান করেছি, এবার নিজের বিচারের সময় এসেছে।—নড়্‌ব না। মাথার ওপর মুকুটের ভার বাড়্‌তেই থাকুক। রাজদণ্ডের চাপে দেহ ভেঙে ও গিয়ে যাক। মাটির ওপর দেহ ঢেলে শুয়ে পড়্‌বার জন্যে প্রাণ তিল তিল ক'রে মর্‌তে থাকুক। তবু সিংহাসন হ'তে নাম্‌ব না। অমর এল আমায় মুক্তি দিতে, আমি গেলাম তাকে বাঁধ্‌তে। কিন্তু সে-যে চিরমুক্ত, নিজের মনের অহঙ্কারের অন্ধকারে প'ড়ে তা বিশ্বাস করিনি। আকাশ তাকে মাটির বুক হ'তে নিজের অমলিন বুকে লুকিয়ে রেখেছে, আমি বাঁধা পড়েছি তাই আমারই বাঁধনে।"

রাজসভায় আর সহস্র দীপ জ্বল্‌ল না। আলো বাতাসও বুঝি আসা যাওয়া বন্ধ ক'রে দিল। এই শূন্যতার ভার বুকে নিয়ে তিনজনে রাজত্ব কর্‌তে লাগ্‌লেন। মাঝে মাঝে বাইরের হাসি-কান্নার প্রতিধ্বনি তাঁদের নাড়া দিয়ে যেত, বিধাতার বজ্রের মত।

যেখানে অমরের দেহ মাটির ওপর পড়েছিল সেখানে জেগে উঠ্‌ল এক মন্দির, রাজকন্যা বিদ্যুল্লেখা এ মন্দিরের পূজারিণী। দিবারাত্র পূজার গান বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সে গান যেন অমরের ব্যথার কান্নারই প্রতিধ্বনি।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

বদরীনাথের পথে

'রেইসিনা' 'রায়সেনা'র অপভ্রংশ। সেকালে নাকি এইখানে পৃথ্বীরায়ের সেনানিবাস ছিল। পল্লীটি দিল্লী সহর হইতে মাইল দুই দূরে। যেস্থান একদিন অসির ঝন্‌ঝনায় মুখর হইত, সেখানে এখন মসিজীবীরা আড্ডা গাড়িয়াছেন। মাঠের মধ্যে সুপরিসর পথের দুইদিকে মালার ন্যায় গ্রথিত সুধাধবল গৃহশ্রেণী। এগুলি ভারত-সরকারের যাযাবর চাকুরেদের 'কোয়ার্টার'। তাঁহারা বৎসরে পাঁচমাস এখানে বাস করেন, আবার শীতের অবসানে বিগলিত-তুষার-শিখরে ফিরিয়া যান।

বাড়ীগুলি দেখিতে সবই প্রায় এক রকমের। ভুল করিয়া রামের ঘরে শ্যাম ঢুকিয়া অঘটন না ঘটায়, এই সাধু উদ্দেশ্যে কোন কোন গৃহস্বামী আলিবাবার গল্পের দস্যুর মত শাদা দেওয়ালের উপর কালির আঁচড়ে হরেক রকম চিহ্ন লিখিয়া রাখেন।

নূতন দিল্লীর পত্তন হইয়াছে এইদিকে। রেইসিনার প্রান্তভাগে অনুচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশে সেক্রেটারিয়েটের লোহিতপ্রস্তরময় বিরাট অট্টালিকা অরুণালোকে রক্তপদ্মের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই বাড়ীটি কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বড়-বড় চওড়া সড়ক, এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হিন্দুমুসলমান রাজবংশের নানা স্থাপত্য-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ। অতীতের এইসব স্মৃতি যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন রেইসিনার পথে-পথে দেওয়ালীর মত অসংখ্য বিজুলী বাতি জ্বলিয়া উঠে।

সহর হইতে দূরে থাকিলেও পয়সার মমতা কমাইলে রেইসিনাপ্রবাসীদের সুখভোগ ঘটিতে পারে। দু'সের আড়াই সের দরে সাহেব-গয়লার জোগান-দেওয়া খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, এবং সহরের দেড়গুণ দামে ব্যাপারীরা ভারে-ভারে মাছ তরকারি দ্বারে-দ্বারে বেচিয়া বেড়ায়। এ প্রদেশের প্রধান অশ্বযান টঙ্গায় তিনজনের বেশি বসা যায় না, কিন্তু ঘোড়াগুলি পশ্চিমের আবহাওয়ায় পুষ্ট, গাড়ীর চাকাও রবার-টায়ার-যুক্ত। সুতরাং আরোহীদের স্ফূর্ত্তি সঞ্চার করিয়া টঙ্গা বেশ 'ফুর্ত্তিসে' চলে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকট গাড়ীর আড্ডা জুম্মা মস্‌জিদের কাছাকাছি 'নয়ীসড়কের' মোড়ে, সে-ও প্রায় দেড় মাইলের পাল্লা। এইজন্য সাধারণের সুবিধার্থে পূর্ত্তবিভাগের কর্ত্তারা রেইসিনাতেও একটি টঙ্গার ঘাটি বসাইয়াছেন। তবে এখানকার ঠিকাদার সব সময়ে কথা ঠিক রাখিতে পারেন না, উপরন্তু তার ভাড়ার হার বাজারদরকে হার মানায়।

দিল্লীর ছুটি যেন প্রবাসীদের ছুটাছুটির উপলক্ষমাত্র। আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন ত ঘরের কাছে, রেলপথে একটা রাত্রি কাটাইতে পারিলে হয় দক্ষিণে সাবিত্রী পুষ্কর নয় উত্তরে হরিদ্বার হৃষীকেশ তীর্থ। সম্মুখে শুক্রবার দোলের ছুটি, শনিবার জুড়িয়া লইলে রবিবারটাও ফাউ পাওয়া যায়। সুতরাং স্থির করা গেল, এই সুযোগে পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডে বদরিকাশ্রমের পথে হিমাচলের স্বর্গসুষমা দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিতে হইবে। নারায়ণের দর্শনলাভ অদৃষ্টে না থাকুক, তাঁহার সিংহদ্বারের বাহির হইতেও ত ফিরিতে পারিব!

দুইটি বন্ধু রোহিণী ও চন্দ্রবাবু সঙ্গে জুটিলেন। সঙ্গিনীও প্রত্যেকের এক একটি এবং তাঁহাদের উপগ্রহও সর্ব্বসমেত বড় কম নয়। কাজেই লোটাকম্বল সকলেরই এক এক প্রস্থ সম্বল থাকিলেও সন্ন্যাসের প্রতিকূল সামগ্রী বহুতর বহিতে হইবে। অগ্রিম দক্ষিণা পাইয়াও ঠিকাদার যথাসময়ে বাম হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গাড়ীর একখানিও আসিল না। সম্মুখের রাস্তায় মাঝে-মাঝে বোঝাই টঙ্গা যাইতেছিল, তাহাদের খান-দুই ফিরিবার মুখে দয়া করিয়া আমাদের দুয়ারে দাঁড়াইল। মহিলাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া পুরুষেরা পদব্রজে চলিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রেইসিনার সীমাতে হনুমান্‌জীর মন্দিরের সম্মুখে তাঁহারাও আর-একখানি গাড়ী পাইলেন। হনুমান্‌জী এখানকার বহুপুরাতন জাগ্রৎ দেবতা। প্রতি মঙ্গলবার দেবালয়ে লোকারণ্য হয়, আঙ্গিনার পাশে জুড়ি-গাড়ী মোটরের ভিড় জমিয়া যায়। ঠাকুরটি বৈষ্ণবচূড়ামণি, আমরাও চলিয়াছি নারায়ণের পথে; অতএব তিনি সহানুভূতি বশতঃ যাত্রীদের দুঃখ দূর করিবেন, বিচিত্র কি!

বম্বে-পঞ্জাব মেল ছাড়িবে ন'টা দশ মিনিটে। এদিকে লটবহর লইয়া আমরা যখন চাঁদনী-চকে, ঘণ্টাঘরের ঘড়িতে তখন প্রায় ন'টা বাজে। মনে-মনে ঠিকাদার ঠাকুরের মুণ্ডপাত করিতে করিতে কুইন্স গার্ডেন ভেদ করিয়া ষ্টেশনে

পৌঁছিলাম। দিল্লীর মুটেদের মোটা পেট অল্পে ভরে না, তাহারা চতুর্গুণ চাহিয়া অন্ততঃ তিনগুণ আদায় করে। দরদস্তুর করিবার সময় ছিল না, বিলক্ষণ লোক্‌সান দিয়া এক নিশ্বাসে ছুটিয়া ট্রেনে উঠিলাম। নাগুরা ঘাগ্‌রা ও পায়জামা পাগ্‌ড়ির ভিড়ের মধ্যে পেশোয়ারগামী ডাকগাড়ী ছাড়িল।

চতুর্দ্দশী তিথি, রেলওয়ে পুলের নীচে সৈকতলীনা যমুনা,—যেন রূপালী পাড়ওয়ালা উজ্জ্বল নীলাম্বরী। ডান-দিকে গাড়ীর জানালার পাশেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত দিল্লীর কেল্লা। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি শাজাহানের শুভ্র রাজপ্রাসাদ গবাক্ষচক্ষুর শূন্য দৃষ্টিতে নদীর পরপারে জনহীন প্রান্তরের দিকে চাহিয়া আছে। যে নাট্যশালা একদা কুসুমদামে সজ্জিত দীপাবলিতেজে উজ্জ্বল ছিল, তাহার উপর কালের করাল যবনিকা পড়িয়াছে। দেওয়ান্-ই-আমের অনুপম শিল্পচাতুর্য্যময় মর্ম্মর-নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ আছে, কিন্তু নিম্নে ময়ূর সিংহাসনে কোহিনূরকিরীটী বাদশাহ নাই, সম্মুখে নতজানু শত-শত আমীর ওমরাহ নাই। সম্রাট্ স্পর্দ্ধাভরে দেওয়ান্-ই-খাসের দেওয়ালে লিখিয়াছিলেন, ভূতলে যদি স্বর্গ থাকে তবে তাহা এইখানে, এইখানে, এইখানে। সে হস্তলিপি বিচিত্র চিত্রময় কফ্‌প্রাচীরে আজিও ভাস্বমান, কিন্তু অদৃশ্য বিধিলিপির মসিলেপে নন্দনের সৌন্দর্য্যসম্ভার মুছিয়া গিয়াছে। রঙ্‌মহালের ভগ্নাংশ দেখিয়া কে বুঝিবে, এই মন্দিরে কত না প্রেমপ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে! এমনি শোভাময়ী রজনীতে সুরসুন্দরীসদৃশী পুরসুন্দরীগণ দিনের কর্ম্মশেষে নর্ম্মভাষের মৃদু গুঞ্জনে বুঝি বাদশাহের চারিদিকে মধুচক্র রচনা করিত! কালচক্রের আবর্ত্তনে ছিন্নভিন্ন হইয়া কোমলাঙ্গীরা ছায়াবাজীর মত মিলাইয়া গিয়াছে, এখন শুধু প্রাসাদের পাষাণ-দৃশ্যে মানুষের মনের নিকষে তাঁহাদের রূপের সোনালী আভা ফুটিয়া উঠে!

দিল্লীর পরে দিল্লী-সাহারাণপুর। একটি ছোট রেললাইন এই ষ্টেশন হইতে সাহারাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সাহাদারার পরেই গাজিয়াবাদ জংশনে এক্সিন ট্রেনের সম্মুখ ছাড়িয়া পিছনে লাগিল, আমরা দিল্লীর দিকে ফিরিয়া উত্তরে উঠিতে লাগিলাম। কোনও বন্ধু এ-পথে দস্যুভীতির রোমাঞ্চকর বর্ণনা করিয়াছিলেন; সুখের বিষয় আমাদের ডাকগাড়ীতে ডাকাত পড়িল না! মুরাদাবাদ, বেগমাবাদ প্রভৃতি মুসলমান শাসনের স্মৃতিসংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে না দাঁড়াইয়া ট্রেন একেবারে মীরাটে আসিয়া থামিল। এ সহরটি সমরবিভাগের নানা বিভাগের কেন্দ্রবিশেষ। আশেপাশে মিলিটারি আপিসে যাঁহারা কলম পেষেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত এখান হইতে কম দামে রসদ পাইয়া থাকেন। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে গরিব কেরানীদের এ সুযোগ অমূল্য। প্ল্যাটফর্ম্মে তাহাদের বড় বড় চটের থলি দেখিলাম। বস্তাগুলি মীরাটের গম আটায় ভরাট কি না কে জানে! পরে দেখিয়াছি, সহরটি বেশ সুন্দর। মীরাটে দেশীয়দের 'ক্লাবের' অনুষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখিলে এ-প্রদেশের দানশীল মহাজনদিগের উপর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

দুপুর রাত্তে সাহারাণপুর। পশ্চিমে লাহোর অমৃতসর, দক্ষিণে মীরাট দিল্লী, পূর্ব্বে অযোধ্যা কাশী;—এ ষ্টেশনটি যেন রেলপথের ত্রিবেণী-সঙ্গম। দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম্মের অপর প্রান্তে লাক্‌সারের গাড়ীতে চলিলাম। ট্রেন চলিতে সুরু করিলে কয়েকজন হরিদ্বারযাত্রী 'গঙ্গামায়িকী জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিল। লাক্‌সারের এদিকে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই রুড়কি। ষ্টেশন হইতে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চূড়া দেখা যায় না। শুধু সরকারের কাটা খাল মাঠের মাঝে হৃদয়কোণে ক্ষীণ স্নেহধারার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া আকাশ কোলে মিশিয়াছে।

লাক্‌সার খাস অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড লাইনের উপর। দেরাদুনের গাড়ীর প্রতীক্ষায় এখানে ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা থাকিতে হইল। হাঁটিয়া গেলেও বোধ করি এতক্ষণে হরিদ্বারের কাছাকাছি পৌঁছান যাইত! অবশেষে ষ্টেশনের তন্দ্রাভঙ্গ করিয়া সশব্দে গাড়ী আসিয়া পড়িল। তখন নিশানাথের আশু বিরহাশঙ্কায় যামিনীর স্বর্ণাভ গণ্ড পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ধূসর বনচ্ছবি শ্যামল হইয়া ফসল এবং যাত্রীদিগের রাত্রিজাগরণ-খেদ লঘু করিয়া প্রভাত বহিল। দিগন্তে পুঞ্জীভূত ধূমের মত হিমালয়ের বিরাট মূর্ত্তি দেখিলাম; ঊর্দ্ধে ঊষার প্রভাহীন শশী যোগেশ্বরের ধ্যানস্তিমিত তৃতীয় নেত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

হরিদ্বার ষ্টেশনটি তেমন বড় নয়। সম্মুখে পর্ব্বতরেলপথের গতিরোধ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেরাদুন যাইতে একটা সুড়ঙ্গ পার হইতে হয়। ষ্টেশনের বাহিরে সড়কের উপর টঙ্গা টম্‌টম্‌ ও গণ্ডা দুই তিন পাণ্ডার ভিড়। তীর্থ-ধর্ম্মের আদালতে যাত্রী মাত্রেই নাবালক, কাজেই অভিভাবক একজন পাণ্ডা চাই! আমাদেরও একটি জুটিল, কিন্তু সর্ত্ত হইল এই যে পরে যদি আর-কেহ বংশের পূর্ব্বগামী কোনও যাত্রীর নিয়োগপত্র দেখাইতে পারে, তবে আমাদের উপর ইঁহার কোনই দাবী-দাওয়া থাকিবে না। ছ'আনা ভাড়ায় গাড়ী পাওয়া গেল। বাজার ছাড়াইয়া আমাদের তীর্থনিবাসে আসিলাম। দোতলা বাড়ীটি ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্ত ঘাটের মাঝামাঝি একেবারে গঙ্গার উপরে। দেখিয়া মন প্রফুল্ল হইল। শতরঞ্জ পাতিয়া বারাণ্ডায় বসিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে, নদীতীর আগা-গোড়া পাথরে মোড়া। মাঝে-মাঝে সাধুসন্ন্যাসীর আড্ডা। পরপারে দূরে আকাশের পটে যেন তুলিতে নীল রংএ আঁকা পাহাড; নিকটে অসুন্নত গিরির নতোন্নত দেহে কোথাও রৌদ্র কোথাও ছায়া; পার্শ্বে সমতলক্ষেত্রে বালুকা-রাশির মধ্যে ক্বচিৎ দু'একখানি কুটীর অথবা ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় গাছ। প্রবল-প্রবাহ-তলশায়ী অসংখ্য প্রস্তর-খণ্ডে প্রতিহত হওয়ায় বীচিভঙ্গময়ী গঙ্গায় অবিরাম কলধ্বনি উঠিতেছে। অতিশয় অধ্যবসায়ী একটি লোক হস্তস্থিত দীর্ঘ যষ্টি প্রোথিত করিয়া তীব্র স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জলের মধ্যে যাত্রীদের উৎসর্গ-করা পয়সা খুঁজিতেছে। মানুষটি প্রাজ্ঞ বটে, এমন পুণ্যতীর্থেও অজরামর-বৎ অর্থচিন্তা করে! চার-পাঁচটি শূন্যগর্ভ অলাবু একত্র বাঁধায় ভেলার মত ভাসিতেছে, একটি ছোট ছেলে সেটিকে লইয়া জলক্রীড়ায় তৎপর। মানুষের জীবনে যেমন, কলুষনাশিনী জাহ্নবীর জীবনেও তেমনি, অন্তঃসারশূন্যেরা কিছুতেই ডুবিতে চাহে না!

অনতিবিলম্বে বড় বড় খাতা ঘাড়ে পাণ্ডাদের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সন্তান-সন্ততির জন্য কিরূপ ধন সম্পৎ রাখিয়া যান বলিতে পারি না, কিন্তু এই গ্রন্থসঙ্গতি একাই যে উত্তরাধিকারীদের ভবার্ণবতরণে নৌকা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই! পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে চোখ বুলাইয়া অসংখ্য ঠিকুজীর মধ্যে আমাদের কাহারও ঠিকানা মিলিল না দেখিয়া প্রভুরা রণে ভঙ্গ দিলেন। সর্ব্বশেষে যিনি অবতীর্ণ হইলেন তাঁহার নাম কুম্ভকর্ণ। দশাননের মধ্যম সহোদরের নিদ্রাভঙ্গে প্রমাদ ঘটিল, কুম্ভকর্ণ অব্যর্থ সন্ধানে আমাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন!

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। ঘাট দেখিয়া কাশীর দশাশ্বমেধ মনে পড়িল। উপরে অভ্রভেদী বিবিধ মন্দির, নীচে সুপরিসর সোপানশ্রেণী। প্রায় ত্রিশবৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট ঘাটের সংস্কার করিয়া হিন্দু সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তীরের সমান্তরালভাবে গঙ্গার মধ্যে চত্বর গাঁথা, ঘাটের সঙ্গে তাহার সংযোজক একটি সেতু। বারিধারা দ্বিধা হইয়া বর্দ্ধিতবেগে খাতের পথে আসিয়াছে, আবার কুলুকুলু শব্দে পুলের নীচ দিয়া নদীহৃদয়ে মিশিয়াছে। যথাসাধ্য নামিয়া গেলাম, কিন্তু ঘাটের জল আমাদের কটিতট ছাপাইয়া উঠিল না। তলদেশ অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডে আচ্ছন্ন, তাহার উপর পদার্পণমাত্রেই প্রখর স্রোত ভীমবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ এক-একটা বৃহৎ মাছ কোথা হইতে আমাদের স্নানকৌতুক দেখিতে আসিয়া পাশ দিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল।

পুলের নীচে লৌহদণ্ডগুলির নিকটে খানিকটা শেওলা আট্‌কাইয়া আছে, অনেক মাছের বাসা সেইখানে। তাহারা ঝাঁকে-ঝাঁকে উঠিয়া যাত্রীদের ছড়ানো খাবার খাইতে সুরু করিল। একজন সঙ্গী গম্ভীরভাবে বলিলেন, এগুলি মহাশোল,—যদিও শোলের সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই, বরং রুই মৃগেল বলিলে চলে। তপোবনে শার্দ্দূল-কুরঙ্গে একসঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়, বাঙ্গালীর সাড়া পাইয়াও তীর্থোদকের মৎস্যেরা তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল না! আমরা যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন ঘাটের পিছনে নির্জ্জন পাহাড়ের চূড়ায় শুভ্র মন্দিরটি মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

একটু বেলা পড়িলে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে কনখল দেখিতে চলিলাম। পথে গঙ্গা পার হইতে হয়। সেতুর উপর হইতে পশ্চাদ্দিকের দৃশ্য রমণীয়। উভয় তীরে গিরিশ্রেণী, মধ্যে নদী কৃষ্ণাভ আরশীর মত প্রসারিত। দূরে সমুন্নত গিরি দেখিয়া মনে হয় বুঝি সুরধুনীর বিরাট তরঙ্গভঙ্গ আকাশে জমাট বাঁধিয়াছে। কনখলে বাগান ও কোঠাবাড়ী বিস্তর, একেবারে আধুনিক সহরের চেহারা

আমাদের গাড়ী দক্ষেশ্বর শিবালয়ের বাহিরে থামিল। প্রধান মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, বটমূলে পাষাণময় নানা মূর্ত্তি! এখানে যে সতীকুণ্ড আছে, জনশ্রুতি এইরূপ যে সতী পতিনিন্দা শুনিয়া সেইখানে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ কুণ্ড নকল, আসল সতীকুণ্ড এখান হইতে ক্রোশখানেক দূরে। আমরা দক্ষালয়ের খিড়কি পার হইয়া 'নীলধারা'র তীরে বসিলাম। জাহ্নবী এখানে স্বল্পপরিসর। পরপারে শিলাখণ্ড-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। বুঝি দক্ষযজ্ঞের শ্মশানস্মৃতি বুকে লইয়া এই ভূমি ধূসর ঊষর বেশ ধরিয়াছে। দক্ষিণে গঙ্গার উপর বাঁধ, সেই পথে গুরুকুল বিদ্যালয়ে যাইতে হয়। সময়াভাবে আমাদের গুরুকুল দর্শনের সাধ মিটিল না।

আসল সতীকুণ্ড দেখিবার জন্য দক্ষালয় হইতে পদব্রজে বাহির হইলাম। পূর্ব্ববিভাগের খালের মধ্যে গঙ্গার জল কলনাদে প্রবেশ করিতেছে। তাহার উপর কাঠের সাঁকো, দুই-একখানা তক্তা অশক্ত হইয়া নড়িতেছে। সন্তর্পণে পার হইয়া মাঠের পথ ধরিলাম। কোন কোন বাগানে আম জামের গাছ আছে। সতীকুণ্ড পঙ্কিল জলের ডোবা মাত্র। চারিদিকে উচ্চ পাড়, একটির উপর বীরভদ্রের মন্দির। যে সতী রমণীকুলের শিরোমণি, তাঁহার পবিত্র নামচিহ্নিত কুণ্ডটির দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। মন্দিরে বীরভদ্রের মূর্ত্তিতে বিশেষত্ব নাই। প্রভু ভৃত্যের প্রভেদ ঘুচাইয়া তাঁহাকেও শিবলিঙ্গের মত গড়া হইয়াছে। পাশের বাগানটি বেশ, নানা ফুলের মধ্যে ফলবান্ কলাগাছ দেখিলাম। কদলী এ দেশে কলিকাতার 'ধান্যবৃক্ষে'র মত, সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

সন্ধ্যায় ফিরিবার সময় রামকৃষ্ণ মিশনে নামিলাম। পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে কয়েকখানি পাকা ঘর। সর্ব্বশ্রেণীর রোগীই আশ্রমে আশ্রয় পায়। আমাদের কোনও বন্ধুর একটি আত্মীয় সরকারী চাকরী ছাড়িয়া এখানে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তখন বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। মিশনের একজন মান্দ্রাজী সন্ন্যাসী বাঙ্গলায় আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

বাসায় আসিয়া সতীকুণ্ডে গিয়া বসিলাম। প্রায় এক প্রহর রাত্রি। থাকিয়া থাকিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। ঘাটের মন্দিরগুলিতে আরতির শঙ্খঘণ্টা থামিয়া গিয়াছে, কেবল জ্যোৎস্নাপুলকিত জাহ্নবীর অবিরাম জলকল্লোল স্তব্ধ রজনীর শব্দময়ী ভাষায় অনন্তদেবের অন্তহীন বন্দনা ধ্বনিত হইতেছে। তীরে পূর্ণিমার চন্দ্রকরধৌত সৌধমালা পবিত্রতার শুভ্রতায় মণ্ডিত, তাই বুঝি ভাগীরথী-প্রণয়ী সলিলে তাহাদের প্রতিবিম্ব! অদূরে কে মধুর বাঁশী বাজায়! যুগান্তরের দোললীলার স্বপ্নসঙ্গীতবৎ নীরবতা-প্লাবী বংশীরব কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিল!

পরদিন অপরাহ্ণে হৃষীকেশ যাত্রা। পথ চৌদ্দ মাইল, টঙ্গা ও টম্‌টম্ চার টাকা করিয়া ভাড়া লইল। হরিদ্বার ছাড়াইলেই বামদিকে ভীমগোদা,—পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র জলাশয়, পাশে ছোট মন্দির। তৃষ্ণার্ত্ত ভীমসেন নাকি এখানে পাষাণস্তূপের মধ্যেও দৈববলে পিপাসা মিটাইতে পারিয়াছিলেন। পথ কোথাও উপরে উঠিতেছে, কোথাও নীচে নামিতেছে, খানিকদূর ডানিদিকে গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলার মত তিনি ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। গাছপালায় আড়ালে পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না,—মাঝে মাঝে উভয়ের মাঝখানে শ্যামা বনশ্রীর আলুলায়িত বস্ত্রাঞ্চলের মত গিরিতরঙ্গিণীর প্রবাহশোভা প্রকাশিত হইয়া পড়ে! বিপরীত দিক্ হইতে কচিৎ দুই একজন সন্ন্যাসী আসিতেছেন, অথবা গৃহীদের এক-আধখানি মন্থর যাত্রীযান চক্রনির্ঘোষ তুলিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে যোড়াসুদ্ধ গাড়ী টানিয়া শুষ্ক খাল পাড়ি দিতে হইল। বর্ষায় যখন পর্ব্বতগাত্রে নানা নির্ঝর ঝরিতে থাকে, তখন তাহাদের বারিধারা বোধ করি এইসব পথেই প্রবাহিত হয়। একটি সরকারী ডাক্-বাংলা ছাড়াইলাম। সমুন্নতশিরা পার্ব্বতীর ভিতর দিয়া পথ গিয়াছে। পরেই আমার বোগা মাঠ, অদূরে সেতু। সেখানে সহস্রের জল প্রান্তরের অন্তর সিক্ত করিয়া মৃদুনিনাদে ছুটিয়াছে। একটি সাহেব পুলের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীচে ছিপ ফেলিয়াছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে ক্ষেত, ঘন বন আর দেখা যায় না। দূরে দূরে পিপাসু আকাশ যেখানে ধরণীর বুকের উপর নত হইয়াছে

সেইখানে কঠিন ব্যবধান শ্যামল শৈল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হৃষীকেশের প্রবেশমুখে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে আলো জ্বলিতেছে দেখিলাম। একটি দরিদ্র দম্পতি শুষ্কপত্র কুড়াইয়া চারিদিক্-খোলা চালাঘরে আগুন করিয়াছে। 'বাবা কালীকম্‌লিওয়ালা'র ধর্ম্মশালায় আমরা উঠিলাম। কৃষ্ণবর্ণ কম্বল ব্যবহার করিতেন বলিয়া লোকে সাধুর এই নাম দিয়াছে। ইনি পশ্চিমের মহাজনদের অর্থসাহায্যে যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কেদার-বদরীর পথে শতাধিক ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হৃষীকেশের ধর্ম্মশালাটি প্রকাণ্ড, ভিতরে কাণ্ডকারখানাও অনেক। সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রত্যহ এখানে আহার পাইয়া থাকেন। তীর্থের পথে আবশ্যক হইলে অর্থদানও করা হয়। গৃহস্থ যাত্রীরা খাবার পান না, তাঁহারা ধর্ম্মশালার শতরঞ্জ বালিশ বাসনকোসন এবং হারিকেন লণ্ঠন বিনামূল্যে ব্যবহার করেন।

রোহিণী-বাবু কমিশেরিয়েটের কর্ত্তা, ধর্ম্মচিন্তার মধ্যে সকলের অন্নচিন্তার ভারও তাঁহার উপর। আমরা নূতন দেশের দর্শক, তিনি আবার আমাদেরও পরিদর্শক। দলের আর-সকলে যখন দেবালয়ে, রোহিণী-বাবু তখন মুদীর দোকানে; আমরা গঙ্গাস্নান করি, তিনি নর্দ্দামা সাফ্ করান; অন্যের পারমার্থিক প্রসঙ্গের মধ্যে তিনি আর্থিক হিসাব মিলাইতে বসেন! আমাদের মনঘুড়ি স্বর্গের দিকে উড়িতেছে বটে, লাটাইটি কিন্তু তাঁহার হাতে! অতিরিক্ত ভারবাহী বলিয়া রোহিণী-বাবু কিছু কাহিল, আমরা পারৎপক্ষে তাঁহার বিরামসুখের ব্যাঘাত জন্মাই না। তবে তীর্থে অত্যধিক স্বার্থপরতা গর্হিত, তাই সন্ন্যাসের পুঁজিপাটা বাঁটিয়া লওয়া গেল; ফলে রোহিণী-বাবু কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন, আর লোটা হাতে চন্দ্র-বাবু আমার সঙ্গে হৃষীকেশ দর্শনে বাহির হইলেন।

দুই ধারে সারি সারি কোঠা বাড়ী। স্থানে স্থানে পতিত জমিও আছে। উত্তরে বিরাট মাঠ, সেখানে বালির মধ্যে শিলার ছড়াছড়ি। বাজারে একটা মেলা বসিয়াছিল, এখন ভাঙ্গিতেছে। ব্যাপারীরা কাপড়ের ছাউনি উঠাইয়া দোকানপাট গুটাইতেছে। সেইসব পুরাণ পণ্য, বাঙ্গালার পল্লীশিশুরা যে-সব জিনিস কিনিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কাপড়-চোপড়েও বিশেষত্ব কিছু নাই। হঠাৎ একটি লোক ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি? পরিচয় পাইয়া একেবারে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার! ইনিও বাঙ্গালী; চোখে চশ্‌মা, লম্বিত শ্মশ্রু, গায়ে ওভার-কোট; খালি পায়ে ঘটী হাতে ঘুরিতেছেন। বলিলেন, বহুদিন পরে বাঙ্গালা বুলি শুনিলেন; কত লোক যায় আসে, কিন্তু বাঙ্গালীর মত প্রেমিক আর কে! পূর্ব্ববঙ্গের কোন ভট্টাচার্য্য পরিবারে ইহার জন্ম; অনেকবার পুলিশের আসামী হইয়া বন্ধনদশা ভোগ করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্র কেহ নাই, ভববন্ধন মোচনের আশায় জীবনের বাকী দিন কয়টা তীর্থে কাটাইতেছেন। ভট্টাচার্য্য আমাদের আগে আগে ত্রিবেণীর ঘাটে আসিলেন। শুনিলাম কুব্জাম্বর ঋষির তপস্যায় এই দূরদেশেও যমুনা ও সরস্বতী গঙ্গার অঙ্গে মিশিয়াছেন। সম্মুখে চন্দ্রালোকে হিমালয়ের অভ্রভেদী গম্ভীর মূর্ত্তি; পার্শ্বে ধূর্জ্জটির জটাজূটবন্দিনী নগেন্দ্রনন্দিনী মুক্তির মহানন্দে ঘোরনৃত্যে উন্মত্ত। শিলা হইতে শিলান্তরে লম্ফে ঝম্ফে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত; ফেনপুঞ্জের অট্টহাস্যে নৈশাকাশ নিমেষে নিমেষে চমকিয়া উঠিতেছে। অচলের তটে সচলের অপরূপ শোভা দেখিয়া মন তন্ময় হইয়া গেল।

প্রভাতে রামসীতার ও ভরতের মন্দির দেখিলাম। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন আছেন লছমণঝোলার পথে। কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন কারিকর ভরতজীর মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে দশাবতারের অতি সুন্দর চিত্র আঁকিতেছে। ত্রিবেণীস্নানের সময় কিনারায় বিশেষরূপে জলের সঙ্গে বলপরীক্ষা হইল। একটু অসাবধান হইলেই লড়াই হারিয়া পাষাণশয্যায় গড়াইবার আশঙ্কা! স্নানান্তে জিলিপি সহযোগে জলযোগ। ধর্ম্মভয়ে ভেজাল নাই বলিয়া বোধ করি এ দেশের মিষ্টান্ন বেশ তুষ্টিকর। পুণ্যস্নানের পরিশ্রমে জঠর শূন্য বোধ হইতেছিল, দু' সের আড়াই সের জিলিপি ঝড়ের মুখে খড়ের মত উড়িয়া গেল।

মধ্যাহ্নে লছমণঝোলায় চলিলাম। যাঁহারা ঝুলি কাঁধে ঝোলার পথে আসেন, সে-সব সাধুসন্ন্যাসীর কোন বালাই নাই। আমরা অ-সাধু, তাই মন কেবল বোচ্‌কার দিকে! ছাতা লাঠি বহিতেই একটা লোক ভাড়া করিতে হইল।

জাহ্নবীর দক্ষিণ কূলে বনভূমির কণ্ঠহারতুল্য পথটি গিরি-গাত্রে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। আশেপাশে তরুশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করিতেছে। স্থানে স্থানে পর্ণকুটীর বা ইষ্টকালয়; কোনটি পথিকের মাথার উপরে, কোনটি বা পায়ের নীচে। বহুনিম্নে প্রবাহিণী কোথাও উপলরাশির মধ্যে চপলমূর্ত্তি, কোথাও বা তাঁহার শ্রান্ত দেহ সৈকতশয্যায় এলাইয়া পড়িয়াছে। পরপারে দিগ্‌বলয়ের সীমা হইতে সীমান্তরে গগনাঙ্গন আচ্ছন্ন করিয়া যোগমগ্ন হিমালয়ের বিরাট ললাট শোভা পাইতেছে।

'রামাশ্রম' কোনও হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার। সম্মুখে সুন্দর বাঁধা ঘাট। ও-পারে 'স্বর্গাশ্রমে' যাওয়ার জন্য আমরা একখানি ডিঙ্গিতে চড়িলাম। হাল্‌কা নৌকা লগির খোঁচায় দ্রুতবেগে চলিল। স্ফটিক জলের তলে নানা রংএর নানা ঢংএর নুড়ি ছড়ানো। অনেক কুড়াইয়া তুলিলাম। স্বর্গাশ্রম কালীকম্‌লিওয়ালা বাবার আর-একটি ধর্ম্মশালা। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে এক এক ঠোঙ্গা সিদ্ধ ছোলা উপহার দিলেন। অনেকখানি পথ চলার পর লবণসংযুক্ত 'চানা' তৃপ্তিপূর্ব্বক চর্ব্বণ করিয়া জলপান করা গেল।

পুনরায় নদী পার না হইয়া এবারে আমরা গঙ্গার বাম তীর দিয়া চলিলাম। ইতস্ততঃ ইটের ছোট ছোট কুটীর। এগুলিতে সাধুরা বাস করেন, স্বর্গাশ্রমের সদাব্রতে তাঁহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। অধিকাংশ কুটীর খালি; একখানির বাহিরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া; তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে নিবদ্ধ।

ক্রমে লছমণঝোলায় পৌঁছিলাম। দুই তীরে প্রস্তর-স্তম্ভ, তাহাতে প্রোথিত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে লম্বিত লৌহরজ্জুতে পুলটি ঝুলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরাও স্বচ্ছন্দে পার হয়। যাহার ভীষণ বর্ণনা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেকালের সেই লছমণঝোলা এখন আরব্যোপন্যাসের কাহিনী মাত্র। যে মাড়োয়ারী শ্রেষ্ঠীর বদান্যতায় ঝোলা রূপান্তরিত হইয়াছে, এখানে আসিলে কেদার-বদরীর যাত্রীরা সকৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করে। সেতুর নীচে নদী বেশ গভীর, স্থানে স্থানে জল আবর্ত্তে ঘুরিতেছে।

লছমণঝোলার নিকটে গঙ্গার বামতীরে 'মহর্ষিকুল বিদ্যালয়।' ব্যাস বশিষ্ঠাদি মুনিরা এই প্রদেশে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহাদের স্মরণার্থে পাঠশালার এই নামকরণ। প্রতিষ্ঠাতা দামোদর দাস, একজন মোহান্ত। অনাথ ছাত্রেরা এখানে বিনা ব্যয়ে স্থান পায়। [illegible] প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যের সঙ্গে বেদ এবং অন্য [illegible] অধ্যয়ন করে। আজকাল ধর্ম্মশালায় স্কুল হইতেছে, কিন্তু সেখানে যাত্রীর ভিড় বলিয়া স্বতন্ত্র বাড়ী চাই। এজন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী। আমরা যৎসামান্য দিলাম। ছেলেরা মধুর কণ্ঠে শঙ্করাচার্য্য রচিত স্তোত্র আবৃত্তি ও বেদগান করিল। ঝোলা পার হইয়া যখন ফিরিতেছি, মহর্ষিকুলের গৈরিক-পরিহিত বা [illegible] তখন শিক্ষকের সঙ্গে গঙ্গায় নামিয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল, যেন ব্রহ্মচর্য্য ধারণ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রাচীন ঋষির চিত্র দেখিলাম।

হৃষীকেশের পথের পাশে অরণ্যের কিয়দংশ [illegible] ষ্টেটের 'ফরেষ্ট'। বড়-বড় গাছের ছায়ায় সন্ধ্যার [illegible] জমাট বাঁধিতেছিল। হৃষীকেশ হইতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত রেল হইবে; স্থানে-স্থানে পাথরের চিহ্নিত-খুঁটি [illegible] হইয়াছে। ক্লেশের আগুনে পুড়িয়া মনের মলিনত [illegible] হইলে বুঝি ভগবানের প্রকৃত দর্শন ঘটে না! [illegible] গিরিপথ অপেক্ষাকৃত সুগম হওয়ার পর তীর্থযাত্রা [illegible] হইবে না কি?

চন্দ্র-বাবু আগে-আগে যাইতেছেন, তাঁহার [illegible] খানি লাল-রংএর র‍্যাপার। সম্মুখে একপাল গোরু [illegible] তেছিল; তাহাদের মধ্যে একটি ষণ্ড লেজ খাড়া [illegible] করিয়া প্রচণ্ড বেগে চন্দ্র-বাবুর প্রতি ধাবিত হইল। [illegible] মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল। লোহিত বস্ত্র [illegible] আমাদের সঙ্গে ছিল, ষাঁড়টি কিন্তু আর কাহাকেও [illegible] উপদ্রব করিল না। চন্দ্র-বাবু প্রকাশ্যে স্বীকার না [illegible] তাঁহার অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বিষ্ণুপ্রীতি [illegible] বহিতেছে। শিকারী বিড়াল গোঁপে চেনা যায়, [illegible] জীবে দয়া যাঁহাদের জপমন্ত্র সেইসব বৈষ্ণব [illegible] কিছুই রাখেন না! এ লক্ষণটি চন্দ্রবাবুর মুখে [illegible] বিষয়। হরিদ্বারের বাজারে হরি সংকীর্ত্তন [illegible] তিনি এক ছটাক বাতাসা কিনিয়া ছুটিয়া গিয়া [illegible] দিলেন। সেই হরির লুটের টীকার সাহায্যে [illegible] দলের ব্যাসকূট সহজ হইয়া আসিল! মহাদেবের [illegible]

চন্দ্র-বাবুর আকারে প্রকারে শৈব ভাবের অভাব অনুভব করিয়া থাকিবে, তাই বুঝি ক্রোধে অধীর হইয়া লাল কাপড়ের ছুতায় তাঁহাকে গুঁতাইতে আসিয়াছিল!

বনের আড়ালে দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠিল। গাছের ডালের ফাঁকে-ফাঁকে জ্যোৎস্নাজাল পথিপার্শ্বে 'কৈলাসপুরী'র সুরম্য হর্ম্ম্যের উপর পড়িল। এ কৈলাস শঙ্করের নিবাস নহে,—শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদের প্রতিষ্ঠিত মঠ। আলো-আঁধারের মধ্যে প্রকাণ্ড সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলিয়া উপরে উঠিলাম। দুই-তিনটা আঙ্গিনা পার হইয়া নাটমন্দিরে পৌঁছা গেল। চারিদিক্ মর্ম্মরমণ্ডিত এবং সুসজ্জিত, কৈলাসপুরীতে ইন্দ্রপুরীর আভাস। উৎকৃষ্ট গালিচা ও গদির উপর বড় বড় বালিশ, মোহান্ত মহারাজ সেইখানে বসেন! শঙ্করকৃত মোহমুদ্গরের আঘাতচিহ্ন মঠের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া ভার! সুদৃশ্য চন্দ্রাতপতলে শ্রেণীবদ্ধ মুণ্ডিত-মস্তক যতীরা সমস্বরে সান্ধ্যবন্দনা গাহিতেছিলেন।

ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। হিমালয়ের পবিত্র অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের ধূলামাটিতে ফিরিতে হইল। বড় বড় কুমড়া হৃষীকেশে কিছু সুলভ দেখিয়া কয়েকটা সঙ্গে লইলাম। আমাদের মত সংসারী লোকের তীর্থের ফল—কুষ্মাণ্ড! তাও বোধহয় অকালের!

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

হস্তামলক

(Blake)

যে দেখে কাঁকরে সৌরজগৎ
স্বর্গের ছবি বনের ফুলে;
অসীম তাহার হস্তামলক,
অনন্তকাল নিমেষ-মূলে।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

চিরন্তনী

(২১)

দত্তবাড়ী ঘুরিয়া আসার পরদিন যাইবার সময় অবিনাশ হঠাৎ সুপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, নূতন লোক-জনদের সঙ্গে আলাপ হল, কেমন লাগ্‌ল, কিছু যে বল্‌লি না?"

দুই ভাইয়ে এরকম আলাপ যে সচরাচর হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। আজ দুদিন ধরিয়া দাদার নানা নূতন খেয়ালে সুপ্রকাশ বিস্ময়ের খোরাক যথেষ্টই পাইতেছিল, কাজেই কথাটার উত্তর না দিয়া সে হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অবিনাশ বলিল, "মুরলা মেয়েটি কেমন গান শোনালে?"

সুপ্রকাশ চিরকালই গানের অনুরাগী; সে বলিল, "চমৎকার! ঠিক পাখীর মত সহজ গান।"

অবিনাশ খুসী হইয়া বলিল, "মানুষটিও বেশ; তোর কি মনে হয়?"

সুপ্রকাশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "একদিনে কি মানুষ চেনা যায়?'

অবিনাশ উঠিয়া চলিয়া যাইবার পর সুপ্রকাশ হাসিয়া শতদলকে বলিল, "ব্যাপার কি বল ত? কার কনে ঠিক করা হচ্ছে?"

শতদল বলিল, "তোমারই বোধহয়। তুমি কবি মানুষ।"

সুপ্রকাশ "তবেই সর্ব্বনাশ!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া চলিয়া গেল। ঘরে বসিয়া মনে মনে কথাগুলো উলটপালট করিয়া তাহার কেবলি হাসি আসিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে পড়িতেছিল করুণার ভাব-গভীর দুটি চোখের দৃষ্টি। মুরলার পাপিয়ার মত গান সে দৃষ্টির কাছে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল। আপনার এই অকারণ তুলনায় লজ্জিত হইয়া সুপ্রকাশ যেন চিন্তাগুলা সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একটা ভাঙা বাড়ীর শেওলা-পড়া চিলেকোঠার দিকে তাকাইয়া

সে গুনগুন করিয়া কি-একটা গান করিতে লাগিল। মুরলারই একটা গানের সুর তাহার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখে একটু হাসির ছটা ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। ভাঙা চিলেকোঠার মধ্যে হাসি আর গানের খোরাক যখন ফুরাইয়া আসিল তখন সে একখানা টাইম্‌টেব্‌ল্ হাতে করিয়া খাটে শুইয়া পড়িল। ঘরে রোদের ঝাঁঝ আসিয়া তাহার মুখে পড়িতেছিল, কিন্তু উঠিয়া জানালা ভেজাইয়া দিতেও তাহার উৎসাহ দেখা গেল না। সে আপন মনে টাইম্‌টেব্‌লের পাতা উল্টাইতে লাগিল। হাসির রং আজ ইহার পাতাতেও লাগিয়াছিল। রোদটা পড়িয়া আসিতেছিল; এমন সময় জোরে দরজাটা ধাক্কা দিয়া ঘরে ঢুকিল কালো বনাতের কোট গায়ে একটি রোগা ফর্সা যুবক। সুপ্রকাশের হাতের টাইম্‌-টেব্‌ল্‌খানা খপ্ করিয়া কাড়িয়া লইয়া সে বলিল, "মহাভারত! তোর হয়েছে কি রে? বিকেল বেলা খাটে পড়ে টাইম্‌টেব্‌লের মধ্যে হাসির স্বপ্ন দেখ্‌ছিস্। আমরা বাপু medical student সব রোগের ডায়াগ্‌নোসিস্ করে বেড়াই। আমাদের কাছে ফাঁকিবাজি চল্‌বে না। বল্ কোথায় খানায় না খন্দে পড়েছিস্।"

সুপ্রকাশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "নিজে খানায় পড়েছ বলে বুঝি ল্যাজ-কাটা শেয়ালের মত সবাইকে দলে টান্‌বার চেষ্টা? মণি না হলে আর এমন বুদ্ধি কার?"

যুবক সুপ্রকাশের পিঠেরউপর সজোরে একটা ঘা দিয়া বলিল, "হ্যাঁ হে সাধুপুরুষ! ঢের ঢের বিড়াল-তপস্বী দেখেছি তোমার মত। আর বেশী কথায় কাজ নেই। এই যে অবিনাশ-দা এতদিন বড় চাল চেলে বেড়াতেন; এখন বুড়ো বয়সে এ-সব হচ্ছে কি শুনি? পরের বেলায় খুব ত কথার ফোয়ারা ছোটে, নিজেদের বেলায় সাত খুন মাপ?"

অবিনাশ-দা বুড়ো বয়সে কি যে করিতে বসিয়াছেন সুপ্রকাশ ঠিক বুঝিয়া উঠিল না। অথচ ঘরের খবর পরের কাছে লইবার আগ্রহটা চিরকালই তাহার চোখে এমন খেলো ঠেকিত যে সে পথেও যাওয়াটা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। অনেক দিন সে বাড়ী ছিল না, ইতিমধ্যে তাহার নারীবিদ্বেষী দাদাটির এদিকেও নূতন কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়; কিন্তু ব্যাপারটা যখন তাহার জানা নাই তখন আর কি বলে? সুপ্রকাশ বলিল, "আরে বাপু অত চটিস্ কেন? নিজেই ত দিদির লাড্ডুর বর্ণনায় লোকের কান ঝালাপালা করে তুলি, এখন পিটিয়ে জয়লাভ কর্‌বার চেষ্টা কেন আবার! মাথা একটু শীতল করে বেরিয়ে পড়্‌বে চল।"

মণীন্দ্র বাহির হইল বটে, কিন্তু পেটের ভিতর তাহার যেন কেবলি উস্‌খুস্ করিয়া বেড়াইতেছিল। এদিকে ওদিকে খানিকটা ঘুরিয়া গড়ের মাঠের একটা ম্যাচ দেখার উপলক্ষে গলা ফাটাইয়া খুব চীৎকার করিয়া মেচি করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সুপ্রকাশকে টানিয়া একটা গাছতলায় আনিয়া বসিয়া সে বলিল, "বোস্ না এইখানে একটু। লোকের ভিড়টা চলে যাক তারপর যাওয়া যাবে এখন। দেশ উদ্ধার করে এতদিন পরে মর্ত্তের মানুষদের মধ্যে যখন ফিরেই এসেছিস্ তখন একটু না হয় বাজে গল্প কর্‌লিই! তাতে কিছু তোর ধর্ম্মের ঝুলিটা কমে যাবে না।"

সুপ্রকাশ ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল, "এই যে একেবারে শুয়ে পড়্‌লাম। বল্ এখন তোর কি বক্তব্য আছে। Night duty, curtain lecture, social scandal প্রভৃতি যত কিছু তোমার হৃদয়-বিদারক এবং মুখ-রোচক গল্প আছে করে যাও, আমি নির্ব্বিবাদে সব শুনে যাব।"

সুপ্রকাশের ভণ্ডামি ও তাহার নিজের সরলতা লইয়া খানিকটা তর্কবিতর্কের পর মণি আসল কথাটা পাড়িল, কারণ সেই কথাটা বলিবার অবসরই সে এতক্ষণ খুঁজিতেছিল। সে বলিল, "দেখ্ বেশী বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়। অবিনাশদার নজর ত যা হয়ে উঠেছিল তাতে বাদশাও হার মেনে যায়। রাজকন্যাই হোক আর মন্ত্রী-কন্যাই হোক, পদ্মিনীই হোক কি নূরজাহানই হোক, আমাদের ডাক্তার সাহেব যেন দেখ্‌তেই পেতেন না। শেষকালে বাপু বুড়ো কেরানীর ফাঁদে ত ধরা পড়্‌তে হল। চটিস্‌নে, দুই ছেলেবেলার বন্ধু তাই বল্‌ছি, আচ্ছা কি জিনিষ এ-তে শুনি?"

সুপ্রকাশ চুপ করিয়া শুনিয়া কেবল একটু হাসিল।

মণি চটিয়া বলিল, "দেখ্ তোর ঐ ভিট্‌কেলেমি আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। আমি-হতভাগা লোককে গাল দিয়ে পাপের ভাগী হব আর উনি সাধুপুরুষ কেবল বসে বসে হাস্‌বেন।"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "তবে কি চাও যে তোমার সমস্বরে chorus ধরি?"

মণি হঠাৎ কথার গতি ফিরাইয়া বলিল, "আচ্ছা, মেয়েটিকে ত দেখেছিস? কি এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী তা ত বুঝ্‌লাম না! হতে পারে আমরা মুদ্দফরাসের ব্যবসা করি, কিছু বুঝি না, কিন্তু তুই ত আছিস মস্ত কবি, তুই বল্‌না।"

সুপ্রকাশ বলিল, "মেয়েটি বল্‌তে ত পৃথিবীতে একজন মানুষকে বোঝায় না যে আমার কবিত্বের জোরে সে অপূর্ব্ব সুন্দরী কি না এক বাক্যে বলে দেব।"

মণি বলিল, "রাখ্, রাখ্ আর ন্যাকা সাজে না। তারিণী-বুড়োর নাতনীকে মহাশয়ের চক্ষে কেমন লাগে সেই কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল। কথাটা মাথায় ঢুকেছে ত এইবার?"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সুপ্রকাশ ঘাসের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। কথাটা কানে আসিতেই তাহার বুকের ভিতর যেন আচম্‌কা একটা ঘা লাগিল। এ নামটা শুনিবার আশঙ্কা সে মোটেই করে নাই। এই একটা কথাতেই তাহার সমস্ত মুখ চোখ যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মণীন্দ্রের চোখে সন্ধ্যার ছায়ায় ধরা না পড়িলেও সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি মুখটা পাশের দিকে ফিরাইয়া লইল। বিশ্বভুবন তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া গেল না বটে, কিন্তু সযত্নে আঁকা সুচিত্রিত ছবির উপর এক ঝট্‌কা কালী ছড়াইয়া দিলে যেমন তাহা হতশ্রী হইয়া যায়, তাহার দিকে চাহিতেও কষ্ট হয়, এই একটা কথার কালীতে সুপ্রকাশের তেমনি ইচ্ছা করিতেছিল তাহার চর্ম্মচক্ষু মনশ্চক্ষু সকলের ত্রিসীমা হইতে রূপলোককে সে দূরে ঠেলিয়া দেয়।

মণি কথার উত্তর না পাইয়া বলিল, "চুপ করে রইলি যে, কথার উত্তরও কি দিতে পার না?"

সুপ্রকাশ তখনি নিজের ভাবনাটা ঠেকাইয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ডাকে সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল, "কি আর বল্‌ব? যা বল্‌বার তুমি ত বলেই ফেলেছ।"

মণি বলিল, "তবু তোর ত একটা মতামত আছে?"

সুপ্রকাশ বলিল, "আমার মতে ভালই ত মনে হয়।"

মণি বলিল, "ওরে বাবা, তোর যে দেখি এরি মধ্যে টান হয়ে গেছে। আর কারুর কথা হলে ত এখুনি দিশী বিলিতী সাত হাজার মাপকাঠি নিয়ে বসে যেতিস্।"

মণির ভ্যানভ্যানানি সুপ্রকাশের কানে কেমন একটা বিরক্তি আনিয়া দিতেছিল। ইচ্ছা করিতেছিল তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া মাটির উপর একটু চোখ বুজিয়া পড়িয়া এলোমেলো চিন্তাগুলা আস্তে আস্তে গুছাইয়া লয়। বাস্তবে কল্পনায় এক নিমিষে কি যে একটা জট সে পাকাইয়া ফেলিয়াছিল লোকের চোখে সেটাকে আড়াল করিতে গিয়া তাহার জাল যেন আরো জড়াইয়া যাইতেছিল। তবু সুপ্রকাশ সামাজিক এ মুখোসটা কিছুতেই এতটুকু সরাইতে পারিল না; সে বলিল, "দেখ্, কাল্পনিক মানুষ নিয়ে ওসব চলে, তা বলে আমি এখনও এতবড় গাধা হইনি যে ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে তোমার সঙ্গে বসে ঘোঁট পাকাব।"

মণি বলিল, "বাপ! তুই দেখ্‌ছি এবার সাক্ষাৎ বিবেকানন্দ হয়ে এসেছিস। তোর সঙ্গে আর কথা নয়!" কিন্তু কথা তাহার অত সহজে ফুরাইবার নয়। মণি আপন মনে আরও কতক্ষণ যে বকিয়া গেল তাহার ঠিক নাই। তারিণী, করুণা, অবিনাশ এই তিনটা নাম ঘুরিয়া ফিরিয়া সুপ্রকাশের কানে আসিয়া লাগিতেছিল, কিন্তু কোন্ সূত্রে এই কটা নাম যে সে গাঁথিয়া তুলিতেছিল, সুপ্রকাশের মন তাহা চাহিয়াও দেখিল না। বিলাতী দোকানের আলোর মালাগুলার দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। মনে তাহার কদিন ধরিয়া যে একটা আনন্দের জোয়ার ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, আজ এক নিমিষে তাহা যেন কোন্ পাতালমুখীন গহ্বরের টানে নিঃশেষে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কেবল খানিকটা ঘোলা মাটি তাহার পঙ্কিলতাটুকু সম্বল করিয়া যেন পড়িয়া রহিল। অন্ধকারে তাহার চোখের কোণে জল ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিক্তরসে মন বিস্বাদ হইয়া উঠিতে

চাহিতেছিল, কিন্তু কি একটা বিষণ্ণ বেদনা তাহাকেও দূরে ঠেলিয়া চোখের জলে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। নিষ্ঠুর নাট্যকার যে তাহাকে লইয়া কেন এ নিদারুণ নাট্যলীলা সুরু করিলেন সুপ্রকাশ ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার বড় গর্ব্ব ছিল যে বিধাতার পরিহাসকেও সে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে; কিন্তু আজিকার এ খেলায় সে হাসিয়া জয়লাভ করিতে ত কিছুতেই পারিতেছিল না, বিদ্রোহ ধ্বজা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারিতেছিল না; অশ্রুজলে পরাজয় স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন আজ যেন আর তাহার গতি নাই।

মণি হঠাৎ তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "কি রে খোলা হাওয়া পেয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়্‌লি নাকি? রামঃ তোকে নিয়ে আজ আর পারা গেল না। চল্ ওঠ্ বাড়ী যাওয়া যাক্।"

সুপ্রকাশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুই যা, আমার এদিকে একটু কাজ আছে।"

দুইজনে উঠিয়া দুইদিকে চলিয়া গেল।

মণি অনেক দূরে চলিয়া যাইবার পর সুপ্রকাশ আবার সেই মাঠেই ফিরিয়া আসিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। একটু দূরের একটা বড় ল্যাম্পের আলো গাছের পাতায় পাতায় পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল, তলায় বড় আল্‌পনার মত একটা ছায়ার ছবি পড়িয়াছিল। আলোটার দিকে পিছন ফিরিয়া সুপ্রকাশ সেইখানেই বসিয়া রহিল। আকাশের অন্ধকার যত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, পথের আলো ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সুপ্রকাশের ইচ্ছা করিতেছিল সন্ধ্যার এই আলো-অন্ধকারের খেলার মধ্যে তাহার দিনগুলা আলস্যে এমনি পড়িয়া পড়িয়া কাটিয়া যাক্। দিনের আলোতে যে বেদনার কোনো রূপই থাকে না, রাত্রির অন্ধকারে তাহাও তীব্র রূপ ধরিয়া উঠে— ব্যক্ত অব্যক্ত যত ব্যথায় সুপ্রকাশের হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল, ততই সে যেন অবসাদের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিতে লাগিল, সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া যাহারা ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিল, যাহারা পথে আধ-অন্ধকারে এমন একটা মানুষকে এখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে একটু ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল। মুখের খুব ক[illegible] অচেনা দাড়িওয়ালা মুখ দেখিয়া সুপ্রকাশ সজা[illegible] উঠিয়া বসিল। বড় দুঃখেও তাহার হাসি আসিল। কি তাহার অদৃষ্টকে হাস্যমুখে পরিহাস করা সহজে সে এমন বালকের মত ভাঙিয়া প[illegible] কেন? কি তাহার হইয়াছে? কিছুই ত নয়! সে ত কি[illegible] পায় নাই, তবে হারাইবার এ বেদনা তাহার কেন? মনকে যুক্তি-তর্কে বুঝাইতে না পারিয়া হার মানিয়া উঠিয়া সে ঘ[illegible] ফিরিয়া চলিল। সারারাত স্বপ্ন দেখিল কতকি যে তাহ[illegible] মাথামুণ্ড নাই। একরাত্রেই সে কত কি যে পাইল আ[illegible] কত কি যে হারাইল জাগিয়া এক যুগেও যাহা বাস্তবে ভাগ্যে ঘটে না।

স্বপ্নের অশ্রুজলে তাহার বাস্তব ব্যথা যেন ধুইয়া নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। সকালের আলোর সঙ্গে অশ্রুধোয়া একটু হাসিতে তাহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সভ্য তখন সে বলিতে পারিতেছিল দেওয়া যে তাহার দেওয়াতেই সার্থক হইয়াছে, এই সকলের শান্ত বেদনাই ত তাহার প্রমাণ। কিন্তু ধরা দেওয়ার লজ্জায় তাহার তরুণ মন মুখখানাকে ক্ষণে ক্ষণে রাঙাইয়া তুলিতেছিল। কেন সে চিঠি লিখিতে গেল? কেন সে দুদিন না দেখিয়া যাচিয়া ধরা পড়িতে গেল?

শুধু দিয়া ধন্য হইবার গৌরবে যখন সে তাহার ব্যথার মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, বিধাতার খামখেয়ালকে যখন সে হেলাভরে অবজ্ঞা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখনও যেন তাহার সকল সাধনা পণ্ড করিবার জন্য অদৃষ্ট নূতন খেলা সুরু করিলেন। নিজেকে জগতের চেয়ে একটু উঁচুতে বসাইয়া তাহার আনন্দের উচ্ছ্বাস আর ব্যথার ক্রন্দনকে একটু দূর হইতে দেখিয়া অতি নিকট অতীতের তাহার এই "আমি"কে সে সবে সমালোচনা করিতে সুরু করিয়াছিল, বাধা-বিঘ্নের অবসান তখনও হয় নাই, এমন সময় নূতন বাধা আসিয়া তাহার সে উচ্চ আসন হইতে তাহাকে টলাইয়া ফেলিল।

শুধু দানের মধ্যে গৌরব করিবার একটা বড় জিনিস আছে, কিন্তু শুধু গ্রহণের মধ্যে মানুষ আজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুপ্রকাশের [illegible]

করিয়া দিবার জন্যই যেন গ্রহণের এই বোঝা তাহার মাথায় যাচিয়া আসিয়া চাপিল। তাহাতে তাহার অনুক্ষণ নিমন্ত্রণের আর শেষ নাই। যাইতে ইতস্তত করে অবিনাশের আগ্রহে সে ভার আর ঠেলিয়া রাখা যায় না। বৈরাগ্যের আপনার আগাগোড়া রাঙাইয়া মনে মনে যখন সে একটা বড় রকম ত্যাগী হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তখন বড় মানুষের বাড়ীর মজ্‌লিসে এই অহরহ নিমন্ত্রণটা তাহার একটুও ভাল লাগিতেছিল না। নিজের মধ্যে তাহার আনন্দের অভাব হইয়াছিল বলিয়া মুরলা-বিজলীর অকারণ হাসি-উচ্ছ্বাস-কলকণ্ঠের কোলাহল সবই তাহার বাড়াবাড়ি ঠেকিত। মনে হইত জীবনটাকে ইহারা এমন তুচ্ছ খেলার সামগ্রীর মত যা খুসি তাই করিয়া নষ্ট করিতেছে,—ইহারাই কি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎবংশীয়া শিক্ষিতা মহিলা? আনন্দবাদের যখন সে একজন মস্ত পাণ্ডা ছিল, তখন এই মেয়েদের সমস্ত তুচ্ছ হাসি-খেলাকেই সে তাহাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস বলিয়া মাপ ত করিতই, হয়ত বা সাদরে গ্রহণ করিত। কিন্তু এই কদিনের মধ্যে সে কেবল পদে পদে তাহাদের গভীরতার অভাব চিন্তাশীলতার ত্রুটি এই-সকলই দেখিতে পাইতেছিল। স্বভাবতই মুরলা-বিজলীর সাজসজ্জার দিকে ঝোঁক যথেষ্ট ছিল, তাহার উপর যখন এই নূতন অতিথিটিকে লইয়া বাড়ীতে একটু সাড়া পড়িয়া গেল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যবোধকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করিয়া দিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবার লোভে সে দিকে দৃষ্টি তাহাদের আরোই বাড়িয়া গেল। হাজার গান-গল্পের মধ্যেও কোথায় কাঁটার বাঁধন ছাড়াইয়া চুল আলুগা হইয়া পড়িল, কোথায় কাপড়ের পাড় কুঁচ্‌কাইয়া গেল, হাতখানা কোথায় কেমন ভাবে পড়িল, সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ থাকিত। একজনের সামান্য ত্রুটি অন্যজন ইঙ্গিতে বুঝাইয়া সাবধান করিয়া দিত। অনিচ্ছার আসা-যাওয়া করিতে হইত বলিয়া সুপ্রকাশ সমস্ত ক্ষণ যেন সমালোচক সাজিয়াই বসিয়া থাকিত। সৌন্দর্য্যের প্রতি মুরলা-বিজলীর অতিরিক্ত দৃষ্টি তাহার চোখে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর শরশয্যা হইয়া উঠিয়াছিল। যত সে বিরক্ত হইয়া উঠিত ততই তাহার মনে পড়িত গ্রামলক্ষ্মীর কোলে দেখা করুণার সেই সহজ শ্রীর কথা। মুরলা-বিজলী যে সুপ্রকাশের এই বিরক্তির ভাব একটুও ধরিতে পারিত না তাহা নয়, কিন্তু সেটা তাহারা অন্যভাবে লইয়া কোলাহল গোলমাল তুমুলতর করিয়া তুলিয়া সভার আনন্দ জমাট করিয়া তুলিতে চাহিত।

সুপ্রকাশ ঠিক করিতেছিল দিন কতকের জন্য আবার কোথাও ঘুরিয়া আসিবে। সেদিন দুপুর বেলা অবিনাশ দরজা জানালা ভেজাইয়া আধ-অন্ধকারে ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল; তাহার চারিধারে বেতের চুবড়িতে কাগজের স্তূপ এলোমেলো ভাবে পড়িয়া ছিল। দুই পাশে দুইটা দেরাজ আধখোলা ভাবে ভিতরের সম্পদগুলি বাহিরকে দেখাইবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া ছিল। এমন সময় ঘরের সাম্‌নের দরজাটা হাঁ করিয়া খুলিয়া দিয়া সুপ্রকাশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অবিনাশ ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া বিরক্ত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া তাকাইল। তাহার চশ্‌মার কাচের উপর দরজার পথ দিয়া অনেকখানি রোদ আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষীণ দৃষ্টিকে মহা বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। সুপ্রকাশ ঘরে ঢুকিয়াই কোনো ভূমিকা না করিয়া বলিল, "দাদা, আমি দিন পাঁচসাত একটু ষ্টিমারে ঘুরে আস্‌তে চাই, আমার গোটাকয়েক টাকা চাই।"

অবিনাশ চশ্‌মাসুদ্ধ চোখদুটা রোদ হইতে বাঁচাইয়া বলিল, "কেন, এই ত এতদিন ভবঘুরের মত ঘুরে বাড়ী ফির্‌লে, আবার এরি মধ্যে অত তাড়া কিসের?"

সুপ্রকাশ বলিল, "কল্‌কাতায় মনটা একটুও ভাল লাগ্‌ছে না, একটু বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসি না!"

অবিনাশ চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "বাংলা কথায় কি বলা যায় না? এই-সব আজকালকার দেড়হাত ছেলেদের তেরোহাত কথা আমি চুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। মনি আবার ভাল মন্দ কি? কি হয়েছে সোজা কথায় বল, ওষুধ দিচ্ছি সেরে যাবে।"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, "কিছু না, একটু বাইরে ঘুর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে।"

অবিনাশ দেরাজ ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, "যাও, যাও, আর হেঁয়ালি বোকো না, এই নাও কোথায় ঘুর্‌বে, ঘুরে এস।" অন্ধকার দেরাজের মধ্যে রোদ পড়িতেই

ঝল্‌মল্ করিয়া কি একটা জ্বলিয়া উঠিল। সুপ্রকাশ কৌতূহলে উৎসুক হইয়া ঝুঁকিয়া দেখিল, একটা সোনার পদকে লেখা "করুণা"। অবিনাশ রোদ বাঁচাইয়া তাকাইবার আগেই সুপ্রকাশের ভাল করিয়া দেখা হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশ সেদিকে না দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে দেরাজটা বন্ধ করিয়া অন্য দেরাজ খুলিয়া খান-কয়েক নোট লইয়া সুপ্রকাশের হাতে গুঁজিয়া দিল।

টাকা লইয়া সেখানে আর না দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ সোজা নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু সোনার পদকটা তাহার লজ্জা আর বেদনা যেন নূতন এবং বেশী করিয়া জাগাইয়া দিল। অবিনাশের একান্ত আপনার কোণে করুণার নামাঙ্কিত পদকটার যে একমাত্র অর্থ তাহার মনে হইতেছিল তাহাতে তাহার দানের গৌরবকে সে আর তেমন করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। জন্মগত সংস্কার তাহার দিবার অধিকারকে খর্ব্ব করিয়া দিবার জন্য তাহার সমস্ত যুক্তিকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিতেছিল। যে চিঠিখানা লিখিবার দিনে আনন্দের গর্ব্বের তাহার সীমা ছিল না, সেই চিঠিখানা মনে করিয়াই আজ সে লজ্জায় ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিতেছিল। লজ্জিত হইবার তাহার কিছু ছিল না, কিন্তু করুণা তাহাকে না জানি কি-একটা মনে করিবে এই কল্পনাতেই তাহার অকারণ লজ্জা দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছিল। মনের আর-একটা বোঝা বাড়াইয়া সুপ্রকাশ পরদিনই মন ভাল করিবার চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িল।

(২২)

কলিকাতার ঘাটের নৌবাহিনী ছাড়াইয়া উপরের ধূম্রলোক আর নীচের ঘোলা জল দূরে ফেলিয়া স্বচ্ছ আকাশ আর স্বচ্ছ জলের আলিঙ্গনের মধ্যে সুপ্রকাশ যত অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল মনটা ততই তাহার হাল্‌কা হইয়া উঠিতেছিল। কদিনের মধ্যে তাহার বিচার, বুদ্ধি সহজ আনন্দ কল্পনা সব যেন কিসের ভারে পীড়িত হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ আর কুটিল হইয়া উঠিতেছিল। আপনাকে মাত্র সম্বল করিয়া দিন কাটানো তাহার কোনো দিনই অভ্যাস ছিল না; কিন্তু খোলা আকাশের তল দিয়া গঙ্গার দুই তীরের গাছপালা ভাঙা ঘাট পথ গ্রাম পিছনে রাখিয়া আজ যত সে নূতন হইতে নূতনতর দৃশ্যের মধ্য দিয়া চলিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল, তাহার এবারকার কলিকাতা-বাসের এই একটা একান্ত আত্মসর্ব্বস্ব দিনের কথা। কি লইয়া সে দিনগুলা কাটাইল? শুধু আপনার ক্ষুদ্র আমিটুকু! যতক্ষণ তাহার অনুকূলে বায়ু বহিয়াছিল, ততক্ষণই জগতে সে আনন্দ দেখিল, যেই একটা দুঃখের ঘায়ে ফিরিতে হইল, অমনি তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল কেবল তাহার অন্তরের আবিলতায়। তাই সে যেদিকে তাকাইয়াছে সেই দিকেই কেবল কত খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। মনের এই খোরাক লইয়া কি সে এতদিন বড়াই করিয়া বেড়াইয়াছে? জগতের রূপ-রসের কথা সে যে এতদিন পরকে বলিয়া বেড়াইত, আজ সে জগৎকে আবার চোখ মেলিয়া দেখিবার আগে সে ত তাহাকে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। সেই ত একদিন বলিত, অনাদিকাল হইতে পৃথিবী গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সকল বন্ধন, ব্যবস্থা, রহস্য সামান্য একটা আজকার মানুষের সাধ্য কি যে এক নিমিষে বুঝিয়া উঠে। কিন্তু আজ কেন সে একটা কথা না বুঝিবার দুঃখে আর সব দূরে ঠেলিয়া ফেলিতেছে? সমস্ত মন দিয়া শুধু আপনার দুঃখকে যে জিয়াইয়া রাখে জগতে সেই ত সকলের চেয়ে দুঃখী, এ কথা সে ত অনেকদিন আপনিই বলিয়া বেড়াইয়াছে, তবে কেন সে আজ নিজের দুঃখ আগ্‌লাইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িল? গঙ্গাজলের সিক্ত হাওয়া সুপ্রকাশের মুখে চোখে কার যেন স্নেহস্পর্শের মত বুলাইয়া তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া তুলিতেছিল, খোলা আকাশের প্রসার তাহার মনের প্রসারও বাড়াইয়া দিতেছিল. এমন করিয়া আপনার মনের ব্যথাটুকু লইয়া ছোট হইয়া থাকিতে আর তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না, দুর্ব্বলের মত ক্রন্দনে তাহার দানের গৌরবকে সে আর খর্ব্ব করিতে চাহিতেছিল না। সে অশ্রু মুছিয়া বীরের মত জগতের ব্যথা মোচন করিতে যাইবে, নিজের ব্যথা লইয়া আর কাঁদিবে না।

মনে মনে কত সঙ্কল্প করিয়া যে সাতদিন পরে সুপ্রকাশ বাড়ী ফিরিল. তাহার ঠিক নাই। গুয়াতন

আবেষ্টন তাহার মনকে আবার টলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এবার সে আপনি আপনার সজাগ প্রহরী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পরদিন অবিনাশ সুপ্রকাশকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেখ খোকা, তোমার এখানকার পড়াশুনো ত একরকম শেষ হল, তা একবার বিলেতটা ঘুরে এলে হত না? বেশী দিন লাগ্‌বেও না, রোজগারের পক্ষেও সুবিধা হবে।"

ষ্টীমারে বসিয়া সুপ্রকাশ তাহার বিশ্বসেবার যতগুলা প্ল্যান করিয়াছিল, বিলাত-যাত্রার সহিত তাহার কোনটারই বিশেষ নিকট সম্পর্ক ছিল না। কাজেই অবিনাশের এরকম প্রস্তাবে সে চট করিয়া একটা উত্তর দিতে পারিল না। সুপ্রকাশকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অবিনাশ বলিল, "কথাটা শোন্‌বামাত্রই যে তোমায় হাঁ কি না বল্‌তে হবে এমন কিছু নয়। দিন দশেক ভেবে দেখ, তারপর না হয় বোলো।" সুপ্রকাশ খুসী হইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আর-একটা কথা আছে।" সুপ্রকাশ অবিনাশের মুখের দিকে কথা শুনিবার আশায় চাহিয়া দেখিল তাহার মুখখানা যেন কি রকম বিব্রত দেখাইতেছে, অবিনাশের পক্ষে ছোট ভাইকে কোনো কথা বলিতে এ রকম বিব্রত হওয়া যে কতখানি নূতন তাহা সুপ্রকাশই বুঝিল। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ চোখ প্রায় লাল করিয়া তুলিয়া শেষে অবিনাশ বলিল, "দেখ, দত্তসাহেবের বাড়ী—আমি তোমার বিলাত যাওয়ার কথা গল্প করেছি, তারা যদি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করে ত যেন সোজা অস্বীকার করে বোসো না। তোমাকেই কথাটা আগে বলা উচিত ছিল, তা তাদের যখন বলেছি তখন তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। পরে এক সময় সে-সব কথা বল্‌ব।" আর কিছু না বলিয়া অবিনাশ হঠাৎ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আজন্মকাল সুপ্রকাশ অবিনাশকে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু চিরকালই সে তাহাকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারূপে দেখিয়াছে। তাহার কোনো কাজের জন্য কাহারও কাছে তাহাকে সে কখনও কৈফিয়ৎ দিতে দেখে নাই, অথবা চাহিতেও দেখে নাই। বিশেষতঃ যাহারা সুপ্রকাশের মত বয়সে ছোট এবং আশ্রিত তাহাদের ত সে কোনোকালে ধমক দিয়া ছাড়া কথাই বলে নাই। আজ সে তাহার একটা কাজ অনুচিত বলিয়া স্বীকার করাতে সুপ্রকাশ যতখানি বিস্মিত হইয়াছিল, পথের একজন মানুষ পায়ে ধরিয়া অকারণ ক্ষমা চাহিতে আসিলেও বোধ হয় সে ততটা বিস্মিত হইত না। কিন্তু এতখানি বিস্ময় যাহাতে তাহার ঘটিল, তাহার মূল কারণটা যে নিতান্ত ছোটখাট কিছু নয়, তাহা খুঝিতে সুপ্রকাশের দেরী হইল না। এত জায়গা থাকিতে দত্ত-সাহেবের বাড়ীতেই বা কথাটা উঠিল কেন? অবিনাশ কি সুপ্রকাশকে লইয়া নিজের বিলাত-যাত্রার পুনরভিনয় করিতে চায়? কথাটা মনে করিয়াই দাদার প্রতি অবিচার করিতেছে ভাবিয়া সুপ্রকাশ লজ্জিত হইয়া পড়িল, কিন্তু অবিনাশের কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তা আর দত্ত-বাড়ীর আদর-অভ্যর্থনা তাহাকে কেবল ওই কথাটার দিকেই লইয়া যাইতেছিল।

সুপ্রকাশের বিশ্বসেবার উজ্জ্বল সংকল্পগুলিকে ম্লান করিয়া দিয়া আবার নূতন নূতন ভাবনা চিন্তা আসিয়া পড়িল। বিশ্বটা তাহার যতক্ষণ তাহার মনে বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততক্ষণ বাঙালীর ঘরের একটি মেয়ের চিন্তাকে দূরে সরাইয়া বিশ্বের চিন্তা করা তাহার পক্ষে তত কঠিন হয় নাই। কিন্তু বিশ্ব যখন সাগর পার হইতে দেখা দিল তখন তাহার হিত-চেষ্টাকে ডিঙাইয়া সেই বাঙালী মেয়ের মুখের ছবিখানাই বড় হইয়া উঠিল।

ইউরোপের নানা দেশে ঘুরিয়া তাহার হিতসাধনের ব্রত উদ্‌যাপন যে আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে একথা সে বুঝিল। মানুষকে দেশের মানুষের চেয়েও উদার ক্ষেত্রে দেখিয়া শুধু মানুষ বলিয়া ভালবাসিবার সাধ তাহার চিরকালই ছিল। কিন্তু হিতসাধনের সংকল্প সে যেদিন করিয়াছিল সেদিন সে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র একটা গণ্ডির মধ্যে জড়িত দেখিয়া ভীত হইয়াই বাহির হইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল। তাই দৃষ্টিটা তাহার সেদিন বিশ্ব-ব্যাপী না হইয়া দেশব্যাপী হইয়াছিল। আজ আবার এই সূত্রে তাহার পুরাতন সাধটা জাগিয়া উঠিল। তাছাড়া

বিদেশের শিক্ষা অভিজ্ঞতা যে দেশের কাজে তাহাকে আরো সাহায্য করিবে ইহা ত ধরা কথাই। মানুষের সুখ দুঃখ বুঝিতে হইলে নিত্য নূতন মানুষের সম্পর্কে আসিতে পারার সুযোগ কখনও ছাড়িতে নাই।

কিন্তু মন যে তাহার তত্ত্বকথায় তৃপ্ত হইতে চাহিতেছিল না। কাছের মানুষকে যে তাহার এখনও বোঝা হয় নাই, দূরের সন্ধানে সে কি করিয়া চলিয়া যায়? এখনও যে তাহার কত জানিবার আছে। দীর্ঘকালের মত দূরে চলিয়া যাইবে করুণাকে কিছু না বলিয়া—এও কি সম্ভব? যে-সব কথা লইয়া সে এত দুঃখ পাইল হইতে ত পারে যে তাহা সবই মিথ্যা। মিথ্যাই যদি না হইবে তবে রাজগঞ্জ ছাড়িয়া নববর্ষের দিনে সে যখন চলিয়া আসিল, তখন করুণার মুখের কথায় কান্না অমন কাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল কেন? শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সে তাহাকে অমন করিয়া দৃষ্টি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছিল কেন? মিথ্যা! মিথ্যা! লোকের মুখের এইসব ছোট কথা কি তাহার এত দিনের অনুভূতির চেয়ে বড় হইতে পারে?

সুপ্রকাশ পুঁথির এক-একখানি পাতার মত করিয়া রাজগঞ্জের তাহার এক-একটি দিন যেন খুলিয়া খুলিয়া দেখিতেছিল। মন তাহার তাহাতে তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যখন মনে পড়িল করুণার সেই গলার হারের কথা, যখন মনে পড়িল আজ এক মাস হইয়া গেছে তবু করুণা তাহার চিঠির উত্তর দেয় নাই, তখন তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত কি-একটা কথা খোঁচা দিয়া দিয়া ঘুরিতে লাগিল।

অন্তরের আলোয় যাহার ক্ষীণ তনুখানি জ্বলিতে দেখিয়াছে, সেই করুণার মনে যে কোনো মলিনতা থাকিতে পারে এ কথা সুপ্রকাশ বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবিনাশের সঙ্গে যে করুণার একটু ঘনিষ্ঠতা আছে, এ কথা ত তারিণীকান্তের মুখেই আসিবার দিন সে শুনিয়া আসিয়াছে। কিন্তু করুণার মুখে কখনও সে অবিনাশের কোনো কথা ত শোনেই নাই, অন্য কথা পাড়িলে করুণা যেন সে কথাটা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে। আজ এ কথাটা সুপ্রকাশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। তবে ইহার অর্থ কি? হয় করুণাকে সে ভুল বুঝিয়া ছলের জালে আপনাকে জড়াইতেছে, নয় অবিনাশই করুণার কাছে.....কি করিয়াছে সুপ্রকাশ ভাবিয়া পাইল না। করুণাকে সে ভুল বুঝিয়াছে এ কথাও সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না।

সুপ্রকাশকে বিলাত যাইবার কথাটা বলিতে অবিনাশকে যেটুকু মাথা নীচু করিতে হইয়াছিল, সেইটুকুর অপমানই তাহার যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই সে কথা শেষ করিয়াই গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। সে মহা এক গণ্ডগোল পাকাইয়া বসিয়াছিল। সুপ্রকাশ যদি বিলাত যাইতে রাজি না হয় তাহা হইলে এই-সব গোলমালের ভিতর হইতে নিজেকে যে সে কি করিয়া মুক্ত করিবে তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

সুপ্রকাশের চিঠি খুলিয়া পড়ার পর হইতে পথ মুক্ত করার চেষ্টায় একটার পর একটা করিয়া সে নূতন নূতন জালেই জড়াইতেছিল।

চিঠিখানা পড়িয়া বিস্মিত ত সে হইয়াই ছিল, রাগও কম করে নাই। কতকটা রাগ করিয়া আর কতকটা ঈর্ষাকে সুবিবেচনা ভাবিয়া অবিনাশ ঠিক করিয়া ফেলিল, সুপ্রকাশের একটা বিবাহ দিয়া দিতে হইবে। চিরকালই সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে; ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কাজটা আগে করিয়া তার পরে ভাবিবার কিছু থাকিলে সে ভাবিতে বসিত। কাজেই ভাবিয়া দেখিবার আগেই সে দত্তমহাশয়কে বলিয়া বসিল, "মুরলার সঙ্গে সুপ্রকাশের বিবাহ দিই এই রকম আমার একটা ইচ্ছা আছে।"

দত্তমহাশয়ের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল ধনী অবিনাশকে জামাই করেন, চেষ্টাও সেজন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন এবং এক সময় ভাবিয়াছিলেন বুঝি সফলও প্রায় হইয়াছেন। কিন্তু শেষকালে হঠাৎ যখন তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন অবিনাশ আবার নূতন একটা প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি মনে মনে খুসী হইলেও কথাটা শুনিবামাত্র বিশেষ ব্যস্ততা দেখাইলেন না। বাড়ী আসিয়াই অবিনাশের মনটা নিজের প্রতি বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। তাড়াহুড়া করিয়া সে যে কোণ্ডটা বাধাইয়া বসিল তাহাতে তাহার গর্ব্বিত মাথাটা দত্তমহাশয়ের কাছে

একটু নীচু ত হইলই, সুপ্রকাশের কাছেও হয়ত হইবে।

দত্তসাহেব মুখে কিছু না বলিলেও যে রকম নিমন্ত্রণ আর আদরের ঘটা লাগ'ইলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাবটা যে কতখানি উদাসীনের উপযুক্ত তাহা বুঝিতে অবিনাশের দেরী হইল না। নিজের মানটা বিশেষ খোয়া না যাওয়াতে অবিনাশ খুসী হইল বটে, কিন্তু এর পর যে আর নিতান্ত চুপচাপ করিয়া থাকা যায় না তাহাও বুঝিল। সুপ্রকাশের মতামতের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়াই যে সে কথাটা পাড়িয়া বসিয়াছে ইহাতে সে একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিল। সুপ্রকাশের কানে কথাটা এই ভাবেই উঠিলে সে যে সেটা নিতান্ত সোজাসুজি ভাবে গ্রহণ করিবে না, তাহাও সে বুঝিল। তাই কথাটা একটু ঘুরাইয়া সুপ্রকাশের কাছে উপস্থিত করিতেই তাহার ইচ্ছা ছিল।

যেদিন সুপ্রকাশ অবিনাশের কাছে বেড়াইতে যাইবার টাকা চাহিতে গিয়াছিল সেই দিনই অবিনাশ কথায় কথায় শতদলের কাছে মুরলার কথা পাড়িল। অবিনাশ বলিল, "খোকা আজকাল প্রায়ই বিকেলে বাড়ীতে থায় না, তার এত বন্ধুবান্ধব জুটল কবে থেকে?"

কবে থেকে যে জুটিয়াছে তাহা শতদলের অপেক্ষা অবিনাশের বেশী জানিবার কথা। তবু শতদলকেই বলিতে হইল, "কি জানি; দত্ত-সাহেবের বাড়ী থেকে ত প্রায়ই নেমন্তন্ন আসে দেখি; তাই বোধ হয় যেতে হয়।"

সত্য কথাটাই বলিবার ইচ্ছা অবিনাশের ছিল, কিন্তু ঠিক বলিবার সময় সে না উল্টাইয়া বলিতে পারিল না। মুখখানা গম্ভীর করিয়া সে বলিল, "দত্ত-সাহেবের ওকে বড্ড ভাল লেগেছে দেখ্‌ছি; ওর সঙ্গে ত মুরলার বিয়ে দিতেও চাইছেন। দেখি কি হয়?" নিজের কথাটা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার হীনতা যতই তাহাকে লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল, ততই লজ্জা ঢাকা দিবার চেষ্টায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

সুপ্রকাশের বিবাহের কথায় যোগ দিতে উৎসুক হইয়া শতদল বলিল, "বিয়ে হলে ত বেশ হয়; কিন্তু ছোট মামার সঙ্গে কি ওরকম ঘরের মেয়ে মানাবে?"

অবিনাশের বিরক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল; সে বলিল, "এরকম ওরকম আবার কি? মেয়েমানুষ আবার কি-রকম হবে? তোমাদের মত মুখ্‌খু নয় বলেই কি তার দাম কিছু কমে গেছে।"

শতদল এরকম উত্তরে দমিয়া গিয়া আর কিছু বলিল না। অবিনাশের ইচ্ছা ছিল শতদলকে দিয়া কথাটা সুপ্রকাশের কাছে তোলায়, কিন্তু কথাটা পাড়িয়াই সে এমন পরাজিত বোধ করিতেছিল যে আর বেশী কিছু তাহার বলা হইল না। চটিয়াই সে কথোপকথনের অবসান করিল।

মনটা অবিনাশের ভাল ছিল না। তাহার উপর গরমও বেশ পড়িয়াছিল। তাই সন্ধ্যাবেলায় সে গাড়ী-বারান্দার ছাদে একলাটি চেয়ার পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজেকে নিজে আজ ক'দিন ধরিয়া নানাভাবে অপমান করিয়া করিয়া সে বিশ্বকেই তাহার জন্য দায়ী করিয়া বিশ্বের উপর চটিয়া গিয়াছিল। বাহিরের সম্পর্কে ছোটখাট নানা কাজেই তাহার সে রাগটা আরও বাড়িয়া চলিতেছিল। আজ অনেক দিন পরে একলা জ্যোৎস্নার আলোয় পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনটা একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। রাত যখন সাড়ে নটা বাজিয়া গিয়াছে তখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, বাহিরে যাইবার উপযোগী গোটা কয়েক জিনিষ কিনিয়া সুপ্রকাশ বাড়ী ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই অবিনাশের মনে হইল, দত্ত-সাহেবের কাছে কথাটা যখন সে পাড়িয়াছে, তখন এই বেলা সুপ্রকাশের মনটা জানিবার একটু চেষ্টা তাহার করা উচিত। অবিনাশ ডাকিল, "কে ওখানে, খোকা?"

দেয়ালের প্রকাণ্ড ছায়ার অন্ধকারের আড়াল হইতে সুপ্রকাশ আলোর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি।"

অবিনাশ বলিল, "কালই তুমি যাচ্ছ ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা কর্‌লে কখন?"

সুপ্রকাশ বলিল, "দেখা আমি করিনি। অল্পদিনের জন্যে যাচ্ছি। তাছাড়া দেখা কর্‌তে গেলেই দল জুটে যায়, আমি তা চাই না; একলাই যেতে চাই।"

অবিনাশ বলিল, "বাছা বাছা লোক হলে একলার

চেয়ে সেই ত আরো ভাল হয়। দত্তবাড়ীর এরা খুব ষ্টিমারের ভক্ত। ওদের সঙ্গে ত তোমার খুব ভাব-হয়ে গেছে দেখ্‌ছি। তারা কেউ যেতে চায়নি?"

সুপ্রকাশ যেন আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, তাঁদের আমি কিছু বলিইনি। আমার মত মানুষের সঙ্গের জন্যে তাঁরাই বা ব্যস্ত হবেন কেন? ভাবটাবও আমার কিছু হয় নি। তাঁদের কত উঁচুতে স্থান, আমার মত ভবঘুরের তাঁদের সঙ্গে ভাব করার স্পর্দ্ধাই নেই।"

সুপ্রকাশ যদিও নিজের দীনতাই কথায় প্রকাশ করিল, তবু তাহার ভাবে ভঙ্গীতে দত্তবাড়ীর কবল হইতে মুক্তি পাইবার একটা চেষ্টা অবিনাশের চোখে বেশ ধরা পড়িল। সে আর কিছু বলিল না।

সুপ্রকাশ নীচের ঘরে শতদলের কাছে খাইতে চলিয়া গেল। শতদল অবিনাশের কাছে যে কথার সূত্রটা পাইয়াছিল, সুপ্রকাশের কাছে তাহাই আবার টানিয়া আনিবার চেষ্টায় বলিল, "কি ছোট মামা, এতক্ষণ ছিলে কোথা? তোমার আজকাল অনেক বন্ধুবান্ধব জুটেছে।"

সুপ্রকাশের কথায় ঝাঁঝ সচরাচর কেহ দেখে নাই; আজ কিন্তু সে চটিয়া উঠিয়া বলিল, "জ্বালিয়ে মারলে সবাই মিলে। খেতে-টেতে দেবে, না সবাই কেবল বাজে কথা বকবে?"

শতদল সুপ্রকাশের এমন ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তখনকার মত আর কোনো কথা না বলিয়া অনেকগুলা থালা বাটি সাজাইয়া হাতায় করিয়া করিয়া খাবার গুছাইতে বসিল। সুপ্রকাশ যতক্ষণ ভাত খাইল, ততক্ষণ তাহার অত্যন্ত বিরক্ত এবং গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া শতদলের আর কিছু বলা হইল না। উঠিয়া যাইবার সময় আর-একবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "তোমার সঙ্গে কত কথা ছিল, তা তুমি ত চটেই আগুন হয়ে উঠ্‌লে, আমার আর কিছু বলা হল না।"

সুপ্রকাশ এবার শান্ত স্বরেই বলিল, "রাগ করা উচিত নয় বটে; কিন্তু মানুষের মন ত সব সময় ঠিক থাকে না। ঘুরে এসে তোমার সব কথা শুন্‌ব এখন, আজ বড় ব্যস্ত আছি। কিছু মনে কোরো না।"

শতদল দেখিল সুপ্রকাশের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বিষাদের ছায়ায় তাহার সমস্ত মুখখানা অন্ধকার দেখাইতেছে। ব্যথিত চিত্তে সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিয়া পাইল না, এমন দিনেই বিশেষ করিয়া তাহার কি দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে।

সুপ্রকাশ চলিয়া গেলে অবিনাশ পড়িয়া পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। করুণাকে সুপ্রকাশের চিঠির সাহায্যে সেও যে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, এত দিন হইয়া গেল তবু তাহার কোনো উত্তর না আসাতে অবিনাশের মনটা আরো খারাপ হইয়াছিল। এত শান্ত বিনীত ভাবে সে এবার চিঠি লিখিল তবু তাহার কোনো প্রতিস্বীকার পর্য্যন্ত করুণা করিল না, ইহাতে মানুষের রাগ না হইবে কেন? আর কোনো কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া সুপ্রকাশকেই সে তাহার কারণ ঠিক করিল। কিন্তু সেই দিন হইতে সে ত সর্ব্বদা ডাকের দিকে নজর রাখিয়াছে - সুপ্রকাশের নামেও ত সে চিঠি আসিতে দেখে নাই। অথচ সুপ্রকাশের সে খোলা চিঠিখানা আবার বহু করিয়া দিন কয়েক পরে সে নিজেই ত ডাকে দিয়া আসিয়াছিল।

পরদিন সুপ্রকাশ যখন ষ্টীমারে বেড়াইতে চলিয়া গেল, অবিনাশ কিসের যেন খোঁজে তাহার সমস্ত ঘর-খানি তোলপাড় করিয়া দেখিতে লাগিয়া গেল। একটা টেবিলের একপাশে এক গোছা চিঠি পাথরের একটা মূর্ত্তির তলায় চাপা ছিল, অবিনাশ সেগুলা টানিয়া দেখিল, কিছুই পাইল না। দুই-একখানা পোষ্টকার্ডের গায়ে রাঙা কালির ছাপ দেওয়া, কিন্তু তাহার লেখক সম্পূর্ণ অপরিচিত; চিঠিগুলাই বার বার পড়িয়া অবিনাশ আবিষ্কার করিল, সাজ গঞ্জের বালিকা-বিদ্যালয়ের উপর সুপ্রকাশের অসীম শ্রদ্ধার কথা। অন্য সময় হইলে তাহাতে সে কিছুই ভাবিত না, আজ কিন্তু একটা অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা সে ছাড়িতে পারিল না।

চিঠিগুলা আবার চাপা দিয়া এটা ওটা টানিয়া বাহির করিল একখানা ঘরোয়া রকম ফোটো,—করুণার তিন ভাইবোনের। এ ছবি তাহার নিজের ঘরেও একখানা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়খানা দেখিয়া তাহার চিত্ত অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। বইয়ের তলায় সেখানা গুঁজিয়া দিয়া সে সে-ঘর ছাড়িয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বসিবার ঘরে চেয়ারের সাম্‌নেই সুপ্রকাশের ছেলেবেলার একখানা ছবি টাঙানো ছিল। সেইখানার দিকে খানিক-ক্ষণ তাকাইয়া অবিনাশ কাজে মন দিবার চেষ্টায় খাতাপত্র টানিয়া বসিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীশান্তা দেবী।

চর্‌কার গান

ভোম্‌রায় গান গায় চর্‌কায়, শোন্, ভাই!
খেই নাও, পাঁজ্ দাও, আম্‌রাও গান গাই!
ঘর-বা'র কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চর্‌কায় আপ্‌নার আপ্‌নার!
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপ্‌নায় নির্ভর!
পড়্‌শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

ঝর্‌কায় ঝুর্‌ঝুর্ ফুর্‌ফুর্ বইছে!
চর্‌কার বুল্‌বুল্ কোন্ বোল্ কইছে?—
কোন্ ধন দর্‌কার চর্‌কার আজ গো?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ্ গো!
চর্‌কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ঘি'র দীপ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

আর নয় আইচাই টিস্-টিস্ দিন-ভর,
শোন্ বিশ্‌কর্ম্মার বিস্ময়-মন্তর!
চর্‌কার চর্য্যায় সন্তোষ মন্‌টায়,
রোজ্‌গার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায়!
চর্‌কার ঘর্ঘর বস্তির ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর মঙ্গল,—আপ্‌নায় নির্ভর!
বন্দর—পত্তন—গঞ্জে সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

চর্‌কায় সম্পদ, চর্‌কায় অন্ন,
বাংলার চর্‌কায় ঝল্‌কায় স্বর্ণ!
বাংলার মস্‌লিন্ বোগ্‌দাদ্, রোম, চীন,
কাঞ্চন-তৌলেই কিন্‌তেন একদিন!
চর্‌কার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর সম্পদ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

চর্‌কাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র!
চর্‌কাই দৈন্যের সংহার-অস্ত্র!
চর্‌কাই সম্মান! চর্‌কাই সম্মান!
চর্‌কায় দুঃখীর দুঃখের শেষ ত্রাণ!
চর্‌কার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপ্‌নায় নির্ভর!
প্রত্যাশ ছাড়্‌বার জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

ফুর্‌সুৎ সার্থক কর্‌বার ভেল্‌কি!
উস্‌খুস্ হাত!—বিশ্‌কর্ম্মার খেল্ কি!
তন্দ্রার ছন্দোয় একলার দোক্‌লা!
চর্‌কাই একজাই পয়সার টোক্‌লা!
চর্‌কার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর ঘর!
ঘর ঘর হিক্‌মৎ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
লাখ লাখ চিত্তে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

নিঃস্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,
বঙ্গের স্বস্তিক চর্‌কার গাও জয়!
চর্‌কায় দৌলৎ! চর্‌কায় ইজ্জৎ!
চর্‌কায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জৎ!
চর্‌কার ঘর্ঘর গৌড়ের ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর গৌরব,—আপ্‌নায় নির্ভর!
গঙ্গায় মেঘ্‌নায় তিস্তায় সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

চন্দ্রের চর্‌কায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি!
সূর্য্যের কাট্‌নায় কাঞ্চন-বৃষ্টি!
ইন্দ্রের চর্‌কায় মেঘ জল থান থান!
হিন্দের চর্‌কায় ইজ্জৎ সম্মান!
ঘর-ঘর দৌলৎ! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপ্‌নায় নির্ভর!
গুজ্‌রাট-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া,—
দাঁড়া আপ্‌নার পায়ে দাঁড়া!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্যঙ্গ-চিত্র

সাবধানের মার নেই!

ফ্রান্স-সুন্দরী—তোমার সঙ্গে ভাব করতে ত চাই বন্ধু, কিন্তু ভয় হয় তোমার লড়াইয়ের বাতিককে।

জার্মানী-যোদ্ধা—সে বাতিক কি আর আছে মনে হয়?—এক হাত আর এক পা ত সবে আস্ত আছে, তা নিয়ে কি লড়াই চলে? ভালো হতেও দেরী আছে, ভালো হলেও লড়াই ছাড়া ঢের আরও কাজে মন দিতে হবে।

—নেবেল্‌স্‌পালটের হইতে।

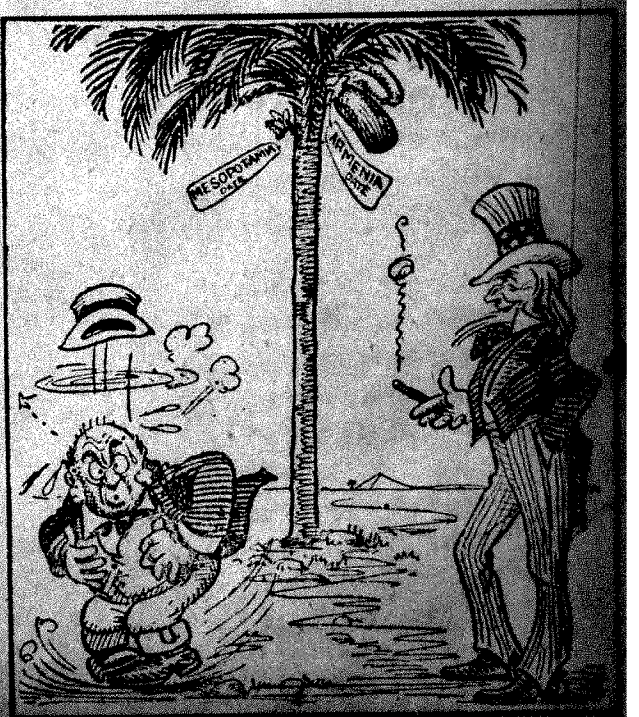

খেজুরের খেজালৎ!

আমেরিকা—তারার খবর কি?

ইংলণ্ড—পরের তার লাঘব করতে গিয়ে কি ঝক্‌মারি! গাছটা ফলের ভার বইতে পারছিল না, তাই কিছু পেটে রেখে দিয়েছিলাম।

আমেরিকা—ভাগ্যিস্ আমি লোভ করিনি? নইলে আমিও পেট কামড়ে মারা পড়তাম।

লণ্ডনের ডেলি এক্‌স্‌প্রেস হইতে।

ইংলণ্ড পরের ধনে পোদ্দারী করিবার লোভ করিয়া মেসোপটেমিয়া আরমেনিয়া প্রভৃতি দেশের অভিভাবক সাজিয়া বসিয়াছিল। এখন সে দেশের লোকেরা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবার ভয়ে ইংলণ্ডকে তাড়া দিতেছে। ইংলণ্ডের তাই না যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—ম্যাণ্ডেট্ অর্থাৎ অভিভাবকত্ব রাখিলে যন্ত্রি যায়, না রাখিলে মান যায়—মহা মুস্কিল।

আগড় আল্‌গা।

যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিরা ধুয়া তুলিয়াছিল—ছোট ছোট জাতিদের স্ব-তন্ত্রতা দেওয়া হইবে। এই প্রতিজ্ঞার সুযোগে গ্রীস আপনার রাজ্য-ভ্রষ্ট বিতাড়িত রাজাকে আবার ফিরাইয়া আনিল; মিত্রশক্তিদের চক্ষুশূল রাজা কনষ্টাণ্টাইন আবার গ্রীসে যাইতেছেন দেখিয়া তাদের ভয় ও বিস্ময়ের অন্ত নাই—অথচ কিছু বলিবারও জো নাই—নিজের জালে নিজে বন্ধ।

—শিকাগো ডেলীনিউস।

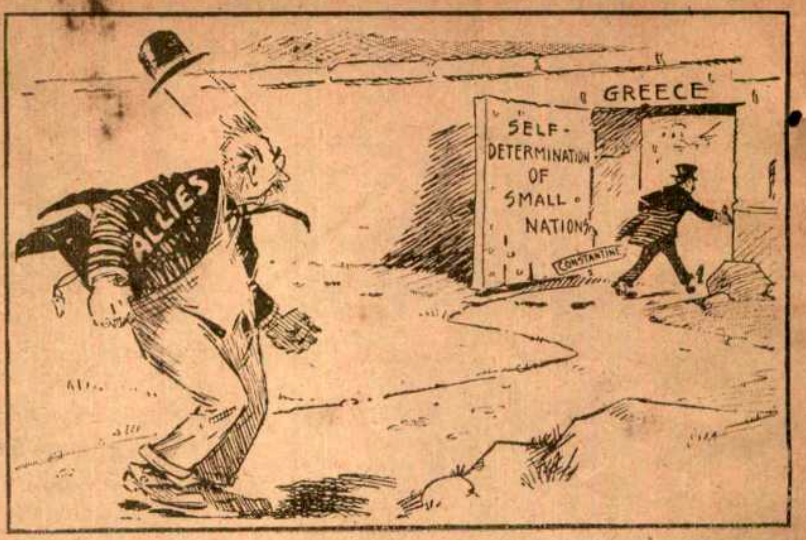

ভূত নামানো!

শ্রমিকের উৎপাদন আত্মসাৎ করিয়া মহাজন দেহে ও মোটে মোটা হইয়া আবর্জ্জনার ঝুড়িতে স্বাধীনতা গণতন্ত্র আর ন্যায়পরতা ফেলিয়া দিয়াছে—কিন্তু এর ফলে বলশেভিজ্‌ম্ ভূত তার চোখের সাম্‌নে!

বিয়ের জন্যে ঝুলোঝুলি !

বুড়ো আমেরিকা য়ুরোপকে যুদ্ধ-বিপদে রক্ষা করিয়া সরিয়া পড়িতে যাইতেছিল, য়ুরোপ তার কাপড় ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে—লীগের পাঁটছড়ায় তাকে সে বাঁধিতে চায়।

—শিকাগো ট্রাইবিউন হইতে।

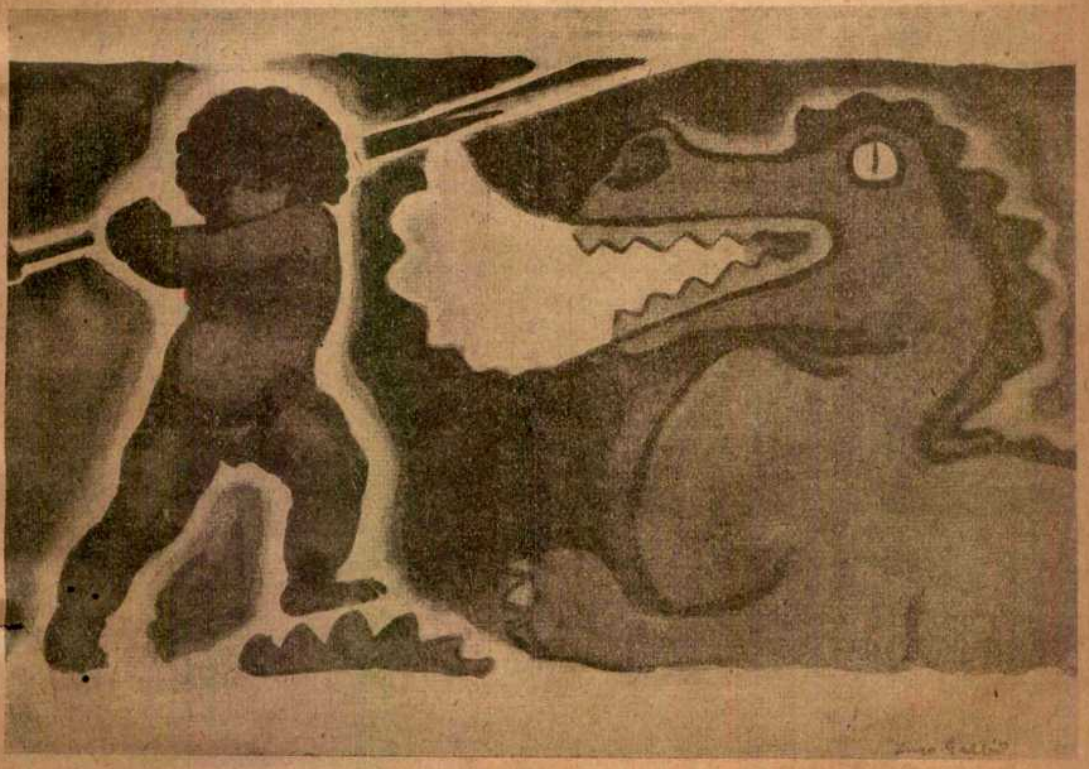

যৌবন আর জুজুর লড়াই।

—সিগারেটার হইতে।

কন্‌সার্ট পার্টি

জেনেভা শহরে "লীগ অফ্ নেসন্‌স্" বৈঠক করিয়াছিল। তাতে দেখা গেল—সব শেয়ালের এক রা আর চোরে চোরে মাসতুত ভাই—সব জাতিই পরের খাইয়া ভুঁড়ি বাগাইয়াছে এবং সকলের চেষ্টা শ্রমিকদের উপর ধনিকদের আধিপত্য কায়েমী রাখা।

—লিবারেটার হইতে গৃহীত।

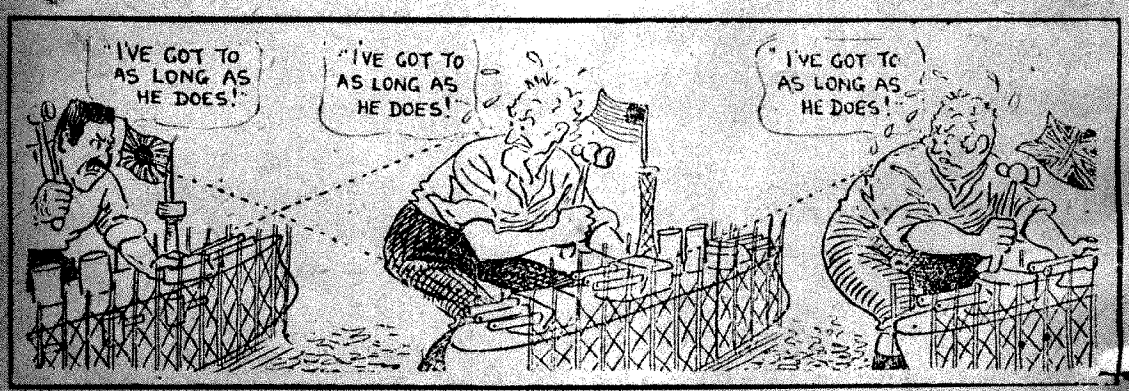

পরস্পরের মুখাপেক্ষা।

প্রত্যেক বড় জাতিই অন্যকে হাতহাতিয়ার কমাইতে ও ছাড়িতে বলিতেছে—আর বলিতেছে—তোমরা ছাড়িলেই আমরা ছাড়ি! আগে কে এই দুঃসাহস করিবে, তার জন্যই মুখ চাওয়া-চাওয়ি চলিতেছে—ফলে হাতিয়ারের কারখানায় হাতুড়ি চলার বিরাম নাই এবং একে অন্যের শক্তিবৃদ্ধি রাজ্যজয় প্রভৃতির ছুতায় নিজের নিজের শক্তিবৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তার করিয়াই চলিয়াছে।—"অন্ত কোথায়? অন্ত কোথায়?—অন্ত এর নাহি নাহি!"

—আমেরিকায় ট্রাইবিউন হইতে।

কুড়ি সালের কংগ্রেস্—কলিকাতায় ও নাগপুরে

(ছবিগুলি শ্রীযুক্ত মুকান্দিলাল, বি-এ (অক্‌স্‌ফর্ড), ব্যারিষ্টার মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত এবং তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত ও মুদ্রিত।)

নাগপুর কংগ্রেসে বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন-গৃহের বাহিরে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচার্য্য।

কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি লালা লাজপৎ রায়; সঙ্গে শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল ও একজন খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক—কলিকাতা কংগ্রেসের প্রবেশ-পথে।

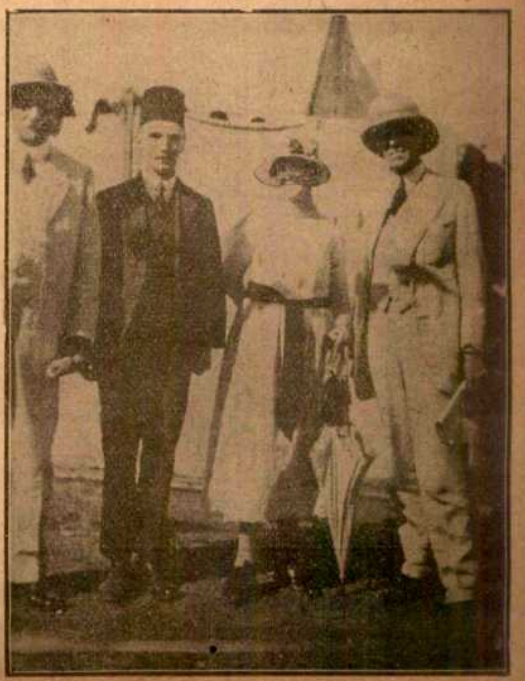

বাম হইতে ডানদিকে—
মিঃ এস আর বোমানজী; বম্বে ক্রনিকেলের সম্পাদক মিঃ পিক্‌থল; এবং কর্ণেল ওয়েজউড নাগপুর কংগ্রেস-মণ্ডপের কাছে।

নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচার্য্য বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনের অবকাশে কর্ণেল ওয়েজ-উডকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন।

নাগপুর কংগ্রেসে হিন্দু পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার।

নাগপুর কংগ্রেসে—
বাঁ হইতে ডাইনে—
কর্ণেল ওয়েজউড; মিসেস্ ওয়েজউড; শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার; ও শ্রীযুক্ত ন চ কেল্‌কার।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দিলাল সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচার্য্যের ছবি লইতে চাহিলে তিনি হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, বিনামূল্যে কিছুতেই আমি আপনাকে আমার ছবি লইতে দিব না।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার—
কলিকাতার কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশের পথে।

স্যর আশুতোষ চৌধুরী কলিকাতা কংগ্রেসে।

শ্রীমতী সরলা দেবীচৌধুরাণী কলিকাতা কংগ্রেসে।

কলিকাতা কংগ্রেসে মাদ্রাজী স্বেচ্ছাসেবিকা।

কলিকাতা কংগ্রেসে দুইজন বাঙালী মহিলা-প্রতিনিধি।

মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি এবং একজন কৃষাণ প্রতিনিধি—নাগপুরে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কক্ষ হইতে প্রত্যাগমন।

শ্রীযুক্ত জিন্না—নাগপুর কংগ্রেসে মূলমত-পরিবর্ত্তন বিষয়ে বক্তৃতার সময়ে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল সম্মিলনী

বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কোম্পানীর অর্থ সাহায্যে মধ্যে মধ্যে এক-একটি সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এবার গত ১লা ফাল্গুন সরস্বতী পূজার দিন মাণিকতলার কারখানায় তাঁহাদের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

অভ্যাগত।—প্রায় ৫০০ জন অভ্যাগত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কোম্পানীর পরিচিত ব্যবসায়ীগণ, অনেক সুবিখ্যাত সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

যাতায়াত।—সহরের আফিস হইতে মাণিকতলার কারখানা পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য কোম্পানীই গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সজ্জা।—প্রবেশদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কারখানার ভিতরের প্রধান রাস্তাগুলি পাতা এবং ফুলে সুসজ্জিত ছিল। রাস্তার উপর নানারঙের বিচিত্র আল্‌পনা। এই আল্‌পনা পটু পটুয়ার হাতের আঁকা, পঞ্চগুঁড়ির ছবি—ফুল পশু পাখী মাছ শঙ্খ; সুন্দর সুঠাম একখানি পায়ের আবির-মাড়ানো লাল ছাপের আল্‌পনা পথিকদের আগম নির্গমের পথ নির্দ্দেশ করিতেছিল; পথের শেষ সূচিত হইয়াছিল একটি রামধনুর সাত রঙের ডোরায় ডোরায়!

প্রদর্শনী।—একটি সুবৃহৎ হলে কয়েক প্রকার দেশী দ্রব্যের সংগ্রহ ছিল। এই প্রদর্শনী যদিও ক্ষুদ্র এবং অল্পকাল-স্থায়ী, তথাপি যে বিশিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর জন্য ইহার আয়োজন হইয়াছিল এবং তাঁহারা যেরূপ আগ্রহের সহিত ইহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয় এই অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় নাই। প্রদর্শনীতে দেশী শিল্পের উৎকর্ষ বিশেষ ভাবে মন মুগ্ধ করিয়াছিল।

প্রদর্শকগণের নাম।—

(১) বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কন্‌ডাইমেণ্ট ওয়ার্কস্, লিমিটেড (আচার, চাট্‌নী ইত্যাদি)।

(২) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড (ঔষধ, গন্ধ ইত্যাদি)।

(৩) বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস, লিমিটেড (কাঁচের চিম্‌নী, ফুলদানী ইত্যাদি)।

(৪) বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী (ভ্যাক্‌সিন্‌স্, সেরাম্‌স্ ইত্যাদি)।

(৫) বেঙ্গল মিসেল্যানি, লিমিটেড (লিখিবার কালি, জুতার পালিশ ইত্যাদি)।

(৬) ব্রিটানিয়া বিস্‌কিট্ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী লিমিটেড (বিস্কুট)।

(৭) ক্যাল্‌কাটা কেমিক্যাল্‌স্ কোম্পানী লিমিটেড (নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য)।

(৮) ক্যাল্‌কাটা গ্লাস এণ্ড সিলিকেট ওয়ার্কস্ লিমিটেড (কাঁচের বিবিধ দ্রব্য)।

(৯) ক্যাল্‌কাটা পটারি ওয়ার্কস্, লিমিটেড (চীনে মাটীর বাসন, পুতুল, ইত্যাদি)।

(১০) ক্যাল্‌কাটা সোপ ওয়ার্কস্, লিমিটেড (সাবান)।

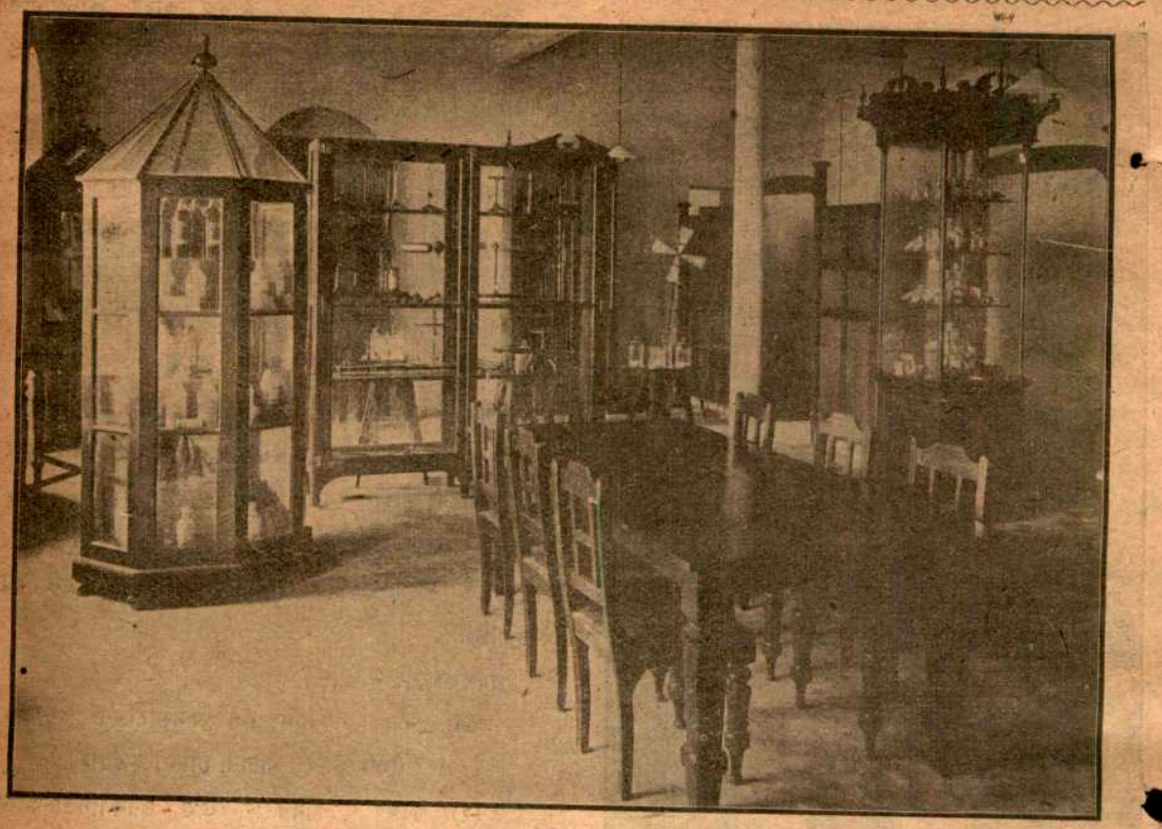

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড্। প্রদর্শনী-গৃহ।

(১১) ক্যাল্‌কাটা রিসার্চ ট্যানারি (কষকরা চাম্‌ড়া, ইত্যাদি)।

(১২) কলার প্রিন্টিং এণ্ড হলো ওয়্যাস, লিমিটেড (টিনের কৌটায় রঙের লেখা ছবি ছাপা)।

(১৩) দাসগুপ্ত এণ্ড সন্‌স্ (ছাপিবার কালি)।

(১৪) দত্ত কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড।

(১৫) দত্ত মেশিন এণ্ড টুল ওয়ার্কস্ (নানাবিধ যন্ত্রপাতি)।

(১৬) এফ এন গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী (পেন্‌সিল, কলম প্রভৃতি)।

(১৭) কে সি বোস এণ্ড কোম্পানী (বিস্কুট)।

(১৮) খাঁ এণ্ড কোম্পানী (কাট্‌লারি অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র)।

(১৯) লিষ্টার এন্টিসেপ্‌টিক্ এণ্ড ড্রেসিং কোম্পানী লিমিটেড (ডাক্তারী চিকিৎসায় ক্ষত বাঁধিবার তোড়জোড়)।

(২০) ন্যাশন্যাল সোপ কোম্পানী (সাবান)।

(২১) ন্যাশন্যাল ট্যানারি কোম্পানী লিমিটেড (চাম্‌ড়ার জিনিস)।

(২২) ওরিয়েণ্টাল সোপ কোম্পানী লিমিটেড (সাবান)।

(২৩) উত্তরপাড়া পটারি ওয়ার্কস্ (মাটির বাসন)।

জলযোগ।—কোম্পানীর প্রশস্ত লাইব্রেরী-কক্ষে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ কক্ষ নানাপ্রকার ফুল পাতা আম্রমুকুল নবজাত পলাশস্তবক ও খর্জ্জুরগুচ্ছের দ্বারা সজ্জিত থাকায় কক্ষের বাতাস স্নিগ্ধ ও সুরভিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রণকর্ত্তাদের আতিথেয়তায় ও যত্নে নিমন্ত্রিতরা আপ্যায়িত হইয়া ফিরিয়াছিলেন।

মাঠে।—কারখানার ভিতরে একটি বিস্তৃত মাঠে বসিবার এবং ম্যাজিক প্রভৃতি আমোদের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যে ফুলগাছের টবে বেষ্টিত মঞ্চের উপর গোলাপজলের উৎস হইতে অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা গোলাপজল বাষ্পাকারে বিকীর্ণ হইতেছিল। সন্ধ্যার পরে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

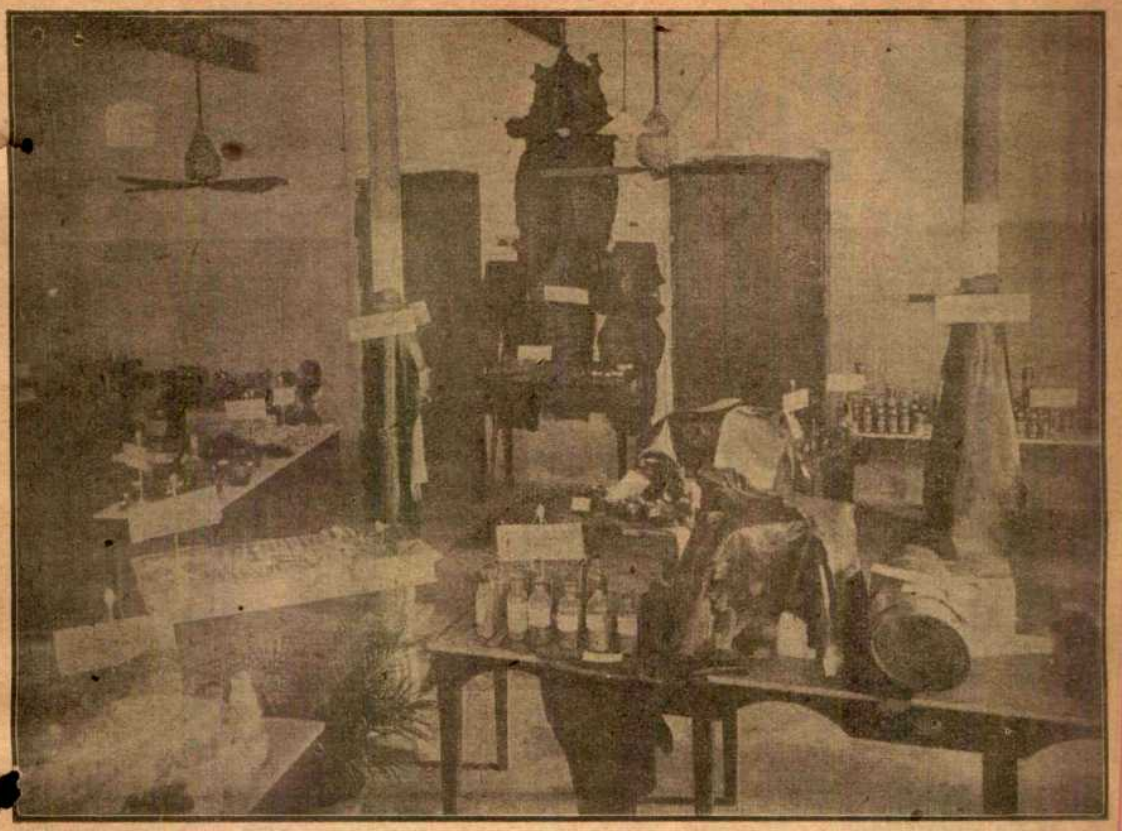

প্রদর্শনীর সাধারণ দৃশ্য।

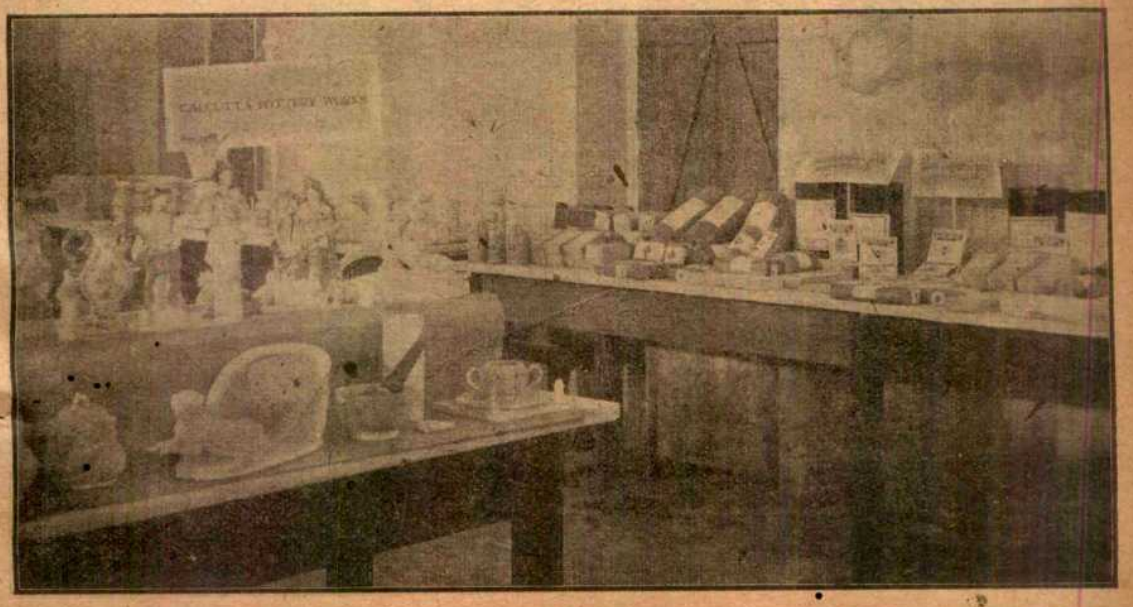

ক্যাল্‌কাটা পটারি ওয়ার্কস্, লিমিটেড্।　　লিষ্টার এন্টিসেপ্‌টিক এণ্ড ড্রেসিং কোম্পানী লিমিটেড্।

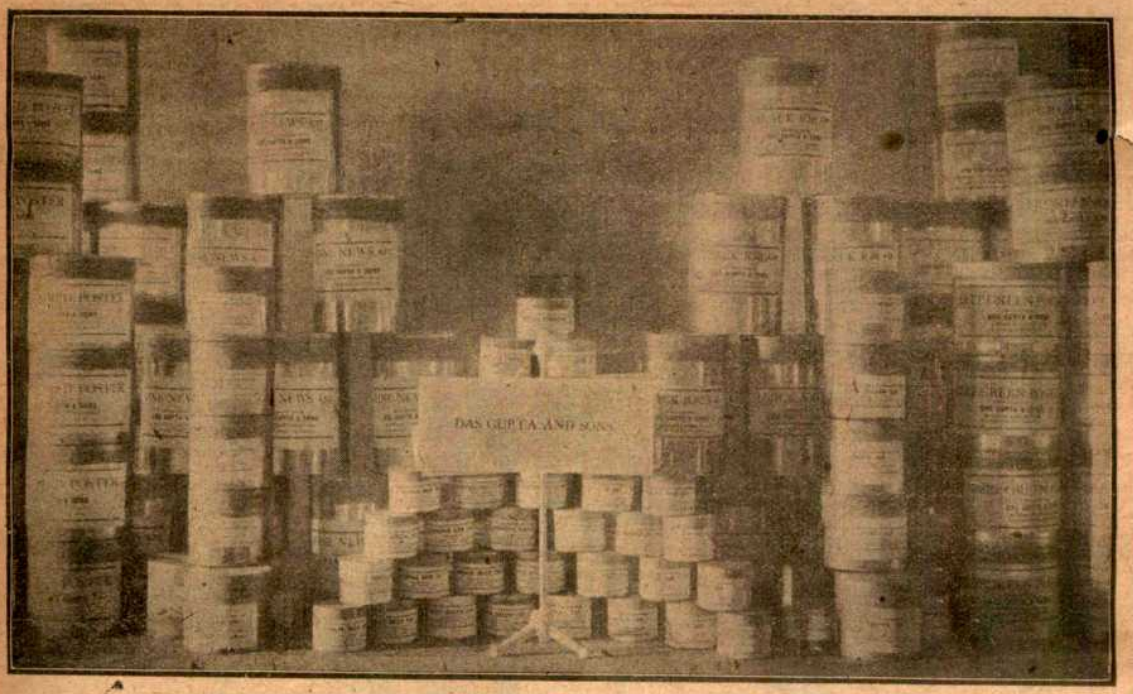

দাসগুপ্ত এণ্ড সন্‌স্ (ছাপিবার কালি)।

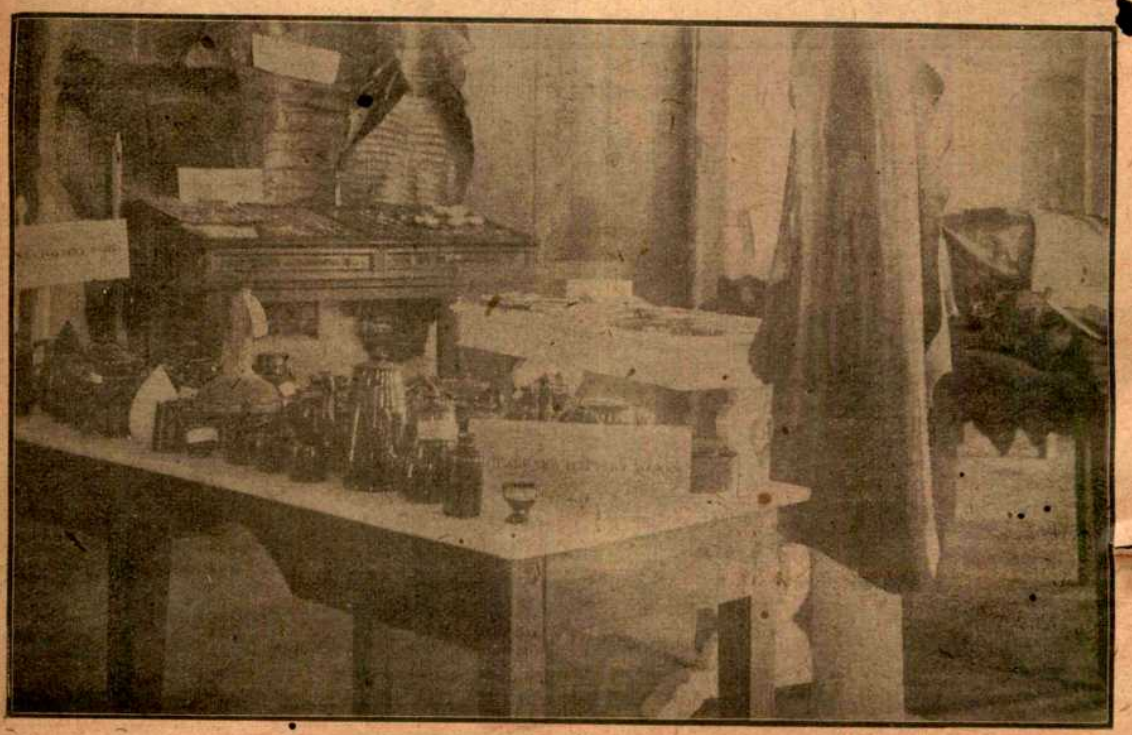

বাঁ হইতে ডান দিকে—উত্তরপাড়া পটারি ওয়ার্কস্ ; খাঁ এণ্ড কোম্পানী (কাট্‌লারি) ; এফ এন গুপ্ত (পেন্সিল, নিব ইত্যাদি)।

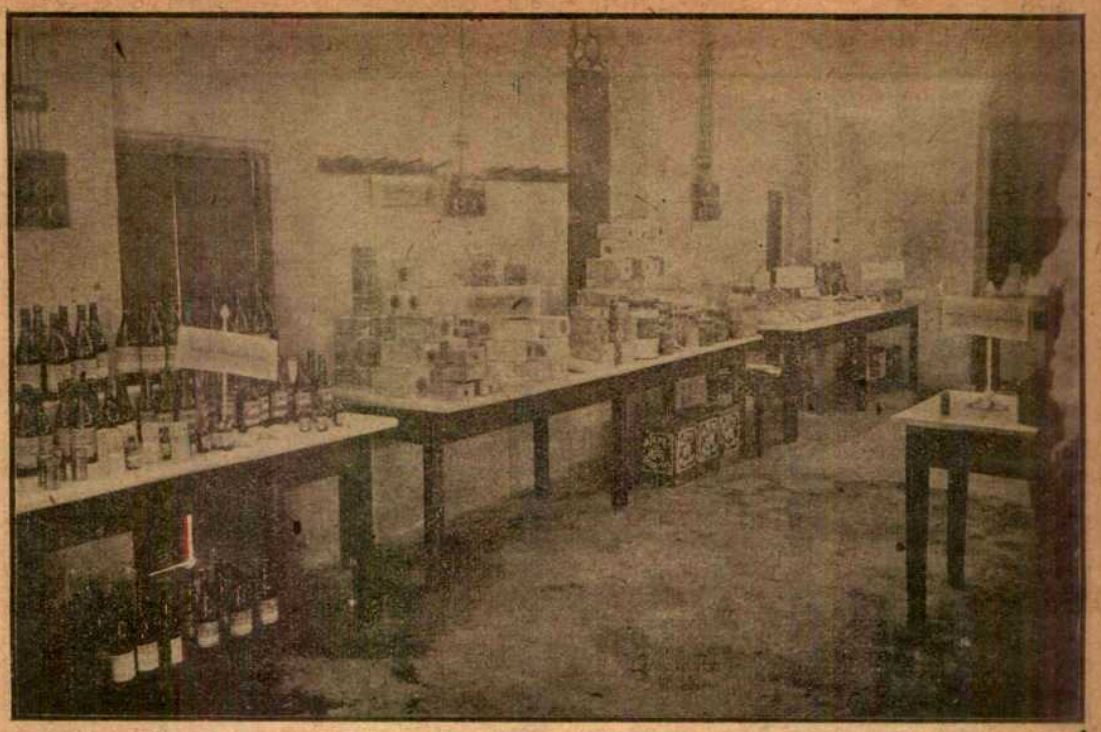

বাঁ দিক হইতে ডান দিকে—বেঙ্গল মিসেল্যানি, লিমিটেড্ (লিখিবার কালি, জুতার পালিশ ইত্যাদি) ;
ব্রিটানিয়া বিস্‌কিট্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, লিমিটেড্ ; কে সি বোস এণ্ড কোম্পানী (বিস্কুট) ; ন্যাশন্যাল সোপ কোম্পানী ;
ওরিয়েণ্টাল সোপ কোম্পানী লিমিটেড্ ; দত্ত কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্।

ন্যাশন্যাল ট্যানারি কোম্পানী লিমিটেড্।

বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কনডাইমেণ্ট ওয়ার্কস্, লিমিটেড্।

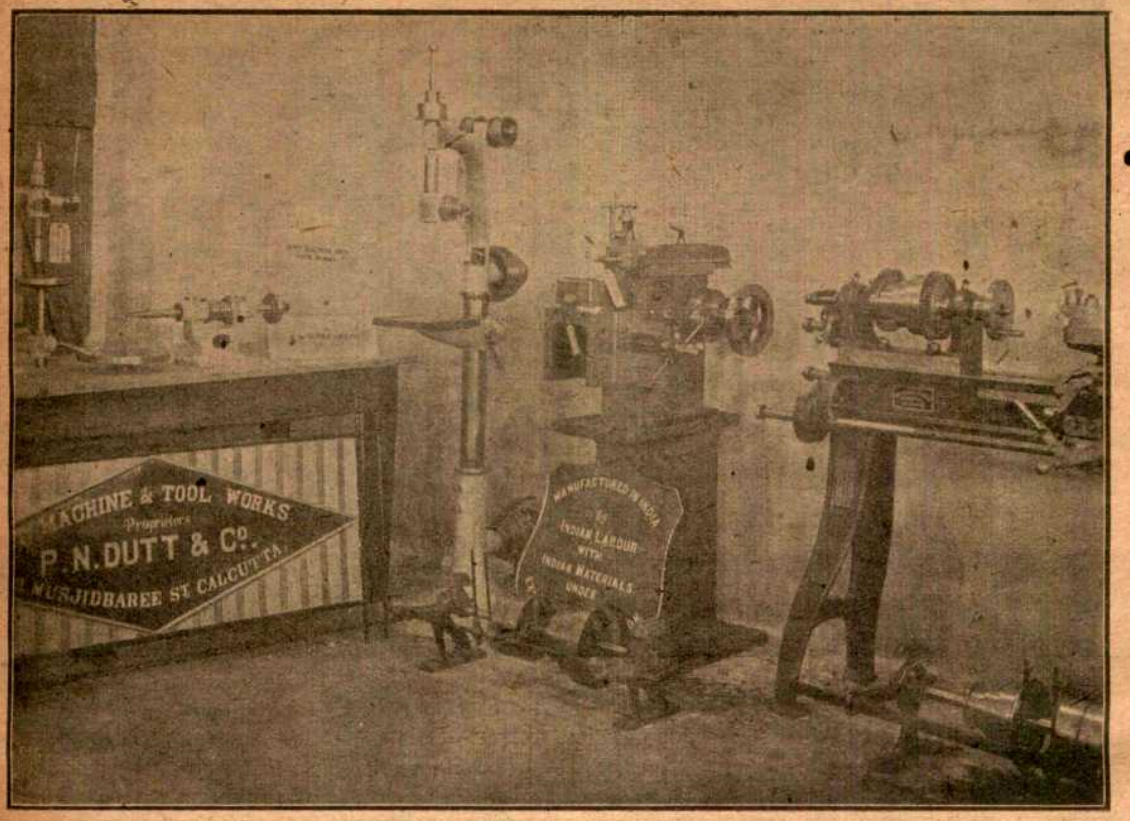

দত্ত মেশিন এণ্ড টুল ওয়ার্কস্।

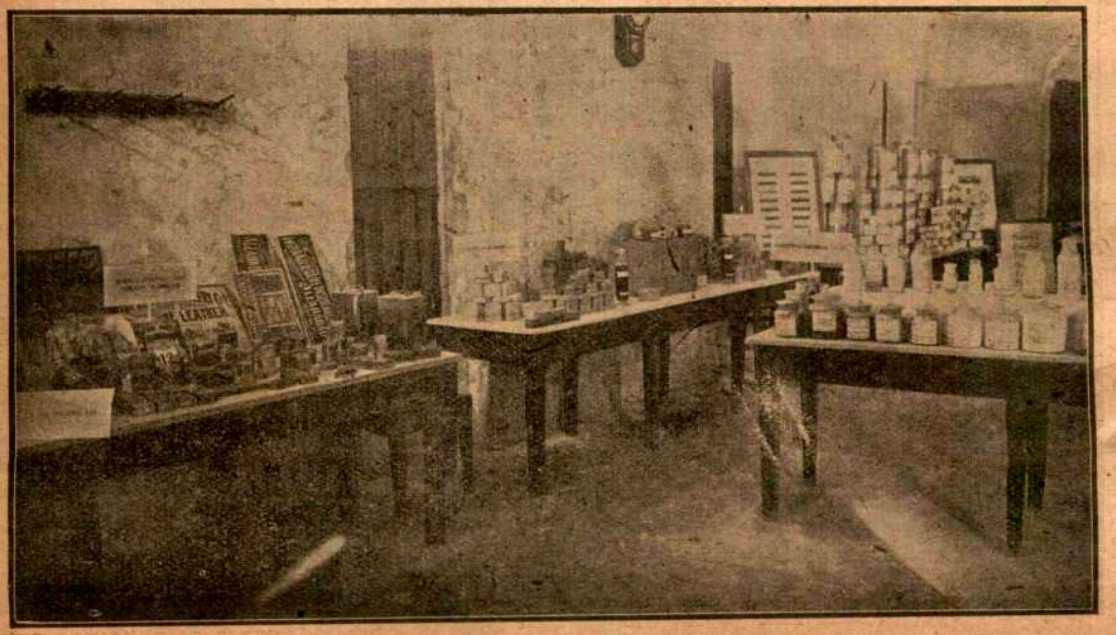

বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস্, লিমিটেড্; কলার প্রিন্টিং এণ্ড হলো ওয়ার্কস্ লিমিটেড্; ক্যাল্‌কাটা সোপ ওয়ার্কস্, লিমিটেড্।

পরদিন মধ্যাহ্নে ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে কারখানার সহস্রাধিক কর্ম্মীগণের সাদাসিধা পর্য্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উৎসবটি বড়ই উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। আমরা আশা করি এই উৎসবটি বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হইবে এবং প্রদর্শনীতে মহিলাদেরও গমনের ব্যবস্থা ও সুবিধা করা হইবে। কেননা দেশজাত জিনিস তাঁদেরও দর্শনীয়।

এই সঙ্গে একটা কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিন দিন আমরা দেখিতেছি যে কায়িক শ্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী ক্রমে ক্রমে হটিয়া যাইতেছে। বাংলা দেশের মুটে-মজুরের কাজ লইয়াছে হিন্দুস্থানীরা, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্র দখল করিয়াছে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটি, কাবুলী, দিল্লীওয়ালা, পার্শী প্রভৃতি যত-সব ভিন্ন-প্রদেশী ও বিদেশী। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা এবং ভাবিবার কথা। কিন্তু বাঙালীর গৌরবের কথাও আছে। তাহা এই যে, বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং সুকুমার শিল্পকলার ক্ষেত্রে—মোটের উপর চিন্তার ক্ষেত্রে—বাঙালী এখনও ভারতবাসীদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যে যে শিল্পে ও কারবারে বুদ্ধি ও বিদ্যার দরকার সেই-সব ক্ষেত্রে এখনও বাঙালীর প্রাধান্য এই ক্ষুদ্র শিল্প-প্রদর্শনীতেও চোখে পড়িয়াছিল।

আমাদিগকে ছবিগুলি ছাপিতে দেওয়ার জন্য আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(৮৭)

পাখা গায়ে ঠেকিলে তাহা মাটীতে ঠেকাইবার প্রথা আছে। ইহার কারণ কি?

শ্রীপ্রভুরাম চট্টোপাধ্যায়।

(৮৮)

নাভিতে তৈল দিলে ঠোঁট ফাটা ভাল হয়, কিন্তু পা বা গাল ফাটা ভাল হয় না কেন? ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ ঘোষ।

(৮৯)

ঢাকাই মসলিন্ দেশী সুতায় প্রস্তুত হইত কি না—এবং কোন্ শ্রেণীর লোকে কিরূপ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সুতা উৎপন্ন করিত?

শ্রীবসন্তকুমার গোস্বামী।

(৯০)

মহাভারতে শকুনির পিতৃ-অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত অক্ষ-ক্রীড়ার কথা বর্ণিত আছে; তৎপূর্ব্বে কি অক্ষ ক্রীড়ার প্রচলন ছিল?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা।

(৯১)

"গল্প" শব্দ কোন ভাষার? ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল?

শ্রীরামাজ্ঞা দ্বিবেদী।

(৯২)

সর্প দংশন ও বালরোগাদি হইলে ওঝারা আরোগ্যার্থে মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকে, তাহার উপকারিতা আছে কি না? কতদিন হইতে ও কাহার দ্বারা ইহা প্রচলিত হইতেছে?

শ্রীগৌরহরি সেন।

(৯৩)

আমাদের এখানে দেখি যে, সাপে কাটায় প্রতিবৎসর অনেক লোক মারা যায়। সাপে কাটার ভাল ঔষধ ও ভাল চিকিৎসা-পুস্তক দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাখিরা।

(৯৪)

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। শুনা যায় যে, বৌদ্ধভিক্ষু তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ লামা শ্রীদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ঐ গ্রামেই বসবাস করিতেন এবং তিব্বতের কোন দেবীর নামানুসারে ঐ গ্রামের নামানুকরণ হইয়াছে; ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু?

শ্রীসুবোধচন্দ্র গুহ।

(৯৫)

সংস্কৃত কখনো কথ্য ভাষা ছিল কি না?

শ্রীসরোজকুমার সরকার।

(৯৬)

আহারকালে ব্রাহ্মণগণ যে "পঞ্চদেবতাকে" 'অন্ন' জল দেন তাহার সার্থকতা কি? না ইহা শুধু একটি কুসংস্কার? ইহা কল্যাণকর হইলে, হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণেতর জাতি-সমুদায় ইহা হইতে বঞ্চিত কেন? অর্থাৎ শুধু ব্রাহ্মণগণই উক্ত অনুষ্ঠানাবলম্বী কেন?

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ।

(৯৭)

হিন্দু বিবাহের সময় বরণ-ডালা ব্যবহার করে। ইহা ব্যবহার করার অর্থ কি? উহা কি কি দ্রব্যে প্রস্তুত হয়? প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কি ইহার কোন উদাহরণ আছে?

(৯৮)

মল মূত্র ত্যাগের সময় দ্বিজদের কানে পৈতা দিতে হয়। তাহার কারণ কি?

খাইতে বসিয়া কথা বলিতে নাই কেন?

শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৯৯)

ছারপোকার উৎপাত প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়; উহা নাশের কোন সহজ ঔষধ বা প্রক্রিয়া আছে কি?

শ্রীমহেন্দ্রমোহন দাস।

(১০০)

শালগ্রাম ও সরস্বতী প্রভৃতি পূজায় ছাগ বলিদানের প্রথা নাই কেন? শাস্ত্রের অথবা ঋষিদের এই সম্বন্ধে মত কি?

শ্রীনীরদরঞ্জন চৌধুরী।

(১০১)

শেষো ধিমগ্নিরিত্যুক্ত মহাস্তো গুরবঃ স্থিরাঃ।
ইমাং লক্ষিত-মর্য্যাদাং চলন্তীং বিভৃথ ক্ষিতিম্॥

—এই শ্লোকটি শ্রীভোজদেব কৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে (চতুর্থ অধ্যায়ে) দেখিতে পাওয়া যায়। উহার শেষ চরণস্থ চলন্তীং ক্ষিতিম্ এই পদ-দ্বয়ের অনুবাদ 'গমন-শীল পৃথিবী' (moving earth) করিলে অর্থ সু-সঙ্গত হয় কি? যদি হয়, তা' হইলে ইহা দ্বারা পৃথিবীর গতিশীলত্ব প্রমাণিত হয় কি না? হইলে, তার সমর্থন-যোগ্য প্রমাণ ভারতীয় জ্যোতিষ স্মৃতি পুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন দত্ত।

(১০২)

ভারতবর্ষে মাদক দ্রব্যের আয় কত? Excise department-এর জন্য গভর্ণমেণ্ট বৎসরে কত ব্যয় করেন? আয়, ব্যয় বিগত ৫ বৎসরের মধ্যে বাড়িয়াছে না কমিয়াছে?

শ্রীবিমলরঞ্জন দে।

(১০৩)

"হরিনাম কর—প্রেম ত্রিসীমানায় আসিবে না" এই ত্রিসীমানা প্রয়োগের তাৎপর্য্য কি? চতুঃসীমা হইল না কেন?

"অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার।" সূচীভেদ্য অন্ধকার কি?

"দুনয়নে দশধারা বহে।" দশধারা ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি?

শ্রীআনন্দচন্দ্র শীল।

(১০৪)

বর্ষাকালে আমাদের দেশে জলাভূমিতে বা 'হাওড়ে' যে "ভূতের আলো" দেখা যায় তাহা মার্শ্‌গ্যাসের প্রজ্বলন বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা ঠিক হইলে ঐ গ্যাস জলের উপর উঠিতেই কিরূপে উহাতে আগুন ধরে? অনেক সময় ঐ আলো জলের উপর দিয়া যেন ভাসিয়া অতি বেগে ছুটিয়া চলে। ইহারই বা কারণ কি?

শ্রীশশীমোহন দাস চৌধুরী।

(১০৫)

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "হাজারি গুড়ের" প্রস্তুত-প্রণালী কি?

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

(১০৬)

পুত্রবতী মাতা আহারে বসিলে সে সময় কেহ বাঁশী বাজাইলে তিনি আহার করেন না। ইহার কারণ কি? আহারে বসিয়া হাঁচি দিলে উঠিয়া বসিতে হয় কেন? আহারের সময় কোন মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদিতে শুনিলে ভোজনপাত্রের নীচে জল ঢালিয়া লইতে হয় কেন?

শ্রীশিশিরকুমার রাহা।

(১০৭)

এক শ্রেণীর কাল পিপীলিকা আছে, চলিত কথায় ইহাদিগকে জিঁয়ে (ভিঁয়ে) বলা হয়। ইহাদের শ্রেণীতে দৈবাৎ পা পড়িলে দংশনের জ্বালায় অস্থির হইতে হয়, কিন্তু জিহ্বাটিকে দন্তের দ্বারা ঈষৎ চাপিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সারিবদ্ধ জিঁয়ের উপর পা দিলে ইহারা দংশন করে না। কেন?

শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

(১০৮)

চড়ক সংক্রান্তির ইতিহাস কি? চড়ক সংক্রান্তিকে চলিত কথায় "শিবের গাজন" বলে কেন?

শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম।

(১০৯)

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার উদর চিরিয়া দাহ করা হয় কেন? এই সভ্য জগতে এই প্রথাটা বড়ই অন্যায় বোধ হয়। পৃথিবীর আর কোন জাতি কি এরূপ করে?

শ্রীগঙ্গাধর দে।

(১১০)

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রামে (গোলাঘাট হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী) একটি পুরাতন মন্দির আছে; সেই মন্দিরের ইতিবৃত্ত এবং কবে কোন্ সালে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে চাহি।

শ্রীমৃচ্ছকটিক।

(১১১)

শুনা যায় নুরজাহানের সমাধিমন্দিরে পারসী ভাষায় কয়েকটি ছত্র লেখা আছে। এই ছত্রগুলি কি ও তাহাদের অর্থ কি?

মহিদীন আহমদ্ সিল্‌হেটী।
ও
শ্রেহট্ট শ্রীঅমৃত পালিত।

(১১২)

১। সপ্তাহ বা সাত দিনের সমষ্টি দ্বারা দিন গণনা প্রথা প্রথম কোন্ দেশে ও কবে প্রচলিত হইয়াছে?

বাইবেলে (Genesis, ii. 2) আছে যে ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সৃজন করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন। ইহুদীদের এই কল্পনাই কি প্রাচীনতম? যদি হয় তবে ভারতের আর্য্যেরা কখন গ্রহণ করিয়াছে?

গ্রহগণের নামানুসারে দিনের নাম কখন্ কোন্ দেশে প্রচলিত হইয়াছে? পার্সী সাহিত্যে পাই যে ইরাণের পৌরাণিক রাজা মনুচেহর সপ্তাহের দিনের নামকরণ করিয়াছিলেন শুম্বা, একশুম্বা, সেশুম্বা, চহারশুম্বা, পঞ্চশুম্বা, শিশ্‌শুম্বা। ইহার বহুকাল পরে রাজা বহরাম গোর সাতটি খিলান দেওয়া গুম্বজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সাতটি গুম্বজের সাতটি গ্রহের নামে নামকরণ করেন। যে গুম্বজ যে গ্রহের তাহার রংও সেই গ্রহের মত করিয়াছিলেন। এক-এক গুম্বজে সপ্তাহের এক-একদিন বসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। ক্রমে, যে দিন যে গ্রহের নামের গুম্বজে বসিয়া রাজকার্য্য হইত সে দিন সেই গ্রহের দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ইরাণে ইসলাম প্রচারিত হইবার পর শিশ্‌শুম্বার স্থানে অরবী শব্দ জুম্‌আ (শুক্রবার) প্রচলিত হইল।

ভারতে কি এই প্রথার অনুকরণ? যদি হয় তবে দেখিতে হইবে ইরাণে সপ্তাহ আরম্ভ শনিবারে, তাহার পর রবি। কিন্তু ভারতের সপ্তাহ আরম্ভ রবিবার, পরে চন্দ্রবার। গ্রহগণ মধ্যে রবি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, বাহ্যদৃশ্যে পরে চন্দ্র, অতএব সপ্তাহ আরম্ভ রবিবারে হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

যে-সকল দেশে গ্রহনাম প্রচলিত, সকল দেশে একই ক্রম। ইহাতে বোধ হয় কোনও একদেশ হইতে নামগুলি পৃথিবীময় ছড়াইয়াছে। সে আদি দেশ কোন্‌টি? ও ঐ ক্রমের কারণ কি? সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা

বড়, চন্দ্র তাহার পর; কিন্তু তৃতীয় স্থানে মঙ্গল, পরে বুধ ইত্যাদি হইল কেন? পূর্ব্বে কি গ্রহদের দূরত্ব এই ক্রমেই জানা ছিল?

আরব দেশে ইসলামের পূর্ব্বে সপ্তাহ আরম্ভ হইত (ও এখনও হয়) শনিবার বা হফ্‌তা। পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন বলা হইত। ইসলাম প্রচারের সময়ে সপ্তম দিবসের নাম জুম্‌'আ রাখা হইয়াছে। ইহার সংখ্যা সম্ভবতঃ ইহুদীদের কাছে পাইয়াছিল।

আরবদেশে, ইরাণে, ও সমস্ত মুসলমানদেশে গ্রহের নামে দিনের নাম প্রচলিত নহে। পার্সী শুম্বা, একশুম্বা ইত্যাদি ও আরবী জুম'আ প্রচলিত।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

(১১৩)

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৎসর, মাস, সপ্তাহ এবং ঋতু একই নিয়মাধীন কি বিভিন্ন? যদি বিভিন্ন হয় তাহা হইলে অতি পূর্ব্বকালের ঘটনা-সমূহ এতদ্দেশীয় নিয়মাবলীর দ্বারা কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়? সীজারের সময় বৎসর ৪৪৫ দিনে ছিল। সেই সময়ের কোন ঘটনা আমাদের কোন্ মাস, কি বার এবং কোন্ বৎসর হইবে? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন।

অর্থাৎ সর্ব্বত্র মাস (২৮,৩০,৩১ দিনে) এবং ১২টি, বৎসর ৩৬৫ দিনে, সপ্তাহ ৭ দিনে এবং ঋতু ছয়টি কি না?

মীমাংসা

(৫২)

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত এবং কলিকাতা ৮০নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীললিতমোহন পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হুগলি বা দক্ষিণ রাঢ়" পুস্তকের প্রথমার্দ্ধে "হিন্দু রাজত্বে রাঢ়" শীর্ষক প্রবন্ধে "পাণ্ডুয়ার" উল্লেখ আছে। (পৃঃ ৬৫—৭১)।

শ্রীকমলকৃষ্ণ শীল।

(৫৮)

"আমের পোকা নিবারণের উপায়"—মাঘ মাসের প্রথমে বা পৌষ মাসের শেষভাগে—আমগাছের চারিদিকে বৃত্তাকারে অল্পপরিসর এক ফুট গভীর খাত (Ditch) কাটিয়া, মাঘ ও ফাল্গুন দুইমাস ও চৈত্রের কিছুকাল প্রত্যহ ঐ গাছে জল দিলে, আমে পোকা হইবে না, পক্ষান্তরে আম বড় ও মিষ্ট হইবে। একবৎসর এরূপ করিলে ৫ বৎসরের কাজ হইবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস।

(৭৭)

শ্রীহট্ট জিলার ইটা পরগণায় ৺রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা শ্রীহট্টে কেন নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত-সমাজে পর্য্যন্ত সুপরিজ্ঞাত ছিল। জেলাস্তরে বড় বড় শাস্ত্রীয় ব্যাপারানুষ্ঠানে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন; এবং উপস্থিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদি করিয়া জয়মাল্য লাভ করিতেন। তিনি যখন এইরূপে বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন এতদঞ্চলের স্মৃতিশাস্ত্রের কূটব্যবস্থা প্রণয়ন ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাঁহার বংশীয় ৺পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের উপরেই আসিয়া পড়িত। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ও সার্ব্বভৌম মহাশয়েরই ছাত্র ছিলেন। তরুণ বিদ্যারত্ন মহাশয় অধ্যাপক সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুপস্থিতে একাকী এইরূপ প্রশ্নাদির মীমাংসা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। পুনরায় সার্ব্বভৌম মহাশয় ফিরিয়া আসিলে পর গুরুদায়িত্বভার-লাঘব হেতু বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন। তাই প্রবাদ হইয়াছিল—"দেশে আইলা সার্ব্বভৌম, বিদ্যারত্নে দিলা ঘুম।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্মৃতিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। উনত্রিংশৎ-প্রদীপ নামে স্মৃতিশাস্ত্রীয় নিবন্ধ গ্রন্থ তিনি সংকলন করিয়াছেন।

শ্রীদেবদত্ত সে-

(৭৮)

(১) গুড়ার্কতুম্বং গুঞ্জাচ তিলচূর্ণ-সমন্বিতম্।
অর্কপত্রেষু বিন্যস্তং মূষিকং হরতে গৃহে॥

গুড়, আকন্দের আঠা, গুঞ্জা (কুঁচ) ও তিলচূর্ণ—এই-সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আকন্দপত্রের উপর গৃহে রাখিয়া দিলে সেই গৃহের মূষিক নষ্ট হয় ও পলায়ন করে।

(২) যদি সজীব ইন্দুর ধরা যায় তবে নিম্নলিখিত উপায় করিবেন।

হরিতাল, ছাগের বিষ্ঠা ও মূত্র, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ)—এই-সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া একটি সজীব ইঁদুরের গাত্রে মাখাইয়া ঐ ইঁদুর গৃহে ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য মূষিক তাহাকে দর্শন করিয়া গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

চিনি ২ পাউণ্ড, মাখন ১৮ পাউণ্ড, সর্ষপচূর্ণ ২৸০ পাউণ্ড, ফসফরাস ২ আউন্স, গরমজল ২৩ পাউণ্ড। প্রথমে ফসফরাস গরমজলে গলাইবে, তাহাতে সর্ষপচূর্ণ মিশ্রিত করিবে, তৎপরে বাকি দ্রব্যগুলি দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। রুটিতে বা অন্য কোন খাদ্য-দ্রব্যে মাখাইয়া রাখিতে হইবে। ইহা খাইবা মাত্র ইন্দুর মরিয়া যায়। ইহা মানুষের পক্ষে বিষ নহে।

শ্রীগদাধর দে।

ইন্দুরের খাদ্যের সহিত রেড্‌ডিয়াম অয়েল সংযোগ করিয়া খাঁচার মধ্যে রাখিলে ইহার গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ইন্দুর খাঁচায় পড়িবে।

ভেসিলীন ১ আউন্স, চিনি ১ আউন্স, মাষ্টার্ড পাউডার ২ ড্রাম ফসফরাস ১ ড্রাম একত্র করতঃ অল্প গরম জলে গুলিয়া কাগজে লেপ করিবে। ইহার কিঞ্চিৎ ইন্দুরের খাদ্যে সংযোগ করিয়া রাখিলে তাহা খাইয়া ইন্দুর মরিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সাহা।

বাজারে ইঁদুর মারিবার নানারকম ফাঁদ (Trap) কিনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ফাঁদ কয়েকটি কিনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে অনেক ইঁদুর নষ্ট করিতে পারা যায়।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিষ (Poison) মিশাইয়া ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে অথবা ঘরের রোয়াকের মধ্যে যে-সব জায়গা দিয়া ইঁদুর বেশী চলাচল করে, সেখানে রাখিয়া দিলে তাহা খাইয়া অনেক ইঁদুর মারা পড়ে। ইহা পরীক্ষিত।

শুনিয়াছি একটি জ্যান্ত ইঁদুর ধরিয়া তাহার লেজ কান কাটিয়া অথবা সমস্ত শরীর চুণ ও হলুদ দিয়া রঙ্গাইয়া ছাড়িয়া দিলে সেই ঘরে আর একটি ইঁদুরও থাকে না।

৺ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সংসারকোষ" নামক একখানা পুস্তকে ইঁদুর নিবারণের এক ঔষধ লিখা আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"শূকরের চর্ব্বি জলে দিয়া ১৫০ ডিগ্রি (ফারেনহাইট) তপ্ত দাও, পরে তাহাতে সিকি পরিমাণ হইস্কি সুরা (Encore whisky) মিশাইয়া বোতলে পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখ। শীতল হইলে

তাহাতে গন্ধকচূর্ণ মিশাইয়া সেই দ্রব পদার্থে কাপড়ের টুক্‌রা ভিজাইয়া ইঁদুরের গর্ত্তে এবং যে পথে তাহার গমনাগমন বুঝিবে সেখানে ছিটাইয়া দিলে সেই গৃহ হইতে ইঁদুর নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে।

মহি-দীন আহমদ চাপঘাটী।

(৮০)

বৈদিক যুগের আদিতেও বয়ন-শিল্পের প্রচার ছিল। ঋক্ সংহিতার প্রাচীনতম অংশেও কবিতা-রচনাকে কাপড়বোনার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। "পুনঃ সমব্যিততং বয়ন্তী ....." (২-৩৮-৪)—বয়ন-কারিণী (রাত্রি) বিস্তৃত (পোড়েন সুতা) পুনরায় গুটাইয়া লইতেছে। "নাহং তন্তং ন বিজানাম্যোতুং" (৭-৯-২)—আমি টানার সুতা জানি না, আমি পোড়েন সুতা জানি না।

ঋক্‌সংহিতায় ও অথর্ব্বসংহিতায় পোড়েন সুতার অর্থে 'ওতু' ('বা' ধাতু=বয়ন করা) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে এই অর্থে 'পর্য্যাস' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই-রূপ টানা সুতার প্রতিশব্দ ঋক্ ও অথর্ব্বে 'তন্ত' ('তন্'=বিস্তার করা) এবং শতপথে 'অনুচাদ।' (শতপথ ব্রা ২-১-২-১৮)।

বাজসনেয়ি সংহিতায় আছে—

সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণ উর্ণাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি।
অশ্বিনা যজ্ঞং সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্য রূপং বরুণোভিষজ্যন্॥ ১৯-৮০।
সরস্বতী মনসা পেশলং বসু নাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বপুঃ।
রসং পরিস্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুর্ধীর স্তসরং ন বেম॥ ১৯-৮৩।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বয়নকার্য্যে মাকু ('তসর') ব্যবহৃত হইত এবং তাঁতকে 'বেমন্' বলা হইত। কাঠের গজাল দ্বারা ('মযুখ') সুতা টানিয়া রাখা হইত এবং সীসার খণ্ড ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ঋগ্বেদের যুগের শেষে বর্ণভেদ প্রচলিত হইয়াছিল বটে—কিন্তু তাহা কেবল চারি জাতিতে। 'তন্তুবায়' প্রভৃতি উপজাতির অস্তিত্ব আমরা আশা করিতে পারি না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি যে বয়নকারীকে 'বায়' বলিত (ঋক্‌সংহিতা—১০-২৬-৩) এবং এই বয়ন-কার্য্য নারীদিগের একরূপ নিজস্ব ছিল। [ঋক্, ১-৬১-৮; ১-১১৫-৪ ইত্যাদি। অথর্ব্ব, ১৪-২-৫১, ১০-৭-৪২ ইত্যাদি।]

শ্রীসুকুমার সেন।

(৮৩)

যুক্তরাজ্যের মধ্য ও পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই কৃষিশিক্ষা ভাল হয়। পশ্চিমে "Barkeley" বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বিষয়ে শিক্ষা সব চেয়ে ভাল হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় সান্‌ফ্রেন্সিস্‌কো সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের এখানেই যাওয়া বিধেয়; কারণ এদিকে পশ্চিম উপকূলে নামিলে পাথেয়ের অনেকটা লাঘব হয় এবং ওদিকে মাসিক খরচটাও কম। শ্রীসুবোধচন্দ্র গুহ।

Iowa universityর বাঙালী অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার "Fifteen Years in America" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে আমাদের পক্ষে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার জন্য Illinois Universityর অধীনস্থ কলেজে যাওয়াই বিশেষ সুবিধা-জনক। তাহার প্রথম কারণ এখানে উক্ত বিষয়ে শিক্ষার বিশেষ ভাল ব্যবস্থা আছে এবং দ্বিতীয় কারণ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাদের অধিকাংশ ছাত্র যাইয়া থাকে ও আছে।

আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎকালে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন যে তাঁহার মতে ভারত-বর্ষের কোন ছেলের B. Sc পর্য্যন্ত না পড়িয়া আমেরিকার কোন বিষয় শিক্ষা করিতে যাওয়া উচিত নয়।

ডাক্তার সুধীন্দ্র বসুর Fifteen Years in America নামক পুস্তকে এ বিষয়ে আরও অনেক খবর আছে।

প্রভাসচন্দ্র বসু।

(৮৪)

বসন্ত গো-পীড়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোঁয়াচে ও মারাত্মক। তাই রোগ প্রকাশ হওয়া মাত্র পীড়িত গরুটিকে অন্যান্য গরু হইতে পৃথক করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ—

গরুর গা কাঁপিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠে, পেট আঁটিয়া যায়, মুখ গরম হয় ও হাই তুলিতে থাকে; পা একত্র জড় হইয়া যায়, কান ঝুলিয়া পড়ে, আস্তে জাওর কাটে ও দাঁত কড়মড় করে, মাংস-পেশীসমূহ অসাড়ের মত হইয়া পড়ে, চোক মুখ দিয়া দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা বাহির হইতে থাকে ও সমস্ত শরীরে ঝুন্‌ঝুড়ি পড়িয়া যায়। এই-সকল লক্ষণ দৃষ্ট হওয়া মাত্র চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

শিমুলের বীচি বসন্তরোগের মহৌষধ। এই ঔষধটি অতি সহজ-সাধ্য। "গাভীপরিচর্য্যা" নামক পুস্তক হইতে ইহার ব্যবহার নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ঔষধটি তিন দিবস ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিবে। কোন্ শ্রেণীর গাভীকে কোন্ দিন কতবার কি পরিমাণে বীচি দিতে হয় নিম্নে তাহার একটি ফর্দ্দ দিলাম—

		১ম বার	২য় বার	৩য় বার
বলবতী গাভী বা বলদকে	(প্রথম দিন)	২৫টি বীচি	১৮টি	১০টি
		(৩ ঘণ্টা অন্তর)		
" "	(দ্বিতীয় দিন)	১৫টি	১০টি	(১২ঘণ্টা)
" "	(তৃতীয় দিন)	১০টি	(প্রাতে একবারমাত্র)	
মধ্যবয়স্কা গাভী বা বলদকে	(প্রথম দিন)	৭টি	৫টি	
" "	(দ্বিতীয় দিন)	৭টি	৫টি	
" "	(তৃতীয় দিন)	৫টি	(একবার মাত্র)	
		১ম বারে	২য় বারে	৩য় বারে
অল্পবয়স্ক বাছুরকে	(প্রথম দিন)	৭টি	৩টি	১৫টি
"	(দ্বিতীয় দিন)	৩টি	২টি	
"	(তৃতীয় দিন)	১টি মাত্র।		

পথ্য—কেবল চাউল ও কলাই উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার মাড়।

কোন কোন সময় অধিক দাস্ত হওয়ায় গরুকে অবসন্ন করিয়া ফেলে এবং ঔষধ সেবনের সুবিধা হয় না; তখন নিম্নোক্ত ২টি ঔষধের যে-কোনটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১।	চাখড়ি গুঁড়া	৩৸০ তোলা
	পলাশ গঁদ	৸০ "
	আফিম	।৶০ আনা
	চিরতার গুঁড়া	১।০ তোলা

এই-সকল ঔষধ উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া ১ ছটাক সরাব ও ভাতের ১ সের মাড়ে মিশাইয়া খাওয়াইবে।

২। কর্পূর ৸০ তোলা, চিরতা ৸০ তোলা, সোরা ৸০ তোলা, শরাব দুই ছটাক, ঘৃতকুমার বীচি সিকিকাচ্চা একত্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

মহি-দীন আহ্‌মদ চাপঘাটী।

এডিসনের ডাকে ভূতের সাড়া।

ভাবীর দেশে

(১)

তরু যারে চেনেনাক, নাহি কোনো পরিচয়,
সেই ফুল ফুটে সেথা, বন আলো করি রয়।
বাঁশী যারে সাধিতেছে, ভাবিতেছে কত দূর,
সেইখানে জেগে রয় অনাহত যত সুর।

(২)

অদৃদিত রবি শশী, অনাগত রাতি দিন,
অজানিত গ্রহ-তারা, হেথা যারা জ্যোতিহীন,
যাদেরে আসিতে হবে, বহু বহু দিন পর
তাদেরি এখন সেথা সাজিবার অবসর।

(৩)

ভগীরথ হেথা যারে শিলা পরে করে ধ্যান,
দ্রবময়ী সুরধুনী বুকে সেথা পড়ে টান।
শবরী যে রাম লাগি তুলে রাখে ফুলকুল,
তাহাদি সুরভি সেথা করে তাঁরে বেয়াকুল।

(৪)

আঁধারের আরাধনা, গোপনের আঁখিজল,
পরকাশে সেই দেশে নবজ্যোতি সুবিমল।
সেথা জাগে যত আশা ভালবাসা বসুধার,
যত কুবুজার শ্যাম, রামকানু যশোদার।

(৫)

আছে আঁখি পথ চেয়ে যার লাগি বারমাস,
শ্রবণ করে যে স্বর শুনিবার অভিলাষ,
কবি যারে খুঁজে মরে ডাকে যারে অবিরাম
সেথা জাগে সেই চির অনাগত অভিরাম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পঞ্চশস্য

ভূতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক এডিসন্ জগৎবিখ্যাত লোক। সম্প্রতি তিনি ভূততত্ত্বের আলোচনায় মন দিয়াছেন। তাঁর ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, দৃশ্য জগতের পাশে এমন যদি কোন অদৃশ্য জগৎ থাকে যেখানে বাস্তবিকই প্রেতাত্মারা বাস করে, তাহা হইলে টেলিফোনের মত কোন যন্ত্রের সাহায্যে সে-জগতের সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই যন্ত্রটি সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের মত হইলে চলিবে না। নূতন বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও বুদ্ধির দ্বারা এমন একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইবে যার সাহায্যে ভূতপ্রেতের কথাবার্ত্তা আমরা বুঝিতে পারিব, অবশ্য ভূতপ্রেত যদি বাস্তবিকই কথা কহিতে জানে বা চায়। যাহাই হোক্ তিনি এইরূপ একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। ছবিতে দেখান হইয়াছে এডিসন্ তাঁর যন্ত্র কানে দিয়া বসিয়া আছেন, আর দূর হইতে একটি প্রেতাত্মা তাঁর সহিত কথা কহিতেছে।

প্ল্যানচেট প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রণালীতে ভূতের সহিত কথা কওয়ার ব্যাপারটা এডিসন্ বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন এ-সব প্রণালীর অনেকগুলি চাতুরী ও ছলনা মাত্র। যারা এই-সব উপায়ে প্রেতাত্মাদের সহিত কথা কহিতে বসে তারা আগে হইতেই আপনা-আপনি অভিভূত হইয়া পড়ে এবং মনে মনে এই বিশ্বাস করিয়া বসে যে, তারা বাস্তবিকই ভূতের রাজ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে। এডিসন্

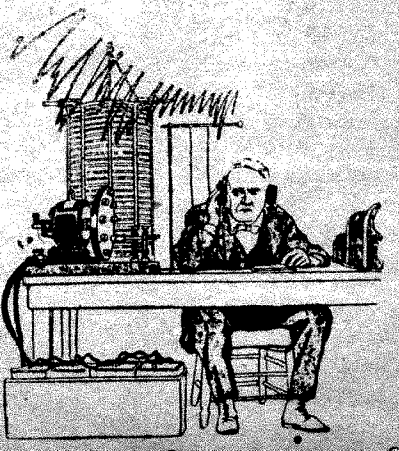

Mr. Edison believes that Scientists who grasp the Principles of his Instrument, will, when they "pass over" be able to Communicate with other living Scientists.

এডিসনের ভূতের সঙ্গে কথা কহিবার চেষ্টা।

বলেন—এমন ছেলেমানুষী উপায়ে প্রেতজগতের সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া মোটেই সম্ভব নয়। ইহা সম্ভব হইতে পারে তারহীন তাড়িত-বার্ত্তার সাহায্যে এবং তাতে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও নিপুণতার প্রয়োজন। এইরকম যন্ত্র হয়ত কেবল বৈজ্ঞানিকদের আয়ত্ত হইবে, সাধারণে এর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধারণা করিতে পারিবে না। এডিসন্ কিরূপ যন্ত্র উদ্‌ভাবন করিতে নিযুক্ত আছেন তাহা তিনি যন্ত্র সম্পূর্ণ না করিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না।

বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষ—

আমাদের ঘরের 'পুসি' বা 'মেনি'কে আজকাল দেখিতে মন্দ নয়—সভ্য-ভব্যও বটে, ভদ্রও বটে। মাছটা, দুধটার প্রতি মাঝে মাঝে সু-দৃষ্টি দিয়া তিনি অভদ্রতা প্রকাশ করেন মাত্র—সেটা পূর্ব্বপুরুষের স্বভাব-দোষ। মোটের উপর বিড়ালটি পরিপাটী জীব। কিন্তু এই পরিপাটী জীবের অতিবৃদ্ধপিতামহরা বিশেষ পরিপাটী আকারের ছিলেন না। সম্প্রতি এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগেকার বিড়ালের পূর্ব্ব-পুরুষের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তিনি ছিলেন (ছবিতে দেখুন) গোসাপের মত এক বিকটাকার অথচ লম্বা লম্বা পা বিশিষ্ট এক মাংসাশী হিংস্রক জন্তু, পঁচিশ ফুট দীর্ঘ এবং বারো ফুট উঁচু। তাঁর বৈজ্ঞানিক নাম সেরাটোসরাস্। যে-যুগে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন সে-যুগে ইঁহার প্রতিপত্তি কম ছিল না; কেননা ইনি ভগবানের এক বিকট সৃষ্টি। অতএব বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিপত্তির সময় মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বড় সুখে ছিলেন না। তাঁকে নিশ্চয়ই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হইত। তবে দেড় কোটি বছর আগে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের আকার ঠিক কি ছিল তাহা বলা কঠিন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন ৫০ লক্ষ বছর আগে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ টারসিয়াসের মত ছিল। বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষ সেরাটোসরাসের মাথার উপর মানুষের পূর্ব্বপুরুষ টারসিয়াসের ছবি দেওয়া হইয়াছে। এই টারসিয়াস্ সম্বন্ধে আমরা গত মাঘ মাসের 'পঞ্চশস্যে' কিছু আলোচনা করিয়াছি।

এখন বিড়াল ও মানুষের দুই পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে এক কোটি বছর বয়সের তফাৎ হইলেও সেই এক কোটি বছরের মধ্যে সেরাটোসরাসের সন্তানসন্ততি এমন আকার পাইয়াছিল যাহা টারসিয়াসের চেহারার চেয়ে যথেষ্ট বৃহৎ ও বিকট। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে তখনকার দিনে মানুষের ল্যাজবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পূর্ব্বপুরুষ গাছে গাছে বেড়াইয়া কীট-পতঙ্গ খাইয়া কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত! কেননা বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষের প্রতাপ মাটিতে বড় কম ছিল না। হায় বিড়ালের পূর্ব্ব-পুরুষ, আজ তোমার সন্তানরা যে মানুষেরই চরণে আশ্রয় লইয়া তার 'প্রসাদী' জিনিসে তুষ্ট হইয়া রহিয়াছে! কিন্তু মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের মনে বিড়ালের যে ভয় ছিল, তাহা এখনো অনেক নরনারীর মনে রহিয়া গিয়াছে—অনেকে তাই কিছুতেই বিড়াল বরদাস্ত করিতে পারে না। বিড়ালের পূর্ব্বপুরুষের দেহটাই ক্রমে সরু হইয়া ল্যাজ হইয়াছিল; কিন্তু এখনকার বিড়ালের ল্যাজ যেন তার দেহের সঙ্গে স্বতন্ত্র একটা লগ্ন অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে;—এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। এদের সর্ব্ব-আদিম পূর্ব্বপুরুষেরা হয় ত জলচর কুম্ভীরজাতীয় জীব ছিল; পরে স্থলচারী হইয়া উঠে। এদের মস্তিষ্ক প্রকাণ্ড ছিল; এত বড় মস্তিষ্কওয়ালা স্তন্যপায়ী জীব ধরণীর কোলে কখন জন্মগ্রহণ করে নাই। এখনো তাই বিড়াল-জাতীয় স্তন্যপায়ী পশুরা আকারের অনুপাতে অপর সকল জীবের চেয়ে মগজওয়ালা।

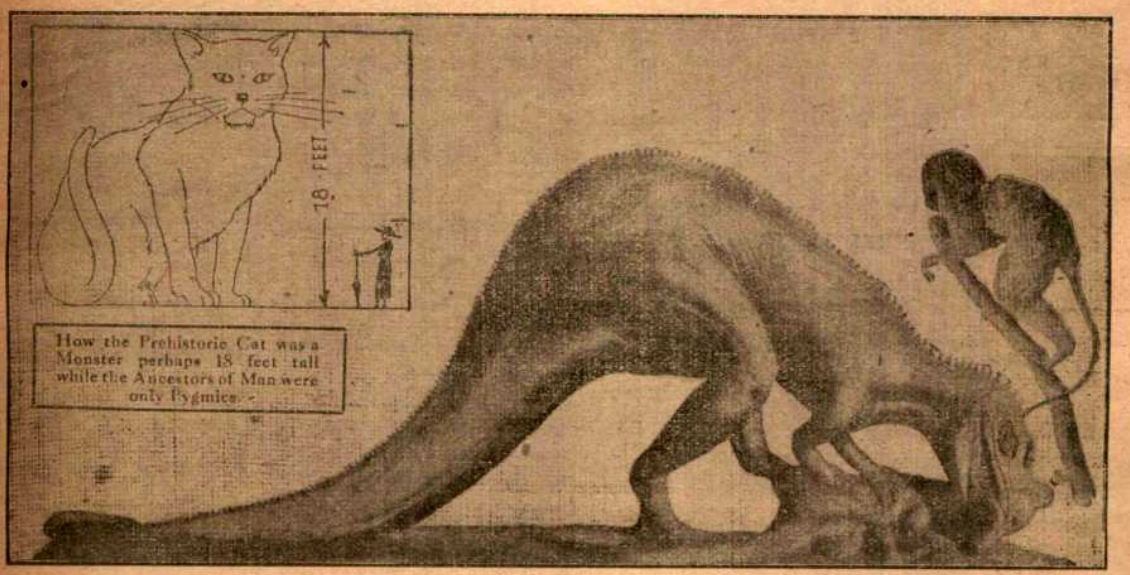

বিড়ালের ও মানুষের পূর্ব্বপুরুষ

বিকট-আকার জন্তুটি বিড়ালের আদি পিতা এবং তার মাথার কাছে ল্যাজওলা জীবটি মানুষের আদি পিতা। এখনকার বিড়াল যদি আগেকার মত আঠারো ফুট উঁচু থাকিত তাহা হইলে মানুষ যে তার কাছে কত ছোট দেখাইত তার তুলনার নমুনা ছবিটির বাঁ দিকের কোণে।

সাইনবোর্ডে গ্রামের পরিচয়—

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিস এবং পারিপার্শ্বিক জায়গাকে কত সুন্দররূপে সুনিয়মিত এবং সুসজ্জিত করিয়া তুলিতেছে। এই-সমস্ত কলার কারুকার্য্যে মানুষের শিল্পী এবং

সৌন্দর্য্য-পিপাসু মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গত ভাদ্র মাসে 'পঞ্চশস্যে' আমরা বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক রাস্তার আলোর থামের কথা লিখিয়াছিলাম। এবারে আমরা বিলাতে কিরূপে সাইনবোর্ডের দ্বারা গ্রামের বিশেষত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা হইতেছে তার কথাই বলিব।

বিলাতের কয়েকজন শিল্পনিপুণ সৌন্দর্য্যপ্রিয় লোক সম্প্রতি এই চিন্তায় রত হন যে, নাম অনুসারে নানা গ্রামের বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি বা ছবি চিত্র করিয়া প্রত্যেক গ্রামের সম্মুখে তাহা রাখিলে লোকের বিভিন্ন গ্রাম বাছিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না। মনে করুন একজন লোককে একটি অচেনা গ্রামে যাইতে হইবে। তিনি হয়ত দূরে ষ্টেশন হইতে নামিয়া গ্রামের উদ্দেশে চলিলেন। কিন্তু গ্রামটি খুঁজিয়া আর পান না। এইরূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগের সময় তিনি যদি দেখেন এক জায়গায় তাঁর গন্তব্য গ্রামটির নাম অনুযায়ী একটি মূর্ত্তি বা ছবি রহিয়াছে তাহা হইলে তাঁর কত সুবিধা ও আনন্দ! এই সুবিধা ও আনন্দ বিধানের সঙ্গে এরূপ মূর্ত্তি-স্থাপনের আর-একটি শিল্প-মূল্যও আছে।

বিলাতে এই কাজের জন্য যে সমিতি হয় তাঁরা গ্রামের বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি গঠনের এক প্রতিযোগী পরীক্ষা ঘোষণা করেন। সেই পরীক্ষায় অনেকে অনেক মূর্ত্তি তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছিলেন। তাদের মধ্যে দুইটি মূর্ত্তি সব চেয়ে ভাল। এই দুইটির নির্ম্মাতা প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। আমরা মূর্ত্তি দুইটির ছবি তুলিয়া দিতেছি। প্রথম মূর্ত্তিটি টেম্‌স্ নদীর কাছাকাছি সেণ্ট্ পিটার্স নামক গ্রামের পরিচায়ক। এটিতে দেখান হইয়াছে যে, সাধু সেণ্ট্ পিটার্স স্বর্গের দ্বারের চাবি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তাঁর মূর্ত্তিটি খুব সাধুত্ব-ব্যঞ্জক হইয়াছে। তাঁর লম্বা দাড়ি ও পোষাক সাধুর মতই হইয়াছে। এ মূর্ত্তিটি চমৎকার! আর একটি মূর্ত্তি সাসেক্‌সের মেফিল্‌ড্ গ্রামের। এটিও সুন্দর। প্রাচীনকালে ইংলণ্ডে মে মাসে মে-পোল নামক উৎসবের খুব প্রচলন ছিল। ইহার পরিচয় স্বরূপ

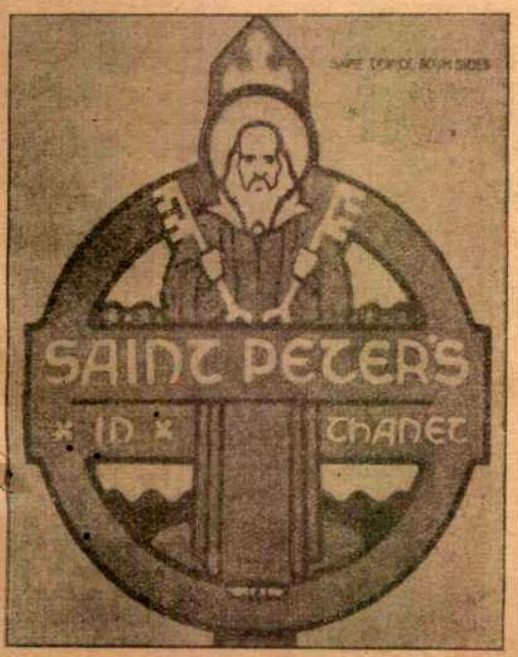

সাইনবোর্ডে গ্রামের পরিচয়।

সাইনবোর্ডে গ্রামের পরিচয়।

মূর্ত্তিটিতে অনেকগুলি বালক-বালিকা আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছে। গ্রামের নাম মে-ফিল্‌ড্; অতএব মে-পোল উৎসবের ব্যঞ্জনা খুবই সঙ্গত হইয়াছে।

এই দুইটি মূর্ত্তি ছাড়া অনেকে আরও অনেক মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। তবে এই দুইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শিল্পকলার উন্নতি সাধন ও মানস-সৌন্দর্য্যের বিকাশ প্রত্যেক জাতিরই সাধনার বস্তু। অবশ্য আমরা দরিদ্র বলিয়া এসব বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জিনিসটি যে মূলতঃ প্রত্যেক সভ্য জাতির অনুকরণীয় তাতে সন্দেহ নাই। আর বাংলাদেশ শিল্পকলায় উদাসীন নয়। শিল্পপ্রিয় বাঙালী এদিকে মন দিন—ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

চেহারায় চিন্তার ছাপ—

দেহের সৌকুমার্য্যে ও মুখের সৌন্দর্য্যে মানুষ যে পশু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে তার কারণ মানুষের বুদ্ধি-শক্তি ও চিন্তা-শক্তি। মনন-শক্তি মানুষের মুখ ও দেহকে সু-নিয়মিত সু-সমঞ্জস ও সু-সঙ্গত করিয়া তুলিতেছে। এবং মানুষ যতই চিন্তা-শক্তিতে উন্নত হইতে থাকিবে তার চেহারা ততই আরো সুন্দর হইতে থাকিবে। এখানে ছবিতে আফ্রিকার একটি গরিলার হাত ও মুখ এবং একটি চিন্তাশীল লোকের হাত ও মুখ দেওয়া হইয়াছে। গরিলার হাতের সোজাদিক ও মানুষের হাতের সোজাদিক এবং গরিলার হাতের উল্টাপিঠ ও মানুষের হাতের উল্টাপিঠ হইতে দেখা যাইতেছে যে মাত্র হাতের গঠনে মানুষের হাত গরিলার হাত হইতে কত সুন্দর ও সু-সমঞ্জস। তারপর দুইটি মুখের কথা। গরিলার মুখ বিকট, হিংস্র, ক্রোধান্ধ, কর্কশ ও প্রতিহিংসাপ্রবণ; আর মানুষের মুখ কমনীয়, সৌম্য, শান্ত, সহনশীল ও উদার।

প্রাচীনকালে মানুষও কোন রকমের বন্য জন্তু ছিল কিন্তু

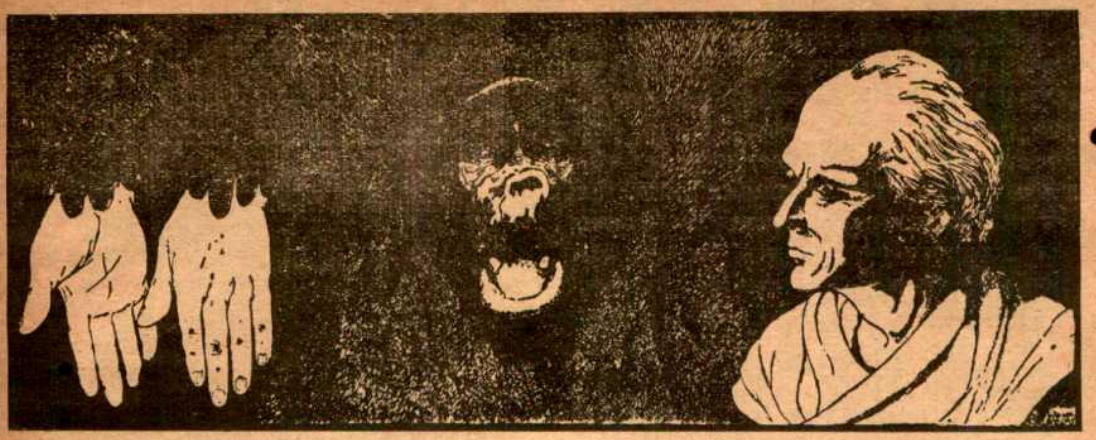

চেহারায় চিন্তার ছাপ।

বহুযুগের ক্রমঅভিব্যক্তিতে মানুষ যে মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে আবহাওয়া, খাদ্যাদি, ঝড় বৃষ্টি শীত তাপ এবং অন্য নানা রকমের উৎপাত উপদ্রব প্রভৃতি অনেক কিছুই কাজ করিয়াছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী কাজ করিয়াছে মানুষেরই নিজের চিন্তা। মানুষ নিজের চিন্তা দিয়া এখনও নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন করিয়া গড়িতেছে। ছবির মুখ-দুটিতে যে তফাৎ তাহা কেবল সুরূপ-কুরূপের তফাৎ নহে, এ তফাতের জন্য কেবল জীবস্রষ্টাও দায়ী নহেন, দায়ী যার যার মনের ভাবনাচিন্তা। আপনার চিন্তা আপনার বর্ত্তমানের চেহারার সঙ্গে আপনার ভবিষ্যতের চেহারার ঠিক এতখানি তফাত ঘটাইতে পারে; পণ্ডিতেরা এই প্রকার বলিতেছেন।

গরিলা বা বানর হইতে তার মুখ যে এত সুন্দর ও সু-সমঞ্জস হইয়া উঠিয়াছে তাহা তার মনন ও চিন্তারই প্রভাবে।

মানুষের মধ্যেও দেখা যায় সুশ্রী মূর্খের চেয়ে কুশ্রী বুদ্ধিমানকে প্রিয়দর্শন বোধ হয়। যে-সব নরনারী বিদ্বান ও শিক্ষিত, যারা মনন-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, তাদের চেহারার শ্রীও অশিক্ষিত মূর্খ নরনারীর সৌষ্ঠবের চেয়ে ঢের বেশী মনোরম। অতএব যে-সব নরনারী সুন্দর হইয়া লোকের মনোহরণ করিতে চান তাঁরা বিবিধ বিদ্যা সুকুমার শিল্প ও সতত চিন্তার চর্চ্চা করিয়া নিজের নিজের চেহারা সুন্দর সুশ্রী করিয়া তুলিতে আলস্য করিবেন না।

তরুণ বর-কনে!—

সম্প্রতি আমেরিকায় একটি একশো বছরের বর ও একটি বাহাত্তর বছরের কনের বিবাহ হইয়াছে। বর-কনে খুবই তরুণ! আমাদের দেশে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' প্রবাদ আছে। তবে তাতে বৃদ্ধের পক্ষে মুস্কিল বড় কম নয়। তাই আমেরিকার এই একশো বছরের বরটি বাহাত্তর বছরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। ছবিতে দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আমরা জানি না প্রথম শুভদৃষ্টিতে কনের মুখে কি রকম রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁর প্রথম সম্ভাষণ গদগদ হইয়া উঠিয়াছিল কি না। এ ত বিবাহ নয়, এ যে মরণ-সমুদ্রে একলা ঝাঁপ দিবার ভয়ে আর-একজনকে জুড়ি করিয়া লওয়া। বর বলেন—কনের হৃদয়ের সহিত তাঁর হৃদয়ের তাড়িতযোগ ঘটিয়াছে; আর তাই ত বিবাহ।

—গুপ্ত।

তরুণ বর-কনে!—১০০ বছরের বর ও ৭২ বছরের কনে।

আদিম মানুষ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইউজিন ডুবোয়া নামক একজন ওলন্দাজ ডাক্তার যবদ্বীপের কোনো-এক জায়গায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার যুগের কতকগুলি কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কার করেন। চোয়ালের দুটি দাঁত, মাজার হাড় এবং মাথার খুলির খানিকটা, শরীরের এই অংশকটিই মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহা হইতেই পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছিলেন যে এই কঙ্কাল এমন কোনো জীবের হইবে যাহাকে মানুষও বলা চলে না বানরও বলা চলে না, যে এই দুয়ের মাঝামাঝি মানুষ-ঘ্যাঁসা বানর বা বানর-ঘ্যাঁসা মানুষ। ইহাকে মানুষ বলা হইবে, না বানর বলা হইবে তাহা লইয়া দ্বন্দ্ব আজও ঘোচে নাই বটে, কিন্তু ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে যে আদিম মানুষের সঙ্গে ইহার জ্ঞাতিত্বের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। বিবর্ত্তনের যে অজ্ঞাত স্তরপর্য্যায় অবলম্বন করিয়া বানর ক্রমে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা বোধ হয় তাহার মধ্যে একটি। বর্ত্তমানের বানরজাতির সঙ্গে বর্ত্তমানের মানুষের নিকট-জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু উহাদিগকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যে বানরজাতীয় জীব হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারা অনেককাল পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, যবদ্বীপে পাওয়া কঙ্কাল তাহাদেরই কোনও নিকট বংশধরের হইবে। কমবেশ কুড়িলক্ষ বৎসর আগে অধুনা জনশূন্য তরুহীন মধ্য-এশিয়ার মালভূমিতে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পৃথিবীর

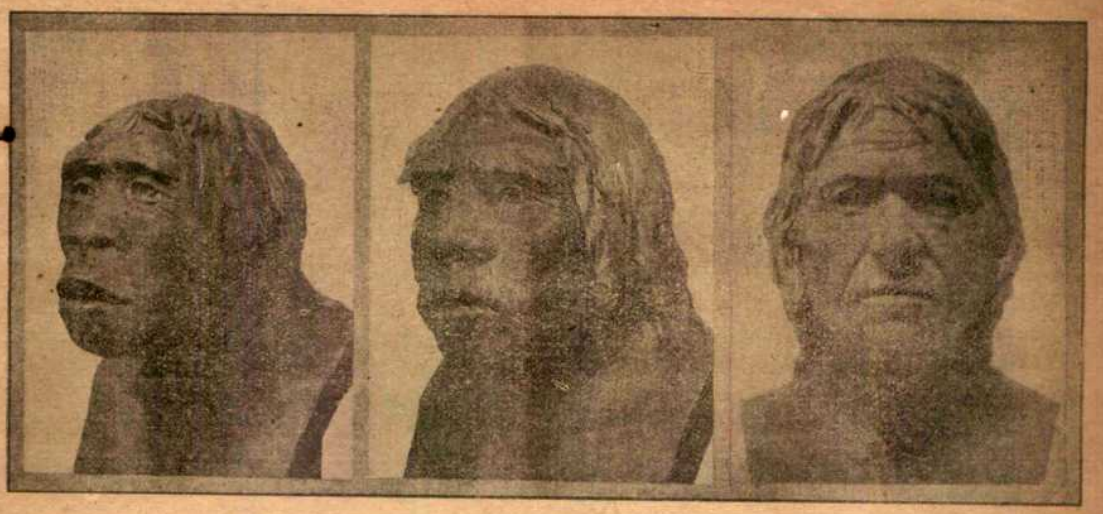

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ।

বানর-থ্যাঁসা হবহব মানুষ, ১৮৯২ সালে যবদ্বীপে ইউজিন্ দুবোয়া ইহার কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। প্রস্তর যুগের আদিম মানুষ; ১৮৫৭ সালে নিয়াণ্ডার্থলে গুহায় ইহার কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন মানুষ, ক্রোম্যাগ্নন নামক স্থানে ইহার অনেকগুলি কঙ্কাল পাওয়া যায়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রমপরিণতির যে একটি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, খুব সহজেই তাহা চোখে পড়ে। চিবুক ক্রমেই সুডোল হইয়া উঠিয়াছে, ভুরুর ঝুলিয়াপড়া উঁচু হাড় সমান হইয়া আসিয়াছে, মাথার খুলি আয়তনে বাড়িয়াছে, মুখে বুদ্ধির ছাপও ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়াছে।

আদিম 'হবহবমানুষ'দের আদিনিবাস ছিল। আমাদের সম্মানাস্পদ পূর্ব্বপুরুষেরা সেইখানে দলেদলে তরুশাখায় বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে নানারকমের লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করিতে আমেরিকা হইতে একদল তথ্যান্বেষী মধ্য-এশিয়াতে অভিযান করিতেছেন। তাঁহাদের দলপতি মিষ্টার রায় সি এণ্ড্রুজ বলেন, "আমরা সেই প্রথম মানুষটির খবর লইতে যাইতেছি, যে সকলের আগে তরুশাখা হইতে নামিয়া আসিয়া দুই পায় ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছিল এবং পাথর ছুড়িয়া ও লাঠি বাগাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা চীন দেশকে ভূতত্ত্বের দিক হইতে জরীপ করিয়া ফেলিব, তারপর প্রস্তরীভূত কঙ্কালাবশেষের জন্য সমস্ত প্রাচীন নদীবক্ষ, লুপ্ত জলনালী ও বরফ-প্রবাহের পথগুলিকে খুঁজিব। একবৎসর পর আমরা মঙ্গোলিয়াতে যাইব এবং সেইখানে আমাদের অনুসন্ধান চলিতে থাকিবে। মধ্য-এশিয়ার ঠিক কোন্ স্থানে মানুষের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু মধ্য-এশিয়াতেই যে হইয়াছিল তাহা আমাদের একেবারে নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়; কাজেই চীন হইতে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া মানুষের আদি বাসস্থান আমরা বাহির করিতে পারিব।"

সুধীর।

কিন্তু তিনি কাটিয়া দেখেন যে ঐগুলির ভিতরে পরিণতিভেদে ছোট বড় নানা আকারের ও বয়সের ফুল ও কুঁড়ি রহিয়াছে (চিত্র দেখুন)। আলোক-সংস্পর্শরহিত অবস্থায় ছিল বলিয়া ফুল ও ডাঁটা ইত্যাদি মোমের মত শাদা রহিয়া গিয়াছে। আর প্রত্যেক পেঁয়াজের মধ্যেই ফুলের সমষ্টিকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য পাতলা পর্দ্দার মত এক-একটি আবরণ আছে।

সাধারণতঃ পেঁয়াজের গোড়ার দিক হইতে মধ্য দিয়া একটা ফাঁপা ডাঁটা বাহির হয় এবং তাহার মাথার ফুলগুলি ছোট ছোট বোঁটার উপর

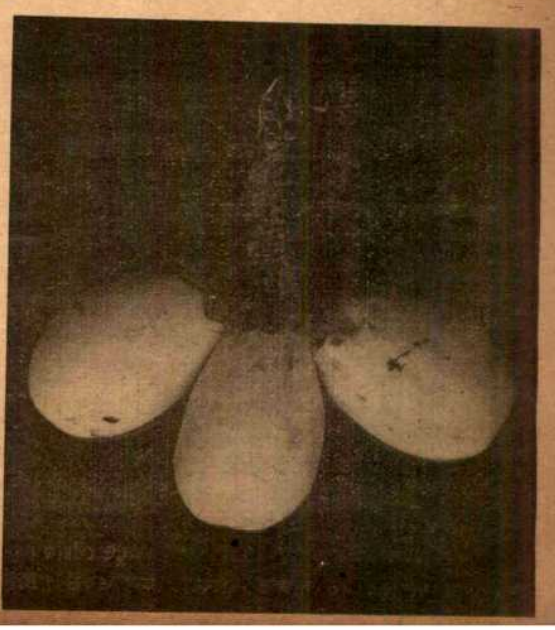

অদ্ভুত পেঁয়াজ—

প্রকৃতির রাজ্যে সাধারণতঃ যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে সে-সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে—সেগুলি এক-একটা বিশেষ নিয়মের বশবর্ত্তী। কিন্তু সময় সময় এমন এক-একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে তখন প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন ব্যাপার অতি জটিল হইয়া দাঁড়ায়।

সংপ্রতি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বর্ম্মণ বি, এসসি, এফ, এল, এস, মহাশয় বোম্বে নেচারেল হিষ্টরী সোসাইটীর জর্নালে উদ্ভিদ্‌রাজ্যের এরূপ একটি অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ সম্বলিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে কতকগুলি পেঁয়াজ তাঁহার হস্তগত হয়। পেঁয়াজগুলি অন্য সাধারণ পেঁয়াজের অপেক্ষা হাতের চাপে কিঞ্চিৎ অধিকতর সঙ্কোচনীয় হইলেও, বাহ্যিক আকারে অন্যগুলির সহিত বিশেষ কোন

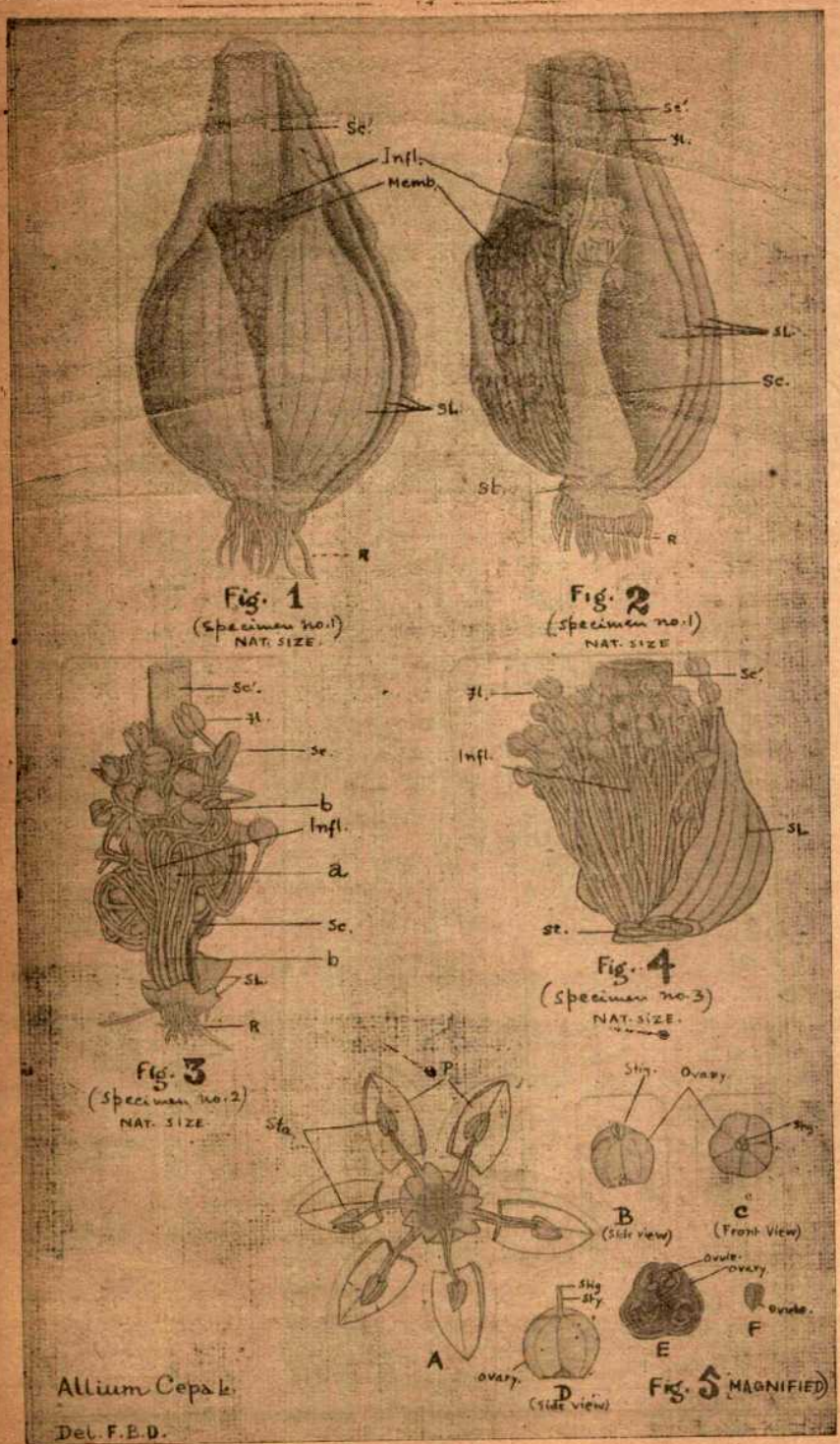

অদ্ভুত পেঁয়াজ।

কদম্বফুলের পাপ্‌ড়ির মত সজ্জিত থাকে। কিন্তু একটি (Fig. 4 দেখুন) পেঁয়াজের মধ্যে সেইরূপ ডাঁটার বা পেঁয়াজের কলির কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর একটির (Fig. 3 দেখুন) মধ্যে ফুল-বাহী যে ডাঁটা বা কলি আছে সেইটি নিতান্তই সরু ও ছোট। অন্য একটির (Fig. 1 দেখুন) মধ্যে দেখা গেল ডাঁটা রহিয়াছে বটে কিন্তু সে ডাঁটা বজ্রবাঁটুলের মত বেঁটে আর মোটা, ফুলগুলি তার মাথার উপর সজ্জিত না থাকিয়া রহিয়াছে এক-পার্শ্বে লম্বালম্বিভাবে।

তৃতীয় ছবিতে (Fig. 3) যে ডাঁটা (Sc.) দেখা যায় তাহা কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে রীতিমত বৃদ্ধি পাইতে না পারিয়া ডাঁটার আকার খুব ছোট এবং নিরেট রহিয়া গিয়াছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিতে পান যে ডাঁটাগুলির কোষ-বিন্যাস সাধারণ ডাঁটার তুলনায় এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে দেখিলেই বুঝা যায় যে পেঁয়াজের ভিতরের বর্দ্ধমান অন্যান্য অংশের বৃদ্ধিহেতু এবং বাহিরের শুষ্ক খোসার আকুঞ্চনের চাপের ফলেই এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে —Exception proves the rule অর্থাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম দ্বারাই নিয়মের সত্তা প্রমাণিত হয়। প্রকৃতিক পদার্থ-সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে যে-সমস্ত ব্যতিক্রম দেখা যায় সেগুলির সাহায্যে সাধারণ নিয়মগুলি ভালরূপে বুঝিবার সুবিধা হয়। জনসাধারণের নিকট অবজ্ঞার বিষয় ও সামান্য কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও এইরূপ ব্যতিক্রম নানা জটিল প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করে বলিয়া বিজ্ঞানরাজ্যে উপেক্ষণীয় নহে।

ক, খ।

অস্ত্র করিয়া বয়স ছাঁটা—

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখের চামড়া ঢিলে হওয়ার দরুণ মানুষের কপালে ভাঁজ পড়ে, গাল তুবড়াইয়া যায়, নাকের দুদিকে ও ভুরুর মাঝখানে কুঞ্চন ধরিয়া সহৃদয় মিষ্ট স্বভাব মানুষকেও অপ্রিয়দর্শন কর্কশ করিয়া তোলে। কোনো উপায়ে এই ঢিলে চামড়ার খানিকটা অনাবশ্যক অংশ ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাকে তার জায়গাটুকুর মধ্যে বেশ মাপসই আঁটসাঁট করিয়া টানিয়া দিতে পারিলে মানুষের মুখের হারানো যৌবনশ্রী অনেকটা

ফিরিয়া আসিতে পারে। দরজি যেমন কবিয়া ঢিলে পোষাককে ছাঁটিয়া কাটিয়া গায়ের সঙ্গে মানাইয়া দেয় ঠিক তেমনি অবলীলায় বিলাতের অস্ত্রচিকিৎসকেরা মানুষের বিশীর্ণ মুখের উপর অস্ত্র ও রিপু-কর্ম্ম করিয়া তাকে সুডৌল সুঠাম ভরাট করিয়া তুলিতেছেন। কাজটি বলিতে যত সহজ শোনাইতেছে করিতে তত নহে। অস্ত্রোপচারে অনেকদিন ধরিয়া যাঁহারা হাত পাকাইয়াছেন কেবল তাঁহারাই এতে হাত দিতে সাহস করেন। কোথাও চুলচেরা মাপজোখের একটু এদিক ওদিক হইলে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, কাজেই খুব সতর্কতা ও বিচার-বিবেচনার সঙ্গে এই কাজে অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমেই কোথায় অস্ত্র করিতে হইবে সেইটে ঠিক করিয়া লইতে হয়। ভুরুর মাঝখানকার কুঞ্চন দূর করিবার জন্য সোজাসুজি ভুরুর মধ্যে অস্ত্র করিলেই যদি চলিত তবে আর কথা থাকিত না। কিন্তু অস্ত্র করিতে হইবে কপালের দুই পাশে কানের কাছাকাছি কোনো এক জায়গায়। তারপর দুইদিকে কপালের চামড়া সাঁড়াশি দিয়া টানিয়া আঁটিয়া সেলাই করিয়া দিতে হইবে। সাঁড়াশি এবং সেলাইয়ের নামে চোখের তারা কপালে উঠিবার কোনও কারণ নাই, কেননা local anaesthetic বা বেদনাহর মালিশ ঘষিয়া সে জায়গার বেদনা-বোধকে আগেই কিছুক্ষণের জন্য দূর করিয়া লওয়া হয়। ঠিক কি পরিমাণ চামড়া ছাঁটিয়া দিলে কুঞ্চনও বেশ পরিষ্কার হইয়া সারিয়া যাইবে আবার অস্ত্রকরা চামড়াও ক্ষতটিকে ঢাকিয়া বুজাইয়া ঠিক মুখে মুখে জুড়িয়া আসিতে পারিবে সেইটেকে বেশ করিয়া হিসাব করিয়া লওয়া আর-এক হাঙ্গামা। দৈবাৎ প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী চামড়া ছাঁটিয়া ফেলিলে মুখটাকে ভয়ানক টানাটানা অস্বাভাবিক দেখিতে হয়, কম ছাঁটিলে কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আবার কুঞ্চন দেখা দিতে থাকে। ঠিক কতটুকু গভীর করিয়া অস্ত্র করিতে হইবে তাহা লইয়াও গোলযোগ কম নয়। দরকারের চেয়ে কম হইলে ক্ষতের মুখে মাংস উঁচু হইয়া থাকিবে, বেশী গভীর হইলে চামড়া সুঠাম এবং সব জায়গায় ঠিক সমান হইবে না ও ক্ষতস্থানে গর্ত্ত হইবে। ক্ষতের দুইদিকের চামড়া এক সমান ও সোজা করিয়া যদি কাটা না হয় তবে সে ক্ষত সহজে

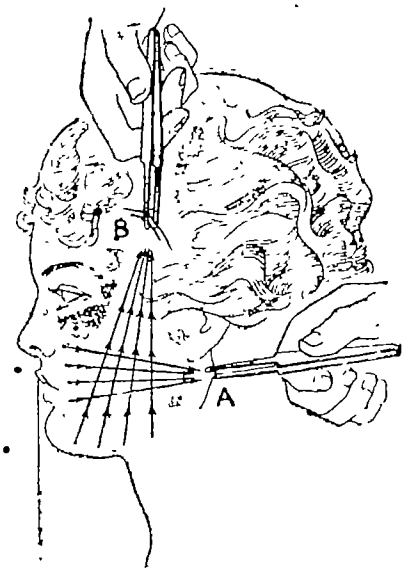

বার্দ্ধক্যের উপর অস্ত্র।

সারিবে না ও বরাবর একটি চিহ্ন থাকিয়া যাইবে। [illegible] পাতির নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা প্রভৃতি ত আছেই। [illegible] পীয়রের নাটকের ভেনিসীয় সওদাগর আণ্টোনিও নিজের [illegible] আধসের মাংস বাজি হারিয়াও শাইলককে এই মুস্কিলে ফেলিতে পাইয়াছিলেন যে তাঁর শরীর হইতে প্রতিশ্রুতি মতো ঠিক [illegible] মাংসই সে কাটিয়া লইতে পারিবে, একরতি বেশী কি কম [illegible] তার নিজের প্রাণটি মূল্য স্বরূপ তাকে দিতে হইত। যে [illegible] আধুনিক কালের এই অস্ত্রচিকিৎসকদের কেউ জীবিত থাকিলে [illegible] এ্যাণ্টোনিওর অবস্থা কি হইত বলা যায় না।

রাজদ্বার

তোমার দুয়ারে রাজা করিতেছে ভিড়
পাশাপাশি শেঠ ও ফকির,
ক্রোরপতি ছেড়ে অভিমান
হাত পেতে মাগিতেছে দান।
কারো পরাণের দায়, এসেছে আশায় বুক বেঁধে;
কেউ এসে দাঁড়ায়েছে দান নিয়ে জিতিবার ছেলে।
দুয়ারের একপাশে লুকায়ে একেলা
দ্বিধায় আমারি শুধু কেটে যায় বেলা।
আমার যে সব তাতে ভুল;
ঘুমাইয়া জাগি, জেগে আঁখি ঢুলুঢুল,
ধূলিরে আলোতে ধরি' বুঝি না কি বরণ সে ধরে,
ধরার রঙের মেলা ঐটুকু বুকটির 'পরে!
—তোমার দয়াতে রাজা নাহি ত সংশয়;
কি চাহিতে কি চাহিব, সেই মোর ভয়।
ধূলিমুঠি সোনা কর, সোনামুঠি ধূলি;
তুমি যে কি যাদুকর সে কথা কি ভুলি?
হে রাজা, ভাঁড়ারে তব কত বস্তু আছে;
কি বলে চাহিব তব কাছে?
—নাম নাহি জানা।
লোভী এ মনেরে তাই করিয়াছি মানা
কিছু চাহিবারে;
কি জানি আমানি চাহে সম্রাটের দ্বারে।
নিজেরে চিনিতে নারে, পরাজয় মানে;
চিনিবে দয়ারে তব কাজ নাই অত অভিমানে!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ

পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার কতক অংশ বর্দ্ধমানে, কতক অংশ মেদিনীপুরে, কতক অংশ মানভূমের সহিত সংযুক্ত ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। তখন ইহার নাম ছিল পশ্চিম বর্দ্ধমান। এখনও দেওয়ানী আদালতের চাপ্‌রাশিদের চাপ্‌রাশে জেলা পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান লেখা দৃষ্ট হয়। জেলার পরিমাণ-ফল ১৬২১ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১১৫৮৬৭০, পুরুষ ৫৬২৫৮৫, স্ত্রীলোক ৫৭৬০৮৫। এ জেলায় ২টি মহকুমা আছে—সদর ও বিষ্ণুপুর। সদর মহকুমার পরিমাণ-ফল ৯২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭৪৬৯১৬। বিষ্ণুপুর মহকুমার পরিমাণ-ফল ৭০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৯১৭২৪।

জেলায় পল্লীর সংখ্যা ৪৬৩৪, সদর মহকুমার ৩৪৪৩, বিষ্ণুপুর মহকুমার ১১৯১। জেলার তিনটি সহরে মিউনিসীপালিটী আছে—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী। জেলায় ২০টি থানা আছে, সদরে ১৩টি, বিষ্ণুপুরে ৭টি।

বাংলা দেশের মধ্যে বাঁকুড়াজেলা পরিমাণে চতুর্দ্দশ, লোকসংখ্যায় বিংশতি স্থান অধিকার করিয়াছে। এ জেলায় প্রতি বর্গমাইলে ৪৩৪ লোকের বাস; বঙ্গদেশে প্রতি বর্গমাইলে ঘন বসতিতে দ্বাবিংশস্থান অধিকার করিয়াছে। সদর মহকুমায় প্রতি বর্গমাইলে ৩৮৯, বিষ্ণুপুরে ৫৪০, বাঁকুড়া থানায় ৪৭৭, বিষ্ণুপুর থানায় ৪৬৩, ওন্দা থানায় ৩৬৭, গঙ্গাজলঘাটীতে ৪০৭, খাতড়া রহিপুরে ৩৭৯, রহিপুরে ৩৩১, সোনামুখীতে ৫৮২, কোতুলপুরে ৬৯২, ইন্দাসে ৬২৯ জনের বাস।

সমগ্র জেলায় বসতবাটীর সংখ্যা ২৩১৭৯৩। ৫০০ হইতে এক হাজার লোকের বাস এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৩৪৮, এক হাজার হইতে দুই হাজার লোকের বাস এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৯৮, দুই হাজার হইতে পাঁচ হাজার লোকের বাস এরূপ গ্রামের সংখ্যা ২১টি, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার লোকের বাস এরূপ গ্রামের সংখ্যা ১টি (লোক-সংখ্যা ৭৫৮৮)।

হলদিবাড়ী মিউনিসীপালিটীর জনসংখ্যা ১৩৮০। যে-সকল গ্রামের জনসংখ্যা দুই হাজারের বেশী যদি সেই-সকল স্থানে মিউনিসীপালিটী স্থাপিত হয় তবে বাঁকুড়া জেলায় আরও ২২টি মিউনিসীপালিটী হইবে।

বাংলা দেশে ১২৪টি সহরে মিউনিসীপালিটী আছে। মিউনিসীপালিটী-সংযুক্ত সহরের মধ্যে বাঁকুড়া ত্রয়োবিংশ (২৩), বিষ্ণুপুর ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩), সোনামুখী চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) স্থান অধিকার করিয়াছে।

এ জেলায় যে-সকল জাতির জনসংখ্যা বেশী তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	বঙ্গদেশে	বাঁকুড়া জেলায়
ব্রাহ্মণ	১২৫৩৮৩৮	৯৯০৮১
বাউরি	৩১৩৬৫৪	১১১৩১৩
বাগ্দী	১০১৫৭৩৮	৯৫৪৮১
গোয়ালা	৬৪৬৪৩৮	৬৭২৩৩
তিলী	৪১৯১২১	৭৫৩০২
সদ্গোপ	৫৫০০২২	৪৭৪৪৪
তাঁতি	৩২২৯৮৩	২৮৪৭৯
তাম্বূলী	৪৮৬৮৫	১৯৩৬৯
কর্ম্মকার	২৬১৯৭৫	২৩৬৭৮

ইহা ভিন্ন বহু সাঁওতালের বাস আছে; তাদের সংখ্যা দিতে পারা গেল না।

শিল্পজীবী জাতির সংখ্যা

মুচী	৪৫৫২৩৬	১২০৭০
সূত্রধর	১৭৭৪৫৩	৬২২২
কলু	১১১৫৬২	২১৯৫৮
সুবর্ণবণিক	১০৯৪২৯	৯২৩২
কুমার	৫৯০৭০৯	১১১৮৮
ডোম	১৯৭৮০৩	১৭১৩২
কাঁসারী	১৬১৪৭	৯

সেন্সাস রিপোর্টে প্রদত্ত ৭০টি জাতির অস্তিত্ব এ জেলায় নাই।

এ জেলায় ১০৩২৯৬৪ লোকের মাতৃভাষা বাংলা; ৪৬৩৯ জনের হিন্দি উর্দ্দু; ৩৪৪ জনের মেড়িয়া; ২৭০ জনের উড়িয়া; ১৫১ জনের রাজস্থানী; ৪৭ জনের গুজরাটী; ৪৬ জনের পস্তু; ৯ জনের মারাঠী; ১৮০ জনের মুণ্ডারী; ১১৩০ জনের কোড়া ভাষা।

এ জেলায় কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কত লোকের বাস।

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৪৮৮৪৪৮	৫০১৩১৩	৯৯০১৬১
মুসলমান	২৫৮৪৫	২৫৮৬২	৫১৭০৭
প্রেতপূজক	৪৭৩১৬	৪৮৪২১	৯৫৭১৭
খ্রীষ্টান	৫৩০	৪৮২	১০১২
জৈন	৬	৬	১২
ব্রাহ্ম	১	—	১

এ জেলায়	পুং	স্ত্রী	মোট
উন্মাদরোগী	২৭৩	১২০	৩৯৩
মূক বধির	৪৮৬	৪৫৬	৮৪২
অন্ধ	৬০৩	৭০৮	১৩১১
কুষ্ঠরোগী			৪৬০০

এ জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ ১টি, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ১৫টি, মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় ৩০, মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয় ১৯; প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭৫, নৈশ বিদ্যালয় ৭০, শিল্প বিদ্যালয় ৬টি; গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় ২টি।

সন ১৩২৪ সালে এ জেলায় ৩১টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল, সন ১৩২৫ সালে ১টি উঠিয়া যায়। সন ১৩২৪ সালে মধ্য ইংরেজি ও বঙ্গ বিদ্যালয়সমূহে ৬৪১৫ জন ছাত্র ছিল; সন ১৩২৫ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬১৮৬ হয় অর্থাৎ ২২৯ জন ছাত্র কম হয়। সন ১৩২৪ সালে এ জেলায় ৯৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৪০০০ ছাত্র ছিল, সন ১৩২৫ সালে ৯৭৫টি বিদ্যালয়ে ৩২৩২৪ জন ছিল, একবৎসরে ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উঠিয়া ১৬৭৬ ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পায়। সন ১৩২৪ সালে ৮২টি নৈশ বিদ্যালয়ে ১৬০৫ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করে। সন ১৩২৫ সালে ৭০টি নৈশ বিদ্যালয়ে ১৩৬২ ছাত্র ছিল, অর্থাৎ একবর্ষে ১২টি নৈশ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়, ২৪৩ জন ছাত্রও কম হয়। সন ১৩২৪ সালে ১৭১৩ জন মুসলমান ছাত্র বিদ্যালয়ে যাইত, পর বর্ষে উহাদের সংখ্যা ১২৩২ হয় অর্থাৎ ৪৮১ জন হ্রাস পায়। ২৪ সালে ৫১১৯ বালিকা বিদ্যালয়ে যাইত, ২৫ সালে উহাদের সংখ্যা ৪০২০ হয় অর্থাৎ ১০৯৯ জন কম হয়। সন ১৩২৫ সালে মোট ২৮টি বিদ্যালয় উঠিয়া যায় এবং ছাত্র সংখ্যা ২১৬৩ জন হ্রাস পায়।

এ জেলায় ২টি পাঠাগার আছে। জেলার ভিতরে ১০টি বাংলাঘর আছে। কম্বলার খনি ১টি, পিতলের কারখানা ২টি, তৈল-কল ২টি, ধান-কল ১টি, তামার কারখানা ১টি আছে। ধানকল ও তেলকলের স্বত্বাধিকারী মাড়োয়ারী। ষ্টিল ট্রাঙ্কের কারখানা ১টি, বিড়ির কারখানা ১টি আছে।

১টি মাত্র মুদ্রাযন্ত্র আছে; সংবাদপত্র "বাঁকুড়া-দর্পণ" মাসে ৪বার মাত্র বাহির হয়।

বঙ্গদেশে ১১৪৭ পুরুষ ১৪৮২ নারী ধান ভানিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাঁকুড়া জেলায় ১৬৫ পুরুষ এবং ৫৬৫ নারীর জীবিকা ধানভানা। এরূপ স্ত্রীলোকদের অধিকাংশই বিধবা।

মিউনিসীপালিটী-পরিচালিত ৩টি সহরে ৩টি এবং মফঃস্বলে ৭টি মোট ১০টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ১১৩৮৬৭ জনের মধ্যে ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ২৬২ বর্গমাইলে ১টি মাত্র দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। বাঁকুড়া জেলায় চিকিৎসকের সংখ্যা ৪৫ জন। এ জেলায়—

বিলাতী মদের দোকান	১
দেশী মদের দোকান	৭২
পচই মদের দোকান	৮১
তাড়ীর দোকান	৫
গাঁজার দোকান	২৩
সিদ্ধির ,,	১৭
আফিমের ,,	২৬
চরসের ,,	১

এ জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে ময়না ও বিহারীনাথ এই দুইটি উচ্চ পর্ব্বত।

ধান্যই এ জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মহুয়া ও হরিতকী সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে কার্পাস চাষ হইত; প্রত্যেক ঘরে ঘরে চরকা দৃষ্ট হইত; এখন আর উহার চাষ হয় না। চাল ধান, হরিতকী, মহুয়া, পিতল কাঁসার বাসন, চামড়া ও জুতা, তাঁতের পাট তসর ও সূতার কাপড় রপ্তানি হয়।

আম, বেগুন, কুল, পটল, পান, কাপড়, সূতা, তামাক, গুড়, ঘী, তৈল, ভুঁটা, সরিষা, পেয়ারা, পোস্ত, তৈয়ার কা

বিরি, অড়হর, মসুরি, লঙ্কা, লবণ, পেঁয়াজ, গম, যব, ময়দা, লোহা, রাং, তামা, পিতল, দস্তা, তামটী, সীসা, কাগজ, গাঁজা, আফিম, মদ, সিদ্ধি, চরস, ঔষধ, চা, মনোহারী ও ষ্টেশনারী দ্রব্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য আমদানি হয়।

এ জেলায় এত কাচের চুড়ি বিক্রী হয় যে একটি কাচের কারখানা বেশ চলে।

মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর, পাঁচরোল ও বাস্কী হইতে প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক টাকার পান আসে। বাঁকুড়া-জেলার লোকের পান খাইবার সাধ খুব বেশী হইলে— ইহার কোন উপকরণই এ জেলায় জন্মে না। পূর্ব্বে সোনামুখী, চন্দ্রকোণা, বাহড়ামুড়ী প্রভৃতি স্থানে বরজ ছিল, এখনও কয়েকটি বরোজ আছে। যখন রেল হয় নাই তখন এ জেলায় উৎপন্ন পানেই সঙ্কুলান হইত। মেদিনীপুর জেলা হইতে মানভূম ও রাঁচীজেলায় পান রপ্তানি হয়। এই দুই জেলার লোকও মেদিনীপুর হইতে বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকার পান খরিদ করে। এ জেলায় পানের বরোজ খুলিলে লোকসানের কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে এ জেলায় তামাকের চাষ হইত, এখন পূর্ণিয়া হইতে আমদানি হয়। বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে বাঁকুড়াবাসী ধূমপানের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে। পূর্ণিয়া হইতে তামাক, বালিয়া হইতে গুড়; রাণীগঞ্জ, ঝান্দো, চক্রধরপুর, নাগপুর, গণ্ডিয়া হইতে হাজার হাজার টাকার বিড়ি বাঁকুড়া জেলায় আসিতেছে।

বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীরা এ জেলার বাহিরে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া যত টাকা পায় তাহার প্রায় চারিগুণ টাকা দিয়া বাহির হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া আনে। এ জেলাবাসীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। এই জন্যই এ জেলায় দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হইয়াছে।

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি এ জেলায় জন্মাইতে পারা যায় তবে আবার সুদিন আসিবে। অন্য স্থান হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ২০ হাজার টাকার আম, ১০০০০ হাজার টাকার পটল এবং প্রায় ৩০০০০ হাজার টাকার অন্যান্য শাক সব্জি আমদানি হয়; চেষ্টা করিলে বাঁকুড়া জেলায় এই-সকল দ্রব্য জন্মাইতে পারা যায়। আমাদের রোগীর পথ্য আদাও পাটনা হইতে আসে, পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থের উঠানে আদা জন্মিত। এ জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তরকারি উৎপন্ন হইলে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে বিক্রয় করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা ঝরিয়া ও আসানসোলে বিক্রী হইবে।

রেল আসিবার পূর্ব্বে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সোনামুখী ও রাজগ্রামের সকল-প্রকার ব্যবসাই বাঙ্গালীর হাতে ছিল, ২।১ জন মাড়য়ারী ব্যবসাদারও ছিল; কিন্তু রেল আসিবার পরেই মাড়য়ারী আসিয়া এজেলার সকল ব্যবসাই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, এখন বাঙ্গালী দোকানদারগণ মাড়য়ারীদের করতলগত। ইহারা আবার পল্লীতে পল্লীতেও দোকান খুলিয়াছে। রেল হওয়ায় বাঁকুড়াবাসী লাভবান হইতে পারে নাই, বাহিরের লোক তাহাদের ঘরের টাকা লইয়া যাওয়ায় তাহারা ক্রমেই দরিদ্র হইতেছে। যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে এ জেলায় আমদানী হইত না, এখন রেলের কল্যাণে তাহা অবাধে আসিতেছে।

এ জেলার জমীদারগণ অন্য জেলার অধিবাসী। তাঁহারা বর্ষে বর্ষে এ জেলা হইতে আপনাদের প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া লন। প্রত্যক্ষভাবে প্রজার সহিত তাঁহাদের কোন পরিচয় নাই। এজেলার সুখে দুঃখে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন, জেলার কোন-প্রকার হিতকর কাজের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিষ্ণুপুর ও বারহাজারী পরগণার মালিক, এই দুই পরগণার পরিমাণ ৮৪২৮৬ একার। ভাগলপুরের উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের পুত্রগণ অম্বিকা-নগর ও শ্যামসুন্দরপুর ও রাইপুর পরগণার জমীদার। মানভূম কাশীপুরের রাজা মাইশরা পরগণার ভূস্বামী। প্রায় বার আনা জমীর মালিক অন্য জেলার লোক।

১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭, ১৯০৮, ১৯১৫—১৬, ১৯১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সামান্য অনাবৃষ্টির জন্য কোন কোন থানায় অন্নকষ্টও হইয়াছিল।

এজেলায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমীতে চাষ হয়। শতকরা ৮৩ ভাগ জমীতে হৈমন্তিক ধান্য এবং ১৭ ভাগ জমীতে আশু ধান্য জন্মে। সদর মহকুমার পশ্চিমাংশ

এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জঙ্গল ও কঙ্করময়।

এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন কৃষি-জীবী, ৫ জন সহরবাসী। অধিবাসীদের শতকরা দশ জন মজুরীর জন্য বর্দ্ধমান হুগলী মেদিনীপুর হাওড়া ও ২৪ পরগণায় যায়। ১৯১৮-১৯ খৃঃ এ জেলা হইতে ৭০১ জন মজুর আসামের চা-বাগানে গিয়াছে। প্রতি বৎসর এই পরিমাণ মজুর আসামের চা-বাগানে যায়।

সন ১৯১৮-১৯ সালে বাঁকুড়া ও মানভূম উভয় জেলাতেই দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু মানভূম জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে লাক্ষা জন্মে, সৌভাগ্যক্রমে গত বৎসরে লাক্ষার দরও খুব বেশী হয়। এক মণ লাক্ষার মূল্য ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এজন্য গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসেই মানভূম জেলার ব্যক্তিগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। গত দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা অন্নাভাবে অস্থির হইয়া গৃহের কাঁসা-পিত্তলের বাসন বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। গত বৈশাখে তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় তাহারা গৃহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। লাক্ষা যদি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয় তবে মানভূম জেলায় আবাদ না হইলেও দুর্ভিক্ষ হইবে না। বাঁকুড়াবাসীর অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—এই তিন মাসে সুচারুরূপে বৃষ্টি হইলেও যদি দৈবক্রমে আশ্বিন মাসে বারিপাত না হয় তাহা হইলে চারি আনা ফসলও পাওয়া যায় না, এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই এজেলায় অন্নকষ্ট অনুভূত হয়। মানভূমবাসীর পূর্ব্বাবস্থা দেখা দিয়াছে, কিন্তু বাঁকুড়াবাসী এখনও গত দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা মহাজন ও গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্জ্জ লইয়াছিল তাহারা এখনও পরিশোধ করিতে পারে নাই। যাহারা কাঁসা-পিত্তলের বাসন ও অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াছিল তাহারা এখনও তাহা খরিদ করিতে পারে নাই। এখনও বাঁকুড়া জেলার পল্লীতে উলঙ্গ ও অর্দ্ধ-উলঙ্গ নর নারী নয়নগোচর হইবে।

পূর্ব্বে এ জেলায় গো-ব্যবসা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজগ্রাম গো-ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল। এখন মানভূম ও বাঁচী জেলা লাক্ষার প্রধান বাণিজ্যদ্বার। পাট [illegible] বাংলার একচেটিয়া সম্পত্তি তেমনি লাক্ষায় ভারতবর্ষের একচেটিয়া সম্পত্তি। বৎসরে প্রায় তিন কোটি টাকার লাক্ষা ভারতের বাহিরে রপ্তানি হয়। বাঁকুড়া জেলা হইতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীকে তাড়াইতে হইলে সকলকে লাক্ষা চাষ প্রচলন করিতে হইবে। এই চাষে আবাদের খরচ আবশ্যক হয় না। পলাশ, কুল ও কুসুম [illegible] জন্মে।

বাঁকুড়া জেলার উন্নতির জন্য কি কি চাই—

১। কৃষি বিদ্যালয়, ২। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসালয়, ৩। মেডিক্যাল স্কুল, ৪। সার্ভে স্কুল, ৫। ব্যাঙ্ক, ৬ [illegible] সমিতির বিস্তার, ৭। গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা [illegible], ৮। সুপেয় জলের ব্যবস্থা, ৯। কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় [illegible] বন্দোবস্ত, ১০। পানের বরোজের সংখ্যা বৃদ্ধি, [illegible] চাষ, ১২। আমগাছ রোপণ, ১৩। অনাথ আশ্রম [illegible] বিধবা আশ্রম, ১৫। কুষ্ঠাশ্রম, ১৬। ধুমপান নিবারণ, ১৭। সালিসী বিচার, ১৮। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত [illegible] সৌহার্দ্দ স্থাপন, ১৯। শিল্প বিদ্যালয়, ২০। [illegible] স্পষ্টবাদী নির্ভীক লোক, ২১। প্রত্যেক [illegible] একটি হিসাবে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ২২। প্রত্যেক [illegible] একটি করিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, ২৩। [illegible] বিদ্যালয়, ২৪। বাণিজ্য বিদ্যালয় Commerce [illegible] ২৫। প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া দাতব্য [illegible], ২৬। কৃষক সমবায় সমিতি করিয়া দেশের কৃষক দেশের সমস্ত জমীর মালিক হইবে, বাহিরে [illegible] কাহারের অধীন কেহ থাকিবে না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible]

অভিশাপ

ছোটরে করিয়া ঘৃণা করেছ যে তা'
তোমারে করেছে নীচ তারি অভিশাপ
তাদেরে না কর যদি তুচ্ছ ঘৃণা দান
ঘুচিবে না কভু তব নীচ অপমান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র [illegible]

মূলার চাষ

প্রবাদ আছে "শতেক চাষে মূলো"। আমাদের দেশের অনেকেরাও 'শতেক চাষ' না হৌক মূলার জমিতে অনেক চাষ দিয়া থাকে। কিন্তু আমি বিনা চাষে মূলার আবাদ করিয়া 'শতেক চাষ' অপেক্ষা অতি অল্প আয়াসে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

আবাদ-প্রণালী—যে জমিতে মূলা করিতে হইবে প্রথমে তাহার সমস্ত ঘাস প্রভৃতি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে ঐ জমিতে এক হাত বা পাঁচপোয়া অন্তর এক-একটি এক ফুট গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহা গোবর-সার ও মাটী দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রত্যেক গর্ত্তে পাশাপাশি ২টা করিয়া মূলার বীজ বপন করিতে হইবে। বপনের পর তাহাতে জল সেচন করিয়া এক-একটি ছোট পাতা দিয়া ঢাকিয়া দিলে ৪।৫ দিন পরে সমস্ত গাছ বাহির হইবে। তখন দুদিন অন্তর জলসেচন করিতে হইবে। এইরূপে গাছগুলি যখন ৮।১০ আঙ্গুল উচ্চ হইবে তখন তাহার গোড়া খুঁড়িয়া আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে। তাহার পর ১৫ দিন অন্তর একবার করিয়া জল সেচন করিতে হইবে। তাহা হইলেই যথাসময়ে বৃহৎ বৃহৎ মূলা জন্মিবে এবং সেগুলি বাজারে প্রত্যেকটি ১০ পয়সা হিসাবে বিক্রয় হইতে পারে। খালি মূলা বলিয়া নয়,—বেগুন, কপি, শালগম প্রভৃতি যাবতীয় দেশী ও বিলাতী সব্জী ঐরূপে চাষ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীইন্দুমোহন ভট্টাচার্য্য।

ব্রহ্মের স্বরূপ

(ইহুদী কবিতা)

তারা ভুল ক'রে গড়িছে মূর্ত্তি
প্রস্তরে আর হেমে,
তোমার স্বরূপ লভিছে স্ফূর্ত্তি
ভক্তপ্রাণেরি প্রেমে।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

নানাসাহেব ও কানপুর হত্যাকাণ্ড

আমাদের ইতিহাসে সাধারণতঃ লিখিত হইয়াছে নানাসাহেব কানপুরস্থ ইংরেজদের অবরোধ করিয়া অবশেষে তাঁহাদের নৌকাযোগে এলাহাবাদ পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করেন কিন্তু তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিবামাত্র নানা বিশ্বাস-ঘাতকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গুলি বর্ষণ করেন ও তাহাতে তাঁহারা সকলে প্রাণত্যাগ করেন। ১২৫ জন নারী ও শিশু নানাসাহেবের বন্দী হন্ ও জেনারেল হ্যাভ্-লকের সৈন্য আগমন করিলে নানাসাহেব তাঁহাদের বধ করিয়া পলায়ন করেন।

এই ব্যাপার সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। Mrs. Hortestet নামের কোন মহিলা এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী এবং গত ভারতবিদ্রোহে ইংরেজদের নির্য্যাতন সম্বন্ধে তিনি একখানি ফরাসী পুস্তক রচনা করেন। সেই ফরাসী পুস্তকের ফার্সী অনুবাদ হইয়াছে, অনূদিত ফার্সী গ্রন্থখানির নাম "খানুম-ই-ইংলিসি দার বালওয়াই হিন্দ" (Khanum-i-Inglisi-dar Balwi-Hind)। এই ইংরেজ মহিলা ভারতীয়দের প্রতি দারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞা দেখাইয়াছেন, সুতরাং তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা ত সত্যই, বরং অতিরঞ্জিত সত্য। এই গ্রন্থের একস্থানে তিনি বলিতেছেন :—

"নানাসাহেব ২০ দিন ধরিয়া আমাদের অবরোধ করিলেন। আমাদের দুর্গে (garrison) খাদ্য কমিয়া আসিতেছিল। জেনারেল আহত হইয়া হস্পিটালে পড়িয়া ছিলেন। এমন সময় ভারতীয়গণ আমাদের আক্রমণ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সন্ধি করিলেন। নানাসাহেব আমাদের নিরাপদে এলাহাবাদে পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। * * * হস্পিটাল হইতে বাহির হইয়া আমি আমার ছেলেদের লইয়া এক গাড়ীতে উঠিলাম। নদীর ধারে আমাদের জন্য অনেকগুলি বোট প্রস্তুত ছিল। গাড়ী নিরাপদে নদীর তীরে পৌঁছাইলে আমি আমার সন্তানদের সহিত এক বোটে উঠিলাম ও বিপদ হইতে মুক্ত জানিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। নিরাপদ

বোধ করিয়াছিলাম, কেননা জলের ব্যবধান থাকাতে গোঁয়ার (contumacious) ভারতীয়গণ আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

"কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলাম বোটগুলির উপর ভীষণ গোলাবৃষ্টি হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে বিনষ্ট হইল। আমাদের নৌকাতে দুই একটি গোলা আসিয়া পড়িল। আমরা ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ আমাদের নৌকা ডুবোডুবো হইল। কিন্তু কি জানি কার দয়ায় পরক্ষণেই একটা বাতাস আসিল ও তাহার বেগে নৌকা নিমজ্জন হইতে রক্ষা পাইয়া তীরের দিকে চালিত হইল। নৌকা তীরে পৌঁছিল; আমার ছেলে ও মেয়ে, আমি এবং অন্যান্য সকলে ডাঙায় অবতরণ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হইতেছিল, এইবার বুঝি রক্তপিপাসু বিদ্রোহীরা আমাদের আক্রমণ করিবে ও গলা কাটিয়া দিবে। আমার এত ভয় হইতেছিল যে আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম।

"এই অবসরে নানাসাহেব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আরো কয়েকজন অনুচরের সহিত তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে সকলে কোষমধ্যে তরবারি রাখিয়া দিল। আমাদের বন্দী করিয়া নানাসাহেব সহরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ দুইই ছিল, আমরা মোট ১০৮ জন ছিলাম। নানাসাহেব আমাদের এক অট্টালিকায় রাখিলেন ও আমাদের আরামের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের বন্দীশালা হইতে বাহির হইতে দিতেন না।

"সেই আমি সর্ব্বপ্রথম এই লোকটিকে দেখিলাম। লোকে যা বলে বলুক, আমি বরাবর বলিব, কানপুর হত্যাকাণ্ডের জন্য নানাসাহেব আদৌ দোষী নন। তিনি ৩০ বছর আন্দাজের যুবা ছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সাদাসিধা ও স্বভাব খুব ভাল ছিল। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি বিদ্রোহীরা যদি নানাসাহেবের কথা শুনিত তাহা হইলে সে ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিত না।

"বিদ্রোহীরা যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল তাহার কারণ এই—যখন জেনারেল হ্যাভ্‌লক (General Havelock) জেনারেল হুইলারের (General Wheeler) সাহায্যার্থ কানপুরে আসিলেন এবং যে সময় আমরা এলাহাবাদ যাইবার জন্য বোটে চড়িলাম, সেই সময় হঠাৎ [illegible] মধ্যে যে বারুদখানা ছিল তাহাতে আগুন ধরিয়া [illegible] ভারতীয়রা মনে করিল, এক দল ইংরেজ যুদ্ধ চালাইবার মৎলবে জেনারেল হ্যাভ্‌লকের প্রতীক্ষায় সেখানে [illegible] আছে। এই কারণে আমাদের সকলকে বধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু জীবিতদের মধ্যে যাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইল, নানাসাহেব তাহাদের প্রাণ লন নাই।

"পনেরো দিন আমরা নানাসাহেবের তত্ত্বাবধানে রহিলাম। আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু নানাসাহেব বাহিরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক রাখিতে বারণ করা সত্ত্বেও কয়েকটি ইংরেজ স্ত্রীলোক চপল প্রকৃতি দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, চরেরা পাথরের সহিত চিঠি বাঁধিয়া দুর্গমধ্যে ফেলিতে লাগিল। তাহার একটি পড়িয়া আমরা জানিতে পারিলাম, ইংরেজরা নানাসাহেবের সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছে এবং বিদ্রোহী সিপাহীরা নগর ছাড়িয়া (evacuate) পলায়ন করিবে।"

"পরের দিন ভীষণ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। বোধ হইল, কোথাও ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে নানাসাহেবের নিকট হইতে একজন অফিসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যে চারিজন ইংরেজ স্ত্রীলোক বাহিরের লোকের সহিত পত্রব্যবহার করিয়াছিল, নানা তাহাদের ধরিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাদের ধরিয়া কাটিয়া ফেলা হইল। তার পরে সহরের লোকেরা আমাদের আক্রমণ করিল। এক মুসলমান ঘাতকের হস্তে একজন ইংরেজ মহিলা সর্ব্বপ্রথম প্রাণ দিল। তাহার পর আরম্ভ হইল অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার সহিত ভীষণ হত্যাকাণ্ড আর খুন।"

ঐতিহাসিকগণ ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কি? এখনও কি নানাসাহেব miscreant butcher বা বদমায়েস হত্যাকারী নামে অভিহিত হইবেন?

অরুণ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

শুভা—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হারিসন রোড, কলিকাতা। ২৭৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। দাম লেখা নাই।

একখানি উপন্যাস। সমাজে নারীসমস্যা কত জটিল ও বিরূপ অন্ধ কুসংস্কারের উপর নারীর অবস্থার প্রতিষ্ঠা তাই দেখানো এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। লেখক তাঁর নায়িকা শুভাকে দিয়া অনেক সমস্যা ভাবাইয়াছেন; তার সার মর্ম্ম এই—"কেন, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলে না?.....আশ্রয় যদি চাও, যদি পুরুষকে ছাড়া তোমার না চলে, তবে সে আশ্রয়ের দাম দিতে হইবে। সবাই সমান দাম চায় না, এক রকম দামও চায় না, কেউ কম, কেউ বেশী; কিন্তু দাম চাই—সে দাম পরাধীনতা, প্রভুত্ব স্বীকার, নিজের আত্মার স্বতন্ত্রতা অস্বীকার। এই না স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মূল কথা। নারী মনে করে সে দীনা ক্ষীণা অবলা, তাই না পুরুষের এই আধিপত্য!" (৯০ পৃষ্ঠা) যে নারী অত্যাচারী পুরুষের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে চায়, আমাদের দেশে তার নিজের পায়ে দাঁড়াইবার মতন শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই ক্ষেত্র নাই। তাই শুভা স্বামীর অত্যাচার হইতে পলায়ন করিয়া সমাজে পতিতা হইয়াছিল; কিন্তু সেই স্বামী পাহাড়িয়া মৈলীকে ঘরণী করিয়া সমাজে আপনাকে পতিত মনে করে নাই। এমনি সব বিপরীত অবস্থার সংঘাতে ও সমাবেশে প্রচুর ঘটনা-পরম্পরায় প্লট ঘনাইয়া ঘোরালো হইয়া প্রবলবেগে বহিয়া চলিয়াছে; প্লটের দুর্নিবার বেগ ও ঘূর্ণাবর্ত্ত ভিতরকার সামান্য সামান্য ত্রুটি পাঠকের মনের সাম্নে ভিত্তিতে চায় না, নতুবা মাদার ক্রিশ্চানের সঙ্গে অথবা সুরেশ-বাবুর সঙ্গে শুভার তত্ত্ব-মীমাংসার তর্ক অসহ্য হইয়া উঠিত—এই দোষটিই বইএর মধ্যে প্রধান, আর্টিষ্টিক সৌষ্ঠবের হানি করিয়াছে। বইএর সব কটি নরনারীর চরিত্র চমৎকার অঙ্কিত হইয়াছে—এক শুভার স্বামী ছাড়া। সকল চরিত্রগুলি দোষে-গুণে-জড়িত এক-একটি জ্যান্ত মানুষ; তার জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে। গণিকা বলিয়া গণ্য সাধ্বী চাঁপার ধর্ম্মানুরাগ, স্নেহ ও সেবাপরায়ণতা, স্বামীপ্রীতি মনকে সম্ভ্রমে করে; থিয়েটারের নট সুরেশবাবুর শান্ত সংযত চরিত্র ও শুভার প্রতি প্রকাশহীন প্রবল ভালবাসা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; বহুভর্তৃকা মৈলীর বর্ত্তমান ভর্ত্তার প্রতি প্রণয়-নিষ্ঠা ও তার আত্ম-সম্মানবোধ দেখিয়া তাকে ঘৃণা করা দুঃসাধ্য; দুশ্চরিত্র নগেন স্ত্রী বর্ত্তমানেও শুভার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু তার মনের দাঁড়িপাল্লা সমান রাখিবার চেষ্টায় সে প্রমাণ করিয়াছে যে সে অমানুষ নহে; নগেন্দ্রের স্ত্রী চপলা স্বামীর প্রণয়িনী বলিয়া শুভার প্রতিক্ষণে অনুরাগিণী ও ক্ষণে ঈর্ষাকুল হইয়া মানবচিত্তের এক সত্যদিকের পরিচয় দিয়াছে; নগেন্দ্রের দাদা সত্যেন-বাবু শুভাকে চাবুক মারিয়া পথে বাহির করিতেও পারিয়াছিল, আবার পরক্ষণেই অনুতপ্তও হইয়াছিল, বহু দুর্ভোগের পরও সে সমস্ত লাঞ্ছনা নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান করিয়া শুভার কাছে ক্ষমা চাহিতেও পারিয়াছিল; এমন কি শুভার হতভাগা স্বামীটাও শেষের দিকে এক কথায় আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে—

"একদিন মৈলী বলিল—তুমি আমার সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য কি লজ্জিত বোধ কর?

* * * *

".....আমি যদি লজ্জাবোধ করি তবে তো আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি যে মানুষ হয়েছি সে তো একরকম তোমারি গুণে।

"এ কথা বুক ফুলিয়ে দশজনের কাছে বল্‌তে পার—সে সাহস তোমার আছে?

"না থাক্‌লে আমি মানুষ নই।"

এমনি দুর্দ্দম সাহসের সঙ্গে সমস্ত বইখানি লেখা। এতে ভাবিবার বিষয় ও সমস্যা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে আছে। এই জিনিষটি নারী-সমস্যার সমাধান করা সমাজের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য; অতএব এই পুস্তক চিন্তাশীল নরনারীর পড়া উচিত। শুভা যখন কোনো এক জায়গায় পা স্থির রাখিয়া দাঁড়াইতে চাহিল, তখন তার মন ও আত্মা ও দেহ যে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজে আশ্রয় না পাইয়া ক্রিশ্চান ধর্ম্মের আশ্রয় লইল এইটাই এ বইএর সর্ব্ববৃহৎ ট্র্যাজেডি—আমাকে এই ব্যাপারটাই সব চেয়ে পীড়া দিয়াছে। মাদার ক্রীশ্চানের মতন পুতশীলা উন্নতহৃদয়া স্নেহময়ী মহিলা আমাদের এই হিন্দুসমাজে কেন সচরাচর চোখে পড়ে না এই ক্ষোভই আমার কাছে অত্যন্ত প্রবল বোধ হইয়াছে। গ্রন্থকার শুভাকে দিয়া যে নাটক রচনা করাইয়াছেন, তার নাম দিয়াছেন "ময়ী"। এই বইখানিরও নাম দেওয়া যায় "ময়ী"। একজন লোক যে একই জীবনে—একই জীবনে শুধু কেন, একই কালে এক সঙ্গে—দুজন লোককে ভালোবাসিতে পারে তাহা দেখানোই এই বইএর অন্যতম সাহসিক উদ্দেশ্য। এই দ্বৈতভাব বইএর সকল পাত্রপাত্রীর চরিত্রে দেখা যায়।

আজকাল যে-সব উপন্যাস বাহির হইতেছে তার মধ্যে শুভা নিঃসন্দেহ একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—নিখুঁত হইত যদি দীর্ঘ তর্ক বক্তৃতাগুলি না থাকিত; সমস্যামূলক রচনায় ইহা এড়ানো দুষ্কর, তবু আর্ট চায় না এমন বেখাপ্পা তর্ক। এই ত্রুটিটা গ্রন্থকারের সব বইতেই দেখিতেছি—তিনি সাবধান হইবেন আশা করি।

বাদশাহী গল্প—শ্রীবামনদাস মজুমদার প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটী, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৪৬ পৃষ্ঠা। ছবি আছে। বারো আনা।

আরব্য উপন্যাসের অসংখ্য গল্পের ভিতর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সাতটি বিভিন্ন রসের গল্প গ্রন্থকার নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন। এতে আছে—জেলে ও দৈত্যের গল্প, আবুহোসেনের গল্প, আলাদীনের প্রদীপের গল্প, সিন্ধবাদ নাবিকের সাতবার সমুদ্রযাত্রার গল্প, রাজার ভাঁড়ের গল্প, চাররঙা মাছের গল্প, আর আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যুর গল্প। গল্পগুলি আরব্য উপন্যাসের গল্পের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও typical। এই কয়েকটি গল্প একত্র বাছিয়া লেখক উত্তম কাজ করিয়াছেন। ছবিগুলি বিলাতী বই হইতে নেওয়া, উৎকৃষ্ট।

রসকরা—শ্রীসলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭৪ পৃষ্ঠা। ছবিওয়ালা। আট আনা।

উপকথার বই। দশটি গল্প আছে। (১) বোল্‌তা ও মৌমাছি, (২) শুকপক্ষী, (৩) বাহাদুর বিড়াল, (৪) বিড়াল বেচে বড়মানুষ, (৫) ঘুঁটেকুড়ুনী রাজরাণী, (৬) মা দুর্গার নামে চিঠি, (৭) আমরা পাঁচটি, (৮) শাদা কথা, (৯) কুঁজোর কীর্ত্তি, (১০) তিন কুড়ে। গল্পগুলি বিদেশী গল্প দেশী ছাঁচে দেশী রকম করিয়া গড়া হইয়াছে। গড়ন পরিপাটি হইয়াছে। গল্প বলার ভাষায় ও ভঙ্গীতে দেশের রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া গল্পগুলি লেখা হইয়াছে বলিয়া এর মধ্যে অনুবাদের বা ধারকর্জ্জের আড়ষ্টতা বা সঙ্কোচ নাই। গল্পগুলি ছোট ছেলেদের যেমন বয়স্কদেরও তেমনি তৃপ্তিপ্রদ—বাস্তবিকই এগুলি রসকরা। শুকপক্ষীর গল্পটির মধ্যে চিন্তা করিবার বিশেষ খোরাক আছে। মা-দুর্গার নামে চিঠির মধ্যে শিশুর সরল বিশ্বাস

ও তার অন্তর্নিহিত বেদনাটুকু পাঠকের মনকে আনন্দ-দুঃখ-মেশানো রসে আপ্লুত করিয়া তোলে। অন্যান্য গল্পগুলিও উপভোগ্য। প্রথম ও শেষ গল্প পদ্যে লেখা।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ৩০ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২০০+১৸৶০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা। ৬ খানি ছবি আছে; তার একখানি রঙিন। কাপড়ে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে ২৯ জন ভিন্ন ভিন্ন খ্যাতনামা লোকের ধারণা সংগ্রহ করিয়া একত্র করা হইয়াছে। এতে রামেন্দ্রসুন্দরের সুন্দর চরিত্রের বিচিত্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। একটা জিনিসকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখিতে হইলে তার চারিদিক হইতে দেখিতে হয়; রামেন্দ্রসুন্দরকে নানাজনে কত রকমে জানিয়াছেন এবং সেই সমস্ত জানার সংশ্লিষ্ট হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞান বিদ্যা বিনয় সৌজন্য মহত্ত্ব নিষ্ঠা মাধুর্য্য—চরিত্রের সব দিক সুস্পষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ রামেন্দ্রসুন্দরের চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই জীবনকথা অভিনব; এর জন্য সম্পাদক নলিনীবাবুর উদ্‌যোগ ও আইডিয়া প্রশংসার যোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গসাহিত্য তথা বঙ্গসাহিত্যপরিষদের একজন প্রধান পোষক ছিলেন; তাঁর জীবনকথা ও চরিত্রপরিচয়ের সমাদর ও সম্মান দেশে হইবে।

মুদ্রারাক্ষস।

একটা-কিছু—শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি-এ, প্রণীত। লাল রংয়ের কাপড়ে বাঁধান। পৃঃ ৷৵+১০৮ মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকখানিতে চারিটি ছোট গল্প আছে মুখপত্রে স্বয়ং গ্রন্থকারের একখানি প্রতিকৃতি। গ্রন্থকার পুস্তকের প্রারম্ভে তাঁহার "লেখকের নিবেদন" লিখিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন, "আজকালকার সমালোচনার মূল্য কত তা আমি জানি—কোন স্থান পুস্তক পাঠ না করেই দুই তিন পাতা সমালোচনা লিখিতে হয়, স্থল বিশেষেও কলা মূলো আম সন্দেশ দিয়ে সমালোচনা বের করান হয়, অধিকাংশ স্থলেই সমালোচক নিজের বিদ্যা সাম্প্রদায়িক মতের সহিত অমিল দেখ্‌লেই নানারূপ কদর্য্য সমালোচনা করতে গিয়ে অন্যায় অধিকার নিয়ে বসেন।" এ ক্ষেত্রে সমালোচকের নীরব থাকাই ভাল।

জহুরী।

বাদশা পির—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবাদলচন্দ্র মজুমদার, ২৩ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃষ্ঠা ২৮০।

একখানি উপন্যাস। ইহাতে সব আছে—নায়কনায়িকার প্রেম, জমিদারের দুশ্চরিত্র পুত্র, মেয়েচুরি, ছুরিকাঘাত, গোয়েন্দাগিরি; কিছুই বাদ যায় নাই। বাংলার পাঠক-সমাজ যদি দেশের এই অবস্থার মধ্যে এই-সব অসার পুস্তক পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিতান্ত দুরবস্থা বলিতে হইবে। বইটিতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। চরিত্র প্লট সবই সেই একঘেয়ে ধরণের। তাহা ছাড়া স্থানে স্থানে রসিকতার উৎকট চেষ্টা নেকামিতে পরিণত হইয়াছে এবং বহুস্থলে তাহা সুরুচির গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। অথচ লেখকের যে লিখিবার ক্ষমতা আছে তাহা এই আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়। তিনি বাজে জিনিসে হাত না দিয়া ভাল কিছু লিখিবার চেষ্টা করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

লায়লী—কলিম উদ্দিন আহম্মদ, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক মহম্মদ হাবিবর রহমান, বগুড়া বাজার, বগুড়া। দাম ১ পৃষ্ঠা ১৯৯।

একখানি উপন্যাস। প্লটে কোন বিশেষত্ব নাই। [illegible] নায়ক-নায়িকা সেই সনাতন প্রথামত বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া [illegible] পৌঁছিয়াছে। লেখক গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় যে নায়িকাহত্যাটি [illegible], তাহা না করিলেও পারিতেন। মানুষের প্রাণগুলা বোধ [illegible] ছেলেখেলার সামগ্রী নয়। ইহা ছাড়া, বাল্যবিবাহ, অ[illegible] সুদ আদায় প্রভৃতি নানা বিষয়ের তর্ক বইখানিতে উত্থাপিত [illegible]। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয় নাই। তবে [illegible] হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন [illegible] বাস্তবিকই উপভোগ্য। লেখকের রুচি সুন্দর; ভাষাও [illegible] ঝর্‌ঝরে।

আসুর-বানি-পাল—শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী [illegible] প্রকাশক কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা। দাম এক টাকা। [illegible]

বইখানি কবি বায়রনের 'Sardanapalus' পুস্তকের [illegible] বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের বিভাগ বড়ই দীন। এজন্য [illegible] পুস্তকের অনুবাদ মাত্রেই আদরণীয়। এই অনুবাদটি [illegible] পুস্তকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। অনুবাদ দুর্বোধ্য বা [illegible] নাই, সুবোধ্য ও সরল হইয়াছে। স্থানে স্থানে লেখকের [illegible] আপনার স্বাভাবিক গতিতে ছুটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়, অনুবাদটি একটু দ্রুত হইয়াছে। গ্রন্থকার আর-একটু [illegible] লিখিলে বইটি আরো চমৎকার হইত। গ্রন্থকারের ভাষা [illegible] আড়ম্বরহীন। বইটির ছাপা ও বাঁধানো ভাল।

অহিংস অ-সহযোগ সিরিজ প্রথম পুস্তিকা—প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৩৩।১ বেনিয়াটোলা [illegible] কলিকাতা। মূল্য দশ পয়সা।

যে মহাত্মা গান্ধীর সত্যসঙ্ক চরিত্রের মাহাত্ম্যে ও [illegible] বোধের অত্যুগ্র প্রেরণায় সারা ভারতবর্ষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাঁর লেখা ও বক্তৃতাকে বাংলা ভাষায় স্থান দিয়া লেখক [illegible] কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এইখানি প্রথম পুস্তিকা [illegible] পর্য্যায়ের আরো পুস্তিকা বাহির হইবে। বইখানির [illegible] জায়গায় জায়গায় অনুবাদের ভাষা একটু আড়ষ্ট হইয়াছে; [illegible] আগেকার ভাষা সরল। গ্রন্থকারের প্রবন্ধটিও সুচিন্তিত। [illegible] গ্রন্থকারের সহিতই বলি—"এই পুস্তিকার বিপুল প্রচারকার্য্যে [illegible] সাধারণের সাহায্য বাঞ্ছনীয়।"

কৃষি-বিস্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান এম্ ধর, ৪৯।২এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক আনা।

কৃষি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা। সংক্ষেপে কৃষির সু-ব্যবস্থা [illegible] জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে আছে। বইটি গ্রন্থকারের বিশেষ [illegible] অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

বাঁচিবার পথ—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান এম্ ধর, ৪৯।২এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই পয়সা।

অল্প আয়াসে ও ব্যয়ে লোককে সাধারণভাবে কিরূপে শিক্ষিত [illegible] যাইতে পারে ইহাতে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। [illegible] যে-সব উপায় ও পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সু-চিন্তিত [illegible] অনায়াসলভ্য। এরূপ পুস্তিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কোথায়—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশক মিত্র [illegible] মুর্শিদাবাদ। দামের উল্লেখ নাই।

একখানি কবিতার বই। পত্নীবিয়োগকাতর গ্রন্থকারের শোকোচ্ছ্বাস। কবিতায় প্রায় সকলগুলিই ভাল। কবিতাগুলির মধ্য দিয়া শোকের একটি সরল স্বাভাবিক অনাড়ম্বর প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

মুরলী—শ্রীসারদাপ্রসাদ ঠাকুর। প্রকাশক জে এন বসু। ২৯, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

গানের বই। কয়েকটি গান মন্দ নয়; কয়েকটি কেমন এক-ঘেয়ে;—নূতনত্ব নাই।

—গুপ্ত।

দূরের মিলন

১

মিলন হ'ল ভালো!
কাছের পাওয়া পাইনি কেহ, পরশ হরষ পায়নি দেহ;
কেমন ক'রে, এমন ক'রে প্রাণ তবু জুড়ালো?
পিয়াসা পুরালো?

২

দুজনে দুই তীরে।
বিজন ঘাটে নেইকো ভেলা, বন্ধ খেয়া সন্ধ্যেবেলা,
নেইকো সেতু-বন্ধ নদীর অধীর উজান নীরে!
সাঁতার জানিনি রে!

৩

ছিলাম দূরে-দূরে।
কেউ কাহারো একটি কথা, শুনতে মোটেই পাইনি তথা,
উতল নদীর করতালির উছল চল সুরে
আকাশ ছিল পূরে!

৪

মিলন হ'ল ভালো!—
চারটি চোখের নিচুপ চাওয়া, মিটালো সব চাওয়া পাওয়া,
দুইটি মুখের নীরব-হাসি জ্বাল্‌ল প্রেমের আলো!
হর্‌ল হিয়ার কালো!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

আলোচনা

ঈশ্বরভক্তদের কাছে ত্রুটি স্বীকার।

মহাত্মা গান্ধীর বর্ত্তমান "Non-co-operation" আন্দোলন প্রসঙ্গে (সম্ভবত) ১৩২৭ সালের পৌষের প্রবাসীতে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য দিয়াছিলাম তাহা পাঠে আমার জন-কএক শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় ব্যক্তি মর্ম্মাহত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া আমি এই পত্র দ্বারা ঈশ্বরবিশ্বাসীদিগের নিকট বিনীতভাবে আমার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আমি ঈশ্বরভক্ত না হইলেও ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নহি। আমার উক্ত পত্রে ঐরূপ মন্তব্য দ্বারা আমি ঈশ্বর-ভক্তদিগকে আঘাত করিয়াছি—এরূপ ধারণা যেন কেহ পোষণ না করেন; যেহেতু আমি ঐরূপে কাহাকেও আঘাত দেওয়া উচিত মনে করি না। সাময়িক উত্তেজনার গর্ব্বে ঐ পত্রটি লিখিত হওয়ায় ঐরূপ মন্তব্য দানের যথার্থ কারণ বিবৃত করিয়া লিখিতে পারি নাই—এখন সে কারণ প্রকাশ করিবারো কোনো সার্থকতা নাই। কাজেই দোষ স্বীকার করিতেছি। আশা করি ঈশ্বরভক্তেরা অতঃপর আমাকে ভুল বুঝিবেন না। ইতি

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

ছারপোকা

রাতে যবে শুয়ে থাকি সুকোমল শয়নে,
ঘুম যবে ঢুলে পড়ে ধীরে দুটি নয়নে,
স্বপন আসিয়া যবে করে মায়া রচনা,
অকাশেতে হাসে যবে সুনীরব জ্যোছনা,—
তুমি তবে চুপিচুপি কোথা হ'তে আসিয়া
সাধের সে ঘুমঘোর দাও ক্ষণে নাশিয়া!
তব দংশন ওগো ঘুমঘোর গভীরে
(যেন) সমালোচনার খোঁচা ভাবে-ভোর কবিরে!
রূপসীর দেহে যেন পাঁচড়ার ক্ষত গো,
পোলাওএর মাঝে ঠিক কাঁকরের মত গো!
গোলাপেতে কাঁটা যেন; সুখে দুখ-বেদনা;—
তোমার উপমা হেন আছে কত শত না।
তোমার প্রতাপে নাকি রবি ফেরে গগনে!
লুকায়েছে মহাদেব হিমালয় গহনে!
সাগরে তোমার ডরে ভাসিছেন শ্রীহরি!
আমরা মানব তবে বল আর কি করি!
অনেকে বধিয়া তোমা করে হাত গন্ধ,
বন্দনা করি আমি তুলি' দীন ছন্দ।
খোসামোদে হয় বশ স্বরগেরও দেবতা,
শয়নের সাথী মোর হবে না কি তুমি তা?

"বনফুল"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

(মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

(১০)

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময়ে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকে গোলামখানা বলিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা সায় দি নাই। কিন্তু জাতীয় কর্তৃত্বের অধীন শিক্ষায়তনের প্রয়োজন তখনও উপলব্ধি করিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলনের সময়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলা হইতেছে এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টারও আমরা সমর্থন করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীই যে ভারতীয় জাতির গোলামী-ভাবের জনক, এই মতের সমর্থন আমরা করিতে পারি নাই; ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ্ রিভিউ কাগজে উহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়াছি। আমাদের যে মত পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা এই, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর গুরুতর দোষ থাকিলেও উহা দ্বারা দেশের হিত হইয়াছে এবং এখনও হইতে পারে, এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু উহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করিতে না পারিলে উহা ভাঙা উচিত নয়। সত্য বটে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বহু ছাত্র সর্কারী চাকরী করে; কিন্তু অনেকে স্বাধীন জীবিকাও অবলম্বন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকেও গোলামী করিতে বলেন না। অন্যদিকে ইহাও দেখা যায়, যে, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরাও সর্কারী চাকরী করিতেছে, যদিও পরিষৎ কাহাকেও সর্কারী চাকরী করিতে বলেন নাই।

(১১)

শুধু ভারতবর্ষে নয়, সব দেশেই খবরের কাগজে গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা হয়। কিন্তু সম্পাদকেরা যতবার গবর্ণমেণ্টের দোষ ধরেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে ততবার গবর্ণমেণ্টের গুণগান করেন না। বস্তুতঃ এরূপ একটা হিসাব রাখিয়া কাজ করা আবশ্যক নয়, সুসাধ্যও নহে, যে, নিন্দা যতবার করা হইল প্রশংসা ততবার করা হইল কি না। উপলক্ষ্য ঘটিলেই নিন্দা বা প্রশংসা করিতে হইবে, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচলিত রীতি।

কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্র-শাসিত দেশের প্রভুরা এই বলিয়া কোপ প্রকাশ করেন, যে, ভারতীয় সম্পাদকেরা কেবল তাঁহাদের নিন্দাই করে, গুণগান করে না—যদিও ইহা সত্য নহে।

শুনিতে পাই, প্রবাসীর সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন লোক নাকি গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে, আমরা কোন্ একটা মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু প্রশংসাও করিতাম, তাহার পর আর করি নাই! সম্ভবতঃ আমাদের এই দুর্ম্মতির কারণও আবিষ্কৃত হইয়াছে! দুঃখের বিষয় এই গবেষণাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন কোন গবেষণার ন্যায় মোটের উপর অসত্য। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই, যে, আমরা কাহারও "বাস্কেট্-হোল্ডার"* নহি, সুতরাং কাহারও প্রশংসা করিতে বাধ্য নহি।

(১২)

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অপ্রতিহত প্রভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন (পৃষ্ঠা ৫৯৩-৪)—

> পরিশেষে বক্তব্য এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষের যে অপ্রতিহত প্রভাব আছে তাহার কারণ তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন; তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম মৌলিক গবেষণা না করিতে পারেন, কিন্তু মৌলিক-গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কার্য্যের অঙ্গ হিসাবে প্রবর্ত্তন তিনিই এদেশে প্রথম করিয়াছেন; সেই আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিকট ঋণী। * * *
>
> বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরাও তাঁহার প্রতি ঐরূপই আস্থাবান, তাঁহারা মনে করেন যে ভারতসর্কারের বিষদৃষ্টি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ রক্ষা এবং কর্ত্তব্যপালন একমাত্র তাঁহার নেতৃত্বেই সম্ভব। সুতরাং তাঁহারা অণুবীক্ষণ লইয়া স্যার আশুতোষের দোষ ত্রুটী অনুসন্ধানই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভ্যগণ স্যার আশুতোষের সহিত একমত হইতে না পারাই ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধের একমাত্র অপরিহার্য্য লক্ষণ বলিয়া মনে করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে স্যার আশুতোষের সহযোগিতা করাই তাঁহাদের

* এই অনুবাদটির জন্য আমরা কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের নিকট ঋণী।—প্রবাসীর সম্পাদক।

একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। যখন সার আশুতোষ তাঁহাদের আস্থা হারাইবেন অথবা তদপেক্ষা কোন যোগ্যতর ব্যক্তির নেতৃত্ব সুলভ হইবে, তখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে, সিণ্ডিকেটে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলে তাঁহার কোন প্রভাব থাকিবে না। * * *

রামানন্দ-বাবুকে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। অনাথ-বাবু যেই হউন, তাঁহার নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন একস্থলে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, অপরস্থলে স্যর নীলরতন, সেই নিয়োগ সেনেটে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে। সেনেটের সকল সভ্যই যে সার আশুতোষের "একান্ত বাধ্য ভৃত্য" নহেন তাহা কি রামানন্দ-বাবুর জানা নাই?

উক্ত বিষয়ে নানা কথার মধ্যে অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ গত ফাল্গুন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে লিখিয়াছেন (পৃঃ ৬৯)—

১৯০৪ সালে আইন পাশ হওয়ার পরে ১৯০৬ সালে যখন সার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইলেন, তখন বঙ্গভঙ্গের দরুণ আন্দোলন প্রবল বেগে চলিতেছিল। তারপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হয়। এখন ত নন্‌কো-অপরেসনের যুগ। এই সকল আন্দোলনের ফলে সরকারের এবং জনসাধারণের মধ্যে খুব মনকসাকসি চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। এই-প্রকার সমস্যার সময়ে সার আশুতোষ পদে, অপদে, বিপদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন। লোকে কথায় বলে, "সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।" নেহাৎ ভাল মানুষটির মত চলিলে টিকিয়া থাকাই বোধ হয় সম্ভব হইত না, কাজ করা ত দূরের কথা। সার আশুতোষের মত লোকের কাজের বিচার করিতে হইবে তাঁহার লক্ষ্যের হিসাবে। লক্ষ্য যদি উদার হয়, তবে সেই লক্ষ্যে পঁহুছিবার জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহার দোষগুণ বিচারে সময় সামগ্রী এবং লক্ষ্যের কথাটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্যই লক্ষ্য উদার বলিয়াই যে তজ্জন্য অবলম্বিত যে-কোন উপায়কে সদুপায় বলিতে হইবে এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু তজ্জন্য অবলম্বিত উপায়কে একেবারে অসদুপায় বলিয়া ঘোষণা করার আগে ভাবিয়া দেখা উচিত, লক্ষ্যসাধনের জন্য সেটি প্রয়োজনীয় কি না। ইংরেজী ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়, The end may not justify the means, but it may explain the means। যাহা প্রয়োজনীয় তাহা খুব সাধু না হইলেও অনেক সময় অনেকের মতে অপরিহার্য্য। সমালোচক যদি এই কথা মনে রাখিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে সেই সমালোচনায় কাজের ক্ষতি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কে সার আশুতোষের প্রধান অপরাধ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নিজের আত্মীয় এবং অনুগত লোক ঢুকাইতে একান্ত ব্যস্ত। ইহাতে হয়ত সময় সময় যোগ্যতম লোকের সেখানে প্রবেশ করা ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং আত্মীয় এবং অনুগত জনের একান্ত পক্ষপাত সকল সময় অনুমোদন করা কঠিন। কিন্তু এইপ্রকার পক্ষপাতকে নিতান্ত দোষ বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সার আশুতোষের যে কিছু পদ প্রতিপত্তি তাহা ভোটের উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে ভোটারের মধ্যে যত অধিক লোক সার আশুতোষের আত্মীয় অনুগত এবং নির্ভরযোগ্য হইবেন, ততই তিনি নিরাপদে এবং নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতে সমর্থ হইবেন। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আশুতোষের নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আত্মীয় অনুগত ঢুকান প্রয়োজন। যদি একবার এই কথা স্বীকার করা যায়, তবে তাঁহার অনেক কাজ ততটা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সার আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কাজ করিতে হইলে সেখানকার প্রত্যেক সমিতির অধিকাংশ ভোট হাতের মুঠায় রাখিতে হইবে। নতুবা তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। নানা উপায়ে এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই সার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা, অথবা ইংরেজীতে যাহাকে ডিক্‌টেটর বলে সেই ডিক্‌টেটর হইয়াছেন।

এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য আশ্বিনের প্রবাসীতে বলিয়াছি এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক পরস্পরের সহিত বুঝ পড়া করুন। এই বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিবার কারণ এই, যে, আমাদের ধারণা চন্দ মহাশয় প্রবাসী-সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া "সমালোচক" কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, যদিও অ-গবেষক আমাদের নাম করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

(১৩)

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ ফাল্গুন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে লিখিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৭১-৭২)—

আমি এমন কথা বলিতে চাই না যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ছাত্রেরা যে কিছু লেখা প্রকাশ করে তাহার দোষ কেহ দেখাইবে না। দোষ অবশ্যই দেখাইয়া দিতে হইবে, নতুবা সংশোধনের ব্যবস্থা হইবে কি প্রকারে? কিন্তু যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন খাঁটি জিনিষের সঙ্গে মেকি জিনিষের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। মেকি নিবারণের জন্য সকল দিক হইতেই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মেকি জিনিষের চল্ বন্ধ করিবার জন্য কারখানার কর্তৃপক্ষেরও যেমন সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য, জনসাধারণেরও তেমনি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া ২।৪টা মেকি মাল ধরিয়া নূতন কারখানার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়। মেকি কোথায় না চলিতেছে? আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টা কিরূপ প্রবল তাহা এদেশে সকলেই জানেন। সেই উন্নতির মাত্রা আরও বাড়াইবার জন্য যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট একটা রাষ্ট্রীয় গবেষণা-পরিষদের (National Research Council) সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পরিষদের অবৈতনিক অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেল (G. E. Hale, Hony. Chairman) পরিষদের মুখপত্র (Bulletin) প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় মেকির চলন সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিব—

Optimistic as we may reasonably feel, however, in view of the progress already attained, we are in no danger of believing that our object has been already accomplished in any large degree. Many tendencies of the time indicate both the opportunity and the necessity for further effort. Not the least of these is a widespread public preference for sensational discovery, even if based on little or no evidence, rather than for solid accomplishment of more sober sort. Pseudo-scientific journals, taken by thousands of enthusiastic amateurs, often feed their readers in the veriest nonsense in the guise of science. Charlatans

offering fabulous wares are successful in securing appropriations from the Congress." (P. 5).

অবশ্যই আমেরিকায় এখনও মেকি চলে বলিয়া যে এ দেশে মেকির প্রশ্রয় দিতে হইবে এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এ দেশে মেকি জিনিষের উৎপত্তির সম্ভাবনা যে বেশী একথা ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, এবং মেকি দেখিতে গিয়া খাঁটি জিনিষ উৎপাদনের যে যোগাড় হইতেছে তাহা নষ্ট করাও কর্ত্তব্য নহে।

"মেকি" কথাটার প্রয়োগ আমরা প্রবাসীতে করিয়াছিলাম। তজ্জন্য অনুমান করিতে সাহস হয়, যে, রমাপ্রসাদ-বাবু পণ্ডিতব্যক্তি হইলেও কৃপা করিয়া অপণ্ডিত-আমাদের কথার জবাব দিয়াছেন। সেইজন্য আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, কি-অর্থে আমরা "মেকি" কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলাম। যাহা গবেষণা নহে, অস্বীকৃত ঋণ, অস্বীকৃত সংকলন, বা সাহিত্যিক চুরি, তাহাকেই আমরা মেকি বলিয়াছিলাম। আমাদের এই প্রয়োগ আভিধানিকদের মনঃপূত না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের অভিপ্রেত অর্থ যে ঐরূপ ছিল, তাহা আমাদের প্রদত্ত মেকির দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। রমাপ্রসাদ-বাবু আমেরিকা হইতে যেরূপ মেকির দৃষ্টান্ত দিতেছেন তাহা অন্যবিধ জিনিষ। তাহার মানে, সেইরূপ হুজুকের জিনিষকে আবিক্রিয়া বলা যাহার সমর্থক যথেষ্ট বা সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। কিন্তু কলিকাতার মেকিটাকে বাস্তবিক সাহিত্যিক চুরি, কিম্বা কোমলতর ভাষায়, নকলনবীসী বলাই উচিত। অতএব রমাপ্রসাদ-বাবু গবেষণা দ্বারা বাহির করুন, যে, আমেরিকার কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ অধ্যাপকের সাহিত্যিক চৌর্য্য ধরা পড়িবার পরও তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা এবং অন্য উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছে; তাহা হইলেই তাঁহার প্রদর্শিত নজীর কলিকাতার সাহিত্যিক চোর বা নকল-নবীসদের কাজে লাগিতে পারে। রমাপ্রসাদ-বাবু লিখিয়াছেন, "যেকি জিনিষের চল বন্ধ করিবার জন্য কারখানার কর্ত্তৃপক্ষেরও যেমন সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য, জনসাধারণেরও তেমনি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।" বিশ্ববিদ্যালয়রূপী কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ মেকি-উৎপাদক গ্রন্থকারদিগকে কি শাস্তি দিয়াছেন জানিতে চাই, তাঁহাদের লেখা বহি পাঠ্য পুস্তকের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন কি না জানিতে চাই। আশা করি রমাপ্রসাদ-বাবু এই তিনটি সোজা প্রশ্নের জবাব দিবেন।

(১৪)

রমাপ্রসাদ-বাবু "২।৪টা মেকি মাল" ধরার কথা বলিয়াছেন। আমরা ডিটেক্‌টিভের কাজ করিনা, নতুবা হয়ত আরও মেকি মাল ধরিয়া দিতে পারিতাম। তথাপি তাঁহার সন্তোষের জন্য আরও কিছু মেকির উল্লেখ করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হইলে তাহাও জানাইব। তখন যেন অভিযোগ না করেন যে, আমরা, "মেকি দেখাইতে গিয়া খাঁটি জিনিষ উৎপাদনের যে যোগাড় হইতেছে তাহা নষ্ট" করিবার চেষ্টা করিতেছি। বস্তুতঃ এরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বঙ্গের বাহিরের গবেষকদের নানাবিধ কৃতিত্বের কথা আমরা প্রবাসীতে ও মডার্ণ রিভিউতে যতবার ও যত লিখিয়াছি, দেশের কোন দৈনিক কাগজও ততবার ও তত বেশী পরিমাণে লেখেন নাই। রমাপ্রসাদ-বাবুর নিজের গবেষণার কথা আমরা অনুরোধ করিয়া আনাইয়া ছাপিয়াছি। যাহা হউক, কিছু মেকি মালের কথা (যাহা এ পর্য্যন্ত প্রবাসীতে বাহির হয় নাই) বলিতেছি। মডার্ণ রিভিউ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

(1) *Selection from the Bible, Part II*, [illegible] ed by the University of Calcutta, 192[illegible]. [illegible] the Introduction to this book, one finds large [illegible] of material from "*The One Volume Bible* [illegible] *tary*" edited by the Rev. J. R. Dummelow, [illegible] (Macmillan & Co., London, 1918), without [illegible] knowledgment. In some passages whole sentences have been taken, amounting to paragraphs or [illegible] out acknowledgment. A few instances [illegible]. The sentences in the middle of p. viii of the Introduction have been taken from p. liii of Dummelow's Commentary. The last paragraph of p. xiii of the Introduction has been taken from pages xxv [illegible] of Dummelow's book. The last ten lines of [illegible], almost the whole of page lxiv and some lines [illegible] lxv of the Introduction have been taken from [illegible] of Dummelow's Commentary. There are no [illegible] of quotation and acknowledgment in these passages. The Introduction to Part II of the *Selection* [illegible] work of Rev. Dr. George Howells. But it is not stated who is responsible for the Introduction to Part [illegible].

(2) *Bengal in the Sixteenth Century*, [illegible] J. N. Das Gupta, Balliol College, Oxford, [illegible], Presidency College, etc. Published by the University of Calcutta, 1914. This book is a [illegible] Calcutta University Readership Lectures. In this book we find borrowings without acknowledgment of paragraph after paragraph from an article in the *Calcutta Review* for October, 1891, [illegible] "A Glimpse of Bengal in the Sixteenth Century of the Christian Era." We shall give a few [illegible] to enable the reader to verify our statement [illegible] Dr. Gupta's Book, pp. 91-92. *In the* [illegible]

353. Mr. Das Gupta's Book, pp. 63-64 *The Calcutta Review*, p. 354. Mr. Das Gupta's Book, pp. 89, 91 · *The Calcutta Review*, pp. 363-64. Mr. Das Gupta's Book, pp. 153, 157 *C. R.* pp. 364-365. D. G.'s Book, pp. 58, 59 · *C. R.*, pp. 354-55. It seems to us that Mr. Das Gupta has also taken passages in his book in pages 114 and 118 from the footnotes in "*The Travels of Ludovico di Varthema*" translated from the Italian by John Winter Jones and edited by George Percy Badger (1863), pages 210, 211, and cxiv. Our reason for thinking so is identity of language in the two works. But it may be that Mr. Das Gupta has taken these latter passages from other books. In any case he has not mentioned the name of all the books from which he has taken the passages, nor has he given any page reference.

(3) *Hellenism in Ancient India*. By Gauranga Nath Banerjee, M.A., Ph.D., P.R.S, Lecturer and Secretary to the Council of Post-graduate Teaching in Arts in Calcutta University. Second Edition thoroughly revised and enlarged. Butterworth & Co., Calcutta. 1920.....Entire paragraphs in Dr. Banerjee's chapter on coins, pp 129,130,131,132, are copied without acknowledgment from E. J. Rapson's "Indian Coins" (Strassburg, 1897), pp. 4,5,6.

এই-সকল বহি অসার ও অকেজো বলিতেছি না। সবগুলিতেই নানা জ্ঞাতব্য কথা আছে। সকল জায়গায় পরিষ্কার ভাষায় ঋণ স্বীকার করিলে নিন্দার কারণ থাকে না। বহিগুলির বর্ত্তমান সংস্করণে যথাস্থানে তাহা সম্ভব নহে জানি; কিন্তু বহির গোড়ায় বা শেষে একটি পাতা জুড়িয়া দিয়া ইহা করা যাইতে পারে। তাহা করিলে ইহাও প্রমাণ হইবে যে লেখকদের ঋণগোপনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না।

এখানে একটি অবান্তর কথা বলি। গৌরাঙ্গ-বাবুর এই বহিটি ১৯২০ সালে ছাপা, কিন্তু ইহাতে তিনি নিজেকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কৌন্সিলের সেক্রেটরী বলিতেছেন। অথচ তিনি এতদিন "একটিনি" করিতেছিলেন; তাঁহার কীর্ত্তি মাঘ মাসের প্রবাসীতে ঘোষিত হওয়ার পর বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসের ৪ঠা তিনি ঐ কাজে পাকা হইয়াছেন। বোধ হয় "কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ" মহাশয়ের মতে "মেকি জিনিষের চল বন্ধ করিবার" ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়!

(১৫)

মাঘ মাসের প্রবাসীতে গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির উপর বিলাতের টাইম্‌সের মত বলিয়া অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

"An extensive essay embodying considerable learning *and research* on a subject on which students have held very diverse opinions."

আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম, কোন্ তারিখের টাইম্‌সের কোন্ পৃষ্ঠা হইতে কথাগুলি উদ্ধৃত। সুরেন্দ্র-বাবু জানাইয়াছেন, ১৯১৯ সালের ১৬ই অক্টোবরের টাইম্‌সের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় উহা আছে। তাহাতে সুরেন্দ্র-বাবুর লিখিত দুটি কথা ছাড়া আর সব আছে বটে। সে দুটি আমরা উপরে বাঁকা অক্ষরে ছাপিয়াছি। তাহা "and research" অর্থাৎ "এবং গবেষণা"। টাইম্‌স্ লিখিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ-বাবুর বহিতে অনেক পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে; কিন্তু সুরেন্দ্র-বাবু যে প্রশংসা পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহা গৌরাঙ্গ-বাবুর বহির দ্বিতীয় সংস্করণেও ছাপা আছে, তাহাতে বলা হইতেছে যে টাইম্‌সের মতে ঐ বহিতে গবেষণাও আছে। এই অতিরিক্ত প্রশংসা কে যোগ করিয়াছে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার অনুসন্ধান করিবেন কি? যদি না করেন, তাহা হইলে গ্রাজুয়েট্‌রা করিবেন কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নাম ভবিষ্যতে যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করা গ্রাজুয়েট্‌দের একান্ত কর্ত্তব্য। "মেকি জিনিষের চল বন্ধ করিবার জন্য কারখানার কর্ত্তৃপক্ষরও" এ বিষয়ে কিছু কর্ত্তব্য আছে। গ্রাজুয়েট্‌দের মধ্যে অনেকে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টকেও ওলট্-পালট্ করিবার সাহস করিতেছেন। তদপেক্ষা সহজসাধ্য কাজে মন দিলে ক্ষতি কি?

(১৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রারের পদ শূন্য হওয়ায় ঐ পদের জন্য ৫৩টি দরখাস্ত পড়ে। দরখাস্তকারীদের মধ্য হইতে সাউথ সবার্বান্ কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে কাজটি দেওয়া হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের যথেষ্ট কোন প্রকাশ্য কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে যদি রমাপ্রসাদ বাবুর কথিত কারণের মত কোন কারণে "আত্মীয় এবং অনুগত লোক ঢুকাইতে" হইয়া থাকে, তাহা একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভাল পাস্ এবং অধ্যাপকতায় কৃতিত্ব দেখিয়া যদি ঐ পদের জন্য লোক নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, বলা হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, নির্ব্বাচিত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনেক আবেদনকারী ছিলেন। তাঁহাদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি

রেজিষ্ট্রারের আফিসের কাজে অভিজ্ঞতা দেখিয়া ঐ পদে লোক নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেরই দাবী সকলের চেয়ে বেশী। দরখাস্তকারীদের যোগ্যতার বর্ণনাপত্রে দৃষ্ট হয়, যে, তিনি গ্রাজুয়েট্ এবং সহকারী রেজিষ্ট্রারের কাজও একএকে কয়েকমাস ধরিয়া একাধিকবার করিয়াছেন। যদি এমন বলা হয়, যে, রেজিষ্ট্রারের আফিসের অভিজ্ঞতা চাই এবং এম্-এ পাস্‌ও চাই, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, যে, দরখাস্তকারীদের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আফিসেরই দুজন এম-এ পাস্ করা কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের কোন একজনকে কেন নিযুক্ত করা হইল না? আমাদের বিবেচনায় আফিসের কাজে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং সততা দেখিয়াই এই কাজে লোক নিযুক্ত করা উচিত ছিল। স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাজুয়েট্ ছিলেন না; কিন্তু আফিসের কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার সুনামও ছিল।

(১৮)

শুনা যাইতেছে স্যার্ নীলরতন সরকারের কার্য্যকাল শেষ হইলে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস্‌চ্যান্সেলার্ হইবেন। যিনি কার্য্যতঃ কর্ত্তা, নামেও তাঁহারই কর্ত্তা হওয়া উচিত। সুখ্যাতি অখ্যাতি তাঁহারই পাওনা হওয়া উচিত। একজন সাক্ষীগোপাল রাখিয়া কাজ চালান অকর্ত্তব্য। ঐ সাক্ষীগোপালকে যদি আবার অন্যের কৃত কাজের অখ্যাতির ভাজন অর্থাৎ স্কেপ্‌গোট্ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহা আরও অন্যায় হয়। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন যেরূপ গঠন, অর্থাৎ যে সব ফেলো, সীণ্ডিক্, শিক্ষক প্রভৃতিকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাতে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরই ভাইস্‌চ্যান্সেলার হওয়া উচিত।

(১৯)

শুনিলাম, এবার চারিজন আর্টসের ছাত্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবেন, একজনের টাকা চারিজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে; অর্থাৎ প্রত্যেকে মাসে ১২৷৷০ করিয়া এবং বৎসরান্তে ২০০ টাকা পাইবেন। আগে শুনিয়াছিলাম সকলসমেত সাতজন এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। বাকী তিন জন আছা হইলে বোধ হয় বিজ্ঞানে ঐ বৃত্তি পাইবেন। তাঁহারা মাসিক ও বৎসরে কত টাকা পাইবেন, জানি না। দেশে গবেষণা ও অনুসন্ধান হওয়া এরূপ বৃত্তি পাওয়া সুখের বিষয় বই কি? কিন্তু ছেলে-বেলায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত লোকদিগকে অসাধারণ পণ্ডিত মনে করিতাম। সে ধারণা সত্য ছিল কি না, যৌবনে ঐ বৃত্তি পাইবার কল্পনা করিবার সময় হয় নাই। তবে, সেকালে একেবারে ১০০০০ টাকা পাইবার কল্পনার সাহস যেমন অনেকের হইত না, তেমনি আবার অনেকের কল্পনাও অভিভূত হইত, তেমনই আবার অনেকের কল্পনা কার্য্যেও হইত। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের অনুসরণ খুব ভাল কথা, কিন্তু টাকাটাও ভাল কাজে লাগাইতে পারিলে মন্দ নয়। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির কল্পনা হয়ত, জ্ঞানান্বেষণচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা হয়ত কমিয়া যাইতে পারে, যদি বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া ছাত্র উহা ভাগ করিয়া পাইতে থাকে। এই যুগে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি "যুকুমণির ছড়া"তেও স্থান পাইয়াছে। এখন ছড়া আছে—

"দাদাগো দাদা, সহরে যাও, তিন টাকা কোরে ... ও
হেই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, বৌ এনে দাও খেলা ক...

ভবিষ্যতের খোকা-বাবুরা পী-আর্-এস্ ... ডীর প্রাচুর্য্যবশতঃ হয়ত বলিবেন, "দাদা গো ... নী পুর যাও, তের টাকা কোরে প্রেমচাঁদ ... দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, থীসিস্ এক ... করি।" কেহ যেন মনে না করেন, আমরা ... কালের কোনও বিদ্বান্ গবেষককে লক্ষ্য ক... এই কথা লিখিতেছি; এবার কে কে বৃত্তি ... তাহা আমরা জানিও না। আমরা ভবিষ্য... বলিতেছি, এবং সাবধান করিতেছি।

একটা কথা মনে হইতেছে। যাঁহারা ... নিবন্ধ লিখিয়া প্রেমচাঁদ বা পীএইচ্-ডী, ইত্যাদি ... তাঁহাদের সেগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার ... এইরূপ নিয়ম করা উচিত। তাহা হইলে ... বুঝিতে পারিবেন, কিরূপ জিনিষের জন্য ... উচ্চতম পুরস্কার ও উপাধি দিয়া থাকেন। ... একই ছাত্র একই নিবন্ধ পেশ্ করিয়া ...

পুরস্কার ও উপাধি পাইতেছেন। ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা বন্ধ করা উচিত।

কেবল পরিহাস করিবার নিমিত্ত আমরা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা সম্বন্ধে এত কথা লিখিতেছি না। বৃত্তিটির উদ্দেশ্য দুই রকম হইতে পারে; (১) পুরস্কার দ্বারা উৎসাহদান, (২) গবেষকের ব্যয়নির্ব্বাহ হইবার মত টাকা তাঁহাকে দিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে গবেষণা করিতে সমর্থ করা। কিন্তু মাসিক ১২৷৷০ ও বর্ষান্তে ২০০ টাকায় আজকাল ছাত্রদের ব্যয়নির্ব্বাহ অতিকষ্টে হয়, এবং উৎসাহদান হিসাবেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীতম ছাত্রদের পক্ষে ঐ পরিমাণ টাকা অবিভক্ত ১৪০০ টাকার মত কার্য্যকর নহে। বি-এ, এমন কি ইণ্টারমীডিয়েট্ পাস্ করিয়াও কোন কোন ছাত্র বার্ষিক ৩৫০ অপেক্ষা অধিক বৃত্তি পাইয়া থাকে।

যদি এবার ৪ জন বা ৭ জনের এই বৃত্তি প্রাপ্তির সংবাদটা ভুল হয়, তাহা হইলে অবশ্য এত কথা লেখা পণ্ডশ্রম হইল। কিন্তু টাট্‌কা ঠিক্ খবর পাওয়াও ত সুসাধ্য নয়।

জানিনা

জানি না কেমনে দিলে, আমার এ দান,
তোমার মনের কোণে পাবে তার স্থান!
এ যে মোর ভালবাসা মালার মতন
কণ্ঠে জড়াইয়া দিতে এমন যতন!
এ যে মোর সব আশা, তাই রাখী করে'
বেঁধে দিতে সাধ তব দুইখানি করে।
এ যে মোর সুখ, তাই আরতির মত
গন্ধদীপে জ্বেলে দিতে চাই অবিরত!
সকল দুখের বাড়া, গোপনে আঁধারে
ধূপ করে' জ্বালাইতে চাই বারে বারে!
হাসির আলোকে আর নয়নের জলে,
গানের সুরের মাঝে, মরমের তলে,
চোখের আশায় আর মুখের ভাষায়
ভালোবেসে দাও স্থান এ ভালোবাসায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দেশের কথা

অন্নের অবস্থা—সু-সংবাদ।

ধান চাউল।—ধান চাউল বাঙ্গালীর প্রাণ স্বরূপ। অন্যান্য দেশেও ধান-চাউলের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় ভাতের উপর একান্ত নির্ভর অন্য কোন জাতি করে না। ধান চাউল ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য হইতেছে দেখিয়া এদেশের লোক আত্মহারা হইয়াছে। এবৎসর একটু সুবাতাস বহিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ চাউল ষ্ট্রেট-সেটেল্‌মেণ্ট, লঙ্কাদ্বীপ, যাবা, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্, কিউবা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। গত বৎসর জাপানে এবং শ্যাম দেশে অজন্মা হওয়াতে পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রহ্মদেশের প্রভূত চাউল রপ্তানি করিতে হইয়াছিল। এবৎসর তথায় ফসল ভাল হইয়াছে, শ্যামদেশে প্রভূত ধান জন্মিয়াছে। শ্যামদেশ হইতে নূতন চাউল ৪৫০,০০০ টন, পুরাতন চাউল ১৫০,০০০ টন বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে। সেখানে পুরাতন চাউল ৩০০,০০০ টন মজুত আছে, নূতন চাউল হইতে ১৫০০,০০০ টন রপ্তানি করা যাইবে। এবৎসর অষ্ট্রেলিয়া হইতে বর্ম্মা-চাউলের জন্য কোন চাহিদা নাই, কিউবা এবং ষ্ট্রেটের অবস্থাও তাই। লঙ্কাদ্বীপ হইতে গত বৎসর কত হাহাকার শুনা গিয়াছিল। এবৎসর তথায় সাড়াশব্দ নাই। ইউরোপের অবস্থাও তদ্রূপ। ১ লক্ষ টনের অধিক বর্ম্মা চাউল রপ্তানিমুখে সমুদ্রে ভাসিতেছে, খরিদ্দার নাই। গত সন বর্ম্মা, শ্যাম ও সেগনে মোট ১৮,৫০,০০০ টন চাউল রপ্তানির জন্য পাওয়া গিয়াছিল; এই বৎসর পাওয়া যাইবে, ৩০,৫০,০০০ টন। পরন্তু গত বৎসর পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে ব্রহ্মদেশের চাউলের চাহিদা ছিল, এই বৎসর নাই বলিলেই হয়। ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন যে ১০ লক্ষ টন বর্ম্মা-চাউল বিদেশে রপ্তানির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। এইক্ষণ জানাইয়াছেন—ঐ সমস্ত চাউল যে বিদেশে যাইবে এমন কোন কথা নাই, এজন্য তাঁহারা ভারতে কত চাউল পাঠাইতে হইবে বা না হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন না। অর্থাৎ যার যত ইচ্ছা বর্ম্মা-চাউল ভারতে আমদানী করিতে পারিবে।

—জ্যোতিঃ।

পাটের হ্রাস ও অন্ন-বৃদ্ধি।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রায় ৫০ কোটী টাকার পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, পাটের একমাত্র জন্মভূমি এই বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও পাট জন্মায় না। সুতরাং পাটের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙ্গালার কৃষকেরা পাট উৎপাদনে বিশেষভাবে মনযোগী হইয়াছিল, কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমরের ফলে পাট বিদেশে রপ্তানী না হওয়ায় পাটের মূল্য অতিমাত্রায় হ্রাস পাইয়াছে, ফলে পাট উৎপাদন করিতে কৃষকদিগের যে ব্যয় হয় বর্ত্তমানে পাট বিক্রয়দ্বারা তাহাও পাওয়া যায় না, কাজেই আজকাল পাটের পরিবর্ত্তে ধান্য চাষের দিকেই লোকের দৃষ্টি অধিকমাত্রায় পতিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় পাটের চাষ কমাইয়া দিলে কৃষকমণ্ডলীর লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

—যশোহর।

অর্থহীন দেশের অর্থের অপব্যয়।

হিসেবটা খতিয়ে দেখ—কাউন্সিল অব ষ্টেটে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে যুদ্ধের আগের বৎসরে আর পরের বৎসরে সরকার-বাহাদুরের পণ্টনের খরচই কত আর শিক্ষা আর স্বাস্থ্য বিভাগের খরচই বা কত?

সরকার-বাহাদুরের তরফ থেকে তার উত্তরে জানা গেছে যে ১৯১

১৪ সালের পল্টনের খরচ ৩০ কোটী টাকা, আর ১৯২০-২১ সালে ৮৭ কোটী টাকা। ১৯২০-২১ সালের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৫½ কোটী টাকা; তবে ছোটখাট যে-সব লড়াই চল্‌ছে তাতে আরও বেশী টাকা লাগ্‌বে।

শিক্ষাবিভাগে ১৯১৩-১৪ সালে খরচ হয়েছিল ৫½ কোটী টাকা আর স্বাস্থ্য-বিভাগের জন্য খরচ হয়েছিল ২½ কোটী টাকা। ১৯১৯-২০ সালে শিক্ষার খরচ ৭½ কোটী আর সরকারী ডাক্তারখানা আর স্বাস্থ্য-বিভাগের খরচ ৪ কোটী।—বিজলী।

ভারতবর্ষে ৬০৭০০ ইংরেজ সৈন্য এবং ২৮০০০০ হাজার দেশীয় সৈন্য আছে। প্রত্যেক ইংরেজ সেনার জন্য বার্ষিক ২১১০৲ টাকা এবং প্রত্যেক দেশীয় সৈন্যের জন্য ৫০০৲ টাকা হিসাবে খরচ পড়ে, এতদ্ব্যতীত অস্ত্র-শস্ত্র গোলা-বারুদ এবং সৈনিক অফিসারদিগের স্বতন্ত্র।—যশোহর।

দরিদ্র দেশের গো-ধন-হানি।

গো-মহিষ গণনা।—১৯১৯-২০ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সময়ে ভারতে ১৪,৫৯,২২,০০০ গো-মহিষ গণনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে গো-মহিষের সংখ্যা ১৪,৩১,৭৯০০০ ছিল। সুতরাং পঞ্চবর্ষ মধ্যে ভারতের গো-মহিষের সংখ্যা শতকরা দুইটি হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। ডিরেক্টর অব ইনকর্‌মেশন বলেন মার্কিন যুক্তরাজ্যে মোট ৬,৭৮,৬৬০০০, আর্জ্জেণ্টিনায় ২,৭০,৫০০০০, জার্ম্মানিতে ১,৭২,২৭০০০, ফ্রান্সে ১,৩৩,১৫০০০, অষ্ট্রেলিয়ায় ১,১০,৪০০০০, ক্যানেডায় ১,০০,৫১০০০ এবং নিউজিলাণ্ডে ২৮,৮৭০০০ গো-মহিষ আছে। অতএব তুলনায় ভারতের গোধনের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। কিন্তু লোক-সংখ্যার অনুপাতে আর্জ্জেণ্টিনায় লোক-প্রতি প্রায় চারিটা, অষ্ট্রেলিয়ায় দুইটার অধিক, মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রায় সাতটা, ক্যানেডায় প্রায় দেড়টা এবং নিউজিলাণ্ডে প্রায় তিনটা হিসাবে গোধন দাঁড়ায়। আর ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা (৩১৪০ কোটি) অনুপাতে গোধন লোকপ্রতি ॥০ অর্দ্ধেক গোধনেরও কম দাঁড়ায়।—হিতবাদী ও বাঁকুড়া-দর্পণ।

গো-ধন-রক্ষার উদ্যোগ।

গোরক্ষা সভা।—কলিকাতায় গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫নং বাঁশতলা ষ্ট্রীটে, মন্দির-প্রাঙ্গণে গোরক্ষার উদ্দেশ্যে এক মহতী সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সভাপতি ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইয়াছে—(১) হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকল্পে ও ভারতের অনর্থকের অবস্থার উন্নতি বিধান জন্য কলিকাতার কসাইখানাগুলিতে গো-হত্যা ও বিদেশে গবাদির রপ্তানী এখনই সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা বিশেষ আবশ্যক। (২) কলিকাতা কর্পোরেশন খিদিরপুরে মামিনপুর লেনে নূতন কসাইখানা স্থাপন স্থির করায় সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রধানতঃ নিরামিষভোজী করদাতাদের নিকট সংগৃহীত কর, এরূপ কার্য্যে ব্যয় করিবার অধিকার মিউনিসিপালিটীর নাই। মিউনিসিপালিটী যদি বর্ত্তমান প্রার্থনায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে কলিকাতার জনসাধারণ অন্য আবশ্যক উপায়ে ঐ কসাইখানা স্থাপনে বাধা দিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে।

—আনন্দ-পত্রিকা।

গো-হত্যা নিষেধ। উড়িষ্যার সম্বলপুর মিউনিসিপালিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাঁহাদের অধীনস্থ কসাইখানায় আর কোনরূপে গো-হত্যা হইতে পারিবে না। সকল মিউনিসিপালিটীতে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।—প্রতিকার।

গো-রক্ষা।—একজন সংবাদদাতা পত্রান্তরে লিখিয়াছেন, গতপূর্ব্ব বুধবার বেলা সওয়া এগারটার সময় কয়েকজন কসাই কলিকাতা সহরের কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া প্রায় দুইশত গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল; ইহারা শ্যামবাজারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই সময় গাড়ী করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, ইঁহাদের বন্ধে তৎক্ষণাৎ গো-রক্ষিণী সেবক,—এই কথা লেখা ছিল। ইঁহারা কসাইদিগকে থামাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সাত হাজার ২ শত গরুগুলি সবই কিনিয়া লইলেন, লইয়া সোদপুর গো-রক্ষণী পাঠাইয়া দিলেন। ধন্য ইঁহাদের মহাপ্রাণতা। সার্থক ইঁহাদের

—বঙ্গবাসী।

দারিদ্র্য-মোচনের আবেদন।

মায়ের জন্য ডাক।—মাতৃজাতি-সেবক সমিতি মায়ের সেবার জন্য, মায়ের ধর্ম্মরক্ষার জন্য, মায়ের লজ্জা নিবারণের জন্য ডাক দিয়াছে। কে ভারতে দীনা দেবীদের সেবার অধিকারী আছ, অর্থ দিয়া নারীর নারীত্ব রাখো। দান নীচের ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ,
মাতৃজাতি-সেবক সমিতি, ২১ নং গৌর লাহা ষ্ট্রীট,

—বিজলী।

বরাহনগর, রামকৃষ্ণ অনাথ-আশ্রম।—সাধারণের সাহায্যে পরিচালিত উক্ত অনাথ-আশ্রমের বালকগণের জন্য বর্ত্তমানে ১৫ জোড়া কাপড় (৮।৯ হাত), ।১০খানি বিছানার চাদর ও ৮টি মশারির প্রয়োজন হওয়ায় আশ্রমের পরিচালকবৃন্দ, সহৃদয় পরোপকারী দেশবাসিগণের নিকট ঐসকল দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ-সম্বন্ধে যিনি যাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

—বিজলী

অনাথ-আশ্রমের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।—ভবানীপুর ৩১ নং কালী ঘোষ রোড হইতে নিখিল ভারত অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় জানাইতেছেন যে,—ইতঃপূর্ব্বে সংবাদপত্রের সহায়তায় আশ্রমের অধিবাসীগণের জন্য যে দেড়শত কম্বল প্রার্থনা করা হইয়াছিল, সহৃদয় দেশবাসীর অনুগ্রহে সে প্রার্থনা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। সকলেই জানেন যে এই আশ্রমে বর্ত্তমান সময়ে অনাথ-আতুরের সংখ্যা অন্যূন দেড় শত। আশ্রমের অধিবাসীগণের জন্য সম্প্রতি ১৫০ জোড়া বস্ত্র, ১৫০খানা বিছানার চাদর এবং ১৫০খানা গামছার আবশ্যকতা হইয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় আশা করেন যে সহৃদয় ও সক্ষম দেশবাসীগণ অচিরকাল মধ্যেই আশ্রমবাসীগণের এই অভাব পূরণ করিয়া ইঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইবেন।—অধ্যক্ষ, অনাথ-আশ্রম।

জলকষ্টে সাহায্য ভিক্ষা।—শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত উত্তর সাঙ্গড় গ্রামে ৩০০ ঘর গৃহস্থের জলকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত একটি বড় জলাশয় খনন করা আবশ্যক। দুই হাজার টাকা নরনারীর পক্ষ হইতে হাত জোড় করিয়া আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, সকলে এই দীন দাসকে কিছু কিছু দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত রায়।
৮৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

—মোহাম্মদী।

অভাব-মোচনের সদনুষ্ঠান।

হিন্দু ব্যামিলি এসুইটি ফণ্ড অর্থাৎ হিন্দু পারিবারিক বৃত্তি-ভাণ্ডার অনেক সময় সংসারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ও নাবালক শিশুসন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাবিধানের কোন সুবন্দোবস্ত থাকে না। বিধবা ও অসহায় বালকবালিকাগণ ও সংসারে প্রতিপালিত ও আশ্রিত

ব্যক্তিগণ মহা অসুবিধায় ও কষ্টে পতিত হন। উক্তরূপ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য ও সময়োচিত সাহায্য দানের অভিপ্রায়ে এই ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পেন্‌সন বা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা দ্বারা উক্তরূপ সাহায্য দান করা হয়। লাইফ ইন্‌সিওরেন্স বা জীবন-বিমায় মৃত ব্যক্তির বিধবা, নাবালক শিশু বা নিঃস্ব আত্মীয়গণ এককালীন কিছু নগদ টাকা পাইতে পারেন। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় উক্ত অসহায় ব্যক্তিগণ এককালীন প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া অচিরেই পুনরায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন। সংসারে প্রতারকের অভাব নাই, অনেকস্থলে আত্মীয়-স্বজন কর্তৃকও বিধবা ও নাবালকগণকে প্রতারিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে জীবন-বিমার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু এনুইটি বা মাসিক পেন্‌সনের বন্দোবস্ত থাকিলে, উক্তরূপ প্রতারণার ও একেবারে নিঃস্ব হইবার ভয় থাকে না। তাই এইরূপ ব্যবস্থার উপকারিতা বুঝিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁহার সমসাময়িক মহানুভব ব্যক্তিগণ হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ড নামক একটি ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ফণ্ড "ইংলিশ ফ্যামিলি পেন্‌সন ফণ্ড" (English Family Pension Fund) এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। ইহা "মিউচুয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটির" ন্যায় মেম্বরগণের সাধারণ সম্পত্তি। বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই ১৮ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই ফণ্ডের মেম্বর হইতে পারেন। ব্রাহ্মগণ ও যে-সকল ভিন্ন দেশীয় হিন্দু বাঙ্গালা দেশে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও ইহার মেম্বর হইতে পারেন। এই ফণ্ডের মেম্বরগণ প্রতি বৎসরে তাঁহাদের মধ্য হইতে ১২ জন ব্যক্তিকে ডিরেক্টররূপে নির্ব্বাচিত করেন। উক্ত ডিরেক্টরগণই এই ফণ্ডের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন।

এই ফণ্ডের যাবতীয় সঞ্চিত ধন অর্থাদি ভারত-গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত থাকে। কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যে এই ফণ্ডের টাকা খাটান হয় না, সমস্তই কোম্পানির কাগজে পরিণত করিয়া আয়ের পথ সুনিশ্চিত ও স্থিরতর করিয়া রাখা হইয়া থাকে। এই ফণ্ডের বর্ত্তমান মেম্বরগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার জে সি বসু, প্রিন্সিপাল জি সি বসু, সার বি কে বসু; দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী; রায় গোপালচন্দ্র বসু বাহাদুর, রায় সি সি চাটার্জ্জি বাহাদুর, বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল মুদিরাম বসু, রায় উপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ডাক্তার জি সি চাটার্জ্জি রায় বাহাদুর, বাবু বসন্তকুমার চাটার্জ্জি, মিঃ উপেন্দ্রলাল মজুমদার, মিঃ কে এল দত্ত, রায় অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রায় মনমোহন রায় সি, আই, ই।

গত ৪৮ বৎসর মধ্যে এই ফণ্ড হইতে প্রায় ১০,০০০০ দশলক্ষ টাকার উপর বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে এবং এখন প্রতিবৎসর প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর বৃত্তি বিধবা, নাবালক, শিশু প্রভৃতিকে দেওয়া হইতেছে। ইহার বিজার্ভ ফণ্ড বা স্থায়ী ধন-ভাণ্ডার ৫০০০ পাঁচহাজার টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া এখন ১২,৮০০০০ বার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটি ফণ্ডের ভিত্তি অতি দৃঢ় এবং স্থায়িত্ব ও খ্যাতি সম্বন্ধে ইহা অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর এনুইটি ফণ্ডের সমতুল্য।

আমরা আশা করি, দেশমান্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার বন্ধু ও সমসাময়িক মহানুভব ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী হিন্দু বিধবা ও অসহায় শিশুগণের কল্যাণ কামনায় পরিচালিত এই ফণ্ডের কার্য্যাবলী দেখিয়া, সকলে ইহার উপকারিতা সম্যকরূপে বুঝিবেন। ফলতঃ এই ফণ্ডে যোগদান করা ও নিজ পরিবারের সাহায্য করা একই কথা। এই ফণ্ড এক্ষণে কলিকাতা ২৯ কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম।—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিক্ষুকগণ যাহাতে অবাধে যেখানে-সেখানে থাকিয়া ঐ রোগ অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত করিতে না পারে এজন্য একটি নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থানুসারে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র থাকিতে বাধ্য করা হইবে। এজন্য বঙ্গীয় সরকার একটি স্বতন্ত্র কুষ্ঠপল্লী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কুষ্ঠ মিশনের সেক্রেটারী একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিবার জন্য সরকারের হস্তে একজন অজ্ঞাতনামা য়ুরোপীয়ানের প্রদত্ত ৫০,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। আর যাহাতে ঐসকল কুষ্ঠরোগীদের সন্তানগণ পিতামাতার সংস্রবে থাকিয়া রোগগ্রস্ত না হয় সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণেরও আয়োজন হইতেছে। রায় ওঁকারমল জেঠিয়া বাহাদুর এই আশ্রমগৃহের জন্য ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০০ শত পণ্ডিতকে অন্যান্য আসবাব ব্যতীত প্রত্যেককে নগদ ৩২৲ টাকা এবং ৫০০০ দীনদুঃখীকে প্রত্যেককে পাত্র এবং চাবি আনা হিসাবে পয়সা দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি ২০০ বিধবার প্রত্যেককে ১৲ টাকা হিসাবে দান করা হইয়াছে। যাহা হউক শ্রাদ্ধে এরূপ দান আজকাল কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।—যশোহর।

লক্ষ টাকা দান।—টর্ণার-মরিসন কোম্পানীর বড়সাহেব বঙ্গদেশের রোগশোকপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ডিউক অব কনটের হস্তে এক লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। ডিউক এই টাকা বঙ্গদেশের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট দিয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

অনাথ-আশ্রমে দান।—ভবানীপুর ৩১ নং কালীঘাট রোডস্থ নিখিল ভারত অনাথ-আশ্রমে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সম্প্রতি নিম্নোক্তরূপ সাহায্য দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনদাস দৌলতরাম প্রতি মাসে পনের সের করিয়া ঘৃত এবং শ্রীযুক্ত নুপচাঁদ মাখিরাম প্রতি মাসে সাড়ে চারি মণ ডাল দিতেছেন। শ্রীযুক্ত কিষেণদাস মাড়োয়ারী, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মোতা এবং শ্রীযুক্ত বলদেও দাস যুগলকিশোর একযোগে সত্তর মণ চাউল দান করিয়াছেন। ভবানীপুরের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল মহাশয় একটি সিঙ্গার কোম্পানীর সেলাইয়ের কল দান করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মতিচাঁদ নাথাত একশত, শ্রীযুক্ত সুরাজমল জহরী বত্রিশ এবং শ্রীযুক্ত মান্নালাল শোভাচাঁদ ৪৭খানা কম্বল দান করিয়াছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় সহৃদয় দাতৃবর্গকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।—অধ্যক্ষ, অনাথ-আশ্রম।

পয়সা ভাণ্ডার।—মেদিনীপুর টাউন স্কুলে একটি "পয়সা ভাণ্ডার" খোলা হইয়াছে। ছাত্রদিগের হাত দিয়া দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে বস্ত্র সাহায্য করাই এই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য। যদি কেহ পয়সা ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার দান সাদরে গ্রহণ করা হইবে। কোনও ব্যক্তি বস্ত্রাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে সংবাদ পাইলে এই ভাণ্ডার হইতে তাহার যথাসাধ্য প্রতিকার করা যাইবে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। উদ্যোক্তাগণের সংকল্প সাধু।—মেদিনী-বান্ধব।

টাকা ও বস্ত্রদান।—স্থানীয় জনসাধারণ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, বি-এল ও শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র রায় কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর থানার ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে অন্নবস্ত্রহীন দুঃস্থগণকে সাহায্য করিবার জন্য সভার পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সপ্ত হকাল গ্রাম-

সমূহের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিতান্ত অভাবগ্রস্তদিগকে নগদ পঁচাত্তর টাকা ও পঞ্চাশখানা বস্ত্র দান করিয়া আসিয়াছেন।—খুলনাবাসী।

দান।—রায় বাধাচরণ পাল বাহাদুর নিম্নলিখিত চারিটি প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে দান করিয়াছেন; (১) রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার, (২) কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয়, (৩) মুসলমান অনাথ আশ্রম, (৪) কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম।—ঢাকা-প্রকাশ।

শিক্ষা-বিস্তারের আয়োজন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী পাটনা সহরে বিহার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় কলেজের উদ্বোধন করিয়াছেন। উদ্বোধন উৎসবের সময়ে প্রায় ৪,০০০ লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।—বীরভূমবার্ত্তা।

জাতীয় বিদ্যালয়।—গত ৩১এ জানুয়ারী মহেশ্বরপাশা গ্রামে একটি, ও যশোহর টাউনে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৫এ জানুয়ারী শিলচরে "আদর্শ বিদ্যালয়" নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।—খুলনাবাসী।

জাতীয় বিদ্যাপীঠ [কলেজ]—স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল মহাশয়ের নামাঙ্কিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, গত ৯ই ফাল্গুন সোমবার বরিশালে জাতীয় ভাবে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে। উহার কার্য্য স্থানীয় টাউন স্কুলে আরম্ভ হইয়াছে। উপযুক্তসংখ্যক ছাত্র উক্ত বিদ্যাপীঠে ভর্ত্তি হইলেই পাঠ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন পরে প্রকাশিত হইবে। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণকে আহ্বান করা হইয়াছে।

—কাশীপুরনিবাসী।

চিকিৎসকের বদান্যতা।—বঙ্গবাসীতে প্রকাশ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজিতনাথ রায়চৌধুরী "সার্ভেন্ট" পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছেন, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাহায্যার্থ তিনি আপাততঃ তিন বৎসরকাল মাসিক তিন শত টাকা করিয়া দান করিতে প্রস্তুত আছেন। ধন্য।—কাশীপুরনিবাসী।

সর্ব্বস্ব দান।—ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ দীপনারায়ণ সিং জাতীয় কলেজ স্থাপনের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির মূল্য বিশ লক্ষ টাকার কম নহে।—বীরভূমবার্ত্তা।

দান।—নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছিনিবাসী শ্রীমতী কৈলাশকামিনী দেবী তাঁহার স্বামী ৺উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে এথাকার গ্রাম্য পাঠশালাকে মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয় করিবার জন্য ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং স্থানীয় হাসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য আরও দশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।—এডুকেশন গেজেট।

লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠা।—খুলনা জেলার গৌরম্ভা পোষ্টাফিসের অধীন কদমদী গ্রামের শ্রীষ্টীয়ান পাড়ায়, বাবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের চেষ্টা ও পরিশ্রমে "হিতসাধিনী লাইব্রেরী" নামে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বজাতীয় লোকের উপকারের জন্য এই লাইব্রেরী স্থাপন করা হইয়াছে। এই লাইব্রেরীতে ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা ভাষার পুস্তকই বেশী পরিমাণে রাখা হইবে, তদ্ভিন্ন গল্প বই ও সাময়িক পত্রিকাও অল্প পরিমাণে থাকিবে। যদি কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই লাইব্রেরীর জন্য অর্থ বা পুস্তক দান করেন, তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।—ভজনানন্দ হালদার।

দান।—বাইসারী পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য শ্রীযুক্ত বাবিকাচন্দ্র সরকার একবালীন ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন, বর্ষিক [illegible] বেঙ্গের জন্যও তিনি ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

—ঢাকা-প্রকাশ।

অদ্ভুত বদান্যতা—পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় টাকা দেশের শিক্ষার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন:—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষির জন্য) [illegible]
নিজ গ্রামের পাঠশালা [illegible] এক [illegible]
জাতীয় বিদ্যালয় [illegible] ৮ হইতে ১০ [illegible]

জাতীয় বিদ্যালয়—সে দিন মহা সমারোহে কলিকাতায় [illegible] উচ্চাঙ্গের জাতীয় বিদ্যালয় (National College) স্থাপিত [illegible] ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে বহুবেস্ ম্যানসন নামক [illegible] অট্টালিকায় আপাততঃ এই কলেজের কার্য্য পরিচালিত হইবে। মহাত্মা গান্ধী এই কলেজের প্রতিষ্ঠ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তৎপক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই প্রকারের জাতীয় বিদ্যালয়ে আমাদের বর্ত্তমান স্কুলকলেজগুলির [illegible] শিক্ষা দেওয়া হইবে না। আমাদের দেশের লোকে যাহাতে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে এবং দেশের বর্ত্তমান অভাব মোচনের উপযোগী শিক্ষা পাইতে পারে এই-সকল জাতীয় বিদ্যালয়ে সেই প্রকার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। চরকাদ্বারা সূতা কাটা এবং হিন্দী ভাষা সকলকে শিখিতে হইবে। অর্থনীতি, এবং ভারতের ইতিহাস ও ভারতীয় অর্থনীতি এবং তদনুরূপ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহও এই বিদ্যালয়ে অধীত হইবে। ছাত্রগণের প্রকৃতি ও ক্ষমতা বুঝিয়া তাহাদিগকে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ারও বন্দোবস্ত থাকিবে। বহু ছাত্র এই কলেজে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইতেছে।—চারুমিহির।

শিক্ষা-বিষয়ে উৎসাহ।

পদক বিতরণ—নীতিশিক্ষা-প্রদায়িনী সভা ও [illegible] বর্ত্তমান বর্ষে রচনা-প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি ঘোষণা করিয়াছেন—

স্বর্ণ-পদক—(১) দয়াময়স্মৃতি-পদক—
বিষয়—অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান।

রৌপ্য-পদক—(২) কানাইস্মৃতি-পদক (স্বর্ণগুপ্ত)—
বিষয়—সমাজসংস্কারে দ্বিজেন্দ্রলাল।
(৩) কুঞ্জবিহারী-পদক—
বিষয়—Possibilities of a Cotton Industry—from the field to the market
(এই প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লিখিতে হইবে
(৪) বৃন্দাবনপাল-পদক—
বিষয়—কলিকাতা নগরীতে পরিশ্রুত [illegible] সরবরাহ ও তাহার যথোচিত ব্যবস্থার।
(৫) রাজকৃষ্ণস্মৃতি পদক—
বিষয়—সমবায়ব্যবসায়প্রণালী ও তাহার উপযোগিতা।
(৬) ব্রজদুলালস্মৃতিপদক—
বিষয়—ব্যবসায়শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
(৭) স্বর্ণমণি-পদক—
বিষয়—হিন্দুসমাজে নারীর স্থান।
(৮) [illegible]
বিষয়—[illegible]

প্রবন্ধগুলি ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট ২৮ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

জাতীয় বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা।

১। আমাদের শিক্ষার সমুদয় ব্যবস্থা শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গের অভিপ্রায় অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে—বাহিরের কাহারও কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না, তবে কাহারও সদুপদেশ গ্রহণ করিতে বাধা থাকিবে না। আত্মশক্তি দ্বারা পূর্ণ আত্ম-বিকাশ আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

২। যে-সকল বিষয়ে অধ্যাপনা চলিতেছে আপাততঃ তাহা বন্ধ করা হইবে না—তবে দেশপ্রচলিত ভাষার ভিতর দিয়া তাহা চলিবে এবং ধর্ম্ম- ও সমাজ-স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইবে।

৩। ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষার গ্রন্থাদি পড়িবার উপযুক্ত ইংরেজী ও হিন্দী লিখিতে পড়িতে ও কহিতে শিক্ষা করিতে হইবে; এজন্য যত দেরীতে উহা আরম্ভ করা চলে তাহা করা হইবে।

৪। সকল শিক্ষার্থীকে চরকায় সুতা কাটা শিখিতে হইবে এবং আত্মীয়স্বজনকে শিখাইতে হইবে। প্রতি গৃহে অবসর সময়ে চরকা চলিবে। এবং প্রতি গ্রামে বা গ্রাম-সমবায়ে আবশ্যক-মত তন্তুবায় থাকিবে।

৫। প্রতি বিদ্যালয়ের সংঘবে স্থানীয় কুটীর-শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে বা শিল্পীর বাটীতে থাকিবে। স্ব স্ব গৃহপ্রচলিত কৃষি ও শিল্পাদি প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শিখিতে হইবে। সম্প্রতি বিলুপ্ত কৃষি ও শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিবে।

৬। নিত্যব্যবহার্য্য শস্যাদি (তুলাসমেত) চাষের ব্যবস্থা থাকিবে।

৭। অনাড়ম্বর সরল গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। শিক্ষার সকল ব্যবস্থা যাহাতে গ্রামেই সম্পন্ন হয় এমন লক্ষ্য থাকিবে।

৮। শিক্ষকগণ যাহাতে অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী থাকিতে পারেন তাহা করিতে হইবে।

৯। সকল শিক্ষায়তন কোন না কোন জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রের সহিত যুক্ত থাকিলেও পরস্পর সাহায্য করিবে।

১০। গ্রামের সকলবিধ কল্যাণকর্ম্মে বিদ্যালয়ের সহযোগিতা ও সহকারিতা থাকিবে।

১১। শিক্ষাকার্য্য একাদিক্রমে এক প্রহরের বেশী চলিবে না। প্রাতে মানসিক শিক্ষা ও অপরাহ্ণে শিল্পাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কোন বিশেষ শিক্ষার জন্য তাহার অনুকূল কাল নির্দ্ধারিত হইবে।

১২। শিক্ষার বিষয়—দেশীয় ভাষা, হিন্দী, সংস্কৃত বা আরবী, ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, বিজ্ঞান, রসায়ন, কৃষি, চিত্রবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বস্তুপরিচয়, পুরাণ, নিজবংশপরিচয়, সঙ্গীত, ব্যায়াম, লিখন, পঠন ও অর্থনীতি।

১৩। পল্লীর সকল গৃহী ও উপার্জ্জনশীল লোকের নিকট হইতে বিদ্যালয়ের জন্য একটী বৃত্তি নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে নিয়মিত হিসাব থাকিবে।

১৪। শিক্ষা খোলা মাঠে বা স্থানে পুস্তকাদি যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করিয়া চলিবে, তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য সকল পুস্তকই থাকিবে ও সকলের অবাধ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকিবে। সংবাদপত্র নিয়মিত স্থানে পড়িতে হইবে।

১৫। অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালক সকলের পরস্পর পরস্পরের অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। বিদ্যালয়ে খুব বেশী ছাত্র থাকিবে না। প্রতি [illegible] জনের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে।

১৬। ভগবৎ আরাধনা ও স্ব স্ব শাস্ত্র ও বর্ণোক্ত আচার ব্যবহার নিয়মাদি যথারীতি পালন করিতে হইবে, সর্ব্বদা পবিত্র থাকিতে হইবে। নিজেদের শাস্ত্রের জ্ঞান অধ্যয়ন ও শ্রবণ দ্বারা অর্জ্জিত হইবে।

এইগুলিই সাধারণ কথা। বিশেষ কথা নিজেরা ঠিক করিবেন বা স্ব স্ব কেন্দ্রের নিকট অবগত হইবেন।

কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

১। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ—পঞ্চবটী কানন, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড মাণিকতলা, কলিকাতা।

২। জাতীয় বিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন—৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৩। কলিকাতা বিদ্যাপীঠ—১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

৪। চরকা শিক্ষার স্থান—বিদ্যাসাগর-বাটী, বাদুড়বাগান।

৫। তিলক জাতীয় বিদ্যালয়—১৫৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অর্থকরী শিক্ষা।

কলিকাতায় বাণিজ্য-বিদ্যালয়।—কলিকাতার জন-কয়েক ভারতীয় নেতৃস্থানীয় বণিক যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় একটি বাণিজ্য-সংক্রান্ত কলেজ স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রফেসার শরচ্চন্দ্র ঘোষ, এম-এ ও অমরনাথ পালিত, এম-এসসি, প্রস্তাবিত কলেজে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। সময়াভাববশতঃ ইঁহারা স্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিতেছেন।

—বীরভূমবাসী ও আনন্দ-পত্রিকা।

অর্থার্জ্জনের সহজ উপায়—চরকা।

উৎকৃষ্ট চরকা—আমার কাছে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চার টাকা দামের চরকা পাওয়া যায়। রেলওয়ে পার্শেলে পাঠাই।

রামসর্ব্বস্ব নন্দী।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চরকা কাটা সুতা বিক্রয়ের কথা।—বর্ত্তমান নন্-কো-অপারেশন হুজুকে বঙ্গের প্রায় প্রতি গ্রামেই চরকা দ্বারা সুতাকাটা আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকদিন শিক্ষার পর লোকে ভাল সুতা কাটা আরম্ভ করিলে বিক্রী ও পাঠাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত অবগত হইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় স্ব স্ব নাম ঠিকানা সহ পত্র দিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত, মাদ্রাসা ষ্টোর এণ্ড এজেন্সি।

২৩ নং দেদার বক্স্ লেন, ওয়েলেস্‌লি, কলিকাতা।

—২০ পরগণা বার্ত্তাবহ।

চরকা দান।—শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি উৎসবে এদেশে অনেকেই দান করিয়া থাকেন। অন্নদান, বস্ত্রদান, অর্থদান প্রভৃতি বহুবিধ দানের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বস্ত্রের যেরূপ কষ্ট, তাহাতে ইহার উন্নতির জন্য এইরূপ উৎসবাদি উপলক্ষে চরকা দানের ব্যবস্থা করা উচিত। দরিদ্র বিধবাদিগকে চরকা দান করিলে তাহারা তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন এবং বস্ত্র নির্ম্মাণেরও সহায়তা হইতে পারিবে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

স্বাধীন ব্যবসা—খেজুরের গুড় ও চিনি।

আমি এ প্রদেশে,—অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত খণ্ডে (C. P. and C. I.) প্রায় ৪২ বৎসর বাস করিতেছি। ওকালতী ব্যবসা করিতে করিতে আমি অত্রত্য খেজুর বন হইতে কি পরিমাণে খেজুর-গুড় ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে তাহা স্থানে স্থানে পরীক্ষা করিয়া [illegible]

করিয়া একটি কোম্পানি ইন্দোর রাজ্যে স্থাপন করিয়াছি। ইন্দোর সহরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে, নদীয়া জেলা হইতে ২৪জন গাছী অর্থাৎ সিউলী আনাইয়া, খেজুর-গাছ হইতে গুড় ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিতেছি। মাঘ মাসের শেষ হইলেই ঐ গাছীরা দেশে ফিরিয়া যাইবে। তার পরে আমাদের কোম্পানির আকের চাষ ও নানা প্রকার কৃষিকার্য্যের কর্ম্ম চলিবে। প্রায় ২৫ বৎসর হইতে আমি এই প্রকারে যশোহর, ২৪পরগণা, নদীয়া হইতে গাছী আনাইয়া স্বকীয় কার্য্য চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে, ও অনেক পরিশ্রম করিয়াছি। শেষ জীবনে ও বৃদ্ধাবস্থাতে স্বকীয় কর্ম্ম করিতে গেলে, যাহাতে আমার অবর্ত্তমানে আমার চেষ্টা, পরিশ্রম, ও বিস্তর খরচ ব্যর্থ না হয় সেইজন্য কোম্পানি স্থাপন করিয়াছি। গাছী লইয়া কেহ এখানে গুড় ও চিনি তৈয়ারী শিখিতে আসিলে অগ্রিম কাহাকেও আমরা কিছুমাত্র টাকা দিব না, বাসস্থান দিব, ও খাইবার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব; এবং যে পরিমাণে খেজুর-গুড় আমরা পাইব তাহার মূল্য দিব। তাহাতে বেশ বলিতে পারি, প্রত্যেক গাছী ৪।৫ মাস এখানে থাকিয়া সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া নিদান পক্ষে ১০০ এক শত টাকা লাভ করিতে পারিবে। আর যে ভদ্রসন্তান গাছীদের দল আনিয়া আমাদের কোম্পানি-ভুক্ত হইয়া প্রতি বৎসর কার্য্য চালাইবেন তাঁহারাও ঐ গাছীদের উৎপন্ন ও আমদানি হইতে অংশ পাইবেন। কিছুদিন বাদে আমি কলিকাতাতে ও যশোহরে গিয়া সম্পূর্ণ আলোচনা করিব ও যাঁহারা এ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগের সহিত পাকা ব্যবস্থা করিতে পারিব।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—উকিল, খাণ্ডয়া, সি, পি।

স্বাধীন ব্যবসা—দেশলাই।

ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় ২৫ বৎসর অদম্য উদ্যমের পর দেশলাই প্রস্তুতের কল আবিষ্কার করিয়াছেন। সমস্ত সাজসরঞ্জাম সমেত কলটির মূল্য দুই সহস্র টাকা মাত্র। একটি কলে প্রতিদিন আট গ্রোস বা ৯৬ ডজন দেশলাই প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলটিতে আরও একটি সুবিধা যে, যে কোন কাঠে কাজ চলিতে পারে, কিন্তু বিলাতী কলে তাহা চলে না। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার দেশলাই জাপান ও সুইডেন হইতে আমদানী হয়, আমাদের আশা আছে প্রতি জিলায় অন্ততঃ ২।৪টি দেশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। "দেশলাইটি পর্য্যন্ত আসে বিদেশ হ'তে" কি লজ্জার কথা।—যশোহর।

স্বাধীনতার পথ।

সালিশী বিচার—মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা বর্জ্জন-নীতির প্রভাবে দেশের নানাস্থানে মামলা মোকদ্দমা সালিশী বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে খড়গপুরের অধিবাসীবৃন্দ সকলপ্রকার অভিযোগ সালিশী বিচার দ্বারা আপোষে মীমাংসা করিয়া লইতেছেন। সেদিন কালীঘাটে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় ভদ্রলোক কর্ত্তৃক একটি গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমা সালিশীতে নিষ্পত্তি হইয়াছে। উভয় পক্ষই স্বেচ্ছায় কালীঘাট জাতীয় বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। মালদহেও ঐ প্রকার একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা সালিশীতে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশ যে বেহারের ছাপরা ও মতিহারী জেলায় ফৌজদারী মোকদ্দমা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমাও তিন ভাগের অধিক কমিয়াছে। উকীল মোক্তার মহাশয়রা হাত গুটাইয়া বসিয়াছেন। মামলা মোকদ্দমায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। বর্জ্জন-নীতির প্রভাবে যদি উহার মেরুদণ্ড জীর্ণ হয়, তাহা হইলে দেশের একটা মহান্ কল্যাণ সাধিত হইবে।

—নীহার।

মাদ্রাজে সালিশী আদালত।—মাদ্রাজের মহাজন সভা-গৃহে উকিলেরা এক সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে সেখানে সালিশী আদালত বসিবে। শ্রীযুত পার্থসারথি আয়াঙ্গার এই আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুত বেঙ্কটরাম আয়ার এবং এন্ রামরাও যথাক্রমে সেক্রেটারী এবং সহকারী সেক্রেটারী হইয়াছেন।—মোহাম্মদী।

বীরভূমে সালিশী বিচার।—আমাদের একজন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন, "বীরভূম জেলায় মাঠপলশা ইউনিয়নের অন্তর্গত পানিত গ্রামের ৺ভোলানাথ মোদকের নাবালক পুত্রের একটি ছোট বাছুর সহিস ডহরী গ্রামের একজন গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়ীর চাকায় থেঁতলাইয়া মারিয়া ফেলে। বাছুরের মালিক গাড়োয়ানের নামে তত্রত্য গ্রাম মেম্বরগণের নিকট মোকদ্দমা করিলে গাড়োয়ানের ১৫০৲ টাকা জরিমানা হয়। এই জরিমানার মধ্যে পাঁচ টাকা ভোলানাথের পুত্রকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য দিয়া বাকী টাকা মেম্বরগণের নিকট জমা রাখা হইয়াছে।" এক্ষণ এই টাকার সদ্ব্যবহার হইলেই এরূপ বিচারে সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন।—বীরভূমবার্ত্তা।

সর্ব্বনেশে কু-অভ্যাস—স্বাধীনতার অন্তরায়।

ঘোড়দৌড়ে সর্ব্বনাশ।—যে-সকল বিলাতী বিলাসে আমাদের টাকার অজস্র অপব্যয় হয়, ঘোড়দৌড় তন্মধ্যে অন্যতম। ঘোড়দৌড় জুয়াখেলা ক্রমে কলিকাতার ধনী সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছে। এই ঘোড়দৌড়ের বাজীতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়িত হইয়া কত সম্ভ্রান্ত ধনী বনিয়াদী বংশ যে সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ফকির সাজিতেছে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাছাড়া সাধারণ ভাবেও ইহাতে দেশের কম টাকার শ্রাদ্ধ হয় না। প্রত্যেক খেলার দিনে এদেশবাসীকে দর্শনী হিসাবেই অন্ততঃ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হয়। বেটিংএর শতকরা ১০ টাকা হিসাবেও প্রায় সপ্তাহে একলক্ষ টাকা দিতে হয়। ফলতঃ এই-সব ব্যাপারে প্রতি সপ্তাহে দেশবাসীর অন্ততঃ দুইলক্ষ টাকা অপব্যয় হইয়া থাকে। নন-কো-অপারেশনের কোন মহাত্মা এইস্থানে নন-কো-অপারেশন চালাইয়া দেশের বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইবেন কি?—মোসলেম-হিতৈষী।

কু-অভ্যাস-বর্জ্জন বা শক্তি-অর্জ্জন।

সুরাপান-ত্যাগ—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুরের কতিপয় লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ ছাড়িয়াছে। এইসকল লোকের প্রতিজ্ঞা বজায় থাকিলে দেশের মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। কলিকাতা অঞ্চলের দেশী মদের দোকান প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রকাশ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বহরমপুরের দেশী মদের দোকানে লোকাগমের সমান ভাবে দৈনিক আমদানি হইতেছে। এখানকার মজুররা এখনও তাহাদের ভুল বুঝিতে পারে নাই—ইহা কি কম দুঃখের কথা।

মদের দোকান বন্ধ।—প্রকাশ ২৪ পরগণা নৈহাটী পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশী মদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ কলের মজুরেরা মদ্যপান বন্ধ করিয়াছে। পাটনা ও বাঁকিপুরের বেনীয়াগণ এবং ভদ্র

করিয়া শপথ করিয়াছে যে, তাহারা আর মদ্যপান করিবে না। তাহাদের মধ্যে যে কেহ মদ্যপান করিবে, তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইবে।

—প্রতিকার।

সুসংবাদ।—কৃষ্ণনগরে কতিপয় ছাত্র মাদক দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বেশ কাজ করিতেছে। শুনা যাইতেছে, মাদক দ্রব্য বিক্রয় অনেকটা কমিয়াছে।—এডুকেশন গেজেট।

আত্ম-শক্তি-লাভ বা স্বরাজ।

স্বরাজের অর্থ আত্মবশতা এবং ইহাই স্বরাজ। পল্লীর উন্নতিতেই স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। যে-সব যুবক বিত্তসম্পন্ন নহেন—অর্থ অর্জ্জন না করিলে চলিবে না, তাঁহারা স্বাধীন জাতীয় যুবকগণের যাহা বৃত্তি তাহাই গ্রহণ করুন, যাহা করিয়া মাড়োয়াড়ী ভাটিয়া ইংরেজ জর্ম্মান অন্ন সংস্থান করিতেছেন তাহাই করুন। দেশের ধনী সম্প্রদায় কাগজের কারখানা করিয়া বস্ত্রের কারখানা করিয়া চিনির ও দেশলাইয়ের কারখানা করিয়া অল্প খাজনায় জমি ও মূলধন দিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিন। তবে এই আন্দোলন প্রকৃত জাগরণ হইবে।

স্বরাজ্য বা স্বরাজ একটা অদ্ভুত কিছু নয়। নিজের শক্তিতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখাই স্বরাজ। আজ যদি জাতি এই ভাবে প্রতিষ্ঠা হয় তবে নয়মাসে মহাত্মা গান্ধীর আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ লাভ হইবে। স্বরাজ ইংরেজ দিবে না, আমাদের অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহারই সাধনা কল্পে, গঠনের সেবায়।—খুলনা।

দেশাত্ম-বোধ ও সৎসাহস।

ধুতি-চাদর—নোয়াখালি থেকে যিনি নতুন কাউন্সিলের সভায় সভ্য হয়েছেন তিনি ধুতি চাদর পরে কাউন্সিলে গিছ্‌লেন। আমাদের নবীন সভ্যরা ত একেবারে লজ্জায় অধোবদন। কেউ হাস্‌লেন, কেউ টিট্‌কারী কর্‌লেন, কেউ 'দেশের কি গতি হবে' ভেবে কাঁদকাঁদ হয়ে পড়্‌লেন। কিন্তু মরদের বাচ্ছার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে একটা সভা করে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে হ্যাট কোট তিনি পর্‌তে না চান, অন্ততঃ যেন চোগা চাপকান পরে কাউন্সিলের মুখ রক্ষে করেন। আর কোনদিন না হয় ত অন্ততঃ ডিউক অব কনট যেদিন উপস্থিত থাক্‌বেন সেদিন যেন ধুতি-চাদর না পরেন। বলো কি গো। যে-সে লোক নয়, রাজার খুড়ো—আর তার সাম্‌নে এমনি অশ্লীল ভাবে যাওয়া। কিন্তু নোয়াখালির সেই অ-সভ্যটি ধুতি-চাদর পরে গিছ্‌লেন। রাজার খুড়ো বাড়ীতে গিয়ে ভিরমি গিছ্‌লেন কি না সে খবর আমরা এখন পাইনি।—বিজলী।

আমরা বলি যে হিন্দি ভারতের সাধারণ জাতীয় ভাষা হয় হউক; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের গৌরবের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যেন অবিচার না করিয়া বসি। আমাদিগের সাহিত্যকে আমরা উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া তুলিব এবং ভারতের মহামিলনভূমিতে গিয়া যখন আমরা দাড়াইব তখন উহাই হইবে আমাদিগের একটি গৌরবময় দিবার ধন। "বিজলী" বলিয়াছেন "বঙ্কিমের সাধের তরী তরঙ্গে না ডোবে।" আমরা বলি বাঙ্গালীর সম্পদ ধন, নির্ধন বাংলার একমাত্র রত্ন বিশ্বের হাটে দেখাইবার একটি মাত্র বস্তু, দেখিও ইহার যেন কোন ক্ষতি না হয়।—খুলনা।

ব্যবস্থাপক সভায় ধুতি চাদর ও বাঙ্গলা ভাষা।—গত ১৮এ ফাল্গুনের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও সংস্কার প্রবর্ত্তন কাউন্সিল সদস্যের ধুতি চাদর পরিধান করিয়া সভায় আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। এমভীবীদের একজন প্রতিনিধি ধুতি চাদর পরিয়া সভায় আসিয়াছিলেন। নোয়াখালির সদস্য শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও একজন গো-শকটের মালিক প্রভৃতি কয়েকজন সদস্য ইংরেজী ভাষা না জানায় বাঙ্গালা ভাষাতেই সত্যপাঠ করিয়াছিলেন।—খুলনাবাসী।

অনুন্নত শ্রেণীর দেশাত্ম বোধ।

রজকের নিবেদন—মহাশয়! আমি একজন অতি সামান্য নিরক্ষর উড়িয়া (ধোপা)। যখন প্রত্যেকেরই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ না করিলে দেশের কাজ হইবে না, তখন আমি ধোপা আমার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি আপনার পত্রে লিখিয়া দেশের কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

আজ আমরা ধোপা-সম্প্রদায় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দিনের রুটী উপায় করিতে সক্ষম হইতেছি না। তখন আমি এই স্থির করিয়া দেশের মায়ের ডাকে আমিও সাড়া দিতেছি যে, আমি আর কোন বিলাতি কাপড় কাচিব না। এস সহর মফঃস্বলের হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী উড়িয়া প্রভৃতি ধোপা ভাই-সকল, আমরা কিছুদিনের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বার্থত্যাগের দ্বারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, আমরা আর কোন বিলাতি কাপড় ও জামাদি কাচিব না। ৭২।এ সুকিয়া ষ্ট্রীট, ইতি জনৈক উড়িয়া রজক।—আনন্দ পত্রিকা।

ঝাড়ুদারগণের সৎকার্য্য—পত্রান্তরে প্রকাশ—গত ১৬ই জানুয়ারী ধনেশ্বর আস্তানে গাটনার ঝাড়ুদারগণ এক সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা আর মদ তাড়ি খাইবে না, নেশা-ভাং করিবে না; মিথ্যা কথা বলিবে না; স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করিবে; মামলা মোকদ্দমার সালিশী নিষ্পত্তি করিবে এবং আপৎকালে পরস্পরকে সাহায্য করিবে। যে এ-নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহাকে পাঁচ বৎসরকাল জাতিচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে; তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা হইবে, আর তাহাকে ঝাড়ুদারণীর হাতে পাঁচ ঘা ঝাড়ু খাইতে হইবে। যে নিয়মভঙ্গকারীকে ধরাইয়া দিবে, সে পাঁচ সিকা বখশিস পাইবে। ভদ্রলোকেরও ঝাড়ুদারগণের এই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। কলের কুলি মজুর ও ঝাড়ুদারগণ হইতেও কি তথাকথিত ভদ্র-আখ্যাধারীগণ নীচ হইয়া থাকিবেন? এখনও ভাই পথে আইস।—খুলনাবাসী।

কসাইদিগের প্রতিজ্ঞা—মানভূম জিলার অন্তর্গত চিরকুতা সহরস্থিত কসাইগণ আর গো-হত্যা করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত তত্রস্থ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে লবণের ব্যবসায় প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।—ঢাকাপ্রকাশ।

অনুন্নতের উন্নতি-বিধানেই স্বরাজ-লাভ।

অনাচরণীয়ের মনঃক্ষোভ—হিন্দুদিগের মধ্যে যে-সকল জাতি অনাচরণীয় অর্থাৎ যাঁহাদের স্পর্শে জল অশুদ্ধ হইয়া যায় ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতীয়গণ তাহা পানীয় হিসাবে গ্রহণ করেন না, সেই-সকল জাতি বড়ই মর্ম্মাহত হন যখন তাঁহাদের বালকগণ বিদ্যালয়ের হিন্দু বোর্ডিংএ স্থান পান না। বিদ্যালয়ের হিন্দু বোর্ডিংএ ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় এবং যে সকল জাতির স্পর্শে জল অনাচরণীয় হয় না, তাঁহারাই স্থান পাইয়া থাকেন। অনেক হোষ্টেলে সাহা ও সুবর্ণবণিকের ন্যায় শিক্ষিত জাতিদিগেরও ছাত্রগণ স্থান পান না—আমাদের জনৈক সাহা বন্ধু হিন্দু হোষ্টেলে স্থান না পাইয়া এক সময়ে যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন তাহাতে আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। বিদ্যাদানের সাম্যভাবে অনাচরণীয়গণ উচ্চজাতির সমকক্ষ হইতে পারে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেই অনাচরণীয়

দের প্রবেশ নিষেধ। এ-বিষয়ে দুই এক ক্ষেত্রে "মেসে" কিছু উন্নতি দেখা যায়। যাই হ'ক আচরণীয় বা অনাচরণীয় সকলেই নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করেন এবং হিন্দুনামধারী সকলকে এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যখন আমরা ভাবিয়া থাকি ও বিদ্যালয়ে সকলেই যখন একত্র শিক্ষিত হয়, তখন ছাত্রাবাসে সকলের রীতিনীতি বজায় রাখিয়া এমন এক ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে হিন্দুনামধারী কোন অনাচরণীয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া না আসেন। বিতাড়িত অনাচরণীয়গণ যেরূপ বিজাতীয় ক্রোধ ও অসহ্য জ্বালা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন তাহাতে স্বদেশহিতৈষী প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির এ-বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।—নবসঙ্ঘ।

সেদিন কলেজস্কোয়ারে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতবন্ধু মিঃ এণ্ড্রুজ বলিয়াছেন, "আপনাদের দেশের ৫ কোটি কি ৬ কোটি লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া কিছুতেই আপনারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবেন না। যে অপরকে দাস করে বা অধীনে রাখিতে ব্যস্ত হয় সে কখনই প্রকৃত স্বাধীনতার সুখের আস্বাদ পায় না। আমি নিজে ইংরেজ, ইংলণ্ড আমার জন্মভূমি; কিন্তু তাই বলিয়া যে ইংলণ্ড হ্যাম্পডেন, ক্রমওয়েল, মিল্টন, বার্ক, শেলী, বাইরন এবং গ্লাডষ্টোনকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিল, যদি সেই ইংলণ্ড আজ তাহার অধীন উপনিবেশসমূহে অপরকে জোর করিয়া অধীন করিয়া রাখে—যদি সে কেবলমাত্র অস্ত্রবলের জোরে—নির্য্যাতন এবং অত্যাচারের প্রভাবে ভারত এবং আয়ার্লণ্ডকে অধীন করিয়া রাখিতে চায়, সে-ইংলণ্ডকে আমি কিছুতেই ভালবাসিতে পারি না। যে-ভারত অপরকে দাস করিয়া রাখে, আপনারা সে-ভারতের গর্ব্ব করিতে পারেন না। এইজন্যই মহাত্মাজী বলিয়াছেন—ভারতবাসীরা যদি পতিত এবং অস্পৃশ্য জাতিদিগকে স্বাধীনতা দান না করে তবে এক বৎসরে যেন একশত বৎসরেও ভারত মুক্তিলাভ করিবে না।"

—প্রতিজ্ঞা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

চিত্তের জয়

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বরাজ।

যিনি নিজেই নিজের রাজা, স্বরাজ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। নিজেই নিজের রাজা হইতে হইলে নির্ভীক হইতে হইবে, ন্যায়বান্ হইতে হইবে, মানবপ্রেমিক হইতে হইবে। নির্ভীক হইতে হইবে এইজন্য, যে, যদি কেহ তাঁহাকে বলে, আমার হুকুম শোন, আমার আইন মান; তিনি বলিবেন, যে-আদেশ আমার বিবেকবিরুদ্ধ তাহা শুনিব না, যে-আইন আমার কিম্বা আমার প্রতিনিধির প্রণীত নহে তাহা আমি মানিতে বাধ্য নই,—তাহা আমি মানিতে পারি, না-মানিতেও পারি। তাহাতে যদি কেহ বলে, জরিমানা করিব, বেত মারিব, জেলে বন্ধ করিব; তিনি বলিবেন, জরিমানা দিব না, বেত খাইব ও জেলে যাইব, কিন্তু তোমার কথা শুনিব না। যদি কেহ ট্যাক্স্ চায়, তিনি বলিবেন, যে-ট্যাক্স্ স্থাপনে আমার বা আমার প্রতিনিধির সম্মতি ছিল না, তাহা দিব না। তাহার পর জরিমানা, বেত্রাঘাত ও জেলের ভয়ের পূর্ব্ববৎ উত্তর। অবশ্য ইহার পর যাবজ্জীবন কারাবাস বা নির্ব্বাসন এবং আইনসঙ্গত বা বেআইনী প্রাণদণ্ডও আছে। তাহাতে যাঁহার ভয় হইবে না, তাঁহার স্বরাজ্যসিদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু এই নির্ভীকতা আসিবে কোথা হইতে? সুখ-দুঃখের বশ হইলে,

নষ্ট হইবে, এবং অপরে আপনার অনিষ্ট করিবার বৈধ কারণ পাইবে।

ব্যক্তিগত স্বরাজ্যসিদ্ধি যাঁহার হইয়াছে, এরূপ একজন মানুষও জাতীয় স্বরাজ্যসিদ্ধির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ। যদি কোন জাতির মধ্যে এরূপ মানুষ অনেকগুলি থাকেন, তাহা হইলে ত সেই জাতিটি স্বরাজ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ।

স্যার্ রাসবিহারী ঘোষ আইনজ্ঞদিগের অগ্রণী এবং অতিশয় বিদ্বান্ ও মনস্বী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁচাত্তরের উপর হইয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি প্রখর বুদ্ধি ও অগাধ আইনজ্ঞান সহকারে ওকালতী করিয়া গিয়াছেন। এত বয়সেও তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার বা স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয় নাই। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ প্রবল ছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর পুস্তক ছিল। তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, পাণ্ডিত্য এবং রচনাপটুতার পরিচয় পাওয়া যাইত। লর্ড কর্জ্জন্ যখন পাশ্চাত্য মহাদেশকে সত্যবাদিতার আকর এবং প্রাচ্য মহাদেশকে মিথ্যার কারখানা বলিয়া মিথ্যা [illegible] প্রচার করেন, তখন কলিকাতার টাউন হলে সভাপতিরূপে ঘোষ মহাশয় তাঁহার বর্দ্ধমান-জেলাস্থিত জন্মগ্রামের ইংরেজী বিদ্যালয়কে তিনি দেড়লক্ষ টাকা, এবং আইন-বহি ছাড়া তাঁহার লাইব্রেরীর আর-সব রকমের বহি দান করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে একটি শিবমন্দিরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথমে দশ লক্ষ, তাহার পর এগার লক্ষের উপর এবং শেষ উইল দ্বারা আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুটি দানের যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং যথেষ্ট ফললাভ এখনও হইয়া উঠে নাই। কর্ম্মীদের নিয়োগ-প্রণালী কিরূপ হইলে এবং অন্য বন্দোবস্ত কিরূপ হইলে, সুফল হইতে পারিত, বলা সহজ নহে। কারণ কৌশলী লোকের পক্ষে প্রভুত্ব-রক্ষা ও অনুগত-পালন চেষ্টার পথ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নহে। রাসবিহারী-বাবুর শেষ দান আড়াই লক্ষ টাকা হইতে কৃষির উন্নতির জন্য এমন লোকদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, যাঁহারা ভ্রমণ করিয়া এবিষয়ে জ্ঞান লাভ ও বিস্তার করিবেন। উদ্দেশ্য সাধু। যদি দাতার টাকায় কাহারো হাওয়া খাইবার ব্যবস্থা না হয়, যদি কৃষিবিৎ শ্রমপটু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ উৎসাহী লোক বৃত্তি পান, তাহা হইলে ঘোষ-মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ তাঁহার দান পাওয়ায় বড় ভাল হইল। ইহা না পাইলে পরিষৎ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত বহুলক্ষপরিমিত [illegible] হইতেও

পরিচালিত দেশের লোক হইলে তাঁহার দ্বারা আরো কত কাজ হইতে পারিত। এদেশে তিনি ওকালতী করিলেন, আইনের ২।১ খানা বহি লিখিলেন, টাকা রোজগার করিলেন, সৎকার্য্যে লক্ষলক্ষ টাকা দান করিলেন, ইংরেজ আমলাতন্ত্র ও শাসকের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন, দুই-একটা আইন প্রণয়নকালে কিছু পরামর্শ দিলেন ও কিছু বাধা দিলেন। স্বাধীন দেশে জন্মিলে তিনি

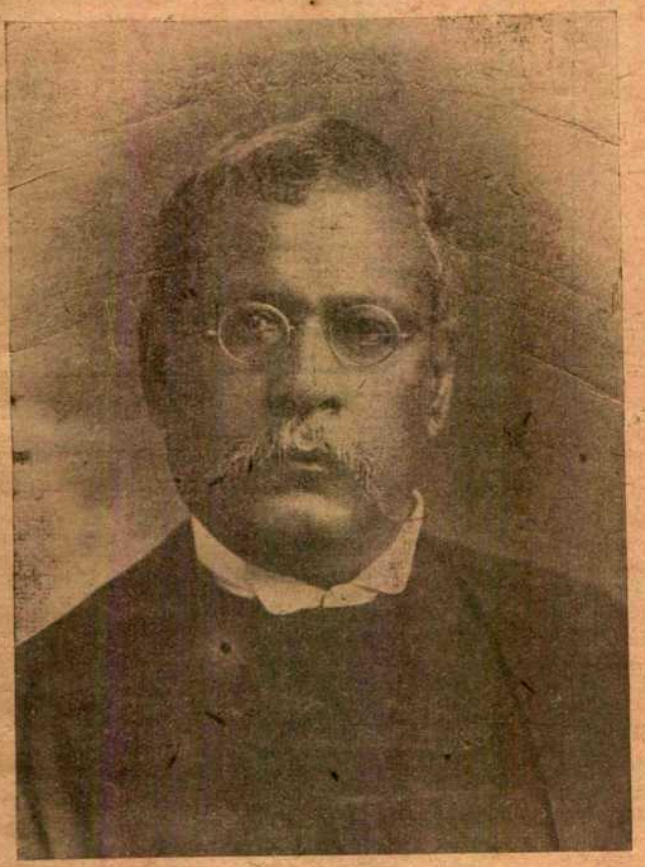

স্যর্ রাসবিহারী ঘোষ।

দেশপতি বা প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিতেন, এবং জাতীয় উন্নতিবিধায়ক নানারূপ ব্যবস্থা ও চেষ্টা করিতে পারিতেন, দেশকালের উপযোগী উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন, এবং হয়ত আইনের ভাষ্য ছাড়া তদপেক্ষা স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট মানসসন্তান রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা।

রয়টারের তারের খবর মধ্যে মধ্যে এইরূপ আসে, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডে সামরিক আইন জারী করিয়া, নিগ্রহনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় খুব কড়াশাসন প্রচলিত করায় দেশটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। অমনি তাহার পরেই ঐ রয়টারের খবরেই দেখা যায়, একটা কি ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে; আইরিশ দলের কোন কোন লোক ব্রিটিশ সেনাপতি, সেনা, পুলিশ খুন করিয়াছে, বারিক্ উড়াইয়া দিয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসল কথা, আইরিশরা পুরা স্বাধীনতা না পাইলে, তাহাদের নেতা "দেশপতি" ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে তাহারা যে-সাধারণতন্ত্র কাগজে (এবং কতটা কাজেও বটে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তদ্রূপ কোন শাসন-প্রণালী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও উহার মিত্র শক্তিদের দ্বারা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত না হইলে, দেশ ঠাণ্ডা হইবে না। আইরিশরা ইংরেজদের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখিতে চায় না। ইংরেজরাও কেবল জেদ বশতঃ এবং প্রধানতঃ সামরিক কারণে আয়ার্ল্যাণ্ডকে অধীনতামুক্ত করিতেছে না। তাহাদের ধারণা আইরিশরা স্বাধীনতা পাইলেই ইংলণ্ডের শত্রুদলে যোগ দিবে। অবশ্য, পাপীর আশঙ্কা অনিবার্য্য; ইংলণ্ড সাত আটশত বৎসর ধরিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে এবং তিনশত বৎসর ধরিয়া বহু-পরিমাণে আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন হইতে ভাল ব্যবহার করিলে আইরিশদের মিত্রতা লাভ অসম্ভব নহে। তা ছাড়া, নিজের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতার জন্য অপরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করা কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত জানি না, ইংরেজদের বাহু অবলম্বন খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ত তাহা করিতে বলে না।

দমননীতির ঐহিক স্থায়ী সাফল্য কেবল মাত্র অত্যাচরিত জাতির সমূলে বিনাশ দ্বারা হইতে পারে (পার-

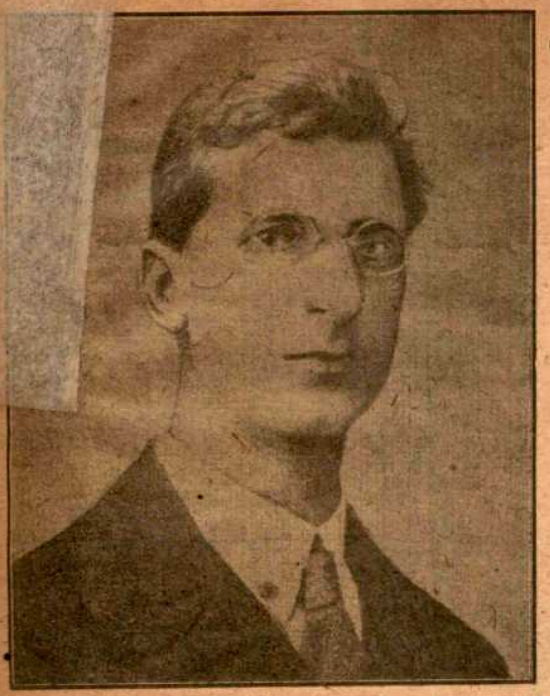

আয়ার্লাণ্ডের স্বরাজ্যের দেশমুখ প্রেসিডেণ্ট ডি ভালেরা।

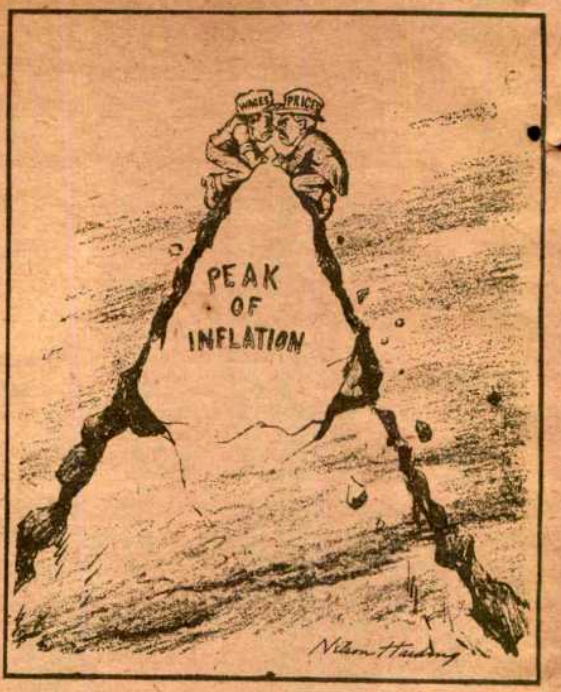

বাড়ের সীমা।
চড়া দাম ও মেহনতআনা চড়িতে চড়িতে শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে।
এখন আর নামা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ত্রিক বা আধ্যাত্মিক সফলতার কথা এইজন্য বলিতেছি না, যে, জেতা জাতিরা মুখে পরলোক ও আত্মা মানিলেও তাহারা বস্তুতঃ ইহলোকসর্ব্বস্ব ও দেহসর্ব্বস্ব)। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে জেতা ইংরেজরা আইরিশ জাতিকে নির্ম্মূল করিতে পারিবে না, আইরিশদের মধ্যে যাহারা পাশববল প্রয়োগের পক্ষপাতী তাহারাও সমুদয় ইংরেজ পুলিশ ও সৈন্যকে বধ করিতে পারিবে না। সুতরাং, যেমন ধর্ম্মবুদ্ধির দিক্ দিয়া, তদ্রূপ লৌকিক বুদ্ধির দিক্ দিয়াও আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। খুন্‌খারাপী, ঘর জ্বালান, সহর জ্বালান, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত লোকেরাও প্রতিশোধ লইবার জন্য করিতেছে; কর্ক সহর তাহারাই পুড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বলপ্রয়োগভক্ত আইরিশ্‌রা দমিতেছে না। একটি আইরিশ বালিকার মনে বড় ক্ষোভ ও অপমানবোধ ছিল, যে, তাহাদের জেলায় সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কিন্তু অল্পদিন হইল সে তাহার কলিকাতাস্থ স্বজাতীয় একজন আইরিশ্‌কে উল্লাসের সহিত জানাইয়াছে যে, এখন তাহার জেলায় সামরিক আইন জারী হইয়াছে! এরূপ জাতিকে নিগ্রহনীতি দ্বারা জব্দ করিবার চেষ্টা গুলিবারুদের অপব্যয় মাত্র—ক্যাথলিক হেরাল্ডের সম্পাদকের মত এই।

—

জিনিষের চড়াদাম ও উচ্চ মজুরী।

ডিম আগে, না পাখী আগে? বীজ আগে, না গাছ আগে? এইরূপ প্রশ্ন যে-প্রকার, আজকাল আর-একটি প্রশ্নও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। জিনিষপত্র আক্রা হওয়ার দরুন সব জায়গার সব রকমের কর্ম্মীরা বেশী মাহিনা মজুরী চাহিতেছে; আবার বেশী মাহিনা ও মজুরী দিতে হয় বলিয়া, কৃষিক্ষেত্র হইতে কারখানা পর্য্যন্ত যে-সব জায়গায় মানুষের ব্যবহার্য্য কোন না কোন জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহার মালিকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বেশী রাখিতেছেন। আবার বেশী মূল্যে জিনিষপত্র কিনিতে হয় বলিয়া শ্রমীরা ফের বেশী পারিশ্রমিক চাহিতেছে। তাহা দিতে হওয়ায়, আবার পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বাড়িতেছে। তাহাতে শ্রমীদের আয়বৃদ্ধির

ইচ্ছার নূতন কারণ জন্মিতেছে। ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্র; বিশেষ করিয়া সেইসব দেশে যেখানকার শ্রমীরা কতকটা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দলবদ্ধ। তাহাতে কোন কোন দেশে ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে, জিনিষ-পত্রের চড়া দাম এবং মজুরীর উচ্চ হার এমন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যে, আর বাড়িবার উপায় নাই। আমেরিকার একখানি কাগজের একটি ব্যঙ্গচিত্রে এই অবস্থা সূচিত হইয়াছে। তাহার প্রতিলিপি এখানে দেওয়া গেল।

—

বিজ্ঞানাচার্য্য মেঘনাদ সাহা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, ডী-এসসী, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে গবেষণা দ্বারা দেশে থাকিতেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন কোন গবেষণা বিদেশী উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিলাতে গিয়া তাঁহার খ্যাতি আরও বাড়িয়াছে। আমেরিকার পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার ক্রেহর্ন্ (Dr. Crehórne) তাঁহার "পরমাণু" (The Atom) নামক পুস্তকের ভূমিকায় ও মূলপুস্তকে ডাক্তার সাহার নিকট বহুবার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। যেসব দুরূহ বিষয়ে ডাঃ সাহা গবেষণা করিয়াছেন, বাংলাভাষায় তৎসম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দ এখনও রচিত না হওয়ায় তাহার আভাস দিতে পারিতেছি না। মার্চ্ মাসের মডার্ন্ রিভিউয়ে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের একখানি চিঠি হইতে এবং ডাক্তার ক্রেহর্নের পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া কিছু আভাস দিয়াছি।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। বঙ্গে সাহা জাতির সামাজিক স্থান বামুন কায়েত বদ্দি কামার কুমার প্রভৃতির নীচে। ইহা হিন্দুসমাজের একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপকর্ষ যে জা'তের উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রমাণ হাজার হাজার মানুষের আচরণে, কাজে ও জীবনে দেখা যায়। ডাক্তার মেঘনাদ সাহার চরিত্র ও কার্য্য আর-একটি দৃষ্টান্ত। হিন্দুসমাজ বৈদিক যুগের মত স্থিতিস্থাপক থাকিলে ইনি ও ইহাঁর মত আরও অনেক যুবক দ্বিজ পদবী পাইতেন। কারণ ব্রাহ্মণের অন্যতম কার্য্য যে জ্ঞানান্বেষণরূপ তপস্যা, তাহা ইহাঁরা নিষ্ঠার সহিত করিতেছেন। যাহা হউক, ইহাঁকে কেহ দ্বিজ বলুক বা না বলুক, ইনি সাতিশয় সম্মানার্হ।

—

একখানি পৃথিবীর ইতিহাস।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ্, জী, ওএল্‌সের লেখা পৃথিবীর ইতিহাস (*The Outline of History*, Cassell and Company, 21 *s.* net) নিখুঁত না হইলেও একখানি শ্রেষ্ঠ বহি। ইহা ইংরেজী-জানা ভারতীয়দের পড়া উচিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইনি অনেক হক্ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞানবুদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, গত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের ইংরেজ আম্‌লাদের শিক্ষা ও যোগ্যতা সেরূপ বাড়ে নাই; তাহারা নিজেদের অপকর্ষ জানিয়া অস্বস্তি বোধ করে, এবং জবর-দস্তি জুলুম ও মধ্যে মধ্যে নৃশংসতা দ্বারা (যেমন পঞ্জাবে) নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। ওএল্‌সের মতে পাশ্চাত্য জাতিদের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠতা বেশী দিন টিকিতে পারে না; তাহারা জানে না যে ত্রয়োদশ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে মোঙ্গোল প্রভৃতি প্রাচ্য জাতিরা ইউরোপের অনেক অংশ জয় করিয়াছিল; তাহারা জানে না যে বিজ্ঞান ও তাহার ফল কাহারও একচেটিয়া নহে, ইহা হাত বদ্‌লাইতে পারে ("They had no sense of the transferability of science and its fruits")। তাহারা উপলব্ধি করে না যে চীনা ও ভারতীয়েরা গবেষণার কাজ ফরাসী বা ইংরেজদের সমান দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে ("They did not realise that Chinamen and Indians could carry on the work of research as ably as Frenchmen or English-

শ্রীযুক্ত এইচ জী ওয়েল্‌স্‌।

men")। ওএল্‌স্‌ বিশ্বাস করেন, যে, প্রাচ্য লোকদের কোন বংশগত বা জন্মগত আলস্য বা উন্নতিবিমুখতা নাই, এবং পাশ্চাত্য লোকদেরও কোন বংশগত বা জন্মগত একচেটিয়া মানসিক উদ্যমশীলতা নাই যাহার দ্বারা তাহারা চিরকাল পৃথিবীতে প্রাধান্য ভোগ করিতে পারিবে। তাঁহার মতে, "এশিয়ার মানুষের মস্তিষ্ক ইউরোপের মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা একবিন্দুও নিকৃষ্ট নহে; ইতিহাসে দেখা যায় যে এশিয়াবাসীরা ইউরোপীয়দেরই মত সাহসী, তেজস্বী, শক্তিমান্‌, সদাশয়, স্বার্থত্যাগী, এবং দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে সমর্থ, এবং পৃথিবীতে ইউরোপীয় অপেক্ষা এশিয়ান্‌দের সংখ্যা বেশীই থাকিবে। বিশেষ কোন জাতির মধ্যে জ্ঞানকে আবদ্ধ রাখা সব যুগেই দুঃসাধ্য ছিল; ইহা এখন অসাধ্য হইয়াছে; জ্ঞান কোন না কোন পথ দিয়া এক জাতি ও দেশ হইতে অন্য জাতি ও দেশের মধ্যে চুয়াইয়া যাইবেই। আধুনিক সময়ে সভ্যতায় ও আর্থিক বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী সাম্য অনিবার্য্য। এশিয়া ইউরোপ-আমেরিকার এক শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা ১০।২০ বৎসরেই সারিয়া লইবে। এখন, চীনা ভাষা এবং চীনা জীবন ও চিন্তার ধারা যেখানে একজন ইংরেজ জানেন, সেস্থলে শত শত চীনা আছেন যাঁহারা ইংরেজদের সমুদয় জ্ঞানের অধিকারী। ভারতবর্ষে এবম্বিধ জ্ঞান ও জ্ঞানীর আধিক্য হয়ত আরও বেশী। ভারতবর্ষ ব্রিটেনে বিদ্যার্থী প্রেরণ করেন, ব্রিটেন ভারতবর্ষে আম্‌লা প্রেরণ করেন। ভারতে গিয়া তথাকার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও চলিত ঘটনা ছাত্ররূপে অনুশীলন করিবার ও জানিবার জন্য ইংলণ্ডীয় লোক পাঠাইবার কোনই ব্যবস্থা নাই।" ওএল্‌সের মতে জ্ঞানবিষয়ে এই প্রকারে প্রাচ্যের প্রাধান্য জন্মিতেছে।

ধর্ম্মবিষয়েও ওয়েল্‌স্‌ অনেক সার কথা বলিয়াছেন। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতবর্ষে সেইসব কথা আমাদের প্রণিধান ও স্মরণের যোগ্য। তিনি বলেন, "ধর্ম্মেধর্ম্মে যে রেষারেষি প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা তাহাদের ত্রুটি ভেজাল বিকৃতি ভাষা ও বাহ্যরূপের মধ্যে; কোন একটি ধর্ম্ম অন্য কোনটিকে পরাজিত করিবে বা নূতন কোন ধর্ম্ম আসিয়া তাহাদের সকলের স্থান দখল করিবে, এরূপ কোন ভবিষ্যতের দিকে আমরা তাকাইয়া থাকিব না; আমরা চাহিব, যে প্রত্যেক ধর্ম্মের খাদ পুড়িয়া গিয়া শুভ্র ধাতুটি নির্ম্মল হইয়া বাহির হইবে, এবং তখন সকলগুলি একই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সেই সত্য এই, যে, সকল মানুষের হৃদয়, জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই এক সর্ব্বময় ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অনুগত হওয়া চাই যিনি সকলের নিয়ন্তা।" ওএল্‌স্‌ ভবিষ্যৎ জগৎ-রাষ্ট্র (world-state) এবং জগৎ-ধর্ম্মে (world-religion) বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, "জগৎ-রাষ্ট্র সাধারণ জগৎ-ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; উহা সরল, বিশ্বজনীন, অধিকতর সহজবোধ্য হইবে। উহা খ্রীষ্টীয়, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইবে না, কিম্বা তদ্রূপ বিশেষ কোন রূপধারী কোন ধর্ম্মমত হইবে না; উহা হইবে স্বয়ং বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ধর্ম্ম।"

বিজ্ঞানাচার্য্য রসিকলাল দত্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং বর্ত্তমান অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, ডী-এস্‌সী, নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিয়াছেন ও তাহার প্যাটেণ্ট লইয়াছেন। তাঁহার কারখানায় ঐসকল জিনিষ প্রস্তুত হয়। যেমন নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে জল ফুটিতে আরম্ভ হয়, নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে কঠিন পদার্থ গলে, তেমনি বিস্ফোরক মিশ্র পদার্থসকলের নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে স্ফোটন হইবার কথা। কিন্তু এইরূপ সকল

ডক্টর রসিকলাল দত্ত।

পদার্থের প্রত্যেকটির এই উত্তাপের মাত্রা জানা ছিল না। ডাক্তার রসিকলাল দত্ত বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানের পর এই তাপমাত্রা স্থির করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবার জন্য লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটী কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে ৭৫ পাউণ্ড অর্থাৎ মোটামুটি ১২০০ টাকা মঞ্জুর করেন। এক্ষণে আমেরিকার ওলকট্ গিব্‌স্ মেমোরিয়াল্ ফণ্ডের ট্রাষ্টীগণ তাঁহাকে ঐ কাজের জন্য তিনশত ডলার অর্থাৎ প্রায় ১২০০ টাকা দিয়াছেন এবং অন্য একটি ফণ্ড্ হইতে চারিশত ডলার দিবার জন্য সুপারিস্ করিয়াছেন। একটি পরীক্ষা করিতে করিতে স্ফোটনে তাঁহার দুটি চক্ষু যাইতে বসিয়াছিল। ভগবৎ-কৃপায় বাঁচিয়া গিয়াছেন।

—

জনতার মতিগতি।

গুস্তাভ্ ল্য বঁ নামক ফরাসী গ্রন্থকারের "জনতা" বিষয়ক গ্রন্থে জনতার মতিগতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি জনতার ভাল মন্দ দুই দিকই দেখাইয়াছেন। মন্দ দিক্ এই একটা দেখাইয়াছেন যে, জনতা গড়া অপেক্ষা ভাঙার কাজে, রচনা অপেক্ষা বিনাশের কাজে, বেশী পটু ও উন্মুখ। জনতার আর-একটা (কু বা সু) গুণ তিনি এই দেখাইয়াছেন, যে, উহা বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা তত চালিত হয় না, যত প্রবল ভাব ও উত্তেজনা দ্বারা চালিত হয়। এইসব কথার সত্যতার পরিচয় সকল দেশেই আজকাল পাওয়া যাইতেছে। অথচ সব দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে জনগণের উপর। একনায়কত্বের দিন গিয়াছে, অল্পসংখ্যক অভিজাত লোকের নায়কত্বের দিনও গিয়াছে। একনায়কত্ব বা অভিজাততন্ত্রকে আবার স্থায়ী ভাবে কোথাও শক্তিশালী করা এখন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সত্য বটে, জনতা যখন নায়কবিশেষের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে কাজ করে, তখন একপ্রকার একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা অস্থায়ী। যাহাকে আজ জনতা ধিক্ ধিক্ বলিল, কয়েকদিন পরে তাহাকেই ধন্য ধন্য করিবে; যাহাকে আজ ধন্য ধন্য করিল, তাহাকে কিছুকাল পরে ধিক্কার দিবে। গত তিন চার মাসের মধ্যে কলিকাতার গোলদীঘিতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। একনায়কত্ব বা অভিজাতনায়কত্ব আর চলিবে না; অথচ জনতা অব্যবস্থিতচিত্ত, ভাব-ও-উত্তেজনাপ্রবণ, এবং ভাঙা ও নষ্ট করার দিকেই তাহার ঝোঁক বেশী। এ অবস্থার উপায় কি?

উপায় সুশিক্ষা। সুশিক্ষাপ্রাপ্ত নায়কেরা জনতাকে তেমন করিয়া নাচাইবেন না, যেমন করিয়া প্রাকৃত নায়কগণ (demagogues) নাচাইয়া থাকে; সুশিক্ষাপ্রাপ্ত জনতাও তেমন করিয়া কেবল ভাব ও উত্তেজনার বশে কাজ করিবে না, যেমন অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত জনতা করে। সংযত হইতে অভ্যাস করা এই শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান। সুশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের একটি প্রধান গুণ ও লক্ষণ এই যে তিনি স্বাধীন বিচারে সমর্থ। এবম্বিধ আরও নানা কারণে আশা হয়, যে, জনতার

গুণ এখন দেখা যাইতেছে, চিরকাল না।

এক একজন বা দশ জনের দ্বারা ভাল দেশের আদর্শ অবস্থা বলা যায় না। স্বশাসনসমর্থ কি না, দেশের কাজ ভাল একটা মানদণ্ড। অর্থাৎ যদি কোন দেশের রাজার অধীনে ভাল খাইতে পায়, সুস্থ ভাল বাড়ীতে সুন্দর শহর ও গ্রামে বাস করে, বিদ্যার অধিকারী হয়, তাহা হইলেই বলা যায় যে, দেশের কাজ ভাল চলিতেছে। দেশের কাজ ভাল চলিতেছে তখনই বলা যাইবে, যখন উল্লিখিত অবস্থা ব্যতীত দেশের লোকেরা নিজে দেশের কাজ চালাইবার মত জ্ঞান বিচারশক্তি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সংযম সাহস প্রভৃতির অধিকারী বলিয়া কার্য্যতঃ প্রমাণিত হইবে। দেশের কাজ ভাল চলার অর্থ শুধু প্রচুর খাদ্য বস্ত্র বিলাসদ্রব্য অট্টালিকা দৈহিক স্বাস্থ্য ও বলের উৎপাদন নহে; জ্ঞানী, স্বাধীনবিচারশক্তিসম্পন্ন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সংযত ও সাহসী মানুষের উদ্ভবও দেশের কাজ ভাল চলার অর্থের অন্তর্গত। ইহা সুশিক্ষা ভিন্ন হইতে পারে না। বিনা ব্যয়ে দেশের ধনী দরিদ্র সকলের কন্যা- ও পুত্র-সন্তানগণ উচ্চতম সুশিক্ষা পাইবার অধিকারী না হইলে এই অর্থে দেশের কাজ ভাল চলা কখন ঘটিতে পারে না। যখন ঘটিবে, তখন জনতার মতিগতিতে বর্ত্তমান অবাঞ্ছনীয় লক্ষণ ও প্রবৃত্তি বহুপরিমাণে হ্রাস পাইবে।

—

নিগ্রহ প্রতিকার নহে।

স্বেচ্ছাচারী রাজা বা আমলাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত বহু দেশে এরূপ দেখা গিয়াছে, যে, স্বাধীনতা-প্রয়াসী লোকদিগের খুব নিগ্রহ করায় দেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এরূপও দেখা গিয়াছে, যে, নানা কারণে দেশের মধ্যে লুটতরাজ ডাকাতি নরহত্যার প্রাদুর্ভাব হওয়া প্রযুক্ত ঐসব দেশে খুব কঠোর শাস্তি দেওয়ায় দেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন দেশেই এমন দেখা যায় নাই, যে, স্বাধীনতা-প্রয়াসী লোকেরা বা দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্ত লোকেরা চিরদিনের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে তাহারা নিজেই কিম্বা তাহাদের বংশধর বা স্থলভুক্তেরা আবার মাথা তুলিয়াছে, আবার শাসনযন্ত্রের পক্ষ হইতে দমন নিগ্রহ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে; ইত্যাদি। এইরূপ ঘটিতে ঘটিতে অনেক দেশে কালক্রমে একনায়কের বা স্বেচ্ছাচারীর রাজত্ব গিয়াছে, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে; প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও, যেমন বর্ত্তমান সময়ে রুশিয়ায়, রক্তপাত করিয়া জোরজবরদস্তি দ্বারা সাধারণ লোকদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বিনষ্ট, হীনবল বা নির্ব্বাসিত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ লোকদের এই প্রভুত্বের বিরুদ্ধেও আবার বিদ্রোহ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, দমন নিগ্রহ উৎপীড়ন অত্যাচার বলপ্রয়োগ ভাল লোকদের স্বাধীনতার ইচ্ছাকে বা দুর্দ্দান্ত লোকদের নানাবিধ দুর্বৃত্ততাকে চিরকাল বা দীর্ঘকালের জন্য প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারে না।

কিন্তু যদি নিগ্রহ দ্বারা চিরকালের জন্য কোন জাতি বা শ্রেণীকে ঠাণ্ডা করিতে পারা যাইত, তাহা হইলেই কি তাহা বাঞ্ছনীয় হইত? পরিবারের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। অনেক বাপ-মা সর্ব্বদা সব বিষয়ে ছেলেমেয়েদিগকে এরূপ শাসনে রাখেন, আজ্ঞাধীন রাখেন, যে, তাহারা ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, নিজেদের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা জন্মে না, সাহসের, আত্মকর্তৃত্বের বিকাশ হয় না। এই-সব ছেলেমেয়ে বড় হইয়া খুব নিরীহ হইতে পারে, গোবেচারী হইতে পারে; কিন্তু বাপমার মৃত্যুর পর উচ্ছৃঙ্খলও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ধরা যাক্, যে, তাহারা খুব "ভাল মানুষ" হইল। তাহাই কি মনুষ্যত্বের আদর্শ? তাহা নিশ্চয়ই নহে। ছেলে যদি দুর্বৃত্ত ও দুর্দ্দান্ত হয়, তাহা হইলে অনেক বাপমা ছেলেকে ঠেঙাইয়া ও অন্যবিধ কঠোর শাস্তি দিয়া সায়েস্তা করেন, ঠাণ্ডা করেন। কিন্তু ইহাতেই কি তাহার প্রকৃত মঙ্গল হয়? কখন কখন এরূপ ব্যবহারে তাহার মনুষ্যত্ব তাহার ইচ্ছাশক্তি পিষ্ট ও চূর্ণ হইয়া যায়; তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। কখন

বা সে আরও দুর্দান্ত ও দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে। শাস্তি কিছুই দিতে হইবে না, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু বলিতেছি, ওগুলা ক্ষণস্থায়ী উপায় মাত্র। মনের পরিবর্ত্তনে, হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে, অভ্যাসের পরিবর্ত্তনেই আসল প্রতিকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পরিবারে যে যে সদুপায় ও সুপ্রণালী অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, রাষ্ট্রেও তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যে-সব সচ্চরিত্র লোক স্বাধীনতা-প্রয়াসী হইয়া আন্দোলন করে, এবং সেই আন্দোলন-সূত্রে হয়ত কখন কখন দমনার্থ কল্পিত কোন কোন আইন ভঙ্গ করে, তাহাদের নিগ্রহ দ্বারা রাষ্ট্রে আদর্শ মানুষ গঠিত হইতে পারে না। তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়াটা আদর্শ নয়; আদর্শ হইতেছে দেশের মানুষকে স্বশাসনে সমর্থ করিয়া তোলা। ইহার জন্য বহু শতাব্দীর কোনই প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত ভাবে যেমন প্রত্যেক মানুষের ২০।২৫ বৎসরে সাবালক ও স্বশাসনক্ষম হইবার কথা, জাতিগতভাবেও তেমনি মানবসমষ্টি ২০।২৫ বৎসরেই স্বশাসনক্ষম হইতে পারে। জাপানীরা, ফিলিপিনোরা হইয়াছে। যাহারা ইহা অপেক্ষা বেশী দিন কোন জাতিকে পরাধীন শিক্ষানবীস্ থাকিতে বলে, তাহারা হয় ভ্রান্ত ও অজ্ঞ, নয় স্বার্থপর ও দুরভিসন্ধিগ্রস্ত ভণ্ড।

আমাদের স্বশাসন-ক্ষমতার বিকাশ নূতন ভারতশাসন-আইন দ্বারা কিপ্রকারে কতদিনে হইতে পারে, তাহার প্রমাণ সংবাদপত্রপাঠক শিক্ষিত লোকেরা, এমন কি নিরক্ষর কুলিমজুরেরাও আজকাল পাইতেছেন। বিস্তারিত মন্তব্য অনাবশ্যক।

দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক যদি দুর্দান্ত হয়, দস্যুতা নরহত্যাআদি করিতে থাকে, তাহাদেরও স্থায়ী প্রতিকার কেবল দমন দ্বারা হয় না। প্রকৃত প্রতিকারের জন্য আরও এবং অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথমে দেখিতে হইবে, কতকগুলি মানুষ কেন এরূপ দুষ্কর্ম করিতেছে। অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, দারিদ্র্য, অনেক দুষ্কর্ম্মের কারণ। মানুষ ধনীদের, ভূস্বামীদের, পুলিশের, অন্য রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারেও, আর সহিতে না পারিয়া, বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দুর্দান্ত হয়। দৃষ্টান্তেও মানুষের এই দুর্দ্দশা ঘটে। পৃথিবীতে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে হত হইল, রক্তের নদী বহিল, গ্রাম নগর ধ্বংসিত লুণ্ঠিত ও উৎসন্ন হইল, লক্ষ লক্ষ নারীর অপমান ও লাঞ্ছনা হইল, ইহার একটা সংক্রামকতা আছে, ইহা মানুষকে পশুভাবাপন্ন করিয়াছে। যদি আইন কানুন দেশের লোককে পিষিয়া মেরুদণ্ডহীন ভীরু ভেড়া করিয়া তুলিতে হইলে অসৎ ও অপেক্ষাকৃত সাহসী লোকদের একটা সুযোগে পরিণত হয়।

অতএব শুধু দমন না করিয়া দুষ্কর্ম্মের কারণ বাহির করিয়া তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করা উচিত। লোকদের মনুষ্যত্ব, সাহস ও ইচ্ছাশক্তিকে ফেলিয়া তাহাদিগকে সৎপথে চালিত করা উচিত। সমস্ত জাতির আত্মিক শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় দুর্দ্দান্ত লোকেরাই সৎপথে চালিত হইলে মহৎ হয়; যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সাহস তাহাদিগকে দুর্বৃত্ত করিয়াছিল, তাহাই তাহাদিগকে সৎপথে অজেয় করে। রত্নাকর যে বাল্মীকি হইয়াছিলেন, অজামিল যে সাধু হইয়াছিলেন, জগাই মাধাই যে ভক্ত হইয়াছিল, তাহা এক-একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে। বিজ্ঞান এরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

নানা প্রদেশে দমন-নীতি।

স্বাধীনতার ইচ্ছা দেশব্যাপী হইয়াছে। সন্ত্রাসবর্জ্জনের আন্দোলন দেশব্যাপী হইয়াছে। কোথাও আইনভঙ্গ ও বলপ্রয়োগ যে একেবারেই নাই, এমন নয়; কিন্তু সহযোগিতা-বর্জ্জকেরাই যে সর্ব্বত্র করিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যাহা হউক আন্দোলন ও অশান্তি যেমন দেশব্যাপী হইয়াছে, এবং নিগ্রহ-নীতিও তেমনি অল্পাধিক পরিমাণে সকল প্রদেশে অবলম্বিত হইতেছে। তন্মধ্যে বিহার সম্বন্ধে প্রতিই দেখিতেছি, লোকের নজর বেশী পড়িয়াছে। তাহার কারণ সম্ভবতঃ দুটি। বিহারে চম্পারন্ জেলায় নীলকর জমিদারের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য মহাত্মা প্রভৃতি চেষ্টা করেন। প্রথম যখন চেষ্টা আরম্ভ হয়,

তাঁহাকে ঐ জেলা ছাড়িয়া যাইতে হুকুম
ন তামিল না করিলে কারাদণ্ড হইতে পারে,
থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐ হুকুম অমান্য করেন।
হার বিচার আরম্ভ হয়, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের উপর-
ম অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া
তাহার পর রায়ৎ ও নীলকরের মধ্যে সম্বন্ধকে
র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কমিটি বসে। গান্ধী
ার অন্যতম সভ্য ছিলেন। কমিটির প্রস্তাবগুলি
পর গান্ধী-মহাশয়ের মতানুযায়ী হয়, এবং তৎ-
সমুদয় ...র্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত হয়। এই কারণে, বিহারে, বিশেষতঃ চম্পারন্ জেলায়, গান্ধী-মহাশয়ের প্রভাব খুব বেশী। তিনি যখন চম্পারনে কাজ করিতেন, তখন তাঁহার সাহচর্য্যে অনেক সুশিক্ষিত ও সদাশয় বিহারীর প্রাণে তাঁহার মানবপ্রেমিকতা, সাত্ত্বিকতা ও সাহস সংক্রামিত হয়। এইহেতু বিহারে সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টার খুব জোর। তথায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজ্‌হর্-উল্ হক্, প্রভৃতির মত সুশিক্ষিত ও বহুঅর্থউপার্জ্জক আইন-জীবী আইনব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মদ্যপান ও মদের দোকানের বিরুদ্ধেও বিহারে খুব প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। যেখানে জনশক্তি এরূপ জোরে কাজ করিতেছে, তথায় যে আম্‌লাতন্ত্রের পক্ষ হইতে দেশকে ঠাণ্ডা করিবার প্রবল চেষ্টাও হইবে, তাহা ত ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। হোন্ না কেন লর্ড সিংহ বাঙালী; তিনি ত ইংরেজের শাসনযন্ত্রের একটা অঙ্গ মাত্র। আর কোন বাঙালী বা ইংরেজ তাঁহার চাকরীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বিহারে ঐ রকম শাসনই হইত। অবশ্য উনিশ বিশ হইতে পারিত। আসল ভুল হইতেছে, ইংরেজ আম্‌লা-তন্ত্রের চাকরী লওয়ায়—তা সে চাকরী ছোটই হউক, আর বড়ই হউক। লর্ড সিংহ ঐ ভুল করিয়াছেন। তা ছাড়া, তিনি দেশী লোক বলিয়া, কিম্বা তাঁবেদার ইংরেজ হাকিমদিগকে আজ্ঞাধীন রাখিবার মত যথেষ্ট দৃঢ়তা তাঁহার নাই বলিয়া, তাহারা অন্যান্য প্রদেশের হাকিমদের অপেক্ষা বেশী জুলুম-বাজ হইতেছে কি না, বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহার দৃঢ়তা বা অদৃঢ়তার বিষয়ে আমাদের কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই।

যেখানে জনশক্তি জাগে ও কাজ করে, সেখানে উত্তেজনা হওয়া স্বাভাবিক, এবং জনতার মতিগতিসুলভ অল্পবিস্তর আইনভঙ্গও হইতে পারে। আন্দোলন, উত্তেজনা ও অশান্তির সুযোগে বদ্‌মায়েস্ শ্রেণীর লোকেও এমন সব কাজ করিতে পারে, যাহার দোষটা সহযোগিতা-বর্জ্জকদের ঘাড়ে পড়ে। আবার পুলিশের লোকেরাও স্বয়ং বা লোক লাগাইয়া আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়া বা করাইয়া তাহার দোষ সহযোগিতা-বর্জ্জকদিগের উপর ফেলিতে পারে।

বিহার ভিন্ন অন্যত্রও নিগ্রহনীতি চলিতেছে। দেশের পরিচারকদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ও মতপ্রকাশে বাধা দেওয়া হইতেছে। তাহাতে ফল বিপরীত হইতেছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে য়াকুব্ হোসেন, গোবিন্দ মেন্ প্রভৃতি বক্তৃতা করিবার নিষেধাজ্ঞা না-মানিয়া জেলে গিয়াছেন। তাঁহাদের পত্নীরা তাহাতে গৌরব বোধ করিতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন দাশকে মৈমনসিংহে ঢুকিতে দেওয়া হইল না এই ভয়ে, যে, পাছে তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে বিরত হয়। কিন্তু ফল হইল এই, যে, খুব বেশী ছেলে পরীক্ষা দিল না, আইনজীবীরা কয়েকদিনের জন্য ব্যবসা স্থগিত রাখিলেন, কুলি-মজুরেরা মোট বহিতে অস্বীকার করিল, সহরে হরতাল হইল, এবং চিত্তরঞ্জন নানাস্থানে রাজসম্মান লাভ করিলেন।

বস্তুতঃ আমরা আগে যাহা লিখিয়াছি, যে, নিগ্রহ প্রতিকার নহে, ইতিহাস এবং মানবচরিত্র-তত্ত্ব উভয়ই তাহার সমর্থন করে। প্রকৃত প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আমরা যে-মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও তাহার অনুসরণ করা যে প্রাদেশিক কোন গবর্ণমেণ্টের কিংবা ভারতগবর্ণমেণ্টেরও সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। প্রাদেশিক কোন গবর্ণমেণ্ট কিম্বা ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের শীঘ্র স্বাধীনতা অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিতে অসমর্থ; অথচ শীঘ্র স্বাধীনতা অর্জ্জন ব্যতিরেকে ভারতের অসন্তোষ ও অশান্তি কোন মতেই দূর হইতে পারে না। এইজন্য ইংরেজ জাতির ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই উচিত ভারতীয়

ইন এপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যাহাতে আমরা শীঘ্র ধীন হইতে পারি।

ব্যপান ও মদের দোকানের বিরুদ্ধে চেষ্টা।

বিহারে ও অন্য কোন কোন প্রদেশে মদের দোকানের কট দাড়াইয়া মদ্যপায়ীদিগকে মদ খাওয়া হইতে নিবৃত্ত রিবার চেষ্টা হইতেছে। নানাস্থানে মদের দোকানের ক্রী খুব কম হইয়া যাইতেছে। অনেক জায়গায় শুঁড়ি-নার ইজারাদারেরা আর ইজারা লইতে চাহিতেছে না। হার-ওড়িষ্যায়, বঙ্গে, মধ্যপ্রদেশে পুলিসের উপর মদ াওয়া যে দণ্ডকারী ও ভাল এবং উহা যে সর্কারের হুকুম, এইরূপ কথা লোকদিগকে সমঝাইয়া দিবার গোপন আদেশ াসিয়াছে শুনিয়াছি। মদ্যপান ও বিক্রয়ের বিরোধীদের নগ্রহও নানাস্থানে হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ এই, য, আবকারী হইতে সব প্রদেশেই সর্কারের খুব আয় য়, ঐ আয় বন্ধ হইলে সর্কারী খরচ চালান কঠিন ইবে। বিহার গবর্ণমেণ্ট একটা সার্কুলার বাহির করিয়া লিতেছেন, যে, আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য, সামাজিক ন্নতি নহে, গবর্ণমেণ্টের বিনাশ সাধন। মধ্য প্রদেশে াগপুরের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে আন্দোলকদের উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টকে অস্বচ্ছলতায় ফেলিয়া ব্যতিব্যস্ত করা। আমাদের মতে আন্দোলকদের উদ্দেশ্য লইয়া তর্কবিতর্ক করা অনাবশ্যক। কারণ, উদ্দেশ্য যদি হয় সামাজিক উন্নতি তাহা হইলেও মদ্যপান বন্ধ করিতে হইবে, এবং তাহাতে মদের কাটতি বন্ধ হইবে এবং তজ্জনিত রাজস্ব-হানি ঘটিবে। যদি গবর্ণমেণ্টকে বিনষ্ট বা ব্যতিব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও মদের কাটতি বন্ধ করিয়া রাজস্ব-হানি ঘটাইতে হইবে। উভয় প্রকার উদ্দেশ্যের সিদ্ধির ফল হইবে একই, অর্থাৎ রাজস্বের হ্রাস। কিন্তু এক দিকে রাজস্বের হ্রাস হইলেই গবর্ণমেণ্ট কেন বিনষ্ট ইবে? পৃথিবীর নানাদেশে (ঔষধার্থে ভিন্ন) মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে ঐসব দেশের আবকারী আয় কমিয়াছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নষ্ট হয় নাই। বরং, অন্যদিকে, মদ্যপান খুব হ্রাস পাওয়ায় লোকে অধিক পরিশ্রমী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় হওয়ায় অধিক ধন উৎপন্ন হইতেছে ও তাহার উপর ট্যাক্স্ আদায় হইয়া রাজস্ব বাড়িতেছে। কিন্তু যদি রাজস্ব মোটের উপর কমেই, তাহা হইলেও কম রাজস্বেই দেশের কাজ চালাইতে হইবে; মানুষকে পাপাসক্ত করিয়া বড় াকুরেরা মোটা মোটা বেতন লইবেন, ইহা অতি গর্হিত ীতি। যদি পাপাসক্তি হইতে রাজস্ব না পাইলে কোন বর্ণমেণ্ট নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার নষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিহার গবর্ণমেণ্টের সার্কুলার বলিতেছেন যে, "সুবিবেচিত আবকারী নীতি" দ্বারা সামাজিক কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। ইহা নিতান্ত বাজে কথা। [illegible] বর্ষে এইরূপ "সুবিবেচিত আবকারী নীতি"র [illegible] কালের মধ্যে আবকারী রাজস্ব ৪৫ গুণ বাড়িয়াছে এবং মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের মোট কাটতি [illegible] বাড়িয়াছে। যে-সব দেশে মদ খাওয়া সামাজিক [illegible], তথায় উহার উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে [illegible] হইতেছে, আর আমরা "সুবিবেচিত আবকারী [illegible]" উপদেশ শুনিতেছি! অধঃপাত আর কাহাকে বলে?

বিহারে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা [illegible] আমরাই প্রথমে মডার্ন্ রিভিউতে লিখি, এবং তাহার বিষয় আমাদের আফিস্ হইতে সবিশেষ জানিয়া লিয়া একজন ভদ্রলোক মফঃস্বলের একখানি বাংলা কাগজে [illegible] বলিয়া অনুমান হয়। গত ১৫ই জানুয়ারীর বিহার [illegible] C. I. Gazette এর ক্রোড়পত্রের ২৩ পৃষ্ঠায় ৩রা [illegible] পাইয়োনীয়ার হইতে মদ্যপানসমর্থক একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয়। অনাবশ্যক বোধে মডার্ন্ রিভিউয়ে আমরা উহার প্রথম প্যারাগ্রাফটি ছাড়া আর বেশী কিছু ছাপি নাই। এক্ষণে অন্যান্য অংশও ছাপিতেছি।

56. In these days when the teetotal [illegible] gaining considerable ground and "Pussy [illegible] becoming the accepted creed of an increas[illegible] number of people, it is well to point out the value [illegible] both as a food and as a medicine, writes a phys[illegible] in the *Daily Mail*. What is wanted is not teeto[illegible] but moderation, for if wine be excluded from t[illegible] of the whole community, a food of equal valu[illegible] would be denied us.

Many great men of the past were wine d[illegible]— Moses, Alexander the Great, Julius Caesar, N[illegible] Shakespeare, Scott, Stephenson, Gladstone, [illegible] field, Bismarck, Tennyson, to name only [illegible] them.

The value of wine as a food is und[illegible] and few years back some experiments wer[illegible] by means of a special instrument, the [illegible] measure the variation of muscular [illegible] was taken and without it. The investigat[illegible] that more work with less fatigue could be d[illegible] wine than without it.

It has truly been said that wine has the [illegible] unlock the stores of energy that exist in the brain and to render available for immediate exp[illegible] energy which without this liberating [illegible] remain in store, unavailable for our [illegible]. Wine also enables people to digest food w[illegible] absence they would be unable to assimil[illegible]

The health of the French Army, and [illegible] the absence of dysentery at Gallipoli, was largely du[illegible] to the use of red wine.

Alcohol is not only a nutrient, it is also [illegible] tonic, a food with a definite action [illegible] system. Like the carbohydrates it [illegible] furnishes energy for muscular work [illegible]

not take the place of alcohol because the
uch specific action on the brain and nervous

, a source of energy can be assimilated very
reas the energy in a dilute alcoholic bever-
ularly in wine, is almost immediately avail-

t that alcohol is a food and is consumed in
ke the carbohydrates is often overlooked,
an who takes as much proteids, fats, sugar,
as he needs plus an alcoholic beverage
and suffer accordingly.
suffering is often attributed to the alcohol,
t is really due quite as much to the food,
in excess of the normal requirement. "A
drinks wine with his meals should take less
n the man who drinks only water."
es of anæmia, impaired nutrition, brain fag,
exhaustion, and in convalescence generally,
f wine is highly to be recommended.

তী ডেলী মেলে যে চিকিৎসক এইসব কথা
ন, তিনি নামটি দেন নাই; নতুবা বুঝা যাইত
দরের চিকিৎসক। প্রবন্ধটাতে নানা অবৈজ্ঞানিক
মিথ্যা কথা আছে। মদ্যের বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে নীলরতন-
বাবু প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদের ও বিদেশী
বিখ্যাত চিকিৎসকদের একটি মত-সংবলিত পত্রী বাহির
হইয়াছিল। আবার তাহা প্রচারিত হওয়া উচিত।

সরকারী টাকায় (অর্থাৎ প্রজাদের টাকায়) পুলিশের
গেজেটে এই সময়ে এরূপ প্রবন্ধ ছাপিবার উদ্দেশ্য কি?
পুলিশ কর্ম্মচারীদের নিজেদের মধ্যে বা দেশের লোকদের
মধ্যে মদ্যপানবিস্তার কি পুলিশের একটা কর্ত্তব্য?

তা ছাড়া, আমাদের দেশের সমগ্র লোকদের খাদ্য-
সম্ভারের মধ্যে ("dietary of the whole community") মদ্য ত অন্তর্ভূত নয়। এদেশে ঐ অঘন্য জিনিষটার
গুণবর্ণন কেন করা হইল? পাশ্চাত্য নানা বিখ্যাত লোক
মদ খাইতেন বলিয়া লেখা হইয়াছে। তাহাতে আমাদের
কি? আমাদের দেশের ঐশ্রেণীর মদ্যপায়ী লোক কতগুলা
আছে? থাকিলেও, যাহা কদাচার কদভ্যাস তাহা আমরা
মানিব না। বড় লোকের গুণ যাহা তাহাই লইব, দোষ
সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য।

যাহা হউক, এই ইংরেজী প্রবন্ধটার একটি বৈজ্ঞানিক
খণ্ডন আবশ্যক। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি,
ঐ প্রবন্ধ-সংবলিত পুলিশ-গেজেটের পাতায় "For information. Circulate" হাতে লেখা বিহার-ওড়িষার
থানায় আসিয়াছে, এবং প্রতি মঙ্গলবার চৌকিদারদিগকে
এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইত বা হয়।

মেথডিষ্ট খৃষ্টিয়ান্‌দিগের ইণ্ডিয়ান উইট্‌নেস্ নামে একটি
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে। তাহা ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয়
অধিকার-লাভ প্রচেষ্টার সমর্থক নহে। কিন্তু তাহা
সহযোগিতা-বর্জ্জকদের মদ্যপান ও বিক্রয় নিবারণ চেষ্টা
পুরা সমর্থন করিয়াছে।

—

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ন্যাল্ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়
একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের যতগুলি পরীক্ষা দিয়াছিলেন সবগুলিতে
খুব কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে-সকল
কর্ম্মীর চেষ্টায় বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার স্বাধীনচিন্ততা প্রকাশ পাইত।
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীর দল এবং কলিকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের পল্টন গঠনের জন্য খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন
এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনারারি লেফ্‌টেন্যাণ্ট
কর্ন্যাল্ উপাধি প্রদান করেন।

—

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ।

সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এক সময় কলিকাতা
রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার নিবাস এই সহরে
বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে। তিনি যেরূপ বিদ্বান্ ছিলেন,
জনসমাজে তাঁহার তদ্রূপ প্রসিদ্ধি হয় নাই। "বঙ্গাধিপ-
পরাজয়" নামক উপন্যাস তাঁহার লিখিত। তিনি ইংরেজী
সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষা জানিতেন, এবং
নানা বিষয়ে অমুদ্রিত বিস্তর লেখা রাখিয়া গিয়াছেন।
পেন্‌শন্ লইবার পর তিনি বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন।
মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বোধ হয় আশীর উপর হইয়াছিল।
বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীটি একটি দেখিবার
জিনিষ। বাহিরে বাহিরে দেখিলে উহা চমৎকার মনে
হয় না। কিন্তু উহাতে নানাবিধ পাথরের কাজ এবং
পাথরে খোদিত নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি আছে। তৎসমুদয়ের
ফোটোগ্রাফ ছাপাইবার যোগ্য।

—

তথাকথিত "অনাচরণীয়"দিগের কথা।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় যখন স্বদেশী আন্দোলন হয়,
তখন অধিকাংশ বাঙালী মুসলমান তাহাতে যোগ দেন নাই,
অধিকাংশ নমঃশূদ্রও যোগ দেন নাই। এখন যে সহ-
যোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে
আমাদের মত আগে আগে প্রকাশ করিয়াছি, এখন পুন-
রুক্তি অনাবশ্যক। উহা ভালই হউক আর মন্দই হউক,
এখন কুড়ি লক্ষ নমঃশূদ্রদিগকে এই বলিয়া উহাতে যো

বলা হইতেছে, যে, একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টই
র উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, আর কেহ করে
তএব এই আন্দোলনে যোগ দিও না, ইত্যাদি।
ড্ সাহেব এইরূপ কথা বলিতেছেন। এসব কথা
সত্য, তাহার আলোচনা আমরা করিব না।

ক্ষণ ভারতে অ-ব্রাহ্মণ প্রচেষ্টা দ্বারাও ব্রাহ্মণেতর
কলকে ব্রাহ্মণদিগের হইতে পৃথক্ রাখিতে চেষ্টা
য়াছে।

বিধ নানা চেষ্টায় জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভে প্রভূত
ন্মিয়াছে।

মরা ধর্ম্মের দিক্ দিয়া কোন জাতি বা জা'তকে
ন অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য মনে করি না। রাষ্ট্র-
দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যে, যতদিন
ক রীতি কোন জা'তকে হীন অনাচরণীয় বা অস্পৃশ্য
দিবে, ততদিন জাতীয় সংহতত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব
রাহত থাকিবে।

ক্ষিণ ভারতে এইশ্রেণীভুক্ত, সংখ্যায় ষাট লক্ষ, "আদ্রি
"দিগের সভায় তাঁহারা গত নবেম্বর মাসে অতি
ভাষায় একটি প্রস্তাব ধার্য্য করেন। তাহার শেষ
তুলিয়া দিতেছি।

ll this meeting is firmly convinced that General
was an angel of mercy compared with the caste
n or Varnashrama Dharma which resulted in
segregation and consequently living death of
millions of men and women for so many centuries
.at Colonel Frank Johnson, who ordered Indians
rawl on their bellies through certain streets in
itsar, was the soul of compassion compared with
e Varnashrama Dharmists who would not allow
bers of our community even to crawl on their
es through their streets, and calls upon Mr.
dhi and his co-workers to have moral courage to
ove these grosser and greater social wrongs of ages
re trying to redress lesser political wrongs of
erday and seeking to destroy the British Govern-
t which has been still and is on the whole the
st and best Government which India has or can
at the present imperfect stage of her national
on.

এই প্রস্তাবটির ভাষা, ভাব ও মতের সমালোচনা বা
ন কিছুই করিব না (যদিও ইহা সত্য যে দক্ষিণ ভারতে
শত গ্রামে ও নগরে ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চজাতিদের
ষিত পল্লীতে "অস্পৃশ্য" জাতিরা, পায়ে চলিয়া ত নহেই,
ক ইটিয়াও যাইতে পায় না)। কেবল ইহাই
লিতে চাই, যে, যে-দেশে লক্ষ-লক্ষ লোকের মনের
অপর লক্ষ-লক্ষ লোকের প্রতি এইরূপ, সেদেশে
জাতীয় স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা করা দরকার,
ক্য ভাব ও সাম্য স্থাপনের জন্য অন্ততঃ
চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা যে কত বৎসর
ধরিয়া এসব কথা বলিতেছি মনে নাই। মহা
গান্ধী বর্ত্তমান সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টা উপলক্ষে বহুবার
বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যতা" দূর করিতে না পারিলে, স্বরাজ
কেন এক শতাব্দীতেও আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব
না। ইহা অতি সত্য কথা।

গ্রাহকদিগের প্রতি বিশেষ অনুরোধ।

প্রবাসীর কলেবর ও মূল্য আগামী বৈশাখ হইতে
দেড়গুণ বাড়িবে বলিয়া গত সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিবার পর
ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিবের ১৯২১-২২ সালের আয়
ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে
দেখা যায় যে ১৯ কোটি টাকা অকুলান পড়িবে এবং
নানা প্রকার ট্যাক্স দ্বারা ঐ ১৯ কোটি টাকা তোলা
হইবে। তাহার মধ্যে পোষ্টকার্ড ও চিঠির ডাকমাশুল
দ্বিগুণিত করা, এবং খবরের কাগজগুলির ডাকমাশুল
কার্য্যতঃ দ্বিগুণিত করা, অন্যতম উপায়। এ পর্য্যন্ত
প্রবাসী দুপয়সা ডাকমাশুলে যাইত। বৈশাখ হইতে চারি
পয়সা লাগিবে। অর্থাৎ গ্রাহক প্রতি আমাদিগকে বৎসরে
ছয় আনা বেশী খরচ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই
হাজার গ্রাহকের জন্য আমাদিগকে বৎসরে ৩৭৫৲ টাকা
অতিরিক্ত খরচ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই ১৮৫৲ এর
চাঁদা ছয় টাকা লিখিয়াছি। এখন পুনর্ব্বার তাহা বাড়াইয়া
৬৷৵০ করা ভাল নয়। এই জন্য চাঁদা ছয় টাকাই থাকিল।
গ্রাহকেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সুবিধা-অসুবিধার
প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে উপকৃত হইব। ভ্যালু-
পেয়েব্‌ল্ ডাকে কাগজ পাঠাইলে অনেক সময় পত্রিকার
মূল্য ডাকঘর হইতে পাইতে বহু বিলম্ব হয়, কখন কখন
টাকা পাওয়াই যায় না। অথচ যে-সকল গ্রাহক ডাক-
পিয়াদাকে টাকা দিয়া পত্রিকা লইয়াছেন, তাঁহারা মনে
করেন আমরা টাকা পাইয়াও অকারণ তাহাদিগকে কাগজ
পাঠাইতেছি না। এই হেতু, যদি গ্রাহকগণ মোকেল মারফৎ
কিম্বা মনিঅর্ডার করিয়া ছয়টি টাকা পাঠাইয়া দেন এবং
তাহার সঙ্গে গ্রাহক-নম্বর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেন, তাহা
হইলে উভয় পক্ষের বড়ই সুবিধা হয়। টাকা ১লা চৈত্র
কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে ২০শে চৈত্র নাগাদ আমাদের আফিসে
পৌঁছিলে বড় ভাল হয়।

আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ এই, যে, যাঁহারা ১৩২৮
সালে প্রবাসী লইবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ১লা
চৈত্রের মধ্যে গ্রাহক-নম্বর সহ তাহা আমাদিগকে
জানাইবেন। ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ ডাকে প্রেরিত কাগজ ফেরৎ
আসিলে কাগজখানি নষ্ট হইয়া আসে, তাহা দেয়

হইলে পত্র পত্র, এবং ডাকমাশুল নষ্ট হয়। ভ্যালুপেয়েব্‌ল্ প্যাকেট্ রেজিষ্টরী করিয়া , এবং ডাকমাশুলও দুপয়সার জায়গায় এক ব। এইজন্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার প্যাকেট্ ফেরত আসিলে আমাদের লোক্‌-বেশী হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া গ্রাহকেরা সুরোধ রক্ষা করিলে বাধিত হইব।

—

কয়েকটি প্রশ্ন।

বিভাগের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ কৌন্সিলের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে নিম্ন-মুদ্রিত প্রস্তাব দুটি মঞ্জুর হয়ঃ—

That Dr. Gauranganath Banerjee, M.A., Ph. D., Offg. Secretary, be appointed secretary for a term of five years with effect from 1st June, 1921, that his initial salary be fixed at Rs. 500 and that the question of his grade be brought up for consideration when the Budget for 1921-22 is prepared.

That Dr. Gauranganath Banerjee do continue to be a member of the staff of Post-Graduate Lecturers in History without further additional remuneration.

কমিটির এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক স্টীফেন, ডাক্তার নরেন্দ্রকুমার মুখুজ্যে, পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু, অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র, অধ্যাপক ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার সুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী। ইহাঁরা সবাই শিক্ষিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তি। ইহাঁদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

(১) তাঁহারা যাঁহাকে কৌন্সিলের সেক্রেটরী ও অন্যতম অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহার একখানি বহি সম্বন্ধে যে-সব কথা খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা পড়িয়াছেন কি না? (২) ঐসব কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন কি না? (৩) বিশ্বাস না করিলে তাঁহাদের সহযোগীর নিন্দা অপনোদনার্থ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না? (৪) যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে রচনাপহরণ কার্য্যটি প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় মনে করেন? (৫) প্রশংসনীয় হইলে তাঁহারা স্বয়ং উহা করিতে প্রস্তুত কি না; বা তাঁহাদের ছাত্র ও বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে উহা করিতে উপদেশ দেন কি না? (৬) যদি নিন্দনীয় মনে করেন, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্যের কর্ত্তাকে তাহারা ছাত্রদের শিক্ষকের পদে ও শিক্ষকপরিষদের সম্পাদকের পদে নিয়োগে দিয়াছেন বা দেন নাই? এবং যাঁহারা দিয়াছেন কি জন্য দিয়াছেন? [বাকী প্রশ্নগুলি সম্মতি জন্য] (৭) নিযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তে ছাত্রদের হইবে, না অপকার হইবে? (৮) ছাত্রেরা ও তাঁহার নিয়োগকর্ত্তাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পা না, এবং তাহাদের গুরুভক্তি বাড়িবে কি না? (৯) আচরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত কি না? (১০) যাঁহারা এই নিয়োগে সম্মতি দি তাঁহাদের ভোট, রমাপ্রসাদ-বাবুর ভাষায়, আং মুঠার ভিতর কি না? (১১) যদি মুঠার ভিতর হয়, হইলে কি প্রকারে ও কি-কি সর্ত্তে ভোটগুলি মুষ্টিগত হইয়াছে?

—

রাষ্ট্রীয় চিন্তার বিভিন্ন ধারা।

আমাদের দেশের রাজনৈতিকমতিবিশিষ্ট (cally-minded) লোকেরা এখন কয়েকটি দলে বি আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক দলেই অকপট স্বদেশ লোক আছেন, স্বার্থসিদ্ধিপ্রয়াসী লোকও আছে। কে কোন্ দলের লোক তাহা ভাবিয়া কাহারও কার্য্যের আলোচনা করিতে আমরা অনিচ্ছুক। ব্য সমালোচনা না করিয়া দুটি দলের রাষ্ট্রীয় চিন্তার আলোচনা করা যাইতে পারে।

একদল মনে করেন, আমরা যদি দেশের কোন কাজ করিবার ভার পাইয়া ও লইয়া তাহাতে যে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে ক্রমশঃ অন্যান্য কাজের আমরা পাইব, এবং শেষে সব কাজই আমাদের আসিবে। এ সম্বন্ধে নানা বক্তব্য আছে। কিছু যে-সব বিষয়ে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়া বি তাহারও পূরা ভার আমরা পূর্ব্বে কখন পাই নাই, পাইতেছি না। সুতরাং দাতাদের ন্যায়বুদ্ধি ও সদাশ আমাদের আস্থা নাই। সকলের চেয়ে দরকারী যেসব বি এবং জাতীয় স্বাধীন জীবন ও আত্মকর্ত্তৃত্বের জন্য যে সব ও বিভাগ একান্ত আবশ্যক, সেগুলি সব ভারতগবর্ণ হাতে। তাহার কোনটির দায়িত্ব আমরা এখনও নাই, তাহা দিবার কোন অঙ্গীকারও গবর্ণমেণ্ট নাই। সকলের চেয়ে মারাত্মক শক্তি দুটি,—(১) স শক্তি এবং (২) আর্থিক শক্তি। সামরিক শক্তি ইং হাতে চিরকাল থাকিবে, ব্যবস্থা ত এইরূপ; কমিটির রিপোর্ট অনুসারে কাজ হইলে ভারতগব পর্য্যন্ত ভারতের অর্থে পোষিত সৈন্যদলের কর্ত্তা খ না। কারণ, কি-জানি যদি কখন ভারতগব

যদের সংখ্যা প্রভাব ও ক্ষমতা বেশী হয়, তাহা
ও সামরিক শক্তি ভারতগবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা
য়াতির প্রভুত্বের পক্ষে নিরাপদ না হইতে পারে।
যেরূপ ক্ষমতাই পাই, আমরা বেয়াদব হইলে
হইলে আমাদের উপর গুলি চালাইয়া আমাদিগকে
করিবার ক্ষমতা অন্যের হাতে থাকা চাই।
ক্ষমতা ইংরেজের হাতে রাখিবার দুটা ওজুহাত
হয়। প্রথম উহাদের হাতে তাহা না
আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি
মরিব; দ্বিতীয়, বাহিরের শত্রু আসিয়া আমাদিগকে
করিবে। এমন কোন দেশ নাই, যেখানের
অদূর অতীত কালে পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে
র কাটাকাটি করিত না। তাহারা পরাধীন না
নিজেদের মধ্যেই আপোসে মিটমাট করিয়া সদ্ভাবে
থতে শিখিয়াছে। আমরা এখনও শিখি নাই, বা
লেই শিখিব না, তাহার প্রমাণ কি? ইংরেজরা
ব আগে আমরা ইউরোপের দেশ-সকলের লোকদের
ণী অন্তর্যুদ্ধ- ও অন্তর্বিবাদ-পরায়ণ ছিলাম না; এবং
ছিলাম, তাহাতে আমরা এত সমৃদ্ধ হইয়াছিলাম
ীপের নানা জাতি অর্থলোভে আমাদের দেশে
ও প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছিল। অনেক দেশে
অন্তর্যুদ্ধ চলিতেছে। যেমন ভূতপূর্ব্ব রুষীয়
র অন্তর্ভূত নানা দেশে, খাস্ রুশিয়ায়, আর্ম্মীনিয়ায়,
তে, ইত্যাদি। ইংরেজ বা অন্য কোন জাতি ত
পরিত্রাতা রক্ষাকর্ত্তা হন নাই? আর যদি
পক্ষপুটের আশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা আহাম্মকের
দের মধ্যে মারামারি করিয়াই মরি, তাহা হইলে
ও পরাধীন থাকা অপেক্ষা ধরাপৃষ্ঠ হইতে আমাদের
ওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নহে? বাহিরের শত্রুর
ার আশঙ্কা সব দেশকেই এখনও করিতে হয়।
ত সকলকেই ওরূপ আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে।
কালে যেমন ইংলণ্ড বার বার রোমান, এঙ্গ্‌ল্
ট্, ডেন্, নর্ম্যান্ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিজিত
আমাদের দেশও তেমনি আক্রান্ত ও বিজিত
। মুসলমান জেতারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা
বার পর এবং ইংরেজরা ভারতের প্রভু হইবার
ন বহিঃশত্রু স্থায়ী ভাবে ভারত জয় করে নাই।
অন্যান্য বহিঃশত্রু যখন ভারতে আসিয়াছিল,
মরা তাহাদের সঙ্গে অনেকদিন পর্য্যন্ত সমানে
াযি; তখনও ভারতীয় বড় বড় দক্ষ সেনাপতি
ষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে পর্য্যন্ত ভারতীয়
সেনাপতির অধীনে ইংলণ্ডীয় 'গোরা' সৈনিক
ছে। ইংরেজ আমাদিগকে পদানত করিবার
পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সৈন্যদ্বারা আফ্‌গানিস্থ
হইয়াছিল, মানসিংহ তাহার সুবেদার ছিলেন
পর শিখ্ আমলে হরিসিং নালুয়া আফ্‌গা
করিয়া আফ্‌গানদিগকে এমন ভয়বিহ্বল ক
যে, এখনও পাঠান মায়েরা হরিসিংএর নাম করি
জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকে। আর এখন এ
যুগে সভ্য ইংরেজের অধীনে ১৫০ বৎসরেরও উ
আমাদিগকে আফ্‌গান আক্রমণের ভয় করিতে
উন্নতি বটে। ইহা সত্য, যে, আমরা ন
শিখিতেছি, নূতন কলকারখানা ব্যবহার করিতে
পৃথিবীর খবর রাখিতেছি, এবং অন্য কোন
কিছু উন্নতি আমাদের হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র
যে দুটি তাহাতে আমাদের অধোগতি হইয়াছে।
কথা লিখিতেছি।

(১) আমরা অতীত কালে অনেকবার
পদানত হইয়াছি, শত্রু কখন কখন আমাদের দে
করিয়া আমাদেরই ভাই প্রতিবেশী হইয়া গিয়া
ব প্রভুত্ব করিয়াছে। কিন্তু আমরা অতীত
শত্রুকে যতবার তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছি, কিং
স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত প্রভুর অধীনতা-
করিয়াছি, তখনই তাহা আমাদের নিজেদের
শক্তি দ্বারা করিয়াছি; মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার
বিদেশীর মুখাপেক্ষা করি নাই, পরের বিদে
চাই নাই পাই নাই লই নাই। এই যে স্বাবল
ও স্বাবলম্বনের কাজ, এই যে বারবার ভূলুণ্ঠি
নিজের জোরে খাড়া হইয়া দাঁড়ান ও দাঁড়াইব
আত্মবিশ্বাস, এই অমূল্য জিনিষটি আমরা ইংরে
হারাইয়াছি। এখন আমরা পরের হাত হইতে
দান স্বরূপ "স্ব-অধীনতা" পাইব বলিয়া আশা
এইরূপ আশাটাই একটা স্ববিরোধী জিনিষ।
চাহিতেছি স্বাধীনতা, অথচ স্বাধীনতার আশাটা
কল্পনাটা পর্য্যন্ত পরাশ্রয়ী, পরানুগ্রহাব
হইয়া
আশা ও কল্পনা পর্য্যন্ত পরাধীন হইয়া যাওয়ার মত
ও গোলামী অতীত কোন যুগে আমাদের হই
না, তাহা ঐতিহাসিকেরা বলুন। ইহাই এ
সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাকর ও ক্ষোভজনক slave me
গোলামী ভাব, বা দাসসুলভ মতিগতি; দুই চারি
প্রার্থী হওয়া ইহার মত গোলামী ভাব নহে।

(২) দ্বিতীয় যে অমূল্য জিনিষটি হারাইয়া
আত্মরক্ষার ক্ষমতা। ইংরেজ যখন প্রথম ভার
তখন সব প্রদেশের লোকেরাই সৈনিক হইত
পারিত, যুদ্ধ করিতে পারিত। ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কে
আমলেও সব প্রদেশ হইতে দরকার-মত কোম্প

তাহার পর ইংরেজশাসনভুক্ত প্রদেশগুলি
পৌরুষহীন ও নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে, এবং দেশী
নেপাল, আফ্‌গান সীমান্তের পাঠানের বাসভূমি,
ন হইতেই প্রধানতঃ সিপাহী সংগৃহীত হইতেছে।
ভারতবর্ষের লোকেরা আত্মরক্ষায় অনভ্যস্ত ও
য়াছে ও হইতেছে।
। পর যতদিন আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে,
উহা "আত্ম"-রক্ষা নয়; উহারা ত আমাদিগকে
ক্ষা করিতেছে, যেমন ভেড়ার মালিক নেকড়ে
মেষ রক্ষা করে। আত্মরক্ষার মানে নিজের
ঙ্গকে রক্ষা করা। তাহা যদি আমরা না পারি,
। "মেষ আমরা, নহি ত মানুষ"; তাহা হইলে
। মেষদিগের ভূভার বৃদ্ধি করিবার কোন
য়াছে কি?
ব ইংরেজলেখক অধ্যাপক স্যার জন সীলি
ম্প্যান্‌শুন অব্ ইংল্যাণ্ড্ নামক বহিতে যে
, "Subjection for a long time to a
oke is one of the most potent causes
mal deterioration", "দীর্ঘকালের জন্য
অধীনতা জাতীয় অধোগতির বা অপকর্ষের
বত্তম কারণ," তাহা ভারতবর্ষের সম্পর্কে অতি

করুন, একটা ঘরবাড়ী আছে ও তাহার সংলগ্ন
আছে। ছলে বলে কৌশলে যাহারা উহার
য়াছে, তাহারা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকারী-
লে, "তোমরা নর্দ্দামা সাফ্ কর, পাঠশালে
নিযুক্ত কর, খুব ভাল করিয়া চাষ বাস কর, পরে
মরাই মালিক হইবে, কিন্তু আপাততঃ প্রধান
াবাট, টাকাকড়ির আমদানীর প্রধান প্রধান
ং, সর্ব্বোপরি, দারোয়ান চৌকিদার লাঠিয়াল
লা আমাদের তাঁবে থাকুক," তাহা হইলে
রীদের পৈত্রিক ঘরবাড়ী ও জমীজমার মালিক
াবনা ও আশা যতটা হয়, ইংরেজদের নিকট
রতশাসন-আইনের বলে আমাদের দেশের
বার সম্ভাবনা ও আশা তদপেক্ষা বেশী বা
ন, পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।
চিন্তার ধারা আর-একপ্রকারের আছে।
যে, আমরা নিজের পৌরুষের দ্বারা নিজেদের
লক হইব, মালিক হইবার পর নর্দ্দামা
হোশয় নিয়োগ, প্রভৃতি, সহজেই হইতে
পরানুগ্রহে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পাইবার
াশা ও কল্পনাকেও মনে স্থান দিব না।
পৌরুষ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে-প্রকারে

দেখাইয়াছিলেন, সে পথ আমাদের নয়। কে
তাহার উত্তর নানা জনে নানা রূপ দিবেন। কেহ
যুদ্ধ অপেক্ষা সত্যাগ্রহ ও সাত্ত্বিক প্রতিরোধ শ্রেষ্ঠ
অধিকতর ধর্ম্মসঙ্গত উপায়; কেহ বলিবেন,
বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভের
সম্ভাবনা নাই, অতএব সত্যাগ্রহ ও সাত্ত্বিক
অবলম্বনীয়; কেহ বা এই উভয় কারণে এই নি
অবলম্বন করিবার পক্ষে। কারণ যাহাই হউক,
পন্থা। কিন্তু ইহাও যে যুদ্ধের মত একান্ত ত্যাগ,
কষ্টসহিষ্ণুতা, চূড়ান্ত সাহসের পন্থা, তাহাতে সন্দে
কেহ এই পথের পথিক হইতে চাহিলে ইহা জানিয়
হইবে। বুঝিতে হইবে, যুদ্ধে ও এই পথে প্রভেদ
যুদ্ধে অপরকে দুঃখ দিতে হয়, নিজেও দুঃখ পাইতে
পথে কেবল নিজেই দুঃখ সহিতে হয়, অপরকে ব
অপরকে আঘাত করা, অপরের দ্বেষ করা এই পথে

—

ভারতের ১৯২১-২২ সালের আয় ব্য

এখন সমগ্র ভারতের এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের
বৎসরের আয়-ব্যয়ের আলোচনা চলিতেছে
কাগজে বিস্তারিতভাবে সমুদয় বা কোন একটি
আলোচনা করিবার স্থান ও সুবিধা নাই। অ
একটা সাধারণ কথা মাত্র বলিব। পাঠকেরা মোট
বুঝিয়া রাখুন, যে, ইংরেজের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য
আবশ্যক, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট অকাতরে অর্থ ব্যয়ের
করিয়াছেন। এইজন্য সেনার জন্য ব্যয় খুব বে
হইয়াছে, সব প্রদেশেই পুলিসের খরচের বরাদ্দ
করা হইয়াছে। আর একটা কথা বুঝিয়া রাখু
ইংরেজের ও ফিরিঙ্গীর সুখসমৃদ্ধি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার
দরকার, তাহার জন্যও খুব অর্থব্যয় করা হইবে।
মোটা মাহিনা আরো মোটা হইয়াছে, ইংরেজ
বাড়ী উৎকৃষ্ট রকম হইতেছে, সার্জ্জেণ্টদেরও তাই,
ফিরিঙ্গী ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের জন্য প্রভূত টাকা
হইয়াছে, ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবী চাকরদিগকে সন্তু
দরকার বলিয়া দেশী হাকিম অধ্যাপক উচ্চশ্রেণীর
প্রভৃতির বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরেজ ও দেশী
সরকারী চাকরের অন্নকষ্ট হয় নাই, তাহাদের বেতন
বাড়িয়াছে; কিন্তু সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর চাকরদের বেতন
সামান্য বাড়াইবার কথা উঠিয়াছে, কাহারও বা
কাহারও এখনও বাড়ে নাই; কারণ, ইহাদের যে
হইয়াছিল! গীতাতে আছে, "দরিদ্রান্ ভর কৌ
প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্;" অভিনব গীতার মন্ত্র, "ঈশ্ব
কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছ দীনে ধনম্"! তদনুসারে